শারদীয়া

সংখ্যা-৯-১, ৯৯-৯২

সম্পাদিকা

শ্রীস্নেহলতা সেন

(বৈশাখ-অগ্রহায়ণ)

শ্রীকমলা দাশগুপ্ত

(পৌষ-চৈত্র)

৮ম বর্ষ

সন ১৩৫২ সাল

(বৈশাখ-চৈত্র)

৩২, আপ্পার সারকুলার রোড

কলিকাতা

—প্রকাশক—
শ্রীঅমরীনাথ চক্রবর্ত্তী
৩৫, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা।

P 30494

—মুদ্রাকর—
শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্ত্তী
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩৫, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা।

সূচীপত্র

[বর্ণানুক্রমিক]

(সন ১৩৫২ সাল)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অনির্ব্বাণ (গল্প)	শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	৩১৩
অন্বেষণ (প্রবন্ধ)	শ্রীবিমল বসু	৫৭৭
অভিবাদন (কবিতা)	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৫
অহিংসার পথ (প্রবন্ধ)	শ্রীঅ:	৫৬৯, ৬৩৫
আগুন (কবিতা)	শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী	৪৮৭
আজ ধরণীর দিকে দিকে (কবিতা)	শ্রীবিমলচন্দ্র দাশগুপ্ত	৫০২
আবাহন (কবিতা)	শ্রীসজনীকান্ত দাস	২৯০
আভাস (কবিতা)	অধ্যাপক সুশীল কুমার দে	১১১
আমাদের সাহিত্য (প্রবন্ধ)	শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬
আমার প্রেতের কান্না (কবিতা)	শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী	৬৪০
আশংকা (গল্প)	শ্রীসুধাংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়	৬৪১
ইউনিসিল (প্রবন্ধ)	শ্রীহেমন্তকুমার তরফদার	৩৮৯, ৫১৩, ৬০৩, ৬৪৩
উপনিবেশের ভবিষ্যৎ (প্রবন্ধ)	শ্রীঅন্তেবাসী	৪৫
উপায় ও পন্থা (প্রবন্ধ)	শ্রীঅমৃত কুঁয়র	৬৬৮
এরা ওরা তারা (কবিতা)	শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী	৫৮৫
ঐতিহাসিক (কবিতা)	শ্রীমহেন্দ্র নাথ	২৩
ওরে বন্ধু কয়েদী (কবিতা)	শ্রীরূপঙ্কর দত্ত	২৬৩
কংগ্রেস ও ঘরোয়া দ্বন্দ্ব (প্রবন্ধ)	শ্রীনগেন দত্ত	৫৯০
কংগ্রেস চিত্র প্রদর্শনী		৬২৭
কংগ্রেস, মধ্যবিত্ত ও গণবিপ্লব (প্রবন্ধ)	শ্রীনগেন দত্ত	৪১০
কংগ্রেস, মধ্যবিত্ত ও বৈপ্লবিক নেতৃত্ব (প্রবন্ধ)		২৫১
কংগ্রেস ও রাজনৈতিক চেতনার সামাজিক ভিত্তি (প্রবন্ধ)	শ্রীনগেন দত্ত	
কংগ্রেস ও হিন্দু মুসলমান সমস্যা (প্রবন্ধ)	শ্রীঅবিনশ্বর সিংহ রায়	২৪৪
কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী-ইস্তাহার		৪২৭
কংগ্রেসের পুনর্গঠন (প্রবন্ধ)	শ্রীঅ:	২৮৩
কবি সত্যেন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)	শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৪
কালের যাত্রা (সম্পাদকীয়)		৫৬, ৯৫, ১৩৮, ১৯০, ২৩৪, ২৭৯, ৩৮১, ৪৪৬, ৫০২, ৫৬২, ৬২৮, ৬৭৩
কি দেখিলাম ? (প্রবন্ধ)	শ্রীছাত্রী	৩০২
কুবের বিদায় (কবিতা)	শ্রীক্ষেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর	২৭৮
কেন '৪২ সাল (প্রবন্ধ)	শ্রীঅ:	
কেশ অব পুজা (গল্প)	শ্রীশুভেন্দু ঘোষ	
ক্রশ-বাহিনী (কবিতা)	শ্রীরমেন চৌধুরী	
গান্ধীজীর স্বাতন্ত্র্য কোথায় ? (প্রবন্ধ)	শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	
ঘরে বাইরে (গল্প)	শ্রীইন্দিরা দেবী	
চরকা (:প্রবন্ধ)	শ্রীঅমূল্যচরণ রায়	
চাষী-মজুরদের দাবী (প্রবন্ধ)	শ্রীনিশাপতি মাঝি	
'চিত্রা'র কবি (প্রবন্ধ)	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য	
চীনাদের পাতাল নগর (প্রবন্ধ)	শ্রীরেবা দেবী	
ছাত্র সমাজের প্রতি (অভিভাষণ)	শ্রীবীণা দাস	
ছায়া পূর্ব্বগামিনী (প্রবন্ধ)	শ্রীমতী	
ছোটদের পাঠাগার (প্রবন্ধ)	শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ (মৌমাছি)	২৬
জন-সংগঠন (প্রবন্ধ)	শ্রীসত্যেন চট্টোপাধ্যায়	৪১৬
জয়তু মহাত্মা (কবিতা)	শ্রীঅমল সেন	৪৬৮
জাতি-বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ (প্রবন্ধ)	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	১১, ৭০, ১১২, ১৬৫, ২১৪, ২৫৬, ৪৭৫, ৫৫১, ৬১৩, ৬৬১
জাতীয় পতাকা ও লাল পতাকা (প্রবন্ধ)	শ্রীঅ:	৩৬০
জ্যান্ত মড়া (গল্প)	শ্রীসৌমেন গঙ্গোপাধ্যায়	২০৬
ঝাঁপি (কবিতা)	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৭৯
তাবু (গল্প)	শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৩৬৬
তৃণাঙ্কুর (কবিতা)	শ্রীঅমর ভট্ট	৪২১
দুর্ভিক্ষের সন্ততি (কবিতা)	শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী	৩৩২
দুইভূমি (গল্প)	শ্রীরূপঙ্কর দত্ত	৩১৯
ধারাগিরি (ভ্রমণ)	শ্রীগিরিবালা দেবী	৩৭৬
নন্‌সেন্স (গল্প)	শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী	২৯
নই আপই (কবিতা)	শ্রীসজনীকান্ত দাস	১২৭
নামের মোহ (প্রবন্ধ)	শ্রীঅন্তেবাসী	২২৬
নারী সমাজ ও গৃহ (প্রবন্ধ)	শ্রীমায়া গুপ্ত	৪৮২
নির্ব্বাসিত বিহঙ্গ (অনুবাদ উপন্যাস)	শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী	৩৬, ৮৫, ১৩৬, ১৭৯, ২২৮, ২৭২, ৪৩৮, ৪২৭, ৬২৩, ৬৪২

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
নীল আন্দোলনের শেষ অধ্যায় (প্রবন্ধ)	—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	
পরাধীনতাই সমস্যা—(প্রবন্ধ)—শ্রীসুব্রতা চৌধুরী		
পশ্চিমে বৈশাখ (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র	সেনগুপ্ত এম. এ, পি এইচ-ডি	১
পুস্তক পরিচয়—	১০২, ২৩২, ৪৪৪, ৫৬০, ৬৭১	
পূর্ব্ব ও মধ্য ইওরোপে সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় (প্রবন্ধ)	—শ্রীবীরেশ্বর ঘোষ	৫৪৯
প্যারী (ভ্রমণ)—ডক্টর রামনাথ বিশ্বাস ৫৫, ৯২, ১৩৩, ২২৬		
প্রজাপতি (গল্প)—'বনফুল'		২৯২
প্রতীক্ষা (গল্প)—শ্রীসুব্রতা চৌধুরী		৪৮৩
প্রাচ্যে জাতীয়তার অনুষ্ঠান (প্রবন্ধ)—শ্রীঅন্বেষাদী		৭৪
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিদায়ী সভাপতির অভিভাষণ—		
বন্ধু (গল্প)—শ্রীবারীন দাশগুপ্ত		
বরিভিলি ট্রেনিং ক্যাম্পে (প্রবন্ধ)—শ্রীমায়া ঘোষ		
বাংলায় কংগ্রেস আন্দোলন (প্রবন্ধ)	—শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ	
বাংলায় প্রজাশক্তি ও নীল (প্রবন্ধ)	—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	৩৩৩
বাইরে যেতে নেই (গল্প)—শ্রীমনোজ বসু		১০৯
বাঙ্গালা দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট (প্রবন্ধ)	শ্রীকালীচরণ ঘোষ	৭৭
বিংশ শতাব্দীর মানুষ আমরা (কবিতা)—শ্রীশান্তি পাল		৬৬৭
বিদায় (কবিতা)—শ্রীবিমলচন্দ্র দাশগুপ্ত		২১৩
বিদায়-বেলায় (গল্প)—শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ		৫২৬
বিরতি—(কবিতা)—শ্রীদেবাংশু সেনগুপ্ত		৩১২
বিশাল বঙ্গিনা (প্রবন্ধ)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়	এম-এ, পি এইচ-ডি	২৯২
বিশ্বরাজনীতিতে কূটনীতি (প্রবন্ধ)—শ্রীনগেন দত্ত		৩৩, ২২০
বুনিয়াদী শিক্ষায় ইংরেজীর স্থান নেই কেন ?	(প্রবন্ধ)—শ্রীমতী অনামিকা দেবী	
বৈদেশিক দৃষ্টিতে বাংলাদেশ (প্রবন্ধ)	—শ্রীসজনীকান্ত দাস	১০১, ১৯৮
ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রকৃত অন্তরায় (প্রবন্ধ)	শ্রীকালীচরণ ঘোষ	
ভারতের কৃষক মজুর ও শ্রেণীতত্ত্ব (প্রবন্ধ)	—শ্রীসুবোধ ঘোষ	১৪৭
ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় (প্রবন্ধ)—শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত		৩৪০
ভূলতাকা (কবিতা)—শ্রীসৌমেন গঙ্গোপাধ্যায়		৫৫
মতিমতাংশ (কবিতা)—শ্রীউমা দেবী		৩১৯
মন্বন্তর কেন ? (প্রবন্ধ)—শ্রীঅবিনশ্বর সিংহ রায়		৬৪

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
মহাকবি নবীনচন্দ্র (প্রবন্ধ)—শ্রীশান্তি দাস		৬১১
মহাত্মাজী (প্রবন্ধ)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়		৪৬৪
মহান প্রহরী (প্রবন্ধ)—শ্রীকপিল চট্টোপাধ্যায়		৬৪৮
মাটির দান (প্রবন্ধ)—শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী		২৩৭
মানব মুক্তিকামী রোঁলাঁ (প্রবন্ধ)	—শ্রীসত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত	১৪৪
মেদাজি রত্নম্ (গল্প)—শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়		৩৪২
মৃত্যুবাহী (কবিতা)—শ্রীঅমর ভট্ট		৫৩৯
যাচ্ঞা (কবিতা)—শ্রীমুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী		৪১৫
যাত্রা (গল্প)—শ্রীঅমলা দেবী		২২৪
যুগের স্বাক্ষর (কবিতা)—শ্রীউমানাথ সিংহ		১৫৪
রবীন্দ্র-নাটক (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন		৭
রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা (প্রবন্ধ)—শ্রীমহেন্দ্র নাথ		৫২৩, ৫৮৬
রাখাল দা' (গল্প)—শ্রীসুব্রতা চৌধুরী		৩৫৫
রাজপথ (কবিতা)—শ্রীমণিমালা দাশগুপ্তা		৪৭৪
রাজনীতির উপাদান-তেল (প্রবন্ধ)	—শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়	
রাজার ফিদায়ী অচেতন ঘুমঘোরে (কবিতা)	—শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ মজুমদার	২০৫
রাশিয়া কথা বলে—অনুবাদ		৪৩৫
রাহুমুক্ত (গল্প)—শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য		৬৭৯
লহ অর্ঘ্য (কবিতা)—শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়		৪৬৭
শিশু ও পারিবারিক শান্তি (প্রবন্ধ)—শ্রীলীলা প্রেমলাভ		৬৯৫
শিশু-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)—শ্রীহরিনারায়ণ ভট্ট		৯
শূন্যের (অনুবাদ-গল্প)—শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়		৪০৪
শূর্পনখার অবমাননা (প্রবন্ধ)—শ্রীমৈত্রেয়ী গুহা		৩০৩
শেষ মিনতি (কবিতা)—শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী		২৭৪
সঙ্কলন (সমালোচনা)—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী		৩৪১
সমর্পণ (কবিতা)—শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ		৫৬৭
সর্ব্বছায়া বিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন (প্রবন্ধ)—শ্রীনগেন দত্ত		৮০
সুন্দরের আবির্ভাব (কবিতা)—শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী		১৬৪
সূর্য্য প্রণাম (কবিতা)—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়		৬৫৭
সোণার কাঠি (প্রবন্ধ)—শ্রীবাণী রায়		৩৭৫
সোভিয়েট তরুণ বীর (অনুবাদ)	—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস	৫৩৫
সোভিয়েট তরুণী জোয়া (অনুবাদ)—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস		১২৮
হিরোসিমা-নাগাসাকী (কবিতা)—শ্রীসমীর ঘোষ		৩৫৪
হে ভারত, নন্দিনী ভারত (কবিতা)—শ্রীনরেন্দ্র বসু		৩০৭
হোমাগ্নি (উপন্যাস)—শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়		১১৭, ১৫৮, ২০৯, ২৬৪, ৩২৯, ৩৮৮, ৪৪৫

মন্দিরা—বৈশাখ, ১৩৫২

পুরনো আলো মেরামত

শিল্পী—আচার্য নন্দলাল বসু

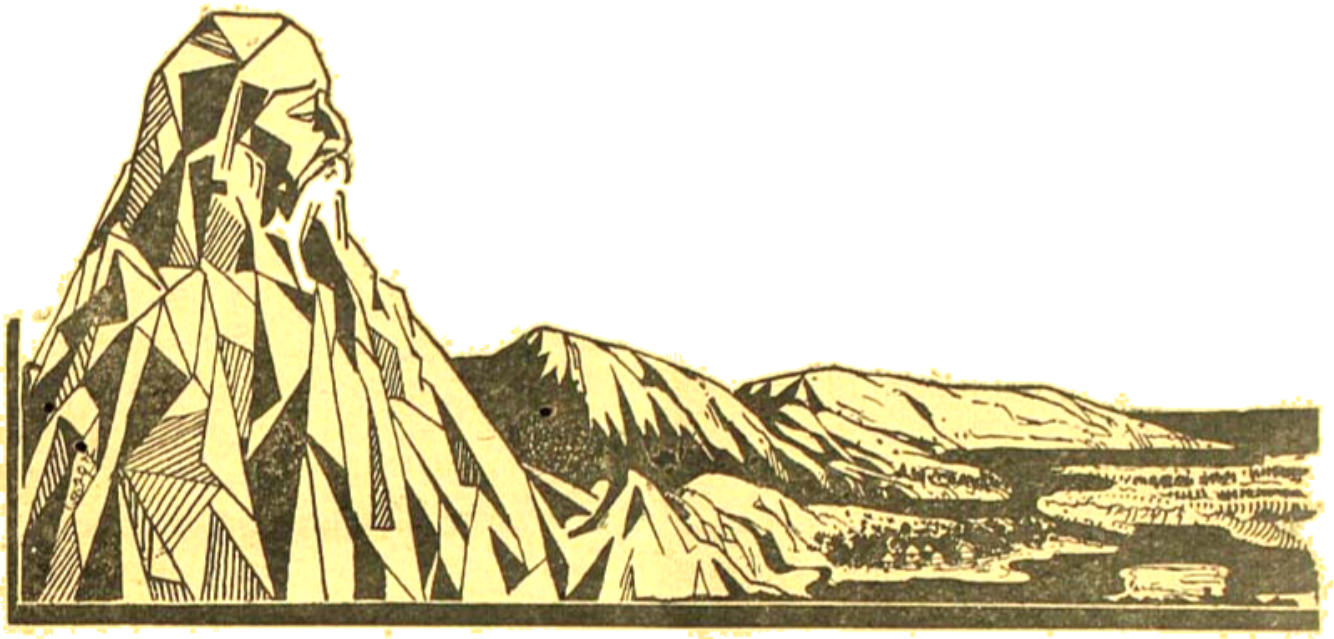

"মনে রাখিতে হইবে আজ স্বদেশের স্বদেশীয়তা আমাদের কাছে যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, ইহা রাজার কোনো প্রসাদ বা অপ্রসাদে নির্ভর করে না; কোন আইন পাশ হউক বা না হউক, বিলাতের লোক আমাদের করুণোক্তিতে কর্ণপাত করুক বা না করুক, আমার স্বদেশ আমার চিরন্তন স্বদেশ, আমার পিতৃপিতামহের স্বদেশ, আমার সন্তান-সন্ততির স্বদেশ, আমার প্রাণদাতা, শক্তিদাতা, সম্পদ্‌দাতা স্বদেশ। কোনো মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিও না, কাহারও মুখের কথায় ইহাকে বিকাইতে পারিব না। একবার যে হস্তে ইহার স্পর্শ উপলব্ধি করিয়াছি, সে হস্তকে ভিক্ষাপাত্র বহনে আর নিযুক্ত করিব না, সে হস্ত মাতৃ-সেবার জন্য সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিলাম। আজ আমরা প্রস্তুত হইয়াছি—যে পথ কঠিন, যে পথ কণ্টক-সঙ্কুল সেই পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আজ যাত্রারম্ভে এখনও মেঘের গর্জ্জন শোনা যায় নাই বলিয়া, সমস্তটাকে যেন খেলা বলিয়া মনে না করি। যদি বিদ্যুৎ চকিত হইতে থাকে, বজ্র ধ্বনিত হইয়া উঠে, তবে তোমরা ফিরিয়ো না, ফিরিয়ো না; দুর্য্যোগের রক্ত-চক্ষুকে ভয় করিয়া তোমাদের পৌরুষকে জগৎসমক্ষে অপমানিত করিও না। বাধার সম্ভাবনা জানিয়াই চলিতে হইবে, অতি-বিবেচকের ভীত পরামর্শে নিজেকে দুর্ব্বল করিও না। যখন বিধাতার ঝড় আসে, বন্যা আসে, তখন সংযত বেশে আসে না, কিন্তু প্রয়োজন বলিয়াই আসে, তাহা ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি দুই-ই লইয়া আসে যখন বৃহৎ উদ্যোগে সমস্ত দেশের চিত্ত বহুকাল নিরুদ্যমের পর প্রথম প্রবৃত্ত হয়, তখন সে নিতান্ত শান্ত ভাবে, বিজ্ঞ ভাবে, বিবেচক ভাবে, বিনীত ভাবে প্রবৃত্ত হয় না। শক্তির প্রথম জাগরণে মত্ততা থাকেই—তাহার বেগ; তাহার দুঃখ, তাহার ক্ষতি আমাদের সকলকেই সহ্য করিতে হইবে—সেই সমুদ্র-মন্থনের বিষ ও অমৃত উভয়কেই আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।"

—রবীন্দ্রনাথ

মাতৃদুগ্ধের অনুরূপ

শিশুদের পক্ষে মাতৃদুগ্ধ অমৃতের ন্যায় অনুপম। কিন্তু বিশুদ্ধতায় এবং পুষ্টিকারিতায় 'ভিটা মিল্ক' মাতৃদুগ্ধেরই অনুরূপ। ইহা খাঁটি গো-দুগ্ধ হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত এবং ইহাতে প্রচুর ভিটামিন বিদ্যমান। আপনার সন্তানের স্বাস্থ্য, শক্তি এবং লাবণ্যের পূর্ণ বিকাশের জন্য তাহাকে নিয়মিত 'ভিটামিল্ক' খাইতে দিন।

ভিটা-মিল্ক

বিশুদ্ধ-পুষ্টিকর-সুস্বাদু

ন্যাশনাল নিউট্রিমেন্টস্ লিঃ, কলিকাতা

পরিচয়

অষ্টম বর্ষ | বৈশাখ—১৩৫২ | ১ম সংখ্যা

75·6·3
·0128

পঁচিশে বৈশাখ

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

'তপোভঙ্গ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কবির সম্পর্কে বলিয়াছেন, "স্বর্গের চক্রান্ত আমি, আমি কবিব্রত মহেন্দ্রের।" এই বর্ণনা তাঁহার নিজের সম্পর্কে সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। লাঞ্ছিত, উপক্রুত, বহু বিভেদের দ্বারা খণ্ডিত আমাদের এই দেশে তাঁহার মত মহৈশ্বর্যময় প্রতিভাসম্পন্ন কবির জন্ম স্বর্গের চক্রান্ত বলিয়াই মনে হয়। বহু বৈরে নিপীড়িত এই হতভাগ্য দেশে মহেন্দ্রের দূতের মতই তিনি এক পঁচিশে বৈশাখ তারিখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আশী বর্ষ পরে তাঁহার তিরোধান হইয়াছে, কিন্তু অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া তিনি যে সাহিত্য রচনা করিয়াছেন তাহা শুধু তাঁহার নিজের নামকেই অমর করিয়া রাখে নাই, বাঙ্গালী, ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসী তাহার মধ্যে অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছে। এই হিসাবে তাঁহার জন্মদিন বাঙ্গালীর পক্ষে একটি বিশেষ উৎসবের দিন। তাঁহার সপ্ততিপূর্তিতে দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন,

"আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শ্রদ্ধামনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারম্বার নমস্কার করি।"

বহুদিক দিয়া রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা সম্ভব। একটা প্রশ্ন অনেক সময় উদিত হয়: আধুনিক সভ্যতার পটভূমিকায় তাঁহার কাব্য কি তাৎপর্য বহন করে? এই যুগ বিশেষ করিয়া আদর্শ বিপর্যয়ের যুগ। বিজ্ঞানে সাধনার পথে মানুষ সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সেই সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া এই যুগে শতাব্দীর একপাদ অতিক্রম করিতে না করিতেই সে এমন দুইটি বিশ্ববিধ্বংসী সমরের আয়োজন করিয়াছে যাহাদের অনুরূপ যুদ্ধ ব্যাস, বাল্মীকি বা হোমার কল্পনা করিতে পারেন নাই। প্রশ্ন হইবে, এই সংহারের সজ্জার জন্য বিজ্ঞানের দায়িত্ব কতটুকু? কেহ কেহ বলেন অনিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞান-চর্চাই ধ্বংসের এই সমারোহের জন্য দায়ী। অপর কেহ কেহ করেন, বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগই এই সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে, বিজ্ঞান নহে; বিজ্ঞান মানুষের কল্যাণের উপকরণ সঞ্চয় করিয়াছে ও করিতেছে এবং এই যুগ বিজ্ঞানের দ্বারা অজস্র উপকরণ সম্ভারের যুগ। এই যুগে কার্ল মার্ক্সের সাম্যবাদ বাস্তবরূপ লাভ করিয়াছে। আবার ইহার বিরোধী মতবাদও

এই যুগে প্রচণ্ড অভিব্যক্তি পাইয়াছে। যাঁহারা এই পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্রনীতি বা সমাজনীতির সংঘর্ষের মধ্যে খানিকটা নিরপেক্ষ থাকেন, তাঁহাদের মনেও প্রশ্ন জাগে, মার্ক্সবাদীরা বাস্তবজীবনকে যে প্রাধান্য দিয়াছেন, সেই প্রাধান্য তাহার প্রাপ্য কিনা। মানুষের কল্পনা, ভাবনা কি বাস্তবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়? সন্দেহ হয়, এই বাস্তবানুগামী সভ্যতার চাপে মানুষের মনোজগৎ তাহার স্বাতন্ত্র্য ও মহিমা হারাইয়া ফেলিবে। আর এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক—দার্শনিক মনের অলিগলিতে সকরুণ করিয়া সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা মানুষের মনকে লইয়া গিয়াছেন বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরীতে। এই পরীক্ষাগারের চুলচেরা বিশ্লেষণে প্রাধান্য পাইয়াছে স্বপ্ন ও অবচেতন আকাঙ্ক্ষা। যে ব্যক্তিত্ব নানা পুষ্পপত্রে শোভিত হইয়া ঐশ্বর্য্যবান্ অভিব্যক্তি পায় তাহা গৌণ হইয়া যাইতেছে; মানবহৃদয়ের বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে আমরা সন্দিহান হইতেছি।

এই যুগের কাব্যে ও সাহিত্যে নানা আদর্শের সংঘর্ষ ও বিপর্য্যয় প্রতিফলিত হইয়াছে। এই যুগের কবি বিচলিত হইয়া নিজেকে প্রশ্ন করিতেছেন, কাব্য-সৌন্দর্য্যের মূল উৎস কোথায়? কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, যাহা কুৎসিত ও কর্দ্দমাক্ত তাহার আমদানী করিতে পারিলেই সাহিত্যের পরিধি প্রসারিত হইবে। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, অতীত কিংবদন্তী ও বর্ত্তমান বিজ্ঞান, করুণ রস ও বিদ্রূপ, মহান্ অনুভূতি ও তুচ্ছ বস্তু—এই সকল পরস্পরবিরোধী পদার্থের সমাবেশ করিলে আধুনিক যুগের প্রকৃত চিত্র দেওয়া হইবে এবং তাহাই আধুনিক। কেহ কেহ কাব্যের সহিত দর্শনের, দর্শনের সহিত দর্শতত্ত্বের, দর্শতত্ত্বের সহিত পুরাতত্ত্বের মিশ্রণ করিয়া এক অপূর্ব্ব চিত্র সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন, এই বিচিত্রবিষয়াকার পদার্থই বর্ত্তমান যুগের কাব্য, কারণ ইহার মধ্যে নিশ্চই বর্ত্তমান যুগের জটিলতার-প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাইতে পারে। আবার কোন কোন কবি বাস্তবজীবনের পঙ্কিলতা ও তিক্ততা হইতে স্বরচিত ছোট্ট একটি জগতে আশ্রয় লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক কালের জনৈক ফরাসী লেখক সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে তিনি সর্ব্বদাই সিগারেট খাইতেন, কারণ তিনি চাহিতেন যে তাঁহার ও জগতের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা ধূমের আবরণ থাকিবে। আধুনিক কালের কাব্যে ও সাহিত্যে স্থানে স্থানে অনুভূতির তীক্ষ্ণতা বা চিন্তার সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া গেলেও মোটের উপর ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অনস্বীকার্য্য ছাপ নাই। মাঝে মাঝে মহাকাব্যের টুক্‌রার সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু এই সংশয়-নিপীড়িত, বিদ্বেষজর্জ্জরিত, বহুধা বিচ্ছিন্ন জগতে মহাকবির আবির্ভাব হইতেছে না। সমালোচকদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ তীব্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াছেন, "And where is even the very tall man whom we have the right to expect?" এই প্রশ্ন শুধু আধুনিক-সমালোচনাসাহিত্য সম্পর্কে নহে, সমগ্র আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে প্রযোজ্য।

এই tall man বা মহাকবির আবির্ভাব যদি এই যুগে কোথাও হইয়া থাকে, তবে তাহা হইয়াছে এই বাংলা দেশে এবং এই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আধুনিক যুগের জটিলতা ও আদর্শ বিপর্য্যয়ের মধ্যে তিনি যে বাণী প্রচার করিয়াছেন তাহা যেমন চরাচরব্যাপী তেম্‌নি সরল ও সহজ। ইহার মধ্যে কোথাও কুটিলতা, অবিশ্বস্ততা অথবা সংশয়জর্জ্জরতা নাই। জনৈকা ইংরেজ মহিলা কবি বলিয়াছেন, "কবিতা সঙ্গীতের একটি অখণ্ড তানের মত। কাব্যের এই বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি সম্পর্কে সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য। তাঁহার কাব্যে বিচিত্র ভাব আছে, কিন্তু সবাই মিলিয়া একটি অখণ্ড তানের সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি পরিপূর্ণতার কবি; তাই তিনি বিচিত্রের মধ্যে একত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি জীবনের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহার মধ্যে দৈন্য, দারিদ্র্য ও কুশ্রীতার উল্লেখ আছে, কিন্তু তিনি দেখাইয়াছেন যে ইহাদের অন্তরালে যে সত্তা আছে তাহা অপরূপ লাবণ্যে সমৃদ্ধ। অন্য কোন কবি সুন্দরের এমন ঐশ্বর্য্যময় রূপ আঁকিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার অনেক কবিতার প্রেরণা আসিয়াছে ঈশ্বরোপলব্ধি হইতে, কিন্তু তাঁহার কাছে ভগবান্ শুধু বিশ্বদেবতা নহেন, তিনি জীবনদেবতাও, তিনি কবির অন্তরে অবগাহন করিতেছেন ও অগণিত যুগ ধরিয়া প্রকৃতির মধ্যে

আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। কবি তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে বহুভাবে বহুরূপে মরণের আবাহন করিয়াছেন, কিন্তু কবি জীবনরসের রসিক এবং মরণের অন্তরালে তিনি দেখিয়াছেন অমৃতের প্রতীক্ষ পরমপুরুষকে, যাঁহার নিকট হইতে পরিপূর্ণ জীবনের আস্বাদ পাওয়া যাইবে। এইখানে অন্যান্য মরমী কবিদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য বিচার করা যাইতে পারে। তিনি মুক্তি খুঁজিয়াছেন, কিন্তু সেই মুক্তি আদিবে বৈরাগ্যের পথে নহে। অসংখ্য বন্ধন মাঝে তিনি মুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে চাহিয়াছেন—

এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ধরি বারংবার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে……
রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার।
যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তা'র মাঝখানে
মোহ মোর মুক্তি রূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তি রূপে রহিবে ফলিয়া।

তাঁহার কল্পিত সন্ন্যাসী শঙ্কর বারে বারে সৃষ্টিলীলায় নিজের তপস্যার সার্থকতা খুঁজিয়াছেন। কবি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

হে শুভ্র বল্কলধারী বৈরাগী
ছলনা জানি সব
সুন্দরের হাতে চাও
আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্মরণ বেশে
বারে বারে পঞ্চশরে অগ্নিতেজে দগ্ধ করে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি বারে বারে বাঁচাইবে শেষে
বারে বারে তারি তুণ সম্মোহনে ভরি দিব বলে
আমি কবি সঙ্গীতের ইন্দ্রজালে নিয়ে আসি চলে
মৃত্তিকার কোলে।

সৌন্দর্যাতীতের সঙ্গে সুন্দরের, বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে তাঁহার সৃষ্টি মহিমার, মৃত্যুর মাধুরীর সঙ্গে জীবনের বিচিত্র বর্ণচ্ছটার এই যে মিলন ও সমন্বয়—ইহাই রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান বাণী। বিভিন্ন বিষয়ের কবিতায় এই বাণী বিভিন্নরূপে অভিব্যক্তি পাইয়াছে। মৃত্যুসম্পর্কিত কবিতার কথা একবার উল্লিখিত হইয়াছে। প্রিয়জনের বিয়োগ তাঁহার প্রতিভাকে নানাভাবে উদ্বোধিত করিয়াছে; তাঁহার এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে একটি সুর বারংবার ধ্বনিত হইয়াছে—মৃত্যু জীবনের ধ্বংস নহে, পরপারেও জীবনের সকল অঙ্গ অক্ষত হইয়া থাকে। এই বিশ্বাস তাঁহার অনুভূতিকে অনন্তলোকবিস্তার দিয়াছে। পরলোকগতা পত্নীর সম্পর্কে তিনি যে সকল কবিতা লিখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে যে কোন একটি শ্রেষ্ঠ কবিতার অর্থ মাধুর্য্য বিচার করিলে এই ব্যাপকতার পরিচয় পাওয়া যাইবে—

অল্প-আয়ু এ জীবনে যে কয়টি আনন্দিত দিন—
কম্পিত পুলকভরে সঙ্গীতের বেদনাবিলীন
লাভ করেছিলে লক্ষ্মী, সে কি তুমি নষ্ট করি যাবে?
সে আজি কোথায় তুমি ধরে রাখিছ কী ভাবে
তাই আমি খুঁজিতেছি। সূর্য্যাস্তের স্বর্ণ মেঘতরে
চেয়ে দেখি এক দৃষ্টে,—সেথা কোন্ করুণ অক্ষরে
লিখিয়াছে সে-জন্মের সায়াহ্নের হারানো কাহিনী।
আজি এই দ্বিপ্রহরে পল্লবের মর্ম্মর-রাগিনী
তোমার সে কবেকার দীর্ঘশ্বাস করিছে প্রচার
আতপ্ত শীতের রৌদ্রে নিজ হস্তে করিছ বিস্তার
কত শীত মধ্যাহ্নের সুনিবিড় সুখের স্তব্ধতা।
আপনার পানে চেয়ে বসে বসে ভাবি এই কথা—
কত তব রাত্রিদিন কত সাধ মোরে ঘিরে আছে
তাদের ক্রন্দন শুনি ফিরে ফিরে ফিরিতেছে কাছে।

অনুভূতি ও চিন্তার এই বিস্তৃতি রবীন্দ্রনাথের সকল প্রকার কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায়। অন্যান্য রোমান্টিক কবিদের মত তিনিও অতীতকালের স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহিয়াছেন। বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের অতীত ঐতিহ্য

তাঁহার কল্পনাকে উদ্বোধিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কবিতার বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহার স্বদেশপ্রেম নিছক স্বদেশানুরক্তি নহে। স্বদেশের অতীত ইতিহাসে যেখানে মানবাত্মা ক্ষুদ্রতাকে পরিহার করিয়া পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের অর্চনা করিতে চাহিয়াছে সেইখানে সেই প্রচেষ্টাকে তিনি কবির অভিনন্দন জানাইয়াছেন। মহাভারতের কাহিনী, হিন্দু, বৌদ্ধ, রাজপুত ও মোগলের ইতিহাস হইতে তিনি সেই সেই অবদান গ্রহণ করিয়াছেন যেখানে মানবাত্মার এই অপরাজেয় আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হইয়াছে। স্বদেশের অতীতের প্রতি কবির অনুরাগ পরিপূর্ণতম অভিব্যক্তি পাইয়াছে 'স্বপ্ন' কবিতায় যেখানে কবি স্বপ্নে কালিদাস-বর্ণিত উজ্জয়িনীপুরে চলিয়া গিয়াছেন—পূর্ব্বজনমের প্রথমা প্রিয়ার অভিসারে। যে পরমৈশ্বর্য্যময় অতীত চিরকালের তরে নিদ্রিত হইয়াছে কবির কল্পনার স্পর্শে সে তাহার সমস্ত মাধুর্য্য লইয়া একটি রমণীর রূপলাবণ্য ও দেহসজ্জার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে—

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রা নদী পারে
মোর পূর্ব্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে
তনুদেহে রক্তাম্বর নীবিবন্ধে বাঁধা
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে।

কবি যে শুধু অতীতের মহিমময় চিত্রই আঁকিয়াছেন তাহাই নহে; তাঁহার দৃষ্টি গিয়াছে সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যতের দিকেও। তিনি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতকে সৌন্দর্য্যের স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত করিয়া ইহাদের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করিয়াছেন—এই ঐক্য প্রকৃতির সুষমায়, হৃদয়ের অনুরাগে ও কবিকল্পনার ঐশ্বর্য্যে আপনার অনপনেয় স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। তাই ১৪০০ সালের নায়িকাকে তিনি স্মরণ করাইয়াছেন—

ভেবে দেখো মনে
একদিন শতবর্ষ আগে
চঞ্চল পুলকরাশি কোন্ স্বর্গ হতে ভাসি'
নিখিলের মর্ম্মে আসি' লাগে
নবীন ফাল্গুন দিন সকল বন্ধনহীন
উন্মত্ত অধীর—
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণু গন্ধ মাখা
দক্ষিণ সমীর ;—
সহসা আনিয়া স্মরা রাঙায়ে দিয়েছে ধরা
যৌবনের রাগে
তোমাদের শতবর্ষ আগে।

বিশ্বের বিচিত্র ও পরিবর্ত্তমান রূপসৃষ্টির অন্তরালে কবি পরিকল্পনা করিয়াছেন অপরিবর্ত্তমান নটরাজকে যাহার

নৃত্যের বশে সুন্দর হল
বিদ্রোহী পরমাণু ;
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্রভানু।

অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ক্ষণস্থায়ী তরঙ্গের অন্তরালে তিনি দেখিয়াছেন সন্ন্যাসী মহাকালকে যাহার

অতল স্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ শিখরে
উচ্ছিত হয়ে উঠ্‌ছে সৃষ্টি
আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গতলে।

জগতের মানুষের আসাযাওয়ার পশ্চাতে তিনি কল্পনা করিয়াছেন এক সীমাহীন পারাবার যাহার তীরে অনন্তকাল ধরিয়া শিশুদের লীলা চলিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ মরমী কবিদের অন্যতম। তাঁহার অধিকাংশ কাব্য রূপকধর্ম্মী; রূপকের মধ্য দিয়া তিনি লোকাতীত পরমপুরুষের পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু এই পরমপুরুষ বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন, সকল রূপের তিনি উৎস আবার রূপের মধ্য দিয়াই তিনি সততঃ প্রকাশিত

হইতেছেন। মানবের সকল পার্থিব আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতির মধ্য দিয়া তাঁহার মহিমা অভিব্যক্তি পাইতেছে। 'রাজা'-নাটো রাণী সুদর্শনা তাঁহাকে স্বামীরূপে আবাহন করিতেছে, 'ফাল্গুনী'তে তিনি প্রকাশ পাইয়াছেন বসন্তের জাগরণের মধ্য দিয়া, আবার 'ডাকঘর' নাটকে অমল তাঁহাকে খুঁজিতেছে শিশুর সরলতা, অসীমা কৌতূহল ও দ্বিধাহীন বিশ্বাসের দ্বারা। এই অনুসন্ধান সর্বত্র মনুষ্যজীবনের রসে সঞ্জীবিত। অমল যখন অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত তখন শিশু মালিনী বলিয়াছে, "বোলো সুধা তাকে ভোলেনি।" সুধার এই সস্নেহ সস্রাবণ মরমী জিজ্ঞাসার উপরে মনুষ্যহৃদয়ের আলোক সম্পাত করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় পার্থিব প্রেমের সরসতা ও মদোন্মত্ততা অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। নায়িকা ফেনিল উচ্ছল যৌবনসুরা তুলিয়া ধরিয়াছে, সে লজ্জিত হইয়া বলিয়াছে, যামিনী না যেতে জাগালেনা নাথ, বেলা হলো মরি লাজে। কিন্তু তাঁহার কাব্যে প্রেমের আর এক মূর্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, যেখানে নারী দেখা দিয়াছে কল্যাণী মূর্তিরূপে, সে শুধু উর্বশী নহে, সে লক্ষ্মী যে পুরুষকে লইয়া যায় অনন্তের পূজার মন্দিরে। যে কোন ব্যক্তির জীবন আলোচনা করিলেই দেখা যায় যে প্রেম তাহাকে মহিমান্বিত করিয়া তোলে। সাধারণ মানুষ বাস্তবজীবনে শত সহস্রের মাঝে একজন, তাহার কোন বৈশিষ্ট্য নাই, কোন মর্যাদা নাই। কিন্তু যেখানে সে প্রণয়ী, সেইখানে সে ঐশ্বর্যবান্—

সেথা আমি জ্যোতিষ্মাণ
অক্ষয় যৌবনময় দেবতা সমান
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী

এই পরিপূর্ণতা, সমগ্রতা, সামান্যের মধ্যে অসামান্যের এই আবিষ্কার—ইহাই রবীন্দ্রকাব্যের বৈশিষ্ট্য।

সুন্দরের যে পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন তাহার তুলনা সকল দেশের সকল যুগের কাব্যে বিরল। তাঁহার কাছে সুন্দর শব্দস্পর্শগন্ধের অতীত অশরীরী ভাবমাত্র নহে, শুধু অগণিত পদপ্রান্তলিপ্ত খণ্ডসৌন্দর্যের সম্মিলন করিয়াই তাহাকে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সুন্দরের আদিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে উর্বশীর মধ্যে, যে উর্বশীকে কোন বিশিষ্ট সৌন্দর্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না, যে অনন্ত-যৌবনা, উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা, যাহার নৃত্যচঞ্চল চরণের মঞ্জীরশিঞ্জনে শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল। চিরসুন্দর শুধু একটা পরিকল্পনামাত্র নহে, জীবনের মধ্যে সে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান। সে কোথাও স্থির হইয়া বসিয়া নাই। চঞ্চল, নিত্যপ্রবাহিত জীবনের মধ্য দিয়া সে নিজেকে সার্থক করিতেছে। এইজন্যই কোন অনুভূতিময় সম্পর্কই মিথ্যা হয় না। পরলোকগতা বান্ধবীর ছবি দেখিয়া কবির একবার মনে হইয়াছিল যে সেই বান্ধবী বুঝি এখন তাঁহার জীবনে অর্থহীন হইয়া গিয়াছেন, তিনি বুঝি এখন শুধু—ছবি, পটে লিখা। কিন্তু একটু পরেই কবি বুঝিতে পারিয়াছেন যে যে প্রেম তাঁহাকে বান্ধবীর প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহা তাঁহার সমস্ত অনুভূতিকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করিতেছে। তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া কবি বলিতেছেন—

কে বলে রয়েছে স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে
মরি মরি সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গ বেগ
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।

কালের আবর্তনে সকল পদার্থই পতঙ্গের মত বিলীন হইতেছে, অতিকায় যুগযুগান্তব্যাপী ঐতিহ্য নিমিষের অধিক আয়ু পাইতেছে না। কিন্তু মানুষের হৃদয়ে যে প্রাণস্রোত প্রবাহিত হইতেছে আপাতদৃষ্টিতে ক্ষণজীবী হইলেও তাহা মৃত্যুহীন সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত। তাই তাহা অবিনশ্বর, তাহা অপ্রমেয়—

কল্পান্ত যখন তার সকল প্রদীপ নিবিয়ে
সৃষ্টির কঙ্কালে দেবে অন্ধকার করে

তখনও সে থাকবে প্রলয়ের নেপথ্যে
বহ্নান্তরের প্রতীক্ষায়

যে অগণিত যুগধারা কালস্রোতে বাহিয়া চলিয়াছে মানবের ক্ষুদ্রতম অনুভূতি তাহা অপেক্ষা সত্য, কারণ এই সমস্ত খণ্ডিত তুচ্ছ অনুভূতি রস আহরণ করিয়াছে প্রকৃতির বহুযুগব্যাপী জীবনধারা হইতে। আজ মানুষ প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু একদিন হতে অচেনার মতই সে প্রকৃতির মধ্যে লীন হইয়া ছিল। বালক বৃক্ষের বল্কলের গায়ে লগ্ন হইয়া আনন্দ পায়। ইহা অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক অনুভূতি, কিন্তু কবি মনে করেন এই স্পর্শে সেই আদিম প্রাণের আতিথ্যদানের নিঃশব্দ আহ্বান রহিয়াছে

যে প্রথম প্রাণ
একই প্রেম জাগাইছে রসরক্তধারে
গোপন সঞ্চারে
মানব শিরায় আর তরুর তন্তুতে
একই স্পন্দনের ছন্দ উভয়ের
অন্তরে অন্তরে।

এই সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের জন্যই রবীন্দ্রনাথের কবিতা এই যুগে বিশেষ তাৎপর্য লাভ করিয়াছে। এই যুগ তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছে যে বাহিরের জগৎ মানুষকে ও তাহার চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। তাই আজ চলিয়াছে বাস্তবের অবিশ্রান্ত সন্ধান, মানব বাস্তব জগৎকে চিনিতে চাহিতেছে, তাহাকে নিজের প্রয়োজনানুসারে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে আবার তাহার কাছে নতি স্বীকারও করিতেছে। একদিকে সে বাস্তবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বলিয়া মনে করিতেছে, অপরদিকে সে বাস্তবকে জয় করিবার অভিযানে ধাবমান হইতেছে। আধুনিক রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহারিক বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব এবং কাব্য ও সাহিত্য—সবাই এইভাবে দ্বিধাখণ্ডিত হইয়াছে। তাই আজ মানবের চিন্তা সংশয়াচ্ছন্ন, তাহার আদর্শ অস্পষ্ট, তাহার সকল প্রচেষ্টা অসার্থক। রবীন্দ্রনাথ বাহিরের জগত ও অন্তরের জগতের মধ্যে কোন ব্যবধান দেখিতে পান নাই। তিনি কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে কোন সংঘর্ষের চিত্র আঁকেন নাই, কারণ তিনি মনে করেন যে অকল্যাণের মধ্যে কোন পারমার্থিক সত্য নাই। তিনি দেখিয়াছেন যে রূপ ও অরূপ, অন্তরাত্মা ও বহির্বিশ্ব—ইহারা বিচ্ছিন্ন নহে, ইহারা উভয়ে একই রসে সঞ্জীবিত, একই প্রেরণা ইহাদিগকে ঊর্ধ্বায়িত করিতেছে। তাই পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম বস্তু, মানুষের ক্ষীণতম প্রচেষ্টা—ইহাদের মধ্যে তিনি পরিপূর্ণের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইয়াছেন। মানুষ যে বাঁচিয়া আছে, সে যে প্রতি রাত্রি অবসানে চোখ মেলিয়া জগতের দিকে তাকাইতেছে—ইহাই কবির কাছে অফুরন্ত বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে।

আবার জাগিনু আমি
রাত্রি হ'ল ক্ষয়
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব
এই তো বিস্ময়
অন্তহীন

নিজের জন্মদিনে কবি দেখিয়াছেন যে তিনি সাধক নহেন, কোন একটি বিশিষ্ট সাধনা বা বিশিষ্ট ধ্যানের মধ্যে তাঁহার বাণীকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। তিনি কবি, বিশ্ব-প্রবাহে যে সঙ্গীত তরঙ্গায়িত হইতেছে তাহা তাঁহার কাব্যে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। তাঁহারই ভাষায় তাঁহাকে আমরা সম্বোধন করিয়া বলিতে পারি—

হে মহাপথিক
অবারিত তব দশ দিক
তোমার মন্দির নাই
নাই স্বর্গধাম
নাহিক চরম পরিণাম
তীর্থ তব পদে পদে
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে
চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে
চঞ্চলের সর্বতোলা দানে
আঁধারে আলোকে
সৃজনের পর্বে পর্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে।

রবীন্দ্র-নাটক

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন

কবি বলিয়া রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি সাধারণত পড়ে না। আমরা একদিক হইতে কবিকে দেখি, বিভিন্ন দিক হইতে দেখিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব কিন্তু বহুমুখে প্রসারিত ছিল—উপন্যাস, সঙ্গীত, বিভিন্ন বিদ্যার চর্চা সাহিত্যশাস্ত্র, যেদিকে তিনি যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, সেদিকেই ফুটিয়াছে নূতন সৃষ্টি, নূতন নূতন দিক খুলিয়া গিয়াছে। নব নব উন্মেষ যদি প্রতিভার পরিচয় হয়, তবে সে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিভার অনন্যসাধারণ ও চমৎকারকারী পরিচয় আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। তাই তাঁহার সম্বন্ধে জানিবার ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করিতে হইলে এই বহুমুখের পরিচয় চাই, নহিলে তাঁহার কোনও মুখেরই পরিচয় সম্পূর্ণাঙ্গ হইবে না।

বিশেষ করিয়া নাটকের সম্বন্ধে তাঁহার একটা ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল। শৈশবে জোড়াসাঁকোর রঙ্গমঞ্চের আবহাওয়া যে কল্পনার রং তাঁহার প্রাণে ধরিয়াছিল তাহা ছিল তাঁহার আজীবন সঙ্গী, চিরসঙ্গী। কেমন করিয়া সাজিয়া গুজিয়া বাহির হইলে যাহাকে স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা যায়, সে সম্বন্ধে পেশাদারী নট অপেক্ষা তাঁহার জ্ঞান কম ছিল না। মানানসই ও বেমাননের মধ্যে যে সূক্ষ্ম সীমারেখা আছে, তাহা প্রকৃত শিল্পীর কাছেই ধরা পড়িবেই; রবীন্দ্রনাথ তাহা সহজে ধরিতে পারিতেন, এবং প্রসাধন বিদ্যার তত্ত্ব ও প্রয়োগকৌশল তাঁহার নিকটে অতি সহজে ধরা পড়িয়াছিল বা তাঁহার সুবোধসিদ্ধ ছিল একথা বলিলে যে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না, তাহা কবির সম্বন্ধে সামান্য ধারণা থাকিলেও বোঝা যায়।

কবির প্রায় বৃদ্ধবয়সে তাঁহার অদ্ভুত চিত্রণশক্তি দেখিয়া লোকে বুঝিয়াছিল, বর্ণবিন্যাসে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার কথা। অভিনয়ের আঙ্গিকে এই বর্ণবিন্যাস যে কতখানি জায়গা জুড়িয়া আছে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই জানেন। কবির প্রকাশনশীল মন নিত্য নূতন উপায় খুঁজিয়াছে আত্মপ্রকাশের জন্য, নানাবর্ণে, নানাগানে, নানাছন্দে, নানাভাবে, অরূপকে রূপে ফুটাইতে—অভিনয় তাহার একটি, কিন্তু অতি মূল্যবান, অভিব্যক্তি। বৈদ্যুতিক আলোর অভিনব প্রয়োগে নাটমঞ্চের আলো-ছায়া আরও চমৎকার হইয়া ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, কবি তাহা পরীক্ষা না করিয়া পারেন নাই। যাঁহারা কবির শেষ পাঁচবৎসরের অভিনয় অথবা তাঁহার তত্ত্বাবধানে অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা স্বীকার করবেন, বৈদ্যুতিক আলোর সংস্থানে অভিনেতা অভিনেত্রী ও নাট্যমঞ্চের আকার যে কেমন বিচিত্রভাবে পরিবর্তিত হইয়া থাকে, সে বিষয়ে কবির জ্ঞান ছিল অতি স্পষ্ট।

রবীন্দ্র-নাটকের শ্রেণী বিভাগ করা বোধহয় অসম্ভব নহে। কিন্তু কাজে সব বই নাই বলিয়া তাহা আমার পক্ষে এখন সম্ভব নহে। তাঁহার ঋতুনাটকগুলি অবশ্য এক পর্যায়ভুক্ত শারদোৎসব, ফাল্গুনী, সুন্দর ইত্যাদি। আবার ডাকঘর, অচলায়তন প্রভৃতি অন্যপর্যায়ের where more is meant than meets the ear—'প্রতীক নাট্য' ইহাদের নাম দেওয়া যায়। 'রাজা ও রাণী' অন্য স্বতন্ত্র পর্যায়ের, এবং "নটীর পূজা', 'তাদের দেশ', 'শ্যামা' ইত্যাদি নাটক সম্বন্ধে অর্থাৎ তাদের শ্রেণীবিভাগ বা পর্যায় সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা দরকার।

প্রতীক অবশ্য খণ্ডকালের, খণ্ডদেশের নহে, তাহা সর্বকালের সর্বদেশের। প্রতীকের ব্যাপিত্ব ও মহত্ত্ব এইখানেই। এইকথা মনে রাখিয়া তাঁহার একটি নাটক আলোচনা করা দরকার। উত্তরকূট—শিবতরাইয়ের ব্যাপারে শুধু চক্ররাজ বিভূতির দ্বারা যন্ত্রসর্বস্ব আধুনিক জগতের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের কথা, বর্তমান সভ্যতার অহংভাবের বিপদের কথাই, তিনি বলিতে চাহেন নাই—তাহার মধ্য দিয়া বাঁচিবার যে একটি পথ খোলা আছে, তাহার কথাও বলিয়াছেন। জীবন একটি ট্রাজেডি নয়, কমেডিও নয়, ক্যারাভান তো মার্চ করিতেই থাকিবে; কিন্তু যুবরাজ অভিজিৎ আকাশচারী নক্ষত্রের মত উঠিয়া সব গোলমাল করিয়া দিবেন। মানবজাতির মঙ্গল তিনি সাধন করিবেন, আর সঙ্গে সঙ্গে শিবতরাইয়ের আর্তকষ্ট নিবারণ করিবেন, গর্ব ও অন্ধভাব হইতে উত্তরকূটের লোকদিগকেও রক্ষা করিবেন। মানুষকে বাঁচিতেই হইবে, যন্ত্ররাজের পরিণামে কল্যাণ নাই,—কিন্তু

বাঁচাইবে কে? ধর্ম কি ধনঞ্জয় বৈরাগীর হাত ধরিয়া আসিবে? সে তো গাহিয়া চলিয়াছে—

"বাজেরে বাজে, ডমরু বাজে, হৃদয় মাঝে হৃদয় মাঝে।
নাচের নাচে, চরণ নাচে, প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে।
প্রহর জাগে, প্রহরী জাগে, তারার তারায় কাঁপন লাগে।
মরমে মরমে বেদনা ফুটে, বাঁধন টুটে, বাঁধন টুটে।"

কিন্তু তত্ত্ব দৃষ্টি, ধার্মিক দৃষ্টি? সত্যবিচার ধনঞ্জয়ের হইলেও তাহার ধারায় কোন কর্ম নাই—কর্মতো অভিজিতের ধারায় আর তাতো আমাদের চোখে ধরা দেয় না। যন্ত্রাসুরকে তিনি আঘাত করলেন, যন্ত্রাসুর তাঁকে সে আঘাত ফিরিয়ে দিলে। তখন মুক্ত তাঁর সেই আহত দেহকে মায়ের মত কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল। অভিজিতের এই লোকমোচন কর্মজগৎকে বাঁচাইল, যদিও অভিজিৎকে আমরা হারাইলাম।

ইহাতে তো ট্রাজেডিও বলা চলে না। লোকদের দিক হইতে তো নয়ই, অভিজিতের দিক হইতেও নয়—'বুক এগিয়ে আসে মরণ, মায়ের মত ভালবেসে।' মৃত্যু অভিজিৎকে কোলে তুলিয়া লইল, স্নেহময়ী মাতার মত। 'যুবরাজকে কি আর পাব না?' গণেশের উত্তরে ধনঞ্জয় ভাই বলিল—'চিরকালের মত পেয়ে গেলি।' সমস্ত নাটকখানির ভিতর দিয়া চলিয়াছে ভৈরবপন্থীদের, তাহাদের কণ্ঠের গান বাউলের একতারার মত নাটকের সুর বাঁধিয়া চলিয়াছে—'জয় ভৈরব জয় শঙ্কর জয় জয় জয় প্রলয়ের শঙ্কর শঙ্কর'। এর কথাগুলি বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া সমস্ত নাটককে যেন সংযুক্ত করিয়া দিতেছে—এক করিয়া দিতেছে। তাহার মধ্যে পূর্বাভাসরূপে আছে—'মৃত্যুসিন্ধু সন্তর।'

প্রবাসী অফিস হইতে প্রকাশিত নাটকটির পৃষ্ঠাঙ্ক ১৩৬। কিন্তু পাত্রপাত্রী অনেক। বেগার প্রথার নবরূপ—আধুনিক ভাষায় Exploitation—তাহা নাটকটি যেন জুড়িয়া আছে। সুমনের মা অম্বা, যাত্রার দলের হুব্বা, রুদ্রশ্রীর স্বামী লছমন, মালাকর বনোয়ারি—সকলেই হাহাকার করিতেছে। মাসী-বোনঝির কথাবার্তায় প্রবীনামাসির যাহাই হোক নবীনা বোনঝির সহানুভূতি যে যুবরাজ অভিজিৎএর দিকে, তাহাও কবি বেশ ভাল করিয়া দেখাইয়াছেন।

ধনঞ্জয় বৈরাগী, বৈরাগীই বটে, তাহার সুর বিশ্বের ঠাকুরের কাছে গিয়া পৌঁছায়। তাই তাহার কথার মাঝে শিকল কিছুই নাই, আছে জ্ঞানের দৃঢ়তা ও ছন্দ—

'তোর শিকল আমায় বিকল কোরবে না,
তোর মারে মরম মরবে না।
তাঁর আপন-হাতের ছাড় চিঠি এই যে,
আমার মনের ভিতর রয়েছে এই যে,
তোদের ধরা আমায় ধরবে না।'

আবার তাহার কণ্ঠে বাজিয়াছে পাখীর মত স্বাভাবিক কলস্বরে গান—

'আয়ো আয়ো প্রভু আয়ো আয়ো
এমনি করেই মারো, মারো!
লুকিয়ে থাকি আমি, পালিয়ে বেড়াই,
ভয়ে ভয়ে কেবল তোমায় এড়াই;
যা-কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো।

ধনঞ্জয় তাই মন্ত্র ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছে 'ওরে ভীতু, মার এড়াবার জন্যেই তোরা হয় মারতে নয় পালাতে থাকিস, দুটো একই কথা। দুটোতেই পশুর দলে ভেড়ার, পশুপক্তি দেখা মেলেনা।' 'তোরা যে মনে মনে মারতে চাস তাই ভয় করিস আমি মারতে চাইনে, তাই ভয় করিনে। যার হিংসা আছে ভয় তাকে কামড়ে লেগে থাকে।' 'তোদের মনকে নিজের কাছে রাখিসনে; ভিতরে যে ঠাকুরটি আছেন তাঁরই পায়ের কাছে রেখে আয়, সেখানে অপমান পৌঁছবে না।'

এই নাটক ১৩২৮ পৌষ-সংক্রান্তিতে প্রকাশিত; এরও ১৫ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৩১৩ খ্রীঃ প্রকাশিত নাটকে বৈরাগীর গান ও কথা স্থান পাইয়াছিল। Intelligent anticipation যদি কবির প্রতিভার একদিক দিয়া পরিচয় হয়, তবে রবীন্দ্রনাথ তাহা সম্পূর্ণভাবে দিয়াছিলেন;—ইহা কবির প্রশস্তি নয়। তাঁহাকে জানিবার একটি ধাপ।

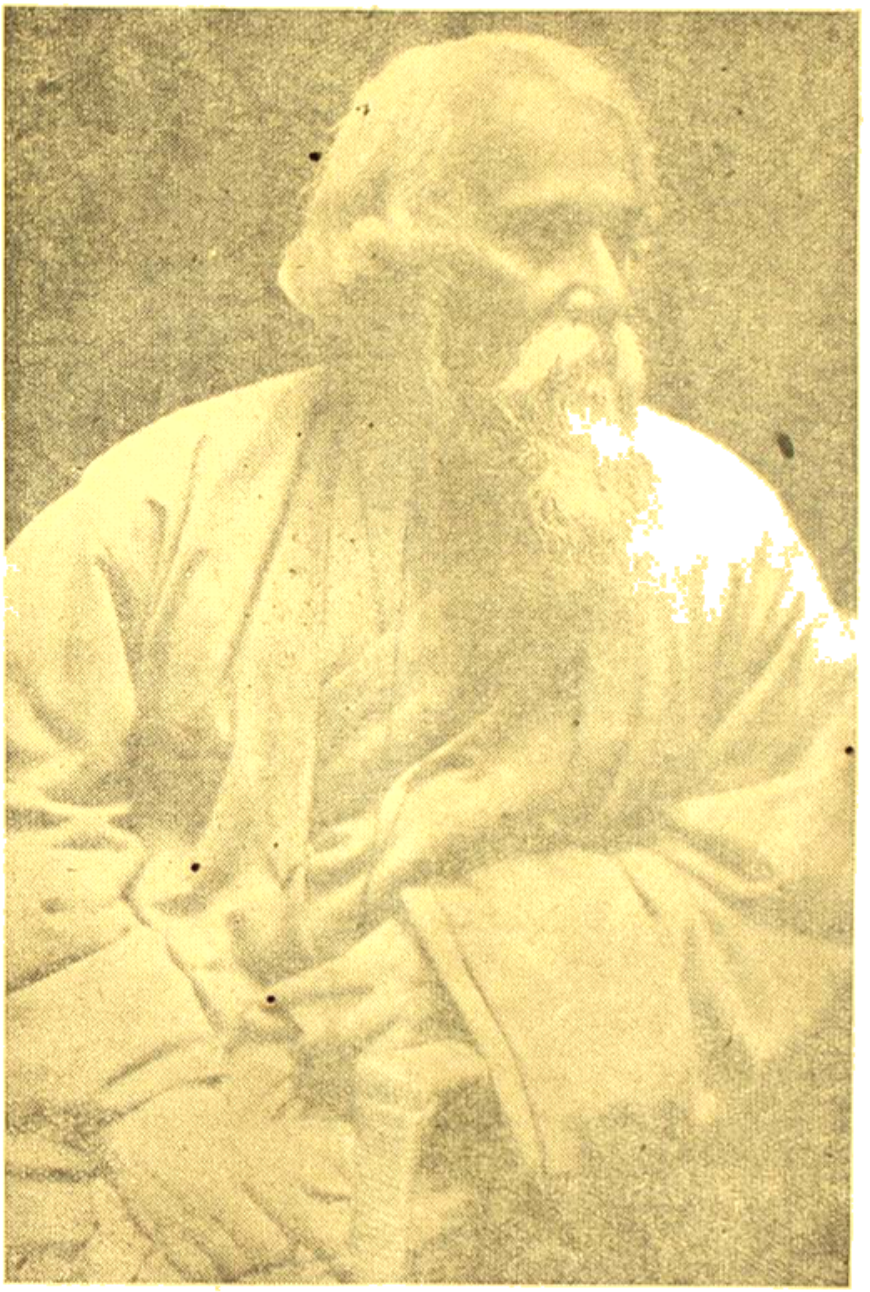

রবীন্দ্রনাথ

শিশুসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীহরিনারায়ণ ভদ্র

শিশু মনের চিত্র আঁকায় রবীন্দ্রনাথের তুলির যে অপরূপ পরশ পাওয়া যায় বাংলা ভাষার মণিকোঠায় তা অনবদ্য। যত সহজ এবং আন্তরিক ভাবে তিনি শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন এ পর্যন্ত আর কোন সাহিত্যিক অথবা কবির পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। অধুনা পূর্ব যুগে শিশুকে অন্তরঙ্গ এবং নিকটে এনে প্রকাশ করা হয়নি—সে দূরে রয়েছে। নিজের বহু শিশুজীবনের চিন্তাধারাই তাঁর চিত্তকে শিশুদের প্রতি সত্যিকারের দরদী করেছে। শিশুমনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাব-কল্পনা, বাংলা শিশু-সাহিত্যে তাঁর সোনার কাঠির পরশ অবিকৃত ভাবে দেখা দিয়েছে। কল্পলোকই শিশুর কাছে বাস্তব। নিজের শৈশবের বন্ধনদশা, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীই তাঁকে বাইরের বৈচিত্র্যময় জগতের প্রতি শিশুদের আকর্ষণের মহিমা বুঝিয়েছে। "ডাকঘরের" অমলের মুখ দিয়ে তাই তিনি বলিয়েছেন "কত বাঁকা বাঁকা ঝরণার জলে আমি পা' ডুবিয়ে পার হ'তে হ'তে চলে যা'ব। দুপুর বেলায় যখন সবাই ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে, তখন আমি কোথায় কতদূরে কেবল কাশ ঘুঁজে ঘুঁজে বেড়াতে বেড়াতে চলে যা'ব।" দূরের নীল পাহাড় অমলকে হাতছানি দিয়ে ডা'কে—গহনার দই চাই—চাই দই তা'র মন উদাস করে নিয়ে যায় পাহাড়-তলীর শ্যামলিমা ঘেরা কুটিরগুলির মাঝে, ডাকহরকরার কাজই তা'র পছন্দ হয় বেশী, প্রহরীর প্রহর জানানো ঘণ্টা তা'র প্রাণে জাগায় উন্মাদনা, ফকিরের সাথে লোকালয়ে যাবার আগ্রহ তা'র অসীম। কেবল তা'র পছন্দ হয় না কবিরাজ মশায়কে যিনি তা'কে ঘরে পুরে রাখবার পরামর্শ দেন। শিশু এইখানেই বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে; অনন্ত স্বাধীনতা প্রয়াসী শিশু বন্ধনের বিরুদ্ধে চিরদিন বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শিশুমনের যে ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তা'তে তা'কে দেখি—চির-ছুটির দেশে। সে কোন তারী কাজ পছন্দ করে না, মা'য়ের সাথে তা'র ভাব—কিন্তু গুরুগম্ভীর বাবাকে আড়ালে করে চলে। আর একটী লোককে সে পছন্দ করে না—তিনি হ'চ্ছেন গুরু-মশাই—যিনি তা'র খেলার কদর বোঝেন না কিন্তু কাজ আদায়ের বেলা ষোল আনা। শিশু চায়—নিত্য ছুটি। তা'র আপনার রচা বাস্তবে অফুরন্ত ছুটি আর আনন্দের ফোয়ারা নিরন্তর বয়ে চলে, যখনই তা'র ব্যাঘাত হয়—অভিমানী শিশু তখন দুর্জ্জয় হ'য়ে ওঠে। জীবিকার্জ্জনের চিন্তা তা'র চঞ্চল মস্তিষ্কে স্থান পায় না—বিদ্যার প্রয়োজন তা'র মোটেই নেই। তাইতো সে তা'র মা'কে বলে—

"নেইবা হ'লাম যেমন তোমার
অম্বিকে গোঁসাই
আমিতো, মা চাইনে হ'তে
পণ্ডিত মশাই।" —শিশু ভোলানাথ

সে মূর্খ হ'তে চায়, কারণ ওদের থাকে অফুরন্ত ছুটি—

"আমার তা'তে কিইবা হ'বে
মূর্খ যা'রা তা'দেরই'তো
সমস্তক্ষণ ছুটি।" —শিশু ভোলানাথ

খোকার সৃষ্টি একান্তভাবে তা'র নিজস্ব সৃষ্টি। আমাদের কাছে যা দামী তা'র কাছে তা' খেলো। তাই শিশু আর বয়স্ক লোকদের ভেতর চিরদিনই পার্থক্য রয়ে গেল। খোকা চিরনির্লিপ্ত, এটা ছেড়ে ওটা ধরে। তাই কবি বললেন—

"লজ্জাহীন সঙ্কোচহীন বিত্তহীন আপনা বিস্মৃত,
অন্তরে ঐশ্বর্য্য তোর, অন্তরে অমৃত।
দারিদ্র্য কখনো দীন, ধূলি তোরে কখনো অশুচি
নৃত্যের বিক্ষোভে তোর সব গ্লানি নিত্য যায় ঘুচি।"
—শিশু ভোলানাথ

শিশুর রাঙ্গা চাঁদ, জ্যোতির্বিদ্যার উপগ্রহ মাত্র নয়, সে তা'র খেলার সাথী। রূপকথা তা'র কাছে উপকথা নয়,—রাজার কুমার বলে নিজেকে ভাবতে তার একটুও বাধে না—সেই যেন অচেনা এক রাজকন্যাকে জীবনকাঠি ছুঁইয়ে, বাঁচিয়ে, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে আসে নিজের রাজধানীতে। কল্পলোকের আসর তা'র কাছে খোলা—তাই তো মর্ত্তলোকের

কে সে উপেক্ষা করতে পারে না। সে ডাক তা'র মনকে আরো দোলা দেয়। সেই সাথে তা'র মাথায় জড়ো হয় কত রাজ্যের ভাবনা—তা'র হদিশ সে নিজেই পায় না—

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান"

আর সেই সাথে,

"মনে পড়ে সুখোরাণী, দুখোরাণীর কথা
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা
• • •
কবে বৃষ্টি পড়েছিল বান এলো যে কোথা?"

—কড়ি ও কোমল

মা' যে শিশুকে ছোট মনে করেন, সে ভয় পাবে ভেবে তা'কে আঁচলের আড়াল করেন, তা'তে শিশু কৌতুক অনুভব করে। কল্পনায় সে "বীরপুরুষ" হ'য়ে ডাকাতদের সাথে লড়াই করে, মা'কে রক্ষা করে। এ ছাড়া তা'রও যে দায়িত্বপূর্ণ কাজ আছে এবং সে সময় কা'রো গোলমাল করা চলবে না সেটা বোঝে,—তাই সে ভুলুকে ধমক দিয়ে বলে,—

"কাজ করচি, গোল কোর না মেলা।" —শিশু অন্য কবিরা যেমন ছেলে ভুলানো কবিতা লিখেই মনে করেন তা'দের দায়িত্ব শেষ, রবীন্দ্রনাথ তা' করেন নি। তিনি শিশু অন্তরের নিভৃততম কন্দরে প্রবেশ করে তা'র শাশ্বতরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। এই বিচিত্র ভাবধারার প্রচলন করে তিনি শিশু-সাহিত্যের সর্ব্বত্র বিচিত্র অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। শিশুর জীবন রহস্যময়, প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য্য এবং রূপকথার কাহিনীতে তা'র জীবন উদ্ভাষিত। তাইতো চাঁদের বুড়িকে সে জন্ম নিতে দেখল নিজের ছোট বোনটী হ'য়ে,—

"এক যে ছিল চাঁদের কোণায়
চরকা কাটা বুড়ী
• •
ঘুমের পথে পথ হারিয়ে
মায়ের কোলে এসে
পূর্ণ চাঁদের হাসিখানি
ছড়িয়ে দিলে হেসে।"

শিশুমনের এই বিচিত্রভাবের আলোছায়ার খেলা রবীন্দ্রনাথই মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করেন, তিনিই শিশুসাহিত্যকে বাংলা সাহিত্যে প্রাণের সজীব ভাষায় রূপায়িত করেন। শিশুদের মাঝে সে রস উপলব্ধি করবার মত খোকার সংখ্যা এত বেশী যে তা'রা রবীন্দ্রনাথের সামান্যতম আনন্দের পরিবেশে মুগ্ধ হ'য়ে যা'য়।

"খ্যান্ত পিসির দিদি শাশুড়ীরা
তিনবোন থাকে কালনায়
শাড়ীগুলো তা'রা উনুনেতে রাখে
হাড়িগুলো রাখে আলনায়।"

এই ভাবে শিশুদের আনন্দের খোরাক তিনি প্রচুর পরিমাণে মজুদ রেখে গেছেন। সুকোমলচিত্ত এই শিশুদের তিনি মুক্ত আলোবাতাসের মাঝে প্রকৃতির সাথে খেলাছলে নীবিড় পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে শান্তিনিকেতনে "আশ্রমিক শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন করেছেন। শিশুর সাথে মেলামেশায় তাঁর ছিল অপার আনন্দ। তা'দের দুরন্ত স্বভাবটুকুও কবি ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও প্রশ্রয়ের আলোতে রমণীয় করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ শিশুকে উপলক্ষ্য করে মাতৃস্নেহের যে রূপ এঁকেছেন তা' সুষমায় স্বর্গীয়, লাবণ্যে কমনীয়। মাতৃ-হৃদয়ের সুখ-দুঃখ, আনন্দ সব শিশুকে ঘিরে উঠেছে লতার মত। শিশুর যে স্বাতন্ত্র্য তিনি রচনা করলেন, বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রুশো তা' মেনে নিয়ে বলেন, "শিশু অদ্ভুত প্রাণী, ক্ষুদ্র মানব।" শিশুদের সঙ্গ তাঁকে আনন্দে উৎফুল্ল করত। তাই ছেলেমেয়েরাও তাঁকে পেয়ে বসত। দেবতা'কে মানুষ যে ভাবে ভক্তি করে ও ভালবাসে এক মাটিরই মানুষ হ'য়ে তিনিই তা' পেয়েছেন, তবুও দেবতার মত তিনি দূরে ছিলেন না। শিশুকাব্যে ও সাহিত্যে শিশুদের প্রতি প্রীতির যে সম্বন্ধ তিনি স্বীকার করেছেন, তা' তাঁর শিশু অনুরাগী চিত্তের অন্তরতম অনুভবের অভিব্যক্তি। শিশুদের সাথে মৈত্রী ও ভালবাসার স্মৃতি তাঁর স্বজন মহিমাকে ধন্য করেছে। ছড়া, ছোটগল্প ও কবিতার ভেতর দিয়ে বার বার তিনি শিশুদেবতার কোমল-করে অঞ্জলি দিয়েছেন।

শিশু বাৎসল্য রসের পিয়াসী, তাইতো স্বর্গের চেয়ে

মর্ত্যের ধূলিবালি মাখা কাকীর কোলই তা'র ভাল লাগে বেশী।—

"স্বর্গে যাওয়া দেব কাকি
বল্‌ছি, কাকী
দেখব আমায় কে কি করে ?
চিরকালই
রইব পালি
তোমার ঘরে।" —শিশু ভোলানাথ

কবি তাই চিরদিন বেঁচে থাকতে চেয়েছেন চির-শিশু হ'য়ে, শিশুদের আনন্দমেলার মাঝখানে।—

"বালা দিয়ে যে জীবনের
আরম্ভ হয় দিন
বাল্যে আবার হোক না তাহা সারা।"

—শিশু ভোলানাথ

তিনিই বুঝালেন যে খোকা শুধু শিশুই নয়, তারই ভেতর লুকিয়ে আছে জাতির আশা-ভরসা ; অনাগত ভবিষ্যতের গণদেবতারা তা'দের মাকে মুক্তির মহানন্দে তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে আসছে—জাতির ললাটকালিমা ধুয়ে দিতে।

জাতি-বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ (১)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ইংরেজ ও ভারতবাসী দুইটি স্বতন্ত্র জাতি। শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতিতে দুইটিই বিভিন্ন। ইংরেজ বিজেতা, ভারতবাসী বিজিত—এদিক দিয়াও উভয়ের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। এ দুইয়ের মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা নাই, অথচ বিরোধিতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তাই বঙ্কিমচন্দ্র উভয় সমাজের মিলনকামীদের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করিয়া ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দেই লিখিয়া গিয়াছেন :

এতদুভয় জাতির মধ্যে যে বিদ্বেষ ভাব, তাহাকেই জাতি-বৈর বলিতেছি। প্রায় অধিকাংশ সদাশয় ইংরেজরা ও দেশীয় লোক এই জাতি-বৈরের জন্য দুঃখিত। তাঁহারা এই জাতি-বৈরকে অশুভকরী মনে করিয়া, ইহার শান্তির জন্য যত্ন করেন। যে সকল সংবাদপত্রে এই জাতি-বৈরের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই আবার ইহার নিরাকরণার্থ নানাবিধ কুটার্থ, মনস্তত্ত্ববিশিষ্ট প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার নিরাকরণার্থ বিদ্যাতীয় সমাজ, সভা, সোসাইটি, এসোসিয়েশন স্থাপিত হইয়া যেত কৃষ্ণ উক্ত কর্ম রক্ষিত হইয়া সহস্রকের ডকের হলা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার সমতার জন্য কত ইউনিয়ন ক্লব সংস্থাপিত হইয়া পুপকার এবং মদ্য বিক্রেতাকুলের আনন্দ বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই এ রোগের উপশম হইল না। দুঃখের বিষয় যে কেহ বিবেচনা করিয়া দেখিল না যে এই জাতি-বৈর শমিত করিয়া আমরা উপকৃত হইব কি না ? আর উপকৃত হই বা না হই, বাস্তবিক ইহার শমতা সাধ্য কি না ?

এই জাতি-বৈরের শমতা যে সাধ্য নয় তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বেকার ও পরবর্ত্তী কালের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে সম্যক পরিস্ফুট হইবে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখ করিব :

মানুষের স্বভাবই এমত নহে যে বিজিত হইয়া জেতার প্রতি ভক্তিমান হয় অথবা তাহাদিগকে হিতাভিলাষী বিশ্বস্থ মনে করে এবং জেতাও কখন বল প্রকাশে বিরত হইতে পারে না। আজকাল, আমরা বটে, কিন্তু বিনীত নহি এবং হইতেও পারিব না। কেননা আমরা প্রাচীন জাতি, অদ্যাপি মহাভারত রামায়ণ পড়ি, মনু যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা অনুসারে চলি, স্নান করিয়া জগতে অতুল্য ভাষায় ঈশ্বর আরাধনা করি। যতদিন এ সব বিস্মৃত হইতে না পারিব ততদিন বিনীত হইতে পারিব না, মুখে বিনয় করিব, অন্তরে নহে। অতএব এই জাতি-বৈর আমাদের প্রকৃত অবস্থার ফল—যতদিন দেশী বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ সম্বন্ধ থাকিবে, যতদিন আমরা নিকৃষ্ট হইয়াও পূর্ব্ব গৌরব মনে রাখিব, ততদিন জাতি-বৈরের শমতার সম্ভাবনা নাই। এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যে, যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরিতার অভাব এমনই প্রবল থাকে। *

---

* সাধারণী, ১১ই কার্ত্তিক ১২৮০ : "জাতি-বৈর"।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভবিষ্যদ্বাণী কতখানি সত্য হইয়াছে তাহা পরে আলোচনা করিব। যে জাতি-বৈরের কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন তাহা আমাদিগকে শুধু দেশাত্মবোধেই উদ্বুদ্ধিত করে নাই, উহা পরিপোষণেও সহায়তা করিয়াছে। এ কারণ আমরা জাতি-বৈরকে দেশাত্মবোধেরই রূপান্তর বলিয়া গণ্য করি। পলাশীর যুদ্ধের পর কুশাসন, মন্বন্তর, ভূমিবণ্টন-ব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশে যে সামাজিক বিপ্লব ঘটে তাহা হইতে আত্মস্থ হইতে বঙ্গসমাজকে দীর্ঘদিন লাগিয়াছিল। এই বিপ্লব বা সংস্থানের মধ্যে কেহ কেহ ভারতীয় শিক্ষা সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইলেও অধিকাংশ ইংরেজ এদেশবাসীকে অত্যন্ত ঘৃণ্যরূপে চিত্রিত করিয়াছে। যাহা ব্যতিক্রম তাহাকেই নিয়ম বলিয়া ধরিয়া লইয়া সমগ্র জাতিকেই হীনমতি আখ্যা দিতে ইতস্ততঃ করে নাই। চার্লস গ্রান্ট ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতিশীল বলিয়া প্রখ্যাত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে সেই দুর্যোগের সময় কয়েক বৎসর তিনি বাংলাদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফ্যাক্টরীতে কর্ম করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। সেখানে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবাসীর অবস্থা বর্ণনা করিয়া তিনি একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। তাহাতে লেখেন :

In the worst parts of Europe there are no doubts a great number of men who are sincere, upright and conscientious. In Bengal, a man of real veracity and integrity is a great phenomenon; one conscientious in the whole of his conduct. It is to be feard, is an unknown character ...Power entrusted to a native of Hindoostan seldom fails of being exercised tyrannically, or perverted to the purpose of injustice. Official or ministerial employments of all sorts, and in all gradations are generally used as means of peculation...The distribution of justice...has commonly become a traffic in venality; the best cause being obliged to pay for success, and the worst having the opportunity of purchasing it ..Such is the power of money, that no crime is more frequent, hardly any less thought of than perjury...The apathy with which a Hindoo views all persons and interests unconnected with himself, is such as excites the indignation of Europeans ...Patriotism is absolutely unknown in Hindoostan.*

বঙ্গীয় সমাজের তখন নিতান্তই দুর্দিন। সমাজের ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের ব্যবহার বা চরিত্র দূষণীয় ছিল সন্দেহ নাই —আর ইহার জন্য এক শ্রেণীর উৎকোচপ্রিয় ব্যভিচারী ইংরেজ ও এদেশীয় সরকারী কর্মচারী বিশেষ দায়ী ছিল—কিন্তু তাই বলিয়া সমগ্র বাঙালী জাতিকে মিথ্যাচারী বলিয়া অভিহিত করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা সুধীজনের বিবেচ্য। ইহার আট বৎসর পূর্বে কিন্তু বহু-নিন্দিত ওয়ারেন হেষ্টিংস বিজিত ভারতবাসীদের অন্তর্নিহিত অফুরন্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার ইংরেজদের পক্ষ আয়ত্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিয়া লিখিয়াছিলেন :

It is no very long since the inhabitants of India were considered by many, scarce elevated above the degrees of savage life: nor I fear, is that prejudice yet wholly eradicated, though surely abated. Every instance which brings their real character home to observation will impress us with a more sense of feeling for their natural rights, and teach us to estimate them by the measure of our own.*

কিন্তু বাঙালীদের সম্বন্ধে ইংরেজ-সাধারণের এবং খ্রীষ্টান পাদ্রীদের কুধারণা ক্রমে বাড়িয়াই চলিল। হিন্দু দেব-দেবীর কদর্য বর্ণনায় শেষোক্ত ব্যক্তিরা পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন বঙ্গীয় নর-নারীকে জ্ঞানের আলো দান করিবার জন্য তাহারা উদ্‌গ্রীব হইল। শ্রীরামপুরের বিখ্যাত খ্রীষ্টান পাদ্রীদের এদেশে আগমন ও দুঃসহ ক্লেশভোগের মধ্যে তাঁহাদের সরল বিশ্বাস বা দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় পাওয়া গেলেও ভারতবাসীর বিরুদ্ধে প্রচার-কার্যে বিলাতে যে কতখানি গভীর ও ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল উহা হইতেই তাহা বেশ বুঝা যায়। বিজেতা উৎকৃষ্টতম, বিজিত নিকৃষ্টতম—এই ধারণা ইংরেজের মনে তখন এতই বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই ধারণা প্রশমিত করিবার কোনই চেষ্টা হয় নাই। ভারতবাসীদের পক্ষে ইহার প্রথম প্রতিবাদ আসে রাজা রামমোহন রায়ের নিকট হইতে। কোম্পানীর সিবিলিয়ান কর্মচারীদের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার

* ইহার সূত্রপাত ও জে. পি. মায়ের কৃত *History of Education in India* নামক পুস্তকে ৪৮-৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

* সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—১৩৩৫, ৩য় সংখ্যা। "বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ"—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

আস্বাদ পাইয়াছেন। অনবরত হীন বলিয়া আখ্যাত বাঙালীরা বিজেতৃ জাতির নিকট হইতে এতদিন যে কদর্য্য ব্যবহার পাইয়া আসিতেছিল রামমোহন তাহার রেওয়াজ ফিরাইয়া দিতে অগ্রণী হইলেন। যেখানে যখনই তিনি যথোপযুক্ত ব্যবহারের অন্যথা দেখিয়াছেন তখনই তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরের কলেক্টর তাঁহার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করিলে ইহার প্রতিবাদ করিয়া রামমোহন তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিন্টোকে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন।* তাহার এই প্রতিবাদ ব্যক্তিগত হইলেও ইহার ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। এদেশীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে কালেক্টর সাহেব যাহাতে অবহিত হন সেই মর্ম্মে বড়লাট তাঁহাকে আদেশ দিলেন।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনন্দে এদেশে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের গতিবিধিতে অবাধ অধিকার স্বীকৃত হয়। ইহার ফল দেশবাসীর পক্ষে শুভই হইয়াছিল বলিতে হইবে। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবার জন্য পাদ্রীরা প্রথমে বিদ্যালয়াদি স্থাপন করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের দ্বিতীয় কার্য্য হইল,—খ্রীষ্টমাহাত্ম্য প্রচারকল্পে বাংলা ভাষায় পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ। বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকও রচিত হইতে লাগিল। এক দিকে উন্নততর পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে আধুনিক শিক্ষালাভের সুযোগ হইল, অন্য দিকে বাংলা ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বলাবাহুল্য, ইতিপূর্ব্বেই [১৮০১ সালে প্রতিষ্ঠিত] ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ ইহার অন্যতম অধ্যাপক পাদ্রী উইলিয়ম কেরীর তত্ত্বাবধানে সিভিলিয়ন ছাত্রদের পাঠোপযোগী বাংলাপুস্তক রচনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে স্বাধীন মত ভাষায় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে ভাষাতেই উত্তর পক্ষ পূর্ব্ব পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ সুরু হইল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাংলা ভাষায় 'সমাচার দর্পণ', 'বাঙ্গালা গেজেটি' প্রমুখ বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়া সাধারণের মধ্যে দেশী-বিদেশী সংবাদাদি পরিবেশনে সুবিধা হইল।

কিন্তু ক্রমে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণের মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া সমাজ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। দেশী পাঠশালাসমূহে ছাপা বই প্রবর্ত্তনের সময় হিন্দুকুলপতি রাধাকান্ত দেবকে স্বদেশবাসীদের এই বলিয়া আশ্বাস দিতে হইয়াছিল যে, তাহাতে খ্রীষ্টতত্ত্বমূলক কোন কথা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের উপর আক্রমণ চালাইত, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের উপর আক্রোশ ছিল অত্যধিক। তাহাদের আক্রমণের প্রতিবাদ স্বরূপ হিন্দুধর্ম্মের সপক্ষে প্রগতিপন্থী সংস্কার-প্রয়াসী রামমোহন রায় লেখনী ধারণ করিতে বাধ্য হন। তিনি এই উদ্দেশ্যে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মণ সেবধি বা *Brahmanical Magazine* নামে দ্বি-ভাষিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার এই প্রতিবাদ সমগ্র জাতির পক্ষে বিজেতৃ জাতির বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রতিবাদ। রামমোহন লেখেন যে, কোম্পানীর আমলের প্রথম পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে শেষের কুড়ি বৎসর যাবৎই পাদ্রীদের এই দৌরাত্ম্য চলিয়াছে। বিজিতেরা স্বভাবতঃই দুর্ব্বল, বিজেতৃ জাতির কার্য্যাকার্য্যের উপর তাহাদের হাত নাই। এদেশের পরিবর্ত্তে তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি স্বাধীন দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারে উদ্যোগী হইলে পাদ্রীদের সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইত। এই প্রসঙ্গে রামমোহন লিখিলেন :

For wise and good men always feel disinclined to hurt those that are of much less strength than themselves, and if such weak creatures be dependent on them and subject to their authority, they can never attempt, even in thought, to mortify their feelings.

We have been subjected to such insults for about nine centuries, and the cause of such degradation has been our excess in civilization and abstinence from the slaughter even of animals, as well as our division into castes, which has been the source of want of unity among us."

রামমোহন এখানে আরও বলেন যে, আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ হইল আমাদের অতিরিক্ত সভ্যতা এবং এমনকি পশুপক্ষী হত্যায়ও আমাদের পরাঙ্মুখতা। জাতিবিভাগ—

* পত্রখানি শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামমোহন রায়'—পৃ. ২৬-২৯ উদ্ধৃত হইয়াছে।

যাহা আমাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ভীষণ পরিপন্থী, আমাদের ঈপ্সিত অগ্রগতির জন্য কম দায়ী নহে। কিন্তু হিন্দুদের মত পরমতসহিষ্ণু ও উদার জাতি জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

It is wellknown to the whole world, that no people on earth are more tolerant than the Hindoos, who believe all men to be equally within the reach of divine beneficence, which embraces the good of every religious sect and denomination."

বহু শতাব্দীর মুসলমান শাসনের পর ইংরেজ কর্তৃক ভারতবর্ষে সুশাসন ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা বিধাতার বিধান বলিয়া গণ্যমান্য ভারতীয়েরা তখন মনে করিতেন। রামমোহন রায়ও যে ইহা বিশ্বাস করিতেন তাহা তাঁহার রচনার মধ্যেই আছে ("being placed by Providence under the sovereign care and protection of the august head of the British nation")। কিন্তু এরূপ মনে করিলেও রামমোহন যখনই সরকারী নীতি বা কার্য্য জাতীয় স্বার্থের বিরোধী বলিয়া বুঝিয়াছেন তখনই তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-সংকোচক সরকারী বিধি-নিষেধের তিনি প্রতিবাদ করেন। এবারকার প্রতিবাদ ব্যক্তিগত ভাবে ব্যক্তি-বিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের বিরুদ্ধে নহে, ইহা হইল সরকারী শাসন-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। অন্য বন্ধুদের সহযোগে তিনি কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টে ইহার বিরুদ্ধে আবেদন করিলেন। আবেদনে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রামমোহনের সঙ্গে ছিলেন চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর। রামমোহন এই বিধির বিরুদ্ধে বিলাতে সপরিষদ রাজার নিকটেও একখানা স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্র সমাজ ও রাষ্ট্রের কতবিধ উপকারে আইসে এবং ইহার শক্তিই বা কিরূপ—এসব বিষয়ে রামমোহনের স্পষ্ট দৃঢ় মত এই স্মারকলিপিখানিতে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি লেখেন:

...a Free Press has never yet caused a revolution in any part of the world, because, while men can easily represent the grievances arising from the conduct of the local authorities to the supreme government, and thus get them redressed, the grounds of discontent that excite revolution are removed; whereas, where no freedom of the Press existed, and grievances consequently remained unrepresented and unredressed. Innumerable revolutions have taken place in all parts of the globe, or if prevented by the armed force of the government, the people continued ready for insurrection. *

রামমোহন উক্ত বিধির প্রতিবাদে নিজস্ব মীরাৎ-উল্-আখ্‌বর (১২ এপ্রিল ১৮২২ প্রতিষ্ঠিত) নামক ফার্সী পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন।

ইহা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। ইহার পূর্ব্ব হইতেই বাঙালী সমাজ কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ আন্দোলিত হইতে থাকে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে শিক্ষা বিস্তার সরকারী দায়িত্ব বলিয়া স্বীকৃত হইলে সাধারণের দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের শিক্ষাদান কার্য্যের কথা বলিয়াছি। ডেভিড হেয়ার প্রমুখ হিতৈষী ইংরেজ এবং স্বদেশীয় গণ্যমান্য ও পণ্ডিত-প্রধানদের চেষ্টা-যত্নে ১৮১৭, ২০শে জানুয়ারি হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিয়মিতরূপে ইংরেজী শিক্ষার প্রথম পত্তন হইল। হিন্দুকলেজ, কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুল (পরে ডেভিড হেয়ারের স্কুল নামে পরিচিত), রামমোহন রায়ের এ্যাংলো-হিন্দু স্কুল ও জগমোহন বসুর ভবানীপুর ইউনিয়ন স্কুলে স্বদেশীয় যুবকগণ ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিল। সভা-সমিতি বিতর্ক-সভা স্থাপিত হইল। শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত হইল। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সময় এই কথাটি কাহারো কাহারো মনে উদয় হইয়াছিল যে, ইহা প্রাপ্ত হইলে এদেশবাসীরাও স্বাধীনতা লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হইবে। ডিরোজিও ইউরেশীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও জন্মভূমি ভারতবর্ষকেই স্বদেশ বলিয়া মান্য করিতেন এবং স্বদেশ-প্রীতিমূলক ইংরেজী কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষায় হিন্দুকলেজের যুবক ছাত্রদল স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইতে লাগিল। কাশীপ্রসাদ ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী বা শিবচন্দ্র ঠাকুর ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন না, তথাপি

* ঐ। পৃ. ১৬৮।

* ঐ পৃ. ৩৫৭।

তাঁহারা হিন্দুকলেজের শিক্ষাগুণে স্বদেশ সেবায় অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, কাশীপ্রসাদ স্বদেশকে উদ্দেশ করিয়া ইংরেজী কবিতাও লিখিলেন। ১৮২৩ সনে রামমোহন রায় সরকারের পক্ষে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা না করিয়া সেই অর্থ পাশ্চাত্য শিক্ষায় ব্যয়ের যুক্তিযুক্ততা প্রতিপন্ন করিয়া তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লেখেন তাহার মূলেও উক্ত চিন্তা বিদ্যমান ছিল।

রামমোহন রায় এদেশে ইংরেজদের স্থায়ী বসবাসেরও সপক্ষে ছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ইংরেজগণ ভূমি ক্রয় করিয়া তাহাতে স্বত্ববান হইতে পারিত না। এই বাধা নিরাকরণের জন্য ১৮২৯ সালে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় তাহাতে রামমোহন আন্তরিকভাবে যোগদান করেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ইংরেজগণ শুধু নিজেদের শক্তি সামর্থ্য দ্বারা নহে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তাধারা এদেশে প্রবর্তিত করিয়া ভারতবাসীকেও নিজেদের উন্নত পর্য্যায়ে তুলিয়া লইয়া যাইবে। অনেকে আশঙ্কা করিত যে, এদেশবাসীদের সঙ্গে ইংরেজরা মিলিত হইলে ভারতবর্ষ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় স্বাধীন হইয়া যাইতে পারে। রামমোহন রায় এদেশে ইংরেজদের স্থায়ী বসবাস সম্পর্কে বিলাতে পার্লামেন্টারী কমিটিতে যে স্মারকলিপি প্রদান করেন তাহাতে এ আশঙ্কার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রথমতঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠিত থাকিলে কানাডার মত এখানেও ওরূপ আশঙ্কা অমূলক বলিয়াই প্রমাণিত হইবে। আর যদি কখনও কোন কারণে অন্যথা ঘটে তাহা হইলেও ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষের মধ্যে সম্প্রীতিই বজায় থাকিবে :

* ...If events should occur to effect a separation, (which may arise from many accidental causes, about which it is vain to speculate or make predictions), still a friendly and highly advantageous commercial intercourse may be kept up between two free and Christian countries, united as they will then be by resemblance of language, religion, and manners. *

পাশ্চাত্য শিক্ষাই যে একদিন ভারতবাসীকে স্বাধীনতা লাভে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে—রামমোহনের মনে এ ধারণা বলবৎ ছিল। কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও কেহ কেহ যে এরূপ বিশ্বাস করিতেন নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে তাহা প্রতীত হইবে। মেজর জেনারেল লাডলো স্মিথ, কে. সি. বি., ১৮৩১, ৬ই অক্টোবর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যকলাপ আলোচনার জন্য পার্লামেন্ট নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেন। কমিটির প্রশ্ন ও তাঁহার উত্তর পর পর প্রদত্ত হইল :

Q. If in the progress of time, India were to become sufficiently instructed to understand the principles of Christian religion, and to comprehend the nature of government, such as that which belongs to the British Constitution, is it your opinion that in that state of civilization, India would permit itself, for any length of time, to be governed by the authority of England?

A. No: I should say not; taking the history of nation, they would feel the value of governing themselves.

Q. Is it not the case that, in that state of civilization which you contemplate as of advantage, the British dominion in India must also be contemplated by you as to cease?

A. I have expressly said, that I think the effect of imparting education will be to turn us out of the country.

Q. If that should take place, are you prepared to say that India may not be of more value to us than it now is?

A. By no means; America has been of more value to us separate than as a colony.

Q. Are the Committee to understand your opinion to be, that, in proportion as India becomes civilized and instructed there would be a desire for independence?

A. I should think there naturally would.

Q. Even if that independence took place, you are not prepared to say that India might not be equally valuable to England as it now is?

A. Certainly not: there would not be such an outlet for gentlemen's sons, for appointments and things of that kind; but I should think the profit of the country would be as great: there would be none of the expense, and all the advantages.

Q. You are aware that the Mahomedans occupied the supreme government of India for seven hundred years: what leads you to think that India may not be connected with us as a colony for the same period?

A. The very effect of educating them, which the Mahomedans did not, would make the difference; the letting them know their own strength, that they

* ঐ। পৃ. ৩১৮।

must feel their own power, and the consequence must be, the natural desire of turning every white face out of the country."*

রামমোহন রায়ের মত স্মিথও বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে স্বাধীন আমেরিকার ন্যায় ব্রিটেনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া শেষোক্ত দেশের বহু সুবিধাই করিয়া দিবে। ভারতবর্ষ শাসনের জন্য ব্রিটেনকে এক কপর্দকও ব্যয় করিতে হইবে না। টমাস বেবিংটন মেকলে বড়লাটের শাসন-পরিষদের আইন-সচিব পদে নিযুক্ত থাকিয়া (১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে) ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক কটূক্তিই করিয়াছেন। তিনিও এদেশে আসিবার পূর্বে পার্লামেণ্টে ভারত-শাসন সম্পর্কে বক্তৃতাকালে কতকটা এই মর্মের কথাই বলিয়াছিলেন :

...that having become instructed in European knowledge, they may, in some future age, demand European institutions.....Whenever it comes, it will be the proudest day in English History."*

পরপদানত ভারতবাসীর সম্মুখে ইউরোপীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার খুলিয়া দিলে তাহারা নিজ দেশে পাশ্চাত্যের অনুকরণে উৎকৃষ্টতর শাসন-পদ্ধতি, অর্থাৎ, স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে উন্মুখ হইবে কিনা—এ কথার যাথার্থ্য পরবর্তী আলোচনায় উপলব্ধি হইবে। তবে একথা আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, স্ব-শাসন ক্ষমতা লাভের পক্ষে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণই যথেষ্ট নয়, ইহার জন্য অন্যান্য বহু বিষয়ও আবশ্যক।

* *The Asiatic journal*—January 1839, p. 11. "Ultimate effects of Native Education of India."

* *History of Education in India*, পৃ. ১১৪ দ্রষ্টব্য।

আমাদের সাহিত্য

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ যুগের উপন্যাস

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্করের 'রাই কমল' উপন্যাসটী হাতে এসেছে। উত্তীর্ণ-কৈশোরে এ-বই প্রথম পড়েছিলাম, এবারে দীর্ঘকাল পরে আবার পড়বার সুযোগ ঘটলো। দেখলাম রস-সৃষ্টি হিসাবে এর আবেদন চিরকালীন, তাঁর প্রথম যুগের লেখাগুলির মধ্যে বোধ হয় সেই গুণেই 'রাইকমল' প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

লেখক জানিয়েছেন, ১৩৩৪ সালের কল্লোল পত্রিকায় "রাইকমল" প্রথমে প্রকাশিত হয় তারপরে ১৩৩৮ সালে। 'রাইকমল' এর একটি সুলভ সংস্করণ* মুদ্রিত হয়, তারপরে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের প্রচেষ্টায় ১৩৪১এর আশ্বিনে এর প্রথম সংস্করণ বের হয়। দাম এক টাকা। এই সংস্করণটীই উপস্থিত পাওয়া গেছে। বইটীর উৎসর্গ-সম্মান দেওয়া হোয়েছে শ্রীমতী উমা দেবীকে।

* ছোট গল্প সিরিজ

তারাশঙ্কর সম্বন্ধে আজ আলোচনা করতে ব'সে এই কথাটাই বেশী ক'রে মনে হোচ্ছে যে তিনি যা যা দেখেন তা প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন। সাহিত্যের প্রাণবস্তু হোচ্ছে দরদ—তারাশঙ্কর তাঁর প্রথম বয়সের রচনা থেকেই তা যুহাতে নিষ্ঠার সংগে পরিবেশন করে আসতে পেরেছেন। এখন তাঁর সেই সাধনার যে পরিপূর্ণরূপ দেখতে পাচ্ছি তাতে সত্যিই আমরা আনন্দিত। আজকে বাংলা দেশের রসিক জনসমাজে তারাশঙ্করের যে অক্ষয় আসন স্থাপিত হোল তার গভীরে ছিলো তাঁর এই সুদীর্ঘকালের অধ্যবসায়—শরৎচন্দ্রের পরে এমন অনাবিল স্নেহ, মমতা, ভালবাসা নিয়ে যে কয়জন বিরলধারার যাত্রী এই শিল্পের বিরাটতরো ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর একজন।

রাইকমলের প্রথম পটভূমিতে পাওয়া যাচ্ছে চাষীদের ছোট্ট একখানি গ্রাম। একটী বৈষ্ণবের আখড়াকে কেন্দ্র ক'রে এই কাহিনী গড়ে উঠেছে। আখড়াটীর নাম 'হরিদাসের ঝুরু'—হরিদাস মহান্ত ছিলো এর প্রতিষ্ঠাতা—তারই স্ত্রী কামিনী ও কন্যা কমলিনীকে দিয়ে কাহিনী আরম্ভ হোল—কন্যা কমলিনীই এ-উপন্যাসের নায়িকার আসন গ্রহণ

বুরেছে। পল্লীবাসীরা এই দুজনকে দেশী ভাষায় বলে 'মা-বিটিরা'!

অতি সাধারণ জীবনযাত্রা তাদের—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আখড়াটী। কামিনী খঞ্জনী বাজিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষে ক'রে আনে, তাতেই চলে, কমলিনীকে ভিক্ষায় যেতে দেয় না, সে এখন গান শেখে। তার একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিলো গানের, এটা সে তার পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলো বলা যায়।

চঞ্চলা কিশোরী কমলিনী, সব সময়ে মুখে হাসি লেগেই আছে। আধবুড়া বাউল রসিকদাস তাই কমলিনীকে ডাকে 'রাইকমল'!

কমলিনী হেসে সারা হয় বলে, কি গো বগ্‌বাবাজী?

বাউল রসিকদাসের শরীরের গঠনভংগী ছিলো অতিরিক্ত লম্বা রকমের, তাই এই নামকরণ।

কামিনী এতে কিন্তু খুব রাগ করে, তিরস্কার করে কন্যাকে বলে, মর মর তুই মুখপুড়ী, চৌদ্দ বছরের ধাড়ী!

রসিক হেসে বাধা দিয়ে বলে, না না বোকোনা — ও আনন্দময়ী রাইকমল!

মোড়লদের ছেলে রঞ্জনের সংগে কমলিনীর বিশেষ অন্তরংগতা। বছর চারেকের বড়ো সে বয়সে তার থেকে। ধর্মতলার প্রকাণ্ড বড়গাছটার তলদেশে এই গ্রামের ছেলে-দের পুরুষানুক্রমিক খেলাঘর। রঞ্জন ছিলো কমলিনীর খেলাঘরের বর!

একটী ননদিনীও ছিলো। তার নাম ঝাড়ু। খেলা-ঘরের অপূর্ব লীলাচাপল্য থেকে মাঝে মাঝে বাস্তবের ছায়া সৃষ্টি হোত—একেকদিন চাষার মাঠ থেকে ফিরে আসা ক্লান্ত শরীরের রাগের অভিনয় সত্যিসত্যিই চরমরূপ নিতো, রঞ্জন কয়েক ঘা বসিয়ে দিতো কমলিনীর পিঠে, প্রত্যুত্তরে আসতো যথোচিত পরিমাণে, সংগীরা এসে থামাতো!

সেই রঞ্জন আজ তরুণ কিশোর। সেই চপলা মুখরা কমলি আজ চৌদ্দ বছরের কমলিনী।

রঞ্জনের মা কমলিনীকে ভালবাসতো। কিন্তু যেদিন তাদের অন্তরংগতার একটী চরম রূপ চোখে পড়লো, সেদিন সে তার ছেলের হাত হারাবার ভয়ে সন্ত্রস্ত হোয়ে উঠ্‌লো। রঞ্জন তখন বেঁকে বসেছে, বলছে সে বোষ্টোম হোয়ে কমলিনীকেই বিয়ে করবে।

পিতা মহেশ্বর মোড়ল এসে কামিনীর কাছে আছড়ে পড়লো, বললে আমার এই একমাত্র সন্তান, আমার সন্তান আমাকে ফিরিয়ে দে কামিনী—তোর ভালো হ'বে।

তাই হোল, গ্রাম ছেড়ে কমলিনীকে নিয়ে কামিনী নবদ্বীপের দিকে রওনা হোল, বললে, তুই দুঃখ করিস্‌নি কমলি, নবদ্বীপে চাঁদের মতো চাঁদ খুঁজে তোর বিয়ে দেবো আমি।

সংগে এলো বাউল রসিকদাস।

এখানে কামিনী বেশ ভালোভাবেই আবার জাঁকিয়ে বস্‌লো। তাদের সেই আসরে এল তরুণ সুবলচাঁদ, এলো বলাই দাস।

রসিকের বড় সাধ এদেরই মধ্যে কারুর সঙ্গে বিয়ে হোয়ে যায় কমলের। সময় এবং সুযোগ পেলে রংগের সংগে মাঝে মাঝে সে কথা সে উল্লেখ করতেও ভোলে না।

কিন্তু কমলের মনকে ঠিক স্পষ্ট করে বোঝা যায় না—সুবল বা বলাইএর কথা উঠলেই সে বিদ্রূপে উপহাসে তীক্ষ্ণ হোয়ে ওঠে। কামিনী মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে প্রমাদ গুণ্‌লো।

আরো কিছুদিন কাটলো। আজকাল কামিনী মেয়ের বিয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে শুধু নবদ্বীপচন্দ্রের চরণাশ্রয়ই খুঁজছে। তারপরে সামান্য কয়েকদিনের জ্বরে সে মারা গেলো। কন্যা কমলিনীকে রেখে গেলো প্রৌঢ় রসিকদাসের কাছে।

দিন যায়। রসিক কমলের বিয়ের জন্যে ক্রমশঃই ব্যস্ত হোয়ে ওঠে। কিন্তু কমলের এই ব্যাপারের দীর্ঘসূত্রতাকে কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারে না। তারপরে একদিন অকস্মাৎ কমল রসিককেই মালা দিয়ে স্বামীত্বে বরণ ক'রে নিলো—এতে প্রতিবেশীরা যতোটা না আশ্চর্য্য হোল তার থেকে বেশী হোল রসিকদাস স্বয়ং।

দিন চলতে লাগ্‌লো। নবদ্বীপের থেকে এবার তারা বেরিয়ে পড়লো। একঘেয়ে জীবনে এখন কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। অনেক দেশ ঘুরলো তারা—তারপর একদিন

ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছলো তাদের নিজেদের গ্রামে। কমলদের ভেঙে পড়া আখড়াতেই তারা আবার নতুন ক'রে ঘর তুললো।

এখানেও তাদের কীর্তনের আসর দেখতে দেখতে বেশ জ'মে উঠ্‌লো। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কেমন যেন একটা ভাঙনের স্রোত আবর্তিত হোয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো! রঞ্জনকে আজো ভোলেনি কমল—ঘটনা এমন দাঁড়ালো যে একদিন রসিক তার সেই বিবাহের মালা রেখে বিয়ে নিরুদ্দেশ হোল। কমলের জীবনে আবার এলো নূতনতরো পরিবর্তন। শ্যামসুন্দরের পূজায় এবারে সে নিজেকে নিঃশেষে নিয়োজিত করলো। দুটী বছর পার হোল এইভাবে। তারপরে একদিন জয়দেবের শ্যামটাদের দরবারে এসে দেখা হোল রঞ্জনের সংগে—দীর্ঘকাল পরে পরস্পরকে তারা কাছে পেলো। রঞ্জন পরম আদরে তাকে নিয়ে এলো নিজের বাড়ীতে। কিন্তু পত্নী নাম্নী একটী মেয়েকে সে ইতিমধ্যেই বিবাহ ক'রেছিলো—কমলদেরই গ্রামের মেয়ে এখন সে কন্যা হতশ্রী—মৃত্যু পথ যাত্রীনি।

কমলকে দেখে সে রীতিমত ঈর্ষান্বিতা হোয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্রে টল্‌লোনা রঞ্জন—পত্নীর মৃত্যুর পর তার স্থান মহারাণীর গাম্ভীর্য্য নিয়ে এসে অধিকার করলো কমল—মিলনের পূর্ণ আনন্দে দুটী হৃদয়ের ধারা এসে এক হোল।

কিন্তু সে স্রোতেও একদিন এলো মন্থরতা। রঞ্জন এখন নূতনতরো ফুলের আনন্দকে আস্বাদন করতে শিখেছে। যেমন ক'রে পত্নী তার জীবন থেকে নিঃশেষে স'রে গেলো, ঠিক সেইভাবেই কমলকে পিছনে ফেলে রেখে আরেকটী তরুণী এসে দাঁড়ালো রঞ্জনের বিস্তৃত রাজপথে। শেষ হোল কমলের পুষ্পবাসর। এর জন্যে কমলের কাছে ক্ষমা চাইলো রঞ্জন।

যেমন ত্বিমিত পায়ে বিনা সমারোহে সে এসেছিলো, ঠিক সেইভাবেই নিঃশব্দ পাদসঞ্চারে কমল স'রে গেলো রঞ্জনের জীবন থেকে। যাবার সময়ে সে কারুর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই করেনি।

এখন সে বৈষ্ণবী। গৃহস্থের ঘরে ঘরে গান গেয়ে খুসী মনে ভিক্ষা নিয়ে যায়। হাটে বাজারে বৈষ্ণবী গান গায়। রসিক শ্রোতার দল নানা প্রশ্ন করে। বৈষ্ণবী মিষ্টি হেসে অবগুণ্ঠনটী শুধু টানে একটু। শ্রোতারা হেসে বলে, বোষ্টুমীর গান যেমন মিষ্টি, হাসিও তেম্‌নি।

বৈষ্ণবী হেসে উত্তর দেয়: বৈষ্ণবীর ওই তো সম্বল প্রভু!

শুধু পথের ধারে, ছায়াঘন পুষ্করিণীর তীরে রান্নার আয়োজন কর্‌তে কর্‌তে মনে পড়ে প্রৌঢ় রসিকদাসের কথা। রাইকমল দুটী হাত কপালে স্পর্শ ক'রে বার বার বলে, তোমার সাধনা সফল হোক—তোমার সাধনা সফল হোক!

এইখানেই কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

প্রথমেই আমরা প্রশংসা করবো লেখকের কাহিনী নির্বাচনের জন্যে। এক কথায় অপূর্ব। এমন একটী নিটোল মাটীর কাহিনীকে তিনি তুলে নিলেন যা বাংলার নরনারীর মনে গভীর দোলা দিয়ে যায়, যা আমাদের দৈনন্দিন গ্রাম্য-জীবনের পটভূমিতে নিত্যবহমান, যা একটী ছন্দিত ঝঙ্কৃত কবিতার মতো!

ঘটনার নায়িকা কমলিনী মুখরা। সেই ছোটবেলা থেকে তাকে দেখ্‌লাম তার হাসে—তার খেলায় তার চলায় চটুল ভংগীতে, শারিরীণি বিদ্যুল্লতার মতো ফুটে উঠেছে কমলিনী। রসিক সে—বগবাবাজীকে নিয়ে রসিকতার তার অন্ত নেই, তবু তার সেই বাইরের বিদ্রূপে ঢাকা আচরণের তলায় দেখ্‌লাম অপূর্ব একটী নারী হৃদয়, স্নেহে শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় টলোমল। মা কাঁদিনী রাগ করে, তবু খেয়াল নেই কমলার সে তার নিজের প্রাণ বিচ্ছুরণের জ্যোতিতে এগিয়ে চ'লেছে—কমলের শৈশব অপূর্ব শোভায় সম্পদে মণ্ডিত।

তারপরে এলো কৈশোর—পেলো সে রঞ্জনকে, এবং পরিপূর্ণ ভাবেই পেলো, তার একটা রূপ এখান থেকেই পাওয়া যায়:—

"সেদিন রঞ্জন গাছে চড়িয়া ফুল ঝরাইতেছিল। তলায় গতিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেগুলি কুড়াইয়া তুলিতেছিল কমলিনী। একটা ফুলে কামড় মারিয়া কমলিনী বলিল, আহা কি মিষ্টি রে!

গাছের উপর হইতে টপ্ করিয়া রঞ্জন ঝাঁপ দিয়া মাটীতে পড়িয়া বলিল, দে, দে তাই—আমাকে আধখানা দে!

আধখাওয়া কুলটা কমলি তাড়াতাড়ি রঞ্জনের মুখে পুরিয়া দিল। কুলটায় পোকা ধরিয়াছিল। বিস্বাদে রঞ্জন টাকরায় টোকা মারিয়া বলিল বাবা : !

কমলি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, কেমন রে ?

রঞ্জন তখনও টোকা মারিতেছিল, সে বলিল, খুব মিষ্টি—তোর এঁটো যে !

হাততালি দিয়া কমলি হাসিতে হাসিতে বলিল, বোল হরিবোল, তোমার মুখে কি চিনি আছে নাকি ?

রঞ্জন বলিল, হুঁ তুইই আমার চিনি।

কমলি হাসিয়া এলাইয়া পড়িল। তারপর বলিল, তোর এঁটো আমার কেমন লাগে জানিস ?

—কেমন ?

—ঝাল—ঠিক লঙ্কার মতো ! তুই আমার লঙ্কা !"

(রাইকমল, ৯ পৃষ্ঠা)

সেই থেকে কমল হোল রঞ্জনের চিনি। আর রঞ্জন হোল কমলের লংকা। অপূর্ব এই নামকরণ। যে স্নিগ্ধ একটী রসলোকের ঝঙ্কারধারা এই ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক সৃষ্টি করলেন তা কবিতার মতোই উপভোগ্য।

কিন্তু তাদের এই শান্ত সুন্দর মিলন লীলায় এলো বিচ্ছেদ। কমলকে নিয়ে কামিনী দেশত্যাগিনী হোল।

তারপর কমলকে দেখ্‌লাম নবদ্বীপে। সেখানে তার মা টাদের হাট বসালো। এলো সুবল, এলো বলাই, কিন্তু কিছুতেই কিছু নয়, রঞ্জন যে গভীর দাগ তার মনে ফেলে গেছে তা তেম্‌নি গভীর হোয়েই রইলো। যারা হেসে এসেছিলো তার কাছে, তাদের শেষ পর্য্যন্ত হেসেই চলে যেতে হোল।

এ পর্যন্ত কমলকে আমরা খুব স্বাভাবিক ভাবে পেলাম। তার মনের গভীরে বিধাতা কান্নার যে অদৃশ্য জাল বুন্‌ছিলেন তার প্রকাশ এখানে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে দেখানো হোয়েছে। এটাও আমরা ধ'রে নিতে পারি তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রৌঢ় রসিকদাসকে শেষ পর্যন্ত সে স্বামীত্বে বরণ ক'রে নিলো।

যুক্তির দিক থেকে বলা যেতে পারে, রসিকদাসের থেকে তার মায়ের মৃত্যুর পরে আর কেউ এমন শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলো না। আর তাছাড়া দীর্ঘকাল একত্র বাসের ফলে যে স্নেহ—যে প্রীতি বা যে শ্রদ্ধাবোধ জন্মানো উচিত তা ঘটবার পরিপূর্ণ অবকাশই ছিলো এখানে।

সুতরাং সকলের দিক থেকে রসিকদাসকে স্বস্তিত ক'রে দিয়ে তাকে বিবাহ করার মূলীভূত কারণটা বলিষ্ঠ !

তারপরে কমলাকে দেখ্‌লাম তার নিজস্ব সংসার যাত্রার মধ্যে। সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগ্‌লো যে, তাদের দ্বৈত-জীবনে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি নামুক। কিন্তু তা হোল না। আজন্ম বৈরাগীর জীবনে ভাঙন এসেছে, তাকে দুর্বার স্রোতে তখন ভাসিয়ে নিয়ে চ'লেছে—সেই বেগে তার ভজন-পূজন সব পণ্ড হোল।

সমস্ত কাহিনীটীকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কমলের নিষ্ঠা, কমলের ঐকান্তিকতা, চমৎকার। গ্রামে ফিরে এসে যখন সে দেখ্‌লে, রঞ্জন তখনো তার মনে সেই ভাবে জড়ছে তখন সে সেই পাপ মনকে রসিকদাসের কাছে অস্বীকার করতে শুধু পায় নি। বরং ইচ্ছে ক'রেই রসিকদাসের সংগে তার বিচ্ছেদকে সে নিজেই আহ্বান ক'রে নিলো।

পরবর্তী জীবনে রঞ্জনকে সে পেলেও বটে, কয়েকটা সুখের দিনও এলো তার জীবনে—কিন্তু তা ক্ষণিকের—যে অল্প দুঃখের মধ্যে তার প্রথম জীবনের ধারা প্রবাহিত হোয়েছিলো তার মধ্যেই সে আবার আবর্তিত হোল। জীবনকে সে অত্যন্ত সহজে গ্রহণ করতে পেরেছিলো, তাই রঞ্জন যখন আরেকটী নবাগতাকে নিয়ে এসে কমলের কাছে ক্ষমা চাইলো, তখন অত্যন্ত সহজেই সে তাকে ছেড়ে আস্‌তে পেরেছিলো। দুঃখকে অবনত মস্তকে এই যে স্বীকার করবার ভংগী এ তার নিজস্ব ! তার চরিত্রে এই ছিলো একমাত্র বৈশিষ্ট।

দীর্ঘ দুবছর সে পটের পূজার মধ্যেও নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলো—কিন্তু পারেনি, সব সময়েই তার মনে জেগেছিলো রঞ্জন—তার লংকা !

এক কথায় কমল নিখুঁত। বিন্দুমাত্র কোনো ত্রুটি নেই কমলের গতিভংগীতে। প্রাণ দিয়ে সে ভালোবাস্‌তে

জানতো, প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেই সে নিজেকে নিঃস্ব ক'রে গেলো। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে ঠিক সেই একই কারণে কমল অবিস্মরণীয় হোয়ে রইলো।

এর পরে আসে নায়ক রসিকদাসের কথা। অত্যন্ত সুন্দর চরিত্র। প্রৌঢ় সে, কিন্তু তার চলাফেরা, তার কথাবার্তা অত্যন্ত স্বাভাবিক আর শোভন হোয়েছে। বাড়িতে বিনুনি পাকানোর দৃশ্যটা জীবন্ত।

রসিকদাসের বুভুক্ষু বৈরাগী মনের নারীসংগ কামনার যে অপূর্ব চিত্র লেখক আমাদের পরিবেশন ক'রেছেন তা এক কথায় চমৎকার। তার ঈর্ষা—তার সৌন্দর্যলোলুপতা, তার আবেগ অনন্য ভাষায় আমরা এই কাহিনীতে রূপায়িত দেখ্‌লাম :

"ঘরের কোণে কমল আজ চৃতদীপ জ্বালিয়াছিল। প্রদীপটা জ্বলিতেছিল বেশ উজ্জ্বলভাবে। রসিক কমলের মুখখানি পরিপূর্ণ আলোকধারার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। কমল হাসিল।

রসিকের দেখিয়া যেন আর তৃপ্তি হয় না,—আশা মেটে না।

কমল বলিল, ছাড়ো।

সে কেমন ভয়পাইয়া গেল। জীর্ণ বাউলের বার্ধক্যমলিন চোখের কী তীব্র অনলজ্বলে একাগ্র দৃষ্টি!

সে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রসিক সহসা উন্মত্তের মতো প্রবল আকর্ষণে কমলের পুষ্পিত দেহখানিকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। কমল ছাড়াইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না। ওই জীর্ণ বাহুতে যেন মত্তহস্তীর শক্তি। কংকাল যেন ফাঁসীর দড়ির মতো দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

কমলের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে আর্তস্বরে প্রার্থনা করিল—মহান্ত—মহান্ত!

উন্মত্ত বাউল যেন আজ বধির হইয়া গেছে!

—(রাইকমল, ৪৮ পৃষ্ঠা)

কাহিনীর শেষ অংশে এই রসিকদাসই ত্যাগের মহিমায় আরো উজ্জ্বল হোয়ে উঠেছে—এইখানেই লেখকের অপূর্ব কৃতিত্ব—উপন্যাস শেষ ক'রেও তাই কমলের সংগে আমাদেরও মনে রসিকদাসের জন্যে একটা বেদনাবোধ জাগে। আমরাও প্রস্তার সংগে কমলের মতো স্মরণ করতে পারি বৈরাগী রসিকদাসকে।

কিন্তু রসিকদাসের এই বৈশিষ্ট্যটুকুই সব নয়, তার সমস্ত চরিত্রের মধ্যে যে জিনিষটি ফুটে উঠেছে তা ঠিক স্বামীর ভালোবাসায় নয়—বুভুক্ষু পিতৃহৃদয়ের অনন্ত স্নেহ নির্ঝরের একটী অপূর্ব ফল্গুধারা। স্বামীত্বের আবরণে তা অভূতপূর্ব রূপ নিয়েছিলো এবং তা' হোয়েছিলো ব'লেই সে এতো সহজে ছেড়ে যেতে পারলো কমলিনীকে, কারণ সে অন্তর দিয়ে তার কল্যাণকেই প্রার্থনা ক'রেছিলো, স্বামীত্বের অধিকার নিয়ে দেহের আকর্ষণকে তাই তার জীবনে কোনো দিনই প্রবল হোয়ে উঠ্‌তে দেখা গেলো না—অত্যন্ত সহজে তাই সে তার বিবাহের মালাটী রেখে নিঃশব্দ পাদসঞ্চারে চলে যেতে পারলো।

কিন্তু আপত্তি আছে আমাদের এই কাহিনীর উপনায়ক রঞ্জনকে নিয়ে। যার জন্যে রাইকমল সমস্তটা জীবন এমনভাবে উৎসর্গ ক'রে দিলে যার জন্যে সে জীবনের তীব্রতম দুঃখকে বরণ ক'রে নিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নি, সেই রঞ্জনকে বার বার বড়ো ভংগুর, বড়ো দুর্বল চরিত্র বলে মনে হোয়েছে। সমস্ত কাহিনী—রচনার মধ্যে তার কোনো বলিষ্ঠ প্রকাশ নেই। বিরুদ্ধ পক্ষ থেকে যুক্তি উঠ্‌তে পারে, প্রেম অন্ধ, সুতরাং রঞ্জনকে বলশালী, বুদ্ধিনিপুণ বা প্রতিভাবান করবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই, তার উত্তরে আমাদের বলবার কথা এই যে কমলের মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের প্রেমকে আকর্ষণ যে করে, তার মধ্যেও প্রতিভা না থাকুক অন্ততঃ কিছুটা বুদ্ধির দীপ্তি আমরা আশা করি—তা না হ'লে যেন সামঞ্জস্য থাকে না, শিল্পের গভীরতম নিপুণ কারুকলার বিরাট পটভূমিকায় কোথায় যেন ছন্দপতন ঘটে—তাই রঞ্জন আমাদের নিরাশ করেছে। এ ঘটনা নিঃসন্দেহে দুঃখের।

পার্শ্ব চরিত্রের মধ্যে নন্দিনী কাদু, মাতা কামিনী, ভোলা, পরী সব বেশ স্পষ্ট। এর মধ্যে পরী এবং কাদুর চরিত্র একটু বেশী উজ্জ্বল।

নায়ক রসিকদাস আদর ক'রে কমলকে ডাকতো 'রাইকমল'। লেখক সেই নামেই তাঁর নায়িকাকে অমর

ক'রে এঁকেছেন। উপন্যাসের উপসংহারে যে করুণা যে দরদ দেখলাম তা অতুলনীয়। কমলকে লেখক প্রকৃত অনুভূতি থেকে রূপ দিয়েছেন। একথা বলবো, রাইকমল তাঁর অম্লান সৃষ্টি, তার মুখের গান, তার স্নেহ, তার করুণা—আর সকলের উপরে তার ছিন্নভিন্ন জীবনের গাথা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হোয়ে রইলো। এই সংগে এই কথাও বলবো, আমাদের তারাশঙ্করের এই সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি যে সেদিনকার রচনার মধ্যে ছিলো তাকেও স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়!

আনন্দের সংগে জানাচ্ছি—লেখকের প্রথম জীবনের রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে তুলনায় 'রাইকমলের ভাষা' আশাজনক। আর তাঁর নায়কনায়িকা এবং অন্যান্য চরিত্রের কণ্ঠে যে সব মহাজন পদাবলী নির্বাচন ক'রে আমাদের শুনিয়েছেন তা অনবদ্য।

এবার আঙ্গিকের কথা। গল্প বলবার ভংগীটী এককথায় চমৎকার, বেশ ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে তিনি কাহিনীটী আমাদের শুনিয়ে গেছেন, তবে ত্রুটী ঘটেছে এর শেষ অংশে। যে ভাবে লেখক কাহিনী শেষ করেছেন তাতে আমাদের বারে বারে মনে হ'চ্ছে এটি একটি নিটোল চমৎকার ছোট গল্পের পরিসমাপ্তি। তাছাড়া আগাগোড়া সমস্ত আখ্যান-ভাগটাই একটি ছোট গল্পের উপযোগী—এক রকম জোর ক'রেই একে উপন্যাসের রাজটীকা পরিয়ে সর্বসাধারণ্যে নামিয়ে দেওয়া হোয়েছে।

তা হোক্ তবু বলবো, রাইকমল শেষ ক'রে আমাদের মনে যে বেদনা, যে অনুভূতি, যে কারুণ্যের শ্রোত উদ্বেলিত হোয়ে ওঠে, তাথেকেই প্রমাণ হ'য়ে, এ কাহিনী কতো রসোত্তীর্ণ, কতো সার্থক হোতে পেরেছে।

রসিকদাসের মতো দাড়িতে বিনুনি পাকানো বাউল আর কমলিনীর মতো সুগায়িকা মুখরা যুবতী কতোই তো দেখেছি—ট্রেণে যাবার সময়ে দুপাশের গাছ গাছালি আর ধান ক্ষেত দেখে আনন্দিত হ'বার পরে ষ্টেশনে নেমে তাদের কথা যেমন নিঃসন্দেহে ভুলে যাই—আমাদের জীবনযাত্রার তীরে তীরে এই রসিকদাস কমলিনীদেরও ঠিক সেইভাবে ভুলেছিলাম—শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর তাঁর প্রাণের রঙে, তাঁর হৃদয়ের তুলিতে যখন এই ছবি এঁকে আমাদের সামনে ধরলেন তখন চমক লাগলো, বললাম—বাঃ, সত্যিই তো! এরকম তো হতেই পারে!

বলা বাহুল্য, আমাদের মুগ্ধ মনের এই স্বীকৃতি থেকেই লেখক তাঁর সৃষ্টির সব থেকে দামী পুরস্কার পেলেন। এর থেকে তাঁর পক্ষে গৌরবের আর কি-ই বা থাকতে পারে?

প্রবন্ধের শেষে, সুতরাং আরো একবার ঘোষণা করছি, রাইকমল বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন নিয়ে অবিচলিত ব'সে রইলো—একটী ছন্দোবদ্ধ কবিতা-উপভোগের মতো একটী সুর-তাল-ঝংকৃত সঙ্গীতের মতো তা আমাদের কানে নিত্যকাল অনুরণিত হ'বে।

P30494

শিশু ও পারিবারিক শান্তি

লীলা প্রেমনাথ

সেদিন রাত তিনটের সময়ে ছমাসের কুণ্ডু হঠাৎ কেসে উঠলো। কাসি আর থামতে চায় না সঙ্গে সঙ্গে কান্নাও। মিনিট দ'শেক পর বিরক্তির ডাক পড়লো "ও কাঁদছে কেন?" উত্তরে কুণ্ডু আবার কেসে উঠলো। অগত্যা কুণ্ডুকে কোল থেকে নামিয়ে উঠে পড়লুম throat paint এর সন্ধানে। বলা বাহুল্য যে কুণ্ডুর কাসির ব্যবস্থা কোরতে প্রায় দশ মিনিট লাগলো। ইতিমধ্যে পারিবারিক শান্তির আকাশে মেঘটার সূত্রপাত হয়েছে। বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে তিনি উঠে বসে আছেন··· ভাব, যদি জিজ্ঞেস করি "বসে আছো কেন" তাহলেই গর্জ্জন আরম্ভ কোরবেন। সে সুযোগ আর হয়ে উঠলো না। শান্তিভঙ্গপর্ব্বে সমান অধিকার দাবী কোরতে গিয়ে ঝড়ীকে কুরুক্ষেত্র গড়ে তোলার আক্ষালনির লাঞ্ছনায় রণে ভঙ্গ দিয়ে unconditional surrender sign করা ওবধি জগতের অন্যান্য ভীরুদের মত আমিও চালাক হয়ে গেছি। অগত্যা খানিকক্ষণ চুপ কোরে বোসে থেকে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

কুণ্ডুর কাসি সারা দুরে থাক সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও হোল। সকাল বেলা ওকে কোলে কোরে বসে আছি হঠাৎ কোথা থেকে quinine-এর খালি বাক্সটা কুড়িয়ে নিয়ে এলেন—"এর ভেতর যে quinine ছিল সে গেল কোথায়, বাক্সটা খালি বাহিরে পড়ে ছিল।" পারিবারিক যুদ্ধ একবার আরম্ভ হোলে interval বড় অল্প পাওয়া যায় তাই খানিকক্ষণের মধ্যে সুট বুট পরে এলেন—"আমার দিয়াশালাইয়ের বাক্সটা টেবিলের ওপর থেকে কোথায় গেল।" এবার আর হাসি চাপতে পারলুম না। আমায় হাসতে দেখে নিজেও হেসে ফেললেন।

হাসি কিন্তু আমার থামলো না। দুপুর বেলা কাজ থেকে ফিরে এলেন যখন সকালের কথা মনে পড়ে আবার হাসি পেল। রাগের সময়ে অন্যকে হাসতে দেখলে নাকি আরও রাগ ধরে যায়, বললেন "তোমার আজ হয়েছে কি? আমায় দেখে হাসছো কেন?" গাম্ভীর্য্য ধারণ কোরে বোললুম "তুমি বড় অকৃতজ্ঞ।" ভাবাচোকা খেয়ে গেলেন। বোললেন "কেন, আমি কি কোরেছি।" আরো গম্ভীর হয়ে বোললুম "মেয়েগুলি তোমায় এত সাহায্য করে—তোমার war effortএ তবু কোনদিন এদের একটু মিষ্টি মুখও করাও না।"

শিশুরা উৎপাত করে। শিক্ষিত মানুষমাত্রই জানে স্কুল কোরে না শিখলে খেপা খাঁটি হয় না। আমরা ভুলে যাই নিজেদের বাল্যকাল, যখন আমরা কত দুষ্টুমি কোরেছি, কত মিথ্যেকথা বোলেছি self-defenceএর ব্যর্থ প্রচেষ্টায়। শিশুর অভিজ্ঞতা, কম বোলে তার কল্পনা-শক্তি এত প্রবল, তার curiosity এত বেশী। এই পুরাতন জগৎটা শিশুর কাছে নূতন। নূতন বোলেই তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তার জানতে ইচ্ছে করে নাড়াচাড়া কোরে, মুখে দিয়ে, ভেঙ্গে, খুলে জগতের প্রত্যেকটি জিনিস দেখতে, উপলব্ধি কোরতে। শিশুর এই জ্ঞানের খনাতল্লাসে বড়দের গুছিয়ে রাখা সাজসরঞ্জাম হয়ে যায় একাকার, ভেঙ্গে যায়, হারিয়ে যায় কত দামী জিনিস, হারিয়ে যায় কত দরকারি সামগ্রী। আমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্রয়োজন শিশুর মনের কাছে কেবল জ্ঞানের কেত্র রূপে। কোনটা বড় গোছান সংসার না জাতির ভবিষ্যতের উৎস। শিশুর জ্ঞানের গতিতে বাধা দিয়ে আমরা জাতির বিকাশে বাধা দিই না কি?

দশ বছর পূর্ব্বে একবার debateএ জোর গলায় বোলেছিলুম "for a child it is better to have no home rather than to have a broken home?" আজ বোলতে হচ্ছে "a child should have a home and a solid home, a home without chaos." কুঁড়ি গাছেই ফুটে ওঠে ফুল হোয়ে।

ভারতের প্রত্যেকটি গৃহ ভবিষ্যৎ ভারতের জন্মস্থান। আমরা যেন আমাদের দায়ীত্ব ভুলে না যাই। ছেলেকে পঙ্গু করে না রাখি তার বাল্যকাল অপূর্ণ রেখে। অপূর্ণ বালক কালে অপূর্ণ মানব হয়ে দাঁড়ায়। অপূর্ণ মানবের মেরুদণ্ড থাকে না। মেরুদণ্ডহীন মানব দাঁড়াবে কিসের জোরে। আমাদের হারানো চিহ্ন, আমাদের অসমাপ্ত কাজ হাতে তুলে দিতে হবে ভবিষ্যতের হাতে। আজকের শিশুই হচ্ছে এই ভবিষ্যৎ। পূর্ণ হয়ে উঠুক এদের বিকাশ।

ঐতিহাসিক

শ্রীমহেন্দ্র নাথ

আদিম আরণ্যযুগ : উচ্ছৃংখল শ্বাপদ হিংসা
দূরান্বিত সামতল কুমারীর ব্যাকুল স্বপনে ;
মূর্ছিত বনের মাঝে মৃত্তিকার দুরন্ত প্রত্যাশা,
উন্মুখ চাঞ্চল্য যতো ধরিত্রীর মধুভরা স্তনে।
সন্তান সন্ততি নেই—কে করিবে সে অমৃত পান
বন্ধ্যা জননীর সেই আরো শুনি ব্যাকুল আহ্বান।

দুরন্ত শ্রমন কোথা ! নিরলস তপস্বী কোথায় !
কোথায় সে বনশ্রীর কুমারীর বরেণ্য কুমার !
পাষাণ চেতনা তার কে ভাঙিবে মর্মের কারায়
ধূসর মৃত্তিকা মাঝে কে সৃজিবে স্বর্গের মন্দার !
আদিম মানব এলো : শ্রমদক্ষ বলিষ্ঠ মানব
নিঃসংগ ধরার বুকে জীবনের শুধু কলরব।

তখনো ছিলোনা কল : ঝকঝকে লক্ষ লক্ষ চাকা
ছিলোনা। শব্দের ভীড়—শব্দ খর বণিক নগরী ;
ওঠেনি আকাশ চিরে' যন্ত্রাগার 'ডায়নামো' ঢাকা
ফ্যাক্টরীর বাঁশী সুরে পোহাওনা বিনিদ্র শর্বরী।
নব্যতন্ত্রী সভ্যতার রসহীন প্রাণের শিকড়
তখনো মাটির বুকে আলগোছে বাঁধে নাই ঘর।

সেদিন আসিলো যারা—পাষাণেরো ভাঙিল যে ঘুম
পাথরে কুঠার হ'লো তীর বর্শা কোদালে শাবল
অরণ্য কাটিল সবে কোপঝাড় নিস্তব্ধ নিঝুম
শিকারীর সকরণে উৎপীড়িত হ'ল বনতল।
অরণি স্ফুলিংগ হ'তে আহরিল তারা বহ্নিশিখা
সেদিনো তাদের ভালে পরালোনা কেহ জয়টিকা।

রহিলো অপরিচিত তারা, যারা লৌহের সন্ধানী
সৃষ্টির চক্রম পথে যাহাদের দীপ্ত অভিযান ;
তখনো মানুষ তারা—নহে নহে সমাজের গ্লানি
আর্যের চক্রান্ত জালে হ'লো তারা অনার্য সন্তান।
আত্মঘাতী ষড়যন্ত্র ! তাই সাক্ষ্য দেয় ইতিহাস
শেয়ালী আর্যের লাগি তাদের কি হয়নি বিনাশ !

মানিল দাসত্ব কেহ ; কেহ গেল পর্বতগহনে
অস্বীকার করিলোই অনাহূত প্রভুত্বের দান ;
স্বাধীন সত্তার মোহে জড়ালোনা শৃংখল চরণে
কেহ দিলো বক্ষ রক্ত—মুক্ত কণ্ঠে মুক্তিরই গান।
দাসত্ব মানিল যারা—তারা র'লো আজো অপাংক্তেয়
নাহি পেলো অধিকার মিলিলোনা নগণ্য পাথেয়।

নগর বসালো তারা তবু সেথা হ'লোনা যে ঠাঁই
যন্ত্রের চক্রান্ত তলে নিষ্পেষিত তাদের জীবন ;
বন্যীর গরল পিয়ে বাঁচিবার কল্পনা বৃথাই
দাসত্বের ধ্বজাধারী নেই কোন স্বতন্ত্র মনন।
তারা শুধু রক্ত দেবে নীল রক্ত বিন্দু বিন্দু করি'
তাদের কংকাল 'পরে ওঠে কার স্বপ্ন সৌধ গড়ি' !

বিঘূর্ণিত কালচক্র ; শতাব্দীর মন্থর চংক্রম
দ্বীপ ভাঙে দ্বীপ গড়ে—সে কথাই বলে ইতিহাস ;
অপসৃত হ'বে জানি আজিকার ক্ষণিক বিভ্রম
প্রবাল-পুঞ্জের 'পরে গড়িবেই নব 'সাইপ্রাস্'।
লহরতলীর প্রান্তে জীবন প্রবাহ নিরলস
কুমারীর গর্ভকোষে মুক্তি মাগে অনার্য তাপস।

নন্‌সেন্স

শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী

স্বপ্ন দেখছি—

হাতের ফাউন্টেন্‌পেনটা এত জোরেই ছুঁড়ে মারলাম যে ধপে বিলেতের "unbreakble" মার্কা বস্তুটি নিমেষেই ভেঙে গেল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই চেঁচিয়ে ওঠলাম —নন্‌সেন্স্, কারখানার কাজে অবহেলা করেছ, বলেছ মিথ্যা কথা, তুমি প্রতারক। সম্পূর্ণ সত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত করতে চাই আমাদের আজীবন সাধনার ফল, বহুধাকিত এ "বল্লতক ওয়ার্কশপ্"। মিথ্যা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা আমি সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঘৃণা করি। তাতে ঘুণ ধরবে এর ভিত্তিতে, হয়তো একদিন তাদের অট্টালিকার মতই ধ্বসে পড়বে ধীরে ধীরে। তুমি যাও, আর কাজে এসো না। নন্‌সেন্স্!

বৃদ্ধ ষ্টোরকিপার গোপালবাবু সবিনয়ে সুপারিশ করে বল্লেন—গরীবের ভাত মারবেন না, দয়া করে—

দয়া করার মধ্যে কৃতীত্ব নেই, গোপালবাবু। দয়াতে কোন মানুষই ভাল হতে পারে না, বড় হতে পারে না। আপনি তো জানেন, ওর কত ভুল আমি অগ্রাহ্য করেছি। কিন্তু এ আমার সামনে বলছে মিথ্যাকথা, কাজে দিচ্ছে ফাঁকি! সে হবেনা মশাই, জীবনের চেয়ে আমার নীতি বড়, প্রিন্সিপ্‌ল্। একটা নয়, দুটা নয়, শত সহস্র জীবনের অকথ্য লাঞ্ছনার অবসানে আমরা গড়ে তুলেছি এই ওয়ার্কশপ্ অশেষ তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে। ভুলের ক্ষমা আছে, কিন্তু যা অন্যায়, যা পাপ তার প্রশ্রয় দেবেন না।

কিছুক্ষণ পরে ফোরম্যান দেবেনবাবু তার টেকো মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে এসে বল্লেন—শত হলেও বিজয় ছেলেমানুষ, হাত জোড় করে ভিক্ষা চাইছে—

—মানুষ ছেলেমানুষ কি বুড়োমানুষ তা তার বয়েস দিয়ে, গোঁফ্‌দাড়ি মেপে নির্দ্ধারণ করা আমার নীতি নয় দেবেনবাবু। আপনিই না একদিন বলেছিলেন যে আপনার ছোট শ্রীমানের চেয়ে বড় ছেলেটি এখনো অনেক ছেলেমানুষ রয়ে গেছে? ঠিক এমনি হয়। কারণ ওটা অনেকখানি নির্ভর করে তার সদ্‌বুদ্ধি, কর্মক্ষমতা আর দায়িত্ববোধের উপর। আপনারা আর অনুরোধ করবেন না। আমি জানি, একান্ত অসহায় হয়ে যখন মানুষ হাত পেতে কিছু ভিক্ষা চায়, সেখানে তার কতো বড় অপমৃত্যু ঘটে! তবু আমার নীতি, আমার আদর্শ ই বড়ো, যা আমি লাভ করেছি এদেরি মাঝ থেকে।

টেনোটাইপিষ্ট কিশোরী এক গাদা চিঠিপত্র টেবিলে রেখে চলে গেলি। টিফিনের ঘণ্টাও বেজে ওঠলো।

খাবার পরে হেড্‌ক্লার্ক মুখুজ্যে মশাই আবার সেই সুর ধরলেন। যেন কত অন্যায় করেছি। নন্‌সেন্স। বলেন— একটা অন্যায় করেছে বইতো নয়। আপনিই তো বলেছিলেন লবারই এখানে একটা নিজস্ব দাবী আছে। একবার ভেবে দেখুন।

—একটা অন্যায় মোটেই উপেক্ষনীয় নয়হে মুখুজ্যে, কারখানা কোন ছার, একটা সাম্রাজ্য ভেঙে পড়তে পারে একটা অন্যায়ের ঘায়ে, তা জানো? আর এও মনে রাখা উচিত যে দাবীর চেয়ে কর্ত্তব্য আগে। তার কথা ছেড়েই দাও, তোমার এ শরীরটা, যা তোমার একান্ত নিজস্ব, তার উপরেও যথাকর্ত্তব্যপালনের অবহেলা করলে, একদিন দেখবে সেও তোমার সব দাবী মেটাতে নারাজ হয়ে বসবে। কোন সুপারিশ শুনবে না। এখন যাও, আমি পরিশ্রান্ত।

কিছুক্ষণ বাদে মিল সুপারভাইজার মিঃ সান্যাল এসে অভিযোগের সুরে বলেন—দু'নম্বর রোলিং মিলটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। 3461 এর থার্ড্ ব্যাচ্‌টা ঠিকমত গ্রাইণ্ডিং হচ্ছেনা।

—তা ওর ফার্ষ্ট্ ব্যাচ্ দেখেও আমি মোটেই সন্তুষ্ট হইনি। চীফ্ কেমিষ্টকে বলুন আর একবার ট্রাই করতে। অয়েল 400এর পার্সেন্টেজ্ just to the demand হয়নি। আর ইঞ্জিনিয়ার শরৎবাবুকে একবার মেসিনটা দেখতে বলুন, কোথাও ভূতপ্রেত লুকিয়ে আছে কিনা। মিঃ সান্যাল, যন্ত্রবাদের শুধু টেক্‌নিক্‌টাই ভালো, যন্ত্রটা নয়।

একজনের পর একজন এসে হাজির হয়, একটুও হাফ ছাড়তে দেয় না। কাজের মধ্যে গৌরব, শ্রমে আনন্দ অনুভব

করি। মুখে বলি—নন্‌সেন্স্, মনে মনে বলি—কাজ যেন আর না ফুরায়।

হাপাতে হাপাতে মতিবাবু এসে বলে—লোকেরা গরম হয়ে গেছে। বিজয়কে রাখতে বলছে, নয়তো—

নয়তো কী?—

ষ্ট্রাইক হতে পারে।

—I feel for them! মতিবাবু, ওদের বলে দিন যে শ্রমিকে আর মালিকে যে সংগ্রাম হয় সেখানে হয়তো ষ্ট্রাইকটাই ব্রহ্মাস্ত্র; কিন্তু অনেক কারণেই মালিকের চেয়ে ওতে বেশী মরে শ্রমিকরাই, এবং মরবেও।

—ওরা বলছে—

—কি বলছে—

—বলছে মানুষের ভাল করাই যদি আমাদের নীতি হয়, তা হলে—

—তা হলে তাদের খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিন যে মানুষের ভাল করতে আমরা চাইনা, আমরা চাই মানুষকে ভাল করতে। দুটোর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আর বিজয়কে বলে দিন আমি তাকে টাকা দিয়ে ব্যবসা করে দেবো। নিজের উপর দায়িত্ব না পড়লে ও গাধাটা শিখবে না। কিন্তু এখানে আমি দৃঢ়, আমার প্রিন্সিপ্‌ল্।

মাত্র দু'বছর আগে এখানে বসেই Angus সাহেব আমাকে চোখ রাঙিয়ে বলেছিলেন—ননসেন্স্! আর আজ—

মশার কামড়ে ঘুম ভেঙে যায়। স্বপ্ন যায় মিলিয়ে। ভূমিশয্যায় ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি। দীর্ঘশ্বাস—হতাশা! আর যাই করো ভগবান, এমন সোনার স্বপ্নটাকে যেন নন্‌সেন্স্ করে দিও না।

অভিবাদন

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চৈত্ররজনী অবসান, হ'লো
রাত্রি শেষ।
এখনো কি চোখে
তন্দ্রাবেশ?
ক্লান্ত পথিক, চোখ মুছে ফেলো,
রেখোনা নয়নে ঘুমের লেশ।
হেরো দিগন্তে উষার আভাস,
রাত্রি শেষ।

তিমির-তোরণ চুমিয়া ওই
আসে তপন,
জাগে ধরিত্রী,
ভাঙে স্বপন।
রশ্মি-তুরগ চরণে চরণে
হানে স্ফুলিঙ্গ, কাঁপে গগন
সুর-নরলোকে উদ্‌ভাসি' এই
আসে তপন।

ওঠো ওঠো জাগো, ধরো গান, চলো
যাত্রীদল।
হেরো প্রদীপ্ত
গগনতল।
বিঘ্ন বিপদ্ পায়ে দলি' যাও
বক্ষে রাখিয়া পণ অটল।
বর্ষ প্রভাত! উড়াও নিশান
যাত্রীদল।

বর্ষ প্রভাত! করো পতাকায়
অভিবাদন।
মুক্তিমন্ত্র
করো সাধন।
চলো দলে দল দৃঢ় অবিচল
প্রতিজ্ঞা—ব্রত-উদ্‌যাপন।
এসো বীরদল, করো পতাকায়
অভিবাদন।

ছোটদের পাঠাগার

শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি)

আজ আমাকেই নাকি বলতে হবে 'ছোটদের পাঠাগার' বা 'ছুটোনাইল লাইব্রেরী' সম্বন্ধে দু'চার কথা। সম্মেলন কর্তৃপক্ষের এই আমন্ত্রণ ও অনুরোধেই আমাকে আপনাদের কাছে উপস্থিত হতে হয়েছে। আপনাদের কাছে আমি যা বলবো—তা হচ্ছে আমার ছোটবন্ধুদের পাঠাগারের অভাব-অভিযোগের-অভিজ্ঞতালব্ধ কয়েকটা ব্যবস্থা ও অব্যবস্থার কথা—এবং সেগুলির সংস্কার ও সংশোধনে আপনাদের সহযোগিতা কিভাবে কোন পথে নিয়ন্ত্রিত হলে—এদেশের শিশু-পাঠাগারগুলি সত্যিকার জাতিগঠনের কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে।

এখানে যে সমস্ত প্রান্তের গ্রন্থাগারিকরা উপস্থিত আছেন—তাঁদের শিক্ষা বা উপদেশ দিতে এই সব কথা বলবো একথা কেউ যেন মনে না করেন। কারণ আমি জানি আপনারা প্রত্যেকেই আমার চেয়ে গ্রন্থাগার বিষয়ে অভিজ্ঞ, পারদর্শী এমন কি কেউ কেউ যথারীতি 'গ্রন্থাগার পরিচালনা'র শিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্রের অধিকারী। আমার এসব কিছুই নেই—তবে ছোটবেলা থেকে পাঠাগারই আমার কাছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠস্থান বলে বিবেচিত হয়েছে—ছেলেবেলায় প্রতিদিন সকালে স্কুলের পড়া শেষ করেই দৌড়তাম—শুঁড়োর সুবার্বান রিডিং ক্লাবের পাঠাগারে—বিকেলবেলা স্কুল থেকে এসে খেয়ে দেয়েই একটু গেলাধুলা করে এসে আবার পড়তে যেতাম পাঠাগারে। পড়ার জন্যে, জানার জন্যে, সেই ছোট বয়স থেকেই ছিল অন্তরে অদম্য আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু লাইব্রেরীর আলমারীর দিকে তাকিয়ে দেখতাম—খালি মোটা মোটা ইংরেজী বাঙলা বই—ছোটদের পড়ার মত তেমন সব ভালো বই রাখা হোতনা তখন। যা দু'একখানা থাকতো তাও পড়ে ফেলতুম। লাইব্রেরীয়ান বা গ্রন্থাগারিক যিনি ছিলেন তিনি ছিলেন স্নেহশীল সহৃদয়, তাই তিনি আমার বই পড়ার ক্ষুধার কথা বুঝতে পেরে, মাঝে মাঝে বড়দের বইয়ের ভেতর থেকে বেছে বেছে দিতেন দু' একখানা বই। বড়দের বইয়ের ভেতর থেকেই নেমে আসতে লাগলো—এই সব ভালো ভালো ইংরেজী বই—কি কি জানেন? Treasure Island, Pilgrim's Progress, Gulliver's Travels, Uncle Tom's Cabin. রবীন্দ্রনাথের বই, শরৎচন্দ্রের বই—তাও সুরু হলো পড়া সেই বয়সেই, পড়ার নেশা ক্রমশঃই বাড়তে লাগলো—যেখানটা বুঝতে পারতাম না সেই লাইব্রেরীয়ান দাদাটির কাছে জেনে নিতাম—তিনি কত সেই বুঝিয়ে দিতেন সব কথা। আজ আপনাদের এই পাঠাগার সম্মেলনে দাঁড়িয়ে সেই গ্রন্থাগারিক দাদাটির কথাই মনে হচ্ছে। সেই যে গ্রন্থাগারিক তিনি নিশ্চয়ই Librarianship পাশ করা গ্রন্থাগারিক নন—কারণ তখনও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বোধ হয় এসব ব্যবস্থা হয়নি। পাশকরা না হলেও তাঁর যাদুবিদ্যায় একেবারে অবাক হয়ে গেছলাম। আপনারা ভাবছেন লাইব্রেরীয়ানের আবার যাদুবিদ্যা কি? তিনি তাঁর দরদভরা মন নিয়ে আমার মনের পাঠানুরাগের প্রতিটি বিষয়কে বুঝে নিয়ে একের পর একটি বই যখন ঘুগিয়ে দিতে লাগলেন যে সব বই পড়তে পারতুম না—সেই সব বইয়ের গল্পগুলিও অনেক সময় মুখে মুখে বলে দিতেন—তখন মনে হলো ঐ অতবড় লাইব্রেরীর সব বইগুলিই নিশ্চয়ই আমাদের মত ছোটদেরই জন্যেই। ক্রমমন্থরে যেন সব ধারণা বদলে গেল—তখন মনে হলো এ যেন আমারই জন্যে সব বই। আগে যে সব বই দেখে মনে হোত—"ওরে বাবা অত মোটা মোটা বই লোকে কি করে পড়ে?" সেই সব বই শেষ হতে লাগলো টপাটপ্! তাই তাঁকে যাদুকর আখ্যা দিয়েছি। আজ সেই সব কথা বিচার করে যখন দেখি তখন মনে হয় এই কথাই—'শিশু-পাঠাগার'কে রূপ দিতে পারে না—সার্থক করে তুলতে পারে না শুধু কয়েক আলমারী রঙ চঙে ছোট বড় মোটা সরু বই। যে কোনও পাঠাগারের পেছনে যদি থাকে একটি শিশু-দরদী মানুষ, শিশু মনকে বোঝার মত সকল জ্ঞান ও আগ্রহ নিয়ে যিনি বড়দের বই থেকেই মুখে মুখে ঘুগিয়ে দিতে পারবেন শিশু মনের খোরাক—তাঁর পরিচালনাতেই কেবলমাত্র সার্থক 'শিশু-পাঠাগার' গড়ে উঠতে পারে শিশু-সাহিত্যের বই

বাদ দিয়েই। কারণ, শিশু-পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক বা লাইব্রেরীয়ানই হলেন প্রাণকেন্দ্র—শিশু-পাঠাগারের গ্রন্থাগারিকের এই দরদভরা মনটি সব আগে থাকা দরকার, যা সমস্ত শিশুকে পাঠাগারে টেনে আনতে পারবে ভালবাসার টানে। শুধু তাই নয়, শিশু-পাঠাগারের গ্রন্থাগারিকের মধ্যে থাকা চাই চরিত্রবল—নিষ্ঠা, ও অধ্যয়নের সহজাত প্রবৃত্তি। শিশু-পাঠকদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে তাঁকে প্রয়োজনানুযায়ী খেলা করতে হবে, গল্প করতে হবে—একই টেবিলে ব'সে ছোটদেরই বই পড়তে হবে। তানাহলে চারপাশের সচেতন শিশুমন তাকে সন্দেহের চক্ষে দেখবে, অবিশ্বাস করবে তাঁর আন্তরিকতায়, এবং ক্রমশঃ ঘৃণা করে দূরে সরে যাবেই, শিশু-পাঠাগারের বইগুলিই শুধু থাকবে—শেষ অবধি শিশুরা সেখানে ভীড় করবে না। এ অভিজ্ঞতা আশা করি এখানে উপস্থিত বহু গ্রন্থাগারিক বন্ধুরই আছে। কিন্তু তাঁরা হয়তো অনেকেই বুঝতে পারেন না কেন এমন ঘটে? শিশু-পাঠাগারে বইয়ের সংখ্যা বাড়ানো সত্ত্বেও কেন পাঠকের সংখ্যা কমে যায়।

এই সব বুঝতে হলে সেই শিশু-দরদী মানুষটি—যিনি ছোটদের পাঠাগারের দায়ীত্ব নেবেন—তাঁকে জানতে হবে (১) শিশু-সাহিত্যের স্বরূপ কি? (২) কেন ছোটরা বই পড়ে? (৩) ছোটদের কোন বয়সে কি কি এবং কতখানি পড়া উচিত? (৪) ছোটদের পড়বার আগ্রহের যে ক্রমবিকাশ—কি ভাবে হয়? (৫) একটি শিশুর পড়ার রুচির সঙ্গে অপরের রুচির পার্থক্যের কারণ কি? (৬) শিশুদের মনের উপলব্ধি ক্ষমতা তারতম্য কি? (৭) ছোটদের পড়ার আগ্রহের মধ্যে ছেলে ও মেয়েদের কি এবং কতটুকু তফাৎ—এইসমস্ত বিষয়গুলি নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকে সংগ্রহ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে শিশু-মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের লেখা বইও কিছু কিছু পড়তে হবে। শুধু তাই নয় তাঁদের সম্পূর্ণভাবে সেই পরিমাণ সাহিত্য-বিচার-শক্তির পরিচয় দিতে হবে। যাতে এটুকু প্রমাণিত হয় যে তাঁরা বুঝতে পারেন কোনটা শিশু পাঠাগারের পক্ষে অবাঞ্ছিত বই—ও কি ধরণের শিশু সাহিত্য বাঞ্ছিত। এই বিচার শক্তির অভাবেই এদেশের শিশু পাঠাগারগুলি এপর্য্যন্ত অবাঞ্ছিত শিশু-সাহিত্যেই পূর্ণ হয়েছে এবং সেই বইগুলিই পাঠানুরাগের সুযোগ নিয়ে—শিশু মনকে রোমাঞ্চ অনুরাগী ও দুর্বল-ভাবপ্রবণ করে তুলছে যার ফলে জাতির সুস্থ প্রাণের বিকাশ ঘটছে না ঠিক তেমন করে—যেমন করে পাশ্চাত্য দেশের ছেলেমেয়েরা জাগছে। এদেশের শতকরা পঁচানব্বইটি ছেলেমেয়ে ভাববিলাসী কল্পনাকেই শুধু মনে করছে একমাত্র বাঁচবার অবলম্বন—তার ফলে অতি বাস্তব কর্মময় জীবনে আর তাদের তেমন কোনও চেষ্টা বা উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। চিন্তাশক্তির চর্চ্চা কমে যাচ্ছে এত দ্রুত, যে তার কোনও হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না, কাজেই শিশু পাঠাগারের গ্রন্থাগারিকের নিজের চিন্তা-বৃত্তিকে—চারপাশের শিশুর সামনে আদর্শ হিসাবে সর্বপ্রথম উপস্থিত করতেই হবে।

এদেশের শিশু সাহিত্যকে আবিলতা ও আবর্জ্জনা মুক্ত করে তুলতে হলে—সব আগে চাই শিশু-গ্রন্থাগারিকদের সঙ্ঘবদ্ধ সমালোচক গোষ্ঠিস্বরূপ কষ্টি-পাথর, তবেই এদেশের শিশুসাহিত্যে খাঁটি সোনা আমদানী করা সম্ভব হবে। আর তা না হয়ে যদি বছরের শেষে মাত্র কয়েকশত বই কেনা ও খাতায় বইয়ের নাম ও গ্রাহকের নাম লেখাই—শিশুগ্রন্থাগার ও তার গ্রন্থাগারিকদের একমাত্র কাজ বলে পরিগণিত হয়—তাহলে শিশু-পাঠাগারগুলি শিশু-পাপাগারে পরিণত হয়ে এদেশে পাপের প্রসার ঘটিয়ে—জাতির ভাগ্যে আরও সংস্র অভিশাপকে ডেকে আনবে। শিশু-পাঠাগারের প্রয়োজন আছে সত্য কিন্তু চিন্তাহীন পুস্তক-সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত শিশু-পাঠাগার গড়ে উঠেছে তার ফলে ক্ষতিই হচ্ছে।

সাধারণ পাঠাগার ও শিশু-পাঠাগারের মধ্যে পার্থক্যটা অনেক—এবং শিশু-পাঠাগারের গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব সাধারণ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বের চেয়ে ঢের ঢের বেশী—এই কথাই আমি বলবো। সাধারণের মধ্যে সাধু আছেন, সন্ন্যাসী, মাতাল, লম্পট, চোর সবাই আছেন এবং সবাই তাঁরা নিজের নিজের মনের মত বই চাইতেও পারেন সাধারণ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে, সে দাবী মেটাতেও হয় গ্রন্থাগারিককে। কিন্তু শিশু-পাঠাগারের পাঠক ও গ্রাহকরা যা চাইবে তার সবইতো তাদের হাতে দেওয়া চলতে পারে না। কাজেই কত সূক্ষ্ম বিচারশক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়ে শিশু-পাঠাগার পরিচালনায়—তা বলে বোঝানো খুবই শক্ত।

তবুও চেষ্টা করবো—কিছু কিছু বলার। তবে এই যে বিচারপন্থা ও কৃষ্ণপন্থা তা যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত একথা কাউকে মেনে নিতে বলছি না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ছোটদের সঙ্গে মিলে মিশে ও বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল মনীষী-দের লেখা পড়ে যেটুকু বুঝতে পেরেছি—সেটুকুই বলবো আপনাদের কাছে।

শিশু-পাঠাগারের গ্রন্থাগারিকদের যে ৭টি বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞানার্জন করতে হবে তা একটু আগেই বলেছি; কিন্তু কেমন করে ঐ জ্ঞানলাভের পথ সহজ ও সুগম হতে পারে—তারও একটু ইঙ্গিত না দিলে গ্রন্থাগারিকদের এই পথের জ্ঞানস্পৃহা এই বক্তৃতা শোনার পরও যেখানে ছিল সেখানেই স্থাণু ও অচল অটল হয়ে থাকবে বলেই মনে করি।

প্রথমেই বলেছি—শিশু-সাহিত্যের স্বরূপ কি? তা শিশু-গ্রন্থাগারিককেই জানতে হবে। এদেশে শিশু-সাহিত্য লেখেন অনেকেই—তবে অবনীন্দ্রনাথ, দক্ষিণারঞ্জন প্রমুখ দু' চারজন ছাড়া 'শিশু-সাহিত্য' যে কি? তা যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে বুঝিয়ে বলতে পারেন এমন লেখক খুব কমই আছেন অথচ গায়ের জোরে অনেকেই নিজের নিজের রচনামাত্রকেই এই একটি অজুহাতে 'শিশু-সাহিত্য' বলে চালাতে চান যে তিনি বইটি লেখবার সময় শিশুদের উদ্দেশ্যেই লিখেছেন। শিশুদের উদ্দেশ্য করে যদি কোনও মহাপণ্ডিত ব্যক্তি শিশুদের ঠাকুর্দাদের উপযুক্ত বই লিখে তার ওপরে একটা 'শিশু' ছাপ মেরে দেন—তাহলেই কি তাকে শিশু-সাহিত্য বলে মেনে নিতে হবে? এমন কয়েকটি বিখ্যাত 'শিশু' মার্কা বই এদেশে আছে—যা এদেশের গ্রন্থাগারিকরা 'শিশু' মার্কা দেখেই কিনেছেন—কিন্তু সে বইগুলি শিশুরা কোনওদিনই কেউ পড়ে না যে এটা তাঁরা কেউ দেখেন না; ফলে ঐ ধরণের 'শিশু মার্কা' দেওয়া শিশু-সাহিত্য লেখকদেরও এই বাস্তব সত্যটি জানিয়ে সতর্ক করে দেওয়ার মত কোনও ব্যবস্থাই এ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি এদেশে, ফলে এদেশের শিশু সাহিত্যে—লেখকদের খেয়াল-খুশি মাফিক যা খুশি লিখে বই প্রকাশ করাটাই রীতি হয়ে পড়েছে। এদেশের শিশু-পাঠাগারের গ্রন্থাগারিকদের তাই শিশু-সাহিত্য কি বুঝতে হলে ছোট ছোট পাঠকদের কাছে জানতে হবে যে প্রতিটি বই পড়ে কোন পাঠকের কেমন লাগছে—কেন ভাল লাগছে না—তার একটা হিসাব নিকাশও মোটামুটি রাখতে হবে। এই ভাবে যদি প্রত্যেক শিশু পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক প্রতিটি বইয়ের সম্বন্ধে শিশু-পাঠকদের মনের কথা সংগ্রহ করেন এবং পরিশেষে সমস্ত শিশু-পাঠাগারের গ্রন্থাগারিকদের এক সভা বা সম্মেলনে মিলিত হয়ে—বিভিন্ন পাঠাগারের শিশু-পাঠকদের মতামতকে কেন্দ্র করে, প্রতি বছরের প্রকাশিত শিশু সাহিত্যের জনপ্রিয়তা ও সমালোচনা সম্বলিত পক্ষপাত শূন্য এক পুস্তক-তালিকা প্রকাশিত করেন—তাহলে সত্যকার শিশু সাহিত্য কি? তা তাঁরা প্রত্যেকেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে বুঝতে সক্ষম হবেন—শুধু তাই নয়—শিশুদের অভিভাবক শিক্ষক—এমন কি তথাকথিত শিশু-সাহিত্য লেখকরাও তখন আসল শিশু-সাহিত্যের স্বরূপ উপলব্ধি করবেন। এদেশের শিশুরা পাবে তখন তাদের ছোটবেলার আনন্দ ও শিক্ষার উপযুক্ত বই। কিন্তু এই গ্রন্থাগারিক সঙ্ঘ শেষ পর্যন্ত যাতে এদেশের ঐ Text Book Committeeর মত সৎ ও সাধু না হয়ে ওঠেন—সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। এ সম্বন্ধে আমি আমার পক্ষ থেকে ছেলে মেয়েদের মধ্যেও একটা আন্দোলন এনেছি এবং খুব শীঘ্রই আমি তাদের কাছ থেকে শিশু সাহিত্য ও বিভিন্ন শিশু-পাঠাগার সম্বন্ধে সত্য ও তথ্য সংগ্রহের জন্যে কতকগুলি বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নপত্র—পুস্তিকা এদেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা করবো। বাঙলা দেশের সমস্ত শিশু-পাঠাগারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আমি সহায়তা চাই, এবং এই ভাবে আমি আমার সাধ্যমত সমস্ত শিশু-পাঠাগারের গ্রন্থাগারিকদের সহযোগিতা করতে চাই। কারণ সর্বপ্রথমেই এদেশের শিশু-সাহিত্যকে আবর্জনা-মুক্ত করে নিতে হবেই—যদি এদেশে একাধিক শিশু-পাঠাগার গড়ে তুলতে হয়, যদি এদেশের 'শিশু-পাঠাগারকে অন্যান্য দেশের মতই শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করতে হয়। শিশু-সাহিত্যের স্বরূপ উপলব্ধিই তাই সব আগে গ্রন্থাগারিক, শিক্ষক, অভি-ভাবকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কেন তা প্রয়োজন? সেটি প্রসিদ্ধ ইংরেজ শিশু-সাহিত্য-বিশারদ Charles Welsh ভারী সুন্দর একটি কবিতার উল্লেখ ক'রে লিখেছেন—

"As soon as the child has acquired the

power of getting at the sense of the printed page, the taste for the good or the bad in literature may begin to grow, and it may do so even while he is acquiring this power. Then he enters on the perilous path so well described by Mrs. Browning in *"Aurora Leigh"*:

To thrust his own way, he is an alien through
The world of books! Ah you! you think
it fine
• • yet behold.
Behold!—the world of books is still the
world.
The worldings in it are less merciful.
And more puissant. For the wicked here,
Are winged like angels. Every knife
that strikes.
Is edged with fire to assail
A spiritual life.

এর পরেও আশা করি আর 'শিশু-সাহিত্যের স্বরূপ' উপলব্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে হবে না। শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে আমেরিকা, জার্মাণী, রুশিয়ায় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয় এবং বিশেষ করে এই দেশগুলিতে শিশু-সাহিত্যকে জাতিগঠনের অন্যতম উপাদান ও শিশু-পাঠাগারগুলিকে শিক্ষাকেন্দ্র বলে গণ্য করা হয়। ১৫ বছর আগে জার্মানীর ২৮টি ষ্টেটে প্রায় ৭৮টি Childrens Literature Committee সৃষ্টি হয়েছিল—এর প্রত্যেকটি কমিটি ছোটদের জন্য যে সমস্ত বই লেখা হোত তা পড়তেন—এবং ভাল বই হলে তা অনুমোদন করতেন—এবং যে সমস্ত বই অবাঞ্ছিত, ভুল বা শিশুদের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হোত—সেগুলির প্রকাশ বন্ধ করে দিতেন। এতে বিশেষ সুফল ফলেছিল—কিন্তু এই জার্মান প্রথার একটি মাত্র দোষ ছিল এই যে, এঁদের এই পুস্তক নির্ব্বাচন পদ্ধতিতে ছোটদের মতামতকে তেমনভাবে গ্রাহ্য করা হোত না। বই নির্ব্বাচন হোত মুখ্যতই বড়দের দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারবিবেচনাকে অবলম্বন করে। এই প্রথাকে তাই আমি ষোল আনা সমর্থন করি না। তবে তখনকার জার্মান শিশু-সাহিত্যে ভাবী জাতিকে পঙ্গু ও অপদার্থ করে তোলার জন্য যে ষড়যন্ত্র চলছিল—তাতে এ ব্যবস্থারই নিশ্চয় প্রয়োজন হয়েছিল। বর্ত্তমানে আমাদের দেশেও শিশু-সাহিত্যের ভিতর দিয়ে দাস-মনোভাব, পরানুকরণ, ও নিজ জাতীয়তাবোধকে ছোট করে দেখানোর যে ষড়যন্ত্র চলেছে—তাতে আপাততঃ আমাদেরও ভাবী জাতির জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত রাখার জন্য কিছু পরিমাণে ঐ রকম কঠোর হতেই হবে। শিশু-পাঠাগারগুলিতে এমন কোনও পুস্তককেই আমরা ঠাঁই দেব না—যা হাজার ভালো হলেও—আমাদের জাতীয় মর্য্যাদাকে ছোট করে এঁকে দেবে আমাদের ভাবী জাতির মনের পটে। আজকাল এক শ্রেণীর লেখক বাজারে দেখা দিয়েছেন যারা সামান্য টাকার লোভে—দেশের ও জাতির স্বার্থ ও সম্মান-বিরোধী কার্য্যকলাপের প্রচারকার্য্যের সহায়তায় ছোটদের মত করে গল্প, গান ও ছড়া লিখে—ছোট ও বড়দের সাহিত্যেও গোপনে বিষ পরিবেশন করার চেষ্টা করছেন। ফ্যাসি-বিরোধী শিশু-সাহিত্যও আজ এদেশে আমদানী হয়েছে—কিন্তু যাদের অত্যাচারে, নিপীড়নে কয়েক শত বছর ধরে আমরা অধমরা হয়েছি এবং এখন প্রায় পুরোপুরি মরতে চলেছি অন্নহীন বস্ত্রহীন হয়ে—সেই মহামানবদলবিরোধী সাহিত্য সৃষ্টির জন্য এই সব ফ্যাসীবিরোধী লেখকদের কলমে কিন্তু কালি জোটে না?

প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় আসতে বাধ্য হলাম এই জন্যেই যে শিশু-পাঠাগারের গ্রন্থাগারিকদের—এই সব হীন কু-প্রচেষ্টা সম্বন্ধেও সচেতন হতে হবে—কারণ ভাবী জাতিকে গড়ার ভার তাঁদেরই হাতে।

শিশু-সাহিত্যের স্বরূপটি জানা ছাড়াও আরও যে যে বিষয়ে জ্ঞান-অর্জ্জন করা শিশু-পাঠাগারের গ্রন্থাগারিকদের পক্ষে একান্ত দরকার বলে উল্লেখ করেছি—সেই বিষয়গুলি জানতে হলে—Maria Montessoriর লেখা *The secret of Childhood*; George Stanley Hallএর লেখা *Aspects of Child life & Education* এবং W. E. Blatzএর লেখা *Understanding the Child*এর মত কিছু কিছু বাছাইকরা শিশু-মনস্তত্ত্বের বই

পড়তে হবে। শিশু-মনস্তত্ত্বের বই হলেও এইগুলি সাধারণের জন্য অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল করে লেখা—এবং এই বইগুলি পড়লে চিন্তাশীল গ্রন্থাগারিক মাত্রেই শিশু-মনের এমন অনেক খবরই পেয়ে যাবেন—যাতে শিশু-পাঠাগারকে অনায়াসেই নূতন রূপ দেওয়া সম্ভব হবে।

শিশু-মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের সামান্য জ্ঞান প্রত্যেক শিশু-পাঠাগারের গ্রন্থাগারিকদের থাকা একান্ত প্রয়োজন—এ ছাড়া শিশু-পাঠাগারের গ্রন্থাগারিকদের প্রত্যেকেরই পড়া উচিত Froebel, Groos, Felix Klein; Stanley Hall; প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় লেখকের লেখা শিশুশিক্ষার পদ্ধতিগুলি।

পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন দেশে 'শিশু-সাহিত্য' সম্বন্ধে যে সমস্ত মনীষী সুচিন্তিত বই লিখেছেন—সেগুলির থেকেও কিছু কিছু জ্ঞান আহরণ করতে হবে—জার্মানীতে শিশু-সাহিত্যের গবেষণায় Walter Quast. জগতকে বহুমূল্যবান তথ্য দান করেছেন।

শিশু-সাহিত্যের সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত বই *Die Literarischen Neigungen in kindes—und Jugendalter.* ইংলণ্ডে 'শিশু-সাহিত্য' নিয়ে যিনি বিশেষ গবেষণা করেছেন—তাঁর নাম Charles Welsh তিনিও একাধিক বই লিখেছেন। আমেরিকার ষ্টানফোর্ড ইউনিভার্সিটির মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক Dr. Lewis M. Terman ও তাঁর সহকারিণী Magaret Limae শিশু-সাহিত্য ও শিশুমনের পর্য্যবেক্ষণ সম্বন্ধে একাধিক বই লিখেছেন। জাপানের শিশু-শিক্ষায় ও শিশু-সাহিত্যের উন্নতির জন্য যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তিনি হচ্ছেন Tsunekichi Mizuno তাঁর লেখা ও বিভিন্ন বই থেকে শিশু-সাহিত্য ও শিশু-পাঠাগার গঠনের অনেক উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন এদেশের শিশু-পাঠাগারের পরিচালক মণ্ডলী।

শিশু-পাঠাগারের গ্রন্থাগারিকদের এই সমস্ত "Theoritical Knowledge" বা 'পঠনাজ্জিত শিক্ষা' হলো শিশু-পাঠাগারের একটি দিক—অন্য দিকে শিশু-পাঠাগারের সাফল্য নির্ভর করছে—পাঠাগারের পরিকল্পনা, পরিবেশ ও পুস্তক-পরিবেশন পদ্ধতির উপরে। কাজেই সে সম্বন্ধে কিছু বলা বিশেষ প্রয়োজন।

এদেশে 'শিশু-পাঠাগার' বলতে বোঝায় ছোটদের বিভিন্ন ক্লাব বা এসোসিয়েশনের গড়া মাত্র কয়েকখানি বইয়ের সংগ্রহে সাজানো একটি বা দুইটি আলমারী। এগুলিকেই আমি 'শিশু-পাঠাগার' বলতে রাজি আছি; অল্প অর্থে, কারণ শিশুরা এ পাঠাগার গড়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু বড় বড় নামকরা পাঠাগারে গিয়ে স্বচক্ষে দেখেছি এদেশের তথাকথিত শিশু-পাঠাগারের যে ব্যবস্থা তাতে সেগুলির নাম 'শিশু-পাপাগার' দেওয়াই বেশী যুক্তিযুক্ত মনে করেছি। বড়দের আলমারীর পাশেই সেখানে এক বা একাধিক আলমারিতে ছোটদের বই নামগারী যা কিছু সাপ ব্যাং—নোংরা আবর্জনা সব এনে পুরে দেওয়া হয়েছে—বইগুলির কোন জাতি বিভাগ—বর্ণভেদ কিছুই করা হয় নি—ডিটেক্‌টিভ, ইতিহাস, উপন্যাস, রূপকথা, সাধারণ জ্ঞানের বই সব একসঙ্গে মিশিয়ে রয়েছে। খুব বড় একটি নামকরা লাইব্রেরীতে গিয়ে একবার 'লাইব্রেরীয়ানকে' বললাম, আপনাদের ছোটদের বিভাগে কি কি বই আছে—আমাকে দেখাবেন? তিনি কি জবাব দিলেন জানেন?—"Catalogue টা Complete নেই, তবে—যখন যা কিছু বাজারে ছোটদের বই বেরুচ্ছে—সবই আমরা কিনে ফেলি সঙ্গে সঙ্গে—কাজেই ছোটদের সব বইই আছে।" বললাম—তাহলে খুব ভাল বলতে হবে আপনাদের ছোটদের বিভাগকে! আচ্ছা আপনাদের এই ছোটদের বিভাগের লাইব্রেরিয়ান কে? ভদ্রলোক খুব গর্বিত হয়ে বললেন—"আজ্ঞে আমিই! কি করি বলুন সবই করতে হয় আমাকে।" আমি বললাম—"আমাকে দেখাবেন আপনাদের লাইব্রেরীর ছোটদের বিভাগটা—আমি ঐ বিষয়ে একটু Interested"—ভদ্রলোক এক গোছা চাবি নিয়ে তাঁর রেলিং দিয়ে ঘেরা কাউণ্টার থেকে নেমে আমাকে নিয়ে গেলেন পাশের একটা আলো-আবছা অন্ধকার ঘরে—আমরা ঘরে ঢুকতেই দেখি চারিধার থেকে গোটাকতক নেংটি ইঁদুর ছুটাছুটি করে পালিয়ে গেল। তারপর দেখি ঐ আলমারী ছোটদের মতরাজ্যের বাদ-বিচারহীন বই—একটি আলমারী খুলতেই উড়লো কয়েকটা আরশোলা। দেখলাম একটা ভাঙ্গা টেবিল ও কয়েকটা বেত-ছেঁড়া চেয়ার রয়েছে তারই চারপাশে—বললাম "আচ্ছা! ছোটদেরা এই বিভাগে ছোটরা এসে বসে পড়াশুনো করে?" লাইব্রেরীয়ান বললেন—

"সে কথা আর বলবেন না স্যার! আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো কি পড়তে চায়—খালি বায়স্কোপ আর সিনেমা।"

আমি মনে মনে ভাবলাম—এতো আরশোলা আর ইঁদুর দেখার পরও যে ছেলে এ ঘরে বসে পড়তে চাইবে তাকে তো Victoria Cross দেওয়া উচিত।

শিশু-পাঠাগারের এই ধরণের ভীতিবহ পরিবেশে কোনও শিশুই কোনও দিন আসতে চাইবে না যে, এটা না বুঝে পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক দোষারোপ করলেন—এদেশের ছেলেমেয়েদের প্রতি। সেই জন্য শিশু-পাঠাগার বা বড় বড় গ্রন্থাগারের শিশু-বিভাগ গঠন করতে হলে সব আগে সেটিকে এক আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করে সাজাতে হবে। ইঁদুর আরশোলার বদলে—সেখানে ছেড়ে রাখা যেতে পারে—বরং সুন্দর সুন্দর পাখী, লোমওয়ালা কুকুর, বেড়াল, পায়রা, খরগোস। শিশু-পাঠাগারের দেওয়ালে থাকবে রকমারী সুন্দর সুন্দর ছবি—ঘরের জানালায় টবে সাজানো ফুল গাছে থাকবে রঙবেরঙের ফুল। টেবিল চেয়ার সব ঝকঝকে তকতকে হওয়া চাই—এমন যদি সব শিশু-পাঠাগার গড়ে তোলা যায় এদেশে—তাহলে ছোটরা পাঠাগার ছেড়ে সহজে বাড়ীতে যেতে চাইবে না।

পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন দেশে এই ভাবেই শিশু-পাঠাগার গড়ে তোলা হচ্ছে। সেখানকার শিশু-পাঠাগারে শুধু যে পড়ার বই থাকে তা ভাববেন না। সেখানে থাকে রকমারী খেলনা, কাঠ-কাটরা, পেরেক হাতুড়ী যন্ত্র। এ ছাড়া খুব উন্নত ধরণের যে সব 'শিশু-পাঠাগার' জার্মানী, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে গড়ে আছে—সেখানে প্রত্যেক পাঠাগারের সংলগ্ন আছে একটি করে ছোট্ট সিনেমা হল—সেখানে ব'সে পাঠাগারের দশপচিশজন সদস্য—পাঠাগারের লাইব্রেরী থেকে ইচ্ছামত ফিল্ম নিয়ে দেখতে পারে।

আমেরিকার Metropolitian Museumএর নীচের তলায় সম্প্রতি যে শিশু-বিভাগ খোলা হয়েছে—বর্ত্তমানে সেটাই হচ্ছে আমেরিকার শিশুদের আনন্দ ও শিক্ষা দেবার সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র। এখানে দেশ বিদেশের শিশু-সাহিত্যের বই সংগ্রহ করে এনে বিরাট শিশু-পাঠাগার গড়ে তোলা হয়েছে, যে কোন ছোট ছেলেমেয়ে এখানে এসে এই পাঠাগার হাতড়ে যে কোনও বই বেছে নিয়ে—এখানে বসেই বা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পড়তে পারে—কোনও চাঁদা দিতে হয় না। এই শিশু-বিভাগে পাঠাগারের চারিপাশের ঘরগুলিতে ছোট্ট কারখানা, ছোট্ট ল্যাবরেটরী, ছোট্ট সিনেমা, ছোট্ট থিয়েটার সব কিছুরই সুন্দর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধরুন একটি ছেলের বই পড়তে পড়তে ছোটখাটো একটা বিজ্ঞানের পরিক্ষা হাতে কলমে করে দেখার ইচ্ছা হোল—সে তখনই ল্যাবরেটরী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত দাদা বা দিদিকে গিয়ে জানালে সে কথা—তখনই তাঁরা সেই সব ব্যবস্থা করে ঐ ছোট ছেলেটির জ্ঞান পিপাসাকে হাতে কলমে পরিতৃপ্ত করে দিলেন। কয়েকটি মেয়ের একটি ছোটদের নাটিকা পড়ে মতলব জাগলো—এটাকে এখনই অভিনয় করে দেখলে কেমন হয়? সঙ্গে সঙ্গে তারা পাঠাগারের পাশের ঘরে ছোট্ট রঙ্গমঞ্চে গিয়ে সেজেগুজে অভিনয় সুরু করে দিলে। Metropolitan Museum এই নব প্রবর্ত্তিত শিশু-বিভাগে সারা সহরের ছেলেমেয়েরা সময় পেলেই এসে জড়ো হয়। সেখানে তারা শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক ও শিশু-পরিচালক পরিচালিকাদের নির্দ্দেশে আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত হয়। শিশু পাঠাগারের গ্রন্থাগারিকদের সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বললেও অত্যুক্তি হয় না—তাঁরা কি না পারেন! ছবি আঁকতে, গান গাইতে, অভিনয় করতে গল্প বলতে সবাই তাঁরা সুদক্ষ। কাজেই তাঁরা বই দেখে গল্প ও ছড়া ইত্যাদি এমন সুন্দর করে পড়ে পড়ে শোনান যে ছোটরা তাই শোনার নেশাতেই রোজ রোজ ভীড় করে সেখানে। ছোটদের পাঠাগারে অনেক সময় ছোটদের নাটক নাটিকা থাকে—কিন্তু সেগুলি ছোটরা পড়ে চট্ করে বুঝতে পারে না বলেই—ওসব দেশে শিশু-পাঠাগারের গ্রন্থাগারিকদের নাটক পড়ে শোনানোর জানটা যাচাই করে নেওয়া হয়। এদেশের শিশু-পাঠাগারে গ্রন্থাগারিকরাও যদি গল্প শোনানো ও নাটকীয় আবৃত্তি ইত্যাদিতে সুদক্ষ হয়ে তা শিশু মনকে জয় করার জন্য প্রয়োগ করেন তবে তাঁরাও সাফল্যলাভ করবেনই একথা আমি বলতে পারি।

ছোটদের পাঠাগারের বড় বড় পরিকল্পনাকে এখনই হয়তো গড়ে তোলা সম্ভব হবে না এদেশে—চেষ্টা করলে সাধারণ

পাঠাগারে দরদী মানুষদের চেষ্টায় আমরা কি কলকাতা, গল্প ও নাটকপাঠের ব্যবস্থা করতে পারি না? আমি চিন্তা করে দেখেছি—কয়েকটি ছোট খাটো ব্যবস্থা ও উপায়কে অবলম্বন করে যদি এদেশের ছোটদের পাঠাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মী ও গ্রন্থাগারিকেরা এখনই কাজ সুরু করে দেন—তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এদেশে একাধিক আদর্শ শিশু-পাঠাগার গড়ে উঠবে, দেশের বিশেষ মঙ্গল সূচিত হবে। সেই রকম কয়েকটি ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়েই আমি আমার বক্তব্য শেষ করবো।

প্রতিবছর একবার করে 'শিশু-সাহিত্য সপ্তাহ' অনুষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করবেন—শিশু-পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক শিশু-সাহিত্যের লেখক ও প্রকাশকেরা এবং অভিভাবকরা একসঙ্গে মিলিত হবে। তাঁদের মিলিত উদ্যোগে প্রতি সহরে ও গ্রামে এই সপ্তাহটি প্রতিপালিত হবে। এই সপ্তাহটি কি ভাবে কি করতে হবে—তার কর্মপন্থা নির্দেশ করে রকমারী পুস্তিকা ও প্রচারপত্র সারা দেশের স্কুলে, ক্লাবে, ও শিশু-পাঠাগারগুলিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। একটি কর্মপন্থা হতে পারে—"শিশু-সাহিত্যের ভালো বইয়ের প্রতি ছেলেমেয়েদের রুচির সৃষ্টি করা" দ্বিতীয় কর্মপন্থা হতে পারে—বিভিন্ন বয়সের প্রতি বছরে ঐ সপ্তাহটিতে নূতন নূতন 'পাঠ-পরিষদ' বা Book-club গড়ে তোলা। তৃতীয় কর্মপন্থা:—প্রতি বছর ঐ সপ্তাহটিকে ছোট ও বড় পাঠকদের মতামতকে কেন্দ্র করে ঐ বছরের সৃষ্ট সেরা শিশু-সাহিত্যের বইগুলির নামের তালিকা প্রকাশ ক'রে সমস্ত পাঠাগার, স্কুল ও ক্লাব পরিষদে পাঠিয়ে দেওয়া। চতুর্থ কর্মপন্থা হতে পারে—শিশু-পাঠাগারের বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতা ঘোষণা করে রচনা আহ্বান করা। রচনা এই বিষয়গুলির উপর লিখতে বলা যেতে পারে যেমন ধরুন (১) "তোমার প্রিয় বই কি?" (২) "কোন্ বইয়ের কোন চরিত্রটি তোমাকে মুগ্ধ করেছে এবং কেন?" (৩) "বইয়ের যত্ন কিভাবে নেওয়া উচিত?" এ ছাড়া—শিশু-সাহিত্যের বইয়ের প্রচারপত্র আঁকার প্রতিযোগিতা হতে পারে—বইয়ের প্রচ্ছদপট, নতুন পরিকল্পনা দেওয়ার জন্যও পুরস্কার ঘোষণা করা যেতে পারে। ছোটদের এই সমস্ত ছবি, রচনা যাতে ঐ শিশু-সাহিত্য সপ্তাহে সমস্ত খবরের কাগজে ছাপা হয় সে ব্যবস্থাও করতে হবে। এই সপ্তাহের পঞ্চম কর্মপন্থা হবে—বিভিন্ন পাঠাগারে ছোটদের সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন এই সম্মেলনে ছোটরাই প্রবন্ধ পড়বে, বক্তৃতা দেবে। রকমারী বইয়ের চরিত্রের সাজের নকল করে সেজে গুজে আনন্দ পরিবেশন করতে পারে। অভিনব অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শিশু-সাহিত্যের বইগুলির সমালোচনা নিয়ে হাসি ও আনন্দের পরিবেশন করবে।

এই সমস্ত কর্মপন্থাকে অবলম্বন করে প্রতিটি শিশু-পাঠাগারে গ্রন্থাগারিক বিস্তারিত কার্যসূচী প্রস্তুত করে সমবেতভাবে কাজে নামতে হবেই এবার—তা না হলে নূতন জাতি গড়ে তোলার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কাজেই আমি আমার উপস্থিত সকল বন্ধুকেই বলছি যে তাঁরা যেমন ধৈর্য ধরে আমার এই দীর্ঘ ভাষণ শুনেছেন—তেমনই ধৈর্য্যের সঙ্গে এদেশে শিশু-পাঠাগার গড়ে তোলার নব নব পরিকল্পনা সৃষ্টি ক'রে দেশের ভাবী জাতীর সামনে নতুন আলোর দীপশিখা তুলে ধরুণ। এদেশের শিশু-পাঠাগারের সংস্কার চাই-ই।*

* (শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে কলিকাতার পাঠাগার সম্মেলনে 'মৌমাছির অভিভাষণ')

বিশ্বরাজনীতিতে কূটনীতি

জাপ-মার্কিন সমস্যার মূলকথা

দ্বিতীয় পর্ব

মগেন দত্ত

বিগত রুশ বিপ্লবের সময় এক বিশেষ ঘটনায় জাপানের বৈদেশিক নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জাপান কোরিয়াকে ভদ্রলোকের মত পকেটস্থ করে। পরে মাঞ্চুরিয়ার দিকে উঁকি ঝুঁকি দিতে থাকে। কাজেই রুশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি আর জাপানের লম্প্রসারণ নীতি এ দুয়ের সংঘর্ষ অনিবার্য্য ; বস্তুত ঘটেও ছিল তাই। যদি রুশ বিপ্লব না ঘটত তাহলে আজকে জাপ-মার্কিন সংঘর্ষের চেয়ে বহু পূর্ব্বেই রুশ-জাপান সংঘর্ষ নোতুন করে বাধত। গতবারে রুশ-জাপান যুদ্ধ কোরিয়াকেই কেন্দ্র করে যেমন ঘটে ছিল এবারেও হয়ত মাঞ্চুরিয়াকে কেন্দ্র করে আবার একটা ঠোকাঠুকি বাধত। এখানে চীনের বৈদেশিক নীতি জাপানের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কেননা, চীনের বৈদেশিক নীতিই জাপানের বৈদেশিক নীতির নিয়ামক। চীন যা কিছু বৈদেশিক নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে জাপানে তার একটা প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। জাপানকেও তাই বিশেষ করে কোন বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করবার পূর্ব্বে চীনের বিষয়ে সন্ধান হতে হয়েছে। অনেক সময় কূটনৈতিক জগতে এমনও ঘটে যে গোপন চুক্তির অনিচ্ছাকৃত প্রকাশ অন্যের ইঁসিয়ারীর পক্ষে বিশেষ কারণ হয়ে পড়ে। জাপান এমনই একটা গোপন চুক্তির তথ্য হাতে পেয়ে নিজেদের দামলে নিয়েছিল। চুক্তির ভাবাগত যা উদ্দেশ্য তাতে জাপানের প্রত্যক্ষভাবে সচকিত হবার বিশেষ কারণ ছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু কূটনীতির মজা হচ্ছে যা ভাষায় প্রকাশ থাকে আসলে তা ব্যাখ্যায় দাঁড়ায় না। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে রাজনৈতিক স্থান-কালের ওপর। যে সময় রুশ-চীন গোপন চুক্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই জটিল এক কথায় বলা যেতে পারে। কেননা তখন রাশিয়ায় নব্য বৈপ্লবিক শক্তির অভ্যুত্থান হতে চলেছে, গোটা সাম্রাজ্যবাদী জগৎ হতভম্ব হয়ে দেখ্‌ছে রাশিয়ায় কি ঘটছে, জাপানও অনেকটা পরিমাণে দেখে শুনে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত,—এমন সময় রুশ-চীন গোপন চুক্তির প্রকাশ—এটা জাপানের চোখে খুব প্রীতিপ্রদ মনে হয়নি।

এখানে আর একটা কথা উঠতে পারে যে এই রুশ-চীন গোপন চুক্তি রাশিয়ায় নব্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর যে মূল্য পাবে তার প্রমাণ কি? অবশ্য এর প্রমাণ আমাদের হাতের কাছে নেই। তবে সাধারণত বৈদেশিক নীতির আমূল পরিবর্তন হয় না। কেননা এক একটা বৈদেশিক নীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে —রক্ষাকবচ সৃষ্টি করা। এবং যাদের বিরুদ্ধে এই রক্ষাকবচ উদ্ভাবন তাদের বৈদেশিক নীতির কোন বিশেষ আকস্মিক পরিবর্তন না হলে অন্ত পক্ষে তার প্রতিক্রিয়া ঘটে না। কাজেই ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে তারিখের যে রুশ-চীন গোপন চুক্তি তার কোন মূলগত পরিবর্তন হবার কারণ নেই। এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল জাপানের বিরুদ্ধে রুশ ও চীনের উভয়েরই রক্ষাকবচ সৃষ্টি করে রাখা। জাপান সম্বন্ধে রাশিয়া এবং চীনের যে সন্দেহ ছিল তা পরবর্তী ঘটনায় অনেকটা সমর্থিত হয়েছে। উত্তর কালে দেখা গেছে জাপান মাঞ্চুরিয়া অধিকার করেছে ও তারও বহুপূর্ব্বে রাশিয়ার বিপ্লবের সুযোগে সাইবেরিয়া অধিকার করার চেষ্টা করেছে। কাজেই ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের রুশ-চীন গোপন চুক্তির মূল সন্দেহের উৎস কোথায় তা বোঝা যাচ্ছে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে রাশিয়া সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র হয়েও তার এ বৈদেশিক নীতির কোন পরিবর্তন হবার কারণ নেই। তাছাড়া চীনের তরফ থেকে ত এ প্রশ্ন মনে উঠতেই পারে না। এই গোপন চুক্তির ষোল আনা উদ্দেশ্যই জাপানকে ঠেকাবার ব্যবস্থা। নিম্নোক্ত চুক্তির ধারাগুলি দেখলেই বোঝা যাবে যে এই চুক্তিতে কার স্বার্থ কতটা রক্ষিত হয়েছে, এবং পূর্ব্ব এশিয়ার জাপানের প্রতি রাশিয়ার ও চীনের বৈদেশিক নীতির মূল পত্তন কি ভাবে হল। এ থেকে অবশ্য জাপানের চোখ খুলে গেল, সেও ব্রিটিশের দিকে ফিরে তাকাল।

In such case the two High Contracting Parties engage to support reciprocally each other with all the land and sea forces they may be able to dispose of at that moment, and to assist each other as much as possible for the victualling of their respective forces.

Article II. As soon as the two High Contracting Parties shall be engaged in a common action, no treaty of peace with the adversary may be concluded by either without the consent of the other.

Article III. During the military operations all Chinese ports shall be open, when necessary, to the warships of Russia, which shall find there any assistance of the Chinese authorities they may require.

Article IV. In order to facilitate for the Russian land forces access to the points under menace and to assure the means of existence, the Chinese Government consents to the construction of a railway across the Chinese provinces of Amur and Kirin in the direction of Vladivostok.

The junction of this railway with the railway of Russia shall not serve as a pretext for any encroachment on Chinese territory, nor for an attempt against the sovereign rights of His Majesty the Emperor of China. The construction and exploitation of this railway shall be accorded to the Russo-Chinese Bank and the clauses of the contract which shall be concluded to that effect, shall be duly discussed by the Minister of China at St. Petersburg and the Russo-Chinese Bank.

Article V. It is understood that in the case of war foreseen by Article I, Russia shall be free to use the railway mentioned in Article IV for the transportation and provisioning of her troops. In peace time Russia shall have the same right for the transportation and provisioning of her troops, with the right to stop over for no purpose other than those justified by the necessity of transportation.

Article VI. The present treaty shall come into force from the date on which the contract stipulated by Article IV shall be confirmed by His Majesty the Emperor of China. It shall have force for fifteen years. Six months before the expiration of that time the two High Contracting Parties shall consider the prolongation of this Treaty.

Made at Moscow on the 22nd of May, 1896."

LOBANOV
WITTE
LI-HUNG CHANG*

*Quoted in the *Foreign Policy in the Far East* —by Taraknath Das.

বিগত ওয়াশিংটন সম্মেলনের সময় এই গোপন চুক্তির দলিলগুলি প্রকাশ হয়। জাপান আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যই এই নজীর দেখায় যে তাকে যদি প্রশান্ত-মহাসাগরে বাঁচতে হয় তার সমরোপকরণ বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন। মার্কিনরা চীনে সব রাষ্ট্রের 'অবারিত দ্বার' নীতি গ্রহণ করে একটা বিশেষ বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। জন হে-র 'অবারিত দ্বার' নীতির এক উদ্দেশ্য বোধ হয় ছিল বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার পথ চীনে মুক্ত করা। তাঁর ভরসা ছিল যে, মার্কিন-উৎপাদন ক্ষমতা সাধারণ ক্ষেত্রে ব্রিটেনের চেয়ে অনেক বেশী। ব্রিটেন নিজেকে কখনই ব্রিটেন হিসাবে দেখে না, সব সময়ই সাম্রাজ্যটা জুড়ে নিয়ে একটা বিরাট আকার দিয়ে দেখে। কিন্তু এই বিরাট আয়তনকে একমাত্র ভৌগোলিক সংস্থান হিসাবে মার্কিন ও রাশিয়ার সঙ্গেই তুলনা করে চলে। উৎপাদন ব্যবস্থার বিচারও সেই হিসাবে তুলনামূলক। যাই হোক সেই উৎপাদন-ব্যবস্থার ওপর ভর করেই মার্কিনরা 'অবারিত দ্বার' নীতি গ্রহণ করেছে। আসলে মার্কিনের কাছে জাপান বাধা নয়, বাধা এক কথায় বলতে গেলে ব্রিটিশ। ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী মার্কিনদের ঠিক দুশ্চিন্তার কারণ না হলেও ভবিষ্যতে ভয়ের কারণ ছিল; যদিও ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীর বিধানগুলোর মধ্যে মার্কিনদের জন্য উভয় পক্ষ থেকেই একটা নীতি মেনে নেওয়া হয়েছিল। তাতে আপাততঃ মার্কিনদের দুশ্চিন্তা কেটেছিল বটে—তবে ভবিষ্যৎ আশঙ্কার কারণ ছিল। তাই মার্কিনরা ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীকে কোন দিনই সুনজরে দেখেনি। এদিকে জাপান ব্রিটিশের সঙ্গে মিত্রতার ফল নানাভাবে উপভোগ করেছে। তার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এশিয়ায় জাপানী মনরো নীতি। মার্কিনদের ফিলিপাইন অধিকারের পর থেকে জাপানের মনে নানা শঙ্কা জাগে। অবশ্য এই শঙ্কাগুলি অবস্থার চাপে পড়ে ধামাচাপাই ছিল, তার কোন উগ্র বিকাশ ঘটেনি। তাহলেও সেটা শঙ্কা বলেই ধরা নেওয়া ভাল। কূটনৈতিক জগতে সব শঙ্কাই সব সময় প্রকাশ হয় না তার কারণ বিভিন্ন স্বার্থের আশু অথবা ভবিষ্যৎ ক্ষতির সম্ভাবনা। কিন্তু এই শঙ্কাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন আইনের আকার ধারণ করে আত্ম-

প্রকাশ করে। যেমন ধরা যাক মার্কিনদের ক্যালিফোর্নিয়ায় জাপানী বসবাস নিষিদ্ধ করে যে আইনটি বিধিবদ্ধ হল সেটি। এর অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজতে গেলে একটা বিষয় চোখে পড়বে সে হচ্ছে সেই শঙ্কা। মার্কিনদের শঙ্কা ছিল যে জাপানীরা হয়ত ম্যাগডালেন উপসাগরে ঘাঁটি তৈরী করতে পারে। অতএব এর ত্রিসীমানায়—যাতে পা দিতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হল। তারপর আর দু'একটা শঙ্কার খবর এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিগত সাইবেরিয়া অভিযানে জাপান যখন মার্কিনদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিপ্লবী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যোগ দেয়, তখন একটা গুজব খুব চালু ছিল। সেটি হচ্ছে যে, জাপান ও জার্মানীর মধ্যে গোপন চুক্তি হয়েছে একে অন্যকে সাহায্য করবে। এই শঙ্কা মনে রেখে মার্কিনরা জাপানের সৈন্য সম্ভার প্রেরণ ও তার বিলি ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ সন্দিহান ছিল। অবশ্য মার্কিনদের পক্ষে এ সব সন্দেহের প্রকৃষ্ট কারণও ছিল। কেননা জাপ-মার্কিন যুক্ত সিদ্ধান্তের বলে যে পরিমাণ সৈন্য-বাহিনী সাইবেরিয়ায় পাঠাবার কথা ছিল, জাপান তার চেয়ে বেশী সৈন্য পাঠায় এবং নির্দিষ্ট সময়ের বহু পরেও অধিকার করে জাপান সাইবেরিয়াতে বসেছিল। এই সাইবেরিয়া অধিকারের শঙ্কা ও তথায় ঘাঁটি বাধবার চেষ্টা মার্কিনদের চোখে ভাল ঠেকেনি। কাজেই কূটনৈতিক সম্বন্ধ বিচারে মার্কিনরা বরাবরই জাপানকে একটু সন্দেহের চোখে দেখত। জাপান অবশ্য তার সাম্রাজ্যবাদী নীতির সমর্থনেই সাইবেরিয়ার দিকে হাত দিয়েছিল। দখলী সত্বের দিক থেকেও এটা মন্দ নয় কেননা কোন প্রকারে যদি সাইবেরিয়া আমলে আনা যায়তবে মাঞ্চুরিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা প্রায় সবটাই স্বপ্নরে আসবে। জাপানের শিল্প-সম্ভারের কাঁচা মাল যোগাবার জন্য বাইরে বেশী দৃষ্টি দিতে হবে না; জাপান অনেক দিন থেকেই মাঞ্চুরিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ঠিক সরাসরি দখল না হোক রাহুগ্রস্ত করে রাখবার চেষ্টায় ছিল। বিগত রুশ বিপ্লবের সময় জাপানের সাইবেরিয়া অভিযান সেইজন্যই সানন্দে গ্রহণ করা। তাই জাপ-মার্কিন যুক্ত সিদ্ধান্তে সম্মতি ১২,০০০ সৈন্য না পাঠিয়ে সে সেখানে পাঠায় তিন ডিভিসন সৈন্য। এত বেশী সৈন্য আমদানির অর্থ যে কি এটা বুঝতে কারুর অসুবিধা হয় না।

ওয়াশিংটন বৈঠকে যে সব দাবী জাপান উপস্থিত করে তার পিছনে বেশীর ভাগই ব্রিটিশের সমর্থন ছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় ইঙ্গ-জাপান গোপন চুক্তির ফলে জাপানের দাবীর মাত্রা বেড়ে যায়। শাংটুং প্রদেশ দখল ও তার ওপর চিরস্থায়ী ব্যবস্থা পত্তন করার ইচ্ছা জাপানের ছিল। এবং ব্রিটিশ জাপানকে তার এই ইচ্ছায় ইন্ধন যোগায়। কিন্তু মার্কিনদের বিরোধিতায় জাপানের ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয়নি। ওয়াশিংটন বৈঠকের একটী বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, এতে প্রশান্ত মহাসাগরে নৌ-শক্তির মোটামুটি সম্বন্ধ বিচার হয়। এ সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা পরে করা হবে। বর্ত্তমানে এইটুকু উল্লেখ থাকল যে ওয়াশিংটন বৈঠকে জাপানের অনেক আশা নির্মূল হয়।

নির্বাসিত বিহঙ্গ

অনুবাদক : শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী

আভাস : ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় যে মহাবিপ্লব ঘটে এর মূলে অদ্ভুত রহস্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মহামান্য জার নিকোলাস ও তাঁর ইঙ্গ-জার্মান রাণী আলেকজান্দ্রার সিংহাসন-ত্যাগের দাবী করল বলশেভিক দল—এর অন্তরালে কী নিগূঢ় কারণ ছিল? দুরাত্মা রাসপুটিন অপূর্ব সৌন্দর্য ও সুধা প্রতিভাবলে ঢাই গেল রাজ-অন্তঃপুরে, তারই মোহন ইঙ্গিতে অভিজাত পরিবারের অন্তঃপুরে ছড়িয়ে পড়ল ঘোরতর লালসা-কামনার পাপস্রোত, চলল ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ রাজপুরুষগণের নিধন-যজ্ঞ। এই কাহিনীতে সেই বিপ্লবমুখের ছবহ ছবি পাওয়া যাবে। পরাধীন ভারতের এই দুর্যোগমুহূর্তে সময়োপযোগী হবে এই উপন্যাসের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী—যবেপানুরাগীর পুরস্কার লাভ করে যারা বন্দীখানা বরণ করে, নির্বাসনে জীবন কাটায়, ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলে—তাদের সাহস, ধৈর্য, স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম ও মর্মান্তিক দুঃখবরণের ইতিহাসও ছবহ মিলবে। এখানে একটা কথা বলা ভাল যে লেখক John Oxenham নিজে সেই বিপ্লব-যুগে রাশিয়ায় উপস্থিত ছিলেন; মূল পুস্তকের নাম *Hearts in Exile*।

বৃদ্ধা অন্য ঘরে চলে গেল—বলে গেল, তুমি বসো, এখনি সে এসে পড়বে।

যুবক বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু খানিক পরেই উঠে দাঁড়িয়ে চঞ্চলভাবে ঘরময় পাইচারী করতে লাগল। কি করে স্থির হয়ে বসে থাকবে? যার ভাবী জীবনের সুখ-সাধনা এমন এক হাতে সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে ঝুলে আছে, যা ক্ষণিকের ভাবাবেগের দুর্বল সুযোগে নমিত হবার নয়—সেখানে কি কেউ স্থির থাকতে পারে?

লম্বা ও ঋজু—অনতিকৃশ দেহ, স্বচ্ছ কালো চোখ, অমায়িক মুখশ্রী, সকালিত কপোল,—বস্তুতঃ পল প্যাভলফের সুকান্ত চেহারা সহজেই মনকে আকর্ষণ করে।

কক্ষটি সুসজ্জিত—কিন্তু বাহুল্যবর্জিত। আসবাব-পত্তর যা কিছু আছে—নিমেষেই চোখে পড়ে। টেবিল, চেয়ার, শাদা আবরণে ঢাকা একটি স্টোভ, সবুজে রংএর ঘেরা দেওয়া টেবিল-বাতি—প্রত্যেকটি উপকরণ বিভিন্ন হলেও যেন অবিচ্ছিন্ন—এবং এক মহান্ প্রয়োজনে সমুজ্জ্বল। এই চেয়ার, যার উপর ইভানোভনা বসে, এই মেজে, যেখানে ইভানোভনার কোমল পায়ের পরশ লাগে—এই আলো, যার সামনে বসে সে লেখাপড়া করে, কর্মের প্রেরণা পায়, গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়,—প্রত্যেকটি উপকরণই যেন সেই মহান্ প্রয়োজনের অচ্ছেদ্য অংশ। তাছাড়া ইভানোভনা এখানে বসে কতবারই না তার কথা ভেবেছে—বিভোর হয়ে দেখেছে ভাবী জীবনের সুখ-স্বপ্ন।

প্যাভলফ অনুভব করল হর্ষ শিহরণ। এই কল্পনা তাকে বিভোর করে তুলল।

পল ঠিকই জানে—তার নিজের এই কল্পনা অমূলক নয়। হোপ তার কথা ভাবে বৈকি! এই ভাবনার মধ্যে রয়েছে অপূর্ব স্বপ্ন-সাধ। অথচ কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস—কোন রকম পুঁথি-পাট সে কক্ষে নেই—ছিলও না। এ যেন নিতান্তই খাপছাড়া গোছের—অশোভন। অন্যদিক দিয়ে অবশ্য এর কারণ ছিল। কে জানে কোন্ শুভ-মুহূর্তে সিঁড়ির গোড়ায় মহামান্য পুলিশ-প্রবরের শুভ পদধ্বনি ঘরটিকে সচকিত করে তুলবে। পুথিপাটের বালাই সে সময়ে ভয়ানক বিপজ্জনক।

দেয়ালে টাঙানো তিনটি অয়েলপেন্টিং। পল সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে তাকাল সেদিকে। তার মন সহসা আন্দোলিত হয়ে উঠল—যে কথা আজ বলবে বলে সে মনে করে এখানে এসেছে, হোপ তার কি জবাব দিবে—ঐ নির্বাক প্রকৃতির চোখে—চেহারায় যেন সুস্পষ্ট প্রকাশমান রয়েছে।

ডানদিকে যাঁর প্রতিচ্ছবি—শান্ত অথচ কর্মনিষ্ঠ চেহারা, ভাবনাপ্রবণ চোখের জ্যোতি, গালে দাড়িগোঁফ—ইনি ইভানোভনার পিতা, আদর্শের জন্যে তিনি কারা-প্রাচীরের অন্তরালে জীবন বিসর্জন দিয়ে শহীদ হয়েছেন। উচ্চতর সত্য; আদর্শ আর সুদৃঢ় সংকল্প তাঁর অন্তরের সবলতার পরিচয়। সেদিকে তাকাতেই প্যাভলফের চেহারা কেমন দৃঢ় হয়ে উঠল। হোপ ইভানোভনা পিতার প্রদর্শিত কর্মপথকেই তার জীবনের মহান আদর্শ বলে গ্রহণ করেছে।

পাশেই স্নিগ্ধ হাস্যময়ী এক মাতৃমূর্তি।—ইনি ইভানোভনার জননী। স্বামীর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তিনি পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে যান। রাজশক্তির উৎকট অবিচার—তাঁর মৃত্যুর একমাত্র কারণ। হোপ ইভানোভনার চেহারাও মায়ের মতোই স্নিগ্ধ সুন্দর অথবা তার চেয়েও যেন বেশি। কিন্তু প্রকৃতির দিক দিয়ে সে পিতৃধর্মী।

তৃতীয় প্রতিকৃতি সুকান্ত চেহারার এক বালক—ইভানোভনার ছোট ভাই। পলের সহিত ইভানোভনার জীবনের আশা-নিরাশার গ্রন্থি জড়িত হবার আগেই এই ভাইটিও পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পরলোকে চলে যায়।

পল বিমুগ্ধ—অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল এইসব প্রতিকৃতির দিকে।

এমনি ভাবে সময়ের পদক্ষেপ চলতে থাকে। হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে গেল। বৃদ্ধা পলের দিকে লক্ষসমর্থনসূচক ইঙ্গিত করে অপর এক অতিথিকে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

আগন্তুকের নাম সার্জ পালমা। লম্বা সুগঠিত শরীর, রহস্য-সমুজ্জ্বল চোখ, চোখের তারা নীল, মাথায় পাতলা চুল, পরণে জাঁকালো পোশাক—সর্বাঙ্গে আভিজাত্যের ছাপ। দেখলে মনে হয়—নিজের উপর, এমনকি, পৃথিবীর সবার উপরই যেন তার সখ্যভাব। সর্বোপরি সে প্রথম আগন্তুকের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী।

পল প্যাভলফকে দেখেই সার্জ মুখে হাসি টেনে এনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। আর এদিকে প্যাভলফের কপোল কুঞ্চিত হয়ে উঠল নিদারুণ বিরক্তিতে।

এভাবে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ায় উভয়ের মনের অসচ্ছন্দতা সত্ত্বেও সার্জ পালমা স্বাভাবিক রহস্য-ভঙ্গীতে বলল: আরে পল যে! এখানে! যার সঙ্গে দেখা করতে এলাম—সে তো তুমি নও?

—তাই তো, সে কথা আমিও বলি।

—নাহে, আসলে কিন্তু আমি সে কথা বলিনে।—সংক্ষিপ্ত হাসি টেনে পালমা আবার বলল যা হোক্ মনের দিক দিয়ে একথা সত্যি যে এ বাড়ীতে একই সময়ে এক সঙ্গে আমাদের দুজনের থাকা চলে না—তুমি কি বল?

পল নীরব। তীব্র বিরক্তিতে তার দেহমন রি-রি করতে লাগল। নিজের গায়ে নিজেই চিমটি কাটতে ইচ্ছে হতে লাগল। কিন্তু তার সংযম-শক্তি অসাধারণ। স্বরের মুখের কথায় সে সম্পূর্ণ উদাসীন। সার্জ পালমার সঙ্গে তার অটুট বন্ধুত্ব—তবু এই মুহূর্তে ঘৃণা জাগল মনে। শেষে শান্তভাবে জানাল—আমি মনে করি না—তোমার এখানে থাকার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে।

—বল কি হে! আমি যদি চলে যাই, পৃথিবী ফাঁক হয়ে যাবে না?

—না যাবে না···

—যাবে না? যাক্, যাদামুখাদে তো কোন লাভ নেই—অথচ দুজনের থাকাও চলে না—তবে কি করা যায়?

—সরে পড়ার অধিকার তো কেউ কেড়ে নেয় নি তোমার?

—একথা তুমি বলতে পার বটে, কেননা তুমি আগে এসেছ। কিন্তু এমন খোলসা পথ ছেড়ে দিয়ে সরে পড়া এত সোজা কি? একটা মীমাংসায় আসা যাক বরং। ভাগ্যের উপর বরাত কেনা যাক, কি বল···

সার্জ পালমা তক্ষুণি পকেটে হাত দিয়ে একটা রুবল বের করে আনল। এবং টুং করে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে খপ করে হাতের মুঠিতে চেপে ধরে বলল: মাথা তোমার আর উল্টো দিক আমার—কেমন, রাজী তো··

কিন্তু প্যাভলফ এই বিরক্তিকর হাল্‌কামিতে নাক সেঁটকাল।

পালমা হো-হো করে হেসে উঠল। কিন্তু হাতের মুঠি খুলতেই তার চোখ দুটি অস্বাভাবিক রকম বড় দেখাল।

—ও হো, তোমারই জিৎ। কি আর করি—এখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও সরে পড়তে হল দেখছি। তুমি সরে গেলেই আমার পালা। মনের কথা যাই হোক্, মুখে বলতে হল—তোমার ভাগ্য ফিরুক···

মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সার্জ বেরিয়ে পড়ল।

বৃদ্ধা বাইরের দিকে উঁকি মেরে তাকাল, একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল: বাঁচা গেল! তবে রাস্তায় হোপের সঙ্গে দেখা না হয়ে যায়···

বৃদ্ধার কথা শুনে প্যাভলফের মনে আশা জাগল।

প্রকাশ্যে বলল : তাহলে লার্ড পালমার্স্টনকে তুমি পছন্দ কর না মাসী ?

মাসী কি উত্তর দিল। বলল : না এ ব্যাপারে মোটেই নয়।

—কেন ? সে পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে, চমৎকার চেহারা···খোসমেজাজী

—বৃদ্ধা বলল : সে কথা সত্যি বটে, তবে তা ছাড়াও অনেক-কিছু ভাল থাকতে পারে

ঠিক এই সময়ে হঠাৎ আলোর আভায় ঝকমক করে উঠল ঘরের প্রত্যেকটি আসবাব। হোপ ইভানোভনা দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল।

—পল যে ! নমস্কার—নমস্কার ! এ নির্জনবাসী দুটো বুড়ো মেয়ের ঘরে চায়ের আসরে আজ তুমি অনাহূত অতিথি ! ভাল—ভাল। মাসী, সব ঠিক আছে তো ? আজ আমার একটু দেরি হয়ে গেল।

এমন আন্তরিক অভ্যর্থনা এবং সচকিত চোখের ছায়াপাত পলকে ভাসিয়ে তুলল। হোপ জানে—তার আসার কারণ, এবং এ সাক্ষাতের পরিণামে কি হবে সেকথা ভেবে তার মনে যেন আশঙ্কা জাগে, হয়ত হোপের মনেও। কয় বছর ধরে ওরা একনিষ্ঠ সহকর্মী এবং তাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের উদার আকাশে বসন্ত বয়েছে বরাবর—কোন রকম লেনদেনের ধার তারা কোনদিন ধারেনি।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়েই হোপ জিজ্ঞেস করল : আর কেউ এসেছিল মাসী ?

—প্রয়োজন কি আর, হোপ ইভানোভনা ?—বৃদ্ধা প্যাভলফের দিকে সহৃদয় দৃষ্টি ফেলে কৌশলে জবাব দিল এবং পাছে আবার কোন প্রশ্ন ওঠে, তা এড়াবার জন্যে অন্য কাজের নাম করে উঠে গেল।

হোপ মৃদু হাসি হেসে বলল : মাসী তামাসা করছে।

—বাস্তবিক ভারি চমৎকার বুড়ীর মন। ও না থাকলে তুমি তো অসহায়·· আর একলাটি পড়ে যাবে···একদিন হয়ত সে সংসারের মায়া কাটাবে—হাঁ, তখন তুমি এমন অসহায় অবস্থায় পড়বে—যদি না তোমার তত্ত্বাবধানের ভার আর কারও হাতে দাও। আজ আমি তোমাকে ওকথাই বলতে এলাম হোপ, ও কর্তব্য-ভার আমার উপর ছেড়ে দেবে কিনা। যেদিন থেকে আমাদের পরিচয়, সেদিন থেকেই আমার অন্তর-মন-তোমাতে মিশে গেছে—একথা তো তোমার অজানা নেই !

হোপ তা জানে এবং ভাল করেই জানে। অন্তরে অন্তরে সে আগেই অনুভব করেছে, হয়ত এমন একটা মুহূর্ত আসবে—সেই দুর্যোগ মুহূর্তে ছিঁড়ে যাবে এই বন্ধুত্বের বাঁধন।

অন্য অবস্থায় হলে হয়ত সেরকম কিছু হওয়া বিচিত্র ছিল না। কিন্তু কথা এই যে বিবাহিত জীবনের সাধারণ আনন্দ উপভোগ, সংসার-বিলাস এবং মাতৃত্ব-গৌরব—এসব হোপের জন্যে নয়; সত্য হোক আর মিথ্যেই হোক, তার অন্তর অন্য এক মহান কর্তব্যে নিয়োজিত এবং সেই কর্তব্যের প্রেরণায় স্ত্রী-জীবনের প্রিয় প্রেয়তম সব-কিছুকেই সে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

প্যাভলফের মনেও এই ভয়ই জাগছিল—কথাটা বলেই তবু সে ভাবল এই অনুরাগ-আবেদনে হয়ত হোপের মন সাড়া দেবে। এবং সম্ভব হবার মতো হলে হোপও সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হত। চোখের পলকে তার হৃদয়-মন ভরে দিত স্বর্গ-সুষমায়।

কিন্তু হোপের সচকিত চোখ—যে চোখের দৃষ্টিতে শত কাজে মুখর ভাষা প্রকাশ পায়, সেই চোখ সহসা অবনমিত হল। প্যাভলফ দেখতে পেল সেই সুশ্রী মুখের উপর কালো ছায়া।

প্যাভলফ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল : আমায় ক্ষমা করো হোপ !

এমন ধীরশান্তভাবে সে বলল যে এই মুহূর্তের ব্যাপারে তার প্রোজ্জ্বল আশা-আকাঙ্ক্ষা যে নিভে ছাই হয়ে গেছে—তা সহসা প্রকাশ পেল না।

—পল !—হোপ ওঠে এগিয়ে গিয়ে বলল। তার সুরে অনুনয় এবং করুণা মাখানো—এবং এ অনুনয় ও করুণা যেন উভয়েরই প্রতি। পল চকিতে কাতর চোখ তুলে তাকাল হোপের মুখের দিকে।

—বন্ধু !—এবার হোপের কথায় দৃঢ়তা প্রকাশ পেল। : তুমি তো জান। আমার এ জীবন কি কাজে সঁপে দিয়েছি!

তারপর দেয়ালে টানানো ছবিগুলোর দিকে চোখ রেখে বলল : তুমি আরও জান—আমার আদর্শ কি এবং কি

আদর্শের ভেতর আমার দেহ-মন যা-কিছু—সব উৎসর্গ করে দিয়েছি। আপন বলতে আর কিছুই নেই আমার। তুমি দরিদ্র, আমিও তাই। দারিদ্র্য আমাদের উভয়ের হাতই কসে বেঁধে রেখেছে। তোমার সকল সাহায্য নিয়েও এতবড় মহান কাজের অতি সামান্যই করতে পারি—কিন্তু কাজ যে চেঁচিয়ে মরছে ওগো কর—কর। তবু তোমাকে ছাড়া আমি অসহায়—আজকের এই ঘটনার পর আর কি তোমায় পাব—শ্রমিকদের ভিড়ে মহান কাজে···

—তোমার কাজে আমি নিজেকে সঁপে দিয়েছি—একথা তো তুমি জান ইভানোভনা।

—হাঁ আমি জানি—জানি। যদিও আমি—আমি···

—হাঁ ইভানোভনা, তা সত্ত্বেও তুমি সার্জ পালমার লক্ষ মোহরকেই বিয়ে করবে···

পল কিছুতেই চেপে রাখতে পারল না তার অশান্ত অন্তরের তিক্ত ভাবাবেগ···বলল আঃ—সেও এখানে এসেছিল। আবার এখনই আসবে। ভগবান যদি আমাদের সহায় তবে এমন বিধান কেন তাঁর?

—পল, একজনের সর্বস্ব দান যদি বহুজনের উপকারে লাগে—তবে তাই করতে দেওয়া উচিত। সার্জ পলমার লক্ষ কোটী মোহর জাতির বন্ধন-শিকল ভেঙে চুরে দিয়ে হয়ত তাদের মুক্তি আনতে পারে। সে কাজের প্রতিবন্ধক হবার কি অধিকার তোমার আমার আছে বলো!

—ত্যাগের অপূর্ব আদর্শ তুমি।—পল বিষণ্ণকণ্ঠে বলল এবং মাথা নুইয়ে হোপের হস্তচুম্বন করে নীরবে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

আর হোপ? হোপ নিস্তব্ধভাবে বসে রইল। তার অপলক দৃষ্টি দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলোর উপর। জীবনের বিচার চলতে লাগল তার মনে। এত উৎসাহ উদ্যম সত্ত্বেও তার চোখে প্রকাশ পেল বিষাদের করুণ ছায়া। কারণ সে জানে, কোন সে পথ, যে পথ তাকে টেনে নিয়ে যাবে···

এই সময়ে বুড়ী মাসা ঘরে ঢুকল। ব্যাকুলভাবে তাকাল তার দিকে। শেষে জানাল—সার্জ পলমা দেখা করতে এসেছে।

হোপের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল এবং সামলে নিল নিজেকে। তার গভীর কালো চোখে প্রকাশ পেল উজ্জ্বল আভা। তাই দেখে সার্জ তরসা পেয়ে এগিয়ে এল।

—এসো—এসো, সার্জ প্যাট্রোভিচ।

—আঃ! রসিকতার ভঙ্গি করে সার্জ বলল। আগে তাহলে বন্ধু পলের দুর্ভাগ্যে সমবেদনা জানাই···

এই কথায় ইভানোভনার ভ্রূযুগল হঠাৎ সটান হয়ে উঠল।

সার্জ বলল: ইভানোভনা, তুমি জান তো—কেন আমি এসেছি? আরও জান আমি স্কুল-কলেজের ছাত্র নই এবং তোমার বাঁধুনীও আমার নেই। কথা এই: তুমি আমার স্ত্রী হতে পার কি?

হোপ শান্তভাবে চোখ তুলে চাইল। তারপর বলল: সার্জ প্যাট্রোভিচ, তোমার ও কথার অর্থ কি?

—ও কথার কি অর্থ? অর্থ, তুমি আমার স্ত্রী হবে কি না—আমার কথায় এই তো বুঝি হোপ ইভানোভনা!

—ও কথা আমিও ঠিক জানি। তাহলে শোন, কুলি-মজুরদের মতো আমি বাস করি···

সার্জ মাথা নেড়ে বলল: ওকথা সবাই জানে।

—এ পর্যন্ত আমার যা মনে পড়ে তাই বলব তোমায়। আমি বুঝতে পেরেছি পরাধীনতার ভারবাহী জনগণের মুক্তির প্রশ্ন আমার মনে জেগেছে এবং আমার অন্তরও তাদের কাছে গুমরে মরছে। আমার বাবা ব্লুমেলবার্গে (Schlusselburg) প্রাণ দিয়েছেন—সমস্ত পৃথিবী সে খবর জানে। তাঁর একমাত্র অপরাধ—পরাধীনতার পঙ্কিলতা থেকে জনগণকে টেনে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। তার আগেই মাও মারা যান। বাবার প্রতি নির্মম অবিচারই তাঁর মৃত্যুর কারণ। ঐ চেয়ে দেখ তাদের প্রতিমূর্তি। তাঁরা দিনরাত কাঁদছেন আর বলছেন—কাজ করে যাও—কাজে লাগো···

—এ কাজ তো মহৎ কাজ।

—কিন্তু বড় বিপজ্জনক। এবং উপযুক্ত কর্মীর অভাব আর অর্থের টানাটানি ও ঝিলেমি—এসব কারণে অন্তর চুরমার করে দেয়। যদি তুমি আমাদের একাজে যোগ দিতে প্রস্তুত থাক তাহলে আমি রাজী—আমি তোমার স্ত্রী হবো।

—হাঁ ইভানোভনা, আমিও যোগ দেব তোমাদের কাজে যে পর্যন্ত তুমি বাড়াবাড়িতে না যাও। তবে জোর-জবরদস্তিতে মুক্তির পথ সুগম হবে এ আমি বিশ্বাস করিনে।

—আমিও করিনে। মস্তিষ্ক এবং অর্থ ঠিকমত খাটাতে পারলে সময়ে মুক্তির পথ খোলসা হবে। হতে সময় লাগবে—কিন্তু মুক্তি আসবে—আসতে বাধ্য—আসবেই।—ইভানোভনা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল। পরে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে শান্তভাবে বলতে লাগল: আমরা গড়তে চাই—ভাঙতে নয়। আমরা গাছ লাগাতে চাই, উপড়াতে চাইনে।

—আমি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তোমার কাজ মেনে নিলাম। এবং পাশাপাশি থেকে কাজ করে যাব।

সার্জ পালমার এই স্বীকারোক্তিতে নিঃসন্দেহ কর্মস্পৃহা প্রকাশ পেল।

হোপ ইভানোভনা এমন দাবী করতে পারে—এজন্য সার্জ প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। সে এই ভেবে প্রস্তুত হয়েছিল—হারানোর চেয়ে আগে পাওনাটাই সে মেনে নেবে। এও নিঃসন্দেহ, এমন একটা স্থির ধারণা তার ছিল—সাধারণ মেয়েদের থেকে বুদ্ধিকুশলা মেয়েদের শুধু এইটুকুই ব্যতিক্রম—নতুবা সবদিক দিয়েই তারা এক। এবং একই বিষয়ে মনের এই বিপর্যয়ের হেতু এখানেই। নতুবা কেন সে কোমলতার সঙ্গে কঠোরতা মেশাবে, ফুলের বদলে নেবে কাঁটা। এ একটা পরিবর্তনশীল রূপমাত্র। তবে নিরাপদ এবং ভোগবিলাসী জীবন ধীরে ধীরে তাকে ফিরিয়ে আনবে কঠোর এবং বিপদসঙ্কুল পথ থেকে। তাহলে পালমার দিক থেকে নিশ্চয়ই কোন অপরাধ হবে না।

কিন্তু ইভানোভনার মনোবল সম্পর্কে পালমার এই ধারণা নিতান্ত অমূলক।

ইভানোভনার বাবার নাম ডাঃ আইভান আর্সকুই। নিপীড়িত জনসাধারণের প্রতি ঐকান্তিক মমতাবোধ এবং দেশের উন্নতির জন্যে গভীর অনুরাগ আইনের চোখে এই ছিল তাঁর অপরাধ। স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন-ব্যবস্থা ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি সমাজ-বিপ্লবে জড়িত হয়ে পড়েন। কিন্তু এই বিপ্লবীমতবাদ স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হয়ে উঠেছিল—এবং বিদ্রোহ বা অসন্তোষের উপর নির্ভর করে নয়। এ হল বিবর্তনের সুযোগ—যে নিমে বলে শেষ পর্যন্ত রাজা—রাজতন্ত্র আপনিই ভেঙে পড়ে। কিন্তু রাজতন্ত্রের পক্ষে এ মোটেই প্রীতিকর নয়—মহাবিপদ। কাজেই ঐ বিপ্লববাদ কুঁড়ি মেলার সঙ্গে সঙ্গেই বিনষ্ট করার জন্যে রাজতন্ত্রের প্রভুরা উঠে পড়ে লাগেন। আইভান আর্সকুইকে তারা সরিয়ে ফেললেন। আইনের চোখে তিনি হলেন 'বিশ্বাসঘাতক'। সুসেনবার্গের অন্ধকারাগার বিচারাধীন আসামী বলে তাকে আবদ্ধ করে রাখা হল। কিন্তু বিচার আর হল না। দুই বছর অমানুষিক নিপীড়ন সহ্য করে শেষ পর্যন্ত তিনি মারা যান। আইনের দুয়ারে এই অবিচারের নির্মমতায় ভগ্নহৃদয়ে মারা গেলেন তাঁর স্ত্রী। হোপের বয়স তখন ষোল—স্কুলের ছাত্রী। এই অসহায় অবস্থায় তার লালন-পালনের ভার নেন বৃদ্ধা মাসীমা।

লেখাপড়া চলতে থাকে। জীবন সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠল তার পিতার আশা এবং আদর্শের ধারায়। কিছুদিন পর মাসীমা মারা গেলেন—সামান্য কিছু বিষয়-সম্পত্তি রেখে। হোপ তখন লেখাপড়া ছেড়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিলে। এবং দিনের প্রতিটি মুহূর্ত নিরলসভাবে খেটে অর্থোপার্জন চলতে থাকে তার। অতি সাধারণ চালচলন এবং খাওয়াপরা বাদে যা কিছু বাঁচত তাই নিয়েই সে প্রচারকার্যে নেমে পড়ল অধঃপতিত দীনদরিদ্রদের মাঝে—যাদের মুক্তির জন্যে তার বাবা নিঃশেষে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন।

পল প্যাভলফের সঙ্গে তার অনেক দিনের পরিচয়—সেই পাঠ্যজীবন থেকে। পলের জননী প্যাভলোভনার সঙ্গেও তার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়ে পড়েছিল। তাঁর সুমধুর প্রকৃতি, সকল ধর্মে উদার মনোভাব—এ সব গুণ পলও মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছিল। হীন অধঃপতিতদের প্রতিও ছিল তাঁর সকরুণ সহানুভূতি। পলের চোখে মুখেও মায়ের প্রাণের পরশ ফুটে উঠত। পল এবং হোপ উভয়ের জীবনের লক্ষ্য হল এক এবং অভিন্ন। কিন্তু অবস্থার দিক দিয়ে পল ছিল অতি-গরীব। তার পিতা মৃত্যুকালে তাকে ইউনিভারসিটির শিক্ষায় কৃতি করে উপযুক্ত মনের সম্পদের অধিকারী মাত্র করে দিয়ে গিয়েছিলেন, আর কিছুই দিয়ে যেতে পারেন নি।

সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টও তাহার স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন।*

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধোত্তর সমস্যা আজ পৃথিবীর সর্বত্র চিন্তাশীল, জননায়কদের চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে মিত্রপক্ষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠতার ফলে বহু সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। এবং সমস্ত সমস্যা ছাপাইয়া উঠিয়াছে অর্থনৈতিক সমস্যা। ইংল্যাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমাজের ঝুর্ধারগণ ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে নিজেদের স্বার্থ কড়ায় গণ্ডায় কি করিয়া বজায় রাখা যাইতে পারে সেই চিন্তায় উতলা হইয়া উঠিয়াছেন। ধনিকতন্ত্রের এই স্বার্থচিন্তার মধ্যে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি, বিশেষ করিয়া ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির ভবিষ্যৎ কি তাহাই পৃথিবীর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে বিশেষ করিয়া ঔপনিবেশিক দেশগুলির অধিবাসীদের বর্তমানে গুরুতর চিন্তার খোরাক যোগাইতেছে। জার্মাণী ও জাপানের পরাজয়ের পর পৃথিবীর অবস্থা কি হইবে ইহাই আসল সমস্যা। আভা ও মুমাত্রা কি পুনরায় হল্যাণ্ডের দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ হইবে, মালয়দ্বীপপুঞ্জ কি আবার বৃটেনের ক্রীতদাস হইয়া জীবনযাপন করিবে; ব্রহ্ম কি আবার তার পশ্চাদগত জীবনে ফিরিয়া যাইবে; ইন্দো-চীন কি ফরাসী দাসত্বে পুনরায় পরিণত হইবে; ভারতবর্ষ কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জলতোলা ও কাটকাটার মজুর হইয়াই থাকিবে? যদি তাই হয় তাহা হইলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত এই যুদ্ধও পৃথিবীতে শান্তি আনিতে অসমর্থ হইবে। এই যে লক্ষ লক্ষ তরুণ প্রাণ এই নরমেধ যজ্ঞে আত্মাহুতি দিল তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে। এই যুদ্ধ অপর বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইবে—শ্বেত জাতিদের লোভ পুনরায় পৃথিবীতে নরশোণিতে সিক্ত করিবে। ইহা একান্ত সত্য যে যুদ্ধোত্তর বিভিন্ন পরিকল্পনায় ঔপনিবেশিক দেশগুলির সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না হইলে পৃথিবীতে কখনও শান্তি আসিতে পারে না।

ঔপনিবেশের অধিবাসীদের অধিকাংশই ন্যায়বিচারের ঘোরতর শত্রু। জাপান ও জার্মাণীর চরদের নানারূপ প্ররোচনা তাহাদের আজ পর্যন্ত প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। যদিও ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি আজ পর্যন্ত তাহাদের যুদ্ধের প্রকৃত লক্ষ্য কি ইহা প্রকাশ্যে বলে নাই এবং মুখে গণতন্ত্রের জয়গান গাহিলেও কার্যে কলাপে তাহারা গণতন্ত্রবিরোধী তথাপি ঔপনিবেশিকগণ তাহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চলিয়াছে। কারণ তাহারা জানে যে ইংরেজ-মিত্রশক্তি অতিসামান্য হইলেও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কিন্তু অক্ষশক্তি গণতান্ত্রিক নীতিরই চূড়ান্ত বিরোধী। এইজন্য ইংরেজ মিত্রশক্তির প্রকৃত আদর্শে সন্দিহান হইয়াও তাহারা তাহাদের বহুল ভাবে সাহায্য করিয়াছে ও করিতেছে।

যুদ্ধের দরুণ ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে যুদ্ধসম্ভার প্রভৃতি প্রস্তুত ও রসদবরাহের জন্য যথেষ্ট শিল্পোন্নতি হইয়াছে এবং ইহার জন্য শ্রমিকসংখ্যারও সুপ্রচুর বৃদ্ধি হইয়াছে। আবার এই যুদ্ধের ফলেই দেখা গেল যে এইরূপ বিশ্ব-যুদ্ধে ঔপনিবেশিক পদ্ধতি যুদ্ধ সুষ্ঠুভাবে চালাইবার পক্ষে প্রতিবন্ধকই সৃষ্টি করে। সোভিয়েট রাশিয়ার যুদ্ধ প্রচেষ্টার অত্যাশ্চর্যকর সাফল্যের কারণের মধ্যেই ঔপনিবেশিক দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টার অনুরূপ সফলতা কেন অর্জন করে নাই তাহা বোঝা যাইবে।

বর্তমান যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির ব্যর্থতার কারণ অন্বেষণ করিতে যাইয়া আমেরিকার "Fortune" (অক্টোবর ১৯৪৪) পত্রিকা বলেন,

"The collapse of the colonial empires during the present war indicates that colonial empires are unable to defend colonies and that colonial peoples are unable to defend themselves against aggression."

অর্থাৎ বর্তমান যুদ্ধে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলির পতন হইতেই বোঝা যায় যে এই জাতীয় সাম্রাজ্যগুলি তাহাদের উপনিবেশ রক্ষা করিতে অসমর্থ এবং উপনিবেশের অধিবাসীরাও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারে না।

ইহার মধ্যে খানিকটা অতিশয়োক্তি থাকিলেও এই কথাটি সত্য যে ঔপনিবেশিক পদ্ধতি উপনিবেশের অধি-

* ফিলিপাইন জাপ-অধিকার হইতে মুক্ত করার পর একদল আমেরিকান রাজনীতিক উদ্যোগ এখন স্বাধীনতা দেওয়া ঠিক হইবে না বলিয়া আন্দোলন করিতেছেন, যদিও ফিলিপিন দেশবাসী এখনই স্বাধীনতা লাভের দাবী করেন।

বাসীদের আত্মরক্ষার শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারে না। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অধীনে এক সেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যতীত ঔপনিবেশিকগণের কোনো যুদ্ধ কোনো পরিপ্রেক্ষিতেই "গণযুদ্ধে" পরিণত হইতে পারে না। এইজন্যই আজ ইহার বিরুদ্ধে বিশ্বমানবের চিন্তাজগতে তুমুল আন্দোলন জাগ্রত হইয়াছে। কিন্তু উপনিবেশগুলির কিরূপ পরিবর্তন সাধন করা যাইতে পারে তাহা নিয়া নানা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও চার্চিলের ১৯৪১এর ১৪ই আগষ্টের সুবিখ্যাত অ্যাটলান্টিক চার্টারের আদর্শে এই সমস্যা সমাধান করা যাইতে পারে বলিয়া অনেকের মত। অবশ্য চার্চিল ও তাঁহার দলভুক্ত ব্রিটিশ শাসকতন্ত্র ইহাতে কখনও রাজী হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রিটিশ সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী হইয়া সম্রাটকে রাজায় পরিণত করিতে হয়; সিসিল রোডসের মন্ত্রশিষ্য তৎপূর্বে ছারা-কিরি করিতে বাধ্য হইবেন।

একথা সত্য যে আটলান্টিক চার্টারের সর্তগুলি এমন ব্যাপক ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে ইহাকে প্রায় ইচ্ছামত সবদিকেই ঘোরান যাইতে পারে। অ্যামেরিকান ধনিকেরা মনে করেন যে আটলান্টিক চার্টারের মতে বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীরা এই সব উপনিবেশে যথেচ্ছ টাকা খাটাইবার সুবিধা পাইবে। অ্যামেরিকার বৈদেশিক নীতি সম্বন্ধীয় বুলেটিন (The American Bulletin on Foreign Policy Reports) বলেন,

"This country (i. e. U. S. A.) undoubtedly has a genuine interest in the removal of monopolist trade and investment practices in foreign areas including colonial Asia."

অর্থাৎ বিভিন্ন বৈদেশিক রাজ্য বিশেষ করিয়া ঔপনিবেশিক এসিয়াতে একচ্ছত্র ব্যবসায় ও টাকা খাটাইবার বিরুদ্ধে সর্ববিধ বাধা সরাইতে অ্যামেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত আগ্রহ নিঃসন্দেহে আছে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অ্যামেরিকার আগ্রহের কারণ উপরোক্ত বিবৃতির মধ্যেই পাওয়া যাইবে। অ্যামেরিকান ব্যবসায়ীরা ভারতবর্ষে তাহাদের টাকা খাটাইবার জন্য এখন হইতেই অত্যন্ত উৎসুক এবং আমাদের অনেক ব্যবসায়ীরাও অ্যামেরিকান ব্যবসায়ীদের সাহায্যে এদেশে ব্যবসায় করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছে। আবার জাপানকে পরাস্ত করিতে হইলে ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করা আবশ্যক সেজন্যই অনেক অ্যামেরিকান রাজনীতিবিদ্ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অচল অবস্থার একটা সমাধান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। এদেশের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতিতে অ্যামেরিকার সাহায্য থাকিলে ব্যবসা বাণিজ্যে অ্যামেরিকা যে এ দেশবাসীর সহানুভূতি পাইবে একথা তাহারা ভাল করিয়াই জানে।

ইংল্যাণ্ডের ধনিক সম্প্রদায় অ্যামেরিকা ও ভারতবর্ষের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতার পরিচয়কে খুব ভালচক্ষে দেখিতে পারে না। এই যুদ্ধের ফলে ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যা একদিক দিয়া একটা বিশেষ রূপ নিয়াছে। আমাদের যে ঋণ ইংল্যাণ্ডের নিকট ছিল যুদ্ধের দরুণ তাহা সম্পূর্ণ শোধ হইয়া এখন ভারতবর্ষ ইংল্যাণ্ডের উত্তমর্ণ জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য যে টাকা হিসাব মত আমরা ইংল্যাণ্ড হইতে পাইব সে টাকা ইংল্যাণ্ড কি ভাবে শোধ করিবে তাহা আমাদের অজ্ঞাত। সম্পূর্ণ টাকাটা আদৌ পাওয়া যাইবে কি না অথবা পাওয়া গেলে সে টাকা আমাদের ইচ্ছামত খরচের অধিকার আমাদের আছে কি না সে বিষয়ে এদেশের লোকের মনে গভীর সন্দেহ আছে। আর্থিক হিসাবে উত্তমর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ঔপনিবেশিকতা ঘুচে নাই কারণ আমাদের রাজনৈতিক সত্তার কোনো পরিবর্তন ইহাতে হয় নাই। তবে অ্যামেরিকার শিল্পপতিগণের ভারতবর্ষের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের ইচ্ছা দেখিয়া ইংল্যাণ্ডের শিল্পপতিগণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন এবং অনুরূপ সুবিধা ভারতের শিল্পপতিদের দিবার সদিচ্ছা তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা যতদিন পর্যন্ত হস্তান্তরিত না হইবে ততদিন পর্যন্ত এইরূপ অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ভারতবর্ষের পক্ষে কখনও মঙ্গলজনক হইতে পারে না।*

* ভারতবর্ষে বৃটিশ কোম্পানীগুলি বিভিন্ন ব্যবসায়ে টাকা খাটাইয়া কত লাভ করেন এবং ভারতের শ্রমিক, কারখানা উৎপাদক, ভারতীয় মহাজন ও শিক্ষিত সম্প্রদায় উহাদের নিকট কি পায় সে-বিষয়ে যাঁহারা জানিতে চান তাঁহাদিগকে Dr. H. C. Mookerjee—*Indians in British Industries* (Saraswaty Library, Calcutta. Re. 1/4) পুস্তকখানা পড়িতে অনুরোধ করি।

যুদ্ধের দরুণ উপনিবেশগুলির মধ্যে যে চাঞ্চল্য আসিয়াছে তাহাতে তাহাদের আভ্যন্তরীন শাসনপদ্ধতির পরিবর্তন অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রাক্ যুদ্ধকালীন ব্যবস্থাতে কেহই আর সন্তুষ্ট হইতে চাহে না। ইহাতে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির কর্ণধারগণ এই অবস্থায় কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন সে বিষয়ে বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইয়াল্টা কনফারেন্সে ত্রি-শক্তির মধ্যে "প্রভাবাধীন রাষ্ট্র" বা Spheres of Influence বলিয়া কিছু স্থির হইয়াছে কি না সে-বিষয়ে পৃথিবীর মনে একটা সন্দেহ আছে। ডাম্বার্টন ওক্‌স্ কন্‌ফারেন্সে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিও ঔপনিবেশিক জাতিগুলির মনঃপূত হয় নাই। সান্‌ফ্রান্সিসকো কনফারেন্সের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তাহারা সন্দিহান। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে প্রতিনিধি সংখ্যা লইয়া প্রথমেই বিবাদ বাধিয়াছিল; যুক্তরাষ্ট্র বাধ্য হইয়া রাশিয়ার প্রস্তাবে সায় দিয়াছে। ইংল্যাণ্ড লীগ অভ নেশনসে যে কূটনীতির সাহায্যে নিজের সংখ্যাধিক্য চিরদিন বজায় রাখিয়া আসিয়াছে এবারেও তাহার কোনো ব্যতিক্রম হইবে না। ভারতবর্ষের "প্রতিনিধি" তিনজনই কর্তার ইচ্ছায় সায় দিয়া চলিতে বাধ্য; কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার স্বার্থ বৃটেনের স্বার্থের সহিত জড়িত, সুতরাং সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবীতে বৃটেন এই সব তাঁবেদারদের সাহায্যে সান্‌ফ্রান্সিসকো কনফারেন্সে যে নিজের প্রভাব বজায় রাখিতে পারিবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে ঔপনিবেশিক নীতি সম্বন্ধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়ার সুস্পষ্ট মতবাদ বৃটেন ও হল্যাণ্ডকে অনেকটা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবে বলিয়া মনে হয়।

উপনিবেশগুলির শাসন সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় কমিশন (International Regional Commission) গঠন সম্বন্ধে এক প্রস্তাব উঠিয়াছে। বৃটেনের উদারনীতিক দলের অনেকে এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে কারণ এইরূপ আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি কমিশনের সাহায্যে উপনিবেশ শাসন করার ব্যবস্থা হইলে ইঙ্গ-আমেরিকান রেষারেষি হ্রাস হইতে পারে। অ্যামেরিকানদের অনেকে মনে করেন যে এই সব কমিশনের হাতে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশের অধিকৃত উপনিবেশগুলির কর্তৃত্বভার অর্পিত হইলে কমিশনের প্রতিনিধি-রাষ্ট্রগুলির একটা নৈতিক দায়িত্ব আসিবে এবং ফলে উপনিবেশের অধিবাসীদের অবস্থার উন্নতি ঘটিবে। কিন্তু এ বিষয়ে বৃটিশ রাজনীতিকদের মত এই যে উপনিবেশের দৈনন্দিন শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে এই সব কমিশনের কোন ক্ষমতা থাকিবে না।

বৃটেনে ঔপনিবেশিক নীতির পরিবর্তন সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া ইতিমধ্যেই সুরু হইয়াছে। অবশ্য ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল দলও যে নাই তাহা নহে। পশ্চাৎপদ জাতিগুলির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার না করা ইহাদের বিশিষ্ট মত।

গত বিশ্বযুদ্ধের পর জেনারেল স্মাট্‌স্ যে Maudate প্রথা প্রচলন করিয়া উপনিবেশগুলি শ্বেতজাতিদের চিরকালের মত করায়ত্ত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বর্তমানে এই Maudate প্রথাকে রূপান্তরিত করিয়া Trusty বা Regional Commission প্রথায় আনিবার চেষ্টা হইতেছে; ধনিকতন্ত্রবাদী শ্বেতজাতির Trusteeship-এর যে কি অর্থ তাহা ঔপনিবেশিকেরা সার্ধ দুইশত শতাব্দী ধরিয়া মর্মে মর্মে টের পাইয়াছে। সুতরাং তাহারা যে ইহাতে ভুলিবে না তাহা বলার প্রয়োজন রাখে না।

সান্‌ফ্রান্সিসকো কনফারেন্স যদি উপনিবেশ সম্বন্ধে একটা সাহসী প্রস্তাব গ্রহণ করিতে না পারে তবে বিশ্বশান্তি যে অতি অল্পদিনের মধ্যেই ভঙ্গ হইবে, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নাই।

প্যারী

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

ফ্রেন্চদের রাষ্ট্রকেন্দ্র প্যারী দেখার জন্য বাস্তবিকই প্রাণ চেয়েছিল। যে দিন প্যারীতে পৌছবার কথা ছিল সেদিন প্যারীতে পৌছতে পারিনি কারণ পথে দেখা হয়েছিল আর এক ভবঘুরের সংগে। লোকটি যুবক। বোধহয় আঠার বৎসর তার বয়স হবে। তার সর্বাংগে যৌবন এসে দেখা দিয়েছিল আর আমার কাছ থেকে যৌবন বিদায় নিতে চলছিল। তার শরীরের সৌন্দর্য, সুন্দর দন্ত পাটি, সোনালী রংএর চুল সবই আমার কাছে মাটির পুতুলের মত মনে হচ্ছিল। তার ইংরেজী বলা শুনে মনে হয়েছিল লোকটি নিশ্চয়ই গ্রেটবৃটেনবাসী নয়। তার জাতের পরিচয় আমি জিজ্ঞাসা করিনি—তার কথায়ই আমি তার জাতের পরিচয় নিতে ঘৃণা বোধ করছিলাম।

আমার পায়ে ব্যথা ধরেছিল। অতি কষ্টে পথ চলছিলাম, হঠাৎ সূর্য আঁধারে ডুবে যাওয়ায় আর চলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। পথেরই পাশে একটি ছোট হোটেল, যাকে ইংলিশে 'ইন্' বলা হয় সেখানে গিয়ে দশ ফ্রাংক দিয়ে একখানা রুম ভাড়া করলাম। সুন্দর যুবকটি আমাকে 'ইন্' ভাড়া করতে সাহায্য করেছিল, সেজন্য আমি তাকে অনেকবার 'মাঁরসি মঁশিয়ে' বলার পরও সে 'ইন্' পরিত্যাগ করছিল না। আমি তার সঙ্গে বেশি কথা না বলে ঘরে গিয়ে পোষাক পরিবর্তন এবং মুখ হাত ধুয়ে বাইরে এসে দেখলাম সেই সুন্দর লোকটি দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাকে বাইরে দেখে বলল, "ক্ষমা করবেন মঁশিয়ে, আমি ন্যাশনেল সোসিয়েলিষ্ট নই, আমি ন্যাশনেলিষ্ট।" "এবার পথে এস সুন্দর মানুষ। আমি ন্যাশনেল সোসিয়েলিষ্টদের অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, একথাটা বার বার তোমাকে বলে দিয়েছি। জার্মাণীতে যতদিন ছিলাম কোন দিনই জার্মাণরা আমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেনি তবুও আমি ন্যাশনেল সোসিয়েলিজম ঘৃণা করি একথাটাও বলতে ভুলিনি, আমার কথা খণ্ডন করার জন্য তুমি যে যুক্তি দিয়েছ তা যুক্তির বাইরে। এখন বলত তোমার চাই কি? আর একখানা রুম ভাড়া করার বোধহয় টাকা নাই, কেমন সে কথা নয় কি?" যুবক হেসে বলল, "আমার অনেক হাজার ফ্রাংক আছে। আমি তোমার একই সংগে প্যারীতে যাব "সেলুতে-দু-সেলুই"এ থাকব। এখনই আমি পাশের রুমটা ভাড়া নিচ্ছি।" যুবক পাশের রুম ভাড়া নিয়ে, রুমে প্রবেশ করল আমিও আমার রুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলাম।

এবার খেতে হবে। ভাত পাবনা, পাব "পাও", মানে রুটি। আমরা যাকে পাওরুটি বলি। পাওরুটি শব্দটি কি করে গঠন হল তা নিয়ে মাথা ঘামাব না। আসল কথা হল ফ্রেন্চদের রুটি খেয়ে পেট ভরাতে পারতাম না, সেজন্য ফ্রান্স্ দেশটাই আমার ভাল লাগেনি। দুধ, দই, অন্যান্য আমার উপযোগী খাদ্য যেন এদেশে পাওয়াই যেত না। ছোট বড় অনেক হোটেল দেখেছি কোথাও এংলো সেক্সন অথবা স্যাক্স খাদ্য পাওয়া যেত না, সর্বত্র এক ঘেয়ে নানারকমের "ষ্টিক" আর পানীয় হল নানারকমের মদ। ইনের মালিককে আমার জন্য কিছুটা খাবার আনতে বললাম—যেমন আলুসিদ্ধ, এবং লবন্জি। ঘরে পাক করা জিনিসগুলি খেতে বেশ লাগল।

এটা একটি ছোট্ট গ্রাম। গ্রামের ভেতর দিয়েই বড় পথটা চলে গিয়েছিল কিন্তু গ্রামের পেছনে এবং আশে পাশের বাড়ি ঘর দেখলে মনে হয় না প্যারীর নিকটে এসেছি। গাছের ডালগুলি কেটে ফেলা হয়েছে, নতুন যে সকল ডাল বেরিয়েছে তা দেখতে অধমরা এবং অসুন্দর। বাড়িঘরগুলি যদিও নতুন তবুও তাতে যেন পুরাতনের একটা ছাপ মারা রয়েছে। এরূপ সর্বত্রই দেখে এসেছি। ফ্রান্সএ প্রবেশ করার পরই যেন অবসাদ এসে আমার ঘাড়ে বসেছিল। এটা আমার দোষ নয়, এটা হল স্থানীয় আবহাওয়ার দোষ। লোকে কথা বলে, শুনলে মনে হয় যেন কলকাতার কোনও বস্তিতে বসে আছি। গ্রাম একটু ঘুরেই ইনের কমন রুমে এসে বসলাম, সাথী সুন্দর যুবকটি আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। তাকে দেখতে পেয়েই বললাম "অনুগ্রহ করে আমার সংগে পলিটিক্স আলোচনা করবেন না, আমি পরাধীন দেশের লোক, আমাদের স্বাধীনতা পাওয়াই সর্বপ্রথম কাজ, তারপর কমিউনিজম্, ন্যাসনেল সোসিয়েলিজম এসব নিয়ে চিন্তা করব। আপনারা স্বাধীন সেজন্যই আপনার স্বাধীনতার স্তর ঠিক করতে

উৎসাহিত।" এবার সুন্দর যুবক বলল "কিছু শিখতেও কি আপনার আপত্তি আছে?" আমি বললাম "কিছু শিখতে আমার আপত্তি নাই, আমাদের দেশকে এসব চিন্তাধারায় জড়াবেন না, সকল সময় আপনাকে মনে রাখতে হবে, কলোনিজেদ দেশগুলির স্বাধীনতা সর্বপ্রথম তারপর অন্যান্য বুলি। এসব বলিতে অনেকেরই মাথা ঠিক থাকে না। ধূর্ত শত্রু এতে আত্মগোপন করতে বেশ সুযোগ এবং সুবিধা পায়। আপনারাও ইচ্ছা করলে আওার গ্রাজুয়েট ক্লাব করতে পারেন, দেখবেন আপনাদের দেশও গঠন হচ্ছে," লোকের হাহুতাশ চলে যাবে।"

পলিটিক্স এবার বন্ধ হল। সুন্দর যুবককে নিয়ে বাইরে একটু বেড়াতে বের হলাম। কতকগুলি লোক বাইরে দাঁড়িয়ে সিদ্ধ শামুক খেয়ে শামুকের খোল ইতস্তত ছুঁড়ে ফেলছিল। তাদের দেখিয়ে দিয়ে বললাম এরূপ করে শামুক ছুঁড়ে ফেলা ভাল নয়,যে ভদ্রলোক বায়গাটি ঝাড়ু দেবেন তার ভয়ানক পরিশ্রম হবে। সুন্দর যুবক মাথা নাড়ল এবং আমাকে শামুখ-খেকোদের সামনে নিয়ে গিয়ে আমি যা বলিছি তাই তাদের বুঝিয়ে বলল। শামুখ-খেকোরা কোন কথা না বলে, শামুখ বিক্রেতার পয়সা দিয়ে চলে গেল। প্রত্যেকে কুড়ি সেন্‌তিম্ করে শামুক কিনেছিল। এক শত সেন্‌তিমে এক ফ্রাংক হয়। হিসাব করে দেখলাম এখানে শামুক খুব সস্তা। কলকাতায় এর চেয়েও বেশী দাম দিয়ে লোকে শামুখ খায়।

গ্রামে একটি বিদ্যালয় ছিল। বিদ্যালয় সকালে বসে এবং বিকালে বন্ধ থাকে। যদিও বিদ্যালয় বন্ধ ছিল তবুও বিদ্যালয়ের সামনের ছোট্ট ফাঁকা বায়গাতে, অনেকগুলি ছেলে মেয়ে খেলছিল। আমাকে দেখে কোন ছেলে মেয়ে ব্লেকী ব্লেকী চীৎকার করল না, আমার দিকে চাইলও না। উত্তর বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি স্থানে আমাকে কেউ নিগার, কেউ ব্লেকী বলে হয়রাণ করতে চেষ্টা করত। দক্ষিণ বেলজিয়াম ফ্রান্সে সেরূপ কথা কেউ আমাকে বলেনি দেখে এর কারণটি খুঁজে বার করার ইচ্ছা হয়েছিল। কারণ খুঁজে দেখেওছিলাম। এটা হল ছোট বেলার শিক্ষার দোষ। মা বাবা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সেজন্য দায়ী।

পরের দিন সকালবেলা সুন্দর মানুষটিকে সংগে নিয়ে প্যারী নগরের দিকে রওয়ানা হলাম। পথে ক্রমেই লোকসংখ্যা বেড়ে চলছিল। নানারকমের যান নানারকমের শব্দ করে চলছিল। যখন পথে মোড় ফিরছিলাম তখন লক্ষ্য করে দেখছিলাম এখানে মোড় ফিরতে ভয়ের কারণ নাই। ইউরোপের কোথাও নাই। রাজা পঞ্চম জর্জ, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট, তাঁরাও যদি পথে চলে তবুও পথে ভয়ের কারণ থাকে না। মোড় ফেরবার সময় আমি নিজের দেশের শাসক সম্প্রদায়ের কথাই ভাবছিলাম। সর্বসাধারণকে কি করে পথে চলতে হয় তা বলে দেওয়া হয় না, অথচ সর্বসাধারণকে গাড়ির নীচে পড়ে মরবার জন্য দায়ী করা হয়।

পথে চলার সময় আমি কথা বলতাম না, সেজন্য আমার সুন্দর সাথী বড়ই বিরক্ত হয়েছিল। অনেক সময় সে বলত লোকটা আপন মনে পথে চলেছে, যেন পথের দুদিকে কিছুই দেখবার নাই। আমি তার কথায় কোন প্রতিবাদ করতাম না শুধু আগিয়েই চলছিলাম। কতক্ষণ পর পথের পাশে একটি ছোট্ট রেঁস্তোরাতে গিয়ে বসলাম। এরূপ রেঁস্তোরা কলিকাতার অনেক স্থানেই দেখতে পাওয়া যায় এবং তাতে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরও সমাগম হয়, কিন্তু এদেশে অশিক্ষিত মজুরই এসব রেঁস্তোরায় গিয়ে বসে। রেঁস্তোরায় মাত্র পাঁচ খানা টেবিল ছিল। প্রত্যেক টেবিলে তিনজন বসবার জন্য তিনখানা করে চেয়ার ছিল। টেবিল ক্লথে নানারকমের ফুলের ছক মারা ছিল এবং টেবিল ক্লথগুলি পরিস্কার ছিল। কাফি তিরিশ সেন্‌তিম, রুটি দশ সেন্‌তিম, মাখন পাঁচ সেন্‌তিম দিয়ে কিনে বেশ করে খেয়ে নিলাম। ডিম এখানে ভয়ানক দাম। চল্লিশ হইতে পঁয়তাল্লিশ সেন্‌তিম করে এক একটি। আমি ডিম খেলাম না, কিন্তু আমার সুন্দর সাথী এক ফ্রাংকে তিনটা করে ডিম কিনে চার ফ্রাংকের এক ডজন ডিম খেয়ে ফেলল। তার কাছে প্রচুর টাকা ছিল। পাউণ্ড, শিলিং, ফ্রাংক, মার্ক, দিনার, করণা ইত্যাদিতে মনিব্যাগটা ভর্তি ছিল। আমরা খাবার পর বয় এসে বকসিস্ চাইল। আমার সুন্দর সাথী বয়কে দশ শিলিং বকসিস্ দিল আর আমি দিলাম দশ সেন্‌তিম; লোকটি উভয়ের দিকে বেশ করে তাকিয়ে "মঁারসি মঁসিয়ে" বলে বিদায় নিল।

আমরা আবার উঠলাম, আবার চলতে লাগলাম! এবার আমরা প্যারী নগরের কাছে আসলাম। লোকের ভিড় ক্রমেই বাড়তে লাগল। হঠাৎ আকাশ অন্ধকার করে ঝম ঝম বৃষ্টি আরম্ভ হল। আমরা নিকটস্থ কাফেতে গিয়া আশ্রয় নিলাম। সুন্দর সাথীর ইচ্ছা ছিল কাফেতে প্রবেশ করে কিছু খাব, কিন্তু বাইরে সাইকেল রেখে যেতে তারও ভয় হচ্ছিল, আমারও ভয় হচ্ছিল। এখানে সাইকেল চুরি যায়। সাইকেল চুরির ভয়ে উভয়ে বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকলাম। বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলে উভয়ে মিলে একটি বেল সেঁকুনের কাছের হোটেলে গিয়ে প্রত্যেকে দশ ফ্রাংক করে এক এক খানা রুম ভাড়া নিলাম। রুম ভাড়া দেবার পর আমার কাছে যা ছিল তা দ্বারা একবেলা খাওয়া হয়েছিল তারপর আমার কাছে যা ছিল তা সবই বিদেশী মুদ্রা। বিকালে বিদেশী মুদ্রা না বদলিয়ে ভিক্ষাতে বের হলাম। সুন্দর সাথী আমার সাহায্য করতে লাগল। উভয় মিলে ত্রিশ ফ্রাংক-এর মত চাঁদা উঠিয়ে হোটেলে ফেরবার পথে একখানা ইংলিশ দৈনিক "ডেলী টেলিগ্রাফ" কিনে নিয়ে আসলাম। বাইরে কিছুই খেলাম না। সুন্দর সাথী চল্লিশ ফ্রাংক (আট টাকা) দিয়ে এক বোতল ভিনো ওয়াইন কিনে নিয়ে আসল। ভিনোর আস্বাদ আমি পূর্বেই করেছিলাম। ভিনো খেতে মিঠা কিন্তু দেশী মদের মতই লাগে। অল্পেই নেশা করে দেয়। বিদেশে মদ খেয়ে শক্তি ক্ষয় করা পর্যটকের পক্ষে অন্যায় কাজ। সেজন্য আমার 'প্রিয় বন্ধু' সুন্দর লোকটি আমাকে যখন এক গ্লাস ভিনো এনে দিল তখন আমি সাহসের সহিত তা প্রত্যাখ্যান করলাম এবং রুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। সুন্দর বন্ধু বার বার করাঘাত করেও আমার কোন সাড়া পেলনা। আমি তখন মঁসিয়ে লাভালের মর্মবেদনার কথা মন দিয়ে পড়ছিলাম। মঁসিয়ে লাভাল বলছিলেন "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ফ্রান্সকে নাজির হাতে বিক্রি করার পূর্বে আমাদের কিছু করতেই হবে।" টেলিগ্রাফ পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পাঠ করে বুঝতে পেরেছিলাম এ পত্রিকার মালিক যেই হউন না কেন, তিনি বৃটিশ বিদ্বেষী ছিলেন না।

সংবাদপত্র পড়া হয়ে গেলে, দরজা খুলে দেখলাম আমার সুন্দর বন্ধু বেশ আরাম করে মদ খাচ্ছে আর আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আমার দরজা খোলা সে টেরও পায়নি। লোকটির মদ খাওয়া দেখে মনে হ'ল সে ভদ্রলোক, সেজন্য তার কাছে এসে বললাম। আমাকে দেখামাত্র আর এক গ্লাস মদ ঢেলে নিজেই খেল। খাবার পূর্বে বলল, "তোমার ভাল হউক" আর গ্লাসটি শেষ করে বলল, "তোমরা কি করে মদ খাবে? বৃটিশ তোমাদের ক্ষতি করেছে বলেছ, আর আমি বলব বৃটিশ তোমাদের রক্ষা করেছে, আমার মনে হয় তোমাদের পূর্বপুরুষ লোকের ব্যয় কমার জন্য মদ খেতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তোমাদের দেশে আর্থিক উন্নতি মোটেই হয়নি সেজন্য জাতও গড়ে উঠেনি। শুনেছি তোমাদের দেশে গাঁজা এবং চরস্ এ দুটি জিনিষের বেশ প্রচলন আছে। এ দুটি জিনিষই মানুষের মন খাটো করে দেয়। দরিদ্রতার লক্ষণ তোমাদের দেশে পূর্ব হতে বিকাশ পেয়েছিল সেজন্য তোমাদের সভ্যতা পাকী, তোমরা পাকী নও।" "ভেবে দেখলাম মদ খেতে হলে টাকার দরকার, সে টাকা আমার নেই, আমি ভিক্ষা করে যা এনেছি তা যদি মদ খেয়ে উড়িয়ে দেই তবে কাল খাবার কিছুই থাকবে না। যাকগে কাল যা হবার হবে, আমিও আজ মদ খাব। সুন্দর লোকটির কাছে বসে বন্ধুকে আর একটা গ্লাস আনতে বললাম। মদ খেলাম, নেশা হল তারপর শুয়ে থাকতে গেলাম। হঠাৎ মনে হল একবার শুনে আসি সুন্দর লোকটি মাতাল হয়ে কি বলে। তার রুমের দরজায় টোকা দিতেই সে দরজা খুলে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি তাকে বাইরে এসে বলতে বললাম। সে এসে বসল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম "তোমার কি নেশা হয়েছে?" সে বলল "বেশ নেশা হয়েছে।"

"এখন বলত তুমি কি ভাবতে ভালবাস?"

"আমি কি ভালবাসতে ভালবাসি জানতে চাও, একটু বস সিগারেট নিয়ে আসি তারপর বলব।"

সিগারেট নিয়ে এসে লোকটি আমার কাছে বসল তারপর আমাকে বলতে লাগল "আমার মনিব্যাগ তুমি দেখেছ। মনিব্যাগ টাকায় ভর্তি, তাতে নানা দেশের টাকা আছে। ইচ্ছা করলেই আমি গাড়িতে অথবা মোটর করে যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যেতে পারি, কিন্তু তা করি না তার কারণ

আছে। আমি প্যারী নগর বেড়াতে আসিনি, আমার এখানে কাজ আছে। আমি সরকারী চাকর নই, আমি ব্যবসায়ীও নই, আমি তোমারই মত একজন পর্যটক, আমার মনের বাসনা কি করে পূরণ হয় তারই কথা আমি মদ খেয়ে ভাবি। আমার বয়স এই উনিশ হবে। আমার বাবা তোমারই বয়সের লোক, কিন্তু তাঁর কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আমি পথে বেরিয়ে পড়েছি। যখনই আমি মদ খাই তখনই আমি আমার বাবার অসম্পূর্ণ কাজ কি করে সম্পূর্ণ হয় তারই কথা ভাবি। আমাকে তোমার তোলা উচিত নয়, আমি তোমাকে ব্লেসড্‌সে ঠকাতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পারিনি। তোমার সে কোট-টা কোথায় ফেলে এলে? এটা ত নতুন কোট দেখছি। তোমার সংগে আমি অনেক দিন ধরে আছি, তুমি আমাকে মোটেই চিনতে পারনি। মনে রেখ যদিও আমার বয়স উনিশ বৎসর মাত্র, তবুও আমি তোমার চেয়ে বড়, তোমরা পিতার অসম্পূর্ণ কাজ করতে ভালবাস না আর আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের অসম্পূর্ণ কাজ করতে ভালবাসি। এখন গিয়ে শুয়ে থাক, কাল আমরা সেলভে-ত্থ'-সেসুই গিয়ে আস্তানা গাড়ব।"

ক্রমশঃ

ভুলভাঙ্গা

শ্রীসৌম্যেন গাঙ্গুলী

শান্তির সে পাত্র মোর পরিপূর্ণ হয়েছে আজিকে
বেদনার উগ্ররসে—আকুলিত হ'ল তাই প্রাণ;
মনে হ'ল এ বিরাট বিশ্বখানি অকস্মাৎ যেন
নিঃস্ব হয়ে গেল; বারে বারে যাহা চাই তার কাছে
আপনার বাসনা পুরাতে—আর পাই নাকো কিছু।
ভাবিলাম—চিরদিন চাহিয়াছি শুধু বাহিরের
রিক্ততার কাছে এই জীবনের অর্থহীন সুখ
কামনার চক্রজালে, শূন্যতার এ দানের বোঝা
বাড়ায়েছি দিনে দিনে,—অন্তরের পূর্ণতার কাছে
কোনদিন চাহি নাই কিছু;

আজ তাই দুর্বিসহ
যাতনার নির্মম ইঙ্গিতে চিনিলাম অন্তরের
পরম পুরুষে; কহিলাম তাঁরে—"ওগো অনাদৃত,
বিধাতা আমার, ক্ষমা কর মোরে, মুক্ত করে দাও
মোর এ কপট আনন্দের ভার হতে, এনে দাও
পরিপূর্ণ প্রাণের চেতনা; সুকঠোর বেদনার
উচ্ছ্বাস-উল্লাসে মোর জীবনের পূর্ণ সার্থকতা।"

তেরশ' বায়ান্ন—নানা বাধাবিপত্তিকে জয় করে' বন্ধুজনের সাহায্য ও সহানুভূতিকে মাথায় নিয়ে 'মন্বিরা' আজ তার অষ্টম জন্মতিথিতে বরণ করেছে। সাহায্য ও সহানুভূতি যেমন তার চলার পথকে সুগম করেছে, বাধা ও বিঘ্ন তেমনি তার শক্তি সঞ্চয়ের কারণ হয়েছে। সুতরাং এই উভয়কেই আজ আমরা মাথায় তুলে নিয়েছি ;—দুঃখদহনের মধ্য দিয়েই যেন আমরা সকল বাধা, সকল ভয়, সকল বিপদকে জয় করতে শিখি।

পরাধীন দেশে রাজনীতি চর্চা, বিশেষ করে' সর্ববিধ অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য প্রচার কার্য, বিদেশী রাজশক্তি কখনও ক্ষমার চক্ষে দেখতে পারে না। "মন্বিরা"র কর্ণধারদের অধিকাংশই আজ তাই বিনাবিচারে কারা-প্রকোষ্ঠের অন্তরালে তাঁদের দেশসেবার পুরস্কার অর্জন করছেন। আজ আমরা তাঁদের স্মরণ করছি—আমরা জানি যে তাঁদের এই দুঃখব্রত নিরর্থক হবে না, হয়নি, হতে পারে না।

১৯৪২-এ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যে গণ-বিক্ষোভ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে সমগ্র দেশকে উদ্বেল করে' তুলেছিল, শাসকশক্তি তাকে বিস্মৃত হয় নি। 'ইতিহাস শিক্ষা দেয় যে সে কিছুই শেখাতে পারে না' এই প্রবচনকে সার্থক করে' রাজশক্তি এখনও তার স্বার্থান্ধ পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেজন্যই ভারতীয় গণমনের একমাত্র প্রতিনিধি কংগ্রেস আজও কারান্তরালে দিন যাপন করছে। একদিকে গণতন্ত্রের মুক্তি প্রচেষ্টায় বিশ্বময় বিপুল নরমেধযজ্ঞ অপরদিকে গণতন্ত্রের অগ্রদূতগণ গণতন্ত্রের তথাকথিত পুরোহিতগণ কর্তৃক স্বাধীনতা হ'তে বঞ্চিত! কথা ও কার্যের এই বিরোধিতার মধ্যেই আমরা আশার বাণী শুনতে পাচ্ছি। আমরা জানি আমাদের এই দুঃখদহনের অন্তরালেই মুক্তির দূত দাঁড়িয়ে আছে।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট—প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যু যেমনই অপ্রত্যাশিত তেমনি আকস্মিক। তাঁর মৃত্যুতে ইংরেজজাতি এমন একজন সুহৃদ হারিয়েছে যার স্থান পূরণ সহজে সম্ভবপর হবে না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে রুজভেল্ট চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মন্দা বাজারের আক্রমণে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ-জীবন যখন বিপর্যস্ত সে-সময় তিনি তাঁর New Deal নিয়ে শ্রমিক ও ধনীর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনতে অশেষ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য ইওরোপের সমস্ত রাষ্ট্রশক্তির নিকট নিজের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি পাঠিয়ে একটা আপোষ-রফা করবার চেষ্টা করেছিলেন। চক্রশক্তি যে গণতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে একটা পৃথিবীব্যাপী সংগ্রাম করবে যা' ইওরোপের সীমা অতিক্রম করে' এশিয়া ও আমেরিকা পর্যন্ত ব্যাপ্ত হবে এটা তিনি পূর্বাহ্নেই বুঝেছিলেন এবং সেজন্যেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তার ইওরোপীয় মিত্রশক্তিগুলি যুদ্ধের পর খারাপ ব্যবহার করলেও কেবল গণতন্ত্রবাদ রক্ষার জন্য তিনি এবার নাৎসি শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতরণ করতে তাঁর দেশ ও জাতিকে প্ররোচিত করেছিলেন। তাঁর নায়কতায় ইওরোপীয় সভ্যতায় সন্দিগ্ধ যুক্তরাষ্ট্র Cash and Carry নীতি হ'তে Lease and Lend নীতিতে সম্মত হয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনশক্তি এমন এক বিস্ময়কর প্রাচুর্য লাভ করেছে যা দুটি মহাদেশে রণসম্ভার কুবেরের অক্ষয় ভাণ্ডারের মত সরবরাহ করেও এতটুকু হ্রাস পায় নাই। হয়ত আন্তর্জাতিক কূটনীতির জালে যুদ্ধোত্তর বিশ্বশান্তি সংগঠনে তাঁর যে পরিকল্পনা ছিল তা' সিদ্ধ হবে না, কিন্তু বিশ্বের নিপীড়িত জাতিমণ্ডলী তাঁর Atlantic Charterকে তাঁর মহদিচ্ছার পরিচায়ক বলে স্মরণ করবে। পরিণত বয়সে

পল শান্তস্বভাব চিন্তাশীল যুবক এবং তখনও সে পড়াশোনা করছে। অবসর সময়ে সে শিক্ষক—সে আদর্শে হোপ অনুপ্রাণিত—পলও সেই আদর্শ নিয়ে অবহেলিত দরিদ্রদের লেখাপড়া শেখায়।

একই আদর্শ এবং বিপদের ভয়ও একই রকম। কারণ জনসাধারণের মধ্যে চেতনা জাগানো, সমাজে তারা কে, কী তাদের ক্ষমতা—এসব কথা ভাবতে শেখানো বা বলা রাশিয়ায় তখন বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল। এই একই কাজের ভেতর দিয়ে তাদের পরস্পরের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে যে তারই ফলে পল প্যাভলফ আরও ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের আশায় মধুর স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়েছিল।

প্যাভলফ কতবার ভেবে দেখেছে—এ স্বপ্ন নিছক স্বপ্ন-মাত্র, তবু সে এই স্বপ্নের ঘোর কাটাতে পারে নি। কারণ, এই যেন তার জীবনের উজ্জ্বল আলো, গৌরবের নিদর্শন—এ যেন অন্ধকারের বুকে আলোর প্রবেশ—যা না হলে পুরুষের জীবন পরিপূর্ণতায় সার্থক হয় না।

এই সময়ে মাঝে এসে দাঁড়াল মার্জ পালমা। বিত্তশালী পিতার একমাত্র সন্তান—সামন্ত রাজবংশের একমাত্র বংশধর। পল প্যাভলফও বংশগৌরবে কম নয়—ইচ্ছে করলে সে পারিবারিক উপাধিও ব্যবহার করতে পারে কিন্তু সে বুদ্ধিমান—তাই আভিজাত্যকে বরাবর এড়িয়ে চলে। পিতার মৃত্যুর পর মার্জ পালমা হল বিশাল সম্পত্তির মালিক।

এক বন্ধুর গৃহে হঠাৎ হোপ ইভানোভনার সঙ্গে মার্জের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। ইভানোভনার অপূর্ব সৌন্দর্য, অসামান্য বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ় চরিত্রবল লক্ষ্য করে সে মুগ্ধ হয়। এবং নানাসূত্রে তাদের পরিচয় ঘটে। কিন্তু হোপের জীবনের আদর্শ সাংসারিক ভোগ-লালসার বহু উপরে এবং যে আদর্শ তার জীবনের মূলমন্ত্র—তারই সফলতার জন্যে সর্বস্বপণ হয়ে সে আজ মেনে নিল বিবাহিত জীবন।

"চিত্রা"র কবি

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য

কুমারসম্ভবের কবি লিখিয়াছেন—মহাদেবের ধ্যান ভাঙিতে মদন যেদিন আসিয়াছিল সেদিন সমগ্র কৈলাসভূমি বসন্তের কল্লোলে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, ফুলের সোহাগ সুধাপানে মত্ত ভ্রমরযুগলকে সে যেমন বেহাই দেয় নাই, কবিভূমির প্রতিটি প্রাণী তরুলতাও তেমনি রতির কটাক্ষপাতে মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল: রবীন্দ্রনাথের চিত্ত ভুলবনেও বিজয়ী বসন্ত তাহার রেখাপাত করিতে ছাড়ে নাই। সারা দ্যুলোক ভূলোক যৌবন চঞ্চল করিয়া সে আসিয়াছিল। ছায়াঘন পল্লবশয়নে বাতাস তাহার ভাষা হারাইয়াছিল। অকম্পিত চম্পকের ডালে মুগ্ধ কপোত দম্পতি নিভৃত কূজনে বিজয়ী বসন্তকে অভিনন্দিত করিয়াছিল।

জীবনের এমনই একটি বসন্তে প্রেমের স্বর্গে কবির অভিষেক হইয়াছে। কবি সেদিন নিসর্গলালিত্য আর মানব প্রীতির মাঝে আপনার মানসলোক সম্পূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কবির হৃদয়াবেগ সেদিন বিশ্ববীণার ঐকতানকে বুঝিতে শিখে নাই। একটি খণ্ড সুরের মাঝে কবির অনুভূতি এবং মানস আপনাকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছে। সেদিন এই খণ্ডসুরই তাহার কাছে সব হইয়া উঠিয়াছিল, এই খণ্ডকেই কবি তাহার কল্পনা ও অনুভূতি দিয়া সম্পূর্ণ করিয়া দেখিতে চাহিয়াছিলেন। সুদূরান্তর হইতে দেশবিদেশের ভাষা আসিয়া কবির কামনার বেদীমূল হইতে ফিরিয়া গিয়াছে, দিবসের কলকল্লোলে নিশীথের মৌনবীণায় যুগযুগান্তরের কথা কেবল অস্পষ্ট স্মৃতির মতই ভাসিয়া আসিয়াছে, হৃদয়মর্মরে কোন প্রতিধ্বনিই তুলিতে পারে নাই। প্রেমের অমরলোকই কবির কাছে জীবনের সম্পূর্ণ অনুভূতি বলিয়া মনে হইয়াছে।

এই খণ্ড মানবপ্রেমের মধ্য দিয়া কবি বহুদূর আগাইয়া গিয়াছিলেন। ধরণীর যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া কবির কল্পনা সেদিন যে সুখস্বর্গলোকের সন্ধান পাইয়াছিল, সে স্বর্গলোকের

নিরবচ্ছিন্ন সুখ নিরবসন্ন শান্তি হৃদিনীনে উদাসীন প্রকৃতি কবিকে বারম্বার নিপীড়িত করিয়াছে, কবির কল্পনালোক কোমল নিবির ধাপে, নিঃস্বসিত নন্দন কাননে আর একটি প্রেমরাষ্ট্র পাশাপাশি সংঘটিত হইয়া উঠিয়াছে। স্বর্গ হইতে বিদায়ের দিনে যেদিন কবির কণ্ঠে মন্দারমালিকা ম্লান হইয়া আসিল সেদিন জানা গেল কবির এই দ্বিতীয় এবং অদ্বিতীয় প্রেমলোক—

মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে
সে যে মাতৃভূমি, তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রু জলধারা।

জানা গেল এই মর্ত্যভূমির এক কোণে নদী তীরে কোন এক গ্রাম প্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটিরে, অশ্বত্থচ্ছায়ায় কবির মানস-সুন্দরী তাঁহার জন্য এই সুখদুঃখ অনন্তমিশ্রিত অশ্রুজলে চিরকাল ভূতলের স্বর্গ খণ্ডগুলি আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাই কবির "প্রেমের অভিষেক" আর "স্বর্গ হইতে বিদায়" কবিতার মূল বিষয় বস্তু।

কবির এই প্রেমস্বর্গ যে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ অন্ততঃ কবির কাছে ইহাকে একদিন সম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে সে কথা কবি আমাদের বলিয়াছেন। সেখানে যে অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই আমরা তাহা জানি।

সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে নাহি পায় পথ
সে অন্তর অন্তঃপুরে।

"স্বর্গ হইতে বিদায়" এবং "প্রেমের অভিষেক" এই দুইটি কবিতা পাশাপাশি রাখিলে দুইটি পৃথক প্রেমজগৎ চোখে পড়ে। একটি স্বর্গের আর একটি মাটির। "স্বর্গে কেবলমাত্র আনন্দ, তাহার মধ্যে কোথাও কোন দুঃখের ছায়ামাত্র পড়ে না। সে আনন্দ যে পৃথিবীর আনন্দ নহে, পৃথিবীর ইহাই গৌরব—মানবজীবনের ইহাই গৌরব। পৃথিবীতে যে আমাদের সবই হারাইতে হয়, সেইজন্যই আমাদের এখানকার প্রেম, এখানকার আনন্দ এত নিবিড়—স্বর্গের লক্ষ লক্ষ বৎসর চক্ষের পলকটুকুর মতও নহে, কারণ সেখানে কোন বৈচিত্র্য নাই, কিন্তু আমাদের পৃথিবীর জীবনের মধ্যে প্রতিমুহূর্তের দেখা-শোনা, কথা-বার্তা, মেলা-মেশা যেখানময় প্রেমের দ্বারা কী নিবিড় রহস্যময়। তাই—

স্বর্গে তব রহক অমৃত
মর্ত্যে থাক সুখদুঃখ অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা,—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি'
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।"

আমার মনে হয় জগতে আমাদের আপনার বলিতে যাহা কিছু তাহাই যে হারাইতে হয় এবং এই পাওয়া ও হারানোর মধ্য দিয়াই বেদনার রসে গোপনে গোপনে যে আমাদের এই মর্ত্যভূমি এত নিবিড় এবং সুন্দর হইয়া ওঠে একথা কবি পূর্ব হইতেই জানিতেন। কিন্তু তথাপি এই খণ্ড মানবপ্রীতিকে সম্পূর্ণ বলিয়া ধরিয়া লইবার ফলে তাহার আপনার অজ্ঞাতসারেই পাশাপাশি একটা নিষ্কলুষ, নিষ্পলক স্বর্গলোক গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং স্বর্গ হইতে বিদায় লইবার আগে আমরা একথা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কবি যেদিন তাহাকে বিদায় দিয়া মর্ত্যের স্বর্গলোক অখণ্ড করিয়া গড়িয়া তুলিলেন কেবল সেদিনমাত্র আমরা একথা বুঝিতে পারিলাম।

কিন্তু এই যে আপাত স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি জগৎ ইহা কী কবিজীবনের সর্বানুভূতির খোরাক জোগাইতে পারে? জগতের মাঝে এই যে বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতি, যাহার মুখর দুপুরে সুদূর আকাশ থমকিয়া হইয়া উঠে, যাহার কুন্দলগন্ধে মৃদুবাতাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে, যাহার মোহনৃত্য চিত্তে চিত্তে মঞ্জুলরাগিনী বাজিয়া উঠে, বর্ণে বর্ণে অঙ্কিত, ছন্দে ছন্দে লিখিত, সঙ্গীতে সঙ্গীতে মুখরিত এই যে চঞ্চলগামিনী বিচিত্রা কবির সর্বানুভূতি কী সব কিছু ভুলিয়া কেবল একটি মাত্র খণ্ডের মাঝে আপনাকে আটকাইয়া রাখিতে পারে? এই বৈচিত্র্যময়ীকে আপনার অন্তরে অন্তরে একটি অখণ্ডরূপে অনুভব না করিলে কবির সর্বানুভূতির তৃপ্ত হইবে কিরূপে?

পদ্মার তীরে একদিন মেঘমুক্ত আকাশে আর সুন্দর বাতাসে কবি নিসর্গের এই বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ স্বচ্ছতম নীলাভের নির্মল বিস্তারে এই নিসর্গ বৈচিত্র্য একাকার হইয়া গিয়াছিল। জলে স্থলে বনে বিচিত্র বর্ণের রেখা পড়িয়া একটা একটানা কল্পলোকের সৃষ্টি হইয়াছিল তীর-উপবন হ'তে আম্রমুকুলের গন্ধ এই সম্পূর্ণতার বার্তা

বহিয়া আনিত, বিহঙ্গের শ্রান্ত কাকলীতে একটি ঐক্যতান বাজিয়া উঠিত। কবির মনে হইত বুঝি,

বিশ্ববীণা হ'তে উঠি গানের মতন
রেখেছে নিমগ্ন করি নিখর গগন।

পূর্ণিমা কবিতার মাঝেও সেই একই কথার প্রতিধ্বনি আছে। একদিন বোটে বসিয়া বাতি জ্বালাইয়া সঙ্গীহীন প্রবাসের শূন্য সন্ধ্যাবেলা পরিপূর্ণ করিতে কবি ডাউডেন সাহেবের সমালোচনা পড়িতেছিলেন। পড়িতে পড়িতে রাত অনেক হইল এবং হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল অবশেষে ত্যক্ত হইয়া বইখানা ধপ করিয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া কবি যেমনই বাতি নিভাইয়া দিলেন অমনি চারিদিকে মুক্ত জানালা দিয়া এক মুহূর্তে অনন্ত আকাশভরা পূর্ণিমা বোট পরিপূর্ণ করিয়া নিঃশব্দ উচ্চহাস্যে সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল। যখন সমস্ত আকাশে সৌন্দর্য আপনি আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে তখন বাতি জ্বালাইয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাউডেনের পুঁথি হইতে সৌন্দর্যতত্ত্ব খুঁটিয়া খুঁটিয়া উদ্ধার করার দুশ্চেষ্টা অত্যন্ত হাস্যজনক—পৃথিবীর প্রান্তে একটা বোটের ভিতর একটি ক্ষুদ্র মানবের এই অদ্ভুত আচরণে অনন্ত আকাশ হইতে এত বড় একটা সুমিষ্ট পরিহাস অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে কবির পৃষ্ঠে আসিয়া সস্নেহে আঘাত করিল ইহাতে তিনি চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। 'চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীলোক পর্যন্ত কতখানি জ্যোৎস্না অথচ টেবিলের উপরে একটি বাতির শিখা সমস্ত লুপ্ত করিয়া দিয়াছিল—অনন্ত নক্ষত্রলোক হইতে এই নিস্তরঙ্গ নদীতলি পর্যন্ত কী পরিপূর্ণ অসীম নিঃশব্দতা অথচ কানের কাছে ডাউডেন সাহেবের এই অকিঞ্চিৎকর বিতর্কে অন্তহীন আকাশের বিশ্বজোড়া নীরবতা একেবারে অগোচর হইয়া গিয়াছিল।' এই অনন্ত আকাশভরা জ্যোৎস্নার মাঝে যে বিশ্বব্যাপী বৈচিত্র্যের ঐক্যতান বাজিয়াছিল কবি তাহার পূর্ণিমা কবিতার মাঝে সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

কবির সর্বানুভূতি খণ্ডের মাঝে তৃপ্ত হইতে পারে নাই, খণ্ডের বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া সে আপনার মত আবেগে অখণ্ডকে অনুভব করিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে। ধরনিমুখর ধরণীর বক্ষলগ্ন এইদিনগুলিই কবিকে অখণ্ড সাধনার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। এই ধরণীর বৈচিত্র্যের মাঝেই সেই সম্পূর্ণ সত্তার অনুভূতি রহিয়াছে। এই সমস্ত খণ্ডকে, বৈচিত্র্যকে, অসম্পূর্ণকে যখন সেই পরিপূর্ণ সমগ্রের মাঝে অখণ্ড করিয়া অনুভব করা যায় তখন স্পষ্টই বুঝা যায় যে এই সমস্ত অখণ্ড এক জায়গায় মিলিত হইয়াছে, এই সমস্ত ভাঙাচোরা এক-জায়গায় অক্ষত সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। এই বৈচিত্র্য এবং একত্বের পাশাপাশি অবস্থান উপনিষদের মতে একই বৃক্ষে নিষণ্ণ দুইটি পক্ষীর মত। বিচিত্রতা এবং একাকীতার কথাই চিত্রার কথা আবার এই কথাই বিশ্বজগতের মাঝে বারম্বার প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে এই অখণ্ডই রূপে রূপে খণ্ডের মাঝে প্রকাশিত হইয়াছে অথচ অখণ্ডকে বাদ দিলে খণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অনুভব করিবার পথে কোন বাধা নাই।

পরম দেবতার পূজা যুগসত্তায় মিলে, এক সত্তায় ভিতর হইতে আদর্শের প্রেরণা আর এক সত্তায় বাহিরের কর্মযোগে তাহার প্রকাশ। সংসারে এই দুই সত্তার বিরোধ সর্বদাই ঘটে, নিজের অন্তরে পূর্ণতার যে অনুশাসন মানুষ গূঢ়ভাবে বহন করিতেছে তাহার সম্পূর্ণ প্রতিবাদে জীবন ব্যর্থ হইয়াছে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এই দুই সত্তার মিলন প্রচেষ্টা কবি স্পষ্টই দেখিতে পাইয়াছিলেন। যে সত্তার প্রকাশ বহির্বিশ্বলোকে সে বৈচিত্র্যময়ী, অন্তরে যাহার প্রকাশ সে একা। কবির কাব্যে এই দুইধারাই কখনও পৃথক হইয়া চলে আবার কখনও যুগ্ম হইয়া সম্মিলিত ঐক্যতানের সৃষ্টি করে।

"এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় কর্মজীবনের বিচিত্রতার ডাক পড়িয়াছে। শতাব্দীর বেদনায় অনুরঞ্জিত মানবাত্মাকে আশ্বাসের বাণী জোগাইতে হইবে—

মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা;

এই কর্মজীবনের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াই যাত্রী মানুষের দল যুগযুগান্তর ধরিয়া অখণ্ডের পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই

অখণ্ডের ভাকই ত এই বিশ্বভুবনকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। কবি জানেন,

তাহার মহান
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্র সমীরে,
তাহার অরুণ প্রাণ লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে,
তারি বিশ্ববিমোহিনী পরিপূর্ণ প্রেমমূর্তিখানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জন মুখে।

তাই ত 'মৃত্যুর পরে' যখনই প্রশ্ন জাগে

কেন এই আনাগোনা কেন মিছে দেখাশোনা
দুদিনের তরে,
কেন বুকভরা আশা কেন এত ভালবাসা,
অন্তরে অন্তরে।
আয়ু যার এতটুক এত দুঃখ এত সুখ
কেন তার মাঝে—
অকস্মাৎ এ সংসারে কে বাঁধিয়া দিল তারে
শত লক্ষ কাজে।

তখনই সন্দেহ হয়,

হেথায় কে অসম্পূর্ণ সহস্র আঘাতে চূর্ণ
বিদীর্ণ বিকৃতি,
কোথাও কি একবার সম্পূর্ণতা আছে তার
জীবিত কি মৃত।
জীবনে যা প্রতিদিন ছিল মিথ্যা অর্থহীন
ছিন্ন ছড়াছড়ি
মৃত্যু কি তরিয়া সাজি তারে গাঁথিয়াছে আজি
অর্থপূর্ণ করি।
হেথা যারে মনে হয় শুধু বিফলতাময়
অনিত্য চঞ্চল,
সেথায় কি চুপে চুপে অপূর্ব নূতনরূপে
হয় সে সফল।

জীবনের সমস্ত অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়াই সেই সম্পূর্ণতার চিরন্তনী দ্যুতি প্রজ্বলিত হইয়া চলিয়াছে। এই ক্ষণিক জীবনের সমস্ত বিফলতাই সেই চিরন্তন জীবনের মাঝে অখণ্ড নূতন রূপে সফল হইয়া উঠে, সমস্ত কালিমা গ্লানি সেই অক্ষয়তার পাদপদ্মে জ্যোতির্ময়ী উজ্জ্বলোর সৃষ্টি করে।

'সাধনা' এবং 'আবেদন' কবিতার মাঝে কবি জীবন দর্শনের এই তথ্যই মানিয়া লইয়াছেন। ভাঙিয়া চুরিয়া কবির সমস্ত সাধনা যে বিফল হইয়া গিয়াছে, সঙ্গীতের তার কে সুরহীন হইয়া গেছে তবুও কবির অকৃতকার্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,—কবির বিফল বাসনারাশি সেই শাশ্বত জীবন প্রবাহের মাঝে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

"আমাদের চেতনার প্রবাহ জাগরণ সুষুপ্তির জোয়ার ভাঁটার মধ্য দিয়া আমাদিগকে গানের মত একবার অহংবোধের খণ্ড চেতনার বিচিত্র তানের মধ্যে ছাড়িয়া দিতেছে এবং আর একবার সমস্ত বিচিত্রতার সমাপ্তি বিশ্বচৈতন্যের অখণ্ড সমের মধ্যে বিলীন করিতেছে। এই ভেদাভেদের ছন্দেই মুহূর্তে বিশ্বসঙ্গীত রচিত হইয়া উঠিতেছে।" আমাদের সমস্ত কল্পনা এবং মানস এই ধরণীর নীলাকাশ, আলো, এই ধরণীর জনপূর্ণ লোকালয়, নিঃশব্দ অরুণোদয়, অবনতমুখী সন্ধ্যা—সমস্ত খণ্ডতার মধ্য দিয়াই খণ্ডতাকে পরিহার করিয়া তুমার সঙ্গে যুক্ত হইতে চাহিতেছে। মনে হয় আমাদের মধ্যে যে সুখদুঃখ অনুভব করিতেছে সে একজন আর একজন আমাদেরই সুখদুঃখের সারাংশ গ্রহণ করিয়া সমস্ত জীবনের বিখণ্ডিত বিচ্ছিন্ন সুরগুলিকে লইয়া একটি অখণ্ড রাগিনী গড়িয়া তুলিতেছে। "আমাদের জীবনের মধ্যে এই দ্বিতীয় জীবন,এই অন্তরতম জীবনকে কী কোন শুভমুহূর্তে আমরা অনুভব করি নাই?" সুখদুঃখের লক্ষধারায় দলিত. দ্রাক্ষার মত নিষ্ঠুর পীড়নে আমাদের হৃদয় নিঙড়াইয়া যে অন্তরতর গভীর রসবোধটি গড়িয়া উঠিতেছে, বর্ণে গন্ধে, ছন্দে রাগিণীতে, বাসনার সমস্ত সোনা গলাইয়া যে অন্তরতম জীবন দেবতার নিত্যনবীন মূর্তি রচিত হইয়া উঠিতেছে তাহাকে ঘিরিয়া যদি আমাদের জীবনের গভীরতম প্রশ্নগুলি জাগিয়া উঠে, তাহাতে কী বলিবার আছে। কবির 'জীবনদেবতা' শীর্ষক কবিতাগুলিতে এ সন্দেহের কথাই ধ্বনিত হইয়াছে

ওগো অন্তরতম
মিটেছে কি তব সকল পিয়াস
আমি অন্তরে মম?

এক একবার আশঙ্কা হয় এজীবনে যাহা কিছু ছিল সমস্তই বুঝি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু জীবন দেবতার এই লীলার কি এই জীবনেই আরম্ভ? যুগযুগান্তের ধরিয়া, জীবন পরাম্পরায়, জনম হইতে জনমে, মরণ হইতে মরণে এই খেলা চলিতেছে, আমাদের এই ক্ষণিক জীবনের অর্ঘ বিপুলতর হইয়া অখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হইতেছে। তাই আমাদের জীবনের সমস্ত সুরে খণ্ড খণ্ড অনুভূতি আর বহিঃপ্রকাশের মধ্যে জীবনদেবতা তার নিত্যবাণীর অখণ্ড সুর মিশাইয়া দিতেছেন। কবির "অন্তর্যামী" কবিতায় জীবন দেবতাকে ঠিক এই প্রশ্নই করা হইতেছে।

'রাত্রে এবং প্রভাতে' কবিতায় জীবন দেবতার এই রূপকে অনুভব করা হইয়াছে। প্রভাতে কবি যে শুভ্রবাসনা দেবীমূর্তি দেখিয়াছেন রজনীর কামনার কোন ছাপ সে ধরিয়া রাখে নাই, কিন্তু তবু সে যে গত রজনীর সুধার পেয়ালা যোগাইয়াছিল একথা অস্বীকার করা চলেনা। কামনার নাগপাশে যাহাকে গতরাত্রে ফেনিলোচ্ছল করিয়া তোলা হইয়াছে প্রভাতের নির্জন নদীতীরে দূরে দাঁড়াইয়া তাহাকেই যে সলজ্জ প্রণতি জানাইতে হইবে, জীবন হইতে মৃত্যু পর্যন্ত এই বিপুল খণ্ডতার মাঝে যে সেই তুমার স্বপ্ন জাগরূক হইয়া উঠিবে—রবীন্দ্র-দর্শনের ইহাই মূল তথ্য।

তাই কবির যে প্রিয়তমার পদপ্রান্তে মদন তাহার তূণ শূন্য করিয়া পূজা উপচার অর্পণ করিয়াছে, তাহারই হিল্লোলে বিশ্বের কামনার পাত্রটি যদি উচ্ছল হইয়া উঠে, তাহারই 'সৌন্দর্যকে সমস্ত মানব সম্বন্ধের বিকাশ হইতে, সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে দূরে' বিশুদ্ধতার এবং অখণ্ডতাকে উপলব্ধি করিবার প্রচেষ্টা যদি ভোগপ্রবৃত্তির মোহাবেশ মিশিয়া বেদনাতুর হইয়া উঠে—সমালোচকের দৃষ্টিতে হয়ত ইহা বড়ই দৃষ্টিকটু লাগিবে, কিন্তু কবির দিক হইতে ইহার যথেষ্ট কৈফিয়ৎ দিবার আছে। তাই উর্বশী কবিতায় যেখানে সৌন্দর্যের ভাব-রূপ উপলব্ধি করা হইয়াছে, যেখানে সৌন্দর্যকে সমস্ত প্রয়োজনের বাহিরে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি সত্তা বলা হইয়াছে, সেখানেও যদি ধরাতলের সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসে আকাশ কাঁদিয়া উঠে—তাহাকে একান্ত স্বাভাবিক বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাই,—

"অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘু ভার"—

স্বর্গের নন্দন গন্ধ বহিয়া আনিলেও,

"অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চির আত্মহারা
নীচে রক্ত ধারা—"

একান্ত রূপেই মর্ত্যের কাব্য। জীবনদর্শনের এই তথ্যই কবির চিত্রা কাব্যগ্রন্থের মূল কথা।

উপনিবেশের ভবিষ্যৎ

শ্রীঅন্তেবাসী

ইওরোপ ও আমেরিকার ধনিকতন্ত্রপ্রধান সমাজ বর্তমানে এক জীবনমরণ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ইওরোপে বৃটেন, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি আফ্রিকা ও এসিয়ার অশ্বেত জাতিগুলিকে শোষণ করিয়া যে সমৃদ্ধি আহরণ করিয়াছে আজ তাহাদের অর্থনীতির সেই ভিত্তিমূল সুতীব্র ভাবে আক্রান্ত হইয়াছে। জার্মানী, ইতালি ওজাপান পৃথিবীর শক্তিমান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে 'Have-not' বা বিত্তহীন আর বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, যুক্তরাষ্ট্র ইহারা 'Haves' বা বিত্তবান্ রাষ্ট্র। জার্মানী, ইতালী ও জাপান তাহাদের ক্রম-বর্ধমান জনসংখ্যা ও শিল্প প্রসারের জন্য উপনিবেশ চায় যেখানকার কাঁচামাল তাহারা সুলভে সংগ্রহ করিয়া অধিকতর মূল্যে সেখানেই তাহাদের শিল্পদ্রব্য বেচিতে পারে। কিন্তু বিত্তবান্ রাষ্ট্রগুলি পূর্বাহ্ণেই পৃথিবীর সমস্ত কাঁচামাল উৎপাদক দেশগুলিতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে এবং সেখানে কোনো রকম হস্তক্ষেপ ইহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত নয়। জার্মানী ১৯১৪ সনে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছিল-কিন্তু বিত্তবানদের বিপুল শক্তিকে পরাজিত করিতে সে সমর্থ হয় নাই। সে যুদ্ধের পর জার্মানী যাহাতে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিতে না পারে সেজন্য বিজেতারা নানারূপ আটঘাট বাঁধিয়া-

ছিল কিন্তু নিজেদের পারস্পরিক ঈর্ষা ও লোভের ফলে "পৃথিবীর বুক হইতে যুদ্ধ শেষ করিবার জন্য যে যুদ্ধ হইয়াছিল" সেই প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধই বর্তমান যুদ্ধকে টানিয়া আনিয়াছে।

বর্তমান যুদ্ধও আসলে বিত্তহীন ও বিত্তবান্ রাষ্ট্রের সংগ্রাম। বিগত যুদ্ধে ইতালি ইংরেজ-মিত্রপক্ষে যোগ দিয়াছিল কারণ সে তাহার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বৃদ্ধি সম্বন্ধে একটা গোপন আশ্বাস পাইয়াছিল। কিন্তু ভার্সাই সন্ধির সময় সে দেখিল যে তাহারা বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করিবার জন্য কাইজারের বিরুদ্ধে 'সন্ধিপত্র ছিন্নকারী' বলিয়া বিরাট প্রচার কার্য চালাইয়াছিল তাহারাই ভার্সাইর প্রাসাদ কক্ষে নিজেদের প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইতে বিধা করে নাই। ইতালির রাজনীতির ধারা তখন হইতে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল; সে বুঝিল যে গণতন্ত্রবাদের ধুয়া ধরিয়া তাহাকে অগ্রসর হইলে চলিবে না। সমাজের সমস্ত শক্তিকে একনায়কত্বের অধীনে আনিয়া সামরিক শক্তিতে স্বপ্রতিষ্ঠ না হইলে বিত্তবান রাষ্ট্রের সঙ্গে এক সামাজিক পঙ্‌ক্তিতে আসন সে পাইবে না। ইহার ফলে ইতালির সমাজ জীবনে রাষ্ট্রনীতি এক নূতন ধারায় প্রবাহিত হইল; ইহার স্রষ্টা মুসোলিনি। জার্মানীও ভার্সাই সন্ধি সর্তের অক্টোপাশবন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করিতে করিতে নাৎসিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইতে চাহিল। মুসোলিনির ফ্যাসিবাদ, হিটলারের নাৎসিবাদ উভয়ই বৃটেনের ধনিকতন্ত্রবাদের চরম মূর্তি। সেজন্যই হিটলার ও মুসোলিনির আবির্ভাবকে ইংরেজ শাসকতন্ত্র স্বদেশে ও বিদেশে ক্রমবর্ধমান সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বরণ করিয়া নিয়াছিল। মুসোলিনির অ্যাবিসিনিয়া অভিযানে ইংরেজ সরকার কোনো আপত্তি করেন নাই, যদিও অ্যাবিসিনিয়া ইংরেজ-প্রস্তাবিত রাষ্ট্র-সংঘের সদস্য ছিল। ওদিকে ভার্সাই সন্ধি সর্তের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এবং ইঙ্গ-ফরাসী সন্ধি সর্তকে লংঘন করিয়া ইংরেজ সরকার হিটলারের সহিত এক নৌ-চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। বস্তুতঃ বহু বিচক্ষণ রাজনীতিকের মতে ইংরেজ শাসকসম্প্রদায়ের প্রচ্ছন্ন নাৎসিবাদ প্রীতিই হিটলারকে ইওরোপ-জয়ে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। এবং তাহাদের নৈতিক সাহায্য ও সহানুভূতির ফলে মুসোলিনির ক্রীড়নক জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র শক্তিকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হয়।

১৯১৯-১৯৩৯ পর্যন্ত ইংরেজের বৈদেশিক নীতি পৃথিবীর সর্বত্র গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে নাৎসিবাদের পোষকতা করিয়া আসিয়াছে। সোভিয়েট রুশের বিরুদ্ধে আর্কস হাউস তল্লাসী, জিনোভিয়েভের জাল চিঠি ইত্যাদি হইতে সুরু করিয়া অ্যাবিসিনিয়ার অভিযানে ইতালিকে, গণতান্ত্রিক স্পেনের বিরুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে, মাঞ্চুরিয়া অভিযানে জাপানকে নৈতিক সাহায্য ও সহানুভূতি দানের মধ্যেই বৃটেনের শাসকতন্ত্রের গণতন্ত্র-বিরোধী মনোভাব পরিস্ফুট। জাপানের মাঞ্চুরিয়া অভিযানের বিরুদ্ধে চীন যখন রাষ্ট্র সংঘে তাহার অভিযোগ জানাইল তখন ইংরেজ-প্রতিনিধি যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহাতে জাপ-প্রতিনিধি আনন্দিত চিত্তে বলিয়াছিলেন যে তিনি নিজেও অমন চমৎকার ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারিতেন না।

ইংরেজ শাসকতন্ত্রের এই গণতন্ত্র-বিরোধী মনোভাবের ফলে নাৎসি ও ফ্যাসিবাদ এমন উগ্ররূপ ধারণ করিল যে শেষে ইংরেজকেই নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইল। বর্তমান যুদ্ধ এজন্যই গণতন্ত্রবাদ রক্ষার জন্য যুদ্ধ নহে—ইহা ধনিকতন্ত্রবাদীদের পরস্পরবিরোধী আত্মদ্বন্দ্ব। সোভিয়েট রুশ এই যুদ্ধ হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে প্রথম হইতেই চেষ্টিত ছিল কারণ তাহার পক্ষে তাহাই সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট নীতি ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহাকে বাধ্য হইয়া ইংরেজ মিত্রপক্ষের সঙ্গে নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য যোগ দিতে হইয়াছে। ফ্যাসি ও নাৎসিবাদের আবির্ভাবে বিশ্বশান্তি যে অচিরেই ভঙ্গ হইবে এই আশংকা সোভিয়েট রাশিয়া প্রথম হইতেই প্রকাশ করিতেছিল; বিশ্বরাষ্ট্র সংঘে রিবেনট্রপ সেজন্য Collective Security—সম্মিলিত নিরাপত্তার দাবী করিতেছিল, একটি রাষ্ট্র শান্তি ভঙ্গ করিলে সংঘের অপর সকলে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। কিন্তু শান্তিরক্ষার এই সহজ প্রস্তাবে ইংরেজ শাসকসম্প্রদায় সুতীব্র বিরোধিতা করিয়াছিল।

বর্তমান বিশ্বযুদ্ধ একটি আকস্মিক ঘটনা এবং ইংরেজ শাসকসম্প্রদায় ইহা পূর্ব হইতে বুঝিতে পারে নাই, ইহা বিশ্বাস করিলে তাহাদের সাধারণ বুদ্ধিমত্তার উপর অবিচার করা

হইবে। যুদ্ধ বাধিলেই তাহাদের প্রাচ্যের সাম্রাজ্য বিপন্ন হইবে এবং জাপান হইতেই যে এই বিপদের আশংকা সর্বাধিক তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সখ্যবন্ধন দৃঢ় করিতে অগ্রসর হয় এবং এজন্যই জাপানের যুদ্ধকালীন সহায়তা সত্ত্বেও ইঙ্গ-জাপ চুক্তিকে বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। সঙ্গে সঙ্গে বহু কোটি টাকা ব্যয় করিয়া সিঙ্গাপুরে এমন এক নৌঘাটি তৈয়ার করে যেখানে ইংরেজ ও মার্কিন সম্মিলিত নৌবাহিনী আশ্রয় নিতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপান প্রাচ্যে নিরংকুশ গতি পাইয়া শিল্পে ও বাণিজ্যে এত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে সে পাশ্চাত্য জাতিগুলির কেবল ঈর্ষা নয় আতংকেরও কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। আতংক, কারণ প্রাচ্যে পাশ্চাত্য জাতিগুলির যে-সব উপনিবেশ ছিল জাপানের লোলুপ দৃষ্টি যে সহজেই তাহাদের উপর যাইয়া পড়িবে তাহা তাহারা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ ছিল না। জাপানের সমস্যা তাহার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। বৎসরে জাপানের জন্মসংখ্যা মৃত্যুসংখ্যার উপরে প্রায় ১০ লক্ষ! এজন্য বাধ্য হইয়াই জাপানকে বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। নিজেদের স্বার্থে যাহাতে জাপানের দৃষ্টি না পড়ে সেইজন্যই লর্ড বেরেসফোর্ডের পুরাতন নীতি "Break up of China" অনুসরণ করিয়া পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি জাপান যখন মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া চীনে দাঁত বসাইল তখন তাহার প্রতিবাদ ত করিলই না উপরন্তু স্যর জন সাইমন বিশ্বরাষ্ট্রসংঘে জাপানের পক্ষে যেরূপ ভাবে ওকালতি করিলেন নির্লজ্জতায় তাহা অতুলনীয়। জাপান যাহাতে পাশ্চাত্য জাতির অধিকৃত দেশগুলির দিকে দৃষ্টি না দেয় সেজন্য তাহারা জাপানের হাতে নানাভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াও চুপ করিয়াছিল।

প্রাচ্যে যখন এইভাবে জাপানকে তোষণ করিবার নীতি চলিতেছিল পাশ্চাত্যে ইংরেজ শাসকসম্প্রদায় ঠিক ঐ ভাবেই মুসোলিনি ও হিটলারকে তোষণ করিতেই ব্যস্ত ছিল। নেভিল চেম্বারলেন বা স্যামুয়েল হোর ব্যক্তিগতভাবে এই তোষণ নীতির জন্য দায়ী নহেন—তাঁহারা তাঁহাদের সম্প্রদায়গত স্বার্থেরই প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিতেছিলেন।

কিন্তু বিত্তহীন রাষ্ট্রগুলি এই তোষণনীতিতে যে তৃপ্ত হইবে ইহা ভ্রান্ত ধারণা; তাই একদিকে অষ্ট্রিয়া, চেকো-শ্লোভাকিয়া ও অপরদিকে মাঞ্চুরিয়া ও চীনের বহুল অংশকে বিশ্বশান্তির বেদীপীঠে বলি দিয়াও সাম্রাজ্যবাদী পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধকে ঠেকাইতে পারিল না। ইংরেজ শাসক-সম্প্রদায় ভাবিয়াছিল যে হিটলার চেকো-শ্লোভাকিয়ার পর পোলাণ্ডকে আক্রমণ না করিয়া সোভিয়েট রুশের দিকে দৃষ্টি দিবে; কিন্তু সোভিয়েট রুশ প্রথম হইতে সুচতুর রাজ-নীতিকের মত নিজের পশ্চিমসীমান্ত যেমন একদিকে সুরক্ষিত করিল অপর দিকে জার্মানীর সহিত অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া নিজের আত্মরক্ষার ঘাঁটী নিরাপদ করিল। ইংরেজ শাসকসম্প্রদায় রাজনীতির এই খেলায় সোভিয়েট রুশের নিকট যেভাবে পরাজিত হইয়াছিল তাহা পাশ্চাত্য রাজনীতির ইতিহাসে উত্তরকালে কৌতূহলের সৃষ্টি না করিয়া পারে না।

বিত্তবান্ ও বিত্তহীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যখন রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব চলিতেছিল তখন শোষিত দেশগুলি, যাহা বর্তমান রাজনীতির ভাষায়, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের 'কলোনি' বা উপনিবেশ তাহাদের মধ্যে বিপুল জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। একদিকে মধ্যপ্রাচ্যের সিরিয়া, লেবানন হইতে সুরু করিয়া আরব, ইরাণ, আফগানিস্থান, ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, ফরাসী ইন্দোচীন, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন্ এবং অপর দিকে মিশর হইতে সুরু করিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন ছোট ছোট স্বাধীন ও বিজিত দেশগুলিতে একটা নূতন জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে হয়। এই জাতীয়তাবাদের প্রধান আদর্শ ছিল শ্বেত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির আওতা হইতে নিজেদের স্বাধীন করা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যখন শ্বেতজাতিগুলি অশ্বেত-জাতির সৈন্য বলের সাহায্য নিতে বাধ্য হইল তখনই এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন জাতিগুলি বুঝিল যে অশ্বেতজাতিরা যুদ্ধক্ষেত্রেও শ্বেতজাতিদের পরাস্ত করিতে অসমর্থ নয়। আবার জারতন্ত্রের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েটতন্ত্রের উদ্ভব নিপীড়িত জনমানবকে যেমন এক নূতন আশার বাণী শুনাইয়াছে তেমনি সাম্রাজ্যবাদী শোষক শক্তিদের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে তাহাদের পরিচিত করিয়াছে। যে জাতীয়

সংগ্রাম উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে সমগ্র প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করিতেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটেন, ফ্রান্স ও জাপানের নিজেদের মধ্যে পৃথিবী বাটোয়ারা করিবার ব্যবস্থা দেখিয়া সেই সংগ্রাম তীব্রতর হইয়া উঠিতেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আরবদের নূতন কনফেডারেশন গঠন করিবার প্রলোভন দেখাইয়া কর্ণেল লরেন্স তাহাদিগকে তুর্কীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাইয়াছিলেন কিন্তু পরে তাহা মধ্যপ্রাচ্যে ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যাইবে আশংকা করিয়া বিভিন্ন আরব দলপতিদের একবার ইহাকে একবার উহাকে সাহায্য করিয়া তাহাদের পারস্পরিক ঈর্ষা ও লোভকে জাগাইয়া রাখিয়া সমগ্র জাতিটাকে দুর্বল রাখিবার প্রচেষ্টায় বৃটিশ শাসকবর্গ বর্তমানে ব্যাপৃত। মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারিলে ইংরেজ ও ফরাসী উভয় সাম্রাজ্যের দরজাই অরক্ষিত থাকিয়া যায়। একদিকে ইরাকের তৈল অপরদিকে ভারতসাম্রাজ্য এই উভয়ই ইংরেজকে মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত অনুকূলপ্রবণ করিয়াছে; সেজন্যই মধ্যপ্রাচ্যে আরব জাতীয়তার বিরুদ্ধে একটি ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া সেখানে শ্বেতজাতিদের একটি আত্মরক্ষামূলক ঘাঁটী প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহুদীদের জাতীয় আবাস 'National Home'কথাটা যে একেবারেই ভুয়া জিনিস তাহা সহজেই বোঝা যায়। ভারতবর্ষে দেশীয় রাজ্যগুলি যেমন বৃটিশ স্বার্থ সংরক্ষণের ঘাঁটী, মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদী-রাষ্ট্র ঠিক তেমনি শ্বেতজাতিদের অশ্বেতজাতিদের বিরুদ্ধে ঘাঁটী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জেনারেল স্মাট্‌সের উদ্ভাবিত তিন শ্রেণীর ম্যাণ্ডেট প্রথা দ্বারা প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশগুলিকে নিজেদের করায়ত্ত রাখিবার যে নীতি পাশ্চাত্য জাতিগুলি অবলম্বন করিয়াছিল ইহাও তাহাদের ভবিষ্যতের আত্মরক্ষার অন্যতম উপায়।

পাশ্চাত্য জাতিগুলির নিজেদের সাম্রাজ্যরক্ষার সর্বদিক-প্রসারী একদিকে এই প্রচেষ্টা অপরদিকে তাহাদের অধিকৃত দেশগুলিকে ভবিষ্যতে স্বাধীনতা দিবার পরস্পরবিরোধী প্রতিজ্ঞার মধ্যে বিজিত জাতিগুলির নিজেদের পথ নিজেরাই বাছিয়া নিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। সমগ্র প্রাচ্যে মিশর ও ভারতবর্ষই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা মন্ত্রের অগ্রদূত। ফরাসীবৈরিতা ও অবস্থান মাহাত্ম্যের সুযোগে মিশরকে ইংরেজ শাসকতন্ত্র বাধ্য হইয়া অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়াছে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত আরব, ইরান ও ভারতবর্ষ স্বাধীনতা না পাইবে ততদিন পর্যন্ত মিশর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় যখন ইতালি আবিসিনিয়ার নির্মম বর্বরোচিত অভিযান এক দুর্বল, অস্ত্রবলশূন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতেছে, ইংরেজ ধনিকতন্ত্রের আত্মসেপরিপুষ্ট জেনারেল ফ্রাংকো স্পেনের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ধ্বংস করিতে লাগিয়াছে প্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদী শৃংখলাবদ্ধ জাতিগুলি তখন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহারা দেখিল বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের সমস্ত বাণী সম্পূর্ণ অর্থহীন; বর্বর স্বার্থপ্রচেষ্টাকে সভ্যতার ছদ্ম আবরণে আচ্ছাদিত রাখিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্যই ইহার সৃষ্টি। ইহার ফলে প্রাচ্য জাতিগুলি ইহাদের হাতে নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল সত্য কিন্তু ইহাতে তাহারা বুঝিতে পারিল যে তাহাদের সাহায্য না পাইলে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারে না। এই শেষোক্ত ধারণাই তাহাদের মুক্তিসংগ্রামকে দৃঢ় ও কঠোর করিয়া তুলিয়াছে।

ঠিক এই সময়ে ইংরেজ ও ফরাসী জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইল। যুদ্ধ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা বুঝিল যে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রবল ও প্রাচ্যের জনবলের সাহায্য না পাইলে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সফলতা অর্জন করা তাহাদের পক্ষে দুষ্কর হইবে। সুতরাং তাহাদের সম্মিলিত প্রচার কার্য হইল গণতন্ত্রের জয় ঘোষণা করা। 'যুদ্ধান্তে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা দান' ইহা হইল এই প্রচারের এক প্রধান অঙ্গ। যুদ্ধ যতই ইংরেজ মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যাইতে লাগিল ততই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির সম্বন্ধে—সিরিয়া, লেবানন, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, ফরাসী ইন্দোচীন, মালয়, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ, ফিলিপাইনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইহাদের আশাপূর্ণ বাণী গগন পবন মুখরিত করিতে লাগিল। জাপান ফিলিপাইন অধিকার করিয়াই তাহার স্বাধীনতা ঘোষণা করিল;

তিনি বীরের মত, কর্মীর মত কর্মপ্রাঙ্গণে তাঁর দেহ রেখেছেন —এর জন্য শোক করতে নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে এই অক্লান্তকর্মী গণতন্ত্রের সেবকের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিবদ্ধ থাকবে।

বাংলার মন্ত্রীত্ব—নাজিমুদ্দিন-সাহাবুদ্দিন-সুরাবর্দী কলঙ্কিত মন্ত্রীসভার আকস্মিক পতনে সমগ্র বাংলা দেশে একটা গভীর স্বস্তির ভাব জেগে উঠেছে। সমগ্রদেশের নৈতিক আবহাওয়া যে ভাবে দূষিত হয়েছে, চোরাবাজার যে ভাবে সমাজের সর্বস্তর আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তার জন্যে মন্ত্রিসভা সম্পূর্ণ না হলেও যে অনেকটা দায়ী সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গঠন করেই দুর্নীতি সম্বন্ধে এক অনুসন্ধান কমিটী বসিয়েছে এবং আন্তরিকভাবে সমগ্র প্রদেশ থেকে দুর্নীতি দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। আর নাজিমুদ্দিন-সাহাবুদ্দিন-সুরাবর্দী শাসিত প্রদেশে প্রকাশ্যে মন্ত্রীদের নামে অমুক-মিনিষ্টার-Duty শতকরা এত টাকা দিলে চিনির পারমিট পাওয়া যাবে, কনট্রাক্ট পাওয়া যাবে রেশন শপ পাওয়া যাবে, কনট্রোলের দোকান খুলতে পারা যাবে, বলে' বাজারে আলোচনা হয়। কোটী টাকার কাপড় চোরাবাজারে বেচা কেনা হয় অথচ বাংলা দেশে মৃতদেহের জন্য এক টুকরা ধুতী নাই, নারী বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা করছে! নিরন্ন মহামারীপ্রপীড়িত দুর্ভিক্ষগ্রস্ত নিজের দেশবাসীর প্রাণ নিয়ে এমন ছিনিমিনি যারা খেলতে পারে তাদের এই আকস্মিক পতনে দেশবাসী সর্বত্র আনন্দিত হয়েছে।

৯৩ ধারা অনুসারে লাটসাহেব বাংলা দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছেন। মন্ত্রীসভা গঠন করবার দায়িত্ব যেহেতু লোক যখন রয়েছে তখন লাট সাহেবের কর্তব্য তাদের হাতে মন্ত্রীত্ব ভার দেওয়া। কিন্তু যাদের সম্বন্ধে দেশবাসীর মনে সন্দেহ আছে মন্ত্রীসভায় কোনো দলই তাদের গ্রহণ করে নিজেদের উপর দেশবাসীর আস্থা যেন না হারান। শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় লাট সাহেবকে জানিয়েছেন যে কংগ্রেস তরফ থেকে মন্ত্রীসভা গঠনের ভার তিনি নিতে পারেন না কারণ এবিষয়ে কংগ্রেসের স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আছে। মৌলবী ফজলুল হক কৃষক-প্রজা পার্টির হয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করতে সম্মত আছেন। কিন্তু গত বারে তাঁর মন্ত্রীসভা দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারেন নি বলেই তাঁর এই দুর্দশা। তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশে চালের বাজারে প্রথম চোরাবাজারের সূত্রপাত হয় বললে মিথ্যা বলা হয় না এবং সুরাবর্দী-সাহাবুদ্দিনের আমলে তাই ফল-পুষ্পে বিকশিত হয়ে বিরাট বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। এক কংগ্রেস ছাড়া এমন কোনো দলই আজ বাংলার ব্যবস্থা পরিষদে নাই যাদের সদস্যদের দেশাত্মবোধের উপর দেশবাসী আস্থা স্থাপন করতে পারে। এর চাইতে লজ্জার বিষয় আমাদের কি হ'তে পারে?

লর্ড ওয়াভেল বিলাত থেকে ফিরে না এলে কেসি সাহেব বাংলার শাসনতন্ত্রের অচল অবস্থা সম্বন্ধে হয়ত কিছু করবেন না। দেশে সত্যিকারের গণতন্ত্রমূলক শাসন ব্যবস্থা ও স্বৈরাচারের মধ্যে পার্থক্য কতখানি তা' এই ৯৩ ধারা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

বরিষিলি মহিলা শিক্ষা কেন্দ্র—কস্তুরবা স্মৃতি তহবিলের সাহায্যে বোম্বাইর নিকটে বরিষিলিতে একটি মহিলা কর্মী শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। গঠনমূলক কার্য-পদ্ধতি কেবল কথার কথা নয়, একটা সমগ্র জাতিকে নীচের থেকে গড়ে তোলবার যে আন্তরিক প্রচেষ্টা কংগ্রেস অবলম্বন করেছে, বরিষিলি কেন্দ্র তারই প্রতীক। এখান থেকে মেয়েরা শিক্ষা পেয়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র গ্রামগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করবেন। নগরকে কেন্দ্র করে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে তাতে সামাজিক সাম্য রাষ্ট্রশক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হলেও ব্যক্তির স্বাধীনতা রাষ্ট্রের চাপে অনেকটা সঙ্কুচিত হয়। গান্ধিজীর গঠনমূলক পরিকল্পনা ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপূর্ণভাবে বিকাশের পরিকল্পনা। কম্যুনিজম ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হলেও রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে সমাজ জীবন গঠন করার ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হতে পারে না বলে অনেকের ধারণা। 'বাস্তব অভাব বাড়িয়ে তাকে মেটান' নীতির মধ্যে মানসিক শান্তির স্থান বোধ হয় খুবই অল্প। এই সমস্যার সমাধান গান্ধিজী করতে চেয়েছেন গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করে সভ্যতা গঠন কোরে। রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক দৃষ্টিতে আমাদের মনে হয় যে গ্রামকে গড়ে' তোলার ভেতর আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সবদিক দিয়েই সাহায্য পাবে। এবং

সেজন্যই দেশের সর্বত্র কংগ্রেসকর্মিগণ আজ গঠনমূলক পরিকল্পনা নিয়ে নিজেদের প্রস্তুত করছেন। এই পরিকল্পনা অংশতঃ সার্থক হলেও নিরক্ষরতা, অস্পৃশ্যতা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা সহজেই সমাধান হবে। বাংলাদেশেও গঠনমূলক কার্য পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে। আমরা আশা করি বাংলার কংগ্রেস কর্মীরা বিশেষ করে যারা গ্রামে থেকে কাজ করতে চান তাঁরা এখনই এই পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষা নেবার ব্যবস্থা করবেন।

সপ্রু কমিটীর রিপোর্ট—স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর নেতৃত্বে গঠিত আপোষ কমিটি ভবিষ্যৎ ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলবার আছে বলে' মনে করি না। আমাদের মনে হয় যে আমাদের শাসনকর্তারা আমাদের নিজেদের মধ্যে ভেদ বিবাদ সৃষ্টির জন্য যে-সব যন্ত্র প্রস্তুত করেছিলেন সেগুলিকে বজায় রেখে সপ্রু কমিটি সঙ্গত কাজ করেন নি। আমাদের সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে উজ্জীবিত রাখতে পৃথক নির্বাচন প্রথার দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী এবং ঠিক এই কারণেই এই প্রথাটি শাসক গোষ্ঠি প্রচলিত করেছিলেন। এইটিকে বজায় রাখলে আমাদের সাম্প্রদায়িক সমস্যা কোনো দিনও মিটতে পারে না। শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা দূর করতে একটা সর্ববাদীসম্মত শাসনপদ্ধতি চাই এটা কর্তৃপক্ষ বললেও প্রস্তাবটা যে অন্তঃসারশূন্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কোনো দেশের শাসনপদ্ধতি সর্ববাদীসম্মত হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ নিজেদের শক্তির উপর আস্থা না থাকলে তৃতীয় পক্ষ চিরদিনই বিবাদ বাধাবার অছিলা খুঁজবে এবং পাবে। এরকম কোনো সর্বদলীয় বা অ-দলীয় কমিটী শাসনতন্ত্র স্থির করবার কোনো বাস্তব মূল্য আছে কিনা সে-বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সানফ্রান্সিসকো কনফারেন্স—বর্তমান মাসে সান-ফ্রান্সিসকো সহরে ভবিষ্যতে বিশ্বশান্তি রক্ষা কি ভাবে করা যেতে পারে মূলতঃ এই উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজ মিত্রশক্তিদের যে সভা বসছে নানা কারণে তার প্রতি পৃথিবীর দৃষ্টি পড়েছে। আসলে মিত্রশক্তিরা বিশ্বশান্তি বলতে ইওরোপীয় শান্তি বোঝে; এবার জাপান আঘাত করাতে এশিয়ার শান্তিও এই প্রসঙ্গে এসে পড়েছে। শান্তি শব্দের ব্যাখ্যা আবার এখানে করা দরকার;—ইংরেজ মিত্রশক্তির স্বার্থে আঘাত যে অবস্থায় লাগেনা সে অবস্থাই তাদের মতে শান্তি। ইউরোপে শান্তি রক্ষা মানে বৃটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট রাশিয়ার স্বার্থ যাতে রক্ষিত হয় তাই এবং এশিয়ার শান্তি মানে ইওরোপীয় ও অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ রক্ষা; যদি এর বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়ায় তাহলেই বিশ্বশান্তি তাতে ব্যাহত হবে! আসলে বলবান রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধাচরণ করাটাই বিশ্বশান্তি ভঙ্গ করা। এদিকে এই সব বলবান রাষ্ট্রগুলির অধীনে যে সব দেশ আছে তারা সবাই স্বাধীন হতে চেয়ে এদের বেশ বিপদে ফেলেছে। বিজিত রাষ্ট্রগুলি ছাড়া স্বাধীন কিন্তু দুর্বল রাষ্ট্রগুলিও নানা সমস্যার কারণ হয়েছে। পোল্যাণ্ডের কি হবে—সোভিয়েট রাশিয়া জার্মাণীর কবল থেকে পোল্যাণ্ড উদ্ধার করে নিজের জাতীয় স্বার্থ রাখবার জন্য যতটা প্রয়োজন ততটা রাখতে চাওয়াতে এসব বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। তেলের খনির দেশ রুমানিয়ায় অ্যামেরিকার শিল্পপতিদের বহু অর্থ তেলের ব্যবসায়ে খাটান আছে। সোভিয়েট রাশিয়া ও অন্যান্য ইওরোপীয় রাষ্ট্র রুমানিয়ায় অ্যামেরিকান প্রতিপত্তি চায় না। ঠিক এমনি অবস্থা হয়েছে ইরাণে। সেখানকার তেলের ব্যবসায়ের অধিকাংশই অ্যামেরিকার হাতে, বৃটেনের স্বার্থও তাতে আছে। সোভিয়েট রাশিয়া এখানে ভাগ বসাতে চাওয়ায় ইরাণে দুবার মন্ত্রীসংকট হয়েছে এবং এখনও সে সমস্যার সমাধান হয়নি। এসব ছাড়া mandateগুলির সমস্যাও সমাধান করতে হবে। সিরিয়া ও লেবানন এ বিষয়ে একটি প্রকাণ্ড সমস্যা। বৃটেন মধ্য প্রাচ্যে তার প্রভাব প্রতি-পত্তির তিলার্ধ হ্রাস হতে দিতে পারে না। সিরিয়া ও লেবানন গত যুদ্ধের পর mandate হিসাবে ফ্রান্সের হাতে ছিল। বর্তমান যুদ্ধে ফরাসীর পরাজয়ের পর সিরিয়া লেবানন ফরাসীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে; পরে ইংরেজের মধ্যস্থতায় একটা রফা হয় এবং সিরিয়া ও লেবানন স্বাধীনতার খানিকটা অধিকার লাভ করে। বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘের অস্তিত্ব যখন নেই তখন সিরিয়া ও লেবাননের অবস্থা কি হবে? আবার কি তারা ফরাসীর হাতে যাবে না তারা স্বাধীনতা পাবে? অন্য দিকে প্যালেষ্টাইন ও আরবের সমস্যাও ইংরেজকে ভাবিয়ে তুলেছে।

আসল কথা পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও ভয়ই বিশ্বরাজনীতির মূলকথা বলে বারে বারে বিশ্বশান্তি ভঙ্গ হচ্ছে। বাহিরে যত বন্ধুত্বই থাক্ কোনো রাষ্ট্রই অপর রাষ্ট্রকে বিশ্বাস করে না। সকলেরই লোভের সীমা নেই এবং সেজন্য ভয়েরও সীমা নাই। গান্ধিজী সানফ্রান্সিসকো কনফারেন্সের প্রাক্কালে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে সম্পূর্ণ নতুন অথচ একান্ত সত্য বাণী দেওয়া হয়েছে। লোভকে জয় কর; কায়মনোবাক্যে অহিংস হও; ভারতবর্ষকে সর্বপ্রকার বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত কর, তাহলেই পৃথিবীর শান্তি রক্ষা হবে। গান্ধিজীর এই বাণীর মূল্য কনফারেন্সে সমবেত রাজনীতিবিদ্‌দের দেওয়ার সাধ্য নেই যদিও এর সত্যতা তাঁরা সকলেই বোঝেন। বিশ্বশান্তি বলতে যদি শক্তিমান রাষ্ট্রগুলিকে যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়া বোঝায় তাহলে তা-যে সত্যিকার শান্তি কখনও আসতে পারে না, এটা রাজনীতিবিদেরা বুঝতে পারেন না। বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ বৃহত্তম শক্তিগুলির প্রভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলেই তার মৃত্যু যেমনই শোচনীয় তেমনি করুণ। পণ্ডিতদের ধারণা যে একটা আন্তর্জাতিক পুলিশবাহিনী গঠন করলে ও একটা আন্তর্জাতিক বিচারালয় খাড়া করলেই পৃথিবীর শান্তি স্থায়িত্বলাভ করবে। এটা যে সম্পূর্ণ অবাস্তব কথা তা' পণ্ডিতেরা ছাড়া আর সবাই বুঝতে পারে। মানুষ যেমন পুলিশের ভয়ে অন্যায়ের থেকে বিরত হয় না, শক্তিমান রাষ্ট্রও তেমনি পুলিশের ভয়ে আক্রমণ করা থেকে কখনও নিবৃত্ত হয় না। শক্তিসাম্য রাখবার রাজনীতি ইওরোপীয় ইতিহাসে সুপরিচিত। ইংরেজ রাজনীতিবিদেরা ইওরোপে শক্তিসাম্য রেখেই পৃথিবীতে এক সময় দুর্ধর্ষ হয়েছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও এই শক্তিসাম্য রক্ষা করা রাষ্ট্রগুলির ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে; কয়বছর আগেও ইংল্যাণ্ড ও জাপানে প্রশান্ত মহাসাগরে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ ছিল স্বার্থের খাতিরে সেই মৈত্রী বন্ধনকে ছিন্ন করে কিছুদিন ইংরেজ আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলাল। আজ জার্মাণ সোভিয়েট রাশিয়া ও জাপান বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ কালই আবার জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় একদিকে জার্মাণ ও রুষে দ্বন্দ্ব অপর দিকে জাপানের সঙ্গে জার্মাণী ও রাশিয়া উভয়েই সখ্য সূত্রে আবদ্ধ। জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য মৈত্রী বন্ধনের অর্থই একের প্রতি অপরের অবিশ্বাস। পরস্পর অবিশ্বাসের উপর শান্তির যে ভিত্তি সে ভিত্তি অতিশয় শিথিল—সে ভিত্তির উপর কখনও বিশ্বশান্তি বেশি দিনের জন্য টিঁকে থাকতে পারে না। এই সহজ কথাটাই গান্ধিজী আজ পৃথিবীকে শুনিয়েছেন।

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত আমেরিকার সামনে ভারতবর্ষের যে ছবি তুলে ধরেছেন তাতে আমেরিকার শিক্ষিত সমাজের একটা বড় অংশ যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। যদিও আমেরিকার বড় বড় সংবাদপত্রগুলি ইংরেজের বিরুদ্ধে কোনো সংবাদই সাধারণতঃ প্রকাশ করে না তবুও বিজয়লক্ষ্মীর বাণী যে একেবারে অরণ্যে রোদন হয়নি তার পরিচয় পাওয়া গেছে ইংরেজ সরকারের আমেরিকান প্রচার বিভাগের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ প্রদানে। সানফ্রান্সিস্‌কো সহরে বাইরের লোককে যেতে দেবার পথে বহু বাধা সৃষ্টি করা হলেও সেখানে সমবেত বৈদেশিক রাজনৈতিকগণকে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে সত্যকার অবস্থা যতটা সম্ভব জানাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এর জন্য শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতই অবশ্যি বিশেষ ভাবে দাবী।

ভারতে ব্রিটিশ কর্তারা ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে যে তিনজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন তাঁর ভেতর স্যর ফিরোজ খাঁ নূনের লম্ফঝম্ফ বেশ চিত্তাকর্ষক। যাদের কৃপাতে তিনি আজ সানফ্রান্সিসকোতে যেতে পেরেছেন তাদের ভরা তরী তিনি যে কূলে ভোবাতে যান নি একথা তিনি এখন থেকেই যাত্রাদলের রাজার মত বেশ হুংকার ও তর্জন গর্জন করে বলতে সুরু করেছেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন যে ভারতবর্ষ সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র (Sovereign State) এবং তিনি তার প্রতিনিধি। এতে বাজে লোকে ভুলতে পারে, তাঁর মনিবরা খুসী হতে পারে কিন্তু বিদেশী রাজনৈতিকদের ভিন্নদেশীয় শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে যে জ্ঞান আছে একথা নূন সাহেব একেবারে ভুলে না গেলে এমন করে তিনি একটা ছেলেমানুষি কথা বলতে পারতেন না।

পোল্যাণ্ডের সমস্যা—লুবলিন গভর্ণমেণ্টকে পোল্যাণ্ডের আসল গভর্ণমেণ্ট বলে স্বীকার করে' নিয়ে সোভিয়েট সরকার যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনকে একটা মহাসমস্যায় ফেলেছেন। ইংরেজ-

গভর্ণমেণ্টের আওতায় যে প্রতিক্রিয়াশীল দলটি নিজেদের পোল্যাণ্ডের লণ্ডন গভর্ণমেণ্ট বলে ইংলণ্ডে বসে মাতব্বরি করছে সোভিয়েট রাশিয়ার এই এক চালে তারা একেবারে মাৎ হয়ে গেল। লণ্ডনস্থ পোল সরকারের সঙ্গে পোল্যাণ্ডের গণমতের যোগ নেই—এরা আসলে অভিজাত গোষ্ঠীর লোক; নিজেদের স্বার্থে আঘাত লেগেছিল বলেই এরা নাৎসী জার্মাণীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল এবং নিজেদের গায়ের চামড়া লণ্ডনে পালিয়ে বাঁচায় রেখেছিল। যারা দেশের দারুণ দুর্যোগে গুপ্ত বৈপ্লবিক প্রথায় জার্মানীর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে এসেছিল আজ তারাই লুবলিন গভর্ণমেণ্টকে দাঁড় করিয়েছে; এরা পোলিশ জনসাধারণের থেকেই উদ্ভূত এবং তাদেরই একান্ত আপনার। সুতরাং শেষ পর্যন্ত এরাই দেশের শাসনভার হাতে নিয়েছে। সানফ্রান্সিসকো বৈঠকে লুবলিন সরকারের প্রতিনিধিকে স্থান দিতে যুক্তরাষ্ট্র অসম্মতি জানিয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া এদের পোল সরকার বলে স্বীকার করে নেওয়ায় আমেরিকাকে একটু বেকায়দায় পড়তে হয়েছে। সানফ্রান্সিসকো কনফারেন্স বসবার মুহূর্তে সোভিয়েট সরকার ইংরেজ ও আমেরিকান সরকারের এই মতানৈক্য উল্লেখযোগ্য।

ইওরোপীয় যুদ্ধের গতি—পূর্বদিক থেকে সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী অদম্য বিক্রমে বার্লিনের দিকে এগিয়ে আসছে—লিখবার সময় (২৩শে এপ্রিল) তারা বার্লিন সহরের কেন্দ্র থেকে ২ মাইলও দূরে নেই। পশ্চিম থেকে আমেরিকান ও ইংরেজ বাহিনীও বার্লিনের সামনে এগিয়ে আসছে। হিটলার এই বিপদের সময় নিজে এসে বার্লিনে দাঁড়িয়েছে কিন্তু বিজয়ী সোভিয়েট সেনার অগ্রগতি রুখবার ক্ষমতা যে নাৎসি বাহিনী হারিয়ে ফেলেছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের কাগজ বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত বিজয়ী মিত্রবাহিনী বার্লিন দখল করবে। কিন্তু এতেই যুদ্ধে শেষ হবে বলে মনে হয় না কারণ হিটলার সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকরণে গেরিলা যুদ্ধে নাৎসি বাহিনীকে নিয়োগ করবার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু এতে যে বিজয়লক্ষ্মী তার অংকশায়িনী হবে না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

গণতন্ত্রবিরোধী একনায়কত্বের দুর্বলতা যে কোথায় মুসোলিনি ও হিটলারের কার্যাবলীর ভেতর তা সুপরিস্ফুট। জনসাধারণের স্বার্থের যোগ যেখানে নেই সে নায়কত্ব কখনও চিরদিনের জন্য দাঁড়াতে পারে না। রাষ্ট্রের স্বার্থ যখনই জনসাধারণের স্বার্থ হয় তখনই তার শক্তি হয় প্রচণ্ড। ধনিকতন্ত্র এই জিনিষটা বুঝতে পারে না; তার পরিণতি গোষ্ঠী নায়কতা থেকে একনায়কতায় এবং তার পরেই আসে সাধারণের নায়কতা।

ফ্যাসি ও নাৎসিবাদের পতন যে অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যে জনসাধারণের হাতে রাষ্ট্রের সর্বাংগীন ক্ষমতা আসবে না, এও অবধারিত সত্য। ফ্রান্সে সেই প্রাচীন অভিজাত তন্ত্র দাঁড়িয়েছে, ইতালিতেও তাই। ইংলণ্ডে রক্ষণশীল দল প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেও টাল সামলে গেছে বলে মনে হয় কারণ সেখানকার শ্রমিক দল প্রাচীন সামন্ত প্রথার আবহাওয়ায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে। সোভিয়েট রাশিয়া পৃথিবীর নিপীড়িত গণমানবের আশার প্রতীক কিন্তু সেখানেও "ম্যানেজার"-তন্ত্র গজিয়ে উঠছে, যুদ্ধের নামে, ভবিষ্যৎ আদর্শের নামে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা এমনভাবে সংকুচিত হয়েছে যেমনটি সামন্ততন্ত্রীর যুগে পরলোকের ধর্মের নামে করা হোত। প্রত্যেক দেশের শাসকশ্রেণীই ভবিষ্যৎ যুগে নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে; টেহারান, ডাম্বার্টন ওক্স, সিন্ধো কনফারেন্সে সবই এই উৎকণ্ঠার পরিচায়ক। যাদের শোষণ করে আজ শক্তিমান জাতিগুলি পৃথিবীতে শক্তিমান্ হয়েছে তারা শোষিত জাতিগুলিকে মুক্তি দেবার জন্য সানফ্রান্সিসকোতে সমবেত হয় নাই, এই কথাটা আমাদের ভুললে চলবে না। আমাদের নিজেদের মুক্তি আমাদের নিজেদের অর্জন করতে হবে; সোভিয়েট রাশিয়া বা অ্যামেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আমাদের স্বাধীনতা এনে দেবে না। যাঁরা মনে করেন যে সোভিয়েটকে বা অ্যামেরিকাকে খুসী করবার জন্য চার্চিল ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবেন তারা নিজেদের দৌর্বল্যকেই প্রশ্রয় দেন মাত্র।

হাওড়া ও যশোহর—হাওড়া গোলাবাড়ী থানার কাছে একটি তরুণী বৃটিশ নৌবাহিনীর সৈনিক কর্তৃক যেভাবে অত্যাচারিতা হন তা' আমাদের পাঠক-পাঠিকারা জানেন। সেই সৈনিকটির দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। যশোহর সহরে স্থানীয় অ্যাডিসনাল সেসনস্ জজের বাড়ীতে বহু সৈনিক চড়াও হয়ে অত্যাচার করেছিল; সামরিক বিচারালয়ে বিচারে অভিযুক্ত চার জনই সনাক্তকরণের অভাবে মুক্তি পায়। ঘটনা যে ঘটেছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই সুতরাং এই মুক্তির আদেশে আদল অপরাধের গুরুত্ব এতটুকু লাঘব ত হলোই না উপরন্তু দেশের শাসনভার যাদের ওপর তাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। এ প্রসঙ্গে পূর্বে একবার আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। থানা-পুলিশের দিকে আমাদের অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থাকলে আমাদের দুর্দশার অন্ত থাকবে না। অত্যাচার হয়ে গেলে থানায় দৌড়ানর আংশিক প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু অত্যাচার বন্ধ করার জন্য আমাদের নিজেদের সংঘবদ্ধ হতে হবে; আমাদের আত্মরক্ষার ভার আমাদের নিজেদের হাতে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে তৎ কর্তৃক প্রকাশিত।

ভবিষ্যৎ

অষ্টম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৫২ | ২য় সংখ্যা

রাজনীতির উপাদান—তেল

সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়

জগতের সমস্যাগুলির মধ্যে তেল সমস্যা যেন আজ সকলকে ছাপিয়ে উঠেছে। তেল বা পেট্রোলের জন্য রাষ্ট্রপতিদের চিন্তার অন্ত নাই। তেলের যোগান পাকা রাখবার জন্য তাঁরা আজ যতটা চিন্তা করছেন তত আর বোধহয় কিছুতে নয়। এইজন্যই রাজনীতির সঙ্গে তেল সংগ্রহের ব্যাপারটা এমন ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত হয়ে গেছে যে, এই তেলকে রাজনীতির অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে একটুও বাধে না। যুদ্ধই যে আজ এই অবস্থার জন্য দায়ী সেকথা নির্বিবাদে বলা চলে। তারও আগে তেলের প্রয়োজনীয়তা জগত অনুভব করেছে বটে, কিন্তু সে প্রয়োজনীয়তার পিছনে তেল-পলির দখলীসত্ত্ব নিয়ে আজকের মতো এত বিসম্বাদ ছিল না।

আজকের এ বিশ্বজোড়া হানাহানির মধ্যে মারণাস্ত্রের যে পর্যাপ্ত ব্যবহার চলছে, তার সবই প্রায় চলে তেলে। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করে বলেছেন, আধুনিক যন্ত্রসজ্জিত একটি সৈন্যবাহিনীর একদিনকার যুদ্ধের খোরাক প্রায় ৫০,০০০ গ্যালন পেট্রোল। আমরা সকলেই জানি, আমেরিকা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত এমন একটানা জাহাজে যাওয়া চলে। কিন্তু তাতে তেল লাগে কত জানেন? প্রায় ১৫০,০০০ গ্যালন। দূরপাল্লার বোমারু বিমান হিসেবে "ফ্লাইং ফোর্টেস্" মিত্রপক্ষের অনেক কাজে এসেছে। এর প্রত্যেকটির পেট্রোলের খোরাক হচ্ছে মাইলপ্রতি দু' গ্যালন। তার মানে, ইংলণ্ডের যেকোনও একটি বিমানঘাঁটি থেকে হাজার বিমানের যদি একটি বহর জার্মানীতে গিয়ে বোমা ফেলতে, তেল তারজন্য লাগে প্রায় ২,০০০,০০০ গ্যালন। ব্রিটিশ সংবাদ মারফৎ এধরণের বিমান আক্রমণের কথা আমরা অনেক শুনেছি। জার্মানীকে বিধ্বস্ত করতে এক নয়, দু' নয়, বহু বিমান বহর এইভাবে গিয়ে হানা দিয়ে এসেছে। তেল যা খরচ হয়েছে তার আনুমানিক হিসেব আমরা এর থেকেই বুঝতে পারি এবং সেই সঙ্গে আরও বুঝতে পারি যুদ্ধের ব্যাপারে এই তেল বস্তুটির অকূলন হলে সমস্তই পণ্ড হয়ে যায়। সেইজন্যই রাষ্ট্রপতিদের কেবলই চেষ্টা যাতে তেলের যোগান ঠিক থাকে, যাতে আক্রমণের পূর্ণশক্তি তেলের অভাবে ক্ষীণ না হয়ে পড়ে।

এই অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করেই গত যুদ্ধের সময় ফরাসী রাষ্ট্রনায়ক ক্লেমাঁসো বলেছিলেন—"এক ফোঁটা তেলের দাম এক ফোঁটা রক্তের সমান"। কিন্তু এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ উক্তি আমরা পাই পরাজিত জার্মানীর সেনাধ্যক্ষ লুডেনডর্ফের জীবনচরিতে। তিনি স্পষ্টই বলেছেন—"তেল অকূলন না হলে' জার্মানী কখনও সন্ধির প্রস্তাব করতো না"। গত যুদ্ধের ধুরন্ধরদের এসব উক্তি থেকে অতি সহজেই বোঝা যায় যুদ্ধের ব্যাপারে তেলের প্রয়োজনীয়তা কত। বর্তমান যুদ্ধে মারণাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ আজ বহুগুণ বেড়ে গেছে এবং এমন এক পর্যায়ে এসে হাজির হয়েছে যেখানে তেলের ব্যবস্থা ভালো না হলে যুদ্ধ চালানোই দায়

হয়ে উঠে। রাষ্ট্রশক্তির মরণ-বাঁচন যার ওপর সেই তেল কোথায় কীভাবে পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা প্রয়োজন।

প্রধানত তিনটি এলাকা থেকে জগতের বাজারে তেল আসে। প্রথম হচ্ছে ক্যারিবিয়ান এলাকা। এই এলাকাটি দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর প্রান্ত থেকে আরম্ভ করে উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগ অবধি প্রসারিত। মেক্সিকো প্রভৃতি প্রধান তৈলক্ষেত্রগুলি এই এলাকারই অন্তর্গত। বাৎসরিক প্রায় ১৫,০০০ লক্ষ ব্যারেল (৪২ গ্যালনে এক ব্যারেল) তেল এখান থেকে উৎপন্ন হয়।

দ্বিতীয় বড় ধরণের তেল এলাকা হচ্ছে ভূমধ্যসাগরের আশপাশ এবং মধ্য প্রাচ্য। রুমানিয়া, ককেশাস্, ইরাক, ইরাণ প্রভৃতি অঞ্চল এই এলাকার মধ্যে ধরা হয়। এখানকার বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ ৩৬০০ লক্ষ ব্যারেল।

তৃতীয় এলাকা হচ্ছে নেদারল্যাণ্ড ইস্ট ইণ্ডিজ, সারাওয়াক এবং বোর্ণিওর কিছুটা। মোট উৎপাদনের পরিমাণ ৪৬০ লক্ষ ব্যারেল। আরও বিস্তর ছোট ছোট এলাকায় তেল পাওয়া যায়। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তা নিয়ে মাতামাতি করবার মতো মাল-মসলা কমই থাকে।

উক্ত তিনটি এলাকার মধ্যে প্রথমটির ওপরই জগতের মোট সরবরাহের তিন ভাগ। শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগই আসে এই অঞ্চল থেকে। আমেরিকার এই সুবৃহৎ তেল ব্যবসা যদিও আজ সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলেছে, তবু নিবিকার মনে সে তার তেল উৎপাদনের সবটা জগতের বাজারে ছেড়ে দিতে পারে না। কারণ তার নিজেরও চাহিদা আছে। দেশের প্রয়োজনে যার করবার পর যা উদ্বৃত্ত থাকবে তাই সে পণ্য হিসাবে জগতের বাজারে বিক্রি করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলেন মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই আমেরিকার নিজেরই লাগে। যন্ত্রযুগের পাশবতি যে-দেশে কোনও বাধা মানেনি, সেখানে এই তেলের অপর্যাপ্ত ব্যবহার আশ্চর্যের বিষয় নয়। কিন্তু উদ্বৃত্ত যে তেল বাজারে আসে তা নিয়ে জগৎ সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। কারণ, সেও চায় একই বেগে এগিয়ে যেতে, সেও চায় যন্ত্রযুগের দুর্বার গতির সঙ্গে পা ফেলে চলতে। রুশিয়া—উৎপাদনের ক্ষেত্রে যার স্থান আমেরিকার পরেই—তারও নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে এমন কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না যা জগতের বাজারে দেওয়া চলতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেছে প্রায় ৮ কোটি টন তেল জগতের বিভিন্ন স্থানে পণ্য হিসাবে প্রতি বছরে কেনাবেচা চলে।

তৈলপতিদের ধারণা রাশিয়ায় যে পরিমাণ তেল সঞ্চিত আছে আমেরিকার সে তুলনায় বহুগুণ বেশী। তাঁরা এমনও বলেছেন যে, আমেরিকার সঞ্চিত তেলের আধার ১৮ বছরের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু রুশিয়ার চলবে তারও পর বহুদিন। রাজনৈতিক দুর্যোগ সূচিত করবার এই যে সম্ভাবনা এটা পুঁজিবাদী দেশ কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছে না এবং এইজন্যই ব্যাপারটি নিয়ে আমেরিকার রাজনৈতিক মহলে এখন থেকেই যথেষ্ট জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়েছে। নতুন তেলখনি হাতে আনবার জন্য তাই আজ তাদের এত আগ্রহ এবং এরই একটা স্পষ্ট রূপ আমরা দেখতে পাই মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ব্যাপারে। রাজনৈতিক দুর্যোগের ধোঁয়া যেন এই এলাকার তেলকে কেন্দ্র করেই জমাট বাঁধছে। এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ, জেমস্ ল্যাভিস্, কিছুদিন আগে বলেছেন—"মধ্যপ্রাচ্যকে এ-যুদ্ধের পরই এক নম্বর তেল এলাকা হিসেবে গণ্য করতেই হবে এবং সেজন্য তেল সরবরাহ করবার প্রধান কেন্দ্রটি আমেরিকা থেকে এ অঞ্চলে স্থানান্তরিত হলে যুদ্ধের সম্ভাবনা বাড়বে বলেই মনে হয়। কারণ, যেসব রাষ্ট্রশক্তি তেলকে বহির্বাণিজ্যের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে' অপরাপর দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায় তাদের পক্ষে তেল সরবরাহের ক্ষেত্রগুলিকে আয়ত্তের মধ্যে না রাখলে চলবে না।"

মধ্যপ্রাচ্যের তেল নিয়ে মিত্রপক্ষের মধ্যে যে অসন্তোষ ঘনিয়ে উঠছে তার একটু পরিচয় এখানে না দিলে ব্যাপারটি ঠিক বোঝা যাবে না। রুশিয়া ইরাণের তেলের জন্য সুবিধাজনক সর্ত চাওয়াতেই এই অবস্থাটির উদ্ভব হয়েছে এবং এই অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি জানতে হলে ইঙ্গ মার্কিন তৈলপতিদের পূর্বতন চেষ্টা ও ইরাণের ভৌগোলিক বিশেষত্বের কথা জানতে হবে।

এই ব্যাপারে দুইজন সেনাপতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক জনের নাম কর্নেল চেষ্টার, আমেরিকার নৌ-

সঙ্গে ইহারা অগ্রসর হইয়া যাইতে পারে না বলিয়াই এই স্বাধু শাসনপদ্ধতির ধ্বংস অনিবার্য।

আজ আমাদের জাতীয় চরিত্র কোনো কোনো দিক দিয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া আসিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। এই দুর্বলতাকে ঘৃণামিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ সহানুভূতি ও করুণার তারল রসে মিশাইয়া যাহারা আজ আমাদের সম্মুখে পরিবেশন করিতেছেন তাঁহারা, আর যাহাই হউন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মিত্র নহেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ভারতবর্ষকে তাহাদের অধীন রাখিবার জন্য যেসব কারণ প্রদর্শন করে তাহাদের মধ্যে প্রায়ই শুনি যে ভারতবাসী দায়িত্ব নিয়া কোনো বড় কাজই করিতে পারে না, দায়িত্বশীল পদে তাহাদের বসানো চলে না, ইংরেজ চলিয়া গেলে হিন্দু মুসলমান ত বটেই অন্যান্য বহু জাতি অধ্যুষিত ও বহু ভাষাভাষী ঐক্যহীন দেশে নিজেরা কাটাকাটি মারামারি করিয়া মরিবে। ঠিক এই সব ধরণের কথাই গল্পে, উপন্যাসে ও কবিতায় ফুটিয়া উঠিতেছে। ইহাদের লেখকেরা কতটা সরকারী গুপ্ত প্রচারকদের প্ররোচনায় এই ধরণের 'সাহিত্য' সৃষ্টি করিতেছেন আর কতটা নিজেদের অনুদারদর্শিতা অজ্ঞতা ও অশিক্ষার জন্য করিতেছেন তাহা বোঝা শক্ত। আমাদের জাতীয় চরিত্রের গ্লানিকে বাহিরে দেখাইবার জন্য বহু ক্যাথারিন মেয়ো, বিত্তাবলি নিকল্‌স্ আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের লেখকদের হাত মিলাইয়া নিজেদের কলুষিত করিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? সাম্প্রদায়িক ঐক্য যে কেন নাই, যে দুর্ভিক্ষের জ্বালায় নারী তার দেহ বিক্রয় করে সে দুর্ভিক্ষ যে কেন হয়—একথা কি আমাদের এই সব সাহিত্যিকেরা জানেন না? এবং জানিলেও যদি লিখিতে সাহস না পান তবে এই সব পরিস্থিতি তাঁহারা তাঁহাদের গল্পে কাব্যে উপন্যাসে সৃষ্টি করিয়া জাতিকে আরো নীচুতে টানিয়া নিতে কেন চেষ্টা করেন?

আমরা কি ছিলাম, কি হইয়াছি ও কেন হইয়াছি এই আলোচনা আমাদের যুব-সম্প্রদায়কে করিতে আহ্বান করিতেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এই সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল হইব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কর্মপন্থা আমরা সুষ্ঠু ভাবে স্থির করিতে পারিব না। আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থার কারণ যে আমাদের বর্তমান পরাধীনতা, এই কথাটা আজ আমাদের সর্বদা বুঝিতে হইবে। এবং এই পরাধীন অবস্থার হাত হইতে মুক্তি না পাইলে জাতি কখনও অনিবার্য ধ্বংসের হাত হইতে রেহাই পাইতে পারে না।

আজ ভারতবর্ষ যে আর্থিক দৈন্যদশার অতিনিম্নস্তরে পতিত হইয়াছে তাহার কারণ এই পরাধীনতা। ১৯৩১ সনের সেন্সাস অনুসারে দেশের মাত্র ১০·৩৪% লোক কোন-না কোন শিল্পের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করিত। এবং ঐ বছরে দেশের জনসংখ্যার মাত্র ১% লোক কোন না কোন ফ্যাক্টরী আইনের অধীনস্থ কারখানায় কাজ করিত। দেশের প্রায় তিন ভাগ লোককেই জমীর উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করিতে হয়। ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং ইনকোয়ারি কমিটীর রিপোর্ট (১৯৩১) অনুসারে একজন ভারতীয় চাষীর বার্ষিক আয় মাত্র তিন পাউণ্ড বা দৈনিক ৵০ আনা। যদিও আমাদের দেশের জমী সহজেই অতিশয় উর্বর, তবুও আমাদের চাষী যে এই সামান্য উপার্জন করে তাহার কারণ ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্যের জন্য জমী ক্রমাগত ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হইয়া এমন এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে চাষোৎপন্ন শস্যের পরিমাণ যৎসামান্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং একই কারণে ভূমিশূন্য চাষী-শ্রমিকের সংখ্যাও দিনের পর দিন বাড়িয়া যাইতেছে। বর্তমান যুদ্ধে অনাহারে, অভাবে পড়িয়া ও অন্যান্য নানাকারণে সৈন্যদলে সামরিক ও বেসামরিক নানা শ্রেণীর প্রায় ৪০ লক্ষ লোক যোগ দিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই ভূমিহীন চাষী-শ্রমিক সম্প্রদায়ের লোক; ইহারা ফিরিয়া আসিলে জমীর উপর চাপ যে আরো বৃদ্ধি পাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং আমাদের জাতীয় দুর্দশা আরো বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য।

ইংরেজ আসিবার পূর্বে আমাদের জমী এমন ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত ছিল না। বোম্বাইর প্রাক্তন ডিরেক্টর অভ্ এগ্রিকালচার ডাঃ মান ১৯১৭ সালে লিখিয়াছিলেন, যে ইংরেজ আসিবার অব্যবহিত পূর্বে এবং আসিবার প্রথম সময়ে প্রত্যেকটি জমিই (holding) বেশ বৃহৎ আকারের, সাধারণতঃ ৯ বা ১০ একরের মত (২৭ হইতে ৩০ বিঘার) ছিল; এবং

জাতি-বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ (২)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভারতবাসীরা পাশ্চাত্য শিক্ষা তথা ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্যক্‌রূপে আহরণ করিতে পারিলে ইংরেজের অধীনতাপাশ অবিলম্বে ছিন্ন করিবে এইরূপ একটি ধারণা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ভারতীয় ও ইংলণ্ডীয় মনীষীদের মনে বলবৎ ছিল, পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া দেখিলে এই ধারণার সারবত্তা বা অ-সারবত্তা উপলব্ধি হইবে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে এই সময়কার আরও কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিলাতে এদেশবাসীদের চরিত্র, জীবন, শিক্ষা, সংস্কৃতি সম্বন্ধে কিরূপ হীন প্রচারকার্য্য চলিতেছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা পাইয়াছি। ইংরেজগণ এই প্রচারের ফলে ভারতবাসীদের অদ্ভুত জীব বা অন্তর্জ্ঞানোত্থার বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছিল। পাদ্রী লঙ্‌ বিশপ হিবার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন :

"Few men felt a livelier sympathy in the condition of the Hindus: he was far from adopting a notion then prevalent, that the whole of the Hindus were a kind of moral monsters. Ward's account of the Hindus has contributed to foster this view. Many of Mr. Ward's remarks respecting the cruelties and immoralities among the Hindus are no more applicable to the body of the people than description of the Billingsgate and the Old Bailey, in London, would be to the inhabitants of the west end of the town."*

অর্থাৎ, বিশপ হিবারের মত অতি অল্প লোকই হিন্দুদের প্রতি এরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তখনকার খ্রীষ্টানদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, হিন্দুরা মনুষ্যরূপী চতুষ্পদ জীব বিশেষ। ইহাদের সম্বন্ধে এই হীন ধারণার জন্য প্রধানতঃ দায়ী ওয়ার্ড সাহেবের পুস্তক। হিন্দুদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতা ও দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগ বর্ত্তমানে যতখানি সত্য, যতখানি সত্য লণ্ডন ওয়েষ্ট এণ্ডের সমগ্র অধিবাসীদের উপর 'বিলিংস্‌গেট' ও 'ওল্ড্‌ বেলি'র দোষারোপ।

বিজেতৃজাতি স্বদেশে বসিয়া এবাবৎ হিন্দুদের নিন্দাবাদ করিয়াছেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের অবাধ চলাফেরার বিরুদ্ধে যাবতীয় বিধিনিষেধই তুলিয়া দেওয়া হইল। তখন হইতে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ নানা ভাবে ভারতবাসীদের মধ্যে 'আলো' বিতরণ করিতে তৎপর হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের শিক্ষা-প্রচেষ্টার কথা এবং তাহাতে আমাদের যে শুভ ফল হইয়াছিল তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। ভারতবাসীদের খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে হইলে তাহাদিগকে যে অগ্রে সাক্ষর করিয়া লইতে হইবে এ জ্ঞান তাঁহাদের ছিল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এদেশে খ্রীষ্টানগণ নিজস্ব পদ্ধতিতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনে তৎপর হইলেন। তাঁহারা একরকম প্রকাশ্যেই বলিলেন যে, অন্তঃপুরে শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া নারীদের মধ্যে খ্রীষ্টকথা প্রচার করিতে পারিলে আশু ফল পাওয়া যাইবে। অন্তরের ভাগ আলোকিত হইলেই বহির্ভাগ স্বতঃই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে! বালক বিদ্যালয়গুলিতে সাক্ষাৎভাবে খ্রীষ্টকথা না শুনাইলেও, বালিকা বিদ্যালয়সমূহে ইহা পাঠের অঙ্গ হইল। হিন্দু ধর্ম্ম, হিন্দু দেবদেবী, হিন্দু পালপার্ব্বণ প্রভৃতির উপরে তাহাদের কিরূপ কুধারণা ও জাতক্রোধ ছিল, এই সকল বিদ্যালয়ের কার্য্যবিবরণী হইতে তাহা জানা যায়। এখানে মাত্র দুই একটি উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। বালিকাদের নাম ছিল বিভিন্ন হিন্দু দেবীর নামানুযায়ী, যেমন—অন্নপূর্ণা, দিগম্বরী, গোলোকমণি, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভৃতি। এই সব নাম সম্বন্ধে এক বিবরণীতে এইরূপ মন্তব্য পাওয়া যাইতেছে :

"While these names from their novelty to an English ear may excite a smile, they will also, when they are considered in connection with the idolatrous feelings which prompted the parents of the children to adopt them, and which they serve to cherish in the minds of

* *Hand-Book of Bengal Missions* By the Rev. James Long. পৃঃ ৪০১।

the children themselves, excite a sigh of regret from the Christian. What kind of conduct ought we to expect from those poor children, named by their parents after imaginary goddesses, whose adultery, cruelty and gratification of other passions, as detailed by their own sacred writings are so abominable."*

এখানে এই মর্মে বলা হইতেছে যে, উক্ত নামগুলি ইংরেজদের কর্ণে নূতন ঠেকিবে ও তাঁহারা মৃদু হাসিবেন, কিন্তু যখন তাঁহারা বুঝিবেন পৌত্তলিক মনোভাবের বশে দরিদ্র হিন্দুগণ কন্যাদের এই নামকরণ করিয়াছে আর সত্য সত্যই তাহারা তাহাদের মনে এই ভাব বদ্ধমূল করাইতে প্রয়াসী তখন খ্রীষ্টানগণ (ইহাদের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া) দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে বাধ্য হইবেন। যাহাদের পিতৃদত্ত নাম নিষ্ঠুর, ব্যভিচারী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ দেবদেবীর নাম অনুসারে করা হইয়াছে সেই সব ছাত্রীর নিকট হইতে আর কিরূপ আচরণ আশা করা যাইতে পারে।

অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে খ্রীষ্টতত্ত্ব প্রচার করাই যে স্ত্রীশিক্ষা দানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাহা নিম্নের উক্তিতেই পরিষ্কার হইয়াছে :

"Some others now engaged in the degrading and polluting worship of idols, shall be brought to the knowledge of *the true God* and *Jesus Christ whom he has sent, whom to know is life eternal.*"†

অর্থাৎ, "যাহারা এখন মূর্তিপূজা দ্বারা নিজেদের কলুষিত করিয়া অধঃপতিত হইতেছে, তাহাদিগকে সত্যকার ঈশ্বর ও যীশুখ্রীষ্টের সম্বন্ধে জ্ঞানদান করিতে হইবে—সেই যীশু যিনি ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ এবং সেই যীশু যাঁহাকে জানা ও চিরন্তন জীবনলাভ একই কথা।"

খ্রীষ্টান পাদ্রীদের বিরুদ্ধে রামমোহন রায়ের আন্দোলনের কথা পূর্বে বলিয়াছি। তিনিও পৌত্তলিকতায় আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। তিনি ছিলেন বেদান্তসম্মত অপৌত্তলিক একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে তাঁহার যে বিতর্ক উপস্থিত হয় তাহার উপসংহারে ১৫ নবেম্বর, ১৮২৩ তারিখে তিনি লেখেন :

I shall now, in a few words, for the information of the Missionary Gentlemen, lay down our religious creed, in conformity with the Precepts of our ancient religion, contained in the Holy Vedanta, though disregarded by the generality of moderns, we look up to *one Being* as the animating and regulating principle of the whole collective body of the universe, and as the origin of all individual souls which in a manner somewhat similar, vivify and govern their particular bodies : and we reject idolatry in any form and under whatsoever veil of sophistry it may be practised, either in adoration of an artificial, a natural, or an imaginary object. The divine homage which we offer, consists soleely in the practice of *daya* or benevolence towards each other, and not in a fanciful faith or in certain motions of the feet, legs, arms, head, tongue or other bodily organs, in pulpit or before a temple. Among other objects in our solemn devotion, we frequently offer up our humble thanks to God, for the blessings of British Rule in India and sincerely pray, that it may continue in its beneficent operation for centuries to come.";

রামমোহন ইংরেজের সহযোগিতা কামনা করিতেন। তিনি বেদান্তসম্মত যে ধর্মের ব্যাখ্যা করিলেন তাহার ভিত্তিতে শুধু হিন্দু নয়, খ্রীষ্টানগণও মিলিত হইতে পারিবেন—এই আশা তিনি পোষণ করিতেন। তিনি ভারতবর্ষে ইংরেজদের স্থায়ী বসবাসের এবং ইংরেজী ভাষা ও ভাবধারার বহুল প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। আর এইজন্যই তিনি পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফকে এদেশে সর্বপ্রথম স্কুল প্রতিষ্ঠা করিতে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের শুভ ফল বহু শতাব্দী যাবৎ যাহাতে ভারতবাসী ভোগ করিতে পারে তাহারও তিনি কামনা করেন। কিন্তু রামমোহন যে কারণে উক্ত আশা পোষণ করিতেছিলেন তাহা কার্যে ফলান্বিত হইতে পারে নাই। বিজিত ভারতবাসীর প্রতি সাধারণভাবে এবং তাহাদের ধর্ম শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ ভাবে বিজেতা খ্রীষ্টান জাতির বিজাতীয় বিদ্বেষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছিল। খ্রীষ্টান তথা ইংরেজ সমাজের মুখপাত্র রূপে ডাফ, ডিয়াল্‌ট্রি প্রমুখ পাদ্রীগণ ক্রমাগত হিন্দু সমাজের উপর গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। হিন্দু সমাজ স্বভাবতঃই ইহাতে বিশেষ

* *The Calcutta Journal*, March 11, 1822. ঐ উ।

† *The English Work of Raja Rammohan Roy*. পাণ্ডিপি আদিল সংস্করণ পৃ. ১২৮।

-শঙ্কাঙ্কিত হইয়া উঠিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বদেশীয় সমাজের ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য পছন্দ করিতেন না। তিনি পাদ্রীদের নামকরণ করিয়াছিলেন 'কালো কোট পরা বিলাতী ব্রাহ্মণ'। দ্বারকানাথ ঠাকুর ওদিও

"ইংরাজদের সকল বিষয়েই প্রশংসা করতেন, কিন্তু পাদ্রীকুলের কোন নিন্দাবাদ বা লজ্জাজনক ব্যবহারের কথা জানতে পারলে তিনি ভারি আমোদ বোধ করতেন।... তাঁর একখানি খাতা ছিল যার মধ্যে তিনি অতি যত্নসহকারে পাদ্রীদের নিন্দাজনক নানা কথা লিখে রাখতেন।... যখনই খৃষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্মের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠতা নিয়ে কারো সঙ্গে তর্ক বাধতো, দ্বারকানাথ তখনই সেই খাতাখানি প্রমাণস্বরূপ পেশ করতেন।*

হিন্দু তথা ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের কিরূপ জঘন্য ধারণা ছিল তাহা চার্লস গ্রাণ্টের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। কিন্তু আপামর সকল ইংরেজের নিকটই ভারতীয় সমাজ এরূপ ঘৃণিত প্রতিপন্ন হয় নাই। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের উক্তি তাহার প্রমাণ। কলিকাতার লর্ড বিশপ হিবারের উক্তিও এখানে উদ্ধৃত করা চলে। তিনি বলেন :

"They are a nation, with whom whatever their faults, I, for one, shall think it impossible to live long without loving them—a race of gentle and temprate habits, with a natural talent and acuteness beyond the ordinary level of mankind, and with a thirst for general knowledge which even the renowned and the inquisitive Athenians can hardly have surpassed or equalled." †

"হিন্দুরা এমন একটি জাতি যাহাদের সঙ্গে, তাহাদের যতই দোষ থাকুক না, একবার বাস করিলে না ভালবাসিয়া থাকা অন্ততঃ আমি অসম্ভব মনে করি—তাহারা এত শান্ত ও মিতাচারী, সাধারণ স্তরের মানুষ অপেক্ষা তাহাদের সহজ প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এত পর্যাপ্ত। হিন্দুদের জ্ঞানপিপাসা বড়ই প্রবল; এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু বিখ্যাত এথেন্সবাসীরাও হয়ত তাহাদের সমকক্ষ ছিলেন।"

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের মত বিশপ হিবারের উক্তিও সাধারণ হইতে ব্যতিক্রম মাত্র। ভারতবাসীর জীবন ও চরিত্রের জঘন্য চিত্র চিত্রণের ফলেই সম্ভবতঃ ১৮৩১ সালে পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটি সাক্ষীদিগের নিকট যে প্রশ্নপত্র প্রচার করেন তাহার মধ্যে এই প্রশ্নটিও সন্নিবেশিত হইয়াছিল—"What is the moral condition of the people?"‡ "ভারতবাসীদের নৈতিক চরিত্র কিরূপ?"

রামমোহন ইহার উত্তরে এই মর্মে বলিয়াছিলেন যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া এক এক শ্রেণীর ইংরেজ ভারতবাসীদের এক এক ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। যাঁহারা সৎ লোকের সংস্পর্শে প্রথম হইতেই আসিয়াছেন তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে ভাল, আর যাঁহারা অসৎ লোকের ফন্দিফিকিরে পড়িয়াছেন তাঁহারা সমগ্র জাতির চরিত্রের উপরই মসি লেপন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া এমন সব লোকও আছেন যাঁহারা উভয় হইতেই ভিন্ন মত পোষণ করেন। অতঃপর তিনি স্বদেশবাসীদের সম্বন্ধে বলেন :

"From a careful survey and observation of the people and inhabitants of various parts of the country, and in every condition of life, I am of opinion that the peasants and villagers who *reside at a distance from large towns and* head stations and courts of law, are as innocent, temperate and moral in their conduct as the people of any country whatsoever; 2ndly, The inhabitants of the cities, towns or stations who have much intercourse with persons employed about the courts of law, by zamindars, etc., and with foreigners and others, in a different state of civilization, generally imbibe their habits and opinions. Hence their religious opinions are shaken without any other principles being implanted to supply their place. Consequently a great proportion of these are inferior in point of character to the former class and are very often made tools of in the nefarious work of perjury and forgery; 3rdly, a third class consists of persons who are in the employ of landholders (zamindars) or dependent for subsistence on the courts of law, as attorney's clerks, and who must rely for a livelihood on their shrewdness; not having generally sufficient means to enter into commerce and business." ‡

রামমোহন এখানে তিন শ্রেণীর ভারতবাসীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন।—(১) যাহারা শহর হইতে দূরে পল্লীগ্রামে থাকে, (২) যাহারা শহরে বিভিন্ন কর্ম ব্যপদেশে অবস্থান করে এবং (৩) যাহারা শহরে মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনায় সাহায্য

* দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত ম্যাক্সমূলারের কথোপকথন। সাহিত্য সম্রাজ্ঞী রমাপ্রসাদ ঠাকুর কর্তৃক 'আমার বাল্যকথা ও আমার বোম্বাই প্রবাস' পুস্তকে ১০৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। † *Hand-Book of Bengal Missions* পৃ ৪২। ‡ *The English Works of Raja Rammohan Roy*. পাণিনি আপিস সংস্করণ, পৃ ২৮৬-৭।

করিয়া জীবিকার সংস্থান করে। প্রথম শ্রেণীর ভারতবাসীরা চরিত্রবত্তা, মিতাচার, সরলতা প্রভৃতি গুণে যে-কোন দেশের অধিবাসীদের সমকক্ষ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা আইন-আদালতের সংস্রবে আসিয়া এবং বিদেশীর প্রলোভনে পড়িয়া ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত হয় ও জালজুয়াচুরি বা মিথ্যার আশ্রয় নেয়। তবে রামমোহন সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেন যে, উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পাইলে তাহারাও উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিকজ্ঞান-সম্পন্ন সচ্চরিত্র ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে। নিজ অভিজ্ঞতা হইতেই তিনি এসব কথা বলিতেছেন।

ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে যেরূপ, ভারতবাসীর শিক্ষা সংস্কৃতি সম্বন্ধেও তদ্রূপ বিজেতৃগণ নানা অসত্য ও অর্ধ সত্য প্রচার করিতে থাকে। টমাস বেবিংটন মেকলে মাত্র ১৮৩৪ সালে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। কিন্তু ইহার পূর্বে বিলাতে অবস্থানকালেই তিনি ভারতবাসীদের সম্বন্ধে হীন প্রচার-সাহিত্য হইতে একটা ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি এদেশে আসিবার পূর্বে পার্লামেণ্টে ভারত-শাসন সম্পর্কে যে বিখ্যাত বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা পাঠেও জানা যায় যে, তিনি ভারতের অতীত ইতিহাস বা ঐতিহ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। তিনি এদেশে আসিয়া ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান—এক কথায় সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহাতে এক দিকে যেমন তাঁহার গভীর অজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছিল অন্য দিকে ভারত সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার-কার্য বিলাতে কিরূপ সুষ্ঠু ও সুনিয়মিত ভাবে পরিচালিত হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়। মেকলের এই কথাটি তো আজ প্রায় সকলেরই জানা যে, ভারতবর্ষ ও আরবের যাবতীয় বিদ্যার পুস্তকসমূহ ইউরোপের যে-কোন প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগারের আলমারির একটি মাত্র তাকে পুরিয়া রাখিতে পারা যায়। ১৮৩৫, ৭ই ফেব্রুয়ারী বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে প্রদত্ত শিক্ষাবিষয়ক মন্তব্য-লিপিতে তিনি ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যে সব উত্তম উত্তম কথা বলিয়াছেন সে সকল সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। তবে ইংরেজী সাহিত্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্য বিজ্ঞানের যখনই তিনি তুলনা করিতে গিয়াছেন তখনই তিনি ঘোর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আর ইহাই তাঁহার পূর্বেকার কুশিক্ষার দ্যোতক। ইংরেজী ভাষার গুণকীর্তন করিয়া তিনি লিখিলেন :

"The question now before us is simply whether, when it is in our power to teach this language, we shall teach languages in which by universal confession, there are no books on any subject which deserve to be compared to our own, whether, when we can teach European science, we shall teach systems which, by universal confession, wherever they differ from those of Europe differ for the worse, and whether, when we can patronise sound philosophy and true history, we shall countenance at the public expense, medical doctrines which would disgrace an English farrier, astronomy which would move laughter in girls at an English boarding school, history abounding with kings thirty feet high and reigns thirty thousand years long, and geography made of seas of treacle and seas of butter."*

মন্তব্য-লিপির অন্যত্র মেকলে আবার বলিতেছেন :

"But to encourage the study of a literature, admitted to be of small intrinsic value, only because that literature inculcates the most serious errors on the most important subjects, is a course hardly reconcilable with reason, with morality, or even with that very neutrality which ought, as we all agree, to be sacredly preserved...We are to teach false history, false astronomy, false medicine, because we find them in company with a false religion. We abstain, and I trust shall always abstain, from giving any public encouragement to those who are engaged in the work of converting the natives to Christianity. And while we act thus, can we reasonably or decently bribe men, out of the revenues of the State, to waste their youth in learning how they are to purify themselves after touching an ass or what texts of the Vedas they are to repeat to expiate the crime of killing a goat?"†

উদ্ধৃত দুইটি অনুচ্ছেদই পরস্পরের পরিপূরক। মেকলে বলেন, ইউরোপীয় ও ভারতীয় দর্শন বিজ্ঞান যেখানে পরস্পর-বিরোধী, সেখানে ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞানই মিথ্যা। ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান হইতে ইংরেজ অশ্ব-চিকিৎসকেরও কিছু শিখিবার নাই। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র বিলাতের যে-কোন জ্যোতিঃ স্কুলের বালিকারও হাস্যের উদ্রেক করে। ইতিহাস এমন সব রাজার কাহিনীতে পূর্ণ যাঁহারা ছিলেন ত্রিশ হাত

* সৈয়দ মুজফর ও জি. পি. মাথেক কৃত *History of Education in India*; পৃ. ১০৬-৭-এ উদ্ধৃত।

† ঐ, পৃ. ১০৭।

উঁচু আর রাজস্ব করিয়াছিলেন ত্রিশ হাজার বছর। আর ভূগোল, তাতে রহিয়াছে মাথন আর মাতগুড়ের কত সমুদ্র আছে তাহার বিবরণ।

দ্বিতীয় উক্তিটিতে কিন্তু মেকলে সাহেবের আসল কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলিতেছেন যে, যখন ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষতাই অবলম্বন করা হইতেছে তখন মিথ্যা ধর্মের সঙ্গে যে মিথ্যা ইতিহাস, মিথ্যা জ্যোতির্বিদ্যা, মিথ্যা চিকিৎসাশাস্ত্র বিজড়িত সে-সব শিক্ষার জন্য সরকারী রাজস্ব হইতে উৎকোচস্বরূপ লোককে অর্থ প্রদান করা কি যুক্তিসঙ্গত ?

যে মিথ্যা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত বলিয়া ভারতীয় ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, বিজ্ঞান যাবতীয় বিদ্যাই মিথ্যা হইল তাহার প্রতি নিরপেক্ষ থাকা সরকারী ভাবে সম্ভব হইলেও ব্যক্তিগত ভাবে সম্ভবপর ছিল না, এমনকি মেকলের পক্ষেও নহে। তাই মেকলে পিতাকে পত্রে লিখিলেন :

"The effect of this [English] education on the Hindoos is prodigious. No Hindoo who has received English education, ever remains sincerely attached to his religion. Some continue to profess it as a matter of policy ; but many profess themselves as Deist, and some embrace Christianity. It is my firm belief that if our plans of education are followed up, there will not be a single idolator among the respectable classes in Bengal thirty years hence. And this will be effected without efforts to proselytize ; without the smallest interference with religious liberty ; merely by the natural operation of knowledge and reflection."*

ইংরেজী শিক্ষাদানের যেরূপ মতলব আঁটা হইয়াছে তাহাতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই ভারতবাসীরা খ্রীষ্টান বনিয়া যাইবে—মেকলে পিতার নিকট এই মর্মের কথা লিখিলেন। মেকলে-বাঞ্ছিত ইংরেজী শিক্ষার ঈদৃশ ফলাফলের কথা শুনিয়া স্বর্গলোক হইতে রামমোহন রায় ও লাডলো স্মিথ নিশ্চয়ই খুশী হইতে পারেন নাই।

* *The Modern Review* for May, 1945, P. 210.

প্রাচ্যে জাতীয়তার অভ্যুত্থান

(চৈত্র ১৩৪১এর পর)

শ্রীঅন্তেবাসী

জাতীয়তাবাদের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যজগতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল প্রাচ্যেও ঠিক সেইরূপ বিবর্তনের সূচনা হইয়াছে। প্রাচীন যুগের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাগুলি ভাঙিয়া পড়িতেছে এবং বর্তমান শিল্প বিপ্লব, পাইকারী ব্যবসা ও মূলধনী কারবারের পদ্ধতি সমাজ জীবনের সর্বত্র প্রবেশ করিতেছে। প্রাচীন অভিজাত ভূস্বামী, যোদ্ধা ও পুরোহিত সম্প্রদায় ধীরে ধীরে ক্রমপ্রসর ব্যবসায়ী,ব্যবহারজীবি ও শিক্ষিত সমাজগুলির নিকটে পিছাইয়া পড়িতেছে। এই নবীন জাতীয়তাবাদের প্রচারক ও নেতা হইতেছে সাধারণতঃ উকীল ও ছাত্র-সম্প্রদায়; এই আন্দোলনকে তাহারাই জনযুক্ত করিতেছে। সংবাদপত্রও জাতীয়তাবাদের অগ্রগমনের পক্ষে এক বিরাট শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অপরদিকে প্রাচ্যের আভ্যন্তরীণ জীবনে এই জাতীয়তাবাদ এক বিরাট সংঘর্ষ আনয়নের কারণ হইয়াছে। যখন এক একটা সম আদর্শ ও স্বার্থবিশিষ্ট শ্রেণী নিজেরা একত্রিত হয় তখন শ্রেণীগুলির ভিতরে আবার সংঘর্ষের উদ্ভব না হইয়া পারে না। বর্তমান জাতীয়তাবাদের ইহা একটা অপরিহার্য ফলদ। তবে শ্বেতজাতিগুলির বিরুদ্ধে সমগ্র প্রাচ্যে যে একটা বিদ্বেষভাব আছে সেই বিদ্বেষভাবই এই আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষকে তীব্র হইতে দেয় না।

জাতীয়তাবাদের দিকে যে ঐতিহাসিক বিবর্তন ইওরোপে অল্পদিন হইল শেষ হইয়াছে প্রাচ্যে যেন সেই বিবর্তনই বর্তমানে কাজ করিতেছে। এবং এই বিবর্তন প্রাচ্যের বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে একটা গোষ্ঠীভাব সৃষ্টি করিতে যে সাহায্য করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ইওরোপে এই বিবর্তনের ধারা যেরূপ ছিল প্রাচ্যে তাহার গতি তদপেক্ষা

অধিক এবং ইহার মূলে রহিয়াছে শ্বেতজাতিদের বিরুদ্ধে প্রাচ্যের বিদ্বেষভাব।

কিন্তু এই ঐতিহাসিক বিবর্তন পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে যে শীঘ্রই একটা সম্পূর্ণ নূতন রূপ নিবে তাহারও একটা আভাস দেখা যাইতেছে। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিপ্লবই ইহার প্রথম পরিচয়। সামন্ত প্রথার পর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আধিপত্যাধীন যে মূলধনীপ্রথা ইওরোপীয় সমাজে ঠাঁই নিয়াছিল সেই প্রথা সুতীব্র আঘাত পাইল রাশিয়ার সামাজিক বিপ্লবে। এই সর্বপ্রথম বঞ্চিত, সর্বহারা শোষিত শূদ্র সম্প্রদায় এক নবীন আশার বাণী নিজেদের জীবনে সার্থক হইয়া উঠিবার লক্ষণে চঞ্চল হইয়া উঠে। ফরাসী বিপ্লবে গণ-মানস যে আশায় উৎফুল্ল হইয়াছিল, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থ চেষ্টায় সে আশা ফলবতী হইতে পারে নাই। রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের মধ্যে শূদ্রশ্রেণী সমস্ত শৃংখল ভাঙ্গিয়া রাষ্ট্র ও সমাজ শক্তি দখলের আশা পাইল। জাতীয়তাবাদ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাবাধীন মূলধনী সমাজ ইহাতে স্বভাবতই প্রচণ্ড আঘাত পায়। এই প্রথম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে লড়াই সামাজিক শ্রেণী সংগ্রামে পরিণত হইতে চাহিল। এই নূতন সর্বহারা শ্রেণী যে একদিন তাহার সংস্কৃতি,আদর্শ ও বাণী দ্বারা পৃথিবীকে জয় করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। একদিনেই অবশ্য এই পরিবর্তন হইবে না—ধীরে ধীরে ইহার অগ্রগতি হইবে। ১৮৩২এর পর ইংল্যাণ্ডের বিরাট অভিজাত সম্প্রদায় প্রায় ১৯১১ সাল পর্যন্ত যেমন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে প্রায় অক্ষুণ্ণ ভাবে নিজেদের শক্তিকে বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল; জার্মানীতে যেমন ১৯১৮ পর্যন্ত অভিজাত শ্রেণী ও জোঙ্কু-সম্প্রদায় একসঙ্গেই সমাজ ও রাষ্ট্রে নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখিয়াছিল, বর্তমানের রাষ্ট্র ও সমাজশক্তির নিয়ন্তা মধ্যবিত্ত বা তৃতীয় সম্প্রদায়ও তেমনি বহুবর্ষ ধরিয়া যে এই তথাকথিত চতুর্থ সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাত মিলাইয়া চলিবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ধর্ম যেমন ক্ষীয়মান ভাবে মানবচিত্তের উপর খানিকটা প্রভাব এখনও রাখিয়াছে জাতীয়তাবাদও তেমনি এখনও কিছুদিন ধরিয়া ক্রমবর্দ্ধমান সামাজিক শ্রেণীসংগ্রাম-বাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।

প্রাচ্যে জাতীয়তাবাদের যে বিবর্তন বর্তমানে চলিতেছে তাহা নানাদিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। ইওরোপে যে গোষ্ঠীভাব আশ্রয় হইয়া উঠিয়াছে সেই গোষ্ঠীভাবের প্রভাব প্রাচ্যেও আসিয়াছে—ইহার এক কারণ প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের ক্রমবর্দ্ধমান ঘনিষ্ঠতা ও অপর কারণ এশিয়া-রুষে গণবিপ্লব। জারের ইওরোপ-এশিয়াব্যাপী বিরাট রুষ-সাম্রাজ্য সোভিয়েট বিপ্লবের মধ্যে আসার ফলে এশিয়ার রুষ-সাম্রাজ্যও তাহার প্রভাব হইতে মুক্তি পায় নাই। ইহার ফলে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের সঙ্গে সামাজিক গণবিপ্লবের আদর্শ আসিয়া মিলিত হইয়াছে। সমাজের যে অর্থনৈতিক অবস্থা সামাজিক বিপ্লবকে পরিণতি দান করে প্রাচ্যের বহু রাষ্ট্রে সেরূপ অবস্থা না থাকিলেও জাতীয় সংগ্রাম ও সামাজিক বিপ্লবের বিবর্তনের মধ্যে নানারূপ বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারার সন্নিবেশ ঘটিয়াছে। জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম ও সামাজিক গণবিপ্লবী সংগ্রাম এখন একে অপরের সাহায্যে অগ্রসর হইতেছে। কম্যুনিজম জাতীয়তা-বাদের বিরোধী হইলেও তৃতীয় আন্তর্জাতিক এশিয়ায় তাহার প্রচার কার্যে জাতীয় সংগ্রামকে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। জার্মাণীর উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদ ও ম্যাৎসিনির ইতালিয় জাতীয়তাবাদ যেমন সমাজের সর্বনিম্নস্তরে মুক্তির বাণী প্রচার করিয়াছে এশিয়ার জাতীয়তাবাদ তেমনি এখন সামাজিক গণবিপ্লবের বাণী প্রচার করিতেছে। টিউনিসের জাতীয়তাবাদীদল *The Young Tunisians* তাহাদের নক্সের (১৯২৪) ঘোষণায় সামগ্রিক ভোটে নির্বাচিত পার্লামেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটী যেমন দাবী করিয়াছিল তেমনি কারখানায় ৮ ঘণ্টা হিসাবে দৈনিক বেতন ও ট্রেড ইউনিয়ন-গুলির বৈধতাও দাবী করিয়াছিল। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর শিক্ষিতেরাই এই সব দাবী উত্থাপন করিতেছে,—চাষী বা মজুরেরা এখনও তাহাদের দাবীকে ভাষা দিবার শক্তি অর্জন করে নাই। আসলে প্রাচ্য এখন একশত বৎসর পূর্বের ইওরোপের অবস্থায় আছে—যদিও তাহাদের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি রহিয়াছে যুদ্ধোত্তর ইওরোপের দিকে। এই বিরোধের ফলে প্রাচ্যের অগ্রগমন হয়ত আরো দ্রুত হইবে। কিন্তু একথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে প্রাচ্যে যে সমাজ-প্রথা বর্তমান তাহাতে নানা বাধা বিপত্তিকে এই অগ্রগমন যদি দলাইয়া না ফেলিতে

পারে, তবে জাতীয়তাবাদ ও সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস একটা বিশেষ আকার পাইবে।

বর্তমানে প্রাচ্যের গোষ্ঠী-ভাবের গতি হইতেছে পশ্চিমাভিমুখী। ইহা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নহে। মানব-সভ্যতার বিবর্তন একটা ঐতিহাসিক গতিধারাকে অনুসরণ করিয়া চলে; ইওরোপীয় সভ্যতার গোষ্ঠীভাব প্রথমে এই ধারাতেই চলিয়াছিল এবং তাহারও পূর্বে প্রাচ্যের অগ্রগমন আরেকবার ঘটিয়াছিল। বর্তমানে প্রাচ্য যে পশ্চিমের অনুসরণ করিতেছে তাহা অনুকরণ নহে। গত দুই শতাব্দী ধরিয়া ইওরোপে যে ঐতিহাসিক বিবর্তন ঘটিয়াছে,—জাতীয়তাবাদ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য ও সর্বশেষ চতুর্থ সম্প্রদায় বা সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শক্তিতে প্রাধান্য লাভ—এই সবই প্রাচ্যে দেখিতে পাইতেছি। ইহার মধ্যে প্রতীচ্যের খানিকটা অনুকরণ প্রচুর করিলেও তাহার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদও জাগিয়া উঠিয়াছে। হুবহু পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণের মধ্যে যে প্রাচ্যের মুক্তি নাই, সেকথা সর্বত্রই শোনা যাইতেছে। প্রাচ্যের সংস্কৃতি, প্রাচ্যের আদর্শকে বিলুপ্ত হইবার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ভারতে, চীনে, জাপানে জাগিয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্যের যাহা কিছু ভাল তাহা নিতে কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু অবিচারিত চিত্তে পাশ্চাত্যের সব কিছু গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সর্বত্র জাগ্রত হইয়াছে। প্রাচীর অতীত গৌরবের ইতিহাসকে বিস্মৃত হইলে চলিবে না—তাহার সহিত পাশ্চাত্যের বাস্তব বিজ্ঞানের দানের সমন্বয় করিয়া তাহা গ্রহণ করিবার জন্য প্রাচ্যের মনীষিদের সতর্ক বাণী প্রাচ্যের জন-সাধারণের হৃদয় সহজেই আকর্ষণ করে।

কিন্তু প্রাচ্যের এই সতর্কতার বাণী এক প্রাচ্যেই সীমাবদ্ধ নাই—প্রাচ্যের অতীত দর্শন বিজ্ঞানের বাণী প্রতীচির মনীষিদেরও আকৃষ্ট করিয়াছে। বাস্তব সভ্যতার যে নির্মমতম প্রথম মহাযুদ্ধের নৃশংসতার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহাই ইওরোপের মহামনীষিদের সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল; এবং যদিও প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইওরোপ ও এশিয়ার তিনটি মানব সভ্যতা গোষ্ঠী পরস্পর বিজিগীষু অবস্থায় ছিল তবু সভ্যতার বিবর্তন হইতে মনে হয় যে মানব সভ্যতা এই নৃশংস বিরোধিতার মধ্য দিয়াই এমন একটি মহাগোষ্ঠীর সূচনা করিতেছে যাহা মানব সভ্যতাকে বৃহত্তর পরিণতির দিকে টানিয়া নিয়া যাইতেছে—যে পরিণতি সমগ্র মানব সভ্যতার সাম্য, প্রেম ও মৈত্রীর মধ্য দিয়াই বিকশিত হইবে।

[সমাপ্ত]

হান্স্ কহ্নের *The History of Nationalism in the East* অবলম্বনে লিখিত।

বাঙ্গালা দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট

কালীচরণ ঘোষ

বাঙ্গালার বুকের উপর ১৩৫০ সালে যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটিয়া গেল, আজও তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে বলা চলে না। মানুষ পূর্ব্বের সংখ্যায় আর না মরিলেও অনশনঘটিত মৃত্যু এখনও বিরল নয়। বাঙ্গালীর কষ্টের পরিসীমা নাই; '৫০ সালে অন্ন, '৫১ সালে ঔষধ পথ্য, '৫২ সালে বস্ত্র এই সামান্য "অবাস্তর" কয়েকটা বস্তুর অভাবে বাঙ্গালী জাতির ধ্বংসের গতি দ্রুত হইয়া উঠিয়াছে। লোকের আর্থিক অবস্থা ও স্বাস্থ্য এত হীন হইয়াছে, সামাজিক পরিস্থিতি এত জটিল হইয়াছে যে ইহা অতিক্রম করিয়া উঠিয়া সহজ সরল অবস্থায় পৌঁছিতে যে কতদিন লাগিবে, তাহা অনুমান করিয়া বলাও কঠিন ব্যাপার।

সকল দুঃখের আলোচনা এক সঙ্গে করা সম্ভব নয়। পঞ্চাশ সালে কেমন করিয়া মানুষ তিলে তিলে পলে পলে মরিয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করার সময় আজ ফুটিয়াছে। অনাহারে কেহ কেহ মরিয়াছেন, যাঁহারা আদর্শের পিছনে মরিয়াছেন—আয়র্লণ্ডে ম্যাকসুইনী, ভারতবর্ষে যতীন দাস, আন্দামানে রামচন্দ্র আরও আমার অজানা কতজন স্বেচ্ছায় অনাহারে প্রাণবিসর্জ্জন দিয়াছেন তাহা জানি নাই; কিন্তু সে মৃত্যু আর অভাবের মধ্যে আশার রেশ বহিয়া দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া যে লোক মরিল তাহার সহিত পূর্ব্বের মৃত্যুর যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আর কিছু না থাক্ একদল "মরিব" বলিয়া মরিল, আর একদল এক মুহূর্ত্তও মরিবার ইচ্ছা না লইয়া মরিল, এই দুইয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান।

এমন অসহায় অবস্থায় যে লক্ষ লক্ষ লোক মরিল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, তাহা ঠিক ভাবিয়া পাই না। বাঙ্গালা দেশে, তথা ভারতবর্ষে ইহার পূর্ব্বে বহুবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে এবং তাহার উপর তদন্তও হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ বন্ধ হয় নাই। যদি এই তদন্তের উদ্দেশ্য এই হয় যে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হইতে পরের দুর্দ্দিনে সতর্ক হইতে পারা যাইবে, তাহা হইলে বলিতে হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ব সূচনা উপেক্ষা করা, দুর্দ্দিনের জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত না হওয়া, অসহায় অধিবাসীর উপর সমস্ত অপরাধ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করা প্রভৃতি সকল লক্ষণগুলি ছোট বড় সকল দুর্ভিক্ষে বর্ত্তমান। এবার উডহেড কমিশনের রিপোর্ট সে সকল ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করিয়াছে। উপরন্তু ইহা যে সকল নূতন বিষয় উদ্ঘাটন করিয়াছে, তাহাতে যাঁহারা শাসনের ভার লইয়া সভ্যতার গর্ব্ব করিয়া বেড়ান, তাঁহারা কি ভাবে ইহা গ্রহণ করিবেন, তাহা একটা অনুমান করা যায়। যাঁহাদের কতক ইচ্ছাকৃত, কতক অনভিজ্ঞতা, দুর্ব্বলতার অযোগ্যতার জন্য এই মহামারী ঘটিয়াছে তাঁহারা মহা আনন্দে শাসনযন্ত্র চালাইয়াছেন, তাঁহাদের কোনও দিন অনুশোচনা উপস্থিত হইবে এরূপ মনে করা ভুল। যদি এই তদন্তের ফলস্বরূপ অপরাধী ধরিয়া সাজা দিবার ব্যবস্থা থাকে, তবেই ভবিষ্যতে কিছু ফল হইবার সম্ভাবনা; আর তাহা না হইলে, যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাই হইবে। যুদ্ধের শেষে, যুদ্ধের জন্য দায়ী লোক ধরিয়া, অবশ্য বিজিত জাতির মধ্যে, সাজা দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু যাহারা প্রকারান্তরে, এমন কি ভুল আদেশ দিবার জন্য লক্ষ লক্ষ অসহায় নরনারী মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদের সাজা দিবার কেন ব্যবস্থা করা হইবে না, তাহা ধারণা করা যায় না।

১৯৪২ সালের অজন্মাই এই দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ বলিয়া রায় দিবার সঙ্গে সঙ্গেই কমিশন বলিয়াছেন যে এই দুর্ভিক্ষ যে অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা তাঁহারা মনে করেন না। তবে কে বা কাহারা এরূপ ঘটাইল, কিরূপে ঘটিল, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়।

১৯৪২ সালের অজন্মার পর যে অভাবের লক্ষণ প্রকাশ পাইল, মফঃস্বল হইতে লোকের দুর্দ্দশা অভাবের সংবাদ

শাসনকেন্দ্রে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে। বাহির হইতে খাদ্য তণ্ডুল আনাইয়া অভাব মিটাইবার যথোপযুক্ত চেষ্টা হয় নাই। যুদ্ধের জন্য মাল চলাচলের যে অসুবিধা হইয়াছিল, তাহার প্রতি সমযমত মনোযোগ না-দেওয়ার ফলে এই অভাব আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় যুদ্ধের কাজে সহায়তা করার অজুহাতে সমস্ত বড় বড় কারবার কারখানা, এবং তাহার উপর ধনী গৃহী ও ব্যবসায়ী, একযোগে বাজারে খাদ্যতণ্ডুল ক্রয় করা সুরু করিয়া দিল। ইহার সহিত যোগ দিল সরকারী মতিচ্ছন্নতা। কর্মকর্তাদের এক একটা আদেশ বিচারক্ষেত্রে রাখা গেল অত্যন্ত অপরিণামদর্শী, সম্পূর্ণরূপে অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচায়ক। মূল্য নিয়ন্ত্রণ, মাল ক্রয়, স্থান হইতে স্থানান্তর মাল প্রেরণ প্রভৃতি আদেশগুলি, এবং তাহা চলচ্চিত্রের গতিতে পরিবর্তন, আজ দেখা যাইতেছে, একটী শিশু বা প্রগল্‌ভ ব্যক্তির পক্ষেও অশোভন।

যখন অভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকট হইয়াছে, তখনও কর্তৃপক্ষ মাল বিদেশে রপ্তানী করিতে ছাড়েন নাই। পরাজয়ের আশঙ্কায় খাদ্য তণ্ডুল অপসারণ, নৌকা, সাইকেল প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ কেবলমাত্র লোকের অসুবিধাই বৃদ্ধি করিয়াছে; প্রকারান্তরে মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কমিশন দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে ইহা অপেক্ষা সহজ অথচ অধিকতর কার্যকরী উপায় অবলম্বন দ্বারা অবস্থার উন্নতি সাধন করা চলিত। যে সকল অঞ্চল হইতে অধিবাসী অপসারণ করা হইয়াছে, ধান্য রোপণ প্রভৃতি কৃষিকার্য হইতে লোককে সরকারী আদেশে বিরত রাখা হইয়াছে, ইহার অধিকাংশই অপরিমিত তৎপ্রসূত এবং অবান্তর।

কর্তৃপক্ষ সহর ও যুদ্ধসংক্রান্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের দিকে অধিকতর মনোযোগ দিয়া পল্লীর প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়াছেন; পল্লীবাসীর যে অন্নের অভাব ঘটিতে পারে, এ কথা এককালে তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহারা উপরন্তু পল্লীর দিক হইতে চাউল "সংগ্রহ" করিতে আরম্ভ করিলেন; লোক সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কেহ ভয়ে খোরাকের ধান বেচিয়া দিল, কাহার নিকট হইতে আইনের দোহাই পাড়িয়া ধান "নিয়ন্ত্রিত মূল্যে" ক্রয় করা হইল। তাহার পর দুর্দিনে বিক্রেতা সপরিবারে অনাহারে মরিল।

কর্তৃপক্ষ প্রথম প্রথম জেলার বড় কর্মচারী মারফত চাউল ক্রয়ের চেষ্টা করেন। জ্ঞান, শক্তি, আন্তরিকতা, যোগ্যতা এমন কি সততার অভাবে এ কার্য্য মোটেই সফল হয় নাই। পরে গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালায়, কি বাঙ্গালার বাহিরে খাদ্য তণ্ডুল ক্রয় করিবার জন্য "আপন ধন" দেখিয়া তার অর্পণ করিলেন। ক্রয়মূল্যের সর্বোচ্চ পরিমাণ বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই; কত মাল তাহারা সরকারী নামে ক্রয় করিল, কত পরিমাণ গভর্ণমেণ্টকে দিল, তাহার হিসাব রাখা হয় নাই। ইহাতে যে বিভ্রাট ঘটিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। ইহা কেবল বাঙ্গালা দেশেই সম্ভব। অপর কোনও প্রদেশ এই কার্য্যের ভার বেসরকারী লোক বা প্রতিষ্ঠানের হাতে দেয় নাই বা তাহার উপর তত্ত্বাবধানের ভার ছাড়ে নাই।

লোক চারিদিকে হাহাকার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পথে পড়িয়া মরিতেছে, হৃদয়হীন রাজকর্মচারী তখনও প্রচার করিয়া বলিয়াছে যে দেশের মধ্যে অন্নের অভাব নাই। ইহা যে কি নিন্দনীয় ব্যাপার, কি অপরিসীম ক্ষতি সাধন করিয়াছে তাহা বলা যায় না। কমিশন এই কার্য্যকে অতি কঠোর ভাষায় নিন্দা করিতে বিরত হন নাই।

এত বড় করাল দুর্ভিক্ষকে কর্তৃপক্ষ কখনও দুর্ভিক্ষ বলিয়া ঘোষণা করিলেন না। এক সময় অর্থব্যয়ের অজুহাতে প্রয়োজনীয় উপায়গুলিও উপেক্ষিত হইয়াছে বলিয়া কমিশন দুঃখ প্রকাশ করিয়া কঠোর মন্তব্যে সরকারকে "আপ্যায়িত" করিয়াছেন; কিন্তু কুম্ভকর্ণের কি ইহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি আছে।

যেমন দুর্ভিক্ষ রোধ করিতে চেষ্টা, তেমনই দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকের দুর্দশা দূর করিবার ব্যবস্থায় কর্তৃপক্ষ নিজেদের "যোগ্যতার" পরিচয় দিয়াছে। এমন অমানুষিক হৃদয়হীনতা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। একেবারে চারিদিকে আগুন জ্বলিয়া উঠিবার পূর্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই; আর পরে যাহা হইয়াছে, তাহা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। আর্তত্রাণ অতিমাত্রায় ব্যাহত হইয়াছে, তণ্ডুলের অভাবে। তখনও কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতার সহিত ধনীর লোভ, ব্যবসায়ীর লাভের অপরিসীম লালসা, সমর্থ লোকের স্বার্থপরতা প্রভৃতি নানা উপদ্রব এক সঙ্গে মিলিয়া এই দারুণ দুর্বিপাক ঘটাইয়াছে। বাঙ্গালা সরকারের সমস্ত অপরাধ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাহাদের আদেশে নৌকা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি দুর্দৈব সংসাধিত হইয়াছে। খাদ্য সম্বন্ধে মনোনিবেশ করে এরূপ কোনও দায়িত্বপূর্ণ লোক এক সঙ্গে কিছুকাল অবস্থিত ছিল না। জনসাধারণের খাদ্য ঔষধ প্রভৃতি একেবারে ক্রীড়ার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। (তাহা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন শ্বেত চর্মধারী, এমন কি, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ফিরিঙ্গি, কেহ এই দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে বা সারি সারি মরিয়া চাউল সংগ্রহ করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছে)। ফল যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। সরকারী মতে ৬,৮৮,০০০ লোক মরিয়াছিল; কমিশন বলিয়াছে ১০ লক্ষ: আর তাহার সহিত রোগে মরিয়াছে ৫ লক্ষ। এই দুইয়ের কোনটাই সত্য নহে; কিন্তু এই ১৫ লক্ষ লোকেরই জীবনান্ত ঘটার জন্য দায়ী যাহারা তাহাদের জন্য কি কোনও ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইবে না?

ঝাঁসি

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১

একপ্রান্তে পুরাণো শহর,
লক্ষ্মীবাঈয়ের দুর্গ,
সুরক্ষিত পুরী,
বারদশ দরোয়াজা।

২

অপর প্রান্তে রেল-স্টেশন
বাগানঘেরা বাংলো
পিচের রাস্তা,
আধুনিকতার জৌলুষ।

৩

ওদিকে সেনাশিবির,
পথ দিয়ে চলেছে বড় বড় মোটর-লরি,
দু'ধারে পাথর-বিছানো মাঠ,
কাঁটাওয়ালা বাবলা গাছ।

৪

শরতের নীল আকাশ,
পূজার আভা সকালের আলোয়,
টাঙায় চড়ে' গেলাম শহরে।

উঁচুনীচু সরু রাস্তা,
ঘিঞ্জি বসতি।
পৌঁছলাম পূজাবাড়িতে।
লালনীল জামা পরা
ছেলেমেয়ের দল
প্রতিমার পানে মুগ্ধদৃষ্টি।

৬

যুবকদল অভিনয়ের আয়োজনে ব্যস্ত,
টাঙাচ্ছে সীন,
আনছে বারাণসী শাড়ি, মখমলের জামা,
মুখস্থ করছে পার্ট।

ফিরলাম পূজা দেখে।
সেঁইয়ার-দরোয়াজা পার হয়ে এলাম।
পিছনে রইলো ধূলাবালি, কঙ্করময় পথ,
আর একধারে বিরাট দুর্গ
জাতির অতীত গৌরবের সাক্ষী।

পার হ'লাম পুরাণো শহর।
অমনি মনে হ'ল,
এই সংকীর্ণ গলির আশেপাশে,
এই পুরাতন বসতি-অঞ্চলে
মিশেছে জাতির প্রাণের চিহ্ন,
ঘুমিয়ে আছে প্রাচীন ইতিহাস।

৯

বণিক্‌সভ্যতার গড়া নূতন পল্লী,
প্রকাণ্ড স্টেশন,
সুসজ্জিত বাংলো,
পদধ্বনিচঞ্চল সেনাশিবির,
হোক তা সুন্দর, হোক তা উজ্জ্বল,
তার সাথে আমাদের প্রাণের যোগ নেই।

সর্ব্বহারা বিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন

মগেন দত্ত

বিগত কুড়ি বছরের মধ্যে নিপীড়িত ও উপনিবেশের জাতিগুলির মুক্তি সংগ্রামের এত বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন ঘটেছে যে তাকে বিপুল বিশ্বের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে আলাদা করে ভাবা যায় না। Second Internationalistরা মনে করতেন যে নিপীড়িত ও উপনিবেশের জাতির স্বাধীনতার সংগ্রাম বিশ্বসংগ্রামের ভিত্তি হতে আলাদা। লেনিনবাদ এই মতবাদের অসারতা প্রমাণ করেছে। নিপীড়িত ও উপনিবেশের জাতিগুলির মধ্যে যে স্বাধীনতার স্পৃহা জেগে ওঠে তা সাম্রাজ্যবাদী শোষিত অর্থনৈতিক ধারার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই দেখা দেয়। লেনিনবাদের এক প্রশ্ন হয়েছে এই শোষিত জাতিগুলি উদ্দেশ্য : 'নিপীড়িত জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে সত্যিকারের বৈপ্লবিক শক্তি নিহিত রয়েছে, না, তার বিনাশ ঘটেছে? সেই বৈপ্লবিক শক্তির যদি বিনাশ না ঘটে থাকে তবে এই বৈপ্লবিক শক্তিকে কি পরিমাণে সর্ব্বহারা বিপ্লবের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারা যায়। এবং কতটা পরিমাণে এই বৈপ্লবিক শক্তিকে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অটুট কেন্দ্র থেকে একেবারে বৈপ্লবিক শক্তির ঘাঁটিতে পরিণত করা যাবে।' লেনিনবাদ এ সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছে। লেনিনবাদ স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পেরেছে,এই যে অপরিস্ফুট বৈপ্লবিক ধারা যা নাকি নিপীড়িত জাতির মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে, তার বৈপ্লবিক সম্ভাবনা কত প্রচুর। সর্ব্বহারা বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ধনতন্ত্রবাদের উচ্ছেদ সাধন করা। এই ধনতন্ত্রবাদেরই সূক্ষ্ম ও জটিল রূপ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদ নিজের জন্মভূমিতে প্রসার লাভ করতে না পেরেই কৃষি ও শিল্পে অনুন্নত দেশে আস্তানা গাড়তে চেষ্টা করেছে। কাজেই যে সর্ব্বহারা বিপ্লবের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ করা সে সর্ব্বহারা বিপ্লব কেন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সাহায্য করবে না। তাই ষ্টালিন বলছেন, "Hence the necessity for the proletariat to support resolutely and actively to support—the national liberation movement of the oppressed and dependant peoples."*

কিন্তু লেনিনবাদ এখানটায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে একটু চুলচেরা বিচার করতে চায়। জাতীয় বৈপ্লবিক চেতনার কতগুলি বিচিত্র স্তর আছে যার প্রত্যেক স্তরে সব সময়ই সাম্রাজ্যবাদ বা ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠিক ঠিক ফুটে ওঠে না। যে বৈপ্লবিক জাতীয় চেতনা সাম্রাজ্যবাদ বা স্বৈরতন্ত্রের রক্ষণকল্পে সংগ্রাম করে তার সর্ব্বহারা বিপ্লবের প্রতি কোন সহানুভূতি নেই। সর্ব্বহারা বিপ্লবের সহানুভূতি কেবলমাত্র সেই সব ক্ষেত্রেই থাকতে পারে যেখানকার উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবাদ বা ধনতন্ত্রবাদ ধ্বংস করা।

লেনিনবাদ স্থানকালের হিসাব করে' বিপ্লবের কতগুলো বিভিন্ন রূপ স্থির করেছে।—তার মধ্যে বিশেষ করে' বলবার কথা এই যে বিপ্লবের রূপের বিভিন্নতা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতেও ঘটতে পারে আবার উপনিবেশ বা নিপীড়িত জাতির মধ্যেও ঘটতে পারে। স্থান, কাল ও নেতৃত্বের বিচারে এই দুটো বিপ্লব প্রকৃতিতে ভিন্ন। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে যে বিপ্লব ঘটে তার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সেই দেশীয় বুর্জ্জোয়া। এই বুর্জ্জোয়াদের কৃষ্টিগত, সমাজগত ও ধর্ম্মগত কতগুলি সাধারণ লক্ষণ থাকে যা সর্ব্বহারা শোষিত শ্রেণীর মধ্যেও বিরাজমান। কাজেই বিপ্লব সংঘটনে এরা যতটা সুবিধা পায় উপনিবেশ অথবা নিপীড়িত জাতির বিপ্লবী শ্রেণীরা তা পায় না। আরও একটা বিষয় আমাদের মনে রাখা ভাল যে ভৌগোলিক সংস্থানের সুবিধা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত যে মনোবৃত্তি তাও সম্পূর্ণ উপলব্ধি করবার সুযোগ উপনিবেশ ও নিপীড়িত জাতিগুলির বিপ্লবীরা পায় না। এই সব বিভিন্ন কারণেই বিপ্লবের বিভিন্নতা ঘটে।

* যেখানে উপনিবেশ ও নিপীড়িত জাতির বৈপ্লবিক শক্তি

* Stalin—*Foundations of Leninism, p 58*

নিজের আত্মবিকাশের চেষ্টায় মাথা খুঁড়ে মরছে সেখানে তার বাধা আসে স্থানীয় সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার শোষকশ্রেণীর কাছ থেকে। এই শোষক শ্রেণীরাই জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে অনেক সময় চেষ্টা করে তাদের শ্রেণীগত স্বার্থের দিকে মোড় ফেরাতে। এজন্যই এখানে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে বৈপ্লবিক নেতৃত্বের।

এই ভাবধারা উপনিবেশ বা নিপীড়িত জাতির মধ্যে কিছু নোতুন নয়। আমরা কথা প্রসঙ্গে চীনের দৃষ্টান্ত দিতে পারি। চীনে যখন বিপ্লব তার প্রথম পর্য্যায় পার হয়ে দ্বিতীয় পর্য্যায়ে পা দেবে ঠিক সে সময় প্রতিক্রিয়াশীল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার স্বার্থগুলি নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রাখবার জন্য এক নবাগত শ্রেণীসমন্বয় সৃষ্টি করল। কারণ সেখানে যদি সর্ব্বহারা নেতৃত্ব মাথা তুলে দাঁড়ায় তবে সেখানে শ্রেণীগত স্বার্থের অবসান ঘটতে পারে।

মার্কস্ যেখানে national bourgeois revolutionএর কথা বলেছেন সেখানে বোধ হয় তিনি এই কথা লক্ষ্য করেই বলে থাকবেন যে, ধনতান্ত্রিকতার প্রসারহেতু উপনিবেশ ও নিপীড়িত জাতির মধ্যে এক জাতীয় বৈপ্লবিক চেতনার উদ্ভব হয়, আর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে ধনতন্ত্রের সর্ব্বোত্তম বিকাশ ঘটেছে বলে সেখানে আর এক জাতীয় বৈপ্লবিক চেতনার উদ্ভব হয়। কাজেই চেতনার ক্ষেত্রে এই দ্বৈতমুখীনতার কথা লক্ষ্য করেই লেনিন, national liberation movementএর প্রতি এত জোর দিয়েছেন। যদি উপনিবেশ ও নিপীড়িত জাতির বৈপ্লবিক চেতনার ক্ষেত্রে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে না ওঠে তবে বিপ্লবের খাঁটি রূপটি প্রকাশ পায় না। এইখানেই সর্ব্বহারা বৈপ্লবিক চেতনার অপরিহার্য্যতা প্রমাণ হয়। সর্ব্বহারা বৈপ্লবিক চেতনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোন রকম শ্রেণী কর্তৃত্বকে এতটুকু আমল না দেওয়া। কথা উঠতে পারে যে সর্ব্বহারারাও একটা শ্রেণী। এবং এদের কর্তৃত্ব ও একনায়কত্ব ধনিক শ্রেণীর মতই কাজ করতে পারে। এর উত্তর হচ্ছে,—অর্থ নৈতিক বিচারে এই সর্ব্বহারা শ্রেণীর কোন স্থিত স্বার্থের বালাই নেই। কাজেই তাদের শ্রেণী হিসাবে কোন কিছুই বিপন্ন হবার কারণ নেই। তাছাড়া এ শ্রেণীর মাঝে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এক বিশেষ ধরণের বৈপ্লবিক চেতনা গড়ে না উঠছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তারা কোন রাষ্ট্রনৈতিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে পারে না। রাষ্ট্রনৈতিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হলে এদের কতকগুলি প্রাথমিক উপাদান চেতনার মধ্যে আয়ত্ত করে নিতে হবে।

এখানে আর একটা কথা বলার প্রয়োজন। জাতীয় বিপ্লবের যে কোন পর্য্যায়েই সর্ব্বহারা শ্রেণী তার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে না। কথা প্রসঙ্গে ষ্টালিন চীনের যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে :—

"Let us now proceed to the second stage of the Chinese revolution. While the first stage was distinguished by the fact that the edge of revolution was directed mainly against foreign imperialism, the distinguishing feature of the second stage is that the edge of revolution is now directed mainly against internal enemies, and primarily against the feudal lords and feudal regime."*

কিন্তু চীন বিপ্লবে এই মত প্রতিপন্ন হয়েছে কিনা, সে কথা ষ্টালিন প্রশ্ন করেছেন। তাঁর মতে চীনে সেটা হয় নি; তাই তিনি বলেছেন :

"It only gave a preliminary impetus in rousing the revolutionary masses against imperialism, only to end its course and leave matters to the future." †

এই ভবিষ্যৎ বিপ্লবের পরিস্থিতিতে সর্ব্বহারা বৈপ্লবিক চেতনা কতটা যোগান দিতে পারে সেইটাই এখানে বিচার্য্য বিষয়। আমাদের মনে রাখা ভাল যে আমাদের সমস্ত আলোচনাটাই নিপীড়িত জাতির ও উপনিবেশের সমস্যা লক্ষ্য করে সুরু হয়েছে। সর্ব্বহারা বিপ্লবের দুটো অঙ্গ—একটা শ্রমিক ও একটা কৃষক। এই দুয়ের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বিচার করলে দেখা যাবে যে এদের শ্রেণী হিসাবে অর্থ নৈতিক

---

* *Marxism and the National and Colonial Question*, p. 214.

† *Ibid.*

শোষণের জন্য দেশীয় পুঁজিবাদী যতটা না দায়ী তার চেয়ে বেশী দায়ী হচ্ছে বিদেশী পুঁজিবাদী। দেশীয় পুঁজিবাদী বিদেশী পুঁজিবাদের তাঁবেদার হয়ে স্থানীয় শোষণ ব্যবস্থার তত্ত্বধারক হয়েছে মাত্র। স্থানীয় পুঁজিবাদের শোষণ ব্যবস্থার একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা যেতে পারে জমিদারী প্রথা। জমিদারী প্রথা ইংল্যাণ্ডেও আছে ভারতবর্ষেও আছে। ভূ-সম্পত্তির ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত বিলি ব্যবস্থার দরুণ যে সব সমস্যা সেখানকার একজন চাষীর আছে এখানকার চাষীরও তেমনিই আছে। ওখানকার জমিদার যেমন খাজনা নেয়, শোষণ করে এখানকার জমিদারও তেমনিই করে। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও একটা বিরাট প্রভেদ রয়েছে এই দুই চাষীর অর্থ নৈতিক অবস্থার মাঝে, সেটা শোষণ—এবং সে শোষণকে উপনিবেশ ও নিপীড়িত জাতির দেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষণই বলা যেতে পারে। শোষণের ধারাটা কি? ইংল্যাণ্ডের একটা চাষী র‍্যামন বাজারে গিয়ে যে কাপড়খানা কিনবে তা তৈরী হবে ম্যাঞ্চেষ্টারে—আর এদেশে পরাণ মণ্ডল বা ছোতান মোল্লা যে কাপড়খানা কিনবে তাও তৈরী হবে ঐ ম্যাঞ্চেষ্টারে। তাহলে এখানেই দেখা যাচ্ছে যে শোষণ ব্যবস্থার অদ্ভুত কৌশলই এশিয়ার জাতিগুলিকে নিপীড়িত অথবা উপনিবেশে পরিণত করেছে। এই শোষণ ব্যবস্থার দ্বার বন্ধ করতে যে পরিমাণ বৈপ্লবিক চেতনার প্রয়োজন তাই জাতীয় বিপ্লবের দান।

এই জাতীয় বিপ্লবের পথকে এবং ভবিষ্যৎ সর্ব্বহারা বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য ষ্টালিন নিজেই নির্দ্দেশ দিয়েছেন :—

"It accordingly appears that temporary blocs and agreements with the bourgeoisie in colonial countries at a certain stage of the colonial revolution are not only permissible but indispensable"*—এই থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে জাতীয় বিপ্লবের সঙ্গে সর্ব্বহারা বিপ্লবের সময়য় অনিবার্য্য, তা যতই সাময়িক হোক না কেন তাকে অস্বীকার করার অধিকার কারুর নেই। এ যেখানে অস্বীকৃত হয়েছে সেখানে সর্ব্বহারা বিপ্লবকে পঙ্গু করা হয়েছে।

আমরা কথা প্রসঙ্গে এবার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দৃষ্টান্ত দিতে পারি। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যদি যাচাই করতে যাই তাহলে ভারতের উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থার রীতি দেখে—নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক শোষণের মধ্যভাগ। এই হিসেবেই ভারতের অবস্থার একমাত্র বিচার চলে। ভারত উৎপাদন ব্যবস্থার ফাঁদে পা দিয়ে কাঁচামালের রপ্তানীকারক হয়েছে, আর বিনিময় ব্যবস্থার পাঁচে পড়ে বিদেশী পণ্যের বাজার হয়েছে। শুধু ভারতের এই অর্থনৈতিক অবস্থা দেখেই বলা চলে যে নিপীড়িত ও শোষিত জাতির মধ্যেই ভারতের স্থান। কাজেই ভারতে যদি কোন রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দেয় সেটা এই প্রকৃতির সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রতিবাদ করেই দেখা দেবে। বস্তুত ঘটেছেও তাই। আমরা সাধারণ অবস্থায় একটা কথা আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের ঘাড়ে চাপিয়ে নেই। সেটা হচ্ছে জাতীয়তার আন্দোলন।

আসলে জাতীয়তার আন্দোলন কি? সাধারণত আমরা জাতীয়তার আন্দোলন কথাটা ইয়োরোপ থেকে গ্রহণ করে থাকি। ইয়োরোপে ছোটখাট জাতিগুলির মধ্যে একদিন জাতীয় মুক্তির একটা আন্দোলন যে দেখা দিয়েছিল এটা ঐতিহাসিক সত্য এবং গোটা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে সুরু করে গত মহাযুদ্ধের পর পর্য্যন্ত ঐ জাতীয় আন্দোলন ইয়োরোপে ঘটেছে। এই সব জাতীয় আন্দোলনের মাঝে ধর্ম্মগত, ভাষাগত, ও সংস্কৃতিগত একতা এবং এর সবার ওপরে শাসক শ্রেণীর অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা অনেকখানি ইন্ধন জুগিয়েছে। এই সব ধারার সমষ্টিগত ফল ইয়োরোপের তথাকথিত জাতীয় আন্দোলনের মাঝে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে আমরা ভারতের সঙ্গে আর ইয়োরোপের একটা বিরাট প্রভেদ রেখা টানিতে পারি এই বলে যে, ভারতের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা আর ইয়োরোপের বিভিন্ন জাতির অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা কোনদিন এক ধরণের ছিল না। এবং আজও নেই।

এটা অনিবার্য্য সত্য যে বিভিন্ন অর্থ নৈতিক ধারার জন্য

* *Marxism and the National and Colonial Question.* p. 148.

বিভাগের ইনি ছিলেন একজন পদস্থ কর্মচারী আর একজন হচ্ছেন উইলিয়াম ডার্সি, ব্রিটিশ রাজদপ্তরের একজন প্রতিপত্তিশালী লোক। ১৮৯৯ সালের কোনও এক সময়ে দুজনেই একত্রে যান তুখণ্ডে একটা রাজনৈতিক গোলযোগের তদন্ত করতে। লোক পরম্পরায় চেষ্টার সাহেব জানতে পারলেন আশপাশের অঞ্চলে ভাগ্যান্বেষণ চেষ্টা করলে তেল পাওয়া যেতে পারে। তদন্ত শেষ করার পর দেশে ফিরে এসে তিনি সঙ্গে সঙ্গে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে তেলের সন্ধানে বেরোলেন। এর আগে বকেশাস্ এলাকায় তেল আবিষ্কৃত হওয়াতে ব্যবসার ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয় তারই সমসাময়িক অর্থকরী ব্যাপারটার দিকে দৃষ্টি রেখেই তিনি গেলেন তেল হাত করতে। নতুন তেল-খনির মালিক হয়ে ধন সঞ্চয় করা ছাড়া আর যে বিশেষ কিছু তাঁর মনে ছিল এমন মনে হয় না। পারস্যের বিস্তীর্ণ মরুময় প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত পেলেন তাঁর লক্ষ্যবস্তুর সন্ধান। ১৯০১ সালে তাঁর শ্রম সার্থক হ'লো—পারস্যের শাহের কাছ থেকে তিনি ৬০ বছরের জন্য তেল নিষ্কাশনের অধিকার লাভ করলেন। এই অধিকার তিনি শেষ পর্যন্ত এংলো-পারসিয়ান (পরে এংলো-ইরাণিয়ান) কোম্পানীর হাতে সমর্পণ করেন। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, বর্তমান ইরাণ তেল উৎপাদনের ক্ষেত্রে চতুর্থ স্থানের অধিকারী।

ইরাণের দক্ষিণ অংশে তেল নিষ্কাশনের অধিকার ব্রিটিশদের এবং এই এলাকাটি তাঁরা পছন্দ করে নিয়েছেন সমুদ্রের কাছাকাছি বলে। কারণ, তেল এখানে পাওয়া গেলেও, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাজে তাকে লাগাতে গেলে জাহাজে করে নিয়ে যেতেই হবে। এই কারণে দক্ষিণ অঞ্চলটাই তাঁরা সুবিধাজনক মনে করেছেন। ইরাণের সমস্ত তেল তুলবার অধিকার ডার্সি ১৯০১ সালে পান। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলেই এই অধিকার বলবৎ থাকবার যে-বিষয়টি চুক্তিতে স্বীকৃত হয়েছে তার মূলে এই জাহাজী সুবিধার ব্যাপারই উহ্য আছে। এংলো-পারসিয়ান কোম্পানী এই অধিকারকে কাজে লাগাতে গিয়ে কিছু অর্থ সাহায্য নিয়েছিলেন বর্মা তেল কোম্পানী ও ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে। ব্রিটিশ সরকারই কোম্পানীর বেশীর ভাগ শেয়ার ক্রয় করে নেয় এবং শোনা যায় বিষয়টি সম্বন্ধে সরকারকে তখন সচেতন করে তুলেছিলেন বর্তমানের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল সাহেবই।

রুশিয়া এবং ইংরেজ ও ওলন্দাজ কোম্পানীগুলি বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকেই তেল নিষ্কাশনের ব্যাপারে লেগে গেছেন। ভূমধ্যসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের তটভূমি পর্যন্ত সব স্থানেই এই এক অবস্থা। মধ্য তেল এলাকায় ইংরেজেরই প্রধান মালিকানা। ইরাকে তেল আবিষ্কৃত হয় ১৯২৭ সালে। এখানে তেল নিষ্কাশনের অধিকার যে কোম্পানীর ওপর ন্যস্ত তার বেশীর ভাগ শেয়ারই ইংরেজ ধনপতিদের হাতে এবং সেইজন্য ইংরেজই যে এ-অঞ্চলের তৈলপতি সেকথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আজ মার্কিনের দৃষ্টি এশিয়ার ওপর পড়েছে, তার কারণ, আরও বেশী তেল তার এখন প্রয়োজন এবং তার নিজের উৎপাদনও ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে।

মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে দেখা যায় ১৯৪২ সাল থেকে ইংরেজ ও মার্কিনের মধ্যে মন কষাকষি চলছে। মার্কিন ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যেই সউদী আরবে তেল ইজারার সুবিধা করে নিয়েছেন এবং ইংরেজ তৈলপতিরা ইরাক, বাহেরিন, প্যালেষ্টাইনে তাদের কর্তৃত্ব আরও দৃঢ় করেছেন। ইরাণের দক্ষিণ অংশে তেল তুলবার অধিকার যে ইংরেজের সেকথা আগেই বলেছি, কিন্তু উত্তর অংশের অধিকার সম্বন্ধে সে একেবারে নিশ্চিন্ত নয়। কারণ একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে হঠাৎ কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বসলে একেবারে নির্বিবাদে তা হজম করাটা স্বার্থান্বেষীদের স্বভাবের একেবারে বাইরে। তাই রুশিয়া যখন উত্তর অংশে তেল ইজারার জন্য ইরাণ সরকারের কাছে আবেদন করলো, ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে তা বিশেষ প্রীতিকর মনে হ'লো না। তাঁরা ভীষণভাবে চেঁচামেচি সুরু করলেন। যুদ্ধের মধ্যে এ অধিকার গ্রাহ্য হতে পারে না, রুশিয়া ইরাণের রাষ্ট্রগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে ইত্যাদি সব মন্তব্য ফলাও করে বিলেতের সাম্রাজ্যবাদী পত্রিকাগুলিতে ছাপা হ'লো।

রুশ, মার্কিন ও ইংরেজ প্রত্যেকেরই সৈন্য এখন ইরাণে মজুত আছে এবং তা যে শুধু তেল সংক্রান্ত ব্যাপারের সুরাহা করবার জন্যই একটা প্রস্তুতি মাত্র সে কথা বেশ বোঝা যায়।

এই এলাকার তেল মিত্রশক্তিকে যে শক্তি জুগিয়েছে তার ফলেই আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরের যুদ্ধে তাদের জয় হয়েছে। ইংরেজ ও আমেরিকা এ-অঞ্চলের তেল না পেলে যুদ্ধের গতি যে কোন দিকে মোড় ফিরতো তা বলা যায় না। রুশিয়া আজ অবধি নিজ এলাকার বাইরে বড় বেশী দৃষ্টি দেয়নি। কিন্তু মিত্রপক্ষকে জয়লাভে সাহায্য করে এসে কোনো কিছুর দিকে সে দৃষ্টি দিবে না এ নিঃস্বার্থ মনোভাব তার যদি না থাকে তাতে তাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কারণ অপরাপর দেশের মতো সেও ইতিমধ্যে য়ুদ্ধের আগুনের মধ্যে পুরোপুরি ভাবে এসে পড়েছে। তেলের চাহিদা তারও আজ অপরিসীম। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা নিয়ে ইংরেজ ও মার্কিন যে-মাতামাতি সুরু করেছে তাতে তেলের অংশ যে অপরিহার্য একথাও সোভিয়েট রাষ্ট্রপতিরা জানে এবং সেই সঙ্গে তাদের নিজেদেরও যে কোনও পরিকল্পনা নাই সেকথা বলা চলে না। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে তেল বস্তুটির চাহিদা সকল দেশের পক্ষেই সমান। কিন্তু ইরাণ সরকারের হয়েছে মহা বিপদ। ক্ষুদ্র শক্তি হিসাবে সে বেপরোয়া মনোভাবও নিতে পারে না অথচ ত্রিশক্তির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতাও তাকে চিন্তিত করে তুলেছে। এই অবস্থায় যুদ্ধের মধ্যে নূতন কোনও ইজারাদার ঠিক করার কথা আপাতত স্থগিত রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করেছে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ইরাণ সোভিয়েটকে নূতন করে তেলের ইজারা দিতে রাজী নয় কেন? সোভিয়েটের সঙ্গে প্রথম যখন ইরাণের প্রধানমন্ত্রী সইদের এ ব্যাপারে আলোচনা হয় তখন তাঁর দিক থেকে এ অধিকার মেনে নেওয়ার পক্ষে কোনও আপত্তি ওঠেনি বরং সোভিয়েটের দাবী তিনি সহানুভূতির চোখেই দেখেছিলেন। আজ যখন সোভিয়েট তার ইজারার সর্তাদি খোলাখুলি ভাবে ইরাণের জনসাধারণকে জানিয়ে দিলো তখনই প্রধানমন্ত্রী সইদ ঘোষণা করলেন—যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তেলের ইজারা সম্পর্কে কোনও কথা চলবে না। এর কারণ কি? কারণ এর রয়েছে শ্রেণীসংঘাতের ভিতের ওপর। ইরাণের রাজনৈতিক মহলের গৃহপঞ্জিক বিশেষত্বের কথা যাঁরা জানেন তাঁরা বলেছেন, গণতন্ত্রমূলক কোনও ব্যবস্থা পুঁজিবাদী আর সব দেশের মতোই ইরাণেও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ইংরেজ ও মার্কিন পুঁজিবাদীদের হাতও যে এ ব্যাপারটির পিছনে অলক্ষ্যে কাজ করছে সেকথাও তারা বলেছেন।

এক্ষেত্রে সোভিয়েটের সর্ত সম্বন্ধে কিছু পরিচয় না থাকলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে না। সোভিয়েট সর্ত দেয়—(১) ইজারার সময় উত্তীর্ণ হলে তেল তোলার যাবতীয় প্রতিষ্ঠানই ইরাণের সম্পত্তি হবে। তার জন্য সোভিয়েট সরকার কোনও ক্ষতিপূরণ চাইবেন না। (২) ইজারাকালীন সোভিয়েট সরকারের যে লাভ হবে তার একটি অংশ ইরাণ সরকার পাবে। এ ছাড়া টন হিসাবে সেনামী এবং জনসাধারণের জন্য কমদামে তেল পাওয়ার অধিকার ইরাণ সরকারের থাকবে। (৩) তেল তোলবার কাজে যেসব কর্মচারী ও মজুর নিয়োগ করা হবে তাদের স্বাস্থ্য ও সুখসুবিধার ব্যবস্থা সোভিয়েট সরকার করবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি গড়বার অধিকারও তাদের থাকবে। (৪) তেল তোলবার জন্য যেসব টেকনিক্যাল শিক্ষার দরকার তা ইরাণীদের দেওয়া হবে এবং টেকনিক্যাল কাজকর্মে তাদের নিয়োগও করা হবে। (৫) ইজারাদারের কাজকর্মের উপর ইরাণ সরকারের তদারক করবার কর্তৃত্ব থাকবে এবং লাভ-লোকসানের হিসাবও পরীক্ষা করতে পারবেন।

বলা বাহুল্য এর চেয়ে ভালো গণতান্ত্রিক সর্ত আর কিছু হতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদীদের সর্ত হতে এগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এইজন্যই সোভিয়েট সর্তগুলির বৃহত্তর পরিবেশ তাদের গাত্রদাহ সৃষ্টি করেছে। গণতন্ত্রের ভয়েই তারা একজোট হয়ে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য আরম্ভ করেছেন। জনকল্যাণের পক্ষপাতিত্ব করে সোভিয়েট কূটনীতি যাতে ইরাণের তেল এলাকায় চড়িয়ে না পড়ে তার জন্য ইরাণ সরকারকে সচকিত করে তুলতে আজ লোকের অভাব নাই। তেল আহরণ ও রাজনৈতিক অভিপ্রায় পাশাপাশি এমনভাবে আজ বেড়ে চলেছে যে জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে যেন আর একটা যুদ্ধের সূচনা খুঁজে পাচ্ছেন। অবস্থা দিন দিনই এত ঘোরালো হয়ে উঠছে যে এযুদ্ধ শেষ না হতেই আর একটা যুদ্ধের ছায়া যেন মধ্যপ্রাচ্যের মরু অঞ্চল ঘিরে ফুটে উঠছে।

সোভিয়েট সর্তগুলির পাশে ইংরেজ কোম্পানীর অবস্থা তুলে ধরলেই বোঝা যায় কেন গণতন্ত্রের ভয় ইংরেজ তৈলপতিদের আরও এক পেয়ে বসেছে। এই কোম্পানীতে শ্রমিকদের কোনও স্বাধীনতা নাই এবং টেকনিক্যাল কাজে ইরাণীদের নিয়োগ করা হয় না। টেকনিক্যাল কাজে তথ্যাদি করবার কোনও অধিকারও ইরাণ সরকারের নাই। গণচেতনার মধ্য দিয়ে ইরাণ যদি সহসা সোভিয়েটের প্রতি ঝুঁকে পড়ে তাহলেই সর্বনাশ। ইরাণী শ্রমিকদের ঘামঝরানো পরিশ্রমের বিনিময়ে অধিক লাভ করা আর তখন চলবে না। এইজন্যই কায়েমী স্বার্থবাদীরা সোভিয়েট সর্তগুলির মধ্যে রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ আবিষ্কার করে ফেললেন। সাম্রাজ্যের বনেদ পাকা করবার জন্যও তারা আকুল আগ্রহে ইরাণের পাশে এসে দাঁড়ালেন, যেন বন্ধুত্বের সম্বন্ধস্থতা না দেখালেই নয়। সাম্রাজ্য রক্ষার মূল উপকরণ যেখান থেকে আসবে সেখানে রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটতে দেওয়া মানে বিপদকে ডেকে আনা একথা সাম্রাজ্যের রক্ষীদল বিশেষভাবেই জানে এবং এই জানার জন্যই আজ এমন এক রাজনৈতিক ঘোরালো অবস্থা মধ্যপ্রাচ্যকে ঘিরে সৃষ্টি হয়েছে যার জন্য যুদ্ধ বাধা একটুও আশ্চর্যজনক নয়।

মন্বন্তর কেন ?

শ্রীঅবিনশ্বর সিংহ রায়

অতিজাত-তান্ত্রিক সমাজে রিপীড প্রভৃতিকে লেনিন এক সময় বিপ্লববিরোধী কার্য ("Counter-revolutionary measures") বলিয়াছিলেন। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেই চৌরাস্তায় দাঁড়াইয়া আজ লেনিনের কথা যে কতদূর সত্য তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। দুর্ভিক্ষ, মহামারী আজ আমাদের দেশকে মৃত্যুর দিকে টানিয়া নিয়া চলিতেছে, এমন সময় ইহার প্রতীকার করে যাহার যতটুকু করা সাধ্য তাহা মানবতার দিক দিয়া সকলেই করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু গণেরীরাম বাটপাড়িয়া শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের মারফৎ যেমন ধর্মকে ব্যবসায়ে নামাইতে প্রস্তুত হইয়াছিল, বিপ্লব-বিরোধী শক্তিরা মানবতাকেও তেমন নিজেদের স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যে সমস্ত রকম বৈপ্লবিক প্রগতির বিরুদ্ধে, গণমানবের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যাহত করিতে নিযুক্ত করিয়া থাকে। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি একটি রাজনৈতিক পার্টি বা দল। ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য। ধনিকতন্ত্র অক্ষুণ্ণ, সাম্রাজ্যবাদ শোষিত দেশে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান, রাষ্ট্রীয় কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, ইহা কম্যুনিষ্ট মতবাদের একটি অবশ্য স্বীকার্য প্রতিপাদ্য। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি যতদিন পর্যন্ত কম্যুনিষ্ট মতবাদের এই প্রতিপাদ্যটি অস্বীকার করে নাই ততদিন পর্যন্ত আমাদের বিদেশী শাসক সম্প্রদায় ইহাকে বেআইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং ততদিন পর্যন্ত ইহার সভ্যদের প্রকাশ্যভাবে কোনো কাজ করিবার সুবিধা ছিল না; কিন্তু ধীরে ধীরে এই দলটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন দলের নামটি ব্যতীত কম্যুনিষ্ট মতবাদের সমস্ত প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি বিসর্জন দেওয়া নিজেদের পক্ষে সুবিধাজনক মনে করিলেন তখনই এই দলটিকে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী সরকার কেবল বৈধ বলিয়াই স্বীকার করিলেন না সর্ববিধ ভাবে ইহাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। পৃথিবীর বৈপ্লবিক বিবর্তনের ইতিহাসে ইহা নূতন নহে। রাজনীতির ছন্দময় রাজপথে কেবল উন্নতিশীল সভ্যতার ছিন্ন পত্রই পড়িয়া নাই, বহু বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের ব্যভিচারিত আত্মার দীর্ঘশ্বাসও সে পথের পথিকদের সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছে।

আমাদের দেশের ছেলেমেয়ে যাহারা সত্যই তাহাদের দেশকে ভালবাসে, সত্যই দেশের বর্তমান দুর্দশায় যাহারা ক্ষিপ্ত হইতে চায় আজ তাহাদের সমস্ত বিষয় পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে হইবে। কোনরূপ ভাঁওতায় ভুলিলে চলিবে না; তাহাদের বুঝিতে হইবে যে পরাধীন দেশে দেশসেবা আরাম ও আয়াসের মধ্য দিয়া কখনও হইতে পারে না, কাল-বৈশাখীর রুদ্ধ আর্তনাদ প্রতি পদে পদে তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ইহা জানিয়া, ইহা বুঝিয়া, প্রতি দেশের স্বাধীনতার

পূজারিগণ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে এবং আমাদের দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস, বিপ্লবী অগ্রগমনের ইতিহাস তাহাদেরই মত' ছেলেমেয়েদের আত্মোৎসর্গের চিহ্নে দেদীপ্যমান। আজ আমাদের বিশ্রাম্ত হইলে চলিবে না, পথ সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবহাল হইতে হইবে, কারণস্থিতি সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হইতে হইবে—সমস্ত কিছুর সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহ নিরসন করিয়া আমাদের কর্মপন্থা স্থির করিতে হইবে। দুঃস্থকে অন্নদান সেবা নিশ্চয়ই খুব বড় কাজ—কিন্তু যে কারণে আজ সমগ্র জাতি দুঃস্থ ক্রমেই জাতিতে, নরকংকালের চলন্ত মিছিলে পরিণত হইয়াছে—সেই কারণকে বিদূরিত করিতে না পারিলে কে এই মহাদেশকে মহাশ্মশানে পরিণত হইতে নিরস্ত করিতে পারে? যে রাজনৈতিক দল আজ রিলীফ কমিটী, নারী সেবা সমিতি, আত্মরক্ষা সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপকে একমাত্র বলীয় কর্মে পরিণত করিয়াছে, তাহারা দেশের বৈপ্লবিক বিকাশের পথে জানিয়া শুনিয়া বাধা সৃজন করিতেছে। কারণ এইসব কার্যে মানবের, বিশেষ করিয়া যুব সম্প্রদায়ের, সাধারণ জনমত সহজেই সাড়া দেয় এবং তাহাদের যে কর্মপ্রবণতা রাজনৈতিক খাতে চলিত তাহা মোড় ঘুরিয়া ঐ সব রিলীফ প্রভৃতি কার্যে ব্যয়িত হয়। এই জন্য জাতির বৈপ্লবিক বিকাশের পথে এই সব "রিলীফ" প্রভৃতি কার্যকে লেনিন Counter-revolutionary measures বলিয়া রাজনৈতিক কর্মীদের সতর্ক করিয়া গিয়াছেন। তবে কি এই সব "রিলীফ" প্রভৃতি কার্যে আমরা অগ্রসর হইব না? নিশ্চয়ই হইব। ধনিকতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ শোষিত রাষ্ট্রে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ঘন ঘন আসিবেই এবং ইহাদের হাত হইতে দুঃস্থ দেশবাসীকে বাঁচাইতে প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিকেই অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু সেজন্য বিপ্লব-পরিপন্থী কোনো রাজনৈতিকদলের হাতে ক্রীড়া পুত্তল যাহাতে না হইয়া পড়ি সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বণ বা শারীরিক আয়াসের লোভে পড়িয়া যেন "শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড"এর অংশীদার না হইয়া যাই!

আমাদের রাজনীতির একদিন লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা লাভ, বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের হাত হইতে রাষ্ট্রীয় শক্তি নিজেদের হাতে আনয়ন করা। ইহার জন্য প্রথমে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং দেশকে তাহাতে প্রস্তুত করিবার জন্য স্থানে স্থানে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি গঠিত হইয়াছিল। তাহার পর পরিবেশ বদলাইয়াছে, পারিপার্শ্বিক পরিবর্তিত হইয়াছে, পরিস্থিতির বৈপ্লবিক অগ্রগমন ঘটিয়াছে। ফলে আমাদের রাজনৈতিক কর্মধারারও পরিবর্তন হইয়াছে; এবং ইহাই স্বাভাবিক। যে কংগ্রেস ক্ষুদ্রসংখ্যক শিক্ষিতদের প্রতিষ্ঠান ছিল তাহাই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আজ সমগ্র ভারতের একমাত্র গণবৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানে দাঁড়াইয়াছে। আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রাম আর আর শুধু নিছক রাজনৈতিক নয়, ইহা নানা ঘাতপ্রতিঘাতে আজ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হইয়াছে। আজ দেশ শুধু বিদেশীর অধীনতা হইতে মুক্তি পাইলেই সন্তুষ্ট হইবে না, আজ তার সমাজ-জীবনে আমূল বিপ্লব চাই। সমাজে-জীবনের সুতীব্র অর্থনৈতিক বিভেদ যাহা ধনিকতন্ত্রের সর্বত্র সমাজকে ডিজরেলীর ভাষায় 'ধনী ও দরিদ্রের পৃথক রাষ্ট্রে' পরিণত করিয়া রাখিয়াছে, সেই অর্থনৈতিক বিভেদকে দূর করিয়া এক নূতন সমাজ সৃষ্টি করিতে হইবে, যেখানে শোষিত ও শোষক বলিয়া কোনো সম্প্রদায় নাই। আজ কংগ্রেস আমাদের দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব আনিবার লক্ষ্য স্বীকার করিয়া একটি গণবিপ্লবী পার্টিতে পরিণত হইয়াছে। যতদিন কংগ্রেস কেবলমাত্র রাজনৈতিক অধিকারের দাবী নিয়া সংগ্রাম চালাইতেছিল ততদিন পর্যন্ত আমাদের শাসকগণ তেমন সন্ত্রস্ত হয় নাই কিন্তু যেই মুহূর্তে ইহা সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও বিরাট বিপ্লবের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছে সে সময়েই ধনিকতন্ত্রবাদী শাসক সম্প্রদায় সচকিত হইয়া উঠিয়াছে। পরিস্থিতি, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের রূপ ও আদর্শের যেমন পরিবর্তন ঘটিয়াছে আমাদের শাসক সম্প্রদায়ের এই অবস্থাকে প্রতিহত করিবার রীতি কিন্তু তেমন বদলায় নাই—ইহার কারণ বোঝা শক্ত নয়। কারণ খানিকটা স্তোক বাক্য, খানিকটা চোখ রাঙানি, খানিকটা দমন এই নীতি ব্যতীত ইহাদের আর কোন অস্ত্রই জানা নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থার

আন্দোলন বিভিন্ন রূপ নেবে। তাই লেনিন বিপ্লবের বিভিন্ন রূপের ও ধারার বর্ণনা করেছেন। আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে ইয়োরোপের জাতীয় মুক্তির আন্দোলন আর ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলন এক প্রকৃতির হতে পারে না। তার কারণ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ধরণই দুই স্থানীয় অবস্থার ওপর নির্ভর করে দুই রকমের গঠন করা হয়েছে। কাজেই ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সর্ব্বপ্রথম ধাপই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণযন্ত্রের নিগড় ভাঙা; ষ্টালিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিপীড়িত বা উপনিবেশের জাতির মধ্যে যে কোন আন্দোলনকেই প্রগতিমূলক আন্দোলন বলেছেন। অবশ্য যদি সেখানে সর্ব্বহারা বিপ্লব-পরিপন্থী কোন স্বার্থ মাথা তুলে না দাঁড়ায়। এই প্রগতিমূলক আন্দোলনের মাঝে যে সব শ্রেণীসমন্বয় (class collaboration) ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই আফগানিস্থানের, মিশরের মুক্তি আন্দোলনকে তিনি সর্ব্বান্তকরণে সায় দিয়েছেন। এখানে একটা বিষয় একটু পরিষ্কার করা ভাল। কেহ কেহ কংগ্রেসকে multi-class organisation বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে শ্রেণী সম্পর্ক বিচার করতে গেলে কথাটার সত্যতা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। এবং আমি স্বীকার করতেও লজ্জার কোন কারণ দেখি না। কেননা সাম্রাজ্যবাদী শোষণের মুক্তি বিপ্লবের প্রাথমিক অবস্থায় এই শ্রেণী সমন্বয় অনিবার্য্য। কিন্তু এই শ্রেণী সমন্বয়ের অনিবার্য্যতাহেতু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তি আন্দোলন বিপ্লবের প্রগতিমূলক ধারা থেকে বিচ্যুত, এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। এখানে ষ্টালিন যেসব যুক্তি অবতারণা করেছেন আমি তাই অনুসরণ করতে চাই।

ষ্টালিন বলেছেন……the struggle the Egyptian *merchants* and *bourgeois intellectuals* are waging for the independence of Egypt is objectively a revolutionary struggle……"* কাজেই শ্রেণী সমন্বয় থাকলেই কোন আন্দোলন কখনও বৈপ্লবিক আদর্শচ্যুত হয় না যদি তার নেতৃত্ব তার সঙ্গে কোথাও বিশ্বাসঘাতকতা না করে। সেই দিক থেকে যদি বিচার করা যায় তবে একথা বলা যেতে পারে যে কংগ্রেসের মধ্যে multi-class combination যতই থাক তার বৈপ্লবিক পরিণতির সম্ভাবনার দিকে এই multi-class combination-এর কোন হাত থাকবে না; কেন না সেখানে সচেতন বৈপ্লবিক গণনেতৃত্ব দিনের পর দিন গড়ে উঠছে। কংগ্রেস নেতৃত্বের একটা যুগ ছিল যখন দেশের শ্রেণী সমন্বয় নিতান্ত ঐতিহাসিক নিয়মেই দানা বাঁধতে শুরু করে। কিন্তু ১৯২১ খৃষ্টাব্দের পর কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধি নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। গান্ধি নেতৃত্বের প্রাথমিক অবস্থায় ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাকে ইন্ধন যোগায় ও আকাঙ্ক্ষাপ্রিয় ধনিক সম্প্রদায়ও তাকে সাহায্য করে। এই দুইটি শ্রেণী দুই মনোভাব নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী চিরদিনই চাকুরীজীবী, তার কাম্য চাকুরী। কাজেই কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল হিসেবে যদি চাকুরীর ফসল তোলা যায় তবে মন্দ কি? এই শ্রেণীগত মনোবৃত্তি নিয়েই তারা কংগ্রেসের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়। আজও যাদের মনে সেই সব দিনের স্মৃতি রয়েছে তারাই বলতে পারবেন যে কোন্ কোন্ শ্রেণী সেই দিন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। এর পরই আমরা আবার কংগ্রেসকে দেখতে পাই ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ঘোড়ের মাথায়। আপনারা সবাই জানেন তখনকার ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা কি রকম ভয়াবহ ছিল। সে আন্দোলনেও মধ্যবিত্ত বেকার যুবকের ভীড় হয়েছিল। দেশীয় ধনতন্ত্র তখনও সম্পূর্ণ নিজেকে বিদেশী ধনতন্ত্রের প্রতিযোগিতার মুখে দাঁড় করাতে পারছে না। তাই তার সংরক্ষণকার্য্য যাতে জাতীয় আন্দোলনের মারফৎ সুরাহা হয় সে তার চেষ্টায় আকুল। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক চেতনার ক্রমবিকাশের ধারা বেয়ে একটা শ্রেণী দিনের পর দিন কংগ্রেসের দরজায় প্রবেশ লাভ করতে শুরু করে। তাদের দাবীর মাত্রা তখনও খুব সজাগ হয়ে ওঠেনি। তারা যে কিছু বলতে পারে এবং তাদের দাবীর সারবত্তা অনিবার্য্য—এই ধারা অনুভব করেই কংগ্রেস আবার নোতুন পথে পা বাড়ায়। এতদিন আমরা কংগ্রেসের যে রূপ দেখেছি, সে রূপ আস্তে আস্তে পরিবর্ত্তন হতে শুরু করে কতগুলো শ্রেণীগত স্বার্থের ঘাতসংঘাতের মধ্য দিয়ে।

* *Foundations of Leninism*, pp. 50-54

কংগ্রেসের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক রূপ যদিও খুব ধীর মন্থর গতিতে ফুটে উঠছে—তবুও সেই দিকেই ইঙ্গিত করে। এই সব ইঙ্গিতের সাড়া আমরা পাই কংগ্রেসের ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের করাচী কংগ্রেসের Declaration of Fundamentalsএর মধ্যে। এতদিন ধরে আমরা কংগ্রেসকে দেখে এসেছি class collaboration-এর পথে। এর পর থেকে সুরু হ'ল class elimination. এরই দুএকটি সূত্রণ আজ এদিক ওদিক দেখা যাচ্ছে যেমন ধরুন—national planning থাকা সত্ত্বেও আবার বম্বে planning তৈরী হ'ল। আমি শুধু এখানে কংগ্রেসের মধ্যে process of class elimination যে সুরু হয়েছে তার ইঙ্গিত করলাম। এর বিস্তৃতমুখী আলোচনার স্থান এটা নয়।

আমি পূর্ব্বেও বলেছি—সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে যে জাতীয় আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল তার সঙ্গে ভারতের আন্দোলনের কোন মিল নেই। ভারতের আন্দোলন মুখ্যত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তির আন্দোলন। এই আন্দোলনের সঙ্গে সর্ব্বহারা বিপ্লবের নাড়ীর যোগ অতি নিকট একথা ভুললে চলবে না। অন্তত লেনিনবাদের শিক্ষা তাই। সর্ব্বহারা বিপ্লবের পরিপন্থী কোন আন্দোলন যদি ভারতবর্ষে কংগ্রেস নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে থাকে তবেই ভারতের মার্কসবাদীরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারেন। এবং সে বিষয়ে লেনিনবাদেরও স্পষ্ট নির্দ্দেশ রয়েছে; কিন্তু ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত যত আন্দোলন কংগ্রেসের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছে তার কোন্‌টা সর্ব্বহারা বিপ্লবের পরিপন্থী? অথচ আপনারা সবাই জানেন যে কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন করে এক শ্রেণীর মার্কসবাদীরা তাদের প্রচার কার্য্য কিরূপ সুকৌশলে চালাচ্ছে। তাদের জন্ম থেকে আজকের এই পরিণতির ইতিহাস সমস্তই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ইতিহাস।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে, University Students Unionএর Political Symposiumএ প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

জালিয়ানওয়ালাবাগ

নির্বাসিত বিহঙ্গ

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী অনূদিত

[দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ]

হোপ পালমা হোপ ইভানোভনার নোতুন পরিচয়। কিন্তু এই পরিবর্তনের ব্যাপারে সংকীর্ণতার লেশমাত্রও পল প্যাভলফের মনকে কলুষিত করেনি। তাছাড়া এসময়ে সে একটা মেডিক্যাল মিশনের কাজ পেয়ে চলে গেল মস্কৌ শহরে। ওডেসায় আর কোনোদিন তাকে দেখা যায় নি।

প্যাভলফ খাঁটি মানুষ। না-পাওয়ার বেদনায় যদিও ক্ষণিকের জন্যে তার মন ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল, কিন্তু সমস্ত অন্তর দিয়ে সে ভালবাসত হোপকে। মন বিক্ষুব্ধ বলে সে যে এই দূর-নির্বাসন গ্রহণ করেছিল—তা নয়। তার মনে এমন এক আচ্ছন্ন আনন্দবোধ জেগেছিল যে, সে ঠিক করল—দূর থেকে সে মনে করবে ইভানোভনাকে, মাঝে মাঝে এসে দেখাও করে যাবে, এবং এই আন্তরিকতাই তাকে তৃপ্তি দেবে। ইভানোভনাকে ভালবাসার একমাত্র অধিকার ছিল তার, এই স্মৃতিটুকু হবে তার জীবনের সম্বল এবং সে গৌরব বোধ করবে এই মনে করে যে, মহান স্বার্থত্যাগ হোপকে আরও মহনীয়া করে তুলেছে—কর্তব্যের দায়ে অধীন জনগণের মুক্তি সাধনায় সে স্বামীরূপে বরণ করেছে সার্জ পালমাকে।*

কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে প্যাভলফের পরিচয় আরও মহৎ—আদর্শ আরও উদার। সে স্থির করল—জীবনের কর্ম-সাধনায় হোপ যদি এম্‌নি করে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে, হোপের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসার ধ্যানে সেও পারে সর্বস্ব বিলাতে, এবং ইভানোভনার কর্ম-সাধনায় যদি সে বুঝতে পারত—তার নিজের সান্নিধ্যের প্রয়োজন হবে, তাহলে সে হাসিমুখে সকল দুঃখ-কঠোরতাও মেনে নিত, কিন্তু কার্যত তেমন কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। উপরন্তু তার মনে হল, বিবাহ-বন্ধন হোপকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি দিয়েছে; বস্তুত সুখী হয়েছে সে। কিন্তু প্যাভলফ এই অদ্ভুত পরিবর্তনকে সহসা যেমন এতটা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারল না—তেমনি অবহেলাও করতে পারল না। পল ইভানোভনাকে ভাল রকমে জানে। সে আরও জানে, উত্তরাধিকার সূত্রে হোপ যে পবিত্র দায়িত্ব-ভার পেয়েছে, তার কাছে আরাম, বিলাস, সুখ-সম্পদ শান্তিময় জীবন—সবই অবহেলার যোগ্য। কারও কারও চোখে হয়ত ঠেকবে, এই অপূর্ব ত্যাগের মহিমা নিতান্ত অবান্তর বা অতিরঞ্জন এবং স্বপ্নের ঘোর ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু রাশিয়ার পরিবর্তন-যুগের ইতিহাস দেখ, এমন বহু দৃষ্টান্ত পাবে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে এই রকম স্বার্থ ও আত্মত্যাগের প্রেরণা—রাশিয়ার জাতীয় জীবনে অপর যে-কোন দেশের চেয়ে ঢের বেশী। কিন্তু যে-সব দেশে জীবনের ভোগবিলাসই মুখ্য বলে সমাদৃত, সেখানে এইরকম আত্মদানের দৃষ্টান্ত যে নিষ্কৃতির উপর নির্ভর করে সে-রকম উদাহরণও বড় দেখা যায় না। পক্ষান্তরে রাশিয়া দেশে জীবন মৃত্যু ও নির্যাতন ভোগ অবস্থার বায়ে যেন পর্দার উপর পাতুর ছায়াপাত করে এবং সময় সময় পৃথিবীর সব দেশে মুগ্ধ বিস্ময়ের আলোড়ন জাগায়। সে দেখল, হোপ তার নব-জীবনে সুখী হয়েছে; কাজেই এ সময়ে তার ওডেসায় উপস্থিতি হোপের আনন্দে বাধাই জন্মাবে, তার সকল সুখানুভূতির মাঝে সময় সময় চোখের উপর ভাসবে পলের শান্ত মুখশ্রী—সে মনে করবে, সেই মুখশ্রীতে আনন্দের ছায়ালেশও নেই, ফলে সরম-সঙ্কোচ তাকে নিরন্তর অভিভূত করে রাখবে, নীরব গম্ভীর দুঃখানুভূতি তাকে অহরহ পীড়া দেবে।

হোপ ইভানোভনাকে এই অবস্থার ভার থেকে মুক্তি দেওয়া উচিত এই ভেবেই সে বিদায়কালে একবার দেখা করেই মস্কৌ চলে গেল। প্যাভলফ দেখা না করলেও পারত: দ্বিধাও জেগেছিল দেখা করবে কি না। শেষে তার মনে হল, এরকম ঔদাসীন্য দেখিয়ে চলে গেলে হোপের মনে ভয়ানক কষ্ট হবে। এবং ভদ্রতার দিক দিয়েও এরকম আচরণ একান্ত গর্হিত, তাই সে গেল দেখা করতে।

বুড়ী মাসাও হোপের নূতন সংসারে আশ্রয় পেয়েছিল। জীবনের মোড় অন্যরকমে ঘুরে গেলেও সে পল প্যাভলফকে যথারীতি সমাদরে অভ্যর্থনা জানাতে ভুল করল না।

—নমস্কার পল আইভানোইচ, বলো বলো। হোপকে এক্ষুণি খবর দিয়ে আসি—তুমি এসেছ।—এই বলেই সে রমণীসুলভ সকৌতুকে মুখের দিকে তাকিয়ে মনোভাব বুঝবার চেষ্টা করল।

পল জানাল: মাসা, আমি মস্কো চলে যাচ্ছি। তাই একবার তোমাদের কাছে বিদায় নিতে এলাম।

—অ্যাঃ, বল কি!—মাসা বিস্মিতভাবে তাকাল।

—আচ্ছা মেরিয়া, হোপ সুখী হয়েছে তো?

—হাঁ পল আইভানোইচ, সে সুখী হয়েছে।—এই বলেই সে একটু থেমে গেল। তারপর আবার তাড়াতাড়ি বলে গেল: তুমি তো জান, সে অন্য-সব মেয়েদের মতো নয়। তার যত চিন্তা—ভাবনা, নিজের জন্যে তো মোটেই নেই—অথচ···এ যেন এক ভয়ঙ্কর—বিরাট পরিবর্তন···

পল একমনে শুনে গেল।

বুড়ী তার লোলচর্মাবৃত হাত নেড়ে আবার বলতে লাগল: সময় সময় এ নিয়ে চেঁচামেচি করতেও আমার ভয় হয়···তবু আমি করি·····হোপ কিন্তু নির্বিকার···গ্রাহ্য করেনা কিছুই। যা হোক, আমার মনে হয়, কিছুদিনের মধ্যেই শহরে দুঃস্থ-দরিদ্রের প্রায় অর্ধসংখ্যা আমাদের বশে আসবে। এবং দেখছি রোজ এসে ভিড় করছে নূতন নূতন সভ্য-সভ্যা!

—কিন্তু পালমা তোমার উপর···হাঁ, তোমাকে ভালো চোখে দেখেতো!

—কথাটা বলতে গিয়ে প্যাভলফের ঠোঁট দুটো অজ্ঞাতে কেঁপে উঠল। মেরিয়ার দৃষ্টিশক্তি বয়সের ধর্মে ক্ষীণ হয়ে এলেও অবস্থাটা তার চোখে এড়াল না। অনায়াসে বুঝতে পারল—এ নিছক দুর্বলতা। বলল: হাঁ, পল আইভানোইচ, পালমা তারি চমৎকার মানুষ! আমি যেমন ভেবেছিলাম, তার চেয়েও অনেক বড় সে। আর অতিশয় দানশীল। বলব কি তোমায় এক এক সময় মনে হয় টাকা-পয়সা সব বুঝি গেল। রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে ভেবে মরি···কিন্তু ভোরে ঘুম ভাঙতেই দেখি—না, শূন্য ভাণ্ডারে আবার রাশি রাশি এসে জমেছে। মানুষের এত থাকতে পারে—আমি আগে জানতাম না·····

—মেরিয়া; মস্কো গিয়ে আমার ঠিকানা জানাব। কোন সময় তোমার বা হোপের প্রয়োজনে যদি আমার দরকার হয়, বলো, আমায় খবর দেবে তো?

—দেব বৈকি! নিশ্চয় দেব। সব সময়ে আপনজনের সহায়তা নেওয়াই তো ভালো। এখন বস, আমি খবরটা দিয়ে আসি।

বুড়ী ভেতরে চলে গেল।

প্যাভলফ বসল না—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

কক্ষটি বেশ সাজান গোছানো। আভিজাত্যের ছাপ বেশ ফুটে উঠেছে। দেয়ালে বড় বড় অয়েল পেন্টিং। ঐ দাঁড়িয়ে আছেন প্রিন্স পিটার—ওদিকে সার্জের জননী এবং পাশেই শোভা পাচ্ছে সার্জ পালমার ছেলেবেলাকার একখানা ছবি। জানালায় আর দরজায় শোভা পাচ্ছে বহুমূল্য সুশোভন পর্দা। খাঁজকাটা মসৃণ টেবিল, শৌখীন চেয়ার এবং তার উপর সাজানো রঙিন পেয়ালা স্বতঃই পলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং সংগে সংগে মনে পড়ল এসকল আবেষ্টনীর ভেতর হোপ এখন বাস করে।

এসময়ে হোপ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই উভয়ের সামনাসামনি দেখা হয়ে গেল।

হোপকে তারি চমৎকার দেখাচ্ছিল। হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, পরণে জাঁকালো পরিচ্ছদ—কোন দিন এমন চমৎকার বেশে তাকে সে দেখেনি। এখন আগের চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে।

প্যাভলফের মুখ কিঞ্চিৎ শুকনো, চোখের দৃষ্টি গম্ভীর, ধারালো—অথচ সচেতন, কিন্তু তাতে কোন রকমের চাতুর্য বা লেশমাত্র অস্বাভাবিকতা ছিল না। আগের মতোই সরল—শান্ত। দুজন উভয়ের দৃষ্টিতেই অজ্ঞাতে একটা অস্পষ্ট রেখা ছায়া ফুটে উঠেছিল—আত্মসংযমের সঙ্কোচ-ছায়া—যা কোনদিন তাদের মধ্যে প্রকাশ পায় নি। নিজের অন্তরের এই দুর্বলতা অনুভব করেও প্যাভলফ হোপের এমন অতিরিক্ত উৎফুল্লতায় বেয়াদপি মনে করল এবং সেজন্য মনে মনে একটু রাগও হল।

হোপ এসেই নমস্কার জানাল। বলল: তুমি নাকি এখান থেকে চলে যাচ্ছ, পল?

—হাঁ, মস্কো যাচ্ছি, হোপ ইভানোভনা। একটা চাকরি পেয়ে গেলাম সেখানে। মাইনে তেমন নয়, তবে চলে যাবে কোনরকমে।

—তুমি তো এ জায়গা ছেড়ে যাবে বলছ। আচ্ছা, এখন সেখানে গিয়ে তুমি আগের মত কাজকর্ম চালাতে পারবে তো?

—কি যে বল! আমার বিশ্বাস, সেখানে আরও বেশি সুযোগ পাওয়া যাবে। দুঃস্থ-নিঃস্বদের ভেতর আমার অন্তর নিবদ্ধ—ওকাজে কোনদিন ঢিলেমি আলসেমির অবকাশ নেই।

—তুমি কর্তব্যে উদাসীন—একথা ভাবতেও আমার কষ্ট হয়।

—তুমি নিশ্চিন্ত থেকো হোপ, যতদিন এ শরীরে ক্ষমতা থাকবে, যে গুরু কর্মভার তোমারই মত মাথায় নিয়েছি, সে তার নেমে পড়বে না কোনদিন। তুমি একবার যার মনে প্রেরণা দিয়েছ, তার পক্ষে কাজে ঢিলা দেওয়া অসম্ভব—তোমাকে ভুলে যাওয়ার মতোই অসম্ভব।

হোপ উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল: করবার মতো এত কাজ পড়ে রয়েছে কিন্তু করবার মতো লোক কত কম···

—তুমি কি সব সময়েই ব্যস্ত থাক?

—হ্যাঁ, সব সময়।

—বেশ, এখন কেমন আছ। খুব সুখী তো?

—হাঁ, বেশ সুখে আছি। কিন্তু অন্য কোন দিকে নজর দেবার সময়-সুযোগ আমার নেই।

—নিশ্চিন্ত হলাম।—পল শান্ত কণ্ঠে বলল: যদি কোন সময় সামান্য ব্যাপারেও আমার প্রয়োজন বোধ কর, তাহলে আমায় অনুরোধ, একটা খবর দিও।

—আমার কাছে এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসবে তুমি ছাড়া কে আর আমার আছে, পল? যদি সময় আসে··· আমার ইচ্ছে···

হোপ, করুণদৃষ্টিতে তাকাল পলের দিকে। পল বুঝতে পারল হোপের মনের দুঃখ: তার জীবন মহনীয় করে তোলার ক্ষমতা—জীবনের কর্মপথ গৌরবোজ্জ্বল করে তোলার তার একমাত্র হোপেরই ছিল। কিন্তু যা সে করতে পারত, তা করা সে ভাল বলে মনে করেনি এবং যা সে করেছে তা ছাড়া আর কিছু করা সম্ভবও ছিল না।

—ঈশ্বর তোমার সহায় হোন—হোপ, সব সময়ে তোমায় স্মরণে রাখুন।—এই বলেই প্যাস্তলফ হোপের হস্তচুম্বন করল এবং হোপও নত হয়ে তার কপালে চুমু দিয়ে বিদায় জানাল।

—সার্জের সঙ্গে একটিবার দেখা করে যাবে না?

—আর তো সময় নেই ইভানোভনা। আজই রাত্রে রওনা হতে হবে। তা ছাড়া আরও কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।—এই বলেই সে বেরিয়ে পড়ল।

সার্জ ফিরে আসতেই হোপ জানাল পলের সাক্ষাতের কথা। সার্জ আন্তরিক দুঃখ জানাল। বলল: পলের সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। বন্ধুত্বের দিক দিয়েও একসময় বেশ অন্তরঙ্গতা ছিল। তারপর, হাঁ··· হোপের মুখের দিকে তাকিয়ে সে কি ভাবল, তারপরেই ফিরে এল আগের কথায়: হাঁ, আমাদের বিয়ের পর বৈ, তার সঙ্গে তো আর দেখা হয়েছে বলে মনে পড়ে না! আমার বিশ্বাস, তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছি বলে সে আমাকে ঠিক ক্ষমা করেনি। কিন্তু সত্যিই তুমি জানো, সে দোষ আমার নয়। সত্যি নয় কি?

—না, সে দোষ তোমার নয়। এবং বেশ জানি, সে জন্য পল আইভানোইচের মনে কোন বিদ্বেষও নেই। তার জন্যে বাস্তবিকই দুঃখ হয়—মস্কোতে সে ভারি একা পড়ে যাবে।

—না—না, সেখানে তার বহু বন্ধু জুটে যাবে।

কিন্তু হোপ ভাল রকমই জানে, মনের গভীরতায় তার নিজ জীবনের মহত্তর সুখাভিলাষ নিয়োজিত হয়ে আছে পল প্যাস্তলফের সন্নিহীন পথে। কেননা, হোপ সুখী হয়েছে। সার্জের সঙ্গে বিবাহিত-জীবন মেনে নেবার ব্যাপারে আন্তরিক সমর্থন কতটুকু, সে বিবেচনা সে সামান্যই করেছিল।

পলমাও সবই জানত। তাই সে হোপের অন্তর আপন করে পাওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লাগল।

প্রথমে চেষ্টা চলে যথাসম্ভব শান্ত এবং বিনীতভাবে: তার নূতন জীবনের যতরকম মধুময় রহস্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচয় করিয়ে দিলে, দুঃস্থ পতিতজনগণের মধ্যে যে মন মহৎ কাজের সন্ধান খুঁজে পেয়েছে, যাদের জন্যে অবিরাম চেষ্টা—এত

পরিশ্রম—সেই মন আপনা থেকেই ক্রমে বিমুখ হয়ে ফিরে আসবে।

পালমা এবং হোপ উভয়ের জীবনের ধারা প্রায় সবদিক দিয়েই বিপরীতমুখী। সার্জ পালমার অর্থপ্রাচুর্য সব সময়েই ছিল তার প্রয়োজনেরও বেশী। দুহাতে সে অর্থের ছিনিমিনি খেলত। সে কখনও ব্যয়কুণ্ঠ হতে পারেনি, জীবনে সঞ্চয়ও করেনি। অর্থের ব্যাপারে সংযমবোধ তার ছিল না, পক্ষান্তরে হোপের নিকট ছিল জরুরী প্রয়োজন। সার্জ অবশ্য নষ্ট করেছে এবং জীবনের স্বাভাবিকতা থেকে অনেক পরিমাণে বঞ্চিতও করেছে নিজেকে।

এবার আচার-আচরণে হোপের প্রতি পালমা উদার ও মুক্তহস্ত হয়ে উঠল। তার ধারণা, হোপের প্রয়োজন সম্ভবত খুবই বেশি। বস্তুত যে ক্ষেত্রে হোপের মোটেই প্রয়োজন নেই সেখানেও তার দানের তাগিদ ছিল অফুরন্ত। সার্জের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা : হোপকে সর্বান্তঃকরণে পাওয়া এবং সম্পূর্ণ ভোগ-সুখের গতিতে উভয়ের জীবন আবদ্ধ করা।

স্ত্রীর হৃদয় অধিকারের নেশায় সে মাঝে মাঝে হোপের আকাঙ্ক্ষিত কর্মপথেও পাশাপাশি যোগ দেবার প্রয়োজন অনুভব করেছিল। এবং ভালবাসার আকর্ষণে সে এমন এক পথে পা বাড়াল যা ছিল তার কল্পনার বাইরে—এমন কি প্রকৃতির বিরোধী। প্রথম প্রথম তার মনে বিরক্তিবোধই জেগেছিল, তবু সে সহ্য করেছে, এমন কি জীবনের এই নূতন অভিজ্ঞতাকে খুসীমনে মেনে নিল—এই কারণে যে, এই পথ—তারই আকাঙ্ক্ষিত পথ যাকে সে সর্বান্তঃকরণে ভালবাসে। হোপের মোহন-শক্তির প্রভাবে তার দৃষ্টিও ক্রমে বদলে গেল—স্ত্রীর চোখই এখন হল তার চোখ: জীবন-তত্ত্ব যারা ছিল তার দৃষ্টির বাইরে, ভালবাসার বিদ্যুৎ-স্পর্শে এবার তাদেরই সে দেখতে পেল নূতন চোখে। সে পেল এক নূতন জগতের সন্ধান—নূতন করে তাকা পেল মুখে।

এই পরিবর্তন চলে ধীরে ধীরে—কিন্তু ইয়ার-বন্ধুমহলে আগের মতো সার্জকে নিজেদের গোষ্ঠিতে না পেয়ে সবাই চটে গেল। দেখা হলে পিঠ চাপড়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল। তারা তাকে চায়ের মজলিসে নিমন্ত্রণ করে আনে এবং হোপের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে শেষে সবাই উচ্চকণ্ঠে বলাবলি করে—সার্জ পালমা সত্যি-সত্যিই মহা ভাগ্যবান। এবং পথভ্রষ্ট হয়েছে বলে যদি কেউ তখন চোখ ঠেরে কথা বলে, সে-সময়ে সার্জ পালমা ধীর শান্ত মনে চাপা হাসি হেসে সব কিছুই উড়িয়ে দিয়ে নীরব করে দেয় তাদের। ঐ সব বন্ধু-লোকদের কেউ কোনদিন মানুষের মঙ্গলজনক কাজ করেনি। হোপ তাদের কোনদিন কোন কথা বলেওনি। সে জানত, ওদের ফাঁপা মন ; মহৎ কাজ করার মতো উপাদান তাদের রক্তে নেই।

জন-মঙ্গলের কাজের ধারায় ছিল শান্ত নির্দোষ ব্যবস্থা এবং তা প্রচার করা হত পরিষ্কার ব্যাখ্যায়। এ কাজ অসহায় অধঃপতিতদের উন্নতির চেষ্টা মাত্র—এর পেছনে আর কোন মতলব নেই, তবে কর্তৃপক্ষের সন্দেহ ছিল বরাবর, নেকনজরও যে ছিল না তা নয়—তবে তেমন নয়। এই মহৎ কাজের দ্রুত উন্নতির জন্যে আরও মহৎ প্রাণের প্রয়োজন ছিল, যে-প্রাণ হবে কর্মচঞ্চল, সাবধানী এবং সূক্ষ্মদর্শী সুবিবেচক।

অবশ্য এদিকে বিপদের স্পন্দনও ছিল। প্রকৃতপক্ষে দুঃস্থ পতিত জনগণের যেদিন চেতনা জেগে উঠবে, নিজেদের মূল্য কি পরিমাণ এবং এই দুর্দশার হেতু কি—এসব ধারণায় সচেতন হয়ে উঠবে—সেদিন তাদের অন্তর গুমরে উঠবে ভীষণ আক্রোশে। এবং এই রোষ কখন হয়ত জ্বালিয়ে তুলবে অগ্নিগিরির দাহ, ছড়িয়ে পড়বে বহুদূর অবধি। নিরীহ জনগণ অপরাধী বলে সেই দুর্যোগের দায়েই দুর্ভোগ ভুগে জীবন দেয় এবং অনেক সময় প্রকৃত দুর্যোগকারীরা সচরাচর সতর্কতাবশত ধরা পড়ে না।

যে কঠোর সর্তে হোপ ও পালমার বিবাহ হল—পালমা সেই সর্ত বরাবরই মেনে চলতে লাগল। হোপের আকাঙ্ক্ষিত কর্মধারায় সেও তার সঙ্গী হয়ে পড়ল। কোথাও একটু ব্যতিক্রম ঘটলে উভয়েই দেখতে পেত—উভয়ের চোখে মুখে যেন চকমকির ঘর্ষণে ফুলকি জ্বলে উঠেছে।

সাধারণ মানুষ নামে মাত্র স্বাধীন—কিন্তু তারা স্বাধীনতা উপভোগে অজ্ঞ—সে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। হোপের লক্ষ্য ছিল—তার পরলোকগত পিতার আদর্শ : যারা অধীনতার বোঝাল কাঁধে বইছে, পঙ্কিল জীবনের দুর্বহতা সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলা এবং একদিন তাদের

জাগ্রত শক্তি যাতে মহৎ আদর্শে নিয়োজিত হয় সে শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু যাতে কোন হিংসাত্মক বা অবিবেচনামূলক দুর্ঘটনার সূত্রপাত হয়—যদিও তাদের ক্ষমতা অপরিণত—তবু সতর্কতারও বিরাম ছিল না। এই দুর্গত জন মর্ম এতরকম সতর্ক-সাবধানতাকে সময় সময় এমন উগ্রভাবে অস্বীকার করে কথাবার্তা বলত, যা শুনে পালমার মন আটকে যাবার মত অবস্থা দাঁড়াত। তখন তার মনে হত ওদের এক-একটি লোক যেন এক-একটি বারুদখানা।

খুব সতর্ক হয়ে ভেবে চিন্তে হোপ দলে যাদের ঠাঁই দিয়েছিল, কাজের ভার দিয়েছিল—তাদের কারও কারও উপর পালমার বিন্দুর সন্দেহও যে জাগেনি তা নয়। একদিন সে জিজ্ঞেস করল: ঐ যে পেট্রফ বলে ছেলেটি, তার কথা তোমায় বলি। তাকে কি তুমি নিরাপদ বলে ভাব?

হোপ বলল: ওকে তো অনেকদিন ধরেই ভাল বলে জানি, মার্জ! এর হাতে অনেকবার অনেক অর্থও দিয়ে দেখা গেছে কাজের সূত্রে—কিন্তু কোনদিন একটা কোপেকও গরমিল করতে দেখিনি।

—আমার কি মনে হয় জান? মনে হয়—সে হাঁটার চেয়ে মাটি কাঁপায় বেশি।—মার্জ মৃদু হেসে বলল। সে যেন সাপের মতো চলে, কাজেই চলতে গিয়ে পাছে তাকে মাড়িয়ে বসি, এই ভয়ে আমি তো পা বাড়াবার আগেই দূরে সরে থাকি।

—না, সে খুব শান্ত।

—ভাল। কেবল ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে যেন বলতে পারি, তোমার অর্থদান যেন সার্থক হয়—যেন তোমার ঈপ্সিত কাজে ব্যয়িত হয়।

—যেখানে আমি টাকা দেই, তাদের এমন দরকার যে তারা আর অন্য কাজে লাগাতে চায় না। কিন্তু তুমি যা বলেছ, তাও ঠিক। ভয়-ঝুঁকি আছে বৈকি। তবে এই ভয়-ঝুঁকি এড়াতে পারিনে যথাসম্ভব সতর্ক লক্ষ্য রেখেও। তুমি যখন আমার উপর এবং আমার কাজের উপর এমন লক্ষ্য রাখ—সে যে অসীম দায়িত্ববোধেই রাখ তা আমি স্বীকার করি।

—সেজন্য আমার কোন আফশোস নেই—যখন যা হবার হবে, সেজন্য দুর্ভাবনাও করব না। তুমিই আমার চোখে জ্ঞান-দৃষ্টি ফুটিয়েছ। এবং আমার দৃঢ়বিশ্বাস একদিন তুমি আমাকে তোমার মনের মতো খাঁটি মানুষ করে গড়ে তুলতে পারবে।

—আমার কাছে তুমি খুব খাঁটি মানুষ। তুমি আমার জন্যে অজস্র দিয়েছ, মার্জ! আমি আগে যেমন ভেবেছিলাম, তার চেয়েও তুমি অনেক বড়।

—এমন গুরুর হাতে পড়লে শিষ্য বড় হবে না কেন? আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ এই যে তোমাকে আমি রাশিয়ার মহারাণী জারিণার আসনে বসাতে পারিনি—তোমার পেয়াল খুশী মাফিক কাজে সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করতে পারিনি।

—আমি বলি, তুমি পারবে। কিন্তু একজনকে বাদ দিয়ে অপরজন সম্পূর্ণ অকেজো। রাশিয়ার জার কিংবা মহারাণী জারিণা—কেউ কাজের বাধা নয়—আসল বাধা তাদের অধস্তন যারা, তারাই। আমি বলতে পারিনে কবে কিভাবে তাদের রোগ সারবে।

—ভাল। আমার সব চেয়ে বড় কথা এই যে আমরা এমনভাবে কাজ চালিয়ে যাব যাতে কোন প্রবল শক্তির সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ না বাধে। তাহ'লে আমাদের কাজ দারুণভাবে বাধা পেয়ে পিছিয়ে পড়বে। আমরাও সম্ভবত···

হোপ কি চিন্তা করল। পরে বলল: সংকল্প আমাদের শুভ—সব ব্যাপারেই। এবং শেষ ফলের আশায়—তোমার কথায়ই বলতে পারি—একমাত্র ভগবানের উপরই নির্ভর করতে পারি আমরা।

—অহো হোপ, আমাদের এই শুভসংকল্প—আর কর্তারা বলেন সাইবেরিয়ার পথ পরিষ্কার করছি।—হাসিমুখে মার্জ বলল: কিন্তু—ঝড়-ঝাপ্টা যা-ই আসুক না কেন আমরা সব সময় সর্বান্তঃকরণে এগিয়ে যাব। আমাদের লক্ষ্য থাকবে—সত্য পথ···ন্যায়ের পথ। —ক্রমশঃ

চীনাদের পাতাল নগর

শ্রীরেবা দেবী

জাপানীরা যাকে "অধিকৃত চীন" বলে সেখানে কয়েকমাস কাটিয়ে এসে হ্যারিসন ফরম্যান সাহেব তার একটা চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন (Bombay Chronicle Weekly, May 6, 1945) :—

গ্রামে-গ্রামে, অলিতে-গলিতে, মাঠে-ময়দানে, সর্বত্রই মাইন পাতা হয়েছে ; পথে চলার পথ, ক্ষেতের ফসলও বাদ পড়েনি। কখন যে কোথায় বিস্ফোরণ হবে, ঠিক নেই। এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেখানে যে জাপানীরা একটা সামান্য নুড়োতেও হাত দিতে ইতস্ততঃ করে—কী জানি যদি বিস্ফোরক কিছু থাকে !

এই একদা-নিরীহ চীনা কৃষককুলের মাইন পাতার কৌশলও অতি বিচিত্র। কাচের জার, পাথরের গায়ে খোদা গর্ত—এই সব হল তাদের মাইন পাতবার ক্ষেত্র। বড় রাস্তার সঙ্গে মাইন ক্ষেত্রগুলির যোগাযোগ আছে। মাটীর নীচে ইট-বাঁধানো টিউবের মধ্য দিয়ে মাইনের তার চলে গেছে একটা সুইচবোর্ড পর্যন্ত। শত্রুর মাইন এলাকায় পদার্পণমাত্রই অপারেটর নির্বিকার প্রশান্তভাবে সুইচ টিপে দ্যায়—ব্যস্ খতম্।

গ্রামবাসীরা এখন আরও সাহসী হয়ে উঠেছে। জাপ-বিরোধী 'স্লোগান' লিখে খড়ের পুতুলের গায়ে তা ঝুলিয়ে রাখে। শত্রুরা পুতুলগুলোকে ফেলে দেবার চেষ্টা করলেই ঐগুলো থেকে বিস্ফোরণ হ'তে থাকে। কাজেই অপমান হজম করে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায় তখন তাদের পিছু হটতে হয়। এই রকম আরও সব মজার কাণ্ড করে থাকে চীনেরা। রাতারাতি গোটা একটা মাঠই হয়ত তারা ভরিয়ে ফেলল স্লোগান-লেখা খড়ের পুতুলে—মাত্র দু'একটার মধ্যে রইল বিস্ফোরক পদার্থ।

কিন্তু যে শিক্ষা জাপানীরা পেয়েছে, তাতে তাদের আর ভরসা হয় না ঐগুলোকে আক্রমণ কর্তে। রাস্তার দুই ধারে গর্ত খুঁড়ে তাতে তারা মাইন পেতে রাখে। পরে খুব সন্তর্পণে তার উপর আটো-ট্যাঙ্কার চালিয়ে নেয়—যাতে চট্ করে কোন সন্দেহ না হয় শত্রুর মনে। কয়েকখানা জাপানী ট্যাঙ্ক নষ্ট হবার পরেই ড্রাইভাররা সতর্ক হয়ে যায়। হঠাৎ যদি দু'একখানা সংকীর্ণ মাঝপথে চলতে গিয়ে উলটে যায়, চীনা-গরিলাবাহিনী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

গ্রামের প্রবেশদ্বারে জাপানীদের অভ্যর্থনা করার জন্যে তৈরী হয়ে আছে চীনাদের কাঠের কামান! কামানগুলি দশ ফিট লম্বা, কুঁদাগুলি জাপানীদের থেকে লুঠ্-করা টেলিফোনের তারে মোড়া। কামানের মুখ থেকে বর্ষিত হয় কাচের টুকরা, পেরেক আর পাথর !

আক্রমণকারীরা যখন গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে তখন তাদেরকে নানারকম বাধার সম্মুখীন হতে হয় ; পথে পাতা মাইন, প্রতি দরজায় বন্দুকের গুলি, প্রতি ছাদ থেকে বোমা-বর্ষণ অত্যাচারী জাপদের বরাতে আনে তাদের লোভের শাস্তি! কিছুক্ষণ এই রকম চলতে থাকে তারপর হঠাৎ সব থেমে যায়, আসে ঝড়ের আগেকার শান্তভাব। গ্রামের লোক সব যেন এক নিমেষে উপে গেল। এবার সুরু হয় নূতনতর লড়াই—মাটির নীচের লড়াই।

যুদ্ধের গোড়ার দিকের গ্রামবাসী বাড়ীর নীচে ঘর তৈরী করতো—আক্রমণকারীর কাছ থেকে লুকোবার জন্যে। জাপানীরা কিন্তু এই আত্মরক্ষাস্থানগুলি সহজেই বার করে ফেলল। এর পর থেকে পাশাপাশি বাড়ীর ভূগর্ভস্থ ঘরগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হল। সারা গ্রামটার নীচ দিয়েই চলল সুড়ঙ্গ আর সুড়ঙ্গ। জাপানীরা এবার আর একখানা বাড়ীর পেছনে লাগল না—সারা গ্রামটাই ঘিরে ফেলল। তারপর সুড়ঙ্গমুখে তারা আগুন, ধোঁয়া আর জল দিতে আশ্রয়স্থল ছেড়ে গ্রামবাসীদের তখন বেরিয়ে আসতেই হল।

বিপদে পড়লেই নানা ফন্দি ফিকির আবিষ্কার হয়। চীনাদের মাথায়ও এক আশ্চর্য কৌশলের কল্পনা এল। আগে যা হ'ত এক একখানা গ্রাম নিয়ে এবার তা হতে লাগল শত শত গ্রাম এক সঙ্গে করে। মাইলের পর মাইল তৈরী হল মাটির নীচে রাস্তা, ঘাট, আশ্রয়স্থল, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাওয়ার পথ। প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য এখানে সঞ্চিত করে রাখবার ব্যবস্থা হল। মোটকথা, দীর্ঘস্থায়ী অবরোধকালে

অবরুদ্ধ নগরীর প্রয়োজনীয় সব কিছুই রইল এই পাতাল-নগরে।

জাপানীরা কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ধরে ফেলল, এই আত্মরক্ষাব্যূহের দুর্বল স্থান কোথায়। এই ভূগর্ভনগরীর এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাওয়ার পথগুলি সব সরলরেখাকারে তৈরী। জাপানীরা গ্রামের বহির্ভাগে গিয়ে মাঠের মাঝখানে বৃত্তাকারে ট্রেঞ্চ খুঁড়তে লাগল। অনেক খোঁড়াখুঁড়ির পর যখন পাতালপুরীর সংযোগস্থাপনকারী পথের সন্ধান মিলল, তারা তা দিল বিচ্ছিন্ন করে। এই ভাবে তারা এক একটা গ্রামকে অন্যগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে লাগল।

চীনা কৃষকের অসীম ধৈর্য এতেও টলল না। তারা আবার নতুন প্ল্যানে সুড়ঙ্গপথ তৈরী করতে লাগল। পথগুলি এবার আর ঋজু করা হল না, এঁকে বেঁকে চলল। প্রত্যেক সুড়ঙ্গেই রইল স্বতন্ত্র ও অনিরপেক্ষ নির্গমপথ। ইচ্ছে করলেই যেন সুড়ঙ্গের কোন নির্দিষ্ট অংশকে বন্ধ করে ফেলা যায়—তার ব্যবস্থাও প্রত্যেক সুড়ঙ্গমুখে করা হল।

বিপজ্জনক এই সব সুড়ঙ্গপথ; জাপানীরা জানে গুঁড়ি মেরে ওর ভিতরে ঢুকলে মাথাটা কাঁধ থেকে খসে যাবে; কোথাও ওৎ পেতে আছে মরীয়া চীনারা, কোথাও বা মাইন-সুইচ আবার কোথাও বা এমন ফাঁদ পাতা রয়েছে পা দিলেই চলে যাবে অতল গহ্বরে!

এই টানেলগুলিতে রয়েছে ম্যানহোল-সংশ্লিষ্ট সারি সারি উল্টো U—টানেলের ভেতরে থেকেই শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থাও রয়েছে। খাবার দাবার ও মূল্যবান যা কিছু গ্রামবাসীরা এনে সঞ্চিত করে এই পাতালপুরীতে—গ্রামের বাড়ীগুলিতে একফোঁটা পানপানিও তারা ফেলে রাখে না। শুধু ঘরবাড়ী পুড়িয়ে জাপানীদের কি আর লাভ হবে? তা ছাড়া পোড়ানো অত সহজও নয়। বাড়ীগুলোর পুরু মাটির দেওয়ালে আগুন লাগানো রীতিমত কষ্টকর ব্যাপার।

নিজেদের ঘাঁটি ছেড়ে জাপানীরা গ্রামের মধ্যে বেশীদূর যেতে ভরসাও তেমন পায় না। কখন যে Eighteenth Group Army Regulars এর গরিলারা এসে আক্রমণ করে বসে এই তাদের সর্বদা আতঙ্ক। এই গরিলাবাহিনীর আশ্রয়স্থল যা ঘাঁটি হচ্ছে ভূগর্ভের এই বিচিত্র নগরী। দিনে তারা লুকিয়ে থাকে, রাত্রে অতর্কিতে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

একবার জাপানীরা ভূগর্ভস্থ চীনাদের জব্দ করবার এক কৌশল করেছিল। সুইসাইড স্কোয়াডের কয়েকজন সৈন্য একটা ফোনোগ্রাফ আর লাউডস্পীকারের সাহায্যে জাপানী ট্রাকের যাতায়াতের শব্দ শোনাতে লাগল নিকটবর্তী ভূগর্ভস্থ চীনাদের। প্রথমটায় চীনারা সত্যিই ভেবেছিল, জাপানী ট্রাক যাচ্ছে—গরিলাবাহিনী তৈরী হল এদেরকে আক্রমণ করবার জন্যে বেরিয়ে আসতে। খানিকক্ষণ বাদেই কিন্তু জাপানীদের চালাকি ধরা পড়ে গেল। ট্রাকের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু কৈ মাটিতো কাঁপছে না। চালাকিটা ধরতে পেরে তারা বাইরে বেরিয়ে পড়ল এবং যে কটা জাপানী ওখানে এই 'বাঁদরামি' করছিল তাদেরকে বন্দী করল। ফোনোগ্রাফটা এখন চীনাদের আনন্দ বর্ধনের উপকরণ হয়েছে।

জাপানীরা এখন নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে। চীনাদের বিব্রান্ত করবার জন্যে তারা হাজার হাজার ছোট ছোট ঘাঁটি স্থাপন করে সর্বদা এঘাঁটি থেকে ওঘাঁটিতে সৈন্য চলাচল করাচ্ছে। মাঝে মাঝে তারা Re-inforcement ও পাঠাচ্ছে ট্রাকে করে। আসলে এক একটা ট্রাকে থাকে ২।৫ জন সৈন্য আর বাকী রবারের পুতুল। চীনাসৈন্যের গুলিতে এই সব রবারের পুতুল ফেটে গিয়ে যেন জাপানীদেরকে উপহাস করতে থাকে।

কোনও কোনও জাপানী ঘাঁটিতে অবিরাম লড়াই চলে। গ্রামবাসীরা গ্রামের কুকুরগুলোকে ঘাঁটির চারিদিকের খাত-এ ফেলে দেয়। জলে হাবুডুবু খেতে খেতে কুকুরগুলো ঘাঁটির (Black-house) দেয়াল বয়ে উঠতে গিয়ে পিছলে পড়ে আর চেঁচাতে থাকে। জাপানীরা ভাবে, শত্রু আক্রমণ করছে। অমনি চলতে থাকে গুলিবর্ষণ। শেষে কিন্তু তারা বুঝতে পারে, কি বোকাটাই না তারা বনল। গুলিবর্ষণ কমে হয়, প্রহরীরা একটু অসতর্ক হয়ে পড়ে, গরিলাবাহিনী এসে তখন তাদের উপর অমিতবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

প্যারী

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

সুন্দর লোকটির কথা শুনে তার সম্বন্ধে বেশিক্ষণ ভাবতে সক্ষম হলাম না। সামান্য জিন খেয়েই বেশ নেশা হয়েছিল। কতকগুলি বাজে চিন্তা করতে করতে শুয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে উঠেই সুন্দর লোকটির ঘরের দরজায় টোকা দিলাম। কেউ সাড়া দিল না। ম্যানেজারের কাছে যেয়ে সুন্দর লোকটির সন্ধান নিলাম। ম্যানেজার বললেন, 'প্যাকতি'—মানে চলে গেছে। 'প্যাকতি' শব্দটির আসল মানে কিন্তু "চলে যাও" হয়। আমি ধরে নিয়েছিলাম "চলে গেছে"। উপরে গিয়ে দরজাটা খুলবার চেষ্টা করলাম। চেষ্টা করতেই দরজা খুলে গেল। রুম খালি। নিজের রুমে গিয়ে পায়ের নীচেই এক-পত্র পেলাম তাতে লেখাছিল "পরে দেখা হবে"। অপেক্ষা না করে আমিও সাইকেল নিয়ে বের হলাম। যদিও উদ্দেশ্য ছিল স্তেলভে-দ্যু-সেলুই পৌছানো তবুও যে দিকে চোখ যায় সে দিকেই যেতে লাগলাম।

আমার সামনে মস্তবড় একটা সেতু পড়ল। সেতুর নীচ দিয়ে একটি নদী বয়ে যাচ্ছে। নদীর নাম সীন্। নদীর জল কোথাও স্বচ্ছ আবার যে দিকে প্রবল স্রোত সেদিকে একটু ঘোলা। নদীর তীরে দাঁড়াবার স্থান নাই। ফুটপাথের উপর দিয়ে দলে দলে লোক চলেছে। বড় পথে অগণিত মোটরকার মোটর লরী, তাদের গন্তব্যস্থলে যাচ্ছে। আমি সাইকেলটা নিয়ে একটা ফুটপাথের উপর উঠলাম তারপর নদীর উপরের আকাশের দিকে তাকালাম। কোথাও একটা ভাংগা বাড়ী দেখলাম না। ১৯১৫ সালে অর্ধেকটা প্যারী নাকি ধ্বংস করা হয়েছিল, তার কোন প্রমাণ পেলাম না। তবুও নদীর তীরের বাড়ী এবং তারই পাশের পথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। সাইকেলটার উপর ঠেলা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ সাইকেলটা পড়ে গেল। আমিও আর দাঁড়ালাম না। পথে পথে ঘুরতে লাগলাম। বেলা যখন তিনটা হঠাৎ মনে হল গন্তব্যস্থানের কথা। পথের পাশের পুলিশটাকে পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করলাম। সে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আমার গন্তব্যস্থান। মন যদি দুর্বল থাকত, মনে যদি ভক্তি থাকত, দেশপ্রেম যদি ভুলে যেতাম, দেশ বিদেশের নারী নিয়ে যদি চর্চা করতাম তবে বলতাম "এটা অদৃশ্য হাতের খেলা, অদৃশ্য হাতই আমাকে আমার বাসস্থানের কাছে টেনে এনেছে।" সুখের বিষয় আমি অদৃশ্য হাত বলে কিছু আছে বলে মনে করি না।

পুলিশের নির্দেশ মত পথে আগিয়ে চললাম। বড় পথটা সোজা চলে গেল। সামনেই একটা ছোট গলি। গলি পথে পিচ দেওয়া ছিল না। ডান দিকে একটা ছোট রেস্তোরাঁ। সে রেস্তোরাঁয় বসে একজন ভারতীয় ভদ্রলোক মানে ছাত্র কফি খাচ্ছিলেন। আমি গিয়ে তাঁরই সংগে পরিচয় করলাম এবং সোলজে-দ্যু-সেলুই-এ যাতে একটি উত্তম রুম ভাড়া পাই তার বন্দোবস্ত করে দিতে বললাম। ছাত্র মহাশয় আমার কথায় রাজি হলেন এবং আমাকে কাছে বসিয়ে বললেন এ যায়গাটা হল পলিটিক্সের গরম স্থান, এখানে বেশিদিন থাকবেন না এবং পলিটিক্সও করবেন না। তাঁর কথায় আমি সায় দিলাম এবং বললাম, পলিটিক্স করতে আমি এখানে আসিনি। গরিব লোক বলেই বাইসাইকেলে করে প্যারী দেখতে এসেছি। হাঁ তাই বল দাদা, তবে এখানে থেকে প্যারী দেখা হবে না, অন্ততপক্ষে অন্যত্র থাকা চাই।

আমি বললাম, কয়েকটি দিন এখানে থেকে ভিক্ষা করে কিছু জমাই তারপর অন্যত্র যাব, আপনি দয়া করে আমাকে সেদিকে সাহায্য করবেন, আপনিও ভিক্ষার ধন হতে বাদ যাবেন না।

তা দেখা যাবে, এখন চলুন, আপনাকে রুমটা ঠিক করে দিয়ে আসি—বলেই ভদ্রলোক উঠলেন এবং নিজের পরিচয় দিলেন। আমি তাঁর পরিচয় নোট বইএ লিখেছিলাম এবং পরে তা ছিড়ে ফেলে দিয়ে ছিলাম। যে লোক বলতে পারে পলিটিক্স নিয়ে চর্চা করো না তার পরিচয় আমার নোট বইএ থাকা উচিত হবে না। হয়ত লোকটা গোয়েন্দাও হতে পারে। গোয়েন্দার নাম নোট বইএ যদি থাকে আর অপর লোক জানতে পারে তবে একটুও সাহায্য করবে না। পর্যটকের সকল দিকেই হুঁসিয়ার হয়ে থাকতে হয়।

সোলভে-দ্যু-সেলুই যাবার পর কয়েকজন লোক আমার প্রতি বেশ কড়া দৃষ্টি ফেলে চলে গেলেন। ম্যানেজার মহাশয় আমার সঙ্গে তেমন ভাল ব্যবহার করলেন না। এরূপ দুর্ব্যবহার আমি অনেক স্থানে পেয়েছি, সেজন্যই কিছু না মনে করে রুমটি নিয়ে নিলাম। দৈনিক তিন ফ্রাংকে এমন রুম প্যারীতে পাওয়া যায় না। ম্যানেজার আমাকে অবহেলা করলেন, কিন্তু যে বয়টি আমাকে রুম দেখাতে নিয়ে এলো তিনি আমার সংগে সদ্ব্যবহার ত করলোই উপরন্তু বন্ধুত্ব স্থাপন করে ফেললো।

জার্মাণীর নরম গদিতে শুয়ে, বেলজিয়মের পালকের বালিশে মাথা রেখে অভ্যস্ত হ'য়ে, ফ্রেন্চ্‌দের বাড়িতে থেকে, অভ্যাসটা একটু বদলে গিয়ে আরাম-প্রিয় হয়েছিল তাই সোলভে-দ্যু-সেলুইএর বিছানা দেখে মন উঠল না। বয়কে অনুরোধ করলাম এ বিছানা বদল করে দিতে। বয় আমার দিকে কতক্ষণ চেয়ে থেকে বললো আপনাকে অন্য রুম দিচ্ছি, সেখানে নরম গদি আছে। আমি বললাম দয়া করে তাই করো। আমার কথা শুনে লোকটির মুখে আনন্দের হাসি বেরিয়ে এল। আমি ভাবছিলাম লোককে কিছু বক্‌শিস্ দিতে হবে, লোকটি কিন্তু বক্‌শিসের কথা ভাবেনি, সে আমাকে সাহায্য করতে পেরেই ধন্য হয়েছিল। উত্তম বিছানার বন্দোবস্ত করে ফের প্যারী নগর দেখতে বের হব এমনি সময়ে একটি লোক বললে "সাইকেল নিয়ে কেন বেড়াতে যাবেন, চলুন আমিই আপনাকে সংগে নিয়ে যাচ্ছি, সাইকেল রেখে আসুন।" আমি তাই করলাম এবং পায়ে হেঁটে বেড়াতে বের হলাম।

ঐতিহাসিক নগর প্যারী পায়ে হেঁটে দেখা অতীব কষ্টকর কাজ। তবুও সাথী পেয়ে অনেকটা সুবিধা হ'ল। তিনি আমাকে পথ দেখিয়ে চলছিলেন তিনি বয়সে বৃদ্ধ। চলার পথে তিনি অনবরত বকে যেতে লাগলেন। প্রথম ভাবছিলাম লোকটার মাথা খারাপ হবে, কিন্তু পরে বুঝলাম লোকটির মাথা খারাপ নয়, যা বলে যাচ্ছে তাতে বেশ অর্থ আছে এবং সজ্ঞানেই কথা বলছে।

আমরা বেশিক্ষণ হাঁটতে পারলাম না। বাসে গিয়ে বসলাম এবং প্যারীর সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যভূমির কাছে এলাম। একটি তোরণ-দ্বারের ভেতর দিয়ে মস্তবড় একটা পথ চলেছে। পথের দুদিকে লোকালয় অতি অল্প তবে পথের দুদিক পত্র পুষ্পে শোভিত। এই পথে বেরিয়েই অনেকে কবিতা লেখে, ভারতবাসী প্যারীর সুনাম ভারতে বহন করে আনে। আমরা বাস হতে নেমে এই পথেরই পাশে একটি বাড়িতে গেলাম এবং দরজায় কড়া নাড়লাম। দরজা খুলে গেল, দেখলাম এ ঘরের সামনার রুমটাতে একখানা ছোট কাফের আড্ডা। কয়েকজন যুবক সেখানে বসে কাফে খাচ্ছিলেন। বৃদ্ধও কাফের আদেশ করল। দু পেয়ালা কাফে খেয়ে যখন আমরা বের হব তখন বৃদ্ধকে একজন লোক ইংগিত করল। বৃদ্ধ সে ইংগিত অবহেলা করে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইংগিত অবহেলা করার কারণ কি? বৃদ্ধ বলল, ভুলে গিয়েছিলাম তোমার কথা। তুমি ত সে ধরণের লোক নও, তোমাকে ভুল করে খারাপ স্থানে নিয়ে এসেছিলাম। তোমার কথা আমার কাছে অন্য একজন লোক বলেছে। সে কথাও ভুলে গিয়েছিলাম। আচ্ছা তুমি ত হিন্দু, পরজন্ম মান? আমি জিজ্ঞাসা করলাম "তুমি কি জাতে ফ্রেন্চ্?" লোকটি বললে "না হে আমি ফ্রেন্চ নই, আমি জাতে জেনিশ্, আমাকে দেশ হতে বের করে দেওয়া হয়েছে, আমি এক জন পাপী লোক, পাপেতেই আমার মন যায়, তোমার কোন সর্বনাশ করব না, তুমি আমার বন্ধুর বন্ধু, অতএব তুমি আমারও বন্ধু। আমার কথার জবাব দিলে না?" আমি বললাম "পুনর্জন্ম বলে কিছু আছে তা আমার মনে স্থান পায় না, তবে আমার দেশের লোক তা মানে, তুমি কি মরবে নাকি? পুনর্জন্মের কথা দিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন?"

লোকটি এ বিষয়ে আর কোন কথা বলল না, সে আমাকে কয়েকটি বড় বড় বিল্ডিং দেখিয়ে বলল, এসব হ'ল নেপোলিয়নের সময়ের রাজপ্রাসাদ, ভেতরে যদি যেতে চাও তবে নিয়ে যেতে পারি। আমি বৃদ্ধকে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে বললাম, এখানে রাজপ্রাসাদ দেখতে আসিনি, নেপোলিয়নের কথা আমি চিন্তাও করিনি, আমি আসছি মানুষ দেখতে, তবে কোন বড় লোকের বাড়ি নিয়ে হাজির করো না, আমি বড়লোক ঘেঁসা নই, তবে বড় বড় রেস্তোরাঁয় যেতে রাজি আছি।

বৃদ্ধ এবার মুখ খুলল এবং আমাকে ফের বাসে নিয়ে বসাল। আমরা বাসে করে শহরের শেষ সীমান্তে একটি দরিদ্র পল্লীতে উপস্থিত হলাম। দরিদ্র পল্লীর বাসিন্দা নানা দেশের লোক। নিগ্রো, মালয়, শ্যাম, চীনা, জাপানী, আর্মেনিয়ান এরাও আছে তবে তাদের সংখ্যা খুব কম। গ্রীক, পর্তুগীজ, ইংলিশ, ডচ, আইরিশ, সাদা রুশিয়ান, মন্টেনিগ্রো, বুলগার এদের সংখ্যাই বেশি। এখানে নানা দেশের খাবারের দোকানও আছে। আমরা একটি সাদা রুশের দোকানে গিয়ে বেশ করে খেয়ে নিলাম। তখনকার দিনে সাদা রুশদের আমি বড়ই ঘৃণা করতাম, কিন্তু তাদের দোকানের পনীর, ঘন দুধ, কালো রুটি, মাখন এবং দই আমার বেশ ভাল লাগত বলেই তাদের দোকানে যেতে বাধ্য হতাম। খাবার খেয়ে আমরা মস্তবড় একটি গ্রীক রেঁস্তোরাঁয় গিয়ে কাফি খেতে বসলাম। যদি বলি রেঁস্তোরাটি লোকে লোকারণ্য ছিল তবে দোষ হবে না। আমরা কতক্ষণ চুপ করেই কাটালাম, তারপর আমি আমার ভিক্ষার বিজ্ঞপ্তি পত্র বিলাতে লাগলাম। আমার পরিচয় সকলের কাছে দিলাম, পঁচাত্তর ফ্রাংকের মত ভিক্ষাও পেয়ে গেলাম, এখন বাকী রইল প্যারী নগর তথা ফ্রেন্চ্‌দের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার অবগত হওয়া। বেশীক্ষণ লাগল না, মিনিট দশেকের মধ্যেই কয়েক জন লোক পেয়ে গেলাম যাঁরা বেশ ভাল ইংলিশ বলতে পারতেন এবং রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধেও তাঁদের বেশ অভিজ্ঞতা ছিল। কথা আরম্ভ হল।

কথা

আপনি তবে চ্যাচ্‌ন্যাও বেড়িয়ে আসছেন, দেশটা কেমন মনে হল?

আপনার কোন দেশ?

আমি, আমার দেশ ত নেই, আমি ইহুদী, এই দেখুন আমার পাসপোর্ট, মিঃ হিটলার আমাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে জার্মাণী হতে বিদায় করে দিয়েছেন।

আপনারাই একদিন জার্মাণী দেশটা পাঁচ পাউণ্ড দিয়ে বৃটিশ, ফ্রেন্চ্‌ এবং আমেরিকার কাছ থেকে কিনে-ছিলেন না, এবার অর্দ্ধচন্দ্র খেয়ে বিদায় হয়েছেন, সেজন্য দায়ী কে?

যারা আমাদের কাছে ভাচ্‌ল্যাণ্ড বিক্রি করেছিল, তারাই এবার নিজের হাতে সে দেশটা নিয়েছে। ফল কি হবে বলতে পারি না, তবে যে সাপকে দুধ-কলা দিয়ে পোষা হচ্ছে সেই সাপই তাদের একদিন কামড়াবে। আপনি বোধ হয় ইংলণ্ডে যাবেন, সেখানে যান, আমার জন্য ইংলণ্ডএর পথ যেমন বন্ধ, পালেষ্টাইনের দরজাও সেরূপ। এখন আমি ঘুমুই, বেশ রাত হয়েছে, শেষটায় শোবার স্থান পাব না। আপনার সংগ পরিত্যাগ করতে ইচ্ছা হচ্ছে না তবে শোয়াটাও পরিত্যাগ করা চলে না, এখন আসি তবে, বিদায়।

যে লোকটি এত কথা বল্‌ল সেও একটি যুবক। অতি কষ্টে সে মনের ভাব প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে। যাদেরই একটু গাম্ভীর্য আছে তারাই এতগুলি কথা এক সংগে বলতে রাজি হয় না। যখন মানুষকে গৃহত্যাগী করা হয় তখন মানুষ গাম্ভীর্য হারিয়ে ফেলে, মনের কথা তাদের অজ্ঞাতে এসে পড়ে। সেজন্য তারা দোষী নয়, যারা তাদের পথে বসিয়েছে তারাই দোষী। একাকী অনেকক্ষণ বসে থেকে লোকটার সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবলাম তারপর ডায়রীতে তারই কথা বিশেষভাবে লিখে অন্য লোকের কথায় যোগ দিলাম। এখানে লোক প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে, কিন্তু হাত পা ছড়িয়ে নড়তে গেলেই ফ্রেন্চ্‌ পুলিশ এসে গলা ধাক্কা দেয়। এরূপ স্থানে এসে আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করেছিলাম। এরূপ স্থানে আমাকে নিয়ে আসার জন্য বৃদ্ধকেও আমি ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম। বৃদ্ধ আমার কথা শুনে বলেছিল, "আমার প্রাপ্য আমি পেয়েছি। অনেক দিন হয় ভাল খাবার পাইনি, তুমি আমাকে পেট ভরে খাইয়েছ, ধন্যবাদ দেবার মত এখানে কিছুই নাই। একবার এদিকে এস, আমার একজন বন্ধুর সংগে পরিচয় করিয়ে দেই, হয়ত আমার বন্ধু তোমাকে পাঁচ ফ্রাংক ভিক্ষা দিতেও পারে।" আমি আনন্দের সহিত বৃদ্ধের বন্ধুর সঙ্গে দেখা করলাম, তবে পাঁচ ফ্রাংক পাইনি, লক্ষ ফ্রাংকএর মত সংবাদ পেয়েছিলাম।

(ক্রমশঃ)

জাতীয় সপ্তাহ—

স্বাধীনতার পথ যে আমাদের কুসুমাস্তীর্ণ নয়, পদে পদে অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়নকে সঙ্গী করে আমাদের চলতে হবে প্রতি বৎসর—সে কথা কংগ্রেস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় 'জাতীয় সপ্তাহ' ব্রত উদ্‌যাপন করে। জালিয়ানওয়ালা বাগের শষ্পাচ্ছাদিত প্রান্তর নিরস্ত্র নির্বিরোধী স্ত্রী-পুরুষ-বাল-বৃদ্ধের রক্তে সেদিন কলংকিত হয়েছিল, অমৃতসরের রাজপথ সেদিন হিংস্র সাম্রাজ্যবাদীর 'প্রেস্টিজ' রক্ষার ক্ষেত্র হয়েছিল। নিরুদ্ধবাক্ পাঞ্জাববাসিগণ যখন ইতিকর্তব্য স্থির করতে অপারগ কংগ্রেস তখন এগিয়ে এল, জাতিকে উদাত্ত কণ্ঠে শোনাল যে এ অপমান পাঞ্জাববাসীর একার নয়, এ অপমান সমগ্র ভারতবাসীর—শুধু ভারতবাসীর নয়, এ অপমান সাম্রাজ্যবাদশোষিত পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত জাতির! প্রতি-বৎসর জাতীয় সপ্তাহে ভারতবাসী সে-কথা স্মরণ করে এবং এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। জালিয়ানওয়ালাবাগ আজ জাতির সম্পত্তি—জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি জাতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে মুক্তি-সংগ্রামের পথে।

জালিয়ানওয়ালাবাগে, অমৃতসরে যাঁরা প্রাণ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার সহ্য করে জাতিকে জাগ্রত করে গেছেন আজ তাঁদের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি; তাঁদের আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয়নি, তাঁদের মৃত্যু-নির্যাতন-অপমান জাতিকে আজ তার লক্ষ্যস্থানের অতি নিকটে নিয়ে এসেছে।

ইওরোপীয় সমর—

রুশ-ভল্লুকের নখর আঘাতে জরাজীর্ণ জার্মানী চারিদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে অবশেষে মিত্রশক্তির নিকট বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করেছে। কিছুদিন থেকে যুদ্ধের গতি যে ভাবে চলছিল তাতে জার্মানীর পতন যে দিনকয়েকের ব্যাপার তা সহজেই বোঝা যাচ্ছিল। সেজন্য জার্মানীর আত্মসমর্পণের সংবাদে লোকে তেমন বিস্মিত হয়নি। যে কোনো দিন জার্মানী পরাজয় স্বীকার করতে পারে এটা সকলেই বুঝতে পেরেছিল বলে এই সংবাদ অপ্রত্যাশিতের মধ্যে যে তীব্র বিস্ময় আছে তার সঞ্চার করতে পারেনি। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মালয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি যে-সব দেশ ইওরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ সে-সব দেশের অধিবাসীরা ইংরেজ মিত্রপক্ষের এই বিজয়ে যে সত্যিকার কোন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেনি, এটা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। ইংরেজ মিত্রপক্ষ মানব-মুক্তির যে বাণীর কথা প্রচার করে আসছেন সেই মুক্তির বাণী তাদের নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রীতদাসদের জন্য নয় এটা ক্রীতদাসরা জানে, তাই তাদের প্রভুদের এই বিজয়ে তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আশান্বিত ত হয়ই নি, উপরন্তু শক্তিমানের শক্তিবৃদ্ধিতে মনে মনে আতংকিতই হয়েছে।

মিত্রপক্ষের এই জয়লাভকে যাঁরা এক গণতান্ত্রিক আদর্শের জয় বলে মনে করেন আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত নই। ধনতান্ত্রিক সমাজে সাম্রাজ্যবাদীদের ভেতর এরকম যুদ্ধ ধনতান্ত্রিকবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি; নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও আত্মরক্ষার জন্য এরকম লড়াই অনিবার্য ঘটনা। সোভিয়েট রাশিয়ার এতে যোগদান আসলে নিছক আত্মরক্ষামূলক। ইংরেজ ও অ্যামেরিকানরা এই যুদ্ধে যেমন নিজেদের সাম্রাজ্যিক স্বার্থরক্ষার জন্য লড়েছে, সোভিয়েট রাশিয়া ঠিক সে-রকম নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য এ-যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল। এ জন্যই সাম্রাজ্যবাদের আওতায় যে-সব দেশ আছে তাদের জনসাধারণ বার্লিনের পতনের মধ্যে নিজেদের অবস্থা ভালদিকে পরিবর্তিত হবার কোন লক্ষণ দেখে না বলেই আশান্বিত হবার পরিবর্তে আতংকিতই হচ্ছে।

তবে দুহাজার মাইল দূরে ভূমিকম্প হলেও যেমন তার আলোড়ন যতই ক্ষীণ হোক দুহাজার মাইল দূরের লোকেরা

পাচ্ছে ঠিক তেমনই এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে গণতান্ত্রিক আদর্শ খানিকটা পুষ্টিলাভ না করে পারে না। আমাদের মত দেশগুলির পক্ষে সেইটুকুই আশা। বিদেশী অধীনতা-পাশ থেকে মুক্ত হবার জন্য আমাদের সংগ্রাম যদি শক্তিশালী হয় তা হলেই এই ক্ষীণ আশার রশ্মিরেখাই আমাদের দাবী বিশ্বের দরবারে প্রোজ্জ্বল করে তুলবে। আমাদের স্বাধীনতার দাবীর যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে কারও কিছু বলবার নাই। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থের মাপকাঠিতে আমাদের দাবীর বিচার সাম্রাজ্যবাদীরা করলেও পৃথিবী তা' করে না। স্টেটিনিয়াস বা ইডেন পর্যন্ত আমাদের দাবীর বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেন না কিন্তু তাঁদের জাতীয় স্বার্থ আমাদের স্বার্থের পরিপন্থী তাই আমাদের স্বাধীনতাকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য যে সব নানান ধরণের 'যুক্তি' ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা তুলছেন তাঁরা তা'তে বাধ্য হয়েই সায় দিচ্ছেন।

মলোটোফ ও ভারতবর্ষ—

সোভিয়েট রাশিয়ার বৈদেশিক সচিব মলোটোফ সানফ্রান্সিসকো বৈঠকে 'ব্রাকেটে' ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ তুলেছেন বলে' আমাদের অনেকে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। পোলাণ্ডের রুষ আশ্রিত লুবলিন সরকারকে স্বল্প বৈঠকে স্বীকার না করায় মলোটোফ ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং সে প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে ভারতবর্ষ ইংরেজের তাঁবেদার রাষ্ট্র হলেও তাকে 'সার্বভৌম' রাষ্ট্র বলে মেনে নিতে সোভিয়েট রাশিয়া যখন আপত্তি করে নি, তখন লুবলিন সরকারকে ইংরেজ ও আমেরিকার মেনে নেওয়া উচিত। এবং এই প্রসঙ্গে মলোটোফ্ আশা করেছেন যে খুব শীগগিরই প্রকৃত স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধিরা এই স্বল্প বৈঠকে বসবেন। অবশ্য মলোটফের এই ভবিষ্যত বাণী সাফল্যমণ্ডিত হলে আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু সুদূরভবিষ্যতেও এর সম্ভবনা আছে কী? আমরা মলোটোফের এই কথাগুলির ভেতর আনন্দোৎফুল্ল হবার কোনো কারণ দেখতে পাই না। ভারতবর্ষ অধীন দেশ, প্রতিনিধিরা ভারতীয় হলেও ভারতবাসীদের প্রতিনিধি নয়, তারা ইংরেজ সরকারের মনোনীত, একথাটা মলোটোফ্ সাহেব এবং সানফ্রান্সিসকো কনফারেন্সে উপস্থিত সবাই জানেন। এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন যে কি ভাবে এগিয়ে চলেছে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মীর বিজয় অভিযান থেকে তা' তাদের হালিফ্যাক্স ও গিরিজা বাজপাইর উপস্থিতি সত্ত্বেও বুঝতে বাকী থাকে না। ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন হবে এবং সেই স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধি শিগগিরই আন্তর্জাতিক দরবারে আসন পাবে, মলোটোফের এই কথার ভেতর এরচেয়ে আমাদের উৎফুল্ল হবার কিছুই নেই। বরঞ্চ স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের আসরে পরাধীন ভারতের মধুপুচ্ছধারী প্রতিনিধিদের এক পংক্তিতে আসনদেবার বিরুদ্ধে মলোটোফ্ সাহেব প্রতিবাদ করলে আমরা মনে করতাম যে গণতন্ত্রের মর্যাদা তিনি রক্ষা করেছেন। তাঁর বলবার ভঙ্গী থেকে মনে হয় যে তিনি বলতে চাইছেন যে স্বাধীন রাষ্ট্রের আসরে পরাধীন রাষ্ট্রকে ছদ্মবেশে চালিয়ে নিতে তিনি যখন আপত্তি করেন নি তখন তাঁর তাঁবেদার লুবলিন গভর্ণমেণ্টকে ঠাঁই দিতে ইংরেজ ও আমেরিকার আপত্তি করা ঠিক নয়। মলোটোফের উক্তির এরকম ব্যাখ্যা করাটা কেহ কেহ অপছন্দ করতে পারেন। ভারতবর্ষ শীগগির স্বাধীন হবে এটা যে মলোটোফের আন্তরিক আকাংখা নয় সে কথা আমরা বলছি না। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবীকে তিনি এমন পঙ্গুভাবে সানফ্রান্সিসকো কনফারেন্সে উপস্থিত করবেন, এটা কেউ ভাবতেও পারে নি।

বাংলার দুর্ভিক্ষ কমিশন—

কমিটী, কমিশন বসানোটা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের একটা নিজস্ব বিশিষ্টতা। নিজেদের অপরাধের বোঝাটা অপরের কাঁধে চাপাবার একটা সুযোগ এতে মেলে। কতকগুলি লোক ও পদ্ধতিকে দোষী সাব্যস্ত করে লম্বা চওড়া উপদেশ দিয়ে এঁরা ক্ষান্ত হ'ন। যারা মরল তারা ত মরেছেই, তাদের জন্য মাথা ব্যথা করে লাভ কি? যাঁরা ভাবেন যে ভবিষ্যতে এরকম পরিস্থিতি হলে কি করা যাবে তার নির্দেশ এই সব কমিশনের রিপোর্টে থাকায় সেই সব পরিস্থিতি উপস্থিত হলে সময় মত প্রতিবিধান করা যাবে, তাঁরাও বিরাট ভুল করেন। আমলাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে অভিজ্ঞতার কোন বালাই নাই।

পঞ্চাশের মন্বন্তর সম্বন্ধে দুর্ভিক্ষ কমিশন যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে সরকারী গলদের পরিচয় পাতায় পাতায়

ফেলে। কিন্তু এই সব গলদ যারা করেছে তাদের শাস্তি দেবার কোনো কথা এতে নাই। সরকারী গলদের ফলে হাজার হাজার লোক মরেছে, অনশন অর্দ্ধাশনের ফলে রোগগ্রস্ত হয়ে কতলোক সারা জীবনের মত পঙ্গু হয়ে রয়েছে—কিন্তু যারা এর জন্য দায়ী তাদের কিছু করবার উপায় নেই। মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে টাকা রোজগার করাটা যাঁদের বিবেকে বাধে নি তাঁদের শাস্তি রাষ্ট্রশক্তি কি দিতে সাহস পায় না? রাষ্ট্রশক্তি যেখানে বিদেশীর স্বার্থে পরিচালিত হয় সমাজ সেখানে দুর্বল, সমাজের বিরুদ্ধে যারা পাপ করে, অন্যায় করে, সমাজ তাদের কোনরূপ সাজা দিতে অক্ষম।

'মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' বাংলার দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টের উপর মন্তব্য করেছে যে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র ভেঙ্গে পড়ার এরকম দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় নি। কথাটা সত্যি। তবে এটাও সত্যি কথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করবার জন্যই ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র বাংলাকে ভাঙ্গতে যেয়ে নিজেই ভেঙ্গে পড়েছে। কিছুদিন থেকে একটা কথা আমাদের দেশে ও বিলেতে উঠেছে যে ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী বলেই এখানকার খাদ্যশস্যের অপ্রতুলতা দেখা দিচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা এবং আসল অবস্থা থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেবার একটা কৌশল মাত্র। ভারতবর্ষে দশ বৎসরে জনসংখ্যা যে অনুপাতে বেড়েছে, ইংল্যাণ্ডে তার চাইতে বেশী বেড়েছে এবং জাপানেও অনেক বেড়েছে। আসলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে আমাদের দেশকে কাঁচা মাল উৎপন্ন করবার জন্য তৈরী করা হচ্ছে এবং সেই চেষ্টার ফলে আমাদের বহু আবাদী জমী অনাবাদী মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে; আমাদের দেশের চাষযোগ্য জমীর অন্ততঃ শতকরা ৩৫ ভাগ অনাবাদী হয়ে পড়ে আছে; রাষ্ট্রশক্তির ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকলে এই জমীতে শস্য জন্মান মোটেই কঠিন কাজ নয়। আমাদের দেশে জমীকে গভর্ণমেণ্ট যে সব বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন তার ভেতর "Not available for cultivation" চাষের জন্য পাওয়া যাবে না বলে একটা শ্রেণী আছে। এই শ্রেণীতে ৮ কোটী ১০ লক্ষ একর জমী অর্থাৎ দেশের সমগ্র জমীর শতকরা ১৭ ভাগ পড়ে। এছাড়া "Current fallow" বা 'চলতি অনাবাদী' বলে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমী আছে। আজকালকার বৈজ্ঞানিক উন্নতির দিনে "not available for cultivation" ও "current fallow" এই দুই শ্রেণীর জমীই জাতিকে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য শস্য দিতে সমর্থ। বর্তমান যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের মত দেশে পর্যন্ত খাদ্যশস্য বাড়াবার কাজে বিজ্ঞানকে টেনে আনা হয়েছে আর আমাদের দেশে আবাদী জমী ধীরে ধীরে অনাবাদীতে পরিণত হলেও সেদিকে রাষ্ট্রের দৃষ্টি নেই, তার প্রতিবিধান করবার কোনো ক্ষমতা নেই। বিদেশী মূলধনীদের বিরাগভাজন হয়ে একসময় রেলপথগুলির অত্যাচারে দেশের স্বাভাবিক জল নিকাশের রাস্তা বন্ধ হয়ে দেশের সর্বনাশ করলেও রাষ্ট্রশক্তি সেদিকে দৃষ্টিপাত করত না। ফলে দেশের বহু জমী জলাতে বা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে, ম্যালেরিয়ায় সারা দেশ ছেয়ে গেছে। তার ফলে আজ আমাদের দেশে এমন বৃহৎ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে যার সমাধান করতে সমগ্র জাতিকে সুকঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অধীনে থাকার পরিণতিই এই। এবং এর জন্যই কোনো অবস্থাতেই সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে গণতন্ত্র অগ্রসর হতে পারে না। উডহেড কমিশন এই সত্য কথাটা উচ্চারণ করতে পারে নি কারণ তা' করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরা আমাদের বিগত দুর্ভিক্ষের যে কারণ এর প্রতিপৃষ্ঠার প্রতি পংক্তিটির অন্তরালে আত্মগোপন করে' আছে তাকে সহজেই খুঁজে পাবেন।

সিরিয়া লেবাননে সমস্যা—

ফরাসী সরকার মধ্য প্রাচ্যে তার প্রভুত্ব ছাড়তে মোটেই রাজী নয়। যে লীগ অব্ নেশনস্ সিরিয়া ও লেবাননে ফরাসীদের 'ম্যাণ্ডেট' দিয়েছিল তার অকালমৃত্যু হলেও ফ্রান্স সেই ম্যাণ্ডেটকে কায়েমী স্বত্বে পরিণত করতে চায়। জার্মানীর হাতে ফ্রান্সের শোচনীয় পরাজয়ের ফলে সিরিয়া ও লেবাননবাসীরা ফ্রান্সকে তাড়াবার সুযোগ পেয়েছিল। এবং সে সময়ে মধ্য প্রাচ্যে কোনো বিবাদ লাগলে জার্মানী তাতে সুবিধা করে' নিতে পারে এই আশংকায় চার্চিলীয় সরকার তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ করে সিরিয়া ও লেবাননকে আংশিক স্বাধীনতা দিয়ে তখনকার মত

গোলমালটা বন্ধ করেছিলেন। এখন জার্মানী পরাজিত, ইংরেজ ব্রিটেন, সানফ্রান্সিসকো, ও নিজেদের আসন নির্বাচন নিয়ে ব্যাপৃত; এজন্যই বোধহয় দা গল সরকার সিরিয়া ও লেবাননে নিজেদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হয়েছে।

গত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকেই শোষিত জাতিগুলি সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছিল। সেজন্যই এবার মধ্য প্রাচ্যে মিশরীয় জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বে এবার আরব লীগ গঠন করতে অগ্রসর হয়েছে। এই লীগ প্রথম থেকেই মধ্য প্রাচ্যে বিভিন্ন আরব জাতিগুলিকে একত্রিত করে বাইরের শক্তিগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য দাঁড়িয়েছে। এই সংগঠন শক্তিশালী হবার পূর্বেই দ্য গল নিজের আধিপত্যকে কায়েম করবার জন্য সিরিয়া ও লেবাননে অভিযান করেছে। এবার মধ্য প্রাচ্যে সিরিয়া লেবাননে শান্তিরক্ষার স্বার্থ চার্চিলের নেই, বরং চার্চিল যে শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য চেষ্টিত সেই শ্রেণীর স্বার্থ দ্য গলের বর্তমান অভিযানে পুষ্ট হবে। সুতরাং চার্চিল-সরকার যে সিরিয়ায় এখন দ্য গলের বিরুদ্ধে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে তা' মনে হয় না।

সিরিয়া ও লেবাননের স্বার্থ আজ সাম্রাজ্যবাদ শোষিত সমস্ত দেশ ও জাতির স্বার্থ। এজন্যই আজ ফ্রান্সের এই অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের তীব্র প্রতিবাদ জানান প্রয়োজন। দ্য গল সরকারের সর্ব বিভাগেই বর্তমানে কম্যুনিষ্টদের প্রতিপত্তি থাকাসত্ত্বেও যখন এই আক্রমণাত্মক অভিযান ঘটতে পেরেছে তখন এই কথাটাই পরিস্ফুট হোল যে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে কোনো অবস্থাতেই যারা সত্যিকারের শ্রেণীস্বার্থের বিরোধী তাদের হাত মেলানো চলে না। এই ঐতিহাসিক সত্যকে ফরাসী কম্যুনিষ্ট পার্টি অস্বীকার করাতেই আজ দ্য গল সিরিয়া ও লেবাননে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থকে লাগাম ছেড়ে দিয়েছে।

ব্রহ্মদেশের সমস্যা

ব্রহ্মদেশের অধিকাংশই এখন জাপ-কবল হতে মুক্ত হয়েছে। ইওরোপের বিভিন্ন দেশগুলি যেমন জার্মানীর হাত থেকে মুক্তি পেয়েই স্বাধীন হয়েছে, ব্রহ্মদেশের অধিবাসীদের সময় তা' হয় নি। মাকখানটায় পুরোণো অতি-তালিদার জুতোকে ঠোক্কর মেরে যে নতুন জুতোর মালিকেরা এসেছিল তাদের জুতো কাঁচা চামড়ায় তৈরী ছিল; পুরোণো জুতোর মালিকেরা তাদের জুতো বেশ করে' সারিয়ে এসে নতুন জুতোকে হটিয়ে দিয়ে আবার নিজেদের পুরোণো জায়গায় কায়েম হয়ে বসেছে। জুতোর নীচে যারা ছিল তাদের অবস্থা যেমন ছিল তেমনই রইল, হয়ত দু'দুবার দুরকম জুতোর ঘা খেয়ে একটু বেশি ক্ষতবিক্ষত হোল মাত্র।

ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকার একটি সরকারী ঘোষণা করেছেন। এতে তাঁরা বলেছেন যে বর্তমানে ব্রহ্মের শাসনতন্ত্র যা' যুদ্ধের পূর্বে কায়েম ছিল তা' স্থগিত থাকবে। যুদ্ধের ফলে অনেক কিছু ওলটপালট হয়ে গেছে সুতরাং এখন সমস্ত ক্ষমতা ব্রহ্মের ইংরেজ লাট সাহেবের হাতে দেওয়া হল। তিনি একটি তাঁরই মনোনীত লোক নিয়ে গঠিত কমিটীর সাহায্যে ব্রহ্মের শাসন কার্য চালাবেন। এর পর যখন তিনি সঙ্গত মনে করবেন তখন যে-সরকারী ব্রহ্মদেশবাসীদেরও এই কমিটীতে নিতে পারবেন। ইংরেজ সরকার আশা করছেন যে এর পরে ব্রহ্মবাসীরা নিজেরাই একমত হয়ে এমন একটি শাসনতন্ত্র গঠন করবেন যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভেতরে থেকেই ব্রহ্মবাসীরা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পেতে পারেন।

জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংরেজ যুদ্ধ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস ইংরেজ মিত্রপক্ষের কাছে জানতে চেয়েছিল যে তোমাদের এই যুদ্ধ করার লক্ষ্যবস্তুটা কি, কেন তোমরা যুদ্ধ করছ। এর উত্তর ইংরেজ সরকার দেয়নি এবং দেয়নি বলেই কংগ্রেস সারা ভারতবর্ষের হয়ে বলেছিল যে অক্ষ-শক্তির পরাজয় আকাংক্ষা করলেও কংগ্রেস এই যুদ্ধে ইংরেজ সরকারের সহযোগিতা করতে পারবে না। কংগ্রেসের আশংকা ছিল যে ইংরেজ সরকার পৃথিবীতে গণতন্ত্র স্থাপনের জন্য যুদ্ধ করছে না, যুদ্ধ করছে তার সাম্রাজ্যকে কায়েম রাখতে। ব্রহ্মদেশ পুনরধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে এই সরকারী তথাকথিত 'শ্বেতপত্র' যে ইংরেজ সরকারের সাম্রাজ্যবাদের নিকট, স্বেচ্ছাতন্ত্রের নিকট সম্পূর্ণ

আত্মনির্ণয়কারী শ্বেতপত্রকে সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। জার্মানরা গ্রীসের, চেকোশ্লোভাকিয়ার, যুগোশ্লোভিয়ার রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক জীবনে সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিয়েছিল; কিন্তু তাই বলে জার্মানদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে-সব দেশ ও মিত্রপক্ষের সম্মিলিত কমিশনের শাসনে যায়নি; সে-সব দেশের অধিবাসীরা ও নিজেরাই নিজেদের দেশ শাসন করছে। ব্রহ্মদেশ জাপ-অধিকারের ফলে যে-বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে গিয়েছে, সে-বিপর্যয়ের সংশোধন ব্রহ্মবাসীরা নিজেরা যে-ভাবে করতে পারবে, বিদেশী ইংরেজ সরকার সেভাবে কখনও করতে পারে না। আসলে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা ব্রহ্ম পুনর্গঠনের যে কথা বলে সে পুনর্গঠনের লক্ষ্য ইংরেজ ব্যবসায়ীর স্বার্থকে সংগঠিত করা। ব্রহ্মদেশবাসীর জন্য ব্রহ্মদেশ গঠন করা ইংরেজ সরকারের কাছে গৌণ লক্ষ্য মাত্র। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগতিতে আশংকিত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে পৃথক করেছিল; তাদের ভরসা ছিল যে যদিই বা ভারতবর্ষ শেষ পর্যন্ত স্বাধীন হয়ে যায় তবুও ব্রহ্ম তাদের হাতে থাকবে। ব্রহ্মের তেল, কাঠ ও খনিজদ্রব্যের ব্যবসায়ে ইংরেজ ব্যবসায়ীর বহু কোটী টাকার মূলধন খাটছে—ব্রহ্মদেশ যদি স্বাধীন হয় তা হলে এই ব্যবসায় তাদের হারাতে হবে।

বর্তমান যুদ্ধ যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য হয়নি তার খুব প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্রহ্মসম্বন্ধে ইংরেজ সরকারের এই 'শ্বেতপত্র'। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় একজন বিদেশী ইংরেজ ডিক্টেটারের হাতে সমগ্র দেশের শাসন-ভার দেওয়া হল। তাঁরই মনোনীত কমিটির সাহায্যে তিনি দেশ শাসন করবেন। এবং যদি কখনও ব্রহ্মবাসীরা একমত হয়ে একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করে তবেই তাদের হাতে তাদের দেশশাসনের ভার ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু ঐ শাসনতন্ত্র পূর্ণস্বাধীনতা-মূলক হলে ইংরেজ সরকার কি করবেন তা' সুস্পষ্টভাবে বলেন নি। ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন লাভ হবে ইঙ্গিত শাসনতন্ত্রের আদর্শ! সাম্রাজ্যবাদ যে সব পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতি শোষিত দেশে সৃষ্টি করে তাতে দেশ শুদ্ধ লোক বা দল কখনও কিছুতে একমত হবে, এ আশা বাতুলতার নামান্তর। ক্রিপস্ প্রস্তাব ঠিক যে ঐক্যের মরীচিকা আমাদের সামনে তুলে ধরেছে এই ব্রহ্ম শ্বেতপত্রও ব্রহ্মবাসীর কাছে সেই মরীচিকাই স্থাপিত করেছে। সাম্রাজ্যবাদ শোষিত দেশে জাতীয়তাবাদ যখন খুব অগ্রসর হয় তখন সেখানে মাত্র একটি বিষয়ে একতা দেখা যায়—সেটি হচ্ছে দেশ থেকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদকে দূরীকরণ। আজ ব্রহ্মদেশে যদি সামগ্রিক ভোটে একটি প্রস্তাব নেওয়া হয় যে ব্রহ্মদেশবাসীরা বিদেশী শাসন চায় কি না চায়—তবে সমস্ত দেশ বিদেশীদের বিরুদ্ধে ভোট দেবে। কিন্তু শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে এরকম একমত কখনও আশা করা যায় না। কারণ সে-সময়ে নানা শ্রেণীর ও নানা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্বার্থ মাথা নাড়া দিয়ে দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো সম্বন্ধে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা কখনও 'জাতীয় স্বাধীনতা' কথাটি ব্যবহার করে না। Self-Government বা স্বায়ত্তশাসন অথবা ইংরেজ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন এর বেশী ইংরেজ সরকার কখনও চায় না। জাতীয় স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে যে পার্থক্য তা অন্ধ ও বাতুল ছাড়া কাহারও বুঝতে বাকী থাকে না। ব্রহ্মশ্বেতপত্র একটি কথা বেশ পরিষ্কার করেই বুঝিয়ে দিল যে সাম্রাজ্যবাদ কিছুই শেখে না—লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বিসর্জনের মর্ম সে বোঝে না; তার সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী তার মহাজনীখাতার—টাকা আনা পয়সার অংকের মধ্য দিয়ে সবই ব্যাখ্যা করতে চায়। এই দৃষ্টিভংগী যতদিন না পরিবর্তিত হবে ততদিন লীগ অভ নেশনস্‌ই বল আর সিকিউরিটি কাউন্সিলই বল সবই ভুয়া। ট্যাংক, এরোপ্লেন, মলোটোফ্ বাস্কেট পুনরায় নূতনতর রূপে মানব সভ্যতাকে পঙ্গু করতে বারে বারে ফিরে আসবে।

সানফ্রান্সিসকোতে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী—

সানফ্রান্সিসকোতে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী ভারতের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যে প্রচারকার্য করছেন তাহাতে তিনি কেবল ভারতের নয়, সাম্রাজ্যবাদ-কবলিত সমস্ত দেশবাসীর আমরণ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর প্রচার কার্যের প্রত্যক্ষ ফল আশু কিছু না হ'লেও ইহা সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূল শিথিল করবার যে প্রচেষ্টা নানা দিক থেকে হচ্ছে

সেই প্রচেষ্টাকে শুরুতরভাবে সাহায্য না করে পারে না। সানফ্রান্সিসকোর ব্যবস্থা পরিষদে তাঁকে বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান করাতেই ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে মার্কিন জাতির আগ্রহ বোঝা যায়।

গান্ধিজী ও ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়—

শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লা, স্যর রতন টাটা, নলিনী রঞ্জন সরকার প্রভৃতি যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতি কি ভাবে হতে পারে দেখবার জন্য ইংল্যাণ্ডে গিয়েছেন। কিছুদিন পূর্বে ভারতসরকার ভারতবর্ষের শিল্পোন্নয়নের জন্য ইংল্যাণ্ডে একটি বেসরকারী ভারতীয় প্রতিনিধিদল পাঠাবার প্রস্তাব করেছিলেন। শ্রীযুক্ত বিড়লা প্রভৃতির বর্তমান বিলাতগমন সেই প্রস্তাব অনুসারে হয়েছে বলে' দেশবাসীর ধারণা। গান্ধিজী এর বিরুদ্ধে তীব্র মত পোষণ করেন জেনে শ্রীযুক্ত বিড়লা তাঁকে জানান যে তাঁরা ইংরেজ সরকারের তাঁবেদার হয়ে বিলাত যাচ্ছেন না; নিজেদের খরচ তাঁরা নিজেরাই সম্পূর্ণভাবে বহন করছেন এবং তাঁরা এদেশে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য বিদেশী বণিকের স্বার্থকে ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রয়োজিত করবেন না। গান্ধিজী শ্রীযুক্ত বিড়লার এই টেলিগ্রামের উত্তরে যে বিবৃতি দেন তাতেই বোঝা যায় যে তিনি ভারতীয় গণস্বার্থকেই কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, যে শিল্পোন্নয়ন দেশের সমগ্র গণসাধারণের স্বার্থকে উন্নীত না করে দেশের স্বল্পসংখ্যক লোকের স্বার্থের পোষণ করে তার সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ নেই। আমাদের দেশে এখনও এমন লোক আছে যারা কংগ্রেসকে বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান, গান্ধিজীকে আমেদাবাদের মিলওয়ালাদের চর বলে প্রচার করে। এরা গান্ধিজীর এই বিবৃতিটির কি ব্যাখ্যা করবে তা জানতে ইচ্ছা হয়। কংগ্রেসের বিবর্তন যে কত দ্রুত ও কিরূপ আমূল সে বিষয়ে যাদের দৃষ্টিশক্তি সংকির্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ তাদের বোঝান শক্ত। কারণ এরা নিজেদের স্বিত স্বার্থের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে কিছুতেই তার বাইরে ভাবতে পারে না। র‍্যাডিকেল ডিমোক্রাট, ডিমোক্রাটিক ভ্যানগার্ড প্রভৃতি বহু ছোটখাট পত্রদল বেকার-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে গঠিত। এদের আদর্শবাদ সুদূরদৃষ্টি ও প্রকৃত শিক্ষার অভাবে অত্যন্ত সংকীর্ণ; নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থের মধ্যে এরা পথ হাতড়ে মরে। পথ এরা পেতে পারে না, কেন পায় না সে বোঝবার মত বুদ্ধি এদের নেই, সেজন্য এরা দায়ী করে দেশের একমাত্র গণপ্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে ও তার নেতা গান্ধিজীকে। নানা বিবর্তনের ভেতর দিয়ে কংগ্রেস আজ এক বিরাট গণবিপ্লবী দলে পরিণত হয়েছে—গান্ধিজীর বর্তমান বিবৃতি সেকথাটি বিশেষ করে পরিষ্কার করেছে।

বাংলার রাজবন্দী ও সংবাদপত্র—

বাংলা দেশে প্রায় ১৪০০ রাজবন্দী বিনা বিচারে আবদ্ধ আছেন। এদের মধ্যে অল্প কয়েকজন ছাড়া প্রায় সকলেই কংগ্রেসের সমর্থক ও কংগ্রেস কর্মে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। বাংলা ও ভারত সরকার কিন্তু এদের সকলকে কংগ্রেস কর্মী বলে' স্বীকার করেন না। কিছুদিন পূর্বে স্যর ফ্রান্সিস মুদী যখন কংগ্রেসী বন্দীদের সংখ্যা প্রকাশ করেন তখন বাংলার এই সব রাজবন্দীদের এই সব হিসাবের মধ্যে ধরেন নি! এটা তাঁর ইচ্ছাকৃত না অপর কিছু তা বলতে পারি না; প্রকাশ, বাংলার লাট কেসি সাহেবকেও এ-বিষয়ে ভুল বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে। কেসি সাহেবকে নাকি বোঝান হয়েছে যে বাংলার কংগ্রেসী রাজবন্দী প্রায় নেই-ই, যাঁরা বিনা বিচারে বন্দী আছেন তাঁরা সবাই terrorist, সন্ত্রাসবাদী। মুসলিম লীগ যখন মন্ত্রিত্ব করেছিলেন তখন তাঁরা ভাবে-ভঙ্গীতে দেখাতেন যে বিনা বিচারে যাঁরা বন্দী আছেন তাঁদের নিয়ে মাথা ব্যথার প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁরা প্রায় সকলেই হিন্দু। তাঁরা কংগ্রেসীই হোন, কি সন্ত্রাসবাদীই হোন এ নিয়া সাম্প্রদায়িক কোনো মন্ত্রিসভাই শ্যামাপ্রসাদ-ফজলুল হক বা নাজিমুদ্দিন-বরদা পাইন বেহাই কিছু করেন নি, করতে চাহেনও নি। মাঝে মাঝে ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্ন উঠিলে দায়সারা গোছ একটা জবাব দিয়ে তাঁরা কাজ সেরেছেন।

কিন্তু এ-বিষয়ে বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলি তাঁদের দায়িত্ব যে এড়িয়ে চলেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাংলার কংগ্রেস আন্দোলন সম্বন্ধে এঁদের যেন কোনো দরদই নেই। মাঝে কালেভদ্রে হয়ত একটা প্যারা কেহ লিখলেন, কোনো রাজবন্দীর সম্বন্ধে হয়ত একখানা চিঠি বের করলেন। নিয়মিতভাবে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বাংলার কংগ্রেস সম্বন্ধে, কংগ্রেস কর্মীদের সম্বন্ধে এঁরা কেউই লেখেন না। এঁরা যদি বলেন যে বাংলায় কংগ্রেস আন্দোলন নেই বলেই তাঁদের লেখবার কিছু থাকে না, তাহলে বলব যে একথা আংশিক ভাবে সত্য হলেও পূর্ণ সত্য নয়। কংগ্রেস সম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশের সংবাদপত্রগুলি যেভাবে লেখেন বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকীয় বিভাগের দৃষ্টি কি সেদিকে পড়ে না? এটা খুবই সত্য কথা যে, কংগ্রেসের এই যে এতগুলি কর্মী আজ কারান্তরালে জীবন কাটাচ্ছে, এদের কথা বাংলাদেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র না লেখাতে নিজেদের সাংবাদিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছেন। এই একান্ত লজ্জার কাহিনী লিপিবদ্ধ না করতে পারলেই ভাল হোত, কিন্তু তাতে সংবাদপত্রের দায় থেকে আমরা নিজেদের মুক্ত করতে পারতাম না।

শ্রীভারতী প্রেস লিমিটেড, ৩৯৷১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং ৩৯৷১ আপার সার্কুলার রোড হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

—রবীন্দ্রনাথ

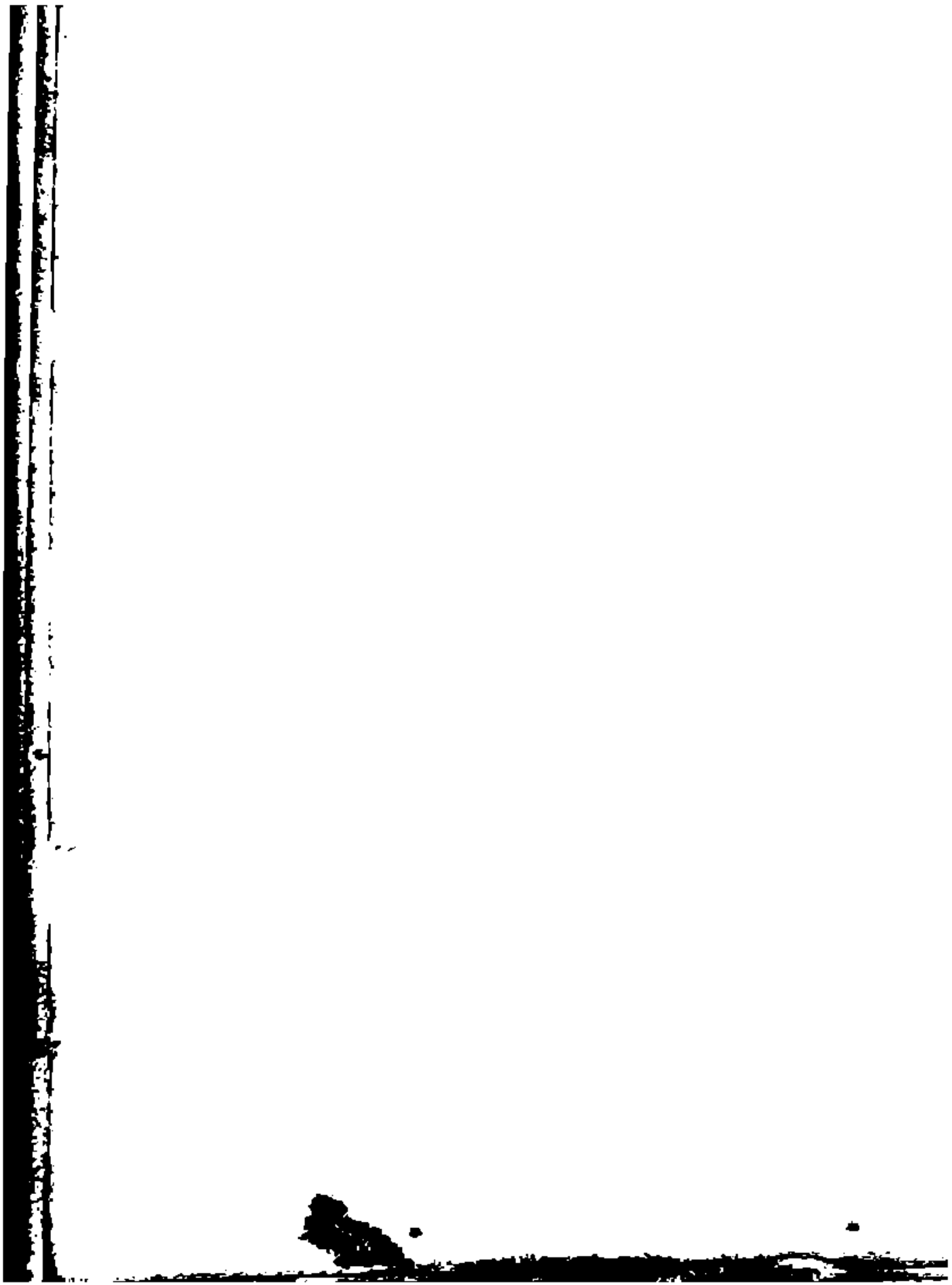

পরিচয়

৯ম বর্ষ আষাঢ়—১৩৫২ ৩য় সংখ্যা

বৈদেশিক দৃষ্টিতে বাংলা দেশ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিদেশীদের কৌতূহলের অন্ত নাই। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম ও দার্শনিক চিন্তাধারা সেই সুদূর অতীতকাল হইতে আজও পর্য্যন্ত বহু বৈদেশিক জাতিকে এদেশে আকর্ষণ করিয়াছে, পরধনলুব্ধ জাতিরা সদলবলে আসিয়া ভারতবর্ষকে লুণ্ঠন করিয়া গিয়াছে, বহু জাতিকে ভারতবর্ষ আশ্রয় দিয়া জীর্ণ ও আত্মস্থ করিয়া ফেলিয়াছে, বহু জাতির সহিত আজিও সংঘর্ষের শেষ হয় নাই। সুদূর পশ্চিম হইতে হিন্দুকুশ ও কারাকোরামের পার্ব্বত্যপথে পদাতিক ও উষ্ট্রবাহী বণিকের দল এদেশে আসিয়াছে ও গিয়াছে, পণ্যের বিনিময় ঘটিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও চিন্তার। ভারতবর্ষই প্রায় সকল ক্ষেত্রে উত্তমর্ণ; ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় গণিত, ভারতীয় জ্যোতিষ পশ্চিম পৃথিবীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে যে সহায়ক হইয়াছে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। মহাজ্ঞানী সোক্রেটিস যে কোনও ভারতীয় যোগীর নিকট তাঁহার অভিনব চিন্তাধারার প্রেরণা পাইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আজ তাহা স্বীকার করিতেছেন। ভারতীয় বুদ্ধের প্রভাব যে উত্তরে চীন, পূর্ব্বে জাপান ও দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জকে আলোড়িত করিয়াছিল, তাহাও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে; চৈনিক পরিব্রাজক ও তীর্থঙ্করেরা খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্ব হইতেই এদেশে দলে দলে তীর্থযাত্রায় আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাচীন পাশ্চাত্য কবি ও ঐতিহাসিকেরা তাঁহাদের কাব্য ও ইতিহাসে ভারতবর্ষকে নানাভাবে জড়িত করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে পাকাপাকি রকমে এদেশে ইংরেজ বণিকদের অধিষ্ঠান পর্য্যন্ত এইভাবে বহু ভ্রমণকারীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ও অন্যান্য রচনায় ভারতবর্ষ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত উল্লেখ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধেও অনেক পুস্তক রচিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক যে কোনও পুরাতন গ্রন্থাগার হইতে সেগুলি সংগ্রহ ও পাঠ করিতে পারিবেন।

বাংলা দেশ সম্বন্ধে বর্ণনারও অভাব নাই। প্রাচীন কালেও আছে, মধ্যযুগেও আছে, তবে বাংলা দেশ বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে। Gadwin, L'Abbe Guyton, H. Verelst, E. Hamilton, Sir William Jones, N. E. Kindersley, J. Richardson, B. Solvyns, R. Crawford, W. Bolts, Major Dirom, W. Fullerton, J. Z. Holwell, E. Ives, R. Orme, W. Playfair, J. Scott, H. Vansittart, W. Hastings, G. Forester, J. Taylor, J. Rennel—প্রভৃতির লিখিত ও অঙ্কিত ভ্রমণ-কাহিনী, ইতিহাস, চিত্র ও মানচিত্রে বাংলা দেশের তদানীন্তন যে পরিচয় পাওয়া যায়, যে কোনও কৌতূহলী পাঠক আজ তাহা সংগ্রহ করিতে পারেন। ইহাদের রচনা অষ্টাদশ শতাব্দীতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ

শতাব্দীর বাংলা দেশ সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত ও প্রকাশিত পুস্তক ও চিত্রের সংখ্যাও কম নয়। এই সকল খ্যাত ও বহুবিদিত উপকরণ লইয়া বাংলার তমসাচ্ছন্ন রূপ-বর্ণনার চেষ্টা আশানুরূপ না হইলেও বর্তমানে অনেক গবেষক ইহা লইয়া কাজ করিতেছেন। তবে দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষাতে এই আলোচনা একেবারেই হয় নাই।

উপরে উল্লিখিত পুস্তক, চিত্র ও মানচিত্রগুলি আমাদের বর্তমান আলোচনার উপকরণ নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীর নবম ও দশম দশকে ইংলণ্ড হইতে একদল মিশনরী বাংলা দেশে খ্রীষ্টমহিমা প্রচারের অভিপ্রায় লইয়া আগমন করিয়াছিলেন এবং পরে দিনেমার উপনিবেশ শ্রীরামপুরে বাসা বাঁধিয়া শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা করিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। বাংলা দেশ সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে ইঁহাদিগকে বিলাতের মূল প্রতিষ্ঠানে সংবাদ সরবরাহ করিতে হইত; এগুলি চিঠি বা জার্নালের আকারে লিখিত হইত। মূল প্রতিষ্ঠান এইগুলি হইতে বাছাই করিয়া তাঁহাদের মুখপত্রে প্রকাশ করিতেন। স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে এগুলি কখনও বাহির হয় নাই। এই সম্প্রদায়ের মুখপত্র ছিল '*Periodical Accounts Relative to the Baptist Missionary Society*'—ইহা মুদ্রিত হইত ইংলণ্ডের ক্লিপটোন হইতে। এই বিবরণগুলি বর্তমানে অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ একটি সেট মাত্র শ্রীরামপুর কলেজের বোর্ডরুমে রক্ষিত ছিল, যুদ্ধের হাঙ্গামায় তাহা স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এই 'পিরিওডিকাল অ্যাকাউন্টসে' বাংলা দেশে প্রথম ব্যাপটিষ্ট মিশনরী জন টমাস, বাংলা সাহিত্যে বিখ্যাত উইলিয়ম কেরী, জশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড প্রভৃতির বাংলা দেশ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা চমৎকার ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে পলাশীর যুদ্ধ ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পনের-কুড়ি বছরের মধ্যেই বাংলা দেশের চেহারা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, এইগুলি হইতে তাহার একটা ধারণা হয়। আমরা ইহা হইতেই নিম্নলিখিত বিবরণটি সঙ্কলন করিতেছি। যাঁহারা এই লেখকদের সম্বন্ধে জানিতে চান তাঁহারা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ১৩৪৪—১৩৪৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত আমার "বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ" প্রবন্ধ দেখিতে পারেন।

জন টমাস সর্বাগ্রে আসিয়াছিলেন, তাঁহার বিবরণীই সর্বাগ্রে দিতেছি। তিনি ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে "অক্সফোর্ড" নামক জাহাজের ডাক্তার হিসাবে বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর তারিখে দিনাজপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর তারিখের 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' জন টমাস কলিকাতায় একটি খ্রীষ্ট-ধর্মসমিতি স্থাপনের আবেদন প্রকাশ করেন; ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনিই সর্বপ্রথম সদস্য হন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ নবেম্বর তারিখে নরদাম্পটনের মূল প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনে জন টমাস যে আত্মবিবরণী দাখিল করেন, তাহাতে বাংলা দেশ সম্বন্ধে কিছু পরিচয় আছে। তিনি বলিতেছেন:

"আমি এখানে হিন্দুদের সম্বন্ধে আপনাদিগকে কিছু খবর দিতে চাই। তাহাদের আচার ব্যবহার, তাহাদের দেশ এবং লিখিতে লিখিতে যাহা কৌতূহলকর বলিয়া আমার মনে হইবে, সেই সকল বিষয়েই আপনাদের জানাইব।

হিন্দুদের মধ্যে চারিটি শাস্ত্র বা আইন প্রচলিত আছে, এইগুলিকে তাহারা বেদ আখ্যা দিয়া থাকে; বেদের প্রতি উহাদের অসীম শ্রদ্ধা এবং ইহাদের ধারণা ব্রাহ্মণেতর কেহ বেদ পাঠ করিলে অথবা শ্রবণ করিলে পাপে পতিত হয়। বহু লক্ষ বৎসর পূর্বে বেদ রচিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস। এই ধারণা যে ভুল তাহা সহজেই তাহাদের মধ্যে প্রচলিত অন্যান্য গ্রন্থ হইতে প্রমাণ করা যায়। বেদ সংস্কৃত ভাষায় রচিত, এই ভাষাকে প্রাচ্যের লাতিন ভাষা বলা যাইতে পারে। সকল ধর্মসম্পর্কিত মতবাদের ইহাই আদি; কোরাণ যেমন মুসলমানদের এবং বাইবেল যেমন আমাদের, হিন্দুদের ইহা তেমনই। পুরাণ নামে আরও আঠারোটি ধর্মগ্রন্থ আছে—এগুলি বেদের ভাষ্য। এই সকল পুরাণ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা ব্রাহ্মণদের রীতি এবং আলাপ-আলোচনায় এই সকল গ্রন্থ হইতে আবৃত্তি করিয়া নিজেদের যুক্তি ও উক্তি প্রমাণ করিবার কৌশল ইহারা সর্বদা অবলম্বন করিয়া থাকে। শাস্ত্রগ্রন্থগুলি পদ্যে রচিত বলিয়া ইহারা সহজেই তাহা আয়ত্ত ও ব্যবহার করিতে পারে। এই সকল শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতি ইহাদের গভীর শ্রদ্ধার কথা যাহারা এদেশে আসে নাই তাহাদের পক্ষে সম্যক

প্রতিধান করা সম্ভব নয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কেহ এই সকল শাস্ত্রকে ভ্রমাত্মক প্রমাণ করিতে চাহিলে ইহারা ধৈর্য্যের সহিত তাহার যুক্তি শ্রবণ করে, একটুও বিচলিত হয় না। এই সকল শাস্ত্রবর্ণিত কোনও কোনও পুরুষ অতিশয় দুশ্চরিত্র ও লম্পট হওয়া সত্ত্বেও ইহারা তাহাদিগকে পরম শ্রদ্ধা করে। কোনও কোনও শাস্ত্রের তত্ত্ব অতিশয় মায়াত্মক, স্পষ্টত নারকীয় উৎস সমুদ্ভূত—তথাপি ইহাদের মন ও আচারের উপর সেগুলির প্রভাব অদ্ভুত। ঈশ্বর যে এক এবং অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্র বিরাজমান এবং সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহাকে পূজা করিতে হয়, তাঁহার সেবা করিতে হয়, আত্মা অবিনশ্বর, আমরা সকলেই পাপী, প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন—এই সকল কথা ইহাদের মধ্যে সাধারণ লোকেরাও সর্ব্বদা বিশ্বাস করিয়া থাকে। আমি যথার্থ বলিতেছি, আমি যখনই ইহাদের সহিত আলাপ করিয়াছি, নিঃসংশয়ে লক্ষ্য করিয়াছি, ইহারা পরের কথা শুনিতে উৎসুক এবং সর্ব্বদা ভদ্র ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহারে অভ্যস্ত। আমার বিশ্বাস, ধর্ম্মের সরলা হিন্দুদের নিকট উন্মুক্তই আছে।...

বাংলা দেশে মঙ্গলসমাচার প্রচারের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বাধা হইতেছে জাতের (caste) বাধা। যে কেহ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আমাদের সহিত পান-ভোজনাদি করিবে, তাহার জাত যাইবে। যাহার জাত গেল তাহাকে তাহার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ও নিকটতম আত্মীয়েরা চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিবে, তাহাদের চোখে সে পতিত ও অন্ত্যজ হইয়া দাঁড়াইবে।...

আমি এখানে একটি কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করিব। ইহা হইতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যাহারা আমাদের সংস্রবে আসিয়া প্রতিমাপূজা, পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের কি প্রকার বিপদ ঘটিয়াছে। মোহনচাঁদ এইরূপ একজন সংস্কারমুক্ত ব্রাহ্মণ, মালদহ হইতে ছয় মাইল দূরে ভোলাহাটে তাহার বাস। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখে সে আমার সহিত [জন টমাস তখন মালদহে এক নীলের কুঠির অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করিতেছিলেন] দেখা করিতে আসে। ফিরিয়া গিয়া সে পার্ব্বতী নামক অপর একজন ব্রাহ্মণকে দেখিতে পায়। পার্ব্বতী মোহনচাঁদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। পার্ব্বতী অবস্থাপন্ন ঘরের লোক, মোহনচাঁদ অপেক্ষা মানে ও বংশগৌরবে শ্রেষ্ঠ। সে হিন্দু আচার অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করিত, প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া দূরবর্ত্তী বন হইতে নানা বিচিত্র ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিত। পূজায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া এই সকল ফুল ইহাদের নিকট অতিশয় মূল্যবান। ফুল আনিয়া সে নিকটবর্ত্তী মহানন্দা নদীতে নানারূপ অঙ্গভঙ্গীসহকারে তাহা নিবেদন করিত। পর্ব্বদিনে সে আরও পবিত্র গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইত। তাহাদের ধারণা গঙ্গায় স্নান করিলে পাপ ধৌত হয়। যাহা হউক, পার্ব্বতী যখন জানিতে পারিল যে, মোহনচাঁদ আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল তখন সে তাহাকে স্নান করিয়া আসিতে বলিল। ইহার কারণ এই যে, একজন ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া সে অপবিত্র হইয়াছে এবং তাহাকেও অপবিত্র করিবে। ইহাদের সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত ধারণা ইহাই যে, ইংরেজ অথবা মুসলমান প্রভৃতি বিজাতীয়ের সংস্রবে আসিলে তৎক্ষণাৎ নদীতে গিয়া অবগাহন স্নান করিয়া পবিত্র হইতে হয়। আমার সহিত আলাপ করিবার পর আমি বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি। মোহনচাঁদকে স্নান করিয়া আসিবার জন্য পার্ব্বতী এই বলিয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল যে, সাহেব অর্থাৎ আমি ম্লেচ্ছ—ঘৃণা না হইতে পারি, কিন্তু অপবিত্র। মোহনচাঁদ তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না দেখিয়া পার্ব্বতী এমন একটি কাজ করিল, যাহা আপনাদের নিকট অতি সামান্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু আমি জানি ইহাদের মধ্যে তাহা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাপারটা কি তাহা বলিতেছি।

এদেশের লোক ধূমপানে অতিশয় অভ্যস্ত। ইহারা তামাকপাতাকে বিবিধ মশলা সহযোগে কাদার মত চটচটে একটি পদার্থে পরিণত করে। একটি কলিকার মধ্যে তামাক তাওয়ার নীচে এই তামাক সাজিয়া উপরে কয়লা ধরাইয়া আগুন করা হয়। তামাক ধরিয়া উঠিলে সমস্ত কলিকাটি একটি নলের এক মুখে স্থাপন করে—অন্য মুখ একটি নারিকেলের খোল অথবা অন্য ধাতুর পাত্র পর্য্যন্ত প্রসারিত থাকে। এই খোলে বা পাত্রে ঠাণ্ডা জল রাখা হয়। কখনও কখনও গোলাপজলও থাকে, কারণ গোলাপজল এদেশে সুলভ। আর একটি নমনীয় নলের সাহায্যে এই ঠাণ্ডা-করা

'যোগা অত্যন্ত আরামের সহিত টানা হয়। এই দ্বিতীয় দলটি সচরাচর লম্বায় আট হাত পরিমিত হয়। এখানকার রীতি এই যে, যখন স্বশ্রেণীর অথবা স্বজাতির ব্রাহ্মণেরা (অন্য জাতির বেলাতেও এই নিয়ম) পরস্পর মিলিত হয়, তখন বন্ধুত্ব ও প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ গৃহকর্ত্তা অতিথিদিগকে হুঁকা দিয়া আপ্যায়িত করেন, হুঁকা এক হাত হইতে হস্তান্তরে ভ্রমণ করিতে থাকে। এখন মোহনচাঁদ এই রীতি অনুযায়ী পার্ব্বতীকে যেই হুঁকা দিল, পার্ব্বতী তৎক্ষণাৎ হুঁকার জল ফেলিয়া দিল। আপনাদের মনে হইবে, এ আর তেমন ব্যাপার কি! কিন্তু আসলে ইহা এক গুরুতর অপমান, হিন্দুরা ইহাকে মৃত্যুর অপেক্ষাও ভীষণ শাস্তি বলিয়া জ্ঞান করে। এই জল ফেলিয়া দেওয়ার অর্থ হইল এই যে, আমি তোমাকে জাতে ঠেলিলাম।

...আমার বিশ্বাস এদেশে মানুষ-বলি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত না হইলেও অতিশয় দুর্লভ ঘটনা। শুনিয়াছি চার বৎসর পূর্ব্বে এদেশী সাময়িক পত্রে একটি মানুষ-বলির কথা বর্ণিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অবশ্য মহিষ, ছাগল ও মেষ বলি অনেক হয়, নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বদিনে যে কেহ এই বলি দেখিতে পারে। কৃচ্ছ্রসাধন বা স্বেচ্ছাকৃত ক্লেশবরণেরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এদেশে এক বা একাধিক বৎসর যাহারা বাস করিয়াছে, তাহারাই ইহা দেখিয়াছে। আমি দুই-একটির বর্ণনা দিতেছি।

প্রথম—চড়ক। যে ব্যক্তি এই প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহাকে পিঠে মেরুদণ্ডের দুই পাশে চামড়ার মধ্যে দুইটি বঁড়শি লাগাইয়া লইতে হয়। এই বঁড়শি দুইটিতে দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে মাটি হইতে প্রায় ছাব্বিশ সাতাশ হাত উপরে তুলিয়া ঘুরাইয়া দেওয়া হয়। সে অনেকক্ষণ ধরিয়া শূন্যে পাক খাইতে থাকে, কিন্তু কখনও যন্ত্রণায় চীৎকার করে না, নিঃশব্দে সব কিছু সহ্য করে। সেই অবস্থায় তাহাকে ফল খাইতে দেওয়া হয়। তাহার মুখ হইতে পরিত্যক্ত ফল অতিশয় পবিত্র বলিয়া গণ্য হয় এবং তাহার অংশ পাইবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। অনেক সময় পিঠের চামড়া ছিঁড়িয়া ভূমিসাৎ হইয়া প্রায়শ্চিত্তকারীকে চূর্ণবিচূর্ণ হইতে হয়; এই কারণে আজকাল বঁড়শির বদলে বুকেপিঠে কাপড় বাঁধিয়া শূন্যে তোলা হয়। বাংলা দেশের প্রত্যেক শহরেই এই দৃশ্য বছরে একবার করিয়া দেখা যায়।

Another torture is after this manner: the man passes threads through each of his sides, in six places; and the threads being thirty yards long, and fixed at each end, he dances backward and forward as in a ropewalk. *

তৃতীয় কৃচ্ছ্রসাধন এইরূপ: প্রায় আড়াই হাত লম্বা একটা শিক জিভে ঢুকাইয়া একবার টানিয়া উপরের দিকে তোলা হয়, একবার নীচে নামানো হয়। ইহা ছাড়া, বছরের পর বছর এক স্থানে অনড় হইয়া বসিয়া থাকা, নিদারুণ গ্রীষ্মে অগ্নির উত্তাপ সহ্য করা, নিদারুণ শীতে বাহিরে শিশিরে শুইয়া থাকা প্রভৃতি আরও বহুবিধ আত্মনিগ্রহের দৃশ্য সচরাচর সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

এদেশে বৎসরের এক অংশে শীত খুব বেশী; রাত্রে দুইটি অথবা তিনটি কম্বল গায়ে চাপাইতে হয়, তাহা না হইলে শীতের চোটে ঘুমই আসে না। দিনের বেলায় গরম-জামা গায়ে দিতে হয় এবং বাংলা দেশের এই উত্তরাংশে ২৬° উত্তর ল্যাটিচুডের তাপের জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত না রাখিলে চলে না।

এদেশে আহার্য্য দ্রব্য অতিশয় সস্তা—এত সস্তা যে, হাজার হাজার দেশবাসী অতিশয় দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। তাহাদের অধিকাংশেরই আয় মাসিক দশ শিলিংয়ের অধিক নয়। তৎসত্ত্বেও তাহারা নিজেদের এবং নিজেদের পরিবার প্রতিপালন করিয়া থাকে, খাজনা দেয়, বাণিজ্যশুল্ক প্রদান করে।

মালদহের নিকটে আমি যেখানে থাকি সেখানে জিনিস পত্রের দাম সাধারণত নিম্নলিখিত রূপ, কিন্তু কলিকাতার দাম-অপেক্ষাকৃত চড়া।

মুরগী ৩০টি	আড়াই শিলিং	ভেড়া একটি	আড়াই শিলিং
হাঁস ১৬টি	ঐ	ছাগল একটি	আট পেন্স
শূকর ১টি	ঐ	ভেড়ার বাচ্চা একটি	ঐ
হরিণ ১টি	ঐ		

* টমাস সাহেব ঠিক কি বুঝাইতে চান, এই বর্ণনা হইতে তাহা কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না বলিয়া অনুবাদ করিতে সাহসী হইলাম না। ব্যাপারটা কেহ বুঝাইয়া দিলে উপকৃত হইব। —লেখক

বরিভিলি ট্রেনিং ক্যাম্পে

শ্রীদারা ঘোষ

কস্তুরীবা ট্রেনিং ক্যাম্প। ঢং ঢং কোরে পৌনে ছ'টার ঘন্টা বাজে। রাতের অন্ধকার জমাট বেঁধে থাকে তখনও। দপ্ কোরে জলে উঠে বিজলী বাতি চারিদিকে। ঘন্টার শব্দে এতক্ষণকার ঘুমন্ত পুরীর তন্দ্রা ছুটে যায়। শিক্ষার্থীরা উঠে দল বেঁধে মুখ হাত ধুতে যায়। প্রার্থনা বাধ্যতামূলক নয়—তাই যায় না সবাই। যে জিনিষে যার বিশ্বাস নেই, শুধু নিয়ম হিসাবে যোগদানের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি—ভালই লাগে। চিমন ভাইয়ের ভজন, জোহ্রা বেন, আত্তা বেনের কোরাণের কলেমা ধ্বনি থেমে যায় একটু পরেই। হুইস্‌ল্ বেজে ওঠে এবারে। Flag salutationএ যোগদানের আহ্বান এ। Camp এটা—দেরি হওয়া অপরাধ—শিক্ষার্থীরা ছুটতে থাকে। দণ্ডায়মান এক, দুই, তিন, চার কোরে আটজন প্রথমে সার বেঁধে দাড়ায়। তাদের প্রত্যেকের পিছনে দশ জন কোরে বেঁধে একজনের পিছনে আরেকজন এই ভাবে দাঁড়ায়। মনি তাই ড্রিল টিচার—অর্ডার হয়—'কদম খোল্'—Stand at easeএর ভঙ্গীতে দাঁড়ায় সবাই। এবার 'হোঁ-সি-য়া-র'—attention এর অর্ডারে সবাই খাড়া হোয়ে ওঠে। তাঁর পরই—'তালসে কদম'। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে Left Right কোরতে কোরতে অর্ডার মেলে 'জোশ কদম'। নায়কের পিছনে হুইস্‌লের সঙ্গে সঙ্গে মার্চ কোরতে কোরতে তালে তালে পা ফেলে সবাই গিয়ে গোল হোয়ে দাঁড়ায়। Postটাকে ঘিরে গোল কোরে দাগ কাটা আছে—তার বাইরে দাঁড়ালে চল্‌বে না। সবাই যতক্ষণ না এসে যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে 'তালসে কদম' কর্‌তে হয়··· এবারে অর্ডার 'কদম খোল'। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এসে Postটার পূর্ব দিকে একটা ছক্ কেওয়া চৌকা জায়গায় দাঁড়ায় গানের জন্য। Post এর দক্ষিণ দিকে আরেকটা ছক্ কেওয়া চৌকা জায়গায় আরেকজন শিক্ষার্থী আগে থাকতেই দাঁড়িয়ে থাকে। এবার অর্ডার দেবার পালা তার। অর্ডার হয়—হোঁ-সি-য়া-র···গান সুরু হয়—'বন্দে মাতরম্'। যোগ দিতে হয় সবাইকেই।

গান শেষ হলে অর্ডার দেবার মালিক এগিয়ে যায় Post এর পশ্চিম দিকে আরেকটা ছক্ কেওয়া চৌকা জায়গায়, যেখানে Camp organiser অনিতাই দাঁড়িয়ে থাকেন। গণ্যমান্য কেউ এলে তাঁদেরই দাঁড়াবার জায়গা ওটা। সামরিক কায়দায় দুজনের নমস্কারের আদান-প্রদান হয়—শিক্ষার্থী এগিয়ে এসে flagএর দড়ি ধরে। Organiser এগিয়ে এসে পতাকা উত্তোলন কোরে স্বস্থানে ফিরে যান। এবার সকলের উপর আদেশ হয়—'নমস্তে'। সবাই এক সঙ্গে হাত তুলে পতাকা অভিবাদন কোরলে সমবেত কণ্ঠে গীত সুরু হয়—

'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা'·····

একি শুধু গান? আন্তঃপ্রাদেশিক শিক্ষা কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রান্তবাসী আমরা—আমাদের ভাষা, চাল-চলন বেশভূষা সামঞ্জস্যহীন, তবু ঐ ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার নীচে একই বেশে, একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে, একই সুরে আমাদের বুক চিরে প্রতিদিন যে কথাগুলি বেরোয়·····

"শান ন ইস্‌কী জানে পায়ে
চাহে জান চলে হী যায়ে"····

কি অদ্ভুত উন্মাদনাই না এনে দেয় আমাদের ভিতর। কি না পারি কোরতে আমরা! প্রাণ দেওয়া—সে ত অতি তুচ্ছ কথা! গান থেমে যায়। 'বন্দে মাতরম্', 'ভারতমাতা কী জয়' শ্লোগানের পর অর্ডার হয় 'ডাইনে ঘুম', 'জোশ কদম' এগিয়ে যায় মার্চ কোরতে কোরতে সবাই যেখান থেকে এসেছিলাম।

এবারে Physical Training। প্রথমেই হয় 'আসন'। মিনিট পনেরো চলে। তারপর ঘুষুৎসু। ঘুষুৎসুর শিক্ষাও কিছুক্ষণ চলে—তারপরে ড্রিল। 'ডাইনে ঘুম' 'বাঁয়ে ঘুম', 'গোপতি'—'জোশ কদম'—পা মেলে না অনেকের—"পাঁয়ের নেহী মিলতা"—মনিতাই ড্রিল শেখান এক দলকে।

Commander সুমন বেন আরেক দলকে নেচিম্

শেখান। "আট ঠোকে মুক"—ঝন্ ঝন্ শব্দে লেজিম তালে তালে বেজে ওঠে। সুমতি বেন তখন আরেক দলকে নিয়ে free-hand exercise, dumbbellsএর শিক্ষা দেন—"এক আউর দো আউর তিন আউর চার"..."এক সাথে হাত উঠাও"—ওদিকে লাঠির ঠকাঠক্ আওয়াজ সুরু হোয়ে গিয়েছে আরেক দলের।.....ঢং ঢং নাস্তার ঘন্টা এবার.....

বাটি হাতে দলে দলে ভোজনালয়ে হাজির হয় সব। Camp Superintendent অমুদিদি দুধ দিয়ে যান সবাইকে। এক জাইস্ কোরে পাঁউরুটিও মেলে তার সঙ্গে। অন্নাবেনের কাছে থাকে চায়ের হাঁড়ি। নিজেদের খরচায় যারা চা খেতে চায়, তাদের নাম লেখা আছে অফিসের খাতায়। এক এক কোরে চা প্রার্থীর সংখ্যাও কম দেখা যায় না। সকলের মুখ গুজন হইসল্ বেজে ওঠে। চুপ সব। কোন্ দস্তার কি কাজ সুমন বেন বলে যান। 'দস্তা নম্বর এক, কর্ত্তব্য ডিউটি'... সকলের বসার জায়গা ঠিক করা, চাটাই, চট বিছানো, তাদের কাজ। দস্তানম্বর দুই, রসুই ; রান্নার লোক আছে—তবু রান্না ঘরের কাজ অনেক—জোগাড় দেওয়া, পরিবেশন করা এদের কাজ। 'দস্তানম্বর তিন, নাইট ডিউটি ...এদের এখন কোন কাজ নেই। দস্তানম্বর চার, সাফাই.....এই ভাবে সকলের কাজ ভাগ হোয়ে যায়। ডিউটির বদলও হয় প্রতিদিন। আধ ঘন্টার মধ্যে নাস্তা সারা হয়। আবা যেন চ্যাচাতে থাকে—"কিসিকো দাওয়াই লেনা হ্যায় তো আ্য যাও, ডাক্তার বাবু আয়ে হ্যাঁয়।" 'আসন' কোরে কারুর পায়ের রগে টান ধরেছে। শুধুরাত্তি কটী খেয়ে কারুর পেটে সহ্য হোচ্ছে না—ডাক্তার বাবুর কাছে যায়।

আবার হইসল্ বাজে। কাঁটা, ঝাড়ু হাতে সাফাইয়ের দল camp compound কাঁট দিতে সুরু করে। খুন্তি, কোদাল হাতে একদল পাইখানার মাটি ঢালার কাজ আরম্ভ করে। ঝুড়াল, কোদাল হাতে বাগ কামের দল বাগান অভিমুখে যায়। রসুই ডিউটির মেয়েরা বালতি হাতে চলেন স্নানের জন্য। স্নানের কাজ শেষ কোরে রান্না ঘরে ঢুকতে হবে তাদের। পুরো একঘন্টা কাজ চলার পর কাজ খতমের ঘন্টা বাজে। কাঁটা, বালতি, ঝুড়াল, কোদাল, যথাস্থানে রেখে স্নানের জন্য প্রস্তুত হয় সবাই। Campএর কুয়া অসহযোগিতা সুরু কোরেছে—জল দেবে না। শুধুতো দড়ি বালতির সঙ্গে তার অসহযোগিতা নয়—আধুনিক কলকারখানার উপরেও তার অবজ্ঞা কম নয়। তাই কান্তিভাই বার বার Electric switch টিপেও তার সাড়া পায় না। মস্তবড় ট্যাঙ্ক দুটো খালি পড়ে থাকে। কল টিপেও পাইপে জল পাওয়া যায় না। Campএর বাইরে এর ওর বাড়ীতে স্নানের কাজ সারতে হয়। বালতি হাতে মেয়েদের দল চললো বাবুমণ্ডল, কুকুকুলীয়ে—যে যেখানে সুবিধা বোধ করে বেশী। যেখানেই যাক, জল বেশী খরচ কোরতে পারবে না। সত্যিকারের যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকরা বিনাজলে, অল্প জলে কাজ চালায় কি কোরে সে শিক্ষা, সে অভিজ্ঞতাও তো থাকা দরকার।

১১টার আগে আর কোন ঘন্টা পড়ে না। ওটুকু সময় সকলের স্নানেই লেগে যায়। এবার scouting এর Period। টর্চের সাহায্যে, নিশানের সাহায্যে signalling শেখান সুমন বেন। টরে টক্কার কোন্ কোন্ অক্ষর হয় সে শিক্ষাও চলে, কোন কোন দিন sentry duty সম্বন্ধে বক্তৃতাও হয়।

আবার ঘন্টা বেজে ওঠে। থালা, বাটি, গেলাস হাতে ভোজনালয়ে হাজির হয় সব। এবারে দস্তানায়কের সঙ্গে বসতে হবে সবাইকে। দস্তার মেয়েরা তাদের নায়কের সঙ্গে সার বেঁধে বসে যায়। এবার ঢং কোরে একটা ঘন্টা যেন সুরজ বেন, পরিবেশন সুরু করে রসুই ডিউটির মেয়েরা। ডাল, রুটি, একটা তরকারী সকলের পাতে দিয়ে যায়। Superintendent সকলের নাম ধরে ডেকে খাতায় 'হাজিরা' নেন। কারুর চিঠি থাকলে দিয়ে দেন এই সময়। খাওয়া শেষ হবার আগে পড়ার নিয়ম নেই কারুর। সব রকম জিনিষ একবার করে সকলের থালায় দেওয়া হলে—একটা থালার উপর কাঠি পিটিয়ে ঘন্টা বাজানো হয়। এবারে খাওয়া সুরু।

খাওয়া শেষ হোতে দেরী লাগে না বেশী। চৌবাচ্চায় জল থাকে, যার যার থালা বাটি গেলাস মেজে ঘরে চলে যায়। বিশ্রাম এক ঘন্টা। চরখা নিয়ে বসে যায় কেউ। কেউ বা

সামনে আয়না রেখে চুল বাঁধতে থাকে পরিপাটি কোরে; সারা দিন রাতের মধ্যে এইটুকু মাত্র অবসর। খুশী মত সবাই স্নো সেণ্ট কোরতে চায়। মৃদুলা বেন আসেন টহল দিতে। ...“you don't know how to take rest, I want you to sleep; শো যাও”—সবাই শুয়ে পড়ে। কারুর বা চোখের পাতা বুঁজে আসে। কেউ বা শুয়ে শুয়ে রুম-মেটের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ কোরে গল্প কোরতে থাকে। কারুর হাতে থাকে বই।

এক ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে যায়। ঘণ্টা বেজে ওঠে। আবার হুইসল্। এবারে কতাই, spinning-এর period, চরখা কাটার জায়গায় চরখা, লাটাই হাতে হাজির হোয়ে বসে যায় সবাই। চরখা কাটা সুরু হয়। শুধু তুলো থেকে সুতোটুকু বার কোরলে হবে না। বীজ শুদ্ধ তুলো-বীজ ছাড়িয়ে, ধুনে পাজ তৈরীর কৌশলও জানা দরকার। অধিকাংশই জানে সুতো কাটতে—কেনা তুলোর পাজে—পাজ বানানোর শিক্ষা দেন প্রফুল্লাদেবী। চরখা বিগড়োলে সারতে আনার কলা-কৌশলও শিক্ষা দেন তিনি। মাঝে মাঝে বড় হট্টগোল হয়। সুমতি বেনের হুইসল্ থামিয়ে দেয় সবাইকে। ...আবার ঘণ্টা।...এবার ভাষণ। গাছের তলায় চট, চাটাই—বিছোয় কর্তব্য ডিউটির মেয়েরা। সবাই চরখা, লাটাই ঘরে রেখে এসে খাতা পেন্সিল নিয়ে সার বেঁধে বসে যায়। আসতে দেরী হলে হুইসল বাজতে থাকে। আরম্ভ হয় ভাষণ। পঁয়তাল্লিশ মিনিট কোরে দু' period ভাষণ চলে। প্রায় প্রতিদিনই নূতন নূতন বক্তা নূতন নূতন বিষয়ে ভাষণ দেন। মৃদুলা বেন এসে বক্তার পরিচয় করিয়ে দেন। এঁদের প্রায় সকলের নামের সঙ্গেই সংবাদপত্রের মারফৎ পরিচয় আছে। বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দেন। বিষয় বিভিন্ন হলেও প্রায় সব ভাষণের মূলে একটি জিনিষ থাকে—গ্রামের লোকের সঙ্গে কি ভাবে চলতে হবে, গ্রামে কি ভাবে কাজ কোরতে হবে। আমাদের সকল দুঃখ দুর্দশার মূলে যে পরাধীনতা সব বক্তাই সেকথা বার বার উল্লেখ করেন। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সুরু থেকে আজ পর্যন্ত কোথায় কি হোয়েছে না হোয়েছে তার ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করেন কোন বক্তা কোন দিন। ডাঃ মেহেরা দেন leadership সম্বন্ধে বক্তৃতা। ডাক্তার অটল সোরান্ চীনের গেরিলা যুদ্ধের কাহিনী। আকির হোসেন জিজ্ঞাসা করেন Basic education সম্বন্ধে আমাদের কি ধারণা। প্রতি বক্তাই বক্তৃতার শেষে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরতে বলেন। কোন কোন দিন প্রশ্নোত্তর শেষ হবার আগেই ঘণ্টা বেজে ওঠে। বক্তা সময় সংক্ষেপের জন্য দুঃখ প্রকাশ কোরে উঠে পড়েন—মেয়েরাও উঠে পড়ে। খাতা পেন্সিল যার যার ঘরে রেখে ভোজনালয়ে হাজির হয়—বৈকালিক জলপানের জন্য। কোন দিন কলা, কমলালেবু, কোন দিন বরফ দেওয়া আখের রস পান কোরে আবার গাছ তলায় জড়ো হয় সবাই। আবার এক period ভাষণ চলে, তারপরে লাইব্রেরী period। লাইব্রেরী periodএ কোন কোন দিন নূতন বক্তার ভাষণ হয় কিম্বা শুধুই আলোচনা চলে কোন বিষয়ে। এবার ঘণ্টা—খেলার। পাঁচ মিনিটের মধ্যে মেয়েরা তৈরী হোয়ে নেয় uniformএ। সাদোদার পাঞ্জাবী, ড্রিল ও খেলার ড্রেস। ফুঁড়েমি কোরে যারা পড়ে না মৃদুলা বেনের কাছে ধমক খায় তারা। চারদিকে দৌড় ঝাঁপ, হৈ চৈ সুরু হোয়ে যায়। সকালের মতই সুমন বেন, সুমতি বেন, মনিভাই এক এক দলকে নিয়ে এক এক রকম খেলা শেখান। Visitorরা ভীড় কোরে দেখতে থাকে। খেলার ঘণ্টা কেটে যায় কোথা দিয়ে—ঘণ্টা বাজে। এবার ঝাণ্ডাবতরণ। সকালের মতই মার্চ কোরে Postটীকে ঘিরে গোল হোয়ে দাঁড়াতে হয় সবাইকে। এবার গান হয় :—

“...রাষ্ট্র গগনকী দিব্য জ্যোতি রাষ্ট্রীয় পতাকা নমো নমঃ
ভারত জননীকে গৌরব কী অবিচল শাখা নমো নমঃ।”

ঝাণ্ডা নামানো হোয়ে গেলে মার্চ কোরে আগের জায়গায় ফিরে গেলে অর্ডার হয় “ফাইল যাও”—তালে তালে চার বার হাতে তালি দিয়ে সবাই চলে আসে। প্রার্থনায় যায় কেউ কেউ। যারা যায় না তাদের মধ্যে কেউ যায় লাইব্রেরীতে, কেউ ঘরে গিয়ে বসে, কেউ বা দোলনায় দোল খায়।...পনেরো মিনিটের মধ্যে বেজে ওঠে নৈশ ভোজনের ঘণ্টা। ঘণ্টা ঘড়ির সঙ্গে তাল রাখে কিন্তু ঘড়ি আকাশের দিকে ফিরেও চায় না। ঘড়িতে বাজে আটটা—দিনের

আলো তখনও জ্বল জ্বল করে। থালাবাটি হাতে আবার জড়ো হয় সবাই। মোটা মোটা রুটির সঙ্গে এবার অল্প তাতও মেলে। এক চামচ ঘি তার সঙ্গে। কড়ুয়া (টক্ ডাল), একটা তরকারী ও দুধ।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই দুই ব্যাচের খাওয়া, থালাবাটি ধোওয়া সারা হয়। এবার ডায়েরী লেখার period। খাতা, কালি, কলম হাতে বসে যায় সবাই ডায়েরী লিখতে—আধ ঘণ্টার জন্য লিখে চলে সবাই ··ঘণ্টা বাজে মনোরঞ্জক কার্য্যক্রমের। হুইসল্ বাজে ঘন ঘন। আবার জড়ো হয় সবাই একত্র। এবারে চলে folk dance, পাখরা নাচ, মাড়োয়ারি নৃত্য, ভীল নৃত্য। কোন্ কোন্ প্রদেশের গ্রাম্য উৎসব কি কি তাও দেখায় এক এক প্রদেশের মেয়েরা। ডাক পড়ে 'আসাম'। আসামের মেয়ে তিনটি উঠে এসে তাদের প্রদেশের কোন উৎসব দেখায়। বাঙ্গলা, বিহার, ইউ পি—এমনি কোরে সব প্রদেশের মেয়েদেরই একবার কোরে উঠতে হয়। কোন দিন বা ডাঃ মেহেতা সিনেমার সাহায্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। কোন দিন চলে জাতীয় সঙ্গীতের শিক্ষা···

"আজাদ করেঙ্গে হিন্দ তুঝে"···মনোরঞ্জক কার্য্যক্রমের ঘণ্টা—মেয়েদের মধ্যে একটু শিথিলতা আসে, যার যার নিজস্ব ভঙ্গীতে বেঁকে চুরে বসে গান শেখে। "সিধা হোকে বৈঠ"—মৃদুলা বেনের গলা শোনা যায়—"Do you understand the meaning of the song? Then how can you sit like this?" লজ্জা পেয়ে সোজা হোয়ে বসে সবাই। গানেরও প্রাণ এসে যায়। দশটা বাজতেই ঘণ্টা পড়ে শুতে যাবার। সবাই উঠে দাঁড়ায়। সুমন বেন ঠিক কোরে দেন sentry duty কটা থেকে কটা পর্য্যন্ত কার।··· সবাই ঘরে চলে যায়। "Lights off"—"Lights off"—সুমন বেন টহল দিয়ে যান। বিজলী বাতি দপ্ কোরে নিভে যায় এক সঙ্গে। ঘরে ঘরে লণ্ঠনের আলো স্তিমিত হোয়ে আসে—সবাই শুয়ে পড়ে।

কোন কোন ঘরের গুঞ্জন তখনও থামে না। আবার সুমন বেন আসেন, "বাত মৎ করো! শো যাও"। চুপ হোয়ে যায় সবাই।···ঘুমোতে খুব কি দেরী লাগে?···

বিশাল পুরী···সবাই সুপ্তিমগ্ন। ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা চারজন,—একটানা sentry duty আজ আমাদের··· আমাদের এক হাতে আছে লণ্ঠন, আরেক হাতে লাঠি—গলায় ঝুলছে হুইসল্।·· দু ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে যায় টেরও পাই না·· ঘড়িতে বাজে বারোটা, ঢং ঢং কোরে জানিয়ে দিই ঘণ্টা পিটিয়ে সবাইকে, প্রহরী আমি।···কেই বা শুনছে! এবার তুলে দিতে হবে আরেক দলকে। চোখ রগ্ড়াতে রগ্ড়াতে উঠে আসে তারা···শুতে যাবার পালা এবার আমাদের। লাঠি, লণ্ঠন, হুইসল্ তাদের হাতে দিয়ে সামরিক কায়দায় নমস্কারের আদান প্রদান কোরে ঘরে চলে আসি। সারা দিন পরে এইবার পূর্ণ বিশ্রাম পৌণে দু'টা পর্য্যন্ত। এলোমেলো অনেক চিন্তাই ভীড় কোরে আসতে চায় মনে, কিন্তু ঘুমে চোখ দুটো জড়িয়ে আসে···

ঘুম ভেঙে যায় হুইসলের শব্দে। ঘন ঘন হুইসল্ বাজছে বিপদসূচক ধ্বনি। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে সবাই। আদেশ আছে এ ধ্বনি শুনলে যে যে ভাবে থাকবে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াবে। আদেশ পালন করে সবাই। সন্তানায়করা ছুটে চলে' যায় যেখান থেকে হুইসল্ বাজছে ঘন ঘন। তেমনি ছুটে এসে সবাইকে যেতে বলে। সবাই ছোটে নায়কের পিছনে। ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের মধ্যে কেমন একটা ব্যস্ত ভাব··· নায়কের পিছনে সবাই সার বেঁধে দাঁড়ায়। Commander যায় টহল দিতে ঘরে, কেউ শুয়ে আছে কি না দেখতে। একমাত্র রোগী ছাড়া শুয়ে থাকা মহা অপরাধ এ সময়ে। আদেশ হয় গেটের কাছে যাবার জন্য। সবাই লাইন বেঁধে ছোটে। সেখানে গেলে ফিরে অর্ডার হয় compoundএর রাস্তাটার চার দিকে ছোটার জন্য। ছোটে সবাই। দুবার ঘোরার পর থেমে যাবার আদেশ মেলে, তারপর হুকুম শুতে যাবার। আদেশ এবং আদেশ পালন পর পর হোতে থাকে। শিক্ষার্থীরা ফিরে যায় নিজেদের ঘরে···এইবার সুরু হয় হাসি আর কথা।···ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ দল বেঁধে উপস্থিত হ'ন এবার "হয়া কেও?" চুপ হোয়ে যায় সবাই প্রহরী ঘণ্টা পিটিয়ে জানিয়ে দেয় রাত ৩টা এখন···

বাইরে যে জেল—

মনোজ বসু

ইন্টারভিউর ব্যবস্থা হয়েছে। হাজতে যাচ্ছে এরা দেখা করতে। লাল রঙের ইট বের-করা একই প্যাটার্নের সরকারি বাড়ি দু'ধারে। অঞ্চলটার নামই হয়েছে আদালত-পাড়া।

ভাঙা সাইকেলের লোহা-লক্কড় আছে একটা বারান্দা ভরতি। আর উঠানে ভাঙা নৌকার তক্তা-কাঠকুটো।

সুপ্রিয়া বিস্ময়ে আঙুল দেখিয়ে বলে, ওরে বাবা—কত!

অনুপম বলল, কো-অপারেটিভ বিল্ডিং-এ পর্বত-প্রমাণ বস্তা সাজানো দেখে এলে—পচা আটা-ময়দা ও-সব। সস্তায় নিলামে বেচবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু এমন নষ্ট হয়েছে যে খদ্দেরই এল না।

উমা জিজ্ঞাসা করে, আর মড়ার খুলি-কঙ্কাল কোথাও গাদা দিয়ে রেখেছে নাকি অনুপম বাবু?

বিস্মিত চোখে চেয়ে অনুপম বলে, কেন?

মহাযুদ্ধের পুরোপুরি মিউজিয়াম হয়ে যেত তা হলে। সমস্ত রয়েছে—একটার কেন খুঁত রাখলেন আপনারা?

পৌঁছে দিয়ে অনুপম বলে, কথাবার্তা বলতে লাগুন আমি ঘুরে আসছি,—এসে বাসায় নিয়ে যাব।

লোহার গরাদের ওদিকে পান্নালাল, এদিকে উমা আর সুপ্রিয়া।

পান্নালাল বলে, কি উমা, টুইশানি এ শহরেও জোটালে নাকি? টুইশানিতে যাবার মুখে দৈবাৎ এসে পড়েছ?

উমা বলে, গালি দিতে এসেছি গাড়ি ভাড়া করে। বড্ড একচোখো তুমি পান্নু-দা।

স্বচ্ছ হাসি হেসে পান্নালাল বলে, কার দিকে পক্ষপাত করলাম, বলো তো—

জেলের পাকাঘর আর দেশের খোলা মাটি—যেন দুই সতীনে টানাটানি করে তোমাকে নিয়ে। কিন্তু জেলের দিকে ঝোঁক তোমার বেশি। অন্তত মাঝামাঝি করে নিলেও বিচার হত—যত দিন জেলে, ততটা দিন বাইরে।

পান্নালাল বলে, জেলের বাইরে যে আরও বড় জেল, বেশি কষ্ট।

সুপ্রিয়া বলে, কি বলছেন পান্নালাল বাবু?

সত্যি কথা, সুপ্রিয়া দেবী। বিরাট বন্দিশিবির ভারতবর্ষ। সমুদ্র ও হিমাচলের পাঁচিলে বিংশ শতাব্দীকে আটকে রাখা হচ্ছে। কোটি কোটি মানুষ নিষ্কর্মা এই সঙ্কট-সময়ে। দেশকে ভালবাসা এখানে অপরাধ। অসওয়েল মোসলের মতো ক্যাদি-বন্ধু ওদেশে মুক্তি পায়, আর নেহরু এখানে পচে মরেন কারাগারে। বাইরের জেল বেশি ভয়ঙ্কর বলে ছোট্ট জেলে শামুকের মতো মাথা গুঁজে ঢুকতে আর লজ্জা পাই নে।

সুপ্রিয়া মিষ্টি জমা দিয়ে এসেছিল গেটে। বলে, কলকাতা থেকে বয়ে এনেছি। খাবেন কিন্তু। আর কি দরকার বলুন।

পান্নালাল বলে, একখানা খাতা পাঠিয়ে দেন যদি অনুগ্রহ করে।

লিখবেন?

পান্নালাল ঘাড় নাড়ল।

সুপ্রিয়া বলে, কি লিখবেন—মহাশ্মশানের কাহিনী?

পান্নালাল বলে, পথের কথা থাকবে বই কি কিছু কিছু। কিন্তু পথটাই তো লক্ষ্য নয়! কোন্ মায়ের ছেলে রক্ত-স্রোতের মধ্যে জন্ম নেয় নি বলুন। রক্তের দাগ মুছতে কতটুকু সময় লাগবে? স্বাধীনতার আলোয় সোনার মানুষ, হাসিতে যাদের মুক্তা-মাণিক ঝরে—আমি লিখে যাব অদূর-কালের তাদেরই কথা।

হাসতে হাসতে এল অনুপম। নাটকীয় ভাবে বলে, আপনি মুক্ত—বুধবার বেলা দশটা অবধি। মামলা সেইদিন। জামিন মঞ্জুর করেছে, হুকুম-নামাও এসে গেছে।

সুপ্রিয়ার দিকে স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে বলল, জামিন মঞ্জুর করাতেই হবে—তুমি যে বলেছিলে। ইন্টারভিউ চলুক এঁদের এই সেরটা দিন সারাক্ষণ ধরে।

ঘোড়ার গাড়ির ছাতে একদল ড্রাম বিউগল ইত্যাদি বাজিয়ে সমস্ত শহর আলোড়িত করে বেড়াচ্ছে। স্বাধীন

সিনেমা-হলে 'মন্বন্তর' নামক নৃত্য-নাট্যের অভিনয় করছেন অভিজাত ছেলেমেয়েরা। ক'দিন ধরেই চলছে, হৈ-হৈ ব্যাপার। টিকিট-বিক্রির সমস্ত টাকা খরচ হবে দুর্গতদের সাহায্যে।

উমা বলে, যাবে পানু-দা? চমৎকার হচ্ছে নাকি। যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের কাছে শুনলাম।

পান্নালাল বলে, চোখের উপর যে মন্বন্তর দেখে এলাম, চমৎকার কি তার চেয়েও।

উমা বলে, চলোই না। দু'দিন পরে কাছে পাবে না তো তোমাকে। দু'দিন পরে তো বলতে যাবো না।

অভিমান-ভরা কণ্ঠ আর ঘাড় দোলানোর ভঙ্গি কচি কিশোরী মেয়ের মতো। তিরিশের কাছাকাছি বয়স—উমার মোটে মানায় না এরকম।

নাচ-গান শুরু হল। হলের আলো নিভেছে। পান্নালালের ভালো লাগে না, উসখুস করছে। বেমানান মোটা আর অত্যন্ত ঘর্মা একটি মেয়ে নৃত্যে বন্যরূপ দেবার চেষ্টা করছে প্রাণান্তক প্রয়াসে স্টেজের উপর। পাশাপাশি মনে পড়ে, ঘরবাড়ি ছেড়ে রাতের অন্ধকারে দলে দলে যারা গ্রাম ছাড়ল, রাউড়ুবির বিলের ধারে এখানে ওখানে ছড়ানো যে সব মানুষের কঙ্কাল।

হঠাৎ চেয়ে দেখল, উমার নিষ্পলক দৃষ্টি তারই দিকে।

ধরা পড়ে উমা হেসে ফেলল। বলে, খাসা নাচছে। নয়, পানু দা?

নাচ দেখছ কি আমার মুখে?

উমা অপ্রতিভ হয় না। বলে, তা যদি বললে, বেরিয়ে যাই চলো। মুখই দেখিগে ভালো করে।

পান্নালাল বলে, মনে পড়ে উমা, একবার লুকিয়ে সাঁকো পেরিয়ে আমরা যাত্রা শুনতে গিয়াছিলাম। কত ছোট তখন! আসরের বাইরে গোড়ো আমগাছের ডালের উপর দাঁড়িয়ে দু'জনে দেখে এলাম।

উমা মুখ টিপে হেসে বলে, কিচ্ছু আমার মনে পড়ে না।

পান্নালাল বলে চলেছে, পাশের খবর বেরুলে তোমার মা আমাকে নেমন্তন্ন করলেন। সেদিনও মনের আশা, এক পাত্র সুখের সংসার হবে আমাদের।

গভীর স্বরে উমা বলে, সংসার যেদিন হবে, অশান্তি বা অসুখ যে হবে না এ তুমি নিশ্চিত জেনো পানু-দা।

যুদ্ধের সৈনিক—সুখ-শান্তি কি আমাদের জন্য?

যুদ্ধ যখন মিটে যাবে?

তার আগে মৃত্যু-সম্ভাবনাই তো প্রতি পদে।

তা হলে পরজন্মে। বড্ড সেকেলে রোমান্টিসিজম্—না পানু-দা? বলে উমা উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে উঠল।

পান্নালাল প্রশ্ন করে, পরজন্ম মান তুমি?

উমা বলে, না। কিন্তু আশা তো চাই। জীবনে কিছুই যদি না পেলাম, পরজন্মের কথা না ভেবে উপায় কি বলো?

একটু স্তব্ধ থেকে বলে, এদেশের মানুষ সব ব্যাপারে বঞ্চিত বলেই বোধ করি এমন বিশ্বাসী পরজন্মে।

বুধবার সকাল বেলা। নিরালা বাড়িতে পান্নালাল আর উমা। স্ট্রিপ্রিয়ার এর ভিতর কারসাজি আছে বোধ হয়। আদালতের বিচারে যা হবে, সে তো আগে থাকতে বলা যায়।

উমার যেন বিশখানা হাত হয়েছে আজ। গল্প করতে পান্নালালের সঙ্গে। ছুটে গিয়ে চিরুনি নিয়ে এল।

চুলটা আঁচড়াও দিকি পানু-দা, ভদ্র হও। ঝোড়ো কাকের মতো দেখাচ্ছে।

এরই মধ্যে এক ফাঁকে চুন দিয়ে এল তরকারিতে। গুণ-গুণ করে গান গাইছে আবার।

পান্নালাল বলে, খুব যে স্ফূর্তি!

বীরাঙ্গনা আমি যে! এ রকম দিন জীবনে তো এই প্রথম এল না।

খিল-খিল করে হেসে ওঠে উমা।

টং করে ঘড়ির আওয়াজ এল কোন্ দিক থেকে। আর মিনিট পনেরোর মধ্যে অস্ত্রশস্ত্রের ট্যাক্সি এসে পড়বে। সেই গাড়িতে কোর্টে নিয়ে যাবে।

হঠাৎ উমা বলে, না-ই বা গেলে! চলো পালিয়ে যাই।

তাতে রেহাই নেই, ওয়ারেন্ট বেরুবে।

দূরে—অনেক দূরে চলে যাব। যে ক'টা দিন বাইরে থাকা যায় ধরা পড়বার আগে।

এই বুঝি?

উমা চোখের জলে আকুল হয়ে বলে, যা ইচ্ছে বলগে তুমি। যা-খুশি লোকে ভাবুক। তুমি যেও না—যেও না—যেও না—

পান্নালাল তাড়া দিয়ে ওঠে, ছিঃ—

উমা উদ্যত অবাধ্য ভঙ্গিতে বার বার মাথা নেড়ে বলতে লাগল, আমার মা তোমার হাত ধরে বলেছিলেন, মরবার সময় নিশ্চিন্ত তরলায় তিনি চোখ বুঁজেছিলেন—তোমার কোন কর্তব্য নেই আমার উপর? নিষ্ঠুর পাষাণ তুমি, কেবল তোমার নাম বাজাবার শখ—

নিচে মোটরের হর্ন। পান্নালাল দ্রুত নেমে গিয়ে গাড়িতে উঠল।

কোর্ট ভাঙবার মুখে কয়েদির গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। পান্নালাল বলে, রাগ করে মুখ ফিরিয়ে থেকো না উমা। চললাম।

সুপ্রিয়ার দিকে হাত জোড় করে, নমস্কার!

পান্নালাল জেলে ঢুকল। মোটা মোটা গরাদে দেওয়া সুবৃহৎ ফটক বন্ধ হল তার পিছনে। পৃথিবীর নির্মমতম যুদ্ধের মধ্যে বড় হয়েছিল সে। দেখেছে, দিনের পর দিন নৈরাশ্য থেকে মুক্তির জন্য প্রাণবান নরনারীর আকুতি, দেখেছে মৃত মানুষগুলোর জীবন বাঁচানোর অক্ষম মর্মান্তিক প্রয়াস। বড় জেল থেকে ছোট জেলে সে যেন সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলল। এ-ও মুক্তি এক রকমের।

আভাস

অধ্যাপক শ্রীসুশীল কুমার দে

এই পৃথ্বীর মৃত্তিকা লয়ে যত ভাঙা আর গড়া,
সকলেরি মাঝে একটি মূরতি মিলায়ে দিয়েছে ধরা;
নূতনের মোহে ঠেলি' পুরাতনে
হারাইয়া খুঁজি, হারানো বেদনে
সত্যের বাহুপাশে ফিরে আসে স্বপ্নের অপ্সরা।

মুগ্ধা জাগে চিত্রিণী হয়ে,—কৈশোর-শেষে যা'রে
পেয়েছিনু কবে আজো পাই তারে যৌবন-পরপারে;
আকাশের সেই অলকনন্দা
প্রাণে ধরা সেই গানে যে বন্দ্যা;
ভালবাসা যাই ভুলিয়া, আবার ভালবাসি বারে-বারে।

হারানো গানের পুরানো সুরটি তাই ফিরে আসে যত,
স্বপ্নের সুখ ভুলাইয়া দেয় সত্যের ক্ষত;
ঝরে-পড়া ফুলে তাই মালা গাঁথি'
ভাঙা ঘরে একা ফুল-শেজ পাতি;
মনে নাই যারে মনে করি তারে করিয়া মনের মত।

দিনান্তে আসি' দিগন্ত-পথ নিশা-সীমান্তে হারা,
আড়ালে ছড়ায় সন্ধ্যা-মেঘের রঙ্গে রশ্মিধারা;
প্রণমি প্রাতের সেই প্রীতি-রবি
ছায়ামাঝে আজো যার কায়া-ছবি,
তাহারি অস্ত-আলোকে ফুটেছে আঁখিতে আঁখির তারা।

ফুটায়ে তারাটি তারাহারা রাতে ফিরে এল, ফিরে এল,
তোমারি আলোকে যাহা ভালো মোর তাই শুধু ভালবেস;
আড়ালে থাকিয়া বাড়ালে আভাসে
যে-রূপের কণা, অনাগত হাসে
হবে তা' পূর্ণ পরের প্রভাতে, মুখে মুখ তুলে হেস।

জাতি-বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ (৩)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ভারতবাসীর ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি বিজেতৃ জাতির সাধারণ মনোভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় ইতিপূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও আমরা কথঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিজিত-বিজেতার মধ্যে নানা বিভেদ বা পার্থক্য ছিল বটে, কিন্তু ইংরেজ ও বাঙালী প্রধানেরা সত্য সত্যই পরস্পরের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। প্রগতিপন্থী রামমোহন রায় এবং রক্ষণশীল রাধাকান্ত দেব উভয়েই এরূপ সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় ইংরেজ ও বাঙালী একযোগে অগ্রসর হন। সরকারী নির্দেশে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হইবার পরই ইংরেজ কর্মচারীগণ সরিয়া দাঁড়াইলেও কেহ কেহ অন্তরাল হইতে এই প্রচেষ্টায় সহায়তা করিয়াছিলেন। এই বৎসরেই কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও ইহার পর বৎসর কলিকাতা স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানেও গণ্যমান্য ইংরেজ ও ভারতবাসীর সহযোগিতা বিশেষ লক্ষণীয়।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ইংরেজদের স্থায়ী বসবাসের সকল বাধা-নিষেধ তুলিয়া দিবার জন্য কলিকাতায় একটি আন্দোলনের সূচনা হয়, ইংরেজীতে এই আন্দোলনকে 'কলোনাইজেশন' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই প্রচেষ্টায় ইংরেজদের প্রধান সহায় হইয়াছিলেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি। নবশিক্ষিত যুব-সম্প্রদায় এই আন্দোলনের সপক্ষে ছিলেন। ইহার পর হইতে তিন-চার বৎসর যাবৎ ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে নানারকম যুক্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তখনকার অবস্থা সম্যক্ বিবেচনা করিলে ইউরোপীয়দের স্থায়ী বসবাসে এদেশবাসীর মঙ্গলই সূচিত হইত। এই উদ্দেশ্যে ১৮২৯, ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতা টাউনহলে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর দুইটি সুচিন্তিত বক্তৃতা করেন। নানা যুক্তি প্রয়োগে তাঁহারা ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, ইতিমধ্যেই দেশমধ্যে ইংরেজের যে-সব শিল্প-বাণিজ্য প্রবর্তিত হইয়াছে তাহাতে দেশবাসীর উপকারই সাধিতেছে। উভয় বক্তাই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে নীলচাষের উন্নতিতে দেশবাসীর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের কথা প্রণিধানযোগ্য :

From personal experience, I am impressed with the conviction that the greater our intercourse with European gentlemen, the greater will be our improvement in literary, social, and political affairs : a fact which can be easily proved by comparing the condition of those of my countrymen who have enjoyed this advantage with that of those who unfortunately have not had that opportunity ; and a fact which I could, to the best of my belief, declare on solemn oath before any assembly. As to the indigo planters, I beg to observe that I have travelled through several districts in Bengal and Behar and I found the natives in the neighbourhood of indigo plantations evidently better clothed and better conditioned than those who lived at a distance from such stations. There may be some partial injury done by the indigo planters : but, on the whole, they have performed more good to the generality of the natives of this country than any other class of Europeans, whether in or out of the service.*

রামমোহন রায় এবং তাঁহার মতানুবর্তীদের এই বিশ্বাস ছিল যে, ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষের স্থায়ী বাসিন্দা হইলে আমরা সাহিত্য সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিতে উন্নতি করিতে পারিব। রামমোহন নিজ অভিজ্ঞতা হইতে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন, বঙ্গে ও বিহারে যে-সব স্থলে নীলচাষ আরম্ভ হইয়াছে সে-সব স্থলের অধিবাসীবৃন্দের, নীলচাষবিহীন অঞ্চলের অধিবাসীদের অপেক্ষা যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কোন কোন অঞ্চল নীলচাষে কিঞ্চিৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও মোটের উপর ইহার দ্বারা সাধারণের হিতই হইতেছে।

* *The Asiatic Journal*—June, 1830. Asiatic Intelligence. P. 69.

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সনন্দদানের প্রাক্কালে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে পার্লামেণ্ট-নিযুক্ত ও সিলেক্ট কমিটিতে 'কলোনাইজেশন' সম্পর্কে সবিশেষ আলোচনা হয়। রামমোহন রায় ইহার বিবেচনার্থ যে সাক্ষ্য-লিপি প্রেরণ করেন তাহার মধ্যেও এবিষয়ের আলোচনা ছিল। বলা বাহুল্য, তিনি বরাবর এদেশে ইংরেজদের স্থায়ী বসবাসের সপক্ষে ছিলেন, সুতরাং ভারতবাসীর দৃষ্টিতে ইহার ফলে যেরূপ সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা সেই কথাই তিনি আগে বলিলেন। আবার, বিরুদ্ধবাদীদের তরফে যে-সব অসুবিধার কথা উত্থাপিত হইয়াছিল ধারাবাহিক ভাবে তাহাও উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিলেন। প্রস্তাবিত অসুবিধাগুলির প্রথমটি হইল :

The European settlers being a distinct race, belonging to the class of the rulers of the country, may be apt to assume an ascendancy over the aboriginal inhabitants, and aim at enjoying exclusive rights and privileges, to the depression of the larger, but less favoured class; and the former being also of another religion, may be disposed to wound the feelings of the natives, and subject them to humiliations on account of their being of a different creed, colour and habits.*

অর্থাৎ, ইউরোপীয়েরা স্বতন্ত্র জাতি, শাসক-সম্প্রদায়ের সগোত্রীয়। তাহারা ভারতবাসীদের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিতে ক্ষান্ত হইবে না। দেশের অধিকাংশ লোকের চেয়ে তারা স্বতন্ত্র অধিকার ও সুবিধা স্বতঃই ভোগ করিবে। তাহাদের ধর্মও পৃথক্, কাজেই কথায় কথায় ভারতীয়দের মর্মে আঘাত দিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হইবে না। স্বতন্ত্র জাতি বর্ণ ধর্ম বলিয়া তাহাদের হস্তে ভারতবাসীর লাঞ্ছনা অপমানও কম ভোগ করিতে হইবে না।

রামমোহন রায় অবশ্য ইহার প্রতিবাদে এই কথাই তখন বলিয়াছিলেন যে, উচ্চশিক্ষিত ভদ্র ইংরেজের হস্তে এদেশবাসীদের খুব কমই লাঞ্ছনা ঘটে। একারণ প্রথম বুদ্ধি বৎসর এই শ্রেণী হইতে সচ্চরিত্র ও সদ্বংশীয় ইংরেজদেরই ভারতবর্ষে স্থায়ী বসবাসের সুবিধা করিয়া দিলে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ, উভয় সম্প্রদায়ের জন্য একই আইন করা হইলে এবং প্রত্যেক শ্রেণী হইতে সমান ভাবে জুরী গৃহীত হইলে উভয়ের ভিতরকার বৈষম্য অনেকটা বিদূরিত হইবে।*

কিন্তু সনন্দ যখন বিধিবদ্ধ হইল তখন তাহাতে 'ছোট' ও 'বড়' ইংরেজদের জন্য তো আর ভেদ টানার সম্ভাবনা ছিল না। ছোট বড়, ভদ্র-অভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবরকম ইংরেজই ভারতবর্ষে বসবাসের সমান অধিকার পাইল। নীলকরদের দৌরাত্ম্য ইতিপূর্বেই সমাজদেহে অনুভূত হইতেছিল। কিন্তু সে কথা পরে আলোচনা করিব। কর্তৃপক্ষও বিজিত ও বিজেতা জাতিদ্বয়ের মধ্যে ভেদসূচক আইন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই।

প্রবাসী ইউরোপীয়দের 'কলোনাইজেশন' আন্দোলনের পরেও বহু দিন বহু বিষয়ে ইংরেজ ও বাঙালী কৃতবিদ্যগণ একযোগে কাজ করিয়াছিলেন। গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সাময়িক ও স্থায়ী বিভিন্ন জনহিতকর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে উভয় শ্রেণীকে যেরূপ মিলিত ভাবে কাজ করিতে দেখি এমনটি পরে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। তবে কলিকাতাতেই প্রধানতঃ ভদ্র ইংরেজ ও শিক্ষিত বাঙালীর অবস্থিতি, কাজেই মিলন-ক্ষেত্র কলিকাতার সীমানা ছাড়াইয়া অধিক দূর বিস্তৃতিলাভ করে নাই। রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায়, কোম্পানীর সনন্দের পুনর্বিবেচনার জন্য আহূত সভায়, মুদ্রাযন্ত্রের শৃঙ্খল-মুক্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আনন্দজ্ঞাপক সভা-সমূহে, বিশেষে ভারতীয় শ্রমিক প্রেরণের প্রতিবাদ সভায়, নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করার প্রতিবাদে প্রতিষ্ঠিত ভূম্যধিকারী সভায়, এমনকি মেকলে কর্তৃক কলিকাতায় সুপ্রিমকোর্টের পরিবর্তে কোম্পানীর মফস্বল আদালত সকলে ইংরেজদের দেওয়ানি মোকদ্দমার বিচার-প্রবর্তন প্রচেষ্টার বিরোধী সভাতেও ইংরেজ ও বাঙালী প্রধানেরা একযোগে কার্য করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্ক, বীমা, সওদাগরি আফিস, জাহাজের কারখানা, বাষ্পীয় পোত প্রবর্তন প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাপারেও উভয় শ্রেণীর কাহারও কাহারও সংযোগ ঘটিল। বিভিন্ন

* *The Works of Raja Rammohun Roy.* পাণ্ডুলি সংস্করণ, পৃ. ৩১৭।

* ঐ। ঐ, পৃ. ৩১৭।

সামাজিক অনুষ্ঠানে ও প্রীতিভোজে ইংরেজ-প্রধানগণ বাঙালীদের সঙ্গে মিলিত হইতেন, দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়া উদ্যানের প্রীতিভোজ আজ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এই অতিরিক্ত ইংরেজ প্রীতিতে দোষ না দিয়া ভূদেব মুখোপাধ্যায় বরং লিখিয়াছেন :

বস্তুতঃ এখনকার কৃতবিদ্য বাঙ্গালীরাও আপনাদিগের দেশের ভাগ্যফল কিসে হইবে তাহা আপনারা বিচার করিয়া বুঝিতেন না। উঁহারা ইংরাজদিগেরই মিত্রতার অনুবর্তী হইয়া চলিতেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। ইংরাজ এবং বাঙ্গালী যে কখনও পরস্পর তুল্য পক্ষ বলিয়া গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারিবে, তখন ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তখন গবর্ণমেণ্ট যে উভয় প্রকার প্রজার মধ্যে কি পর্য্যন্ত প্রভেদ করিয়া চলিত তাহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারাই বিলক্ষণ উপলব্ধ হয়। তখন ২৪ পরগণার যে চৌকীদারী ট্যাক্সের আদায় হইত তাহা কেবল বাঙ্গালীরাই দিতেন, উহা কোন ইংরেজ অধিবাসীকে দিতে হইত না।*

এখানে ভূদেব গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ইংরেজ ও বাঙালীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কথা সাধারণভাবে বলিয়াছেন ও ইহার একটি দৃষ্টান্তের মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিভেদ-সৃষ্টি কার্য্য তৃতীয় দশকের পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হয়। রামমোহন রায় ইহা লক্ষ্য করিয়াই ইংরেজ ও বাঙালী প্রধানদের মধ্যে মিলন-ক্ষেত্র রচনায় অতটা তৎপর হইয়াছিলেন। তাঁহার পর তাঁহার অনুবর্ত্তীরা ও হিন্দু কলেজাদির নব্যশিক্ষিতেরাও ইহার জের টানিয়া চলিয়াছিল। যাহা হউক, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যতই অধিক মাত্রায় দেশের শাসন-ভার লাভ করিতে লাগিল ততই স্বজাতীয়দের শুভাশুভের দিকে অতিরিক্ত নজর দিতে আরম্ভ করিল। বেসরকারী ইংরেজদের সঙ্গে কোম্পানীর কর্ম্মচারীবর্গের বহু ক্ষেত্রে একযোগে ব্যবসাদি কার্য্য চলিত। নীলচাষে উভয়েরই বিশেষ স্বার্থ ছিল। এইজন্য নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধকল্পে ১৮১৯ এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে নীল আইন বিধিবদ্ধ হয়, ডাইরেক্টর সাহেবেরা বিলাত হইতে ইহার বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ লিখিলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। ১৮২৬ সালে বিধিবদ্ধ জুরী আইন বিজিত-বিজেতার মধ্যে ভেদবৈষম্যের একটি চরম নিদর্শন। এই আইনে খ্রীষ্টান মাত্রেই—ইংরেজ ও দেশীয় খ্রীষ্টান সকলেই—হিন্দু,মুসলমানের বিচারে জুরীর কার্য্য করিতে পারিত, কিন্তু হিন্দু মুসলমান জুরী তাহাদের বিচারের ক্ষমতা পায় নাই! তীব্র আন্দোলনের ফলে এই ভেদসূচক ব্যবস্থাটি অবশ্য ১৮৩৩ সালে রহিত হয়।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দে ভারতবাসীদের শিক্ষা বা শিক্ষায় সম্বন্ধে একটি কথাও লিপিবদ্ধ হয় নাই, অথচ সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজদের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য বাজেট-বিভাগ প্রসারিত হইল, কাজে কাজেই ইহার ব্যয়ও আশাতীত রূপ বৃদ্ধি পাইল। রাজ্যবৃদ্ধির জন্য যে-সব ঋণ করিয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্বজাতীয়দের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছিল তাহার ভার সবটাই ভারতীয় রাজস্ব তথা ভারতবাসীর ঘাড়েই চাপান হইল!

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই সময় এমন কতগুলি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন যাহার ফলে ভারতবাসীদের মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করার কথা হয়। পরবর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যেই এই অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হয়। ইহার প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত ভূম্যধিকারী সভার কথা একটু পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৮৩৮ সালের ১৯এ মার্চ্চ ইহার প্রথম সভা হয়। এই সভার সভাপতি রাধাকান্ত দেব দেশবাসীর প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ মনোভাবের বিষয় এইরূপ উল্লেখ করেন :

"ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রাজ শাসনের অধীনে প্রথমতঃ লোক সকল বিলক্ষণ সুখে কালযাপন করিতেন কিন্তু এইক্ষণে ভূমি বাজেয়াপ্ত করা বিষয়ে অত্যন্ত ভয় জন্মিয়াছে এবং ভূম্যধিকারিরাও উদ্বিগ্ন আছেন। পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্ট প্রজারদের হিতার্থে কি কার্য্য করিয়াছেন কএক বৎসর হইল যখন দেশের কোন২ অংশ বন্যাপ্রযুক্ত উপদ্রুত হইল তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কিকিৎকালের নিমিত্ত আপনারদের দাওয়া স্থগিত রাখিয়াছিলেন কিন্তু পরে সুদ সমেত উসুল করিলেন তাহাতে অনেক জমিদারী নষ্ট হইল ও প্রজারদের অত্যন্ত ক্লেশ ঘটিল। প্রজারদের যে সকল অনিষ্ট বিষয়ে অভিযোগ হয় তন্মধ্যে প্রধান অনিষ্টকর নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করণ। অতএব সময় মতে আমারদের এক সমাজ স্থাপন করা উচিত হয়…।"*

* বাঙ্গালার ইতিহাস, তৃতীয় ভাগ। পৃ. ৭, ৮।

* রাধাকান্ত দেব, ৩য় সং। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। পৃ. ৪২।

গবর্নমেণ্টের শিক্ষানীতিও ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে একটি বিশিষ্ট উদ্দেশ্যে এক বিশিষ্ট ধারায় চালিত হইতে থাকে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক দেশীয় পাঠশালাদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ সম্বন্ধে সম্যক অনুসন্ধানের জন্য উইলিয়ম এডামকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহার উন্নতি ও প্রসার নিমিত্ত কোনই ব্যবস্থা করিয়া যান নাই। এডাম শিক্ষা-সৌধের ভিত্তিস্বরূপ দেশীয় পাঠশালাগুলিকে গ্রহণ করিয়া জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিস করিয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষ কিন্তু তাহার সুপারিস গ্রহণীয় মনে করিলেন না। পরন্তু ইংরেজীর মাধ্যমে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারেই তাঁহারা সবিশেষ মনোযোগী হইলেন। বেণ্টিঙ্ক মহোদয় এই নূতন শিক্ষা-নীতিতে সম্মতি দিয়া গেলেও ইহার সত্যকার প্রবর্তক ও ব্যাখ্যাতা ছিলেন টমাস বেবিংটন মেকলে। এদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা তথা সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন সম্বন্ধে মেকলে সাহেবের কিরূপ হীন ধারণা ছিল পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা তাহা দেখাইয়াছি। ইংরেজী শিক্ষা প্রচারে তাঁহার মনোভাবও আমাদের অবিদিত নাই। সরকারী নির্দ্দেশে কি সংস্কৃত কি আরবি ফার্সি সব শিক্ষাই সঙ্কুচিত হইল। এ সকল ভাষায় পুস্তক প্রকাশের ভার এশিয়াটিক সোসাইটির হাতে দিয়া সরকার দায়মুক্ত হইলেন।

বেণ্টিঙ্কের আমলেই মুন্সেফ, ডেপুটি কলেক্টর, সদর আমীন প্রভৃতি পদে ভারতবাসীদের নিয়োগ আরম্ভ হয়। বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড (১৮৩৬-৪২) নিয়ম করিয়া দিলেন যে, যে যত বেশী ইংরেজী শিখিবে তাহাকে তত উচ্চ পদে নিযুক্ত করা হইবে। পরাধীন বাঙালীদের মধ্যে রাজভাষা শিখিবার ধুম পড়িয়া গেল। পূর্ব্বে এ-সব মনীষী আশা বা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন যে, ইংরেজী শিক্ষার ফলে ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভে উন্মুখ হইবে তাহা ভ্রান্তিমূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতে লাগিল। ইংরেজী শিক্ষিত সাধারণ বাঙালী স্বাধীন হইবার চেষ্টার পরিবর্ত্তে সরকারে চাকুরি গ্রহণ করিয়া সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেই অধিকতর আগ্রহান্বিত হইল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসগোপাল ঘোষ প্রমুখ যে-সব বাঙালী সরকারে চাকুরী গ্রহণ করেন নাই তাঁহারা সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতির বিবিধ সমস্যার আলোচনা করিতে লাগিলেনবটে, কিন্তু আলোচনা ব্যতীত আর কিছুই তাঁহারা তখন করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ইংরেজের শিক্ষা-নীতি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে খাতে চলিয়াছিল তাহাতে এমনটি না হইয়া অন্য কিছু হইবার উপায় ছিল না। পূর্ব্বে সরকার খ্রীষ্টান পাদ্রীদের দূরে রাখিয়া চলিতেন, এই সময় হইতে সরকারের বিশেষ প্রিয়পাত্ররূপে সরকারী বিভিন্ন বিভাগে এবং বিশেষ করিয়া শিক্ষা বিভাগে তাঁহাদেরই পরামর্শ গ্রাহ্য হইতে লাগিল। ইহার বিষম পরিণতি দেখিয়া রাধাকান্ত দেব ডক্টর হোরেস হোমান উইলসনকে ৭ অক্টোবর ১৮৪১ তারিখে এক পত্রে লেখেন :

Missionary influence is now on the ascendant : every department from the fountain head of Government to the lowest course of office is infected with it.*

ভারতীয় সাহিত্য দর্শনাদি যাহাতে সরকারী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা দেওয়া না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হইতে লাগিল। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি এতদিন পাঠশালাদিতে পুস্তক সরবরাহ করিতেছিলেন। সরকারী শিক্ষা-কমিটি অতঃপর নিজেরাই পাঠ্যপুস্তক রচনায় অগ্রণী হইলেন। এ উদ্দেশ্যে একটি সাব্-কমিটি গঠিত হইল এবং শেষ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হইল যে, যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক প্রথমে ইংরেজীতে রচনা করিতে হইবে। এই সব পুস্তক 'সেন্সর' কর্তৃক অনুমোদিত হইলে বাংলা হিন্দী উর্দু প্রভৃতি বিভিন্ন দেশভাষায় অনুবাদ করা চলিবে। এরূপ করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এদেশবাসীদের ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যের পরিবর্ত্তে ইউরোপীয় দর্শন ও সাহিত্যের ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেওয়া। পাদ্রী ইয়েট্স এ বিষয়ে শিক্ষা-কমিটির বিশিষ্ট পরামর্শদাতা ছিলেন। তিনি কমিটিকে নিম্নোক্তরূপ পরামর্শ দেন :

I would submit that it is absolutely necessary to the object in view, that the Council of Education should first fix series of their Class Books in English. As these are prepared they might hand them over to the Section for Vernacular Class Books to be translated into such

* ঐ। ঐ। পৃ: ২০।

languages as might be thought desirable, and with such alteration only as the idiom of the language and the usages of the people might require.*

সরকারী শিক্ষা-কমিটি তাঁহার মত গ্রহণ করিলেন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় *Encyclopædia Bengalensis* বা "বিদ্যাকল্পদ্রুম" খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। সরকার ইহাতে অর্থানুকূল্য করিতে সম্মত হন। এই গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হইলে শিক্ষা-কমিটি এইরূপ মন্তব্য করিলেন যে, ইহার ইংরেজী অংশ অনুমোদন করা হইল, বাংলা অংশও 'সেন্সর' বা পরীক্ষা না করিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে। কেননা কৃষ্ণমোহনের চরিত্র ও বিদ্যাবুদ্ধি তাঁহাদের বিশেষ জানা। কমিটিরই ভাষায়

The English text is read over and approved by the Council prior to publication. The Bengalee is entrusted entirely to the author, whose known character and acquirements are considered sufficient guarantees for its accuracy, without submitting it to any further censorship.†

সরকারী শিক্ষানীতির ফলে এমন একদল বাঙালী সৃষ্টি হইতেছিল যাহারা স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর পরিবর্তে ইংলণ্ড ও ইংরেজকেই আপন বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিল। মেকলে সাহেবের ভগিনীপতি সার চার্লস ট্রেভিলিয়নও এদেশে নূতন শিক্ষা-নীতি প্রবর্তনে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তিনি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্যদান কালে ঐ কথা অতি আগ্রহের সঙ্গেই স্বীকার করিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, নিজেদের বিষয় স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে গিলে ভারতবাসীরা এই কথাই বেশী করিয়া ভাবিবে যে, ইংরেজকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে না পারিলে স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা নাই। একমাত্র ইংরেজী শিক্ষার প্রসার দ্বারাই তাহাদের এই চিন্তা অপনোদন করা যাইতে পারে। ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে ভারতবাসীরা ইংরেজের আদর্শে প্রতিষ্ঠানাদি স্থাপন করিতে সচেষ্ট হইবে। তাহাদের এই ধারণা জন্মিবে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষগণ বর্বর শাসনের অধীন থাকিয়া কি দুঃখকষ্টই না ভোগ করিয়াছে; আর তাহাদের সঙ্গে নিজেদের উন্নততর অবস্থার তুলনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে। ইংরেজের আশ্রয় ব্যতিরেকে উন্নতির কোন আশা নাই, ইহা ছাড়া তাহারা আর কিছুই ভাবিতে পারিবে না। ট্রেভিলিয়নের ইংরেজী কথাগুলি এই :

Familiarly acquainted with us by means of our literature the Indian youth almost cease to regard us as foreigners. They speak of our great men with the same enthusiasm as we do. Educated in the same way, interested in the same pursuits with ourselves, they become more English than Hindoos just as the Roman provincials became more Roman than Gauls or Illilians.

As long as the natives are left to brood over their former independence, their sole specific for improving their condition is, the immediate and total expulsion of the English.....It is only by the infusion of European ideas that a new direction can be given to national views. The young men brought up in our seminaries turn with contempt from the barbarous despotism under which their ancestors groaned to the prospect of improving their national institution on the English model.....they have no notion of any improvement but such as rivets their connection with the English and makes them dependent on English protection and instruction.*

সুতরাং ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতা লাভ করিলে আমাদের স্বাধীনতালাভের পথ পরিষ্কার হইবে, অথবা ইংরেজ প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে মিলিত হইলে দেশের ও দশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইবে—এই সব ধারণা ক্রমেই ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইল। বিজিত ভারতবাসীরা ইংরেজদের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া চলিবে, তাহাদেরই কথায় এই মনোভাব প্রকাশ পাইতেছে। তবে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা লাভ করিয়া এবং পাশ্চাত্ত্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবাসীরা অন্তভাবে উপকৃত হইয়াছে। এই কথাই পরে আলোচনা করিব।

* *General Report of the Committee of Public Instruction*, etc. for 1842-43, পৃ. ২৩।

† *General Report of the Committee of Public Instruction*, etc. for 1845-46. পৃ. ৮২।

* ১৯৩৪, মে সংখ্যা *The Modern Review*. পৃ. ৪১০-এ উদ্ধৃত

হোমাগ্নি

[উপন্যাস]

শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(এক)

উনিশ শো উনত্রিশ সালের পয়লা জুলাই।

এক মাস গরমের ছুটির পর সেদিন আবার তারকনাথ হাইস্কুল খুলিল। স্কুলের সঙ্গে লাগাও বোর্ডিং,...স্কুলের বিদেশী ছেলেদের আশ্রয়স্থল। বোর্ডিংএ ছাত্রের সংখ্যা প্রায় একশোর কাছাকাছি। ছেলেরা সকলে আসিয়া এখনও পৌঁছে নাই। সাধারণতঃ বাড়ী হইতে বিদেশে আসিবার সময় স্কুলের পড়ুয়াদেরও মন কেমন করে, স্কুল খোলার দিনই স্কুলে আসিয়া হাজিরা দিতে ইচ্ছা করে না। ছেলের মায়েরও অল্পবয়সী ছেলের বিদেশে অসহায়ত্ব কল্পনা করিয়া তাড়াতাড়ি কাছ ছাড়া করিতে ইচ্ছা হয় না, মনে হয় যে ক' দিন ছেলে কাছে থাকে সেই বেশ। উভয় পক্ষেরই গোপন ছলনাতে দুই এক দিন দেরীটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই ঘটিয়া যায়। তবে ছেলেদের যথাসময়ে না আসিলেও চলে। কিন্তু যাঁহারা চাকরী করেন, মানে যাঁহারা শিক্ষক, তাঁহাদের চাকরীতে হাজিরা দিতে হাজির না হইয়া উপায় কি! তাঁহাদেরও হয়ত বাড়ী ছাড়িয়া আসিতে কষ্ট হয়। কিন্তু সে কষ্টকে আমল দিয়া চলিলে কি সংসার করা চলে? আর ষোল বছরে যে ব্যথা অতি গুরুভার, ছেচল্লিশ কি ছাপান্নতে সেটি অতি হাল্কর। কাজেই মাষ্টারেরা সকলেই আসিয়াছেন।

হেডমাষ্টার চন্দ্রশেখর রায়চৌধুরীই সর্ব্বপ্রথম আসিয়াছেন। আগের দিন বিকালে তিনি আসিয়া দেখিলেন যে, সে দিনের সকালের ট্রেনে মাত্র দুইটি ছেলে আসিয়াছে—দুই ভাই। এখান হইতে বহু মাইল দূরে বন্দরে তাহাদের বাবা ষ্টেশন মাষ্টার। সেই বাঙ্গালীহীন দেশে ছেলেদের বাংলা শিক্ষা অসম্ভব। তাই এতদূরে পড়িতে পাঠাইয়াছেন। ভদ্রলোকটির বাড়ী এ দেশেই, যদিও দেশের বাস বহুকাল উঠাইয়া দিয়াছেন। একে দেশের স্কুল, তাহার উপর পড়াশোনায় স্কুলটির সুনাম আছে, সকলের উপরে চন্দ্রশেখর বাবুর সঙ্গে ভদ্রলোকের যেটুকু সামান্য পরিচয় আছে তাহাতে তাঁহাকে অতি সৎ মানুষ বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইয়াছে। তাই ছেলেদের এখানে বোর্ডিংএ চন্দ্রশেখর বাবুর নিকটে রাখিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। ছেলে দুটি অতি দুরন্ত। চন্দ্রশেখর বাবুর ধারণা স্কুলের সমস্ত ছেলেদের মধ্যে এই দুই ভাইয়ের মত দুর্দ্দান্ত ছেলে আর নাই। আগের দিন বিকালে যখন তিনি আসিয়া স্কুলে পৌঁছিলেন তখন স্কুল কম্পাউণ্ডে ঢুকিয়াই দেখিলেন দুই ভাই পরস্পরের নিকট হইতে প্রায় বিশ পঁচিশ গজ দূরে দাঁড়াইয়া একটা ব্লাডারহীন বলের শূন্য খোল লইয়া ফুটবল খেলিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়াই দুই জনেই ভীত ও লজ্জিত হইয়া খেলা বন্ধ করিল। তারপর আস্তে আস্তে অতি লঘুপদে ধীর ও সঙ্কুচিত ভাবে দুই ভাইয়ে আসিয়া প্রণাম করিল,—যেন অতি শান্তশিষ্ট সুবোধ বালক, প্রথমভাগের গোপালের মত। চন্দ্রশেখরবাবুর তাই মনে হইল। সারাদিনের পরিশ্রমে, ট্রেনে আসার ক্লান্তিতে তিনি তখন পরিশ্রান্ত। স্কুলে ঢুকিয়াই দুই ভাইকে বেপরোয়া ভাবে ফুটবলের কসরৎ লইয়া খেলিতে দেখিয়া তিনি অকস্মাৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। পর মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে দেখিয়া যখন তাহারা খেলা বন্ধ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিল তখন তিনি তাহাদের ব্যবহারের আকস্মিক পরিবর্ত্তনে না হাসিয়া পারিলেন না। কিন্তু সে হাসিকে অতি তাড়াতাড়ি সস্নেহ হাস্যে পরিণত করিয়া তাহাদের দিকে তাকাইলেন। এ হাসি তাঁহার অভ্যস্ত, কিন্তু অকৃত্রিম। তাকাইবার পূর্ব্বে এক বার মাথা তুলিয়া একবার নামাইয়া চকচকে মোটা কাঁচের চশমার ভিতর হইতে তাহাদের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দেখিয়া লইলেন। তবে ছেলে দুইটী সারা হইয়া গেল। তাঁহাকে দেখিয়া ছেলেদের এই ভয় তাঁহার কাছে অতি পরিচিত, অতি স্বাভাবিক, তবু তাহাদের এই ভয় দেখিয়া তাঁহার বড় মায়া হইল। আহা, ছোট দুধের ছেলে! মা-বাপ ছাড়িয়া কোথায় কোন দূর দেশে পড়িয়া আছে! প্রতিটি ছাত্রের ভয় দেখিয়াই তাঁহার এমনি মায়া হয়। তিনি ধীরে ধীরে সস্নেহ কণ্ঠে ডাকিলেন—কি রে, ভাল ছিলি তোরা?

ঘাড় হেঁট করিয়া, তাঁহার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া কৃতার্থ কণ্ঠে হাসিমুখে বড়টি বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ! সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া কথাটাকে যথাসম্ভব জোরালো করিল। ছোটটির মুখ অতি অকৃত্রিম হাসিতে তখন ভরিয়া গিয়াছে, তাহার ছোট ছোট দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

চন্দ্র বাবু এ টুকুর সবই জানেন, বোঝেন। ছাত্রদের মুখে এমনি প্রসন্নতার প্রকাশ তিনি প্রতি মুহূর্তে কামনা করেন। কিন্তু তিনি জানেন তাহা হইবার নয়। ছাত্রদের সঙ্গে অতি সহজভাবে কথা বলিলে, সহজ ব্যবহার করিলে, অতিমাত্রায় গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া না চলিলে কয়েক দিনেই নিদারুণ বিশৃঙ্খলা আসিয়া উপস্থিত হইবে। আর তাহার মাত্রা ও ফল কোথায় গিয়া পৌঁছিবে কে জানে! তবু মাঝে মাঝে অসাধারণ গাম্ভীর্য্যের সিংহাসন হইতে নামিয়া তিনি সহজভাবে অতি সামান্যক্ষণের জন্য ছাত্রদের কাছে আসিয়া দাঁড়ান, তাহারা তাঁহার ক্ষণিক স্নেহস্পর্শে কৃতার্থ হইয়া যায়। কিন্তু চন্দ্রবাবুর দুঃখ এই যে, ছেলেরা বোঝে না তাঁহার গাম্ভীর্য্যের সবটাই তাহাদের জন্য স্নেহ দিয়া রচিত। বাহিরের এই শক্ত কাঠামোটা যে তাহাদেরই কল্যাণের জন্য এ তাহারা বোঝে না। আর ইহারা বড় অবোধ, অবুঝ, বুঝিবেই বা কি করিয়া? সে বুদ্ধি কি ইহাদের আছে? তিনি আবার ছেলে দুইটির দিকে তাকাইলেন। তখনও তেমনি হাসিতে মুখ তাহাদের জল জল করিতেছে। তিনি কোমলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোদের বাবা ভাল আছেন রে গোপাল?

বড়টির নাম গোপাল, ছোটটির নাম ভূপাল। গোপাল উত্তর দিল—সেই পূর্ব্বের ছোট্ট উত্তরটি—আজ্ঞে হ্যাঁ। গোপালের মুখে হাসি স্ফুটতর হইয়া উঠিল, সে হাতের আঙুল-গুলা পেষণ করিতে লাগিল। চন্দ্রবাবু বুঝিলেন—উহারা বড় খুসী হইয়াছে। তিনি প্রত্যেক ছুটির পূর্ব্বে আর পরে ঠিক এমনি প্রশ্নই করেন প্রতি ছাত্রকেই। ছাত্রেরা তাহা জানে। ইহার মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই, তবু তাহারা পরম পুলকিত হইয়া উঠে। ইহারই প্রত্যাশা করে একান্ত ভাবে। ছুটির পূর্ব্বে বাড়ী যাইবার সময় বলেন—সাবধানে ট্রেনে যাবি। গাড়ীতে জানলা দিয়ে বাইরে ঝুঁকবি না। আর বাড়ী হইতে আসিলেই জিজ্ঞাসা করেন এই কুশল প্রশ্ন। ছেলে দুইটির মন ও মুখ তখনও খুসীতে উজ্জ্বল। কিন্তু চন্দ্রশেখর বাবুর তখন অন্য কথা মনে পড়িয়াছে। ট্রেন হইতে তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন; হাতমুখ ধোওয়া, স্নান করা, আহার ও বিশ্রাম অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করিতেছেন। কোমল কণ্ঠস্বরকে এবার অত্যন্ত ব্যবহারিক করিয়া লইয়া প্রশ্ন করিলেন—হ্যাঁরে, সকালের ট্রেনে তো এসেছিস! দিনে খেয়েছিলি কি?

ছেলে দুইটির মুখ শুকাইয়া গেল। যদিও তাহারা মুড়ি খাইয়াছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে তেলে ভাজার পরিমাণ ছিল প্রচুর। তাহারা জানে চন্দ্রবাবু বাজারের তেলেভাজা খাওয়া একেবারে পছন্দ করেন না। ইহার জন্য অনেক ছেলেকে অনেক বার তিরস্কার করিয়াছেন, এবং এই অপরাধের জন্য প্রহারও করিয়াছেন দুই চারিজনকে। এই তো মাস কয়েক আগের কথা গোপালই মনে করিতে পারে। আশেপাশের গ্রামে কলেরার জন্য মুড়ি ও বাতাসা ছাড়া অন্য কিছু খাইতে চন্দ্রবাবু ছেলেদের বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দিন বিকালেই ভূপাল ও গোপাল অতি চমৎকার করিয়া ভাজা বেগুনি খাইয়াছিল। আর তাহারই কিছুক্ষণ পর কি একটা কারণে গোপাল ভূপালকে মারে। ভূপাল কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া চন্দ্রবাবুকে জানায় যে, তাহার দাদা তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া তেলেভাজা খাইয়াছে। তারপর সন্ধ্যা বেলায় চন্দ্রবাবু কি প্রহারই না তাহাকে দিয়াছিলেন! আর সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আনাইয়া তাহার জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিতেও দেরী করেন নাই। তখন হইতে চন্দ্রবাবু খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলেই সে ভয় পায়। তাহার উপর আজ তো যথেষ্ট তেলেভাজা খাইয়াছে। তবে বিপদ হইতে ত্রাণ করিল ভূপাল, সে বলিল—দিনে মুড়ি মুড়কি আর বাতাসা খেয়েছিলাম।

চন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—তেলেভাজা খাস নি তো?

দুই ভাইয়েই অম্লান বদনে মিথ্যা কথা বলিল—না স্যার। যদিও 'সদা সত্য কথা বলিবে', 'সত্য কথার উপকারিতা—ওয়াশিংটন' ইত্যাদি দুইতায়েই যথেষ্ট পড়িয়াছে, তবু সে কথা মনে পড়িল না। চন্দ্রবাবু নিজে ছাত্রদের বার বার সত্য কথা বলিতে উপদেশ দেন, শিক্ষা দেন, মিথ্যা কথা বলিয়া ধরা

পড়িলে তিরস্কার করেন ; তবু যেখানে সত্যকথা বলিলে ক্ষতির ভয় আছে সেখানে ছাত্রদের কেহ সারতঃপক্ষে সত্যকথা বলে না। চন্দ্রবাবু তাহা জানেন। তাই ছেলেদের কথা যখন তাঁহার যেমন মনে হয় তেমনি বিশ্বাস করেন, বা বিশ্বাস না করিয়া জেরা করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি বোধ হয় বিশ্বাস করিলেন, তাই আর কোনও জেরা না করিয়া অন্য কথা পাড়িলেন, বলিলেন—আচ্ছা যা। রাত্রে কি খাবি ? খাবি আর কি ? আমার কাছেই খাবি। আমি রান্না করব।

তাহারা নিষ্কৃতি পাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, যথানিয়ম সম্বরই যাইতেছিল। ফুটবলের খোলটা চন্দ্রবাবুর চোখের সামনে হইতে লইয়া গিয়া পাশে আমবাগানে খেলা চলিবে। চন্দ্রবাবু আবার ডাকিলেন—শোন। এই চাবি নিয়ে আমার ঘরটা খোল তো। তারপর দড়ি বালতিটা বের কর। স্নান করব।

তাহারা বাঁচিল। যাক—তবু হাত পাটা চালু থাকিবে। আর তাহার উপর হেড মাষ্টার মশায়ের কাজ করা হইবে। রাত্রে আবার তাঁহার কাছে খাবার ব্যবস্থা ! সোজা কথা !! গোপাল সাগ্রহে তালা খুলিতে আরম্ভ করিল। চন্দ্রবাবু অতি ধীরে ধীরে টিনের অতি পুরানো ট্রাঙ্কটি খুলিয়া ফেলিলেন। ঘরের তালা তখন খোলা হইয়াছে। গোপাল তখন ছোট ঘরখানির চৌকির এবং টেবিলের ধূলা ঝাড়িতেছে। ধূলা ঝাড়া হইলে চন্দ্রবাবু টেবিলের উপর আস্তে আস্তে মাজনের শিশি, জিভ-ছোলা, দাড়ি কামাইবার ক্ষুর, ব্রাশ, একটি সেলুলয়েডের বাটি, একটি সাবানের কেস, গামছা সব বাহির করিয়া একে একে সাজাইয়া রাখিলেন। সেগুলি গত আট বৎসর ঐ টেবিলটির উপরে ঠিক অমনি ভাবেই সাজানো থাকে।

চন্দ্রবাবু অতি পরিচ্ছন্ন স্বভাবের লোক। সে পরিচ্ছন্নতার পরিমাণ এত বেশী যে প্রায় রোগের পর্য্যায়ে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তাঁহার সময় হিসাব করা। ভোর পাঁচটার সময় উঠিয়া গাড়ু হাতে প্রাতঃকৃত্য সেব করিয়া ঠিক ছয়টার সময় আপনার ঘরের সামনের বারান্দার চৌকিতে বসিবেন। প্রাতঃকৃত্যের সময়ে সাবানটি দিয়া দুইবার হাত ধুইবেন, তারপর বিশ বৎসর একাদিক্রমে ছাত্রজীবনের প্রারম্ভ হইতে যে মাজনটি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে দাঁত মাজিবেন। তারপর যে জিভছোলাটি গত পনর বৎসর ব্যবহার করিতেছেন সেইটিতে জিভ পরিষ্কার করিবেন। তারপর হাত পা মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া পাটকরা একটি সাদা গামছাতে মুখ মুছিতে মুছিতে ঘরে আসিবেন। এই সাদা রঙের গামছাই তিনি ছাত্র জীবন হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তারপর ঘরে ঢুকিয়া কাপড় ছাড়িয়া রামকৃষ্ণের ও বিবেকানন্দের ছবির দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া প্রণাম করেন, তারপর বাহিরে বারান্দার চৌকিতে বসিয়া ঘণ্টা দেড়েক সেদিনের পড়াইবার নির্দ্দিষ্ট অংশটুকু পড়েন। সেগুলি এই দীর্ঘ পনর বৎসর শিক্ষকতা করিতে গিয়া বহুবার পড়িয়াছেন, হয়ত অনেক অংশ মুখস্থ হইয়া গিয়াছে, তবু পড়েন। নূতন কিছু মনে হইলেই পাশে নোট করিয়া রাখেন। তারপর বইগুলি তুলিয়া রাখিয়া আবার হিসাবের খাতা ও ক্যাসবাক্স লইয়া বসেন। তিনি বোর্ডিংএর সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌ট্‌। ফিফথ মাষ্টার তিনকড়ি মণ্ডল যখন তাঁহার পড়া শেষ হইবে সেই সময়ের অপেক্ষায় থাকেন, তিনি তখন আসিয়া হাজির হন। তাঁহার সহিত দৈনিক বাজার খরচের হিসাব করিতেই সাড়ে আটটা বাজিয়া যায়। সাতটার সময় ছেলেদের পড়িতে বসিবার ঘণ্টা পড়ে। সাড়ে আটটার সময় ছাত্রদের পড়া জমিয়া আসার সময়। তিনি সেই সময় বোর্ডিংএর ঘরে ঘরে কে কেমন পড়িতেছে দেখিবার জন্য বাহির হন। আধ ঘণ্টা ছেলেদের পড়াশুনার তদারক করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার চৌকিতে বসেন। তখন সেকেণ্ড মাষ্টার হরিলাল বাবু, থার্ড মাষ্টার কালীকিঙ্কর বাবু, ফোর্থ মাষ্টার চিত্তরঞ্জন বাবু আসিয়া গল্প করিতে বসেন। হাটবারের দিন গ্রামের দুই চার জন ভদ্রলোক হাট করিয়া ফিরিবার পথে বসিয়া গল্প করিয়া যান। তারপর সাড়ে নটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই স্নানের ঘণ্টা পড়ে। সকলে স্নানের জন্য উঠিয়া পড়েন। তারপর সাড়ে দশটা হইতে সাড়ে চারিটা পর্য্যন্ত স্কুল। সমস্ত ছুটি হইয়া যায় যখন চন্দ্রবাবু তখনও পড়ান। তিনি বিশেষ করিয়া প্রথম শ্রেণীতে (ক্লাস টেন্‌) শেষের ঘণ্টাটি পড়াইয়া থাকেন। তাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী, তাহাদের প্রত্যেকটির প্রতি বিশেষ ব্যক্তিগত দৃষ্টির প্রয়োজন। সেইজন্য শেষের ঘণ্টায় ছাত্রদের প্রত্যেকের ইংরেজী অনুবাদ

সংশোধন করিতে করিতে কোন কোন দিন পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা হইয়া যায়। তাহার পর যখন তাঁহার চোখ ক্লান্ত হইয়া আসে, হাত আর কাজ করিতে চায় না, মুখ শুকাইয়া যায়, ক্ষুধায় পেটের নাড়ী চন্ চন্ করে, তখন বাকী খাতাগুলি হাতে লইয়া তিনি উঠিয়া পড়েন, ছাত্রদের ছুটি হয়। তারপর আবার সেই চৌকী। চিঁড়া ভিজান থাকে। দুধ ও চিঁড়া খাইয়া কিছুক্ষণ মাষ্টারদের সঙ্গে গল্প করিয়া বেড়াইতে বাহির হন। বেড়াইয়া ফিরিতে সাতটা সাড়ে সাতটা হইয়া যায়। যখন ফেরেন তখন চৌকীর উপর লণ্ঠনটি বাতি কমাইয়া রাখা থাকে। তিনি হাত মুখ ধুইয়া বাতি বাড়াইয়া দেন। আলোটি তাঁহার বহুদিনের। এখানে প্রথম শিক্ষকতা করিতে আসিয়া কিনিয়াছিলেন। আজও আলোটি, আলোর কাচটি অতি উজ্জ্বল, পলতেটি পরিষ্কার সুডৌল বৃত্তাকারে কাটা। তিনি সেই আলোয় বসিয়া কিছুক্ষণ কাজ করেন। তারপর অতি চুপি চুপি আবার বাহির হন বোর্ডিংএর ছেলেদের দেখিতে কে কেমন পড়াশুনা করিতেছে। তারপর সাড়ে নয়টা বাজিতে বাজিতে আবার খাবার ঘণ্টা পড়ে। তারপর আবার চৌকীতে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শুইয়া পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা, অতি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া যান। তাঁহার মনে হয় যেন একটা বিশাল পরিবারের কর্ত্রী তিনি—এখানে সকলের ভাল-মন্দের দায়িত্ব তাঁহার। অতি নিরুপদ্রব অবিচ্ছিন্ন শান্তিতে, সুচারু শৃঙ্খলায় সমস্ত সংসার চালনা করিয়া তিনি পরম তৃপ্ত হন। ধরাবাঁধা দিনগুলি।

কিন্তু আজকের দিনটি ছকে বাঁধা দিনের মত চলিতেছে না। চলা সম্ভবও নয়। স্কুল খোলার আগের দিন এমনি বিশৃঙ্খলাতেই কাটিয়া যায়। আজও কাটিতেছে। তাঁহার জিনিষপত্রগুলি তখন গুছান হইয়া গিয়াছে। তিনি সাদা গামছাখানি পাট করিয়া চিরাচরিত প্রথায় কাঁধে ফেলিয়া কুয়াতলার দিকে চলিলেন। দেখিলেন গোপাল তখন কলিকলে দড়ি লাগাইয়া কূয়ায় বালতী নামাইতেছে। তিনি হাঁক দিলেন—এই তুই তুলতে পারবি নে। থাক থাক আমি যাচ্ছি। গোপাল তখন আপনার শক্তি প্রমাণ করিবার জন্য জলতরঙ্গি বালতি টানিতে আরম্ভ করিয়াছে। নীচের ঠোঁটের উপর দাঁত চাপিয়া সজোরে টানিয়া জলতরঙ্গি বালতি তুলিতেছে। চন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার হাত হইতে বালতির দড়ি কাড়িয়া লইয়া বাকীটা নিজেই টানিয়া তুলিলেন। তাঁহারও হাঁপ ধরিয়া গিয়াছে। বয়সও তো কম হইল না, পঞ্চাশ হইল। ঘটিতে করিয়া জল তুলিয়া গামছা ভিজাইলেন। উঃ, জলটা কত ঠাণ্ডা। নাঃ, এ ঠাণ্ডা জলে এই অবেলায় আর স্নান চলিবে না। সর্দ্দি হইবে, কে জানে ম্যালেরিয়াও হইতে পারে! আশ্চর্য্য কি! তিনি শুধু হাত পা মুখ ধুইয়া ফেলিলেন। গোপাল তাঁহাকে ডাকিতেছে। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন—ঝি আসিয়াছে, তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম করিতেছে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া মেয়েটি উনানে আঁচ দিতে গেল। রাত্রের রান্না হইবে। মেয়েটি চলিয়া যাইতেছে, চন্দ্রবাবু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মেয়েটির বয়স অত্যন্ত অল্প—বছর আঠারো উনিশ। রূপ তাহার নাই—তবে অতুল স্বাস্থ্য মেয়েটির। একে বয়স অল্প, তাহার উপর শরীরের ঐ বাঁধুনি। মেয়েটিকে ঝি হিসাবে বহাল করিতে তাঁহার একেবারে ইচ্ছা ছিল না। তবু তাহাকে রাখিতে হইয়াছে। মেয়েটির মায়ের মিনতিতে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। আর মেয়েটিকে ছাড়ানোও যায় না এখন। মেয়েটির কাজে কোন আলস্য নাই, অতি লজ্জাবতী, তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করে। সব চেয়ে বড় কথা ছেলেদের দিকে কখনও তাকায় না পর্য্যন্ত। তবু তাঁহার সন্দেহ ও দুশ্চিন্তা যায় না। কিন্তু ছাড়ানোরও উপায় নাই। একটি লোকের অন্ন তিনি মারিবেন কি করিয়া।

মুখ ধুইয়া তিনি চৌকীতে গিয়া বসিলেন। তখন উনানে আগুন পড়িয়াছে। গোপাল তরকারী কুটিতেছে। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া মেয়েটি অতি সন্তর্পণে পাশ কাটাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল, দাঁড়াইল না। রান্নার সমস্ত জোগাড় ইতিমধ্যে সে করিয়া দিয়াছে। কাজ হইয়া গেলে সে আর দাঁড়ায় না। তবু চন্দ্রবাবু আর একবার অতি বিরক্তির সহিত মেয়েটির গমনপথের দিকে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চাহিলেন। মেয়েটি তখন চলিয়া গিয়াছে। চন্দ্রবাবু আর দেরী না করিয়া রান্না করিবার ব্যবস্থায় মন দিলেন।

রাত্রি নয়টা বাজিল। ঘরের মধ্যে ক্লক ঘড়িটা টং টং করিয়া নয়টা ঘণ্টা বাজাইয়া তাঁহাকে খানিকটা সচেতন করিয়া দিল। চারিদিক নিস্তব্ধ, বাহিরে বর্ষার পাতলা কালো মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন, চারিদিক অন্ধকার। চৌকীর উপর হইতে আলোটি তুলিয়া লইয়া বাতি কমাইয়া নীচে রাখিয়া দিয়াছেন। ছেলে দুইটি পাশের ছোট ঘরখানায় বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। উনানের উপর হাঁড়িতে টগবগ করিয়া ভাত ফুটিতেছে, ভিতর হইতে গনগনে আঁচের লাল আলোয় এলুমিনিয়ামের হাঁড়ির সাদা তলাটা লাল দেখাইতেছে, আশপাশের খানিকটা জায়গা স্বল্প আলোকিত। তিনি শূন্য দৃষ্টিতে সেই দিকে অকারণে তাকাইয়া আছেন। অন্য দিন এখানে কত সমারোহে, কত আলো; প্রচুর লণ্ঠনের আলোয় এখানকার কোথাও অন্ধকার থাকে বলিয়াও ভ্রম হয় না, কত তরুণ কণ্ঠের কোলাহলে, আনন্দ-উচ্ছ্বসিত রবে এখানকার সমস্ত স্থান মুখরিত হয়, প্রতিটি স্থাবর বস্তু কলহাস্যে, তীক্ষ্ণ চীৎকারের রবাঘাতে মুখরিত হয়। পূর্ব্বেও প্রতিদিন হইয়াছে, আবার আগামী কালও হইবে। তবু আজ কত নিস্তব্ধতা, কত অন্ধকার! অন্যদিন উজ্জ্বল আলোতে ও তরুণ প্রাণের উত্তাপে অবসাদ আসা দূরের কথা, উৎসাহের চাপে তিনিও চঞ্চল থাকেন। কিন্তু আজ! সমস্ত বিগত জীবনের কথা আজ এই অন্ধকার ও নিঃস্তব্ধতার অবকাশে শুধু আশাভঙ্গের নিষ্ফল কাহিনীর আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে। এই যে আজ তিনি সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকারের মধ্যে একলা নিঃসঙ্গ বসিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে নিজেই নিজের জন্য ভাত ফুটাইতেছেন, এই কি তার আজীবনের কাম্য ছিল? তরুণ জীবনে কি তিনি ইহারই কল্পনায় বিভোর থাকিতেন? তিনি কি চাহিয়াছিলেন আর কি পাইয়াছেন? কল্পনা ছিল ভাল করিয়া এম. এ. পাশ করিয়া কোন কলেজে একটি অধ্যাপনা জুটাইয়া লইবেন। শিক্ষকের সুউচ্চ ও সুদূরবর্ত্তী আসন হইতে স্নেহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে যে বিচিত্র ও বিশেষ জ্ঞান তিনি ছাত্রদের বিতরণ করিবেন তাহা হইবে তুলনারহিত। সাহিত্যের নব নব ব্যাখ্যায় ছাত্রেরা চমকিত ও বিহ্বল হইয়া যাইবে। তাহাদের মনে তাঁহার বিচিত্র ও সহজ সমাধানে অন্ধকারের মধ্যে চকিত বিদ্যুতের প্রায় ক্রিয়া হইবে। তাহাদের বুদ্ধি, মন, চরিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। তাঁহার স্নেহের স্পর্শে তাহারা উত্তপ্ত হইবে। সেই উত্তাপ ও আলো তাহারা দেশ-দেশান্তরে বিকীরিত করিবে। প্রাচীন গুরুর নূতন আবির্ভাব হইবে তাঁহার মধ্যে,—যে গুরুর দয়ায়, মমতায় ও স্নেহস্পর্শে অজ্ঞানতিমির দূর হয়। শুধু কি তাই? এ তো অতি তুচ্ছ গণ্ডীবদ্ধ কর্ম্মের কল্পনা! তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইবে দরিদ্র-নারায়ণের বিশাল লীলাপ্রাঙ্গণে। তাহাদের তিনি প্রেমে, সেবায়, শিক্ষায় মানুষ করিয়া তুলিবেন। মনে যে কল্পনা ছিল বাস্তবে তাহার কি পরিণতি হইল? তিনি করিতেই বা পারিলেন কি?

এমন চিন্তা তাঁহার সাধারণতঃ হয় না। তিনি স্মরণ করিতে পারেন এ জাতীয় অবসাদ তিনি জীবনে একবার কি দুইবারের বেশী ভোগ করেন নাই। সে তাঁহার স্বভাব নয়। এই ছোট্ট পল্লীগ্রামটির মধ্যে, ছোট্ট স্কুলটিতে শিক্ষকতা করিয়া, ছাত্রদের পড়াইয়া ও দেখাশুনা করিয়া তিনি একজাতীয় স্বয়ং-সম্পূর্ণতা সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন। আর সে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আত্মপ্রসাদে পরিপূর্ণ। সমস্ত পৃথিবী আস্তে আস্তে তাঁহার কাছে সঙ্কুচিত হইয়া এই স্কুলটির গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কল্পনা করার স্বভাব তাঁহার একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার জন্য দুঃখও তাঁহার নাই। যে সুখ ও শান্তি জীবন কামনা করে তাহা তিনি পরিপূর্ণভাবেই এখান হইতেই সংগ্রহ করিতে পারেন। তবে আজ দৈহিক ক্লান্তির সঙ্গে বিগত জীবনের কল্পনার আশাভঙ্গের দুঃখে অবসাদগ্রস্ত হইয়া মোহাবিষ্টের মত তিনি বসিয়া ছিলেন। চারিদিকে একটানা অন্ধকার আর স্তব্ধতা, হাঁড়িতে টগ্‌বগ্‌ করিয়া একঘেয়ে শব্দে ও ছন্দে ভাত ফুটিতেছে।

অকস্মাৎ কাহাদের পদশব্দের সঙ্গে সঙ্গে অতি নিকটে কাহার কথা ভাসিয়া আসিল—ভাতটা নামিয়ে ফেলুন মাষ্টার মশায়। পোড়া গন্ধ উঠছে।

চন্দ্রবাবু সচকিত হইয়া চাহিলেন। কাহারা আসিল অন্ধকারে কিছু বুঝিতে পারিলেন না। শুধু তাকাইতে গিয়া নজরে পড়িল আকাশের মেঘ কাটিয়া গিয়া নির্ম্মল আকাশে অতি উজ্জ্বল তারা ফুটিয়া উঠিয়াছে, অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়া

গিয়াছে। চন্দ্রবাবুর বড় ভাল লাগিল। কে কথা কহিল কিছু বুঝিতে পারিলেন না, তবে সবল তরুণ কণ্ঠস্বর এই তারাস্বচ্ছ রাত্রির মাধুর্য্যের মত তাঁহাকে বিচলিত করিল। তিনি যেন সর্ব্বান্তঃকরণে এমনি আহ্বানের কামনাই করিতেছিলেন।

ঈষৎ বিচলিত স্বরেই তিনি প্রশ্ন করিলেন—কে? এত রাত্রে? আপনারা? বলিতে বলিতেই তিনি আলোর বাতিটা বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া গ্রামের দুইটি তরুণ ভদ্রলোক। একজনের নাম আনন্দময় রায়। অন্যজন আনন্দময়ের বন্ধু ও সঙ্গী তারণ ভট্টাচার্য্য। আনন্দময় চন্দ্রবাবুর মুখের দিকে হাসিমুখে চাহিয়া আছেন। এতরাত্রে এই দুইজন ভদ্রলোককে দেখিয়াও চন্দ্রবাবু বিস্মিত হইলেন না। আনন্দময়ের কাছে দিন রাত্রি নাই, সময় অসময় নাই। প্রয়োজন বোধ করিলে তিনি যখন যেখানে খুশী গিয়া হাজির হন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনটা অন্যের। পরোপকার করিবার উদগ্র আগ্রহ নাই, তবে দরকার হইলে যেটুকু করা উচিত করিয়া থাকেন আপনার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করিয়া। কখনও কখনও ইহার জন্য বহু শক্তিশালী ও পদস্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইয়াছে। সেক্ষেত্রে তিনি কখনও পিছাইয়া যান নাই, তাহার জন্য ক্ষতি স্বীকারও তাঁহাকে যথেষ্ট করিতে হইয়াছে। আবার যে ক্ষেত্রে সহজ মীমাংসা সম্ভব সে ক্ষেত্রে প্রথমে তাহারই চেষ্টা করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাতেই কাজ হইয়া যায়। তিনি স্বভাবত মিষ্টভাষী, তবে প্রয়োজন হইলে অতি তীক্ষ্ণ কটু ও রূঢ় কথা বলিতেও তাঁহার বাধে না। অবলীলাক্রমে মুখে একটি কুঞ্চন না আনিয়া সেক্ষেত্রেও আপনার বক্তব্য বলিতে পারেন। সেইজন্য পরিচিত সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমীহ করে। তিনি এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। এখান হইতেই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছেন। অবশ্য তিনি চন্দ্রবাবুর কাছে পড়েন নাই। চন্দ্রবাবু যে বছর জানুয়ারী মাসে বহাল হন, সেই বছর মার্চ্চ মাসে আনন্দময় পরীক্ষা দিয়াছেন। তাই উভয়েই উভয়কে বিশেষ শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিয়া থাকেন। তবে সে স্নেহ প্রকাশের বস্তু নয়, উভয়ের ব্যবহারে শ্রদ্ধার ভাবই ফুটিয়া উঠে। তাই মনের এই অবস্থায়, এই নিঃসঙ্গ অবসন্ন অবসরে তাঁহাকে দেখিয়া তিনি বিশেষ খুশী হইয়া উঠিলেন। সাগ্রহে বলিলেন—বসুন, বসুন। বলিয়া চৌকীর কম্বলটা টানিয়া দিলেন। যদিও টানিবার দরকার ছিল না তবুও ওই বাহুল্যটুকু না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

আনন্দময় ও তাঁহার সঙ্গী তারণবাবু বসিলেন। আনন্দময় হাসিয়া বলিলেন—বললাম তো মাষ্টার মশায়। কিন্তু ওদিকে আপনার ভাত যে পুড়ে গেল।

চন্দ্রবাবু ভাত নামাইয়া, ফেন ঝরাইতে দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিলেন। আনন্দময়ই আবার কথা আরম্ভ করিলেন—এত রাতে আপনাকে মাষ্টার মশায় বোধ হয় আশ্চর্য্য হয়েছেন। একটু কাজ আছে। আজ রাত্রে না হলে আপনাকে আর কোনদিন একা নিরিবিলি পাওয়া যাবে না। এই তো কাল সকাল থেকেই ভীড় আরম্ভ হবে। তারপর একটু সামান্য চুপ করিয়া থাকিয়া আপনার বক্তব্যটুকু শেষ করিলেন—আপনাদের সিক্‌স্থ মাষ্টার মারা যাওয়ায় একটা পোষ্ট তো খালি হয়েছে। লোকও বোধ হয় একজন নেবেন আপনারা। তা আপনি তারণকে তো পুরোপুরি জানেন—মানুষটিকেও জানেন, ওর সংসারের খবরও আপনার অজানা নয়। এখন ওকে যদি নেন তবে ওর বড় উপকার করা হবে, আমারও হবে। আর একথাও ঠিক যে ওর চেয়ে উপযুক্ত লোক আপনি পাবেন না। আর ও এই গ্রামেরই লোক, সেই হিসেবে ওর একটু বিশেষ দাবীও আছে। এখন সবই তো আপনার হাতে। আপনি একটু ইচ্ছে করলেই হয়ে যায়। আপনার বক্তব্য সুশেষ করিয়া আনন্দময় চন্দ্রবাবুর দিকে চাহিলেন। চন্দ্রবাবু তখন তারণবাবুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া।

তারণবাবু মানুষটি রোগা ফর্সা। একে দুর্ব্বল চেহারার মানুষ, তাহার উপর দীর্ঘকাল সাংসারিক অভাব অনটনের মধ্যে থাকিয়া শারীরিক পুষ্টির অভাবে দুর্ব্বলতর। তাহার উপর মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য দীর্ঘকাল একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে লইয়া ভদ্রলোক বিব্রত। কিন্তু এক সময় তিনি তাঁহার সহপাঠী ও বন্ধু আনন্দময়ের মতই সহজ ও সবলমনা ছিলেন। তখন প্রতি মুহূর্ত্তে আপনার মধ্যে

মানসিক শক্তির সন্ধান বোধ করিতে পারিতেন, প্রয়োজন হইলে সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া কাজে লাগাইতে পারিতেন। তবে এই দীর্ঘ দিনের জীবন-সংগ্রামে ব্যবহারিক জীবনে বার বার কোণঠাসা হইয়া সমস্ত সচেতন সাধুতা ও শক্তি আজ অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার যে পরিমাণ সাধুতা ছিল, কাজ করার ক্ষমতা তেমন ছিল না।

চন্দ্রবাবু চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। আনন্দময়ের কথা শেষ হইবার পরও কিছুক্ষণ মাটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর গভীর চিন্তা হইতে অকস্মাৎ জাগ্রত হইয়া তিনি এক কথায় জবাব দিলেন—আচ্ছা, তাই হবে। তারণ বাবুকে আমি নিলাম। পরশু থেকে তা হ'লে আপনি আসবেন তারণ বাবু। পরশু একটার সময় আসবেন। তবে মাইনে তো জানেন, বেশী নয়, চল্লিশ টাকা।

আনন্দময় উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তারণ বাবুও বন্ধুকে অনুসরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আনন্দময় বলিলেন—আচ্ছা আসি মাষ্টার মশায়। তারণের যে উপকার আপনি করলেন তার পরিমাণ তো আপনি বোঝেন। আর কি বলব! বলিবার আর কিছু দরকার ছিল না। তিন জনের মুখেই যে ভাষা ফুটিয়া উঠিল, যে ভাব প্রকাশ পাইল তাহার পর আর কথা চলে না। তিন জনেই নমস্কার বিনিময় করিয়া কথা শেষ করিলেন। আনন্দময় পথে নামিলেন, চন্দ্রবাবু আলোটা তুলিয়া ধরিলেন, আনন্দময়ের পিছনে তারণবাবুও নামিলেন। চলিতে গিয়া তারণবাবু একবার চন্দ্রবাবুর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্তে চাহিয়া রহিলেন, তারপর আর একটি নমস্কার করিয়া পথে পা দিলেন। আনন্দময় তখন অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছেন, তারণবাবু তাড়াতাড়ি পা চালাইলেন বন্ধুকে ধরিবার জন্য। চন্দ্রবাবু আলো হাতে সিঁড়ির উপর চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়া ডাকিলেন—ওরে গোপাল, উঠে আয় তোরা, খাবি।

খাওয়া হইয়া গেলে পরিপাটি করিয়া পাতা পাতলা বিছানায় চন্দ্রবাবু শুইয়া পড়িলেন। দক্ষিণদিকে মাথা করিয়া শোওয়া তাঁহার চিরকালের অভ্যাস। ছেলে দুইটা শুইয়া পড়িয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, কেবল মাথার উপর দেওয়ালে ক্লকঘড়িটা টক্ টক্ শব্দ করিতেছে। উত্তরের জানালা খোলা। জানালার পাশেই পাকা রাস্তা পূর্ব্ব পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার ওপারে স্কুলের সেক্রেটারী এখানকার প্রসিদ্ধ জমিদার ও ধনী সদানন্দ মুখুজ্জে বাবুদের গেষ্টহাউস। যদিও তাঁহাদের পৈত্রিক বাস এই গ্রামেই, এখন এখানকার বাস উঠাইয়া তাঁহারা সদর সহরে থাকেন। মাঝে মাঝে যখন জমিদারীর কাজে বা সরকারী তদন্তে কি স্কুলের মিটিংএর সময় আসেন তখন ওখানে ওঠেন। তাহা ছাড়া বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারীরাও এখানে আসিলে একবার দুই মাইল দূরস্থিত ডাক বাংলো পর্য্যন্ত মোটর লইয়া গিয়া ফিরিয়া আসিয়া এইখানেই উঠিয়া থাকেন। গেষ্ট হাউসের সামনে কম্পাউণ্ড, ওঁচাল দিয়া ঘেরা জায়গায় মস্ত বাগান। বিদেশী পাম, ঝাউ ও সুপারী গাছে সাজান। গেষ্ট হাউসের গেটের মুখে মস্ত বড় অশ্বত্থ গাছ, তাহারই সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া সমান আয়তনের একটি মধুমালতীলতা উঠিয়া গাছটিকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। চন্দ্রবাবু সেই দিকে চাহিয়া আছেন। আষাঢ় মাসের আকাশ হইতে মেঘ সরিয়া গিয়াছে অনেকক্ষণ, অন্ধকার অতি স্বচ্ছ। অশ্বত্থ ও মধুমালতীর গাছের স্থূল অবয়বগুলি অতি স্পষ্ট। উহার হাতের মত মোটা একটা ডালে একটা কাল ঝুলির মত বেটা ঝুলিতেছে ওটা বোধ হয় এক গোছা মধুমালতী। গোটা গাছটা এ সময়টা ফুলে ভরিয়া যায়। অল্প অল্প বাতাস দিতেছে, তাহার সঙ্গে ভাসিয়া আসা ফুলগুলির গন্ধে গোটা ঘরখানা সুরভিত। অশ্বত্থ গাছের ডালগুলার ফাঁক দিয়া নির্ম্মল আকাশের খণ্ডগুলি হীরার কুচির মত উজ্জ্বল তারায় ভরা। মধ্য আকাশে কালপুরুষের মধ্যে গোটা দুই তারা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহারও ওপাশে একতলা পাকা বাড়ীখানার পিছনের বটগাছের মাথার উপরে সিন্ধোজ্জ্বল সপ্তর্ষি ধ্রুবতারাকে প্রদক্ষিণে রত। উহার মধ্যে বশিষ্ঠ কোনটি? ওই তো ঘুড়ির লেজের মত তারার সারির শেষের আগেরটি—ওইটিই তো বশিষ্ঠ! অরুন্ধতী দেখা যায় না? অরুন্ধতী! অরুণা! প্রথম বয়সে নববিবাহিতা অরুণাকেও তিনি অরুন্ধতী সপ্তর্ষি চিনাইতেন। অরুণাকে আর মনেও পড়ে না! তাহার মৃত্যুর পর কত দিন হইল? অনেক। প্রায় দশ বৎসর। অরুণার মৃত্যুতে তিনি বড় আঘাত পাইয়া-

ছিলেন। আর আজ অরুণাকে মনেও পড়িতেছে না। বার বার তিনি তাহার কোমল মুখখানি মনে করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়িল না। কেবল মনে পড়িল তাহার ঠোঁটের নীচে একটা কাটা দাগ ছিল। মনে না পড়ায় দুঃখও হইল না। এবার বাড়ীতে অরুণার ছবিখানাও ফেলিয়া আসিয়াছেন। এখানে আসিয়া তিনি অরুণার বদলে কত পাইয়াছেন। এখানে এই ছেলেদের মধ্যে, এই অজস্র কর্ম্মের মধ্যে কত সুখ, কত তৃপ্তি, কত শান্তি। এই তো আজ রাত্রে যে কাজটি করিলেন সেটি কত ভাল হইয়াছে। বড় ভাল হইয়াছে। বোধ হইল তারণবাবু বড় কৃতার্থ হইয়াছেন। আনন্দময়ও বিশেষ খুসী হইয়াছেন। তাঁহার সহিত আনন্দময়ের কোথাও যেন মিল আছে? কোথায়? কে জানে? তবে আছে। উদার আদর্শবাদী বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ। তিনি বিশেষ খুসী হইয়াছেন।

ঘুম আসিতেছে। সমস্ত দেহে মনে এক পরম প্রশান্তি সঞ্চারিত হইতেছে। এক অবিচ্ছিন্ন শান্তি।

আনন্দময়ের সহিত যে চরিত্রগত ঐক্যের সন্ধান তিনি পান তাহা মিথ্যা নয়। তবে সে আদর্শবাদ আজ বাস্তবের পৌনঃপুনিক স্পর্শে ম্লান হইয়া অন্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে মাত্র। আনন্দময়ের চরিত্র ও কর্ম্মের মত অমন সহজ সরল রূপটি আর তাহার অব্যাহত নাই। তিনিও কৈশোরে, যৌবনে, এমন কি এখানে শিক্ষকতা করিতে আসিয়াও প্রথমে ব্যবহারিক জীবনের কুটিল পন্থার সহিত একটা মিটমাট করিয়া লন নাই। তিনি এমনি ভাবেই মানুষ হইয়াছিলেন। তাঁহার বাবা ছিলেন সাবডিভিসানাল স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর। তিনি কঠিন চরিত্রের আদর্শবাদী ছিলেন। তিনিও ইংরাজী পড়িয়াছিলেন, ইয়ং বেঙ্গলের যুগের মানুষ তিনি। তবে সমপাঠীদের উল্টা পথে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শে তিনি জীবনকে ঢালিয়া গড়িয়া লইয়াছিলেন। প্রথম জীবনে সন্ন্যাস লইবার ইচ্ছা ছিল। তবে সন্ন্যাসধর্ম্মী ব্রহ্মেন্দ্রের আদেশে ও পরামর্শে সংসারের পথে আসিয়াছিলেন। সংসার তাঁহার ভালও লাগিয়াছিল। চন্দ্রশেখর তাঁহারই প্রৌঢ় বয়সের সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। বাবা তাঁহাকে দেখাশুনা করেন নাই, তাহার অবকাশও তিনি পান নাই, সে মনও তখন আর ছিল না। তখন তিনি পরকালের পরম আহ্বানের জন্য শান্ত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন। তবু সূর্য্যের বিকীরিত উত্তাপে উত্তপ্ত মাটুয়ের মত ছোট ছেলে সুস্থ হইতে পিতাকে দেখিত আর আপনাকে লইয়া আপনার কল্পনায় নবরূপে আপনাকে রচনা করিত। সেইভাবেই কয়দিন চলিল। চন্দ্রবাবু তখন বাবার মতই পরমহংসদেব ও ও বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছেন, সেই কর্ম্মপন্থাই অনুসরণ করিবার কল্পনাও করিতেছেন। এমন সময় সংঘাত আসিল। বৃদ্ধ পিতা তখনও জীবিত। চন্দ্রনাথ এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া রামপুর কলেজে ভর্ত্তি হইলেন, এফ. এ. পড়িতে লাগিলেন। কলেজের প্রথম দুই বৎসরে তিনি যাহা দেখিলেন তাহা তাঁহার কল্পনাঙ্কিত পথ হইতে পৃথক। তিনি আপনার দীর্ঘদিন-সঞ্চিত আদর্শ ও চিন্তাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিলেন। অবশেষে এফ. এ. পাশ করিয়া বি. এ. পড়িবার সময় তাঁহার বিশ্বাসে চিড় খাইয়া গেল।

ইংরাজী তিনি বরাবর ভালই জানিতেন, তিনি ছাত্রও ছিলেন মেধাবী। বি. এ. ক্লাসে প্রথম তিনি ইংরেজী সাহিত্যের স্বাদ পাইলেন। যে ভাবে তিনি মানুষ হইয়াছেন এবং যে ভাবে আপনার জীবনকে গড়িবার কল্পনা তাঁহার ছিল তাহাতে ইংরেজীর প্রতি একটা বিতৃষ্ণা ছিল। 'সনাতন' ভাব ও চিন্তা তাঁহার কিশোর মনে এক অপূর্ব্ব মায়াজাল সৃষ্টি করিয়াছিল। বি. এ. ক্লাসে ইংরেজী কবিতা পড়াইতে আসিলেন যিনি তাঁহার নাম কুইলার সাহেব। কুইলার তখন কলেজের প্রিন্সিপাল। তাঁহাকে ছাত্রেরা প্রায়ই দেখিতে পাইত না। কলেজে সব দিন ক্লাসও লইতেন না। তিনি নাকি অতি মদ্যপ ও অতি মাতৃভক্ত। চন্দ্রবাবু প্রথম দুই বৎসর এফ. এ. পড়িবার সময় তাঁহাকে দেখেন নাই। তাঁহার কথা অনেক শুনিয়াছিলেন, ছাত্রদের মধ্যে কুইলার সাহেবকে লইয়া সপ্রশংস আলোচনার বিরাম ছিল না। তবু তিনি মদ্যপ ব্যক্তির প্রশংসার কথা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত কোন দিন ভাবেন নাই। বি. এ. ক্লাসে প্রথম দিন কুইলার সাহেব কবিতা পড়াইলেন—গ্রের এলিজি। একদিনে চন্দ্রবাবু ইংরেজী সাহিত্যের আর কুইলার সাহেবের ভক্ত হইয়া উঠিলেন। অল্পদিনেই কুইলারের সঙ্গে চন্দ্রবাবুর ব্যক্তিগত

পরিচয়ও হইল। তারপর চলার পথে টেনিসন, রুকার, ব্রাউন হইতে, এডিসন, জনসন্, গোল্ডস্মিথ, বার্ক, মেকলে, কার্লাইল—কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইতে বাকী থাকিল না। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের পাশে বিদেশী সাহিত্যিকরা স্থান করিয়া লইল। আজও ঘরে দক্ষিণের দেওয়ালে মাথার উপর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ছবি টাঙান, আর নীচে বইয়ের শেল্‌ফে ইংরেজী গ্রন্থলেখকদের রচনা সাজানো। তবে আজ দুইয়েরই সামান্য ধূলা পড়িয়াছে। কাজের ভীড়ে ও দুই দিকেই মন দিবার অবসর পান না।

কল্পনা ছিল ভাল করিয়া এম, এ, পাশ করিয়া অধ্যাপক হইবেন, আর দরিদ্র জনগণের শিক্ষায় ও সেবায় জীবন কাটাইবেন। কিন্তু তাহা আর হইল না। বি, এ, পরীক্ষা দিবার পরই বাবার মৃত্যু হইল। সংসারে তখন দুইটি বিধবা বোন, আর বড় এক ভাই। বড় ভাই বিবাহিত, সন্তান অনেকগুলি। তিনি পড়াশুনাও করিয়াছিলেন, ভাল মানুষও ছিলেন, ল পাশ করিয়া ওকালতীও করিতেন। তবে পশার তাঁহার হয় নাই। হইবার কথাও নয়। অন্ততঃ চন্দ্রবাবুর তাই ধারণা। বাবার কঠিন শাসনে তিনি ভাল মানুষ হইতে দুর্বল মুখচোরা ভীরু প্রকৃতির মানুষ হইয়া গিয়াছেন। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পেনশন বন্ধ হইল, সঙ্গে সংসারও অচল। চন্দ্রবাবুকে এখানে পঞ্চাশ টাকা মাহিনায় চাকরী লইতে হইল। ভবিষ্যতের সমস্ত কল্পনা নষ্ট হইয়া গেল, আশার আলো নিভিয়া গেল, সংসারের বিপুল বোঝা অনভ্যস্ত ঘাড়ে চাপিল, দেহ ও মন ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। তবু তিনি দুঃখ পান নাই, আশাভঙ্গের বেদনা মনে আসিলেও মনের জোরে তাহাকে উড়াইয়া দিয়াছেন, কোন দিন হায় হায় করেন নাই। সংসার পালনের গুরুদায়িত্ব পিতৃদত্ত অনুচ্চারিত আদেশের মত মনে করিয়া, হাসি মুখে, প্রসন্ন মনে সুমহান কর্তব্য হিসাবে পালন করিয়া আসিয়াছেন। পঞ্চাশ টাকায় কি হয়! দুই বেলা পাঁচটা টিউশানি করিয়া আয়ের অঙ্কটা বাজের সমান করিতে কি প্রাণান্ত পরিশ্রমই না তাঁহাকে করিতে হইয়াছে! কাজে ফাঁকি দেওয়া তাঁহার স্বভাব ছিল না। অন্য শিক্ষকদের মত হেলা ফেলা করিয়া কি স্কুলে কি প্রাইভেট ছাত্রদের কোথাও পড়াইতে পারেন নাই কোন দিন। সেই নৈতিক দায়িত্ব পালনের পুরস্কার কিছু মিলুক আর না মিলুক, ব্যবহারিক পুরস্কার মিলিল। কিছুদিনের মধ্যেই এসিস্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টারের পদ মিলিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আত্মীয়স্বজনের পীড়াপীড়িতে বিবাহও করিলেন একটি সরল ও সুন্দর গ্রাম্য মেয়েকে। অনিচ্ছায় বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহ করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে সংসারে কত সুখ। কিন্তু সুখ তাঁহার সহিল না। বিবাহের দুই বৎসরের মধ্যে সুখের দিন সঙ্গে সঙ্গে সংসারও শেষ হইয়া গেল। প্রথমেই গেল অরুণা, তারপর দাদার এক ছেলে, দুই মেয়ে। তারপর দুই বিধবা বোন। তারপর দাদার স্ত্রী। দুই বৎসরে সব শেষ। বাকী রহিলেন শুধু দাদা আর তাঁহার আট বছরের ছেলে। তিনি তখন এখানে। একদিন সংবাদ পাইলেন—গৃহ শূন্য, দাদা ছেলেকে লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তিনি আঘাতে আঘাতে বিহ্বল হইয়া গেলেন। তিনি বহুচিন্তা করিয়াও এ পরিণামের কার্য্য কারণ সম্বন্ধ কিছু আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। বিহ্বলতা যখন কিছুতেই কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না তখন কাজ আসিয়া তাঁহাকে বাঁচাইয়া দিল। স্কুলের হেডমাষ্টারের পদ ও তাহার সমস্ত দায়িত্ব তাঁহার ঘাড়ে চাপিল। তিনি বাঁচিয়া গেলেন।

স্কুল-সংক্রান্ত নানান কাজে ব্যাপৃত থাকিয়া, উপরের ক্লাসে ছাত্রদের ইংরাজী পড়াইয়া, বোর্ডিংএর সমস্ত কাজ কর্মের তদারক করিয়া তিনি পুনরায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিলেন। পুরাতন আদর্শ নূতন রূপ পরিগ্রহ করিল। কিন্তু তরুণ বয়সের সে অম্লান উজ্জ্বলতা আর আসিল না। তবু প্রেম পাইলেন, শান্তি পাইলেন, স্বস্তি পাইলেন। হারাইবার আর কিছু না থাকায় দুশ্চিন্তা হইতেও নিষ্কৃতি পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে বহু বিচিত্র অকল্পিত ক্ষুদ্রতার কৃত্রিমতার ও খুটিলতার সঙ্গে সংঘাত হইল। যেখানে পারিলেন সহজে সরাইয়া দিলেন, যেখানে পারিলেন না সেখানে মাথা হেঁট করিয়া তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতে হইল। সেই জীবনই তো চলিতেছে!

সব কিছু সত্ত্বেও তিনি আজ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত! নিজের সম্বন্ধে চিন্তার প্রশ্নই নাই, আর স্কুল সংক্রান্ত সমস্ত কাজ সম্বন্ধেও চিন্তার কারণ নাই। তিনি জানেন তাঁহাকে কি

করিতে হইবে, কোথায় কাহাকে কি বলিতে হইবে, কাল কি কাজ আছে, একমাস পরে কি হইবে।

ভোর হইল। চন্দ্রবাবুর যখন ঘুম ভাঙিল তখন ক্লক ঘড়িটায় পাঁচটা বাজার শেষ ঘণ্টাটির বাজনার রেশ আস্তে আস্তে মিলাইয়া যাইতেছে। এ তাঁহার বহুকালের অভ্যাস। উঠিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ছবির দিকে শান্ত দৃষ্টিতে চাহিলেন এবং প্রণাম করিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইলেন। সোমবার। সোমবার আর শুক্রবার এখানে হাট বসে। এখনও সামান্য অন্ধকার আছে। সাদা কাপড় মোড়া মাথুরগুলি কাঁধে সব্জী বোঝাই ভার লইয়া পাশের রাস্তা দিয়া দিয়া দ্রুতপদে চলিয়াছে। পথের চলন্ত মানুষের দল হইতে পাঁচ সাত জনের একটি দল স্কুল কম্পাউণ্ডে আসিয়া ঢুকিল। সনের ষোল সতের বছরের ছেলে সব। কাহারও গায় পুরাণো সাবান-কাচা সার্ট, কাহারো গায়ে গলাবন্ধ কোট; ঘাড়ে টিনের একটি করিয়া বাক্স—কোনটি একেবারে অতি ঘোর রংয়ে রঙান, কোনটি বা খুব পুরাণো রং চটা, সকলেরই হাতে একটি করিয়া বোঁচকা। সকলেই চার পাঁচ ক্রোশ দূরের গ্রামের চাষীদের ছেলে। এখানে বোর্ডিংএ থাকিয়া স্কুলে পড়ে। চন্দ্রবাবুকে দেখিয়া সকলেই দাঁড়াইল। চন্দ্রবাবু বুঝিলেন সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছে। বেচারারা ভারী বোঝা বহিয়া এতটা পথ আসিয়াছে তাহার উপর আবার ওগুলা এখানে নামাইবে! তিনি বলিলেন—এলি সব? আচ্ছা, এখন যা তোরা। মুখ হাত ধুয়ে বিশ্রাম করে দেখা করবি। তিনিও বারান্দা হইতে নামিলেন।

আস্তে আস্তে সকালের আলো ফুটিয়া উঠিল, হাটের যাত্রীদের পায়ের তাড়নায় উৎক্ষিপ্ত রাঙা ধূলায় আকারহীন বর্ণহীন রৌদ্র আকার ও রঙ ধরিল, স্কুলের বোর্ডিং অজস্র গুঞ্জনং-ধ্বনিতে ভরিয়া উঠিল। চন্দ্রবাবু যখন চৌকীতে আসিয়া বসিলেন তখন বোর্ডিং ও স্কুলের প্রত্যেক ঘরের তালা খোলা হইয়াছে, ঝাঁট পড়িয়াছে, সমস্ত স্কুলবাড়ী উৎসবের দিনে দেবতার মন্দিরের মত পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র বোধ হইতেছে। চন্দ্রবাবু শান্ত প্রফুল্ল মনে কাজে বসিলেন। আজ পড়ার প্রয়োজন নাই, বাজার খরচের খাতা ও ক্যাসবাক্স লইয়া তিনি বসিলেন। হাটে গোলমাল হইতেছে, বোর্ডিংএ চারিদিকে হৈ হৈ শব্দ। এই তো কাল যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছিল, তখন জনহীন এই বিশাল বাড়ীটাকে দেখিয়া মনে হইয়াছিল যেন এখানে আর কোন মানুষে কখনও পদক্ষেপ করিবে না, আর তাহারই দুঃখে সমস্ত বাড়ীটা যেন হায় হায় করিয়া মরিতেছিল। আর আজ সকালে! সুপরিচ্ছন্ন সমস্ত বাড়ীটা রৌদ্রে আজ প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছে। চন্দ্রবাবু চৌকী ছাড়িয়া মাটিতে নামিলেন—এদিকে পথের ভীড় আর এখানে ছেলেদের আনাগোনা। তিনি পিছন ফিরিলেন। ঘড় ঘড় শব্দ হইতেছে। ট্রেণ আসিতেছে। দক্ষিণ দিকের গেট দিয়া তিনি তাকাইলেন। খানিকটা দূরেই লাইন। সেখানে সব আসিয়াছে এমন অনেক ছেলে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। ট্রেণখানা চলিয়া গেল। স্কুলের যাচগাটা পার হইবার সময় অন্ততঃ বিশটি ছেলে ট্রেণ হইতে মুখ বাড়াইয়া হাত নাড়িয়া হৈ হৈ করিয়া বন্ধুদের ও স্কুলকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া গেল। বলিয়া গেল—আসছি—এই তো ষ্টেশন। চন্দ্রবাবু খুশী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ছেলেগুলার ও কি কাণ্ড! অমনি করিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়ায়! যদি একটা পড়িয়া যাইত!

একে একে মাষ্টারেরা আসিলেন। যাঁহাদের দূরে বাড়ী, বোর্ডিংএ থাকেন প্রথমে আসিলেন তাঁহারাই। একে একে সকলে চন্দ্রবাবুর চৌকীতে আসিয়া হাজির হইলেন—সেকেণ্ড মাষ্টার হরিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, থার্ড মাষ্টার কালিকিঙ্কর দাস, ফোর্থ মাষ্টার চিত্তরঞ্জন রায়, ফিফ্‌থ্ মাষ্টার তিনকড়ি মণ্ডল। থার্ড মাষ্টার কালিবাবুই সকলের মধ্যে বয়স্ক, তিনিই আসর জমাইয়া বসেন, আজও বসিয়াছেন। বিশাল চেহারা, সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, মোটা হাড়ের কাঠামো, তাহার উপর তিনি দুর্ব্বল নন। বয়স পঞ্চাশ অনেকদিন পার হইয়াছে, তবু শরীর শিথিল হয় নাই। ফর্সা রং, চমৎকার মুখ চোখ। শরীরের তুলনায় মাথাটা ছোট, নাকটি টিকালো, চওড়া কপাল, পাতলা ঠোঁট। কেবল চোখগুলি ছোট, তাহাতে কখনও অতি প্রখর বা কখনও অতি শূন্য দৃষ্টি প্রকাশ পায়। তিনি অতি বিষয়ী তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি। বৈষয়িক প্রয়োজনে অতি কুটিল পন্থা অনুসরণ করাই তাঁহার স্বভাব। অতি তীক্ষ্ণ ব্যবসায় ও বাস্তববুদ্ধি দ্বারাই তাঁহার সমস্ত কাজ চালিত হয়, অথচ তাহার বিপরীত

রকমের একটা আদর্শ ও তিনি ভালবাসেন। তাঁহার কামনা ও স্বভাব, ইচ্ছা ও কর্ম প্রায় বিপরীতমুখী। তিনি স্কুল পত্তনের প্রথম হইতেই আছেন। সে হিসাবেও তিনি প্রধানতম। ইহা ছাড়া তাঁহার গোপন অহঙ্কারের আরও কারণ আছে। স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে পণ্ডিত মহাশয়কে বাদ দিয়া তিনিই সর্বাপেক্ষা অবস্থাপন্ন। আর তাঁহার ছেলে দুইটি খুব ভাল ছাত্র, দুইজনেই স্কলারসিপ লইয়া ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে, কলেজেও ভাল ছেলে বলিয়া তাহারা তাহাদের সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

সেকেণ্ড মাষ্টার হরিদাসবাবু ঠিক কালিবাবুর বিপরীত। কালিবাবু তাঁহাকে আপনার 'অনুপূরক' বলিয়া মাঝে মাঝে ঠাট্টা করেন। বেঁটে, রোগা, কাল, শান্তশিষ্ট মানুষটি। কোন গণ্ডগোলে নাই, ঝামেলায় নাই, সব কিছু বিশেষ ভাবে বাঁচাইয়া চলেন। তাঁহারও বাড়ীর অবস্থা ভালই, প্রায় কালিবাবুর মত। সর্বদাই একটা না একটা দুশ্চিন্তায় বিব্রত। কালিবাবু তাই লইয়া অবিরাম তাহাকে ঠাট্টা করেন। হরিবাবু মাঝে মাঝে সেগুলি উপভোগ করিয়া হাসেন, কখনও কখনও বা রাগ করিয়া উঠিয়া চলিয়া যান।

থার্ড মাষ্টার চিত্তরঞ্জন বাবু একসময় সুপুরুষ ছিলেন। অল্পবয়সে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় তাহার দেহ ও মন দুইয়ের স্বাস্থ্যই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। স্বভাব হইয়া গিয়াছে অত্যন্ত খিটখিটে। হেডমাষ্টার চন্দ্রবাবুকে বিষম ভয় করেন, আর চন্দ্রবাবুর বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও ছাত্রদের কথায় কথায় প্রহার করেন। তাঁহার ধারণা তিনি সর্বদাই অসুস্থ। অনবরত পেট টিপিতেছেন, আর থু থু করিয়া থুথু ফেলিতেছেন।

ফিফ্‌থ্‌ মাষ্টার তিনকড়িবাবু অপেক্ষাকৃত তরুণ। তিনি এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া এখানেই চাকরী করিতেছেন। সত্যকারের স্বাস্থ্যবান পুরুষ। কাল রং, গৌষ্টবহীন বড় বড় চোখ, পুরু ঠোঁট। তবে মানুষটি বড় নিরীহ, অধিকাংশ সময় চুপ করিয়া থাকেন। চুপ করিয়া থাকার আর একটি কারণ আছে। কথা কহিবার সময় হাত পা নাড়িয়া অঙ্গভঙ্গি করিয়া কথা বলা তাঁহার অভ্যাস। তিনি সে সম্বন্ধে সচেতন বলিয়া যথাসাধ্য অল্প কথা বলেন। তিনি পদমর্যাদায় স্কুলের কনিষ্ঠতমদের একজন, তাহার উপর চন্দ্রবাবু ও কালিবাবু তাঁহার পূর্বের শিক্ষক। কথা কম বলিলেও, নিরীহ গোছের মানুষ হইলেও তিনি অতি বুদ্ধিমান এবং বিশেষ রসিক। চন্দ্রবাবুর ধারণা এ স্কুলে এমন বুদ্ধিমান ছাত্র আর আসে নাই।

তিনকড়িবাবু চৌকীতে না বসিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া আছেন। চৌকীর মধ্যস্থলে কালিবাবু বসিয়া। কথা হইতেছে বর্ষার, চাষের। এক চন্দ্রবাবু ছাড়া সকলেই সংসারী মানুষ, সকলেরই জীবিকার প্রধান উপায় চাকরী নয়—চাষ। এ আলোচনায় সঙ্গে সকলের মন একতারে বাঁধা। বর্ষা এখনও নামে নাই, আকাশে সামান্য সামান্য মেঘ দেখা দিয়া মিলাইয়া যাইতেছে। আকাশের অবস্থা একেবারে শরৎ-কালের মত। সকলেই সে জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত। আলোচনা চলিতেছিল। সকলেই আপনার কথা বলিতেছেন, এমন কি মাঝে মাঝে তিনকড়িও যোগ দিতেছে। শুধু চন্দ্রবাবু চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার ও বিষয়ে কিছু বক্তব্যও নাই, চিন্তাও নাই, প্রয়োজনও নাই। এমন সময় স্নানের ঘণ্টা পড়িল। সকলে উঠিলেন। একটি ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া চন্দ্রবাবুও স্নান করিবার জন্য উঠিলেন। এই একমাসে অনেক কাজ বাকী পড়িয়াছে।

[ক্রমশঃ]

সোভিয়েট তরুণী জোয়া

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস

সোভিয়েট রাশিয়ার খম্‌বোভ্‌ প্রদেশের ছোট একটি গ্রাম। প্রত্যেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ের মুখে একটীমাত্র কথা "What would Zoya do in my place? What must do I be like Zoya?" কি করে জোয়ার মত হওয়া যায়।

আঠার বৎসরের একটী স্কুলের বালিকা আজ সোভিয়েট জাতীয় ইতিহাসে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে রুশো-জার্মান যুদ্ধে। এই বালিকাকে নিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ায় বহু গল্প, কবিতা, ইতিহাস ও রচনা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে। বড় বড় যাদুঘরে বিভিন্ন প্রকারের ছবি রাখা হয়েছে। সোভিয়েট জাতীয়-জীবনে এক অদ্ভুত আলোড়ন এনে দিয়েছে এই আঠার বৎসরের মেয়ে 'জোয়া'।

আট বৎসর বয়সে সাধারণতঃ সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষা সুরু হয়। জোয়া স্কুলে ভর্ত্তি হ'য়েই 'পাইওনিয়ার' দলে যোগ দিয়ে শিশু সমিতির আদর্শ ও কর্ম্মপন্থাকে মনোযোগ দিয়ে শিখতে চেষ্টা করে। এই শিশু পাইওনিয়ার দলের আদর্শ হ'লো —কেউ সিগারেট খেতে পাবে না, মিথ্যা কথা বলতে পারবে না, পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনের কথা অবমাননা করতে পারবে না, কঠোর আত্মসংযম, বন্ধুজন ও দীনে দয়া, সমাজের প্রকৃত কল্যাণের প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হবে। ছোটবেলা হতেই এইসব গুণের একটীরও অভাব ছিলো না জোয়ার জীবনে। তদুপরি সোভিয়েট স্কুলের সর্ব্বোচ্চ নম্বর পেত স্কুলের বিভিন্ন পরীক্ষায়।

দশ বৎসর বয়সে জোয়া পিতৃহীন হবার পর থেকেই সব সময় মায়ের কাছে কাছে থেকে বিভিন্ন ঘরোয়া কাজে যথেষ্ট সাহায্য করতো। বালিকাসুলভ চঞ্চলতার মধ্যে মাকে সব সময় প্রফুল্ল রাখতো। স্বামী-বিয়োগের কোন দুঃখই মায়ের মনে আসতে দিত না। সকল সময় মাকে উৎসাহ ও আশার মধ্যে রাখতো। এই সকল অবস্থার মধ্যে মাতাপুত্রী পরস্পরের স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রইল।

পনের বৎসর বয়সে জোয়া পাইওনিয়ার দল থেকে সোভিয়েট যুব-সংঘ কোম্‌সোমোলে (Komsomol) যোগ দিল। এই সংঘ হতেই সামাজিক ও রাজনীতিক কার্য্য সুরু হয়। অল্প দিনের মধ্যেই জোয়া এই সংঘের বিশেষ কৃতী ও দায়িত্বপূর্ণ সভ্য হয়ে উঠলো।

এক কৃষক পরিবারে জোয়ার জন্ম। বিধবা মাতা একটী কারখানার স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। এত কাজের মধ্যেও জোয়া স্কুল ফেরত মা ও ছোট ভাইয়ের জন্য খাবার তৈরী করে রাখতো। ঘরের সমস্ত কাজকর্ম্ম মা আসার আগেই সে করে ফেলতো, মাকে কিছুই করতে হতো না।

দেশ সেবার মধ্য দিয়ে বিশেষ যশস্বী হবে এই ছিলো জোয়ার সাধনা। বিভিন্ন পল্লী ও কারখানার লাইব্রেরী হতে জোয়া বই সংগ্রহ করে পড়াশুনা করতো। এই বয়সেই সে রাশিয়া, জার্ম্মানী, ফরাসী ও বৃটিশ লেখকদের বিশিষ্ট গ্রন্থ অধ্যয়ন করে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেছিলো। দৈনিক ডায়েরীর মধ্যে সমস্ত কথা লিখে রাখতো। পনের বৎসরের বালিকা জোয়ার ডায়েরীতে লেখা ছিলো—Respect yourself, don't overestimate yourself; don't look yourself in your own shell; don't be one-sided; don't shout that people neither respect nor appreciate you; work hard to develop yourself and you will acquire greater confidence in yourself."

ডায়েরী থেকে বুঝতে পারা যায় ছোটবেলা হতে জোয়ার অনুপ্রেরণা ও আদর্শ। এই ছিলো তার সাধনা। বীর হওয়াই ছিলো জোয়ার দৃঢ় সংকল্প। সমাজ সেবা, অধ্যয়ন ইত্যাদি ছাড়াও সঙ্গীতের প্রতি তার বিশেষ অনুরাগ ছিলো। মায়ের সঙ্গে প্রায়ই থিয়েটার ও সিনেমা দেখতো।

এই বয়সেই জোয়া সেক্সপিয়ারের বিখ্যাত গ্রন্থ Othello-এর উপর মন্তব্য করেছিল—"Man's struggle for high ideals, for moral cleanliness···for victory of man's true and high emotions."

নৈতিক চরিত্র ছিলো তার একেবারে নিখুঁত, স্বচ্ছ,

যৌবনের দৃঢ়তার মধ্যে মা কতবার তাকে গোপনে পরীক্ষা করেছেন নানাভাবে কিন্তু জোয়া প্রতিবারেই জয়ী হয়েছে। বহু গ্রামবাসী, আত্মীয়স্বজনের মেলা ও সিগারেট খাওয়া বন্ধ করেছে স্কুলে, এমন কি মাকে পর্যন্ত কতবার সংযত করেছে। এইভাবে সোভিয়েট জীবনে নানা বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে জোয়া অষ্টাদশ বর্ষে পৌঁছল যুব-সংঘের বিশিষ্ট সভ্য হিসাবে, বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, সংগীতানুরাগী, সমাজসেবিকা ও মায়ের স্নেহময়ী ও সাহায্যকারী হয়ে। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে সমগ্র সোভিয়েট সমাজের বিশেষ কল্যাণ করবে এই ছিলো তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

তারপর সোভিয়েটে আকাশে দেখা দিল কালো মেঘ। সমগ্র সোভিয়েট নরনারী জেগে উঠলো সন্ত্রস্ত হয়ে। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন প্রাতে জার্মানের সোভিয়েট আক্রমণ মলোটভের বক্তৃতার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো সমস্ত সোভিয়েট রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। দেশের এই মহা দুর্দিনের সমাগমে জোয়া স্থির থাকতে পারলো না। ডায়েরীতে লিখলো—Things are going to be changed; life is going to be different. বিদ্যুৎ স্পর্শের মতো সমগ্র সোভিয়েট নরনারী এক মুহূর্তে জেগে উঠলো দেশরক্ষা ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে। জোয়ার সমবয়সী সকল যুবকেরা লালফৌজে দলে দলে ভর্তি হতে চললো মনের আনন্দে। সকলের মুখে এক কথা—"জার্মানকে ধ্বংস করবো, শত্রুকে নিপাত করবো", "পিতৃভূমির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবো"।

নারী জীবনের জন্য জোয়া নিজেকে অত্যন্ত অভিশপ্ত মনে করলো, পুরুষ হলে আজ তাকে কেউ আটকে রাখতে পারতো না। সত্যিই একদিন জোয়া মাকে বললো যে সে সৈনিক হবে, জার্মান মারবে। মা বিশেষভাবে জোয়ার মনের পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন, বুঝতে তাঁর কিছুমাত্র বাকী রইল না যে জোয়াকে আর স্বামী-বিয়োগ-সন্তপ্ত বুকে, সমাজের মধ্যে রাখা সম্ভব হবে না।

শিলাবৃষ্টির মত মস্কোর উপর জার্মানরা বোমা ফেলতে লাগলো। মস্কোর ফায়ার-ব্রিগেডে কার্যরত জোয়া এতে কিছুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে প্রচুর দৃঢ়তার সহিত নিজের কর্তব্য পালন করে গেলো। দিনের পর দিন তার সাহস বেড়ে চললো, কিছুতেই সে আর মনকে সংযত করতে পারলো না। মেয়ের এই দৈনন্দিন অদ্ভুত পরিবর্তনে মা অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হলেন। আঠার বৎসরের জোয়া আর একমাত্র ষোড়শ বর্ষীয় পুত্র সোয়াই তাঁর জীবনের আশার আলো। জাতির ডাকে পুত্র জোয়ার আগেই যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত হয়েছে। জোয়াই বর্তমানে মায়ের নিরাশ হৃদয়ের একমাত্র আশার জ্যোতিঃ।

অল্প দিনের মধ্যেই, স্মলেন্স্ক, কিয়েভ প্রভৃতি বহু নগরীর পতন হলো। কয়েকদিনের মধ্যেই জার্মানরা রাজধানীর খুব নিকটবর্তী হলো। মধ্য রাশিয়ার সমস্ত স্কুল বন্ধ হলো। ফলে সোভিয়েট ছাত্র ও যুবক যুবতী দেশের দুর্দিনে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। কোম্‌সোমোলের নির্দেশক্রমে জোয়া আলু উৎপাদন ক্ষেত্রে গিয়ে কাজ আরম্ভ করলো। কিন্তু তেজস্বিনী তরুণী জোয়া এই কাজে মোটেই সান্ত্বনা পেলো না। সে সত্যিকারের রণক্ষেত্রে যাবে, নিজ হাতে জার্মান ধ্বংস করবে—এই উত্তেজনা তার ভেতর ক্রমেই বেড়ে চললো। আলু উৎপাদন ক্ষেত্র হতে সে মায়ের কাছে ফিরে এলো।

মেয়ের এই উত্তেজনা দেখে মা বললেন—"তুমি যে নিতান্ত বালিকা, তারপর সবেমাত্র শস্যক্ষেত্র থেকে ফিরেছ, সৈন্যদের আহার যোগানের ব্যবস্থাই নারীর প্রধান কাজ।" কিন্তু জোয়া কিছুতেই শান্ত হতে পারলো না। সোভিয়েট বেতারে জাতীয় সংগীতের সুর তার মনকে খুবই নাড়া দিত। মনকে দৃঢ় করলো সে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবেই।

একদিন সকালে সে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মা নিজেকে আর কিছুতেই সম্বরণ করতে পারলেন না। নানা রকম চিন্তা মায়ের মনে দোলা দিতে লাগলো। সন্ধ্যায় জোয়া ফিরে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বললো—"মা, তোমাকে একটা অত্যন্ত গোপন কথা বলবো, শত্রুর কাছাকাছি যাচ্ছি আমি যাচ্ছি, এইটা অতি ভয়ঙ্কর ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ হলেও আমি এই কাজে গর্ব অনুভব করি, যে এই মহৎ কাজটা আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে। তুমি কাউকে এই কথা বলবে না, এমনকি সোয়াকে পর্যন্ত বলবে না। তোমার মেয়ে গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছে এই কথা কোন প্রকারেই কারো কাছে প্রকাশ করবে না।" মা কোন কথা বলতে

পারলেন না। শুধু মায়ের চোখ দুটী সজল হয়ে টপ্ টপ্ করে অশ্রু পড়তে লাগলো, নিজেকে অতি কষ্টে সংযত করে বললেন—"মা, তুমি যে ছেলে নও।" অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত জোয়া বললো—"ছেলে মেয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য কোথায়? নারীরাও ঠিক পুরুষের সমপর্যায়ে গঠিত হয়, মা, তুমি মনকে দৃঢ় করো। এইভাবে কি পিতৃভূমিকে রক্ষা করতে পারবে? গেরিলা বাহিনী স্বেচ্ছাসেবক, স্বেচ্ছায় আমরা পিতৃভূমিকে রক্ষা করবো। মা, তুমি কিছু চিন্তা করো না। সোভিয়েট তোমাকে রক্ষার ভার নেবে।"

'গেরিলা'! এই কথাটী মায়ের বুকের ভিতর হাতুড়ীর মত ঘা দিতে লাগলো। শেষদিনের রাত্রি, পরের দিন ভোর বেলা জোয়া তার ইপ্সিত পথে যাত্রা করবে। মাতা পুত্রী একসঙ্গে বিছানায় পরস্পরের বাহু বন্ধনে শুয়ে-আছে। কিছুতেই মায়ের ঘুম আসে না। বার বার মেয়ের সঙ্গে নানা প্রকার কথা বলার ইচ্ছা হলো। মনে মনে ভাবলেন হয়ত আর দেখা হবে না, হয়ত এইটাই উভয়ের শেষ রাত্রি। খুব সাবধানে মা উঠে বসলেন। জোয়াও জেগে বললো—"তুমি কি ঘুমাওনি মা?" "সময় দেখতে আমি উঠেছি, তুমি ঘুমাও মা, আরও ঘুমাও"। এই বলে মা আবার শুয়ে পড়লেন কিন্তু ঘুম আর আসতে চায় না, মনের কোণে কত প্রশ্নই জিজ্ঞাসু হয়ে উঠলো, কতবার মনে হলো জোয়াকে জিজ্ঞাসা করে। হয়ত এতে তার মতের পরিবর্তন হতে পারে, যদি আমরা মস্কো হতে উঠে অন্যত্র চলে যাই অথবা জোয়া অন্য কোন পরামর্শ দিতে পারে। কিন্তু সকলই বৃথা কোন পরিবর্তন আসবে না।

ছোট ভাই সোয়া কিছুমাত্র জানলো না মাতা-পুত্রীর মধ্যে এই বিরাট তরঙ্গের কথা। সকালেই উঠে সে কারখানায় চলে গেল। দিদিকে একবার দেখে পর্য্যন্ত যায় নি। মাতা-পুত্রী একসঙ্গে চা পান করলেন, জোয়া যাত্রার জন্য তৈরী হতে লাগলো। মা নিজের পশমের সোয়েটার পর্য্যন্ত মেয়েকে দিতে চাইলেন, কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণা জোয়া প্রবল আপত্তি করে বললো,—"গরম সোয়েটার ছাড়া তোমার কি করে চলবে মা?" উত্তরে যাত্রা করলেন। মায়ের এই বিষণ্ণতা দেখে জোয়া বললো—"মা, কি হয়েছে, তুমি অমন হতাশ হয়ে পড়লে কেন? ওকি, তোমার চোখে জল কেন? তোমার চোখের জল আমায় দেখতে দিও না মা, এই শুভ যাত্রায়।" জোর করে মা হাসতে চেষ্টা করলেন। জোয়া সানন্দে বললো—"হ্যাঁ মা, তুমি হাস, তোমার মেয়ের জন্য আজ তোমার গর্ব্ব করা উচিত! বীর হয়ে তোমার কাছে ফিরবো অথবা বীরের মত মরবো এই আমার সংকল্প।"

উভয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে সহস্র চুম্বনের মধ্যে উভয়ের স্নেহকে নিঃশেষ করে দিলেন। জোয়া ট্রামে উঠতেই ট্রাম চলতে সুরু করলো। বহুক্ষণ মেয়ের গন্তিত যাত্রার দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রশ্ন প্রশ্নই রইল। তার সমাধান হলো না। গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা ঘরে ফিরলেন। সত্যিই আজ মা গর্ব্বিত, ধন্য বালিকা জোয়া।

যথা সময়ে জোয়া গেরিলা বাহিনীর নায়কের কাছে এসে তার আগমন সংবাদ জানালো। নায়ক তাকে প্রশ্ন করলো 'তুমি কি ভয় পাচ্ছ না?' জোয়া দৃঢ়স্বরে বললো—'না'। 'রাত্রে একা গভীর জঙ্গলের ভিতর তোমাকে নানারূপ বিপদের মুখে থাকতে হবে, ভয় পাবে না তো?' —'আমি থাকতে পারবো'। 'যদি জার্ম্মানরা তোমাকে বন্দী করে, অত্যাচার করে?' 'আমি অনায়াসে তা সহ্য করবো, প্রাণ থাকতে বিশ্বাস ভঙ্গ করবো না।' বালিকার দৃঢ় চিত্ত দেখে নায়ক সন্তুষ্ট হয়ে তাকে গেরিলা বাহিনীভুক্ত করলেন। জোয়া নাম পরিবর্ত্তন করে গেরিলা বাহিনীতে নাম রাখলেন 'তানিয়া' (Tanya)। অবিলম্বে তাকে মস্কো হতে জঙ্গলে প্রেরণ করা হলো।

তীব্র শীত পড়েছে। সমস্ত জল জমে বরফ হতে চলেছে। জোয়া কোন করণা হতে জল সংগ্রহের চেষ্টায় বের হলো। অনেক দূর গিয়ে দেখলো জার্ম্মানদের একটী ক্যাম্প। চুপি চুপি ক্যাম্পের সমস্ত অবস্থা জেনে আসলো নির্ভয়ে এবং গেরিলা অধিনায়ককে যথাযথ খবর দিলো।

বরফের প্রাচুর্য্য হেতু বহুদিন গেরিলাদের জল খাওয়া হয়নি। জোয়া বহু চেষ্টায় সমস্ত গেরিলাদের খাবার তৈরী করলো। বহুদিন পর গেরিলাবাহিনীর মনের আনন্দে পেট ভরে খাওয়া হ'লো। এই বিপদসঙ্কুল জীবনে সকলে তাকে ধন্যবাদ দিল।

এই সময়ের মধ্যেও সে মায়ের কাছে পত্র লিখে মাকে উৎসাহিত করতো। ক্রমে ক্রমে দুর্দিন ঘোরতর হতে চললো। জার্মানদের তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো, টেলিফোনের তার কেটে দেওয়া হলো। জার্মানদের গতি-রোধ করবার জন্য রাস্তার উপর গোপনে মাইন পেতে আসলো। এই কাজগুলোতে জোয়ার বিশেষ কৃতিত্ব দেখা গেল। জার্মানরা নিকটে সোভিয়েট গেরিলার অস্তিত্ব অনুভব করলো।

রাত্রির অন্ধকারে গেরিলারা দলে দলে জঙ্গল হতে বের হয়ে নানাভাবে জার্মানদের উপর উৎপাত সুরু করলো। সেতু ভেঙ্গে দেওয়া, টেলিফোনের তার কাটা, রসদ লুট করা ইত্যাদি খুব সুনিপুণভাবে চলতে লাগলো। জোয়ার আগ্রহ হলো সে প্রত্যক্ষভাবে জার্মানদের শান্তি ভঙ্গ করবে, তাদের তাঁবুর কাছে গিয়ে। সহকর্মীদের বললো—'আমি যদি মরি তবে দশটী জার্মান প্রাণ নিয়ে মরব।'

দশজন গেরিলা নিয়ে জোয়া চললো নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে পেট্রিস্টসেভো গ্রামে, জার্মানদের একটী প্রধান বিশ্রামকেন্দ্রের কাছাকাছি। অন্যান্য গেরিলাদের অদূরে রেখে জোয়া কয়েকটা বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিলো। অন্য কোন জার্মানদলের সঙ্গে যাতে সহজে সংবাদ আদান প্রদানের অসুবিধা হয় তার জন্য বহু টেলিফোনের তার কেটে দিলো।

পরদিন খোঁজ নিয়ে জানলো জার্মানদের ক্ষতি খুব সামান্য হয়েছে। এই সংবাদে জোয়া নিজেকে অত্যন্ত লজ্জিত মনে করলো, নিজের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে বলে। গেরিলা অধিনায়কের কাছে জোয়া আবার অনুমতি চাইল সেই গ্রামে যাবার জন্য। নায়ক তাকে বললো—'জার্মানরা একটু শান্ত হউক, তারপর যাবে।'

একদিন অপেক্ষা করে জোয়া পুনঃ তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরী হতে লাগলো। পুরুষের পোষাকে নিজেকে সজ্জিত করলো। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি সঙ্গে নিল। তা ছাড়া কয়েকটা বেনজাইনের শিশি, কয়েকটা দিয়াশালাই ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিও সঙ্গে নিল। জামার পকেটে একটী রিভলভার নিল। তাঁবু ছেড়ে যাবার আগে জোয়া একজন বন্ধুকে বললো—'তুমি প্রতিজ্ঞা করো যে, ইতিমধ্যে আমার কিছু হলে তুমি আমার মাকে সংবাদ দেবে।' বন্ধু জোয়ার হাতখানি সজোরে চেপে ধরে বললো—'কি করে আমি তোমার মাকে খবর দেব, তোমার প্রকৃত নাম যে জানি না।' জোয়া দৃঢ়ভাবে বললো—'প্রকৃত নামের কোন দরকার নেই। মস্কোর তিমিরাজেভ জিলা কাম্‌সোমোল কমিটিতে লিখলেই তারা আমার মাকে ঠিক খবর দেবে।' সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুইজন নারী গেরিলাকে সঙ্গে করে জোয়া সগর্ব্বে যাত্রা করলো।

ঠিক পূর্ব্বদিনের মতো একই পথ ধরে জোয়া চলতে লাগলো অতীব সতর্কভাবে সেই জার্মান আস্তাবল পেট্রিস্টসেভো গ্রামের দিকে। ক্রমে জার্মান ক্যাম্পের নিকটবর্ত্তী হতে লাগলো। মধ্যে কোন শব্দ বা কোন প্রহরী চোখে পড়লো না, অন্ধকারে কোথাও একটু আলো দেখা গেল না। নিস্তব্ধ গ্রাম যেন একেবারে মহানিদ্রায় শায়িত। একটী আস্তাবল তার লক্ষ্যপথে পড়লো। প্রায় দু'শতাধিক ঘোড়া সেই আস্তাবলে আছে পূর্ব্বেই সে সংবাদ পেয়েছিল। আস্তে আস্তে পকেট থেকে রিভলভারটা হাতের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে সে আস্তাবলের নিকটবর্ত্তী হতে চললো। তখনো পর্য্যন্ত কোন কিছুর সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। আস্তাবলের কাছে গিয়েই কতকগুলো শুকনো কাঠের উপর শিশি খুলে কিছু বেনজিন ঢেলে দিল। একটী দিয়াশালাই-এর কাঠি জ্বালালো কিন্তু কাঠিটা ভেঙ্গে গেল। পুনঃ দ্বিতীয়বার কাঠি জ্বালবার জন্য হাত ঘুরাতেই কে পেছন হতে হঠাৎ তার হাতখানা সজোরে ধরে ফেললো।

কিছুক্ষণ উভয়ে খুব ধাক্কাধাক্কি সুরু করলো, জোয়া রিভলভারের ট্রিগার টানবার পর্য্যন্ত সুযোগ পেল না। একটা ঝাঁকানিতেই হাত থেকে রিভলভার দূরে পড়ে গেল। একজন জার্মান গার্ড একখানি দড়ি দিয়ে জোয়ার হাত দুখানি পেছনে বেঁধে সংকেত ধ্বনি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জার্মান সৈন্যরা হাজির হলো। নিকটবর্ত্তী এক কৃষকের ঘরে তাকে নিয়ে গেলো। তারা এই "বালকের" মাথার টুপি, জুতা ও অন্যান্য পোষাক সব খোলার পর দেখলো এ বালক নয় একটী তরুণী।

হস্তদ্বয় পেছনে বদ্ধ অবস্থায়, খালি পায়ে ও সামান্য পোষাকে তাকে আর একটী কৃষকের ঘরে নিয়ে গেল। সেটা

জার্মানদের হেড্‌কোয়ার্টার ছিলো। জোয়ার জার্মান ভাষা জানা থাকাতে তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও অভিপ্রায় জোয়া বুঝতে পারলো। কোনপ্রকারের ভান না করে জোয়া একেবারে অবিচলিত রইল। জার্মান কমাণ্ডার তাকে প্রশ্ন সুরু করলো—'কে তুমি?'

'আমি বলবো না।'

'তুমিই কি গতরাত্রে আত্মাবলে আগুন লাগিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার এতে কি উদ্দেশ্য ছিলো?'

'আমি তোমাদিগকে ধ্বংস করতে চাই।'

বহুভাবে গেরিলাদলের অবস্থানের খবর জানতে নানা-প্রকার প্রশ্ন করে কোনও উত্তর পেল না। অষ্টাদশ বর্ষীয়া জোয়া দৃঢ়চিত্তে উত্তর দিলো—"না, আমি কিছুই জানি না, তোমাদিগকে কিছুই বলবো না।" তার উপর চাবুক মারার আদেশ দেওয়া হলো, দশটী চাবুকের পর কমাণ্ডার প্রশ্ন করলো—"এখন বলো তোমার গেরিলারা কোথায় আছে?" কোন উত্তর দিল না। আবার দশটী চাবুক। কিন্তু তেজস্বিনী জোয়া এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না। মনকে আরও দৃঢ় করে ফেললো। পুনঃ পুনঃ চাবুক চললো। সমস্ত পোষাক রক্তে লাল হয়ে গেল। কিন্তু তার চোখ হতে এক ফোঁটা অশ্রু বের হলো না। সমস্ত শরীর ফুলে গেল। কোন গুপ্ত কথা জার্মানরা বের করতে পারলো না। দুঘণ্টা পরে সেই খালি পায়ে ও রক্তাক্ত পোষাকে তাকে অন্য একজন কৃষকের ঘরে নিয়ে গেল। কৃষক-পত্নী জোয়ার এই রক্ত-দেহ দেখে অত্যন্ত দুঃখিত হলো। জার্মান কমাণ্ডারের কাছে মেয়ের মুক্তির জন্য আবেদন করল। তার সমস্ত শরীরে কাল দাগ পড়েছে। চামড়ার উপরে যা হয়ে রক্ত জমাট হয়ে গেছে। রক্তে মাথার চুলগুলি ভিজে একেবারে শক্ত জটা হয়ে গেছে। সমস্ত শরীর ফুলে যথেষ্ট যন্ত্রণা হচ্ছিল, মধ্যে মধ্যে রক্ত বের হচ্ছিল। তবুও জোয়ার মুখে কোন প্রকার বিষণ্ণতার ভাব দেখা গেল না বা আত্মসমর্পণের ইচ্ছাও প্রকাশ পেলনা। পেছনে হাত দু'টী বন্ধ রইল।

জার্মান সেনা জোয়াকে নানাভাবে কটূক্তি করছিলো। কৃষকপত্নী কতবার জোয়ার মুক্তি ভিক্ষা করলো। কিন্তু জার্মান সেনা কোনরূপ সহানুভূতি না দেখিয়ে আরো বেশী গালিগালাজ আরম্ভ করলো। সমস্ত দুঃসহ যন্ত্রণা জোয়া নীরবে সহ্য করে গেল। খালি পায়ে রক্তাক্ত সামান্য একখানি বস্ত্রের আচ্ছাদনে জার্মান সেনার আদেশক্রমে প্রত্যেক ঘণ্টায় প্রায় ২০ মিনিট রাস্তায় অনবরত হাটাহাটি করতে হয়েছিল। জোয়া কোনরূপ প্রতিবাদ করে নাই।

জার্মান গার্ড বদল হয়ে গেল এবং এই সুযোগে কৃষকপত্নী জোয়াকে একটু বিছানায় শু'তে দিবার অনুমতি চাইল। তাকে শু'তে দেওয়া হলো। শু'য়েই জোয়া জার্মানসেনাকে হাত খুলে দিতে বললো। নিতান্ত অসহায়া দেখে তার বন্ধন খুলে দিল। কৃষক-পত্নী একখানা কম্বল তার গায়ের উপর দিল। কৃষক-পত্নী তার পাশে বসে রাশিয়ান ভাষায় জিজ্ঞাসা করলো—"তুমি কে, তোমার মা আছে কি? জোয়া বললো —কেন তুমি জিজ্ঞাসা করছো? তুমিই কি দুদিন আগে এখানে এসেছিলে? বল, কোন ভয় করো না, জার্মানসেনা আমাদের ভাষা বুঝতে পারবে না; তুমিই কি আগুন লাগিয়েছিলে, কেন?" জোয়া বললো—"হ্যাঁ, আমি, এই আমাদের প্রতি, সমস্ত সোভিয়েট নরনারীর প্রতি নির্দেশ—জার্মান মারো, তাদের সমূল সত্তার ধ্বংস করো। আচ্ছা, ক'খানা বাড়ীতে আগুন লেগেছিলো, ক'জন জার্মান মরেছে?" তিনখানা বাড়ী, তাতে ২০টী ঘোড়া আর মাত্র একজন জার্মান মরেছে।" জোয়া বিস্মিত হয়ে বললো—"এত কম, মাত্র একজন!"

অবশিষ্ট রাত্রির জন্য জোয়া ঘুমিয়ে পড়লো।

পরদিন সকালবেলা। বহু জার্মান সেনা, নায়ক, অধিনায়ক এলো। সকলে কত রকম প্রশ্ন করলো। কত লোভ দেখালো। কিন্তু জোয়া একেবারে নিরুত্তর। সে আপত্তি জানাল যে তাকে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় রাখা হয়েছে। জার্মান কর্ণেল জোয়ার সমস্ত পোষাক ফেরৎ দিতে আদেশ দিলো। সমস্ত শরীর এত বেদনা ও যন্ত্রণাময় হয়েছিলো যে নিজের পোষাক পর্য্যন্ত পরতে পারছিলো না। কৃষক-পত্নী তাকে সাহায্য করলো। এর মধ্যেও জার্মানরা প্রশ্ন করতে ভোলে নি, কিন্তু কোনপ্রকার উত্তর না পেয়ে একেবারে আশা ছেড়ে দিলো।

খোলা ময়দানে ফাঁসি-ক্ষেত্র তৈরী হলো। আকাশ প্রদীপের বাঁশের মতো লম্বা দড়ি দিয়ে একটা বাঁশ পোতা হলো। বাঁশের কাছে দু'টী বাক্স একটার উপর একটা রাখা হলো। তার বুকের মাঝখানে বেনজাইনের শিশি দু'টী ঝুলিয়ে দেওয়া হলো এবং একখানা বোর্ডে "বাড়ী ধ্বংসকারী" লিখে তার বুকের উপর ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।

শত শত জার্মান সেনা ও কমাণ্ডার আসল, গ্রামের সমস্ত অধিবাসীকে জোর করে ডেকে আনা হলো সেই ফাঁসী-ক্ষেত্রে। চারিদিকে উত্তম প্রহরী নিয়োগ করা হলো যেন অন্যান্য গেরিলারা এসে তাদের সেই প্রিয়, তেজস্বীনী, প্রকৃত দেশ-অনুরাগিনী 'তানিয়া'কে যেন রক্ষা করতে না পারে। সমস্ত গ্রামবাসীর মুখে বিষাদের ঘনচ্ছায়া। একজন জার্মান সেনা জোয়াকে বাক্সের উপর দাঁড় করিয়ে তার গলায় দড়িটা আটকে দিল। জোয়া শান্তভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলো। সমস্ত অধিবাসী এই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে পিছন ফিরে দাঁড়ালো।

একজন জার্মান অফিসার ক্যামেরার সাহায্যে ফটো তুলবার জন্য 'পোজ্' নিচ্ছিল। এই বিলম্বের সুযোগে জোয়া সমগ্র দেশবাসীকে লক্ষ্য করে বললো—"কমরেডস্, কেন তোমরা এত বিমুখ হয়েছো? তোমরা সাহসী হও, যুদ্ধ করো, জার্মান ধ্বংস করো, তাদের আগুন লাগিয়ে দাও, বিষ দিয়ে মেরে ফেলো।" জার্মান-ঘাতক দড়ি টান দিল। সঙ্গে সঙ্গে জোয়ার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এলো, সেই রুদ্ধশ্বাসে জোয়া বললো —"হে দেশবাসী, বিদায়! যুদ্ধ কর, শত্রু ধ্বংস কর; ষ্টালিন আমাদের সঙ্গে আছে ……"। এই তার শেষ কথা। অষ্টাদশ-বর্ষীয়া সোভিয়েট কৃষক তরুণী জোয়া দেশের মুক্তি কামনায়, পিতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই ফাঁসি-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়ে দড়ির উপর আকাশে ঝুলে রইল। পায়ের নীচে থেকে বাক্সগুলি সরিয়ে ফেলা হলো।

১৯৪১ সালের ৫ই ডিসেম্বর বিদুষী তেজস্বিনী তরুণীর ফাঁসী হলো। ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সে সোভিয়েট আকাশে সেই অবস্থায় ঝুলে রইল। পরম বেদনার সহিত সেই গ্রামের কৃষকেরা কোন প্রকার আড়ম্বর না করে বরফের নীচে তার দেহ অতি যত্নে সমাধিস্থ করলো।*

* ইহা গল্প নহে, সোভিয়েট রাশিয়ার একটি সত্য ঘটনা। বিখ্যাত লেখক ভরিস্ ভিনট্রাসের 'মাদার রাশিয়া' পুস্তক হইতে অনূদিত।

প্যারী

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

ইউ ফ্রিচ্ অন্লি, ইংলিশ? ঐ মঁশিয়ে। জার্মানটির কথার উত্তর দিয়ে একটি ফ্রেন্চ সিগারেট ধরালাম। জার্মানটি আমার সিগারেট টিপ-দেশলাই দিয়ে ধরিয়ে দিয়ে বল্লেন, আপনি হয়ত ভাবতে পারেন আমি একজন ঘোর জার্মান। আমি তা নই, আমি একজন ঘোর ইন্টার-নেসনেলিষ্ট। আপনার এ সম্বন্ধে মত কি? আমি বল্লাম আমার দেশ পরাধীন, যেদিন স্বাধীন হব সেদিন আপনাদের চেয়ে বেশি ইন্টারনেসনেলিষ্ট হব এটা নিশ্চয় কথা। এখন আপনি আমার একটি প্রশ্নের জবাব দিন। আমি জার্মানী বেড়িয়ে এসেছি। হিটলার ইয়ুথ লিগ, যুবক যুবতীদের বিদ্যালয়, মাটির নীচের অস্ত্রাগার, খাদ্যের প্রাচুর্য সবই বুঝতে পেরেছি, কিন্তু এখানে সেখানে বৃটিশ পর্যটক দেখতে পেয়ে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, একজন লর্ডকেও সাইকেলে জার্মানী বেড়াতে দেখে এসেছি। অথচ একটিও পোল্ অথবা সোভিয়েট প্রজা দেখতে পাইনি, তার কারণ কি? ভদ্রলোক কি যেন একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, প্রাহাতে সোকোলদের সংগে আপনার দেখা হয়েছে? আমি বল্লাম, হাঁ মশাই, ব্রতিস্লাভা পার হয়ে যতই এগিয়ে গেছি ততই প্রায় সব স্থানেই সোকোলদের দেখা পেয়েছি। তারা আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেনি। এমন কি আমাদের দেশ থেকে একজন নেতা এসেছিলেন তাঁরও প্রতি নাকি এরা অন্যায় ব্যবহার করেছিল। তিনি ছিলেন সিনসিনে।

নির্বাসিত বিহঙ্গ

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী অনূদিত

[তৃতীয় পরিচ্ছেদ]

শেষে এমন একটা সময় এল যখন হোপের পরিপূর্ণ কর্মোৎসাহ-সত্ত্বেও নিজের উপর নজর দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। সে ভেবে দেখল—এ অবস্থায় শহর ছেড়ে নিজের পল্লীকুটিরে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়াই বেশি প্রয়োজন।

প্রথম প্রথম অল্প অল্প জ্বর হয়, কিছুতেই সারানো গেল না। কারণ শহরে থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও কাজের বিরাম ছিল না, কাজেই তার বিশ্রামের সুযোগও হল না। অন্তহীন কাজ এবং সম্পূর্ণ সফলতাবে সব কাজ না করা পর্যন্ত কিছুতেই সে নিরস্ত হয় না।

সার্জ পালমা অগত্যা অতিরিক্ত কাজের ঝক্কি নিজের উপর নিয়ে শহরের কর্মতারাক্রান্ত বিস্তৃত গণ্ডি থেকে বহুদূরে কৃষ্ণসাগর তীরে শান্ত নিবিড় পল্লীকুটিরে পাঠিয়ে দিল হোপকে এবং কাজের তাগিদে সে নিজেই শহর এবং গ্রামে নিত্য যাতায়াত করতে লাগল।

একদিন শহর থেকে সার্জ একটা চাঞ্চল্যকর খবর নিয়ে বাড়ী ফিরল। সে ভেবে দেখল, এ খবর হোপের কাছে গোপন করেও কোন ফল হবে না—কেন না এ খবর এমনভাবে ইতিমধ্যেই রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে যে, গোপন করার চেষ্টা বৃথা।

ব্যাপার এই :

ওডেসার পুলিশ-সাহেব নিহত হয়েছেন। রাত্রিবেলায় অফিস থেকে মোটরে বাড়ী ফেরবার পথে তাঁর উপর গুলি নিক্ষিপ্ত হয় এবং বাড়ী পৌঁছবার আগেই তিনি মারা যান।

এ ধরণের ব্যাপারে যা হয় : ধরপাকড়ের অবাধ হিড়িক পড়ে গেল। মস্তবড় জাল ফেলা হল বহুদূর ছড়িয়ে কিন্তু আসল মাছ তাতে ধরা পড়ল না—যদিস পাওয়া গেল না মূল আততায়ীর। কিন্তু পুলিশের পক্ষে হাল ছাড়া অগৌরবের—কাজেই চলেছে বিচারের অভিনয় এবং নিরীহের উপর নিদারুণ উৎপীড়ন।

সার্জ যখন এ খবর নিয়ে ফিরল—মহা বিচলিত হয়ে পড়ল হোপ, তার মন উত্তেজনায় ভেঙে পড়ল। দরিদ্র কুলীমজুরদের জন্যে তার যত দুর্ভাবনা।

সার্জ কিছুতেই তাকে শান্ত করতে পারল না। দলের কেউ কেউ হয়ত ইতিমধ্যেই পুলিশের জালে ধরা পড়েছে, আর জালের ফোকর দিয়ে যারা বেরিয়ে গিয়ে এখনও গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে, তারাও হয়ত শেষ অবধি শিকারীর রোষ-নজর এড়াতে পারবে না।

হোপ অবিলম্বে শহরে যাবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল। যদিও তার দৃঢ় ধারণা যে দলের কেউ এই ব্যাপারে জড়িত নয় —তবু সে শান্ত হতে পারল না। এ অবস্থায় তাকে বাধা দিয়ে রাখবার একমাত্র কাজ হল সার্জের। সার্জ এবং বৃদ্ধা মেরিয়া দুজনেই অনেক বুঝিয়ে, বলে কয়ে আপাততঃ নিরস্ত করলেও হোপের মনের উপর দিয়ে বয়ে চলল নিদারুণ দুর্ভাবনার ঝড়।

ঘটনার স্রোত কিভাবে চলেছে সার্জ সে-সব খবর সংগ্রহ করে এনে হোপকে জানাতে লাগল। তার দলের হতভাগ্য যারা যারা জালে জড়িয়ে পড়েছিল, পুলিশের শত চেষ্টা-সত্ত্বেও সন্দেহের অবকাশে অনেকেই ছাড়া পেয়ে গেল। নিহত পুলিশ-সাহেবের স্থলে কর্মভার গ্রহণ করলেন অপর একজন রাজকর্মচারী, এবং ভাগ্য-বিপর্যয়ে এবারেও এমন দুর্ঘটনার সূত্রপাত না হয়, সে ব্যবস্থা সতর্কভাবে সহজেই অবলম্বিত হল। এবং কিছুদিনেই বুঝা গেল, আবার যেন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে।

এভাবে কিছুদিন চলল। সার্জ পালমা এখনও নিয়মিতভাবে পল্লীভবন থেকে শহরে যাওয়া আসা করছে। হোপের শারীরিক অবস্থাও অনেকটা ভালোর দিকে, দলের কাজকর্মও চালানো হচ্ছে সুশৃঙ্খলভাবে। অবশ্য এই সাম্প্রতিক ঘটনায় সতর্ক সাবধান হতেই চলেছে সব-কিছু। কিন্তু এর পরিসমাপ্তি দেখা গেল দ্রুত এবং আকস্মিক ঘটনায়। হোপের সকল বিশ্রাম অবসর শেষ হল—মনের শান্ত নির্মল আকাশে ঘনিয়ে এল অশান্তির ঘনঘটা—সর্বোপরি ভগবানের নির্মম বিধানে হোপের জীবনের সকল আশা-ভরসা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

হোপ পথের দিকে চেয়ে বসে আছে—সার্জ শহরে গেছে

এসেই ফিরে আসবে। কিন্তু সে আর ফিরে এল না—এমন কি কোন খবর পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

হোপের মনে যে ভয়-সন্দেহের নিশাচর পাখী এতদিন গোপনে বাসা বেঁধেছিল, সেদিন তাই যেন গুপ্ত আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এসে তার মস্তিষ্কে নিদারুণ পাখার ঝাপটা মেরে গেল। ঝড় যেন আরও ঘুমুল হয়ে উঠল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটতে লাগল—যখন সার্জের আসার আর কোন সম্ভাবনাই দেখা গেল না, অথচ কোন খবরও এল না—তখন সকল ভয়আশঙ্কা—দ্বিতীবিকা যেন তাকে ঘিরে-এল মড়া-খেকো শিড়কাকের মতো।

বেদনাপ্লুত কণ্ঠে বলল সে: মাথা, সে বুঝি আর বেঁচে নেই।

মেরিয়া সান্ত্বনা দেয়: না মা, অমন কিছু হয়নি। তাহলে নিশ্চয় একটা খবর শোনা যেত। আমার বিশ্বাস—আসার সময়ে হঠাৎ কোন কাজের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে···

—তাহলে নিশ্চয় খবর দিত।—না, সে আর এ পৃথিবীতে নেই···

গ্রামের একজন এসে তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করল। বলল: কোন আকস্মিক ব্যাপারও তো ঘটতে পারে। শহরের পথে এমন বিপদ ঘটা বিচিত্র নয়—কারও জীবন নিরাপদ নয় সেখানে। হয়ত সে হাসপাতালে পড়ে···

—তাহলে তো একবার সেখানে গিয়ে দেখা উচিত···আমি এক্ষুনি যাব···

মেরিয়া বলল: না মা, আজ নয়। দেখা যাক—হয়ত সে এখন আসছে। পথে রয়েছে। আমরা যাব—আর সে এসে এখানে বসে থাকবে।

মলিনমুখে হোপ আবার বলল: না মাথা, সে আর নেই—বেঁচে নেই নিশ্চয়।

বৃদ্ধা মেরিয়া নানা কথায় তাকে বুঝাতে লাগল। হোপ নিজেও নানা যুক্তি দিয়ে মনকে বুঝাতে চেষ্টা করে; অগত্যা ভোর না হওয়া পর্যন্ত কোনরকমে অপেক্ষা করতে রাজি হল।

* * * *

সারাটা রাত বিনিদ্রভাবে দুর্ভাবনায় কাটিয়ে পরদিন ভোরে তারা রওনা হল শহরে। সেখানে গিয়ে দেখে—তাদের বাড়ী পুলিশের কবলে পড়েছে।

কেন সেখানে এত পুলিশ কর্মচারীর ভিড়, কি হয়েছে, বাড়ীর মালিকের কি হোল—অনেক চেষ্টা করেও হোপ কোন খবর সংগ্রহ করতে পারল না।

সার্জ পালমা গ্রেপ্তার হয়েছে—পথচারীদের মুখে মুখে এমনই একটা কথা পাওয়া গেল। কিন্তু আসল ব্যাপার তার চেয়েও গুরুতর।

হোপ নিরুপায়—নিরাশ্রয়, তার সর্বস্ব যেন উজাড় হয়ে গেছে। সে পাগলিনীর মতো ছুটে গেল পুলিশ সাহেবের অফিসে, কিন্তু পুলিশসাহেব সোজা বলে দিলেন—কোন খবর জানান হবে না। হোপের করুণ আবেদনের জবাবে তার কঠোর চেহারায় যেন সহসা আগুনের ফুলকি জ্বলে উঠল। একান্ত গভীর দুঃখের অন্ধকারে তার মনে পড়ল স্বামীর পরিচিত বন্ধু-বান্ধবদের কথা এবং পরিশেষে ক্ষীণ আলোর আভা যেন প্রকাশ পেল তার মনে। কিন্তু শাসকের নিয়মতান্ত্রিক ধরপাকড়ের কঠোরতায় বন্ধুত্বের বাঁধন পড়ল ফুলের উপর তীব্র তুষারপাতের মত।

যেখানে অবিশ্বাসের সন্দেহমাত্রই সাইবেরিয়ার পথ খোলসা করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট, সেখানে যে হতভাগ্যের উপর রাজরোষ পড়েছে, বন্ধুত্বের বাঁধন তাকে কচিৎ বাঁধতে পারে। এক্ষেত্রে বন্ধনে চাই দৃঢ়—সময়ে আবার তাও যায় ছিঁড়ে—আসা-ভরসা আপনি অতলে তলিয়ে যায়।

যে পর্যন্ত তার ক্ষমতা ছিল, আঁধার পথে হোপ কেবল ঘুরাই ঘুরে বেড়াল। শেষে মরীয়া হয়ে জরুরী চিঠি লিখল মস্কো-এ পল প্যাভলফের কাছে। কিন্তু তারও উত্তর এল না। ফলে সে একেবারে ভেঙে এলিয়ে পড়ল। মেরিয়া ওরফে তাকে বয়ে নিয়ে এল মেশের বাড়ীতে।

হোপের বাঁচবার আশা রইল না। মেরিয়া ও তার অনেক আত্মীয়া মৃত্যুর সঙ্গে যুঝাযুঝি করতে লাগল হোপের জীবন নিয়ে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তাদেরই হল জয়। কিন্তু বাঁচা বা মরা—এসবে হোপ তখন সম্পূর্ণ উদাসীন।

কিন্তু হঠাৎ এক অনাগত শিশুর কোমল স্পর্শ যখন সে অনুভব করল—তখন তার দুর্বল বুকে জাগল নোতুন শক্তি, জীবনের স্পন্দন জাগল তার রক্তপ্রবাহে। বেঁচে থাকার এতবড় দুঃখের ভেতরেও সে যেন জেগে উঠল এক অভাবনীয় স্নেহের আকর্ষণে। (ক্রমশঃ)

দেশবন্ধু স্মরণে :

প্রতি বৎসর বাংলার তথা ভারতের স্মৃতি পথে ১৬ই জুন এক মর্মন্তুদ স্মৃতিকে বহন করে আনে। এই দিনটিতেই আমরা দেশবন্ধুকে চিরদিনের জন্য হারিয়েছিলুম। জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন উদারনৈতিক দলের কেদারা-বিলাসে পর্যবসিত হতে চলেছিল দেশবন্ধু সে-সময়ে আবির্ভূত হয়ে তার মোড় এমনভাবে ঘুরিয়ে দিলেন, যে আজ পর্যন্ত আর তাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হয় নি। বিলাসকে তুচ্ছ করে দেশসেবার মহৎ ব্রতে উজ্জীবিত হয়ে তিনি যে দুঃখবরণের পথ বেছে নিয়েছিলেন সে-পথই যে আমাদের মত পরাধীন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে একমাত্র পথ সে বিষয়ে আজ আর কোনো সন্দেহ নেই। এই দুঃখের, ত্যাগের পথ বেয়েই জাতির মুক্তি সাধকেরা এগিয়ে চলেছে। দেশবন্ধুর তিরোধান দিবসের স্মৃতি আমাদের চলার পথের বাধা বিপত্তিকে তুচ্ছ করতে শিক্ষা দিক, আজ জাতির এই কামনা।

মৌলানা আজাদ—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যদের কারামুক্তিতে আমরা সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোহিত রূপে এঁরা দেশমাতৃকার পদতলে নিজেদের সমগ্রভাবে সমর্পণ করেছেন—পরাধীন জাতির ভাগ্যে যে লাঞ্ছনা প্রাপ্য সে লাঞ্ছনাই এঁদের কপালে জয়ের তিলক পরিয়ে দিয়েছে। নিপীড়িত ও শোষিত জাতির মুক্তির প্রতীকরূপে আজ এঁরা এগিয়ে চলেছেন ; এঁদের নমস্কার !

ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জি—ভারত সরকারের আদেশে ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জি সম্প্রতি হাজারিবাগ জেল হ'তে মুক্তি পেয়েছেন। তাঁকে তাঁর দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমরা সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলা দেশে যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় নীরব কর্মী স্বদেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বর্গত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সেই প্রথম সহকর্মীদের মধ্যে যাদুগোপাল প্রধানতম। তাঁর অপূর্ব সংগঠন ক্ষমতা, অসামান্য মনীষা, বিরাট আত্মত্যাগ তাঁকে একদিকে যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের শীর্ষ স্থানে নিয়ে এসেছে অপরদিকে তেমনি বিদেশী শাসকশক্তির রোষ দৃষ্টি তাঁকে অনবরত অনুসরণ করতে বিরত হয় নাই। যতদিন না আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারব ততদিন পর্যন্ত যাদুগোপাল ও তাঁর ন্যায় অপরাপর স্বাধীনতার পূজারীদের এমন নির্যাতন বন্ধ হতে পারে না।

যাদুগোপালের বৈশিষ্ট্য যে তাঁর অসামান্য মনীষা ও সংগঠন শক্তি সহজাত বর্মের ন্যায় তাঁকে আচ্ছাদন করে রেখেছে। আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য যখন স্বায়ত্তশাসন, হোমরুল ও ডমিনিয়নের আদর্শবাদের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, যাদুগোপাল তার বহু পূর্ব থেকে বুঝেছিলেন যে পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া পরাধীন সাম্রাজ্যবাদ-নিষ্পেষিত জাতির মুক্তি সংগ্রামের অন্য কোনো লক্ষ্য থাকতে পারে না। মার্কসবাদ সম্বন্ধে আমাদের দেশবাসীর কোনো ধারণাই যখন নাই বললেই চলে, আজকালকার লাল ঝাণ্ডাওয়ালাদের দলের নেতারা যখন রাষ্ট্রশক্তিকে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে কি ভাবে নিয়োজিত করা যায় সেই চিন্তায় ও চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন ডাঃ যাদুগোপাল তখন তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে নিম্নতম স্তরের বিপ্লবের কথা ভাবছিলেন। যেদিন থেকে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র ভেঙ্গে চুরে গণবিপ্লবের আদর্শের দিকে মুখ ফেরাল যাদুগোপাল সেদিনই বুঝেছিলেন যে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির দিন ফুরিয়ে গেছে—কংগ্রেসকে অবলম্বন করেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম লড়তে হবে। তখন দল রাখা মানে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রাখবার অপপ্রচেষ্টায় কংগ্রেসকে তথা গণ-বিপ্লবী আন্দোলনকে দুর্বল করা। সেইজন্যই তখন তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে মিশে তিনি 'যুগান্তর' দলকে ভেঙ্গে দিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের অগ্রগমনে ভীত সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তি যাদুগোপালকে কখনও ভালো চোখে দেখতে পারে নাই, তাই কংগ্রেসের আগষ্ট প্রস্তাবের অছিলায় তাঁকে কারারুদ্ধ করতে তাদের দ্বিধাবোধ হয় নাই। কারাবাসে তিনি তাঁর স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলেছেন। আমরা আশা করি তিনি সত্বর নিরাময় হয়ে পুনরায় আমাদের পথ দেখাবেন। আমরা তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ওয়াভেল পরিকল্পনা—বহু জল্পনা-কল্পনা অবসান করে' লর্ড ওয়াভেল ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থা সমাধানের জন্য যে পরিকল্পনা দিয়েছেন সে-বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মতামত দেবার সময় এখনও আসে নাই। সাম্রাজ্যবাদী শাসক-সম্প্রদায়ের কোনো প্রতিজ্ঞাতেই শোষিত ও বিজিত দেশবাসী সাধারণতঃ আস্থা স্থাপন করতে পারে না। যে সহানুভূতি ও সহযোগিতার জন্য লর্ড ওয়াভেল দেশের নেতৃবৃন্দের কাছে আবেদন করেছেন, দেশবাসী সে আবেদনকে যে কি ভাবে নেবে তা এখনও সে স্থির করতে পারে নাই। শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি দেশবাসীর আস্থা নেই বলেই আজ ওয়াভেল পরিকল্পনা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাবে কোনো মত দেওয়া চলে না। ভারতবর্ষকে ক্যানাডা প্রভৃতি দেশের মত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেবার ভরসা ইংরেজ সরকার পূর্বেও দিয়েছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ডের শাসকতন্ত্রের সে-বিষয়ে প্রকৃত মনোভাব যে কি সে-কথাও তাঁরা প্রকারান্তরে ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হন নাই। ১৯১৭ সালে যখন ইংরেজ সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য বিব্রত সেসময়ও ভারতবর্ষের সহযোগিতা পাবার জন্য ডমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের একটা আশ্বাস তারা তাঁকে শুনিয়েছিল; পরে ১৯২৯ সালে ভারতবর্ষকে ডমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস দেওয়া যে ইংরেজ সরকারের লক্ষ্য সে-বিষয়ে লর্ড আরউইন স্পষ্ট ঘোষণাই করেছিলেন। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত সে প্রতিশ্রুতি রাখবার কোনো লক্ষণই যে দেখা যায় নাই সেকথা অবিসম্বাদিত সত্য। এই সব প্রতিজ্ঞার মূল্য ভারতবাসী যে এতটুকু দেয় না তার কারণ প্রত্যেক বারেই দেখা যাচ্ছে যে ইংরেজ শাসকতন্ত্রের কর্ণধারগণই এই সব প্রতিজ্ঞাকে তাঁরা কি চোখে দেখেন তা বলতে দ্বিধা করেন না। ১৯২৯-এ লর্ড আরউইনের ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রাক্তন ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেড বিলাতের লর্ড সভায় বেশ খোলাখুলি ভাবেই বলেন যে "No sane man could assign any approximate period for the date on which we could conceive India attaining Dominion Status. No one had the right to tell the people of India that they were likely in any near period to attain the Dominion Status",—অর্থাৎ কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ডমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস্ ভারতবর্ষ কবে পাবে সে বিষয়ে একটা আনুমানিক তারিখ দিতে পারে না। এমন কি তারা যে শীগ্‌গিরই ডমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস্ পাবে ভারতবাসীকে একথা বলবার অধিকারই কারুর নেই। লর্ড আরউইনের ঘোষণা সম্বন্ধে ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের অন্যতম কর্ণধারের এই বিবৃতির ফলে ভারতবাসীরা যদি তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো রকম আশার বাণীতেই প্রলুব্ধ হতে রাজী না হয় তা হলে সেটা কি খুব অবিবেচনার কাজ হয়? শুধু লর্ড বার্কেনহেডই নয়, এক বৎসর পরে উইনষ্টন চার্চিল ঘোষণা করেন, "The British nation has no intention whatever of relinquishing effectual control of Indian life and progress. We have no intention of casting away that most truly bright and precious jewel in the Crown of the King, which more than all our other Dominions and Dependencies, constitutes the glory and strength of the British Empire." এ বিষয়ে বৃটেনের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ষ্ট্যান্‌লি বলডুইনের বিবৃতিও (১৯৩৪) ভারতবাসীর বিস্মৃত হওয়া কঠিন: "It is my considered judgement in all the changes and chances of this wide world today, that you have a good chance of keeping the whole of that subcontinent of India in the Empire for ever." এক দিকে স্বায়ত্তশাসন দানের প্রতিজ্ঞা অপর দিকে শাসক সম্প্রদায়ের কর্ণধারগণের সুস্পষ্ট বিরোধাচরণ—এই উভয়ে মিলিয়া আজ ভারতবাসীকে এই শাসক সম্প্রদায়ের কোনরূপ আশার বাণীতে আস্থা স্থাপন করতে যদি অবিশ্বাসী করে' তোলে, তবে তার জন্য দায়ী কে?

লর্ড ওয়াভেলের পরিকল্পনাতে এই জন্যই আমরা খুব আশান্বিত নই। ইংল্যাণ্ডের সাধারণ নির্বাচনের সময়

শ্রমিকদলের বিপক্ষে রক্ষণশীলদলের নির্বাচন তরীর পালে একটু বেশী হাওয়া দিবার জন্য এই পরিকল্পনা রক্ষণশীলদের একটা নির্বাচনী চাল কিনা সে-বিষয়েও অনেকের মনে সন্দেহ জাগছে। গত যুদ্ধের সময় Home for the Heroes এই বুলিতে যে "খাকী ইলেকশনে" রক্ষণশীলদল জয়লাভ করেছিলেন সে-সব কথা শ্রমিকদল আজ তাদের দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলছে না। যে উইনষ্টন চার্চিল বৃটিশ সাম্রাজ্যকে দেউলিয়া করতে তার হাল ধরেনি, যে উইনষ্টন চার্চিল অ্যাটলান্টিক চার্টার যে ভারতবর্ষের মত পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদ শোষিত দেশবাসীর জন্য নয় বলতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করে নি, সেই চার্চিলের গভর্ণমেণ্ট যখন ওয়াভেলের হাত দিয়ে আমাদের স্বাধীনতার বর পাঠিয়ে দেন তখন আমাদের তার বিরুদ্ধে সন্দেহই দৃঢ়মূল হয়। যে অচল অবস্থা বর্তমানে এদেশের রাজনৈতিক জীবনে আমাদের শাসক সম্প্রদায়ের অনমনীয় সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের জন্য স্থায়ী হয়েছে সে অবস্থা সমাধানের জন্য এই ব্যগ্রতা ঠিক আন্তরিক কিনা সে বিষয়ে দেশবাসী এখনও কোনো প্রমাণ পায় নাই। জুলাই মাসের প্রথম দিকে বৃটেনের সাধারণ নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে তারপর লর্ড ওয়াভেলের পরিকল্পনাকে আমাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসক-শ্রেণী মাঝদরিয়াতে বাণচাল করে দিতে ইতস্তত: করবে কিনা সে-বিষয়েও অনেকের মনে সন্দেহ আছে।

লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আজাদকে পরামর্শ সভায় না ডেকে যে হিসাবের ভুল করেছিলেন তা' তিনি শুধুরে রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন; কিন্তু তাঁর আরেক চালে কংগ্রেস বর্ণহিন্দুদের প্রতিষ্ঠান বলে' পরিগণিত হতে চলেছে। কংগ্রেস যে বর্ণহিন্দু প্রতিষ্ঠান নয় একথা লর্ড ওয়াভেল নিশ্চয়ই জানেন এবং তাঁর পরিকল্পনা যদি সত্যসত্যই ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়ের আন্তরিক শুভেচ্ছার পরিচায়ক হয় তবে এখনই তাঁকে তাঁর পরিকল্পনার এই দুষ্ট দিকটাকে সংশোধিত করতে হবে। মুসলীম লীগকে যেমন নয় কোটি মুসলমানের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করা ভুল, কংগ্রেসকে বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান মনে করা তার চাইতে মারাত্মক অন্যায়। গান্ধিজী একথা প্রথমেই ওয়াভেল সাহেবকে জানিয়েছেন এবং আমাদের আশংকা হয় যে কেবল এই সমস্যার জন্যই ওয়াভেল পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কারণ জিন্না সাহেব সুর তুলেছেন যে তিনি পরিকল্পনার কোন রকম পরিবর্তনেই সায় দেবেন না। এতে সমস্ত পরিকল্পনাটাকে বাতিল করবার দায়িত্ব এখন জিন্না সাহেবের স্কন্ধেই এসে পড়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসক সম্প্রদায়ের হাতে জিন্না সাহেবকে ক্রীড়নক হতে দেখবার আশংকা দেশবাসীর আছে। ধর্মের বিরোধকে বাঁচিয়ে রেখে ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যকে কায়েম রাখা যে কত সুবিধাজনক সে কথা বহু পূর্বেই ইংরেজ বুঝতে পেরেছিল। সেই ১৮৮৮ সালে স্যর জন ষ্ট্রাচি লিখেছেন, "The truth plainly is that the existence side by side of these hostile creeds is one of the strong points in our political situation in India." এবং ইংরেজ শাসনকর্তাদের অনেকেই যে ধর্ম নিয়ে বিরোধ বাঁধলে সুবিধাটা কোন্ দিকের হবে সেটা বুঝতে অক্ষম ছিলেন না, সে বিষয়ে ইংলণ্ডের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড (১৯১০) প্রায় খোলাখুলি ভাবেই বলে গেছেন, "The political success which have rewarded efforts of the (Muslim) League .....have been so signal as to give support to a suspicion that sinister influences have been at work, that the Mahomedan leaders were inspired by certain Anglo-Indian officials, and that these officials pulled wires in Simla and London, and of malice afore-thought sowed discord between the Hindu and Mahomedan communities by showing Mahomedans special favour."

অতীতের ইতিহাস যাই হোক আজ এটা আমাদের কাছে বাস্তব সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে সাম্প্রদায়িকতা এমন একটা স্থান নিয়েছে যে কিছু দিনের মতো তাকে অস্বীকার করা যাবে না; কিন্তু এটাও সত্যি কথা যে দেশবাসীর ভেতর বৈপ্লবিক জাতীয় চেতনাবোধ যতই ছড়িয়ে পড়বে ততই এই সাম্প্রদায়িকতা দূর হয়ে যাবে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আজকে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব যাদের ভেতর সীমাবদ্ধ আছে তারা মুসলমান সমাজের অভিজাত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। এঁদের শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে

সাধারণ মুসলমান সমাজের শ্রেণীস্বার্থের যে সংঘাত তা' এখন চাপাচুপি দিয়ে রাখা চললেও খুব অল্পদিনের মধ্যেই যে তা আত্মপ্রকাশ করবে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। হিন্দু মহাসভা ও ঠিক এরকম অভিজাত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিয়েই গঠিত। হিন্দুদের ভেতর যাদের বৈপ্লবিক জাতীয়তা-বোধ জাগ্রত হয়েছে তারা সবাই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে, মুসলমানদের ভেতরও এই জাতীয় চেতনা বৈপ্লবিকতার ধারা বেয়ে যেমন যেমন চলতে থাকবে তেমন তেমন তারা অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাত মেলাবে কংগ্রেসের প্রাঙ্গনে এসে। ধর্ম ও রাজনীতি যে এক বস্তু নয় একথাটা আজ মুসলমান সমাজের সাধারণ লোকে এখন না বুঝলেও কিছুদিন পরেই দৈনন্দিন স্বার্থের সংঘাতে বুঝতে পারবে। এবং সে-দিনই যে সে কোন্ পথে ঘুরে দাঁড়াবে, তা জিন্না সাহেব জানেন এবং আরো জানেন যে যেদিন এ ব্যাপার ঘটবে সেদিনই তাঁর ও তাঁর অভিজাত সমাজের রাজনৈতিক জীবনের শেষ হবে। সেজন্যই তিনি সর্বত্রই সাম্প্রদায়িক হিসাবে পা ফেলে চলেছেন—যতদিন এমনি করে নিজের যশের তরীকে ভাসিয়ে রাখতে পারা যায়!

যে কেন্দ্রীয় পরিষদের পরিকল্পনা ওয়াভেল সাহেব করেছেন তাতে গলদ আছে বিস্তর। কিন্তু তা' সত্ত্বেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী পরামর্শ বৈঠকে যোগ দিতে রাজী হয়েছেন কারণ এতে রাজনৈতিক অচল অবস্থার জন্য যে কংগ্রেস দায়ী নয় সেটাই সুপ্রমাণিত হবে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ঘটনা-সংঘাতে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেচে যেখানে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষার সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছেন। যুদ্ধের পর চীন সমগ্র এশিয়ায় প্রবল পরাক্রমশালী হতে বাধ্য; ফরাসী ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ডে চীনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য; তার ওপর আছে বর্তমানে জাপ-অধিকৃত ফেডারেটেড মালয় ষ্টেট প্রভৃতি দেশ। এসব দেশেও একটা প্রকাণ্ড গণজাগরণ এই যুদ্ধের ফলে না হয়ে যায় না। পাশ্চাত্য জাতিগুলি যে অজেয় নয়, এই কথাটা বর্তমান যুদ্ধে যে-ভাবে প্রমাণিত হয়েছে তাতে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির 'প্রেষ্টিজ' অত্যন্ত নির্মম ভাবে আহত হয়েছে। এই অবস্থায় ভারতবর্ষে একটা তীব্র অসন্তোষ থাকাটা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে মোটেই সুবিধাজনক নয়। এ সব নানা কারণেই যে চার্চিল গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর কাছে এই পরিকল্পনা দিয়ে ওয়াভেল সাহেবকে পাঠিয়েছেন তাতে সন্দেহ নাই।

রাজবন্দী মুক্তিসমস্যা—ওয়াভেল পরিকল্পনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিত ও বিনা বিচারে আবদ্ধ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে বলে' দেশের লোক আশা করেছিল। সে আশা তাদের পূর্ণ হয় নি। এক বাংলা দেশেই প্রায় ২৫০০ রাজনৈতিক বন্দী আছে। ইহাদের কেহ কেহ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলার দরুণও বন্দী আছেন। ইহা ছাড়া ভারতরক্ষা আইনে বহু রাজনৈতিক কর্মী বন্দী রয়েছেন। এঁদের অনেকেই যদিও কংগ্রেসের কাজে আত্মসমর্পণ করেছেন তবুও ব্রিটিশ ভারতীয় গেষ্টাপো এঁদের ছেড়ে দিতে পক্ষপাতী নয় বলেই এঁরা মুক্তি পাচ্ছেন না বলে দেশের লোকের ধারণা। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, কিরণচন্দ্র মুখার্জি, মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণচন্দ্র গুহ, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, ভূপতি মজুমদার, সুরেশচন্দ্র দাস, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী রমেশচন্দ্র আচার্য্য, অমূল্য মুখার্জি, বীরেন চ্যাটার্জি, জ্যোতিষচন্দ্র ভৌমিক, রসিকলাল দাস, সুনীর রায়, শ্রীমতী বীণা দাশ, কমলা দাশগুপ্তা, উমেশলাল সিংহ প্রভৃতির অনেকেই বহুদিন পূর্বেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এঁদের কেহ কেহ নিজেদের জীবনের প্রায় এক তৃতীয়াংশই, কেহ কেহ তারও অনেক বেশী সময় কারাকক্ষে কাটিয়েছেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মুখার্জি প্রায় ৬০এর কোঠায় পা দিয়েছেন। জীবনের প্রায় ৩০ বৎসর কাল ইনি বন্দীর জীবন যাপন করছেন। কারাকক্ষে যে ভাবে এঁকে জীবন কাটাতে হয়েছে তার ফলে আজ তিনি চিকিৎসকের অসাধ্য রোগে জীর্ণ ও পঙ্গু। শ্রীযুক্তা কমলা দাশগুপ্তা নিদারুণ ক্ষয়রোগে বহুদিন থেকেই আক্রান্ত; সরকারী মেডিকেল বোর্ডের পরীক্ষাতেও এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী হাপানী রোগে বহুদিন যাবৎ কষ্ট পাচ্ছেন। এঁদের বন্দী রাখার কি প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে? সাপ্তাহিক স্বরোচার্চ সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত চক্ষুরোগে বহুদিন থেকে ভুগছেন;—ভূপেনবাবুকে যারা জানেন

তাঁরা সহজেই বুঝতে পারেন যে যিনি সারাদিনরাত লেখাপড়া নিয়েই থাকেন তাঁর চক্ষুপীড়া হলে কি অবস্থা হয়? ভূপেনবাবু, অরুণবাবু, মনোরঞ্জনবাবু, সুরেনবাবু, প্রতুলবাবু প্রভৃতি প্রায় সবাই জীবনের ১৯।২০ বৎসর জেলেই কাটালেন। এঁদের সবারই স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আবার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলায় দণ্ডিত আসামী শ্রীযুক্ত অম্বিকা চক্রবর্তী প্রভৃতি যদিও সাধারণ আইনে দণ্ডিত অপরাধীদের মেয়াদ কাল কারাকক্ষেই কাটালেন তবুও তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয় নাই। রাজনৈতিক বন্দী বলেই এঁদের প্রতি যে এই ব্যবহার হচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এঁরা প্রায় সকলেই রোগজর্জর দেহ নিয়ে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। দোসর 'অরোরা' ও 'লিবার্টি' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সীও অত্যন্ত পীড়িত। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর কথা ত দেশবাসী অবগত আছেনই। এরূপ বহু আছেন; একজনকে ছেড়ে আরেকজনের নাম করা অনুচিত। কেবল দৃষ্টান্ত হিসাবে যাঁদের সঙ্গে দেশবাসী পরিচিত তাঁদের নামই করলাম। এঁদের আটক রেখে তথাকথিত বৃটিশ আইন ও শৃংখলার মর্যাদাও রাখা হচ্ছে না, আর ন্যায় বিচারের মাহাত্ম্যও থাকছে না। আধুনিক রাজনীতিতে এই দুটো জিনিষের মর্যাদা অবজ্ঞা কোনো দিনই নাই। তবুও দেশবাসীর সম্মিলিত প্রতিবাদ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাগ্রত হওয়া দরকার।

একটা কথা এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি সাধারণভাবে রাজবন্দীদের মুক্তি চাই স্লোগানের সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দণ্ডিত আসামীদের জন্য পৃথক ভাবে এক মুক্তি আন্দোলন সুরু করে' সমগ্র রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি আন্দোলনকে এমন এক বিশ্রী পরিস্থিতিতে এনে ফেলেছেন যার তুলনা নেই। চট্টগ্রাম আন্দোলনের দণ্ডিত আসামীরা জেলে থাকাকালীন নিজেদের কম্যুনিষ্ট দলের সভ্য বলে প্রচার করেছেন বলেই কি কম্যুনিষ্ট পার্টি "Pre-Reform Political Convicts"দের মুক্তি আন্দোলন সুরু করেছেন? এমন মনোবৃত্তি যে তাঁদের কতটা নীচে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তা বোঝবার শক্তিও কি তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন? চট্টগ্রাম মামলায় বন্দীদের মুক্তি আমরা নিশ্চয়ই চাই কিন্তু তাঁদের একক মুক্তি আন্দোলনটা যে বৃহত্তর রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি আন্দোলনকে কেমন করে পঙ্গু করে সে কথাটা কি তাঁরা বুঝতে পারেন না? অন্যান্য দলকে বাইরে এলে তাঁদের ভাওতার ব্যবসা তাসের ঘরের মত ভেঙে চুরে যাবে এই আশংকাতেই কি তাঁরা রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি আন্দোলনকে একটা সংকীর্ণ খাতে ঠেলে নিতে চাচ্ছেন?

বস্ত্র সংকট—বাংলাদেশে যত সমস্যাই সংক্রামক রোগের অবস্থা নিতে সুরু করেছে। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা করলে এ অবস্থা না হোয়ে পারে না। দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে বাংলাদেশের যে দুরবস্থা হোয়েছে, সারা জাতির ভবিষ্যৎটাই বহু বৎসরের মত তাতে পঙ্গু ও অথর্ব হোয়ে গেছে। আজ যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ হোতো তা হলে এমন দুর্ভিক্ষ সে হোতেই পারত না সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দেশের লোকে প্রথম থেকেই বলেছে যে এই দুর্ভিক্ষ মানুষের তৈরী। উডহেড কমিশনও প্রকারান্তরে সেকথাই স্বীকার কোরেছেন। এই কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করবার সময় আমরা বলেছিলাম যে কমিশন, কমিটী প্রভৃতি তদন্ত কমিটীগুলি সাম্রাজ্যবাদী শাসক সম্প্রদায়ের শাসিত দেশগুলিকে চোখঠার দেওয়ার যন্ত্র মাত্র। বস্ত্রসংকটে বাংলাদেশের নরনারী যে-ভাবে বিব্রত হয়ে পড়ছে তাতে আমাদের কথার সত্যতাই প্রমাণিত হচ্ছে। রেশনিং-এর ভরসা দেখিয়ে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা যে মর্মান্তিক বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই নয় একথাটা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। আজ দেশে এমন একটা শোচনীয় অবস্থা দাঁড়িয়েছে যখন মেয়েরা বস্ত্রের অভাবে আত্মহত্যা করতে পর্যন্ত বাধ্য হয়েছে। সহরে সহরে অর্দ্ধনগ্নদের মিছিল শাসক সম্প্রদায়ের অকর্মণ্যতাকে যে ভাবে ব্যঙ্গ করছে তাতেও তাদের চৈতন্য হবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। তার কারণ শাসকসম্প্রদায়ের সঙ্গে দেশবাসীর প্রাণের যোগ নেই কোনো দিক দিয়েই। দেশের লোক না খেয়েই মরুক, অসুখে অশ্বিচর্মসার হোক কি বস্ত্রাভাবে নগ্ন হয়ে থাক তাতে দায়িত্ব ত তাদের নয়! ইওরোপে যেখানে যুদ্ধ হয়েছে সেখানেও এমন অনাহার, এমন বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ ত হয়নি।

আর বাংলাদেশে এমন হোল কেন? ইওরোপের মানুষও মানুষ,—সেখানকার মানুষদের ভেতর আমাদেরই মত লোভ আছে, ক্রোধ আছে, মদ আছে, মাৎসর্য আছে: সেখানেও Black Market আছে, মজুতদার আছে—তবুও সেখানের দেশবাসী না খেয়ে কেন মরে না, বস্ত্রাভাবে কেন উলঙ্গ থাকে না। তার কারণ সে-সব দেশ সাম্রাজ্যবাদএর শোষিত দেশ নয়। সাম্রাজ্যবাদী শাসকতন্ত্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, তাদের পদলেহন করে যারা বেঁচে থাকতে চেয়েছে তারাও শাসনের ও শোষণের হাত থেকে মুক্তি পায়নি, পেতে পারে না—কারণ মৃত্যুর করাল দেবতা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট। ধনতন্ত্রবাদের রীতিই এই—বিজিত দেশবাসীকে শোষণ করেই সে বেঁচে থাকে, এর ব্যতিক্রম ঘটলেই তার ধ্বংস অনিবার্য।

বর্তমান বস্ত্রসংকটে আমরা এই চিরাচরিত প্রথার পুনরাবৃত্তিই দেখছি। বস্ত্রসংকট সৃষ্টি করে সঙ্গে সঙ্গে তা নিরাকরণের চেষ্টায় এক গাদা অফিস ও অফিসার নিযুক্ত হ'ল কিন্তু বস্ত্র যে কোথায় তার হিসেব নেই। প্রাদেশিক সরকার দোষ দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের আর কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের। কলকাতা সহরের মধ্যবিত্তদের চেঁচামেচি বন্ধ করবার জন্য ওয়ার্ড কমিটী হল কিন্তু তাদের হাতে যে কাপড় দেওয়া হল তা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই কম। বহুদিন থেকে যে অপ্রাচুর্যের ভিতরে দেশের লোক বাস করে' আসছে তার ফলে আজ দৈন্য চরম অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। সাময়িক প্রয়োজনের অজুহাতে দেশবাসীকে এমনভাবে দৈন্যদশায় ফেলা এক সাম্রাজ্যবাদশোষিত দেশেই হতে পারে। যে দীনতার মধ্যে, অভাবের মধ্যে আমরা আজ এসেছি সে দীনতা অক্সোবাসীর, লণ্ডনবাসীর হয়নি—যদিও তারা যুদ্ধের মধ্যেই জীবন কাঁটিয়েছে। এ-রকম দুরবস্থা অবশ্যম্ভাবী জেনেই কংগ্রেস দেশবাসীকে অল্পবস্ত্র সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হতে প্রথমেই উপদেশ দিয়েছিল। বর্তমানের নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতার ফলে গ্রামগুলির চরম দুরবস্থা হতে বাধ্য। যেদেশের ১০০ জন লোকের ৮৫ জন গ্রামে বাস করে তাদের দুরবস্থা যে সীমাহীন হবে একথা কংগ্রেস বহুপূর্বে বললেও, না গভর্ণমেণ্ট না দেশবাসী সতর্ক হয়েছিল। ভারত সরকার যুদ্ধ প্রচেষ্টার নামে যে নীতির আশ্রয় এদেশে গ্রহণ করলো সে-নীতি যদি ইংল্যাণ্ডে চার্চিল গভর্ণমেণ্ট নিতে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত করত তা হলে সেদিনই তাঁকে তক্তা-তাউসের ওপর থেকে নীচে নেমে আত্মরক্ষা করতে হ'ত। যে-দেশে ইওরোপীয় এসেছিল তার অপূর্ব বস্ত্র সম্ভার আহরণ করতে সে দেশের মেয়েরা ইংরেজ আগমনের আড়াই শ বছরের ভেতরে বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা করছে!

সহরগুলিতে এই বস্ত্রাভাব হয়ত এমন তীব্র থাকবে না, কারণ এটা বড় অশোভন। কলকাতার রাজপথ থেকে মড়ার লাশ ও ভাইবিন-ভিখারীদের দূর করবার যে ব্যবস্থা করে' বড়লাট ওয়াভেল সাহেব সহরকে কেতা দুরস্ত করে' সহরবাসীর ও সঙ্গে সঙ্গে গবরের কাগজওয়ালাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন, সহরের বস্ত্রাভাবও হয় ত সেই একই কারণে শীগগিরই মেটান হবে, গ্রামবাসীদের বঞ্চিত করে। গ্রামবাসী উলঙ্গ থাক তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারদের লজ্জিত হবার কিছু নেই।

আমাদের কম্যুনিষ্ট বন্ধুরা ও উলঙ্গ-মিছিল গঠন করে' তাঁদের চমৎকার সংগঠনীশক্তির পরিচয় দিচ্ছেন, কিন্তু তাঁরা এই মিছিলের লোকদের কি জানিয়েছেন যে তিনশ বছর আগে এই ইংরেজ ব্যবসায়ী এসেছিল আমাদের কাপড় কেনবার জন্য এদেশে আর তিনশ বছরে আমাদের কাপড় তাদের বংশধরেরা এমন করেই নিয়েছেন যে দেশ আজ হয়েছে উলঙ্গ, জননী হয়েছেন দিগম্বরা।

ট্রিয়েষ্টের সমস্যা—যুগোস্লাভ নেতা মার্শাল টিটো জার্মান সৈন্যদলকে বিতাড়িত করে ট্রিয়েষ্ট দখল করায় ইংরেজ মিত্রপক্ষের সামনে একটা অশোভন সমস্যা দাঁড়িয়েছে। গত যুদ্ধের পর অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে অন্যান্যের সঙ্গে যুগোস্লাভিয়া নামে এক নতুন রাজ্য ভার্সাই সন্ধি সর্ত অনুসারে সৃষ্ট হয়। চেকোস্লাভিয়া ও যুগোস্লাভিয়া সৃষ্টি করার ভেতর মিত্রপক্ষের কূটনৈতিক মতলব ছিল যে তারা জার্মানী ও অস্ট্রিয়া উভয়কেই চিরদিন একটা গোলমালের ভেতর রাখবে। জার্মানী ও অস্ট্রিয়াহাঙ্গেরী যদি একসঙ্গে মিলতে পারে তাহলে তা' ফ্রান্সের স্বার্থের পক্ষে কখনও অনুকূল হতে পারে না এটা বুঝেই ভার্সাই সন্ধি সর্তে একটা প্রস্তাব ছিল যে অস্ট্রিয়া ও জার্মান সাম্রাজ্যের

ভেতর কখনও মিলন হবে না। চেকোশ্লোভিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া সৃষ্টি করে' অস্ট্রিয়াকে যথেষ্ট দুর্বল করা হয়। এই পটভূমিকার পটে ইতালি কেন তার মিত্র জার্মানীকে ত্যাগ করে ইংরেজদের সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয় সেটুকু জানলেই মার্শাল টিটো ট্রিয়েষ্ট দখল করে' ইওরোপীয় কূটনীতিক মহলে যে গোলমাল পাকিয়ে তুলেছেন তা বোঝা যাবে।

আড্রিয়াতিক সাগরের সম্পূর্ণ উপকূলটার দিকে ইতালির লোভ চিরদিনই। কিন্তু ঐ স্থানটি ছিল অস্ট্রিয় সাম্রাজ্যের। জার্মানীর সঙ্গে অস্ট্রিয়ারও মিতালি, তাই ইতালিরও সে মিতা, সুতরাং ইতালি বাধ্য হয়েই চুপ করেছিল। ইংরেজ এই সুযোগ নিল—সে লোভী ইতালিকে বলল যে তুমি যদি আমার পক্ষে যোগ দেও তাহলে আড্রিয়াতিকের উপকূলভাগ অস্ট্রিয়ার হাত থেকে কেড়ে' নিয়ে তোমাকে দেব। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে সব স্লোগান ইংরেজ-মিত্রপক্ষ প্রচার করেছিল তার ভেতর বড় স্লোগানটাই ছিল যে কেউ কারো রাজ্য দখল করবার জন্য ঐ যুদ্ধ লড়ছে না। স্লোগানের অর্থই এই—যত বড় গলায় যে কথাটা বলা হয় ঠিক তত বড় কূটনৈতিক চাল দিয়েই ঐ স্লোগানকে নষ্ট করা হয়। পররাজ্য দখল করব না বলে যখন স্লোগান চলছে ইংরেজ কূটনৈতিকের দল তখন ইতালির সঙ্গে এক গোপন সন্ধি চুক্তি করছে যে ইতালি ইংরেজ পক্ষে যোগ দিলে আড্রিয়াতিক উপকূল ভাগ অস্ট্রিয়ার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তাকে দেওয়া হবে। এতেই প্রলুব্ধ হয়ে ইতালি জার্মানীর পক্ষ ছেড়ে ইংরেজের দলে যোগ দেয়। কিন্তু যুদ্ধ যখন মিটল তখন চারদিকে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। অস্ট্রিয়াকে একেবারে ধ্বংস করাটা তখন সমীচীন মনে হোল না। ইতালিকে আড্রিয়াতিকের উপকূল ভাগ দিয়ে তার নৌবাণিজ্যকে প্রতিপত্তিশালী করে তোলাটা ইংরেজ খুব পছন্দসই মনে করে নাই। ইতালিকে দেওয়া হল ট্রিয়েষ্ট বন্দর ও ট্রেন্টিনোর খানিকটা। কিন্তু আসলে এই জায়গাটা ছিল স্লাভ জাতির; উনবিংশ শতকে যে জাতীয়তাবাদ সমগ্র ইওরোপে একটা নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছিল স্লাভদের মত বৃহৎ ও সুপ্রাচীন জাতিও তার প্রভাব থেকে মুক্ত হয় নাই। তাই সন্ধি সর্ত যখন এই জাতীয়তাবাদকে সর্বত্র স্বীকার করে নিচ্ছিল সে সময়ে স্লাভদের একটা বিশিষ্ট অংশকে এমন করে' ইতালির অধীন করা যে ভবিষ্যতের জন্য বিপদ সৃষ্টি করার নামান্তর সে কথা ইওরোপের রাজনীতিকরা বুঝেও বুঝলেন না।

বর্তমান যুদ্ধের পর মার্শাল টিটো যুগোশ্লোভিয়ার ওপরে ট্রিয়েষ্ট ও আড্রিয়াতিক উপকূলের অনেকটা দখল করায় ইংরেজ ও ফ্রান্স একটা মহা সমস্যায় পড়েছে। এবারকার ইওরোপীয় যুদ্ধে যে-যে রাষ্ট্র যে-যে স্থান দখল করেছে সেই-সেই রাষ্ট্রের ওপর সে-সব স্থান, ভবিষ্যতে একটা সুনির্দিষ্ট সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত, শাসন করার প্রথা স্বীকৃত হওয়ায় মার্শাল টিটো ট্রিয়েষ্ট দখল করে সে-জায়গা ছাড়তে প্রস্তুত হন নি। কিন্তু মিত্রপক্ষ এ প্রস্তাবে সম্মত হতে পারেন নাই। এর নানা কারণের মধ্যে দুটি কারণ খুব সহজেই মনে পড়ে। একটি হচ্ছে যুগোশ্লাভিয়া নিজেদের স্লাভ আত্মীয়দের ত্যাগ করতে না-ও চাইতে পারে। ফলে ইওরোপের ভবিষ্যৎ হিসাব নিকাশের সময়ে এই নিয়ে একটা গোলমালের সৃষ্টি হওয়া বিশেষ আশ্চর্যের কথা নয়। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটাই সব চাইতে বড়। সেটা হচ্ছে আড্রিয়াতিক উপকূলে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার। সোভিয়েট রাশিয়ার একটা বৃহৎ অংশ স্লাভ; মার্শাল টিটো স্লাভ ও কম্যুনিষ্ট মতে বিশ্বাসী। মার্শাল টিটোর আড্রিয়াতিক উপকূলে প্রভাব বিস্তার অর্থই সেখানে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার। ইংরেজের মন এই অবস্থায় সায় দিতে পারে না, কারণ এর ফলে একদিকে দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপে কম্যুনিজমের বিস্তার, অপরদিকে ভূমধ্যসাগরে সোভিয়েট রাশিয়ার মত একটি পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ। বর্তমান যুদ্ধের ফলে ইওরোপে যদি কোনো রাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত হয়ে থাকে সে রাষ্ট্র হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়া। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় সাম্রাজ্য কোনো দিন সৃষ্টি হয় নাই—এবং এর গঠন প্রণালী এমন নতুন ধারায় তৈরী যে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিঘ্ন ও বিপদ এতে নেই—আছে তার সবটুকু সুব্যবস্থা। কোনো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রই এজন্য সোভিয়েট রাশিয়াকে পছন্দ করতে পারে না। এবং ট্রিয়েষ্টের সমস্যা এজন্যই ইওরোপের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দিক নির্ণয় করে। মার্শাল টিটো ইংরেজের সঙ্গে খানিকটা আপোষ করলেও শেষ পর্যন্ত ট্রিয়েষ্ট

যে ইওরোপীয় কূটনীতির মহলের একটা সমস্যা হয়ে থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মধ্য প্রাচ্য সমস্যা—ইতালি যেদিন আবিসিনিয়া দমন করতে রওনা হয়েছিল, জাপান যেদিন মাঞ্চুকুয়ো দখল করেছিল লীগ অভ্ নেশনসের মৃত্যু সেদিনই হয়েছিল। কিন্তু তার প্রেতাত্মা এখনও সাম্রাজ্যবাদীদের কাঁধ থেকে নামে নাই। ফ্রান্স লীগ অভ্ নেশনস থেকে সিরিয়া ও লেবাননের ম্যাণ্ডেট পেয়েছিল—এবং সেই ম্যাণ্ডেটকে বজায় রাখতে বর্তমান ফ্রান্সকে যে ঝঞ্ঝাটের ভেতর দিয়ে পথ চলতে হচ্ছে সে কথা সংবাদপত্র পাঠকেরা জানেন। মধ্য প্রাচের জাতিগুলিকে পাশ্চাত্য জাতিগুলির অধীন করবার যে হীন চেষ্টা ম্যাণ্ডেট প্রথার সাহায্যে করা হয়েছিল বর্তমান যুদ্ধে ফ্রান্সের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে সেই অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত হবার জন্য সিরিয়া ও লেবানন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইংরেজের সাম্রাজ্যিক স্বার্থও কম নয়। সেখানকার আরবজাতিগুলি ইংরেজ ও ফরাসীর সাম্রাজ্যিক বিরুদ্ধে স্বার্থের সুযোগ নিয়ে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে চাইছে। ফরাসী যেখানে দণ্ড নীতির সাহায্যে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চায় সুচতুর ইংরেজ সেখানে সাম ও ভেদ নীতির পন্থা অবলম্বন করে মধ্যপ্রাচ্যে ফরাসীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। একদিকে ফরাসীকে সে বলছে যে তুমি অস্ত্রত্যাগ কর, অন্য দিকে সিরিয়া ও লেবাননকে বলছে যে এস, তোমাদের ও ফরাসীদের ভেতর বিবাদকে এক মধ্যস্থ সালিসী কমিটির হাতে দেও—তোমাদের ভেতর একটা আপোষের চেষ্টা করি। ফরাসী এতে রাজী হয় নি; সে ইংরেজকে অসুবিধায় ফেলবার জন্য বলছে যে কেবল সিরিয়া লেবানন কেন, এস সমগ্র মধ্য প্রাচ্যের সমস্যাকেই এক আন্তর্জাতিক বৈঠকের হাতে দেওয়া যাক্। ফরাসী জানে ইংরেজের দুর্বলতা কোথায়? মধ্যপ্রাচ্যে নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে কাউকে ইংরেজ কোন প্রশ্ন করতে দিতে পারে না;—তাই ফরাসীর প্রস্তাব ইংরেজ প্রত্যাখ্যান করেছে। মিশরে আরব লীগ নামে আরব রাষ্ট্রগুলির সভা সমগ্র আরব জাতির ভাগ্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করছে তারা যে ফরাসীর বিরুদ্ধে ইংরেজের প্রথম চালে ইংরেজের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ইংরেজের সাম্রাজ্যিক স্বার্থ মধ্যপ্রাচ্যে ফরাসীর চাইতে যে অনেক বেশী সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এমতাবস্থায় আরব লীগকে সতর্ক ভাবে পা ফেলতে হবে। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার যে প্রস্তাব ফরাসী করেছে সেই বৈঠকের আলোচ্য বিষয় যদি মধ্যপ্রাচ্যের স্বাধীনতা সম্বন্ধে হয় তাহলে আরব লীগের উচিত হবে ফরাসীর প্রস্তাবে সায় দেওয়া। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ—ইংরেজ, ফরাসী, মার্কিন, সোভিয়েট রাশিয়ার সাম্রাজ্যিক স্বার্থ—মধ্যপ্রাচ্যে যেমন করে' কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তাতে ভবিষ্যতে আবার তুমুল ঝঞ্ঝার আশংকা করা বিশেষ অমূলক হবে না।

মৈমনসিংহে ছাত্র কেডারেশন: বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের যে অধিবেশনটি সম্প্রতি মৈমনসিংহে হয়ে গেল সেটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল এই অধিবেশনের সভাপতি হয়েছিলেন। ভূপেন বাবু কিছুদিন গুপ্ত বৈপ্লবিক কর্মী হিসাবে নাম কিনে ছিলেন। এবং সে-কারণেই যে ছাত্র ফেডারেশনের ছেলেরা তাঁকে সভাপতি করেছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কর্মী ও নেতার ভেতর যে তফাৎ সে-কথা ছেলেরা ভূপেন বাবুর বক্তৃতা পড়ে বুঝেছে। চিন্তাশক্তির এমন দীনতার পরিচয় আমাদের দৌভাগ্যক্রমে খুব কমই পাই। তিনি ছেলেদের জুতার পালিশ ও দাঁতের মাজন তৈরী করে স্বদেশ সেবা করতে বলেছেন; কিন্তু চরকাকে বলেছেন 'পরাজিত মনোভাবের প্রতীক'। যে দেশের দেশবাসীর দৈনিক আয় চার আনা কি পাঁচ আনা সে-দেশের কজন লোকে জুতো পরবার সৌভাগ্য রাখে সেকথা বক্তৃতা লিখবার সময় সান্যাল মশাইর নিশ্চয়ই খেয়াল ছিল না। এঁদের চিন্তার গণ্ডী কেবল এঁদের নিজেদের মধ্যবিত্ত সমাজের চারদিকে—তার বাইরে যে বৃহৎ জগৎ আছে তার সংবাদ এঁদের মত লোকের মনের আনাচে কানাচে খুবে হয়ত বেড়ায় কিন্তু তাদের সত্যিকার সমস্যা এঁদের প্রতিনিয়ত আচ্ছন্ন করে' রাখে না। যে অর্থনীতিকে চরকা আজ কায়েম করতে চাচ্ছে সে অর্থনীতি যে কতবড় একটা বৈপ্লবিক অগ্রগমনের সূচনা করে সে কথা বোঝবার সামর্থ্য এদব লোকের নেই। বৈপ্লবিক পরিণতি বলতে নিজেদের সংকীর্ণ শ্রেণীর স্বার্থের

উন্নতি কিন্তু দেশের সর্বব্যাপী জনসাধারণের স্বার্থের বিষয়ে যারা ভাবতে অক্ষম তারাই চরকাকে 'পরাজিত মনোবৃত্তির প্রতীক' বলে নিজেদের অদূরদর্শিতার পরিচয় দম্ভের সঙ্গে দিতে পারে। ভূপেন বাবুর বক্তৃতা তাঁর চিন্তাজগতের অপরিণত অবস্থার পরিচয়ই দেয়।

ছাত্র ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষ যদি ভূপেন বাবুর মতকে সমর্থন করেন তা হলে বুঝতে হবে যে এঁরা খুব শীঘ্রই প্রতিক্রিয়াশীল দলের সঙ্গে যোগ না দিয়ে পারবেন না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে সর্বদেশে ও সর্বকালে একদিকে যেমন প্রতিক্রিয়াশীল দল বেরিয়ে এসেছে অপরদিকে আবার এই শ্রেণীই বিপ্লব-যজ্ঞের ঋত্বিক সৃষ্টি করেছে। ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্ব কি প্রতিক্রিয়াশীল অ্যামেরি-মোসলি-চার্চিলকে আদর্শ করবে, না, তাঁরা জনগণের সামগ্রিক স্বার্থকে নিজেদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বার্থের উপরে দেখবেন? ছাত্র ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষের পরিষ্কার ভাবে নিজেদের পরিচয় দেবার সময় এসেছে। এই সম্মেলনে তাঁদের বর্তমান নাম পরিবর্তন করে' 'ছাত্র কংগ্রেস' নাম গ্রহণ করা তাঁদের অঙ্গীকৃত কর্তব্যের মধ্যে ছিল; তা' তাঁরা করেন নি। বাঙ্গালার ছাত্রদের দৃষ্টি আমরা এদিকে আকর্ষণ করছি। ছাত্র ফেডারেশনের [illegible] আশা করি তাঁরা তত্ত্বের উপর ভর করে চলবার দীনতা থেকে নিজেদের মুক্ত করবেন।

আগামী নির্বাচন—বাংলায় খুব শিগগীরই সাধারণ নির্বাচন হবে। সেজন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতের ব্যবস্থা সর্বত্র সুরু হয়ে গেছে। ভোট দেওয়া প্রত্যেক দেশবাসীর একটী মৌলিক অধিকার। আমরা আশা করি বাংলার [illegible] কংগ্রেস কর্মীগণ এ-বিষয়ে অবহিত হয়েছেন।

আমাদের কথা—সংবাদপত্রগুলির 'নিউজ প্রিণ্ট' কাগজ অধিক পরিমাণে পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও পেয়েছি। সেজন্যই 'মন্দিরা'র আয়তন আমরা বৃদ্ধি করেছি। 'মন্দিরা'য় এখন থেকে নিয়মিতভাবে দু'টি উপন্যাস এবং জাতীয়তা-বাদী লেখকদের প্রবন্ধ বেরুচ্ছে। আমরা আশা করি সব দিক দিয়েই আমরা 'মন্দিরা'র আরো উন্নতি-বিধান করতে সমর্থ হব।

যাঁরা কবিতা পাঠান অনুগ্রহ করে তাঁরা নকল রেখে পাঠাবেন। অমনোনীত কবিতা ফিরে দেওয়া থাকলেও আমরা ফেরত পাঠাতে অক্ষম।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা'র কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রগতি

৩য় বর্ষ | শ্রাবণ—১৩৫২ | ৪র্থ সংখ্যা

ভারতের কৃষক মজুর ও শ্রেণীতত্ত্ব

শ্রীসুবোধ ঘোষ

ভারতবর্ষে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠনের কাজ চলেছে। এই সম্পর্কে অনেক সঙ্ঘ সমিতি সভা ও ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে। যাঁরা এই সব ইউনিয়ন ও সঙ্ঘের উদ্যোক্তা সংগঠয়িতা বা কর্মী তাঁরা নিশ্চয় মনে করেন যে কৃষক ও শ্রমিকের জন্য এই রকম বিশিষ্ট এবং ভিন্ন প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত। কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই এই আয়োজন।

ভারতবর্ষের কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের এই উদ্যোগ ও সংগঠনের মধ্যে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। উদ্যোক্তারা প্রায় সকলেই অ-কৃষক এবং অ-শ্রমিক।

যাই হোক্, এই সব উদ্যোক্তাদের যদি প্রশ্ন করা যায়,—কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য এই ধরণের ভিন্ন সংগঠনের প্রয়োজন কি? সর্ব্বসাধারণের স্বার্থ (অথবা 'মঙ্গল') প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে যদি কোন সংগঠন থেকে থাকে বা করা হয়, তার সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিকেরাও সামিল হয়ে থাকলে দোষ কোথায়? কি ক্ষতি?

সচরাচর একটী কথা দিয়ে তাঁরা উত্তর দেন—শ্রেণীস্বার্থ। অর্থাৎ কৃষক ও শ্রমিকদের শ্রেণীগত একটা ভিন্ন স্বার্থ আছে। সেই জন্য কৃষক ও শ্রমিক একান্তভাবে এমন কোন একটী প্রতিষ্ঠানের ওপর সমস্ত আস্থা রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারে না, যার মধ্যে তাদেরই শোষক ব্যক্তি বা দল আছে। একজন শোষক-ব্যক্তির স্বার্থের প্রশ্ন আর একজন শোষিত-ব্যক্তির স্বার্থের প্রশ্ন একই সঙ্ঘের প্রকৃতির মধ্যে ঠাঁই পেতে পারে না, কেননা এই উভয় 'স্বার্থ' সহযোগী নয়, প্রতিযোগীও নয়—বলা যায়, পরস্পর-বিরোধী।

কৃষক ও শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্যোক্তা এবং কর্মীদের যুক্তি আমরা শুনলাম। এর পর, যে সকল প্রশ্ন একে একে আমাদের সম্মুখে আসে, সেগুলি আমরা বিবৃত করি। তারপর বিচার।

প্রশ্নগুলি সবই অতি সাধারণ ও প্রচলিত কতকগুলি কথা নিয়ে। শোষক কে? শোষিত কে? সমাজ কাকে বলি? শ্রেণী (class) কি?

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত প্রত্যেকটী কথার অর্থনৈতিক তাৎপর্য্যটাই বড়। অর্থনৈতিক ভিত্তিতেই সর্ব্বসাধারণের জীবনে যে অবস্থাগত শ্রেণীভেদ ও তারতম্য হয়েছে, এগুলি তারই সংজ্ঞাবাচক শব্দ। কৃষ্টিগত কুল গোত্র বর্ণ জাত ইত্যাদি ভেদ হিসাবে এই সব পর্য্যায় নির্ণীত হয়নি।

শোষক কে? এই প্রশ্নকে বড় বেশী ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। অপরের শ্রমের ওপর যিনি নিজে পুষ্ট ও সম্পন্ন হয়ে ওঠেন, তিনিই শোষক। অপরের শ্রমার্জিত সম্পদ যিনি আত্মস্থ করেন তিনিই শোষক। এই হিসাবে আমরা বলি—জমিদার প্রজার শোষক, মিল-মালিক—মজুরের শোষক ইত্যাদি।

সমাজ ও রাষ্ট্রের আইনের সাহায্যেই জমিদার প্রজাকে শোষণ করেন, মিল-মালিক মজুরকে শোষণ করেন। সুতরাং,

এই সঙ্গে আর একটা সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—শোষণ-ব্যবস্থা নামে একটা ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে। এই ব্যবস্থারই দৈনন্দিন প্রসেস বা ক্রিয়া হিসাবে শোষক এবং শোষিত নিজ নিজ কাজ করে যায়, জীবন যাপন করে।

কৃষক এবং মজুর উভয়েই শোষিত, অতএব উভয়ে কি একই শ্রেণীর? যদি বলা যায় কৃষক ও মজুর উভয়ে একই শ্রেণীর, তবে উভয়ের ভিন্ন সংগঠন হবার প্রয়োজন কি?

উত্তর হতে পারে—এই উভয় শ্রেণীকে শোষণের রীতি ভিন্ন রকমের। সুতরাং দুই ভিন্ন ধরণের শোষণের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য দুই ভিন্ন ধরণের কর্মপন্থা নিয়ে দুই ভিন্ন সংগঠন প্রয়োজন।

এই উত্তর মেনে নেওয়া যাক্। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা উদাহরণ সামনে দাঁড় করাই:

মহাজনেরা শোষক। মহাজনের দ্বারা যারা শোষিত তারা খাতক। মহাজন দ্বারা খাতকের শোষণের প্রক্রিয়া ও রীতি ভিন্ন ধরণের। সুতরাং 'খাতক' ইউনিয়ন গঠনের প্রয়োজন নেই কেন?

কিন্তু খাতকদের মধ্যে কৃষক ও মজুর উভয়ই আছে। কৃষক একটা শ্রেণী, মজুর একটা শ্রেণী, এবং উভয়ে মিলে খাতক নামে একটা শ্রেণী—তা'হলে কি এই রকম একটা সিদ্ধান্ত করা উচিত? যদি তাই বলা হয়, তবে 'শ্রেণীর' বৈজ্ঞানিক অর্থ আর থাকে না।

এখানে একটা পাল্টা জবাবও কেউ দিতে পারেন; খাতক-কৃষকের সমস্যা কৃষক-ইউনিয়ন বা সঙ্ঘেরই সমস্যা। খাতক-মজুরের সমস্যা মজুর-ইউনিয়নেরই সমস্যা। কৃষক ও মজুরের নানা সমস্যার মধ্যে খাতকতার সমস্যাও একটা। সুতরাং এই সমস্যাকে ভিন্ন করে দেখার প্রয়োজন নেই। কৃষক সঙ্ঘ দেখবে খাতক-কৃষকের দুঃখ দূর করার পথ। মজুর সঙ্ঘ দেখবে খাতক-মজুরের দুঃখ দূর করার পথ।

আবার মেনে নেওয়া গেল, এই যুক্তি সত্য ও সঙ্গত। কিন্তু এই মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা সিদ্ধান্ত আপনা-আপনি সত্য হয়ে ওঠে—ভিন্ন ভিন্ন শোষণ-রীতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী গড়ে ওঠে নি। খাতকেরা তাই একটা 'শ্রেণী' নয়। খাতকেরা হয় মজুর, নয় কৃষক, অথবা অন্য কিছু।

যদি বলা হয়, যারা অপরকে আর্থিক শোষণ করে তারা একটা শ্রেণী। তাহলে জমিদার মিল-মালিক এবং মহাজন সবাই এক 'শ্রেণী'তে এসে পড়ে। কিন্তু এই ভাবে বিচার করাই কি ঠিক? শোষণ-রীতির পার্থক্য, বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি বিচার করে শ্রেণী-স্বরূপ নির্ণয় করা ঠিক নয়?

শোষণের রীতি বা কর্মের (form) পার্থক্যকে যদি আমরা আমল না দিই, তাহলে বলতে বাধ্য হব, শোষকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী নেই। শোষক নামে একটি 'সম্প্রদায়' আছে।

হ্যাঁ, এইখানেই অনেক জটিলতা ও অস্পষ্টতা এসে ঢুকেছে। কৃষক ও মজুরের সংগঠক নেতা ও কর্মীদের লেখা, কথা ও বিবৃতির মধ্যে আমরা সচরাচর এই অদ্ভুত অবৈজ্ঞানিক একটা বিচার দেখতে পাই, তাঁরা একই নিশ্বাসে বলেন 'শোষক সম্প্রদায়' এবং 'শোষিত শ্রেণী'।

'শোষিত জনগণ' অথবা 'শোষিত সম্প্রদায়' কথাও কেউ কেউ বলে থাকেন। এইখানে যদি তাঁকে চ্যালেঞ্জ করা হয়—শোষিত 'সম্প্রদায়' বলে যদি কিছু থাকে, তবে এই সম্প্রদায়কে নিয়ে একটা সঙ্ঘ হোক্ না কেন? তিনি তখুনি উত্তর দেবেন—এই শোষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে যে!

তাঁকে আবার প্রশ্ন করুন—কি করে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হলো?

তিনি বলবেন—ভিন্ন ভিন্ন রকমের শোষণের (exploitation) ফলে ও রীতি অনুসারে।

জিজ্ঞাসা করুন তাঁকে—উদাহরণ দিন।

তিনি তখনই উদাহরণ দেবেন—কৃষক ও মজুর।

প্রশ্ন করুন—তাহ'লে খাতকেরা কি? একটা ভিন্ন শ্রেণী নয়?

বেচারা কৃষকনেতা বা মজুরকর্মী তখনি তার চিন্তার অপরিচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট সুতোলিকার আড়ালে সরে পড়বে এবং উত্তর দেবে—না, খাতকেরা শ্রেণী নয়।

সুতরাং, এঁদের 'শ্রেণী'র সংজ্ঞা আমরা চেষ্টা করেও এঁদের কাছে পাই না। নিজের যুক্তিতে নিজেকে হারিয়ে দিয়ে এঁরা শেষ পর্যন্ত একটা বচন মাত্র আশ্রয় করেন।

প্রথমে বলবেন, জমিদার, মিল-মালিক, মহাজন—এরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী। কিন্তু সেই যুক্তিতে কৃষক, মজুর ও খাতক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হলেও এঁরা তা স্বীকার করবেন না। এঁদের যুক্তি 'কৃষক ও মজুর' পর্যায় পৌঁছে খাতকের বেলায় পিঠটান দেয়।

তারপরেই বলবেন—শোষকেরা হলো একটী 'সম্প্রদায়', কিন্তু সেই যুক্তিতে শোষিতেরা একটী সম্প্রদায়, একথা তাঁরা স্বীকার করেন না।

কেন করেন না?

করেন না এই কারণে যে, তাহ'লে শোষিত সম্প্রদায়কে নিয়েই একটী সংগঠন হতে পারে। কিষাণ আর মজুরদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সংগঠনের সার্থকতা বাতিল হয়ে যায়।

এইবার সম্ভবতঃ কোন পেশাদার মজুর-নেতা এগিয়ে এসে উত্তর দেবেন: জীবিকাগত শ্রম হিসাবেই (occupational labour) ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘ গঠন করার জীবিকার ভিত্তি ও পদ্ধতি ভিন্ন, মজুরের জীবিকার ভিত্তি ও প্রয়োজন। কৃষকের-পদ্ধতি ভিন্ন। তাই এই ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘ।

অর্থাৎ কৃষকেরা কৃষিজীবী এবং শ্রমিকেরা শ্রমজীবী।

এই ধরণের হাস্যকর ভাষা এবং ব্যাখ্যা, আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। সমাজতত্ত্বের বিচারে, এই ধরণের নিছিদে এবং লঘু এক একটী বচন নিয়েই মজুর ও কৃষকের মার্কামারা হিতৈষীরা সন্তুষ্ট আছেন। আবার অপরকে বুঝিয়ে বিজ্ঞ করে তোলারও দায়িত্ব এঁরা নিয়েছেন।

কৃষকেরা কৃষিজীবী, এর অর্থ আমরা কি বুঝবো যে কৃষকেরা শ্রমজীবী নয়? কৃষি কি শ্রম নয়? কৃষকেরা কি 'মজুর' নয়? সমাজ-বিজ্ঞানের সূত্রগত অর্থে কৃষক ও মজুরের পার্থক্য কি?

কোন বিজ্ঞ শ্রমিক-নেতা এখুনি একেবারে আকাশ থেকে উত্তর দেবেন—কি যে বলেন মশাই! Rent আর Wage এর পার্থক্য বোঝেন না? কৃষকরা দেয় Rent আর মজুরেরা পায় Wage। উভয়ের জীবিকার আর্থিক প্যাটার্ণ ভিন্ন।

তাঁকে প্রশ্ন করি: তুলনাটা কি রকম হলো? কৃষকেরা দেয় Rent, আর মজুরেরা কি দেয় বলুন? একজন যা 'দিল' আর একজন যা 'পেল'—এই দুই ভিন্ন জিনিসকে একসঙ্গে আনছেন কেন?

তিনি নিশ্চয় উত্তর দেবেন—মজুরেরা দেয় শ্রম বা লেবর।

আমরাও এইখানে স্বীকার করি, এইবার উত্তরটা ঠিক হয়েছে। সুতরাং আমরা এইবার অনুরোধ করবো শোষিতদের মধ্যে সংগঠনের কাজ এই নীতি হিসাবেই হোক্। অর্থাৎ Rent-payers' Union এবং Wage-earners' Union; খাজনা দিয়ে যে ব্যক্তি (জমিতে) 'শ্রম' করে, এবং যে ব্যক্তি 'শ্রম' করে মজুরী পায়—এই দুই ব্যক্তির অর্থনৈতিক জীবনের গঠনে পার্থক্য আছে। সুতরাং, যদি 'শ্রেণী' বিচার করতে হয়, তবে এইভাবেই করা হোক্!

কিন্তু কই, সেভাবে বিচার তো হয় না! যদি তাই হতো, তবে দেখা যেত যে, জমিতে শ্রম করে যে মজুরী পায় অর্থাৎ জমি মজুর বা ভূমিহীন কৃষক, তার স্থান হবে শ্রমিক সঙ্ঘ বা লেবর ইউনিয়নে। অপরদিকে, আমরা জানি, অকৃষি শ্রমেও রেন্ট-প্রথা আছে। যেমন একজন রিক্সা কুলি। সে রিক্সা মালিককে দৈনিক বা সাপ্তাহিক একটা নির্দিষ্ট রেন্ট দিয়ে, তারপর রিক্সা নিয়ে শ্রম করে এবং উপার্জ্জন করে। অতএব এই রিক্সা কুলির স্থান (রেন্ট-দাতা) কৃষকদের সঙ্ঘে।

আমাদের মজুর-হিতৈষী এবং কৃষকপ্রেমিক কর্ম্মী ও নেতার দল আবার আপত্তি তুলবেন। এবং মাত্র এই একটী যুক্তি দিয়ে আমাদের থামিয়ে দেবেন—কৃষক হলো কৃষক আর মজুর হলো মজুর। ব্যাস্, দুই ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন চাই।

আমরাও স্বীকার করবো,—হাঁ, এই যুক্তি ছাড়া তাঁদের আর কোন যুক্তি নেই। সমাজবিজ্ঞানের নিয়মে বা অর্থনৈতিক প্রকৃতি বিচার করে তাঁরা কৃষক ও মজুরের সংজ্ঞা পরিষ্কার করে বুঝে নেননি। তাঁরা নিতান্ত স্থূল অর্থে কৃষক ও মজুর নামে দুই শ্রেণী ভাগ করে নিয়েছেন। অর্থাৎ—(১) যারা জমিতে কায়িক শ্রম করে এবং (২) যারা জমি ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে কায়িক শ্রম করে। উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে কায়িক শ্রমের যোগাযোগ বা সম্বন্ধটা (relationship) কি ধরণের সেই দিক দিয়ে পার্থক্য নির্ণয় করে তাঁরা কৃষক ও মজুরকে বিচার করেননি।

বেশ, তাঁরা যাকে ক্ষেত্র বলছেন, সেই ক্ষেত্রেই এসে আমরা এঁদের সওয়াল করি।

কৃষিজীবী বা কৃষক অর্থই কি একটা শোষিত সম্প্রদায় (বা শ্রেণী)? ভারতবর্ষে কয়েক লক্ষ বিত্তশালী শোষক কৃষিজীবী যে আছেন, সেই বাস্তব সত্যকে এড়ানো যায় কি করে? অর্থনৈতিক দিক দিয়ে, নানা রকম কৃষক আছেন। (১) যিনি নিজের জমিতে চাষবাস করে বেশ দু'পয়সা করেছেন। অর্থাৎ স্বচ্ছল মধ্যচাষীর কৃষক, (২) যিনি নিজের জমিতে চাষ করেও দুঃস্থ হয়ে আছেন, (৩) যিনি নিজের জমিতে মজুর লাগিয়ে শস্য উৎপাদন করেন, (৪) যিনি নিজের জমিতে অপরের কাছে ঠিকা বাটাই বা বর্গা দিয়ে উৎপন্ন ফসলের কাণা গ্রহণ করেন, এবং (৫) ভূমিহীন কৃষিমজুর।

জমিদারীর প্রদেশে, অথবা রায়তওয়ারী প্রদেশে, উভয়ত কৃষিজীবীরা এই কটী শ্রেণীতে বিভক্ত।

উক্ত ৩নং প্রথাটি মূলতঃ ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী বা capitalist প্রথা। ৪নং প্রথাটী হলো জমিদারী বা সাবেকী য়ুরোপের ফিউডাল প্রথা। রায়তওয়ারী প্রদেশে, যেখানে নামে জমিদার নেই, সেখানে কাজে জমিদারগিরি আছে। অর্থাৎ একজন কৃষক তার নিজস্ব জমি অপরের কাছে বর্গা বা বাটাই দেয়।

এইবার সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করা যাক্—আমাদের দেশে কৃষক সঙ্ঘগুলির মধ্যে কোন্ ধরণের কৃষকের স্থান? এগুলি কি কৃষক-সাধারণের সঙ্ঘ? যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে, এর মধ্যে শোষক এবং শোষিত উভয়েই একসঙ্গে এসে ভীড় করেছে।

এবং, আমরা জানি বর্ত্তমান কৃষক সঙ্ঘগুলি এই রকম মাত্র ভূমিজীবী লোকের সঙ্ঘ। যে-নিয়মে কৃষক-সঙ্ঘে ৪ নম্বরের কৃষক স্থান পেয়েছে, সেই নিয়মে এর মধ্যে জমিদারদেরও স্থান হতে পারে। শুধু জমিদার কেন? ৩ নম্বরের কৃষকেরা যে সঙ্ঘে আছে, সেই সঙ্ঘে তাদেরই অর্থনৈতিক মাসতুতো ভাই চা-করেরাও (Tea Planters) থাকতে পারেন।

পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে যে কৃষকেরাও মজুর। একদল কৃষক মাত্র কায়িক শ্রম অর্থে মজুর। আর একদল কৃষক অর্থনৈতিক অর্থে মজুর—তারা শ্রম বিক্রয় করে।

কিন্তু আর একটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো—ভারতের মজুরেরাও কৃষকবর্গের মানুষ। অর্থাৎ গ্রামের মানুষ। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে ভারতের মজুরেরা সামাজিক ভাবে গ্রাম-সংস্কৃতির মানুষ। প্রকৃতিতে তারা পূর্ব্বলিখিত কৃষক সমাজের ১ থেকে ৪নং পর্য্যন্ত প্রত্যেকটী পর্য্যায়ের মানুষ। বিশেষ করে কারখানার মজুরদের সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। হুইট্‌লি রিপোর্ট অর্থাৎ Royal Commission on Labour'এর সিদ্ধান্ত ও তথ্যগুলির মধ্যে আমরা এর সমর্থন পাই। ঐ রিপোর্টের কয়েকটী কথা ও মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল:

(১) ভারতের সহর ও কারখানার মজুরেরা প্রধানতঃ গ্রামের লোক। য়ুরোপের মজুরের মত তারা সহরজাত মানুষ নয়।

(২) ভারতের মজুরেরা কিছুদিনের জন্য সহরে ও কারখানায় কাজ করে। তারপর স্বগ্রামে ফিরে যায়।

(৩) মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে অথবা মনেপ্রাণে (at heart) কারখানা মজুরেরা গ্রামবাসী।

(৪) মজুরদের কিছু অংশ কৃষিজীবী।

(৫) ভারতীয় কারখানা মজুরের সামাজিক সত্তার ভিত্তি (social root) গ্রামের মধ্যেই নিহিত।

(৬) জীবিকাত্রষ্ট গ্রাম্য কারিগর ও কৃষকেরাই অধিকাংশ সহরের কারখানার মজুর।

হুইট্‌লি রিপোর্টে আর একটী মন্তব্য আছে: Our considered opinion is that, in present circumstances, the link with the village is a distinct asset and that the general aim should be, not to undermine it, but to encourage it and as far as possible, to regularise it.

হুইট্‌লী রিপোর্টের তথ্য ও মন্তব্যের মধ্যে এই ইঙ্গিতটী স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে যে, ভারতের কারখানার ও সহরের মজুরেরা এখনো একটী 'ক্লাস' (শ্রেণী) হিসাবে পরিণত হয়নি। আজ কৃষক, এক বছর পরে কারখানার মজুর এবং চার বছর পরে আবার কৃষক বা গ্রামবাসী—এই হলো

কারখানা মজুরের জীবিকা বা অর্থনৈতিক জীবনের প্রকৃতি। কারখানা মজুরের সমাজ আজও গ্রাম-সমাজ। যদি তাকে 'শ্রেণী' বলা হয়, তবে সে গ্রাম্য শ্রেণী মাত্র। তার মনস্তত্ত্ব, উৎসব, রুচি, পরিবার-প্রীতি, ভূমিস্নেহ, সমাজের সংযোগ, শেষ জীবনের আশ্রয়—সবই গ্রামের মধ্যে নিহিত। সে কৃষক-সংস্কৃতির মানুষ। ভারতের কারখানা মজুরের মধ্যে শ্রেণীবোধ আছে বলার অর্থ জোর করে একটা মূঢ়তাকে ঘোষণা করা। সে মেশিনকে ও কারখানাকে ঘৃণা করে। সে জমিকে ভালবাসে।

অতএব, কি হওয়া উচিত ছিল? উচিত ছিল মজুর সম্প্রদায়কে এবং কৃষক সম্প্রদায়কে একই সংগঠনের মধ্যে সমাবেশ করা। ভারতের কারখানা মজুরের ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক-বৈষয়িক স্বরূপ হলো তার কৃষকত্ব। সে কৃষক-সমাজের মানুষ।

কৃষক ও মজুরের মধ্যে অর্থনৈতিক লক্ষণ অনুসারে একটা স্পষ্ট পার্থক্যের দাঁড়ি টানা যায় না। বিত্তের পার্থক্য দিয়ে, কৃষ্টির পার্থক্য দিয়ে, শিক্ষার পার্থক্য দিয়ে বা অর্থনৈতিক প্যাটার্নের পার্থক্য দিয়ে, কোন ভাবেই কৃষি ও মজুরকে দুটী বিশিষ্ট বিভাগে ভাগ করা যায় না। তা ছাড়া, যদি শুধু হাতের লাঙল দেখেই কৃষক আখ্যা দিতে হয়, তবে বহু আধুনিক জনক রাজা কৃষকের পর্য্যায়ে ঢুকে পড়বেন। কিম্বা হাতের হাতুড়ি দেখেই যদি মজুর চিনতে হয়, তবে বহু মহাজনকে মজুর বলে ভুল হবে।

তা ছাড়া কয়েক কোটি ভারতবাসী আছেন, যাঁরা প্রতিদিনের জীবনেই অর্দ্ধেক কৃষক এবং অর্দ্ধেক মজুর।

আমরা সচরাচর একটা কথা শুনে থাকি—'চা-বাগানের শ্রমিক'। চা-বাগানের শ্রমিককে আমরা লেবারার কুলি বা মজুর বলে থাকি। অন্ততঃ এই একটী ক্ষেত্রে দেখি, মজুরের সংজ্ঞা সম্বন্ধে ভুল করা হয়নি। মজুরীর বিনিময়ে কৃষিঘটিত কাজ করে, তাই চা-বাগানের শ্রমিকেরা 'মজুর' হয়েছে, 'কৃষক' হয়নি।

কিন্তু আর এক ক্ষেত্রে আমাদের ভাষার মধ্যে সংজ্ঞাগত ভুল হয়ে থাকে—'ভূমিহীন কৃষক' কথাটীর মধ্যে। মজুরীর বিনিময়ে কৃষিঘটিত কাজ করে এরা, তবু এদের 'কৃষক' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে এবং কৃষক সঙ্ঘের কর্ত্তারা এদের অন্তর্ভুক্তিকরণ করবার জন্য এগিয়ে আসেন।

কারখানা শ্রমিকদের সঙ্ঘেও নিতান্ত শ্রমিক ছাড়া, ফোরম্যান, টাণ্ডেল, মিস্ত্রী, সর্দ্দার ইত্যাদি ব্যক্তিরা স্থান পায়। কারখানার সমগ্র কাজের মধ্যে এই শেষোক্ত ধরণের ব্যক্তিদের কাজ হলো শ্রমিকদের ওপর শোষণের কাজ। অর্থাৎ এদের ভূমিকা—শোষকের ভূমিকা। এরা শুধু সাপ্তাহিক বা মাসিক বেতন নিয়ে নয়, কমিশন প্রথায় এবং কণ্ট্রাক্ট প্রথায় শ্রমিকদের ওপর এমন এক ধরণের প্রভুত্ব করেন, যার প্রকৃতি হলো শোষণ অর্থাৎ শ্রমিকের ন্যায্যাধিত প্রাপ্যের একটা অংশ এঁরা আত্মসাৎ করেন। কারখানা জীবনে যাদের অর্থনৈতিক সত্তা শোষকস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তারাও মজুর ইউনিয়নে স্থান পায় এবং 'একই স্বার্থের' জন্য মজুরদের সঙ্গে এক হয়ে নাকি লড়াই করে!

এখানে আমরা আবার এক ধরণের শ্রেণীতত্ত্বের ব্যাখ্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়াই। অনেকে বলবেন, মজুর ইউনিয়নের নেতারা বলে থাকেন, মার্ক্সের ব্যাখ্যা ভুলেও অনেকে বলে থাকেন যে—middle class বা মধ্য শ্রেণী নামে একটা শ্রেণী আছে। এই মধ্য শ্রেণীর কাজ হলো শোষণ-ব্যবস্থার মধ্যে শোষকের পক্ষে দালালের কাজ করা। অর্থাৎ সে স্বয়ং শোষক নয়, শোষকের এজেণ্ট।

যদি তাই হয়, তবে তারা শোষিত শ্রমিক সাধারণের ইউনিয়নে স্থান পায় কেন? এরা তো ভিন্ন শ্রেণীর লোক।

মধ্যশ্রেণীকে আবার অদ্ভুত একটা কথা দিয়ে প্রায়ই সংজ্ঞাত করা হয়—মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা সম্প্রদায়।

এই সব ভ্রান্ত সংজ্ঞা প্রমাণ করে যে শ্রেণী বা সম্প্রদায় ইত্যাদি কথাগুলির কোন বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্য বক্তাদের উপলব্ধির মধ্যে নেই। কারণ—(১) মধ্যবিত্ত মাত্রই মধ্যশ্রেণীর (শোষকের এজেণ্ট) কাজ করে না। (২) মধ্যশ্রেণীর বহু ব্যক্তি আছে যাঁরা বিত্ত হিসাবে শোষিতের চেয়েও নীচু।

একজন সৈনিক বা কেরাণী শোষকের এজেণ্ট বা মধ্যশ্রেণীর মানুষ। বিত্ত হিসাবে সে বহু মজুরের ও চাষীর চেয়ে নিকৃষ্ট এবং গরীব হতে পারে। কিন্তু তার অর্থনৈতিক ভূমিকা (Role বা Status) হলো শোষকের পক্ষে দালালি।

এইবার অনুধাবন করা যাক, শোষণ ব্যবস্থার কাঠামোটা এই রকমের—প্রথম শোষক শ্রেণী, মাঝখানে তাদের এজেন্ট বা মধ্যশ্রেণী এবং তারপর সবার অধম শোষিত শ্রেণী।

কিন্তু সত্যিই কি শোষণ ব্যবস্থার প্যাটার্ণটা এই ধরণের তিনটী সুস্পষ্ট ডিপার্টমেণ্ট বা ক্রমিক স্তরে ভাগ করা?

না, মোটেই নয়। মধ্যশ্রেণী নামে একটা বিশিষ্ট পদার্থ আমরা দেখি না। মধ্যশ্রেণীর মধ্যেই উর্দ্ধতন থেকে অধস্তন স্তর পর পর নেমে গেছে। মধ্যশ্রেণীর মানুষ স্বয়ং নিজে শোষিত; সে তার নীচের একটা দলকে শোষণ করে। এই দল আবার তার অধস্তন দলকে শোষণ করে। এইভাবে এজেন্ট বা মধ্যশ্রেণীর মধ্যে একটা স্তরবিন্যাস আছে। ব্যবস্থাটা ধাপে ধাপে নেমে গেছে। সর্ব্বোচ্চ শোষক মালিক এবং সর্ব্বনিম্ন শোষিত শ্রমিকের মাঝখানে অনেকগুলি মধ্যশ্রেণী রয়েছে। এদের ওপর শোষণ কার্য্যের বিভিন্ন দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। বেতন রূপে বা মুনাফার অংশ রূপে এরা 'দালালি' পেয়ে থাকে।

শিক্ষিত ভদ্রলোক মাত্রকেই স্থূল করে মধ্যশ্রেণীর মানুষ বলা হয়ে থাকে। শিক্ষিত ভদ্রলোক অর্থাৎ বুদ্ধিশ্রমজীবীদের মধ্যে দুই ভিন্ন অর্থনৈতিক সত্তার মানুষ আছে। সমাজতন্ত্রের নিয়মে এরা দুই শ্রেণী—(ক) প্রথম হলো, যাঁরা বুদ্ধিশ্রম দিয়ে শোষকের পক্ষে দালালি করেন। এঁরা প্রকৃত মধ্যশ্রেণী (middle class)। (খ) দ্বিতীয়, যাঁরা বুদ্ধিশ্রম দিয়ে নিছক একটা খাটুনি বা 'job' খাটেন। বুদ্ধিশ্রমকে যদি 'শ্রম' বলতে বাধা না থাকে, তবে এরাও শ্রমিক। দৈনিক ৮।১০ ঘণ্টা ধরাবাঁধা নিয়মে এরা খাতা লেখেন, টাইপ করেন, হিসাব রাখেন।

বুদ্ধিশ্রম এবং কায়িক শ্রমকে অর্থনৈতিক বিচারে দুটী ভিন্ন বিষয় বলে মনে করা যায় কি? এই দুই শ্রমকে শোষণের রীতি নীতি ও প্রকৃতি কি ভিন্ন রকমের?

না, তা নয়। একই প্রদেশ, একই পরিণাম, একই দুঃখ-যাতনের ও অনাচারের সৃষ্টি এবং মনুষ্যত্ব খর্ব করার আয়োজন।

যদি প্রস্তাব করা যায় যে, এক একটি জীবিকা হিসাবে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হওয়া উচিত: প্রস্তাব করার দরকার নেই, বর্ত্তমানে আমরা দেখতে পাই, শ্রমিক ইউনিয়নগুলি এই ভাবে এক একটি জীবিকার ভিত্তিতে গঠিত। যথা রিক্সাচালক ইউনিয়ন, ক্ষৌরকার ইউনিয়ন, পাচক ইউনিয়ন, ভৃত্য ইউনিয়ন, দোকান-কর্ম্মচারী ইউনিয়ন, পোষ্টাল-কেরানী ইউনিয়ন ইত্যাদি।

কিন্তু এর মধ্যে এক স্বার্থের সূত্র কোথায়? কেরানী ইউনিয়ন এবং ভৃত্য ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধের সম্পর্কটা বড়। ভৃত্যেরা কেরানীকে তাদের শোষক মনে করে। কেরানীরা মার্চেণ্ট অফিসকে তাদের শোষক মনে করে। জীবিকা হিসাবে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি তাই এক একটি 'শ্রেণী'গত ইউনিয়ন বলা যায় না। যদি তাই বলা হয়, তবে বলতে হবে প্রত্যেক 'জীবিকাই' এক একটী ভিন্ন শ্রেণীর ভিত্তি এবং ভারতবর্ষে তাহলে কয়েক হাজার শ্রেণী আছে।

বলা বাহুল্য সমাজবিজ্ঞানের নিয়মে এই ভাবে 'শ্রেণী'কে সংজ্ঞাত করা হয়নি। এই ভাবে বললে, 'শ্রেণীর' কোন অর্থনৈতিক পরিচয় থাকে না।

ভারতবর্ষের মত পররাষ্ট্র শাসিত ঔপনিবেশিক আপনার দেশের মনুষ্যসমাজে মধ্যশ্রেণী অনেক আছে।

এখন প্রশ্ন, এই মধ্যশ্রেণীর প্রথম বর্গে কারা আছেন? ভারতীয় পুঁজিপতিরা কি মধ্যশ্রেণী? ভারতের শোষণ ব্যবস্থার প্রথম বর্গের শোষক কারা?

ভারতীয় পুঁজিপতিরা কোটীপতি হতে পারেন, কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক-ঐতিহাসিক ভূমিকাটী কি?

আমাদের অবশ্যই বলতে হয়, এঁরা মধ্যশ্রেণী।

ভারতের শোষণ ব্যবস্থার মূল গুণ ধর্ম্ম ও প্যাটার্ণ হলো সাম্রাজ্যবাদী। এই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যবস্থা যাঁরা চালু রাখছেন, তাঁরা সেই ভাবে ভারতের রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাকে গড়ে নিয়েছেন। এই State বা রাষ্ট্রিক অধিকার যাঁদের হাতে, তাঁদের মধ্যে আমাদের দেশের পুঁজিপতিদের স্থান নেই। আমাদের দেশের পুঁজিপতিরা ঐ রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার কর্ত্তাস্থানীয় নন। তাঁরা অনুগত আজ্ঞা-বাহক, সুবিধাপ্রাপ্ত (Privileged) একটি দল, রাষ্ট্রিক কর্ত্তৃপক্ষের কাছে দাবী দাওয়া করে কতগুলি সুবিধা আদায় করেন মাত্র। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বড় বড় দায়িত্বগুলি এঁরা গ্রহণ করেন। এঁরা রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্বসম্পন্ন শোষক নন। এঁরা নিছক এজেন্ট,

Middle-class মাত্র। ইংলণ্ডে যে অর্থে কোন ভদ্রলোক একজন ক্যাপিটালিষ্ট, এঁরা অর্থাৎ ভারতীয় পুঁজিপতিরা সেই অর্থে সাব-ক্যাপিটালিষ্ট। ভারতবর্ষের মত পরাধীন ঔপনিবেশিক (colonial) অবস্থার দেশে প্রধান ও প্রথম শোষক হলেন তাঁরাই যাঁরা এই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ ও নিয়ন্তা। ভারতের 'দেশী রাজা' এবং জমিদার উভয়েই মধ্যশ্রেণী বা দালাল মাত্র। সাম্রাজ্যবাদের রক্ষণাবেক্ষণে ও মুরুব্বিয়ানার আশ্রয়ে এঁদের উৎপত্তি ও স্থিতি। এঁরাও অনুভব করেন যে, এঁদেরও শোষক আছে। এঁদের ওপর অন্যায় করা হয়। এঁদের ওপরও আর্থিক বা সাম্পদিক অবিচার করা হয়।

এই পর্যন্ত প্রসঙ্গক্রমে আমরা যে সব বিষয় আলোচনা করলাম, তার মধ্যে একটা সত্যের ইঙ্গিত এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব ফুটে উঠেছে। এই বিষয়টীকে আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে। পরাধীন ঔপনিবেশিক দেশে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদের প্রভাবে সমাজ ঠিক শ্রেণীগত শোষণের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে না। অবস্থা পরিণাম ও অবনতি আরও খারাপ এবং আরও জটিল দুঃসহকর। এ হেন দেশে এক 'শ্রেণী' ঠিক আর এক 'শ্রেণীকে' শোষণ করছে—ব্যাপারটা এত স্পষ্টাস্পষ্টি ও কাটাছাঁটা নয়। এ হেন দেশের সমাজে যে ভাঙন দেখা দেয়, সে-ভাঙন ষোল-আনা ভাঙন। শ্রেণীবদ্ধতা বা শ্রেণী-চেতনা নামে কোন সু-সংস্কারের সৃষ্টির আশাও এর মধ্যে নেই। সমাজ নিতান্ত কয়েক কোটী ব্যক্তি হিসাবে (Individually) চূর্ণ হয়ে রয়েছে। এখানে, এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির শোষক। যে নিজে শোষিত, সে-ই আবার অপরের শোষক।

বাংলা ভাষায় 'সর্বহারা' নামে একটা কাব্যিক কথা দিয়ে যে কি বোঝায়, তা আমাদের বোধগম্য হয় না। এদেশে each against each—সমগ্র শোষণ ব্যবস্থা অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এই ভিত্তির ওপর রয়েছে।

এবং, এদেশেরই শ্রমিক ও কৃষক সঙ্ঘের সংগঠন ও রীতি-নীতির মধ্যে এই বাস্তব ঐতিহাসিক উপলব্ধির কোন স্বীকৃতি দেখতে পাই না। উদ্যোক্তারা পশ্চিমী শাস্ত্র থেকে বেছে বেছে কতকগুলি কথা গ্রহণ করেছেন এবং পশ্চিমী আন্দোলনের পদ্ধতিগুলিকে হুবহু কেতাবী ধরণে অনুকরণ করছেন। ফলে শ্রমিক সঙ্ঘগুলি প্রকৃতপক্ষে এক একটা সালিশী বোর্ড মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, মধ্যশ্রেণীর সঙ্গে বিতণ্ডা করে একটু মজুরী বৃদ্ধি করিয়ে নিতে পারলেই কাজ ফুরিয়ে গেল। শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মত শিক্ষা দীক্ষা প্রচারের এবং দেশ-জাতি-সমাজ বোধ জাগ্রত করায় কোন চেষ্টা শ্রমিক ও কৃষক নেতারা করেন না। নিছক একটা স্বার্থ-বাদের আদর্শ প্রচার করা হয়। 'শ্রেণী' বা 'সমাজ' বলতে কোন বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রতি উদ্যোক্তাদের শ্রদ্ধা নেই।

"But a wide colonial policy has led to the European Proleteriat party falling into such a position that the whole of society does not exist by its labour, but by the labour of the almost enslaved colonial slaves." (*Lenin*) ; অন্ততঃ লেনিনের মত মনস্বীর কথায় আস্থা রেখে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে য়ুরোপের সমগ্র সমাজ এবং সেখানকার 'সর্বহারার' দলও আমাদের শোষক।

এই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে ভারতীয় আন্দোলনের রূপ কি ধরণের হওয়া উচিত? 'শ্রেণী' বলে কোন জিনিষ খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়েছি। আমাদের সমাজে এখনো আমরা মার্ক্সকথিত অর্থনৈতিক 'শ্রেণী' পাইনি। জীবিকা হিসাবে এবং সম্প্রদায় হিসাবে সংগঠন হতে পারে এবং সেই ভাবেই হয়েছে। কিন্তু এই সংগঠনের মধ্যেই গলদ রয়ে গেছে। এই ধরণের সঙ্ঘ 'এক লক্ষ্য' বা 'এক স্বার্থ' প্রণোদিত হতে পারে না। এর ফল হবে—"Room after room, we hunt the house through"। খণ্ড খণ্ড ভাবে স্বার্থ রক্ষার আয়োজনে পরস্পর বিরোধের দিকটাই প্রবল হয় এবং মূল লক্ষ্য পণ্ড হয়।

আমাদের সমাজ কয়েক কোটী 'ব্যক্তি'তে পরিণত হয়েছে। শ্রেণীগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থরক্ষার মত ঐক্য-বোধও নেই। জীবনের পদ্ধতিও সেই রকমের নেই। এই বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে, সকল সংগঠনের আয়োজনকে চালিত করা উচিত। আমাদের বর্তমান কৃষক মজুর ও 'জীবিকা'-গত সঙ্ঘগুলির রীতি নীতি প্রকৃতির মধ্যে একটা গলদ রয়ে গেছে। সর্বাগ্রে এই গলদ পরিহার করে, নূতন ভাবে সংগঠনের রূপ দিতে হবে।

যুগের স্বাক্ষর

উমানাথ সিংহ

'ফ্যান্' 'ফ্যান্' ক'রে মরে গেল বাড়ীর লোক
তবু জ্ঞান হ'ল না কো—
অন্ধকার কারাগারে বন্ধ হ'ল
সূর্য-স্বাধীনতা।
ঘরে ভাত আছে,
তবু খেতে হ'ল শিশুর নরম মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে—
চালে খড় আছে,
তবু শুতে হ'ল ডাস্টবিন পাশে
মরা বিড়ালের পচা-পেটে মাথা দিয়ে।
পিপাসা-শুকনো-চোখে
সমুদ্রের লবণাক্ত ঢেউ
গুণি বসে বসে—আর গুণি
কত রমণীর দেহ বিক্রী হ'ল এক রাতে
কতবার কত হাতে হাতে।
তবু হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে ফিরি আমি
যদি কিছু পাই—হাতে এসে ঠেকে যেথি
ক্ষুধের মরণ-ইতিহাস।

অন্যদিকে "ফসল বাড়াও" আর্তনাদে
কান ঝালাপালা করে।
তাই নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল গর্জে ওঠে,
দেশকে বাঁচাতে হবে।
দেশের বুকের হাড়ে
বালি ঘসে শান দেয় গোপন ছুরিকা।...
...আগুনের হল্কা ছুটাও—
মাটিতে আগুন দাও—
জ্বালো মশাল ধানের শীষে
যে-মাটির ধানে অধিকার নেই আমাদের।

সব পুড়ে যাবে—শেষ হবে ধীরে ধীরে
আলেয়ার পথ ধ'রে ভুল পথে হাঁটা।
সোনালী সত্যের বাণী
তপস্বিই যে-দুঃখের মর্ম হ'তে
ছুটে চলে দিগন্তের পারে—
যে-বাণীর গতি
সাম্য-মৈত্র-স্বাধীনতা বয়ে ছুটে চলে

বিপ্লবী প্রাণের উৎস হ'তে—
যে-বাণীর রক্তরাগ
দেখা দেয় দিগন্তরে আগামী দিনের—
যে-বাণী মৃত্যুকে করেছে অস্বীকার—
যে-বাণী শুধু গণশক্তির ইতিহাস—
সে-বাণী যে রূপ নিল
ভারতের ঘরে ঘরে স্নেহময়ী মা-র অন্তর জুড়ে।

কে সে?
ভারতের নারী—ভারতেরই এই মা।
আন্দোলনে জন্ম নিল—
আত্মদানে সৃষ্টি হ'ল আরও কত মা।
কে এদের জন্মদাতা?
সেই বিপ্লব-বেদিকা
সবুজের রক্ত দিয়ে যুগ-যুগান্তর ধ'রে বাঁধা।
সে-বেদীর মহাযজ্ঞধূমে
রূপ নেবে স্বাধীন ভারত।
তবু শিল্পী ঘুম দেবে
উপেক্ষার উন্নাসিক গর্ব নিয়ে
শুয়ে শুয়ে শিমুলের বালিশ মাথায় দিয়ে?
সমুদ্রের নীল তোরণের পথে পথে
নৌবহরের হিংস্র গর্জন—তবু স্তব্ধ রবে?
রবে না, রবে না কভু—প্রাণ ধর্ম তার
ছুটে যাবে লেখনীর মুখে—
গাবে গান—স্বাধীনতা, স্বাধীনতা শুধু—
মানুষের প্রাণ্য স্বাধীনতা।
বেদনার কুলীশ-গহ্বরে
শিউরে শিউরে
উঠেছে যে-নবতর বিপ্লবের ভাষা—
সেই মুক্তি দেবে—আলো দেবে;—কথা কবে
বলেদী শিক্ষার ভিত্তি গেড়ে।
কবি,
শিল্পী-সাহিত্যিক
দিয়ে যাবে অমর লেখনী দিয়ে
যুগের স্বাক্ষর—
প্রতি রেখা তার
কেঁপে কেঁপে জাগাবে ভারতে;
নিদ্রিত কালের কাছে
শোনাবে সে মন্ত্রের নিয়ম—
বন্দে মাতরম্।

মানব মুক্তিকামী রোলাঁ

শ্রীসত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত, এম, এ

মহামানব রোলাঁর জীবননাট্যের অবসান হয়েছে। পৃথিবীর কাছে তাঁর পরিচয় বড় একজন সাহিত্যিক ব'লে, সমর-বিরোধী ব'লে। কিন্তু ভারত তাঁর কাছে ঋণী অন্য কারণে। ভারতবর্ষকে জগৎসভায় পরিচিত ক'রে দিয়েছেন ভারতের সবচেয়ে বন্ধু রোলাঁ। ভারতের আধ্যাত্মিক গরিমা ও ঐতিহ্য তিনিই জড়বাদী ইউরোপের কাছে প্রকট করেছেন। আজ জগৎ তাঁর মৃত্যুতে যথার্থ ক্ষতিগ্রস্ত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যখন "শান্তির ললিত বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস", এই সময়েই রোলাঁর মত সাধকের প্রয়োজন ছিল। তাঁর আজীবন সাধনাও লোকোত্তর প্রতিভার সমাক পরিচয় ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। শুধু তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে, তারই একটা দিক বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

রোলাঁর জন্মের সময় ফ্রান্সে দুটি বিরুদ্ধ মতবাদের লড়াই চলছিল। স্বাধীনতার বাণী ও ধর্মের আহ্বান যখন তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের মনে সাড়া তুলেছিল, তখন রোলাঁর সূক্ষ্ম কবি-মন মতবাদের ধাক্কায় বিপর্যস্ত হয়নি। হ্যাগনারের সুরের ঝলতান তাঁর সমস্ত মন ও চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছিল। সঙ্গীত ছিল রোলাঁর অন্তরের ভাষা। তিনি তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন যে যখনই তিনি মনের শান্তি হারিয়েছেন, তখনই বীথোফেনের সুর তাঁকে নবজীবনের পথে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সঙ্গীতের মধ্যেই তিনি আন্তর্জাতিকতার ইঙ্গিত পেলেন, এই সাধন পথের নির্দেশ তাঁকে দিয়েছিলেন ঋষি টলষ্টয়। টলষ্টয় "কি করা উচিত" পুস্তকে আর্ট সম্বন্ধে গতানুগতিক ধারাকে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে' দেন। রোলাঁ এতদিন স্বপ্নের জগতে বিভোর হ'য়ে ছিলেন। টলষ্টয়ের বাণী তাঁকে সত্যাধীর অচলায়তন থেকে মুক্তি দিলে, তাঁর স্বপ্নের আবেশ কেটে গেল, কিন্তু সংশয় তাঁর তখনও দূর হয় নি। তিনি তখন টলষ্টয়কে অনুযোগ করে' পত্র লেখেন। টলষ্টয়ের প্রত্যুত্তর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে। টলষ্টয় লিখেছিলেন—"মানুষকে যা সংহত করে তাই—আর্ট। আর্টিষ্ট—তিনিই যে মনুষ্যত্ব ও মনুষ্য-সমাজের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারেন। আর্টিষ্ট যদি মৈত্রী ও মনুষ্যত্বের বাণী প্রচার করতে পারেন, তবেই তিনি যথার্থ আর্টিষ্ট।" সপ্তদশ শতাব্দীর কবি হারবার্টের মনে যে দ্বন্দ্ব ছিল, রোলাঁর মনেও সেই দ্বন্দ্ব দেখা দিল। একদিকে গুরু টলষ্টয়ের প্রভাব অন্যদিকে দেশ কাল সমাজ বিবর্তন অতীত কাব্য ও সুরলক্ষ্মীর অর্চনা তাঁকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ জয়ী হ'ল। মনুষ্যত্বের চিরন্তন বাণী তাঁর সাহিত্যে, ছন্দে, গানে ভাস্কর হয়ে উঠ্‌ল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোলাঁ পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু যখন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, জাতিতে জাতিতে, এবং সমাজ জীবনে ভাঙনের পালা সুরু হল, তখন রোলাঁই প্রথম জনগণকে ভ্রাতৃত্ব ও মিলনের রাখীবন্ধন পরাতে চেয়েছিলেন। সেই দিন থেকে আজীবন রোলাঁ তাঁর বলিষ্ঠ আদর্শবাদ ও স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের পরাজয় রোলাঁর মনে বিন্দুমাত্রও রেখাপাত করেনি। উগ্র জাতীয়তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী কবি কিপ্লিংএর মত তিনি জাতীয় গৌরব প্রচারে ঘৃণা বোধ করতেন। যাঁ ক্রিস্তফে অলিভিয়ার যা বলেছেন, তাইত রোলাঁর অন্তরের বাণী, "পরাজয় ও কামা। ধন্য এই বিপর্যয়। এই পরাজয় ক্ষুদ্র জাতীয়তার গণ্ডী থেকে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটিয়েছে, আমাদের আদর্শবাদের দীপশিখাটিকে প্রোজ্জ্বল করেছে।" রোলাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক 'সেন্ট লুই', খৃষ্টধর্মের শাশ্বতবাণী—প্রেমের বাণী এর উপজীব্য বিষয়। মানুষের মধ্যে পরস্পর হানাহানি ও বিজাতীয় ঘৃণা তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছিল, 'এয়াট' তাঁর এই সময়কার বেদনাহত মনের প্রকাশ। শুধু সাহিত্যের মধ্যেই তিনি টলষ্টয়ের নির্দেশ নিবদ্ধ রাখেন নি। বুর্জোয়া—আর্ট ও থিয়েটারকে মানুষের আর্ট ও থিয়েটার করতে তিনি বদ্ধপরিকর হন। অবাধ পরিচল যৌন আবেদন ফ্রান্স নাট্যমঞ্চকে জড়িমাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। রোলাঁ এই পঙ্কিলতা থেকে নাট্যশালাকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। রোলাঁ তাঁর ইস্তাহারে জানালেন—"আমি

বিপুল জনগণের জন্য লিখছি। আমার মাতৃভূমি শুধু নদীমেখলা ফ্রান্স নয়। সমগ্র বিশ্ব আমার দেশ।" এই সময়—তাঁর কথা পৃথিবীর কর্ণগোচর হয়নি, কিন্তু জাঁ ক্রিস্তফ তাঁর বিশ্বজনীনতা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, দেশে দেশে মন্ত্রিত করে দিয়েছে। জনগণের রঙ্গমঞ্চের জন্য তিনি '১৪ই জুলাই', 'ডাণ্টন' এবং 'রবেসপিয়েরে' নামক নাটকত্রয় লিখলেন। ফরাসী বিপ্লবের বিভিন্ন স্তরের ইতিহাস নাট্যকারের দৃষ্টিপ্রদীপে প্রতিভাত হয়েছে। "ট্রায়াম্ফ অব্ রিজনে" তিনি সমবেতোপাসনা থেকে মুক্ত স্বাধীন জনগণের আবাহন গেয়েছেন। এতদিন পর্যন্ত রোলাঁ যা লিখেছিলেন, তার মধ্যে ঔজ্জ্বল্য ছিল, ভাববিলাস ছিল, ছিল না সত্যদর্শীর অন্তর্দৃষ্টি, ছিল না জীবনের সম্বন্ধে ব্যাপক ধারণা, দুঃখের আগুনে পুড়ে তিনি মানুষের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। জীবন সম্বন্ধে মূল বক্তব্যগুলি জাঁ ক্রিস্তফেই পরিস্ফুট হয়েছে। জাঁ ক্রিস্তফের জীবনের মধ্য দিয়ে রোলাঁ সৃষ্টির সমগ্র রহস্য, প্রেমের চিরন্তন বাণী ও জাগতিক ধারা ব্যক্ত করলেন।

জাঁ ক্রিস্তফ উপন্যাস নয়। সমগ্র বিশ্বের সমস্যা যেখানে প্রকট, সমগ্র পৃথিবী যেখানে পটভূমি, তা মহাকাব্যের প্রসারকেও তুচ্ছ করে ঊর্দ্ধে উঠেছে, একে পৃথিবীর সমস্ত জাতির জাতীয় পুস্তক বল্লে অত্যুক্তি হবে না। সমুদ্রের চেয়েও গভীর ও অন্তহীন জীবনের ছায়াছবি এতে প্রতিফলিত হয়েছে। আর্টের দিক থেকে বিচার করলে জাঁ ক্রিস্তফের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া যায় না, একমাত্র টলষ্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পিস', গ্যটের 'উইলহেলম মিষ্টার' এবং দান্তের 'ডাইনাই'এর পটভূমির সঙ্গে এর আংশিক তুলনা চলে। মানুষের সমস্ত দুর্বলতা, স্খলন, ত্রুটী, বিচ্যুতি রোলাঁ সহজভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। জীবনপথের পরিশ্রান্ত পথিকের সমস্ত সমস্যা ও তার সমাধান এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। জাঁ ক্রিস্তফ জনগণের অধিসংখ্যক প্রতিনিধি।

রোলাঁর সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের নটরাজের প্রলয়ঙ্কর নৃত্যে। রোলাঁর অত্যন্ত স্পর্শকাতর প্রাণে এই আঘাত গুরুতর হয়ে বাজল। যে শান্তিনিকেতনের কল্পনায় তিনি এতদিন বিভোর ছিলেন, তা তাসের বাড়ীর মত বিপর্যস্ত হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ল। অনেকে রোলাঁকে সমরবিরোধী বলেই জানেন, কিন্তু সমরবিরোধিতা মানে ত শুধু শান্তিপ্রিয়তা নয়। যিনি শান্তি স্থাপনের জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত পাত করতে পারেন, তিনিই যথার্থ সমরবিরোধী। তাঁর এই অনন্য বিশ্বাস তাঁকে সব কিছু হিংসা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়োজিত করেছে। অলিভিয়ারের কথা স্মরণ করা যাক্—"আমি যুদ্ধ ঘৃণা করি। যুদ্ধ আমাকে দুঃস্বপ্নের মত শ্বাসরুদ্ধ করছে।" তাঁর স্মারকলিপিতে রোলাঁ ওরা অসাই এই কথা লিপিবদ্ধ করেছেন—"আজ আমি দেউলে, এই উন্মত্ত পৃথিবীতে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। মানুষের ভ্রাতৃত্ববন্ধন একেবারে ছিঁড়ে গেল। আমি যদি চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়তে পারতাম।" ফ্রান্সকে তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু এই দুঃসময়ে ফ্রান্স ও অন্যান্য রাষ্ট্র তাঁর কাছে একই মনে হল। অলিভিয়ারের কথার মধ্যেই তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গী ফুটে উঠেছে। "আমি ফ্রান্স ভালবাসি। কিন্তু ফ্রান্সের জন্য আমি আমার আত্মাকে হত্যা করতে পারি না, আমার বিবেকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না।" যুদ্ধ বিরতির পর রোলাঁ "হিউম্যানিটি" নামক ইস্তাহারে রক্তাক্ত পৃথিবীকে নবজীবনের আহ্বান শোনালেন। মানুষের উপর যে বিশ্বাস যুদ্ধের আঘাতায় টলিয়াছিল, তাই আবার সুদৃঢ় হল। এই সময়েই "অ্যাবাভ্ দি ব্যাট্‌ল" প্রকাশিত হয়।

বর্তমান মহাযুদ্ধও রোলাঁর মানসিক বিপর্যয় ঘটিয়েছিল। রোলাঁ বিশ্বাস করেছিলেন যে রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর প্রয়োজন আছে। "আই উইল নট রেষ্ট" (আমি থামব না) পুস্তকে তিনি লিখেছেন,—"আমার ধর্ম ক্ষুধার্ত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত জনগণের দুঃখ দূর করা। আমি তাঁদের দীন সেবক। আমি জনগণের সেবায় ব্যাপৃত থাকব।" বর্তমান যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেছেন, রোলাঁ লিখছেন —"হিংসা অহংকারের বস্তু নয়। কিন্তু বর্তমানে এ কঠোর কর্তব্য। এই যুদ্ধের পর শ্রেণীহীন, বিভেদহীন সমাজ গড়ে উঠবে।" সাম্যবাদের প্রশংসা তিনি উচ্ছ্বসিতভাবে করেছেন, রোলাঁ মৃত্যু পর্যন্ত এই স্বপ্নে বিভোর ছিলেন যে বর্তমান যুদ্ধের চিতাভস্মের উপর নূতন শ্যামলা, রূপরসবর্ণগন্ধ গীতময় পৃথিবী গড়ে উঠবে। ধ্বংসের মধ্যে লুকিয়ে আছে নবজীবনের বিপুল সম্ভাবনা। গভীর তমসার মধ্যে রয়েছে পরিদৃশ্যমান্ জ্যোতির্ময় প্রভাত। রোলাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু রোলাঁ অমর। তিনি যাদের ভালবেসেছেন, সেই অগণ্য জনগণের অন্তরের মণিকোঠায় তাঁর স্মৃতির দীপশিখাটি জ্বলবে অনির্বাণ।

কিছুক্ষণ

শ্রীকল্যাণী দেবী

সেদিন দুপুরের আগে—

দিনের আলো যখন অকস্মাৎ নিভে এলো, আকাশ বেয়ে নাম্‌লো বহু-সহস্র—ছোট ছোট জলের কণা। অগত্যা ঘরে এসে ব'স্‌লো সুমিতা। অন্ধকার আরও গাঢ় হ'য়ে এলো এবং জলের ছাঁটগুলোও সঙ্গে সঙ্গে তীব্রতার মাত্রা ছাড়িয়ে এতদূর চলে এলো, যার জন্য সুমিতার বাতায়নও হ'লো রুদ্ধ।

চমৎকার! অখণ্ড নীরবতা। সুমিতা এবার ভাবতে পারে। বর্ষা নেবেছে—, কলেজে যাওয়া চ'লতে পারে না এবং যেহেতু ঘরখানা অন্ধকার, বইপড়াও চ'লতে পারে না। কিন্তু কি ভাবা যায়? কলেজের ক্লমরুম? না কোনো সপ্রতিভ প্রফেসরের ক্লাশ? কোনো সাহিত্যিকের লেখা বা কবির কবিতা? অসহযোগ, সমাজবাদ বা কম্যুনিজম্? জাতীয় জাগরণ—দেশের আগামী ভবিষ্যৎ? নয়তো তা'র নিজেরই ভাবী ঘরোয়া জীবন। কোন্‌টা প্রয়োজনীয় কোন্‌টা কাজে লাগতে পারে অথবা—কোন্‌টা বেশি রোমান্টিক্।—হঠাৎ সুমিতার বেজায় হাসি এলো। অন্ধকার ঘরে—একা একা আপনমনে যে হাসি, সে হাসি থামতেও বুঝি দেরী লাগে। তাই মুখে কাপড়গুজেও স্বস্তি পায় না সে।……কেন হাসবো না? না ভেবে পারলো না সুমিতা।

জীবনের গতি হারিয়ে, অসাড়—পঙ্গু হ'য়ে গেছে যা'দের মন তা'রাই বাঁচবার জন্য, শুধু বেঁচে থাকবার জন্য, কেমন চমৎকার অভিনয়ের মুখোস্ পরে ঘুরে বেড়ায়। তা'রা হাসে না—কাঁদে না—, তা'রা গান গায় না। সুখ বলে তা'দের কিছুই নেই—, দুঃখের অনুভূতিও তা'দের আছে কি না সন্দেহ।

পরাধীনতার বেদনায় স্থির—অসহিষ্ণু, তা'দের মনের গতি একটা নির্লজ্জ-যোকামীতে পরিণত হ'য়েছে। তাই তা'রা প্রাণ খুলে হাসতে জানে না, হৃদয়-ভাঙা দুঃখের আঘাতেও তেমন করে চোখের জল ফেলতে পারে না।

……ওই যে ছেলেমেয়েগুলো পথে বেরিয়েছে, মুক্তির অধীর আবেগে যা'রা মত্ত হ'য়ে উঠেছে, তা'রা কি সত্যিই সংস্কৃত? পারস্পরিক সহানুভূতি কি তা'দের আছে? তা'রা কি ভুলতে পেরেছে হিংসা, নিষ্ঠুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সঙ্কীর্ণ স্বার্থের হানাহানি?

হঠাৎ অত্যন্ত নরম রকমের ভাবালুতা ঘিরে ফেল্‌লো তাকে। জান্‌লায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির কম্‌মানি দেখতে কেমন লাগে! কিন্তু বাইরে তখন রীতিমত ঝড়। জান্‌লা খুলবার ব্যর্থ চেষ্টায় ঘেমে গেলো সুমিতা। কি বিপদ!

তবু একটু ফাঁক রেখে দাঁড়ালো সে জান্‌লার কোল ঘেঁসে। ভিজে-বাতাস আরও তুরন্ত হ'য়ে তাঁর চোখে-মুখে এসে পড়তে লাগ্‌লো। কিন্তু সুমিতার ভাবনা তখন অনেক দূরের পথে। দৃষ্টি গিয়ে থেমেছে—, ওই রাস্তার ওপাশের লাল্ বাড়ীটার গায়ে—, যেখান থেকে বৃষ্টির জলগুলো অদ্ভুত স্বচ্ছন্দগতিতে তর্ তর্ করে নেবে যাচ্ছে: কি সুন্দর! এমন স্বচ্ছন্দ-জীবনের স্বাদ যে পেয়েছে সে সত্যই সুখী। কিন্তু স্বচ্ছন্দতাই নাকি উন্নতির অন্তরায়, যেহেতু প্রয়োজন বোধ না থাকলে—আবিষ্কারের মোহ জাগে না।…

কিন্তু তবু সুমিতা একবার না ভেবে পারলো না—বর্ত্তমান জীবন-যাত্রায় মানুষের শান্তি কোথায়? কেমন করে আসবে? কোথায় গেলে মানুষ পাবে তেমন শুভ্র-স্বচ্ছ—আলো ভরা জীবনের স্বাদ! স্থিতির মন্ত্র না হারিয়ে, গতির মন্ত্র শিখতে পারবে কোথায়—? কোন্ লোকে? যেখানকার জীবন হবে সত্য—মধুময়—উজ্জ্বল—সুন্দর!

হোমাগ্নি

[উপন্যাস]

শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(দুই)

তাহার পরদিন। দোসরা জুলাই।

ঢং ঢং করিয়া দশটা ঘণ্টা পড়িল। বাস্তবিক আসলে সাড়ে দশটা। স্কুল বসিল। মাষ্টারেরা সকলে আসিয়া অফিস ঘরে একত্র হইয়াছেন। বোর্ডিংএ যাঁহারা থাকেন এবং বাহিরে যাঁহারা থাকেন সকলেই আছেন। বাহির হইতে যাঁহারা আসেন তাঁহারা সকলেই আসে পাশের গ্রামের লোক। এই গ্রামটি হইতে দুই কি তিন মাইল আশপাশের গ্রামেই সকলেরই বাড়ী। বোর্ডিংএ থাকেন হরিদাস বাবু, কালিবাবু চিত্তবাবু আর হিমকড়িবাবু। এসিস্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, ফার্ষ্ট এডিশনাল টিচার সীতানাথ মুখোপাধ্যায়, সেকেণ্ড এডিশনাল টিচার হরেরাম কাব্যতীর্থ সকলেই বাহির হইতে আসেন। পণ্ডিত ঘনশ্যাম বেদান্ততীর্থ এই গ্রামেই থাকেন। নানান ব্যবসায়ের সঙ্গে শিক্ষকতাও চলে। বহু শিষ্য সেবক আছে। কোন শিষ্যের দেওয়া ছোট একখানি বাড়ী পাওয়ায় তিনি এখানেই থাকেন। কেরাণীবাবু বংশী বসু, এই গ্রামেই এক ভদ্রলোকের ছেলেকে পড়ান ও সেইখানেই থাকেন। স্কুল হইতে কিছু দূরে মুসলমান ছাত্রদের জন্য যে বোর্ডিং আছে সেইখানে থাকেন মৌলবী সাহেব, তমিজুল হোসেন, তিনিই তাহাদের দেখাশুনা করেন। তবে চন্দ্রবাবুই ও বোর্ডিংএরও সুপারইনটেনডেন্ট।

স্কুল বসিবার পূর্ব্বেই সকলে আসেন, কিছুক্ষণ গল্পগুজব করেন, তারপর ঘণ্টা পড়িলে ক্লাসে যান। কেরাণী বংশীবাবু বেঁটে খাটো গোলগাল মানুষটী, কাল রং, শান্ত শিষ্ট। কথায় কথায় মিষ্ট হাসি হাসেন। সকলেই তাঁহাকে দেখিতে ভাল বাসে। রাগ বলিয়া কিছুই নাই। তবে নীচের ক্লাসে কোন কোন দিন কোন মাষ্টারের অনুপস্থিতিতে পড়াইতে গেলে মার ধোর যে না করেন এমন নয়। তবে সে প্রহারের পরিমাণ অতি অল্প। একটা আধটা পাতলা চাটি, দুই একটা চিমটি এই পর্য্যন্ত। তিনি স্কুল বসিবার পূর্ব্বেই আসিয়া আপনার চেয়ারে বসিয়া খাতায় রোল টানেন। আজও টানিতেছেন।

ওপাশে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিলেন এসিস্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টার হেমেন্দ্রবাবু ও সীতানাথ বাবু। কালিবাবু ও হরিদাস বাবু যেমন পরস্পরের অনুপূরক, ইঁহারা দুইজনও তেমনি। হেমেন বাবু কালিবাবুর মত লম্বা, দীর্ঘাকৃতি। মাংসল দেহ কালো রং, মাথায় চুল একেবারে ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, সামনে খানিকটা টাক। তিনি অঙ্কের মাষ্টার। ফার্ষ্ট ক্লাস হইতে ফোর্থ ক্লাস পর্য্যন্ত অঙ্ক কষান। তিনি হাতে কতগুলা পেন্সিল চক লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন আর গল্প করিতেছেন।

সীতানাথবাবু পড়ান বাংলা আর ইতিহাস। আলাদা আলাদা থাকা তাঁহার স্বভাব। কথা কম বলেন। যেটুকু বলেন সেটুকু চন্দ্রবাবুর মত মর্য্যাদা-সম্পন্ন না হইলেও, অতি মার্জ্জিত। বাংলা সাহিত্যকে ভাল বাসেন, বিশেষ করিয়া ছন্দ বহুত কবিতা। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভক্ত। সাহিত্য লইয়া কালিবাবুর সহিত মাঝে মাঝে তর্ক করেন। আলোচনায় চিরকাল উভয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। যুক্তিতে কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারেন না। কোন দিন কোন মীমাংসাও হয় না। উভয়েই উভয়ের পক্ষসমর্থনে দুই সমান্তরাল পথে যুক্তি দেন। তবে বিরোধ হয় না। মানুষটি সাহিত্যরসিক বলিয়া স্কুলের সামান্য লাইব্রেরীর ভার তাঁহার হাতে দেওয়া হইয়াছে। মানুষটি যেন শুকাইয়া গিয়াছেন। শুকনো, বেঁটে, সামনের দুইটি দাঁত বেজায় উঁচু। সমস্ত মাথায় টাক ; যে কটি চুল আছে তাহারই জন্য সুগন্ধি তেল এই পাঁড়াগাঁয়ে থাকিয়াও বরাবর ব্যবহার করেন। জামা কাপড় সব সময় সহরের মানুষদের মত সাদা ধবধবে। সঙ্গে একখানি চাদর ব্যবহার করেন। সার্ট পরিলেও চাদর-খানি আনিতে ভোলেন না।

সেকেণ্ড এডিশনাল টিচার হরেরামবাবুর আসিতে প্রতিদিনই দেরী হয়। খালি পায়ে একপা ধূলা লইয়াই অফিসে ঢুকিয়া প্রতিদিনই অকারণ কৈফিয়ৎ দেন। ভদ্রলোকের বাড়ী পাশের গ্রামেই, এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। ছাত্র জীবনে

মেধাবী ছাত্র বলিয়া খ্যাতি ছিল। প্রাইভেটে আই-এ, ও বি-এ, পাশ করিয়াছেন। তাহার উপর কাব্যতীর্থ। তবু মনে শিক্ষার একটুও রং ধরে নাই। তিনি যেন প্রকৃতির অপরিণত প্রাচীন মনের আধুনিক সৃষ্টি। কোন শ্রী নাই, লাবণ্য নাই, তাহার বদলে আছে বিশাল দেহ, দেহে প্রচণ্ড শক্তি। অর্থহীন চোখের দৃষ্টি, খসখসে শরীর, রৌদ্রে বাতাসে অচিকণ শরীরের বহু জায়গায় ফাট। অল্পবয়সী চোর চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িয়া তাঁহার হাতের প্রহারে মরিয়া যায়। তাহাও তিনি সগৌরবে প্রচার করেন। ক্লাসে গিয়া প্রচুর ফাঁকি দেন। পড়াইতেও একেবারে পারেন না। তবু তোষামদের জোরে কোন রকমে টিকিয়া আছেন। সেক্রেটারী হইতে চন্দ্রবাবু, কালিবাবু, হেমেনবাবু সকলকেই একাধারে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। চন্দ্রবাবু সব বোঝেন। কিন্তু ম্যানেজিং কমিটির কুটিল পন্থা তিনি জানেন, তাই চুপ করিয়া থাকিতে হয়। আর তাহা ছাড়া একটা লোককে কর্মহীন করিতেও মায়া হয়।

পণ্ডিত ঘনশ্যাম বেদান্ততীর্থের বয়স প্রায় ষাট। বেদান্ত চাটিয়া মারিয়া দিয়া বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই চাকরীতে তোষামদ এবং জীবনে তেজারতি সম্বল করিয়াছেন। ক্লাসে ঘুমান, ছেলেরা গল্প বলিতে অনুরোধ করিলে বাজে গল্প বলেন, ব্যাকরণ পড়াইতে গিয়া ঘরোয়া কথার আলোচনা করেন। এজন্য বার বার চন্দ্রবাবু তাঁহাকে কঠিন তিরস্কার করেন। তিনি বয়ঃকনিষ্ঠ চন্দ্রবাবুর নিকট প্রতিবার হাতজোড় করিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করেন অসঙ্গত ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি না করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। দুই চারি দিন পর আবার ভুলিয়া যান। স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি। প্রায় লক্ষ টাকার মালিক। স্থূল থলথলে দেহ, চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি, জড়ানো জড়ানো বিচিত্র ভঙ্গীর উচ্চারণ। আর সমস্ত পোষাকে অপরিচ্ছন্ন গ্রাম্যতা ও কার্পণ্য সুপ্রকট।

মৌলবী তমিজুল হোসেন সাহেবকে চন্দ্রবাবু বড় ভাল বাসেন। পাতলা ফর্সা, লম্বা মানুষটি চল্লিশ বছর বয়সেই একেবারে সত্তর বছরের মত বুড়ো হইয়া গিয়াছেন। বিদ্যা অতি সামান্য, তবে তাহাতেই পড়ানোর কাজ চলে। সামনের দাঁতগুলি পড়িয়া গিয়াছে, উপরের যে কয়টি বাকী আছে সেগুলিও ঠেলিয়া বাহির হইয়া যাইতে চাহিতেছে। কোন রকমে নীচের ঠোঁটের ঠেলা দিয়া তাহাদের ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন। কথায় কথায় প্রাণ খুলিয়া হাসেন। হাসিতে আরম্ভ করিলে হাসি আর থামিতে চায় না। প্রাণখোলা সরল লোক। শিশুর মত সরল। পৃথিবীতে কোথাও কেহ নাই। মাঝে মাঝে স্বধর্মী ছেলেদের মিঠাই কিনিয়া খাওয়ান, হিন্দুধর্মী ছাত্রেরা উপস্থিত থাকিলে তাহাদেরও বিশেষ স্নেহের সহিত খাওয়াইয়া থাকেন। তাঁহার সাদা দাড়ি ও মাথার সাদা টুপি দেখিলেই ছেলেরা খুসী হইয়া উঠে।

সাড়ে দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই গল্প শেষ করিয়া নেম রেজিষ্টার হাতে করিয়া যে যার ক্লাশে চলিয়া গেলেন। কালিবাবু ও সীতানাথবাবুর লিখার। কালিবাবুর হাতে স্কুলের ক্যাশের ভার, তিনি খাতা ও বাক্স খুলিয়া ক্যাশ মিলাইতে লাগিলেন। চাবি হাতে করিয়া সীতানাথবাবু লাইব্রেরী ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। বংশীবাবু কল টানিতেছিলেন, তাঁহার সেই কাজেই চলিল।

কয়েক মিনিট পরেই চন্দ্রবাবু আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। চোখে চশমা, গায়ে গরদের কোট, তাহার উপর গরদের চাদর, পরণে মিলের ধুতি, পায়ে শালিশ করা শু। দেখিলে সম্ভ্রম হয়। চিঠি লেখার কাজ বাকী পড়িয়াছিল, তিনি চিঠির জবাব লিখতে বসিলেন।

সোয়া এগারটায় প্রথম ঘণ্টা পড়িল। মাষ্টার বদল হইল। একবার অফিসঘর ভরিয়া গেল, আবার খালি হইয়া গেল। চন্দ্রবাবু সব চিঠির জবাব ইংরাজীতে লিখিয়া, বাংলায় শেষ চিঠিখানা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। অন্য চিঠিগুলা বংশীবাবুকে দিলেন পোষ্ট করিবার জন্য। তারপর শেষ চিঠিখানা লেখা শেষ করিয়া কাজ করিলেন। তারপর ভুরুতে রাখিয়া উঠিয়া গেলেন ক্লাসগুলা তদারক করিতে, কেমন পড়ান চলিতেছে দেখিবার জন্য।

অফিস খালি। বংশীবাবু গিয়াছেন চিঠিগুলা চাকরকে দিতে। শুধু কালিবাবু হিসাব লিখিতেছিলেন। তিনি উঠিয়া ধীরে ধীরে ভুরার হইতে খামগুলো বাহির করিয়া ফেলিলেন। খামটা বন্ধ নয়। ভিতরের চিঠিখানা বাহির করিয়া পড়িলেন। তারপর যেমন ছিল রাখিয়া দিয়া নিজের

জায়গায় আসিয়া বসিলেন। চন্দ্রবাবু তারণ ভট্টচায্‌কে স্কুলে চাকরী দিলেন? তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া! তাঁহার গোপন ইচ্ছাটা চন্দ্রবাবুর অজানা ছিল না। তিনি একটা নিশ্বাস টানিয়া লইয়া আপনার জায়গায় বসিলেন। কাজে মন গেল না। খাতা বন্ধ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিলেন। ওদিকে আমবাগানে আমগাছের ওপাশে একটা ছেলে বিড়ি টানিতেছে। কে ও? ফোর্থ ক্লাসের নরেন। নরেন! তিনি শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিলেন। গভীর চিন্তার সময় এমনি শূন্য-দৃষ্টি তাঁহার চোখে ফুটিয়া ওঠে।

তারণকে তিনি বর্ত্তমানে কাজ দিয়াছেন এবং যাহাতে তাহাকেই রাখা হয় সেইজন্য তারণের যোগ্যতার কথা বিশেষ-ভাবে ফলাও করিয়া লিখিয়াছেন সেক্রেটারীকে, যদিও তারণকে রাখা সেক্রেটারীরই অনুমোদন সাপেক্ষ—এ কথা লিখিতেও চন্দ্রবাবু ভুলেন নাই। কিন্তু চন্দ্রবাবুকে তিনি যে ইঙ্গিত দিয়াছিলেন তাহা তিনি ভুলিলেন কি করিয়া?

তাঁহার হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। ক্লাস আছে। ফার্ষ্ট ক্লাসে জুগোল পড়াইতে হইবে। ঘড়িতে দেখিলেন সাড়ে এগারটা। দেরী হইয়াছে—তবে বেশী নয়, পনর মিনিট মাত্র। তিনি বাক্সে খাতা বন্ধ করিয়া তর তর করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে লাগিলেন। আজ কি পড়াইতে হইবে? মনে পড়িতেছে না তো?

অফিস ঘর হইতে নামিয়া চন্দ্রবাবু মাটির উপর দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিলেন। এ তাঁহার রাজত্ব, সাধনার পীঠ। ইহার সব কিছুর সহিত তাঁহার বুকের রক্ত, তাঁহার হৃদয়ের মমতা মিশিয়া আছে।

চারিদিকে একতলা বাড়ী। উত্তরে গেট, দক্ষিণে গেট। পশ্চিম দিকে সরু গলি পথ। মাঝখানে ঘাসে ঢাকা মাঠ। উত্তর দিকে স্কুল বাড়ীর মস্ত দাওয়া-উঁচু বাড়ী গেটের ধার পর্য্যন্ত। সামনে মস্ত হল। একটা কাঠের পার্টিশন দিয়া দুইটা ক্লাস হয়। পরীক্ষার সময় বা কোন মিটিং কি উৎসবের সময় পার্টিশনটা সরাইয়া গোটা হলটা ব্যবহার করা হয়। হলের এ পাশে দুইখানা ঘর। একখানা অফিস ঘর। একখানা হেডমাষ্টারের বসিবার ঘর। ও পাশের দুখানা ঘরের একখানায় সেভেন্‌থ ক্লাস বি, সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণী। তাহার পাশের ঘরখানা স্কুলের যাবতীয় অব্যবহার্য্য, প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় জিনিষে বোঝাই, সেখানা তালা বন্ধ থাকে। বিশেষ তত্ত্ব দেখাইবার প্রয়োজন হইলে দুই চারজনকে সেই অন্ধকার ঘরে পুরিয়া রাখা হইবে বলিয়া শাসানো হয়। কাজেই সে ঘর খানার জন্য ছোট ছেলেদের অন্তর কাঁদে না। হলের গায়ে লাগান তিনখানা ঘর। এক-খানায় মৌলবী সাহেবের ক্লাস হয়। পরের খানায় সেভেন্‌থ ক্লাস এ। তাহার পরের খানা, অফিসের লাগাও সেখানি—লাইব্রেরী। এই বাড়ীখানার পরই স্কুলের গেট। তাহার পর একতলা পাকা বাড়ী একখানা। সেখানা বোর্ডিং। ছোট ছোট ঘরে ভাগ করা, প্রতি ঘরে দুই তিন জন করিয়া থাকে। ঘরের সামনে মস্ত বারান্দা। উহারই সামনের দিকে, গেটের পাশেই চন্দ্রবাবুর ঘর। এ বোর্ডিংটার নাম পাকা বোর্ডিং। তাহার পরই পূর্ব্ব দিকে রান্নাঘর, আর খাবার দুইটা বড় চালা। তাহার পর দক্ষিণ দিকে দুইটি বোর্ডিং। একটি মাটির, একটি পাকা। তাই একটির নাম মাটির বোর্ডিং, অপরটি কৃতপূর্ব্ব সুপারিন্‌টেনডেন্ট তারিণীবাবুর নামে তারিণী বোর্ডিং। আর সমস্ত পশ্চিমটা জুড়িয়া খুব দাওয়া-উঁচু একতলা বাড়ীতে বড় বড় চারখানা ঘর। উপরের চারটা ক্লাস হয় সেখানে। চন্দ্রবাবু আবার একবার চারিদিকে তাকাইলেন। সদ্য চুন দেওয়া বাড়ীগুলি দুপুরের অত্যুজ্জ্বল রৌদ্রে ঝলমল করিতেছে। জায়গা ভাল লাগিল তাঁহার। তিনি উত্তরের স্কুলঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

তিনি প্রথমেই ঢুকিলেন সব চেয়ে নীচের ক্লাসে, সেভেন্‌থ্ ক্লাস বিতে। চিত্তরঞ্জনবাবু হাতের লেখা শেখাইতেছেন। প্রথমে বোর্ডের উপর 'dog' 'cat' প্রভৃতি লিখিয়া দিয়া সেগুলি সেই রকমভাবে লিখিতে বলিয়াছেন। তাহাদের লেখা হইয়া গেলে খাতাগুলি দেখিয়া অক্ষরের ভঙ্গী ঠিক করিয়া দিতেছেন। কাহারও অক্ষর হেলিয়া এলাইয়া পড়িয়াছে সেগুলি সোজা করিতেছেন। কাহারও অতি ক্ষীণ শক্ত গঠনের অক্ষরকে মোটা সবল করিয়া দিতেছেন। কাহারও অসমান অক্ষরকে সমান করিয়া, কাহার ছোট অক্ষরকে বড় করিয়া লিখিয়া দিতেছেন। চন্দ্রবাবু বাহির হইয়াই হলে পড়িলেন। সেখানে ফিফথ ক্লাসে তিনকড়িবাবু বাংলা পড়াইতেছেন।

তিনি দাঁড়াইতেই ছেলেরা বেঞ্চ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি বসিতে বলিলে সকলে বসিল। তিনকড়ি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা পড়াইতেছে। তিনকড়ি কথা কহিবার সময় যে পরিমাণ অঙ্গভঙ্গি করে পড়াইতে গিয়া তাহার দশগুণ করিতেছে। চন্দ্রবাবুর হাসি আসিল। তিনকড়ি পড়িতেছে, "চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের কণ্ঠ কোথায় বাজে রে। সে আমাদের বাংলা দেশ, আমাদেরই বাংলা রে।" তিনকড়ি একটি ছেলেকে প্রশ্ন করিল—চণ্ডীদাস কে? তিনকড়ি পড়ায় খুব ভাল। অত সহজ ও সরল করিয়া বুঝাইতে আর কেহ পারে না। চন্দ্রবাবু খুশী হইয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মনে কবিতার চরণ দুইটি গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল।

চলিতে চলিতে হলের পাশেই সেকেণ্ড ক্লাস এ'তে গোলমাল শুনিতে পাইলেন। তিনি ঢুকিয়া পড়িলেন। ক্লাসের গোলমাল এক মুহূর্তে থামিয়া গেল, ছেলেরা একসঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। হরেরাম বাবুর অঙ্কের ক্লাস—তিনি বাহিরে গিয়াছেন। তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি ছেলেদের গোলমাল করিতে নিষেধ করিয়া বাহির হইতেছেন এমন সময় হরেরামবাবু ক্লাসে ঢুকিলেন। অনাবশ্যক ভাবে বলিলেন—একটু কাজ ছিল। মুখে অপ্রতিভ হাসি। চন্দ্রবাবু ক্লাস হইতে বাহির হইলেন। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই সাবরেজিষ্ট্রি অফিসে কোন খাতকের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সুদী কারবারের কারবারী। তিনি সিক্সথ ক্লাসে হলের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন। কবিতার কলি দুইটা তখন মনে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সিক্সথ মাষ্টারের মৃত্যুর পর হইতে একজন মাষ্টারের অভাব হইয়াছে। বংশী বাংলা ব্যাকরণ পড়াইতেছে। বংশী পড়াইতেছে স্বরসন্ধির সুপ্রাচীন সূত্র। নয় যুক্ত ইন্দ্র—নরেন্দ্র। কারণ যদি অকার কিম্বা আকারের পর ই-কার বা ঈ-কার থাকে তাহা হইলে—। শিখুক, ছেলেরা সন্ধি শিখুক। ব্যাকরণ ভাল করিয়া না শিখিলে মাতৃভাষা ভাল করিয়া শিখিতে পারিবে না। চন্দ্রবাবু ক্লাসটা পার হইয়া অফিসে গিয়া ঢুকিলেন। চাকর রামচরি উপু হইয়া বসিয়া আছে। বংশী তাহাকে শূন্য অফিস ঘর পাহারা দিতে রাখিয়া গিয়াছে। তিনি অফিস হইতে বাহির হইয়া পশ্চিমের দিকের বারান্দাতে গিয়া ফোর্থ ক্লাসে উঠিলেন।

সীতানাথ বাবু বাংলা পড়াইতেছেন। চমৎকার পড়াইতেছেন। চমৎকার কথা! কাহার লেখা? "তুমি কে, যে তুমি আলস্যের বিলাস-দোলায় মধুর বিলাসে সময় যাপন করিবে, আর আমি চৈত্রের রৌদ্র ও শ্রাবণের বৃষ্টি মাথায় বহিয়া তোমার জন্য ভোগাবস্তু আহরণ করিব?" আর দেখিবার দরকার নাই। ভদ্রলোক চমৎকার পড়াইতেছেন। তিনি পাশের ঘরে থার্ড ক্লাসে গিয়া ঢুকিলেন।

সেখানে হরিলালবাবু ইতিহাস পড়াইতেছেন। "খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্মের তমসারাশির উপর পৌরাণিক ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। লুপ্তপ্রায় চিন্তাক্ষমতা পুনরায় জাগ্রত হইল। ইহাই ব্রাহ্মণ প্রবর্তিত বিপ্লব। এই সময়ে তিন চারিশত বৎসরের মধ্যে কালিদাস, ভবভূতি, বানভট্ট, অর্থাভট্ট, বরাহ-মিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত জীবিত ছিলেন। ইহা ভারতীয় সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ।" চন্দ্রবাবুর আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু সময় নাই। যি: এ.তে তাঁহার ইতিহাস ছিল। তখন কালিদাস, ভবভূতি বলিতেই কল্পনায় কি স্বর্ণছায়াই না পড়িত! আজও তাহার ম্লান ছায়া পড়িল।

সেকেণ্ড ক্লাসে ঘনশ্যাম পণ্ডিত মহাশয় রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত অংশ পড়াইতেছেন। "অহং যদ্য যাতি তত্র মাকতো-বাতি শঙ্কিত। তীব্রাংশুঃ শিশিরাংশুশ্চ তথাং সন্তপ্ততে ভিষি।" পণ্ডিত ব্যাখ্যা করিতেছেন। "রাবণ বলছেন সীতাকে, মহাবীর রাবণ সীতার কাছে আপনার বীরত্বের, শৌর্যের অহঙ্কার করছেন, বলছেন—"। চন্দ্রবাবু আর শুনিলেন না।

ফার্স্ট ক্লাসে কালিবাবু ভূগোল পড়াইতেছেন। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক-ম্যাপ বোর্ডে টানান। কালিবাবুর মত ভূগোল খুব কম শিক্ষকই পড়াইতে পারেন। পড়াইতেছেন ভারতের জল-বায়ু। তাঁহার চোখে অপ্রাজ্ঞর সূক্ষ্ম দৃষ্টি। "এই মহাদেশের মত বিশাল ভূখণ্ডের প্রকৃতি অতি বিচিত্র ও বিচিত্র। তাই এর জলবায়ুতেও এত প্রভেদ ও বৈচিত্র্য। উত্তরে বহু হাজার ফিট উঁচু পর্বত চিরকাল বরফে আবৃত হয়ে হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত হয়ে আছে। সে অঞ্চল অতি শীতল—শীত ছাড়া সেখানে আর কোন ঋতু নাই। তার নীচে

পাঁচ থেকে সাতে সাত হাজার ফিট উপরে পাঁচ থেকে পঁচিশ মাইল চওড়া মন অথবা, হাজার হাজার মাইল তার বিস্তার, ঘন কালো অন্ধকার আর বিচিত্র হিংস্র জন্তুতে সে বনভূমি অগম্য, মনুষ্য বাসের অযোগ্য। তবু সেখানে মানুষের সামান্য সামান্য বসতিও দেখা যায়। ভারতের পূর্ব্ব সীমান্ত আসাম ও ব্রহ্মদেশের উত্তর পশ্চিমাংশ ইহারই অংশ বিশেষ। অবশ্য বর্ষণে ভয়ঙ্কর। কিন্তু পশ্চিম প্রান্তে ইহারই বিপরীত দেশ। সিন্ধুর সমান্তরাল ধূ ধূ মরুভূমি, তৃণ-গুল্মহীন বালিয়াড়িতে ভর্ত্তি। সেখানে বরুণহীন আকাশ, জলন্ত সূর্য্য। এরই মাঝখানে মনুষ্যবাসযোগ্য সিন্ধু গাঙ্গা সমতলভূমি কোটি কোটি মানুষের পদক্ষেপে, প্রাণের কোলাহলে পরিপূর্ণ। কৃষিতে, সভ্যতায়, শান্তিতে, ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ। এর দক্ষিণে—" কালিবাবুর চোখে সেই মুগ্ধ দৃষ্টি। ঐ বিচিত্র প্রকৃতির প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অনুভূতি মস্তিষ্কের কোষে, স্নায়ুতে সঞ্চারিত হইয়া চোখে আনন্দিত বিস্ময়ের যে দৃষ্টি ফুটাইয়া তোলে সেই দৃষ্টি তাঁহার চোখে। চন্দ্রবাবুর মনে হইল তাঁহার নিজের চোখেও সেই দৃষ্টির আভাস আসিয়াছে। একমনে ছেলেরা শুনিতেছে, তাহারাও বোধহয় অমনিই কল্পনায় আচ্ছন্ন। তিনি বাহির হইলেন।

ভৌগোলিক বৈচিত্র্যে বিচিত্র ভারতবর্ষ, রাম-সীতা-রাবণের কাহিনী সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ, কালিদাস-ভবভূতির কাব্য সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ; তাহারই পরিচয় ছাত্রেরা লাভ করিতেছে। মনে প্রাণে তাহারা সে শিক্ষা গ্রহণ করুক। বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য তাহারা সুন্দর করিয়া শিখুক। ব্যাকরণের সকল জটিলতার মধ্য দিয়া আপনার মাতৃভাষার সহজ সরল রূপটি তাহারা চিনিয়া লউক। ব্যাকরণ না পড়িলে ভাষা শেখা যায় না। সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহারা পরোপকার করিবার আনন্দ জয়ের শিক্ষা পাইবে। শক্ত, সমর্থ চরিত্রের মানুষ হইয়া তাহারা দেশের লোককে ভাল বাসিবে, দরিদ্রের দুঃখে বিচলিত হইয়া তাহা দূর করিতে প্রাণপাত করিবে, তাহারা দশকে, দেশকে ভালবাসিবে, দেশের প্রাচীন ও বিগত সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনিবে। ভাবিতে ভাবিতে তিনি মাঠে নামিলেন। মাঠে একটিও ছেলে নাই, সকলেই ক্লাসে। মাথার উপরে জলন্ত সূর্য্যের আলোয় সমস্ত স্কুল কানন করিতেছে। সমস্ত স্কুলে চাপা, গুরুন ধ্বনির আকারে সেই প্রশান্ত প্রার্থনাই ধ্বনিত হইয়া ঊর্দ্ধলোকে উঠিতেছে। মানুষ গড়িবার সাধনা চলিতেছে।

তিনি প্রশান্ত মনে অফিসে গিয়া ঢুকিলেন। দেখিলেন তারণ ভট্টাচার্য্য আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই একটু হাসিয়া তারণবাবু উঠিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। চন্দ্রবাবুর মনে পড়িল। তারণবাবুকে সিক্সথ ক্লাসে ব্যাকরণ পড়াইতে দিতে হইবে। তারণবাবু কঠিন ঠিক করাই আছে। তার পূর্ব্বে অন্য মাষ্টারদের কথাটা জানানো প্রয়োজন।

এমন সময় ঘণ্টা পড়িল। সকলেই একে একে আসিয়া অফিস ঘরে ঢুকিলেন। তারণবাবু সকলেরই পরিচিত। সকলেই তারণবাবুকে দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইলেন এবং আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তারণবাবুর হইয়া উত্তর দিলেন চন্দ্রবাবু। সকলকে উদ্দেশ করিয়া একটু গলা তুলিয়া বলিলেন—শুনুন মশাই, আপনাদের বলতে মনে ছিল না। সিক্সথ মাষ্টার মশায়ের মৃত্যুর পর হ'তে একজন মাষ্টারের অভাবে কত কষ্ট হচ্ছিল তা তো আপনারা দেখেছেন। তাই তারণবাবুকে নিয়ে নিলাম।

সকলেই বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়া মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন। এ রকম পরিস্থিতির জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। সকলেই চুপ করিয়া গেলেন। কালিবাবু ও হেমেন বাবু স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভ্য। সকলের অগোচরে তারণ বাবুকে চাকরী দেওয়ায় বলিবার কাহারও কিছু নাই। যদি কিছু অধিকার কাহারও থাকে তবে সে ঐ দুই জনের। তবে হেমেন বাবু কখনও প্রতিবাদ করেন না, আবার কোন নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করিবার চেষ্টাও তাঁহার নাই। অবশ্য ম্যানেজিং কমিটির প্রত্যেকটি সভায় উপস্থিত থাকেন। চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, সমস্ত আলোচনা মন দিয়া শুনিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু শোনা হয় না। ভোটের সময় প্রয়োজন মত সেক্রেটারী ও হেডমাষ্টারের মতে ভোট দিয়া উঠিয়া যান। স্কুলে নিয়মিত আসেন, নিয়মিত পরিশ্রম করেন, ফাঁকি দেন না। স্কুলের সহিত তাঁহার কেবল চাকরীর সম্বন্ধ। অবসর সময়ে স্থানীয় ইউনিয়ান বোর্ডের কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকেন। তিনি সেখানকার

সরকার মনোনীত সভ্য এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট। এই স্কুলের সেক্রেটারী সদানন্দ বাবু প্রেসিডেন্ট, তিনি কোনও মিটিংএ উপস্থিত থাকেন না। হেমেন বাবুকেই সব কাজ চালাইতে হয়। তিনি নিজে অবশ্য কোন কাজ নিজের দায়িত্বে করেন না, সমস্ত সভ্যের মতামত লইয়া একটা সামঞ্জস্য করিয়া কাজ করেন। কাজেই তারণ বাবুকে চাকরী দেওয়ায় তাঁহার বলিবারও কিছু ছিল না। তিনি শুধু বলিলেন—কই, জানতাম না তো আগে! তাঁহার অঙ্কের ক্লাস আছে, তিনি বাহির হইয়া গেলেন। অন্য সকলে নীরবে আপন আপন ক্লাসে চলিয়া গেলেন। কেবল মৌলবী সাহেব হা হা করিয়া হাসিয়া চন্দ্রবাবুর কাজের অনুমোদন ও তারণবাবুকে আন্তরিকভাবে প্রশংসা করিয়া গেলেন—বাঃ, আচ্ছা করেছেন হেডমাষ্টার সাহেব। তারণ বাবু সাচ্চা আদমী। কাজ উনি বহুৎ আচ্ছা করবেন—আপনি দেখবেন।

অন্য সকলের নীরব অনিচ্ছার কারণ সকলের কাছেই অত্যন্ত স্পষ্ট, কেহ সে কথা আলোচনা না করিলেও তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তারণবাবু আনন্দময়ের বন্ধু বলিয়া তাঁহাকে ইহারা কেহ সহ্য করিতে পারেন না। আনন্দময়ের চরিত্রের সঙ্গে ইহাদের সকলের কোথায় অমিল আছে, তাহা স্পষ্ট প্রকট নয়, অতি গূঢ়। আনন্দময় সম্বন্ধে যখন কোন আলোচনা হয় তখন কিছুক্ষণ দুই চারিটা নিন্দা করিতে করিতেই সকলে উত্তপ্ত হইয়া উঠেন। তবে অসহিষ্ণু হওয়া চলে না। কারণ তাঁহাদের সহিষ্ণুতার সীমা নাই। আনন্দময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতেও দুই একজন আসিয়াছেন। সামান্য আঘাতেই ইহাদের আদর্শ ভ্রষ্টতার ও চারিত্রিক তুচ্ছতার কথা তাঁহার চোখে বড় হইয়া উঠে, তখন তাঁহার তর্কের ভাষা কঠোর হইয়া উঠে, ভঙ্গী কঠিন ও কুটিল হইয়া দাঁড়ায়, কণ্ঠস্বর আবেগময় হইয়া বিপুল বেগে আঘাতের বর্ষণ হয়। প্রত্যুত্তরে অতি সহিষ্ণু শিক্ষকটি মনে মনে জ্বলিয়া পুড়িয়া গেলেও মুখে ভাষা ফোটে না, সামান্য মৃদু প্রত্যুত্তরে সে বন্যা বাঁধিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোথায় ভাসিয়া যান। এই কারণে শিক্ষকদের সকলেই আনন্দময়কে ভয় করেন এবং সেই কারণেই বিরুদ্ধতারও অন্ত নাই।

সকলেই নীরবে বাহির হইয়া যাওয়ায় সমস্ত ঘরের আবহাওয়াটা কেমন অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল। চন্দ্রবাবুও তাহার চাপে কেমন চুপ করিয়া গিয়াছিলেন। সেটা জোর করিয়া কাটাইয়া উঠিবার জন্য অকস্মাৎ গা ঝাড়া দিয়া উঠিলেন এবং একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া খানিকটা সহজ হইয়া উঠিলেন। তারপর তারণবাবুকে বলিলেন—চলুন ফিফ্‌থ্ ক্লাসে আপনি ইতিহাস পড়াবেন। আপনাকে বলিয়ে দিয়ে আসি। তারণবাবু নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনিও চলিতে ফিরিতে পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেলেন।

তারণবাবুকে ক্লাসে বসাইয়া দিয়া আসিয়া যখন চন্দ্রবাবু অফিসে ঢুকিলেন তখন বংশীবাবুও নাই। কেবল কালিবাবু মুখ নীচু করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। কালিবাবু কেন অমন করিয়া বসিয়া আছেন তাহা চন্দ্রবাবু সবই বুঝিতে পারিলেন, তবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কি কালিবাবু, অমন করে বসে কেন?

মুখ তুলিয়া কালিবাবু জবাব দিলেন—না এমনিই। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন—আপনি কিন্তু তারণকে না রাখলেই পারতেন চন্দ্রবাবু। আমি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার বলে বলছি না। কিন্তু আপনি মাষ্টারদের সকলের মতামত তো এ বিষয়ে জানেন! যদি তারণকে রাখতেই আপনার ইচ্ছা ছিল, তা হলে আগে একবার মাষ্টারদের জিজ্ঞাসা করে নিলে ভাল হোত।

—সেই ভয়েই তো পারিনি। এমন অবস্থা দাঁড়াল যে তারণকে না রেখে আর উপায় ছিল না। তাই পাছে অন্য মাষ্টারদের জিজ্ঞাসা করলে কোন গোলমাল বাধে, সেইজন্যেই ওটা আর করিনি।

কালিবাবু কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। তবু সে মনোভাব চাপিয়া কেবল যেন কিছু বলিবার জন্যই বলিলেন—এমন কি অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যাতে আপনি তারণকে রাখতে বাধ্য হয়েছেন—তা আমি জানি না, জানতেও চাই না। তবে কাজটায় মাষ্টাররা সব ক্ষুব্ধ হয়েছেন, দেখলেন তো!

চন্দ্রবাবু একটু বিচলিত হইলেন। কেহ তাহার ব্যবহারে কি কারণে আঘাত পাইয়াছে এ চিন্তা ও সংবাদ তাঁহার কাছে বড় বেদনাদায়ক। তিনি অল্প একটু ইতস্ততঃ করিয়া

বলিলেন—দেখুন, মাষ্টাররা যদি আঘাত পেয়ে থাকেন এতে আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি নাচার। আর আপনাকে বলতে বাধাই বা কি! সেদিন রাত্রে তারণবাবুকে সঙ্গে করে আনন্দবাবু আমার কাছে এসেছিলেন। বললেন—তারণের একটা চাকরী আপনি করে দিন। একটা তো আপনার হাতে রয়েছে। ভদ্রলোক বললেন, আমারও কেমন মনে হ'ল। কথা দিয়ে ফেললাম। কিন্তু কাজ দিয়ে তো কোন দোষের কিছু হয় নি। তারণের মত উপযুক্ত লোক অত অল্প মাইনেতে আপনি তো আর পাবেন না! আর তা ছাড়া লোকটি আসলে বড় 'নিভি'।

কালিবাবু চুপ করিয়া থাকিলেন। তাঁহার মস্তিষ্ক অতি-মাত্রায় সচল হইয়া উঠিয়াছে। চন্দ্রবাবুর সঙ্গে আনন্দময়ের যোগাযোগ তো বড় বিচিত্র! কিন্তু কেন? ইহার আসল রহস্যটা কি? এ সংবাদ পাইলে সমস্ত শিক্ষকদের বিক্ষুব্ধ মন একেবারে তিক্ত হইয়া উঠিবে। কালিবাবু সম্পূর্ণভাবে সংবাদটি লইবার জন্য আবার প্রশ্ন করিলেন—কিন্তু কেন মশাই? আনন্দময়কে কথা দিলেন! ব্যাপার কি?

চন্দ্রবাবু একটু আত্মগত সুরে বলিলেন, দেখুন ভদ্রলোক তো কখনও নিজের স্বার্থ নিয়ে লড়াই করে নি। আর নিজের কি পরের কোন প্রয়োজনে আর কখনও আমার কাছে আসেনি। প্রথম এলেন, আর ফেরাতে পারলাম না। কেমন বেধে গেল। তাই কথা দিয়ে ফেললাম।

চন্দ্রবাবু চুপ করিলেন। তাঁহার মনে আনন্দময়ের কথাই সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। কালিবাবুও চুপ করিয়া বসিয়া। পাশের ক্লাসে মৌলবী সাহেব স্বাস্থ্যতত্ত্ব পড়াইতেছেন। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেমন ভাবে স্বাস্থ্যের কোন নিয়মটী, কখন পালন করিতে হয় তাহা বুঝাইতেছেন। ওপাশে তারণবাবু বোধ হয় আলাউদ্দিন খল্‌জী পড়াইতেছেন। কালি বাবু শুনিয়া ভাবিলেন কি হবে? ওসব পড়ে কি হবে? স্বাস্থ্যের নিয়ম জেনেও তো সকালে উঠেই দাঁত মাজতে ভুলে যাবে। আর বাড়ী গিয়ে আলাউদ্দিন খল্‌জীর রাজ্য জয়ের কথা ভাবতে ভাবতে পান্তাভাত খাবে; একটু নুন কম হ'লে কাঁদতে কাঁদতে আরও নুন চাইবে। এই লেখাপড়া!

এমন সময় ঢং ঢং করিয়া টিফিনের ঘণ্টা বাজিল। আধ ঘণ্টা টিফিন। সকলে একবার অফিসে আসিয়া আবার বাহির হইয়া গেলেন। বোর্ডিংএ গিয়া এবার তাঁহারা বিশ্রাম করিবেন। অফিস খালি। চন্দ্রবাবু কাজ করিতে লাগিলেন।

[ক্রমশঃ]

সুন্দরের আবির্ভাব

শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী

ঐ যেখানে শিশুরা সব করে ধূলাখেলা
সরল প্রাণের উল্লাসে তোর ভ'রে সারাবেলা,
ঐখানেতে সহজ সরল সোহাগ-কাঙাল বেশে,
সুন্দর হে, ধূলির ধরায় দাঁড়াও তুমি এসে।

ঐ যেখানে মায়ের বুকের গভীর অতল স্নেহে
স্বর্গ আসে হর্ষে নেমে ধূলি-মাটির গেহে,
ঐখানেতে ক্ষুধায়-ভরা স্নেহ-আতুর বেশে
সুন্দর হে, ধূলির ধরায় দাঁড়াও তুমি এসে।

ঐ যেখানে মাটির দুলাল সরল চাষীর দল
সোনার ফসল ফলায় মাঠে খুঁড়ি' মাটির তল,
ঐখানেতে সবল দেহে নিবিলাসী বেশে
সুন্দর হে, ধূলির ধরায় দাঁড়াও তুমি এসে।

ঐ যেখানে বাঁশীর ডাকে চিত্ত-পাগল-পারা,
কলঙ্কিনী কুল-কামিনী হ'য়েছে ঘর-ছাড়া,
ঐখানেতে বোধের অতীত রহস্যময় বেশে
সুন্দর হে, ধূলির ধরায় দাঁড়াও তুমি এসে।

ঐ যেখানে বিশ্ব জয়ের বিপুল আশা বুকে
নিঃস্বতারে ক'রছে বরণ আনন্দে ও সুখে,
ঐখানেতে আপন-ভোলা দেবতারি বেশে।
সুন্দর হে, ধূলির ধরায় দাঁড়াও তুমি এসে।

জাতি-বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ (৪)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ইংরেজী শিক্ষার আপাত ফল দেখিয়া চার্লস ট্রেভিলিয়ান ভাবিয়াছিলেন ভারতবাসীরা সমুদায়ই একেবারে ইংরেজ বনিয়া যাইবে। এরূপ চিন্তার জন্য ট্রেভিলিয়ানকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ ১৮৩৫ সালে অনুসৃত শিক্ষানীতির এইরূপ পরিণতিই কর্তৃপক্ষ আশা করিয়াছিলেন। ভারতবাসীর যদি কোন নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য না থাকিত তাহা হইলে তাহারা অনায়াসেই এই নবাগত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মধ্যে আত্মবিলোপ করিয়া ফেলিতে পারিত। যেমন পৃথিবীর অন্যান্য বহু অঞ্চলের অধিবাসীরাই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আওতায় আসিয়া ইহার দোষ গুণ বিচার না করিয়াই ষোল আনা সাহেব হইয়া গিয়াছে। ফলে ভারতবাসীর নিজস্ব সংস্কৃতির অস্তিত্ব বা প্রাচীনত্ব কল্পনাও করিতে পারেন নাই। বিলাতে ভারতবাসীরা যেরূপে চিত্রিত হইয়াছিল তাহাতে তিনি তাহাদের 'ভূতলে অধম জাতি' বলিয়াই ভাবিতে ও বুঝিতে শিখিয়াছিলেন।

ভারতবাসীরা তখন সত্যসত্যই ভূতলে অধম জাতি। সদ্যগত পঞ্চাশের মন্বন্তরের ফলে কত বাঙালী প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে তাহার সংখ্যা এখনও নির্ণীত হয় নাই। তবে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালী এই মন্বন্তরে আত্মাহুতি দিয়াছে তাহা হইলে মোট সংখ্যা ধরিয়া অনুপাত করিলে বলা যায় প্রতি বার জনে এক জন মারা গিয়াছে। কিন্তু কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে তিন কোটী বাঙালীর মধ্যে এক কোটি, অর্থাৎ প্রতি তিন জনে এক জন মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ইহার ফলে বাঙালীর সমাজ-জীবন তখন পর্যুদস্ত, বিধ্বস্ত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরে সরকারী ভূমিবণ্টন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, বিদেশী ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির ফলে যে বাঙালী সমাজ উদ্ভূত হইল তাহা দেশের জল মাটির পক্ষে একেবারেই নূতন। তাহারা প্রাচীন সামাজিকতা ভুলিয়া প্রতীচীর ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সভ্যতার আশ্রয়ে বড় হইতে লাগিল। চার্লস গ্রাণ্ট এই বাঙালী সমাজের মধ্যেই স্বদেশপ্রেমের চিহ্নমাত্রও দেখিতে পান নাই। দৈবদুর্বিপাকে পড়িয়া তখন যে সমাজ গড়িয়া উঠিতেছিল তাহা দেখিয়াই তিনি কুৎসিত মন্তব্য সকল করিয়াছিলেন। এই সমাজের সঙ্গে পুরাতনের খুব কমই মিল ছিল, অথচ নবাগত ইউরোপীয় ভাবধারাকে গ্রহণ করিতেও ছিল ইহা সম্পূর্ণ অক্ষম।

ভারতীয় স্বজাতিপ্রীতিও কিন্তু মোটেই পাশ্চাত্ত্য ধরণের ছিল না। পাশ্চাত্ত্য স্বদেশপ্রেম বা স্বজাতিপ্রীতি সাধারণ মানবপ্রীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। অন্যকে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত বা পদদলিত করিয়া, তাহার সর্বস্ব আত্মস্থ করিয়া নিজের দেশ ও জাতিকে বড় করিব এই তাহার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য হইতেই তাহার 'নেশন্যালিজম' বা জাতীয়তাবোধের উৎপত্তি। ইহার পরিণতি হইয়াছে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে। আধুনিকতম ফাসিবাদ বা নাৎসিবাদ এই সাম্রাজ্যবাদেরই বিভিন্ন রূপ। প্রাচীন কাল হইতে ভারতবাসীর স্বদেশপ্রেম ছিল অন্তর্মুখী। নিজের দেশ ও নিজের জাতিকে আমরা বড় করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা অন্যের ঘাড় মটকাইয়া নহে। নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিয়া তাহা নিজের দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা ছিল সনাতন রীতি। বার মাসে তের পার্বণের ঘটা, পুষ্করিণী খনন, রাস্তাঘাট নি ।, পথিপার্শ্বে বৃক্ষাদি রোপণ, টোল-চতুষ্পাঠী স্থাপন, বিদ্বজ্জনকে ও বিদ্যার উন্নতিতে যথোপযুক্ত সাহায্য, দানসাগর, অন্নছত্র প্রভৃতি দ্বারা অভিজাত সম্প্রদায় সাধারণের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলিতেন। যিনি যত জাতির ও সমাজের হিতসাধন করিতে পারিতেন তিনি তত উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কেহ কেহ বলেন, ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়াই আমরা সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি। ইউরোপখণ্ডেও জার্মানী বা ইটালীকে তথাকার অধিবাসীরা এক দেশ এক জাতি বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে এই মাত্র সে দিন। সন তারিখ ধরিয়া হিসাব করিলে এক শত বৎসরও হইবে না। আমাদের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভারতবর্ষের অখণ্ডত্ব প্রতিদিন

আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ইংরেজের সংস্পর্শে না আসিলেও, এমন কি রাষ্ট্রনীতির দিক হইতেও, আমরা ভারত বর্ষকে একরাষ্ট্র বলিয়া ভাবিতে শিখিতাম, কেননা যুগধর্ম ছিল ইহার অনুকূলে।

যে কথা বলিতেছিলাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বৎসর এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বৎসর—এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে যে সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল, সব দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয়, সম্পূর্ণ নূতন। যে বাঙালী পূর্বে আত্মোন্নতি বলিতে সমাজোন্নতি বুঝিত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সভ্যতার প্রথম আভায় বিভ্রান্ত হইয়া সে যেন ইহা ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছিল। কিন্তু জাতি মরে, তবু ঐতিহ্য মরে না। সেই পুরাতন ঐতিহ্য অল্পকাল মধ্যেই ধীরে ধীরে সমাজে পুনরায় ভিত্তি গাড়িতে আরম্ভ করিল, সমাজ আবার আত্মস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। বিলাতে বসিয়া পুস্তকাদি মারফত মেকলে সাহেব যে বাঙালী সমাজের কথা জানিয়াছিলেন, আর এখানে আসিয়া তিনি যে সমাজের সম্মুখীন হইয়াছিলেন উভয়ের মধ্যে তখনই অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছিল। ১৮৩৫ সালে ইংরেজী শিক্ষা সরকারী ছাপ লাভ করিলে সাধারণের মধ্যেও ইংরেজী শিক্ষার ধুম পড়িয়া যায়, অনেকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা সভ্যতাকেই আদর্শ বলিয়া গণ্য করিতে থাকে—এসবই সত্য, কিন্তু ইহা ছাড়া আরও কিছু তখন সমাজ মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সরকার ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের অন্তত: কুড়ি বৎসর পূর্বে বাঙালী প্রধানেরা ও বিদ্বজ্জনমণ্ডলী এ বিষয়ে অবহিত হইয়া হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তখন রাজ-সরকারে চাকুরী লাভের জন্যই শুধু ইহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, প্রতীচ্য জ্ঞান ভাণ্ডার যাহাতে ভারত-সন্তানেরা আয়ত্ত করিয়া উপকৃত হইতে পারে তজ্জন্যই ইহা বিশেষ করিয়া স্থাপিত হয়। কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিনের সভায় পণ্ডিত-মণ্ডলীর মুখপাত্র রূপে এক ব্যক্তি ঐদিনকার সভাপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সার্ এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্টকে সংস্কৃত সাহিত্যের চিহ্ন স্বরূপ যে একটি পুষ্প উপহার দিয়াছিলেন তাহা একেবারে নিরর্থক নহে। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিদানেই তিনি তাঁহাকে প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান উপহার দেন। আমাদেরও যে জগৎকে কিছু দিবার আছে এ জ্ঞান তখনই আমাদের মধ্যে জন্মিয়াছিল। বস্তুত: জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবাসীর নিকট জাতি বা বর্ণভেদ কখনও ছিল না। এ বিষয়ে তাহার মন সদা মুক্ত, চির উদার।

ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার যেমন আমাদের নিকট খুলিয়া গেল, তেমনি আমরা নিজস্ব সমাজের প্রতিও সজাগ হইয়া উঠিলাম। নূতন জ্ঞান লাভের সুযোগ হইল বটে, কিন্তু ইহার ফলে নিজস্ব সম্পদ রক্ষা করিতেও আমরা উদ্বুদ্ধ হইলাম এবং ব্যক্তিগত ও সংঘবদ্ধ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। রামমোহন রায় পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টকে যে পত্র লেখেন তাহাতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য সরকারী অর্থে নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠার অপ্রয়োজনীয়তার কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রচুর নিন্দাবাদও করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বজাতীয়দের মধ্যে বিভেদ বৈষম্য বিদূরিত করিয়া যে উদার ধর্ম প্রতিষ্ঠায় তিনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে সংস্কৃতেরই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত মতামত যাহাই থাকুক, তাঁহার অবলম্বিত পন্থায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থাদি মুদ্রিত, প্রকাশিত ও আলোচিত হইবার প্রেরণা লাভ করিল। স্বদেশীয় ধর্ম ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে বিদেশীয়, বিশেষ করিয়া খ্রীষ্টান পাদ্রীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিদ্বজ্জন-সমাজ সংঘবদ্ধ চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই প্রসঙ্গে কলিকাতার গৌড়ীয় সমাজের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং নব্যশিক্ষিত উভয়শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় বাঙালীকেই এখানে একযোগে কার্য করিতে দেখি। রামমোহন-সখী দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং প্রাচীনপন্থী রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, শিবচরণ ঠাকুর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সে যুগের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের সহযোগে এই সমাজ স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জন উদ্দেশ্যে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার প্রধান কার্য ছিল হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষণ ও পোষণ। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি হিন্দু কলেজ গৃহে ইহার প্রথম

অধিবেশন হইল। সভাপতি হইলেন রামকমল সেন; রসময় দত্ত সভায় এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন যে রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ের ও ধর্মবিষয়ক নিন্দার উত্তর দান সম্পর্কে আলোচনা হইলে সভায় যোগদান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তাঁহার দ্বিতীয় আপত্তির ঘোরতর প্রতিবাদ হইল এবং স্থির হইল যে, ধর্মবিষয়ক নিন্দার প্রত্যুত্তর অবশ্যই করিতে হইবে। রাধাকান্ত দেবের প্রস্তাবে রামকমল সেন ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর সমাজের সম্পাদক হইলেন। ইহার দ্বিতীয় অধিবেশনও হিন্দু কলেজ গৃহেই হয়। এবারে, ইহার কার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার জন্য একটি ধনভাণ্ডার খোলার প্রস্তাব হইল। চন্দ্রকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু ব্যক্তি ইহাতে অর্থসাহায্য করেন। বিদ্যাবৃদ্ধির জন্য এই সমাজ; ইহার সভ্য কালীকান্ত ঘোষাল নানাপ্রকার গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত 'ব্যবহার মুকুর' নামক গ্রন্থ এক অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় সমাজের অধিবেশন কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সভ্যের গৃহে হইত। পাখুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের এবং ভূকৈলাসের জয়নারায়ণ ঘোষালের ভবনে সমাজের দুইটি অধিবেশনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮২৪, ২৬শে জুন গৌড়ীয় সমাজ বেদপাঠের ব্যবস্থা করেন।* এই সমাজের বিষয় আর কিছুই জানিতে পারি নাই, তবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই যে নেতৃস্থানীয় বাঙালীগণ স্বীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

রামমোহন রায় ও তাঁহার প্রতিপক্ষের সংস্কৃত শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রকাশ ও আলোচনার কথা একটু পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা মাদ্রাসাও এই বৎসর পুনর্গঠিত হইল। উভয় প্রতিষ্ঠানই প্রাচ্য-বিদ্যাশিক্ষার ও আলোচনার কেন্দ্র হইয়া উঠিল। উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যাহার সূচনা হইয়াছিল এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তাহা কতকটা পরিণতি লাভ করিল। সরকারী শিক্ষা-কমিটির অনুকূলে এই সময় পাশ্চাত্ত্য বিবিধ বিদ্যার পুস্তকাবলী সংস্কৃত ও আরবিতে ভাষান্তরিত হইয়া পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হইয়াছিল, প্রাচ্য সাহিত্য ও শাস্ত্র-গ্রন্থাদিও সরকারী অর্থে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় কার্য্যের ফলে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চ্চার বিশেষ সুবিধা হইল।

সংস্কৃত শাস্ত্র ও বিদ্যা চর্চ্চার সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার কথা বলিলাম। বাঙালী মনীষীদের কেহ কেহ ব্যক্তিগত ভাবেও ইহার আলোচনায় বিশেষভাবে মন দিয়াছিলেন। এ প্রসঙ্গে রাধাকান্ত দেবের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 'শব্দকল্পদ্রুম' নামে বিখ্যাত সংস্কৃত অভিধান সংকলন করিয়া প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। এই বিরাট্ অভিধানের মূল ভাগের মুদ্রণ কার্য্য ১৮৫১ সালে এবং পরিশিষ্ট ভাগের মুদ্রণকার্য্য ১৮৫৮ সালে পরিসমাপ্ত হয়। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যের বিদগ্ধসমাজে সংস্কৃত চর্চ্চার প্রতি যে অত্যধিক আগ্রহ লক্ষিত হয় তাহার মূলে রাধাকান্ত দেবের এই প্রচেষ্টা অনেকখানি কার্য্য করিয়াছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পিতা সুপণ্ডিত বিশ্বনাথ তর্কভূষণ এবং তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী একযোগে মনুসংহিতার সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ পাশাপাশি রাখিয়া একটি বিশিষ্ট সংস্করণ বাহির করিতেছিলেন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী কৃত ইংরেজী অনুবাদ এতটা সুন্দর ও মূল-অনুগ হইয়াছিল যে বিদ্বজ্জনের নিকট সার্ উইলিয়ম জোন্সের অনুবাদ অপেক্ষাও ইহা অধিকতর প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই তারাচাঁদই চতুর্থ দশকে নবাদলের নেতৃপদ লাভ করিয়াছিলেন। এ কথা পরে বলিতে হইবে।

যুবকেরা নব্যশিক্ষার প্রভাবে পড়িয়া স্বজাতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতি তখন বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহারই মধ্যে একদল ছাত্রই আবার মাতৃভাষার উন্নতির জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহারা স্বদেশীয় ভাষার প্রতি বিমুখ হওয়া দূরে থাকুক, ইহারই মাধ্যমে ইহারই উন্নতি প্রচেষ্টায় একটি সভা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। আমি এখানে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর রামমোহন রায়ের এংলো-হিন্দু স্কুলে প্রতিষ্ঠিত 'সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভা'র কথা বলিতেছি। সভা

* সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৯-১৩এ গৌড়ীয় সমাজ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে যথারীতি সভার অধিবেশন হইল। প্রায় তিন শত ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত হইলেন। কর্ম্মকর্ত্তৃ-সভা গঠিত হইল। তারাচাঁদ হইলেন সভাপতি, সহকারী সভাপতি হইলেন রামগোপাল ঘোষ ও কালাচাঁদ শেঠ, সম্পাদক রামতনু লাহিড়ী ও প্যারীচাঁদ মিত্র। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, মাধবচন্দ্র মল্লিক, প্যারীমোহন বসু ও তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ম্মকর্ত্তৃ-সভার সদস্য হইলেন। ছাত্রবন্ধু ডেভিড হেয়ার হইলেন 'অনারারি ভিজিটর' বা 'সম্মানিত পরিদর্শক'। জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভায় সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতি নানা বিষয়েই আলোচনার ব্যবস্থা হয়। সভায় সভ্যগণ নিজ নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় সম্বন্ধেও আলোচনা করিতে পারিতেন। এই সভার প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয় ১৮৩৮, ১৬ই মে। পাদ্রী কৃষ্ণমোহন 'ইতিহাস পাঠে লভ্য' শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভায় পঠিত ও আলোচিত প্রবন্ধ-সমূহের মধ্যে যে-কয়টি উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত তৎসমুদয় গ্রন্থভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইত। এইরূপ প্রবন্ধ-পুস্তক সর্ব্বসাকুল্যে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়, ১৮৪০, '৪২ ও '৪৩ সালে। ইহা পাঠে জানা যায়, সভায় শুধু ভাবমূলক বা জ্ঞান-মূলক বিষয়েরই আলোচনা হইত না, শিক্ষা ও সমাজের উন্নতিমূলক নানা বিষয়েরও এখানে আলোচনা হইত। শেষের দিকে এখানে রাষ্ট্রীয় বিষয়ের আলোচনা সুরু হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম দিককার একটি রচনার কথা এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৩৮, ১৬ই জুনের সভায় উদয়চরণ আঢ্য "এতদ্দেশীয় লোকদিগের বাঙ্গালাভাষা উত্তমরূপে শিক্ষাকরণের আবশ্যকতা বিষয়ক প্রস্তাব" পাঠ করেন। বিদ্যালয়সমূহে ছেলেরা মাতৃভাষার মাধ্যমে অল্প সময়ে কিরূপ অধিক জ্ঞান লাভ করে তাহার সম্বন্ধে বলেন :

"অত্র আমার বক্তব্য যে ইংলণ্ডীয়দের শিক্ষার দ্বারা অনুভব, যেহেতু তাহাদিগের এক সাধারণ শিক্ষালয়ে যে বালক পূর্ব্ব শিক্ষা পায় তাহার বর্জ্জন অবধি শাস্ত্রজ্ঞান বিষয়িত মতে জন্মে এবং সাংসারিক প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহোপযোগী জ্ঞানেরও ত্রুটি হয় না; অর্থাৎ কি মন্ত্রী কি যন্ত্রী সর্ব্বকর্ম্মজ্ঞই হয় এবং যে যুবক যে কর্ম্ম ইচ্ছা কিছু দিবস সাধন করিলেই বিশারদ হয়েন। অতএব ঐ শিক্ষার দ্বারানুসারে এক শিক্ষালয় কলিকাতার মধ্যস্থলে সংস্থাপিত হয় এবং তাহাতে কিরূপ শিক্ষক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য এবং বালকদিগের বিদ্যারম্ভাবধি শেষ পর্য্যন্ত কি পুস্তক পাঠ নির্দ্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন তাহা স্থির হয় ও ঐ পাঠশালা কিরূপে আরম্ভ হয় এবং তাহা কিরূপে নির্ব্বাহোপায় তাহার বিবেচনা ঐক্য মতে করা যায়?"

প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, উদয়নাথ আঢ্য মহাশয় এখানে যে প্রস্তাব উপস্থিত করেন তদনুযায়ী কলিকাতার মধ্যস্থলে একটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দু কলেজের দেশীয় সদস্যগণ, বিশেষতঃ প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি অগ্রণী হইয়াছিলেন। তাঁহারা ডেভিড হেয়ারকে দিয়া ১৮৩৯, ১৪ই জুন বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ইহার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করান এবং পর বৎসর ১৮৪০, ১৮ই জানুয়ারী ইহাতে পঠন-পাঠন আরম্ভ হয়।* এই বিদ্যালয়টি হিন্দু কলেজ পাঠশালা বা বাংলা পাঠশালা নামে পরিচিত হইয়াছিল। এখানে বাংলার মাধ্যমে যাবতীয় বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ বাংলা পাঠ্য-পুস্তক রচনারও আয়োজন করিয়াছিলেন, কয়েকখানি পুস্তক মুদ্রিতও হইয়াছিল। কিন্তু সরকারী শিক্ষা-কমিটির ঔদাসীন্যে পাঠশালার শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই, তাঁহাদের প্রতিবন্ধকতায় পাঠ্য-পুস্তক রচনাও বন্ধ হইয়া যায়। এই সময়কার সরকারী শিক্ষানীতির কতকটা আভাস পূর্ব্ব অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে।

যাহা হউক, সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা ছিল প্রধানতঃ ভাবমূলক। আলোচ্য বিষয়গুলিকে বস্তুগত করা তাহার উদ্দেশ্য মধ্যে গণ্য ছিল না। বাহিরের যে সকল স্বার্থ আসিয়া এই সময় আমাদের ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আঘাত দিতেছিল তাহার প্রতিরোধে ইহার শক্তি নিয়োজিত হইতে পারে নাই। যে-সব প্রচেষ্টা দ্বারা বাহিরের আঘাত প্রতিরোধ করিয়া এদকল অমূল্য রাশিদের চেষ্টা হইয়াছিল। এবং ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতি চর্চ্চারও সুযোগ ঘটিয়াছিল তাহার কথাই এখন বলিতে যাইতেছি।

---

* বাংলা পাঠশালা স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল—to "provide a system of National Education, and to instruct the Hindoo Youths in Literature, and in the Sciences of India and Europe, through the medium of the Bengali Language."—*General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of Bengal Presidency for 1843-44, p. 19.*

আমাদের সাহিত্য

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এ যুগের উপন্যাস

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকে আমরা শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্করের 'নীলকণ্ঠ' উপন্যাস-খানি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো। এ-টীও তাঁর প্রথম যুগের লেখা। গ্রন্থারম্ভের ভূমিকায় 'নিবেদন'-এ বলা হোয়েছে, উপন্যাসখানি ১৩৩৯ সালে 'উপাসনা' মাসিক পত্রিকায় ধারা-বাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়, তখন এর নাম ছিলো, 'যোগ বিয়োগ'। এখন নতুন নামকরণ হোল 'নীলকণ্ঠ'। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় আশ্বিন—১৩৪০-এ। উৎসর্গ-সম্মান দেওয়া হোয়েছে খ্যাতনামা কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে।

আলোচনা আরম্ভের মুখে প্রথমেই জানিয়ে দেওয়া ভালো, এই উপন্যাসখানিরও পটভূমি একটী পল্লীকে কেন্দ্র ক'রে। দেখা গেলো একদল ছেলে সন্ধ্যার কিছু আগে প্রচুর কলরব করতে করতে বাড়ী ফিরে আসছে। কলরবের প্রধান কারণ এই যে তাদেরই দলের অন্যতম সংগী শ্রীমন্ত পেয়ারা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে এবং বাবুদের বাগানের 'খোট্টা'টার হাতে বেশ 'ঘা কতক' খেয়ে এসেছে। সংগীদের লজ্জা সেখানেই এবং তার জন্যেই শ্রীমন্তের বিরুদ্ধে বাজে, বিদ্রূপে তারা শাণিত তরোয়ালের মতো ঝল্‌সে উঠেছে।

কিন্তু শ্রীমন্তর যুক্তি এই যে হঠাৎ যখন ধ'রে ফেলেছে তখন সে মার খাওয়া ছাড়া আর কিই বা করতে পারতো—তাও সে যে ধরা পড়লো তার মূলে তাদেরই দলের বিপিনই দায়ী—সে যদি পাঁচিলের ওদিক থেকে মিছিমিছি পড়ে যাবার ভান ক'রে না চেঁচাতো তাহ'লে তো শ্রীমন্ত কখনোই ফিরে যেতো না—এবং এই ভাবে লাঞ্ছিত হোত না। সুতরাং এই দুর্ঘটনার জন্যে সে মোটেই দুঃখিত নয়।

একজন সংগী বললে, খুব লেগেছে তো? নিতান্ত তাচ্ছিল্যের হাসি মুখের উপরে টেনে এনে শ্রীমন্ত জানালে, ছাই বরং যে চাপড় মেরেছে তারই হাতে লেগেছে বেশী। দ্বিতীয় একজন সন্দেহ প্রকাশ ক'রে বললে, না, মেলে (মারলে) আবার লাগে না? উত্তরে শ্রীমন্ত বলেছিল, মাইরি বলছি লাগে না, দেখেছিস্ তো পণ্ডিত মেরে মেরে আর আমার পিঠে হাত ঠেকায় না, আর বিশ্বাস না হয়তো দেখ্ তোরা!

সুতরাং বাকী কয়জন বিনা দ্বিধায় এসে যাকে বলে 'চাদা ক'রে মার' দিয়ে বুঝতে পারলো সত্যিই তার লাগে না—আর দাঁতে দাঁত টিপে সমস্ত বেদনাকে অম্লান মুখে সহ্য ক'রে শ্রীমন্তও প্রমাণ দিলো যে তার একটুও লাগেনি।

এই হোল এ-উপন্যাসের প্রধানতম চরিত্র শ্রীমন্তের শৈশব কালের ইতিহাস।

নিতান্ত দরিদ্রের সংসারে সে জন্মেছিলো। নিতান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়েই তার শৈশব অতিবাহিত হোল। শেষ পর্যন্ত অর্থের অভাবে একদিন পাঠশালাও ছাড়লো সে; বাপের সংগে যুক্তি ক'রে ঠিক করলে এবারে তারা আলুর চাষ করবে। ছোট্ট সংসার তাদের। মা, বাবা, সে আর তার মৃতা সহোদরার একটী মাত্র শিশুকন্যা গৌরী। তাকে নিয়েই শ্রীমন্তর অলস মুহূর্তগুলি ভ'রে উঠ্‌লো।

শ্রীমন্ত প্রবল উদ্যমে সংসারের কাজে, চাষের কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিলে, না, লেখাপড়াতে তার আর কাজ নেই।

এই পরিবারে আরেকটী লোককে মাঝে মাঝে দেখা যায়, সে হ'চ্ছে শ্রীমন্তর শ্বশুর হরিলাল—গৌরীর বাবা। শোনা যায়—গৌরীর মাকে সে-ই নিজের হাতে নেশার ঘোরে হত্যা করেছিলো। সুতরাং জামাইকে শ্রীমন্তের মা কোনোদিনই সু-নজরে দেখ্‌তো না। নিতান্ত আশ্রয়হীনা মেয়ের মেয়ে ব'লেই সে গৌরীকে বাড়ীতে স্থান দিয়েছিলো। হরিলালও কচিৎ কখনো তাদের বাড়ীতে আস্‌তো।

হরিলালের জীবনে একমাত্র কাজ ছিলো তার ভাঙা বাড়ীর ভাঙা ঘরে গুলি আর গাঁজার আড্ডাটীকে নিত্য-প্রধুমিত ক'রে রাখা, আর তানপুরা, একজোড়া বাঁয়াতবলা আর পাখোয়াজ নিয়ে মাঝে মাঝে সংগীতের আসর বসানো। অনেক দিন থেকেই শ্রীমন্তর এই আড্ডাটীর ওপরে লোভ ছিলো—পাঠশালা

ছাড়বার পর হরিলাল একদিন নিজেই নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে তাকে দীক্ষা দিলে। তাকে 'মানুষ' করবার ভার নিলে হরিলাল। গাঁজা খেয়ে শ্রীমন্ত বুঝতে পারলো সংগীত শাস্ত্রে তার একটা বোধ জন্মেছে—হরিলালের আসোয়ারী আলাপটা তার বড়ো ভালো লেগেছিলো, সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সে বাড়ী ফিরলো।

শ্রীমন্তর মা বুঝতে পেরে প্রমাদ গণলো। স্বামীর সংগে যুক্তি ক'রে ঠিক করলে, অবিলম্বে শ্রীমন্তকে বিয়ে দিয়ে হরিলালের হাত থেকে বাঁচাতে হ'বে। নিরিকার আর উদাসীন স্বামী প্রথমে এ সব কথায় তেমন কান দেয়নি—পরে স্ত্রীর নিত্য-তাড়নার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে শেষ পর্যন্ত সে সম্মতি সত্যিই বউ নিয়ে এলো শ্রীমন্তর।

মেয়েটির নাম গিরিবালা। শ্যামলা রং, মাঝারি চোখ, নাকটা একটু চাপা, আবাল্য পরিশ্রমে সর্বাংগ সুগঠিত, দৃঢ়। ব্যবহারও চমৎকার—কয়েক দিনের মধ্যেই নতুন সংসারে সে নিজেকে মসৃণভাবে মিলিয়ে দিলে।

শ্রীমন্তর মায়ের পরিকল্পনা ব্যর্থ হোল না, গিরিবালার প্রভাবে সত্যিই শেষ পর্যন্ত হরিলালের আড্ডা সে ছেড়ে দিলে।

মনে মনে চটলো হরিলাল, সুযোগ খুঁজতে লাগলো প্রতিশোধ নেবার।

দিন চলতে লাগলো। শ্রীমন্ত এখন পরিপূর্ণ যুবক। গিরি এখন রীতিমতো গৃহিণী। মা বাবা দুজনেই কিছুকাল হোল পরলোকের যাত্রী হোয়েছেন।

কিন্তু আশ্চর্য এই, গিরিবালার মনে একটা বেদনার মেঘ ধীরে ধীরে জমে উঠছে আজকাল—সেটা আর কিছু নয়—শাশুড়ীর সাধ সে পূর্ণ করতে পারে নি—নারী হোয়ে একটী পৌত্রকে সে তাঁর কোলে তুলে দিতে পারলোনা, মাঝে মাঝে এই একটা দুঃখই তার সমস্ত বুক কাঁপিয়ে অবারিত হোয়ে ওঠে। যতো দিন যায় ততোই সে রাত্রের তাবিজ আর মাদুলিতে নিজেকে আরো হাস্যকর ক'রে তোলে।

সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই তার সমস্ত অপত্য-স্নেহ এসে পড়লো গৌরীর উপরে—শ্রীমন্তও বাদ গেলো না—গৌরীকে কেন্দ্র ক'রে তাদের ছোট্ট সংসারের স্তিমিতপ্রায় প্রবাহটি একটু একটু ক'রে আবার কল্লোলিত হোয়ে উঠলো।

একদিন পথে হরিলালের সংগে শ্রীমন্তর কিছুটা হাতাহাতি হোয়ে গেলো। গাঁজার আড্ডা থেকে শ্রীমন্তকে হারানোর দুঃখটা সে ভুলতে পারে নি, তার পক্ষে মৌতাতের দিক থেকে এ ক্ষতি অপূরণীয়—বলা বাহুল্য শ্রীমন্তর 'লাঠী খেলা—কঠোর কর্কশ' হাতে হরিলাল যে শিক্ষা পেয়েছিলো তা সে দীর্ঘকাল ভুলতে পারে নি।

আজকে সময় বুঝে সে প্রতিশোধ নিতে এলো। বললে গৌরী আমার মেয়ে, আমাকে ফিরিয়ে দাও, তোমাদের কাছে আর ফেলে রাখবো না।

এই একটা জায়গা, যেখানে তাদের দুর্বলতা অপরিসীম। ভালো ভাবে বুঝিয়ে অনেক ক'রেও শ্রীমন্ত যখন হরিলালকে রাজী করাতে পারলো না, তখন সে চোখ রাঙিয়ে এসিয়ে এলো। ভীত হরিলাল পেছু হাটলো—কিন্তু যাবার সময়ে শাসিয়ে গেলো, পুলিশ এনে সে তার মেয়েকে এদের হাত থেকে 'উদ্ধার' করবে।

গিরিবালা শ্রীমন্তকে পরামর্শ দিলে—আর দেরী নয়—অবিলম্বে পাত্র দেখে গৌরীকে ভালো ভাবে বিয়ে দিয়ে দাও—নাহ'লে চামার হরিলালকে বিশ্বাস নেই—সে টাকার লোভে যে কোনো জায়গায় মেয়ে বিক্রী ক'রে দিতে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হবে না।

কথাটা তীরের মতো এসে বিঁধলো—শ্রীমন্তকে। সে সচেতন হোয়ে উঠলো। প্রতিজ্ঞা করলে, যতো শীগ্‌গীর পারে, সুপাত্র দেখে সে যে ক'রে হোক গৌরীকে বিয়ে দেবেই।

শ্রাবণের মাঝামাঝি তখন। অনেক অন্বেষণের পর একটী সুপাত্র পেলো শ্রীমন্ত, কিন্তু তার পরিবর্তে যে অর্থমূল্য তাকে দিতে হ'বে তার কথা ভেবে সে চিন্তিত হোল। কিন্তু না, তবুও সে ভাববে না, শেষ জমিটুকু বেচেও গৌরীকে সে সুখী করবে। না হয় নিঃস্বই হবে শ্রীমন্ত তার জন্যে।

সেই দুরন্ত বর্ষণের মধ্যে মহাজনের কাছে তার ভূমি-লক্ষ্মীকে বাঁধা দিয়ে আড়াইশো টাকা নিয়ে শ্রীমন্ত ঘরে ফিরলো। কিন্তু এসে দেখলো ঘর অন্ধকার। একলা গিরি ব'সে আছে শুধু। গিরির উচ্ছ্বসিত কান্নার মধ্যে থেকে সে এইটুকু মাত্র সংগ্রহ করলো যে সেই পশু হরিলাল এসে তার

মেয়ে গৌরীকে গিরির কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে এবং আজই রাত্রে 'ছুচোখ কানা' কোনো হতভাগা পাত্রের সংগে তার বিয়ে দেবে ঠিক হোয়েছে। সংগে লোকজন নিয়ে এসেছিলো হরিলাল একা গিরিবালা কি-ই বা করতে পারতো তার বিরুদ্ধে?

শ্রীমন্তর সমস্ত শরীরের রক্ত মুহূর্তে মাথায় উঠে এলো। রান্নাঘরের মাচার থেকে এক গাছা লাঠী টেনে নিয়ে বললে, চল্‌লাম।

গিরি চমকে উঠে হাত ধ'রে বাধা দিতে গেলো। কিন্তু কোনো কথাই শুনলো না শ্রীমন্ত। সেই অন্ধকার দুর্যোগময় রাত্রিতে সে পৌঁছলো মহাদেবপুরে—গিয়ে দেখ্‌লে বিয়ের সমস্ত আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। কিন্তু আশ্চর্য এই যে হরিলালের মাথা ফাটিয়ে দেবার বদলে সে আছাড় খেয়ে তার পায়ের ওপরে পড়লো, বললে, 'ওস্তাদ, গৌরীর দিকে তুমি চাও!'

মহাজনের কাছ থেকে গৌরীর বিয়ের জন্যে সংগ্রহ ক'রে আনা টাকা দিয়ে সে উপস্থিত বিপদটাকে বন্ধ ক'রে দিলে। ভিক্ষে চেয়ে নিলে গৌরীকে হরিলালের কাছ থেকে। কিন্তু তবু ভুলবার নয়। পশু আর অমানুষ হরিলাল সেই রাত্রেই ধুতুরার বীজের সংগে শ্রীমন্তকে গাঁজা খাইয়ে বেহুঁস ক'রে রেখে সেই কানা লোকটার সংগেই গৌরীকে বিয়ে দিলে। বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে শ্রীমন্তর নেশা কেটে আসে—এবং এই বিশ্বাসঘাতকতা দেখে সে স্থির থাকতে না পেরে সেই লাঠী দিয়েই নির্মমভাবে হরিলালের মাথায় আঘাত করে—তার পরেই অন্ধকার—কিছুটা হৈ চৈ কিছুটা আর্তনাদ এবং একটা ভয়ংকর বিশৃঙ্খলা।

কয়েকদিন পরে নরহত্যার চেষ্টা, কন্যা রাহাজানির চেষ্টা প্রভৃতি অভিযোগে শ্রীমন্তর হাতে হাতকড়া পড়লো। পশু হরিলাল মরে নি, সে ছেটায় বাঁধা মাথাটা দুলিয়ে শ্রীমন্তকে এসে বললে, "কেষ্ট চাঁদ, ঘুঘু দেখা ছাই—লেকিন ফাঁদ দেখা নেই—আব্ দেখো ফাঁদ, সোনার চাঁদ!"

গিরিবালা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো, হরিলাল মরেনি।

তারপরে দীর্ঘ মামলা এবং শ্রীমন্তর সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের কারাবাসের ইতিহাস।

এইখানে কাহিনীর পটপরিবর্তন হোল। শ্রীমন্তর বালা সংগী, কিঞ্চিৎ বিত্তশালী বন্ধু বিপিনের অনেকদিন থেকেই গিরিবালার কমনীয় দেহলতাটীর প্রতি গভীর লোভ ছিলো। শ্রীমন্তর এই কারাবাসে তার সুযোগ অবারিত হোয়ে উঠ্‌লো। সে প্রচুর উদারতা আর পরম বন্ধুর আবরণ নিয়ে এসে গিরিবালার সাম্‌নে দাঁড়ালো।

কিন্তু গিরিবালাও বুদ্ধিমতী মেয়ে—বিপিনের আসল রূপটাকে চিনে নিতে তার একটুও দেরী হোল না। সেও সমান নির্মমতায় পরিহার ক'রে চল্‌তে লাগ্‌লো বিপিনকে। কিন্তু তার মাথার ওপরে যে দারিদ্র্য উদ্যত হোয়েছিলো তা তাকে গভীরতরো অন্ধকারের মধ্যে এনে ফেললে—দুঃখের সেই তিমির রাত্রির ইতিহাস বড়ো করুণ, তবু এতো বিপদেও গিরি টল্‌লো না একটুও, বিপিনের কাছে সে তেম্‌নি পাথরের মতো কঠিন, ইস্‌পাতের মতো নির্মম হোয়ে রইলো। বিপিন ভয় পেলো।

দিন চলে। গিরির মনের সন্তান কামনার সেই হাহাকারটা কিন্তু আরো বিস্তৃততরো রূপ নেয়—নিজের মনে সে তার অনাগত শিশু বিধাতার জন্যে আসন রচনা ক'রে ব'সে থাকে শুধু।

কিন্তু গ্রামের লোকের চোখে এর জন্যে ঘুম নেই—বিপিনকে জড়িয়ে একটা কুৎসিৎ অপবাদ রটনা হলো চারদিকে—উদ্যোগী পুরুষেরা পঞ্চায়েৎ ডাকলেন, সেই প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে গিরিবালাকে নাকি সমস্ত দোষ স্বীকার করতে হবে। বিত্তবান্ বিপিন নাকি ইতিমধ্যেই একটু সলজ্জ হাসি হেসে চমৎকারভাবে গিরির সংগে নিজেকে জড়িয়ে দিয়েছে, এখন গিরি স্বীকার কলেই সব কোলাহলের অবসান হয়।

আহতা সর্পিণীর মতো গিরিবালা বেঁকে দাঁড়ালো। জানিয়ে দিলে, সে দোষী নয়—সে কখনোই যাবে পঞ্চায়েৎকে একথা বল্‌তে।

পঞ্চায়েৎ বর্জন করলো গিরিবালাকে। তাকে ত্যাগ করলো অপাংক্তেয়। ঠিক এই সময়ে বিস্ময়ে, আনন্দে, উল্লাসে গিরি আবিষ্কার করলে তার সেই বহু-যুগ আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নকামনা আজ সফল হ'তে চ'লেছে। সেই বহু-প্রতীক্ষিত

শিশুদেবতা আসছেন! তার যৌবন-পুষ্ট-শরীরের প্রতিটী রেখায় তারই আগমনী গান বাজছে!

আবার সমস্ত পরিবেশ চকল হোয়ে উঠ্‌লো। নূতনতরো রসের যোগান পেলো নিন্দুকেরা—কিন্তু গিরি তো জানে, এতে তার বিন্দুমাত্র কোনো লজ্জার কারণ নেই—এ তার নিজের সন্তান—এ তারই স্বামীর সন্তান!

গহনা যখন অসহ্য হোয়ে উঠ্‌লো তখন নিবিড় কোনো অন্ধকার রাত্রে সে নিঃশব্দে গ্রাম ছেড়ে যাত্রা করলো নিরুদ্দেশের পথে—যাবার সময়ে নিজের হাতে আগুন দিয়ে গেলো সমস্ত গ্রামে, আগুন দিলো তার নিজের ঘরে, তার সমাজের নাগপাশে। রাত্রির গভীর অন্ধকারে সমস্ত গ্রামের সেই অগ্নিলীলা বড়ো উজ্জ্বল হোয়ে উঠ্‌লো।

এই ঘটনার দীর্ঘ চার বছর পরে আবার যবনিকা উঠ্‌লো। দেখা গেলো গিরি একটা ঘাটের উপরে ব'সে আছে, পাশে তার একটী ঘুমন্ত শিশুসন্তান। ছেলেটীর নাম দিয়েছে 'নীলকণ্ঠ'—গিরির জীবন মন্থন ক'রে যতো কিছু বিষ উঠেছে তার সমস্তটুকুই পান ক'রে এসেছে সে। তাই তার এই নাম।

ছেলেকে বাঁচাবার জন্যে তার জীবনযুদ্ধের কিছুটা রক্তাক্ত ইতিহাস আছে এখানে, তারপরে দেখা গেলো, জীবনযুদ্ধে পরাজিতাই হোল গিরিবালা—একদিন অন্ধকারে ছেলেকে রেখেই সে বিস্মৃতির গভীর অতলে তলিয়ে গেলো।

এবারে নীলকণ্ঠ একলা। গ্রামের পথে পথে সে ঘুরে বেড়ায়, অনাথ আতুর ব'লে সে ভিক্ষা করে দরোজায় দরোজায়—কখনো বা পাকা লেবু সংগ্রহ ক'রে এনে বিক্রী করে, এই বয়সেই উপার্জনের পথটা পাকা করতে চেষ্টা করে।

গৃহস্থেরা কেউ বা দয়া ক'রে ভিক্ষা দেয়—কেউ দেয় না। তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই নীলকণ্ঠের। সংসারের যতো কিছু অবহেলা, অশ্রদ্ধা সমস্তই হাসিমুখে বহন করবার জন্যেই যেন পৃথিবীতে এসেছে নীলকণ্ঠ।

এরই মধ্যে শ্রীমন্ত জেল থেকে খালাস পেয়ে গ্রামে ফিরে আসে একদিন। দেখে সব শূন্য ও শ্রীহীন। গিরিবালা যে গ্রামেই আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিলো এরকম একটা সংবাদ তার কানে আগেই এসেছে।

এবারে তার শূন্য ঘর নিয়ে এসে দেখ্‌লে। এইখানেই তার দেখা হোল নীলকণ্ঠের সঙ্গে।

আলাপ হোল। কিন্তু পরস্পরকে কেউ চিন্‌লো না কোনোদিন, চিন্‌বার উপায়ও নেই। তারপরে নীলকণ্ঠ শ্রীমন্তর সাথী হবার জন্যে ব্যস্ত হোয়ে ওঠে একদিন। বিরক্তই হয় শ্রীমন্ত, তাড়া দিয়ে ওঠে, বলে, ভাগ্। তারপর আবার তার কী মনে হয়, ফিরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একসময়ে কোলে তুলে নেয় নীলকণ্ঠকে, তারপরে সামনের দীর্ঘায়িত পথ ধ'রে হাঁটতে থাকে।

এই হোল নীলকণ্ঠ, নীলকণ্ঠের সংক্ষিপ্ত গল্পাংশ।

সমস্ত কাহিনীটীর মধ্যে তিনটী চরিত্র বিশেষভাবে উজ্জ্বল হোয়ে আছে। প্রথম হোচ্ছে হরিলাল তারপরে গিরিবালা, তারপরে শ্রীমন্ত। তিনজনের উপরেই লেখক যে অপূর্ব সৃষ্টি-কোণ থেকে আলোক-সম্পাত ক'রেছেন তার কোনো তুলনা নেই। একথা বলবো, হরিলালের মতো চরিত্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। একটী গার্হ চরিত্র হোয়েও সে যে পাঠকের মনের ওপর এতো বেশী গভীর ছাপ ফেলে যেতে পারে তা 'নীলকণ্ঠ' পড়বার আগে পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল না। সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে যতোখানি অংশই হরিলালকে পাওয়া গেছে ততোখানি অংশই সে তার নিজস্ব অদ্ভুত প্রতিভার আলোতে, উজ্জ্বল হোয়ে আছে। শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্করের হাতে যে 'টাইপ' চরিত্র চমৎকার রূপ পরিগ্রহ ক'রে একথা আমরা অবশ্যই জান্‌তাম—কিন্তু তার থেকে হরিলালের মতো যে মানুষও সৃষ্টি হোতে পারে তা আমাদের কল্পনারও বাইরে ছিলো। নিঃসন্দেহে হরিলাল একটী 'সৃষ্টি'!

হরিলালকে প্রথম দেখ্‌লাম, যখন শ্রীমন্ত পাঠশালা ছেড়ে দিয়ে গভীর অভিনিবেশে সংসারের কাজের দিকে ঝুঁকেছে এবং পিতার সঙ্গে আলুর চাষ করবার জন্যে প্রায় কোমর বেঁধে ব'সেছে। ঠিক এই সময়েই :—

"—আরে বাপ্‌রে বাপ্, তিন দিনকা ছোক্‌রী, ইসকে অন্দর পাঁও বরাবর জটা নিকাল গিয়া!

কণ্ঠস্বর শ্রীমন্তের ভাবীপতি হরিলাল—গৌরীর বাপের।

হরিলালের কথাই এমনি। হিন্দী যাত বলিতে সে কেমন ভালবাসে। সে গেরুয়া কাপড় পরে, গোঁফ দাড়ী রাখে, তেল মুখে না। বাম বাহুতে একটা লোহার তাগা পরিধান করিয়া রাখে, গাঁজা খায়, একটা তানপুরা লইয়া সাধে।

শ্রীমন্ত হরিলালের কথাটা ঠিক বুঝিতে পারে নাই। সে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। হরিলাল হা-হা করিয়া হাসিয়া শ্রীমন্তের পিঠে চাপড় দিয়া কহিল, কেয়া বাবুজি, সমঝা নেহি? বলি পাঠশালা ছাড়তে না ছাড়তেই ঘোর সংসারী? একদম গোবরে হাত? তিন দিনের যোগী হোতে না হোতেই পা পর্যন্ত ছটা গজিয়ে গেলো বন্ধু। বহুৎ আচ্ছা—জীতা রহো!

শ্রীমন্ত একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল, সে মৃদুস্বরে কহিল, গল্প দুটোর চেহারা হোয়েছে ভাখোনা, এতে কি চাষ চলে?

তাহার মাথায় এক চাঁটি বসাইয়া দিয়া হরিলাল তাহার হাতখানা ধরিয়া টানিয়া কহিল—ভাগ্!—আয় আমার সংগে আয়। চাষ করে কে কবে বড়ো লোক হোয়েছে? আমি তিন দিনে তোকে মানুষ ক'রে দেবো।" (নীলকণ্ঠ, ১৪ পৃষ্ঠা)

একটী আঁচড়ে এইখানেই হরিলাল চমৎকার ফুটে গেলো—তার সম্পূর্ণ একখানি ছবি আমরা এই ছটা লাইনের মধ্যে থেকেই স্বচ্ছন্দে দেখে নিতে পারছি। তারপরে গিরিবালার অনুরোধে শ্রীমন্ত গাঁজার আড্ডায় যাওয়া বন্ধ করবার পর প্রথম যেদিন হরিলালের সংগে দেখা হোল, তার সেদিনের বিকশিত-তম রূপটা দেখুন :—

"হরিলাল কহিল—এও পাঠশালামে কেও নেই যাতা?

শ্রীমন্ত চলিতে চলিতেই বেশ গম্ভীর ভাবে কহিল—আর যাব না।

—কেও? হরিলালের চোখ দুইটা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

—কেও আবার কি? তোমার সংগে মানুষে মেশে? মিশে তো শেষে খুন করতে শিখবো।

আর যায় কোথা! হরিলাল খড়ের আগুনের মতো জ্বলিয়া উঠে, সে খপ করিয়া শ্রীমন্তের চুলের মুঠা ধরিয়া টান মারিয়া কহে—

—কোন্ শালা এ কথা বোলতে হ্যায়—কোন্ হারামজাদ—খুন করেগে—কাট ডালেগে—!

হরিলালের ওই একটা বিশেষত্ব, রাগিলেই সে তলোয়ার ভাঁজিত, শত্রুর শির সে আর রাখিত না—অন্ততঃ মুখে।

...শ্রীমন্ত আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া কহিল, এই দেখ, আমার সংগে বেশী চালাকী দেখাতে না বলছি। তোমাকে দুমড়ে ভেঙে দেবো—

শ্রীমন্তের কথাটা বলা বাহুল্য হইল। হরিলাল সেটা পূর্বেই বুঝিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল—কিন্তু লম্ফ ঝম্ফ ত্যাগ করে নাই।

—দেখ্ লেঙ্গে, হাম দেখ্ লেঙ্গে, হামরা সাথ্ মে রহেনেসে তেরা আপের মে ভালো হোগা, আচ্ছা যাও, তুমকো ফুস্ বোলা ঝুট, মানুষ হোনে বুঝ্তিস্, বুঝ্লি, মানুষ হোলে বোঝে, কচু হোলে সেরে—তোম দফর কচু হ্যায়, দফর কচু।

হরিলাল তখন এই বলিয়া সরিয়া পড়িল বটে, কিন্তু একেবারে ব্যাপারটা ছাড়িল না—আবার গিয়ে আসর পাতিল শ্রীমন্তর বাড়ীতে.....সে এবারে একটা ছুরী হাতে করিয়াই হাজির, মুখে একটু মদের গন্ধ।

—এ প্রাণ আর রাখ্বোই না, ছিমন্তে আমার অপমান করে—

শাশুড়ীর পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করে, শ্বশুরের পায়ে প্রণাম করে, দাও পায়ের ধুলো দাও এ প্রাণ আর রাখ্বোই না—একটা ছোটলোকের মেয়ের পরামর্শে ছিমন্তে কিনা—নাঃ, এ প্রাণ আর রাখ্বোই না!

শাশুড়ী বিব্রত হইয়া কহে—দোহাই বাবা আমার, আসুক শ্রীমন্ত।

—কভি নেহি, এ জান্ নেহি রাখেগা, বলিয়া সে ছুরীটা উঁচু করিয়া তোলে। (নীলকণ্ঠ, ২৩-২৪ পৃষ্ঠা)

অপূর্ব!

প্রথম থেকে আলোচনা করলে দেখা যাবে, হরিলালের প্রত্যেকটী গতিভংগী লেখক সুনিপুণ হাতে চিত্রিত করতে পেরেছেন—এতো বড়ো শয়তান, এতো বড়ো কাপুরুষ আর

নীচমনা মানুষকে যে এতো অবলীলায় ঠকানো যায় তা সত্যিই এর আগে দেখবার আমাদের সৌভাগ্য ঘটে নি।

আরেকটা ভাগোর মেয়েকে নিয়ে যেতে এসে হরিলাল উত্তেজিত তর্কের মধ্যে শ্রীমন্তকে তার স্ত্রী গিরির উদ্দেশে কী বাণী দিচ্ছে শুনুন :—

……উত্তরে সে (হরিলাল) কহিল, ঘুমোক, আমার মেয়ে আমাকে দাও। ঢের হোয়েছে, ঢের ভাত দিয়েছো, আর না। এমন গম্ভীর ভাবে কথা কওয়া হরিলালের পক্ষে অস্বাভাবিক। ইহাতেই গিরি বেশী দমিয়া গেল। হরিলাল বকিয়াই যায়—ভাত, আবে ভাত দেখলাতা হামকো? ভাত? —ভাত তো খালকা বীচ্, কেয়া দাম উসকো, আর দেখ্লাতা কি না একটো আওরৎ, আরে তুলসীদাস কেয়া বোলা জান্তা?—

"শিরকা তাজ, মরদ কা মান,
জুরি আর চক্ষু ছুঁহি সমান।"
(এর তুম শির মে উঠায়া?"

(নীলকণ্ঠ, ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা)

আনন্দের কথা এই যে, উপন্যাসের শেষের দিকেও হরিলাল আগের মত সমান ঔজ্জ্বল্যে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে পেরেছে। যখন শ্রীমন্ত দীর্ঘকালের জন্যে কারাবাসে। যখন বিপিনকে নিয়ে গিরিবালার সংগে একটা কুশ্রী ঘটনা চারদিকের বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে তখন রসিকতা করবার একটা সুযোগ নিয়ে এসে হরিলাল গিরির সামনে দাঁড়ালো, কয়েকটা কথা কাটাকাটির পর গিরি বললে :—

"কোন্ সাহসে তুমি আমার বাড়ীতে আবার পা দাও, লজ্জা করে না তোমার?

হরিলাল হা হা করিয়া হাসিয়া কহিল—সীতারাম—সীতারাম, লজ্জা সরম তো হামারা নেহি হ্যায়, উ তো আওরৎ, জেনানা কী চীজ্—হাম মর্দানা হ্যায়—

……গিরি প্রবল উত্তেজনায় কহিল,—বের হোয়ে যাও বল্‌ছি আমার বাড়ী থেকে, এখুনি বের হোয়ে যাও, নইলে,—সংগে সংগে তাহার হাতখানা দুলিয়া উঠিল, সে হাতে তাহার কাটারী!

……হরিলাল পলাইল। কিন্তু দরোজার মুখেই একবার ফিরিয়া দুই কলি গান সে গাহিয়া গেল, কহিল, একটা গান বেঁধেছি সখি—

বিপিনে বিয়ে করবে আমার
বি—পিন বি—হারী!"—

(নীলকণ্ঠ, ১২২ পৃষ্ঠা)

চরিত্র চিত্রণের এই চমৎকার কৌশল শুধু আমাদের স্তম্ভিত করে না, একেবারে মুগ্ধ করে। গ্রন্থালোচনায় সর্ব প্রথমে আমরা হরিলালকে স্মরণ ক'রে এ ভাবে সম্মান দিলাম, তার একমাত্র কারণ তার এই নিখুঁত প্রতিচ্ছবি—সমস্ত গ্রন্থখানির মধ্যে হরিলাল অবিস্মরণীয় হোয়ে রইলো।

এর পরে চরিত্রের দিক থেকে মনে পড়ে গিরিবালার কথা। সেই এ উপন্যাসের নায়িকা। প্রথম থেকে তার গতিকেন্দ্রী কথাবার্তা সমস্তই অত্যন্ত সুন্দর হোয়েছে। যে বলিষ্ঠ মন এবং স্নেহ ভালোবাসা নিয়ে সে শ্রীমন্তর সংসারে এসেছিলো তা সত্যিই নবীনা গৃহলক্ষ্মীর সম্পূর্ণ উপযুক্ত। পরবর্তী জীবনে তার সব থেকে বড়ো দুঃখ যে সন্তান কামনাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছিলো, তারো প্রকাশ অনবদ্য বলা যায়। এমন কি এক রাত্রে স্বামীকে সন্তানের আশায় বিবাহ করতে অনুরোধ করবার অব্যবহিত পরে চমৎকার একটী দৃশ্যের অবতারণায় লেখক যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তাও বিস্ময়কর :—

"…… সে স্বামীকে আপনার দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়া কহিল। রাগ হোল বুঝি? শোনো শোনো!

শ্রীমন্ত ফিরিয়া কহিল, এ সংসারে আজ ছ' সাত বছর এক সংগে ঘর করছি, তুমি আমার সব চেয়ে বড়ো, একি তুমি জানো না?

নারীটীর অন্তর পুরুষের সোহাগে পুলকে দুলিয়া দুলিয়া উঠে, গিরি চটুল ভাবে কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর টানিয়া কহিল, তাই নাকি? কতো বড় গো, তোমার ওই তেলপাকা কালো হুঁকোটার চেয়েও বড়ো?

শ্রীমন্ত এবার স্ত্রীর গালে সোহাগের চড় মারিয়া কহিল—ভাগ্!

উত্তরে গিরি পরম সোহাগে স্বামীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তা জানি ব'লেই তো এতো দুঃখ, এতো লজ্জা আমার যে তোমার মনের খেদ মেটাতে পারলাম না।

শ্রীমন্ত তিরস্কার করিয়া কহিল, ফের ওই কথা, তাহ'লে কিন্তু আমি উঠে যাবো।

আচ্ছা, থাক্ থাক্, এই মুখ বন্ধ করছি। বলিয়া সে স্বামীর অধরে আপন অধর আবদ্ধ করিয়া দিল। অতি পুলকে গিরি স্বামীর নিকট হইতে আগে প্রেম নিবেদন পাইবার স্ত্রীর যে একটা মর্যাদা ও সনজ রীতি আছে, তাহা আজ লঙ্ঘন করিয়া ফেলিল।" (নীলকণ্ঠ, ৪৬ পৃষ্ঠা)

এক কথায়, গিরিবালাকে মনে হয় চমৎকার শান্ত একটী যেন কল্যাণের প্রতিমূর্তি—কিন্তু আমাদের আপত্তির কথা এই যে তার সন্তান-কামনাকে কেন্দ্র ক'রে বারে বারে লেখক যে পরিবেশের সৃষ্টি ক'রেছেন, তা যেন একটু অতিরিক্ত ব'লে মনে হোয়েছে—হয় তো আরো কম হোলে এর ব্যঞ্জনাটা পাঠক পাঠিকার মনে আরো গভীর ছায়া ফেলতে পারতো।

তৃতীয় চরিত্র—শ্রীমন্ত। অত্যন্ত সাধারণ নায়ক এবং কোন বৈশিষ্ট্যই নেই বললে চলে। এদিক থেকে সে নিখুঁত। শৈশব থেকে আরম্ভ ক'রে যৌবনের প্রান্তসীমা পর্যন্ত যতোটুকু তাকে দেখা গেলো, ততোটুকু সুসম্পূর্ণ—নিটোল একটী মানুষ বলা যায়—তার কথাবার্তা, তার গতিভঙ্গী, পাঠক পাঠিকার মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারে না। সুতরাং শ্রীমন্ত নিঃসন্দেহে সুসম্পূর্ণ হোয়েছে, কিন্তু স্মরণীয় হোতে পারে নি।

চরিত্র বিশ্লেষণ সম্বন্ধে আমাদের আরো একটা অভিযোগের কথা এই যে, এ পর্যন্ত পর পর তিনখানি উপন্যাস আলোচনা ক'রে দেখা গেলো কয়েকটী মানুষ অত্যন্ত চেনা, তারা জামা কাপড় অথবা শাড়ী বদলে নতুন নামে এ মঞ্চ থেকে ও মঞ্চে অবতীর্ণ হোচ্ছে।

এই আখ্যানের বিপিন চরিত্রটীকে আমরা ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে দেখেছি 'চৈতালী ঘূর্ণি'র সুবলের মধ্যে (অবশ্য রুচি ও মনোবৃত্তির বিচারে সুবল ও বিপিনের চরিত্রগত পার্থক্য আমরা অস্বীকার করি না) দেখেছি রাইকমলের একটী ছোট্ট চরিত্রে। একই চরিত্র যদি বার বার একই আবেদন নিয়ে উপন্যাসকারের প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থেই আবর্তিত হোতে থাকে তাহলে সেটা নিঃসন্দেহে পীড়াদায়ক হোয়ে ওঠে।

চরিত্র হিসেবে বিপিন চমৎকার, তার লালসা, তার লোভ তার তীক্ষ্ণ মনের কল্পিত পথাতিবাহন সবই নিখুঁত হোয়েছে বলা যায়।

গিরি সম্বন্ধেও প্রায় সেই কথা বলা যায়, 'চৈতালী ঘূর্ণি'র যামিনী আর এই উপন্যাসের গিরির মধ্যে এরকম অনেক সাদৃশ্য আছে।

পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে 'পাঁচুর মা'এর উজ্জ্বল হোয়ে উঠ্‌বার অনেক অবকাশ ছিলো—কিন্তু সেদিক থেকে তাকে কোনো সুযোগই দেওয়া হয়নি। ফলে তার সেই অপূর্ব সম্ভাবনাটী নষ্ট হোয়ে গেছে।

গৌরী চমৎকার। এ ছাড়া আশে পাশে আর যারা আছে তারা প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের জায়গায় সুপ্রতিষ্ঠিত হোয়ে বসতে পেরেছে।

একটা কথা শুধু এখানে আমাদের জানাবার আছে এই যে, যে-গৌরীকে নিয়ে শ্রীমন্তর জীবনে এতো বড়ো একটা প্রলয়ংকর ঘটনা ঘটে গেলো, তার সম্বন্ধে লেখক শেষ পর্যন্ত এতো উদাসীন রইলেন কী করে? যে বিষেকে কেন্দ্র ক'রে এই বিস্ফোভ সেই ঘটনার প্রধানা নায়িকা গৌরীর পরবর্তী জীবনে কি পরিণতি নামলো তার একটা বিশদ ছবি আমরা আশা ক'রেছিলাম। তার কারণ আর কিছু নয় বিবাহ-সভায় যে কাণা পাত্রের হাতে তাকে অর্পিতা হোতে দেখেছি তাতে শেষের দিকে 'গৌরী সুখে আছে' শুধু এইটুকু ইংগিত পেয়েই আমরা সন্তুষ্ট হোতে পারিনি, আরো একটু প্রশস্ত আলোকোদ্ভাসিত পটভূমিকায় তাকে দেখ্‌তে পেলে আন্তরিক খুশী হোতাম।

কিন্তু নীলকণ্ঠ-কাহিনীর আসল কৃতিত্ব এই যে উপন্যাসকার যে গল্পটী এর মধ্যে সৃষ্টি ক'রেছেন সেইটেই তাঁর সমস্ত দুর্বলতা এবং ত্রুটীকে নিঃশেষে ঢেকে দিতে পেরেছে। সব থেকে বড়ো আবেদন এবং মর্মস্পর্শী ঘটনা তিনি সৃষ্টি ক'রেছেন শেষের দিকে পিতা পুত্রের মিলনের মধ্যে দিয়ে—মিলন তাদের হোল ঠিকই, কিন্তু কেউ কাউকেই চিন্‌তে পারলো না। এমন কি কোনোদিনো যে তাদের প্রকৃত পরিচয় পরস্পরের কাছে

উদ্ঘাটিত হবে তার বিন্দুমাত্র কোন অবকাশ রইলো না। কাহিনী শেষ করবার পর পাঠকের মনে এই যে বেদনা বোধ জাগে, তার থেকেই সমস্ত উপন্যাসের উপরেই তার একটা সশ্রদ্ধ সহানুভূতি আসে সুতরাং সমস্ত ত্রুটীই এখানে আর তেমন প্রকট হোয়ে চোখে লাগে না।

একথা অনস্বীকার্য যে শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর মানুষকে অন্তর দিয়ে দেখ্‌তে পেরেছেন। সেইজন্যে স্বভাবতঃই তাঁর লেখার গল্পকে অতিক্রম ক'রে মানুষ অনেক বড়ো হোয়ে উঠে; এই একই কারণে তার আবেদন বহুদূর কাল পর্যন্ত সুবিস্তৃত হোতে পারে।

উপন্যাসের আংগিক সম্বন্ধে আমাদের নতুন কিছু বলবার নেই—তবে ভাষা সম্পর্কে কিছু না ব'লে পারা গেলো না। যে-ভাষায় তিনি উপন্যাস আরম্ভ ক'রেছেন তা প্রতিমধুর এবং অত্যন্ত সুখপাঠ্য, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন এক একটী শব্দ প্রয়োগ ক'রেছেন যা রীতিমতো অস্বস্তিকর।

যেমন ধরুন :—

"গিরি একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া থাকে, ক্ষণ পরে কহে, তার চেয়ে দেখে শুনে দেওয়াই ভালো, সম্পত্তি কিছু দিও, সব দিয়োনা, সময় গিয়েওতো মানুষের ছেলে পেলে হয়!" (নীলকণ্ঠ, ৬৭ পৃষ্ঠা)

অথবা :

"পাচুর মায়ের ঝগড়ার কথায় রতন পিছায় নাই। কিন্তু গিরির শান্ত অথচ দৃঢ় উত্তরে সে ভড়কাইয়া গেল।"

(নীলকণ্ঠ, ১৫১ পৃষ্ঠা)

কিংবা :—

"গিরি ঘরের দাওয়া হইতে আরেক গিরির মতোই আস্ফালন করিল—দেখ আমি কিন্তু দানছত্র খুলি নাই—

শ্রীমন্ত আন্দারে তাল মারিল—নিশ্চয়ই!"

(নীলকণ্ঠ, ৫৬ পৃষ্ঠা)

উদ্ধৃতির বড় অংশগুলিকে ইচ্ছে করলেই সু-সংস্কৃত করা যেতে পারতো!

এ-ছাড়া অনবধানতাও আছে, যেমন ধরুন ১১ পৃষ্ঠায় গৌরী বলেছে :—

"বই নেব,—শ্লেট!"

আবার ১২ পৃষ্ঠাতেই :—

"গৌরীর সেই এক বায়না—বই, শ্লেলেট!"

আবার ২৯ পৃষ্ঠায় :—

"গৌরী ব্যতিব্যস্ত ভাবে বাধা দিয়া কহিল—চুপ কর, পড়ছি আমি, এই দেখ বই—এই দেখ শ্লেলেট!

এগুলি নিশ্চয়ই আংগিক কোনো ত্রুটী নয়—তবে সাবধান হোলেই বা দোষ কি?

আর একটী ত্রুটী বড়ো বেশী চোখে লেগেছে আমাদের, সেটা আর কিছু নয় গিরিবালার মতো মেয়ের পক্ষে তার ছেলের নাম 'নীলকণ্ঠ' কী ক'রে রাখা সম্ভব হোলো এই কথা ভেবে। তার একমাত্র কারণ এই যে, গিরিবালা যে পরিবেশে মানুষ, তার থেকে তার বহু লাঞ্ছিত জীবনের সংগে মিলিয়ে এতো সুন্দর আর কবিত্বপূর্ণ নাম রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়, আমাদের মনে হয় কোন কথকতা, কীর্তন বা যাত্রার আসর থেকে এই নামের বিশ্লেষণ শুনে একপ্রকার অনুপ্রেরিতা গিরিবালা পরবর্তী জীবনে ছেলের নাম 'নীলকণ্ঠ' রাখ্‌ছে—এরূপ অনেক বেশী শোভন, সুন্দর আর যৌক্তিক হোত!

আগেই আমরা বলেছি, নীলকণ্ঠের মধ্যে যতো দোষই থাক, তার আংগিক বা চরিত্র চিত্রণ যতোই দুর্বল বা সবল হোক কেবলমাত্র গল্পাংশের অপূর্ব অভিনবত্বের জন্যে পাঠক-পাঠিকাকে একেবারে মুগ্ধ ক'রে রাখে। নীলকণ্ঠ প'ড়ে মনে হয় বাংলার পল্লীর নিভৃততম কোণের চমৎকার একটী বেদনা-রঞ্জিত ছবিকে শিল্পী প্রাণের রসে এবং রঙে অপূর্ব ক'রে এঁকেছেন—বালক নীলকণ্ঠের বেদনা সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে আমাদের ক্ষিষ্ণু মানব সমাজের যে দুঃখকে প্রতিফলিত ক'রেছে, একথা বলবো, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার তুলনা নেই—সুতরাং একথাও বিশ্বাস করি যে আগামী কালের সুবিস্তৃত ইতিহাসেও শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্করের এই অপূর্ব কাহিনী, উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় এমনিই রঞ্জিত থাকবে!

আমাদের সাহিত্য-ভবন
কলকাতা।

নির্বাসিত বিহঙ্গ

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী, অনূদিত

[চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

যে সংক্ষিপ্ত ঘটনা এখানে বলা হবে তার মূলে জড়িত রয়েছে অতি বাস্তব হৃদয়াবেগ—অথবা এমন ঘটনার হুবহু বিবরণ যা মানুষের মনে উত্তেজনা জাগায়। তথাপি, যেহেতু জীবনের এক-একটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কার্য উন্মুখর চিন্তার ফুল বা ফল, কাজেই এ সবের বাড়তির পরিণতি লক্ষ্য করার মতো। ছোটর সমবায়েই বড়র জন্ম, এবং অতি সাধারণ একটি মুখের কথা—বীজরূপে মাটির স্পর্শ লাভ করে এমন একটি অঙ্কুর হয়ে শেষে মাথা উঁচু করে উঠে—কালে তাতে ফুল ফুটে, সুগন্ধ ছড়ায়, জীবনের গতি বদলে দেয় এবং ঘূর্ণাবর্তনে পথে ঘুরে ফিরে শেষে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে ওঠে।

শোক-দুঃখ-বিমর্ষতায় কী করে পেরিয়ে যায় দীর্ঘ বারোটি মাস। সেন্টপিটার্সবার্গ থেকে তিন হাজার মাইল দূরে, সাইবেরিয়ার নির্বাসন-প্রান্তরে কাঠের খুঁটি দিয়ে ঘেরা বন্দীশালায় আবার ঘটনার যোগসূত্র গাঁথা হয়।

ছোট ছোট কাঠের ঘর। বাইরে সীমারেখায় বিরাট ঘেড়া-প্রাচীর। সেই প্রাচীরের গায়ে ঠেস দিয়ে বসার সুযোগ যদি তোমার ঘটে,—তাহলে এমন হুবহু কিছু দেখতে পাবে—যেমন পল প্যাভলফ এখন সুস্পষ্ট দেখছে। উপরে মেঘমৌত নীল আকাশ। ঝকঝকে সূর্যকিরণ অসহ্য তাপ বিকিরণ করছে। যেদিকে তাকাও, দাঁত-বের-করা সব কাঠের খুঁচি-খুঁটি সুনীল শূন্যতাকে যেন বর্বর হিংস্রতা নিয়ে ভীষণ-ভাবে কামড়ে ধরে আছে। প্রকাণ্ড লম্বা এবড়ো-খেবড়ো কাঠের চালাঘর—লোহার শিক-বসানো খোঁচাপাচ জোকর-জানালা—শক্ত ঝুলুপমারা ছোট্ট দরজা। সুঁচালো চূড়ো কাঠের গির্জা। এখানে ওখানে শান্ত্রীদের শাদাকালো বস্ত্র। নীল পোষাক-পরা বেয়নেটধারী—এক কশাক প্রহরী উদাসীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। তার দৃষ্টিতে এমন তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠেছে—এখানে সবাই যেন তার চেয়েও নরাধম। লোমশ চেহারা, উস্কখুস্ক মাথার চুল, গায়ে ছাইরংএর ওভারকোট, চ্যাপ্টা-টুপি-মাথায় তাড়িত বন্দীদলের পায়ের তাড়নে নীচের ধুলো মাটি কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছে। নীরবে তারা চলেছে। পাশে পাশে লোহার শিকল-বেড়ীর এলোমেলো ঝনঝনিতে সে নীরবতা বিক্ষোভিত করে তোলে। শিকলের আওয়াজ স্বভাবতই জনসাধারণের মনে আতঙ্কের অনুভূতি জাগায় কিন্তু প্যাভলফের মন তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

ঘরের ভেতর যে দিকটায় একটু শুকনো জায়গা ছিল সেখানে প্যাভলফ একটা তাঙা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে আছে। কৌতূহলী হয়ে সে লক্ষ্য করছে এবং বেশ উপভোগও করছে সহচর কয়েদীদের চাল-চলন। ক্ষুধাতুর কুকুরের শুকনো হাড়ের টুকরোই মহাভোজ। মাসের পর মাস ধরে পাষাণময় অন্ধকোঠায় বন্দী যদি বন্দীখানার সীমার মধ্যেও ক্ষণিকের জন্যেও জীবনের আলোর ঝরণা পায়, নীচে কাদামাটিতে দাঁড়িয়েও যদি মাটি ও আকাশের উচ্চতা তার চোখে পড়ে—এ যেন বিকট দাঁতওয়ালা যন্ত্রদানবের মুখ থেকে মুক্তি—সমাধি থেকে যেন জীবনের পুনরাবির্ভাব—মনুষ্যত্বের সঙ্গে যেন মুক্তির যোগাযোগ—এক সুমধুর সমন্বয়—যার জন্যে চিরকৃতজ্ঞতায় মাথা নমিত না হয়ে পারে না।

এক বছরের বন্দীদশায় পল প্যাভলফের চেহারায় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে,অবশ্য মনের দিক দিয়ে ধীরশান্ত মানুষটির তেমন কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তার মুখের গড়ন সদা নির্ভরশীল এবং ঔৎসুক্যে ভরপুর। লম্বা কাহিল দেহ—এখন তাকে আরও কাহিল ও রোগাটে, লম্বা দেখাচ্ছিল এবং সম্ভবত মুখের ভাব, কোটরগত চোখের গাম্ভীর্য, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আলুথালু ঔদাসীন্য তার স্বভাব-বিভোর কৌতূহলী অবস্থাটাও যেন ধরা পড়ে।

প্যাভলফের শান্ত সতর্ক কৌতূহলী দৃষ্টি চারদিকে সহবন্দীদের উপর নিবদ্ধ—এই সুদীর্ঘ অবরোধের ভেতরেও যেন সে ওদের মধ্যে কর্ম-চপল মাধুর্যের সন্ধান পেয়ে যেতে ওঠে। তার লক্ষ্যের মাঝে ছিল ভাবনা-গভীর তীক্ষ্ণতা এবং যদিও মনে মনে ছিল প্রতিটি মানুষের বিচার-ভার এবং অতীত ঘটনার বিশ্লেষণ। দেখলে মনে হয়—যেন পাঠাগারে আগত ছাত্র—মনোমত পুঁথির হঠাৎ সন্ধান পেয়ে গভীর পাঠে নিমগ্ন।

অদূরে পাশার ছক নিয়ে বসেছে অনেকগুলি সহবন্দী—থালি হাতে পাশার চালে তাদের মনোযোগ রেখে বাজিমাৎ চলে। একজনের হাতে ও পায়ে শিকল বাঁধা। পালাক্রমে সে যখন পাশা ফেলে, তখন এই শিকলের ঝনৎকারে যেন শয়তানের হি-হি রব জেগে ওঠে। তারা খেলায় বাজি রাখে—যেমন আহার্যের খানিকটা অথবা জমানো চায়ের টুকরো।

বেঁটেখাট হাসিখুসী-মুখ একটি লোক হাতগাড়ী ঠেলে নিয়ে চলেছে। সেও খেলা দেখবার জন্যে প্যাভলফের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকটার বয়স হয়েছে, অথচ উৎফুল্ল তার বেশ, কিন্তু এমন হাসিখুসী মুখ প্যাভলফ আর কখনও দেখেনি। টুপিটা খুলতেই দেখা গেল—লোকটার মাথার একদিক কামানো। বুঝা গেল, গুরু অপরাধে দণ্ডিত আসামী সে। তারপর লোকটা এমন ভাবে কয়েক মিনিট ধরে মাথাটায় হাত বুলাল যেন চুলের এরকম অদ্ভুত ছাঁটে এখনও সে অভ্যস্ত হয়ে উঠেনি। হাতগাড়ীর সঙ্গে তাকে শেকল দিয়ে জুড়ে রাখা হয়েছে—তখনই সে গাড়ীটাকে ঠেলে ঠেলে চলতে থাকে, চাকা দুটি তখন একঘেয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ কলরব তোলে।

—এই—এই···

প্যাভলফের দিকে তার পরিচিত মাথাটা কাঁকিয়ে বলে—এই—এই···দিন যে গেল হে···হারালেই উপোষ—খোকামিও বটে।

প্যাভলফ মাথা নাড়ল। —সত্যি তাই! ওদের চোখে পাশার দানই বড়। এখন তোমার ঐ গাড়ীর কলরবটা একটু থামাতে পার না কি?

—না মশাই, পারিনে।—লোকটা বলে এবং এমনভাবে বলে—ঐ কলরবটা থামাতে পারলে সে যেন খুসী হয়।

—আমার বাড়তি তেল যা কিছু ছিল সবই ঢেলেছি। কিন্তু ও ক্যাঁচক্যাঁচানি আর থামল না। ধুলোকাদা ওর গলায় আটকে গেছে বোধ হয়। কাজেই তেলচবি আমি সবই খাওয়ালাম তবু যদি চেঁচায় তো—ও চেঁচাক। একদিন ওই চেঁচানি তোমারও সয়ে যাবে। কী চমৎকার শোনায় আওয়াজটা—না?

—এখনও আমার ধাতে উঠেনি। কদ্দূর থেকে ঠেলে এনেছ ওটাকে?

—পনের শো মাইলের উপর গো মশাই, পনের শো মাইল—সেই ওরেনবার্গের পথ থেকে···

এই বলেই লোকটা গল্প করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে গাঁট হয়ে বসে পড়ল।

—তাহলে তো এখন তারি মেহনত হয়েছে তোমার?

—হাঁ—না, মশাই তা নয়। সময়ে সবই ধাতস্থ হয়ে যায়। আমার তো বিশ্বাস কর্তারা ওটাকে নিয়ে গেলে আমার সবই গেল। ও হল গিয়ে আমার পথের সাথী—কোন রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়ে ওকে ভুলে গেলেও ও আছে ঠিক সঙ্গে সঙ্গে। পথ চলতে চলতে আমি ওর সঙ্গে কত কথা বলি। কিন্তু ও কেবল একই রকম জবাব দেয়—ক্যাঁচ—ক্যাঁচ—ইয়েস—ইয়েস. ইয়েস—হাঁ গো হাঁ··· সব কথারই ঐ এক কথা··· 'ইয়েস' 'ইয়েস'···

লোকটির কথার ধরণ ও সরল অঙ্গভঙ্গীতে প্যাভলফের মন চাঙা হয়ে ওঠে। বলল: ও কি করে কথা বলে?

—শোন তাহলে। আমার ইস্তিরি, মশাই, সব কথাতেই কেবল মুখ ঝামটা দিয়ে বলত—না—না—না—। তার এই না—না—না কোন দিনও থামল না। আমার কপাল ভাল যে ও বুলি আর নেই। এখন এই সাধের গাড়ী কখনও আমাকে না—না—না বলে না—ও বুলিতে আমাকে নাকানি চুবানি খাওয়ায় না বরং কাছে কাছে থাকে।

এই সময়ে একটি ছোট্ট মেয়ে—কোলে কালো রংএর একটি বেড়াল—এসে গাড়ীটাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। বেঁটে বুড়োর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট নেড়ে বলল: আজ আমাদের গাড়ীতে চড়াবে না—খোকাবাবা!

—হাঁ গো হাঁ, চড়ে বসলেই তো হয়—এক চক্কর দিয়ে আনি। তোমার পুসী আজ কেমন আছে?

—ও কাদামাটি বড্ড অপছন্দ করে, খোকাবাবা।—বলেই মেয়েটি গাড়ীতে চেপে বসল। বুড়ো গাড়ী ঠেলতে লাগল।

বালিকার আবোল তাবোল কলধ্বনি, গাড়ীর ক্যাচর ক্যাচর এবং হাতবন্দী শেকলের আওয়াজ সমান তালে বাজতে লাগল।

খানিক পরেই লোকটি আবার সেখানেই ঘুরে আসে গাড়ী নিয়ে। এবার তার মুখের ভাব আরও হাসিখুশী। মেয়েটি গাড়ী থেকে নেমে বেড়ালটির গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলে—নমস্কার পোকাবাবু, এবার চললুম তাহলে···

খানিকদূরে একটি লোক দাঁড়িয়েছিল—তার চেহারা বিষাদ-মলিন, মেয়েটির জন্যেই সে অপেক্ষা করছিল। বালিকা তাড়াতাড়ি তারই কাছে ছুটে গেল।

—এই—এই, বেঁটে-বুড়ো কি বলতে চাইল্। বালিকা তখন ছুটে গিয়ে সেই লোকটিকে জড়িয়ে ধরল এবং হাত ধরে চলে গেল। বুড়ো বলল—দুদিন হোল লোকটার স্ত্রী মারা গেছে—যথাসর্বস্ব ব'লে যা রেখে গেছে সে ঐ মেয়েটাকে।··· এ যাবগা তার পক্ষেই সব চেয়ে ভাল যার বৌ নেই—স্ত্রী নেই।

প্যাতলফ তখন বলল—ঐ একটু আগেই যে বললে তুমিও বিয়ে করেছ?

—হাঁ মশাই, করেছিলাম।···এই বলেই সে পরম স্নেহে গাড়ীটাকে মৃদু চাপড় মেরে বলল: এই গাড়ীই এখন আমার সাধের ঘরণী।

—তাই নাকি—গাড়ীটাকে বিয়ে করলে কেন?

—তাহলে শোন কি ব্যাপার! আমার স্ত্রী—সেই আগে যাকে বিয়ে করেছিলাম—বুঝলে কিনা, আর একজনকে নিয়ে উধাও হল সে। আর আমি কিনা একদিন সে ব্যাটাকে ধরে আচ্ছা করে উত্তম মধ্যম লাগালাম। তার ফলেই যা হবার হোল—এই গাড়ীটার সঙ্গেই নিজেকে জুড়ে নিলাম।

—লোক ঠ্যাঙানোর চমৎকার পরিণাম বটে!

—তা জানিনে। কিন্তু জান, লোকটা ঠিক মরে গেছে।

—কিন্তু তোমার স্ত্রী—অর্থাৎ আগের স্ত্রীর কথাই বলছি···কি উপায় হল তার?

—কি আর হবে? হাড় জুড়োল আর কি! আমারও জুড়িয়েছে।

তারপর আবার বলতে লাগল সরলভাবে—বুঝলে কিনা আমরা একমতে মিলতে পারিনি, কেননা, সে সব সময়ে চলতো তার ইচ্ছামত। কি আর করি—আমার চেয়ে সে ঢের বেশি লাদ্রেল কি না! তখনও সে আমারই স্ত্রী—আর আমি আর কাউকে ঘেঁসতেই দেইনি তার কাছে। যা হোক শেষে সে গেল মরে। আর তাতে আমার ভালই হল। ওর দখল ছেড়ে আমি গাড়ীটা নিয়েই বেশ ভাল আছি। আমার পেয়ালে মাফিক সে চলে এবং যা বলি সব সময়ই বলে, ইয়েস—ইয়েস—ইয়েস। আর না—না—না—এই বুলিই ছিল আমার সেই স্ত্রীর। এবং নিজের মর্জি-মাফিক ছিল তার চালচলন। পক্ষান্তরে এই গাড়ীতে আমি—চড়তে পাই—উঠে বসতে পারি। একদিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয়—স্ত্রীর মতোই সে নিত্য খিদমৎ করে আমার।

—একে নিয়ে আর কতদূর তুমি যাবে?

—আরও দু' হাজার মাইল—সেই কারা পর্যন্ত।

—তারপর? হাঁ—তখন তাকে ছাড়তেতো তোমার খুব কষ্ট হবে?

ছাড়াছাড়ি হলে তো! কর্তারা বলেন—যদ্দিন বেঁচে আছি—আমাদের সম্পর্ক টুটবে না। আমার বিশ্বাস, রাস্তায় খোঁড়া হয়ে শুয়ে পড়বে না ও। একটাকে ছেড়ে আর একটাকে ধরব—ও আমি পারব না কখনও। সৌভাগ্য যে এর আগে কখনও ওরকম দুর্ভাবনা আমার মনে জাগেনি। ধরো, তাই যদি হয়, তবে আমার কি উপায় হবে?

বলতে বলতে লোকটির প্রসন্ন মুখের উপর কালো ছায়া যেন ঘনিয়ে এল।

সাইবেরিয়ার নির্বাসন-প্রান্তরের পারিপার্শ্বিকতার ভেতরও বেঁটে নোংরা একজন মানুষের মধ্যে এমন অপূর্ব সাহসী আত্মার সন্ধান পেয়ে প্যাতলফের মন আনন্দে মেতে উঠল। বলল: তুমি মহাভাগ্যবান। এত কষ্টও তুমি এমন হালকা ভাবে এড়াতে পার?

—আহা! অতশত আমি জানিনে বাপু! যা আর ফেরাতে পারবে না—যার রদবদল হবে না—ও নিয়ে বকবক করে কি লাভ বলতো? তা ছাড়া, দেখ প্রিয়াটি আমার কত কাজের—সময় সময় চড়ে বসতে পারি ওর উপর। লটবহর চাপাতে পারি। ছেলেমেয়েদেরও ঘুরিয়ে আনতে পারে ও—এমন কি প্রতিবেশী কুকুরটিকেও সে কোলে উঠিয়ে নেয়। আর আমার সেই গুণবতী—হ্যাঃ, জান—শিশুদের সে দেখতে পারত না—কুকুর ছিল তার দুচক্ষের বিষ।

লম্বা ঢেঙা একটি লোক—ঘুরে ঘুরে শেষে একটা ঘরেরই দেয়ালে ঠেস দিয়ে খেলা দেখছিল। বেঁটে বুড়োর কথা তার কানে যেতেই বলল: আমার কুকুরটার কথা কিছু বলছ নাকি—গ্রেগরি রেপানোভিচ?

—হাঁ সেকথাই হচ্ছিল মিঃ জুবফ। বলছিলাম—ও মাঝে মাঝে আমার গাড়ীতে চড়ে খুব আমোদ পায়।

—তা পায় বৈকি—গাড়ীতে ঘুমিয়ে আরও আরাম পায়। যদি গাড়ীটা আরও বড় হত—শোবার মত যায়গা হত··· কাল ভিড় জমেছিল খুব জান, তাই ঘেঁষাঘেঁষি করে মেঝেতে পড়ে রাত কাটাতে হল। স্যাঁৎসেঁতে কাদামর মেঝে—ঠাণ্ডায় আমার হাড়-পাঁজর সব ধরে গেছে।

—আঃ!···বুড়ো গ্রেগরি চিবিয়ে চিবিয়ে বলে: কাল রাতে আমার প্রিয়ার বুকে কি আরামেই না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। —জান, তোমার ছোট্ট কুকুরটিও পাশে ছিল। কাজেই আমার হাড়-পাঁজর বেশ জুৎসই-ই আছে। তবে কথা এই—ঠিকমত পা ছড়ানো যায় না বলে—ওদের তেমন আরাম দেওয়া যায়নি।

এবার প্যাভলফ এই নূতন লোকটিকে জিজ্ঞেস করল: তুমি কোথায় যাবে?

—আর কোথায়! এই দেশেই!

—তবে কুকুরটাকেও যে নিয়ে এলে তুমি? সে-ও নির্বাসিত নাকি?

—লোকটি কুকুরের গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বিষণ্ণমুখে বলল: না, ও ছিল আমার শিশুমেয়ের সম্পত্তি। তারাও আমার সঙ্গ নিয়েছিল। পথে জ্বর হয়ে তারা মারা গেল। যা হবার তা হোল। শিশু ও স্ত্রীলোকের পক্ষে এ রাজ্যের পথঘাট বড় ভীষণ। কুকুরটাকে আর ফেলে আসতে পারিনি। তাছাড়া—

কি বলতে গিয়ে লোকটির শোককাতর মুখ কেঁপে উঠল।

—তাছাড়া—কি বলছিলে, বল?

জুবফ ঘাড় তুলে একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখল—কোথাও আবার সবুজ-পোষাকধারী শিকারী কুকুর আড়ি পেতেছে কিনা। তারপর সতর্কভাবে বলল: যেখান থেকে কর্তারা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন—আমি সেখানেই আবার ফিরে যাব কিনা—সেই শুভদিনে পাহাড়-পথে এই ফিকি-কুকুর হবে আমার সঙ্গী। সুঁচের মতো ধারালো তার বুদ্ধি এবং নির্জন পথে-প্রান্তরে পাকাবুদ্ধিওয়ালা কেউ একজন থাকা ভাল—যাতে দুচারটে কথা বলে একঘেয়েমি কাটান যায়।

—তোমার কি বিশ্বাস যে পালাতে পারবে?···প্যাভলফ অতিরিক্ত কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল। তারও ইচ্ছে, একই পথের পথিক হওয়া।

—নিশ্চয়। ইচ্ছে করলে যে কেউ এখান থেকে পালাতে পারে। ও কর্মটা তো ঘুরে ফিরে বেড়ানোর মতো সোজা। তবে জান—তাতে এ বুঝায় না যে ঘরে ফিরে যাওয়া অত সোজা। সে হল সম্পূর্ণ অন্য কথা। বুঝলে? সংসারে আমার কেউ নেই যে আবার ফিরে যাব। যদি কোন পাহাড়ে গিয়ে লুকোতে পারি, সেখানেই আমি ভেরা বাঁধব।

—মনে কর—যদি টিকটিকির দল তোমায় দেখে ফেলে···

—তা হলে ও জানই—পায়ে বেড়ি পরে কারাতেই চালান যাব।

বুড়ো গ্রেগরি ততক্ষণ হাঁ করে একমনে শুনে যাচ্ছিল তাদের কথা। এবার বলল: ও একই কথা হোল। বনে যখন বরফ পড়তে সুরু হবে, তখন উপোসেই মরতে হবে তোমাকে।

—না গো না—আমি সবই ভেবে দেখেছি।

—আঃ, আমার মতো আলাপিনী প্রিয়ার প্রেমে বেড়ির বাঁধন পরেছে যে মহাভাগ্যবান—তার পক্ষে পালিয়ে যাওয়া কথার কথা নয়।—বলতে বলতে গাড়ীর গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিল বেঁটে লোকটি।

—কি বললে? পালাবে? একি বিশ্বাসযোগ্য? কাজটা অত সোজা নয়—ও চেষ্টা করবারই আমার করা হয়েছে।—বলতে বলতে আর একজন লোক এসে দাঁড়াল তাদের কাছে। হোৎকা ধুমসো চেহারা লোকটার। দুপায়ে লোহার বেড়ি পরা। গায়ের রং ধোঁয়াটে কালো। মাংসল চিবুক। ঘোড়াগাড়ীর ঘোড়ার মতোই জোয়ান শরীর।

একটু থেমেই আবার বলতে লাগল সে: আরও শোন—কারার চেয়ে আরও জঘন্য যায়গা আছে যেমন, টয়াকুটস্ক্। না গ্রেগরী!···

প্যাভলফ জিজ্ঞেস করল: কী ব্যাপার-ওখানকার? তুমি সেখানে ছিলে নাকি?

—হাঁ, মশাই। সেখানেই আছি এবং চিরজীবনের মতো—তেরা বেঁধেছিও সেখানে। কারাকে তোমরা সবাই বল—নরক। কিন্তু ইয়াকুটস্ক—নরকের বাড়া—শতগুণে অধম।

প্যাভলফ বলল: হতে পারে অতি জঘন্য···

—জঘন্য! জান—কারা দেখে তবু মানুষ আছে—অবশ্য অতি দুঃখকষ্টে। কিন্তু ইয়াকুটস্কে—সেখানে স্রেফ অসভ্য জাতি—তারা কাঁচা মাংস খায়, বরফের উপর ঘুমায়। জানোয়ার—সোজা জানোয়ার—ওদের সঙ্গে বাস করা চলে না। আমি দেখ—কেমন মোটা খসখসে চামড়া আমার। আর আমার মতো জাদরেল অনেক সইতে পারে এই শরীরে; ইয়াকুটস্কেও থাকতে পারি কিন্তু ইয়াকুটদের মোটেই সইতে পারিনে।

—কর্তারা এত সদয় হয়ে কেন তোমায় ইয়াকুটস্কে চালান দিলেন বলত?

—তাই বল। শোন তা হলে। আমাদের তো চালান দেওয়া হল। এই সাইবেরিয়ার দলে তোমারই মতো একটি লোক ছিল—কারাতে তাকে পাঠাবে। কিন্তু কথা এই—তার মতলব যে—সে পালিয়ে দেশে ফিরে যাবে। সে প্রস্তাব করল—আমরা পরস্পরের নাম বদল করে, সে সাইবেরিয়ায় থেকে যাবে আর আমি যাব কারাতে। অবশ্য চালাকি করে সে পালিয়ে দেশে ফিরল বটে কিন্তু বোকামির ফলে আবার ধরা পড়ল। শেষ পর্যন্ত কর্তারা দেখলেন যে—তাদের হাতে একই নামের দুই মহাপুরুষ পড়ে আছি। কাজেই আসল মহাপুরুষটির পরিচয় বের করার জন্যে দুজনকেই সোজা ইয়াকুটস্কে চালান করে দিলেন। ঠিক মত আমরা এগুতে লাগলাম—পালানোও সোজা নয় অতো—কেননা শয়তানের চোখা নজরও তো যেমন তেমন নয়! কিন্তু সৌভাগ্য যে রাস্তায় সঙ্গীটি মারা গেল। —না—না—আবার যদি আমাকে সেখানে পাঠানো হয়, তা হলে পালাবার আগেই আমি মারা যাব—এতে কোন ভুল নেই।

জুবফ কুকুরটির গায়ে একমনে হাত বুলাতে বুলাতে কথা শুনে যাচ্ছে। এবার প্যাভলফ তার দিকে তাকাল: তোমায় এ দুর্গতি কেন মিঃ জুবফ?

লোকটি তিক্তকণ্ঠে বলে গেল তার কাহিনী: আমি ছিলাম পাঠশালার গুরুমশাই। একদিন ছাত্রদের পড়াচ্ছিলাম—মানুষ কি করে বাঁচতে পারে—কেমন করে বড় হয়। কাজেই কর্তারা দিলেন মূল উপড়ে—ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সোজা গোবরের গাদায়। তারপরে তো এই এখানে। আমার যতদূর বিশ্বাস—আমি মানুষের মন বিগড়াবার চেষ্টা করিনি। কিন্তু কর্তারা আমার স্ত্রীকন্যাকেও ঠেলে দিল মৃত্যুর মুখে। এখন এই কিকি ছাড়া আপন বলতে আমার কেউ নেই। সুতরাং এখন ঠিক করেছি জঙ্গলে বাস করব—কারও তোয়াক্কা রাখব না। ···আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতাম—কিন্তু এখন আর তার শক্তিকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না—এই তো তার ক্ষমতা?

প্যাভলফ শান্তভাবে সান্ত্বনা দিল: এতো শুধু মানুষের নির্মমতা···

—না, ও শয়তানির খেলা···ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়ার মতো যে লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল সে বলল বিষম জোর দিয়ে: নীচে মানুষ আর উপরে শয়তান। ক্ষমতা হাতে পেল কি অমনি মানুষ বড় হল—হল শয়তান।

স্কুল মাষ্টার একবার কাঠের কুঠুরিগুলোর দিকে নজর রেখে বলল: আর আমরা একই ফাঁদে-পড়া ইঁদুর। এক-একবার আমার মনে হয়—এই ফাঁদই যেন তার কালো ধারালো দাঁত দিয়ে আমাদের চিবিয়ে খাবে।

জোয়ান লোকটি বলল: ঐ ফাঁদ কত হাজার চাকার যে গিলে খাচ্ছে কিন্তু ঠিক হজম করতে না পেরে রোজই খুতু মেরে ফেলে দেয়—ইয়াকুটস্কে, কারায় আর নারচিনস্কে। যতদিন গেলার পদার্থ অবশিষ্ট থাকবে ততদিন রাক্ষসের মত সে এভাবে গিলে যাবেই—না মশাই? —বলেই প্যাভলফের দিকে বক্র ইঙ্গিত করল।

প্যাভলফ বলল: না, ও আমি বিশ্বাস করিনে—একদিন-না-একদিন এর শেষ হবে···

—হাঁ, আমার প্রলোভন একেই বলে।···

জোয়ান লোকটি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল।

(ক্রমশঃ)

কবি সত্যেন্দ্রনাথ

শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যেন্দ্রনাথ স্বপ্নজয়ী কবি। রবীন্দ্রনাথের যুগে তাঁহার অনতিক্রম্য প্রভাব অতিক্রম করিয়া আপন স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এই স্বল্পজীবী, স্বল্পভাষী কবি সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁহার বিভিন্নমুখী প্রতিভার বিশ্লেষণ সহজ-সাধ্য ত নহেই, সাধারণ ভাবে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করাও বৈধায়ত বা সমীচীন নহে। সেইজন্য কবি সত্যেন্দ্রনাথের একটা বিশিষ্ট রূপ যাহা তাহার অনেক রচনার ভিতরেই পরিস্ফুট হইয়াছে, যাহা তাঁহার সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর জীবনধারায় ও বিষাদ-তীব্র চোখের চাহনিতে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল—এখানে তাঁহার সেই নিভীক স্বদেশপ্রেমিকতার আলোচনাই সংক্ষেপে করিতে চাই।

সত্যেন্দ্রনাথের অভ্যুদয় হইয়াছিল প্রদীপ্ত সূর্যের কিরণোজ্জ্বল সাহিত্য-আকাশে, আর এক অপূর্ব ও অসামান্য শক্তিসম্পন্ন জ্যোতিষ্কের ন্যায়। সকলেই অবগত আছেন যে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ছন্দ-সরস্বতীর বরপুত্র,—তাঁহার যাদুকর। তাঁহার সৃষ্টিভঙ্গী ছিল যেমন মর্মস্পর্শী, বর্ণনা-শক্তিও ছিল তেমনি সজীবতায় পরিপূর্ণ। নিপুণ চিত্রকরের তুলিকাস্পর্শে চিত্র যেমন প্রাণবান হইয়া উঠে, তাঁতুরের রেশমী যন্ত্রে যেমন প্রস্তর-খণ্ড পায় জীবন্ত রূপ তেমনি ভাষাশিল্পী সত্যেন্দ্রনাথের লেখনীর যাদুস্পর্শে রূপায়িত হইয়া উঠিত অন্তরের যত কিছু ভাব সম্পদ, যত কিছু অনুভূতি, যত কিছু আশা ও আকাঙ্ক্ষা। যেন কোন সম্মোহিনী মন্ত্রে ছিল তাঁহার অবাধ অধিকার। যেমন খুশী শব্দের পর শব্দ যোজনা করিতেন। নূতন নূতন ছন্দে, নূতন অলঙ্কারে রচনা করিতেন তাঁহার অর্ঘ্যাবলী মহা-সরস্বতীর চরণোপান্তে প্রদান করিবার জন্য; অনাদৃত, অপ্রচলিত, অপাংক্তেয় শব্দকেও ছন্দ-মন্দাকিনীর পবিত্র ধারায় অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে কবিতার অঙ্গে সংযোজিত করিয়াছেন, তাহাকে মর্যাদা দিয়াছেন। এইরূপ বিন্যাস নৈপুণ্য তাঁহার সমকক্ষ দেখা যায় না। "শিকলে সূর্যোদয়" কবিতায়;—

"উষার আভাস জাগলো কিরে
দিনমণির খুললো মণিকোঠা
শুকতারাটির শিউলি ফুলে লাগলো কিরে
অরুণ রঙের বোঁটা?
পুব তোরণে চিড় খেল' কি
দিগ্‌বারণের নিবিড় দন্তাঘাতে
দুতরো ফুলের ডালি মাথায়
তুষার গিরি জাগছে প্রতীক্ষাতে।"

কি সুন্দর বর্ণনা! কিন্তু বোঁটা কথাটি, বিশেষতঃ চিড় খাওয়া শব্দ কবিতার আদরে অপ্রচলিত ও অপাংক্তেয় বলিয়াই পরিগণিত হয় নাকি? সত্যেন্দ্রনাথের লেখনীস্পর্শে ঐ চিড় খাওয়া শব্দটিও যেন একান্ত সহজ সুপ্রয়োগে পরিণত হইয়াছে; এমন কি ঐ স্থানে উহার ব্যবহার অপরিহার্য ও অপরিবর্তনীয় বলিয়া মনে হয়।

তাহার পর,—

"মুক্তা ফলের লাবণ্য কি
আমের দিল মুক্ত নীলাম্বরে?"

এই আমের শব্দটিও কি সুন্দর ভাব প্রকাশক? নূতন নূতন শব্দ যোজনা করিয়া ভাষার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বদা সচেষ্ট। "তাজের" বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন,—

"জিত মরণের বুকে গাড়িয়া নিশান
অমী প্রেম তোলে হের শির
ধবল বিপুল বাহু মেলি চারিখান
ঘোষে জয় মৌন গভীর
চির সুন্দর তাজ প্রেমে নিরমাণ
শিরোমণি মরণ জয়ীর।"

গাড়িয়া নিশান শব্দও কোমলাঙ্গী কবিতার বুকে স্থান পাইল।

আবার দেখুন "চিত্র শরতে"—

"এই যে ছিল সোনার আলো
ছড়িয়ে হেথা ইতস্ততঃ

আপনি খোলা কমলা কোরার
কমলা ফুলি রোয়ার মত।
এক নিমিষে মিলিয়ে গেল
মিশমিশে ওই মেঘের স্তরে
গড়িয়ে যেন পড়লো মণী
সোনার লেখা লিপির পরে
তালপালাতে বৃষ্টি পড়ে
শব্দ বাজে ঘড়িক ঘড়ি
লক্ষ্মীদেবীর সামনে কারা
হাজার হাতে খেলাছ কড়ি।"

"অভ্র-আবীরে" অঞ্জলী কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন,—

"অনেক তোমার ভক্ত আছে
অনেক হোমরা বাল্মিকী
হোমরা চোমরা নই আমি, তুই
মোর পানে হাত চাইবি কি ?"

এইরূপ "ঘড়িক ঘড়ি", "হোমরা চোমরা" শব্দ আর কোথাও কবিতার আসরে স্থান পাইয়াছে কি ? প্রকৃতপক্ষে এইরূপ অপ্রচলিত শব্দকে লেখ্য ভাষায় প্রচলিত করার যে সৎ সাহস তাহা সত্যেন্দ্রনাথের নির্ভীক মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক। তাঁহার সেই অকুণ্ঠ নির্ভীকতা তাঁহাকে অনুপ্রেরণা দিয়াছিল "জাতির পাতি" কবিতা রচনায় ;—সমাজের দেহ হইতে অতি অনিষ্টকর ক্লেদ গ্লানি দূর করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং বলিষ্ঠ বাসনাই ছিল সেই অনুপ্রেরণার মূলে। তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা তাঁহার কবিত্বের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। জালিয়ানাওয়ালাবাগের অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের পরে জনৈক খ্যাতনামা প্রাচীন জননায়কের, দেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, মন্ত্রীত্ব গ্রহণে তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে যে ধিক্কার দিয়াছিলেন তাহার কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"স্বদেশ একদা যারে দিয়েছিল ফুলের মুকুট
একি হায় সেই তুমি ? মর্যাদায় রাজার অধিক—
ছিল যেই ? একি ভিক্ষাবৃত্তি আজ, একি মুকুটুট ?
ফুটা সম্মানের লাগি সম্মানীর লাঞ্ছনা হা ধিক !
জীবন্তে জালিয়াঁবাগে পুঁতে ফেলে ভারত মাতার
শ্রাদ্ধে দেবে স্বর্ণ ধেনু, অগ্রাহ্য সে অমানুষ দান ;
ভাটের। আসুক ছুটে দলে দলে ক্ষতি নাই তায়
তুমি যে ছিঁড়েছ সঙ্গে, এই দাগা এই অপমান।
না মুকাতে রক্ত চিহ্ন না শুকাতে নয়নের পানি
প্রবীণ স্বদেশভক্ত সেচে দিয়ে হলে অগ্রধানী !"

স্পষ্টবাদী নির্ভীক সত্যেন্দ্রনাথ আবার মহারাষ্ট্রকেশরী লোকমান্য তিলকের অন্তর্ধানে লিখিয়াছিলেন,—

"তোষামোদের তোষাখানায় ছিল না তার ঠাঁই
আড়াই কড়ার অনারেবল নয়
সে ছিল লোকমান্য তিলক তুলনা তার নাই
জাতীয়তায় তিলক সে অক্ষয়।"

স্বদেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার দাবীর চিঠিতে কণ্ঠকণ্ঠে গর্জিয়া উঠিয়াছিলেন—

"যোগ্যতা নেই ? দেশ চেয়ে,—মানব ইতিবৃত্তময়
কালার দানের অঙ্কগুলি গোরার চাইতে অমিন নয়।
কালা দেছে বাল্মিকী ব্যাস ; গোরা দেছে মিল্টনে
কালা দেছে বুদ্ধ অশোক ; গোরা দেছে ? কিং জনে ?
কালার ছিল বৌদ্ধ মিশন, গোরার মিশন খৃষ্টিয়
সবাই জানে কালার দেশেই নকল করে সৃষ্টিও
কালার কীর্ত্তি মিশর ব্রাবিড় আরব চীনের সভ্যতা
গোরার কীর্ত্তি ? ভাইনামাইট সভ্য করার দ্রব্যতা
গোরা যারে ভব্যতা কয় তিনশো বছর বয়স তার
কালার যা গৌরবের জিনিষ, তার অন্ততঃ তিন হাজার।"

'বড়দিনে' কবিতায় যীশুখৃষ্টের স্মরণে বড় দুঃখেই কবি গাহিয়াছেন—

"মস্ত দেশের ক্ষুদ্র মানুষ আমরা, তোমায় দেখি অবাক হ'য়ে
অশেষ প্রকার অধীনতার ক্রুসের কাঁটা সারা জীবন ব'য়ে
রাষ্ট্র মোদের কাঁটার মুকুট, সমাজ মোদের কাঁটার শয্যা সে যে
যতই বাধার পাশ ফিরি হায় ততই বেঁধে ততই ওঠে বেজে।"

মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশে রচিত অর্ঘ্যাঞ্জলীতে কবি স্বরাজের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"স্বরাজ প্রয়াসী জাগো দেশবাসী স্বরাজ স্থাপিত হবে
ত্যাগের মূল্যে কিনিব সে ধন, কাহেম করিব তবে।
যা কিছু স্বরণে সেই ত স্বরাজ সেই ত সুখের খনি
আপনার কাজ আপনি যে করে পেয়েছে স্বরাজ পুঁজি।

দীপাকে স্বরাজ, স্বরাজ-স্বকরে নিজের বসন বোনা
স্বরাজ-স্বদেশী-শিল্প পোষণে স্বাধিকারে আনাগোনা
স্বরাজ, আপন ভাষা-আলাপনে, স্বরাজ স্ব-রীতে চলা
স্বরাজ,—যাকিছু অন্যত তাহারে নিজের ছুপাথে দলা।"

রাষ্ট্রে বা সমাজে দেশে দেশে যুগে যুগে যতকিছু বিপ্লব বা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার শুভসূচনা চিরদিনই করিয়াছে সেই দেশের জাতীয় কবির কণ্ঠস্বর। স্বপ্নবিলাস অথবা নিছক লীলাবর্ণনাতেই কবির চরম সার্থকতা নহে, অন্ততঃ জাতীয় কবির নহে। অবসর বিনোদনের সাথী যে কবিতা, জ্যোৎস্না-লোকে বসিয়া প্রিয়া বা প্রিয়তমার সান্নিধ্যে মানসিক আনন্দের উপাদান-দায়িনী যে কবিতা, ভাবাবেশ হৃদয়ে আবেশবিধায়িনী যে কবিতা, তাহার মূল্যও বড় কম নহে। সত্যেন্দ্রনাথ একটি কবিতার অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"বাজারে বিকায় ফল তণ্ডুল
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা
হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল
দুনিয়ার মাঝে সেই ত সুধা।"

'হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল',—ফুলের পরিবর্ত্তে আমরা কাব্য বা কবিতাও বলিতে পারি। অন্তরকে সহজে স্পর্শ করিতে কবিতার সমকক্ষ আর কিছুই নাই। নীতি-কুসুমাঞ্জলী চিরদিন বোধোদয়ের অপেক্ষা সমধিক চিত্তগ্রাহী হইবেই। কৌটিল্যের রাজনীতিও শ্লোকে নিবদ্ধ হইয়া আজ পর্য্যন্ত মুখে মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে ছন্দের প্রবাহে হৃদয়ের দ্বার সহজেই খুলিয়া যায় অন্তরক্ষেত্র সিক্ত সরস হইয়া উঠে, এবং ফলে ভাবপ্রেরণা অনায়াসেই অঙ্কুরিত হইয়া এক বিশাল সম্ভাবনার সূচনা করে। কবিতাকে তাই প্রাণময়ী শক্তি বলিতে পারা যায়। কবির কার্য্যকারিতা এবং দায়িত্বও সেই কারণে অপরিসীম। যে কবি জনপ্রিয় হইবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেন, যাঁহার লেখনী-প্রসূত-বাণী জনগণের হৃদয় আন্দোলিত করিয়া তুলিতে পারে তাঁহার দায়িত্ব আবার ততোধিক। কবি সত্যেন্দ্রনাথ সেই সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্য-প্রতিভা একদিকে যেমন কাব্যরসিক সুধীসমাজকে মুগ্ধ করিয়াছিল, এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁহার রচনা নৈপুণ্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, তেমনি সাধারণ পাঠক সমাজেও সত্যেন্দ্রনাথের নানা কবিতা নানা ভাবে সুপরিচিত। ১৩২৯ সালের ১০ই আষাঢ় অর্থাৎ মাত্র ২৩ বৎসর পূর্ব্বে সত্যেন্দ্রনাথ পরলোক-গত হন; তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ৪১ বৎসর, তাহাও সম্পূর্ণ নহে। এই অল্পপরিসর জীবনের মধ্যে তাঁহার সহস্র-মুখী কাব্যপ্রতিভা সহজেনায়াসে আপনাকে নিঃশেষিত করিয়া বহির্গত হইয়াছিল। ছন্দের বৈচিত্র্যে বাঙ্গালী কবির মধ্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়; তিনি নিজের দেশকে কেবলমাত্র ভালবাসিতেন বলিলে কিছুই বলা হয় না। 'মধুর চেয়েও মধুর সে যে আমাদের এই দেশের মাটি'—ইহাই কবি সত্যেন্দ্র-নাথের আন্তরিক উক্তি। কবি গাহিয়াছিলেন—

সকল দেশের চেয়ে সকল বিষয়ে তাহা তরুলতার শ্যামলতায় হউক বা দোয়েল কোকিলের কাকলীতেই হউক,-কিম্বা মানুষের মনুষ্যত্বের দিক দিয়াই হউক সবার চেয়ে বড়—

"সে আমাদের বাংলা দেশ
আমাদের এই বাংলা রে॥"

উদাত্ত স্বরে উন্মাদনাময়ী ভাষায় কবি তাঁহার স্বদেশবাসীকে শুনাইয়া বলিলেন যে আমরা সত্য সত্যই অপদার্থ বা মৃত নহি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষের নিকট হইতে যে মহাবীর্য্যবান উত্তরাধিকার আমরা লাভ করিয়াছি তাহা জগতের মধ্যে অতুলনীয়। কবি শুনাইলেন,—

"আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে দলিত চতুরঙ্গে
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়।
এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হটিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।
জ্ঞানের নিদান আদি বিদ্যান কপিলসাঙ্খ্যকার
এই বাংলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক হার।
বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে তুষ্কর
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর॥"

আঘাতের পরে আঘাতে জীর্ণদেহ তখনও বাঙালীকে অভয়মন্ত্র শুনাইয়া কবি গাহিলেন,—

"মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি
বাঁচিয়া গিয়াছি বিধির আশীষে অমৃতের টিকা পরি।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়
বাঙালীর ছেলে বাঘের বুকেতে ঘটাবে সমন্বয়।"

একদিকে এই উদ্দীপনাময়ী বাণী শুনাইয়াছেন আবার অন্যদিকে কঠোর বাস্তবের নির্মম উপলব্ধিতে বিহ্বলহৃদয় কবি আর্তকণ্ঠে পরমপিতার উদ্দেশে প্রার্থনা জানাইয়াছেন ;—

"ভুবনভরা হাহাকারে ওগো প্রভু ওগো ভুবন স্বামী
শুকিয়ে ওঠে হৃদয় আমার শুকিয়ে ওঠে চির তোমারে আমি।
সকল আলো সঙ্কুচিত সূর্যে হেরি কলঙ্ক নিশানা
জাগো তুমি সত্যসূর্য, জগৎ ভরা সংশয়ে দাও হানা।
বিশ্বে জাগো বিশ্ব-বিধাতা প্রীতে
দাও হে অভয়, হোক পরিচয়
হোক পরিণয় মঙ্গল শক্তিতে।"

বাস্তবিক, শক্তি যদি মঙ্গলনিয়ন্ত্রিত না হয় তাহা হইলে সে শক্তি আপন শিবকে পদদলিত করিয়া নৃমুণ্ড-মালিনী কালিকার ন্যায় শুধু শ্মশানেই বিরাজ করিতে থাকিবে। কবি লিখিলেন,—

"রুদ্ররূপে রোদন তুমি
সান্ত্বনা সে শান্ত শিবের রূপে
জ্যোতিষ্ক হয় ফুৎকারে ছাই
পরম জ্যোতি জাগাও ধূলির স্তূপে
মৃত্যু তালের নৃত্যে হৃদয়
পড়ছে ঢলে চলতে তোমার সনে
জাগাও প্রভু মুক্তমনে, গতিক্রমের
ক্রান্তি সংক্রমণে।
রোদন মাঝে বাজুক বোধন বাঁশী
তাহার আখর রাখুক লিখে
হিসাব হারা হিয়ার কান্না হাসি।"

সত্যিকারের কবি যিনি তাঁহার মনে কখনও কাহারও উপর বিদ্বেষ থাকিতে পারে না। অন্যায়ের প্রতিবাদ তিনি করেন নির্ভীক ও সুতীব্র ভাষায়, কিন্তু অন্যায়ের প্রতিকার করিতে কখনও তিনি আর এক অন্যায়ের প্রশ্রয় দেন না। তিনি চান সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল, তিনি চান মানবজাতির সমষ্টিগত উন্নতি, তিনি চান সকল প্রকার অত্যাচার সকল প্রকার হিংসা ও বিদ্বেষের স্বেচ্ছাকৃত অবসান। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই সত্যিকারের একজন কবি। বিশ্ব-বিধাতার চরণে মিনতি—আর্দ্র কণ্ঠে প্রার্থনা জানাইলেন,—

"প্রীতি শীতল এই পৃথিবী
প্রেত শিলা হয় যাদের উপদ্রবে
রুদ্র রূপে তাদের কর নত
দস্যুসুরের দম্ভ কাড়ো,
মুখে মধু কৈতবে—কৈটভে
মাটির তলে পাঠাও কীটের মত।"

সার্বজনীন মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিলেন,—

"আজ বরষের নূতন প্রাতে
আলোক পাতে প্রাণকরে প্রার্থনা
ওগো প্রভু ওগো জগৎস্বামী।
প্রণব গানে নিখিল প্রাণে
নবীন যুগের কর প্রবর্তনা
জ্যোতির রূপে চিত্তে এস নামি।
সকল প্রাণে জাগুক রাজা ;
যাক রাজাদের রাজাগিরি নেশা
জগৎ জনের যাক থেমে তাণ্ডব ;
ঘুচাও হে দেব ! নিঃশেষে এই
মানুষ জাতির মানুষ পেষণ পেশা
চির তরে হোক সে অসম্ভব।
দেশ বিদেশে শুনছি কেবল
রোজ রাজাসন পড়ছে খালি হয়ে
সে-সব আসন দখল কর তুমি
মালিক ! তোমার রাজধানী হোক
সকল মুলুক এ বিশ্বনিলয়ে
সত্যি সনাথ হোক এ মর্ত্যভূমি।"

কবির এই খেদোক্তির সহিত আমরাও কণ্ঠ মিলাইয়া বলি যে মানুষ জাতির এই মানুষ পেষণ পেশার অবসান হউক—মানুষ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে, কাঞ্চন কৌলিন্য ও বর্ণের বৈষম্য ভুলিয়া সমগ্র বিশ্বের বুকে শুধু মানুষ বলিয়াই পরিচিত হউক ; মানুষ মানুষকে ভালবাসুক, মানুষ মানুষকে উৎপীড়ন ও ধ্বংস

না করিয়া পরস্পরের সহায় হউক। পশু-বলের উপর চিত্ত-বলের প্রাধান্য সর্বত্র সংস্থাপিত হউক।

তরুণ সম্প্রদায় চিরদিনই সকল জাতির ও সকল সমাজের আশা ও ভরসা স্থল। ভাবপ্রবণ তরুণের দল সহজেই সকল কাজে অগ্রসর হইয়া যায়। সাংসারিক ভালমন্দের বিবেচনায় লাভ লোকসানের হিসাবে যাহাদের মন এখনও সঙ্কুচিত হইয়া যায় নাই, সেই তরুণেরাই পারে অজ্ঞাত-ভবিষ্যৎ কর্মপ্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়িতে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের অনুরবর্তী হিজলী বন্দীশালায় এই তরুণদের নিগ্রহে ব্যথিত হইয়া লিখিয়াছিলেন,—

"আমি যে দেখেছি তরুণ বালক
উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী বেদনা মরেছে পাথরে
নিষ্ফল মাথা কুটে
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন
শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।"

সেই তরুণদের উদ্দেশে কবি সত্যেন্দ্রনাথে তাঁহার "কলাধু" কবিতায় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

"উচিত ব'লে দণ্ড নেবার দিন এসেছে আজ
উচিত ক'রে পরতে হবে চোর ডাকাতের সাজ।
চিত্তবলের লড়াই সুরু পশুবলের সাথ
বজ্রবেগের হানার মুখে কিসের তরুর বাঁধ।
প্রলয় জলে বটের পাতা! চিত্ত-চমৎকার
তীর্থ হ'ল বন্দীশালা, নিকল অলঙ্কার।
কলাধু তোর জনম সাধু, মোছ রে চোখের জল
রাজরোষেরি রোশনাযে তোর মুখ হ'ল উজ্জ্বল।"

কবির এই নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা তাঁহাকে চিরদিন অমর করিয়া রাখিবে। বন্দীশালা সত্যই তীর্থে পরিণত হইয়াছে। রাজরোষের রোশনাযে শত সহস্র জননীর মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথের বিয়োগে যে প্রীতির আশীর্বাদ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন,—

"অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত-ক্রুর, তার পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণ সম
তুমি সত্য বীর! তুমি সুকঠোর, নির্মল নির্মম
করুণ কোমল।"*

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মেদিনীপুর শাখার বার্ষিক উৎসবে লেখক কর্তৃক পঠিত।

কোম্পানী প্রসঙ্গ

মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ১৯৪৪ সালের রিপোর্ট ক্রমাবয় উন্নতির রিপোর্ট। আলোচ্য বৎসরে ২,১০,৫২,৮২৫ টাকার পলিসিপত্র গৃহীত হইয়াছে। প্রথম বৎসরের আয়ের শতকরা নব্বই টাকা খরচের খাতে রাখিয়াও আলোচ্য বৎসরের খরচ পড়তা আয়ের শতকরা ২২.১৮ হইয়াছে; তৎপূর্ব বৎসরে এই সংখ্যা ছিল ২৩.২%। বীমা তহবিলের পরিমাণ আলোচ্য বর্ষে ছিল ৫১,৮০,৩৯১৸৵৩ পাই, তৎপূর্ব বৎসরে ইহা ছিল প্রায় ৪১৷ লক্ষ টাকা। যদিও বর্তমানে সুদের আয় অত্যন্ত অল্প তথাপি কোম্পানী তাহার ন্যস্ত টাকা হইতে ৪৬% সুদে পাইয়াছে। ১৪ বৎসরের মধ্যে এই কোম্পানীটি যে উন্নতি দেখাইয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

পুস্তক-পরিচয়

Starving India—A Study into the Nature and Causes of India's Food Problem. By "Satyasandha". Published by the Socio-economic Research Centre—101A, Ballygunj Place, Calcutta. Price -/12/- pp 56.

বর্তমান যুদ্ধের দরুণ যে দুর্মূল্যতা ও খাদ্যদ্রব্যের অপ্রাচুর্য দেশে মন্বন্তর সৃষ্টি করিয়াছে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে খাঁটি অর্থ-নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখক তাহার কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ইংরেজী ও বাংলাতে যে সব পুস্তক বাহির হইয়াছে বর্তমান পুস্তকখানি গ্রন্থকারের গভীর জ্ঞান ও গবেষণার জন্য যে তাহাদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার প্রমাণ-পঞ্জীর সাহায্যে ও সুযুক্তির সহিত দেখাইয়াছেন যে যুদ্ধের সময় যে খাদ্যের অপ্রাচুর্য দেখা দিয়াছে তাহা আসলে খাদ্যের অপ্রাচুর্য নয়, সরকারের "ইনফ্লেশান" বা মুদ্রাস্ফীতি নীতিই এই তথাকথিত অপ্রাচুর্য আনয়ন করিয়াছে। এবং আমাদের শ্রমিক ও কৃষিজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদেশী ও দেশী ধনিকদের শোষণের ফলেই এই অপ্রাচুর্যের সমস্যা তীব্র রূপ নিয়াছে। জনসংখ্যার বাড়না বা খাদ্য শস্যের উৎপাদন পরিমাণের হ্রাস এই সমস্যার কারণ নয়। গ্রন্থকারের মতে 'খাদ্য শস্যের অপ্রাচুর্য' সমস্যা নয়, সমস্যা হইতেছে 'দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বধাবন'—ইহা কেবল খাদ্যশস্যের নয়, সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির বেলাতেই ইহাই আসল সমস্যা। লেখকের মতে গভর্ণমেণ্ট বিলাতের ভারতীয় ষ্টার্লিং ব্যালান্সের দাবিতে এদেশে অপরিবর্তনীয় (inconvertible) এবং বাধ্যতামূলক গ্রহণযোগ্য (fiat money) নোট ছাপিয়া এই সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছেন। গ্রন্থকার অত্যন্ত সুযুক্তির সঙ্গে দেখাইয়াছেন যে "Every rupee printed is a 'net gain' to the Government of India and a 'net loss' to the people of India. Rise of prices is only the medium through which India Government procures the said goods and services for supplying them to the British Government……This necessarily causes rise of price-level in the country and the growing food scarcity. Poor India is being made to starve and die in order to lend away enormous sums of money. ভারত সরকারের এই মুদ্রাস্ফীতি নীতিই যে মূলতঃ দুর্ভিক্ষ, ব্লাক মার্কেট প্রভৃতির জন্য দায়ী লেখক বিপুল দৃষ্টান্ত ও যুক্তির দ্বারা তাহা সুপ্রমাণিত করিয়াছেন। Grow more Food Campaign কেবল বিজ্ঞাপন, পুস্তিকা ও বক্তৃতার সাহায্যে সফল হইতে পারে না তাহা যে কৃষককুলকে আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভর করে সে কথাও লেখক দেখাইতে ভোলেন নাই। মজুতদারের উপর যে হুমকী ও তাহার স্কন্ধে অধিকাংশ দোষ দ্বারোপ চালাইতে যান তাহারও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ গ্রন্থকার সুষ্ঠুভাবে করিয়াছেন। এমন উচ্ছ্বাসহীন, সম্পূর্ণ যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আজ পর্যন্ত আমাদের গত মন্বন্তরের কারণ বিশ্লেষণ কেহই করেন নাই, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমরা প্রত্যেককে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

[শ্রীঃ]

হিরণ্ময়ী (ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক)। **রাজা সীতারাম রায়** (ঐতিহাসিক নাটক)। শ্রী অবলাকান্ত মজুমদার কবিভূষণ প্রণীত। প্রত্যেকখানার মূল্য ১।০। প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দুইখানিই বিশেষত্বহীন তথাকথিত ঐতিহাসিক নাটক। কাগজ ও ছাপা ভাল ইহা ব্যতীত এই বই দুইখানি সম্বন্ধে কিছু বলিতে না পারিয়া আমরা দুঃখিত। [শ্রীঃ]

শিশুর কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা

শিশুমন নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে বহুদিন থেকেই আলোচনা চলছে। শিশুমনের কৌতূহলকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দ্বিমত এখন কোথাও নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে এই কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে কটি বাপ মা পারেন। সব চাইতে বিপজ্জনক অবস্থা হয় যখন শিশু তার নতুন ছোট ভাইটি বা বোনটিকে হঠাৎ আসতে দেখে। তখনই সে প্রশ্ন করে, 'কোথা থেকে এ এল'। মা হল দিশেহারা পিতার অবস্থাও তাই। বকে ঠকে করে' এনে ফেলে রেখে বা হাসপাতালে অমন শিশু থাকে যাদের নিয়ে এলেই হোল—এ রকম উত্তর যে আর দেওয়া চলে না সে-কথাটা সবাই এখন বুঝতে সুরু করেছেন। 'নূতন জীবন' মাসিক পত্রিকায় মিঃ ইউসুফ 'শিশুর কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা' এই সমস্যা নিয়ে খুব সাবলীলভাবে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে বিষয়টি আলোচনা করেছেন। এ ধরণের প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে একটা বিশেষ দিককে পুষ্ট করবে বলেই আশা করা যায়। [শ্রী অ]

৯ই আগষ্ট—

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ১৯৪২ এর ৯ই আগষ্ট একটি বিশিষ্ট দিবস। ভারতের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা সে দিন যে উপ্রগ্রকাশ ধারণ করেছিল তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ৯ই আগষ্ট থেকে এক সপ্তাহ কাল সংগ্রামীদিগকে গঠনমূলক কর্মপন্থায় আত্মনিয়োগ করবার জন্য রাষ্ট্রপতি আজাদ যে ঘোষণা করেছেন তা নিম্নে দিলাম। দেশবাসী যে এই আদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন করবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

"৯ই আগষ্ট হইতে যে সপ্তাহ আরম্ভ হইবে বিভিন্ন প্রদেশে সেই সপ্তাহকে জাতীয় সপ্তাহ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমি সমগ্র ভারতের কংগ্রেস কর্মীদের কতকগুলি নির্দেশ দিতেছি। এই দিবসের পবিত্রতা যাহাতে নষ্ট হয়, এমন কোন কার্য আমরা হইতে দিব না। যাঁহারা আত্মাহুতি দিয়াছেন, কোলাহলপূর্ণ অনুষ্ঠান এবং সস্তাবুলি দ্বারা তাঁহাদের স্মৃতির অপমান করা হয়। যে আদর্শের জন্য তাঁহারা প্রাণ দিয়াছেন সেই আদর্শ পূরণের জন্য কাজ করিলেই তাঁহাদের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শিত হইবে। সংগঠন এবং শৃঙ্খলার অভাবই আমাদের জাতীয় সংগ্রামের দুর্বলতা। এই দুর্বলতা দূর করিবার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুত হইতে হইবে। বর্তমান দিনের পরিবর্তিত অবস্থায় গঠনমূলক কর্মপন্থা দ্বারাই আমরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিকে পরিণত হইতে পারিব। এই গঠনমূলক পরিকল্পনার দ্বারাই আমরা দেশের জনসাধারণকে স্বস্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং আমাদের শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিব।

আমি দেশের সমস্ত কংগ্রেসকর্মীকে উপযুক্ত-ভাবে ৯ই আগষ্ট দিবস পালনের জন্য আবেদন করিতেছি। কার্যে এবং বাক্যে কোন প্রকার উচ্ছ্বাস থাকিবে না। পরন্তু সুসংবদ্ধ বাক্যসংষ্টির দ্বারা স্বাধীনতার জন্য জাতীয় কামনা প্রকাশ করা হইবে। যে স্থানে প্রকাশ্যে সভা আহ্বান নিষিদ্ধ নহে সেই স্থানে অপরাহ্ণ ছয়টার সময় সভা আহ্বান করিয়া দেশের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে নূতন করিয়া প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিতে হইবে। যে স্থানে সভা আহ্বান নিষিদ্ধ সেই স্থানে কোন লোকের গৃহে সভা আহ্বান করিতে হইবে। সভাপতি ছাড়া অন্য কেহই সভায় বক্তৃতা করিবেন না। সভাপতি সংক্ষেপে আমাদের শান্তিপূর্ণ ও অহিংস সংগ্রামের কথা ব্যাখ্যা করিবেন এবং গঠনমূলক কর্মপন্থার প্রয়োজনীয়তা কি তাহা বুঝাইয়া দিবেন। তাহার পর শ্রোতৃবর্গ গত তিন বৎসরে যাঁহারা পরলোকগমন করিয়াছেন তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য দুই মিনিট নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিবেন। তারপর শ্রোতারা শৃঙ্খলার সহিত এবং নীরবে সভাস্থল ত্যাগ করিবেন। গঠনমূলক কর্মপন্থা অনুসারে কাজ করিয়া এই সপ্তাহ প্রতিপালন করিতে হইবে।"

ওয়াভেল পরিকল্পনা—ওয়াভেল পরিকল্পনা সম্বন্ধে আষাঢ়ের 'মন্দিরা'তে আমরা যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম কার্যতঃ তা অমূলক বলে পরিগণিত হয় নাই। সিমলার বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এই ব্যর্থতার মধ্যে ব্রিটিশ কূটনীতির হস্তক্ষেপ পরিষ্কার ভাবে ফুটে ওঠেছে। যে সাম্প্রদায়িকতাকে বৃটিশ রাজনৈতিকেরা এতদিন ধরে' পোষণ করে এসেছেন, যা' এতদিন বৃটেনকে সর্বভাবে তোষণ করে এসেছে, তা এবারও তাদের ব্যর্থ মনোরথ করে নাই। তবে অন্যান্যবার এরকম ব্যর্থতাকে ভারতবাসীরা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ সম্বন্ধে কখনও একমত হতে পারে না বলে' যে দায়িত্ব ভারতবাসীদের স্কন্ধে চাপান হ'ত এবার সেটা ঠিক অমন ভাবে হতে পারে নি। মুসলীম লীগ যে হোয়াইট হলের ক্রীড়নক, হোয়াইট হলের হাতের দড়ি যে লীগকে ওঠাচ্ছে,বসাচ্ছে, নাচাচ্ছে সে কথাটা ওয়াকিব মহলের বুঝতে বাকী নাই। এই তৃতীয় পক্ষ যতদিন পর্যন্ত এদেশে আছে ততদিন পর্যন্ত আমাদের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র গঠন সম্বন্ধে যে কখনও ভারতের সব দল একমত হ'তে পারবে না,সে বিষয়ে কারুরই সন্দেহ নেই। রাজনৈতিক সমস্যার মীমাংসা যে কখনো সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে হতে পারে না, এই সহজ কথাটাই আবার নতুন করে' প্রমাণিত হোল। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতবর্ষে চিরস্থায়ী ভাবে কায়েম করবার জন্য যে সব উপায় ব্রিটিশ কূটনৈতিক পণ্ডিতেরা উদ্ভাবন করেছেন, তার ভেতর সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও দেশীয় রাজ্যের সমস্যা সর্বপ্রধান। গত মাসে আমরা স্যর জন ষ্ট্রাচির কথা উদ্ধৃত করে দেখিয়েছিলাম যে সেই ১৮৮৮তেই হিন্দুমুসলমান সমস্যা যে ভারতবর্ষে ইংরেজের রাজনৈতিক অস্তিত্বের পক্ষে একটি প্রধান উপায়, সে কথা ব্রিটিশ রাজনৈতিক মহল বিশেষভাবেই অবগত ছিলেন। এবং বর্তমান যুগেও বার্কেনহেড্, ষ্যানলি বল্ডুইন্, উইনষ্টন চার্চিল প্রভৃতি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের যাঁরা মাথা তাঁরা ভারতবর্ষ যে কখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতা থেকে মুক্ত হবে, একথা কল্পনাতেও আনতে পারেন না। সানফ্রান্সিস্কো কনফারেন্সে সাম্রাজ্যবাদীদের অধীন রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতার দাবীর বিরুদ্ধে বৃহৎ শক্তিপুঞ্জ যে ভাবে দাঁড়িয়েছিল তার পরও চার্চিল-আমেরি-ওয়াভেল সিমলা বৈঠকের পরিকল্পনা কথাতেই আমরা এর সাফল্যের বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম। যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ তার অধীনস্থ দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে "স্বাধীনতা" শব্দ কখনও ব্যবহার করে না, 'ডমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস', 'হোমরুল', 'সেলফ্ ডিটারমিনেশন' প্রভৃতি স্বার্থবোধক শব্দের মধ্যেই যারা নিজেদের অধীনস্থ দেশগুলির ভবিষ্যৎ দেবে তারা সহজ ভারতবর্ষকে 'স্বাধীনতা' দিতে অগ্রসর হয়, তখন দেশবাসী যদি তাকে সন্দেহের চোখে দেখে তবে তাদের বেশি দোষ দেওয়া যায় না।

সিমলা বৈঠকের ব্যর্থতার দায়িত্ব লর্ড ওয়াভেল নিয়েছেন, এটা তাঁর উদারতা ও দূরদর্শিতার পরিচয়। দূরদর্শিতা এই জন্য যে লর্ড ওয়াভেল ব্রিটিশ কূটনৈতিকদের কার্যকলাপ থেকে ভারতবাসীর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিজের উপর এনে ফেলতে চান। কিন্তু আসলে সম্মেলন যে ১০ নং ডাউনিং ষ্ট্রীটের চালে বানচাল হোল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মুসলিম লীগ ভারতের সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের দাবী ত্যাগ করলে সে তার মৃত্যু অনিবার্য একথা জিন্না সাহেব খুব ভাল করেই জানেন এবং চার্চিল, আমেরি এবং তাঁদের দলও সে কথা অবগত আছেন। অপরদিকে কংগ্রেস যে তার নিখিল ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের দাবী ত্যাগ করে একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে নিজেকে নামাতে রাজী হবে না, একথাও তাঁরা জানতেন। ভারতের রাজনৈতিক সমস্যাকে এঁরা যে মুহূর্তে সাম্প্রদায়িক গণ্ডীতে এনে তার সমাধান করতে চাইলেন সে মুহূর্তেই এই সম্মেলনের ভাগ্যলিপিতে তার অপঘাত মৃত্যু লিখিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবার সদিচ্ছা যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নেই ওয়াভেল কনফারেন্সের এই পরিণতি সে-কথাটা বিশেষ করেই বুঝিয়ে দিল। মুসলিম লীগ নেতাদের মনোভাবের সমস্ত ইতিহাস জেনেও চার্চিল সরকার সে মনোভাবের অনমনীয়তাকে কি ভাবে প্রতীকার করা যাবে তা স্থির না করে যখন সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন তখনই তার ব্যর্থতার দায়িত্বও তাঁরা নিজেদের কাঁধে নিয়েছিলেন। যদি ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার আন্তরিক সদিচ্ছা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের থাকত তাহলে তাঁরা

জিন্না সাহেবের গণতন্ত্রবিরোধী মনোভাবকে আমলে এনে নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় পৃথিবীর সামনে আর এমন করে' তুলে ধরতেন না। মুসলিম লীগের দাবী যে কেবল অযৌক্তিক নয়, তা' যে সম্পূর্ণ গণতন্ত্র বিরোধী আমাদের ব্রিটিশ শাসকবর্গ সে কথা জানেন। কমন্স্ মহাসভায় স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস (২৬ অক্টোবর ১৯৩৯) এ বিষয়ে যে বিশদ আলোচনা করেছিলেন সেকথা তাঁরা নিশ্চয়ই ভুলে যান নাই। তিনি বলেছিলেন,

> .....The argument has been brought forward by the Lord Privy Seal that it is difficult to work out any satisfactory method of central self-government for India because of the communal difficulty. That in my mind is not a valid argument. The same could be said of Poland with its Russian, Jewish, German and Polish citizens. The same could be said of Czecho-Slovakia with its Suderans, Czechs and Slovaks; *and I cannot understand the argument, if it is put forward on the basis of democracy, which denies a majority of its rights, in order to protect a minority.* It may be necessary to modify some of the rights of a majority, and to get them to agree to such modifications, as the Congress has willingly agreed, but *you are not justified in taking away the rights of a majority because you assert that you desire to protect a minority. If you do so, you are, in fact, converting the majority into a minority*.....If you accept democracy, if you set up a democratic system, which is to ascertain which class, or caste, or party is in the majority, you must then accept the results of that democratic system, and, at the moment, whether you like it or not, the Congress Party is the majority in British India." *(Italics ours).*

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেরপ্রতিনিধির সংখ্যা কোন ধর্মের বা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে স্থির হলে সে প্রতিষ্ঠান কখনও গণতান্ত্রিক নীতিতে চলতে পারে না। ধর্ম ও সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ কোটাধিকারের উপর আমাদের জাতীয় পরিষদকে গঠন করতে হবে। আমাদের শাসকসম্প্রদায় তা' কখনও চায় না; তাই তাঁরা যুক্ত নির্বাচন প্রথা তুলে' দিয়ে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা প্রচলিত করেছেন। এবং যে কারণে এর প্রবর্তন করেছে ঠিক সে-কারণেই জিন্না সাহেব ও তাঁর লীগকে নানা দিক দিয়ে বড় করে' তুলেছেন। কংগ্রেস ধর্ম ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান;—ইংরেজ কর্তৃপক্ষ যদি সত্যি সত্যিই ভারতবর্ষের অচল অবস্থার অবসান ঘটাতে চান তাহলে এক কংগ্রেসের সংযোগিতায় সাহায্যেই তাতে সমর্থ হবেন; কিন্তু শতকরা ২২ জন মুসলমানের বিরুদ্ধাচরণেই যদি তাঁরা বাকী শতকরা ৭৮ জনের দাবীকে দাবিয়ে রাখতে চান তবে তাঁদের ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার সমস্ত আস্ফালন যে মিথ্যার উপর স্তব্ধ সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ থাকবে না।

কোনো এক দলের সম্মতি না থাকলে কনফারেন্সকে ভেঙ্গে দেওয়া হবে একথা যদি ওয়াভেল সাহেব পূর্বাহ্ণেই বলতেন তবে কংগ্রেস যে এ সভায় যোগ দিত না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। শতকরা ২২ জনকে শতকরা ৭৮ জনের সমান আসন দেওয়াই গণতন্ত্র বিরোধী কিন্তু কংগ্রেস তাতেও স্বীকৃত হয়েছিল এইজন্যে যে এতে রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান হবে এবং সরকারী বিশৃঙ্খলতার ফলে দেশে যে অনাহার ও অভাব অনটনের তাণ্ডব নৃত্য চলেছে দেশের নেতৃবৃন্দ পরিচালিত জাতীয় গভর্ণমেণ্ট তার নিরসন করতে পারবে। তাঁদের ভরসা ছিল এবং আছে যে দেশের ভেতর যে সামাজিক বিপ্লব চলেছে তার ফলে উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—তা সে হিন্দু, বা মুসলমান বা অন্য যে কোনো ধর্ম সম্প্রদায়গতই হোক—ভেঙ্গে যেয়ে ক্ষমতা এসে পড়বে জনসাধারণের হাতে। সুতরাং মুসলিম লীগের গণতন্ত্র বিরোধী দাবী অন্যায্য ও বৈপ্লবিক প্রগতিবিরুদ্ধ হলেও তার সঙ্গে সহযোগিতা করে' এখন জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করতে পারলে দেশবাসী সাম্রাজ্যবাদী শোষণ পদ্ধতি থেকে মুক্তি পেতে পারবে। কিন্তু তাঁরা বোধহয় এটা বোঝেন নাই যে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব এখন যাঁদের হাতে আবদ্ধ তাঁরা নিজেরাই সেই শোষণপদ্ধতির যন্ত্র সুতরাং নিজেরা আত্মহত্যা করে' দেশের জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার মত আত্মত্যাগ তাঁদের কাছে আশা করা যেতে পারে না। যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম লীগকে গড়ে তুলেছে জিন্না

সাহেব ও তাঁর দল সেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে পুরোপুরিই আছেন। আজ এই কথাটা দেশবাসীকে বুঝতে হবে যে, যে খাদ্য ও বস্ত্র সমস্যা, যুদ্ধের দরুণ যে সব দুর্নীতি আমাদের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক জীবনকে কলুষিত করে তুলেছে—তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা কংগ্রেস করেছিল সেই প্রচেষ্টার মূলে জিন্না সাহেব ও তাঁর দল নির্মম ভাবে কুঠারাঘাত করে' তাঁরা যে জনসাধারণের কেউ নন, সে-কথাটাই প্রমাণিত করেছেন।

এটা খুবই সত্য কথা যে যতদিন পর্যন্ত তৃতীয় পক্ষ এদেশে আছে ততদিন পর্যন্ত বিভিন্ন দলগুলির সম্পূর্ণ একমত হওয়া সম্ভবপর নয়। এবারকার সম্মেলনে দেখা গেল যে এক মুসলিম লীগ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক দলই কংগ্রেসের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল। এ সত্ত্বেও যখন ওয়াভেল সাহেব মুসলীম লীগের অমতে কাজ করতে চাইলেন না তখন এটা বুঝতে হবে যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষই এই অচল অবস্থা মেটাতে চান না। জিন্না সাহেব যে দাবী করছেন সে দাবী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও গণতন্ত্র বিরোধী; তাঁর আবদার রেখে জাতীয় প্রগতিকে পেছিয়ে দেবার দায়িত্ব সেইজন্যই ইংরেজ সরকার ছাড়া আর কারুরই হতে পারে না।

অনেকে মনে করছেন যে জিন্না সাহেবের অনমনীয় মনোভাবের কথা যখন জানাই ছিল তখন কংগ্রেসের এই সম্মেলনে যোগ দেওয়াই উচিত হয় নি। আমরা এ যুক্তির ভেতর সার কিছু আছে বলে মনে করি না। কংগ্রেস চায় জনসাধারণের স্বার্থ এবং যে দিক দিয়েই তার পুষ্টি হতে পারে বলে মনে হবে কংগ্রেসকে সেদিক দিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। এই সম্মেলনে একটা জিনিষ সমগ্র পৃথিবী আবিষ্কার করেছে যে, কংগ্রেসই ভারতের কেবল সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল নয়, কংগ্রেসই একমাত্র রাজনৈতিক দল। মুসলিম লীগের কোনো প্রতিপত্তিই ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে নেই; তার প্রভাব কেবল বিভেদ ও বিরোধ জাগিয়ে রাখবার জন্যই নিযুক্ত। শিখ, অ-বর্ণ হিন্দু, বর্ণ-হিন্দু, শিয়া ও মোমিন মুসলমান সম্প্রদায়, ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায় ও জাতীয়তাবাদী দল প্রভৃতি রাজনৈতিক সকল দলই জাতীয় প্রগতি সম্বন্ধে কংগ্রেসের সঙ্গে একমত। আমাদের মনে হয় কংগ্রেসের এই সর্বপ্রধান ও একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসাবে সর্বস্বীকৃতি একদিকে যেমন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ঘটনা, অপরদিকে মুসলিম লীগের একান্ত গণতন্ত্রবিরোধী মনোভাব গণতন্ত্রবাদী মুসলমান সম্প্রদায় থেকে একে অচিরেই বিচ্ছিন্ন করবে। এবারকার ব্যাপারে বোঝা গেল যে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তি কেবল একটি মাত্র দলের তরফ করতে পারে,—সে দলটি হচ্ছে মুসলিম লীগ। এ প্রসঙ্গে অবশ্য একথা বলাও যুক্তিসঙ্গত যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই ক্রীড়নকের অপর সহায়ক কম্যুনিষ্ট পার্টি। মুসলিম লীগের সঙ্গে যে দেশের জনসাধারণের কোনো আন্তরিক যোগ থাকতে পারে না এটা খুব সহজেই বোঝা যায়। মুসলিম লীগ মুসলমান সম্প্রদায়কে মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়—পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর এই সতর্কবাণীর প্রতি আমরা মুসলমান সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে তাঁরা কি নিজেদের বলি দেবেন, না, যে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মাহুষ দেশবাসী তাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে তাদের উদ্ধারের জন্য তাঁরা আগুয়ান হবেন? মুসলমান সম্প্রদায় কি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর হাতের পুতুল হয়ে গণতন্ত্রের অবিস্মরণীয় শত্রু হয়ে জীবন যাপন করবে?—এই প্রশ্নের উত্তর অতি শীঘ্রই মুসলমান সম্প্রদায়কে পৃথিবীর দরবারে দিতে হবে। মুসলিম লীগের এই গণতন্ত্রবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল আত্মবিকাশের পরও যারা কংগ্রেস-লীগের ঐক্যের কথা মুখে আনবে তারাও যে মুসলিম লীগের মত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক মাত্র সে কথাটা বোঝা কি খুব দুরূহ?

ততঃ কিম্?—সিমলা বৈঠকের এই পরিণতির পর কংগ্রেস তথা দেশবাসীর কর্তব্য কি? গঠনমূলক কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে কংগ্রেস তার পরিকল্পনা পূর্বেই দেশের সম্মুখে দিয়েছে। এটা অত্যন্ত সুখের কথা যে মাঠে ও মন্বন্তরে মরার বাড়া হয়ে দেশের লোক কংগ্রেসের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। তারা বুঝতে পারছে যে স্বাবলম্বী না হতে পারলে কারুর আর রক্ষা নেই। যুদ্ধ লাগবার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস প্রত্যেক গ্রামের গ্রামবাসীদের স্বাবলম্বী হতে অনুরোধ জানিয়েছিল। আজ দেশবাসী দেখতে পাচ্ছে যে সে অনুরোধ না রাখার ফলে আজ

গ্রামবাসী শুধু মনে প্রাণে মারা যায় নি—তার নৈতিক চরিত্র পর্যন্ত হারিয়েছে। এর চাইতে মর্মান্তিক ব্যথার কথা আর কি হতে পারে?

কংগ্রেসকর্মীরা ধীরে ধীরে কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসছেন—বাইরে এসে তাঁরা তাঁদের আত্মীয়পরিজন বন্ধুবান্ধব ও সমগ্র দেশবাসীর যে দুরবস্থা দেখবেন তা যে তাঁদের কল্পনার বাইরে ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের আশা আছে যে তাঁরা এতে মুষড়ে পড়বেন না। এই নিরাশার মাঝেই তাঁদের আশার প্রদীপ জেলে ধরতে হবে। এই প্রেরণাক্ত নির্দ্দিষ্ট পথই তাঁদের চলবার পথ। আজ তাঁদের গ্রামবাসীদের ভেতর গিয়ে গ্রামবাসীদের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থ ভেবে' গ্রামবাসীদেরই একজন হয়ে তাদের জাগ্রত করে তুলতে হবে।

আমাদের এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশে কেন মন্বন্তর আসে, যাদের বসুন্ধরের লোভে যুগযুগান্তর থেকে বিদেশী বণিক তার বাণিজ্য-তরী নিয়ে এসেছিল তারা কেন বস্ত্রাভাবে দিগম্বর হয়েছে সে-কথা আজকার কর্মীদের দেশবাসীকে জানাতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের বাণী, কংগ্রেসের আদেশ তাকে জানাতে হবে। কংগ্রেসের গঠনমূলক পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে না পারলে জাতি হিসাবে, মানুষ হিসাবে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য। সামনেই হয়ত সাধারণ নির্বাচন আসছে। প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীকে এজন্য সর্বশ্রেণী ও সম্প্রদায়ের ভেতর মিশতে হবে—কংগ্রেস কি চায়, কংগ্রেসের লক্ষ্য কি, সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে কংগ্রেসের মত কি এই সব কথা কংগ্রেস কর্মীকে বোঝাতে হবে। যে সাম্প্রদায়িকতার জন্য আজ আমাদের একতা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে যাচ্ছে—সেই সাম্প্রদায়িকতা যে সম্পূর্ণ গণতন্ত্রবিরোধী ও আসলে তা উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য পরিকল্পিত, এই কথাটা আজ দেশের সবাইকে বোঝাতে হবে। কাজ অত্যন্ত দুরূহ—কারণ এর ভেতরে হাততালি পাবার কোনো পন্থা নেই; এর ভেতর আছে বিদ্রূপ, টিট্‌কারী ও লাঞ্ছনা লাভের ইঙ্গিত। কিন্তু স্বাধীনতার পূজারী চিরদিনই লাঞ্ছনা, বিদ্রূপ ও টিট্‌কারীকে অঙ্গের ভূষণ করে' এগিয়ে গেছেন। আজও যে তাঁরা যাবেন সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

মিঃ কেসীর বক্তৃতা।—২৩ ধারার সুযোগ নিয়ে অষ্ট্রেলীয় সাধারণ তন্ত্রের প্রজা মিঃ কেসী দিল্লীর মোগল বাদশাহের মত বাংলার একচ্ছত্র অধিপতি হয়েছেন। গণতন্ত্রের বালাই নেই, ব্যবস্থাপক সভা ও পরিষদের সদস্যদের কাছে জবাবদিহি করবার গোলমাল নেই, মিঃ কেসী তাঁর শাদাকোলো আই. সি. এস্ কর্মচারীদের আওতায় বেশ রাজত্ব করে যাচ্ছেন। বাংলা সরকারের সমস্ত বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাই আই. সি. এস্ কর্মচারী। প্রচার বিভাগে যে মুসলমান ভদ্রলোকটি ছিলেন, তিনি 'লীগের' লেটোয়া হলেও আই. সি. এস্ ন'ন, শিক্ষা-বিভাগের লোক। সে জন্যই বোধ হয় তিনি মান থাকতে সরে পড়লেন, সরকারী চাকুরী ছেড়ে সোজা দিল্লী গিয়ে লীগের মুখপত্র 'ডন' কাগজের সম্পাদক হচ্ছেন। এবার তাঁর স্থানে একজন আই. সি. এস্ এলে কেসী সাহেবের চারদিকের প্রত্যেকটি খুঁটীই খাঁটি লোহার তৈরী হবে।

কিছুদিন হয় এক বেতার বক্তৃতায় কেসী সাহেব বাংলা দেশের অবস্থা যে সব দিক দিয়েই উন্নত হচ্ছে এবং আরও হবে এই আশ্বাস আমাদের দিয়েছেন। নাৎসি ফাসি দলের কর্তাদের একটা মূল কথা ছিল যে মিথ্যা কথা খুব জোর করে' আর দিনের পর দিন চেঁচিয়ে বললে সাধারণ লোকে তা বিশ্বাস করবেই। যদিও কেসী সাহেব প্রচার বিভাগের উপযোগিতায় খুব নিশ্বাসী তবু নাৎসি ও ফাসিদের উপরোক্ত প্রচার কার্যকে তিনি ঘৃণা করেন বলেই আমরা মনে করি। সেজন্যই তিনি বাংলাদেশকে আশার কথা শোনাতে গিয়ে অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়েছেন দেখে দেশের লোকে দুঃখিত হয়েছে। খাদ্য রেশন যে ভাবে করা হয়েছে তাতে বহু লক্ষ টাকার খাদ্য নষ্ট হয়েছে, এটা কেবল রাখবার অব্যবস্থার জন্য নয়, যাদের উপর এই ভার ছিল ও আছে তারা মরদ দিয়ে কাজ করবার জন্য শিক্ষিত নয়। দেশের বহু সহস্র লোক যখন অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে তখন যে-সব খাদ্যশস্য আর আর খারাপ হচ্ছে সেগুলি মানুষের অব্যবহার্য হবার পূর্বেই যদি অনাহারক্লিষ্টদের ভেতর বিতরণ করবার ব্যবস্থা থাকত তবে অনেকেই বাঁচত। বহু সহস্র মণ খাদ্য যখন মানুষের অখাদ্য হয়ে গেছে তখন তাদের বেচবার চেষ্টা করা হয়েছে এই সর্তে যে যারা ঐ সব জিনিষ

কিনবে তারা তা মানুষের খাদ্যরূপে আর বিক্রী করতে পারবে না। কিন্তু এ সর্ত বহু স্থানেই পালিত হয় নাই। যখন এরকম সর্ত পালন করাবার ক্ষমতা সরকারের নাই তখন সরকারের ঐ রকম ব্যবস্থা করা কোন রকমেই ঠিক হয় নাই। লোকে পশুর খাদ্যকে মনুষ্য খাদ্যের চাইতে নিকৃষ্ট বলে' মানে—কিন্তু পশুকে মারলেও যে খাবারে সে মুখ দেয় না, মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় তাই খাচ্ছে এবং ফলে সমস্ত দেশ আজ একান্ত দুর্বল রোগজর্জর মানুষের আবাস স্থান হয়েছে। খাদ্য সম্বন্ধে যাদের ওপর ভার দেওয়া হয়েছে তাদের অনেকেরই তাদের ওপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা নেই। মানুষ মরতে দেখলেও এদের অনেকে আইনের বিধিকে কঠোরভাবে মেনে চলেছেন। লাল ফিতার বাইরে যাবার মত বুদ্ধি ও সাহস এদের মস্তিষ্ক ও হৃদয় অনেক দিন আগেই যে হারিয়ে ফেলেছে সেকথা কেসী সাহেবের বোধ হয় এখনও জানবার অবকাশ আছে।

না, কেসী সাহেব, না। এখনো আমরা বনের বাইরে কেন, প্রান্তদেশেও আসতে পারিনি। যে অবিমৃষ্যকারিতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, মানবজীবনের প্রতি যে গভীর অবজ্ঞা, ঘুষ নেওয়া-দেওয়া, 'ব্ল্যাকমার্কেট' সৃষ্টি করতে যে পরোক্ষ সহায়তা লর্ড হার্বার্টের আমলে জন্ম নিয়েছিল, তার সমস্তটা এখনও বাংলা থেকে লোপ পায়নি। আজও দেশের লোকে কাপড়ের জন্য ঘরের বাইরে আসতে পারছে না, চাষীমজুর বস্ত্রাভাবে চাষ করতে বা মজুর খাটতে যেতে পারছে না—ঘরে ছেঁড়া খোঁড়া এমন কিছু নেই যা পরে' কোনে রকমে লজ্জা নিবারণ করে' জীবিকার্জনে বেরুতে পারে। যে সব জায়গায় কাপড় দেওয়া হয়েছে সে সব জায়গায় সাধারণতঃ পরিবার প্রতি একখানা কাপড় দেওয়া হয়েছে—যেন একখানা কাপড় হলেই পরিবারের সকলের অভাব মোচন হবে! এ যেন মেডুসার চোখ, একটি চোখ দিয়ে তিন বোনের কাজ করা!! এ সত্ত্বেও কেসী সাহেবের প্রচার বিভাগ বাংলাদেশে কাপড়ের পারমিটের সংখ্যা কেমন সপ্তাহের পর সপ্তাহ বেড়ে চলেছে চিৎকার করে দেখাচ্ছে। যে দেশে নগ্ন ও অর্দ্ধনগ্নদের মিছিল চলেছে, সে দেশে লোকে বাড়ীর মা বোন ছেলেমেয়ের কাপড় সংগ্রহের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে সে দেশের প্রচার বিভাগের এই দাম্ভিকতাকে দেশের লোক তাদের অসহায় অবস্থার প্রতি মর্মন্তুদ ব্যঙ্গ বলেই গ্রহণ করবে।

বস্ত্র-সংকট কেন কোনো সংকটই এমন তীব্র হ'ত না যদি কেসী সাহেবের পরামর্শদাতাদের ভেতর সত্যিকারের সংগঠনকারী একটি লোকও থাকত। সমস্ত বস্ত্রব্যবসায়ীদের গুদাম সীল করে তাদের উপর হুকুম দেওয়া হল যে তারা সরকারের নিযুক্ত ছাওলিং এজেন্টদের কাছে ছাড়া আর কারুর কাছে কোনো কাপড় বেচতে পারবে না; নির্দিষ্ট দরে সরকারী দালালেরা সব কাপড় নিয়ে যাবে। যেদিন কাপড় সীল হয়েছিল সেদিন থেকে সেই কাপড় কতদিনের ভেতর সাধারণ লোকের কাছে বেচবার জন্য গিয়েছিল কেসী সাহেব যদি সে হিসাবটা বের করেন তাহলে তাঁর পরামর্শদাতাদের গাফিলতির দৌড় টের পাবেন।

অন্ন ও বস্ত্রের কথা আর কত বলব। রেশন বিভাগটা যে ভাবে চালান হচ্ছে তাতে মনে হয় যে গভর্ণমেণ্টের পরামর্শদাতারা গভর্ণমেণ্টকে যেন ব্ল্যাকমার্কেটের কর্ণধার করে তুলেছে। চাল, গম, আটা প্রভৃতি সরকার নিযুক্ত ক্রেতারা যে দরে কিনে গভর্ণমেণ্টের কাছে যে দরে বেচেছে সেই দর যাচাই করবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কি ব্যবস্থা করেছেন? Reconditioned Rice যা রেশন দোকানে পাওয়া যায় সেটা কি পদার্থ? গুদাম পচা চাল ঝাঁকরা দিয়ে ঝেড়ে চুন বা ঐ জাতীয় পদার্থ দিয়ে মেজেঘষে চকচকে করে দেওয়া নয় কি? ঐ চাল কি জাতীয় স্বাস্থ্যের অনুকূল? ঐ চাল খেলে শিশু, বৃদ্ধ, রোগীর অবস্থা কি হয়? চালের ভেতর কাঁকর, তুলোরদলা ইত্যাদি এত বেশী পরিমাণে কোথা থেকে আসে,—যুদ্ধের আগে ত কোনো দিন এমন নোংরা চাল দেশের লোকের বরাতে জোটে নাই! যুদ্ধের দোহাই দিয়ে দেশবাসীকে অনেক কিছু সহ্য করান হয়েছে যা যাদের দেশে যুদ্ধ তারা পর্যন্ত সহ্য করে নাই। যুদ্ধের অজুহাতে মানবত্বকে বিসর্জন দিয়ে যে সংগঠন সে সংগঠন কখনও নীতি বিগর্হিত না হয়ে পারে না—এবং জীবনের সর্বকর্মে যে কলুষ এসে পড়েছে যার হাত থেকে সরকারের সর্বোচ্চ থেকে নিম্নতম কর্মচারী সম্বন্ধে পর্যন্ত দেশবাসী সন্দেহমূলক ইঙ্গিত করতে কুণ্ঠিত হয়

তার মূল কারণই হচ্ছে মানবতার দিকে চুলি-লাভের চোখ ফিরিয়ে যুদ্ধের নামে জাতির সমস্ত সম্পদ ও শক্তিকে নিয়োগ করার প্রয়াস। জাতিকে যেভাবে লড়তে হবে, একথাটা সরকারী কর্তারা ভুলে যেতে পেরেছিলেন এইজন্য যে যুদ্ধটা [illegible] হিতার্থে লড়া হচ্ছে না, হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ব্রিটিশ সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখতে; এবং সেই স্বার্থের মূলকাঠি সমগ্র ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের স্বার্থকে বলি দিতে কারুরই কোনো কুণ্ঠা নেই। দেশবাসী যারা জীবনের ছটিটি মুহূর্ত দৈন্য ও অভাবের তাড়নায় পাগলের মত হয়ে আছে তারা কখনও কেসী সাহেবের আশ্বাসে আশ্বস্ত হতে পারে না। অন্ন বস্ত্রের জন্য মানুষকে যদি সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকতে হয় তাহলে সে অন্য কাজ করবে কোন সময়? এই অন্তর্দ্বন্দ্বের চিন্তাতেই জাতি তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছে; কারণ এর চাইতে বড় দুর্ভাবনা আর কি থাকতে পারে? এজন্য আমাদের দেশের প্রথম লক্ষ্যই ছিল যে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান যেন থাকে। এটা দেশবাসী জানে যে কেসী সাহেব যে যন্ত্রের এক কোনে একটি ক্ষুদ্র মাত্র সে যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করবার ক্ষমতা তাঁর নেই এবং যে দায়িত্ব তিনি মাথায় করে' নিয়েছেন সে দায়িত্ব আজকার গণতান্ত্রিক যুগে কেউ মাথায় পেতে নেয় না। যদি তিনি অসাফল্যের গ্লানি থেকে বাঁচতে চান তবে তাঁর কর্তব্য কংগ্রেসকে ডেকে নিয়ে প্রাদেশিক শাসনভার তাদের হাতে দেওয়া। তিনি বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়ার সঙ্গে এতদিনে অনেকটা ওয়াকিবহাল হয়েছেন এবং একথাটা ভাল করেই জানেন যে বাংলার পরিষদে বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে একমাত্র কংগ্রেসই দলের নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলে এবং জাতীয় জীবনকে কলুষমুক্ত করতে যদি কোনো দল আন্তরিক চেষ্টা করে থাকে তবে এক কংগ্রেসই তা করেছে ও করবে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'অগ্নিবীণা'র কার্যালয় ৩নং আপার সার্কুলার রোড হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

আপনার স্বাস্থ্য কামনা করি

প্রত্যহ···প্রতি ঘণ্টায়···প্রতি মুহূর্তে আপনার জন্য···প্রত্যেক নর-নারী ও শিশুর জন্য ইহাই কামনা। কিন্তু এই শুভেচ্ছাকে ব্যর্থ করার জন্য সর্বদাই ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র শত্রু ওৎ পাতিয়া রহিয়াছে।

দৈনন্দিন জীবনে অত্যাধিক খাটুনি, চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদির সকল আপনার দেহের উপর বিষম চাপ পড়িতেছে। আপনি কখনও জানতেও পারেন না যে, ধীরে ধীরে আপনার জীবনীশক্তি ক্ষয় পাইতেছে—স্নায়ুসমূহ নির্জীব হইয়া আসিতেছে।

ইহা টনিক সৃষ্টিতে নব অবদান আবিষ্কৃত হওয়ায় স্বাস্থ্য অর্জনের সংগ্রামে ইহা পরম সহায়। ইহা পাকস্থলী পরিষ্কার রাখে, নূতন রক্ত সৃষ্টি করে, স্নায়ুগুলিকে সতেজ করে, টিস্যুগুলি পুনঃ নির্মাণে ও গঠনে সাহায্য করে।

বিভিভাইন সেবন করুন—ইহা খাদ্য-গুণসম্পন্ন, স্বাস্থ্য-সংগঠক, খাদ্য-প্রাণ ও অত্যাবশ্যক খনিজ পদার্থপূর্ণ একটি উৎসাহ-উদ্দীপক ও ক্ষুধাবর্দ্ধক টনিক।

বিভিভাইন

দেহ ও মনের শ্রেষ্ঠ টনিক!

বেঙ্গল ড্রাগ হাউস লিঃ, ২২নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিঃ

কলিকাতার ডিষ্ট্রিবিউটার্স—গুহঠাকুরতা এণ্ড কোং লিঃ। B. D. 1039

নাগার্জুন

অলোকসামান্য প্রতিভাবলে গরিমা-মহিমা আয়ুর্বেদের
সংস্কার করিয়াছিলেন বহু শতাব্দী পূর্বে—
— আজ —
আয়ুর্বেদ আবার স্খলিত-গৌরব, হতমান, বিপর্যস্ত।
তাই নাগার্জুনের পুণ্য নামের পতাকা বহন করিয়া

- কর্মকুশল লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈদ্য
- পাশ্চাত্যশিক্ষানিপুণ চিকিৎসক
- ফলিত রসায়নে কৃতী বৈজ্ঞানিক

সমন্বয়ে পরিচালিত

নাগার্জুন আয়ুর্বেদ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট

আয়ুর্বেদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

ঔষধ পরিচয় বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য।

কার্যালয়:—৪, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা; রসশালা—দমদম ক্যান্ট.

সিলেট ইনডাষ্ট্রিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

টেলিগ্রাফ—ইনডাষ্ট্রিয়েল ফোন—সিলেট ১৭

কলিকাতা অফিস:—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

টেলিগ্রাফ—সিডাষ্ট্রিয়েল ফোন—কলিঃ ৫৬০৭

অনুমোদিত মূলধন— ১০,০০,০০০৲
বিক্রীত মূলধন— ৫,৫০,০০০৲
আদায়ী মূলধন (অগ্রিম কল ও
সেয়ার বাবদ প্রাপ্ত টাকা সহ) ৪,৩৫,০০০৲
কার্য্যকরী তহবিল ১,০০,০০,০০০৲ উর্দ্ধে

—অন্যান্য শাখা—

ঢাকা, ময়মনসিং, নারায়ণগঞ্জ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, গৌহাটী, শিলং, নওগাঁ, শিলচর, করিমগঞ্জ, করিমগঞ্জ বাজার, মৌলবী বাজার, হবিগঞ্জ ও ডাউকি।

সর্ববিধ ব্যাঙ্কিং কাজ সুবিধাজনক সর্তে করা হয়।

জে, এম, দাস—জেনারেল ম্যানেজার

দার্জিলিং ব্যাঙ্ক

লিমিটেড

হেড্ অফিস: ভবানীপুর, কলিকাতা।

গ্রাম: 'রেইনবো' কলিকাতা। ফোন: পি. কে ২৬৮১

—কলিকাতা ব্রাঞ্চ—

ডালহৌসী স্কোয়ার	—নর্টন বিল্ডিং, ফোন—ক্যাল ৬৫৭১
বড়বাজার	—২০৪, হারিসন রোড, ফোন—বি, বি, ২২০৪
হাওড়া	—বেলিলিয়াস রোড, হাওড়া।
শিয়ালদহ	—বৈঠকখানা বাজার।
বালীগঞ্জ	—ল্যান্সডাউন রোড,।
বেহালা	
শ্যামবাজার	—১০৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর নিকট)

—অন্যান্য ব্রাঞ্চ—

ভারতের সকল প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে

মিঃ বি, মুখার্জ্জী—ম্যানেজিং ডিরেক্টর

অষ্টম বর্ষ | ভাদ্র—১৩৫২ | ৫ম সংখ্যা

৯ই আগষ্ট

শ্রীসত্যকান্ত দাস

স্বাধীনতার বইছে বাতাস সময় বয়ে যায়,
মিলেছি আজ ভায়ে ভায়ে মায়ের আঙিনায়।
লক্ষ বীরের মুক্তি সাধন
ছিঁড়েছে আজ পায়ের বাঁধন,
মাঝ দরিয়ায় তুফান তুলে ভিড়ল ঘাটে নায়—
মায়ের মুক্তিযজ্ঞে তোরা যোগ দিবি কে আয়।

আলো বাতাস রুধল যারা রাখল কারাগারে,
বিদায় এবার দেব তাদের চরম নমস্কারে।
স্বাধীনতার পরম বাণী
অনেক দুঃখে নিলেম জানি
দীর্ঘ দিনের তপস্যা আর ত্যাগের সাধনায়—
মায়ের মুক্তযজ্ঞে তোরা প্রাণ দিবি কে আয়॥

বৈদেশিক দৃষ্টিতে বাংলা দেশ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জন টমাস ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ নবেম্বর মুল ব্যাপটিস্ট সমিতির নর্থাম্পটনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনে যে আত্ম-বিবরণী দাখিল করিয়াছিলেন,তাহা হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি—

"আনারস, আম, কলা, লেবু, তরমুজ, পীচ (পীচ বলিতে টমাস কি বুঝিয়াছিলেন আজ তাহা বলা কঠিন) প্রভৃতি ফল ও মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং দামেও সস্তা। এই অনুপাতে অন্যান্য জিনিসও অপর্য্যাপ্ত মেলে। সুতরাং কোনও ইউরোপীয় যদি সেখানে একটি বড় বাড়ি, পাল্কি এবং অনেকগুলি চাকরবাকর রাখিয়া ইউরোপ হইতে আনীত হ্যাম (শূকরের মাংস), জিহ্বা (ষাঁড়ের জিভ), ক্ল্যারেট, পোর্ট প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর খাদ্য ও পানীয় ব্যবহার করে তাহা হইলে বাংলা দেশে থাকা তাহার পক্ষে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিবে। অনুযায়ী সে দেশে ভোগের যথেষ্ট অবকাশ আছে এবং অল্প খরচে অনেক দাসদাসী রাখা চলে। সেখানে এমন অনেকগুলি চাকর দরকার, এখানকার পক্ষে যাহাদের মোটেই প্রয়োজন নাই। যেমন ধরুন—ছাতাবরদার, এক ধরনের ছাতা মাথায় ধরিবার জন্য ; একজন বাবুর্চ্চি, একজন দোবা—এসব তো চাই-ই, আরও বেশি দুই একজনকেও চাই। সব চাইতে খরচের ব্যাপার হইতেছে বাবুর্চ্চি, অবশ্য তাহারও মাসিক বেতন ১৫ শিলিঙের অধিক নয়। সব চাইতে ব্যয়সাধ্য হইতেছে বাড়িভাড়া, কারণ সে দেশে টাকার আইন-সঙ্গত সুদ হইতেছে শত-করা বারো টাকা। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কিন্তু শত-করা আট টাকার বেশি সুদ গ্রাহ্য করে না। আমি নিজে একনাগাড় ছয় মাস নৌকায় বাস করিয়াছিলাম, খরচ ছিল সামান্যই, কিন্তু ইউরোপের যে কোনও রাজপুত্র অপেক্ষা আমি আরামে ছিলাম। ১৬ হইতে ১৮ শিলিং ব্যয় করিয়া যে কোনও মিশনরী সেখানে চমৎকার বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতে পারে, অবশ্য দেওয়াল হইবে মাটির এবং ছাদ খড়ের। আমিও এই ধরনের বাড়িতে বাস করিয়াছি, এবং নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, এখন ইংলণ্ডে আমি যে আরামে আছি, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি আরাম সেই মাটির ঘরে ভোগ করিয়াছি।

স্থানীয় লোকেদের বর্ব্বরতার কথা যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি বলিব যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অখ্রীষ্টিয়ানদের যে সকল বর্ব্বরতার কথা আমরা কানে শুনিয়াছি অথবা বইয়ে পড়িয়াছি, ইহারা মোটেই সেরূপ নয়। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, হিন্দুরা পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে অহিংস ও নির্দ্দোষ ব্যবহারের জন্য প্রসিদ্ধ ; তন্মধ্যে আবার বাংলা দেশের লোকেরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের অপেক্ষা তাহাদের ব্যবহার, বন্ধুদের প্রতি তো বটেই, এমন কি, শত্রুদের প্রতিও এমন ভদ্র ও হিংসালেশহীন যে, ভারতবর্ষেই তাহা প্রবাদের মত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি, তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট শক্তি ও খ্যাতিসম্পন্ন কয়েকজন ব্যক্তি আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, আমার কাজ তাহাদের স্বার্থের অত্যন্ত বিরোধী হইলেও, আমার কোনও সামান্য দৈহিক ক্ষতি করিবার চেষ্টাও কখনও করে নাই, যদিও আমি তাহাদের বসতির এক মাইলের মধ্যে একটি নির্জ্জন বাড়িতে রাত্রিতে জানালা দরজা-সম্পূর্ণ খুলিয়া রাখিয়া শয়ন করিতাম, কখনও তত্ত্বোয়ালে অথবা বন্দুক আমার কাছে থাকিত না। অবশ্য কলিকাতার আশেপাশে থাকিলে এতখানি সাহস প্রকাশ করা সম্ভব বা সমীচীন হইত না।"

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ জুন তারিখে ক্যাপ্টেন ঐীলমাস পরিচালিত ডেনিশ ইস্ট ইণ্ডিয়াম্যান (জাহাজ) 'প্রিন্সেস মেরিয়া' যোগে উইলিয়ম কেরীর পরিবারসহ জন টমাস ভারতবর্ষ যাত্রা করেন এবং ওই বৎসরের ১১ নবেম্বর তারিখে কলিকাতা পৌঁছেন। তাহার পর নানা ভাগ্য বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া বহু ঘাটের জল খাইয়া টমাস ও কেরী উভয়েই শেষ পর্য্যন্ত যথাক্রমে মালদহ জিলার মদনাবাটী ও মহিপালদীঘিতে মর্জ্জ উড্‌নীর আশ্রয়ে দুই নীলকুঠির অধ্যক্ষরূপে অধিষ্ঠিত হন।

এখানে তাঁহারা প্রায় ছয় বৎসর অবস্থান করেন। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ হইতে ২৯ সেপ্টেম্বর বার্মিংহামের মিঃ পীয়র্সের নিকট জন টমাস মদনাবাটী হইতে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে নিম্নলিখিত বর্ণনাগুলি উদ্ধৃত হইল—

"এখানে এ দেশবাসীর কণ্ঠে সর্ব্বাপেক্ষা মধুর ধ্বনি আমি তখনই শুনিতে পাই, ডাকবাহক হাঁক দিয়া যখন বলে, 'চিঠি, চিঠি, বিলাতী চিঠি।'...নবজাত শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াই যদি মায়ের স্তন্য পান না করে, তাহা হইলে এই হতভাগোরা বলে, 'ছেলের ভূত লেগেছে'; শিশুটিকে একটি ঝুড়িতে শোয়াইয়া ইহারা ঝুড়িটি কোনও গাছের ডালে টাঙাইয়া দেয়। ওই অবস্থাতেই শিশুর প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায়।...মুসলমান এবং হিন্দু, আমার মনে হয় এই উভয় সম্প্রদায়ই পরম ঈশ্বরের প্রতি সমান শ্রদ্ধাসম্পন্ন। কিন্তু সমস্ত দেশ জুড়িয়া দেখিতে পাওয়া যায়, এই দুই ভিন্ন সম্প্রদায় স্ব স্ব মৃত মহাত্মাদের প্রতি ভিন্নভাবে পূজা নিবেদন করিয়া থাকে, দেবদূত এবং দেবতারাও পূজা পায়। যেখানেই যাই, বড় বড় গাছের নীচে অথবা উঁচু টিপির উপরে পীরের দরগা, নয় দেবতার পূজাস্থান দেখিতে পাই। মুসলমান-হিন্দুদের দেবতা দেবদূত অথবা মহাপুরুষরা এই দুই নামেই অভিহিত হয়; মুসলমানের পীর, হিন্দুর দেবতা। পীরের স্থাপত্য এইটুকু যে, পীরের আস্তানা ইট এবং সুরকি দিয়া গাঁথা, প্রায় তিন ফুট উচ্চ। এখানে সচরাচর একটি প্রদীপ জ্বালিয়া রাখা হয় এবং চতুর্দ্দিকে পোড়ামাটির তৈয়ারি ঘোড়া ও হাতীর মত দেখিতে কতকগুলা মূর্ত্তি ছড়ানো থাকে। এই মূর্ত্তিগুলি সাজাইয়া দিয়া পীরের আনন্দবিধান করা হয়। পীর হইতেছে কোনও মৃত মহাত্মার স্বর্গত আত্মার লৌকিক নাম। এই মৃত সাধুর মৃতদেহ আশেপাশেই কোথাও দুই মাত্রার সংযোগস্থলে গোর দেওয়া থাকে। পীরের দরগায় ভক্তেরা চালের পিঠা, ফল, মশলা প্রভৃতির অর্ঘ্য লইয়া আসে; পীরের সেবাইৎ সেখানেই হাজির থাকে সে কোরাণের কিছু বয়েৎ আবৃত্তি করিয়া দেওয়ার পর সকলে মিলিয়া প্রসাদ ভক্ষণ করে। কোরাণ সচরাচর যাহারা পাঠ করে, তাহারা লিখিতে পড়িতে জানে না।

পীরের নিকট ইহারা যে সকল প্রতিজ্ঞা করে, সেগুলি হাস্যকর। কোনও কাজে যদি কেহ সফলতা লাভ করিতে চায়, সে পীরের কাছে যায়, দুই-তিনবার মাটিতে মাথা ঠেকায় এবং শেষে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলে, তুমি যদি আমার কাজ হাসিল করিয়া দাও, তাহা হইলে তোমার দরগায় ভাল সিন্নি দিব।' পরে যদি কাজ হাসিল হয়, পীর সিন্নি পায়; না হইলে পীরের ভাগ্যে কিছুই জোটে না। কোথাও কোথাও দেখিয়াছি পীরের আস্তানার উপর পাকা ইমারৎ নির্ম্মিত হয়; সেটিকে অত্যন্ত পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নও রাখা হয়। দূর হইতে এই সৌধগুলি অতিশয় চমৎকার দেখায়।

দেবতাদের সম্বন্ধেও দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক। দেবতার আস্তানাগুলিও উঁচু জায়গায় অথবা বড় বড় গাছের নীচে স্থাপন করা হয়; কোনও পুরাতন ভগ্নপ্রাসাদ বা মন্দির হইতে প্রস্তরখণ্ড আনিয়া দেবস্থানগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। একটা কথা আপনার জানা আবশ্যক, বাংলা দেশে প্রস্তরখণ্ড একটি অতিশয় দুর্লভ বস্তু। পূর্ব্বে যখন দেশ অনেক বেশী সমৃদ্ধশালী ও জনবহুল ছিল, তখন ধনী ব্যক্তিরা দুই তিন শত মাইল দূরের পর্ব্বত হইতে পাথর আনাইতেন এবং মন্দির মসজিদ কবর অথবা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইতেন। সেই সব মন্দির মসজিদ আজ ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে। এখন দেবতাস্থানের কথাই বলি। এক আধ খণ্ড পাথর আনিয়া দেবতার স্থানে স্থাপন করিয়া, তাহাতে খানিকটা লাল রঙ (সিঁদুর) লেপিয়া দেওয়া হয়। পীরের দরগার মত দেবতাস্থানের উপরেও মাঝে মাঝে মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই মন্দিরের স্থাপত্য-পদ্ধতি পীর-দরগার মুসলমান-পদ্ধতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহা ছাড়া প্রত্যহ ফুল ও উপরোক্ত লাল রঙ দেবতাস্থানে যাহা অর্পণ করা হয়, দেবতাস্থানগুলি তদ্দ্বারা সম্পূর্ণ পৃথক চেহারা ধারণ করে।"

জন টমাস মহীপালদীঘি হইতেই ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ অক্টোবর তারিখে ব্রিস্টলের ডক্টর রাইল্যাণ্ডের নিকট যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে গঙ্গার সাঁড়াসাঁড়ি বানের একটা বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি—

"এখানে সাঁড়াসাঁড়ি বান (bore) একটা প্রকাণ্ড নৈসর্গিক ঘটনা। সমুদ্রের জোয়ার নদীপথে প্রচণ্ড বেগে

প্রবেশ করিয়া এই কাণ্ড ঘটাইয়া থাকে। বৎসরের কোনও কোনও মাসে, ঠিক মত বলিতে গেলে উহাদের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহার বেগ প্রবলতম হইয়া থাকে। এই বানের আগমন-বার্তা বহু মাইল দূর হইতেই ঘোষিত হয়, শব্দ যাহা হয় তাহা অনেকটা পার্শ্ববর্তী উপসাগরে ফেনায়িত সমুদ্রের গর্জনবৎ বোধ হয়। এই বান যখন আসে, তখন নদীর জলে জাহাজ ও নৌকায় ভীষণ আলোড়ন উপস্থিত হয়; কিন্তু নদীর জলে অর্থাৎ তীরের কাছাকাছি ইহা এমন প্রবল আকার ধারণ করে যে, তাহা কিছু সম্মুখে পাইলে খড়কুটার মত ভাসাইয়া লইয়া যায়; বৃহত্তম নৌকাও ইহার তাড়নায় এক মিনিটে কাত হইয়া যায়। কয়েক মিনিট পরেই দেখা যায়, কোথাও কিছু নাই; বিপর্যয়ের সকল চিহ্ন অন্তর্হিত। শুধু দেখা যায়, নদী প্রবলবেগে নীচে নামিয়া যাইতেছে। এই সময়ে দুই তিন মিনিটের মধ্যে নদীর জল দশ-পনরো ফুটের অধিক বাড়িয়া যায়। অজ্ঞতা ও অসতর্কতার জন্য এই সময়ে প্রতিবৎসর বহু জীবন নাশ হইয়া থাকে। এমনিতে সাঁড়াসাঁড়ি বানে বিশেষ কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই, কারণ নদীর যে স্থলে পাড় খাড়া এবং জল গভীর থাকে—এই সকল স্থানে কোনও গতিকে পৌঁছিতে পারিলেই আপনি নিরাপদ। এই সাঁড়াসাঁড়ি বানের আগমনকালও পূর্বাহ্নে গণনার দ্বারা জানা সম্ভব। আমি একবার এই সাঁড়াসাঁড়ি বানকে চকল বায়ুপ্রবাহের বিরুদ্ধে ভয়াবহ গর্জন করিতে করিতে আসিতে দেখিয়াছিলাম। বাতাস এবং জলের সংঘর্ষে যে ঢেউ উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার ললাটে শুভ্র ফেনার পতাকা বায়ু-তাড়নে সুদীর্ঘ আকার লইয়া পিছনে পিছনে ছুটিতেছিল; একটি নৌকা কয়েকজন দেশী আরোহী লইয়া প্রায় তীরের কাছে পৌঁছিয়াছিল, (আর দশ গজ গেলেই সম্ভবত তাহারা তটের আশ্রয় পাইত) চক্ষের নিমেষ ফেলিতে না ফেলিতে বান আসিয়া নৌকাটিকে আক্রমণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহা দৃষ্টির অন্তরালে জলের নীচে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আরোহীদের মধ্যে দুই জনকে উদ্ধার করা হইল। বাকিরা সলিলসমাধি লাভ করিল। নৌকাটির আর সন্ধান পাওয়া গেল না। এখানে বলা আবশ্যক যে, এ দেশের লোকেরা সাঁতারে অতিশয় পটু।"

জন টমাস এই ঘটনা কলিকাতার গঙ্গায় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, মালদহে নয়। সমুদ্রের ঢেউয়ের মালদহ পর্যন্ত পৌঁছায় না। মহীপালদীঘিতে জর্জ উডনীর পীলকুঠিতে টমাসের চাকুরি লওয়ার অব্যবহিত পূর্বে জর্জ উডনীর এক পুত্র কলিকাতায় সস্ত্রীক গঙ্গা পার হইতে গিয়া নৌকাডুবিতে মারা যান। এই নৌকাডুবির সহিত টমাস ও কেরীর মালদহে চাকুরি লওয়ার সম্পর্ক ছিল। টমাস বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না। তিনি চোখে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার বিবরণই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উইলিয়ম কেরী ছিলেন মহাপণ্ডিত; বৃক্ষতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব এবং ভাষাতত্ত্বে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল, এই কারণে তাঁহার জার্নাল ও চিঠি-পত্রে বঙ্গদেশের ফলমূল, জীবজন্তু, আচার-ব্যবহার, কৃষিকর্ম প্রভৃতির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক ও প্রণালীবদ্ধ। উইলিয়ম ওয়ার্ড ও জোশুয়া মার্শম্যান ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বাংলা দেশে পৌঁছিয়াছিলেন। কেরীর মধ্যে মিশনরী ভাবাবেগ অত্যধিক ছিল বলিয়া তিনি বাংলা-দেশের ধর্ম ও ধর্মসংক্রান্ত আচারব্যবহারের সম্পর্কে পক্ষপাতদুষ্ট বিবৃতি দিয়াছেন। ওয়ার্ড যখন প্রথম আসিয়া পৌঁছান, তখন তাঁহার দৃষ্টি সহজ ও অনাবিল ছিল। সেই অবস্থায় তিনি বাংলা দেশ ও বাঙালীদের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহার মধ্যে বিস্ময়, প্রীতি ও সহানুভূতির পরিচয় মেলে। পরবর্তী কালে তাঁহার মধ্যেও মিশনরী আগ্রহ পুণমাত্রায় ঢুকিয়াছিল এবং হিন্দুধর্ম ও হিন্দু আচারব্যবহার সম্পর্কে তিনি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ সুবৃহৎ একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। এক ধর্মের ব্যাপার ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রেই ইহাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রায় গোড়া হইতেই টমাসের মস্তিষ্ক বিকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহার জার্নাল মহীপালদীঘির পর আর অগ্রসর হয় নাই। অনেক অবান্তর কথা ইহাতে আছে। ব্যক্তিগত কথাবার্তাই বেশি। ইহার মধ্যে বাংলা দেশ সম্বন্ধে যেখানে যেখানে উল্লেখ পাইয়াছি, সেই-টুকুই উদ্ধৃত করিয়াছি। পরিমাণে ইহা অত্যন্ত নগণ্য। কিন্তু উইলিয়ম কেরী ও উইলিয়ম ওয়ার্ডের জার্নাল ও চিঠিপত্রের বেলায় সে কথা খাটে না। এখানে উপকরণ প্রচুর, বাছিয়া লওয়াই কঠিন।

বুনিয়াদী শিক্ষায় ইংরাজীর স্থান নাই কেন?

শ্রীমতী অনামিকা দেবী

গান্ধী পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতির সহিত পরিচয় অধুনা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অল্প বিস্তর আছে। কারণ খবরের কাগজে এই সম্বন্ধে লেখা, আলোচনা সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথা হইতেছে কোন উদ্যোগ বা শিল্পের মধ্য দিয়া জ্ঞান অর্জ্জনের প্রয়াস। এই শিক্ষার সমর্থনকারীদের বিশ্বাস যে, এই অভিনব পদ্ধতিতে ছেলে-মেয়েরা তাহাদের গড়নের প্রাথমিক পর্য্যায়ে সত্যিকার শিক্ষার সুযোগ পায়। শিক্ষা বলতে শুধু অক্ষর জ্ঞান বা কোন ভাষা আয়ত্ত করবার কৌশল নয়। ইহার আসল উদ্দেশ্য হইতেছে মনের সুষ্ঠু বিকাশ ও সার্থক পরিণতি। মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় এবং সচরাচর আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় ইহা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় যে, ৭।৮ বৎসর হইতে ১৩।১৪ বৎসর পর্য্যন্ত ছেলে-মেয়েরা খুব বাস্তবমুখী হয়। সেই সময়ে তাহারা সব কিছু জানিতে ও বুঝিতে চায় দেহের অঙ্গ পরিচালনার মধ্য দিয়া। শৈশবের এই মনোভাব তাহার শিক্ষা পরিকল্পনা কালে নজরে রাখা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় তাহার মনের গড়নকে উপেক্ষা করা হইবে, ফলও হইবে মারাত্মক কারণ ইহাতে মনের বিকাশ ও পরিবর্দ্ধনে বাধা আসবে। এই বিজ্ঞানী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে (Craft) হস্তশিল্পকে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধান বাহন করা হইয়াছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার সময়কাল সাত বৎসর। ছেলে-মেয়েরা সাত বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে এ শিক্ষা সমাপ্ত করিবে। এই সময়কালের মধ্যে বিদ্যার্থীকে প্রচলিত ব্যবস্থায় ইংরাজী ব্যতীত প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত যে জ্ঞান দেওয়া হয়, তাহা দেওয়া হইবে। চলিত ব্যবস্থায় এগার বৎসরের পাঠ্য বস্তু তাহাকে সাত বৎসরে দেওয়া সম্ভব হইবে। ইহাতে সংশয় প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু এই সংশয় নেহাৎ অমূলক—একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই তাহা বুঝা যায়। বুনিয়াদী শিক্ষায় ইংরাজীর স্থান নাই। বর্ত্তমান পাঠ্যতালিকায় অক্ষর পরিচয়ের সময় হইতেই ইংরাজী বিশেষ জোরের সহিত পড়ানো হয়। এই বৈদেশিক ভাষাকে মাথায় ঢুকাইতে ছাত্র-ছাত্রীর কিরূপ বেগ পাইতে হয় তাহা আমরা প্রায় সকলেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি। মস্তিষ্ক শক্তির ইহার চাইতে বড় অপচয় কল্পনা করা শক্ত। ছাত্রকে তাহার পাঠ্যকালে পড়ার তৃতীয়াংশ সময় ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করিতে লাগে। ইহা মোটেই অতিরঞ্জন নয়। এত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রবেশিকা পরীক্ষাকাল পর্য্যন্ত শতকরা পাঁচজন ছাত্রও মোটামুটি শুদ্ধভাবে ইংরেজী লিখিতে ও বলিতে পারে না। তৎপর এই ভাষার দুর্গম দুর্গ আরোহণ করিয়া বিদ্যার্থীর পড়ার বিষয় বস্তুর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ভাষা শিক্ষা নয়, শিক্ষার বাহন মাত্র। এই বাহনকে বশ করিয়া তবে বিদ্যামন্দিরে যাইতে হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ এই বৈদেশিক ভাষারূপ বাহনকে বশ করা অধিকাংশের পক্ষেই সম্ভব হইয়া উঠে না। ফলে বিদ্যামন্দিরের প্রবেশদ্বার আমাদের নিকট রুদ্ধ। আর যারা শক্তির ভীষণ অপচয় ঘটাইয়া এই বাহনকে আয়ত্ত করেন তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধিও কম ক্ষেত্রেই হয়। কারণ অতিরিক্ত ধকলাধকলির ফলে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল ও শক্তিহীন হইয়া তাঁহারা জ্ঞান-দেবতার সত্যিকার পূজারী হইতে পারেন না। অবশ্য এই নিয়মের গুটিকয়েক যে ব্যতিক্রম নাই তাহা নহে—তাঁহারা অসীম শক্তিধর; তাঁহাদের জাত আলাদা। সাধারণের 'মানে' তাঁহারা বিচার্য্য নহেন।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা সাধারণতঃ কি দেখি। প্রথমে পাঠ্য বিষয় আমরা মাতৃভাষায় পড়ি; তৎপর আবার একই বিষয় একটু পড়া ইংরেজী ভাষায় অধ্যয়ন করি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ষষ্ঠ শ্রেণী (class VI) পর্য্যন্ত আমরা এতদিন বাংলায় যে পাটীগণিত শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছি তাহা

বলিতে গেলে প্রবেশিকার সম্পূর্ণ কোর্স—চতুর্থ শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের একটি বিষয় পুনরায় পড়ানো হয়, তবু তফাৎ হইতেছে ইংরেজী সংখ্যা ও ইংরেজী ভাষার। ইতিহাস ও ভূগোলের ব্যাপারও ঠিক এমনই। (অধুনা বিশ্ববিদ্যালয় এই পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়াছেন)। ইহাতে হিসাব করিলে সহজে দেখা যায় যে, সাম্প্রতিক ব্যবস্থায় যে পাঠ্যবিষয় বিদ্যার্থীদের এগার বৎসরে পড়ানো হয়, তাহা ইংরেজী বাদ দিলে সুষ্ঠুভাবে ৭ বৎসরে পড়ানো সম্ভব হয়। শুধু ইংরেজী তাদের জন্য এই চারি বৎসরে লক্ষ লক্ষ ছেলের যে সময়ের অপব্যয় ও মস্তিষ্ক শক্তির ক্ষয় হয়, তাহা ভাবিলে দুঃখ হয়। গতানুগতিকতাকে অন্ধভাবে সাধারণ মানুষ মানিয়া লয়, তাই আজও এই দেশে এই সর্বনাশা বিধি অবাধে বিনা আপত্তিতে চলিয়া আসিতেছে। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই কর্তব্য এবং দায়িত্ব কি উপায়ে জাতীয় শক্তির এই অভাবনীয় অপচয়কে রুদ্ধ করিয়া জাতীয় কল্যাণে ফলপ্রসূ কর্মে নিয়োজিত করা যায়। ইংরেজী ভাষার প্রতি মোহ আজও প্রায় সকল শ্রেণীর মধ্যে অনুভূত হয়। ইহা যে গোলামী মনোভাবমূলক, ইহাতে সংশয় নাই। এই চিন্তাতে কাহারও কাহারও মনে বিরক্তি বা রাগের সঞ্চার হইতে পারে। কিন্তু কথাটা তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়। প্রধানতঃ ইংরেজী ভাষার এত মূল্য ও সম্মানের মূল কারণ এদেশে ইংরাজ শাসন। রাষ্ট্র শাসন ব্যাপারে—চাকুরী, আইন আদালত, সর্বত্র ইংরেজী ভাষার বাধ্যতামূলক চলন। ইংরেজী জ্ঞান ব্যতীত চাকুরী মিলে না, আইন-ব্যবসায়ী হওয়া যায় না এমন কি ব্যবসা ক্ষেত্রেও বহু অসুবিধা। তাই স্বতই প্রশ্ন উঠে বাস্তব প্রয়োজনে ইংরেজী শিক্ষা অপরিহার্য, এই যুক্তি নিঃসন্দেহে আংশিকভাবে স্বীকার্য। কিন্তু বর্তমানে স্থিতিতে যাহা বাধ্যতামূলক, যাহা চালানো—তাহাই ভাল এবং কল্যাণপ্রদায়ক হইবে, ইহাও যুক্তির কথা নহে। উদাহরণার্থ বলা যায় যে, অবস্থাদৃষ্টে আমরা আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার হইতে বঞ্চিত। এই অবস্থা আমরা বাধ্য হইয়া মানিয়া করিতেছি। ইহার প্রতি আমাদের কোনরূপ মোহ বা আসক্তি নাই। পরাধীনমুক্ত হইতে আমরা সদাই উৎসুক এবং তজ্জন্য ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ বরণ করিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও করিতে প্রস্তুত। ইংরেজী ভাষা সম্পর্কে এই অনুসরণ করিয়া চলা উচিত যে ইংরেজী ভাষার এই বাধ্যতা-মূলক চলন আমরা অনন্যোপায় হইয়া সহ্য করিতেছি। বৈদেশিক শাসনের মধ্য দিয়া যেমন সামগ্রিক ভাবে জাতীয় কল্যাণ আনিতে পারেন। মুষ্টিমেয় লোক হয়তো তাহাতে লাভবান হইতে পারে। ঠিক তেমনি বৈদেশিক ভাষা জনগণের ভাষা হইতে পারে না, গুটিকয়েক লোকমাত্র তাহা আয়ত্ত করিতে পারে। নিরন্তর চেষ্টার দ্বারা যেমন আমরা পররাষ্ট্রের পরিবর্তে স্বরাষ্ট্র স্থাপন করিব তেমনি অবিরাম চেষ্টার দ্বারা প্রথম সুযোগেই মাতৃভাষাকে পরভাষার স্থলাভিষিক্ত করিব।

ইংরেজী ভাষা প্রেমিক হয়তো সঙ্গে সঙ্গে এই মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্কীর্ণতাজ্ঞাপক বলিবেন। তিনি সাধারণ চলিত যুক্তির অবতারণা করিয়া বলিবেন এই বিচারে হওয়া উচিত, যে ভাষা গ্রহণীয় কি অগ্রহণীয় তাহা তাহার গুণগত এবং পরিমাণগত সম্পদের বাহুল্য বা স্বল্পতা—ভৌগোলিক সীমার তারতম্য দিয়া নহে। এ যুক্তি নিঃসন্দেহে মনোরম স্বীকার করি। ইংরেজী ভাষা সমৃদ্ধিশালী এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলির অন্যতম তেমনি ফরাসী ভাষা, আর্মাণ ভাষা এবং রোম ভাষাও সম্পদের দিক দিয়া কম নহে, কিন্তু ঐ ভাষাগুলির সঙ্গে পরিচয়ের জন্য আমরা তেমন উৎসুক নহি। বস্তুতঃ বলিতে গেলে প্রত্যেক জাতির নিজ নিজ স্বকীয়তা রহিয়াছে এবং সেই স্বকীয়তা বা নিজস্বতা কেবল মাত্র স্বদেশী ভাষার মধ্য দিয়াই পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি পাইতে পারে। জাতির স্রষ্টা মন (creative mind) স্বাভাবিক ছন্দে মাতৃভাষায় বিকাশ ও পরিবর্তনের সুযোগ পায়। এই প্রসঙ্গে মহাকবি মধুসূদনের কথা মনে আসে। কবিপ্রতিভার প্রথম স্ফুরণের পর্যায়ে তিনি তাঁর দেয় দিতে চাহিয়াছিলেন ইংরেজীতে, কিন্তু সেই ভুল তিনি যেমনি ধরিতে পারিলেন অমনি তাঁহার মুখ দিয়া স্বতঃ নিঃসারিত হইল··· 'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন'। রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভা মাতৃভাষাকে বাহন না করিয়া কি এমন সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গসুন্দররূপে বিকাশ পাইতে পারিত? মানুষের অন্তরের বাণী প্রকাশের যথাযথ উপায় মাতৃভাষা, এই মত তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাই সারা জীবন সেই উদ্দেশ্যে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কেহ বলিতে পারেন যে

রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী ভাষার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন বলিয়াই এত বড় হইয়াছেন। কিন্তু এই কথা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? শ্রেষ্ঠ মনীষীরা বিশ্বে তুলনাহীন সৃষ্টি; তাঁহারা কাহারও অনুকরণ করেন না—আপন ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে তাঁহারা ভাষা ও সাহিত্যকে সম্পদশালী করেন। বিভিন্ন দেশের মনীষীদের উদাহরণ দিলে এই উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হয়। আন্তর্জাতিক মনীষী ও সাহিত্যিক টলষ্টয়, রোলাঁ—কেহ ইংরেজী জানিতেন না অথচ বিশ্বের সম্পদ-ভাণ্ডারে তাঁহাদের অবদান কি বিরাট! আমাদের কেমন যেন ধারণা হইয়া গিয়াছে যে ইংরেজী ছাড়া বিশ্বের দরবারে কাহারও স্থান হইতে পারে না। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। ইংরেজী ভাষাভাষী দেশ ছাড়া রাষ্ট্রনায়কদিগের মধ্যেই বা ইংরেজী কয় জন জানেন? পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ দেশের সর্বনিয়ন্তা ষ্টালিন ইংরেজী জানেন না। অন্যতম বৃহত্তম দেশ চীনের কাণ্ডারী চিয়াংকাইশেকের ইংরেজী জ্ঞান নেহাৎ সামান্য। ফরাসী রাষ্ট্রনেতা গণের ইংরেজী জ্ঞান সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ রহিয়াছে।

আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই নহে যে ইংরেজীর সঙ্গে সর্বতোভাবে অসহযোগ স্থাপন করা। যাঁহারা ইংরেজী সাহিত্য হইতে সম্পদ আহরণে উৎসুক তাঁহারা অবশ্য ঐ ভাষা শিখিবেন। এই মনোভাব সকল আন্তর্জাতিক সমৃদ্ধিশালী ভাষা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। সাত হইতে চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ বুনিয়াদী শিক্ষাকালে ছাত্রছাত্রীদের কোন বৈদেশিক ভাষা শিক্ষার প্রশ্নই উঠে না। উত্তরবুনিয়াদী শিক্ষাকালে—বিদ্যার্থী ইচ্ছা করিলে ইংরেজী শিক্ষা করিতে পারিবে, এবং সেই অধ্যয়নে সত্যিকার আনন্দ পাইবে।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিতে পারে—কেহ কেহ বলিবেন আন্তর্জাতিক ভাবধারার সঙ্গে যোগাযোগ রাখিতে হইলে আমাদিগকে অনন্যগতি হইয়া ইংরেজী ভাষার শরণ লইতে হইবে। চলতি ব্যবস্থায় একথার সত্যতা অস্বীকার করা যায় না, কারণ ইংরেজী পুঁথি পুস্তকের সাহায্যেই প্রতীচ্যের চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয়। কিন্তু অধুনা এই পরিচয় মুষ্টিমেয় লোকের। এই পরিচয়কে সার্বজনীন ও নিবিড় করিতে হইলে তাহা জনগণের ভাষায় জনগণের বোধ্য করিয়া বলিতে হইবে, এবং স্বদেশী ভাষার সাহায্য ভিন্ন ইহা করা অসম্ভব। ইংরেজী শিক্ষার যাঁহারা সুযোগ পাইয়াছেন এই দায়িত্ব তাঁহাদেরই। বিদেশী ভাল ভাল বই মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়া ঐ সব পুস্তকের ভার অবলম্বনে সহজ সরল ভাবে পুঁথি লিখিয়া তাঁহারা তাঁহাদের ইংরেজী ভাষা শিক্ষাকে কিছুটা সার্থকতা দিতে পারেন।

ঘরে বাইরে

শ্রীইন্দিরা দেবী

সেদিন ছুটি ছিল—তাই মিসেস মুখার্জির ওখানে হানা দিলাম। আশঙ্কা করেছিলাম হয়ত নীলুদিকে (মিসেস মুখার্জির নাম) পাব না। যে রকম পাঁচটা কাজে ব্যস্ত থাকেন। পৌঁছতেই সবার আগে একটি কচি মুখ আমায় অভিনন্দিত করলো। নীলুদির ছেলে বুল্টু, এত সুন্দর ব্যবহার, কাছে এসে দাঁড়ালো হাসিমুখে। কতই বা বয়স, বছর দশেক হবে—কিন্তু কি সুন্দর, শুধু দেহে নয় মনে, আঁচারে ব্যবহারে। মা ভালো হলে কি ছেলে এত ভালো হয়? 'আসুন' বলে আহ্বান করলো সে। আমার সঙ্গে দুটি ছোট ছেলে ছিল, ওদের সঙ্গে বুল্টুর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললুম—"তোমরা খেলগে, আমি যাচ্ছি তোমার মা'র কাছে।"

—"মা পড়ার ঘরে!" বুল্টু আমার কথার সাড়া দিয়ে বললো, তারপর ছেলে দুটির হাত ধরে বললো: "চলো আমরা বাগানে লাল মাছ দেখিগে।"

নীলুদিকে অবাক করে দেবার জন্য নিঃশব্দে তার পড়ার ঘরে এসে দাঁড়ালাম। দেখি একরাশ কাগজপত্র টেবিলের ওপর, তার মাঝখানে বিমর্ষ হয়ে বসে নীলুদি: ফিকে লাল রঙের শাড়ীর আঁচল বাতাসে উড়ছে, উড়ছে দীর্ঘ কোঁকড়ানো কালো চুল। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে পড়লাম, নীলুদি কিছুই জানতে পারেননি। চমকে দেবার জন্য ডাকলাম, 'নীলুদি'! ঘাড় ফিরিয়ে আমায় দেখে তিনি হাসলেন, বড় কালো চোখে

এলো উজ্জ্বলতা, ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন : "এলো ! কি সৌভাগ্য আমার।"

বললাম : "থাক্ ! বলি ব্যাপার কি, কার ওপর রাগ করে বসে আছ ? কর্তার ওপর চটেছ বুঝি ?"

—"কি যে বলো ভাই, রাগ আবার করব ঐ মানুষের উপর ? জানো না ত, কাজের সময় উনি একেবারেই আলাদা মানুষ হয়ে যান ! থাক্ সে কথা।"

—"তবে এমনি করে হতাশ প্রেমিকের ভঙ্গী নিয়ে বসে আছ কেন ?"

—"কেন জানো ?" বলে নীলুদি একখানা ছাপানো কাগজ আমার এগিয়ে দিয়ে বললেন : "পড়ো আগে।"

দেখলাম সে-কাগজে লেখা আছে :

"বঙ্গীয় আইন সভার আগামী নির্বাচনে নিম্নলিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন নরনারী ভোট দিতে পারবেন—

(১) যাঁরা ১৯৪৪-৪৫ সালে ইন্‌কাম ট্যাক্স দিয়েছেন।

(২) ১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে যাঁরা অন্তত আট আনা (স্ত্রীলোকদের পক্ষে অন্তত দেড় টাকা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দিয়েছেন।)

(৩) ১৮৪০ সালের সেস এ্যাক্ট অনুযায়ী যাঁরা অন্তত আট আনা (স্ত্রীলোকদের পক্ষে একটাকা) দিয়েছেন।

(৪) যাঁরা অন্তত ছয় আনা (স্ত্রীলোকদের পক্ষে দুই টাকা) চৌকীদারী ট্যাক্স দিয়েছেন।

(৫) যাঁরা ম্যাট্রিক পাশ করেছেন বা হাই-ইস্কুল, মিডল-ইস্কুল বা মাদ্রাসার ষষ্ঠ মান থেকে প্রমোশন পেয়েছেন বা সংস্কৃত আদ্য পরীক্ষায় পাশ করেছেন।

পড়তে পড়তে আমার দম ফুরিয়ে এলো। আমি থামতেই নীলুদি যেন বিরক্ত হলেন। বললেন : "ওকি, থামলে কেন ?"

—"এ যে মহাভারত নীলুদি !"

—"তা হোক সবটুকুই পড়ো। তোমায় পড়া দরকার।"

—"দরকার ?" আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওঁর দিকে তাকালুম।

—"হ্যাঁ দরকার শুধু তোমার নয়, তোমার আমার সকলের। কিন্তু কেন দরকার সেকথা পরে বলছি। এখন বাকীটা পড়ে নাও।"

নীলুদির কথায় আদেশের সুর। আমি পড়তে লাগলাম।

—"যাঁদের বয়স একুশ বৎসর তাঁরা সকলেই নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। শিক্ষার অধিকারে যে কোন লেখাপড়া জানা মেয়ে ভোট দিতে পারবে। ভোটের তালিকায় নাম রেজেষ্ট্রী করবার জন্য, মেয়েদের নিজের নাম, বাবার নাম, কোথায় লেখাপড়া শিখেছেন ইত্যাদি লিখে দরখাস্ত করতে হবে। এই দরখাস্ত কোন ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী এবং একজন গেজেটেড্ অফিসারের সই থাকা দরকার।

প্রচার পত্রিকা পড়া শেষ করলাম আমি। নীলুদি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন : "কি ব্যাপার বুঝতে পারছো ? বাংলার আইন সভায় সাধারণ নির্বাচন হবে। এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা দরকার প্রত্যেক নরনারীর। নাগরিকের প্রধান কর্তব্য এটা।"

—"তাতো বুঝলাম, কিন্তু—" বলে আমি থামলাম।

—"ঐ কিন্তুতেই সব খেয়েছে। নিজেদের অধিকারকে স্বীকার করিয়ে নেবে, নিজেকে ভোট দেবার অধিকারী করে তুলবে, নির্বাচনের সময় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে,যাতে যোগ্য লোক নির্বাচিত হয়—অযোগ্য লোকের পরিবর্তে। দেশের মঙ্গল কর্মে অংশ গ্রহণ করতে গিয়েও তোমার মত অনেকেই এই কিন্তু বলে থেমে যাচ্ছে। নিজেদের অধিকার নিজে অধিকার করে নেবে, সেখানেও এই 'কিন্তু' ?"

—"নির্বাচনে মেয়েরা ভোট দিতে পারবে ?"

—"হ্যাঁ, ভোট দিতে গেলে আগে থেকে নিজেদের 'ভোটার লিষ্টে' নাম রেজেষ্ট্রী করে নিতে হয়। কি কি যোগ্যতা থাকলে ভোট দেবার অধিকারী হতে পারা যায় সেত তুমি এখুনি পড়লে।"

—"পড়লাম তো। কিন্তু কেবল ট্যাক্স বা কর দেবার কথা রয়েছে এতে। পুরুষেরা কর দেয়, কিন্তু এদেশে ক'টা মেয়ে ইনকাম ট্যাক্স দেয়, চৌকিদারী, মিউনিসিপ্যালিটির কর দেয় বলো তো ?"

—"আর মেয়েরা কর নাই দিল তাতে কি হয়েছে, তবু মেয়েরা ভোট দিতে পারে যদি তাদের বয়স একুশ বছর হয় এবং লিখতে পড়তে জানে। শিক্ষার অধিকারে মেয়েদের ভোট দেবার অধিকার আছে। এটাই বা কি কম কথা?"

—"শুধু শিক্ষার অধিকারে?" জিজ্ঞাসা করলাম।

—"হ্যাঁ, যে মেয়ে ইনকামট্যাক্স বা চৌকিদারী ট্যাক্স দেয়, সে মেয়ের কথা ছেড়েই দেওয়া গেলো। কিন্তু শুধু যে লিখতে জানে, নাম সই করতে জানে, পড়তে জানে—এই শিক্ষার অধিকারে মেয়েরা ভোট দিতে পারবে, নির্বাচন ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করতে পারবে। এ কি কম কথা? তবে দেখো দেখি ইংলণ্ডের কথা। এমন একদিন ছিল—সেখানেও মেয়েদের ভোট দেবার অধিকারকে 'অধিকার' বলে গ্রহণ করবার জন্য ইংলণ্ডের মেয়েরা কত আন্দোলন করেছিল। ঠিক আমাদের মতই অবস্থা। সামাজিক অক্ষমতা দূর করবার জন্য মেয়েদের এগিয়ে আসতে হবে।"

ভয়ে ভয়ে বললাম: "এগিয়ে তো এসেছে।"

—"এগিয়ে এসেছে কোথায়! এখনো তারা পড়ে আছে অনেক পিছনে। এই জন্যই তো বসে বসে চুপ করে ভাবছিলাম।"

নীলুদি চুপ করলেন। সুন্দর মুখখানা আবার দুঃখে ম্লান হয়ে গেল।

—"জানো সেই সকালে বেরিয়েছিলাম, এই একটু আগে ফিরেছি—সারা দিন খাওয়া হয় নি প্রত্যেক ঘরে ঘরে ঘোরে ঘোরে গিয়েছি ভোটার হবার ফর্ম নিয়ে। সাধারণ শিক্ষার অধিকারে সব মেয়েদের ভোটার তালিকাভুক্ত করবো এই আমার সঙ্কল্প। যারা লেখাপড়া জানে অর্থাৎ যারা পড়তে ও নিজেদের নাম সই করতে পারে তাদেরই হাতে তুলে দেবে তাদের অধিকার।"

—"তাহলে সারাদিন কি কষ্টই না গেছে তোমার?" সান্ত্বনা দিয়ে বললাম।

—"কষ্ট!" নীলুদি হাসলেন, ম্লান হাসি দুঃখ ও বিষাদ ভরা।

—"কষ্ট বলে কিছুই মনে করতাম না যদি সফল হতাম নিজের কাজে। যেখানেই গেছি, বুঝিয়েছি মেয়েদের, বুঝিয়েছি নাগরিক অধিকার পুরোপুরি নেবার জন্য, স্বাধিকার নেবার জন্য ভোটার শ্রেণীভুক্ত হওয়া দরকার। কাকে ভোট দেবেন কি না দেবেন সে প্রশ্ন পরে, আগে অধিকারকে গ্রহণ করুন, তারপর সে অধিকার বাস্তব কাজে লাগাবেন। দু'একজন সই করে দিয়েছেন, বাকী যারা তাঁদের কথা: কি হবে ভোটার হয়ে? উনি আসুন জিজ্ঞাসা করি ইত্যাদি। জনসাধারণের, বিশেষ করে মেয়েদের, কোন সাড়া নেই। জানো এক জায়গায় গেছি, মস্ত বড় লোক, মেয়েদের সঙ্গে কথা কইলাম। ফর্ম ভর্তি করে সই করে দিয়ে বল্লেন: ভোট দেবার সময় গাড়ী পাঠাবেন তো?.....আমি হেসে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলাম। নিজ অধিকার নেবে, নিজ স্বার্থ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তা দেখবে সেখানে তাদের গাড়ী পাঠাতে হবে। যেন আমারই দায়, আমারই কাজ। এজন্য তারী দুঃখ হয়".....বলতে বলতে নীলুদির চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো।

রাজার ঝিয়ারী অচেতন ঘুমঘোরে

শ্রীঅমিয়ভূষণ মজুমদার

স্বর্ণ প্রদীপ নিভেছে বাসর ঘরে।
রাজার ঝিয়ারী অচেতন ঘুমঘোরে।
কুসুমলেখা—বুকে,
গলিত বকুলে কাঁদিছে গন্ধ আকুল অন্ধ শোকে।

অভিমানহত নিরব নিভৃত বিস্মরণের তলে
ধূলিময় বীন; বীনকার নাহি কেহ
নয়নে যাহার শাওন গহন স্নেহ
তরুণ সে বীনকার
আসিবে আর বার।

জ্যান্ত-মড়া

শ্রীসৌম্যেন গঙ্গোপাধ্যায়

পাড়ায় কোন একটা লোক মরলে হয়! অমনি আমাদের যেতে হবে মড়া পোড়াতে। এটা যেন আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়ে গেছে। আর সেই কারণেই কে যে কখন এবং কোথায় মরছে—খবরটা আগে এসে পৌঁছত আমাদের কাছেই। সব কাজ ফেলে ছুটে যেতাম তখনই—যেন মহা উৎসবের ব্যাপার। ব্রাহ্মণ কায়স্থের অভাব ছিল না আমাদের মধ্যে। ব্রাহ্মণের মড়া হ'লে তারাই কাঁধ দিত, আর কায়স্থ শূদ্র হ'লে তো কথাই নেই—যারা আগে খবর পেত তারাই ছুটে যেত।

সেদিন তখন প্রায় ভোর চারটে হবে। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল আমার; কে যেন ডাকছে—'বাবু ও বাবু, একবার দরজাটা খুলেন!" চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে উঠে দরজা খুলে দিই, দেখি গোপাল বাবুদের চাকর। শুধালুম তাকে—'কিরে, নিধে, কি ব্যাপার এত ভোরে?' সে বললে হাঁপাতে হাঁপাতে—'আমাদের বাবু মারা গিছেন গো, আপনি আসুন শিগ্‌গির করে।' চোখ থেকে আমার ঘুম ছুটে গেল এক মুহূর্ত্তে, 'কি বল্‌লি, তোদের বাবু মারা গেছেন?'—বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি তাকে। সে এবার চেঁচিয়ে উঠে বললে—'বলি হাঁ গো হাঁ, ত্যাখন প্রায় তিনটে রাত হবে, ডাক্তার বাবু অ্যাৎখন্ বলে বলে চলে গেলেন এই মাত্তর। আপনি আসুন গো তাড়াতাড়ি।' —'আমি যাচ্ছি এখুনি, তুই যা'। তাকে বিদায় দিয়ে ভাবলুম—যখন মারাই গেছেন, তখন আর তাড়াতাড়ি করে হবে কী, আরও দু'চার জনকে ডেকে নিয়ে যাই।

পাড়ার এম্-ই স্কুলের বাংলার মাষ্টার—গোপালবাবু। ছোটবেলায় তাঁর কাছে পড়েছিলুম। আর সেই কারণেই রাস্তায় দেখা হলে হাত দু'টো কপালে ঠেকাতে বাধ্য হতুম এখনও পর্য্যন্ত। চমৎকার লোক ছিলেন তিনি। স্কুলের অন্যান্য মাষ্টারদের চেয়ে তাঁকেই আমাদের পছন্দ হত বেশী। কারণ ছেলেদের মারা অভ্যাসটা তাঁর মোটেই ছিল না। তা' ছাড়া ক্লাসের "সেরেও বয়" হিসাবে ভালবাসাটাও তাঁর পেয়েছিলুম একটু অতিরিক্ত মাত্রায়। এখন যেন বুঝতে পারতুম, জীবনে এই ভালবাসা জিনিসটাকে তিনি সীমাবদ্ধ করতে চাননি কখনও। প্রায় মাসখানেক আগে তাঁর সঙ্গে রাস্তায় একবার দেখা হয়েছিল, কি একটা কথা প্রসঙ্গে তিনি সেদিন বলেছিলেন আমাকে—'দেখ বাবা, ঐ যে ভালবাসা কথাটা তোমাদের মুখে মুখে প্রায়ই শুনতে পাই, ওটা কিন্তু বড় দামী জিনিস, অন্তরের সবচেয়ে বড় সম্পদ। ভগবান যতখানি ভালবাসা করে দিয়েছেন তোমাদের বুকে তারি স্বাভাবিক ও স্বচ্ছ ধারা ঢেলে দিতে চেষ্টা কোরো এই দুর্ভাগা দেশবাসীদের হৃদয়ে। প্রকৃত আন্তরিকতার অভাবেই আজ আমাদের দেশের এই অবস্থা। বিদেশীর কাছে ও জিনিসটা আশা করা বৃথা; কিন্তু নিজেদের কাছ থেকে নিজেরা বঞ্চিত হব কেন বল তো?'

রাস্তায় দেখা হ'লে এই ধরনের কত কথাই তিনি বলতেন আমাকে। শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুয়ে আসতো তাঁর কাছে। ...

গোপালবাবু সম্বন্ধে আরও কত কথা জেগে উঠ্‌তে চাইছিল মনের মধ্যে, সেগুলোকে সরিয়ে দিয়ে চলার বেগটা একটু বাড়িয়ে দিলুম।

গোপালবাবুর কাজ শেষ করে তখন বাড়ী ফিরছি—নটা বেজে গেছে। অন্যান্য বন্ধুরা যে যার বাড়ীর রাস্তা ধরেছে, কারণ এই সময়টার সকলেরই ব্যস্ততার সীমা থাকে না। বাড়ীর দরজায় পা দিয়েছি এমন সময় পিছন থেকে কে যেন নাম ধরে ডাকলে আমাকে—'ফণীবাবু, ও ফণীবাবু!' ফিরে তাকালুম পিছনে। কিছু দূরে একটা বাড়ীর রকে বসে এক ভদ্রলোক, সেই ডাক্‌ছে আমাকে। লোকটাকে প্রায়ই ঐ রকটায় বসে থাকতে দেখি। তবে ও যে কে অথবা কি যে করে তা' জানি না। কিন্তু ও আমার নাম জানলো কি করে! সোজা তার সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলুম—'ডাকছেন আমাকে?' বেশ গম্ভীর স্বরে উত্তর এলো—'হাঁ, ডাকছি, একটু প্রয়োজন আছে।'

লোকটাকে দেখলে মনে হয় জীবনের মধ্যে একটা দারুণ

দুঃখ কষ্টের বোঝা সে বয়ে চলেছে। চেহারার মধ্যেও তার একটা ছাপ সুস্পষ্ট। পরনে ছেঁড়া আধময়লা একটা কণ্ট্রোলের ধুতি, গায়ে বোতামহীন একটা পাঞ্জাবী, গলার কাছ থেকে বুকপকেট পর্যন্ত ছিঁড়ে গেছে তার। খালি পা, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, কতদিন যে তেল দেয় নি মাথায় বলা কঠিন। একটু কুণ্ঠিত স্বরেই প্রশ্ন করলুম—'কি প্রয়োজন আমাকে'? সে বললে—'হাঁ, জিজ্ঞেস করছিলুম গোপালবাবুকে পুড়িয়ে এলেন তো?' আশ্চর্য্য, এ যে গোপালবাবুকেও চেনে দেখছি! ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিলুম—হাঁ। এবার একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বললে সে—'কাজটা কিন্তু ভাল করেন নি!' মনে হ'ল লোকটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ, তা না হ'লে এমন অদ্ভুত কথা বলবে কেন! একটু হেসে উঠে বললুম—'মারা গিয়েছিলেন যে, পোড়াব না!' 'মারা গিয়েছিলেন—ও—তাহলে ভালই করেছেন;' একটু থেমে সে আবার বললে—'আপনাকে কিন্তু আমার আর একটা কথা বলার ছিল—ফণীবাবু।'

—'কি কথা, বলুন।'

—'জিগ্‌গেস করছিলুম—জ্যান্ত মড়া পুড়িয়েছেন কখনও?'

এ আবার কেমন প্রশ্ন! লোকটা নিশ্চয়ই পাগল। খুব হাসি পেল তার কথা শুনে। আমাকে এ রকম হাসতে দেখে লোকটা একটু জোর গলায় প্রশ্ন করল—'হাসছেন যে!'

—'হাসবো না, আপনার যেমন কথা! জ্যান্ত মড়া আবার পাব কোথায়; দিতে পারেন দু'একটা জোগাড় করে? তাহলে নয় চেষ্টা করে দেখতে পারি।' লোকটা যেন লাফিয়ে উঠলো আমার কথা শুনে, বললে—

—'পারবেন, পারবেন পোড়াতে, যদি এনে দিতে পারি জ্যান্ত মড়া!'—'ঐ তো বললুম, চেষ্টা করে দেখতে পারি। কিন্তু এ ধরনের মড়া আপনি পাবেন কোথায়?'—এবারেও একটু উপহাসের সুর বেজে উঠলো আমার কথায়। চোখ দু'টো বড় বড় করে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে, তারপর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললে—'না মশাই, খুঁজতে যেতে হবে না কোথাও। দেশের মধ্যে তো জ্যান্ত মড়ার অভাব নেই। এই ধরুন আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে একটা মড়া কথা বলছে। বলুন—পারবেন কি আমাকে পোড়াতে?' এবার একটু ভয় হ'ল আমার, লোকটা সত্যিই পাগল! তার সঙ্গে আর কথা না বলে বাড়ীর দিকে রওনা হলুম। আমাকে চলে যেতে দেখে লোকটা চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—'কি মশাই, চলে যাচ্ছেন যে বড়! বলে যান পারবেন কি না?'

আমি তখন প্রায় বাড়ীর দরজার কাছে এসে পড়েছি।

বাড়ী এসে মনে হল—লোকটা কিন্তু একটা বেশ দামী কথা বলেছে তার পাগলামীর ভেতর। সত্যিই তো আজ দেশের মধ্যে জ্যান্ত মড়ার অভাব কোথায়? আজ যে শত শত নর-নারী খেতে না পেয়ে, পরতে না পেয়ে কঙ্কালসার আর উলঙ্গপ্রায় হয়েছে, তারা তো সকলেই এক একটা জ্যান্তমড়া। তাদের মধ্যে লজ্জা সরম বলে আর কিছু নেই, মায়া-দয়া একেবারে লোপ পেয়েছে হৃদয় থেকে, শুধু বুকের ক'খানা পাঁজরের মধ্যে দিয়ে এখনও হাতুড়ি ঠোকার শব্দ শোনা যায় —ঠকাঠক্—ঠকাঠক্। এই তো দু'দিন আগে হাজার হাজার মড়াকে মরতে দেখলুম সহরের রাস্তায় রাস্তায়,—'ডাস্টবিনে'র ধারে, ফুটপাথের পাশে, আরও কত জায়গায়। এখন যে কত মরছে তার আর কে খোঁজ রাখে! তারাও তো এসেছিল এই জগতে বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার নিয়ে; যতদিন তাদের পরমায়ু আছে ততদিন মানুষের মত বেঁচে থাকার অধিকারও আছে তাদের সবারকারই। তবু তারা আজ সে অধিকার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু মানুষ হয়ে যারা আজ মানুষের এই জন্মগত অধিকারকে অস্বীকার করেছে, মানুষের বেঁচে থাকার দাবীকে ক্ষুণ্ণ করেছে, তাদের হৃদয়হীন প্রাণে একটা আঁচড়ও লাগতে দেখি না। স্বার্থ ছাড়া আর কিছু তারা বোঝে না, বুঝতে চায় না। আর এই স্বার্থের জন্যই একটা পরাধীন দেশের মানুষগুলোকে এরা মেরে ফেলেছে। কিন্তু তবু এই জাতটা যেন অমর, কিছুতেই মরতে চায় না; মরেও বেঁচে আছে, এদের এই হৃদয়হীনতার সাক্ষী দিতে। লোকটা তাহ'লে……

—'ফণীবাবু, ও ফণীবাবু, চ'লে এলেন কেন? জবাব দিন আমার এ প্রশ্নের—পারবেন কি আমাকে পোড়াতে?'

এই রে! লোকটা আমার বাড়ী পর্য্যন্ত ছুটে এসেছে, আচ্ছা

পাগলের হাতেই পড়া গেছে! এবার মেজাজটা একটু গরম করে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। চড়া গলায় বললুম তাকে—'দেখুন, আপনার সঙ্গে পাগলামী করার মত সময় নেই আমার। আপনি চলে যান এখান থেকে,—এক্ষুণি চলে যান।' মাথাটা একটু নিচু করে দরজার একপাশে সে দাঁড়িয়েছিল। আমার কথা শুনে মাতালের মত, জড়ান স্বরে সে বললে—'চলে তো যাব, কিন্তু আপনি বলুন আমাকে পোড়াতে·····।' বাকী কথাগুলো তার মুখ থেকে আর বেরুল না; টলতে টলতে পড়ে গেল ফুটপাথের ওপর। চেয়ে দেখি চোখ দুটো তার যেন জবা ফুলের মত রাঙ্গা হয়ে উঠেছে। কী করি এখন! ঘর থেকে এক ঘটী ঠাণ্ডা জল এনে মাথায় দিতে লাগলুম। কিন্তু চোখের রংএর পরিবর্ত্তন হওয়া দূরে থাক্, পাতা দুটোও আস্তে আস্তে বুঁজে এল। আমার তো বুকের ভিতর কাঁপছে তখন, একে দেরী হয়ে গেছে কলেজের, তারপরে এই বিপদ! কোন রকমে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলুম তাকে খাটের ওপর। রাস্তায় অনেক লোক দাঁড়িয়ে গেছে এর মধ্যেই। মুখে আর একটু জলের ঝাপ্টা দিয়ে হাওয়া করতে লাগলুম। হঠাৎ ভীড়ের মধ্য থেকে কে একজন বলে উঠলো—'কি হ'ল লোকটার মশাই? গতিক্ তো বড় ভাল বুঝছি না? ভূপেন ডাক্তারকে একবার ডেকে আনবো নাকি?' একটু কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বললুম—'যদি আনেন তো বড় উপকার করা হয়, দেখুন না একটু।'

দু' একটা বাড়ীর পাশেই ভূপেনবাবুর ডাক্তারখানা। এ পাড়ার পুরাণো ডাক্তার তিনি। সুচিকিৎসার জন্যে নাম ডাকও আছে বেশ।

একটু পরেই ভূপেনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সেই অচেনা ভদ্রলোকটি ঘরে ঢুকলেন।

—'কি খবর ফণীবাবু, এ লোকটাকে আবার কোত্থেকে আনলেন? আরে, একে যে প্রায়ই যতীনদের বাড়ীর ঐ রকটায় বসে থাকতে দেখি, কি হ'ল এর?'—ভূপেনবাবু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে প্রশ্ন করলেন।

—'আর বলেন কেন ডাক্তারবাবু, সকাল থেকে এর পাল্লায় পড়ে আজ যেন হার্টফেল্ করবার জোগাড়; কলেজ যাওয়াও তো ঘুচে গেল আজকে।' খুব সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলুম ভূপেন বাবুকে। তিনি কিন্তু বিশেষ আশ্চর্য্য হলেন না। লোকটাকে ভাল করে পরীক্ষা করার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—'আপনার ভাগ্য ভাল, ফণীবাবু।' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম—'কেন বলুন তো?' 'কেন আর, লোকটাই হার্টফেল্ করেছে, আপনাকে আর করতে হবে না।'

—'হার্টফেল্ করেছে! বলেন কি ডাক্তারবাবু, হার্টফেল্ করেছে!!'

—'হাঁ, হার্টফেলই করেছে। মাথাটা এর আগে থেকেই একটু বিগড়ে ছিল। হঠাৎ একটা মানসিক উত্তেজনায় রক্ত উঠে গেছে মাথায়।'

—'তা হলে উপায়?'

—'উপায় আর কি! সকালে গোপালবাবুকে যা' করে এলেন এরও তাই বন্দোবস্ত করুন। কিন্তু তার আগে পুলিশে একটু খবর দিন; নয়তো আবার ঝুক্কিতে পড়বেন।' একটু থেমে ভূপেনবাবু আবার বলতে থাকেন—'দেশের মধ্যে এই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সম্প্রদায়ের অবস্থাটাই বড় শোচনীয় হয়েছে, ফণীবাবু। অভাবের তাড়নায় ভিক্ষা চাইতেও এদের আত্মসম্মানে ঘা লাগে, তাই এদের ওপরেই দারিদ্র্যের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। যতদিন না দেশের এই সর্ব্বনাশা বিধিব্যবস্থার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্ত্তন দেখা দিচ্ছে—ততদিন এদেরও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এই একই তালে চলতে থাকবে।··· কিন্তু থাক্ সে কথা, আমি উঠি এখন।'—

নমস্কার জানিয়ে বিদায় দিলুম ভূপেনবাবুকে।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শবদেহটা পড়েছিল পুলিশের ভাঁড়ারকে। কিন্তু যখন তার আত্মীয়স্বজনের কোনই খোঁজ পাওয়া গেল না, তখন আবার তাকেও কাঁধে তুলতে হ'ল কয়েকজন বন্ধু মিলে। পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর সহানুভূতি প্রকাশ করে বললেন—'কেন আর মশাই আপনারা কষ্ট করবেন, দিয়ে দিন না হিন্দুসৎকার সমিতির হাতে।' অনেক অনুরোধ জানিয়ে তাঁকে বললুম আমি—'এ রকম কত শত মড়াকেই তো আপনারা তুলে দিয়েছেন হিন্দু-সৎকার সমিতির হাতে, এটাকে আজ আমাদের হাতেই ছেড়ে দিন দয়া করে।'

সহৃদয় ভদ্রলোক দয়া ক'রতে কুণ্ঠিত হলেন না। একটা পুলিশও দিয়ে দিলেন আমাদের সঙ্গে। এবার কিন্তু হরিবোলের এক অক্ষরও বেরুল না মুখ থেকে। বুকের ভেতরটা একটা অজানা ব্যথায় গুমরে উঠতে লাগ্‌লো।

হোমাগ্নি

(উপন্যাস)

শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কাজ করিতেও চন্দ্রবাবুর ভাল লাগিতেছিল না। মনে যেন খানিকটা গ্লানি ও তিক্ততা জমিয়া অবসন্নতা আসিয়াছে। কি লাভ হইল মাষ্টারদের ক্ষুব্ধ করিয়া? কেহ মুখে তাঁহার সহিত এ লইয়া আলোচনা করিবেন না বটে, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া যে ক্ষোভ তাঁহারা নিজের মনে সৃষ্টি করিলেন তাহা সহজে ভুলিতে পারিবেন না। মুখে প্রকাশ করিতে না পাইয়া ঐ ক্ষোভ মনের পাক খাইয়া অবিরাম কুটিল চিন্তার জন্ম দিবে; আর তাহাই তাঁহার সহিত ব্যবহারের সমস্ত প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাদের চোখের দৃষ্টিতে, চলায়, সহজ কথার কুটিল টানে অতি প্রকট হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে। আর কালি বাবু! থাক—তিনি সমস্ত শিক্ষক হইতে একটু স্বতন্ত্র; তিনি কি ভাবে কি করিবেন, বলিবেন তাহা তিনি জানেন না। তবে অন্য সকলের মত তিনি অসহায় মনোভাবের লোক নন। কি লাভ হইল তারণবাবুকে রাখিয়া? ইহাদেরই সহিত যখন তাঁহার কর্ম্মজীবন জড়িত তখন ইহাদের আঘাত করার ফল ভাল হইবে না। তারণবাবুকে রাখায় যে একটি সংকাজ হইয়াছে, তিনি যে উপযুক্ত শিক্ষক,—তাহাতে সন্দেহ নাই। আনন্দময়ের একটি অনুরোধ রাখিতে পারিয়া তিনি যে বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন তাহাও ঠিক। কিন্তু তাহার বদলে যে তিক্ততার সৃষ্টি হইল তাহাতে লাভের চেয়ে লোকসানের অঙ্কটাই বড় হইয়া দাঁড়াইল। তিনি কলমটা রাখিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন। ঘরখালি, বাহিরে মাঠে ছেলেরা হৈ চৈ করিতেছে। দরজার দিকে তাকাইতেই দেখিলেন একটি ছেলে দাঁড়াইয়া। তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাঁহার কি টিফিনের সময়ও বিশ্রাম নাই! ইহারা কি টিফিনের সময়ও বিশ্রাম করিতে দিবে না? তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—কি চাই? 'কি চাই' সেটাও কল্পনা করিবার চেষ্টা করিলেন। হয় তো কাহারও সঙ্গে মারামারি করিয়াছে, কি ঝগড়া হইয়াছে, তাহারই নালিশ করিতে আসিতেছে।

ছেলেটি ততক্ষণে তাঁহার চেয়ারের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার উত্তর চন্দ্রবাবুর সমস্ত কল্পনাকে মিথ্যা করিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল—আমি হেড মাষ্টার মশাইয়ের কাছে এসেছি? তিনি কোথা?

চন্দ্রবাবু ঈষৎ চকিত হইয়া তাহার দিকে চাহিলেন। তাহা হইলে ছেলেটি এ স্কুলের ছেলে নয়, এ গ্রামেরও নয়, হয়ত এ অঞ্চলেরও নয়। বছর পনের বয়স হইবে, তাহার কম নয়, তাহার বেশীও হইবে না। ঠোঁটে অল্প গোঁফের রেখা। তিনি উত্তর দিলেন—আমিই হেড মাষ্টার। কি চাই?

অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে হেঁট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তারপর বলিল—আমার বাড়ী এখান থেকে দূরে মাষ্টার মশায়। কাশী থানার মউলো। এখান থেকে আট কোশ! আমি সেখানে মাইনর স্কুলে ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়তাম। বাবা ছাড়া আমার আর কেউ নাই। আমাদের অবস্থাও ভাল নয়। বাবার সঙ্গে আমাদের হেড মাষ্টারের ঝগড়া হয়েছিল, বাবা তাই আমাকে স্কুল ছাড়িয়ে দিলেন। বাবা এখানকার বাবুদের গোমস্তার কাজ পেয়ে আজ ভোরে বাড়ী থেকে গিয়েছেন। আমিও চলে এলাম এখানে, এখানকার স্কুলের আর আপনার নাম শুনে। ছেলেটি সমস্ত বক্তব্য অল্প কয়েকটি কথায় শেষ করিল। বাঃ, খাসা বলিবার ভঙ্গি তো! বলিবার সময় আবার মাথাটা পিছন দিকে হেলাইয়া সারাক্ষণ অন্যপক্ষের মুখের উপর স্থির ও উজ্জ্বলভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখে। কথা বলিবার সময় বড় বড় চোখ দুইটা বিস্ফারিত হইয়া উঠে। তাঁহার বড় ভাল লাগিল। তিনি তাহাকে দেখিতেছিলেন। এ বেশে এমন শক্ত মোটা মজবুত কাঠামো দেখা যায় না। পনের বছর বোধহয় বয়স। তবু ইহারই মধ্যে সমস্ত শরীর সবল স্বাস্থ্যে পরিপূর্ণ। দেহ এখনও সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই। তবু চওড়া কপাল, জোড়া ভ্রূ, তাহার নীচে বড় বড়

তাদের ভাসা চোখে একটা অদ্ভুত চরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছে। নাকটা টিকালো, কিন্তু নীচে একটু বেশী ফাঁকা। পুরু ঠোঁট। সামনের দাঁত দুইটা বোধ হয় যত বড় তত উঁচু। উপরের ঠোঁটটা উঁচু হইয়া আছে। কালো রং। অনেক দিন বোধ হয় ভাল করিয়া বিশ্রাম ও আহার পায় নাই; তাহার উপর পথশ্রমে ক্লান্ত। যেন একটা কালো কষ্টিপাথরের বিশাল সৌষ্ঠবহীন দেহে অনেক দিন ধরিয়া তেল জল পড়ার অভাবে সেটি অচিক্কণ ও রুক্ষ হইয়া পড়িয়া আছে। তবু তাহার রূপের প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে ভ্রম হয় না। চন্দ্রবাবু রীতিমত উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার জন্য কি করতে পারি?

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—আমায় আপনার স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা করে দেন। মাইনে তো আমি দিতে পারব না। কোথাও কোন দীনতা নাই, জড়তা নাই; অতি সহজভাবে আপনার অভাবের কথা সে ব্যক্ত করিল। সত্যই ছেলেটি অভাবী। গায়ে একটা অতি পুরাতন ছলকাচা শার্ট, হাতটা বোধ হয় ছেঁড়া, তাই আস্তিন পর্য্যন্ত গুটান। পরনে তাঁতে বোনা একটা মোটা লালপাড় ধুতি, পা পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই। অবশ্য ছেলেটিও লম্বা অনেকটা। পায়ের যতখানি উপর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে ধূলায় ভর্ত্তি, পা খালি। অভাবের চিহ্ন সর্ব্বাঙ্গে। কিন্তু স্বভাবে সে অভাবের কোন চিহ্ন নাই। চন্দ্রবাবু শিক্ষকতার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রথম সাক্ষাতে কোন ছাত্রকে এত সহজে আলাপ করিতে দেখেন নাই। কিন্তু ছেলেটির সম্পর্কে পরিচয় কি? নাম কি? বাঁধাধরা প্রশ্নগুলোই জিজ্ঞাসা করিতে তুলিয়াছেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন—

—তোমার নাম কি?

—শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।

—আচ্ছা তোমার নামের মানে কি জান?

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের হাসি ফণির ঠোঁটে দেখা দিল, বলিল—সাপের রাজা, বাসুকী।

—তুমি রামায়ণ মহাভারত পড়েছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—রামায়ণ মহাভারত কে লিখেছিলেন তুমি জান?

—জানি। রামায়ণ লিখেছিলেন বাল্মীকি, আর মহাভারত বেদব্যাস। মহাকাব্য দুটি সংস্কৃতে রচিত। বাংলায় কবি শিরোমণি কৃত্তিবাস রামায়ণের ও কাশীরাম দাস মহাভারতের অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশ করেন। সে একেবারে পাঠ্যপুস্তকের ভাষায় বলিয়া গেল। বলিতে কেমন ভাল লাগিতেছিল না, মনে হইতেছিল—অন্যভাবে বলিতে পারিলেই যেন ভাল হয়। কিন্তু আর ভাল করিয়া বলিবার কায়দা তাহার জানা নাই। চন্দ্রবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন—

—কোন ক্লাসে পড়তে?

—বললাম তো, মাইনর ফার্ষ্ট ক্লাসে।

—তোমার বাবার নাম কি?

—শ্রীগোবিন্দপদ রায়।

তারপর আরও কয়েকটা প্রশ্নের পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—তা হলে—?

ফণিই তাঁহার কথা শেষ করিয়া দিল—আমাকে ফ্রি করে দেন, যাতে মাইনে না লাগে। আমার তো মাইনে দেবার শক্তি নাই। আর থাকবার খাবার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

খাইবার কথা বলিতেই চন্দ্রবাবুর মনে হইল ছেলেটি কি খাইয়াছে! তিনি প্রশ্ন করিলেন—তুমি খেয়েছ?

নিঃসঙ্কোচে ছেলেটি বলিল—আজ্ঞে না, আর কিছু খাই নাই। তবে না খেলেও কিছু অসুবিধা হবে না। আমার অভ্যাস আছে। উত্তর শুনিয়া চন্দ্রবাবু অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর নিজে উঠিয়া গিয়া চাকরকে ডাকিলেন। এবং বোর্ডিংএর হাঁড়িতে ভাত আছে কিনা জানিতে বলিলেন। যদি না থাকে তবে বাজার হইতে আনাইয়া দিতে বলিলেন। ফণি প্রতিবাদ করিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চন্দ্রবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। ছেলেটির শক্ত মুখখানা কেমন কেমন দেখাইতেছে, উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। এমন সময় চাকর আসিয়া সংবাদ দিল—ভাত আছে। যে খাইবে তাহাকে সে ডাকিতে আসিয়াছে। চন্দ্রবাবু ছেলেটিকে বলিলেন—যাও। খেয়ে এস। খাওয়া হয়ে গেলে এইখানেই আসবে। ফণি চাকরের পিছন পিছন চলিয়া গেল;

যাইবার সময় শুধু একবার পিছন ফিরিয়া চন্দ্রবাবুকে দেখিয়া লইল। চন্দ্রবাবুর মনে পড়িল—কয়েক দিন আগে ঘন অন্ধকারের মধ্যে লণ্ঠনের অল্প আলোকে তারণবাবুর চোখেও এই দৃষ্টি দেখিতে পাইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর মন শক্ত হইয়া উঠিল। কোন ছাত্র কাজ করার, কোন দুঃস্থ লোকের উপকার করার ফলে যদি অকারণ ক্ষোভের উদ্ভব হয় তাহা তিনি সহ্য করিবেন, তাহার প্রতিবাদ করিতে তিনি ভয় পাইবেন না বা সঙ্কুচিত হইবেন না। টিফিন শেষ হইয়া আসিল। কেরাণী বংশীবাবু আসিয়া আপনার জায়গায় বসিল। চন্দ্রবাবু উঠিলেন। বলিয়া গেলেন—তারণবাবু আসিলে যেন তাঁহার ঘরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

তারণবাবু তাঁহার ঘরে যাইবামাত্র তিনি বলিলেন—দেখুন তো তারণবাবু, বোর্ডিংএর রান্নাঘরে একটি ছেলে থাকে। তার খাওয়া হলে তাকে এখানে আমার ঘরে নিয়ে আসুন তো। তারণবাবু বাহির হইয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই ফণিকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ফণি তাহার ময়লা কাপড়ে মুখের জল মুছিতে মুছিতে আসিয়া হাজির হইল। তাহার দৃষ্টি তখন কোমল হইয়া আসিয়াছে। চন্দ্রবাবু প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন—তা হ'লে এখানে তুমি পড়বে? তোমার পড়বার থাকবার খাবার ব্যবস্থা আমি করে দেব। কিন্তু তুমি তার বদলে আমাকে কি দেবে?

ফণি প্রশ্ন না বুঝিতে পারিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কি বলিবে সে? হেড মাষ্টার মশায় কি চাহেন তাহার কাছে?

চন্দ্রবাবু প্রশ্নটাকে আরও সহজ করিলেন—তোমাকে আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে তুমি ভাল করে পড়াশুনো করবে। আর ভালভাবে শুদ্ধভাবে থাকবে। ফণি ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

অকস্মাৎ চন্দ্রবাবু বলিলেন—আচ্ছা, তোমার মাইনর ফার্ষ্ট ক্লাসের ষ্ট্যাণ্ডার্ডে ফিফ্‌থ ক্লাসে ভর্ত্তি করে নেব। তুমি পাশ করতে পারবে তো?

ফণি এবার হাসিল, তারপর বলিল—আমি ফার্ষ্ট হব আপনি দেখবেন।

ফণির এই উদ্ধত অহঙ্কৃত জবাবে চন্দ্রবাবু ও তারণবাবু দুইজনেই বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন। তবু কৌতূহলও হইল।

চন্দ্রবাবু আবার তাহার পুনরায় প্রতিশ্রুতি লইলেন—ঠিক?

—দেখবেন। অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে ফণি উত্তর দিল।

চন্দ্রবাবুর ছেলেটিকে ভাল লাগিয়াছে। তিনি কাগজ কলম টানিয়া একখানা চিঠি লিখিলেন আনন্দময়কে। সেখানা তারণবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন—ওকে আপনি ছুটির পর আনন্দবাবুর কাছে নিয়ে যাবেন আর এই চিঠিখানা দেবেন। তারপর ফণিকে বলিলেন—তুমি এঁর সঙ্গে যাবে। এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে তোমার থাকবার ব্যবস্থার জন্যে লিখলাম। তিনি অতি ভাল লোক। তাঁর ওখানে থাকলে তোমার অনেক উপকার হবে।

চন্দ্রবাবু উঠিলেন, বলিয়া গেলেন আমার ক্লাস আছে। তোমার তো খেয়ে ঘুম পেয়েছে দেখছি। তুমি বারান্দায় চৌকিতে শুয়ে পড়। বিকেলে উনি তোমাকে ডেকে নিয়ে যাবেন।

তিনি চলিয়া গেলেন। ফণি কম্বল বিছানো চৌকিতে শুইয়া পড়িল এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল।

বিকালে তারণবাবু ফণিকে সঙ্গে লইয়া আনন্দময়ের বাড়ীতে হাজির হইলেন। আনন্দময় তখন বৈঠকখানার সামনে বাগানে গাছ খুঁড়িতেছিলেন। দক্ষিণদুয়ারী বাংলা প্যাটার্ণের দাওয়া-উঁচু, খেড়ো বাড়ীর সামনে কাঁকর বিছানো, রাস্তার দুইপাশে বাগান। একটায় ফলের শাক-সব্জীর; অন্যটায় ফুলের। বাগানের মাঝখানে অজস্র সূর্য্যমুখী ফুলে হলুদ রঙের উৎসব। গাছগুলার তলা খোঁড়া শেষ করিয়া তিনি একটা কচি কৃষ্ণচূড়া চাপা গাছের গোঁড়া খুঁড়িতেছিলেন। পাশে এক জন নিম্নশ্রেণীর চাকর—সে বাড়ীর মাহিন্দার, গরুগুলির খাওয়ার তদারক করে—জলের বালতি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তারণ ও ফণি তাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তিনি গাছ খুঁড়িতে খুঁড়িতেই তাহাদের ছোট্ট সম্ভাষণ করিলেন—এস। আবার কাজ করিতে লাগিলেন। তারণ আনন্দময়ের কাছে নিয়মিত আসেন, তিনি আনন্দময়ের ধারধরণ সব জানেন তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ফণির কিন্তু এটা ভাল লাগিল না। লোকজন আসিয়াছে দেখা

করিতে, অথচ ভদ্রলোক সে দিকে মন না দিয়া সামান্য গাছ খোঁড়ার কাজে ব্যস্ত। এটা তাহার একটা অবহেলা ভাবিয়া মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তারণবাবু কিন্তু ঠিক অন্যরূপ ব্যবহার করিতেছেন, ফণি দেখিল। আনন্দময় তখন গাছটার গোড়া খুঁড়িয়া শেষ করিয়াছেন। কচি সবল ডাঁটাটির গায়ে একটি শক্ত কাঠি বাঁধিতে তিনি তখন ব্যস্ত। তারণ বাবু সব কাজ অতি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতেছিলেন। ফণি ভাবিয়া বিরক্ত হইল, একজন একটা গাছের ডাটায় কাঠি বাঁধিতেছে তাহাতে অন্যজনের অত মনোযোগ দিয়া দেখিবার কি থাকিতে পারে! ভদ্রলোকের ইচ্ছাটা কি! তারণ তখন হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—তোমার কিন্তু ঐ কুচকুচের চারাটার ওপর বড় বেশী দৃষ্টি। তুমি যা বয় নাও ওর, বাপরে!

আনন্দময়ের কাজ শেষ হইয়াছিল। হাত দুইটা হইতে মাটি ঝাড়িতে ঝাড়িতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুখে এক মুখ হাসি—কৌতুকে ভরা। তিনি বলিলেন—দেখ তারণ, ফলের আশায়, ভবিষ্যতের আশাতেই এই পৃথিবীতে মানুষের তারতম্য হয় ভাই। সূর্য্যমুখীর ফুলগুলো দেখ, বাগান আলো করে রয়েছে। কিন্তু ক'দিন! এবার তো ওদের শুকোবার পালা আসছে। ওদের তো আর ভবিষ্যৎ নাই। কিন্তু এই কচি ছোট্ট গাছ এর মস্ত ভবিষ্যৎ আছে। এ বড় হবে, এর ফুল ফোটার মেয়াদ এক বছরে ফুরোবে না, এর ফুলের শুধু রূপ আর গন্ধতেই শেষ হবে না, শুকিয়ে সবজিতে দেওয়া চলবে। তাই ওকে এত যত্ন। তার ওপর এখন ছোট আছে ত! বড় হোক, তখন আর দেখতে হবে না। ঝড়ের হাত থেকে বাঁচতে আপনিই পারবে, মাটির থেকে রস আপনিই টানবে। যাক্—তোমার দরকার কি বল, এ ছেলেটি কে? এতক্ষণে ফণির দিকে নজর পড়িল।

ফণির কিন্তু আনন্দময়ের কথাগুলি বড় ভাল লাগিল। মনে হইল—যেন এ কথাগুলা, ঐ উপমাটা তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া প্রয়োগ করা। ভদ্রলোককে একটা প্রণাম করিবে না কি? এইখানেই যদি থাকিতে হয়। না থাক—কোন প্রয়োজন নাই। মাষ্টার মহাশয় যদি বলেন তখন প্রণাম করিলেই চলিবে। চটপট অকারণে প্রণাম করিতে তাহার ভাল লাগে না। আর তাহার উপর ভদ্রলোক হয়ত মনে করিবেন যে সে তোষামোদ করিবার জন্য প্রণাম করিতেছে।

তারণ বাবু এইবার কাজের কথা পাড়িলেন। সমস্ত বলিয়া, তিনি চন্দ্রবাবুর চিঠিখানি তাঁহার হাতে দিলেন। চেয়ারের উপর চশমাটা খোলা পড়িয়া ছিল। চশমাটা চোখে লাগাইয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তিনি চিঠিখানি পড়িতে লাগিলেন। ফণি আপনার অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রায় নিঃশ্বাস রোধ করিয়া চিঠিখানা শেষ করার অপেক্ষা করিতে লাগিল। চিঠি পড়া হইয়া গিয়াছে, তবুও আনন্দ চিঠির দিকেই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তারপর ফণির দিকে তেমনি ভঙ্গিতেই চাহিলেন। এমন করিয়া চাহিবার অর্থ কি? ফণির মুখে চোখেও তখন একটা উগ্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আনন্দময় দেখিলেন—এক জোড়া বড় বড় চোখ বিস্ফারিত, অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাঁহার অদ্ভুত লাগিল। বিরক্তিও হইল, আবার খুসী হইলেন। একজন ভিক্ষার্থীর চোখে এ কি দৃষ্টি, কিন্তু এমন অসঙ্কোচ দৃষ্টি কয়টা চোখে থাকে! তিনি প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন—নাম কি? উত্তর আসিল। তারপর প্রশ্নের অবসর বর্ষণ! ফণি দেখিল—চন্দ্রবাবুর মত নন ভদ্রলোক। সে উত্তর দিতে হাঁপাইয়া উঠিল।

আনন্দময় প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া ফণির সমস্ত ইতিহাস সংগ্রহ করিলেন। বাপের একমাত্র ছেলে ফণি। বয়স পনের বছর। বাবার অবস্থা এক সময় ভালই ছিল। বাবার নাম অহি রায়। জাতিতে সদ্গোপ—চাষা। অবস্থা ভাল ছিল বলিয়া কোন দিন বাপকে নিজে হাতে লাঙল ধরিতে হয় নাই। কিন্তু অত্যন্ত গোঁয়ার আর মামলাবাজ লোক অহি। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফণি বাপের প্রচুর নিন্দা করিয়া ফেলিল। কষ্ট তাহার হইতেছিল, কিন্তু আনন্দময়ের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ভঙ্গি এমন কৌশলময় যে সমস্ত উত্তর না দিয়া সে পারে নাই। উত্তর দিতে দিতেই আপনার অজ্ঞাতসারে সে কখন বাপের সুপ্রচুর নিন্দা করিয়া বসিয়াছে। নিন্দার কারণও অবশ্য যথেষ্ট। একাধারে জমিদার ও গ্রামের সমস্ত লোকের সঙ্গে মামলা ও ঝগড়া করিয়া যখন সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তখনই এই গ্রামেরই ধনী জমিদার সদানন্দ বাবুর বড় ছেলে তাহাকে

কোন একটা মহালে গোমস্তা না নায়েবের চাকরী দিয়াছেন! ঐ সদানন্দ-বাবুরাই তাহাদেরও জমিদার। অহি রায়ের সমস্ত জমি সদানন্দ বাবুর বিশাল সম্পত্তি দেনামাত্র বাড়াইয়া তুলিয়াছে। অন্য সময় হইলে হয়ত অহি চাকরী লইত না। কিন্তু কৌটিল্যনীতিতে পারদর্শী—অহি কুটিল পন্থায় হারানো জমি পুনরুদ্ধারের আশাতেই চাকরী লইয়াছে—এ কথাও ফণি গোপন রাখতে পারিল না,। সে গ্রামের মাইনর স্কুলে ভাল করিয়াই পড়াশুনা করিতেছিল। ক্লাশ্‌ক্লাসে পড়িতেছিল—এমন সময় অহি হেড মাষ্টারের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া তুলিল। তাহার বিনা মাহিনায় পড়া শেষ হইল। বাপও অন্যগ্রামে চলিয়া গেল চাকরী লইয়া। তাই সে কি করে? বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। আনন্দময়ের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়া সে শেষে বলিল—আমারও তো ভবিষ্যৎ আছে! আমিও তো নিজেকে নষ্ট করতে পারি না।

আনন্দময়ের হাসি আসিল। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, পনের বছর তাহার বয়স, সে আপনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, আর সেই কল্পিত ভবিষ্যৎ রচনা করিবার দুঃসাহস বুকে লইয়া পৃথিবীতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে! বাহাদুর ছেলে!

আনন্দময় বলিলেন—বেশ তুমি আমার বাড়ীতে থাকবে। জিনিস তো দেখছি কিছুই নাই তোমার। তোমাকে একটা বাক্স আর বিছানা দিতে হবে। তুমি ঐ সামনের চালঘরে থাকবে। ঐ চৌকীর ওপর। এস, বাড়ীর ভেতর এস। জল খাবে। তারণ এস।

আনন্দময়ের পিছনে তারণ, তারণের পিছনে ফণি রাস্তায় নামিল। ফণির ইচ্ছা হইতে লাগিল—আনন্দময়কে একটা প্রণাম করে।

বিদায়

শ্রীবিমলচন্দ্র দাশগুপ্ত

(সৈনিক-কবি Wilfred Owen—(১৮৯৩-১৯১৮)-এর
'The Send-off'—কবিতার অনুবাদ)

অন্ধকার গলি বেয়ে, গান গেয়ে তারা নামলো:
সারি বেঁধে দাঁড়ালো পথের পাশের ছাউনিতে—
গাড়ীর সামনে।

—পরণ হর্ষে মুখ তাদের উজ্জ্বল।
বুকভরা তাদের সাদা ফুলের মালা,
মরে-যাওয়া মানুষ যেন।
কেউ নেই তাদের বিদায় দিতে:
ছিল শুধু কুলীরা—
তাদের আগ্রহহীন চোখে তাকিয়ে:
আর, হঠাৎ-আসা এক ভবঘুরে:
দুঃখ তার, কেউ রইলোনা আর শিবিরে।

—গাড়ী-ছাড়ার অনুজ্ঞার সংকেত,
সবুজ আলোর মিটিমিটি:
যাত্রা হোলো সুরু।
এমনি করে চুপি চুপি তারা চলে গেলো
—চেপে-যাওয়া অন্যায়ের মতো।
তারা আমাদের কেউ নয়:
আমরা জানিনা
যুদ্ধের কোন দরজায় তারা হানা দিতে গেলো।
জানিনা, আজও কী তারা আছে বেঁচে,
বিদ্রূপ কর্তে কেন মেয়েরা দিয়েছিলো মালা—
এ-কথা ভেবে।
কোন দিন আবার কী তারা ফিরবে?
উঠবে কী বেজে অভ্যর্থনার উচ্চ ঘণ্টাধ্বনি?
তারা কী গাড়ী থেকে নামবে—
ঝাঁকে ঝাঁকে, আনন্দ-কোলাহলে?
—হয়ত ফিরবে একটি কি দুটি—মৃতাবশেষ—
ধীর পায়ে, চুপি-চুপি,
আধ-চেনা গ্রামের পথে, কূপের ধারে:
—অভ্যর্থনা লজ্জা পাবে।

জাতি-বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ (৫)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

পাশ্চাত্য সভ্যতা তথা ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া যখন আমরা কতকটা আত্মস্থ হইতেছিলাম সেই সময় আবার নানারকম বিপদাপদেরও আমাদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। আর ইহারই ফলে ইংরেজ জাতির সঙ্গে আমাদের বিজিগীষা অধিকতর প্রকট হইয়া পড়ে। ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন যে সম্ভব নহে এ বোধ তখনও আমাদের মধ্যে তেমন জন্মে নাই। তবে এই সময় হইতে সমাজের উপর খ্রীষ্টীয় ধর্ম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যে চাপ পড়িতেছিল তাহার প্রতিরোধে সমাজ-নেতৃবর্গ অগ্রসর হওয়ায় এই বোধ জন্মিতে ও ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিল। তত্ত্ববোধিনী সভার নাম সাম্প্রতিক আলোচনার ফলে হয়ত অনেকে অবগত হইয়াছেন। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা নিছক জ্ঞানের দিক হইতেই নানা সমস্যার আলোচনায় রত হইয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা এমন একটি দিক বাছিয়া লইলেন যাহার সঙ্গে ছিল জাতির জীবনতন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ যোগ। ভগবৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই ভাষায় ইহার উদ্দেশ্য ছিল "আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার।" এই উদ্দেশ্য সংসাধন করিতে গিয়া সভাকে এক বিরাট শক্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ইহার ফলে যে সংঘাত আরব্ধ হয় তাহা মূলতঃ সামাজিক হইলেও জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার পক্ষে ইহা প্রথম সার্থক অভিযান।

সরকারী, বেসরকারী এবং পাদ্রী ইংরেজের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ যে আর অধিকদিন বিলম্বিত হইবে না একথা ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেই কতকটা প্রতিভাত হইয়াছিল। সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজের মতিগতির আভাস আমরা পাইয়াছি, সরকারী বিভিন্ন বিভাগের, বিশেষতঃ শিক্ষাবিভাগের উপর খ্রীষ্টান পাদ্রীদের প্রভাবের কথা আমরা কিঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছি। এই পাদ্রীগণ ডাফ, ডিয়াল্‌ট্রি প্রভৃতির নেতৃত্বে হিন্দু-ধর্মের উপর অহরহ গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রথম যুগের হিন্দু কলেজের কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কোন কোন খ্যাতনামা ছাত্র খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণও করিয়াছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের প্রভাব নব্য শিক্ষিতদের উপর পড়িতে লাগিল এবং সামান্যসংখ্যক লোক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলেও অধিকাংশই স্বজাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর আস্থা হারাইতে লাগিল। পাদ্রীরা মফস্বলে গিয়া নিঃসম্বল অজ্ঞ জনগণের নিকট যীশুর মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন ও নানা প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে প্ররোচিত করিলেন। পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ *India and India Missions* পুস্তক মারফত পৃথিবীর সমগ্র ইংরেজীভাষীদের নিকট ভারতবাসীদের ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতির বীভৎসতা প্রচার করিলেন। দেখিতে দেখিতে পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়া গেল। ডাফ চারি বৎসর কাল (১৮৩৫-৩৯) ব্রিটেন ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া ভারতীয় ধর্মের বীভৎসতা বক্তৃতাদি দ্বারাও প্রচার করিতে লাগিলেন, শুধু বই লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তত্ত্ববোধিনী সভা এই স্রোতের গতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা ও তত্ত্ববোধিনী সভার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানকেই উচ্চতর স্থান দিয়াছেন। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত সম্যক গ্রাহ্য না হইলেও তত্ত্ববোধিনী সভা সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা সর্বতোভাবেই যুক্তিযুক্ত। তাঁহার মতে তত্ত্ববোধিনী সভা—

"ইদানীন্তর অভিপ্রায়ে প্রবর্তিত হইয়াছিল, সুতরাং উহার ফল অধিকতর কালব্যাপী হইয়াছে। এই সভার উদ্দেশ্য সনাতন বৈদিক ধর্মের সংস্থাপন—ইহার নাম তত্ত্ববোধিনী সভা। এই সভা সর্বতোভাবে রাজকীয় কার্য বিষয়ে সম্পর্ক শূন্য থাকিয়া জাতীয় ভাষা ও ধর্ম প্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সুতরাং যেরূপ দুরভিসন্ধি সহকারে ইহার কার্য আরব্ধ হইয়াছিল, ইহার ফলও সমস্ত তেমনি দূরতর পরবর্তী পুরুষগণের ভোগ্য হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যে নদী

[illegible] পর্বত-সৃঙ্গ হইতে নির্গত হয়, তাহার প্রবাহও তেমনি দুরন্তাধী হইয়া থাকে।" (বাঙ্গালার ইতিহাস। তৃতীয় ভাগ। পৃ. ২২।)

তত্ত্ববোধিনী সভা স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে যে তিনটি উপায় ক্রমে অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা সে সময়কার খ্রীষ্টান পাদ্রীদের ভীষণ মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছিল। জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা, বঙ্গদেশে বেদ-চর্চা প্রবর্তন উদ্দেশ্যে কাশীতে ছাত্র প্রেরণ ও কলিকাতায় শাস্ত্রগ্রন্থাদি প্রচার, এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ—এই সব ব্যবস্থা দ্বারা সভা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইলেন। পাঠশালায় তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইলেও আধিভৌতিক বিষয়াদি শিক্ষারও বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু সকল শিক্ষাই দেওয়া হইত বাংলাভাষার মধ্য দিয়া। আর এই উদ্দেশ্যে সরকারী পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেরাই পাঠ্যপুস্তক রচনায় মন দিলেন। এই পাঠ্যপুস্তক রচনায় পাঠশালার শিক্ষক ও পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নানা কারণে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল এই পাঠশালাটি কলিকাতা হইতে বংশবাটীতে (বাঁশবেড়ে) স্থানান্তরিত হয়। এই দিবস সেখানে পাঠশালা-স্থাপন উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাহাতে সভাপতি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত যে বক্তৃতা করেন তাহা হইতে বিশেষ-ভাবে পাঠশালার এবং সাধারণভাবে তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য ও কার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়। দেবেন্দ্রনাথ বলেন :

"তত্ত্ববোধিনী···সভার প্রতিজ্ঞা যে আমারদিগের মনুষ্যের শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম যেহো প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহা প্রচলিতা হয়, এই উদ্দেশ্যে বিবিধ উপায় সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে পাঠশালাকে এক প্রধান উপায় গণ্য করা গিয়াছে,···

"কেবল শাস্ত্রের দৃষ্টি অভাব জন্যই অনেকে এই শাস্ত্রকে অবিশ্বাস ও অমান্য করিতেছে, আমি নিশ্চিত বলিতে পারি যে যাঁহারা এইক্ষণে শাস্ত্র মানিতেছেন না তাঁহারদিগের শাস্ত্র জানা থাকিলে অবশ্য মানিবেন। এইক্ষণে ইংরাজী বিদ্যার দ্বারা চতুর্দ্দিকে জ্ঞানের কৃষ্টি হইতেছে। অতএব আমারদিগের শাস্ত্র আমারদিগের চিরকালের যে বেদান্তশাস্ত্র, যাহা গুপ্ত থাকায় জন্য প্রায় লুপ্ত হইয়াছে তাহাই এইক্ষণে প্রকাশ করা অতি আবশ্যক হইয়াছে, এই বেদান্ত শাস্ত্রের প্রচারাভাবে স্বধর্ম্মে থাকিয়া ঈশ্বরজ্ঞানদ্বারা চরিতার্থ না হইয়া বিদ্যাবশে অনেকে বিজাতীয় খ্রীষ্টানধর্ম্ম প্রভৃতি এইক্ষণে অবলম্বন করিতেছে। স্বধর্ম্মে থাকিয়া ঈশ্বর-জ্ঞান দ্বারা চরিতার্থ হইলে কে পরধর্ম্মের আশ্রয় লইবে?

"স্বধর্ম্মে থাকিয়া যাহাতে ঈশ্বর জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় তন্নিমিত্তেই এই পাঠশালা স্থাপিতা হইয়াছে। পরমার্থ এবং বৈষয়িক উভয় বিদ্যারই উপদেশ প্রদান করা হইবেক।···"

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৭৬৫ শক।

দেবেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় যাহা মাত্র আভাসে বলা হইয়াছিল, অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাহা খোলাখুলিভাবে বিবৃত করিলেন। বিজাতীয় ধর্ম্ম ভাষা সাহিত্য রাজনীতির অনুগামী হইয়া নিজস্ব যাহা কিছু উৎকৃষ্ট সবই আমরা বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি। ইহা হইতে রক্ষা পাইবার অন্য এক উপায় এই তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা। অক্ষয়কুমার তাঁহার অনবদ্য ভাষায় বলেন :

"আমরা আর কোন বিষয়ে আপনারদিগের প্রতি নির্ভর করিতে পারি না। আমরা পরের শাসনের অধীনে রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ্য করিতেছি, এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাতে শঙ্কা হয় কি জানি পরের ধর্ম্ম বা এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম হয়। অতএব এইরূপ আমাদের স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে নতুবা ইংরাজদিগের সহিত আমারদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবে না—তাঁহারদিগের ভাষাই এদেশের জাতীয় ভাষা হইবেক এবং তাঁহার-দিগের ধর্ম্মই এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম হইবেক, সুতরাং বাক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে হিন্দু নামে খুচিয়া আমারদিগের পরের নামে বিখ্যাত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার নিবারণ করিতে এবং বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান শাস্ত্র এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভা অদ্য ১৭৬৫ শকের ১৮ই বৈশাখ রবিবারে এতৎ পাঠশালা রূপ নবকুসুম প্রসব করিলেন।"

—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন, ১৭৬৫ শক।

জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠায় তত্ত্ববোধিনী সভার কৃতিত্ব অপূর্ব্ব। কিন্তু এ বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনার পূর্ব্বে আর একটি প্রতিষ্ঠানের কথাও এখানে বলা আবশ্যক, কেননা এই উভয় প্রতিষ্ঠানই পরস্পরের পরিপূরক হইয়া কার্য্য করিয়াছিল। যেমন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি বা ভারতবর্ষীয় সভাকে সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভারই পরিণতি বলা চলে। প্রসিদ্ধ বাগ্মী, ক্রীতদাস প্রথার অন্যতম উচ্ছেদকারী এবং ভারত-বাসীদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিসম্পন্ন জর্জ্জ টমসনকে

ঠাকুর ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিলাত সঙ্গে করিয়া এদেশে লইয়া আসেন। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার নেতৃবর্গ ১৮৪৩, ১১ই জানুয়ারি ইহার অধিবেশনে ডক্টর টমসনকে অভিনন্দিত করেন এই সভায় জ্ঞান ও তথ্যমূলক আলোচনাই বিশেষ ভাবে হইত বলিয়াছি। এই সময়ে দেখিতেছি—দেশের বিচার ও শাসন বিভাগ সম্বন্ধেও সভায় আলোচনা হইতেছে। ১৮৪৩, ৮ই ফেব্রুয়ারি সংস্কৃত কলেজ হলে তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার যে অধিবেশন হয় তাহাতে সুপ্রসিদ্ধ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় "The present state of the East India Company's Criminal Judicature and Police under the Bengal Presidency" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধের যেখানে সরকারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সমালোচনা ছিল সে স্থান শ্রবণ করিয়া নিমন্ত্রিত অতিথি হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কাপ্তেন রিচার্ডসন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন—আমি এই কলেজগৃহকে রাজদ্রোহীদের আড্ডাস্থল হইতে দিব না। রিচার্ডসনের এরূপ মন্তব্য ও অহমিকা প্রকাশের কোনই অধিকার নাই—সভাপতি তারাচাঁদ তীব্র অথচ স্পষ্ট ভাষায় একথা জানাইয়া দিলে রিচার্ডসন অগত্যা তাঁহার উক্তি প্রত্যাহার করিয়া সভার সম্মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এ বিষয়টির কিন্তু এখানেই পরিসমাপ্তি হইল না। পরবর্তী কয়েক দিন যাবৎই ইংরেজ সম্পাদকগণ নিজ নিজ সংবাদপত্রে নব্যদলের উপর অকথ্য গালিবর্ষণ করিয়া গায়ের ঝাল মিটাইতে লাগিলেন। 'ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া' এইরূপ মন্তব্যও করিলেন যে, বাট্টাভিয়া বা সামোয়াতে (যবদ্বীপ) এরূপ বক্তৃতা করা হইলে বক্তাকে নিদেনপক্ষে নির্ব্বাসন-দণ্ডেও দণ্ডিত করা হইত। অথচ সম্পূর্ণ বক্তৃতাটি ২রা ও ৩রা মার্চ্চ সংখ্যা বেঙ্গল হরকরায় হুবহু ছাপা হইলে দেখা গেল সরকারী আইন-আদালতের দুর্নীতি এবং পুলিশের দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য থাকিলেও তাহাতে রাজ-দ্রোহাত্মক কিছুই নাই!

যাহা হউক, ডক্টর টমসনের উপদেশে তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারিচাঁদ মিত্র প্রমুখ নব্যদল একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপনে অগ্রণী হইলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল কলিকাতায় 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার উদ্দেশ্য ঐদিনকার সভায় গৃহীত নিম্ন প্রস্তাবটি হইতে জানা যায়:

"That a society be now formed and denominated the Bengal British India Society; the object of which shall be, the collection and dissemination of information relating to the actual condition of the people of British India, and the Laws, Institutions and the resources of the country; and to employ such other means of a peaceable and lawful character, as may appear calculated to secure the welfare, extend the just rights and advance the interests of all classes of our fellow subjects."

এই বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের সমান হিতকল্পে প্রতিষ্ঠিত সভা-সমিতিগুলির মধ্যে প্রথম বলা যাইতে পারে। এই সভা প্রতিষ্ঠাকালে এখানকার কোন ইংরেজের নিকট হইতেই ইহা সমর্থন লাভ করে নাই। ভূদেববাবু লিখিয়াছেন:

"যখন প্রথম এই সভার সূত্রপাত হয়, তখন কি গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, কি ইংরেজবণিক, কি সংবাদপত্রের সম্পাদক, কোন প্রকার ইংরেজই উহার অনুমোদন করেন নাই। সকলেই উহার প্রতি বিদ্রূপ এবং বাঙ্গোক্তি করিয়া যাহাতে সভ্যেরা উৎসাহবিহীন হয়, এমত যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই উৎসাহ নিবারিত হইল না।...ঐ সময় হইতে ধারাপ্রকারে এখানকার লোকেরা আপনাদিগের সভ্যতার চিহ্ন প্রকটিত করিতে লাগিলেন।" *

ভূদেব এই প্রসঙ্গে আরো লেখেন যে, "ইংলিসম্যান, ষ্টার প্রভৃতি সংবাদপত্রে চক্রবর্ত্তী দলের প্রতি গল্প পদ্যময় অনেক বাঙ্গোক্তি প্রচারিত হয়। সাধুশীল তেজস্বীতাব তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর নামানুসারেই ঐ দলের নামকরণ হয়।" বিরোধী সংবাদপত্রসমূহ এই নব্যদলকে 'চক্রবর্ত্তী ফ্যাকশন' নাম দিয়াছিল।

* "বাঙ্গালার ইতিহাস"। ৩য় ভাগ। পৃ. ৩৪-৩৬

সে-যুগে সমাজ সংস্কারের দিকেই অধিকাংশ শিক্ষিতের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। এই হেতু ভারতবর্ষীয় সভাও প্রথম প্রথম নিছক রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিবর্তে সমাজ ও পৌর সংস্কারের দিকে মন দিয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, তত্ত্ববোধিনী সভা ও ভারতবর্ষীয় সভা পরস্পরের পরিপূরক ছিলেন। উভয় সভাই ভারতবাসীদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, ইউরোপীয়ের কোনরূপ সাহায্যের অপেক্ষা ইহারা করেন নাই। তবে তত্ত্ববোধিনী সভা-যখন আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া সমাজ-সেবায় মন দিলেন, তখনই ভারতবর্ষীয় সভা রাজনীতি চর্চায় অভিনিবিষ্ট হইবার সুযোগ লাভ করিলেন। ভূদেববাবু এই দুইটি সভার কার্যকলাপ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"তাৎকালিক কৃতবিদ্য বাঙ্গালী মাত্রেরই অন্তঃকরণে স্বদেশীয়-সামাজিক দোষ সংশোধন করাই যে সর্বাপেক্ষা প্রধানতম কার্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল, ইহা সেই সময়ের ভারতবর্ষীয় সভার কার্যপ্রণালী পর্যালোচনা করিলেই স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়। ভারতবর্ষীয় সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য গবর্মেণ্টের রাজনীতি এবং ব্যবস্থাসম্পৃক্ত কার্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তদ্বিষয়ে দেশীয় জনগণের অভিপ্রায় প্রকাশ করা, কিন্তু সভা ঐ সময়ে আপনাদিগের একমাত্র প্রকৃত কার্যের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারা একজন সুপ্রীম কোর্টের উকীলকে আপনাদিগের সভাপতি করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং কখন রাজধানী পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন, কখন পুলিসের দোষানুসন্ধান করিতেছিলেন, আর কখন বা বিধবা বিবাহের উপায় বিধান, কখন বহুবিবাহ নিবারণ, কখন স্ত্রী শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বস্তুতঃ ভারতবর্ষীয় এবং তত্ত্ববোধিনী সভার আনুপূর্বিক ক্রমে কার্য পর্যালোচনা করিলে সুস্পষ্টরূপেই প্রতীত হয় যে, যতদিন তত্ত্ববোধিনী সভা বল প্রকাশ করিতে না পারিয়াছিলেন, তাবৎকাল ভারতবর্ষীয় সভাও আপন প্রকৃত কার্যে অভিনিবিষ্ট হইতে পারেন নাই। কিন্তু হার্টির সাহেবের অধিকার কালের [১৮৪৪, জুলাই—১৮৪৮, জানুয়ারি] মধ্যেই এই উভয় কার্য সুসম্পন্ন হইয়া উঠিল। তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের ধর্মপ্রণালী সংস্থাপিত করিলেন, এবং একজন সুশিক্ষিত বাঙ্গালী [বাবু রামগোপাল ঘোষ] ভারতবর্ষীয় সমাজের সভাপতি হইয়া রাজকার্য বিষয়েই সভার বিশেষ দৃষ্টি জন্মাইলেন। সচরাচর অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, এদেশীয় লোকেরা স্বতঃসিদ্ধ হইয়া কোন কার্যই করিতে পারেন না, আর ইঁহারা যাহা করিতে পারেন তাহাও অপরের অনুকৃতি মাত্র হয়। কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম [এখানে তত্ত্ববোধিনী সভা] এবং ভারতবর্ষীয় সমাজ এই দুইটিই অপরের সহায়তা বা অনুকৃতির ফল নহে। ঐ দুই সভার দ্বারাই হিন্দু সমাজের ভাবি পরিবর্ত সমূহের বীজ উপ্ত হইয়াছিল।"*

এই উদ্ধৃতিতে তত্ত্ববোধিনী সভার বল প্রকাশের কথা বলা হইয়াছে। তত্ত্ববোধিনী সভা নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষণ ও পোষণের জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা কি নবদল কি প্রাচীনপন্থী সকলেরই সমর্থন লাভ করিয়াছিল। ইহা খ্রীষ্টীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির আঘাত হইতে স্বীয় সমাজকে রক্ষা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই সময়কার আর একটি কার্য যাহা সভার কর্মপ্রণালীর সার্থকতা সম্যকরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিল, তাহার উল্লেখ এখানে বিশেষভাবে প্রয়োজন। কেননা ইহার ফলে সাধারণ জনগণের মধ্যেও ইহার উদ্দেশ্য ও আদর্শ শিকড় গাড়িতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সময় খ্রীষ্টান করিবার ধুম পড়িয়া যায় বলিয়াছি। তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক কর্মচারীর অপরিণতবয়স্ক পুত্র ও তাহার স্ত্রীকে পিতার সনির্বন্ধ অনুরোধসত্ত্বেও পাদ্রী ডাফ খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করেন। অপরিণতবয়স্ক বালককে যাহাতে খ্রীষ্টান করা না হয় এইজন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হইলে তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। কয়েক বৎসর পূর্বে কিন্তু প্রধান বিচারপতি সার এডওয়ার্ড রায়ান এরূপ ব্যাপার হইতে দেন নাই। বর্তমান ক্ষেত্রে উদাহরণ না দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ ইহার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সচেষ্ট হইলেন। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলিই খ্রীষ্টানীর কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। যাহাতে দরিদ্র হিন্দু সন্তানগণ পাদ্রীদের বিদ্যালয়ে না গিয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠানে পাঠাভ্যাস করিতে পারে এইজন্য দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে নেতৃবর্গ এক সভায় সমবেত হইয়া এই ধরণের একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ কলিকাতায় হিন্দু চেরিটেবল ইন্‌স্টিটিউশন বা হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় নামে প্রস্তাবিত অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। অত্যাচারী মিশনরীদের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (আষাঢ় ১৭৬৭ শক) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কালে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

---

* বাঙ্গালার ইতিহাস। ৩য় ভাগ। পৃঃ ৪১-৪২

"অত্যাচারে মিশনরিগণ প্রতীক্ষা করিতেছে, ইহাতে কৃতকার্য্য না হইলে কি বিদ্যার জোরে [illegible] দুই একটি বিপক্ষের মুক্তমতা জন্মিতে পারে তাহে আর কি রক্ষা থাকে? তাহারা এতকাল আমাদিগের পরাক্রমকে পরীক্ষা করিতে পারে নাই—অতএবই আমাদিগের প্রতি তাহাদিগের শ্রদ্ধা দূর হয় নাই, কিন্তু এইবারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয়ি না হইলে তাহারা ভবিষ্যতে আমাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে কোন সংশয় করিবেক না। সর্ব্ব দিয়ে আঘাত করিয়া তাহাকে নষ্টীয় পরিত্যাগ করিলে প্রতিহিংসা করিতে কি সে বিলম্ব করে? কালবশে মিশনরিদিগকে দমন না করিলে তাহারা ভবিষ্যতে বল পাইয়া পূর্ব্বক আমাদিগের সন্তানদিগকে খৃষ্টধর্ম্মের বিষ পান করাইতে বিলম্বমাত্র কি শোধ করিবেক? অতএব বিপক্ষের শোধ প্রমথিত করিয়া নিরস্ত হওয়া অপেক্ষা [illegible] উদ্যোগ না করাও মঙ্গল ছিল। ফলতঃ এ সকল আশঙ্কারই প্রয়োজন কি? আমাদিগের যুক্তি সমূলে ছিন্ন হইয়াছে—উপায় সকল দেখা হইয়াছে, এইক্ষণে দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিলেই অভিলাষ সম্পূর্ণ হইবেক।

"...তোমাদিগের কর্ত্তব্য যে ঐক্যকে বদ্ধমূল কর, কলহের লোপান বিধ্বস্ত কর, এবং বিদ্যা ও প্রণয়কে মুক্ত করিয়া কার্য্য সাধনে অগ্রসর থাক। এইক্ষণে যখন কৃতকার্য্য হইবে, তখন সকল পরিশ্রম বিস্মৃত হইবে, বিপক্ষের বল ক্ষীণ হইবে, তরঙ্গনি বিস্তৃত হইবে, স্বাধীনতাশালী বৃদ্ধি হইবে, এবং এইক্ষণে যাহারা দূর হইতে কটাক্ষ করিতেছেন, তখন তাঁহারা বিস্মিত হইতে বাধ্য হইবেন।"

ভূদেববাবু বলেন যে, "যে সময় কলিকাতার ধনশালী বাবুরা এইরূপে স্বধর্ম্ম রক্ষার চেষ্টা করেন সেইকালে কয়েকজন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য যুবাপুরুষ খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধমত ইংরাজীতে লিখিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রচারিত করিতে লাগিলেন। মিশনরী সাহেবেরা তজ্জন্য উত্তেজিত হইয়া ঐ সকল বিরুদ্ধ মতের প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।" তত্ত্ববোধিনী সভার এই সমকালীন কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ভূদেব বলেন :

"তত্ত্ববোধিনী সভাও এই সময়ে বিশিষ্টরূপে আপন বল প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তখন ইহার সভ্য সংখ্যা আট শতের অধিক হইয়াছিল। এই প্রদেশে বেদবিদ্যা প্রবিষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে চারিটী ব্রাহ্মণ সন্তান ঐ সভার ব্যয়ে বারাণসীধামে বেদাধ্যয়নার্থ প্রেরিত হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী উৎসাহশীল যুবকগণ মিশনরীদিগের বৃষ্টীয়ানুরাগী হইয়া আপনাদিগের ধর্ম্মের প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ঐ সময় হইতেই এদেশে খৃষ্টধর্ম্মে বৃদ্ধির পরিণাম হইল।*

নব্যশিক্ষিতগণ এতদিন হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী হইয়াও পুনরায় এই সময়ে কেন এদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া ভূদেববাবু বলেন :

"ঐ সময়ে সর্ব্বপ্রকার সামাজিক দোষ সংশোধন করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হওয়া সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করে। সুতরাং যতদিন দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম্মপরিবর্ত্ত ব্যতিরেকে উল্লিখিত দোষ সমূহের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, তাবৎকাল যে ধর্ম্মের সাময়াপুসারে ঐ সকল দোষ সংরক্ষিত হইতেছে বলিয়া মনে হয় তাহা বিদ্বেষের পাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কোন প্রকারে একবার দৃষ্ট হয় যে, জাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়াও সামাজিক দোষের সংশোধন হইতে পারে, তবে জাতীয়ধর্ম্ম স্বভাবতঃই মনুষ্যের শ্রদ্ধা এবং গৌরবের সম্পদ হইয়া থাকে। তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশীয় লোকের সামাজিক দোষ সংশোধনের প্রতিবন্ধক নয়—অথচ উহাই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ঐ ধর্ম্মপ্রণালী বৈদেশিক শিক্ষার প্রাচীন ব্যবস্থাদির উপযোগিতা সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন যুবকদিগের যে মনোরম হইবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি?" *

হিন্দু কলেজের নব্যশিক্ষিত যুবকগণ, বিশেষতঃ তাঁহারা ডিরোজিও ও রিচার্ডসন শিষ্য, হিন্দুর ধর্ম্মকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। অথচ তাঁহারা অনেকেই সত্যসত্যই স্বদেশের হিতকামী ছিলেন। এই বিজাতীয় মনোভাব হইতে স্বধর্ম্মের দিকে তাঁহাদের ফিরাইয়া আনিতে তত্ত্ববোধিনী-সভার কৃতিত্ব অসাধারণ বলিতে হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে এ সকলেরই মূলে ছিলেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তত্ত্ববোধিনী সভা ও ভারতবর্ষীয় সভা দুইটিই আমাদের স্বজাতীয় প্রতিষ্ঠান। ইহাদের সুফলপ্রসূ ও বহুমুখপ্রসারী কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ভূদেব বলিতেছেন :

"খৃষ্টীয় মিশনরীদের সহিত অনুক্ষণ সংঘর্ষে হিন্দু সমাজে যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ও আচার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক হইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আবির্ভাব হয় তাহার ফলেই সনাতন হিন্দুর ধর্ম্ম ও হিন্দু আচার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ হইতেছে। হিন্দুধর্ম্মী যে কোন প্রকার প্রকৃত সংস্কার বা উন্নতির বিরোধী নহে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে। আমার ভারতবর্ষীয় সভার অনুষ্ঠিত পরেই দেশময় রাজনৈতিক সভা সকল স্থাপিত হইয়া এদেশীয় লোকদিগকে রাজকার্য্য সম্বন্ধে কিছু পরিমাণে অভিজ্ঞ করিতেছে। কিন্তু এই

* ঐ, ৩য় ভাগ পৃ, ৫৯-১০

* ঐ, ৩য় ভাগ, পৃ, ৪০০।

দুই প্রধানকার্যে গবর্মেণ্টের বিন্দুমাত্র সহায়তার অপেক্ষা করা হয় নাই।" *

লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালের মধ্যেই দেশী বিদেশীতে এই সংঘাত উপস্থিত হইয়াছিল। অথচ তাঁহার শাসন-পদ্ধতি কতকগুলি বিষয়ে খুবই উদার ছিল। মাত্র লেখাপড়া-জানা লোককেই সরকারী কর্মে নিয়োগের ব্যবস্থা, সমগ্র বঙ্গে একশত একটি বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য দ্বারা তিনি সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু স্থানীয় ইউরোপীয় সমাজ তাঁহার উপরে প্রসন্ন ছিল না। তিনি শাসনভার ত্যাগ করিয়া গেলে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা-কল্পে কলিকাতা টাউন হলে যে সভা হয় তাহাতে ইউরোপীয়গণ তাঁহার মাত্র একখানি চিত্র রক্ষার প্রস্তাব করেন। কিন্তু পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও রামগোপাল ঘোষের সমর্থনে তাঁহার একটি মর্মর মূর্তি স্থাপন করাই অধিকাংশের মতে ধার্য হইল। ইউরোপীয়গণ অনেকে উক্ত প্রস্তাব সমর্থন না করিলেও রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা এমন তেজোব্যঞ্জক অথচ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, পরদিন কোন কোন সংবাদপত্র তাঁহাকে 'Indian Demosthenes' বা 'ভারতীয় ডিমস্থিনিস' বলিয়া অভিহিত করেন। এখানে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, হাডিঞ্জ-প্রতিষ্ঠিত বঙ্গবিদ্যালয়গুলির উন্নতি তো দূরের কথা, সরকারী অনাদর হেতু ইহা ক্রমশঃ হীনদশাগ্রস্ত হয় ও পরে অনেকগুলি একেবারে উঠিয়া যায়।

গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভার সঙ্গে শিক্ষাবিষয়ক সরকারী কমিটির মতদ্বৈধতা এই সময়কার আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। শিক্ষা-কমিটি ক্রমশঃ ইহাদের কর্তৃত্ব কাড়িয়া লইতে থাকেন। যখন কোন খ্রীষ্টান পাদ্রীকে হিন্দু কলেজের শিক্ষক রূপে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হইলে অধ্যক্ষ-সভা বরাবর ইহার প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন। কৈলাসচন্দ্র বসু নামক কলেজের একজন শিক্ষক ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে অধ্যক্ষ-সভা তাঁহাকে কার্য হইতে অব্যাহতি দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। শিক্ষা-কমিটি কিন্তু ইহাতে বাদ সাধিলেন। তাঁহাদের অনমনীয়তায় বিরক্ত হইয়া কলেজের অন্যতর গবর্নর প্রসন্নকুমার ঠাকুর পদত্যাগ করিয়া ইহার সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করেন। কৈলাসচন্দ্র বসুকে পরে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। ইহার পর বৎসর গুরুচরণ সিংহ নামে কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর জনৈক ছাত্র খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলে আবার উভয় কমিটির মধ্যে বিতর্ক সুরু হয়। গুরুচরণকে কলেজ ত্যাগ করিতে হইল বটে, কিন্তু কলেজে হিন্দু ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ের ছাত্র ভর্তি করা যাইবে না এরূপ সুস্পষ্ট নিয়ম আছে কি-না সে সম্বন্ধে অধ্যক্ষ-সভার পক্ষে রাধাকান্ত দেব এবং শিক্ষা কমিটির সভাপতি ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনের (বেথুন) মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ আরম্ভ হইল এবং শেষ পর্যন্ত রাধাকান্ত দেব প্রায় চৌত্রিশ বৎসর অধ্যক্ষতা করিবার পর ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে এই পদ ত্যাগ করিলেন।

গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকে বঙ্গের হিন্দুশীল ব্যক্তিগণ স্বধর্ম ও স্বসংস্কৃতি রক্ষায় সবিশেষ তৎপর হইয়াছিলেন এবং ইহার ফলে ইউরোপীয়দের, বিশেষতঃ খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তাহা পরবর্তী দশকে ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করে। এই কথাই এখন বলিব।

* ঐ, ৩য় ভাগ, পৃ. ৩২।

বিশ্বরাজনীতিতে কূটনীতি

জাপ-মার্কিণ সমস্যার মূল কথা

তৃতীয় পর্ব

অগেন্দ্র ভট্ট

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী পিকিনস্থ জাপময়ী ডক্টর হিওকি চীন সাধারণতন্ত্রের সভাপতি য়ুয়ান-সি-কেই-র নিকট এক দাবী পেশ করেন। ইহাই কুখ্যাত একুশ-দফা দাবী।* এখানে আমাদের বিবেচনার বিষয় যে, এই একুশ-দফা দাবী। চীনের বিভিন্ন বৈদেশিক স্বার্থের মূলে কোন রকম আঘাত করেছে কিনা। আর যদি করেই থাকে তার প্রকৃতি কি।

প্রথমতঃ এই দাবী এমন সময় চীনের নিকট উপস্থিত করা হয় যখন গোটা বিশ্বের প্রধান প্রধান শক্তিগুলি জীবন-মরণ যুদ্ধে ব্যাপৃত। সেজন্য তারা এ ব্যাপারে তখন খুব সামান্যই দৃষ্টি দিতে পেরেছিল।

দ্বিতীয়তঃ প্রধান শক্তিগুলির মধ্যে ব্রিটেন জাপানের মিত্র এবং এ মিত্রতা একেবারেই একটি কূটনৈতিক। তৃতীয়তঃ চীনে ব্রিটেনের পর বড় স্বিতস্বার্থ ছিল মার্কিনদের। কিন্তু তাদের স্বিতস্বার্থকে ঘায়েল করা যেতে পারত যদি ব্রিটেনের সঙ্গে জাপানের মৈত্রী বজায় থাকে। ব্রিটেন সম্বন্ধে জাপানের মনে কোন আশঙ্কা ছিল না। আশঙ্কা ছিল প্রকৃত পক্ষে মার্কিন স্বিতস্বার্থ নিয়ে। চীনে মার্কিন স্বিতস্বার্থের রাজনৈতিক পত্তন ও তার রক্ষকবচ রচিত হয় "মুক্তদ্বার নীতি"কে কেন্দ্র করেই। জন হে (John Hay) যে 'মুক্তদ্বার নীতি' প্রবর্তন করেন তাই পরবর্তী কালে মার্কিন সুদূর প্রাচ্যে যুক্ত রাষ্ট্রের অমোঘ বৈদেশিক নীতি হয়ে দাঁড়ায়।

জাপানের বৈদেশিক নীতি গত মহাযুদ্ধের সময় চীনে এক নোতুন পথা অবলম্বন করে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট জাপান জার্মাণীর নিকট চীনের স্যানটুং প্রদেশের সিংটাও বন্দর দাবী করে। সিংটাও ছিল প্রাচ্যে জার্মাণীর একটি নৌ-ঘাঁটি। সেজন্য এর গুরুত্ব সম্বন্ধে মনে কোন সন্দেহ থাকা নিষ্প্রয়োজন। জার্মাণী যে এ দাবী সহজ মনতে রাজী হবে না এ কথা জাপান নিজেও জানত। কিন্তু তা সত্বেও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার এই দাবীর অভিনয় করবার প্রয়োজন ছিল। ঠিক যে সময় জাপান এই দাবী উপস্থিত করে তার কিছু পূর্ব্ব থেকেই চীন সাধারণতন্ত্রের সভাপতি য়ুয়ান-সি-কেই জার্মাণীর কাছ থেকে চীনের এই বন্দরটি যাতে ফিরে পাওয়া যায় তার জন্য আলাপ-আলোচনা করছিলেন। (১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে জার্মাণী চীনের কাছ থেকে স্যানটুং প্রদেশের কতগুলো স্থান আদায় করে।) চীন জার্মাণীর যুদ্ধমান অবস্থা বুঝেই তা ফিরিয়ে পাবার জন্য দাবী জানায়। রণনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে যদি আমরা চীনের এই প্রচেষ্টাকে দেখি তা হলে বলা যেতে পারে যে এখানে জাপানের পক্ষে শঙ্কিত হবার প্রকৃষ্ট কারণ আছে। যদি সিংটাও নৌ-ঘাঁটি চীনের কবলে যায় তবে জাপানের আত্মরক্ষার বহির্ঘাটি হয় বিপদগ্রস্ত। সেই জন্যই জাপান যে গত মহাযুদ্ধে জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তার রণনৈতিক ভিত্তি হল তার আত্মরক্ষার উপাদান। এই সব দেখে-শুনেই হয়ত জাপান চীনের বৈদেশিক নীতির এদিকটা খুব কড়া নজরে পাহারা দিত। চীনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে, সিংটাও বন্দর চীনের হাতে নিশ্চিন্ত মনে ছেড়ে দিয়ে, জাপান কোরিয়ায় তার সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালাতে পারে না। কেননা পীত সাগরের পূর্ব্বতীরে যেমন কোরিয়ার অবস্থিতি ঠিক তার বিপরীত দিকে পীত সাগরের পশ্চিম তীরে স্যানটুং প্রদেশের অবস্থিতি। এই ভৌগলিক অবস্থিতি জাপানের কোরিয়া রক্ষার পক্ষে মারাত্মক। যদি কিয়াও-চাও উপসাগরের মুখে কোন নৌ-ঘাঁটি শত্রু-ভাবাপন্ন দেশের হস্তগত হয় তবে জাপানের পক্ষে কোরিয়ার নিশ্চিন্ত মনে বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিশ্বরাজনীতিতে এ যাবৎ চীনের সঙ্গে জাপানের অহিনকুল সম্বন্ধই ছিল। তার তুলনায় জার্মাণীর সঙ্গে অনেকটা পরিমাণে সখ্যভাব (অন্তত যুদ্ধ ঘোষণা করবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) ছিল। তাছাড়া চীনে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ক্ষেত্রে জাপ-জার্মাণ নীতির তেমন

* 'সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিক নীতি' (সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা) গ্রন্থে এ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

কোন বিরোধ ছিল না। হয়ত কোরিয়ার রক্ষাব্যূহ হিসাবেই জাপান দিয়াও নৌ-ঘাঁটি রেখে থাকবে। কিন্তু এই নৌ-ঘাঁটি যদি কোন রকমে চীনের হাতে পড়ে তাহলে কোরিয়ার ভবিষ্যত আশঙ্কাময়। এই আশঙ্কায় জাপান চীনের সঙ্গে জার্মাণীর কোন বোঝাপড়া হবার পূর্ব্বেই জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং তিলমাত্র সময় নষ্ট না করেই সরাসরি স্যানটুং প্রদেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দখল করে। মার্কিন কূটনৈতিক দৃষ্টিতে এই অধিকার ও জাপানের সম্প্রসারণ উদ্দেশ্য-মূলক মনে হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। অবশ্য ব্রিটিশ বৈদেশিক দপ্তর জাপানকে এই অধিকারে কোন বাধা দেয়নি বরং তাদের জ্ঞাতসারেই এই সব ঘটেছে।

আমরা পূর্ব্বে যে একুশ-দফা দাবীর বিষয় উল্লেখ করেছি তা এই স্যানটুং অধিকারের পরবর্ত্তী ঘটনা। কিন্তু জাপ-মার্কিণ সম্বন্ধ বিচারে একুশ-দফা দাবী যেমন অপরিহার্য্য তেমন স্যানটুং অধিকারের উল্লেখও অপরিহার্য্য। স্যানটুং অধিকার করেই জাপান চীনের নিকট একুশ-দফা দাবী পেশ করে। মার্কিনরা মনে করে এই দাবী তাদের 'মুক্তদ্বার নীতি'র মূলে কুঠারাঘাত করেছে। সব ক্ষেত্রেই চীনে জাপানী বৈদেশিক নীতি একটু বিশেষ সুযোগ পেয়েছে—তার কারণ উভয় দেশের ভৌগোলিক নৈকট্য। যে-হেতু জাপান একবারে চীনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সেই-হেতুই চীন-শোষণ-কার্য্যে জাপান মার্কিনদের চেয়ে প্রারম্ভিক সুবিধা পেয়েছে; এবং মার্কিনরাও অনেক ক্ষেত্রে তা মেনে নিয়েছে। পরে ল্যানসিং-ইশি চুক্তির বিস্তৃত আলোচনায়ও এই ভৌগোলিক নৈকট্যের কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে। এ থেকে একটি বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে মার্কিনরাও (বর্ত্তমান যুদ্ধ সুরু হবার বহু পূর্ব্বে) জাপানকে চীনে একটা বিশেষ আসন দিয়েছিল। তা না হলে territorial propinquity-র রাজনৈতিক মর্য্যাদা দেবার কোন মানে হয় না। অবিশ্যি territorial propinquity কথাটার রাজনৈতিক মূল্য মার্কিন স্বরাষ্ট্র সচিব ব্রায়ান (Bryau) বিশেষ ভাবে দেন। স্বরাষ্ট্র সচিব ল্যানসিং আবার তার প্রতিবাদও করেন। কেননা এই কথাটি পরে এমন একটি রাজনৈতিক গুরুত্ব ধারণ করে যে ল্যানসিংকে তা নিয়ে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল।

বিভিন্ন দিক দিয়ে বিচার করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে জাপানের ইচ্ছা চীনের যুদ্ধে যোগদান করার পক্ষে অনুকূল ছিল না। পক্ষান্তরে মার্কিনরা চেয়েছিল যে চীন জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুক। গত মহাযুদ্ধের সময়—জাপানের ইচ্ছা ছিল যে, চীন যেন কোন মতেই জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করে। (অবশ্যি এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে; ওয়াং-চিং-উই অন্য মত পোষণ করতেন)। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ৩রা ফেব্রুয়ারী মার্কিনরা জার্মাণীর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে এবং অন্যান্য নিরপেক্ষ জাতিগুলিকে অনুরোধ করে যাতে তারা মার্কিনদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। অবশ্যি এ অনুরোধের লক্ষ্য-স্থল ছিল লাটিন আমেরিকা। যাই হোক মার্কিন রাজনৈতিক মহলের ধারণা ছিল যে চীন মিত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু বাধা সেখানে একমাত্র জাপান। এই ধারণার মধ্যে খানিকটা যে সত্য ছিল না এমন নয়। এখানে জাপানী কূটনৈতিক মহল অনেকটা আতঙ্কগ্রস্ত। জাপানী কূটনৈতিক মহল মার্কিনদের অস্ত্রসজ্জার অপরিমিত প্রসার দেখে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এবং এই অস্ত্রসজ্জার যদি কিছু অংশ চীন মিত্রশক্তির অংশীদার হিসবে পায় তবে চীন হয় ত তার প্রতি পূর্ব্ব অবিচারের সমাধান করতে চাইবে। এবং সে ক্ষেত্রে মার্কিনরা চীনকে অনেকখানি সাহায্যও হয়ত করবে। মার্কিনরা যদি যুদ্ধোত্তর বিশ্বে চীনে তাদের প্রভাব খুব শোক করে গড়ে তুলতে পারে তাহলে বর্ত্তমানের এই ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী খুব বড় বাধা হয়ে উঠবে না। মিত্রশক্তির অংশীদার হিসেবে জাপানের চেয়ে চীন যে বেশী সুযোগ পাবে তার অনেক কারণ বর্ত্তমান। তাছাড়া চীন একুশ-দফা দাবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে একেবারে নিছক নিঃসহায় মনে করছে। এদিকে একুশ-দফা দাবীকে মার্কিনরা প্রতিবাদের দৃষ্টি দিয়ে দেখছে। এই সব বিবিধ কারণে জাপান চীনের যুদ্ধে অবতরণ করার পক্ষে ছিল না। আবার মার্কিন কূটনীতি হয়ত এভাবেও ভাবতে পারে যে জাপানের এই সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ, যা প্রথমেই চীনে সবার সমানাধিকারবাদকে ধ্বংস করতে উদ্যত, তাকে যে কোন প্রকারেই হোক বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি অঙ্কুরে বিনাশ না হয় পরে হয় ত তা বিশাল মহীরূহে পরিণত হবে। (কথা প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে জাপানের আশা অঙ্কুরেই বিনাশ হয়েছিল।

কেননা ওয়াশিংটন বৈঠকে জাপান তার একুশ-দফা দাবী তুলে নিতে বাধ্য হয়।) যাই হোক মার্কিনরা বিষয়টার গুরুত্ব পূর্ব্ব থেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল। এবং সেইভাবে স্বরাষ্ট্র সচিব ল্যানসিং তাঁর নীতি অবলম্বন করেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন মার্কিনস্থ জাপানী রাজদূত মার্কিন স্বরাষ্ট্র সচিব ল্যানসিংএর কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠান। এই স্মারকলিপি আলোচনায় মার্কিনদের চীন সম্পর্কে একটা মৌলিক নীতির যে ভাবে উল্লেখ করা হয় সেটা ল্যানসিং-এর মোটেই মনঃপুত ছিল না। জাপানী রাজদূতের ভাষণে প্রকাশ যে মার্কিনরা চীনে জাপানের বিশেষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মর্য্যাদা মেনে নিয়েছে। কাজেই চীন সম্পর্কে কোন নীতিগত আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হলে এই প্রতিপাদ্য বিষয় মেনে নিয়ে তবেই আলোচনা চলতে পারে। জাপানের হঠাৎ এই স্মারকলিপি রচিত ও প্রেরিত হবার কারণ আছে। গত মহাযুদ্ধের সময় চীন যখন সত্য সত্যই স্থির করে যে সে মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেবে,তখন মার্কিনদের ধারণা হয় যে জাপানীরা চীনে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নানাবিধ সাহায্য করে। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মার্কিনরা তাদের বৈদেশিক নীতির ইঙ্গিত করে এক সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম পিকিনে পাঠায়। মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তর যে সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম পিকিন গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঠায় তার মর্ম্মার্থ এই :—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনে ইদানীং যে সব রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছে তা খুব উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করছে এবং আশা করে যে শীঘ্রই চীনে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে। এখানে এটা মোটেই মুখ্য বিষয় না যে চীন যুদ্ধে যোগ দিয়েছে এখানে সব চেয়ে চীনের পক্ষে অপরিহার্য্য মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে তার জাতীয়তা কেন না সে এই জাতীয়তার পথে অগ্রসর হবার জন্য অসীম ধৈর্য্য ও ত্যাগ স্বীকার করেছে।

চীনে কি জাতীয় রাষ্ট্র গঠন হয় বা কোন শ্রেণী সেই রাষ্ট্রের অন্তরধার হিসেবে কাজ করে সে সম্বন্ধে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের ঔৎসুক্য ততটুকুই যতটুকু পর্য্যন্ত সে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) চীনের পক্ষে বন্ধুভাবে কোন কাজে আসতে পারে। কিন্তু চীনে সংহত ও কেন্দ্রীভূত কোন রাষ্ট্র যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় সে বিষয় মার্কিন রাষ্ট্রের দৃষ্টি খুব সজাগ। মার্কিন রাষ্ট্র খুবই আশা করেছিল যে চীন তার উপদলীয় বা দলীয় স্বার্থের সংঘাত ভুলে গিয়ে বিশ্ব রাষ্ট্র সমাজে এক সংহত ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠ নাহিত্বশীল রাষ্ট্র গঠন করবে।

মোটামুটি কথা এই যে যদি চীনে কোন সুযোগপূর্ণ রাজনৈতিক আবহাওয়া দেখা দেয় তবে মার্কিন রাষ্ট্রের পক্ষে তা অনেক ক্ষতিকর হতে পারে। এই আসল স্বার্থের কথাটা যখন মার্কিন রাষ্ট্র বেশ সুন্দর ভাষায় ভদ্র লোকের মত পত্রস্থ করেছে তখনই জাপানের টনক নড়েছে। জাপানী পররাষ্ট্র দপ্তর তখনই চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে তবে মার্কিনদের সত্যিকারের উদ্দেশ্য চীনে কি ?

জাপানের বক্তব্য হচ্ছে এই যে স্বরাষ্ট্র সচিব ব্রায়ান (Bryan) ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ তারিখের পত্রে জাপানের চীনে যে বিশেষ দাবী আছে তা মেনে নিয়েছেন। মূলত এই জাপানী দাবী মেনে নেবার ব্যাপারটা ঘটে একুশ-দফা দাবী উত্থাপন করবার অব্যবহিত পরে। স্বরাষ্ট্র সচিব ব্রায়ানের মূল বক্তব্য অথবা উদ্দেশ্য এখানে যে বিকৃত করা হয়েছে তার প্রমাণ আছে। কেননা ল্যানসিং-ইসি আলোচনা ক্ষেত্রে এটি প্রকাশ হয়ে পড়ে যে স্বরাষ্ট্র সচিব জাপানের ভৌগোলিক নৈকট্যের কথা মনে করেই উপরি-উক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু জাপান সেই বক্তব্যের ব্যাখ্যা করে নিজের সুবিধামত নীতি গ্রহণ করে, যাতে তার স্বার্থ ও প্রভুত্ব চীনে বজায় থাকে।

জাপানী রাজদূত আশা করেন যে স্বরাষ্ট্র সচিব ল্যানসিং যেন তার পূর্ব্ববর্ত্তীর নীতিই গ্রহণ করেন। জাপানী রাজদূতের এ আশার ভিত্তি কি তা বোঝা মুস্কিল। যাইহোক এর পরবর্ত্তী ঘটনায় জাপ-মার্কিন সম্বন্ধ আরও জটিল হয়ে ওঠে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ১৮ই জুন জাপানী পররাষ্ট্র সচিব টোকিওস্থিত মার্কিন রাজদূতের কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করেন। এই স্মারকলিপিতে স্পষ্ট দাবী পেশ করা হয় যে জাপান চীনে এক সার্ব্বভৌম স্বার্থের অধিকারী ; এবং এই স্বার্থ যেমন রাজনৈতিক তেমন অর্থনৈতিক। এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করার এই যে ইতিপূর্ব্বে যে স্বার্থ "বিশেষ" ছিল। তা এখন "সার্ব্বভৌম" হল। তার অর্থ যে দাবী আগে অপরিস্ফুট ছিল। তা ক্রমশই কূটনীতির ভাষায় পরিস্ফুট হতে সুরু করল।

এতক্ষণ আমরা যে ল্যানসিং-ইসির আলোচনার কথা উল্লেখ করেছি তা আসলে সুরু হয় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর। ঠিক চীন যুদ্ধ ঘোষণা করার এক সপ্তাহ পরেই ভাইকাউন্ট ইসি ওয়াশিংটনে আসেন। খুব ধুরন্ধর কূটনীতিজ্ঞ বলে ইসির খ্যাতি আছে। তিনি ওয়াশিংটনে আসেন বিশেষ দূত হিসাবে। নানা কারণে ইসির ওয়াশিংটনে আগমন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইসি যে শুধু কূটনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এসেছিলেন তা নয়। কি পরিমাণ অর্থনৈতিক সুবিধা মার্কিনদের কাছে আদায় করা যায় এ উদ্দেশ্যও তার মাথায় ছিল। আর কূটনৈতিক দিক থেকে বলতে গেলে আর একটা উদ্দেশ্য ছিল যে মার্কিন জনমত যেন কোন ক্রমেই জাপানের বিরুদ্ধবাদী না হয়ে ওঠে। একুশ-দফা দাবী পেশ করার পর থেকেই মার্কিন জনমত ক্রমশই জাপান সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠে। যদি মার্কিন জনমত জাপানের বিরুদ্ধবাদী হয়ে ওঠে তবে জাপানের পক্ষে বাণিজ্যের অসুবিধা প্রচুর। কেননা জাপানের প্রয়োজনীয় বাণিজ্য জাহাজ তৈরীর মালমশলার যথেষ্ট অভাব আছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে একমাত্র মার্কিনরা ছাড়া জাপানকে আর কেউ ধার দিতে সমর্থ নয়। সবাই এখন নিজের যোগান দিতে ব্যস্ত এ অবস্থায় মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া কেউ নেই। সেই জন্যই ল্যানসিং-ইসি আলোচনায় জাপানের বাণিজ্য জাহাজের স্বল্পতার কথা উল্লেখ হয়। ভাইকাউন্ট ইসি বলেন যে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র যদি তার রপ্তানী বাণিজ্যের ওপর বিধিনিষেধ তুলে না নেয় তবে জাপানের পক্ষে ঠিক ঠিক যুদ্ধের সম্ভার তৈরী করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার উত্তরে ল্যানসিং জানায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই রপ্তানী বাণিজ্যের ওপর বিধিনিষেধ তুলে নেবে যদি জাপান রাজী হয় তা যে তার জাহাজ ব্যবসায় উদ্বেগকে খাটাবে বলে। এই কথাটা সরাসরি ভাবে স্বীকার করা কঠিন। কেননা যুদ্ধ প্রয়োজনে জাহাজের স্বল্পতা যেমনি মার্কিনদের দেখা দিয়েছে তেমনি জাপানেরও দেখা দিয়েছে। জাপানী জাহাজ শুধুই মাত্র বাণিজ্য বহন করে বেড়াবে পক্ষান্তরে তার নিজের আত্মরক্ষা বাধা পাবে—এটা সম্ভব নয়। তা ছাড়া জাপানের বহির্বাণিজ্যের দিক থেকে আরও বলার আছে, ইউরোপের অন্যান্য শক্তিবর্গ যখন যুদ্ধে আটকা পড়েছে সেই অবসরে জাপান নিজের বহির্বাণিজ্যের প্রসার ও ঘাঁটি তৈরী করেছে। গোটা প্রশান্তমহাসাগর এলাকার বাজার এই ফাঁকে অধিকার করার চেষ্টা করেছে। এই বাণিজ্য প্রসারের কাজে জাপানের আর একটা বিশেষ সুবিধা হল যে সে মিত্র শক্তির অংশীদার—কাজেই অনেকটা বিনা প্রতিযোগিতায় অন্তর বাজার দখল করেছে। কিন্তু এই সবের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা কিছু থাকা চাই। কিন্তু স্বরাষ্ট্র সচিব ল্যানসিং-এর কথার ঝোঁকটা বাণিজ্য জাহাজের দিকেই যুদ্ধ জাহাজের দিকে নয়। শেষ পর্যন্ত এই বলে একটা সিদ্ধান্ত করা হয় যে জাপান জাহাজ তৈরীর উপযুক্ত কাঁচামাল মার্কিনদের কাছ থেকে পাবে বটে তবে জাপানী বাণিজ্য জাহাজকে ব্যবহারের সুযোগ মার্কিনদের দিতে হবে। ভাইকাউন্ট ইসিও তথাস্তু বলে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে।

প্যারী

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

রাত্রে প্যারীর কোমিনী রোডে পৌঁছি, তাই বুঝতে পারিনি জায়গাটি কিরূপ স্থানে অবস্থিত। অন্ধকার তখনও কাটে নি, তবে আশে পাশে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারলাম রাত্রি প্রভাত হয়েছে। শীতের দেশে ঘুম ভাঙলেও বিছানা ত্যাগ করতে ইচ্ছা হয় না। আমি চোখ বুজেই শুয়েছিলাম। হঠাৎ মনে হল শরীরের উপরে গুটিকতক বড় বড় উকুন যেন চলাফেরা করছে। আর শুতে পারলাম না। তৎক্ষণাৎ বিছানা পরিত্যাগ করে একখানা তোয়ালে দিয়ে শরীরটা মুছে ফেললাম। পোষাক পরে একটি চেয়ারে বসে নিকটের বিছানায়-শোওয়া সাথীকে ডাকলাম। সাথীও আমার মতই অপর বিছানায় উলংগ হয়ে শুয়েছিল। সেও ঘুম থেকে উঠেই আমারই মত আগে তার শরীরটা তোয়ালে দিয়ে মুছে পরে

কাপড় চোপড় পরে নিল। সাথীকে জিজ্ঞাসা করলাম এরূপ কর্দর্য্য স্থানে আসবার কারণ কি? সে জবাব দিল এই পৃথিবীতে যারা দরিদ্র এবং নিপীড়িতের জন্য কাজ করে, তাদের প্রথম দিকে কষ্ট পেতেই হয়; পরে যখন কৃষক মজুররা রাজ্য-শাসনের ভার নিজেদের হাতে কেড়ে নেয় তখনই নিপীড়ন ও শোষণের সমাপ্তি ঘটে। আরও বলল গত পাঁচ বৎসর ধ'রে সে আত্মগোপন করে আছে। ফ্রান্সে যদিও সোশিয়ালিষ্টদের বেশ প্রাধান্যই রয়েছে, আসলে কিন্তু তারা মোটেই সোশিয়ালিষ্ট নয়। তারাও চায় ফ্রান্সের ধনী এবং দরিদ্র এ দুই শ্রেণীই বজায় থাকুক। কতকগুলি লোক নিরন্ন, বিবস্ত্র হয়েই জীবন নিঃশেষ করুক। সোশিয়ালিষ্টরা বলে, যদি পৃথিবী হতে ধনী এবং দরিদ্র এই শ্রেণী বিভাগ লোপ পেয়ে যায় তবে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যই থাকবে না। এই নরপশুরা এদের বিরুদ্ধমত পোষণ করে বলেই ফ্রান্সের সর্বত্র ধরপাকড় অনবরতই চলেছে।

সাথীর কথায় আমি বিশেষ সাড়া দিলাম না। শুধু বললাম কিছুটা গরম জল আনিয়ে দিন, হাত মুখ ধুয়ে কিছুটা খেতে হবে। পাশের রুমে ঘুমন্ত বৃদ্ধকে জাগিয়ে গরম জলের ব্যবস্থা করলাম। গরম-জলের পাত্রটি অপরিষ্কার ছিল এবং গরম জল মোটেই ব্যবহারের উপযুক্ত ছিল না। সাথী এবং বৃদ্ধকে নিয়ে আমরা পথে এলাম। বাইরে তখন পিন্‌পিনে বৃষ্টি পড়ছিল। বৃষ্টিতে ভিজেই আমরা নিকটস্থ একটি রেঁস্তোরায় গেলাম। রেঁস্তোরা আয়তনে খুবই ছোট। কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারের যে কোন চায়ের দোকানের সংগে তার তুলনা চলে। তবে যে সকল লোক রেঁস্তোরায় বসে খাচ্ছিল তারা কলেজ স্কোয়ারে চায়ের দোকানের আগন্তুকদের চেয়ে স্বতন্ত্র ধরনের ছিল। কথাবার্তা তারা খুবই কম বলছিল এবং যা বলছিল তা সবই কোন একটি ভাল বিষয়বস্তু নিয়ে। খাওয়া শেষ করে আমরা বাসে গিয়ে চড়লাম এবং চ্যায়েস্ ক্লঁই নামক পথে গিয়ে পৌঁছলাম। চ্যায়েস ক্লঁইর যে বাড়িতে গিয়ে আমরা উঠি সেই বাড়ি একজন ধনীর এবং আশে পাশে আরও ধনী লোক বাস করত। চ্যায়েস্ ক্লঁইর বাড়ীটাতে অনেক ভদ্রলোক ভাল বেশভূষায় বসা ছিলেন। আমার পরিচয় পেয়ে তাঁদের একজন বললেন "আজকাল টুরিষ্টের সংখ্যা বেশ বেড়ে গেছে। এতদূর থেকেও যে টুরিষ্ট এখানে আসতে পারে সেটাই আমি আশ্চর্য্যের বিষয়। এদের খাওয়া থাকা কি করে চলে? এরাও কি আমেরিকার (Hobo) হবোদের মতই একরকমের জীব? লোকটা তাড়াতাড়ি চ'লে গেলে আমরা রেহাই পাই; কারণ একে আমরা কিছুই দিতে পারব না।" এতগুলি কথা হয়েছিল এর বিন্দু বিসর্গও আমি বুঝতে পারিনি। তবে যে ভদ্রলোক কথা বলছিলেন, তাঁর মুখের অবস্থা এবং হাত-পা নাড়া দেখে বুঝতে পেরেছিলাম তিনি আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আমাকে যখন আমার সাথীরা বলল এখানে কাজ শেষ হয়েছে এখন চলুন, তখন আমি আমার সাথীকে বললাম "দয়া করে একটু দাঁড়ান, আমি এদের ঘরটা দেখে নেই।" তারা দাঁড়াল। গৃহস্বামীর আদেশ না নিয়েই ঘরের চারিদিক দেখে নিয়ে আমি বললাম—"এরা নিশ্চয়ই ধনী লোক, এদের বাড়ীতে কেন আমায় নিয়ে আসছেন? এরকম লোকের বাড়ীতে আমাকে আর কখনও নিয়ে আসবেন না। আমি পৃথিবীর ধনী এবং বড়লোকদের সংগে পরিচিত হইতে চাই না।" তারপর গৃহস্বামীর দিকে তাকিয়ে বললাম "আপনার বাড়ীতে ওরা কেন যে আমাকে নিয়ে আসছেন্ তা বুঝতে পারছি না। আপনার সময় ক্ষেপণের জন্য ক্ষমা করবেন।" এই বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে আসলাম। পথে এসে সাথীদের জিজ্ঞাসা করলাম, গৃহস্বামীর সংগে তাদের কি কথাবার্তা হয়েছিল। গৃহস্বামীর সংগে যে সকল কথা হয়েছিল সাথীরা আমাকে তা জানাল এবং বলল "এই প্রকারের লোকই ফ্রান্সের গণতন্ত্রের শাসনকর্তা। পৃথিবীর লোক ফ্রান্সের সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার কথা শুনে সুখী হয়। এই প্রকারের ধনীরাই এই গালভরা কথাগুলির মালিক।"

পায়ে হেটে পথচলা তখনকার দিনে আমার কাছে কষ্টকর ছিল। ফের আমরা বাসে ক'রে প্যারীর সৌন্দর্য দেখতে দেখতে অগ্রসর হতে লাগলাম। পথে নানা ধরণের লোক জনের সংগে দেখা হ'তে লাগল। অনেক লোক দেখলাম যাদের সংগে কলকাতায় তথাকথিত মধ্যবিত্তদের সংগে বেশ সদৃশ রয়েছে। একজনের সংগে অন্যজনের দেখা

হওয়া মাত্রই নানারূপ আলাপ এবং আলোচনা সুরু হয়, অথচ একে অন্যকে যে সকল কথা বলে তার কোনই মূল্য নেই। আমার সাথীদের অনুগ্রহেই এই সকল কথা বুঝতে পেরেছিলাম। যদি সাথীরা সংগে না থাকত তবে এ সকল কথা কিছুই বুঝতে সক্ষম হতাম না।

লোকে বলে প্যারী বড়ই সুন্দর। কিন্তু সৌন্দর্যময় প্যারীতে এসে দেখলাম সেখানে সৌন্দর্য বলে কিছুই নেই। যে সকল প্রাসাদের কথা লোকমুখে শুনতে পাওয়া যায়, সেই প্রাসাদগুলি দেখলে মনে হয়না তাতে কোনরূপ সৌন্দর্য আছে। সর্বত্রই বুভুক্ষা-রাক্ষসী যেন মুখ খুলে রয়েছে। বড় বড় বাড়ির পাশে এমন দরিদ্র লোক দেখতে পাওয়াযায় যে,তাদের দেখলে যে কোন লোকের দুঃখ হয়। যে দেশে সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার কথা উচ্চকণ্ঠে বলা হয়, সেই দেশের লোকের সংগে পথে বের হ'তে হ'লেই পরিচয়পত্র নিয়ে বের হ'তে হয়। শুধু পরিচয়পত্র সংগে রাখলে হয় না; পাঁচটি ফ্রাংকও পকেটে রাখতে হয়, নতুবা ভিখারী-আইনের ফাঁদে পড়তে বেশী সময় লাগে না। ইউরোপের কোথাও এইরূপ আইনের প্রচলন নাই। অথচ যে দেশের লোক একের নম্বর স্বাধীন বলে পরিচয় দেয়, সেই দেশেই এইরূপ নিয়ম-কানুন প্রচলিত রয়েছে।

এবার আমরা একটি বৃহৎ কাফেতে গিয়ে উঠলাম। কাফেতে কমের পক্ষে পাঁচশত নর-নারী বসা ছিল এবং প্রত্যেকেই নানারূপ কথাবার্তা বলে সময় কাটাচ্ছিল। আমরা তিনজনেও একটি টেবিল অধিকার করে প্রত্যেকের দরকার অনুযায়ী মধ্যাহ্ন ভোজনের খাদ্যের আদেশ করলাম। খাওয়া হয়ে গেলে বৃদ্ধ এবং আমার খাওয়ার বিল দশ ফ্রাংক চুকিয়ে দিয়ে আমি আমার ভিক্ষাপত্র কাফেতে উপস্থিত স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে বিতরণ করে আসলাম; দুইশত কার্ডের কম বিতরণ করি নাই। দুইশত কার্ড বিতরণের ফলে পনর ফ্রাংক পেয়েছিলাম। এত বড় একটি কাফেতে পনর ফ্রাংক পাব ব'লে আমি মনেও স্থান দেই নাই। ভেবেছিলাম, এতবড় কাফেতে কমের পক্ষেও একশত ফ্রাংক পাওয়া যাবে। এত কম পাবার একমাত্র কারণ হলো,এখানে যত নর-নারী উপস্থিত ছিলেন, তারা প্রায়ই ধনীদের গৃহের চাকর ও চাকরাণী। ফ্রান্সের ধনীদের গৃহে চাকর এবং চাকরাণীরা অল্প-ভাষী এবং কৃপণ হয়ে থাকে। এই গুণটি তারা তাদের মনিবের কাছ থেকেই আয়ত্ব করে।

কাফে হ'তে বিদায় নিয়ে আমি এবং বৃদ্ধ সেন্ত্রে-দু-সেলুই-এর দিকে রওয়ানা হই এবং বিকাল বেলায় এসে পৌছি। বৃদ্ধ আমাকে ঘরের বারান্দায় রেখেই নিজের রুমে চলে গেল। আমি যখন কমনরুমে বসে বিশ্রাম করছিলাম তখন দুজন সোশিয়ালিষ্ট এসে আমার সংগে রাষ্ট্রনীতি নিয়ে সমালোচনা করতে থাকেন। তারা বিশুদ্ধ ইংরাজীতে কথা বলছিল। তারা ছিলেন এন্টি-সোভিয়েট্। সোশিয়ালিষ্ট মতাবলম্বী কি ক'রে এন্টি-সোভিয়েট্ হ'তে পারে তা আমার ধারণা ছিল না। এই ভদ্রলোক দুটি সোজাসোজি সোভিয়েট্ রুশের বিপক্ষে কিছুই বলেন নাই। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কি সাদা রুশ? তারা তৎক্ষণাৎ বললেন "আপনি ঠিক ধরতে পেরেছেন, আমরা রুশ দেশবাসী ছিলাম। বর্তমানে ষ্টালিনের অত্যাচারে অত্যাচারিত হ'য়ে এদেশে এসেছি।" দেশত্যাগী, রাজভক্ত, ভগবানে বিশ্বাসী সাদা রুশদের প্রতি আমার একটা ঘৃণার ভাব সকল সময়ই ছিল। আজ এই দুইটি সাদা-রুশের পরিচয় পেয়ে তৎক্ষণাৎ মুখ হতে থুথু ফেলে দিয়ে বললাম, আমি আপনাদের সংগে কোনরূপ বাক্যালাপ করতে চাই না। আপনারা যে কি রকম জীব, তা আমি বিশেষরূপে জানি। অতএব আমার সংগে আর কথা বলবেন না।

প্যারী নগরীতে মোট ২০ দিন ছিলাম। চারিটা দিন কোনরূপ বিপদ আপদ ঘটেনি, কিন্তু সাদা-রুশদের আক্রমণ করার পর থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম আমার পেছনে লোক লেগেছে এবং আমাকে বিপদে ফেলবার জন্য নানারূপ চেষ্টা-চরিত্র করছে। সেইদিনই বিকাল বেলা যখন এক প্যাকেট সিগারেট কিনবার জন্য আমি বাইরে গিয়েছিলাম তখন হঠাৎ একজন পুলিশ আমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে একটা জাঁড়ি পুলিশ ষ্টেশনে বসিয়ে রাখে। কি অপরাধে আমাকে ধ'রে নিয়ে আটক ক'রে রাখা হ'ল জিজ্ঞাসা করলে তার কোনও উত্তর পেলাম না। এইরূপ করে আমাকে মোট চৌদ্দবার শুধু প্যারী নগরীতে আটক রাখা হ'য়েছিল।

সুখের বিষয় ইংলণ্ডে পৌঁছবার পর সেরূপ কষ্ট আমার মোটেই হয় নি। ইংলণ্ডে প্রকাশ্য ভাবে মত প্রকাশ করলে আটক থাকার ভয়ের কোন কারণ থাকে না। ইংলণ্ডের ডিমোক্রেসীর সঙ্গে যদি ফ্রান্সের ডিমোক্রেসীর তুলনা করা হয়, তবে অন্যায় করা হবে। উভয় ডিমোক্রেসীতে অনেক তফাৎ রয়েছে। ইংলণ্ডে তুমি প্রাণভরে বকতে পার, কিন্তু যেই কাজে অগ্রসর হবে, দেখতে পাবে তোমার পায়ে বেড়ি প'ড়েছে। ফ্রান্সে বকতেও পারবে না, কাজের কথা উঠলেই গুলির সম্ভাবনাও আছে। পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীরা ডিমোক্রেসীর অর্থ কি বলতে চায় তারাই জানে। আমাদের এসব বড় কথায় কর্ণপাত না করাই ভাল। ডিমোক্রেসীকে অনেকেই আবার 'হিপোক্রেসী' (ভণ্ডামী) বলে উপহাসও করে। এই উপহাস ফ্রান্সে, বৃটেনে এবং আমেরিকায় শুনতে পেয়েছি অনেকবারই।

নামের মোহ

শ্রীঅন্তেবাসী

বহুদিন পূর্ব্বে 'মন্দিরা'তে "কালের যাত্রা" অংশে "নামের মোহ" বিষয়ে একটি মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। মন্তব্যটি মানুষের সাধারণ দৌর্ব্বল্য সম্বন্ধে ছিল। আমাদের দেশের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক কর্ম্মীদের মধ্যে নাম জাহির করা চিরদিনই অন্যতম বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। "নামকা ওয়াস্তে" চিরদিনই বিদ্রূপের বাণী। এই কারণেই আমাদের দেশের বহু বৈপ্লবিক রাজনৈতিক কর্ম্মী চিরদিনই দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের নিকট অপরিচিতই রহিয়া গিয়াছেন। দেশের সাধারণ লোকে যখন ইহাদের কার্য্যকলাপের ফলভোগী হয়—তখন তাহারা বোঝে ইহা "স্বদেশী" ছেলেদের জন্য বা (পরবর্ত্তী যুগে) কংগ্রেসের জন্য হইয়াছে। ইহার ফলে সমগ্র প্রতিষ্ঠানটির উপরই দেশবাসীর দরদ বৃদ্ধি পায় এবং তাহার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ফলে প্রতিষ্ঠানটিও শক্তিমান্ হইয়া আরো বড় কাজ, দুরূহ কাজ করিতে পারে।

কিন্তু প্রতিষ্ঠানের মূল আদর্শ ও কার্য্যপদ্ধতি সমাজের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য যেখানে লক্ষ্যবদ্ধ নহে, সেখানেই প্রতিষ্ঠান কর্ম্মীকে বড় করিতে চেষ্টা করে; তাহার ছবি বাহির করিয়া, তাহার সুকৃত কার্য্যকে বড় করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করে—নামের মোহের ফাঁদে কর্ম্মী সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে,—কারণ কর্ম্ম সেখানে কর্ম্মীকে সংগ্রহ করিতে অসমর্থ।

এই পদ্ধতি হিটলারের ন্যাশানাল সোস্যালিষ্ট দল ও মুসোলিনীর ফ্যাসিদল অবলম্বন করিয়া নিজেদের দল-বৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল। দলবৃদ্ধির এই সহজ উপায় ইহার পর অনেকেই অনুসরণ করিয়াছে। নিজেদের পারিপার্শ্বিক ও পরিপ্রেক্ষিতকে উপেক্ষা করিয়া যখন কোনো দল গড়িয়া উঠে, তখনই তাহারা দল বৃদ্ধির এই সহজ উপায় গ্রহণ করে। আমাদের এদেশে কম্যুনিষ্টরা যতদিন দেশের পরিপ্রেক্ষিতকে স্বীকার করিয়া কাজ করিয়া যাইতেছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা নামের মোহ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু যেদিনই বাহিরের কারণে বাধ্য হইয়া তাঁহারা আমাদের দেশের ও সমাজের পারিপার্শ্বিককে অস্বীকার করিলেন, সেদিনই তাঁহারা তাঁহাদের দলরক্ষা ও দলবৃদ্ধির জন্য "নামের মোহ"কে বড় করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন—দল রাখিতে এমনি করিয়া তাঁহারা নিজেদের আত্মমর্য্যাদা ও সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্ব বহুস্থলে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

"পীপ্‌ল্‌স্ ওয়ার" ও "জনযুদ্ধ"-এর প্রায় প্রত্যেকটি সংখ্যাই নিজেদের দলের কর্ম্মীদের তথাকথিত "কৃতকার্য্যের" উল্লাসে পরিপূর্ণ থাকে। এই একান্ত নির্লজ্জ ও প্রায় সর্ব্বদাই মিথ্যাদ্বারা অতিরঞ্জিত আত্মপ্রশংসার বাহুল্য যে ইহাদের আত্মহত্যার নামান্তর, সে-বিষয়ে ইহাদের দলপতিদের ধারণা নাই বলিয়া ইহাদের চাতুর্য্যের অবমাননা করিতে চাহি না। ইহারা মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুন সংবাদ নিশ্চয়ই জানেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরের সরলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুন-সৃষ্ট এক সাময়িক সঙ্কট হইতে কৌরব পক্ষ বাঁচিয়া যাওয়াতে অর্জ্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে অপমান করিয়া বসেন। পরে উত্তেজনা কমিলে অর্জ্জুনের অত্যন্ত অনুশোচনা হয়; এমন

দেবতুল্য ভ্রাতাকে অপমান করিয়া বাঁচিয়া থাকা অন্যায় ভাবিয়া, অর্জুন আত্মহত্যা করিতে যান। ঠিক সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের দেখা। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত অবগত হইয়া বলিলেন যে, আত্মহত্যা করা মহাপাপ। তবে অর্জুন ভ্রাতৃ-নিন্দা করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছে সে পাপ হইতে মুক্তি পাইতে হইলে আত্মহত্যা করা ব্যতীত গত্যন্তরও নাই। কিন্তু তৎপরিবর্তে আত্ম-প্রশংসা করিলেই তাঁহার সেই পাপমোচন হইবে। কারণ শাস্ত্র ও মহাজন বিধি হইতেছে যে, আত্ম-প্রশংসা আত্মহত্যারই ন্যায় মহাপাপ। আমাদের কম্যুনিষ্ট নেতারা যে ইহা জানেন না তাহা নহে; বরং আমাদের মনে হয়, জানিয়া শুনিয়াই তাঁহারা আত্মপ্রশংসার দরজাগুলি তাঁহাদের সমস্ত প্রচার পত্রিকাগুলিতে পরিপূর্ণভাবে উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যাহাতে ইহাদের মধ্য দিয়া সরল ছাত্রের দল আসিয়া তাঁহাদের ফাঁদে পড়ে এবং এই ভাবে আত্মহত্যা করিয়া বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদলের অভিপ্রায় পূর্ণ করে।

ষ্টুডেন্টস্ ফেডারেশনরূপ মক্ষিকাটিকে এই টিকটিকির দল যে এই কারণেই গ্রাস করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুকে তাঁওতা দিয়া ভুলাইয়া আনিবার মধ্যে তাঁহাদের এই টিকটিকি বুদ্ধিই যে পরিপূর্ণ ভাবে বর্তমান ছিল, সে বিষয়টি যতই দিন যাইতেছে ততই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। নিজেদের দলবৃদ্ধি করিতে ইহাদের যে চাতুর্য্য ও তৎপরতা দেখা যায়, তাহা যদি দেশের স্বাধীনতা আনয়নের জন্য, দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব সংঘটনের জন্য ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে আজ দেশবাসী ইহাদের মাথায় করিয়া রাখিত; ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর চর বলিয়া ইহারা ধিক্কৃত হইত না।

যে কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া ইহাদের দলবৃদ্ধি করিবার যে চেষ্টা ইহাদের পাইয়া বসিয়াছে, তাহাতে ইহাদের দলপতিরা, নিজেদের অবস্থা দিন দিন কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, সে বিষয়ে যে বেশ সন্ত্রস্ত হইয়াছেন তাহা সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়। 'রবীন্দ্র-স্মৃতি দিবস' উপলক্ষে ইহারা নিজেদের ক্ষীয়মাণ দলকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য যে ভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, তাহাতেও দলের শোচনীয় অবস্থার কথাই পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। ফেডারেশন "কেবল সভ্যদের জন্য" নাম দিয়া একটি ইস্তাহার বিভিন্ন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর সকল ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে, যাহারা ফেডারেশনের সভ্য নয় তাহাদের মধ্যে, বিলি ও সুযোগ বুঝিয়া বিক্রী করিতেছে। ইহারা মুখে বলিতেছে যে ইহার এক আনা দাম রবীন্দ্র-স্মৃতি ভাণ্ডারে যাইবে —কিন্তু ইস্তাহারটির কোথাও সেকথা লেখা নাই। ইস্তাহারে রবীন্দ্রনাথের একখানা ছবি আছে ও তাঁহার সম্বন্ধে কিছু উচ্ছ্বাস আছে—কিন্তু ভিতরটা খুলনার একটি কর্মীর কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত বিবৃতি আছে। এবং শেষে আছে যে এই ফেডারেশন-বীর-কর্মীর চেষ্টাতে খুলনা জেলার সমস্ত ছাত্রই ছাত্র ফেডারেশনের সভ্য হইয়া গিয়াছে! কিন্তু হায়, একথাটি কোথাও নাই যে ঐ খুলনা জেলায় যে পৌলতপুর কলেজ আছে তাহার ছাত্র ইউনিয়নে এই 'সহস্র-সূর্য্য প্রোজ্জ্বল' ফেডারেশনের সদস্যদের একজনও স্থান পায় নাই! প্রত্যেকটি আসনই প্রাদেশিক ছাত্র কংগ্রেসের সদস্যেরা নির্ব্বাচনে দখল করিয়াছে। অপর কলেজটিতে ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হয় নাই।

আমাদের কম্যুনিষ্টরা যদি মনে করেন যে নামের মোহ ও মিথ্যার বেসাতির সাহায্যে তাঁহারা দেশকে ভুলাইতে পারিবেন তাহা হইলে বলিব যে তাঁহারা সেই বহুল প্রচারিত ও প্রমাণিত প্রবচনটি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, You can fool some people for some time but not all people for all time.

এখনও সময় থাকিতে সতর্ক হইলে তাঁহারা বুদ্ধির পরিচয় দিবেন। বাংলার ছেলেমেয়েরা আর যাহাই হউক নির্ব্বোধ নহে। সংকট-ত্রাণ-সমিতি দ্বারা স্বাধীনতা পাওয়া যায় না, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হয় না—একথা তাহারা যে ধীরে ধীরে বুঝিতেছে তাহা কম্যুনিষ্ট প্রধানেরা হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছেন। বাংলার প্রাদেশিক কম্যুনিষ্ট দলে যে ভাঙনের সাড়া পড়িয়াছে তাহা তাহারই প্রতীক। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দাবার ঘুঁটি হিসাবে দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের চালাইবার এই হীন ও নীচ প্রচেষ্টা হইতে তাঁহারা যদি এখনও নিবৃত্ত না হন তাহা হইলে ইতিহাসের নির্ম্মম প্রতিশোধও যে তাহাদের জন্য উদ্যত হইয়া রহিয়াছে সে কথাও যেন তাঁহারা বিস্মৃত না হ'ন।

নির্বাসিত বিহঙ্গ

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী অনূদিত

[পঞ্চম পরিচ্ছেদ]

কয়েদী-বোঝাই একখানা গাড়ী এসে দাঁড়াল। বিভিন্ন রকমের লোক নেমে এল ধীরে ধীরে, যারা খেলায় মগ্ন ছিল, তারা ছাড়া এই নবাগতদের দেখে পুরাণোরা সবাই এসে সারি বেঁধে দাঁড়াল।

প্যাভলফ যেখানে ছিল—সেখানেই ঠায় বসে রইল। রুদ্ধ গাড়ীর বন্ধ হাওয়ায় গাদা-মারা স্ত্রীলোক ও শিশুদের অবস্থা—ক্ষুদ্র খাঁচায় আটকানো বন্য পশুর মতো—নিঃশ্বাস নেবার জন্যে তারা অবিরাম হাঁপায়। এ দৃশ্য প্যাভলফের মনে পীড়া দেয়।

প্যাভলফ আগের বিষয় নিয়েই অন্যমনস্ক—সেই ঠেলাগাড়ীর গাড়ী-ঠেলা মানুষটি, কুকুরের মনিব আর সেই গাড়োয়ানী চেহারার লোকটির কথাই তার মনে যেন সজীব স্মৃতি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনি সময় একজন নবাগত তার সমস্ত লটবহর কোন কাঠের ঘরে ফেলে রেখে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং এদিক ওদিক কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে প্যাভলফের কাছে এসে পড়ল। দীর্ঘ শরীর, মাথায় সুন্দর চুল, গালময় দাড়ি। তার দিকে চোখ পড়তেই প্যাভলফের মনের উপর যেন এক পরিচিত মুখের ছায়া এসে পড়ল। সে পলকে চমকে উঠল। এবং এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লোকটির দিকে।

লোকটি এবার এক পা দু' পা করে কাছে এসে পড়ল। প্যাভলফ তার আপাদ মস্তক লক্ষ্য করে নিল এবং চোখে চোখ পড়তেই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল লোকটাকে। —তুমি পালমা!

—ও, প্যাভলফ, তুমি!

সঙ্গে সঙ্গে উভয়েই উভয়ের হাত শক্ত করে চেপে ধরল।

—আহা, নরকেও বন্ধুজনের মুখ দেখলে শান্তি মিলে। স্বভাবসুলভ সকৌতুকে পালমা বলে।—তবে কিনা, এখানে তোমাকে দেখে তারি কষ্ট হল।

—আমারও কষ্ট হচ্ছে তোমাকে দেখে। তারপর?—ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে—তোমার স্ত্রী—হোপ ইভানোভনা—সে তো এখানে নয়?

—ভগবানকে সহস্র ধন্যবাদ—সে এখানে নয়।

প্যাভলফ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

পালমা সুর চড়িয়ে বলল, কিন্তু জানিনে সে কোথায়? কিন্তু এখানে নেই শুনেও দুহাত তুলে ভগবানের গুণগান করতে পারিনে। জানো বারোটি মাস হল—ওরা আমাকে ছিনিয়ে এনেছে আজ অবধি তার কোন খবরই আমি পাই নি। তবে···বলতে বলতে কথা আটকে গেল—মনের দুঃখ আবেগ কিছুতেই যেন চেপে রাখতে পারল না সে।

প্যাভলফ তার হাতে কাঁকুনি দিয়ে বলল: এখানে ঠিক হয়ে বসো ভাই—শুনি তোমার খবর। ওরা তোমায় কোথায় চালান দিয়েছে?

—কারা-প্রদেশে—দশ বছরের মেয়াদে।

—কেন?

পালমা শুকনো ঘাসের উপর বসে বলল: কেন, তা আমি জানিনে। ওরাও হয়ত জানে না—কিংবা কোন কথাই ওরা আমাকে বলবে না। আমি ভাবি—কেবলই ভাবি; আর ভাবতে ভাবতে আমার মস্তিষ্কে ঝড়ের তাণ্ডব লাগট শুরু হয়ে যায় যেন। তবে এইটুকু মাত্র মনে হয়—যাদের হিতের জন্যে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করতাম, তাদের কেউ কেউ ওদের দলে ভিড়েছে! আর ওরাই আমাকে এখানে চালান দিয়েছে। এই আশঙ্কা কিন্তু আমার বরাবরই ছিল, কিন্তু তবু—আশঙ্কা নিয়ে তো আর কাজ করা চলে না! ঝুঁকি নিতেই হয় কাজ করতে গেলে। প্যাভলফ তোমায় এইমাত্র বলি যে—

পালমার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক শোনাল হঠাৎ। রাগে সে সজোরে মাটীতে ঘুঁষি মারল। জান, আমি এখন বেশ বুঝতে পারি, মানুষের মন কী হেতু বিষিয়ে উঠে। কে মানুষকে শয়তান বানিয়ে ছাড়ে। এমন কাজকে আমি শতবার ধিক্কার না দিয়ে পারি না। আমি কোনদিন জোর-জবরদস্তির পক্ষপাতী নই—এমন পরামর্শও কাউকে দিইনি। সাধারণের ভালো হয়—বলে যা বুঝেছি, তাই প্রচার করা ছাড়া অন্যায়

কিছু করিনি। কিন্তু, হায় ভগবান্, যদি কোনদিন একটিবার ছাড়া পাই, তাহলে এর সুদ একজনকে আদায় করতে হবে—জবাবদিহি করতে হবে তাকে।

—কিসের সুদ?—প্যাভলফ শান্তভাবে বলে।—যেহেতু স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে অধঃপতন থেকে টেনে উঠাতে চেয়েছ, যেহেতু তারা চিরদিনের গোলাম নয়—এর?

পালমা উত্তর দিল: তুমি জান না—ওরা সব চিরদিনের গোলাম। নিজের গলার গোলামি-ফাঁস ওরা নিজেরা না খসাতে পারলে চিরকালই গোলাম হয়ে থাকবে। কিন্তু সেদিন আসবে। আসবে প্যাভলফ—সেদিন নিশ্চয়ই আসবে একদিন। জ্যান্ত মানুষ চিরদিন অতিজাত দানবের পদানত হয়ে ধুলো কুড়াতে পারে না।

—সে আমিও বলি—আসবে সেদিন। কিন্তু সেদিন এখনও বহুদূরে। এবং মাঝপথে নিষ্পেষণও বড় কঠোর।

কিছুক্ষণ কারও মুখেই কোন কথা বেরুল না। উভয়েরই মনের উপর যেন কি এক গভীর দুর্ভাবনার কালো ছায়া পড়ল।

—তুমি কোথায় গ্রেপ্তার হয়েছ?—প্যাভলফ হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করল।

—পেট্রোপাভ্‌লস্ক-এ।...তুমি?

—সেন্টপিটার্সবার্গ-এ।

বিশেষ করে বলবার মতো বিবরণ এখানে প্রয়োজন হয় না। ঐ দুটি শব্দই যথেষ্ট—অনুভব করবার পক্ষে। নির্যাতন, মস্তিষ্কবিকৃতি আর মৃত্যু ঐ দুটি নামেই প্রকাশ পায়। ও ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ নেই। নিপীড়িতের জন্য জাগ্রত ভাবনা যাদের, তাদের জন্যেই ঐ পুরস্কার।

—কিন্তু সার্জ, হোপ ইভানোভনার কি হবে? তোমরি অনুপস্থিতিতে না-জানি কি অবস্থায় তার দিন কাটছে? তাকে নিয়েও টানাটানি করছে না তো?

এই দুর্ভাবনা ও আশঙ্কা প্যাভলফের মস্তিষ্ককে তীব্রণ আলোড়িত করতে লাগল।

—হায় ভগবান!—পালমা দুর্ভাবনায় কাতর হয়েও মাটিতে মুষ্টি ঠুকে বলল—যে মানুষ পড়ে গেছে, তাদের উপরই প্রবলের মার চলে। হোপের জন্যে দুর্ভাবনা, তার বন্ধু-বান্ধব-হারা নিঃসহায় অবস্থা—আমাকে এক একসময় পাগল করে তোলে। হয়ত সে বেঁচেই আছে, অথবা মারা গেছে। হয়ত বা তার দেহ ফাঁসীকাঠে ঝুলছে। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পার—ব্যাপার কতদূর গড়িয়েছে। আমার যথাসর্বস্ব তারা আটক করতে পারে—ওদের হাতে তো কিছুই রক্ষায় না! তারপর...

বলতে বলতে তার কথা জড়িয়ে গেল মুখে। নিদারুণ উত্তেজিতভাবে—সকরুণ চোখ মেলে সে তাকিয়ে রইল প্যাভলফের মুখের দিকে। যে চোখের গাম্ভীর্যময় দৃষ্টিতে সকৌতুক চঞ্চলতা প্রতিভাত হতো, সে দৃষ্টি যেন এবার তিক্ততার কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

খানিক পরেই সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল: তুমি তো জাননা প্যাভলফ আসন্ন শিশুত্বের লোভে কয়েকমাস আগেই হোপকে বিশ্রামের জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম দেশের বাড়ীতে। আর আমি এখানে—...থাক্ সে কথা।...আমি জানিনে, সে বেঁচে আছে কিনা, শিশুটি জীবিত কিনা! আমি ঠিক এখনও প্রিয়ার প্রিয়তম না সন্তানের পিতা। হায়, আমার তখন কি মনে হয়—জান? আমি যেন আর মানুষ নই—যেন নির্মম শয়তান হয়ে গেছি। ভগবানের বজ্র অভিশাপ পড়ুক—চিরদিন পড়ুক তাদের মাথায় যারা আমার সুখের ঘর ভেঙ্গে দিয়েছে...

আবার স্তব্ধ নীরবতা—এ নীরবতা যেন নিদারুণ অসহ্য। শেষে প্যাভলফ কথা বলল: সত্যি, নির্যাতন নিষ্পেষণ কী নিদারুণ ভাবেই চলেছে। কী বিষময়—আমরা যেন দুই পাথরের চাপে পড়েছি। দুই পাথরের ঠুকাঠুকিতে আগুন, জানি। একদিন জ্বলবে সে আগুন। অত্যাচারী প্রভুর দল সে আগুনের আভায় দেখবে নরকের বিভীষিকা। ফরাসী দেশেও এমনি আগুন জ্বলেছিল। ভগবান, সেদিন যেন আমি বেঁচে থাকি, সেদিনের ব্যাপার যেন নিজের চোখে দেখতে পাই, যারা আগুনের বেষ্টনীতে পড়বে, তাদের যেন উদ্ধার করতে পারি—করুণা দেখাতে পারি। তুমি জান, আমি মানুষ হতে চলেছিলাম, কিন্তু ওরা আমায় নামিয়ে দিলে পশুত্বে। হোপ ইভানোভনা! স্বর্গের সুষমা—স্বর্গের সুত সে। আমার মধ্যে সে মানুষ গড়ার স্বপ্ন লোপণ করত কিন্তু

আমাদের আর আর সবারই মতো তার সব আশা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল ওরা। হায়, সে কেবল পথের দিকে চেয়ে থাকবে—আশায় আশায় তার দিন কাটবে। আমার সংবাদ পাওয়ার জন্যে মাথা খুঁড়বে। কিন্তু কিছুই সে পাবে না—শেষে হতাশ হয়ে পৃথিবীর মায়া কাটাবে।

প্যাভলফ সান্ত্বনা দিল : দুঃখের আঘাতে সে মারা যাবে—এ আমি ভাবতে পারি না—স্বীকার করি না। আমি জানি—কি রকম সাহসিনী মেয়ে সে। অদ্ভুত তার মনের জোর—দুঃখের নির্মমতা সহজে তাকে টলাতে পারবে না। মেয়েরাও এমন শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে—ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়।

পালমা বিষণ্ণ চোখে তাকাল।

—তুমি ভেবো না সার্জ। ভগবানে নির্ভর কর। হোপও ভগবানে নির্ভরশীলা।

পালমা মাথা নাড়ল। বলল : যা বললে সবই ঠিক। তাকে কাছে পাওয়ার আগে আমি ভাবতেও পারিনি এত বড় মহৎ প্রাণ পৃথিবীতে থাকতে পারে।…সহসা হারানো সুখের স্মৃতি জাগে তার মনে। মুহূর্তের মধ্যে সে ভুলে যায় নিজেকে। খানিক পরেই মাথা তুলে বলে—আমরা সুখী হয়েছিলাম এবং দিনদিন আমাদের সুখের নীড় প্রেমে মাধুর্যে স্বর্গসুষমায় গড়ে উঠছিল…কিন্তু এখন…

বলতে বলতে সে নিতান্ত কাতর হয়ে পড়ল।

দুর্বহ বারোটি মাস তার কেটেছে চাপা দুঃখ বুকে নিয়ে। আজ সে প্রথম প্রাণ খুলে কথা বলতে পারল। তাকে যে জানে, অনুভব করতে পারে তার মনের বেদনা—আজ তারই কাছে মনের সকল কথা বলতে পেরে কিছুটা সান্ত্বনা পেল, রুদ্ধ বেদনা তার অনেকটা হালকা হল যেন।

সে বলতে লাগল তার পুরানো স্মৃতির জের টেনে—অনর্গল সে বলে যেতে লাগল। বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ল সে। কিন্তু একজনের আনন্দমুখর স্মৃতি যে দরদী প্রতিবেশীর মনে যে নিদারুণ দুঃখ-দাহ সৃষ্টি করতে পারে এ যেন সে অনুভব করতে পারল না—দেখতে পেল না—ভাবতেও পারল না।

পালমা বলতে লাগল : দিনের পর দিন আমাদের সান্নিধ্য আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল পল আইভানোইচ। আমার হৃদয়মন সে অধিকার করে নিয়েছিল—আমাকে টেনে নিয়ে গেছল তার আকাঙ্ক্ষিত কর্মক্ষেত্রে। কেবল আমিই পারিনি তাকে জয় করতে। কর্তব্য এবং কাজ—এই ছিল তার আদর্শ এবং আদর্শের প্রেরণাতেই সে আমাকে গ্রহণ করেছিল। একথা সে আগেই আমাকে বলেছিল কিন্তু আমি কি নির্বোধ, ভেবেছিলাম আমি একদিন তাকে ফেরাতে পারব তার ঐ বিপদসংকুল পথ থেকে এবং তখনই তাকে পাব—একান্ত আপনার করে। কিন্তু কার্যতঃ ফল হল উল্টো। আমাদের বিবাহ হবার পর থেকে কি হলে সে সব রকমে সুখী হবে একমাত্র এই ভাবনা ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতেই পারিনি। তার চোখের দৃষ্টিই হল আমার চোখের দৃষ্টি, তার পথই হল আমার চলার পথ। সে যা ভালবাসে—যেহেতু সে ভালবাসে একারণে আমার কাছেও তাই ভাল লাগত। কিন্তু এখন…বলতে বলতে তার উচ্ছ্বাস সহসা থেমে যায়। তার উদ্যত দৃঢ়মুষ্টি সহসা মাটিতে আঘাত হানল।

—আচ্ছা সার্জ সে তোমাকে ভালোবাসতে পেরেছিল তো?—শান্তভাবে পল জিজ্ঞেস করল—পাছে তার নিজের দুর্বলতা ধরা পড়ে এই ভয়ে।

পল অপরাধীর মতো মাথা হেঁট করে বলল : নিশ্চয়ই! মানুষ অপর মেয়েদের ব্যাপারে ভুল বুঝতে পারে—নিজের স্ত্রী সম্পর্কে নিশ্চয়ই পারে না, পল আইভানোইচ। সত্যিই সে আমায় ভালবেসেছিল এবং দিনে দিনে সে ভালবাসা যেন নিবিড় হয়ে উঠেছিল।

সার্জ থেমে গেল। অল্পক্ষণের জন্যে কারও মুখেই কোন কথা জোগাল না। প্যাভলফের অন্তরে বিষাদ-ছায়া। কিন্তু এই দুর্বহ সুখ-স্মৃতির বেদনার মধ্যেও সার্জের অন্তর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

তারপর তারা ক্রমে ফিরে এল নিজেদের কথায়। সার্জ জিজ্ঞেস করল : আচ্ছা পল, কি ব্যাপারে তুমি ধরা পড়লে?

পল নিজেকে সামলাতে পারল না। বলল : হোপের আদর্শই ছিল আমার প্রতি কাজে। আমিও তারই মতো শান্তভাবে কাজ করে চলেছিলাম দরিদ্র অধঃপতিতদের মাঝে। এবং সে কাজে কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু কর্তারা

একরাত্তিরে এসে আমার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলে।··· তারপর আর কিছুই জানিনে।

পালমা মাথা নাড়ল। আচ্ছা ওরা কি বলেনি কেন, কিসের জন্যে গ্রেপ্তার করল?

—হাঁ, আমাকে এই বলে সম্মানিত করেছে, বাহাদুরিটাও নিয়েছে যে—আমার মতলব এবং চালচলন নাকি বেআইনী। কিন্তু কোন বেআইনী প্রচেষ্টা আমার ছিল না—অন্তত আইনের চোখে।

—তারপর?

প্যাক্তলফ বলল: তারপর পাঁচ বছরের মেয়াদে····· মিস্যুসিনস্ক্।

সার্জ মাথা নেড়ে বলল: তাই নাকি। তবু মন্দের ভালো। শুনেছি, সেখান থেকে পালানো তেমন কঠিন কাজ নয়—যদিও দেশে ফিরে যাওয়া সোজা কথা নয়। কয়েদী গাড়ীতে এই নিয়ে একজনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। সে নাকি পালিয়ে দেশে ফিরে গেছল—কিন্তু থাকতে পারল না। তাই আবার হাতে পায়ে বেড়ি পরে চলেছে কারা-প্রদেশে।

—আমার বিশ্বাস, এর পরিণাম এই রকমই হয়। তোমার কত নম্বর ঘর?

—আট নম্বর। ঘরটায় হাওয়া চলাচল নেই—বড্ড গুমোট। শুনেছি, আমাদের আসার আগেই ওখানে আরও অনেককে ঠেসে রাখা হয়েছে। এবার তো আমরাও সংখ্যায় আরও কুড়ি জন। দিনটা না হয় কোন রকমে কাটানো যায় কিন্তু রাত্রিটা রীতিমত নরকবিশেষ।

—শুধু নরক? মহীয়সী দাস্তে যদি সাইবেরিয়ায় এই রকম কুঠরি-ঘরে সপ্তাহখানেক এসে ঘুমুতে পারতেন তবে আরও আরও এমন কিছু লিখে যেতে পারতেন। যা আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারত)।

—তুমি শুনেছ কি কবে এখান থেকে আমাদের চালান দেওয়া হবে?

—মনে হয়, তোমাদের জন্যেই যা দেরি হচ্ছে। তবে আজ তোরে শাস্ত্রী বাছাই হচ্ছিল দেখেছি।

—এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি যেতে পারি ততই ভাল।

সে রাত্রিতে দুর্গন্ধময় কুঠরীর এক কোণে গাদাগাদি বস্তিটাতে অন্যান্য দিনের মতো ঘুমানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিশেষত একশত লোকের নোংরা পরিবেশ যাকে ঘিরে থাকে তার পক্ষে ঘুমানো কোন রকমেই সম্ভব নয়। হাঁচি, কাসি, গোঙরানো, ঘোড়ার মতো নাক ডাকানো, হাত পায়ের বিক্ষেপ—গুঞ্জাগুঞ্জি—শান্তিদের এ অবস্থা দেখে মনে হয় পশুর শবে বোঝাই জাগাড়। এমন পরিবেশ-পরিচ্ছন্ন দেহ-মন-বিশিষ্ট সার্জ পালমার মতো যুবকের পক্ষে ধাতস্থ করে নেওয়া সোজা কথা নয়, তবে কোন কোন সময় ঘুমানো যে একেবারেই অসম্ভব—এমন মনে হয় না পল প্যাক্তলফের।

কিন্তু সেই রাত্তিরে তার মন সব-কিছুর বাইরে কোথায় যেন নিবিষ্ট হয়ে গেছে। ঘুম নেই, খোলা চোখ—প্রসারিত দৃষ্টি—আবহাওয়ার তীব্রতা যদিও তার চোখের উপর অপরিসীম বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল এবং মলিন ধূম-বাষ্প ও গভীর অন্ধকার বন্ধকুঠরীর ঘন সন্নিবদ্ধ শক্ত খুঁটির দেয়াল তার দৃষ্টিতে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করে রেখেছিল, তবু মনের দৃষ্টি যেন আরও দূরে—বহুদূরে অন্য এক বিষয়ের পিছু ছুটোছুটি করছিল·····

[ক্রমশঃ]

পুস্তক-পরিচয়

Capital, Vol. II—Karl Marx. First Indian Edition. Published by Saraswaty Library, C 18-19, College Street Market, Calcutta. Rs. 12/-

মার্কসের বিখ্যাত গ্রন্থ "ক্যাপিট্যাল" তিন খণ্ডে জার্মান ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডে প্রথম খণ্ডটি ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া বাহির হইয়াছিল। কিন্তু মূলধনী সমাজের বিরুদ্ধাচারণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড বৃটেনে কেন বৃটিশ-সাম্রাজ্যের কুত্রাপি বাহির হয় নাই। এক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাক্স ঈষ্টম্যান তিন খণ্ডেরই ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। বাংলার সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক পুস্তকপ্রকাশক সরস্বতী লাইব্রেরী ইতিপূর্ব্বে ক্যাপিট্যালের প্রথম খণ্ড ভারতীয় প্রকাশকদের মধ্যে সর্বপ্রথম বাহির করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। বর্তমানে তাঁহারা উহার পূর্ণাঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ডও প্রকাশ করিয়াছেন। এই খণ্ড এঙ্গেলস্ সম্পাদিত জার্মাণ পুস্তকের ম্যাক্স ঈষ্টম্যানের ইংরেজী অনুবাদ। প্রথম খণ্ডে মূলধনী সমাজের উৎপাদন সমস্যার বিবর্তন সম্বন্ধে মার্কস আলোচনা করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় খণ্ডে তাহারই পরবর্ত্তী বিকাশ The Process of Circulation of Capital সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে যাঁহারা জানিতে চাহেন তাঁহাদের কেবল প্রথম খণ্ড ক্যাপিট্যাল পড়িলেই চলিবে না; দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে এই অর্থনীতির যে সম্পূর্ণ বিকাশ মার্কস তাঁহার অসাধারণ মনীষা দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন তাহার সহিত পরিচিত না হইলে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে না। একটি সুনির্বাচিত শব্দসূচী গ্রন্থখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছে। ছাপা কাগজ চমৎকার। এদেশের মুদ্রণশিল্প যে অল্পদিনের মধ্যে কত অগ্রসর হইয়াছে সে-বিষয়ে সরস্বতী লাইব্রেরীর প্রকাশিত প্রত্যেকটি পুস্তকই নিদর্শন। আমরা তৃতীয় খণ্ডের আশায় রহিলাম। শ্রী:

Capital (Abridged Edition)—Karl Marx. Edited by L. G. Arduihcas. Published by Saraswaty Library, C18-19 College Street Market, Calcutta. Cloth Rs. 6/8; Paper Rs. 5/-.

এই পুস্তকখানি প্রথম খণ্ড ক্যাপিট্যালের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। যাঁহাদের সম্পূর্ণ পুস্তকটি পড়িবার সময় নাই তাঁহাদের নিকট এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে। সম্পাদক মিঃ আর্ডনিকাস মার্কসের পুস্তকের কোনো প্রয়োজনীয় তথ্যই ইহাতে ত্যাগ করেন নাই, বস্তুতঃ মূল রচনা ও বিষয়-বস্তুর সমস্তটাই তিনি রাখিয়াছেন। কেবল মার্কস্ যে সব উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত তাঁহার তথ্য ও বিচার্য বিষয়কে প্রমাণিত ও বিকাশিত করিতে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে যেগুলি বর্তমানে প্রাচীনতা দোষে নিরর্থক ও প্রয়োজনীয়তাহীন হইয়া পড়িয়াছে কেবল সেই সব দৃষ্টান্ত ও উদাহরণগুলিই সম্পাদক ত্যাগ করিয়া গ্রন্থের আয়তন কমাইয়াছেন। একটি সুচিন্তিত শব্দ-সূচী ও সম্পাদকের বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ মুখবন্ধ এই পুস্তকখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই পুস্তকখানি মার্কসীয় চিন্তাধারা ও অর্থনীতির সহিত যাঁহারা পরিচিত হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদের বিশেষ ভাবে সাহায্য করিবে। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার। শ্রী:

Kasturba—Edited by Sibdas Banerjee, Published by Handmade Paper Industries of India, 1, Gokul Baral Street, Wellington Sq., Calcutta. Price Rs. 2/-

গান্ধিজী, শ্রীযুক্ত দেবদাস গান্ধী, হুমায়ুন কবীর, স্যর রাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতি মনীষিগণ কস্তুরবার মৃত্যু উপলক্ষে যে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন হাতে তৈরী তুলট কাগজে তাহা ছাপিয়া সম্পাদক যে ভাবে তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন তাহা সত্য সত্যই মর্মস্পর্শী। এই পুস্তিকার প্রধানতম

বিশেষত্ব চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত ফণি গুপ্তের আঁকা ছয় খানা চিত্র ও প্রচ্ছদ। আমরা আশা করি ইহা ঘরে ঘরে বিরাজ করিবে। শ্রীঃ

নয়নচারা—সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, প্রকাশক পূর্ব্বাশা লিমিটেড্। দাম দেড় টাকা।

বাংলার স্মরণীয় মন্বন্তরের ছবি বহু শিল্পীই এঁকেছেন নানা ভাবে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মনে হয়েছে তা যেন কেবলমাত্র করাল কঙ্কালী রূপের প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াসমাত্র; বহু লেখক সেগুলোকে শুধুমাত্র ফটোগ্রাফের মতই অনুকরণ করেছেন—মর্ম্মস্পর্শী অনুভবের ভেতর দিয়ে রূপ পায়নি তা। কিন্তু "নয়নচারা"র কয়েকটি গল্প আছে যা সত্যি রূপ পেয়েছে প্রাণের দরদে, বেদনাময় অনুভূতির সৌন্দর্য্যে।

মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় মরছে ভিলে ভিলে, ক্ষুধারাক্ষসী তার মেদমজ্জায় টান দেয়। জীবনমরণের কূলে এসে তাই তার চেতনা লোপ পায়, জীবনাবসানের এমন নির্ম্মম মুহূর্ত্তেও সহরের ফুটপাথে শুয়ে আমু যখন তার ময়ূরাক্ষী নদীতীরে "নয়নচারা" গাঁএর কথা ভাবে, স্বপ্ন দেখে গাঁএর মাটীর, গাছের ছায়ায় ময়ূরাক্ষী নদীর জল, ডিঙ্গি ও ধানক্ষেতের তখন মনে হয় লোকটিকে যেন চিনি—তার সে "নয়নচারা" যেন আমাদের চিরচেনা। যে গাঁএর বুকে সে এত বড় হয়েছে, যে মাটির রস তার শিরা উপশিরায় বইছে, যে "মা" একদিন তার মুখে তুলে দিয়েছে অন্ন তারই সন্ধানে আজ সে সহরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে—তাকে তো সে ভুলতে পারে না। তাই তার অন্তিম সময়ে যে মেয়েটি তাকে দিল দুটি অন্ন তাকে সে আবেগব্যাকুল স্বরে শুধু জিজ্ঞাসা করল মাত্র—"নয়নচারা গাঁয়ে কী মেয়ের বাড়ী?" তার এ দরদমাখানো ভাষায়ই তার অন্তরকে চেনা যায়—পরিচয় পাওয়া যায় তার ভেতরকার মানুষটির।

"মৃত্যু যাত্রা" গল্পটি সত্যিই উচ্চস্তরের। একথা স্বীকার করে আনন্দ অনুভব করছি যে গল্পটির বিষয়বস্তু এবং তার সহজ সরল প্রকাশ ও ভাব-ভাষার সমন্বয় সত্যই প্রশংসার্হ।

মিনাক্ষী

রাশিয়ার রাজদূত—মাইকেল স্ট্রগফ। লেখক জুলে ভার্ণে। অনুবাদক শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী। সরস্বতী লাইব্রেরী, সি ১৮-১৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ২১৪+৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ২৷৷০ টাকা।

ফরাসী সাহিত্যিক জুলে ভার্ণের নাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত। তাঁহার লেখা 'Around the World in Eighty Days', 'Five Weeks in Balloon' প্রভৃতি বহু পুস্তক বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের বিচিত্র কাল্পনিক তথ্য লইয়া লিখিত তাঁহার প্রত্যেকটি রচনা কালে আবিষ্কারের সত্যতাও প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকখানিতে লেখকের কল্পনা-শক্তির সম্পূর্ণ নূতন পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে ডুবোজাহাজ বা উড়োজাহাজের কথা নাই—আছে এক দুঃসাহসিকের সাইবেরিয়া অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী। রাশিয়ার জারের আমলে আইভান ওগারেফ নামক জনৈক বিশ্বাসঘাতক রাশিয়ান সেনাধ্যক্ষের প্ররোচনায় সাইবেরিয়ায় তাতার-বিদ্রোহ দেখা দেয়। তাতার-দের তড়িৎ-গতি আক্রমণে একে একে শহর, নগর, বন্দর, গ্রাম অতি সহজে বিদ্রোহীদের কবলিত হইতে থাকে। এ সময়ে জারের এক জরুরী গোপন সংবাদ লইয়া মাইকেল স্ট্রগফ রওনা হয় সাইবেরিয়ার তুষার ভূমির উপর দিয়া বিপন্ন রাজধানী ইরকুটস্কের দিকে। কি করিয়া এই রাজদূত শত্রু কবলিত দেশের ভিতর দিয়া জীবন বিপন্ন করিয়াও যথাসময়ে সংবাদ পৌঁছাইয়া দিয়া বিদ্রোহীদের সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিল—এ কাহিনী পড়িতে পড়িতে অবাক্ হইতে হয়। মানুষের পক্ষে ইহা কি সম্ভব? অথচ অসম্ভব বলিয়াও মনে হয় না। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ রোমাঞ্চকর ঘাত-প্রতিঘাতের বর্ণনায় সমৃদ্ধ। বাংলা তর্জ্জমায় কোথাও আড়ষ্টতা নাই—ভাষা ঝোরালো অথচ সহজ ও মধুর। মনে হয় না যে ইহা অন্য ভাষার অনুবাদ। ভিটেকটিভ ও অবৈজ্ঞানিক এ্যাডভেঞ্চার কাহিনীমূলক শত শত পুস্তকের পর ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত এই অনুবাদ-উপন্যাসখানি বাংলা শিশু সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে। বইখানা বিভিন্ন ১৯টি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ছায়াচিত্রেও রূপান্তরিত হইয়াছে। এই কাহিনী ছোট বড় সকলকেই আনন্দ দিবে। মুদ্রণ পারিপাট্য, কাগজ ও সুদৃশ্য কভার-বাঁধাই সুরুচির পরিচায়ক ও প্রশংসনীয়।

রবীন্দ্রনাথ—২২শে শ্রাবণ তার মর্মন্তুদ স্মৃতি নিয়ে আবার এসেছে, আবার চলে গেছে। বাংলার কবি যে দান সমগ্র পৃথিবীকে দিয়ে গেছেন, সে দান শুধু একজনের বা এক যুগের জন্য নয়—তা সবযুগের সর্বমানবের জন্য। তাঁর মহা-মানবের স্বপ্ন সেই অনাগত দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যে দিনকে এগিয়ে নিয়ে আসবার জন্য আজ সবাই ব্যাকুল। তাঁর বাণী, তাঁর গান আজও বাংলার আকাশ বাতাস ধ্বনিত করছে, তাঁর কাব্য দর্শন সাহিত্য সৃষ্টির ভেতর তাঁকে আমরা বারে বারে ফিরে পাচ্ছি।

কিন্তু তাঁকে আমরা দিয়েছি কি? তাঁর বাণীকে কি আমরা জীবনের কোনোদিকে সার্থক করতে পেরেছি? এই কথাটাই আজ সমগ্র জাতিকে প্রশ্ন করছি। তাঁর থেকে এত পেয়েছি তাঁকে দিয়েছি কি? সভা ডেকে, ক্লাবে বসে তাঁর কবিতা আউড়ে, তাঁর গান গেয়ে, তাঁর সম্বন্ধে গদগদ ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ করেই কি তাঁর প্রতি আমাদের কর্তব্য সমাপন করছি না? কবিগুরুর সত্যিকারের যে দক্ষিণা প্রাপ্য তাকি তাঁকে আমরা দিতে পেরেছি বা দেবার চেষ্টা করেছি? তাঁর স্মৃতির জন্য চাঁদার খাতা খোলা হয়েছে—টাকা দিয়ে তাঁর স্মৃতির পূজা করা ত অতি অনায়াসসাধ্য কাজ। দেশের লোক যদি ভুটি করে পয়সা দিত তাহলে আজ দশকোটি টাকা চাঁদা উঠত—কিন্তু আজ পর্যন্ত স্মৃতি তহবিলে দশলক্ষ টাকাও ওঠেনি। এর চাইতে লজ্জার কথা আর কি হতে পারে? যে-জিনিস দিতে আমাদের তিলমাত্র অসুবিধা হয় না সেই জিনিসই যখন আমরা দিতে পারি নি, তখন তাঁর নাম করে কবিতা আবৃত্তি ও প্রবন্ধ পাঠ করা কি আমাদের ন্যাকামির পরিচায়ক নয়?

রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে যা চেয়েছেন তা সামান্য অর্থের চাইতে অনেক বড়। তিনি চেয়েছেন আমাদের কাছে মহা-মানবতার প্রতিষ্ঠা। ব্যষ্টিতে, সমাজে, রাষ্ট্রে—সমগ্র মানব-জাতিকে নিয়ে এমন এক সমাজের প্রতিষ্ঠা করা যেখানে হিংসা-দ্বেষ নেই,—মানবসংস্কৃতি যেখানে পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে। আমাদের ভেতর দিয়ে কি তাঁর সে আশা পূর্ণ হবার কোনো ভরসা আছে? আজ তাঁর চতুর্থ মৃত্যু বার্ষিকীর মেঘমান প্রভাতে এই কথাটিই বেদনাতুর চিত্তে স্মরণ করছি।

৯ই অগাষ্ট—জালিয়ানালাবাগে ভীত সাম্রাজ্যবাদ তার মাথা হারিয়ে যে উন্মত্ত নিষ্ঠুরতায় ভারতবর্ষের চল্লিশকোটি লোকের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছিল ১৯৪২ এর ৯ই অগাষ্ট যে-তারই প্রত্যক্ষ ফল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কাশ্মীর থেকে সুরু করে' কুমারিকার শেষ পর্যন্ত ও বেলুচিস্তান থেকে সুরু করে ব্রহ্মের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত সবাইকে জালিয়ানালাবাগ রক্তপ্লুত কষাঘাতে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে তারা সবাই এক, সাম্রাজ্যবাদের কাছে তাদের সবার আসন সমান—সবাই তারা সাম্রাজ্যবাদের শোষণের পাত্র মাত্র। এর ভেতর উঁচুনীচু কেউ নেই, সবাই সমান। শুধু কি ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মকে মাত্র জালিয়ানালাবাগ এই কথা শিখিয়েছিল—না, জালিয়ানালাবাগের শিক্ষা আরও ব্যাপক হয়েছিল? সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদ শোষিত দেশের জনমনও এই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়নি। জাতীয়তার যে শিক্ষা সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে এশিয়াবাসীকে পাশ্চাত্য শোষণের বিরুদ্ধে চঞ্চল করে তুলছিল সেই চাঞ্চল্য আরও ব্যাপ্তি পেয়েছিল—গভীরতা পেয়েছিল জালিয়ানালাবাগে।

১৯৪২ এর ৯ই আগষ্ট সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই চাঞ্চল্যের বিস্ফোরক আত্মপ্রকাশ মাত্র। এই আত্মপ্রকাশ স্বাভাবিক এবং যতই দিন যাবে ততই এর প্রচণ্ডতা দুর্জয় শক্তি অর্জন করবে। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই। ৯ই অগাষ্টের বিস্ফোরক তার শক্তি লাভ করেছিল জাতির সমগ্র গণশক্তির মর্মদেশ থেকে। সেজন্যই এর প্রচণ্ডতা এমন দুর্জয় হয়ে উঠেছিল। এবং যতদিন পর্যন্ত না বিস্ফোরণের সমস্ত

কারণ সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হবে ততদিন পর্যন্ত জাতি এমনি করেই তার সমাজ ও রাষ্ট্রদেহ থেকে এই বিষ দূরে নিক্ষেপ করবার জন্য প্রচণ্ড হতে প্রচণ্ডতর চেষ্টা করবে।

১৯৪৭ এর ৯ই আগষ্ট সমগ্র জাতি তার অতীত প্রচেষ্টার দিকে স্থিরচিত্তে মুখ ফিরিয়ে আছে। যারা মনে করে যে জাতি তার অতীত আত্মপ্রকাশের জন্য অনুতপ্ত মানব প্রগতি সম্বন্ধে তাদের মত মূর্খ আর কেউ নেই। আজ জাতি তার অতীতের সালতামামি করছে—এ তার ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হবার লক্ষণ। গণমনের এই বৈপ্লবিক প্রগতির প্রতীক হিসাবে কংগ্রেস আজ নির্ভীক ভাবে দাঁড়িয়ে বলছে,—সে ভুল করে নাই, জাতি ভুল করে নাই,—সমাজের অগ্রগমনের ধারা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথ ধরে এমনি করেই অগ্রসর হয়। হয়ত কোথাও কোনো ত্রুটী, কোনো বিচ্যুতি জাতির অগ্রগমনের পথকে একটুকু বাঁকিয়ে চুড়িয়ে নিয়েছে—কিন্তু তার জন্য চোখের জল যারা ফেলতে যাবে তারাই ভুল করবে। এই ত্রুটী বিচ্যুতি কার দোষে হয়েছে সে কথা আলোচনা করা আমাদের পক্ষে, আমাদের সাধনার সিদ্ধি লাভের পক্ষে অবান্তর কথা মাত্র। অহিংসার পথ থেকে জাতি কেন বিচ্যুত হ'ল সে কথা আলোচনা করবে তার্কিক নৈয়ায়িকের দল তাদের পুঁথিপত্র খুলে। জাতির কি সে-সময় আছে? গবর্ণমেণ্ট বলেছে, কংগ্রেসের জন্যই আগষ্ট হাঙ্গামা হয়েছে। এনিয়ে চুলচেরা তর্কের কি কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমাদের মনে হয় না। নেতাদের ধরে নিলে হাঙ্গামা কিছু হবেই। এবং সেজন্য গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব বারো আনা, না কংগ্রেসের দায়িত্ব বারো আনা সে সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় সময়ক্ষেপে করা বৃথা। শ্রীযুক্ত পট্টভি সীতারামায়ার বক্তৃতা নিয়ে আলোচনা করলে কোনো ফল হবে কি না সে-বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমাদের মনে হয় যে কংগ্রেস যে একটা সুশৃঙ্খল গণ-সংঘে দ্রুত পরিণতি লাভ করেছে এই সত্যটিই আগষ্ট আন্দোলন পরিষ্কার ভাবে প্রমাণ করেছে। কংগ্রেস যে যতদিন হয় তার বুর্জোয়া রূপ ত্যাগ করে' খাঁটি গণ সংঘ হয়েছে এই সত্যটি আগষ্ট আন্দোলনে জনগণ তাদের প্রাণ দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে প্রমাণ করেছে। যাঁরা বলেন যে তবে কেন এই আন্দোলন ব্যর্থ হোল তাদের আমরা বলব যে এই ব্যর্থতার কারণ শ্রদ্ধাহীনের দৃষ্টিতে বিচার না করে শ্রদ্ধাবানের দৃষ্টিতে বিচার করলে স্বতঃস্ফূর্ত হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন্ বিপ্লব, কোন্ বৃহৎ আন্দোলন একবারে সফল হয়েছে? যে পরিপ্রেক্ষিত ও পারিপার্শ্বিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করে কার্ল মার্কস প্রথম কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র-বৃটেনে স্থাপিত হবে বলেছিলেন সেই পরিপ্রেক্ষিত ও পারিপার্শ্বিকের সমস্ত গবেষণাকে ব্যর্থ করে প্রথম কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র গঠিত হোল সম্পূর্ণ কৃষিপ্রধান রাষ্ট্র রাশিয়ায়। কংগ্রেস নেতৃত্ব কেন, পৃথিবীর কোন নেতৃত্বই কোনো আন্দোলনের সফলতা সম্বন্ধে কোনো প্রতিজ্ঞা করতে পারে না। আগষ্ট আন্দোলন কেন সফল হ'ল না তার বিচার করা দরকার কেবল এই জন্য যে তাতে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাকে আমরা সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারব।

আগষ্ট আন্দোলন 'Quit India' প্রস্তাবকে সার্থক করতে না পারলেও এটা ঠিক যে এই আন্দোলন সমগ্র ভারতীয় গণমনকে এমন একটা প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেছে যাতে ভবিষ্যতের জন্য জাতি নতুন করে' প্রস্তুত হতেছে। গতবারের আন্দোলনের ব্যর্থতার নানা কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে যে চাষী ও মজুর শ্রেণীর মধ্যে কংগ্রেস কর্মীদের কাজ খুব শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে হয় নাই। কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য যে তাদের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতি বিধান, কংগ্রেস যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে সে স্বাধীনতা যে শ্রেণী নির্বিশেষের জন্য, একথা প্রত্যেকটি দেশবাসী মনে প্রাণে বিশ্বাস করে' বলেই ১৮৫৭ এর বিপ্লব প্রচেষ্টার পর এত বড় গণবিপ্লব আর ভারতবর্ষে হয় নাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই আন্দোলনের আংশিক ব্যর্থতা হয়েছিল এই জন্য যে কংগ্রেস গ্রামবাসীর মধ্যে যেয়ে সুসংহত ও সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করতে সুবিধা পায় নাই। গান্ধিজী কংগ্রেসকে যখনই সহর থেকে সরিয়ে গ্রামে নিয়ে গিয়েছিলেন তখন থেকেই গ্রামে কোনো কাজ করতে গেলেই কংগ্রেস কর্মীকে সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের রোষদৃষ্টিতে পড়তে হয়েছে। এ সব কারণেই কংগ্রেস কৃষক ও মজুর শ্রেণীকে সুশৃঙ্খল কর্মপন্থায় শিক্ষিত করতে পারে নাই। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি এজন্য এখন কংগ্রেসকে দায়ী করছেন। এ সম্বন্ধে একটা সোজা কথা তাঁদের আমরা বলতে চাই। গভর্ণমেণ্ট যে দিন থেকে

তাঁদের দলের উপর হতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিলেন সে দিন থেকেই তাঁরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ইঙ্গিতে প্রকাশ্যে আলোচনা চালিয়েছিলেন; তাঁরা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর যুদ্ধ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন; কংগ্রেস কর্মীদের পঞ্চম বাহিনী বলে' তাঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছিলেন; কংগ্রেসের আগষ্ট প্রস্তাব সম্বন্ধে তাদের কার্য্য-কলাপ যে জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহিতার পর্য্যায়ে উঠেছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তারা যে পরিপ্রেক্ষিত ও পারিপার্শ্বিকের দোহাই দিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন কালের নিকষ পাথরে যাচাই করে' যখন দেখা গেল যে তাদের সমস্ত সিদ্ধান্তই ভুল তখনই তাঁরা কংগ্রেসে ঢুকবার জন্য ছল খুঁজতে সুরু করেছেন। এবং যে আগষ্ট আন্দোলন ও কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে সর্ববিধ বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে গেছেন সেই আগষ্ট আন্দোলন ও আন্দোলনের সহীদদের স্মৃতির জন্য আজ তাঁরা নির্লজ্জের মত সভাসমিতি করতে সুরু করেছেন। তাঁদের এই ভণ্ডামী দেশের লোকে বুঝতে পারবে না বলে কি তাঁরা মনে করেন?

আগষ্ট আন্দোলন যে জাতির মর্য্যাদা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জাতির নৈতিক গর্ব কতটা বাড়িয়ে দিয়েছে সে কথা শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি মাত্রেই মর্মে মর্মে অনুভব করেন। কংগ্রেস যে আর বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান নয়, সে যে পূর্ণ বৈপ্লবিক গণ-সংঘে পরিণত হবার মুখে চলেছে, এটা বর্ত্তমানের লক্ষণ দেখে বলা যেতে পারে। কেননা এবারকার আন্দোলনের সাড়া মুখ্যত এসেছে গণ-সাধারণের কাছ থেকে। আগষ্ট আন্দোলন দেশকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে কংগ্রেসই সত্যকার গণপ্রতিষ্ঠান এবং কংগ্রেস দেশকে ভুল নির্দেশ দেয় নাই। আজ আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে দেশের সেই সব বীর সন্তানদের কথা স্মরণ করছি যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের অকাতরে আত্মাহুতি দিয়েছেন, যাঁরা আজও কারান্তরালে তাঁদের সাধনার সিদ্ধিলাভের দিন গুণছেন। আমরা জানি তাঁদের আত্মদান ব্যর্থ হয় নাই, তাঁদের সাধনার সিদ্ধি লাভের আর বিলম্ব নাই।

বিলাতের নির্বাচন—ইওরোপের যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই শ্রমিক দল চার্চিলের কোয়ালিশন বা সম্মিলিত গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেন। তাঁদের আশংকা হয় যে যুদ্ধজয়ের ফলে কনসারভেটিভ্ পার্টির ক্ষমতা এত বেড়ে যাবে যাতে বৃটেনের গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়বে। সোভিয়েট রাশিয়ার সাহায্যে যুদ্ধে জয় লাভ করা সত্ত্বেও চার্চিল-দল জয় লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজতন্ত্রবাদকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করতে কসুর করে নাই। এই সব কারণেই বৃটেনের শ্রমিকদল চার্চিল-সরকার থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ নির্বাচনের জন্য তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। চার্চিলদল বোধ হয় ভেবেছিলেন যে জার্মান জয়ের গৌরবটা টাট্‌কা থাকতে থাকতেই যদি সাধারণ নির্বাচন হয় তা' হলে তাঁদের দলকে কেউ রুখতে পারবে না; এবং সেজন্যই শ্রমিক দলের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁদের সমস্ত গবেষণাকে ব্যর্থ করে বৃটেনের গণসাধারণ যে ভাবে তাদের ভোট দিয়েছে তা'তে তাঁদের সমস্ত আশাভরসা নির্মূল হয়েছে। নির্বাচনে শ্রমিক দল এত বেশী ভোট পেয়েছে যে তাদের প্রতিনিধিদের সংখ্যা রক্ষণশীল ও অন্যান্য সকল দলের সম্মিলিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা একত্র করলেও তার চাইতে বেশি হয়েছে। পূর্ব পূর্ব বারে যখন শ্রমিকদল গভর্ণমেণ্ট চালাবার ভার নিয়েছে তখন তাদের অপর দলের সাহায্য নিতে হয়েছে। এবার সে অন্য-সব দলের মিলিত বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে চলবার মত শক্তি অর্জ্জন করেছে।

শ্রমিক দলের এই জয়লাভ কেবল বৃটেনের ইতিহাসে নয় পৃথিবীর সর্বত্র গণতান্ত্রিক অগ্রগমনের একটা বিশিষ্ট অবদান। সাধারণ মানুষ যে তার নিজস্ব অধিকার সম্বন্ধে ধীরে ধীরে ওয়াকিবহাল হচ্ছে এই কথাটাই এই নির্বাচন থেকে পরিষ্কার হল। দ্বীপবাসী লোক সাধারণতঃ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্বন্ধে একটু বেশি সচেতন হয়। সেজন্যই সাধারণতঃ তাদের মনোবৃত্তি হয় রক্ষণশীল। শ্রমিকদলের বর্ত্তমান জয়লাভে বোঝা গেল যে বৃটেনের সাধারণলোকেও রক্ষণশীল অর্থনীতির প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন দেশ বলে' এই নির্বাচনের ফলে

আমাদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে কিনা সে সম্বন্ধে একটা কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। বর্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থার একটা নিরসন হওয়া সম্বন্ধে দেশময় একটা আশার ভাব জেগে উঠেছে। এটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যদিও ব্রিটিশ শ্রমিকদল সাম্যবাদে বিশ্বাসী তথাপি তারা যে নিজেদের অর্থনীতি ও সমাজনীতির একটা আমূল বিপ্লব আনবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে একথা বিশ্বাস করবার কোনো কারণ উপস্থিত হয় নাই। ব্রিটেনের সামগ্রিক অর্থনীতি তার সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। যেদিন ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার পাকেচক্রে পেয়েছিল সেদিনই বৃটেনের সমগ্র অর্থনীতি ও সমাজনীতির মধ্যে একটা পরিপূর্ণ বিপ্লব আসে। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা পর্যন্ত পলাশীর যুদ্ধের পরে ভারতের অর্থসম্পদ যে ভাবে বৃটেনে যেতে আরম্ভ করে তাকে 'বঙ্গ-লুণ্ঠন' বা Bengal Loot বলে অভিহিত করেছেন। এর ফলে সমগ্র ভারতীয় অর্থনীতি বদলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সামাজিক জীবনেও আসে একটা প্রচণ্ড বিপ্লব। শিল্প ও কৃষির সামঞ্জস্যে ভারতে যে বিপুল সমৃদ্ধিময় সমাজ গড়ে উঠেছিল সে সমাজ ও সমৃদ্ধি বিদেশী বণিক সমাজের ব্যবস্থায় অতি অল্পদিনেই ভেঙে চুরে যায়। ফলে আমাদের দেশ হ'ল সম্পূর্ণ কৃষিপ্রধান;—আমাদের সমাজজীবনের স্বাভাবিক অগ্রগতি হয়ে গেল রুদ্ধ। সেজন্যই ফিউড্যাল বা সামন্তনীতির যুগ আজও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি নাই। অপরদিকে ভারত লুণ্ঠনের অপর্যাপ্ত সম্পদ বৃটেনের একান্ত দীন অর্থনীতিকে রাতারাতি করল মহাসমৃদ্ধময়। যে Industrial Revolution বা শিল্পবিপ্লবের ফলে বৃটেনের বৈদেশিক বাণিজ্য তাকে পৃথিবীর শীর্ষ স্থানে নিয়ে গিয়েছে সেই শিল্প বিপ্লব সম্ভব হয়েছে ভারতের সমৃদ্ধি লুণ্ঠনের ফলে ও সমগ্র ভারতীয় অর্থ ও সমাজনীতিতে আমূল বিপ্লব ঘটিয়ে তাকে কৃষিপ্রধান সমাজে পরিণত করার জন্য; এবং এরই ফলে আজ ভারতবর্ষ বিদেশীর কাঁচামালের যোগানদার ও পণ্যশিল্পের খরিদ্দার। বৃটেনের বর্তমান সমৃদ্ধির মূলে যে বিপ্লব, তাকে অস্বীকার করলে বৃটেনের অর্থনাতিক অবস্থার যে পরিণতি হবে বৃটেনের শ্রমিক দল সে বিষয়ে মোটেই অজ্ঞ নয়। তারা জানে যে আজ যদি ভারতবর্ষ অর্থনীতিতে বৃটেনের অর্থনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহলে বৃটেনের জীবনযাত্রার মান (Standard of Living) অত্যন্ত নীচু হয়ে যেতে বাধ্য এবং তার ফলে সর্বপ্রথম আহত হবে বৃটেনের শ্রমিক ও তার পরিবার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বৃটেনের বৈদেশিক বাণিজ্য বাহিরের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে আসছিল। 'অটোয়া প্যাক্ট' প্রভৃতি ব্যবস্থা করে সাম্রাজ্যের ভেতরের ব্যবসাটা যাতে বৃটেনের হাতে থাকে সেবিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি বৃটেনের কর্ণধারেরা করেন নাই। কিন্তু তাতেও বৃটেনের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হয় নাই। এই সমস্যার সমাধান যাতে হতে পারে সেরকম আমূল বিপ্লবের পরিকল্পনা, বৃটেনের শ্রমিকদল কেন সেখানে যে মুষ্টিমেয় কম্যুনিষ্ট দল আছে, তাদেরও নেই। সেজন্যই শ্রমিকদলের অগ্রগমনে ভারতের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতি হবে বলে যারা বিশ্বাস করেন আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত নই। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতি না হলে রাজনৈতিক অবস্থারও কোনো উন্নতি হতে পারে না। হয়ত প্রদেশগুলিতে যে ৯৩ ধারাতে একচ্ছত্রী শাসন চলছে তার অবসান হয়ে প্রাদেশিক অ্যাসেম্বলি ও কাউন্সিলগুলি কাজ করবে, রাজনৈতিক বন্দীরা হয়ত মুক্তি পাবেন; এরকম টুকরাটাকরা পরিবর্তন যে আসল সমস্যা সমাধানের কিনারা ঘেঁসেও যায় না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আপদ্ধর্মাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত এই সব অতি-নিকট সমস্যাগুলির সমাধান এমনিতেই ঘটত; রক্ষণশীল বা শ্রমিকদলের প্রাধান্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই কম।

এ কথাটা আমাদের ভুললে চলবে না যে অ্যাটলী বা পেথিক লরেন্স বা ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ এঁরা নিজেদের দেশের স্বার্থ সর্বাগ্রে না দেখে একটা মতবাদ বজায় রাখতে যাবেন। এটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। অ্যামেরি সাহেব যে বলেছেন যে লেবার বা কনসারভেটিভ্ যেই গভর্ণমেণ্ট চালাক না কেন ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেই একমত—এটা খুবই সত্য কথা। আমাদের ভুললে চলবে না যে বৃটেনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে আমাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রনের ভার চিরদিনই তাদের উপর থেকে যাবে। আমাদের সমস্যা তারা সমাধান করবে তাদের সমস্যার অনুকূলে। কোনো একটা বৃহৎ

গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে যে ব্রিটিশ শ্রমিকদল আমাদের সমস্যা সমাধান করতে চাইবে, এ আশা কেউ করে না। আমাদের বৈপ্লবিক অগ্রগমনের মধ্যেই আমাদের মুক্তি। শ্রমিকদলের আগমনে বড় জোর সাময়িক সমস্যার কিছু সমাধান ঘটবে—কিন্তু আমাদের মূলসমস্যা যে তা নয় সে বিষয়ে প্রত্যেক রাজনৈতিক চেতনাশীল দেশবাসীই জানে।

জাপ যুদ্ধের অবসান—জাপযুদ্ধের অবসান ঘোষিত হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া জাপানের সঙ্গে যে অনাক্রমণ চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল তার অবসান ঘটিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় ও আমেরিকা কর্তৃক অ্যাটম বা আণবিক বোমা জাপানের উপর নিক্ষেপ করার জন্যই জাপান যে যুদ্ধাবসানে নিজের বাধ্যতা জানিয়েছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। সোভিয়েট রাশিয়া জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেই উত্তর মাঞ্চুরিয়ার অনেকটা অংশ দখল করে নিয়েছে। এই দিকটার দখল নিয়ে চীনের সঙ্গে রুশ সাম্রাজ্যের বহুদিনই বিরোধ ছিল। বোলশেভিক রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ায় চীনের সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করে সেই বিরোধের অবসান ঘটিয়েছিল। কিন্তু নিজেদের দুর্বলতার জন্য মাঞ্চুরিয়া চীনের হাত ছাড়া হয়ে জাপানের হাতে যায়। জাপান মাঞ্চুরিয়ায় একটা তাঁবেদার রাষ্ট্র গঠন করে নিজের সাম্রাজ্যিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। রাজনীতির হাওয়া আবার এবার বদলাল; এখন হয়ত দেখব মাঞ্চুকুয়োর আর জাপ তাবেদার রাষ্ট্র নেই, সেটা হয়েছে মাঞ্চুকুয়ো সোভিয়েট রাষ্ট্র। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে এই রাষ্ট্রের সম্পর্ক হবে গাঢ় এবং সেজন্যই বৃটিশ ও আমেরিকার ধনপতিদের তা হবে চক্ষুশূল।

জাপ যুদ্ধের অবসান হলেই যে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হবে এ আশা দুরাশা মাত্র। যে সমস্যাগুলি বর্তমান যুদ্ধের মূলে ছিল তা' পুরোপুরিই থেকে গেছে সুতরাং আবার কয়েক বৎসর পরেই যে এই আগুন জ্বলে উঠবে না তার কোনোই কারণ নেই। ধনিকতন্ত্রসমাজ যুদ্ধের ভেতর দিয়েই নিজেদের প্রয়োজনীয়তাকে ধ্বংস করে। এ জন্যই প্রথম যুদ্ধের প্রেতাত্মা যেমন 'যুদ্ধ শেষ করার জন্য যুদ্ধ' স্লোগানকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়াতে ব্যঙ্গ করেছে সেই ব্যঙ্গ বর্তমান যুদ্ধের অবসানে তীব্রই হয়ে উঠেছে, তার—অবসান হয় নাই।

এই যুদ্ধের জন্য সমগ্র পৃথিবীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক জীবনে যে তুমুল আলোড়ন ঘটেছে, যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, তার সমাধানের জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়েছে। রাষ্ট্রের যারা অধিনায়ক তারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের অনুকূলে সেই সব সমস্যা সমাধানের কথা ভাবছেন। আমাদের রাষ্ট্রের ভার আমাদের উপর নাই,—যাদের উপর আছে তাদের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ আমরা করতে পারি না। এবং তাদের ধারণা যে আমাদের ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতা আমাদের চাইতে তারা ভাল বোঝে। এমতাবস্থায় আমাদের অবস্থা যে কি হবে তা বলার প্রয়োজন নেই। এজন্যই আবশ্যক আমাদের দেশের বৈপ্লবিক প্রগতিকে এগিয়ে নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা। বৃটেনের শ্রমিক দলও আমাদের এগিয়ে দেবে না, রাশিয়ার সোভিয়েট রাষ্ট্রও আমাদের সাহায্য করতে আসবে না। নিজেদের রাষ্ট্রের ও সমাজের স্বার্থের গণ্ডীতে সবাই বাঁধা। মৌখিক শুভেচ্ছা সবারই হয়ত পাব কিন্তু তাতে আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হতে পারে না। রাষ্ট্রীয় বা কূটনৈতিক প্রয়োজন ছাড়া কোনো রাষ্ট্রই অপর রাষ্ট্রের সাহায্যে আসে না, তা সে সোভিয়েট রাষ্ট্রই হোক কি ক্যাপিটালিষ্ট রাষ্ট্রই হোক।

যুদ্ধোত্তর সমস্যা সম্বন্ধে সমগ্র পৃথিবীই এখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এ কেবল বোমার ঘায়ে ভাঙা চোরা বাড়ী ঘর সাজানর সমস্যা নয় এ সমস্যা হচ্ছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান এবং যে সমাজনৈতিক বিপ্লব যুদ্ধের কামান ও বোমার বিস্ফোরণের মধ্যে বিস্ফোরক শক্তি সংগ্রহ করেছে সেই বিপ্লবের পরিণতি সম্বন্ধে সমস্যার সমাধান। বর্তমান বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইওরোপে সোভিয়েট রাশিয়া প্রচণ্ড শক্তি অর্জন করেছে অপরদিকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র পৃথিবীর প্রধানতম শক্তি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রাচীন শক্তি-গুলির মধ্যে এক বৃটেনই কোনো রকমে দাঁড়িয়ে আছে ভগ্নপ্রায় অবস্থায়। সাম্রাজ্যিক অস্তিত্বের উপর তার যে অর্থনীতি দাঁড়িয়ে এই যুদ্ধে সে অর্থনীতি নিদারুণ আঘাত পেয়েছে। ফলে সে উত্তমর্ণ জাতি থেকে অধমর্ণ জাতিকে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে তার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের তালে পা না ফেলে আর চলার উপায় নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরও তার অবস্থা

অনেকটা এ রকমই হয়েছিল; অ্যামেরিকার ব্যাঙ্কগুলি বৃটিশ সরকারকে নিজেদের হুকুমে চালাবার মত অবস্থা করেছিল। সেবার সে বহুকষ্টে সে দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু এবারকার অবস্থা আরো শোচনীয়। এবার তার ঋণ কেবল অ্যামেরিকার কাছে নয়, অধমর্ণ ভারতবর্ষ পর্যন্ত এবার উত্তমর্ণ। শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট এই সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে অসমর্থ হলে যে একটা প্রচণ্ড আন্তর্জাতিক সমস্যার সৃষ্টি হবে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নাই।

জার্মাণীর পতনের ফলে ইওরোপের সমস্যা অত্যন্ত সংকটপূর্ণ হয়েছে। পট্‌স্ড্যাম কনফারেন্সে জার্মাণীর ভবিষ্যৎ ত্রিশক্তি যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে চাইছে এর ফলে সেখানে একটা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আশংকার কথাই মনে হয়। একটা সম্পূর্ণ শিল্পপ্রধান জাতিকে কৃষিপ্রধান জাতিতে পরিণত করা যে ঐতিহাসিক পরিণতির বিরোধী এই কথাটা ত্রিশক্তির প্রধানগণ নিজেদের ভবিষ্যৎকে নিরাপদ রাখবার ভাবনায় ভুলে গেছেন। পটস্ড্যাম সিদ্ধান্তের ফলে পুনরায় একটা সামরিক গোষ্ঠী জার্মাণীতে গড়ে উঠবে যারা ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে সমস্ত দেশবাসীর আন্তরিক সহানুভূতি লাভ করবে। এ বিষয়ে একটা আশার কথা আছে যে সোভিয়েট রাশিয়া ও বৃটেনের শ্রমিক গভর্মেণ্ট সম্মিলিত হয়ে নিজেদের অংশে সাম্যবাদমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যদি সাহায্য করে তা হলে অ্যামেরিকার অংশে গণতন্ত্র আপনা আপনিই প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু সে সাহস বৃটেনের শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের হবে কি?

জার্মাণীর বাইরে ফ্রান্স ও ইতালির অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। গৃহযুদ্ধে উভয়েই মগ্ন এবং উভয়ের রাষ্ট্রিক গঠন পদ্ধতিই ভাঙাচোরার ভিতরে। বলকানের ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি নতুন করে তাদের সীমান্ত সমস্যার দ্বন্দ্ব নিয়া ব্যাপৃত। সোভিয়েট রাশিয়ার হাত সেখানে সুস্পষ্ট—ফ্রান্স ও বৃটেনের সেদিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ওদিকে তুরস্কের সঙ্গে ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলি বিশেষ করে সোভিয়েট রাশিয়া লীগ অব নেশনসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে মণ্ট্রেজ কনভেনসন (১৯৩৬) মেনে নিয়েছিল তাই নিয়ে মন কষাকষি সুরু হয়েছে। মণ্ট্রেজ কনভেনসনে তুর্কীকে ভূমধ্যসাগরের ও কৃষ্ণসাগরের অন্তবর্তী জলভাগের উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল। সোভিয়েট রাশিয়া এখন বলছে যে সে-সময়কার অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন হয়েছে সুতরাং এই কনভেনসনের শর্ত পালটাতে হবে। ভূমধ্যসাগরের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য সোভিয়েট রাশিয়া অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। ট্রিয়েষ্ট ও মণ্ট্রেজ কনভেনসনের সমস্যা থেকেই তা পরিষ্কার হয়েছে। এ ছাড়া জাপানের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার ফলে এশিয়ায় সোভিয়েটের দাবী ও চীনের উপর তার প্রভাব যে প্রচণ্ড হবে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠবে এবং এর পরিণতি যে কোথায় ও কি ভাবে হবে সে-বিষয়ে ভাবতেও ভয় হয়।

ইওরোপের সমস্যার বাইরে আছে সমগ্র প্রাচ্যের সমস্যা—আফ্রিকা, এশিয়ার সমস্যা। অ্যাটলান্টিক চার্টারের প্যাসিফিক রূপ কি হবে? আজ ত্রিশক্তিকে পৃথিবীর জনগণের সামনে এর উত্তর দিতে হবে। ফরাসী ইন্দো-চীন, ব্রিটিশ ফেডারেটেড মালয় ষ্টেটস্, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ এসব দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা কি 'যথা পূর্বং তথা পরং', *Status Quo ante bellum* থাকবে? সোভিয়েট রাশিয়াকে, অ্যামেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে, বৃটেনের শ্রমিক সরকারকে এর জবাব দিতে হবে। ভারতবর্ষের কথা ছেড়েই দিলাম।

যুদ্ধোত্তর সমস্যা ও আমরা—যে যুদ্ধের জন্য আমরা দায়ী নই, যা আমরা ঘোষণা করি নাই, যা আমাদের রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক কোনো স্বার্থের সঙ্গেই জড়িত নয় সেই যুদ্ধের ফলে আমাদের দুর্দশার—অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক ও নৈতিক দুর্দশার—সীমা নাই। যুদ্ধের পরে যে সব সমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনকে উপদ্রুত করবে তাদের সম্বন্ধে দেশবাসী অনেকদিন থেকেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ এখন শেষ হয়েছে সুতরাং সেই অনাগত দুর্ভাবনা এইবার বাস্তব রূপ নিয়ে জাতির বুকের উপর জগদ্দল পাথরের বোঝা নিয়ে বসল। জাতি পরাধীন, সাম্রাজ্যবাদী কনজর্ভর এক রাষ্ট্রের অধীনে আমরা আছি। সুতরাং আমাদের যে কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তা সহজেই অনুমেয়। অর্ধ-সরকারী ও বেসরকারী নানা রকম 'প্ল্যান' নিত্য নতুন প্রকাশ পাচ্ছে। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিটী কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি

বলিয়াছে। কিন্তু এরা যে গোড়া কেটে আগায় জল ঢালবার ব্যবস্থা করছে সে-বিষয়ে কি এরা জানে না? এদেশের সরকারী ও অর্দসরকারী সমস্ত পুনর্গঠন পরিকল্পনা বৃটেনের অর্থনীতির দিকে তাকিয়ে তৈরী হচ্ছে।

বেণী সাহেব ঢাকায় এক বক্তৃতায় বলেছেন যে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের এমন ব্যবস্থা হয়েছে যাতে যুদ্ধের পরও মানুষ চাকুরীর পেছনে যাবে না, চাকুরীই মানুষের পেছনে যাবে। এটা জাতির পক্ষে আশা কি নিরাশার কথা তা বোঝা দুরূহ। যুদ্ধের সময় দেখেছি চাকুরী মানুষকে তাড়া করছে, কিন্তু তার ফলে আমাদের জাতীয় সম্পদের কতটুকু উন্নতি হয়েছে? চাকুরী করে ঘরে টাকা এনেছি, কিন্তু সে টাকার পরিমাণ যুদ্ধের পূর্বের টাকার পরিমাণের চাইতে সংখ্যায় বেশী হলেও তার ক্রয়-শক্তি যে পূর্বেকার টাকার ক্রয়শক্তির থেকে কত অল্প সে-বিষয়ে কি কারুর জানা বাকী আছে। টাকা আনলেও না খেয়ে দেশবাসী কাতারে কাতারে মরেছে, রোগে জাতটা পঙ্গু হয়ে গেছে। 'যুদ্ধের প্রয়োজন'-এর অজুহতে জাতিকে সব দিকে বঞ্চিত করার ফলেই আজ আমাদের চিরন্তন দুর্দশা এমন তীব্র মারাত্মক রূপ নিয়েছে। যুদ্ধের পর ভারতের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা যদি ইংলণ্ডের অর্থনীতির উন্নতির দিকে তাকিয়ে থাকে তবে এদেশের দুরবস্থার আর সীমা থাকবে না।

আমাদের সমস্যা ৯৩ ধারার অপসরনে বা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিতে নয়। আমাদের সমস্যার সমাধান 'Quit India' প্রস্তাবের মধ্যেই অন্তর্নিহিত। কংগ্রেসের এই বাণীকে বাস্তবরূপ দিবার নির্দেশ চৌদ্দদফা গঠনমূলক প্রস্তাবের মধ্যে দিয়েছে। আজ কর্মীদিগকে সেদিকে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে। কংগ্রেস কর্মীদের অনেকে ধীরে ধীরে কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। বাহিরের কলকোলাহল থেকে তাঁরা দূরে ছিলেন সুতরাং বাইরে যারা আছেন তাঁদের থেকে দেশের বৃহত্তর সমস্যা সম্বন্ধে তাঁরা ভাববার অবকাশ বেশী পেয়েছেন। এটা খুব আশাপ্রদ যে যাঁরা কংগ্রেসের ভেতরে ও বাইরে দল গড়ার পক্ষপাতী ছিলেন তাঁরা অনেকেই তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে দল ভেঙে কংগ্রেসের তলে আসতে সুরু করেছেন। কিন্তু এই অছিলায় কেবল দল গড়বার মোহে, নীতির কোনো বালাই না রেখে কংগ্রেস অফিস দখল করবার লোভে যদি নতুন করে নাম-হীন দল বা Clique যদি সৃষ্টি হয় তবে তার ফল অত্যন্ত শোচনীয় হবে। বাংলাদেশের রাজনীতি যদি পুনরায় Policy ধাঁদ দিয়া Politics করতে সুরু হয় তবে আমাদের দুরবস্থার সীমা থাকবে না। যেসব আত্মত্যাগী কংগ্রেসকর্মী এখনও জেলে আছেন আমরা আশা করি তাঁরা বাইরে না আসা পর্যন্ত সকলেই অপেক্ষা করবেন। গতবারও 'দাদারা কিছু বোঝেনা', 'তারা Socialism বিশ্বাস করে না' বলে একদল কর্মী তৃতীয় পক্ষের পরোক্ষ সহায়তা করে দেশে কংগ্রেসনেতৃত্বের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করেছিলেন; এবারও যদি সে রকম হয় তবে দেশবাসী যে তাদের মার্জনা করবে না, সেবিষয়ে তাঁরা দৃঢ়নিশ্চয় থাকতে পারেন।

কাগজ নিয়ন্ত্রণ—যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে; সামরিক প্রয়োজনে সংবাদপত্র ও কাগজ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ভারতরক্ষা আইনের বলে প্রচলিত সমস্ত আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করার জন্য সমগ্র দেশবাসীর এখনই আন্দোলন সুরু করা প্রয়োজন। কাগজের অপ্রতুলতার অছিলায় Newspaper. Control Order ও Paper Control (Economy) Order যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তাতে এই আদেশগুলি রাজনৈতিক কারণে অপব্যবহৃত হয়েছে বলেই দেশবাসীর ধারণা। স্যর আজিজুল হকের পক্ষে এটা মোটেই সম্মানজনক নয়। সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধে, অনিচ্ছাকৃত হলেও, তাঁর দায়িত্ব যে কতটা সে কথা তাঁর দেশবাসী ভুলবে না। নিত্য নূতন সাময়িকপত্র বের করবার অনুমতি দিতে যেখানে তিনি আপত্তি করেন না সেখানে তিনি কোন্ অজুহতে News Paper Control Order ও Paper Control (Economy) Orderএর বলে পুরাতন সাময়িক পত্রগুলির প্রকাশের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে পারেন? আজকে তাঁর দেশবাসীর এই প্রশ্নের কি উত্তর তিনি দেবেন? প্রাদেশিক সরকারের উপর দায়িত্ব চাপালেই তিনি রেহাই পেতে পারেন না। D. I. Rulesএ যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আদেশ দিবার তার সেখানে তিনি প্রাদেশিক সরকারকে টেনে আনতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ যে সব স্থানে প্রাদেশিক সরকার "No objection"

বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছে সে সব স্থলেও তিনি দৃঢ়হস্তে কাজ কেন করেন নাই? আই. সি. এস্ কর্মচারীদের উপর হুকুম চালাবার জন্য বড়লাটের মন্ত্রণাসভার সদস্যেরা নিযুক্ত হয়েছেন, না, তাঁরা আই. সি. এস কর্মচারীদের হুকুমমত চলবার জন্য সেখানে গেছেন? স্যর আজিজুল হককে এ বিষয়ে তাঁর দেশবাসীর কাছে খুব শিগগীরই উত্তর দিতে হবে।

পরলোকে সরলা দেবী চৌধুরাণী—গত ১লা ভাদ্র সরলা দেবী চৌধুরাণী দেহত্যাগ করেছেন। স্বদেশীর যুগ থেকে সুরু করে জালিয়ানাবাগের যুগ পর্যন্ত বাংলার রাজনীতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর দান ছিল অজস্র। বাংলার মধ্যবিত্ত ও কলিকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ করবার জন্য তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী রূপে কবিগুরুর সাহচর্য ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের প্রথম দিকটা গড়ে' উঠেছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সসম্মানে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং মহিলা গ্রাজুয়েটদের ভেতর প্রথম হওয়ায় "পদ্মাবতী" পদক পান। ১৩০৬ সাল থেকে তিনি "ভারতী" পত্রিকার সম্পাদনা সুরু করে সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল এই কাগজটি অক্ষুণ্ণ গৌরবে চালিয়ে যান। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বীরাষ্টমী ব্রতের প্রবর্তন তাঁর বিশিষ্ট দান। বাঙালী ছেলেদের দৈহিক শক্তি লাভের জন্য তিনি সর্বদাই আন্দোলন করতেন। পাঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। পঞ্জাব ও বাংলার মধ্যে একটা বন্ধন স্থাপন করতে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করেন। জালিয়ানাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর যখন সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশ ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের অত্যাচারে ভীত ও সন্ত্রস্ত, পঞ্জাবের কোনো সংবাদ যখন বাহিরে আসত না, সরলা দেবী সেই সময় কৌশলে তাঁর গানের ও কবিতার মারফৎ বাংলাতে ও অন্যত্র পঞ্জাবের সংবাদ জানান। বাঙালী জাতি চিরদিনই তাঁর দানের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ রাখবে। তাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীদীপক চৌধুরীকে আমাদের গভীরতম সমবেদনা জানাচ্ছি এবং আমরা আশা করি যে তিনিও তাঁর পিতা ও মাতার পদাংকানুসরণ করে' কংগ্রেসের বাণী বহন করবার গৌরব অর্জন করবেন।

চীনের সমস্যা—যে অন্তর্বিবাদের জন্য চীনে বিদেশী রাষ্ট্রগুলি হস্তক্ষেপ করবার সুবিধা পেয়ে এসেছিল সেই অন্তর্বিবাদ এই যুদ্ধের মধ্যে শেষ ত হয়ই নাই উপরন্তু এখন তা আরো তীব্র হয়েছে। পূর্বেকার চীনের অন্তর্বিবাদ ছিল স্থানীয় সামন্তদের মধ্যে—এরা কখনও নিজেরা একে অন্যের জমিদারি আক্রমণ করত কখনও বা কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করত। বর্তমানে এই বিবাদ এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে চীন সরকার ও চীনের কম্যুনিষ্ট দলের ভেতর। কেন্দ্রীয় চীন সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চীনের কম্যুনিষ্ট দল চীনের সীমান্ত প্রদেশগুলিতে নিজেদের সর্বভৌম আধিপত্য বিস্তার করেছে। জাপ-আক্রমণের ফলে উভয়েই সমান ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই আশংকায় উভয়েই শত্রুর বিরুদ্ধে মিলিত হয়েছিল জেনারেল চিয়াং কাইশেকের সর্বাধিনায়কত্বে। ১৯৩৭এর ডিসেম্বরে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি ঘোষণা করে যে তারা কেবল জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যই চিয়াং সরকারের সঙ্গে সম্মিলিত হয় নাই, যুদ্ধের পর চীন পুনর্গঠন কার্যেও তারা চীনের কেন্দ্রীয় সরকার কুওমিন্টাংএর সঙ্গে কাজ করবে :—

> "The Communist Party of China has not merely joined hands with the Kuomintang to save the nation during the war, but is determined to co-operate harmoniously with the Kuomintang to reconstruct the nation after the war has ended in victory." (As quoted in *The Birth of a New China*—A. Clegg p. 85. Indian Edition)

কিন্তু এটা ঐতিহাসিক সত্য যে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি তাঁদের এই প্রতিজ্ঞা যুদ্ধের পর কেন যুদ্ধের সময়ও রক্ষা করেন নাই। চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি নিজেদের অধিকৃত অঞ্চলে যে প্রোগ্রাম দিয়েছে সে প্রোগ্রামের সঙ্গে সাম্যবাদের কোনো নিকট সম্পর্ক নেই। এই প্রোগ্রামে ধনিকতন্ত্র-বাদকে উচ্ছেদ করা দূরের কথা এতে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকারকে পুরোপুরি স্বীকার করা হয়েছে, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিকে স্বীকার করা হয়েছে। কৃষকের জীবিকার মান বাড়াবার জন্য জমির খাজনা কমান হয়েছে, সমবায় সমিতি (সোভিয়েট সমবায় সমিতির সঙ্গে এদের কোনো দিকেই মিল নাই) স্থাপন

করা হয়েছে এবং ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা যাতে অতিরিক্ত লাভ না করে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

কুওমিনট্যাং সরকারের প্রচারিত নীতির সঙ্গে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতির অমিল প্রায় নেই বললেই হয়। এমতাবস্থায় চীনে একটা গৃহযুদ্ধ বাধলে সেটা সমগ্র প্রাচ্যের পক্ষেই বিশেষ অমঙ্গলজনক হবে। সর্বাধিনায়ক চিয়াং কৈশেক চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদককে আলোচনা করবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন। প্রকাশ, তিনি সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। একদিকে কেন্দ্রীয় চীন সরকারের সংবাদ প্রেরণে বাধানিষেধ অপর দিকে কম্যুনিষ্টদের চিরাচরিত অতিরঞ্জিত ভাষণের মধ্য থেকে সত্য বের করা দুরূহ। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে এই প্রত্যাখ্যানকে যুক্তি সঙ্গত বলে মনে হয় না। উভয় শক্তির দ্বন্দ্বতার দ্বন্দ্ব চীনের ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করেছে। আমরা আশা করি চিয়াংকৈশেক কালের গতির বিপরীতে চলবেন না; কুওমিনট্যাং সত্যিকার গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠন করবার শক্তি তিনি জনসাধারণ থেকেই পাবেন এবং সেই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তিনি সান ইয়াৎসেনের স্বপ্ন সফল করবেন। নূতন সোভিয়েট-চীন মৈত্রী চুক্তি আশা করি চীনকে অন্তর্বিবাদের হাত থেকে রক্ষা করবে।

রাজার বক্তৃতা—বিলাতী নির্বাচন সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য ছাপা হবার পর পার্লামেন্ট উদ্বোধন উপলক্ষে 'রাজার বক্তৃতা' আমাদের হস্তগোচর হয়েছে। শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনো আমূল পরিবর্তনের নীতি গ্রহণ করেন নাই 'রাজার বক্তৃতা' পড়ে সেটা পরিষ্কার বোধগম্য হ'ল। "পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন" দেবার জন্য ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে শ্রমিক সরকার আলোচনা করবেন জেনে আমরা সবাই তাঁর সদিচ্ছায় আশ্বস্ত হলুম।

নিজের ভাগ্য নিজেকে তৈরী করতে হবে—শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের ওপর যারা নির্ভর করবে তারা দেশকে পিছিয়েই নেবে। সমগ্র দেশকে এজন্য প্রস্তুত করা আশু প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। গান্ধিজীর ১৪ দফা গঠনপদ্ধতি অনুসরণ করে যতটা সম্ভব দেশের অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করতে হবে। আমাদের আদর্শ হবে 'Quit India' প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করা। আমাদের শক্তি আসবে চাষীর থেকে, মজুরের থেকে। তাদের জানতে হবে যে কংগ্রেস দাঁড়িয়েছে তারই স্বাধীনতার জন্য, তারই মুক্তির জন্য। তার অন্ন ও বস্ত্র সমস্যা, জীবনযাত্রার সমস্ত সমস্যা সমাধানের ভার নিয়েছে কংগ্রেস। যে চাষ করে জমী তার, যে ধান জন্মায় ধান তার—কংগ্রেস যে এই আদর্শ নিয়ে কাজ করছে একথাটা আজ দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে জানাতে হবে। তাহলেই কংগ্রেসের পতাকার নীচে সমগ্র দেশ এসে দাঁড়াবে।

রাষ্ট্রীয় শিক্ষালয়—দেশের ভেতর যেয়ে কাজ করবার জন্য শিক্ষিত কর্মীর আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করেন। এইরূপ এক দল কর্মী সৃষ্টি করবার জন্য কলিকাতায় রাষ্ট্রীয় শিক্ষালয় নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভ্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এই বিদ্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে গত ১৮ই আগষ্ট কংগ্রেসের আদর্শ সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি অহিংসা, চরকা, ও খাদি, গণসাধারণের সহিত সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে কংগ্রেসের লক্ষ্য সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে সাম্য স্থাপন করা এবং তাঁর মতে, তাই প্রকৃত সোস্যালিজম বা সাম্যবাদ। তিনি বলেন যে সাম্যবাদ ও হিংসা, এই দুইটি পরস্পর বিরোধী। সোভিয়েট রাশিয়াকে তিনি এজন্যই সোস্যালিষ্ট রাষ্ট্র বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত নন কারণ সেখানে রাষ্ট্র জাতীয়তার গণ্ডীর ভেতর কাজ করছে এবং সেজন্যই হিংসার সাহায্য তাকে নিতে হয়। আভিজাত্য ও দলীয় প্রাধান্য এই দুই-ই সোস্যালিজমের বিরোধী কিন্তু হিংসার সাহায্য নিলেই এদের আবির্ভাব হতে বাধ্য। খাদি ও চরকা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে খাদি ও চরকা প্রচলিত হলে মূলধনী সৃষ্টির তা হবে প্রতিবন্ধক। কেন্দ্রায়িত অর্থনীতিই ধনিকতন্ত্রবাদের ও হিংসার জন্ম দেয়। সেজন্যই অহিংসা কেন্দ্রায়িত অর্থনীতি সৃষ্টি করতে দেয় না এবং কংগ্রেস অর্থনীতিতে সেজন্যই ধনিকতন্ত্রের স্থান নাই। তিনি মনে করেন যে আমরা সকলেই যদি চরকা কাটি তা হলে দেশে এমন একটা বিরাট শক্তিমান সংঘ দাঁড়াবে যে সংঘই দেশের স্বাধীনতা আনয়ন করতে সমর্থ হবে। কংগ্রেসের প্রত্যেকটি কর্মীকে তিনি গ্রামে যেয়ে গ্রামবাসীর সঙ্গে পরিচিত হতে বলেন, তাঁদের কাছে কংগ্রেসের বাণী প্রচার করতে বলেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি গত দুর্ভিক্ষে কংগ্রেস কর্মীরা কাজ করে নাই বলে দুঃখ প্রকাশ করেন। আমাদের মনে হয় এ বিষয়ে ডাঃ ঘোষ নিরপেক্ষ খবর পান নাই। যে-সব কংগ্রেস কর্মী বাইরে ছিল তারা কোনো না কোনো উপায়ে জাতির এ দুঃসময়ে অকুণ্ঠিত চিত্তে সেবা করেছে। অন্ন বিতরণ কেন্দ্র, দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র ঔষধ বিতরণ কেন্দ্র ইত্যাদির ভেতর দিয়ে কংগ্রেস কর্মীরা তাদের যথাসাধ্য করেছেন। ডাঃ ঘোষ বোধ হয় জানেন না যে সরকারের কর্মচারীদের অকর্মণ্যতা ও বহু সময়ে কংগ্রেস বিরোধিতার জন্য জিনিষপত্র পেতে ও পাঠাতে কি বেগ পেতে হয়েছে। হিন্দু মহাসভা যে রিলীফ করেছিল সেই রিলীফের অধিকাংশ কেন প্রায় সব কর্মীই কংগ্রেসের ছিল। এক কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিরোধাচারণের জন্য কংগ্রেস কর্মীরা ওদের ঘৃণ্য পদার্থের মত এড়িয়ে চলেছে—নইলে তারা যেখানেই আর্তসেবার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেখানেই তারা সেবার জন্য দৌড়ে গেছে। কংগ্রেসের নামে কোনো কাজ করার উপায় তখন ছিল না তাই কংগ্রেস কর্মীগণ কম্যুনিষ্ট দল ছাড়া অন্য সব দলের সঙ্গে মিলে কাজ করেছে। ডাঃ ঘোষ এ বিষয়ে দল-নিরপেক্ষ সংবাদ সংগ্রহ করলে বোধ হয় বুঝতে পারবেন যে কংগ্রেস কর্মীদের যে অপবাদ তিনি দিয়েছেন তা ঠিক নয়।

অম্বিকা-চিমুর বন্দী—অম্বিকা চিমুর পুলিশ হত্যা মামলায় সাত জন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত বন্দীদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ রহিত করে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয়েছে। শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের এই সদ্বিবেচনার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ।

'মন্দিরা' কার্যালয়ে অগাষ্ট উৎসব—গত ৯ই অগাষ্ট 'মন্দিরা' কার্যালয়ে 'মন্দিরা'র কর্মী ও অনুরাগীদের উপস্থিতিতে প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্তের নির্দেশে সকাল ৮টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী, বহু নির্যাতিত স্বদেশসেবক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ রায় সমবেত কণ্ঠের 'বন্দে মাতরম' ধ্বনির মধ্যে পতাকা উত্তোলিত করেন। একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতায় তিনি অগাষ্ট আন্দোলন ও জাতীয় পতাকার অর্থ আলোচনা করেন।

অন্যান্য কথার মধ্যে আগষ্ট আন্দোলনের দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'আগষ্ট আন্দোলনের দায়িত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। তবু যেন মনে হয় সব কথা বলা হয় নি। আরও অনেক কিছু বলবার আছে। এই আন্দোলনকে গণ আন্দোলন এবং বিপ্লবাত্মক আন্দোলন বলে স্বীকার কোরে আন্দোলনের দায়িত্ব কংগ্রেসকে নিতেই হবে, কারণ কংগ্রেসই দেশকে স্বাধীনতা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ কোরেছে এবং কংগ্রেসই দেশে বিপ্লবাত্মক মনোবৃত্তির সৃষ্টি কোরেছে।

'তবে আন্দোলন অন্তর্বিপ্লবের বিপথে গিয়েছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই বিপথে যাওয়ার দায়িত্ব কার? এখানে প্রায় সকলেই একমত যে এ দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের। কারণ গভর্ণমেণ্ট যদি মহাত্মা গান্ধী হতে সুরু কোরে আমাদের মত চুনোপুটীদের পর্যন্ত হঠাৎ কারারুদ্ধ কোরে না ফেল্‌তেন, তবে দেশের এক দল লোকের মাথাখারাপ হোতো না এবং তারাও আন্দোলনের নামে পাগ্‌লামো কোত্তো না। তবু আমি আন্দোলন বিপথে যাওয়ায় ষোলআনা দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টের ঘাড়ে চাপাতে রাজী নই। আমি বড়জোর দশ আনা দায়িত্ব গভর্ণমেণ্টকে দিতে রাজী আছি। বাকী ছয় আনা দায়িত্ব আন্দোলন প্রতিরোধকারীদের। নদীতে পাথর ফেলে তার স্রোত বন্ধ করা যায় না। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে চড়া পড়েছে বলে গঙ্গার স্রোত বন্ধ করা যায় নি। সে বিপথে চলে গ্যাছে। কতকটা পল্লা দিয়ে আর কতকটা খাল নালায় দুকূল ভাসিয়ে জনপদ নষ্ট কোরে চলে গ্যাছে।

'তাই এই আন্দোলন বিপথে যাওয়া দশ আনা দায়িত্ব যদি গভর্ণমেণ্টের হয়ে থাকে, তবে ছয় আনা দায়িত্ব তাদের যারা আন্দোলন প্রতিরোধ কোরে দাঁড়িয়ে ছিল, তা তারা কমিউনিষ্ট হউক, কি র‍্যাডিক্যালই হউক, কি সিভিলই হউক, কি ক্রিমিনেলই হউক। আমি এই আন্দোলনের জন্য গৌরব বোধ করি। একটা অসহায় জাতি নেতৃত্ব হীন হয়েও যেভাবে জেগে উঠেছিল, সমগ্র দেশ যে ভাবে উথলে উঠেছিল, তাতে আশা হয় যে বুঝিবা জীবনের শেষ নিশ্বাসটা স্বাধীন দেশেই ফেল্‌তে পারবো। এই আশায় বুক বেঁধেই আজ আপনাদের কাছে বিদেয় নিচ্ছি।'

শারদীয়া সংখ্যা—অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও 'মন্দিরা'র শারদীয়া সংখ্যাকে সর্বদিক থেকে সমৃদ্ধ করবার আয়োজন আমরা করেছি। প্রবন্ধ গৌরবে 'মন্দিরা' যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে বাংলাদেশে খুব অল্পসংখ্যক সাময়িক পত্রিকাই তা পেরেছে। কার্তিক সংখ্যা 'মন্দিরা'ই শারদীয়া সংখ্যা হবে। যে সব লেখক লেখিকা ও বিজ্ঞাপনদাতা আমাদের এতাবৎ সাহায্য করে এসেছেন তাঁদের অনুগ্রহ লাভ এবারও করব বলে আমরা ভরসা করি।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা'র কার্যালয়

মাতৃদুগ্ধের অনুরূপ

শিশুদের পক্ষে মাতৃদুগ্ধ অমৃতের ন্যায় অনুপম। কিন্তু বিশুদ্ধতায় এবং পুষ্টিকারিতায় 'ভিটামিল্ক' মাতৃদুগ্ধেরই অনুরূপ। ইহা খাঁটি গো-দুগ্ধ হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত এবং ইহাতে প্রচুর ভিটামিন বিদ্যমান। আপনার সন্তানের স্বাস্থ্য, শক্তি এবং লাবণ্যের পূর্ণ বিকাশের জন্য তাহাকে নিয়মিত 'ভিটামিল্ক' খাইতে দিন।

ভিটা-মিল্ক

বিশুদ্ধ·পুষ্টিকর·সুস্বাদু

ন্যাশনাল নিউট্রিমেন্টস্ লিঃ · কলিকাতা

সিলেট ইনডাষ্ট্রিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

টেলিগ্রাফ—ইনডাষ্ট্রিয়েল ফোন—সিলেট ১৭

কলিকাতা অফিস :—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

টেলিগ্রাফ—সিডাষ্ট্রিয়েল ফোন—কলিঃ ৫৬০৭

অনুমোদিত মূলধন— ১০,০০,০০০৲

বিক্রীত মূলধন— ৫,৫০,০০০৲

আদায়ী মূলধন (অগ্রিম কল ও শেয়ার বাবদ প্রাপ্ত টাকা সহ) ৪,৩৫,০০০৲

কার্য্যকরী তহবিল ১,০০,০০,০০০৲ উর্দ্ধে

—অন্যান্য শাখা—

ঢাকা, ময়মনসিং, নারায়ণগঞ্জ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, গৌহাটী, শিলং, নওগাঁ, শিলচর, করিমগঞ্জ, করিমগঞ্জ বাজার, মৌলবী বাজার, হবিগঞ্জ ও ডাউকি

সর্ব্ববিধ ব্যাঙ্কিং কাজ সুবিধাজনক সর্ত্তে করা হয়।

জে, এম, দাস—জেনারেল ম্যানেজার

জীবন বীমায়

বম্বে মিউচুয়্যাল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্

ভারতের

প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত—১৮৭১

দস্তিদার এণ্ড সন্স্

চীফ্ এজেন্টস্

২নং রয়্যাল এক্স্‌চেঞ্জ প্লেস্, কলিকাতা।

ফোন: কলিকাতা ১০১৮

পরিচয়

অষ্টম বর্ষ | আশ্বিন—১৩৫২ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কংগ্রেস ও হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

শ্রীঅবিনশ্বর সিংহ রায়

কংগ্রেসের আদর্শ কি, কংগ্রেস কি চায়—এই প্রশ্ন হঠাৎ মনে হয় অত্যন্ত অবান্তর। কারণ কংগ্রেস যে ভারতের স্বাধীনতা চায় ইহা ত সকলেই জানি। সকলেই জানি যে হোমরুল, ডমিনিয়ান স্ট্যাটাস ইত্যাদি দাবীকে ধীরে ধীরে ত্যাগ করিয়া কংগ্রেস বর্তমানে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিতেছে, ইহাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। কিন্তু এই যে লক্ষ্য ইহার মধ্যে নানা জটিলতা লুকাইয়া আছে এবং দেশবাসীর মধ্যে জাতীয় চেতনাবোধ যতই বাড়িতেছে এই সব জটিলতা-গুলি ততই আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। আমাদের জাতীয় চেতনাবোধ কুড়ি পঁচিশ এমন কি দশ পনর বৎসর পূর্ব হইতেও যে এখন অনেক বাড়িয়াছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নাই। ইহার প্রধান কারণ আমাদের অর্থ-নৈতিক দুর্দশার ক্রমাগত বৃদ্ধি। আমাদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য আমাদিগকে এখন আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হইতে সতর্ক করিতেছে। তাই আমরা চক্ষু মেলিয়া দেখিতেছি, আমাদের নিজেদের প্রকৃত অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। বাহিরের পৃথিবীতেও একটা চাঞ্চল্য জাগিয়াছে, তাহারও ঢেউ আসিয়া আমাদের নিদ্রাজড় মনকে আঘাত করিতেছে। এই সব কারণেই আমাদের জাতীয় চেতনা-বোধ বাড়িয়াছে, সতর্ক হইয়াছে, তীক্ষ্ণ হইয়াছে।

এই সতর্কতা ও তীক্ষ্ণতা আমাদিগকে আমাদের দুর্দশার কারণ ধীরভাবে বিশ্লেষণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে এবং তাহারই ফলে আমাদের সমস্ত স্বাধীনতার প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এখন দেখিতেছি যে, কেবল ইংরেজের হাত হইতে স্বাধীনতা পাইলেই আমাদের সমস্ত সমস্যা মিটিবে না, বরঞ্চ উহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক নূতন সমস্যা যাহা এখন এই পরাধীনতার দরুণ সুপ্ত হইয়া আছে তাহা মাথা নাড়া দিয়া উঠিবে। কংগ্রেস একটি প্রবহমান জীবনীশক্তি সম্পন্ন পার্টি বা দল, সুতরাং এই সব জটিল সমস্যার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতৃত্ব সম্পূর্ণ সজাগ রহিয়াছে এবং এই সব সমস্যার সমাধানের জন্য কংগ্রেসের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রহিয়াছে।

এই জন্যই আমার প্রথম প্রশ্ন 'কংগ্রেস কি চায়' উত্তর দেওয়া সহজ নয়। যে-সমস্ত জটিল সমস্যা আজ আমাদের জাতীয় জীবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ও আমাদের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে আসিবে, সেই সমস্ত জটিল প্রশ্নের সমাধানের ভিতরই আমার প্রশ্নের উত্তর রহিয়াছে। 'কংগ্রেস দেশের ও জাতির সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা চায়' বলিলেই আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল না।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশবাসীর নিকট সর্বাপেক্ষা জটিল সমস্যা হইতেছে হিন্দু-মুসলমান, দুইটি পৃথক ধর্মাবলম্বী একই দেশের অধিবাসীদের সমস্যা। পঁচিশ বৎসর পূর্বেও এই সমস্যা আমাদের দেশে কোনো সমস্যা বলিয়াই

পরিগণিত হইত না। দেশের প্রায় সর্বস্থানেই—গ্রামে, পল্লীতে, সহরে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বহু শতাব্দী ধরিয়া একত্রে বাস করিয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে। কোনো প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের হইতে বেশি, কোনো প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু হইতে বেশি। ইসলাম ধর্ম এদেশে প্রায় ৯০০ বৎসর যাবৎ দৃঢ়ভাবে স্থান নিয়াছে। রাজকীয় ধর্ম বলিয়া এবং প্রথম প্রথম মুসলমান রাজারা ধর্মপ্রচারে উৎসাহী ছিলেন বলিয়া এদেশের কিছু লোক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল; ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল হিন্দু কৃষিজীবি ও কিছু ছিল হিন্দু সমাজের অন্যান্য নিম্নস্তরের। আমাদের দেশের মুসলমানদের অধিকাংশের পিতৃপুরুষই হিন্দু। বহিরাগত মুসলমানদের বংশধরের সংখ্যা খুবই কম এবং যাহারাও আছে তাহারাও এদেশের স্থায়ী অধিবাসীদের সহিত বিবাহাদি দ্বারা মিলিয়া একই হইয়া গিয়াছে। একই পিতৃপুরুষের বংশধর বলিয়া হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোনরূপ জাতিগত বা সংস্কৃতিগত মূল পার্থক্য নাই। একজন বাঙালী হিন্দু ও একজন বাঙালী মুসলমানের চেহারা, হাঁটাচলা, কথাবার্তায় কোনো পার্থক্যই ভিন্ন দেশের বা ভিন্ন প্রদেশীয়ের দৃষ্টিতে পড়ে না; তেমনি পাঞ্জাবের একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানের মধ্যে কোনো পার্থক্যই আমাদের চোখে সহজে পড়ে না। ভাষা, বেশভূষা সমস্তের সাদৃশ্যই চোখে প্রথমে পড়ে।

এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে তীব্র বিরোধ প্রায়ই আমাদের জাতীয় সংহতিকে কলঙ্কিত করে কেন? ইহার মূল কারণ প্রধানতঃ অর্থনৈতিক, অবশ্য পরে রাজনৈতিক স্বার্থ আসিয়া স্বতঃই ইহার সহিত যোগ দিয়াছে। মূলতঃ হিন্দু সমাজের নিম্নস্তর—চাষী প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা—মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করার ফলে সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানগণ ভারতীয় অর্থনীতির নিম্নস্তরে আছে। যে সব মুসলমান বাহির হইতে এদেশে আসিয়াছিল এবং যাহারা এদেশের মুসলমান শাসনাধীনকালে তদানীন্তন রাজসরকারের সহিত যুক্ত ছিল, তাহাদের বংশধরেরাই সাধারণতঃ বর্তমানের মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়। অবশ্য ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকুরী করিয়া যাহারা অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে তাহারাও এই কাঞ্চন-কৌলীন্যের যুগে বর্তমানের মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের সহিত অন্তর্ভুক্ত। মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত কিছুদিন পূর্বেও যে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম বা সম্প্রদায় নিয়া কোনো বিরোধ ছিল না তাহার মূলে হইতেছে মুসলমান সম্প্রদায়ের নিজসম্প্রদায়গত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক। মুসলমান সমাজে বহুদিন পর্যন্ত কোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না—একদিকে সমাজ দেহের সর্বোচ্চস্তরে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়, অপরদিকে সর্বনিম্নস্তরে মুসলমান চাষী ও মজুর। ইসলামের সাম্যবাদ সত্ত্বেও ইহাদের মধ্যের ব্যবধান চিরদিনই অতিশয় সুগভীর ও দুর্লঙ্ঘ্য। ইহার কারণও অর্থনৈতিক। পাদ্রী, পুরোহিত, মোল্লা ধনিকতন্ত্র সমাজে চিরদিনই রাজশক্তি তথা অভিজাত শক্তির পৃষ্ঠপোষক। পরলোকে অক্ষয় স্বর্গবাসের প্রলোভন দেখাইয়া ইহলোকের নরকবাসের যন্ত্রণাকে ভুলাইবার জন্যই ইহাদের প্রধান প্রচেষ্টা ও অস্তিত্বের সার্থকতা। চাষ করিবে চাষী ধান পাইবে জমীদার—এই ব্যবস্থার অযৌক্তিকতা যাহাতে চাষীর মনে না ওঠে সেই জন্যই তাহাকে যত স্তোক বাক্য দিতে হয়। এই স্তোক বাক্য দিবার জন্যই সামন্তপ্রধান ও ধনিকতন্ত্রপ্রধান সমাজে পাদ্রী, পুরোহিত, মোল্লার প্রয়োজনীয়তা। ইসলাম সাম্যবাদে বিশ্বাস করে—ধনী দরিদ্রের মধ্যে ভেদাভেদ দেখে না—ইহা হইল অভিজাত সম্প্রদায়ের স্তোক বাক্য। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে কি দেখি। ঈদের শরীফে আহারের সময় নবাব সাহেব উপস্থিত থাকেন সত্য এবং সকলের সঙ্গে এক চামচ খাদ্যও হয়ত গ্রহণ করেন কিন্তু তৎপরেই শারীরিক অসুস্থতার ভাণ করিয়া নবাব বাহাদুর সেখান হইতে সরিয়া পড়েন কেন? এক মুসলমান সম্প্রদায়েই নহে—সমস্ত ধনিকতন্ত্রী অভিজাতপ্রধান সম্প্রদায়েই ইহা দেখা যায়। ব্রাহ্মণ মহারাজা দীনতম ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পাদোদক খাইবে কিন্তু তাহার পুত্রের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিবে না। খৃষ্টান সমাজেও ঠিক ইহাই। আসলে সম্প্রদায়গত যে সাম্য তাহা আসে অর্থনৈতিক সাম্যের সহিত;—ধনীর সহিত ধনীর, চাষীর সহিত চাষীর, মজুরের সহিত মজুরের, মধ্যবিত্তের সহিত মধ্যবিত্তের।

হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত তুলনায় মুসলমান সম্প্রদায় অর্থনৈতিক হিসাবে অনেক নীচে। দ্বিতীয়তঃ সংখ্যাতেও

তাহারা অত্যল্প। এজন্যই এতদিন পর্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের কোনো সম্প্রদায়গত বিরোধ ছিল না। বর্তমানে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে—ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে এক নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। জীবিকা-র্জনের পথ ইহাদের পক্ষে রুদ্ধ; হিন্দু নিম্ন ও উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজ বহু পূর্ব হইতেই চাকুরী ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকায় দরুণ সেখানে নবাগত মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের প্রবেশে দারুণ বাধা। পরাধীনতার জন্য অধিকাংশ সরকারী চাকুরী ও বৃহৎ ব্যবসা বাণিজ্য বিদেশীদের আয়ত্তে। হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ সেখানে সমভাবেই বাধা পায়। পরাধীনতা না থাকিলে শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্র বহুল প্রসারিত হয় সুতরাং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, হিন্দুই হৌক কি মুসলমানই হৌক, নিজেদের অর্থ-নৈতিক উন্নতির জন্য বর্তমানের মত পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হয়না। উপার্জনের দ্বার রুদ্ধ বলিয়াই বিদ্বেষ বাড়িয়া ওঠে কিন্তু যে পরাধীনতার জন্য উপার্জনের দ্বার রুদ্ধ সে পরাধীনতাকে দূর করিবার চেষ্টা প্রথম প্রথম অনগ্রসর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিস্ফুট হয় না। কারণ এখানে তৃতীয় পক্ষ নিজেদের স্বার্থসংহত করিবার জন্য প্রথম হইতেই বিদ্বেষটি নিজেদের দিকে যাহাতে না আসে তাহার চেষ্টা করে। কখনও এক সম্প্রদায়কে, কখনও অপর সম্প্রদায়কে নানাভাবে প্রলুব্ধ করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ জাগ্রত করিতে চেষ্টা করে। কুখ্যাত লর্ড কার্জনের 'সুরোরাণী-দুরোরাণী' নীতি, পৃথক নির্বাচন, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রীতি এই ২০০ বৎসর অটুট ছিল তাহা ভাঙ্গিতে সুরু করিয়াছে। আজ অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে সম্পূর্ণ অপরিচিত ও কোনরূপ স্বার্থ সম্পর্করহিত হিন্দু মুসলমানের মাথায় লাঠি মারিতে দ্বিধাবোধ করে না এবং মুসলমানও তেমনি অপরিচিত হিন্দুকে ছোরা মারিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। সমাজ জীবনে এই যে গভীরতম লজ্জার ব্যাপার ইহার জন্য দায়ী প্রথমে আমাদের পরাধীনতা এবং দ্বিতীয়তঃ আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক অব্যবস্থা। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত ও অভিজাত সম্প্রদায় নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থহানির জন্যই আমাদের এই লজ্জাজনক সমস্যার প্রকৃত সমাধানের দিক হইতে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের দৃষ্টি অপরদিকে নিয়া পরোক্ষভাবে তৃতীয় পক্ষের স্বার্থসিদ্ধি করিতেছে। অখণ্ড হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, দ্রাবিড়ীস্থান, শিখিস্থান প্রভৃতির জন্য যে দাবী সে দাবীর মূলে হইতেছে হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অতিজাতদের নিজ নিজ কায়েমী স্বার্থকে চিরস্থায়ী করা। কারণ তাহারা জানে অর্থনৈতিক বিপ্লবের যে বন্যা আজ আসিয়া আমাদের সমাজদেহে আঘাত করিতেছে তাহা হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য খণ্ড খণ্ড ভাবে সমগ্র জাতিকে ত্যাগ না করিতে পারিলে তাহাদের রক্ষা নাই।

জাতি বা রাষ্ট্র কখনও ধর্মের সীমানা দিয়া ঘেরা থাকে না। তাহা হইলে Holy Roman Empire ভাঙ্গিয়া যাইত না, অটোমান সাম্রাজ্য অমন চুর চুর করিয়া খসিয়া পড়িত না। এখন আমাদের বুঝিবার দিন আসিয়াছে যে, এক সমস্বার্থবিশিষ্ট অর্থনীতির বন্ধনে যাহারা আছে মূলতঃ তাহারাই একটি জাতি। এই অর্থে একদিন পৃথিবীর সমস্ত বিভিন্ন জাতি তাহাদের ভৌগোলিক, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক সমস্ত কৃত্রিম গণ্ডী ভাঙ্গিয়া এক বৃহৎ শ্রেণী-সমন্বয়ীন জাতিতে পরিণত হইবে। পৃথিবীর সমস্ত দেশের মানব-মনীষীরা বর্তমানের অসাম্য ও ভেদ বিবাদ, যুদ্ধবিগ্রহ চিরদিনের জন্য বন্ধ করিবার ইহাই একমাত্র অবস্থা বলিয়া যখন স্বীকার করিতেছেন সেই সময় আমরা নিজেদের খণ্ড খণ্ড করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। ইহার চাইতে অদূরদর্শিতা ও সঙ্কীর্ণচিত্ততার আর কি দৃষ্টান্ত থাকিতে পারে?

কংগ্রেস যে কোনো সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রতিনিধি নয়—সে যে সারা ভারতবর্ষের হইয়া কথা বলিবার অধিকার অর্জন করিয়াছে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যায় কংগ্রেসের সমাধান পদ্ধতি হইতে তাহা সুপরিস্ফুট হইয়াছে। এক দিন ছিল যখন কংগ্রেস কেবল ভারতীয় অভিজাতদের প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবী করিয়াছিল, তখনও কংগ্রেস নেতৃত্ব বুঝিতে পারে নাই যে অভিজাত সম্প্রদায়ই দেশ নয়, মুষ্টিমেয় অভিজাত সম্প্রদায়ের বাহিরে যে বৃহৎ সম্প্রদায় পড়িয়া আছে, যে সম্প্রদায় রৌদ্রে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, কাদায় ডুবিয়া অভিজাত সম্প্রদায়ের মুখে নিজেদের সুখার অন্ন তুলিয়া

দিয়া স্ত্রী, পুত্র, মাতা নিয়া বিরস বদনে উপরের দিকে একবার চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় মাঠে খাটিতে যায় ও কলের 'সিটি'র সঙ্গে দৌড়াইয়া যন্ত্রমানবের সেবাতে রত হয়—সেই সম্প্রদায়ই আসল দেশ, সেই সম্প্রদায়ের স্বার্থই দেশের স্বার্থ—তাহার প্রতিনিধিত্ব করিবার গৌরবময় দুর্বহ অধিকার যে হাসিমুখে তুলিয়া নিতে না পারিবে দেশের প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকার তাহার নাই। যতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস এই অধিকার নেয় নাই, তাই পায় নাই। গান্ধিজী যখন আসিয়া কংগ্রেসের দরজায় কুণ্ঠিত পদক্ষেপে দাঁড়াইলেন তখন কংগ্রেস হাত মোচড়াইয়া ফিরিতেছে—সে-সম্বিৎ সে তখনও পায় নাই যে সম্বিৎ তাহাকে তাহার আসল রাস্তায় পৌঁছাইয়া দিবে। হরিজন উন্নয়ন পদ্ধতির মধ্য দিয়া, মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশ ও পূজা-দিকারের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে গান্ধিজী দেশের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিবার পথ পাইলেন। চম্পারণ আন্দোলনে গান্ধিজী দেখিলেন দেশ কোথায়, দেশ কাকে বলে। চাষের ধূলার অন্তরাল তাঁহার চক্ষু খুলিয়া দিল। আর তিনি ফিরিলেন না। তারপর হইতে দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন—লবণ সত্যাগ্রহ, চরকা ও খাদি আন্দোলন :—এসবই ত দেশের দীনাতিদীন, চাষীমজুরের অর্থনীতির সঙ্গে নিজেকে মিশাইয়া দেওয়া—সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসকে তাদেরই হাতে তুলিয়া দেওয়া। সাম্প্রদায়িক সমস্যা ত অতি তুচ্ছ সমস্যা—গান্ধিজীর কাছে তা কোনো দিনই সমস্যা বলিয়া মনে হয় নাই। যখন তিনি চম্পারণে গেলেন তখন কি হিন্দু বা মুসলমান চাষীর কাছে যাইবেন বলিয়া গেলেন? চম্পারণ ত তাঁহার কাছে সমগ্র ভারতের নিপীড়িত ও শোষিত কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতীক। লবণের জন্য যে সত্যাগ্রহ তিনি সুরু করিয়াছিলেন সে-ত অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য নয়—বিড়লা-ইস্পাহানীর জন্য নয়। সে-ত দীনাতিদীনের স্বার্থের জন্য—সেখানে ত কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়ের বিভেদ নাই। সেখানে আছে একটি প্রতীক—দেশের অর্ধশিনে মৃতপ্রায় কৃষক,—তাহার আবার ধর্মই বা কি, সম্প্রদায়ই বা কি? এমনই করিয়া বেণিয়া গান্ধী নিজেকে সারা ভারতবর্ষের জনসাধারণ—দেশের চাষী ও মজুরের স্বার্থের মধ্যে নিজেকে মিশাইয়া ফেলিয়া কংগ্রেসকেও টানিয়া আনিয়াছেন কৃষক ও মজুরের মধ্যে;—কংগ্রেস আজ আর অভিজাত কেদারাবিলাসী বা মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নহে—আজ কংগ্রেস সমগ্র ভারতের চাষী ও মজুরের,—তাহাদের নিয়া আমাদের দেশ তাহাদেরই অবিসম্বাদিত প্রতিনিধি। তাহাদের জন্যই Quit India প্রস্তাব, তাই এই প্রস্তাবকে তাহারা কোনোরূপ নেতৃত্বের সাহায্য না পাইয়াও এমন রূপ দিয়াছিল যাহা পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো বিপ্লব কোনো দিন পায় নাই। ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিপ্লব তাহার নিকট তুচ্ছ এমনকি রুষবিপ্লবের প্রথম পর্যায়ও ইহার কাছে হার মানে।

আজ ইহা আমাদের বুঝিতে হইবে যে সমস্যাকে হিন্দু মুসলমান সমস্যা নাম দিয়াছি, সে সমস্যা মোটেই হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণ, চাষী মজুরের সমস্যা নহে। সেই সমস্যা আসলে হইতেছে হিন্দু ও মুসলমান উচ্চ ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থসংঘাত। ইহার সহিত হিন্দু ও মুসলমান চাষী বা মজুরের কোনো স্বার্থ সংস্পর্শ নাই—সামন্তপ্রধান সমাজের চিরাচরিত প্রথামত ইহারা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্রীড়নক হিসাবে শোচনীয় অভিনয় করিতেছে।

কংগ্রেস অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব বহুদিন ত্যাগ করিয়াছে; সে চায় দেশের এই শতকরা ৯০ জনের বৈষয়িক অভাব হইতে মুক্তি, সে চায় তার সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা। সেজন্যই কংগ্রেস দেশের সম্মুখে যে ১৪দফা গঠনমূলক পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছে তাহাতে হিন্দু, মুসলমান বা অন্য কোনো ধর্মের অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সায় দিবে না। কারণ এই পরিকল্পনা তাহাদের শ্রেণীস্বার্থকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে। কংগ্রেস দেশে এমন একটি অবস্থা আনয়ন করিতে চায় যে অবস্থায় দেশের প্রত্যেকটি লোকের সাংসারিক কোন অভাব থাকিবে না। খাওয়া পরা শিক্ষা জীবিকার্জন—ইহার সমস্ত ভারই কংগ্রেস পরিকল্পনা অনুসারে রাষ্ট্র-সরকার গ্রহণ করিবে। বর্তমান সভ্যতার সহরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া দেশ গড়িয়া ওঠে; তাহার ফলে সহরেই সমস্ত ধনী, অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আসিয়া বসে এবং গ্রামগুলি হয় কর্মশক্তিহীনের দৈন্যদশাগ্রস্ত কেন্দ্র।

হৃৎপিণ্ডে সমস্ত দেহের রক্ত আসিয়া শক্তিত ও পরিশুদ্ধ হইয়া পুনরায় দেহের সমস্ত স্থানে ফিরিয়া যায় তাই দেহ সুস্থ থাকে; কিন্তু বর্তমান সভ্যতায় রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ড নগরে, দেশের সব স্থানের রক্ত আসিয়া শক্তিত হইলেও তাহা পুনরায় আর দেশের সর্বত্র ফিরিয়া যায় না—তাই রাষ্ট্রদেহে নানা রোগ-পীড়া জন্মিয়াছে। কংগ্রেস রাষ্ট্রদেহের এই পীড়ার উপশম করিবার জন্য নগর হইতে পুনরায় গ্রামে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছে। গ্রামগুলির বর্তমান দুর্দশায় তাহাতে ফিরিবার কথা হইলে আমাদের অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চক্ষু মাথায় ওঠে। কিন্তু এইটুকু আমরা ভুলিয়া যাই যে, গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই যখন সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে তখন গ্রামের এই দুর্দশা থাকিবে না—বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতায় জীবন-যাত্রাকে সহজ ও সুখভোগ্য করিবার জন্য যে সব সুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে অন্ততঃ তাহার সবই প্রত্যেকটি গ্রামবাসী পাইবে। বর্তমানে একজনে লক্ষপতি এবং আরেকজন দিনান্তে এক মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করিতে পারে না—এই অব্যবস্থা দূর করার ভার কংগ্রেস নিয়াছে। কংগ্রেস সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ভাবে দেশের প্রত্যেকটি লোকের জন্য এই ব্যবস্থা চায়। এবং তাহার প্রথম চেষ্টাই হইবে দেশের চাষী ও মজুরদের অবস্থার উন্নতি করা। কংগ্রেসের চম্পারণ সংগ্রাম, হরিজন উন্নয়ন প্রচেষ্টা, চরকা ও খাদি প্রচলন, লবণ সত্যাগ্রহ—ইহার প্রত্যেকটিই দেশের গরীব চাষী ও মজুরের জন্য আন্দোলন—ইহার প্রত্যেকটিই রাষ্ট্র-সরকারের সাহায্যপুষ্ট ধনিক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের স্বার্থ-বিরোধী। এই সব আন্দোলনের প্রত্যেকটিই যে অত্যন্ত তীব্র ভাবে পরিচালিত হইয়াছে সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। এবং ইহা হইতেই কংগ্রেসের আসলরূপ টের পাওয়া যায়।

মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য মুসলিম লীগের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত মুসলিম লীগ মুসলমান চাষী ও মজুরদের আর্থিক অবস্থা মুসলিম লীগ পরিকল্পিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কিরূপ হইবে তাহা খুলিয়া বলেন নাই। 'ইসলামীয় সাম্যবাদ' সম্বন্ধে তাঁহারা লম্বাচৌড়া কথা বলেন বটে কিন্তু ইতিহাসে চাষী ও মজুরের অবস্থা কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে কখনও উন্নত ছিল বলিয়া কোনো প্রমাণ নাই। খলিফা ওমর হয়ত দরিদ্রের মত বাদ করিতেন, কিন্তু তাহাতে দেশের দরিদ্রের দরিদ্রতা ত ঘুচিয়া যায় নাই! যে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সে সময়কার সমাজ ছিল সেই পরিস্থিতিই ক্রমে ক্রমে চাষীর অবস্থা শোচনীয় করিয়াছিল। মিশরে, তুরস্কে, আরবে, ইরাণে, পারস্যে, আফগানিস্থানে কোথায় মুসলমান চাষীর অবস্থা উন্নত ছিল? একথাটা আমাদের দেশের প্রত্যেক ছেলে-মেয়েকে সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খৃষ্টান হোক, ইহুদী হোক বুঝিতে হইবে যে ধনিকতন্ত্র সমাজপদ্ধতি—তার নাম পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসীই হউক কি ন্যাশনাল সোশ্যালিজমই হোক—কোন সময়েই কৃষক ও মজুরের দুর্দশার লাঘব করিতে পারে না; কারণ তাহাদের শ্রমের ফলেই ধনিকতন্ত্র গড়িয়া ওঠে ও পুষ্টিলাভ করে। কৃষক ও মজুরের শ্রমের পূর্ণ মূল্য যদি সমাজ দেয় তাহা হইলে ধনিকতন্ত্র কি করিয়া টেঁকে? রাম রাজত্বই বল আর ইসলামিক রাজত্বই বল সব রাজত্বেই দেশের যাহারা শতকরা ৯০ জন চিরদিনই তাহারা দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত। আমাদের মডারেট দল একথা জানেন, হিন্দু মহাসভা একথা জানেন এবং মুসলিম লীগও একথা জানেন। এবং যেহেতু এই সব দল ধনিকতন্ত্রের পোষণের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে সেই জন্য ইহাদের পরিকল্পিত রাষ্ট্রে কৃষক ও শ্রমিকের অবস্থা কি হইবে তাহা কখনও পরিষ্কার করিয়া কেহ বলে না। কংগ্রেস কৃষকের জন্য, শতকরা ৯০ জনের জন্য যে ভাবে কাজ করিয়াছে, হিন্দু মহাসভা বা মুসলিম লীগ তাহার কিছুই করে নাই—সেইরূপ কোনো পরিকল্পনাই তাহাদের কর্মপদ্ধতিতে নাই। দুভিক্ষে লঙ্গরখানা খোলা বা চাউল বিতরণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যের মধ্যে পড়ে না। উহা সাময়িক দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য সাময়িক প্রতিবিধান। উহার সহিত সামাজিক বিপ্লব সংঘটনের কোনো সম্পর্কই নাই—বরঞ্চ ক্ষেত্র বিশেষে এই সব দাতব্যের কাজ সমাজের বৈপ্লবিক প্রগতিকে বাধা দেয়।

মুসলিম লীগ যদিও নিজেকে দেশের ৯০ জন মুসলমানের প্রতিনিধি বলিয়া দাবী করে তবু আজ পর্যন্ত তাহার নেতৃত্ব এমন কোনো পরিকল্পনা করে নাই বা এমন কাজ করে নাই যাতে শতকরা ৯০জন মুসলমানের আর্থিক অবস্থার কোনো উন্নতি হয়। যদি বলে ইংরেজ সরকারের বিরোধিতার জন্য পারি নাই তাহা

মাটিতে পত্তন করবার চেষ্টা করছে—এ বিষয় বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি তাদের যথেষ্ট সহায়তা করবে। দ্বিতীয়ত : বিদেশী বস্তুপাতি এদেশী স্বিতস্বার্থগুলির মরফত যাতে চালু হয়, অথচ যন্ত্র তৈয়ারী কলকারখানা যাতে না বাড়ে—এই দুই নীতি ভারতে আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এদিকে দেশী স্বিতস্বার্থগুলি চেষ্টা করছে যাতে বিদেশ থেকে ধারে মাল পাওয়া যায় এবং এই ধারের জামিনদার হিসেবে ভারত সরকার যাতে দাঁই থাকেন। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে যে-ভাবে দেশী স্বিতস্বার্থগুলি ভারত সরকারকে সাহায্য করেছে—তাতে দেশী স্বিতস্বার্থের এ ভাবে চিন্তা করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারত সরকার যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্থানীয় প্রতিনিধি একথা দেশী স্বিতস্বার্থগুলি তাদের শ্রেণীগত স্বার্থের আশায় মাঝে মাঝে ভুলে যান। তার প্রমাণ যখন এই মহাযুদ্ধের সময় কংগ্রেস বলেছিল—"no man no pie" তখন দেশী স্বিতস্বার্থ সে কথা মোটেই আমলে আনেনি। কারণ তারা ভেবেছিল যে জনগণের চেতনাকে টাকার লোভ দেখিয়ে কিছুটা দমিয়ে রাখা যাবে। ভাবটা হচ্ছে এই যে "Defence Bond-ও কেনা যাক, আর যদি কোন রাজনৈতিক কর্ম্মী দুটো টাকা চায় তাও দেওয়া যাবে।" এই দুটো মনোভাব যে পরস্পরবিরোধী—তা দেশী স্বিতস্বার্থ বুঝতে চায় না। বুঝতে চায় তখনই যখন তার শ্রেণীগত স্বার্থে আঘাত লাগে। তাই তারা সর্ব্বপ্রকারে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে হাতে রাখার চেষ্টা করে। এবং যখন দেশী উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশী উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটতে সুরু করে তখন তারা একদল শ্রেণীস্বার্থ লোভী রাজনৈতিক কর্ম্মীকে বেশ মোটা মাইনে দিয়ে জাতীয়তার বড় বড় বুলি প্রচার করবার চেষ্টা করে। এবং বিদেশী পণ্য কিনলে যে দেশের টাকা বিদেশে যাবে তার সবিস্তৃত বর্ণনা statistics সহকারে প্রকাশ করেন। এই রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীরা একবারও ভাবতে রাজি হয় না যে তারা আজ যাদের হয়ে বিস্তৃত বিবরণ প্রচার করছে তারাই একদিন সুকৌশলে রাজনৈতিক আন্দোলনকে পিছন থেকে ছোরা বসাবার চেষ্টা করেছে। আজ কংগ্রেসের তথাকথিত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে চিনে রাখবার সময় এসেছে। কেন এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কংগ্রেস চিনে রাখবে? সেই বিষয় একটু ভেবে দেখবার সময় এসেছে। কংগ্রেস তার ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের যুগে যে দাবী দেশের নিকট উপস্থিত করেছিল তার প্রথম বিরোধিতা করে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তারা দলে দলে কেরাণীগিরি চাকুরী নিয়ে কংগ্রেসের "no man" নীতির শ্রেণীগত ভাবে বিরোধিতা করে। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখেছি যে কংগ্রেসের "no pie"র নীতি কি ভাবে দেশী স্বিতস্বার্থগুলি দ্বারা সম্মানিত হয়েছে। এবারে আমরা দেখতে পেলাম যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বারা কি ভাবে কংগ্রেস নীতি পদদলিত হয়েছে। কেন কংগ্রেসের নীতির এই রূপ অবমাননা হয়? এ বিষয় কংগ্রেসের কোন ত্রুটি আছে কিনা তাও ভাববার আজ সময় এসেছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কংগ্রেস তার রাজনৈতিক চেতনা গঠনের চেষ্টা সবই ঐ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কেত্রে উজাড় করেছে। এদিকে শিল্পবিপ্লবের ফলে জাতীয় ধন উৎপাদন ব্যবস্থায় একটা আলোড়ন ধীরে ধীরে তার শক্তি সঞ্চয় করছিল। তার ফলে দেশী শ্রমিক ও চাষী উভয়েরই জীবনধারণের মানদণ্ড ক্রমনিম্নগতি হতে থাকে। মাঝে মাঝে দু'একটা স্ফুরণ এদের অসহনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিবাদকল্পে প্রকাশ হয়েছে—তার মূল্য সব ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন শ্রেণীর লোকেরা দেয়নি। আর যদি বা কোথায় মূল্য দিয়েছে তাও নিজেদের স্বার্থ পুরোপুরি বজায় রেখে তবেই দিয়েছে। সাধারণ সামাজিক দৃষ্টান্তে আমরা দেখতে পাই যে কোন মিল কুলীর ধর্ম্মঘট বা ঐ জাতীয় প্রতিবাদের ক্ষেত্রে কেরাণীবাবুরাই বড় বাধা। এই সব ক্ষেত্রে কেরাণীবাবুরা যে বাধা দেন তার মূল উৎস হচ্ছে তাদের রাজনৈতিক জীবন দর্শন। পূর্ব্বে বলেছি, "কিছু শোষণ বন্ধ কর" এই নীতি মধ্যবিত্ত সুলভ। এই রাজনৈতিক জীবন দর্শন গ্রহণ করেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী কৃষক ও মজুরের বিরুদ্ধ দলে যোগ দেয়। সেইজন্য দেখা যায় কোন ধর্ম্মঘটে কেরাণীবাবুরাই সবচেয়ে মিটমাটের জন্য উঠে-পড়ে লাগেন। এবং অধিকাংশকে বোঝান যে "বাবা কিছু নাও কিছু ছাড় মিটমাট করে ফেল।" এই যে মনোবৃত্তি এর পিছনে অর্থনৈতিক কারণই খুব প্রবল। অফিসের বড়বাবুর

চাকুরী গেলে competetion-এর বাজারে আর বড়বাবু হয়ে কোথায় ঢোকা যাবে না, এবং তার সামাজিক, পারিবারিক ঠাট বজায় থাকবে না। তার অর্থ সবই যাবে। এই সব আশঙ্কা তাকে কোন বৈপ্লবিক চিন্তাধারা গ্রহণ করতে বাধা দেয়। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে কোন চাষী বা মজুর সে ভাবে ভাবেনা। তার কারণ তার সামাজিক ও আর্থিক জীবন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের নিম্নতম ধাপে। (এখানে একটা প্রতিবাদ উঠতে পারে যে ভারতের চাষী ও মজুরদের জীবনধারণের মানদণ্ড সব ক্ষেত্রে উপরিউক্ত ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়। তার কারণ ভূমি ব্যবস্থার ফলে চাষী ও মজুর কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছু ভূমির মালিক। কাজেই শ্রেণী হিসেবে তারা একেবারে নিঃস্ব নয়। একথা মধ্যবিত্ত কেরাণীকুল সম্পর্কেও খাটে। কিন্তু এই সব কারণ ধরে নিয়েও এ কথা সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে শ্রমিকরা ও চাষীরা সমাজের নিম্নতম ধাপে ও নিঃস্ব। এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে চাকুরীসর্বস্ব ভূমিহীন এক বিশেষ ভাসমান সামাজিক পানা বলা যেতে পারে। একটা চাষীর হাল যেমন তার আয়ের পক্ষে একমাত্র সম্বল, তেমনি কলম কেরাণীবাবুর পক্ষে একমাত্র আয়ের সম্বল। কেননা এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে কোন কেরাণী হয়ত শারীরিক অসুবিধাবশত আর কলম ধরতে পারল না এবং সঙ্গে তার আয়ের পথ বন্ধ হল। সেই দিক থেকে বিচার করতে গেলে বলতে হয় দুই-ই নিঃস্ব কিন্তু স্বার্থ বিভিন্ন।) এত সব বলার পরে আমাদের একটা বিষয় বিবেচনা করার এই যে, নিম্নতম ধাপের যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন তাদের জন্য কংগ্রেস কি করতে পারে। পূর্বে আমরা দেখেছি যে মধ্যবিত্ত সমাজ কংগ্রেসকে তার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, একমাত্র বৈপ্লবিক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন একটি বিশেষ শ্রেণীর কর্মীরা বাদে সবাই কংগ্রেসকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে দ্বিধা করেছে তার ফলে কংগ্রেসের বৈপ্লবিক শক্তি বহুল পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে। আজকে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট আন্দোলনের পর সবারই প্রশ্ন হচ্ছে যে কংগ্রেস কাদের? এর সঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন জড়ানো রয়েছে যে কংগ্রেস এতদিন ছিল কাদের? যাদের ছিল তাদেরই থাকবে না নোতুন বৈপ্লবিক নেতৃত্ব কংগ্রেস গ্রহণ করবে। যদি কংগ্রেস বৈপ্লবিক নেতৃত্ব গ্রহণ করে, তবে কি জাতীয় বৈপ্লবিক নেতৃত্ব গ্রহণ করবে? কেননা আজ মধ্যবিত্ত শ্রেণীও তাদের এক প্রকার বৈপ্লবিক নেতৃত্ব গড়ে তোলবার জন্য বদ্ধপরিকর। তারা ধনতন্ত্রের সংস্কার চায় যেমন ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক-দল চায়। এই যে ধনতন্ত্রসংস্কারক নেতৃত্ব তার উপাদান হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক চেতনা। আর যে গণনেতৃত্ব—যাদের উদ্দেশ্য ধনতন্ত্রের সমূল উচ্ছেদ ও সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা তাদের উপাদান হচ্ছে বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন নিঃস্ব চাষী ও মজুর। অতীতের অভিজ্ঞতা দৃষ্টান্তে এ কথা বলা যেতে পারে যে মধ্যবিত্ত সমাজ যে ভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসে লজ্জাকর। যখন কংগ্রেস এ যুদ্ধে স্বার্থ নেই বলে নীতিগ্রহণ করেছে, তখন এই মধ্যবিত্ত সমাজ তার স্বার্থ রক্ষা করতে ছুটেছে। যখন কংগ্রেস বলেছে যে, যুদ্ধে আমাদের অর্থ যাবে না, তখন দেশী স্থিতস্বার্থ তাদের থলি খুলে দিয়ে 'অর্থ যাবে যুদ্ধ করতে' এই ভাব প্রকাশ করেছে। অতএব এই দুটো শ্রেণীর নীতি সবক্ষেত্রেই কংগ্রেসবিরোধী। বাকী থাকল আজ অগণিত চাষী ও মজুর। এবং এদেরই ত্যাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—আগষ্ট প্রস্তাব। আগষ্ট প্রস্তাবের পর যা ঘটেছে তার সামাজিক ও শ্রেণীগত সংযোগ ইত্যাদির বিশ্লেষণ করার স্থান এটা নয়। তবুও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে এদেরই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতের নোতুন ইতিহাস তৈরী হয়েছে। যদি কংগ্রেস আজ বাঁচতে চায় তবে বৈপ্লবিক গণ নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে। নচেৎ চীনের মত কতগুলো অনিবার্য্য রাজনৈতিক যুদ্ধের মধ্যদিয়ে যেতে হবে।

জাতি-বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ (৬)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ইংরেজ ও বাঙালীর মধ্যে যে সংঘাত উপস্থিত হয়, পঞ্চম দশকে তাহা চরমে উঠে। বাঙালীরা তখন সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ইহার প্রতিরোধে অগ্রসর হয়। ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি—এককথায় যে-সব বস্তু লইয়া সমাজ-জীবন গঠিত, তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই ইংরেজের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। চতুর্থ দশকে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের কার্যকলাপের কথা বলিয়াছি এবং হিন্দুসমাজ তাহার প্রতিকারে কতখানি অগ্রসর হইয়াছিল তাহাও বিবৃত করিয়াছি। পঞ্চম দশকের আরম্ভেই হিন্দু-নেতৃবর্গ সমাজের গলদ দূর করিয়া খ্রীষ্টানীর মূলে আঘাত করিতে অগ্রসর হইলেন। এই সময় কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে হিন্দু সন্তানদের খ্রীষ্টান করার ধুম পড়িয়া যায়। প্রধানতঃ ভবানীপুর-বাসীদেরই আগ্রহাতিশয্যে কলিকাতার নেতৃবৃন্দ ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে চিৎপুরস্থ ওরিয়েন্টাল সেমিনারি গৃহে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান করেন। সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। এই সভায় সিদ্ধান্ত হইল যে, যাহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে কি অখাদ্য ভক্ষণ করিয়াছে তাহারা সত্যসত্যই অনুতপ্ত হইলে হিন্দুসমাজে তাহাদিগকে গ্রহণ করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট একটি প্রস্তাবের আকারে এই প্রশ্নটি মীমাংসার জন্য প্রেরিত হইল: "যাহারা নিষিদ্ধ খাদ্য খাইয়াছে এবং যাহারা স্বেচ্ছায় পরধর্ম গ্রহণ ও ইহার আচারাদি পালন করিয়াছে, তাহারা সত্য সত্যই পূর্ব ধর্মে ফিরিয়া আসিতে অভিলাষী হইলে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সামান্য অর্থের বিনিময়ে তাহা করিতে সমর্থ হইবে কি না।" উপস্থিত পণ্ডিতগণ প্রস্তাবের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তৎক্ষণাৎ ইহার অনুকূলে মত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বঙ্গদেশের, এমনকি পশ্চিমাঞ্চলের পণ্ডিতগণের নিকট হইতেও এ বিষয়ে সম্মতি-পত্র পাওয়া আবশ্যক বিবেচনায় প্রস্তাবটি তাঁহাদের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা হইল। সভাপতি মহাশয় উপস্থিত সকলকে জানাইলেন যে, হিন্দুধর্মরক্ষক নদীয়াধিপতিও এরূপ প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন।

সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহার গুরুত্ব এতদিন পরে আমরা হয়ত সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিব না, কিন্তু হিন্দুসমাজের তৎকালীন অবস্থায় এতদ্দ্বারা মহা সুফল ফলিবারই সম্ভাবনা হইয়াছিল। এই সভাধিবেশন ও এখানে গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পরবর্তী ৪ই জুন তারিখে যে সারগর্ভ মন্তব্য করেন তাহা আজিকার দিনেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইবে। দীর্ঘ মন্তব্যের শেষভাগে কিন্তু পত্রিকাখানি এই আশাই পোষণ করিয়াছিলেন যে, নানাবিধ সংস্কারের মধ্য দিয়া খ্রীষ্টানীর দিকেই ক্রমে হিন্দুসমাজ অগ্রসর হইবে। যাহা হউক, আবশ্যক অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল:

"Last week we published an analysis of the proceedings of the great Hindoo Meeting held on the 25th May at the Oriental Seminary, and we cannot but think that the assembly itself, and the resolutions expressed and adopted at it, constitute one of the most important events that has occurred in India in the present century. It is not that we attach so much importance to the questions actually proposed at the Meeting, as to the general tendency of the arguments and opinions put forward by the most distinguished speakers. It was in fact, though not in name, a Hindoo protest against one of the more prominent evils of the system of caste, which have been for centuries considered the bulwark of Hindooism. It must be remembered that the gentlemen assembled at the Oriental Seminary on that day, did not belong to the party commonly called Young Bengal, and who are generally suspected of a desire to shake off the trammels of caste altogether. The great majority of them consisted of men whose highest pride it has been to preserve the purity of their priestly lineage, and the minutiae of their religious observances.....The Chairman of the Meeting was a Rájah, best known among his countrymen for his valuable contributions to Sanscrit literature and his inflexible adherence to every dogma of the Purans. His Chief supporter, Rajah Kalee Krishna Bahadoor, maintains a

regular Council of Pundits whose decisions upon matters of ceremonial or religious observances, carry as much weight in Calcutta, as those of the Pope in the Catholic Churches of the continent. They are the very men who laid the agitation against the Act for securing the liberty of conscience, and who wish even now to strip every Christian convert of his ancestral patrimony. Yet it is men of this stamp, the most orthodox supporters of the ancient system, who have begun to acknowledge that the chain of caste is perhaps a little too tight and that it may be possible to give additional strength to the body corporate by a slight relaxation of its stringency. The manner in which they propose to do this is even more remarkable than the fact itself. Instead of proposing, as might have been expected, a form of expiation so tedious and severe, that none but those most earnest to be readmitted would consent to undergo it, they propose a pecuniary gift, not in itself of large amount, and gradually diminishing with the caste of the person excommunicated."

পাঠক-পাঠিকা উপরের উদ্ধৃতিতে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, 'ফ্রেঞ্চ অফ ইণ্ডিয়া' এই সভা ও ইহার সিদ্ধান্তকে উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান ঘটনা বলিয়াছেন। কেননা হিন্দু-ধর্মের উপর যাহাদের বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে সেই নবাদল নহে, পরন্তু হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দ এবং পণ্ডিত-সমাজ সমবেত হইয়া চিরাচরিত জাতিভেদ বন্ধন একবাক্যে শ্লথ করিয়া পরধর্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের স্বধর্মে ও স্বশ্রেণীতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। উক্ত পত্রিকার মতে তাঁহারা যে উপায়ে ইহা করিবেন* বলিয়াছেন তাহা অভিনব এবং যুগান্তকারী—তাহা হইল কোনরকম প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে না গিয়া সামান্যমাত্র অর্থের বিনিময়ে স্বধর্ম-ত্যাগী হিন্দু নিজ সমাজে ও ধর্মে ফিরিয়া আসিতে পারিবে। এই বিরাট্ হিন্দুসভা হইতেই ঐ সময়কার পণ্ডিতোদ্ধার সভার উৎপত্তি। ১৭৭৫ শকে (১৮৫৩-৪) পণ্ডিতোদ্ধার সভার সভ্যগণের অনুমতিক্রমে "পণ্ডিতোদ্ধার বিষয়ক ভূমিকা ও ব্যবস্থাপত্রিকা" শীর্ষক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় উক্ত সভার প্রস্তাবের সপক্ষে বঙ্গের একশত জন খ্যাতনামা পণ্ডিতের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি ব্যবস্থাপত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভূমিকায় আছে ধর্মত্যাগী ব্যক্তিগণের হিন্দুধর্মে পুনর্গ্রহণের অনুকূলে সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা। ইহার একটি যুক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। খ্রীষ্টান বা মুসলমানেরা ধর্মত্যাগী হইলেও স্বধর্মে ফিরিয়া যাইতে কোন বাধা নাই, এইজন্য তাহাদিগকে ধর্মান্তর গ্রহণ করাইতে কেহ তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না। কিন্তু হিন্দুদের বেলায় এইরূপ বাধা থাকায় বিধর্মীগণ তাহাদের মধ্যেই ধর্মপ্রচার করিতে এতটা আগ্রহশীল। সুতরাং যদি ধর্ম রক্ষা করিতে হয় তবে খ্রীষ্টান বা মুসলমানদের মত হিন্দুদেরও একবার ধর্ম ত্যাগ করিলেও পরে ফিরিয়া আসার পক্ষে কোন বাধা-নিষেধ থাকিবে না।

হিন্দুসমাজে আত্মরক্ষার জন্য একদিকে যেমন সামাজিক গলদ দূরীকৃত করিতে অগ্রণী হইল, অন্যদিকে নিজ ধর্ম বিষয়েও তাহারা তেমনি অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিল। হিন্দুদের পক্ষে খ্রীষ্টান ধর্মের দোষগুণ বিচার করিয়া বক্তৃতা ও পুস্তকাদি রচনা হইতে লাগিল। এ বিষয়ে নব্য ব্রাহ্মগণই সবিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ভূদেব বলেন :

"কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় পাদ্রিরা যেমন খৃষ্টধর্মের প্রচার করিতে-ছিলেন—অমনি তাহাদিগের পাশে পাশে নব্য ব্রাহ্মেরা আপনাদিগের মত রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং কোন কোন স্থানে সনাতন হিন্দু ধর্মের সপক্ষেও দুই একটি বক্তৃতা হইতে লাগিল। অবশেষে এই সময়ে আর একটী উপায় করিয়াছিলেন। এতদিন খৃষ্টধর্মাই এদেশের ধর্মের প্রতি আক্রমণ করিয়া ইহার দোষ সমস্ত প্রদর্শন করিতেছিল—এই অবধি অন্যেরা খৃষ্টধর্মের প্রতি আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা যে সকল সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিত খৃষ্টধর্ম মানিতেন না, তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধ যুক্তিসকল সংগ্রহ করিয়া ছাপাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই অবধি ছেলেরা ইংরাজী পড়িলেই খৃষ্টান হইবে—এ আশঙ্কা দূর হইয়াছে।"*

দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরাধিককাল ভারতবর্ষে থাকিয়া পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ভ্রান্ত তমসাচ্ছন্ন ভারতবাসীদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের আলো বিকীরণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টা প্রায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় তিনি হতাশমনে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। তিনি যাইবার সময় ভারতবাসীদের এই বলিয়া অভিসম্পাত দিয়া যান যে, এত চেষ্টা করিয়াও তিনি যখন বিশেষ কিছু

* বাঙ্গালার ইতিহাস, ৩য় ভাগ, পৃ. ৮৭.

করিতে পারিলেন না তখন তাহাদের উদ্ধারের আর আশা নাই। তিনি তাহার পর আর এদেশে ফিরেন নাই।

ধর্ম সমাজ সম্বন্ধে যেরূপ, শিক্ষা সংস্কৃতি সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ত সংঘর্ষের ফলে বঙ্গীয় সমাজে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই সময়কার সরকারী শিক্ষা-নীতি কোন্ পথে চলিতেছিল চার্লস্ ট্রেভিলিয়ানের উক্তি হইতে তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। পঞ্চম দশকেও হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভা এবং সরকারী শিক্ষাকমিটি বা Council of Education-এর মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ চলিতে থাকে। সরকারী বিধানে কলেজের অধ্যক্ষ-সভা কিরূপে একটি নিষ্ক্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল, ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসনকে ১৮৪১, ৭ই অক্টোবরে লিখিত রাধাকান্ত দেবের একখানা পত্রের নিম্নাংশ হইতে তাহা জানা যায়:

"From the period that the former [Hindoo College] was placed under the Government patronage the Council of Education had been gradually encroaching on the privileges of the Managing Committee till under the presidentship of the late Mr. Bethune this encroachment became so complete as to render the native members mere non-entities. This invasion of their rights has often brought the Council and the Committee in open collisions with each other. On one occasion a serious difference arose between these two bodies on a subject involving the violation of certain fundamental rules of the College which terminated in the retirement of Baboo Prosunnocumar Thakoor, the Governor of the College from his post. On a similar subject, after an interchange of many angry minutes between myself and the late President my feelings were so exasperated that I was obliged to dissolve my connection with the Institution. Virtually there is no native management at present."*

পঞ্চম দশকেও অধ্যক্ষ সভার নিষ্ক্রিয়তা পদে পদে প্রমাণিত হইতে লাগিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই হীরা-বুলবুল নামে কলিকাতাবাসী এক পশ্চিমা গণিকার পুত্রকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করিয়া লওয়া হয়। ইহাতে হিন্দুদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হইল। কলেজের অধ্যক্ষ-সভা বৃথাই এই কার্যের প্রতিবাদ করিলেন। সরকারী শিক্ষা-কমিটি জিদ ধরিলেন, গণিকা-পুত্রকে কলেজ হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া হইবে না। রাধাকান্ত দেব ইতিপূর্বেই কলেজের সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। সরকারী শিক্ষা-কমিটির উক্ত জিদের প্রতিবাদে তাঁহাকেই সভাপতি করিয়া আশুতোষ দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ হিন্দু কলেজ অধ্যক্ষ-সভার মাননীয় সভ্যগণ এবং মতিলাল শীল, রাজেন্দ্র দত্ত প্রমুখ হিন্দু-প্রধানগণ একযোগে ২রা মে, ১৮৪৩ দিবসে কলিকাতায় হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। মতিলাল শীলের শীল্‌স্ ফ্রী কলেজ এবং গুরুচরণ দত্তের ডেভিড হেয়ার একাডেমী এই নূতন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হইল। হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ক্যাপ্‌টেন রিচার্ডসন ইহার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিলেন। কলেজের ছাত্র-সংখ্যা কমিয়া যাইবার উপক্রম হইল। শিক্ষা-কমিটি প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা বাধ্য হইয়া কলেজ-রেজিষ্টার হইতে হীরা-বুলবুলের পুত্রের নাম কাটিয়া দিলেন। এই উপলক্ষে ১৮৪৩, ২রা মের 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' পত্রের মন্তব্য এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পত্রিকা লেখেন:

"We hear from a source, which may be relied upon, that the authorities of the Hindu College have at last struck off the name of Heera-Bul-bul's son from the register of the institution, and announced the circumstance to the rest of the pupils to prevent their going away. If this be the fact, my the expulsion of the lad, whose admission justly gave so much offence to the native community, and was so long unjustly upheld by the Council of Education, and the Sol disant friends of public instruction, is too late, and only serves to show that nothing short of demonstration of native feeling as was evinced the other day on the occasion of the opening of the Hindu Metropolitan College, could awake the educational board to a proper sense of the justice or even the expediency of the measure.

রাষ্ট্রনীতি বিষয়েও বঙ্গবাসী এই সময় কতকটা সচেতন হইয়া উঠে। তখন ইহার প্রচুর কারণও ঘটিতে থাকে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকৃত অঞ্চলে ইংরেজ প্রজা এবং ভারতবর্ষীয় প্রজা উভয় শ্রেণীর মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের মত বিচার বিষয়েও বৈষম্য বিদ্যমান ছিল। মফস্বলে ব্যবসা বা অন্যবিধ কর্মে লিপ্ত বেসরকারী ইংরেজদের কি দেওয়ানি কি ফৌজদারি

* স্বপ্রণীত "রাধাকান্ত দেব", ৩য় সংস্করণ (সাহিত্য সাধক চরিত-মালা—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ), পৃ. ১১-এ উদ্ধৃত।

কোনপ্রকার মোকদ্দমার বিচারই সেখানকার কোম্পানীর আদালতে হইতে পারিত না। মেকলে সাহেব ইংরেজদের দেওয়ানি মোকদ্দমাগুলির বিচারের অধিকার মফস্বলের আদালতগুলিকে দিয়া যান। কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মোকদ্দমা একমাত্র কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টেরই এক্তিয়ার থাকায় বেসরকারী ইংরেজগণ মফস্বলে নিষ্কণ্টক হইয়া বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের অত্যাচার উৎপীড়নও চরমে উঠার অবকাশ পায়। উক্ত বৈষম্যকে দূরীভূত করিয়া ইংরেজ ও ভারতবাসী উভয় প্রজাকেই একই নিয়মে একই আদালতের অধীন করিবার জন্য ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন (বেথুন) কয়েকটি আইনের পাণ্ডুলিপি রচনা করিয়া প্রচার করেন। ইহাতে যেন ভীমরুলের চাকায় ঢিল পড়িল। কলিকাতা ও মফস্বলের ইউরোপীয় সমাজ ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহারা ইতিমধ্যেই নিজ নিজ শ্রেণীর স্বার্থ-সংরক্ষণ করে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স এবং ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত নীলকর সঙ্ঘ—দুইটিই ইউরোপীয়দের শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষার্থ সমাজ বা প্রতিষ্ঠান। ইহার উপরে কলিকাতার ইংরেজ-সম্পাদিত প্রায় সমুদয় সংবাদপত্রই তাহাদের স্বার্থরক্ষায় অনুকূল। কাজেই বীটন-প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হইলে আন্দোলন কিরূপ তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। ইংরেজগণ ক্ষেপিয়া গিয়া এই আইন-নিচয়ের নাম দিল 'ব্ল্যাক একট্স্' (Black Acts) বা কাল আইন! রামগোপাল ঘোষ ভারতবর্ষীয় সভার সভাপতি এবং বঙ্গীয় সমাজের রাজনৈতিক নেতা। তিনি প্রস্তাবিত আইনগুলির যুক্তিযুক্ততা প্রতিপাদন করিয়া বিধিবদ্ধ হইবার সপক্ষে একখানি পুস্তিকা ঐ নামে রচনা করিয়া প্রকাশিত করেন। ইংরেজগণ কিরূপ ক্ষেপিয়া গিয়াছিল রামগোপালের বিরুদ্ধে অবলম্বিত একটি ব্যাপারে তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া যায়। উক্ত পুস্তিকা লিখিবার অপরাধে রামগোপাল কেরী-প্রতিষ্ঠিত এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট বা সহকারী সভাপতির পদ হইতে অপসৃত হইলেন! সরকারও অগত্যা প্রস্তাবিত আইনগুলি প্রত্যাহার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন।

এই ব্যাপারে বঙ্গবাসীরা কতকটা সচেতন হইল বটে, কিন্তু উক্ত আইনগুলি প্রত্যাহারের বৎসরখানেকের মধ্যে এমন আর একটি আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গেল যাহাতে নিজেদের অসহায় অবস্থার কথা সম্যক্ বুঝিয়া লইবার সুযোগ ঘটিল। বঙ্গদেশে বেন্টিঙ্কের সময় হইতেই খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া আসিতেছিল। ১৮৫০ সালের "লেকস লোসি" (Lex-Loci) নামে একটি আইন বিধিবদ্ধ করিয়া এই রীতি শুধু বঙ্গদেশেই নহে, সমগ্র ভারতবর্ষে কায়েম করার ব্যবস্থা হইল। বঙ্গের নেতৃবৃন্দ ইহার বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন, বিলাতে পার্লামেন্টেও দরখাস্ত করা হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, আইন পাস হইয়া গেল। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে অস্ত্রাঘ আন্দোলনের ফলে একটি ন্যায্য আইন বিধিবদ্ধ করা হইতে সরকার নিরস্ত হইয়াছিলেন, আর এক বৎসর যাইতে না যাইতেই বাঙালীর ন্যায্য প্রতিবাদ সত্ত্বেও সমাজের স্বার্থহানিকর একটি আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গেল! চিন্তাশীল সমাজনেতৃবর্গ ইহাতে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু তাঁহারা নিশ্চেষ্ট বসিয়া রহিলেন না। ইউরোপীয় সমাজের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার সাফল্য দর্শনে নিজেদেরও সঙ্ঘবদ্ধ করিবার কথা তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন। এই সময় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিয়াছিল। নূতন সনন্দ প্রদানের সময় ভারতবাসীরা যাহাতে নিজেদের জন্য কিছু সুযোগ সুবিধা লাভ করিতে পারে সেজন্য সময় থাকিতে প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হইল। কিছুকাল আলাপ-আলোচনার পর প্রথমে দেশহিতার্থী সভা, এবং পরে পাকাপাকি ভাবে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর তারিখে নব্য ও প্রাচীন, রক্ষণশীল ও উদারপন্থী সকলে মিলিয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার সভাপতি হইলেন রাজা রাধাকান্ত দেব, সম্পাদক হইলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেশের গণ্যমান্যব্যক্তিগণ ইহার অধ্যক্ষ-সভার সদস্য নির্বাচিত হইলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কার্যকলাপ এখানে আলোচ্য নহে, তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, গত শতাব্দীর পঞ্চম দশকে সর্বশ্রেণীর ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্যই ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আজ ইহা জমিদার-শ্রেণীর সভায় পর্যবসিত।

ইহার বর্তমান রূপ প্রারম্ভকালীন মূর্তি ধরা পড়িবে না।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে শ্বেত-কৃষ্ণের বিচার-বৈষম্য বিদূরণের জন্য সরকারীভাবে আর একবার চেষ্টা হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এক সাধারণ সভার অনুষ্ঠান করিয়া সরকারী প্রস্তাব পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। কিন্তু এই সময় সিপাহী যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় সরকার এ বিষয়ে আর অগ্রসর হন নাই।

এই দশকের আর একটি প্রধান ঘটনা সিপাহী বিদ্রোহ। বাঙালী সমাজ ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ কোনভাবেই যুক্ত ছিল না। কলিকাতার ইংরেজগণ এবং ইংরেজ সংবাদপত্রগুলি কিন্তু ক্ষেপিয়া গিয়া বাঙালীদেরও মুণ্ডপাত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্রগুলিও এই সময় ক্ষেপিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা এই সময় সরকারকে যে-সব উপদেশ দেন তাহার কয়েকটি নমুনা কৃষ্ণবাবু "বাঙ্গালার ইতিহাসে" (৩য় ভাগ, পৃ. ৯৯) প্রদান করিয়াছেন :

"দাও—মহাপাতকী মহাদোষী ভারতবর্ষনিবাসী মাত্রকে সমূলে বিনাশ কর।"

"মহম্মদের এবং বিষ্ণুর লেখকদিগকে ইহাই শিক্ষা দিতে হইবে যে তাহারা যেন পশু—আমরা তাহাদিগকে পশুর ন্যায় বধ করিব।"

"ভারতবর্ষীয়রা যতগুলি ইউরোপীয় মারিয়াছে সেই ইউরোপীয়দের মাথার এবং গাত্রে যতগুলি করিয়া লোম ততগুলিকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইতে হইবে।"

সিপাহী-বিদ্রোহের আরম্ভে সিপাহীদের নৃশংস অত্যাচার এবং মধ্যভাগে ব্রিটিশ সেনাদলের ততোধিক নৃশংস প্রতি-হিংসার কথা আজ ইতিহাসের বস্তু। তৎকালীন বড়লাট লর্ড ক্যানিং এক বৎসরের জন্য মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হইলেন। স্বনামধন্য কালীপ্রসাদ ঘোষ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচ হেতু তাঁহার বিখ্যাত সাপ্তাহিক "হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার" বন্ধ করিয়া দিলেন। যাহা হউক, লর্ড ক্যানিং সর্বদা মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া চলিতেন এবং ব্রিটিশ সেনা এবং বেসরকারী ইংরেজদের হিংসাংসা বৃত্তির সম্যক প্রশ্রয় না দিয়া মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উহারা তাঁহাকে "Clemency Canning" বা 'দয়াল ক্যানিং' আখ্যা দিয়াছিলেন। এই সময়ে "হিন্দু প্যাট্রিয়টে" হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সপ্তাহের পর সপ্তাহ সরকারকে ধৈর্য্য ধারণ করিতে উপদেশ দিতেন। বাঙালীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদেও তাঁহার লেখনী চালিত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশের মফস্বল অঞ্চলে ঠিক এই সময়ে যে একটি ভীষণ ব্যাপার চলিতেছিল, সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও তীব্রতা হেতু সেদিকে তখন বিশেষ কাহারও নজর পড়ে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভাবধি বঙ্গে কতকটা ব্যাপকভাবেই নীলচাষের সূচনা হয়। বিভিন্ন সময়ে সরকারী ধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মফস্বলে ইউরোপীয় নীলকরগণও ক্রমে সর্বেসর্বা হইয়া উঠে। কোম্পানীর আইন-আদালত তাহাদের কার্য্যাকার্য্য নিয়ন্ত্রণে কতখানি অপারগ ছিল একটু পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি। নীলকরগণ এইরূপে নিরঙ্কুশ হইয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, এবং দাদনাদি ব্যবস্থার ফলে প্রতিনিয়ত রায়তদের উপর তাহাদের নিপীড়ন চলিতে থাকে। গত শতাব্দীর প্রথম দশক হইতেই কোন-না-কোন ভাবে নীলকরদের উৎপীড়ন কাহিনী প্রকাশিত হইতে সুরু হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'সমাচার দর্পণ', 'বঙ্গদূত' প্রভৃতিতেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে এইরূপ অত্যাচার কাহিনী বাহির হয়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ধারাবাহিকভাবে নীলকরদের অত্যাচারকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলেন। পঞ্চম দশকের মধ্যভাগে রাজসাহী, মালদহ, পাবনা, নদীয়া, ফরিদপুর, যশোহর প্রভৃতি জেলার রায়তবৃন্দ নীলকর-অত্যাচারে আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিল না। "জমির শত্রু নীল, কর্ম্মের শত্রু দিন, ক্ষেতের শত্রু পাদ্রী হিল" প্রভৃতি ছড়া কাটিয়া গান গাহিয়া নীলচাষীরা নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করিতে লাগিল। নদীয়া চৌগাছায় বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস, মালদহে রসিক মণ্ডল গ্রামে বসিয়া নীলচাষীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। যশোহরে নব্যশিক্ষিত যুবক শিশিরকুমার ঘোষ রায়তদের সঙ্ঘবদ্ধ করিতে অগ্রণী হইলেন। "প্রাণ যাবে তাও স্বীকার, তথাপি আমরা নীল ছুঁইব না"—তাহারা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া নীলচাষ বন্ধ করিয়া দিল। যশোহর

হইতে শিশিরকুমার ঘোষ এবং কৃষ্ণনগর হইতে মনোমোহন ঘোষ 'কলিকাতার 'হিন্দু পেট্রিয়টে' নীলকরদের অত্যাচার কাহিনী সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিতে থাকেন। সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র ইহা প্রকাশ করিয়া অত্যাচার সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন জেলার রায়তগণ নীলকরদের বিরুদ্ধে কিরূপ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল, বঙ্গের তৎকালীন ছোটলাট সার্ জন পিটার গ্রাণ্ট সে সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতা হইতে এই মর্মে বর্ণনা করিয়াছেন :

"আমি যমুনা নদীর তীরবর্তী সিরাজগঞ্জ হইতে ফেরত ফিরিয়া আসিতেছি। আমি ঢাকার রেলপথ সংক্রান্ত ব্যাপারের জন্য তথায় গিয়াছিলাম। নীলের ব্যাপারের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। মাথাভাঙ্গা নদী হইয়া গঙ্গার সহিত হইয়া যাওয়াই আমার অভিপ্রেত ছিল ; কিন্তু কুষ্টিয়ার নদীতে পৌঁছাইয়া যখন দেখিতে পাইলাম, অপেক্ষাকৃত দ্রুত পথে যাওয়া যায়, তখন কুষ্টিয়া ও কালীগঙ্গা নদীতেই অগ্রসর হই। এই দুইটি নদী নদীয়া ও যশোহর এবং পাবনা জেলার কতকাংশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। নানা স্থানে প্রজারা উপস্থিত ছিল। তাহাদিগের একমাত্র প্রার্থনা—সরকার আদেশ প্রচার করুন, তাহাদিগকে নীলের চাষ করিতে হইবে না। ঐ দুই নদীপথে যখন আমি প্রত্যাবর্তন করি, উষাকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত—আমার ষ্টীমার যখন ৯০।৭০ মাইল অতিক্রম করে, সেই সময় নদীর উভয়কূল জনসঙ্ঘে পূর্ণ ছিল। তাহারা এবিষয়ে সুবিচার চাহিতেছিল। নদীতীরবর্তী গ্রামসমূহের স্ত্রীলোকেরাও বহুত্র দলে উপস্থিত ছিল। যে সব পুরুষ গ্রামে ও দুইটি গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে উপস্থিত ছিল, তাহারা নিশ্চয়ই উভয় কূলের দূরস্থ গ্রামসমূহ হইতেও আসিয়াছিল। ভারতে সরকারের কোন কর্মচারী যে কখন ১৪ ঘণ্টাকাল এইরূপ বিচার-প্রার্থী জনতার মধ্য দিয়া ষ্টীমারে গমন করিয়াছেন তাহা মনে হয় না। ইহারা সকলেই নৃত্যলাসম্পন্ন ও সরলপ্রকৃতি ; কিন্তু ইহাদিগের আন্তরিকতা অসাধারণ। লক্ষ লক্ষ সরলপ্রাণ শিশুর এইরূপ কার্য্য যে অর্থহীন ইহা মনে করা নির্ব্বোধের কার্য্য হইবে। ইহার বিশেষ অর্থ আছে। বহু সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার এই যে ক্ষমতা ইহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখাই সঙ্গত।" *

মহাত্মা গান্ধী ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তন করেন। ইহার অন্যূন ষাট বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের রায়তগণ নীলকরদের বিরুদ্ধে এইরূপ অসহযোগ নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। নীলকরদের ও রায়তদের মধ্যে কোথাও কোথাও দাঙ্গাহাঙ্গামাও হয়। পরবর্ত্তী কালে এই আন্দোলনের গুরুত্ব লঘু করিবার জন্যই হয়ত ইহাকে 'নীল হাঙ্গামা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। রায়তগণের এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে ভারতসরকার ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে 'নীল কমিশন' বসাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিভিন্ন সাক্ষীদের সাক্ষ্যে নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে। নীল কমিশন ভারত-সরকারকে যে রিপোর্ট প্রদান করেন তাহাতে তখন তখনই রায়তদের কল্যাণকর বিশেষ কোন নিয়ম ধার্য্য বা প্রস্তাবিত হয় নাই বটে, তবে এই সময় হইতেই যে নীলকরদের অত্যাচার অনেকটা লাঘব হইতে থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুবিখ্যাত কবি ও নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে "নীল দর্পণ" নাটকে এই সব অত্যাচার-কাহিনী অমর করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ গত শতাব্দীর পঞ্চম দশকে নগরে ও গ্রামে বঙ্গবাসীরা নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে কতকটা সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল।

---

* শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের "কংগ্রেস ও বাঙ্গালা" (পৃঃ ২৭-৩) হইতে উদ্ধৃত।

মাটির দাম

শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী

সব জিনিষেরই নিজস্ব সঠিক কোন দাম থাকে না, যদি মানুষ তাকে সে দাম না দেয়। মনের সম্পদেই অনেক সময় বাইরের সাধারণ বস্তুও মহার্ঘ হয়ে ওঠে। জালিয়ানওয়ালাবাগ দেখতে গিয়ে এ কথাটাই বোনকে বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। আজকে এই বাগের বস্তুসম্পর্কীয় মূল্য আর বেশী কি আছে? জমিটুকুর সাধারণ দাম, তার সাথে ৯১টি মাটির টব্, ৩ খানা নোটিশ বোর্ড, কতগুলো পুরাণো ইট, কিছুটা আগাছা,আর কতকগুলো সাধারণ শ্রেণীর ফুলগাছের প্রাথমিক প্ল্যান্টিং চার্জ। এই তো এর সাধারণ দৃশ্য। এ ছাড়া আর কি আছে এর মধ্যে যার জন্য হাজার হাজার মাইল দূর থেকেও এত লোক ছুটে আসে একবার দেখে যেতে? কি তারা দেখে?

পুরাণো ইতিহাস নিয়ে অযথা ভাবাবেগের প্রশ্রয় দেওয়ার কাজ নেই।

১৯শে নভেম্বর, রবিবার, ১৯৪৪ সাল। জালিয়ান্‌ওয়ালা বাগের পেছনের ছোট্ট দুয়ার খুললো—সামনের বড় গেট বন্ধই থাকে। সাথে ছিল ছোট বোন, অমৃতসরের সরকারী কর্মচারী ধীরেন সাহা, কংগ্রেস কর্মী দেবেন মুখার্জী আর কয়েকজন করাচী থেকে। বাগটি বর্তমানে বাংগালী কংগ্রেস কর্মী এস্. সি. মুখার্জীর তত্ত্বাবধানে রয়েছে। তাই আমাদের সাধারণের নিষিদ্ধ স্থানে প্রবেশে তেমন আটকায়নি।

করাচী থেকে যারা বাগ দেখতে এসেছিলেন, তাঁরা কিছুটা এগিয়ে গিয়েই একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে অধৈর্য হয়ে ফিরলেন। ভাবটা যেন—'ধিক্কার, এই কি সেই বৃন্দাবন!' এত রক্তিত যার ইতিহাস, এত পয়সা খরচ করে যা দেখতে এলাম, তাতে দেখবার যে ছাই কিছুই নেই। বাস্তবিকই নয়নরঞ্জনের জন্য তেমন কিছুই নেই। দু'খানা বোর্ড ইংরাজী ও হিন্দিতে লেখা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। আর একখানায় পূর্বোক্ত দুই ভাষায় লেখা—"এখান থেকে লোকদের গুলি করা হয়েছিল।"

আমরা চারিদিকটাই ঘুরছিলাম অনেক আগাছার মাঝ দিয়ে। এক সময়ে কাঁটার খোঁচড় লেগে পায়ের কিছুটা রক্ত বের হয়ে পায়ের উপরেই পরে শুকিয়ে গেল। জালিয়ানওয়ালা বাগের মাটিতে তা পড়লো না। দেখলাম এক কোণে একটা বিশাল কূপ। বর্তমানে চারিদিকে বেশ বাঁধানো হয়েছে—ইট-সিমেন্ট আর জালের বেড়া। এই কূপের সম্বন্ধেও ইতিহাস আছে। কিন্তু ভিতরে এখন পরিষ্কার জল ছাড়া আর কিছুই নেই। কোন বিশ্রী গন্ধও অনুভব করলাম না। কূপের গায়ে ছোট্ট বোর্ডে হিন্দিতে লেখা রয়েছে—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" বোর্ডখানা কে ওখানে রেখেছে জানি না। এ প্রদর্শনীর মূল্য অনেক থাকলেও আমার কিন্তু হাসি এসেছিল। কারণ শিশুকাল থেকে আমিতো এই জেনেছি যে এ জন্মভূমিও আমাদের নয় আর এ জননী আমাদের বিমাতা—তাই স্বর্গ আমাদের দুঃস্বপ্ন মাত্র।

ডানদিকে ফিরে দেখি পুরাণো প্রাচীরে অনেক বড় বড় ক্ষতচিহ্ন লোহার জালি দিয়ে আবৃত। উপরে লেখা রয়েছে হিন্দিতে—গুলির দাগ। এবার পেছন দিকে এগিয়ে গেলাম। একটা বড় গাছের নিচে কিছুটা উঁচু আধগা, তার উপর একখানা আধাভাংগা ছোট্ট পুরাণো ইটের কুঠরীর মতই। পরিচয় কিছুই পেলাম না, তবে দেখলাম জিনিষটি খুবই পুরাণো—হয়তো বা সেই সময়েরই। বাকখানের আর সবই পরে পরিবর্তিত করা হয়েছে—মৌলিকতা প্রায় সবটাই ঢাকা দেয়া হয়েছে। উঁচু জায়গাটায় দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল—ঘর ভেঙে যায়, ভিত্তি ভাংগে না। নূতন ঘর ওঠে, পুরাণো ভিত্তির উপর জোর করে। শেষে সবাই বাগের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম। কংগ্রেসীরা এখানে ইট দিয়ে একটা উঁচু প্ল্যাটফর্ম করেছে। একপাশে বসে খুব নিরীক্ষণ করে মাটির দিকে চাইলাম।.....অলক্ষ্মী মাটি! কৃষ্টির জলের মতই সব কিছু শুষে নেয়। চিহ্নটুকুও বাকী রাখে না।

'The thirsty earth soaks up the rain,
And drinks and gapes for drink again.'

পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছিল অর্ধেকটা আকাশ লাল করে দিয়ে। বড় গাছের সবুজ পাতাগুলো তাকেই যেন অভিবাদন জানাচ্ছিল। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম লালের বুকে সবুজের খেলা।

ফিরবার কালে কিছুটা মাটি পকেটে করে নিয়ে এলাম—এমনি! যারা দেখলো সবাই খুব একচোট হাসলো। ছোটবোন বলে—মাটির আবার কি দাম আছে? উত্তরে বলি—মানুষেরই বা কি দাম আছে? মানুষের দামেই মাটির দাম। এ দেশে মানুষেরও কোন দাম নেই, তাই এ প্রশ্ন। আর যেখানে মানুষের দাম আছে, চেয়ে দেখো সেখানে এক ইঞ্চি মাটির জন্যে হাজার হাজার লোক প্রাণ দিচ্ছে। তবু বলে মাটির দাম নেই।

ওরে বন্ধু কয়েদী

রূপঙ্কর দত্ত

ওরে বন্ধু কয়েদী
ডাকি শুনছি নি
রাত্রি ক্রমে গহীন হ'ল
তবু ঘুমাই নি।
কেমন করে উল্টো তালে,
দিনগুলো তোর বাঁধা জালে
ঘুমায় ঢুলে চারে দেয়ালের গায়
বন্ধু, আমার ডাক কি কোন কালে
তোদের দেশে যায় ?

তোর হোথা কি শিকগুলো সব
কেবল জেগে রয়—
ঘুমায় নাকি ওরা ?
তাইত ভাবি, দেবো কিনা দেবো—
ছেড়ে মনের টিয়া
কি জানি বা মেরেই বসে ছোরা।

আমার দেশে পক্ষী ডাকে
শাওন্ চান্নি রাতে,
ঝুমুম ঝুমুর বাজে বাদল
আওল বাওল বাতে।

তোর দেশে কি ডাকে বন্ধু,
জেলের ঘরের ছাতে
দোয়েল, কিঙে, শ্যামা—
ডালে কি রে দোলে বকুল
হয় কি রে সব ক্ষমা—
ঝরে ঝরে সারা রাত্রি বসে ?

বন্ধু, কেবলই কি ঘানি টানিস বসে ?
মোর কথা কি ভুলে গেছিস
ঘানি-টানার ফাঁকে ?
কত কী যে বলছে কত লোকে।

ঘুর ঘুরে মন কি রে তোর,—
ঘুরেই গেল শেষে
আসবি না আর দেশে ?

ফুটবে নাকি গজনী দীঘির
রক্ত শালুক ফুল ?
শাওন্ দিনে ময়া নদীর
ভরবে নাকি কূল ?
উঠবে নাকি নেচে দুলে দুলে,
বলতো বন্ধু, সত্যি গেলি ভুলে ?

তোর লাগি যে বন্ধু আমি
লয়ে তারার মালা—
রাত্রি জেগে থাকি।
অষ্ট প্রহর কেবল ডাকে পাখী,
বলে বলে যায়—
আসবে বন্ধু আসবে অচিন নায়।
কোন সে দেশে তোকে নিয়ে
আদরে দিয়ে পাড়ি,
শতেক কোশল হোক না দূরে
যাব নেহের বাড়ি।

বলবো তারে নাও খুলে দে
বন্ধু আনতে যা—
দেরি যদি করবি তবে—
আমার মাথা খা।
চোখে আমার কি যে হ'ল
ঘুম আসে না মোটে,—
ঐত শুনছি তোমার গলা—
মোল্লাগঞ্জের ঠোটে।

লোকেরা সব বলছে ডেকে—
কেমন ছিলে হোথা ?
তুমি ছুটছ আমার পানে—
মুখে কও না কথা—
এদিকে যে আমার ভাখো,
কেমন হ'ল মাথা—
তোমার সঙ্গে বলতে কথা—
কথা বেধে যায়।

হোমাগ্নি

(উপন্যাস)

শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[তিন]

নভেম্বরের মাঝামাঝি, কার্ত্তিকের শেষ।

ইতিমধ্যে পাঁচ মাস কাটিয়া গেল। গ্রাম্য স্কুল, শান্ত পল্লী-গ্রাম, শান্ত দেশ। স্কুলে কোন হৈ-চৈ নাই, গণ্ডগোল নাই, উত্তেজনা নাই। অবিচলিত অবিচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে গড়াইয়া গড়াইয়া জীবন চলিতেছে। জীবন আদৌ চলিয়াছে কি না সে কথা বার দিলেও, জীবন আছে কি না সেইটাই সন্দেহ হয়। মানুষগুলি তেমনিই আছে, ছেলেগুলি তেমনিই আছে, মাষ্টারগুলিও তেমনিই আছেন। ছাত্রেরা যেমন পড়িত তেমনি পড়ে, যেমন ভুলিত তেমনি ভুলে। যে বানান ছয় মাস আগে শিখিয়া ভুলিয়াছিল আজও তাহা ভুল করিতেছে। যেমন করিয়া পাঁচমাস আগে শিক্ষক প্রথমবার সে ভুল সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন তেমনি করিয়া সে ভুল আজও সংশোধন করিতেছেন। ভোলারও বিরাম নাই, সংশোধনও পৌনঃপৌনিক-ভাবে চলিয়াছে। চন্দ্রবাবু মাঝে মাঝে অনুভব করেন যেন জীবনে স্পন্দন নাই। গতি-বৃদ্ধি সব যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহা অবশ্য তাঁহার অবসর-মুহূর্ত্তের অবসাদগ্রস্ত দৃষ্টির ছবি। কিন্তু আসলে এই স্থলটির যে আদর্শ ছবি তাঁহার মনোলোকে তিনি আঁকিয়া রাখিয়াছেন, যাহার প্রতিবিম্ব বিশ্রামহীন সমস্ত কর্ম্মের মধ্য দিয়া বার বার স্থলটির মধ্যে বিম্বিত হইতে দেখেন সে এক পরিপূর্ণ প্রশান্তির ছবি। কোন দ্বিধা নাই, দ্বন্দ্ব নাই, সমস্ত কাজ অতি স্বচ্ছন্দ শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া সমাপ্ত হইতেছে। সমস্ত ছাত্র ও শিক্ষকের যুক্ত কর্ম্মের ফলে এক পরম শান্তি বিরাজ করিতেছে। এখানে থাকিয়া তিনি তো জানেন বাহিরে গ্রামের মধ্যে কত বিবাদ কত কলহ! কিন্তু এখানে এই গণ্ডীবদ্ধ আয়তনের মধ্যে সে সবের প্রবেশ নাই। আর এই প্রশান্তি রক্ষাই তাঁহার কাজ, তাঁহার কল্পনা।

তবু মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট গণ্ডগোল ঘটিয়া এই শান্তিকে ক্ষণকালের জন্য বিঘ্নিত করিয়া তোলে। এই তো কিছুদিন পূর্ব্বে একটি ছেলে ফুটবলের মাঠে আছাড় খাইয়া পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। চন্দ্রবাবুর সে কি চিন্তা! ডাক্তার আসিলেন—একজন নয় দুইজন। একজন ডাক্তার স্কুল কমিটির সভ্য, সেই কারণে বিনা ফিতে তিনি দেখেন। আরও একজনকে ফি দিয়া আনা হইল। ছেলেটির বাড়ীতে টেলিগ্রাম গেল। তাহার বাবা আসিয়া কয়েকদিন থাকিয়া ছেলে যখন আরোগ্যের পথে তখন ফিরিয়া গেলেন। তবে চন্দ্রবাবু নিশ্চিন্ত হইলেন।

তার কিছুদিন পূর্ব্বে ভোর বেলা তিনি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া চৌকির উপর বই লইয়া বসিয়াছেন এমন সময় হোর্থ মাষ্টার চিত্তবাবু আসিয়া চুপি চুপি হাজির। অত ভোরে এক চন্দ্রবাবু ছাড়া আর কেহ উঠে না। চন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসুভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই তিনি তাঁহাকে কোন কথা না বলিয়া চুপি চুপি তাঁহাকে উঠিয়া আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। বিস্মিতভাবে চন্দ্রবাবু তাঁহার অনুগমন করিলেন। কিছুক্ষণ পর, চিত্তবাবুর সঙ্গেই তিনি ফিরিয়া আসিয়া চৌকিতে বসিলেন। শান্ত, ছোট মানুষটির মুখখানি রাগে ক্ষোভে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ পর একটু বেলা হইলে দক্ষিণ দিকের তারিণী বোর্ডিংএর তিন নম্বর ঘরের ছেলেদের ডাক পড়িল। পাশের ঘরে অর্থাৎ চার নম্বর ঘরে চিত্তবাবু থাকেন। তিন নম্বরে তিনটি ছেলে থাকে। তাহার মধ্যে একজন নাই। বাড়ী গিয়াছে। বাকী দুইজন। ডাক এক সঙ্গে পড়িল না, পড়িল একে একে। প্রথমেই যে ছেলেটি আসিল তাহার নাম কিষ্টো। সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে। খানিকটা বয়স হইয়াছে। বেঁটে, শক্ত চেহারা, কালো রং, চোখে মুখে ধূর্ত্ততা মাখানো। সে আসিবামাত্র চন্দ্রবাবু তাহার হাতে একখানি কাগজ দিলেন, বলিলেন—তোমার ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, তুমি আধ ঘণ্টার মধ্যে এখান থেকে চলে যাবে। ছেলেটির মুখটা সাদা হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তাহার পর ডাক পড়িল অপর ছেলেটির। চৌদ্দ বছরের ফুটফুটে পাতলা ছেলেটি। নাম শীতল। সাদা রং আরও সাদা হইয়া তাহার মুখখানা মড়ার মুখের মত হইয়া গিয়াছে। সে চন্দ্রবাবুর সামনে দাঁড়াইতেই কাঁপিতে লাগিল। চন্দ্রবাবু তাহাকে পড়াশুনায়

গালিগালাজ করার জন্য কিপ্তের মত প্রহার করিলেন। মার খাইয়া ছেলেটি ফিরিয়া গেল। সেই কয়টা দিন অত্যন্ত বিরক্তির মধ্যে কাটিয়াছে তাঁহার। তারপর আবার পূর্ব্বের শান্তি ফিরিয়া আসিল।

তারণবাবুর নিষ্ঠোগে যে ক্ষোভ, যে অশান্তি স্কুলের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে নয়, শিক্ষকদের মধ্যে দেখা দিয়াছিল তাহা আস্তে আস্তে কাটিয়া গেল। শিক্ষিত সহিষ্ণু মানুষ এই শিক্ষকগুলি। দুর্ব্বল কোমল মন তাঁহাদের। বেশী দিন কাহারও প্রতি বিরাগ পোষণ করা অসম্ভব, বিশেষ করিয়া বিরাগ যেখানে কল্পিত। তাহার উপর তারণবাবু মানুষটীও ভাল। এখানকার মাষ্টারদের মত সহিষ্ণু প্রকৃতির না হইলেও, চাকরীর খাতিরে সহকর্ম্মীদের গূঢ় আন্তরিক বিরাগের অস্তিত্ব বুঝতে পারিয়াও কোন প্রতিবাদ করেন নাই। মাষ্টাররা যেমন কল্পনা করিয়া মনে মনে ক্ষুব্ধোদ্যত হইয়াছিলেন, বাস্তবে তাহা দেখিতে না পাইয়া তাঁহাদের সে মনোভাব চলিয়া গেল। তারণবাবুকে তাঁহারা অন্তরের সহিত গ্রহণ করিলেন। চন্দ্রবাবুও নিশ্চিন্ত হইলেন।

পারিলেন না কেবল কালিবাবু। তিনি সহকর্ম্মী শিক্ষকদের পরিবর্ত্তিত মনোভাব লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার বাহ্যিক ব্যবহারও পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিল। অন্য সকলের মত তিনিও তারণবাবুর সহিত কথা বলিবার সময় মুখে হাসি টানিয়া আনেন, কপাল মসৃণই থাকিয়া যায়, বিরক্তির কুঞ্চন-রেখা ফুটিয়া উঠিতে দেন না। তিনি তারণ সম্বন্ধে বার বার তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন তাহার অপরাধ কি? তাহার তো কোন অপরাধ নাই। তাহার উপর মানুষটি সত্যই ভাল। স্কুলের অনেকের চেয়ে ভাল। তার উপর সে বার বার তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়াই চলিয়াছে, শ্রদ্ধার সহিতই তাঁহার সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলে। তিনি বার বার তারণকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পারেন নাই। তাঁহার অলাক্ষাতে, তাঁহার সহিত পরামর্শ পর্য্যন্ত না করিয়া চন্দ্রবাবু যে এমন করিয়া তারণকে স্কুলে লইয়া বসিলেন কালিবাবুর মনে হয় যেন সেটার উদ্দেশ্য কালিবাবুকে আঘাত করা; এই স্কুলে তাঁহার সর্ব্বব্যাপী ক্ষমতাকে খর্ব্ব করা। তাহার উপর তাঁহার ভাইপোকে ঐ চাকরীটিতে লইবার কথা চন্দ্রবাবুকে তিনি বলিয়াছিলেন। চন্দ্রবাবু সেই কথাটাকেই বিশেষ ভাবে অস্বীকার করিবার জন্যই যেন তারণবাবুকে তাড়াতাড়ি ঢুকাইয়া লইলেন। এ যেন তাঁহার কথাটাকে না মানিবার জেদ চন্দ্র-বাবুর। তাঁহারও জেদ চড়িয়া যায়। কি করিয়া তারণ এখানে টেঁকে তাহা তিনি দেখিবেন।

সেদিন তিনি সকাল বেলায় রায় সাহেব নারায়ণ রায়ের ছেলে নিতাইকে পড়াইতেছিলেন। রায় সাহেবের বাড়ী গিয়া নিতাইকে পড়াইয়া আসিতে হয়। কালিবাবুর অন্য ছাত্ররা তাঁহার কাছে গিয়াই পড়ে। তবে বড়লোকের ছেলে নিতাই। তাহার কথা স্বতন্ত্র। রায় সাহেবের একমাত্র ছেলে সে। তাহার উপর বৃদ্ধবয়সের সন্তান। তাই বড় আদুরে। আর সে যে মা-বাপের আদুরে ছেলে, তাহার আব্দারের যে মূল্য আছে এ-কথাটা সে জানে। তাই শুধু মা-বাপের কাছে নয়, তাহার এই স্নেহের ক্ষেত্র যতদূর প্রসারিত, সে তাহার বাবার প্রতি ভয়েই হোক, তাহার বাবার টাকার জন্যই হোক, সে কারণেই হোক, নিতাই তাহার ষোল আনা আব্দারের লাঙ্গল দিয়া চষিয়া বেড়ায়। কালিবাবুও তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ পান না। পড়িতে বসিয়া তাহার পড়ার নাম নাই; এ গল্পে সে গল্পে সময়টা কাটাইয়া দিবার চেষ্টা করে। কালিবাবুর সেটা ভাল লাগে না। ধরা-বাঁধা কাজ করা স্বভাব তাঁহার। আর তাঁহার কাজকে যে কেহ নিন্দা করিবে এ চিন্তা তাঁহার অসহ্য। তবে বড়লোকের বাড়িতে কিছুক্ষণ নিরিবিলি গল্প করার আরাম আছে। কাজ তো সারাদিন ধরিয়াই। অন্য ছাত্ররা কড়ায় গণ্ডায় পাওনা বুঝিয়া লয়। কাজেই এখানে গল্পটা মন্দ লাগে না। তবে এক একদিন কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত হইয়া ওঠে, তাহার উপর রায় সাহেবের কটুকথার ভয়ে তাড়াহুড়া করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করেন। তখন নিতাই গল্প করিতে চাহিলে ধমক্ দেন। এমনি করিয়াই পড়াশুনা চলে। তাহার পর আবার গল্প সুরু হয়। অবশ্য সে কয়দিনে যেটুকু পড়ান তাহাতেই কাজ হইয়া যায়। তাঁহার পড়াইবার কৌশল ও শক্তি অসাধারণ, আর নিতাইয়েরও সাধারণ বুদ্ধি আছে। আর ঐ সামান্য বুদ্ধি থাকাটাই ছেলেটির কাল হইয়াছে। তাহার

ধারণা হইয়া গিয়াছে, সে অসাধারণ বুদ্ধিমান, পড়াশুনা করুক আর নাই করুক পরীক্ষায় 'ফার্ষ্ট প্রেস' তার বাঁধা। আর ইহার ফলে পদে পদে সে নিজের অসাধারণ বিজ্ঞতার ও চতুরতার পরিচয় দিতে চায়। এ রকম ছেলেকে পড়াইতে কালিবাবুর বিরক্তি আসে। তবু সামনে অ্যানুয়াল পরীক্ষা। ভাল করিয়া পড়ান দরকার। একটু ঘষা মাজার দরকার আছে। পরীক্ষায় যদি ছেলে সেকেণ্ড হয় রায় সাহেব তাহা হইলে আর বাকী কিছু রাখিবেন না। অতি কটু ভাষায় গালি-গালাজ করিতে তাঁহার বাধে না, এক্ষেত্রেও বাধিবে না। কালিবাবু ইংরাজী বন্ধ করিয়া পাটীগণিত খুলিলেন। নিতাই বলিল—কতকগুলো ইম্‌পর্টাণ্ট্ অঙ্ক কষান স্যার। অন্ততে তো ফুল মার্ক বাঁধা।

কালিবাবু চটিয়া উঠিলেন। গত হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের সমস্ত অঙ্ক পূর্ব্ব সন্ধ্যায় কষাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও ছেলেটা পরীক্ষার খাতায় দুইটা অঙ্ক ভুল করিয়া আসিল আর সেইখানে কপি পাইল একেবারে ফুলমার্ক। কালিবাবু রাগিয়া বলিলেন—থাম্, আর ইয়ারকি করিস না। তোর বিদ্যে আমার জানা আছে। সারা বছর অঙ্ক ক'ষে দুটো ভুল করলি। আর কপি একমাস আগে তুলে হয়ে ফুল মার্ক পেলে। তুই থাম।

নিতাইও চটিয়া উঠিল—আপনিই তো ভুল ক'রে লিখিয়ে দিয়েছিলেন। ভুল করে লিখিয়ে দিলে কেউ ঠিক ক'রে করতে পারে নাকি?

আশ্চর্য্য মিথ্যাবাদী! আর অদ্ভুত ঔদ্ধত্য! কালিবাবুর নিতাইকে খুন করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু উপায় নাই। চটির শব্দ উঠিতেছে। রায় সাহেব আসিতেছেন। এই অবস্থায় কালিবাবুর তিরস্কৃত হইবার সমূহ সম্ভাবনা। মিথ্যাবাদী ছেলেকেই তিনি বিশ্বাস করিয়া তাহার সামনেই কালিবাবুকেই তিরস্কার করিতে তাঁহার বাধিবে না। তিনি সসব্যস্তে বলিলেন আচ্ছা, আচ্ছা, সে অঙ্ক কর। দরকারী অঙ্কগুলোই কষে ফেল আগে।

নিতাই দরকারী কথাটার মানে বোঝে। মাষ্টার মহাশয় পরীক্ষায় যেগুলি পড়িয়াছে, সেইগুলির কথা বলিতেছেন। সে তাই কালিবাবুকে তিরস্কারের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিল। কালিবাবু দরকারী অঙ্কের জন্য পাটিগণিত খুলিলেন। অঙ্ক আরম্ভ হইল। একটা, একটা করিয়া তিনটা হইল। নিতাই অঙ্কগুলা আলাদা খাতায় টুকিতেছিল। এমন সময় রায় সাহেব পাশের ঘর হইতে বাহির হইলেন। হাতে খানকয়েক চিঠি ছিল, চাকরের হাতে দিলেন পোষ্ট করিতে। তারপর ধপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। কালিবাবুর সহিত তাঁহার গল্প আরম্ভ হইল।

অদ্ভুত মানুষ এই রায় সাহেব। তাঁহার আসল নাম নারায়ণ রায়। তিন চার পুরুষ ধরিয়া বড় জমিদার। আয় প্রায় হাজার দশের টাকা। নগদ টাকা কড়িও আছে। তাঁহার বয়স বছর পঞ্চান্ন। অল্প বয়স হইতেই সরকারের অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন হইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। সরকারের প্রতিভূ সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তাহারই ফলে পঞ্চান্ন বছর বয়সে রায় সাহেব উপাধিতে অলঙ্কৃত হইয়াছেন। তাহা লইয়া তাঁহার আর অহঙ্কারের সীমা নাই। আর এ পদবী তাঁহার কাছে কোনদিন পুরাতন হইল না। তাই তাঁহাকে রায় সাহেব বলিয়া ডাকিলে তিনি খুসী বৈ অখুসী হন না। তাই লোকে কতকটা পরিহাস করিয়া কতকটা ভয়ে তাঁহার মনোরঞ্জন করিবার জন্য রায় সাহেব বলিয়া ডাকে। এই পাঁচ বছরে নূতন নামের নীচে পঞ্চাশ বছরের পুরাণো নামটা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহার নাই। তবে দুইপুরুষে বড়লোক ব্যবসায়ী সদানন্দবাবুরাই তাঁহার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁহারা লক্ষপতি ধনী হইলেও পূর্ব্বে গোপন হিংসা ছিল কিন্তু অন্য কোন দ্বন্দ্ব তাঁহার ছিল না। বর্ত্তমানে সদানন্দবাবু জমিদারীও কিনিতেছেন। তাই দ্বন্দ্ব সুরু হইয়াছে। সদানন্দবাবুদের গালাগাল না দিয়া তিনি জল খান না। অন্য কোন আলোচনার মধ্যেও তিনি অবান্তরভাবে সদানন্দবাবুকে টানিয়া আনিয়া তাঁহাদের সুপ্রচুর নিন্দা করিয়া আলোচনার পরিসমাপ্তি করেন। আজও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। তিনি ভুল লইয়াই আলোচনা করিলেন। বলিলেন—দেখ মাষ্টার, সদানন্দর বাবা তারকবাবু ভুল না ধরে দিলে কি আর এখানে ভুল হত না? হত। আমি আমার বাবার নামে করিয়ে দিতাম। এখনও আমি পারি। তবে গাঁয়ে

একটা ভুল রয়েছে; সেটাকে নষ্ট ক'রে দিয়ে লাভ কি হবে? কালিবাবু লাজ দিয়া ঘাড় নাড়িলেন। রায় সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন—কিন্তু সদানন্দর হাতে পড়ে স্কুলটা উচ্ছন্নে গেল। যা তোমার ম্যানেজিং কমিটি। নেহাত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট, তাই কিছু বলতে পারি না। তা না হ'লে একবার দেখে নিতাম। সদানন্দটা কি আর মানুষ হে। শয়তানের একশেষ! আর তেমনি তোমার হেডমাষ্টার ঐ চন্দ্র চৌধুরী—হাবারাম একটা! হবুচন্দ্র রাজা তার গবুচন্দ্র মন্ত্রী! তারপর তোমাদের ঐ এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড হে হেমেন,—হেমা চাষা। ওটা আবার ইউনিয়ান বোর্ডের মেম্বার, ভাইস্ প্রেসিডেন্ট। সাতটা চড় মারলে মুখ থেকে কথা বের হয় না। মেয়ে-মুখো, নিজের কিছু করবার সামর্থ্য নাই। পরের রায়ে রায় দেয়। ওটাকে তোমরা তাড়াও না কেন হে? যে লোক অনবরত চৌকিদারি ট্যাক্স গোণার ভাবনা ভাবে, সে পড়াবে কি করে? ওকে তাড়াও হে, ওকে তাড়াও। তোমরা না পারতো বল আমাকে। আমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে লিখছি। রায় সাহেব দম লইবার জন্য থামিলেন। আবার অন্য একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—ভাল কথা, হ্যা হে মাষ্টার, তোমরা আবার ঐ যাউতুলে তারণটাকে তোমাদের মধ্যে ঢোকালে কেন? ওই আনন্দ'র সঙ্গী ওটা। এ তো ভাল কথা নয়। ঐ আনন্দটা একটা ডাকাত। তার সঙ্গী ওটা। আনন্দ কি বলে জান? বলে 'ইংরেজ রাজত্বে আমাদের সমূহ ক্ষতি হয়েছে'। আমার সাক্ষাতে অবশ্য বলেনি। বললে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিতাম। জেলের ব্যবস্থা করতাম। ঐ লোকের সঙ্গী; ওকে তাড়াও।

কালিবাবু বলিলেন,—আমি আর কি করি বলুন। চন্দ্রবাবু রেখেছেন ওকে। উনি হেডমাষ্টার। ওর উপর কি আমি যেতে পারি? এ বিষয়ে যা কিছু করবার অধিকার সব ম্যানেজিং কমিটির।

রায় সাহেব বলিলেন—থাকতাম আমি ম্যানেজিং কমিটিতে তো সব টিট করে ছেড়ে দিতাম!

—তা আসুন না। এই তো জানুয়ারীর শেষে ম্যানেজিং কমিটির ইলেকসেন। দাঁড়ান না আপনি।

রায় সাহেব লোলুপভাবে বলিয়া উঠিলেন—দাঁড়াব মাষ্টার? তুমি বলছ দাঁড়াতে? লোলুপতাকে লামলাইয়া লইয়া বলিলেন—না:, ওদের সংস্রবে আমি যাব না।

কালিবাবু রায় সাহেবের আন্তরিক ইচ্ছার আভাস পাইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিঃস্পৃহ কণ্ঠে বলিলেন—সত্যিই তো, কথাটা আমি বুঝিনি। আপনার মত লোকের ওর ভেতর যাওয়া শোভা পায় না।

রায় সাহেব কথাটা কাড়িয়া বলিলেন—না, না, ও কথা বল না। আমারও তো সাধারণের প্রতি একটা দায়িত্ব আছে।

—নিশ্চয়।

কালিবাবু বুঝিলেন এইবার রায়সাহেব যুদ্ধোদ্যত হইয়া উঠিবেন। এবং ভোটযুদ্ধে তাঁহার অবতীর্ণ হওয়া নির্দ্ধারিত। ঘোর যুদ্ধ এবার আসন্ন।

কালিবাবু রায়সাহেবের বাড়ী হইতে বাহির হইলেন।

কালিবাবু যখন স্কুলে ফিরিলেন তখন স্কুল বসিয়া গিয়াছে। প্রথমে দুই ঘণ্টা তাঁহার ছুটি। তবু একবার অফিসে গেলেন। ক্যাসের কিছু কাজ ছিল।

কালিবাবু সেখানে গিয়া দেখিলেন—আনন্দময় আসিয়াছেন, তিনি চন্দ্রবাবুর সহিত গল্প করিতেছেন। তিনি মোটেই আশ্চর্য্য হইলেন না। পাঁচ মাস আগে আনন্দময়কে এখানে দেখিলে আশ্চর্য্য হওয়ার কথা ছিল। আজকাল আনন্দময়ের আসা যাওয়াটা একটু ঘন হইয়াছে। কালিবাবু ইহার কারণ জানেন না। অনুমান করেন অনেক কিছুই, কিন্তু কোনটাই মিলে না।

তারণ এখানে মাষ্টার হওয়ার পর হইতেই তাঁহার যাতায়াত আরম্ভ হয় নাই। আরম্ভ হইয়াছে ফণি ভর্ত্তি হওয়ার পর হইতেই। প্রথম মাসখানেক আনন্দময় ফণির কোন সংবাদই লন নাই। তিনি বাহিরের মানুষ, নানান জনের নানান কাজ লইয়া থাকেন। সপ্তাহে চার দিন সমাজ-সেবক-সমিতির কাজ আছে; তাহার সেক্রেটারী হিসাবে তাঁহার ঘাড়ে সব ভার, সব তিনিই করেন। দরিদ্রদের চাউল বিতরণ, তাহাদের অভাব যতটুকু সম্ভব দূর করা।

পালাবার। তাই বাড়ী হ'তে পালাবার ওষুধ দিয়ে দিলাম। ছেলে আর কোন দিন বাপের সঙ্গে ঝগড়াও করবে না, আর বাড়ী হ'তে পালাবার কথা মুখেও আনবে না। আর মা বাপও তেমনি। দুলাল গৃহত্যাগ করবেন এই ভয়েই কেঁদে সারা। চন্দ্রবাবু মনের রাগটা নিঃশেষ করিয়া মুখে প্রকাশ করিয়া আনন্দময়ের পাশে বসিয়া পড়িলেন।

আনন্দময়ের মুখে অতি ক্ষুরধার হাসি আত্মপ্রকাশ করিল, বলিলেন—আচ্ছা, মাষ্টার মশায়, ঐ যে ওকে মারলেন, তাতে ক'রে কি ওর মা-বাপের সঙ্গে ব্যবহার শুধরে যাবে বলে আপনি মনে করেন? আমার তো মনে হয়—ঐ ছেলেটি বেশী করে ঝগড়া করবে বাড়ীতে। আরও বেশী ক'রে বাড়ী হ'তে পালাবার ভয় দেখাবে। তা নাও হ'তে পারে। আপনার মারের ভয়ে হয়ত ওর রাগটা অন্যদিকে চেহারা নেবে। আপনার ভয়ে হয়ত যেগুলি আপনি নিষেধ করেছেন সেগুলি করবে না, হয়ত অন্য কিছু করবে। মা-বাপের ওপর ছেলের রাগ কি অভিমান সফলভাবে ব্যবহার করার সংখ্যাতীত কৌশল প্রত্যেক ছেলের জানা।

চন্দ্রবাবু প্রশ্নটাকে অত গভীর ও সূক্ষ্মভাবে দেখিতে রাজী নহেন। তিনি এক কথায় আনন্দময়ের কথা উড়াইয়া দিলেন—চুলোয় যাক মশায়, সে ওর মা-বাপ বুঝে করবে। ও আমার কাজের কি দায়িত্বের গণ্ডীর বাইরে। আসুন, উঠে আসুন। আপনাকে স্কুলটা ক্লাসগুলো দেখিয়ে আনি।

আনন্দময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিলেন। স্কুলটি তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতেই হইবে। তাঁহার চোখে এই কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে দেখা, সেই প্রহৃত তরুণটির ভাবলেশহীন সঙ্কুচিত দৃষ্টি, পাথরের মত মুখটা ভাসিতেছিল।

চন্দ্রবাবু ও আনন্দময় মাঠে নামিলেন। উজ্জ্বল দ্বিপ্রহর, আলোয় ঝলমলে ঘরগুলি, গুঞ্জনমুখর উৎসবময় পুরী—চন্দ্রবাবুর কাছে প্রতিদিনই ভাল লাগে। আনন্দময়েরও অন্যদিন হইলে ভাল লাগিত, কিন্তু আজ আর লাগিল না। সেই ছেলেটির নাম বুঝি জগজ্যোতি; কি মূর্ত্তিমান ব্যঙ্গ! সেই অর্থহীন তীক্ষ্ণ স্থির দৃষ্টি তাহার সমস্ত দৈহিক উজ্জ্বলতার উপর এক অর্থহীন ছায়াপাত করিয়া গিয়াছে। শূন্য মনেই আনন্দময় চন্দ্রবাবুকে অনুসরণ করিয়া ফার্ষ্ট ক্লাসে ঢুকিলেন। হেড পণ্ডিত মহাশয় সংস্কৃত পড়াইতেছেন। চন্দ্রবাবু ও আনন্দময় ক্লাসে ঢুকিতেই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল, আবার বসিল। চন্দ্রবাবু ছেলেদিগকে দুই একটা করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আনন্দময় পিছনে দাঁড়াইয়া ছেলেদের দেখিতে লাগিলেন।

গুটি পঁয়ত্রিশ ছেলে ক্লাসে। প্রত্যেকেরই বয়স ষোলর উপর, ষোল হইতে বোধ হয় বাইশ পর্য্যন্ত। স্থির হইয়া বসিয়া আছে সকলে। সে স্থিরতা যেন চাঞ্চল্যকে সংযত করিয়া যেন আসে নাই, ইহারা যেন স্বভাবতই স্থির। কেমন সব যেন! আর দেখা হইল না। চন্দ্রবাবু ক্লাস হইতে বাহির হইলেন। আনন্দময়কেও বাহির হইতে হইল।

চন্দ্রবাবুর সঙ্গে প্রতিটি ক্লাসে তিনি ফিরিলেন সব জায়গাতেই ঐ একই ছবি তাঁহার চোখে পড়িল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে জগজ্যোতির অবিকল পাথরের মত ভাবলেশহীন মুখে যে অর্থশূন্য দৃষ্টি তিনি দেখিয়াছিলেন তাহারই প্রতিচ্ছায়া প্রতিটি ছেলের চোখেই। একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কেবল ফিফ্‌থ্ ক্লাসে ঢুকিবামাত্র তাঁহার চোখ পড়িল ফণির দিকে। তাহার চোখে মুখে কেমন একটা হাসিখুসী ভাব, চেনা আত্মীয়কে অপরিচিতের মধ্যে দেখিলে যেমন হয় তেমনি। উজ্জ্বল চোখে ফণি তাঁহাদের দিকে চাহিয়া আছে। ফণির মুখে চোখে যে অসঙ্কোচ তারুণ্যের দীপ্তি দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা আনন্দময় এই তিনশো ছেলের মধ্যে কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। অধিকাংশ দৃষ্টিই তীক্ষ্ণ, দুই একজনের চোখে মুখে যদি বা অসঙ্কোচ দৃষ্টি ফোটে, সে দৃষ্টি ধূর্ত্ততায়, সাংসারিকতায় কুটিল। ফণির গায়ে ছেঁড়া সার্ট, তার উপর একটা সুতি চাদর। দুই একজন ছাড়া সকলেরই তাই। দারিদ্র্যের ছাপ সমস্ত বেশভূষায় অতি স্পষ্ট। কাহারও পায়ে জুতা নাই। গায়ে সুতি সার্ট বা কোটের উপর রঙীন সুতি চাদর, বড় জোর রেশমের পুরাণো র‍্যাপার। কেবল কয়েকজন বিশিষ্ট পোষাকে সজ্জিত। একজন সদানন্দ বাবুর ছেলে দেবেন, ফোর্থ ক্লাসের ছাত্র; আর একজন রায় সাহেবের ছেলে নিতাই ফণির সঙ্গে পড়ে; আর বাকী কাহাকেও তিনি চেনেন না। বোধ হয় বিদেশী ছেলে বোর্ডিংএ থাকে।

তিনি ভাবিতে ভাবিতেই বাড়ী ফিরিলেন। এই কি সেই

ছাত্রের দল, যাহারা দেশের ভবিষ্যতের আশা যাহারা দশের দুঃখ দূর করার কল্পনা করে; যাহাদের প্রশস্তিতে পাঠ্য-পুস্তকগুলি ভরা! ইহারা কি তাহারাই? কিন্তু তিনি তো দেখিতে পাইলেন না! না, ইহা উহাদের ছদ্মবেশ! কিন্তু তাই বা কেন? নাঃ, উহারা অমনিই, তাহার বেশী কিছু নয়। কিন্তু কেন তাহারা অমন হইয়া গিয়াছে? অতিরিক্ত শাসনে? শিক্ষকদের অবহেলায়? পারিপার্শ্বিকের চাপে? দারিদ্র্যে? কেন?

তিনি জানেন উহাদের সাংসারিক অবস্থার কথা। সকলেই চাষী ঘরের ছেলে। পাঁচ হইতে ত্রিশ চল্লিশ বিঘা জমির মালিক উহাদের বাপেরা। অবস্থায় ইতর বিশেষ নাই। কিন্তু উহারই মধ্যে যাহার বাপের চল্লিশ বিঘা জমি আছে তাহার আপনার চেয়ে হীন অবস্থার ছেলের প্রতি আকারে ইঙ্গিতে অবহেলা অতি সহজেই প্রকাশ পায়। ব্রাহ্মণের ছেলে শূদ্রের ছেলের সহিত কিছুতেই এক সঙ্গে বসিয়া পাইবে না। তাহাদের খাইবার পৃথক ব্যবস্থার কথা তিনি জানেন। কিন্তু পার্থক্য তো কই তাঁহার চোখে পড়িল না। তাহাদের সহিত যদি কাহারও পার্থক্য কিছু থাকে তবে তাহা সদানন্দবাবু ও রামসাহেবের ছেলেরই আছে। আর সেটা অতি সহজেই নজরে পড়ে।

কিন্তু দীর্ঘকাল নানান লোকজনের সহিত মেলামেশা করিয়া, নানান কর্মের মধ্য দিয়া অদৃষ্টবাদের সহিত আর একটা জিনিস তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন। আশা ও ভরসা। মানুষের প্রতি, মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার আশা ভরসার অন্ত নাই। সহজাত সহানুভূতির সহিত সব কিছু দেখিবার চেষ্টা করেন, বিপদ ও অসুবিধা হইতে পরিত্রাণের পথ খুঁজিয়া বেড়ান, পানও। দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার মনে হইল ছেলেদের বুকে যেন একটা জগদ্দল পাথর চাপান আছে, সেটা সরাইতে পারিলেই তাহারা সহজভাবে নিঃশ্বাস লইয়া বাঁচিবে। কিন্তু সে পাথরটা কি? সরানোই বা কেমন করিয়া যাইবে? উহাদের ভাল করিয়া না জানিলে, উহাদের অসুবিধার কথাও জানা যাইবে না। উহাদের সহিত কি করিয়া ভালভাবে, ঘনিষ্ঠভাবে মেশা যায় তাহাই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

শেষ মিনতি

শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী

ছন্দ আমার ফুরিয়ে গেছে পাই না খুঁজে সুর,
কেউ এসে আর দেয় না ধরা, সবাই রহে দূর।
গীতমালিকা শেষ হলো গো, রিক্ত গানের ডালা,
মন মেউলে সুরের প্রদীপ, রইবে না আর জ্বালা।
মনের মত পাইনা বাণী শুষ্ক নিঝুম ভাবা,
ছিন্ন বীণায় ধরার ধূলি, বাঁধলো গো তার বাসা।
বসন্ত বায় ভুবন পরে লাগায় মধুর দোল,
তরুর শাখে কোকিল গাহে ;—"খোল রে বাঁধন খোল।"
আগুনজ্বালা ফাগুন দিনে সুরের ঘুড়ের খেলা,
বকুল চাপা হেনার সুবাস মদির সারা বেলা।
কাঁপলো বায়ু মাতলো ধরা, খুশীর বহে ধারা
চতুর্দিকে সুরের দোলা, টুটলো বাঁধন-কারা।

আমার তবু সুর জাগে না শুষ্ক বীণার তার,
কোন অতলে তলিয়ে গেছে গানের ছন্দ সার।
ফাগুন মাসে কোকিল মিছে গাইলো মধুর গান
হৃদয় পরে নাই কোন দোল, সুপ্ত নীরব প্রাণ।
ছন্দ বীণার ইন্দ্রজালে আর পড়ি না ধরা,
বন্ধ আমার সুরের দুয়ার, বিফল বিলাপ করা।
কেমন করে ভরবো সখি, ব্যাকুল তব প্রাণে,
কেমন করে জাগাই তোমা সুরের পরশ দানে।

আর কি ওগো আসবে ঘরে, মোহন সাজে সেজে
হাতের কাঁকন পায়ের নূপুর উঠবে কি আর বেজে।
সুরের নেশায় দূরের থেকে উঠবে না আর দুলি,
কাঁপন লাগা লাজের মুখোস্ পড়বে না তো খুলি,
ঘাটের পথে কলস কাঁখে চমকিবে না থেমে,
সুরের রেশে জোছনা রাতে আসবে না আর নেমে।

শূন্য ঘরের এক কিনারে শুষ্ক নিঝুম আমি,
শিরার বুকে নাইকো সাড়া, সুর গেছে গো থামি।
ব্যথার পাথার বুকের পরে বাড়ায় দ্বিগুণ জ্বালা,
আর তো সখি নারবো কভু গাঁথতে সুরের মালা।
আমার শুধু রইলো বাকী আঁখির চপল জল,
তাই দিয়ে কি মিটবে ক্ষুধা, বলগো সখি বল।
রিক্ত প্রাণের সিক্ত চোখে শেষ মিনতি মোর,
তৃপ্ত যেন তোমায় করে আমার নয়ন লোর।

নির্বাসিত বিহঙ্গ

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী

[ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

প্যাভলফ যা অনুমান করেছিল, তাই ঠিক হল। পরদিন তাদের দেখা গেল পথে।

পালমা এবং প্যাভলফ দুজনেই রাজনৈতিক বন্দী। এই হিসেবে টেলগা গাড়ী চড়ে যাবার অধিকার তাদের ছিল। কিন্তু তারা হেঁটে চলেছে। নির্বাসিত স্বামীর পিছু পিছু চলেছে এক শোকার্তা নারী, চলেছে কটি নাবালক ছেলে। মায়ের অশ্রুজল আর কাকুতি-মিনতি—শত চেষ্টা করেও কর্তাদের কাছে প্রমাণ করতে পারে নি যে তারা নাবালক—তাদের বয়স বারোও হয় নি। বয়স যাই হোক তাদের ক্লান্ত পা-গুলো একান্ত অবশ হয়ে পড়েছিল। পালমা ও প্যাভলফ তাই দেখে গাড়ীর ওপর বসিয়ে দিল তাদের। নিজেরা চলল হেঁটে।

পাহাড়ে পথ। নীচে পুষ্পাচ্ছাদিত উপত্যকা-ভূমি। মাঝে মাঝে বার্চ ও পপলার সমন্বিত ঘন অরণ্য, বহুদূর বিস্তৃত তৃণভূমি—সবুজের বাহার নিয়ে সবেমাত্র দিন মেলেছে। ক্বচিৎ কোথাও এলোমেলো গ্রাম আর ঝড়-ঝটিকায় আধা-ভাঙা কাঠের বাড়ী!

প্রথম দুইদিনে পালমা ও প্যাভলফ অনুভব করল—রোজ পনের-বিশ মাইল পথ চলা নেহাৎ কম নয়। কিন্তু গ্রুসেলবার্গ ও পেট্রোপেভলফস্ক্-এর বন্দীবন্দী পাথর-বোঝা শক্তি-সামর্থ্যের ধার ধারে না। তবে বিশুদ্ধ সচল হাওয়া এই ছিল তাদের অবলম্বন—দেহের পক্ষে উত্তেজক রসায়ন। তাছাড়া বর্ষার দিন বলে বালুঝড়ের ভীষণ ঝাপ্টা থেকেও তারা রেহাই পেয়েছিল।

দুই দিন পর পর একদিন পুরো বিশ্রাম—নামলে নেবার জন্যে এই ছিল নিয়ম। কিন্তু প্রথম সপ্তাহ পার হবার পর দেখা গেল একদিনের হাঁটা নেহাৎ দুষ্কর না হলেও এই একঘেয়েমি ব্যাপারটা নিতান্ত বিরক্তিজনক।

প্যাভলফ ও পালমা উভয়েই পাশাপাশি চলতে লাগল। কথাপ্রসঙ্গে প্যাভলফ জানতে পারল ওভেসার হোপের স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের দিনগুলোর বিচিত্র কাহিনী এবং অনুসন্ধিৎসু হয়ে করল এই কারণে যে বিবাহিত জীবনে হোপ অসুখী হয় নি।

প্যাভলফ হোপকে জানে, নিঃসন্দেহে বুঝতে পারে হোপের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। কাজেই তার সম্পর্কে সব কথা শুনতেও সমুৎসুক। সার্জ পালমাও এমন একজন নিরলস শ্রোতা হিসেবে প্যাভলফকে পেয়ে এ অবস্থায়ও আবার নূতন জীবনের আস্বাদ পেল। মেতে উঠল কথায়। সারাদিন কথার ভেতর দিয়ে সে যেন সুদীর্ঘ পথের দূরত্ব অল্প সময়ে ঝরিয়ে দিতে পারে, সহজতম করে তুলতে পারে দুর্গম পথ-চলার নিদারুণ কঠোরতা—আর বিশ্রামকালের সরাইখানার ভিড়ের অসহনীয় তিক্ততা।

পল প্যাভলফ ক্বচিৎ দু'একটা কথা ছাড়া বিশেষ কোন কথা বলল না—কারণ সার্জের উচ্ছ্বসিত কথার মুখে ভাল করে কথা বলার কোন সূত্রই সহসা সে খুঁজে পায় না।

রাত্রিবেলায় পশুপালের মতো খেদিয়ে নিয়ে যেখানে তাদের রাখা হয়, সেই ধূম-মলিন অন্ধকার বন্দীখানা থেকে প্যাভলফ দেখতে পায় ছড় বিভীষিকার ছায়া; উদ্বেগ বোধ করে এবং এক একবার হাসি পায়; অথচ সে হাসিতে উন্মত্ততার কোন লক্ষণ নেই। দুর্গম সীমাহারা সাইবেরিয়ার পথ—বন্দীরা যেন মৃত্যুর দোসর—মৃত্যুদেবতা যেন তাদের সম-আত্মীয়, কেন না, মৃত্যু মানুষের মধ্যে যত ভেদাভেদ, রেষারেষি সব ঘুচিয়ে দেয়। এখানে সব দিক দিয়েই সবার সমান অবস্থা, ব্যবস্থাও একই রকম। সাধারণ বন্দী যারা তারা চলবে হেঁটে আর রাজবন্দীদের জন্য অবশ্য স্ত্রীং-এর গদি বর্জিত টেলগা গাড়ীতে চড়ে হাড় গুঁড়ো করে যাবার ব্যবস্থা এমন কি হাতখরচা কয়েক ফার্দিং অতিরিক্ত বরাদ্দ থাকলেও উভয়ের সাধারণ অবস্থার কোন পার্থক্য নেই। উভয়েরই মাথার উপর কালো মেঘের ছায়া। উভয়েরই অতীত মরে গেছে সমভাবে—যেন বন্ধ পুঁথি। ভবিষ্যৎ তরঙ্গহীন—শূন্য। বন্ধ পুঁথির আষ্টেপৃষ্ঠে মহা দুর্দৈবের ছাপ-আঁকা সিল-মোহর এঁটে দিয়েছে যেন।

দুই দিন পর।

সরাইখানার এক অপেক্ষাকৃত নিরালা জীর্ণকোঠায় প্যাভলফ ও সার্জ বিশ্রাম করছে। এই সুযোগে ইগনাজ সেখানে এল। পুরানো কয়েদী, ছোঁতকা—গাড়োয়ানী চেহারা। সে জিজ্ঞাসা করল—বন্দীরা ট্রেড য়ুনিয়ন গড়েছে, তাতে তারা যোগ দিতে রাজী কিনা। এ বিষয়ে তার অসাধারণ দক্ষতা, কাজেই সবাই মিলে তাকেই য়ুনিয়নের প্রেসিডেন্ট করেছে।

সঙ্ঘ গড়ার এই মতলব তাদের মধ্যে নূতন। বিশেষত প্যাভলফ এই সঙ্ঘের কথা শুনে খুব কৌতূহলী হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল: এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য?

ইগনাজ জানাল: আমরা সবার কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করি এবং তাই দিয়ে পরস্পরের সাহায্য করি।

—কি রকমের সাহায্য?

—সব রকম—যত রকম হতে পারে। যেমন, পথে বন্দীদের খাবার ফুরিয়ে গেলে কিনে দিয়ে সাহায্য করতে পারি। তোমার ধূমপানের ইচ্ছা হল কিংবা এক চুমুক তাড়ি চাই—তাও সংগ্রহ করে দিতে পারি—তুমি একা চেষ্টা করেও তা হয়ত করতে পার না। তাছাড়া শেকল-বেড়ী পরে যে সব বন্দীরা দুর্ভোগ ভুগছে, সম্ভব হলে সেই শেকল-বেড়ী খুলেও তাদের মুক্ত করে দিতে পারি, তবে সে সুযোগ—ইয়েনিসেইস্ক্-এনা পৌঁছা পর্যন্ত বড় হয় না। তাছাড়া, মনে কর, অতিরিক্ত হাঁটার ফলে পা কেটে কেটে যারা আর চলতে পারে না, অথচ না চলেও উপায় নেই—তখন? তখন আমরা টেলগা গাড়ী ভাড়া করে পালাক্রমে তাদের চড়িয়ে পথের কষ্ট লাঘব করতে পারি। একবার বুঝে দেখ, আমিও জোর করে বলতে পারি তুমিও স্বীকার করবে এরকম সঙ্ঘের কত প্রয়োজন।

—তা ঠিক। তবে ওরকম প্রয়োজন আমাদের কোন উপকারে আসবে না। আচ্ছা, সঙ্ঘের আর কি কাজ?

—আর একটা কাজ অবশ্য আছে। সে হল—তুমি যদি সাহস করে পালিয়ে যেতে চাও, তার ব্যবস্থাও আমরা করে দিতে পারি। তবে সে রকম কাজে মেম্বরদের সমর্থন থাকলেও আমি ততটা মত দিই না। কেন না, কাজটা ভারি বিপজ্জনক। দেখা গেছে, প্রতি তিনজনে বড় জোর একজনের চেষ্টা সফল হয়—বাদবাকী এগার জনই ধরা পড়ে এবং পিঠের চামড়া দিয়ে দুর্বুদ্ধির প্রায়শ্চিত্ত করে।

—তাই নাকি। বুঝতে পারি না—মাথায় যদিই-বা পালাবার মতলব জাগে কি করে পালানো যায়?

—সোজা কথা এবং সোজা কাজ। আগে মতলব স্থির করতে হয়। তারপর ঠিক প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত সুস্থ ঠাণ্ডা হয়ে—অর্থাৎ খুব সতর্কভাবে প্রস্তুতের নিয়ম মেনে বশংবদ হয়ে চলবে। তারপর আসবে বসন্ত কাল। কোকিলের সাড়া পাবে……বরফ গলে পথ পরিষ্কার হতে থাকবে। তখন সুযোগ বুঝে জঙ্গলে ঢুকে পড়লেই…ব্যস……

—ব্যস…সোজা রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন।

—না-না। সে আলাদা কথা, স্যর। আমি নিজে একবার উত্তরের পথ ধরেছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম কাজটা ভয়ানক ঝটমটে। যাক সে কথা—কথা হল, আমাদের এই যে সঙ্ঘ যদি তোমার কোন রকম সাহায্যে নাও করতে পারে তুমি অনায়াসে পার সঙ্ঘকে সাহায্য করতে তাতে দুর্বল, অক্ষম, অসহায়দের খুব উপকার হবে।

—ভাল কথা! দুর্বল, অক্ষম, অসহায়দের জন্য কিছু দিচ্ছি। তুমি এখন যেতে পার। আর আমাদের কোন প্রয়োজন হলে তোমায় জানাব।

প্রেসিডেন্ট খুব খুশী হল। প্যাভলফের দেওয়া টাকাটা পকেটস্থ করে এমনভাবে একটা তৃপ্তির হাসি হাসল যেমন ঘোড়াগাড়ীর ঘোড়া অপর গাড়ীর পেছনে রক্ষিত কচি তৃণরাজি আস্বাদ করে তৃপ্তি পায়।

লোকটি চলে যাওয়ার পর সার্জ জিজ্ঞেস করল: তাহলে তুমি কি পালিয়ে যেতে চাও পল আইভানোইচ?

—হয়ত তাই। একজন যা পারে, যেমন করেই হোক, অন্যেরও তা জেনে রাখা ভাল। আমি এই পর্যন্ত জানতে পেরেছি যে এই প্রদেশে রক্ষীরা বন্দীদের ওপর বড় একটা নজর রাখে না। বস্তুত একথাও শোনা গেছে, কর্মচারীরা ইচ্ছে করেই চোখ বুঁজে ঝিমোয়। তাদের মনের ভাবটাও যেমন: পালাতে পারতো পালাও—চোখ তো বুঁজেই আছি……

—কেন? বন্দীদের এমন তাচ্ছিল্য করার হেতু?

—হেতু—বন্দীদের প্রাপ্য অ্যালাউন্সটা আত্মসাৎ করা। বন্দীরা যদি বনে পালিয়ে থাকে বা জাহান্নমে যায় তাতে তাদের কি আসে যায়? বন্দী যদি বেড়াজাল ভেঙে শেষ পর্যন্ত দেশে গিয়ে পৌঁছয় তবেই তাদের পক্ষে একটু মুস্কিল। তারা শুধু এই শেষ সঙ্কটের কথাটাই ভাবে—নইলে আর কিছু নয়। তবে আমার মনে হয়, লোকটা যে মতলব দিয়ে গেল সেই অনুযায়ী উত্তর অঞ্চলে চম্পট দিলে মন্দ হয় না।

সার্জ পালমা এবার ব্যস্ত হয়ে বলল: যদি তুমি তাই কর পল আইভানোভিচ, তাহলে—দোহাই তোমার—আমার একটা কথা তোমায় রাখতেই হবে।

—নিশ্চয়ই। অসম্ভব কিছু না হলে সবই আমি করতে পারি··

—প্রথমে তুমি আমার স্ত্রীকে খুঁজে বের করবে—করবে তো? তাকে বলবে, আমার জন্যে সে যেন বৃথা আক্ষেপ না করে। আমি জানি সে এই দুঃসংবাদ কি ভাবে গ্রহণ করবে। সে নিজেকে দায়ী করে তীব্র অনুশোচনা করবে—যে সে-ই আমাকে ওপথে নামিয়েছিল—এই বলে। কিন্তু ওরকম ক্ষোভ করার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি তাকে বলো যে আমরা যে একসঙ্গে কাজ করতে পেরেছি সেই স্মৃতি অনুক্ষণ আমার মনকে আনন্দে ভরপুর করে রাখে। আমরা যে কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, এইটুকুই যা দুঃখ—আর কোন দুঃখ নেই। আর একটা কথা জানাবে যে—সে যেন অবিলম্বে রাশিয়া ছেড়ে লণ্ডনে চলে যায়। সেখানে রথচাইল্ড ব্যাঙ্কে টাকা জমা আছে। আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম ভবিষ্যতে এমন হতে পারে, তাই এ ব্যবস্থা করে রেখেছি। আর আমার নামে সে যেন—ঠিকানায় চিঠি রেখে যায়: তাতে যেন লেখা থাকে কোথায় গেলে তাকে পাব। আমি যত শীঘ্র পারি ফিরব—আমাকে কিভাবে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এসব কথা অবশ্য তাকে বলার দরকার নেই, শুধু বলবে—আমি নিশ্চয় ফিরব। পল, এই কথাগুলো তাকে বলবে তো!

—তুমি নিশ্চিন্ত থাক সার্জ প্যাট্রভিচ্, যদি আমি একবার বেরিয়ে পড়তে পারি আর তাকে খুঁজে পাই, তাহলে সব কথাই বলব।

—তুমি ইচ্ছে করলেই বেরিয়ে পড়তে পারবে,—সার্জ আগ্রহভাবে পলের বাহু চেপে ধরল।—তুমি শপথ কর যে তুমি পালাবেই, আর সব কথা তাকে বলবে···

—হোপ ইভানোভনার জন্যে যথাসাধ্য করব, সার্জ প্যাট্রভিচ। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম এবং প্রতিজ্ঞার অবহেলা করবনা·····

—বেশ, মনে রেখো।—সার্জ চিন্তিতভাবে তাকাল পলের দিকে। বলল: আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি, প্রাণ গেলেও সে বিশ্বাস আমি হারাব না।

—তুমি আমাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পার, সার্জ মানুষের একটি মাত্র জীবন—সে-জীবন বন্ধুজনের মঙ্গলের জন্যে নিয়োজিত করার মতো মহৎ কাজ আর নেই।

এ আলোচনার পর সার্জ সুমধুর কল্পনায় বিভোর হলেও তীব্রণ উদ্বেগ বোধ করতে লাগল। শীঘ্রই হোক বা দেরীতেই হোক হোপ ইভানোভনা তার খবর ঠিকই পাবে এবং তার সীমাহীন ভালবাসা, প্রগাঢ় অনুরাগ নিঃসন্দেহে গ্রহণ করবে। কিন্তু সে কবে?···

বন্দীদলে একমাত্র বুড়ো গ্রেগরি ছাড়া নির্মল হাসিখুশী মুখ সম্ভবত আর কারও ছিল না। কোন কিছুতেই যেন লেশ-বেশ নেই। সদা নির্বিকার ভাব, প্রফুল্লতা ও অদ্ভুত সহিষ্ণুতা নিয়ে সে চলেছে দলের আগে আগে। যেখান থেকেই যাত্রা সুরু হয়, সে সাগ্রহে চেষ্টা করে প্যাভলফ আর সার্জকে পাশে রেখে চলতে। গাড়ীর ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ আর হাতের বন্ধনী শেকলের ঝনঝন আওয়াজ পেছনে থেকেও বেশ শোনা যায়।

কেউ কেউ রহস্য করে পেছন থেকে তাকে ধাক্কা দিয়ে বলে: ওহে বাচাল গাড়ীর মনিব, তুমি ওখানে পৌঁছবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছ দেখছি।

সঙ্গে সঙ্গে শীতের আপেলের মতো ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে সে কলরব করে ওঠে: বহুৎ আচ্ছা! আমি সংসঙ্গে থাকতে চাই কিনা! এই দুই ভদ্দর লোকের সঙ্গে চলেছি। তাঁর গাড়ীখানা কচিৎ খালি হয়। সেই ছোট্ট মেয়ে আর তার সুখীবেড়াল গাড়ীর নিত্যকার সওয়ার। মাঝে মাঝে সে পরিষ্কার অস্বীকার করে বলে—অপরিচিত লোকজনের

চোখের সামনে গাড়ী চড়বে না আর। বলেই সে নেমে ছুটে যায় তার বাবার কাছে। বাবার হাত ধরে সে হাঁটতে থাকে। অথনই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, পা যখন আর চলতে চায়না তখন হয় আবার গাড়ীতে ফিরে আসে অথবা তার বাবার কোলে চেপে বসে কচিমুখে এমন সব সুমধুর আবল তাবল বলতে থাকে যে শুনে সবার মনই উল্লাসে ভরা হয়ে ওঠে। মনে হয় অন্যান্য জীবন-পথে সবাই যেন চড়ুই ভাতির ভোজ আয়োজনে মেতেছে—বন্ধন, বন্দীজীবন আর বন্ধনশালা—কিছুই নেই সেখানে।

তবে ঐ 'বাচাল গাড়ী' একা একা বড় চলতে চায়না—যখনই ঐ বালিকা নেমে হেঁটে চলে, অথবা তার বাবার কোলে আশ্রয় নেয়, তখন সে অন্য শিশুদের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। অথবা কোন চলৎশক্তিহীনা মায়েদের তুলে নেয়। চালক গ্রেগরি মায়েদের আপ্যায়িত করে শুকনো চা দিয়ে আর ছোটদের মধ্যে বিলায় টুকরো বিস্কুট। তারা আশ্চর্য হয়ে তাকায় তার মুখের দিকে। সে তখুনি সারা মুখে হাসির লহর ফুটিয়ে বলতে থাকে এ দেহটা বাঁচিয়ে রাখতে বেশি-কিছুর তেমন প্রয়োজন হয় না। বেশিতে আমি অভ্যস্ত নই—নাও ধরো—ধরো···ও আমার বাড়তি ভাগ···

সার্জ পালমার মন তখন অন্য বিষয়ে নিয়োজিত ছিল—অন্যের কথা সে আর ভাবছিল না। প্যাভলফের উপর সে যেন সর্বস্ব বিলিয়ে দিল। এখন পথ-চলতেও তার কাছে দারুণ বিরক্তি লাগছিল। ব্লুক্রেটদের তয় বিতীষিকা অভিশপ্ত দানবের মত পথ জুড়ে বসে আছে, প্রতি পদক্ষেপে যেন শাস্তিভঙ্গ করছে। এই আপদের চেয়ে এখন যেন হঠাৎ তাকে আরও বিক্ষুব্ধ করে তুলল বুড়ো গ্রেগরির গাড়ীর বিরক্তিকর আওয়াজ। ভীষণ রেগে গেল সে। একাধিক-বার সে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে তাকাল সেদিকে। তার এই হঠাৎ অদ্ভুত আচরণে বুড়োও হ্যালক্যাল করে তার দিকে তাকাল।

পালমা গজ গজ করে বলল: চুলোয় যাক তোমার গাড়ী।

বুড়ো গ্রেগরি হা-হা-করে উঠল। কি-কি হোল? আমি জানি সংসঙ্গেই আমি আছি।

—কোন্ কথায় কি কথা। তুমি অন্য কায়গায় যাও এখানে আর নয়।

প্যাভলফ বাধা দিল: চমৎকার মানুষ এই বুড়ো। ব্যস্ত হয়োনা। দেখো শেষে তোমারও সয়ে যাবে। নিজেকে ধন্যবাদ দাও যে আমাদের গাড়ী ঠেলতে হচ্ছে না—সেকলও পরতে হয়নি···

একদিন বিকাল বেলা। সুদূরে দেখা গেল গ্রন্থিল পর্বত শ্রেণী সুদীর্ঘ সমুদ্রতরঙ্গের মতো ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে। সেখানে সূর্য কিরণ পড়ে ঝকঝক করছে শ্রেণীবদ্ধ কশাক সেনাদের সুতীক্ষ্ণ বেয়নেট। পর্বতের পাদদেশে ঘনসবুজ প্রান্তরে ফুটে রয়েছে লরেল আর রডোডেনড্রন ফুলের অপরূপ বাহার। বন্ধুর ভূমি ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত শেওলা ঢাকা অসংখ্য পাথর স্তূপ—পথ চলা ক্রমেই বিপদজনক করে তুলেছে। এ অবস্থায় বন্দীদল আর দাঁড়াতে পারছে না। তবু তাদের চলতে হচ্ছে রক্ষীদের তাড়নায়। তারা চলেছে হামাগুড়ি দিয়ে—বুকে হেঁটে চলেছে মানুষের মিছিল।

দিনটাও ছিল অস্বাভাবিক রকমের গরম। যেখানে গিয়ে থামার কথা সে স্থান তখনও অনেক দূরে রয়েছে। সবাই অবসন্ন ও হতাশ হয়ে বিশ্রামের জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়ল।

প্যাভলফ ও পালমা কাতর হয়ে পড়েছে। তারা কোন রকমে চলেছে টলে টলে একটা অস্বাভাবিক নিঃশব্দতার ভেতর দিয়ে। এলোমেলো পদতাড়ন শব্দ, হাতের বেড়ীর মৃদু ঝঙ্কার বুড়ো গ্রেগরির গাড়ীর ক্যাঁচ ক্যাঁচে—এবং চাকার চাপে পাথর গুড়ো হবার খচখচ আওয়াজ যেন এক অব্যক্ত বিতীষিকার সৃষ্টি করে তুলেছে। গাড়ীর উপর বসে রয়েছে বালিকা ভুসেনকা—তার কোলে সেই কালো বেড়ালটি। তারও যেন মুখের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। গাড়ী অস্বাভাবিক ঝাকুনিতে কেবল তার মাথার কোকড়ানো চুলগুলো কাঁপছে, মাথা দুলছে।

এই অবস্থায় হঠাৎ একটা চাঞ্চল্যকর সোরগোল উঠল। বন্দীদল সচকিত হয়ে ফিরে তাকাল—মুহূর্তের উচ্ছৃঙ্খলতায় প্রকাশ পেল রক্ষীবাহিনীর এলোমেলো হাকডাক ক্রুদ্ধ গালি-গালাজ তীত চকল হয়ে উঠল সকলে। কশাক সেনারা রাগে

আগুন হয়ে লাফিয়ে পড়ল বন্দীদলের উপর। এলোপাথাড়ি ভাবে বেয়নেট চালিয়ে মহাতঙ্কনে লাইন ভেঙে দিল। তারপর তারা ছুটে চলল বন-বাদাড় ভেঙে।—বনপ্রান্তে শোনা গেল রাইফেলের আওয়াজ।

দশবারো জন বন্দী পালাবার আশায় তাড়াহুড়ো করে সরে পড়েছিল। সম্ভবত আগে থেকেই তারা এই বন্দোবস্ত করে রেখেছিল এবং নিশ্চয়ই কোন সঙ্কেত পেয়ে এক সময়ে সটকে পড়েছিল। অক্লান্ত নিরীহ সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে পড়ল রাস্তায়। এই ক্ষণিক বিশ্রামেই তারা যেন যথেষ্ট শান্তি পেল—যদিও তার ফল খুব সুখের হবার কথা নয়।

কশাকদল ফিরে এল তাদের শিকার নিয়ে।—তিনটি মৃতদেহ আরও চারটি রক্তাক্ত শরীরে—আহত স্থান থেকে তখন রক্ত ঝরছে রাইফেলের কুঁদের আঘাতে মাথা গুড়ো হয়ে গেছে। আরও কেউ পালিয়ে তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল কি না—হাজিরা না ডাকা পর্যন্ত ঠিক বোঝা গেল না।

কশাকদলের ক্যাপটেন তখনও রাগে ফেটে পড়ছে। বন্দীরা একবার আড়চোখে তার গালাগালির মাপট লক্ষ্য করল পরে নতচোখে তাকাল মৃত ও আহত সঙ্গীদের দিকে। তাদের এমনভাবে ফেলে রাখা হয়েছে, ভবিষ্যতে যারা পালাবার মতলবে আছে তাদের মনে যেন এই দেখে বিভীষিকা জাগে এই আশায়।

বালিকা ভুসেনকাও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল—এই বিভীষিকা। ভয়ে বিস্ময়ে তার নীল চোখের দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে উঠেছে। হঠাৎ কি দেখে সে ব্যস্ত হয়ে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নীচে নেমে পড়ল। এক ছুটে সে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল একটি মৃতদেহের পাশে। পুসী বেড়ালটি তখনও তার কোলে।

—বাবা, বাবা……

বিকৃত ভাবে সে চেঁচিয়ে উঠল : ঐ অসভ্যেরা বুঝি তোমায় মেরেছে বাবা! আহা, এ কী করল ওরা। কথা বল বাবা……তুমি কি কথাও বলতে পারছ না……

বলতে বলতে মেয়েটি মৃতের বিকৃত মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল। তার বাবা—সংসারে এই তার প্রিয়……এই তার একমাত্র আপনার……এই তার আশ্রয়……

প্যাভলফ মেয়েটির কাছে এগিয়ে গেল।

—পিছু হটে দাঁড়াও।—ক্যাপ্টেন গর্জে উঠল উদ্যত দলবলের মধ্য থেকে। কিন্তু প্যাভলফ সে হুকুমে কানই দিলনা। মেয়েটিকে কোলে নিয়ে সস্নেহে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

—ভুসেনকা, তোমার বাবা তোমার মায়ের কাছে চলে গেছেন। সেখানেই তিনি থাকবেন।

—অ্যাঃ, সত্যি……

—হাঁ, তিনি বাড়ী গেছেন।

—বাড়ী গেছেন। তাহলে রাশিয়ায়।

—রাশিয়ার চেয়েও ভাল দেশ আছে। তিনি সেদেশে গেছেন।

—না, না। তাহলে আমাদের সঙ্গে নিয়ে গেলেন না কেন?

—তুমি পরে যাবে। তুমি ভালো মেয়ে হও……পর……

—তাহলে আমার এই পুসীও যাবে?—বলেই সে কোলের বেড়ালটাকে এমন ভাবে সোহাগে জড়িয়ে ধরল—যে তার ইচ্ছে, হয় তারা দুজনেই যাবে, নয়ত কেউ যাবে না।

—দেখা যাক্ তোমার পুসীও ভাল স্বভাবের হয় কিনা… তবে তো……

—কিন্তু ঐ দেখ, আমার বাবাকে নিয়ে লোকগুলো কি করেছে……

—এখন তাকে গাড়ীতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু ওতো একটা কঙ্কালসার দেহ মাত্র। আসলে তোমার বাবা অনেক আগেই তোমার মায়ের কাছে চলে গেছেন।

নেহাৎ বালিকা—এসব কথার কতটুকু আর বুঝতে পারে? অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল প্যাভলফের মুখের দিকে।

বুড়ো গ্রেগরি বলল : ওকে একবার আমার কোলে দাও। গাড়ীতে বসিয়ে দিলে ওর মন হালকা হবে—অত দুঃখ থাকবে না। এখন আমিই হব ওর বাবা—আমিই ওকে দেখাশোনা করব।

সঙ্গে সঙ্গে লম্বা পা ফেলে সবেগে তেড়ে এল ক্যাপ্টেন।

কিন্তু বালিকা সেদিকে লক্ষ্য করল না। সে বলতে লাগল বুড়ো মেষপালককে, না গো তুমি আমার বাবা নও। তুমি বরং দেখা শোনা করো……তোমার গাড়ী আমাকে কত ভালবাসে……

ক্যাপটেন এতক্ষণ রাগে কাঁপছিল। এবার কাঁপা স্বরে জিজ্ঞেস করল : তোমরা কে হে ? এতটা মেলামেশা এখানে কি নিয়ে ?

তারপর প্যাভলফের দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বলল : এই মেয়েটি কে ?

প্যাভলফ আঙুল দিয়ে একটি মৃতদেহ দেখিয়ে বলল : ওর বাবা ঐ পড়ে আছে।

—তাহলে আগেই তুমি লোকটাকে চিনতে ?

—মেয়েটিকে অনেকবার ওর কোলে দেখেছি—তাই চিনতাম।

—তুমিও ও দলের একজন—নিশ্চয়ই তুমি ঐ দলভুক্ত। দলের পাণ্ডাটি তাহলে কে ?

প্যাভলফ মাথা নাড়ল। আইন-কানুন আমি জানি, ওদলের কথা বললেই মৃত্যু…

—বলো, দলের নিষ্কৃতি করছি……যে কথা বলবে না… দাঁড়াও……

সঙ্গে সঙ্গে তার তীক্ষ্ণ নজর বন্দীদের উপর ঘুরতে লাগল। তারপর—হাঁ, মনে পড়েছে …তুমি।

ক্যাপটেন তার তর্জনী বেয়নেটের মতো খাড়া করে ধরল ইগনাজের বুকের উপর। ইগনাজ পুরোপো পাপী। আগেও সে একবার গাড়ী থেকে পালিয়েছিল।

—হাঁ, এদিকে এসো তুমি।

ওদের ভেতর তোমাকেই বড় চঞ্চল দেখাচ্ছিল—না ? তুমিই বুঝি দলের পাণ্ডা ?

ইগনাজ বলল : হাঁ হুজুর, আমিই প্রেসিডেন্ট। কিন্তু ও-কাজে আমি নেই—আমার মত নিয়ে হয়নি ও-কাজ। আমি চঞ্চল হয়ে তাদের বাধা দিয়েছিলাম। কেননা, ও কাজ নেহাৎ বোকামি ছাড়া কিছু নয়…

—হুঁ। এবার আমিই তোমায় খাস প্রেসিডেন্টের আসনে বসাব। শেকলবেড়ী সব নিয়ে এসো এদিকে। মন্ত্রণাসভার বসার আগে প্রেসিডেন্টের শেকলবেড়ী পরে নেওয়াই ঠিক হবে…

পর পর অনেকগুলো শেকল আর বেড়ী এনে ইগনাজের হাতে-পায়ে বেশ করে পরিয়ে দেওয়া হল। পাঁচজনের শেকলবেড়ী ওজনে পাঁচের বোঝা। পঞ্চতালিশ পাউণ্ড চাপানো হল একজনের ওপর। চলতে পারুক বা না পারুক—সে পরের কথা—

তারপর ক্যাপটেন নিজের চিহ্নহস্তের তারিফ করে বন্দীদের হুকুম করল—চলো—ইগনাজকে বানিয়ে দিল বন্দীদলের নেতা। দেহে পাঁচের বোঝা—এই নিয়েই তাকে চলতে হবে দলের পুরোভাগে সমান তালে পা ফেলে। বিদ্বেষের হাসি দেখা গেল নির্মম রক্ষীদের মুখে। এই অপূর্ব মিছিলের অগ্রগতি লক্ষ্য করে তারা বেশ আমোদ উপভোগ করতে লাগল।

মৃত ও আহতের বোঝা নিয়ে গাড়ীগুলো চলেছে পেছনে পেছনে। হঠাৎ মৃত্যুর করতালি শুনে যারা ঢলে পড়েছে তাদের শেষ নিঃশ্বাস জমাট হয়ে আবহাওয়াকে যেন ভোলাটে করে তুলেছে। গাড়ীগুলো আর গাড়ী নয়—ওদের মর্যাদা বেড়ে গেছে।—এখন সেগুলি শবাধার। বিভিন্ন রকমের বন্দীরা এখন আর আগের মতো নয়—তারা যেন চলেছে শব-যাত্রার মিছিল করে।

[ক্রমশঃ]

কুবের বিদায়

শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

—আমি শান্তি চাই—
বিত্তের স্তূপের মাঝে নাহি শান্তি নাই,।
রচেছি জীবন ভরি' অর্থের পাহাড়
অর্থের সন্ধানে কভু মানি নাই হার—
নয়নে দেখেছি শুধু সুবর্ণের জ্যোতি
জীবনে করেছি শুধু স্বর্ণের আরতি
শ্রবণে শুনেছি শুধু সুবর্ণের গান
চিরকাল করিয়াছি সুবর্ণ সন্ধান।
জীবনের শেষে আজ ফিরে দেখি হায়
জীবন ভরেছে মোর শুধু হতাশায়,
আনন্দের কণা নাহি—সুখশান্তি কোথা ?
অর্থরাশি আছে পড়ে'—পড়ে' আছে বাধা।
অর্থের আলেয়া লাগি' ঘুরিয়াছি হায়
জীবন ভরেছে তাই শুধু হতাশায়।
করেছি অর্থের পূজা ভরিয়া জীবন
অর্থেরে দেখেছি, তবু ভরে নাই মন।
স্বর্ণের দীপ্তিতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়
তবুও ভ্রুকুটি করে, করি হায়, হায়।
—কাঁদে মোর হিয়া—
স্বর্ণস্তূপে বসি' কাঁদে শান্তির লাগিয়া।
হে কুবের ! লহ ফিরে ভাণ্ডার তোমার
তোমারে পূজিলে নাহি ঘুচে হাহাকার।
জীবন ভরিয়া পূজা করিয়াছি হায়
জীবনের শেষে দেখি—বৃথায়—বৃথায়।
মণিমুক্তা রত্নরাজি সুবর্ণের তার
আমারে দিয়াছ তুমি ;—তব কোষাগার
সাধনায় তুষ্ট হয়ে' দিয়েছ আমারে
তথাপি ঘুরেছি আমি ধন অন্ধকারে।
রত্নতৃষ্ণাকাতরা অন্ধকার কূপ
পর্বত সমান জাগে সুবর্ণের স্তূপ,
সুবর্ণের রুদ্ধস্তূপে বন্ধ হয় শ্বাস
তথাপি উপায় নাই করিতে প্রকাশ
নিজের মনের ব্যথা,—লোকে ভাবে মনে
মোরে সম সুখী বুঝি নাহি ত্রিভুবনে।
নাহি প্রেম—নাহি স্নেহ নাহি দয়ামায়া
নাহি শান্তি—সুবর্ণের অন্ধকারচ্ছায়া
নিমেষে নিমেষে মোরে করিতেছে গ্রাস
হৃদয়ের মাঝে মোর জাগিতেছে ত্রাস।
সুবর্ণের বীভৎসতা দেখে নাই যারা
তব কৃপাকণাভরে লালায়িত তারা।
ভুলাও তাদের দিয়া সুবর্ণের স্তূপ,
দেখে নাই যারা তব বীভৎসস্বরূপ।
ভুলাতে চেওনা মোরে—ভুলিব না আর
ফিরাতে দিতেছি আজি ভাণ্ডার তোমার ;
তোমার প্রসাদ পেলে যারা তুষ্ট হয়
তোমার প্রসাদ লাগি' নিজেরে বিক্রয়
যাহারা করিতে পারে ;—আপনার প্রাণ
নিষ্ঠুর সুবর্ণ তরে করিতে পাষাণ
কাতর নহে যে জন—দাও হাতে তার
মোর হাত হ'তে তব ভাণ্ডারের ভার।
চাহিব না আমি—ফিরে যাব হেসে
পর্ণ কুটীরেতে ধীরে দরিদ্রের বেশে ;
কভু না চাহিব পুনঃ ভাণ্ডারের ভার—
স্বর্ণদীপ জ্বালি পুনঃ খুঁজিব না আর
তোমার ভাণ্ডারে শান্তি স্বর্ণস্তূপ মাঝে ;
বুঝেছি শান্তির কণা নাহি তব কাছে।
অর্থে সুখ আছে ভাবে অর্থহীন যারা
জানে না স্বর্ণের চাপে শান্তি যায় মারা।
স্বর্ণ বিনিময়ে শান্তি কিনিবারে চায়—
বিফল হইয়া শেষে করে হায় হায়।
চাহিনা তোমারে আমি—আমি শান্তি চাই—
কণামাত্র শান্তি তব ভাণ্ডারেতে নাই—
ছাড়িয়াছি তাই তব ভাণ্ডারের ভার—
আমি শান্তিকামী—অর্থ নাহি চাহি আর।
লভেছি গভীর শান্তি ছাড়িয়া তোমায়
কুবের ! ফিরিয়া যাও, তোমারে বিদায়।

সুভাষচন্দ্র—সরকারী ভাপ নিউজ এজেন্সীর এক সংবাদে প্রকাশ যে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বিমান দুর্ঘটনার ফলে একটি জাপানী হাসপাতালে মারা গেছেন। এই সংবাদে সমগ্র ভারতবর্ষে গভীরতম শোকের ছায়া পড়েছে—রাষ্ট্রপতি আজাদ থেকে দীনতম মজুরটি পর্যন্ত এই সংবাদে গভীর ভাবে বিচলিত হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করায় কংগ্রেস তাঁকে ত্যাগ করেছিল কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার উগ্র পূজারী হিসাবে তাঁর স্থান চিরদিনই এদেশে উচ্চে ছিল। আজ সমগ্র ভারতবাসী স্বদেশের জন্য তাঁর অসামান্য আত্মত্যাগ, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য তাঁর আমরণ সংগ্রামের কথা স্মরণ করে শোক প্রকাশ করছে। জাপান ও জার্মানীর সাহায্যে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্য গ্রহণ করেছিলেন এবং এরূপ চেষ্টার উদাহরণ আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে রয়েছে। অবশ্য কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনির্ভরশীল হওয়াতেই বিশ্বাসী।

আমাদের দেশের স্বাধীনতা চেষ্টাকে খাটো করে যারা একনায়কতন্ত্রবাদী ষ্টালিনের দেশের স্বার্থকে বড় দেখে সেই তথাকথিত 'ভারতীয় কম্যুনিষ্টরা' সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদে সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে বিপুল শোকোচ্ছ্বাসের পরিচয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা এর ভেতর রাষ্ট্রপতি আজাদ, পণ্ডিত নেহরু থেকে সুরু করে' সকলের ভেতরই ফ্যাসিবাদ প্রীতির দৃষ্টান্ত দেখতে পেয়েছেন! এঁদের নিজেদের মানসিক দৈন্যের যে পরিচয় এঁরা দিচ্ছেন তাতে এঁদের ভারতবাসী বলে পরিচয় দিতে ঘৃণায় ও লজ্জায় সকলেরই মাথা নুয়ে আসে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর যে সরকারী নিষেধাজ্ঞা ছিল তা একই দিনে প্রত্যাহৃত হয়েছে। গত ৩রা সেপ্টেম্বরে বিপিসিসি'র কার্যকরী সমিতির প্রথম অধিবেশন অস্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্তের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা আশা করি বাঙ্গালার কংগ্রেস কর্মীরা দলাদলি ভুলে কংগ্রেসের আদর্শকে নিজের সঙ্গে নিজেদের জীবনে ও কার্যে ফলবতী করবার জন্য প্রস্তুত হবেন।

এ প্রসঙ্গে বোম্বাই, দিল্লী ও যুক্তপ্রদেশ তাদের কার্যকরী পরিষদ থেকে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্যদের বিতাড়িত করে যে সদ্দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন সে বিষয়ে বাংলার কংগ্রেস কর্মীদের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করছি। বোম্বাই কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাটীল বলেছেন যে এই সব কম্যুনিষ্টরা কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞাপত্র সই করেও নিজেদের কার্য দ্বারা সর্বদাই তাকে লঙ্ঘন করেছেন। এঁরা কংগ্রেসের অহিংস প্রচার, খদ্দর ও চরকা নীতিতে কোনোদিনই আস্থা স্থাপন করেন নাই, সবার উপরে ভারত আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের নির্দেশ কেবল অমান্যই করেন নাই তার বিরুদ্ধাচরণও করেছেন। এঁদের আত্মসম্মান জ্ঞান থাকলে এদের উচিত ছিল কংগ্রেসের আনুগত্য অস্বীকার করা অথবা নিরপেক্ষভাবে অবলম্বন করা। এঁরা তার কোনোটাই করে নাই। ১৯৬২এ কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্যরা যে ভাবে কাজ করেছেন তাতে এটা সুস্পষ্ট হয়েছে যে কংগ্রেস সভ্যদের আনুগত্য ও নিষ্ঠা অবিভাজ্য (undivided and indivisible allegiance) হওয়া দরকার। অপর কোনো দলের সভ্য কংগ্রেসের সভ্য হতে পারবে না—এবিষয়ে কংগ্রেস সদস্যদের সতর্ক থাকার প্রয়োজন। এবারে কম্যুনিষ্ট ও র‍্যাডিকালরা যা করেছে ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় 'ভারতসেবক সংঘ'এর নাম দিয়ে অনুশীলন পার্টি'র দল ঠিক তাই করেছিল এবং ১৯৩৯-৪০এ 'ফরোয়ার্ড ব্লক'ও তাই করেছে! কংগ্রেসের কর্মকর্তা হয়েও কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞা ও কংগ্রেস সভ্যতাকে খুসীমত পরিবর্তন করেছে। তাদের এই মনোভাব প্রমাণ করে যে তাদের কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য ছিল গৌণ—অপর কোনো দলের প্রতি আনুগত্য ছিল তাদের কাছে মুখ্য। এই

মনোভাবের ফলে কংগ্রেসকে ভাঙিয়ে ঐ দল দলকে বড় করার চেষ্টা করা স্বাভাবিক। এবং তাতে বাধা পড়লেই আবার এরা কংগ্রেসকে ভাঙবার চেষ্টা করবে—অতীতেও ঠিক এই চেষ্টাই করেছে। এই ধরণের experiment পর পর চলতে দেওয়া অর্থ কংগ্রেসকে সবল করার চেষ্টা নয়,—তাকে টেনে গুমে ডুবান করা। এজন্যই বোম্বাই, দিল্লী, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানের কংগ্রেস কমিটি এদের বহিষ্কৃত করেছে। বাংলার কংগ্রেস কমিটীর দৃষ্টি আমরা এদিকে আকর্ষণ করছি। যারা গত আগষ্ট আন্দোলনের সময় কংগ্রেসের নির্দেশ অমান্য করেছে বা তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে বাংলার কংগ্রেসকে তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়হস্তে কাজ করতে হবে। এমন কি যে সব কংগ্রেসকর্মী এই সব কংগ্রেস বিরোধীদের সঙ্গে মিশে কাজ করতে চায় বা যায় তাদের সতর্ক করে দিতে হবে যে কংগ্রেস তাদের এই আচরণকে উপেক্ষা করবে না। কংগ্রেস এমন কর্মী চায় না যে দুনৌকায় পা দিয়ে চলতে চায়। ২৪ পরগণা, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের কোনো কোনো কংগ্রেসকর্মী কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এরকম কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে হাত মিলাতে গিয়েছে; এ জাতীয় কর্মীদের কংগ্রেসে যে স্থান নেই এই কথাটা আমাদের এখনই পরিষ্কার করে বলবার সময় এসেছে। প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আমরা এদিকে আকর্ষণ করছি।

কুচবিহার—ভারতবর্ষের করদ রাজ্যগুলি বিস্তীর্ণ ভারত সাম্রাজ্যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ইতস্তত বিচ্ছিন্ন দুর্গের কাজ করে। সামন্ত-নরপতিরা সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্বেচ্ছাতন্ত্রকে আঁকড়িয়ে ধরে আছে। সুতরাং কলেজে ঢুকে কুচবিহারের রাজকীয় সেনারা অধ্যাপক ছাত্র ও ছাত্রীদের যে মারপিট করেছে এটা সেখানকার হিসাবে একটা খুব অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু এটা আমাদের কাছে বিস্ময়ের ও লজ্জার ব্যাপার বলে মনে হয় যে ছেলেরা শুধু মারই খেল—একটা বর্বরকে খায়েস করবার মত শক্তিও কি এই এতগুলি ছেলের ছিল না? তাদের আত্মরক্ষার অধিকারও কি নেই? না, সে-সময়ও তারা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করছিল! অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা দাঁড়াতে না শিখল তারা শিখল কি? ধিক তাদের!

সমস্ত বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ কুচবিহারের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। সারা বাংলার ছেলেরা ও মেয়েরা যে এখনও বেঁচে আছে এই প্রতিবাদ সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিল।

'আজাদ হিন্দ' সৈন্যদল—শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে প্রাচ্যে যে আজাদ হিন্দ সৈন্যদল গঠিত হয়েছিল তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেশের লোক অত্যন্ত চঞ্চল হয়েছে। এদের ভেতর যেসব ভারতীয় সৈন্য জাপানের হাতে বন্দী হয়েছিল তাদের অনেকে আছে; এ ছাড়া সুদূর প্রাচ্যে যে সব ভারতবাসী ব্যবসায় প্রভৃতির জন্য বাস করতেন তাঁদের অনেকেও আছেন। রাষ্ট্রপতি আজাদ, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রভৃতি কংগ্রেস নেতাদের মতে এবং শ্রীযুক্ত পি. এন্ সাপ্রু প্রভৃতির ন্যায় বিশিষ্ট ব্যবহারজীবদেরমতে এদের যুদ্ধবন্দী হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করা হবে কিন্তু পদস্থ কর্মচারীদের সামরিক আদালতে বিচার করা হবে। এদের অধিকাংশ আমাদের পরাধীনতা থেকে মুক্ত করবার জন্যই স্বাধীন ভারত সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলেন সেইজন্যই এঁদের বিরুদ্ধে কোনো দণ্ডাদেশই ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী কোনো লোক চাইতে পারে না। কিন্তু এদের ভার পড়েছে ইংরেজ সরকারের উপর—আমাদের দেশবাসীর উপর নয়। এদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের লক্ষ্য সম্বন্ধে ইংরেজ সরকারও ভারতবাসীর আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত সেজন্যই এইসব সৈন্যদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেশবাসী কোনো রকমেই নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। সাধারণ সৈনিকদের অধিকাংশকেই হয়ত ছেড়ে দেওয়া হবে কারণ এরা যে শ্রেণী থেকে আসে এদেশের সৈন্যদল সাধারণতঃ সেই শ্রেণী থেকেই সংগৃহীত হয়; সুতরাং ভবিষ্যৎ সৈন্যসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রেখেই যে এই ব্যবস্থা হয়েছে তাতেও সন্দেহ নেই; কিন্তু এদের নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধে যে সে কথা খাটে না তা আমরাও জানি, আমাদের প্রভুরাও জানেন। সুতরাং জেনারেল অ্যারের স্বশ্রেণীয় বিচারে যে এদের কি অবস্থা হবে তা আমাদের বুঝতে বিশেষ বাঁকী নাই। তবে সিপাহী বিদ্রোহীর সময় যেমন সরাসরি গাছে ঝুলিয়ে ব্রিটিশের সুবিচার ও দয়া আমাদের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদের দেখান হয়েছিল তা' না দেখিয়ে যে

এদের কাঠগড়াতে দাঁড় করান হবে এতেই আমরা আমাদের প্রভুদের ন্যায়বিচারের জন্য ধন্যবাদ দেব।

মুক্তি রাজবন্দী—জাতীয় স্বাধীনতার যে সব পৃতাত্মীরা ধীরে ধীরে কারাপ্রাচীর থেকে বেরিয়ে আসছেন তাঁদের ও তাঁদের পরিবারদের ভরণপোষণ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এদের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে যে নিঃশেষিত হয়ে যায় নাই, এই কথাটা আমরা বাঙ্গলার হোম ডিপার্টমেন্ট ও মিঃ কেসীর পরামর্শদাতাদের বলতে চাই। অনেক রাজবন্দীর পরিবারকে যে ভাতা দেওয়া হত তাঁদের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সে ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এটা অত্যন্ত অন্যায় ও কোনো রকমেই যুক্তিসঙ্গত নয়। দ্বিতীয়তঃ যে সব রাজবন্দীদের কোনো ভাতা দেওয়া হত না সে সব রাজবন্দীদেরও মুক্তির পর অন্ততঃ কিছুদিন পর্যন্ত একটা ভাতা দেওয়া সরকারের কর্তব্য। অনেক রাজবন্দীকে নানা রকমের বিধিনিষেধের বাঁধনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে অথচ তাঁদের ভাতা বন্ধ করা হয়েছে। এঁদের জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করাও সরকারের কর্তব্য। কোনোরকম বিচার না করে স্বাধীনতা হরণ করার গুরু দায়িত্ব যে গভর্ণমেণ্ট নিতে পারে সত্যতা ও মানবতার দাবীতে সেই গভর্ণমেণ্ট এঁরা যতদিন উপার্জনক্ষম না হন ততদিন পর্যন্ত তাঁদের ভাতা দিতে বাধ্য।

শ্রীমতী বীণা দাস

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও যুদ্ধ—পরাধীন দেশে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকে বৎসামান্যই; যুদ্ধের অজুহাতে তারও আবার বহুল সংকোচ হয়েছিল ভারতরক্ষা আইনের আইনচীন আদেশগুলিতে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এসব আদেশগুলি ব্যাপকভাবে যে কবে সরকার প্রত্যাহার করবেন তার কোনো ইঙ্গিতই দিচ্ছেন না। গতবার যুদ্ধের পর ভারত-রক্ষা আইনের অনেকগুলি নির্দেশকে স্বাধীভাবে আইনে পরিণত করার যে প্রয়াস রৌলট বিলের সাহায্যে করা হয়েছিল, এবার সে রকম কোনো ব্যাপক চেষ্টা বোধ হয় হবে না।

কিন্তু দেশের লোককে এখন থেকেই সতর্ক হতে হবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বক্তৃতার স্বাধীনতা, সভাসমিতির স্বাধীনতা সর্বাগ্রে চাই। কাগজের অভাব এখন প্রায় মিটে গেছে। সুতরাং Newsprint Control Order, Newspaper Control Order, 1942 এবং Paper Control (Economy & Distribution) Order প্রভৃতি এখনও বজায় রাখার কোনো অর্থ হয় না। 'ফরোয়ার্ড' 'সংহতি' প্রভৃতি সংবাদপত্রগুলিকে প্রকাশ করবার অনুমতি না দেওয়ার কারণ কাগজের অপ্রতুলতার মধ্যে নেই বলেই দেশের লোকের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে। ভারতরক্ষা আইনের এই জাতীয় অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে দেশের লোককে এখনই দাঁড়াতে হবে। এ বিষয়ে আমরা বাংলা সরকারের কাগজ সম্বন্ধীয় স্পেশাল অফিসার ও বাংলার হোম ডিপার্টমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাঁদের কর্তব্য এখনই ভারত সরকারকে এই আদেশগুলি উঠিয়ে দেবার জন্য লেখা।

সুস্বাগতম—'মন্দিরা' পরিচালিকা শ্রীযুক্তা বীণা দাসকে আমরা সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। গত ৬ই সেপ্টেম্বর তিনি প্রেসিডেন্সি জেল থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। আগষ্ট অভ্যুত্থানের প্রথমেই কংগ্রেসের আদেশে যাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি তাঁদেরই একজন।

সাপ্তাহিক 'ফরোয়ার্ড' সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র ভৌমিক, সহঃকর্মসচিব শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়, শ্রীরবি বসু, শ্রীশরৎচন্দ্র দত্ত, ডাঃ নিশিকান্ত গাঙ্গুলী প্রভৃতি কংগ্রেসের বহু পুরাতন কর্মী পুনরায় আমাদের ভেতর ফিরে এসেছেন। তাঁদের সকলকেই আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

আগামী সাধারণ নির্বাচন—এই বৎসর শেষ হবার আগেই সমগ্র ভারতবর্ষে সাধারণ নির্বাচন হবে। কিন্তু নির্বাচনের জন্য যে ভোটার তালিকা তৈরী হয়েছে সে তালিকা চার বৎসর আগের পুরাণো তালিকা। এখন যাদের ভোট দেবার যোগ্যতা হয়েছে এই পুরাণো তালিকাতে তাদের অনেকের নাম নেই। ২১শে সেপ্টেম্বরের ভিতর নিজ নিজ জেলার কর্তৃপক্ষের কাছে ভোটার তালিকায় নাম সন্নিবেশ করবার জন্য আবেদন করতে হবে। ভারত সরকারের কর্তব্য যে সাধারণ নির্বাচন মাস কয়েকের জন্য বন্ধ রেখে নতুন করে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা। যুদ্ধের সময় দেখা গেছে জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যকে সংকুচিত করে খুব তাড়াতাড়ি যুদ্ধের দরুণ অনেক কিছু করা সম্ভবপর হয়েছে। লর্ড এবাডেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সহরকে বিদেশী ও দেশীদের চোখে সভ্যতব্য করবার জন্য সহর থেকে কেমন সামরিক তৎপরতার সঙ্গে সমস্ত ভিখারীদের সরিয়ে ফেলেছিলেন সেটা দেশবাসীর স্মরণ আছে। সুতরাং সেই সামরিক তৎপরতার সঙ্গে খানিকটা কর্মদক্ষতা মিশ্রিত করে নতুন করে ভোটারদের তালিকা তৈরী করতে তিনি আদেশ দিলেই ত হয়। গণতন্ত্রবাদকে ফ্যাসিবাদের বাহন যখন তিনি করতে চান না তখন পুরাণো ভোটার তালিকা ছিঁড়ে ফেলে নতুন তালিকা করাতেই ত তাঁর সদিচ্ছার প্রমাণ হবে।

একটি শোচনীয় ঘটনা—ঝিনাইদহের ছাত্র-কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীমান্ জ্ঞানপ্রকাশ বসু আত্মহত্যা করেছেন। স্থানীয় বস্ত্রসংকটের প্রতীকারকল্পে আন্দোলন করার 'অপরাধে' স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্কুল থেকে বহিষ্কৃত করেন। কর্তৃপক্ষ যখন এ বিষয়ে অত্যন্ত অনমনীয় মনোভাব অবলম্বন করেন, তখন সে মর্মাহত হয়ে আত্মহত্যা করে। স্কুল-কর্তৃপক্ষের এই আচরণ যে সর্বথা নিন্দনীয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীমান্ জ্ঞানপ্রকাশের শোকসন্তপ্ত আত্মীয়দের আমাদের সহানুভূতি জানাচ্ছি।

খাজা নাজিমুদ্দিন—মিঃ কেসীর পরামর্শদাতারা বলতে পারেন কি যে থিয়েটার রোডের সরকারী বাড়ীতে খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব এখনও কেমন করে থাকতে পাবেন? প্রধান মন্ত্রী বলে' তিনি নাম মাত্র ভাড়ায় থিয়েটার রোডের যে প্রাসাদোপম সরকারী বাড়ীতে ছিলেন মন্ত্রীত্ব থেকে বিতাড়িত হবার পরও তাঁকে কেন সে বাড়ীতে থাকতে দেওয়া হয়েছে? তাঁর নিজের বাড়ী কলকাতাতে আছে—সে বাড়ীতে তিনি ভাড়াটে বসিয়ে নিজে নাম মাত্র ভাড়ায় সরকারী বাড়ীতে আছেন। এটা কি মিঃ কেসী ও তাঁর পরামর্শদাতাদের অনুমতি নিয়ে হয় নাই?

আরেকটা কথা, ডিরেক্টর অফ পাব্লিক ইনফরমেশন মিঃ আলতাফ আলি মুসলীম লীগের মুখপত্র 'ডন' কাগজে চাকরী নিয়ে পদত্যাগ পত্র তিনমাস পূর্বে দিলেও তাঁর পদত্যাগপত্র কেন সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করা হয় নি? সরকারী চাকুরীতে থাকাকালীন তিনি দিল্লী কন্‌ফারেন্সে 'ডন' কাগজের প্রতিনিধি হিসাবে গান্ধিজী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কি দেখা করেছিলেন বা করতে চেয়েছিলেন? মুসলীম লীগকে এভাবে প্রশ্রয় দেবার কি অর্থ হতে পারে? আমরা আশা করি যে মিঃ কেসীর পরামর্শদাতারা এবিষয়ে তাঁদের বক্তব্য শীঘ্রই দেশবাসীকে জানাবেন।

ভ্রম সংশোধন—পৃষ্ঠা ২৫৪, ১০ম পংক্তিতে "দমধিত হয়" স্থলে "দমধিত নয়" হইবে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'অগ্নিবীণা'র কার্যালয় ৩৯নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

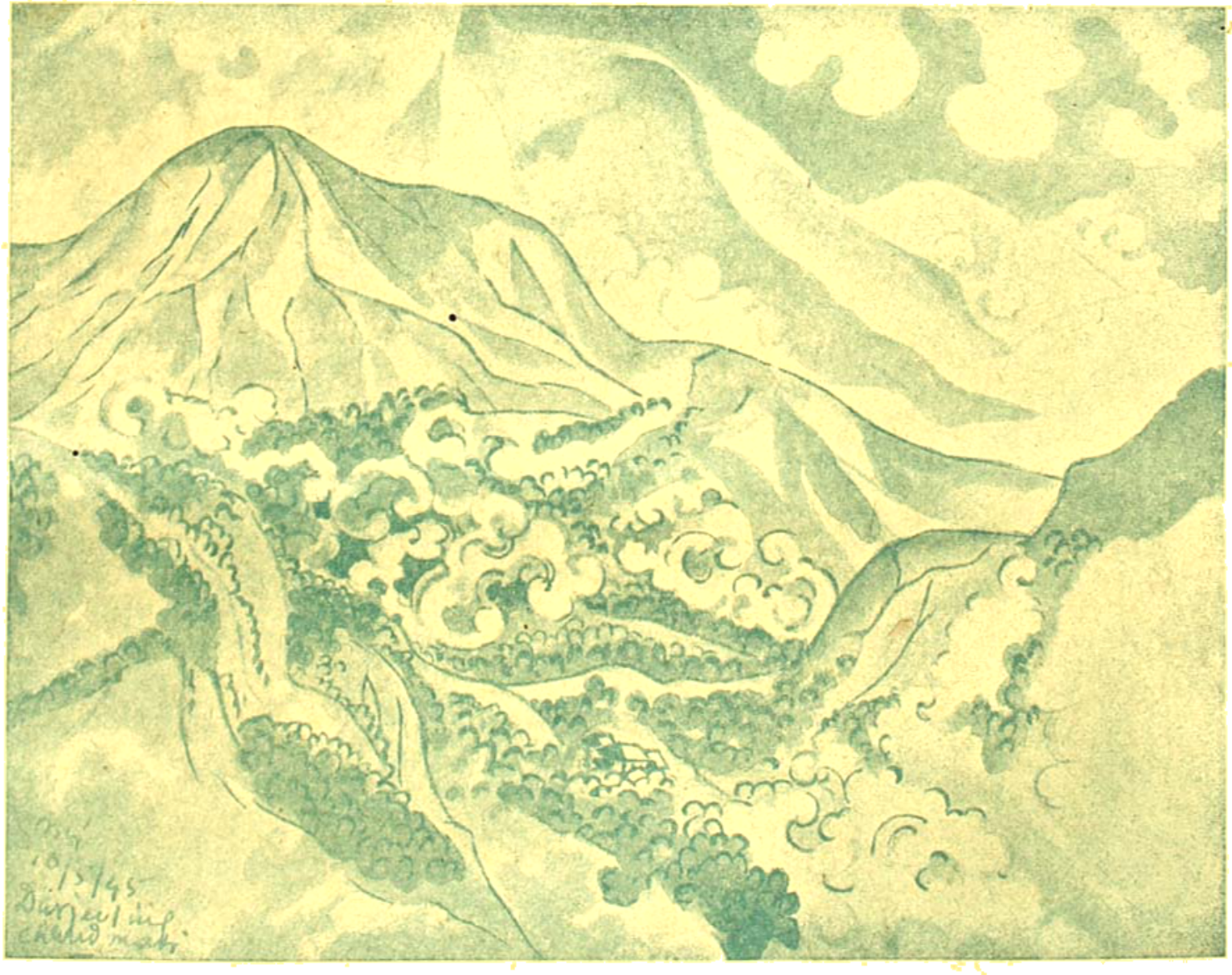

দার্জিলিংএ মেঘের খেলা

রাণী চন্দের সৌজন্যে

শিল্পী—শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু

অষ্টম বর্ষ | শারদীয় সংখ্যা—১৩৫২ | ৭ম সংখ্যা

কংগ্রেসের পুনর্গঠন

শ্রীঅঃ

আজ প্রশ্ন উঠেছে—কম্যুনিষ্টদের কংগ্রেসে স্থান দেওয়া উচিত কি না। এতদিন কম্যুনিষ্ট পার্টি ব'লে কোন প্রকাশ্য দল ছিল না; আজ সরকারের তাঁবেদারীতে এরা প্রকাশ্য দল হিসাবে দাঁড়িয়েছে এবং সরকারী অনুগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পুষ্টিলাভ করছে। গত দুই বছর সরকারের একান্ত বশংবদ হ'য়ে, এমন অনেক কাজ এরা করেছে, যার ফলে বিদেশী রাষ্ট্র-শক্তির কৃপা ও প্রসাদ এদের উপর পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে; কিন্তু ঠিক সেই সব কাজের ফলেই জাতির নিকট এরা এই বিদেশী সরকারের একটি বেসরকারী অঙ্গ বলেই গণ্য হয়েছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার জারিষ্ট সরকারের যেমন ছিল Black Hundred, ইটালির ফ্যাসিষ্ট সরকারের যেমন ছিল Black Shirt, নাজী জার্মানীর যেমন S.S.—বর্ত্তমানে ভারতীয় সরকারেরও তেমনি এক বা একাধিক তাঁবেদারী দল পোষণ করা দরকার হ'তে পারে। সরকারের একান্ত অনুগত যারা, তারাও কম্যুনিষ্টদের অতিভক্তি দেখে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়েছে। তাই স্যার নৃপেন সরকারও লিখেছিলেন—"আজ শাসকতন্ত্র সাম্যবাদকে কি দৃষ্টিতে দেখেন অথবা সাম্যবাদ কতখানি দেশের জনসাধারণকে প্রভাবিত করিতে পারিয়াছে, তা জানি না। কিন্তু ইহা জানা শক্ত নহে যে, বর্ত্তমানের ভারতীয় কম্যুনিষ্ট শুধুমাত্র সরকারের অস্ত্রস্বরূপ এবং তাহা শুধু শাসক সম্প্রদায়ের প্রচার-কার্য্যের জন্যই নিযুক্ত—এমন একটি অস্ত্র যাহার সাহায্যে প্রয়োজন হইলে কংগ্রেসকে দুই চারি ঘা পিটাইয়াও দিতে পারা যায়।" (ভারতবর্ষ চৈত্র—১৩৫০)! এই উক্তি অনুযায়ী ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে Black Hundredএর পার্থক্য কোথায়?

যখন রাষ্ট্রীয় অবহেলায় ও দুরদৃষ্টহীনতায় অকালে লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধের রথচক্রতলে অনাহারে প্রাণ দিয়েছে, তখনও তারা তোতাপাখির মতো প্রচার করেছে—এটা জনযুদ্ধ। যে সব দেশে এই বিশ্বযুদ্ধ জনযুদ্ধ না হলেও অন্তত জাতীয় যুদ্ধ, সে সব দেশে একটি লোকও অনাহারে বা মহামারীতে এমনি-ভাবে মরে নি; চীনের মতো এমন অগোছালো বিশৃঙ্খল রাষ্ট্রের নায়কগণ পর্যন্ত বলতে পারছেন যে, একটি লোকও অনাহারে বা মহামারীতে এমনিভাবে মরে নি। আর আমাদের দেশে—যুদ্ধ যেখানে প্রকৃতভাবে ভারতভূমির প্রান্ত ছাড়িয়ে ভিতরে প্রবেশ করে নি—লক্ষ লক্ষ লোক অসহায় কীট-পতঙ্গের মতো অনাহারে মরেছে। তারপর মরেছে ও মরছে—মহামারীতে, রোগে, বিনা চিকিৎসায়, বিনা পথ্যে। তবুও এদের সহযোগিতার নীতি, policy of collaboration ব্যাহত হয় নি, তখনও এদের জনযুদ্ধের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে নি। প্রতি পদে পদে এরা জাতির স্বাধীনতা প্রচেষ্টাকে বাধা দিয়েছে, ঐ প্রচেষ্টার প্রতি বিরুপতা করেছে। লেনিন বলেছেন—"One cannot jump out of an imperialist war, one cannot attain a

democratic unoppressive peace without overthrowing the power of capital—without the state power passing to a different class." অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে কেউ লাফিয়ে বের হ'তে পারে না। ওখান থেকে বের হবার সত্যিকার গণতান্ত্রিক শান্তি স্থাপন করবার একমাত্র উপায় হ'ল বিপ্লবের ভিতর দিয়ে রাষ্ট্রাধিকারী ধনিকশ্রেণীর হাত হ'তে বৃহত্তর অপর এক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা আহরণ করা। ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের পক্ষে ঐ ভ্রমসাধ্য পন্থায় চলবার কষ্টস্বীকারের প্রয়োজন হয় নি; তারা এক সুপ্রভাতে দৈববাণীর মতো প্রত্যাদেশ পেয়ে এক লাফেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকে জনযুদ্ধের স্বর্গলোকে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। লেনিন বলেছেন,—"……the social character (of the war) is determined not by the good wishes but by the class character of the Government that wages the war." অথচ এরা dialectical fatalism এর—যাকে বলা হয় pseudo-Marxist theory—আশ্রয় নিয়ে ঠিক করল, চার্চিল-এমেরির দল রাতারাতি সদিচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ("out of good wishes") এই যুদ্ধকে ভারতের পক্ষে জনযুদ্ধ করে তুলবেন। এদের এই যুক্তি ও মনোভাবের সঙ্গে তুলনীয় একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই—অবশ্য ঐ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ক্রোপট্‌কিনের (Kropotkin) সঙ্গে এদের তুলনা করা চলে না। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে মস্কোতে প্রতিক্রিয়াশীলদের এক সম্মিলনীতে ক্রোপট্‌কিন তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনাকে নস্যাৎ করে যুদ্ধের স্বপক্ষে বক্তৃতায় বলেছিলেন—"All are beginning to understand that we must build a new life on new socialist principles……Lloyd George is making speeches imbued with socialist spirit…… In England, in France and in Italy there is forming a new comprehension of life imbued with socialism." হায় ক্রোপট্‌কিন্! জীবনের সব সাধনা বিসর্জন দিয়ে যে সোশিয়ালিজ্‌মের ধূয়া তুমি দেখেছিলে, কয়েক বছরের মধ্যেই প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন ফ্যাসিবাদের দমকা হাওয়ায় তা উড়ে গেল। আজকার জনযুদ্ধওয়ালাদের দুরাশাও এমনি ভাবে ব্যর্থ হবে। লেনিন বেঁচে থাকলে আজ বলতেন, ইংলণ্ডের পক্ষেও এই যুদ্ধ জনযুদ্ধ নয়—তার প্রমাণ চার্চিলের প্রখ্যাত উক্তি, সাম্রাজ্যের দোকানদারি গুটিয়ে নেবার জন্য তিনি প্রধান মন্ত্রী হন নি এবং ব্রিটেনের অধিকারে যা আছে তার একতিলও তিনি হাতছাড়া করবেন না। লেনিন আজও এই ধ্বনিই তুলতেন—"Turn this global war into a global civil war." কিন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থ যখন মনকে আচ্ছন্ন করে, তখন স্থূল বুঝবার অবকাশের অভাব হয় না; তাই এরা আজ সহজেই ভুল বুঝতে রাজী হচ্ছে। নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থে অন্ধ হ'য়ে জাতীয় স্বার্থ ও নিজেদের ব্যক্তিগত আত্মসম্মান এরা বিক্রি করেছে।

সে কথা স্বতন্ত্র। তারা একটা ভিন্ন রাজনৈতিক দল; নিজেদের নীতি ও কর্মপন্থা—তা যতই স্বার্থদুষ্ট হ'ক, যতই বিকৃত হ'ক, যতই বিপ্লববিরোধী হ'ক—তা অনুসরণ করার অধিকার তাদের আছে। সব দেশেই বিপ্লব যখন আসন্ন হয়, জন-অসন্তোষ যখন গভীর ও ব্যাপক হ'য়ে দানা বাঁধতে সুরু করে, তখন প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রশক্তি এমনি কিছু কিছু সেনানী সংঘ ও শক্তি নিজেদের অধিকারে ও আয়ত্তে রাখে। রাষ্ট্রশক্তির এই অপকৌশল সুবিদিত এবং এর জন্য তার দোষানুসন্ধান করাও নিরর্থক। তার স্বার্থরক্ষার নীতি অনুসারেই রাষ্ট্রশক্তি সর্বত্র ইহা করেছে। বড় বড় কথায় আচরণে সাম্রাজ্যনীতি কি ভাবে যে নিজেদের তাঁবেদারী দল গঠন করে, ইংরেজের সাম্রাজ্যিক ইতিহাসে বরাবরই তা' দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার তথা ভারতের চূড়ান্ত ও চিরন্তন দারিদ্র্যের সঙ্গে তাল রেখে একটা দৃষ্টান্ত আইরিশ ইতিহাস থেকে এখানে উদ্ধৃত করছি। রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব আইরিশ জাতীয় জীবনে বরাবরই প্রবল ছিল, এবং ইংরেজ বরাবরই এর প্রভাব নষ্ট করবার চেষ্টা করেছে। এই উদ্দেশ্যে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের বুলি নিয়ে ইংরেজরা ওখানে Charter schools নামে এক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। জাতীয় ভাবাপন্ন রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব থেকে আইরিশ বালক-বালিকাদের মন মুক্ত করার জন্য এরা সরকারের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ পেত। "The Society proposed to the

poor parents to take their half-starving children for education and technical training. It was found that in seasons of famines when Catholic parents saw their children drooping with hunger and were unable to obtain them bread, they sent them to these schools and withdrew them when the pressure was past. To prevent this a new law was made—the parents lost all control over their children if once placed in these schools."

এই সব স্কুলের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল—"spreading education"—শিক্ষা বিস্তার এবং "to rescue the souls of thousands of poor children from the dangers of Popish superstitions and idolatry,—"পৌত্তলিকতা ও পোপীয় কুসংস্কার হতে হাজার হাজার দরিদ্র শিশুদের আত্মাকে রক্ষা করা। বড় বড় কথার আবরণে দেশের দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে রাজশক্তির অনুগ্রহে কি করা যায় তার প্রমাণ এবার ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য সরকারী অনুগ্রহপুষ্ট বহু দল দিয়েছে। কম্যুনিষ্ট পার্টি কোন্ উদ্দেশ্যে কোন্ স্বার্থের তাড়নায়, কোন্ নীতিতে কি করবে, বা সরকার কোন দল বা পার্টিকে তার প্রসাদ দিয়ে পোষণ করবে, তা কংগ্রেসের বিচার্য বা আলোচ্য বিষয় নয়। এটা তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে পরাধীন দেশে বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির সম্মতি, সমর্থন ও সাহায্য নিয়ে যে রাজনীতি চলে, তা জাতির স্বার্থের অনুকূল হয় না এবং আমাদের দেশে সেই রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেস নীতির বিরোধী। এমনি রাজনীতি যারা করছে, কংগ্রেসে তাদের স্থান হ'তে পারে কি না, তাই কংগ্রেসের বিচার্য।

পুরানো নজিরের বলে যুক্তি দেখানো হচ্ছে, কংগ্রেসে তো বরাবরই বিভিন্ন দলের ও মতের লোকের স্থান ছিল,—কাজেই এখন থাকবে না কেন? এটা কোন যুক্তি নয়, এটা হ'ল sophistry—অপযুক্তি। বালো মানুষ যা করে, যৌবনে তা সে করে না; প্রৌঢ় বয়সে তার আচরণ হয় আবার অন্য রকম, বার্দ্ধক্যে আরও পরিবর্তন সাধন করতে হয়। যখন রাজনৈতিক চেতনা দেশে প্রায় ছিল না বললেই হয়, যখন কংগ্রেস ছিল মাত্র উচ্চশ্রেণীর অবসর-মতো রাজনৈতিক আবেদন পেশ করবার প্রতিষ্ঠান, তখনকার দিনের নজির দেখানো আজকের দিনে নিতান্ত বাজে ও নিষ্ফল মনের পরিচয়। এমন কি ১৯৪০ সালেও কংগ্রেস যা ছিল, ১৯৪২ সালের পর কংগ্রেস ঠিক তা আর নেই।

একটা কথা হামেশাই শোনা যায় যে, কংগ্রেস হ'ল জাতীয় প্রতিষ্ঠান, জাতির সর্বব্যাপক সংস্থা (National organisation)—কাজেই সর্বদল, সর্বশ্রেণীরই স্থান এতে আছে। এঁদের যুক্তি হ'ল, কংগ্রেস কোন পার্টি বা দল নয়, ইহা নিখিল ভারতীয় সংঘ। তাঁরা বলতে চান কংগ্রেস যদি এক-দল প্রতিষ্ঠান (one-party organisation) হয় তবে তার জাতীয় চরিত্র নষ্ট হবে। জাতীয়তার এটা হল বিকৃত ব্যাখ্যা। সেই হিসাবে আজও কংগ্রেস জাতীয় সংস্থা নয়—কারণ মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, লিবারেল ফেডারেশন, প্রভৃতি দলের স্থান এতে নেই। কংগ্রেসের বিপ্লবী জাতীয় চরিত্র নির্ভর করছে তার গণতন্ত্রের উপর—নিপীড়িত জনমনের অবচেতন বাসনা ও আকাঙ্ক্ষাকে সচেতন করে তুলে তাদের বিপ্লবের পথে চালিত করার ক্ষমতার উপর। যারা কংগ্রেসের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ ও তার ভবিষ্যৎ role বা নির্দিষ্ট কর্ম সম্বন্ধে অন্ধ, তারাই শুধু ঐ বিকৃত ব্যাখ্যা করতে পারে—কারণ ওটা তাদের শ্রেণীবুদ্ধির অনুকূল।

ধীর মন্থর গতিতে এই ৬০ বছর ধ'রে কংগ্রেস এগিয়ে চলেছে গণনেতৃত্বের দিকে এবং গণবিপ্লবের উদ্দেশ্য নিয়ে। একথা ঠিকই যে, কংগ্রেসে বিভিন্ন দল ও বিভিন্ন স্বার্থের সমাবেশ এতদিন ছিল এবং এখনও কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুসারে তা সম্ভব। কিন্তু একদিন কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি মহাত্মা গান্ধী বিলাতে Round Table-এর বৈঠকে ইংরাজ সাম্রাজ্য শক্তির পূর্ণ সমাবেশের সামনে ঘোষণা করেছিলেন—"The Congress represents in its essence the dumb and semi-starved millions scattered over the length and breadth of the land, in its seven lakhs villages. Every interest which is worthy of protection has to subserve to this interest and if there is

genuine and real clash, I have no hesitation in saying that the Congress will sacrifice every interest for the sake of the dumb millions." সেইজন্য কংগ্রেসের রূপান্তর ঘটবার বিরুদ্ধেই তিনি প্রচার করেছিলেন; যা ধীরে ধীরে লোকের অগোচরে ঘটছিল, তাই তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, কংগ্রেসে তখন একটা বিশেষ স্বার্থ প্রবল হচ্ছে, আর সে স্বার্থের বিরোধী কোন স্বার্থ সেখানে স্থান পাবে না। সমাজের কতক স্তরকে যে কংগ্রেস থেকে বাদ দেওয়া হবে, তাতেই ইঙ্গিত ছিল এই উক্তিতে।

কংগ্রেস যতদিন কেবল আলোচনা সভা ছিল, ততদিন কংগ্রেসে সকলেরই স্থান ছিল। এমন কি, সে সময়েও তার মধ্যে অপসরণ প্রথা—process of elimination—সুরু হয়েছে। তাই ১৯১৭ সালে মডারেটপন্থীরা, কংগ্রেসের যাঁরা স্রষ্টা, কার্যতঃ তাঁরাই কংগ্রেস ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হলেন। অবশ্য কংগ্রেস প্রস্তাব ক'রে তাদের বের করে দেয়নি, কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে যে শক্তির সৃষ্টি হচ্ছিল, তাঁরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে নরমপন্থীরা কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। সে সব নেতাদের মধ্যে যে পরিমাণ রাজনৈতিক সততা ও আত্মসম্মানজ্ঞান ছিল, যারা বিভীষণী প্রথায় (faction work) বিভেদ সৃষ্টিকে রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি হিসাবে নেয়, তাদের মধ্যে সেই সততা ও আত্মসম্মানবোধ আশা করা যায় না। তাই তারা স্বেচ্ছায় কংগ্রেস ত্যাগ করছে না। কংগ্রেসের নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

১৯৩৮ সালে একদল কর্মী বিপ্লবী-দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে ঘোষণা করেছিল—

"The Indian National Congress being the most suitable organisation existing for the capture of political power and it being extremely impolitic to foster the growth of more than one political organisation which may issue commands at a moment of fight, we wholeheartedly join that organisation." এই ব'লে তারা তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত পুরানো দলের বিলোপ সাধন করেছিল। এই রাজনৈতিক সংস্থিতির (stand) উপযোগিতা আজ আরও বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৪২ সালে কংগ্রেস স্বাধীনতা আহরণের সংগ্রাম ঘোষণা করে। কথার মারপ্যাঁচ ছেড়ে দিয়ে এ কথা বলতেই হবে, যে, কম্যুনিষ্টগণ সেই সময় সর্বপ্রকারে—আমরা স্পষ্টতঃ ও জোরের সঙ্গে বলছি—সর্বপ্রকারে এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে সরকারকে সাহায্য করেছে; কংগ্রেসের নির্দেশের বিপরীত কথা লোককে বুঝিয়েছে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করেছে, এবং কংগ্রেসের প্রতি জনগণের আস্থা ও আনুগত্যের ভিত্তি শিথিল করার চেষ্টা করেছে। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস ভুল নির্দেশ দিয়েছে কি না, কংগ্রেসের নির্দেশ জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল ছিল কি না—সে প্রশ্ন এখানে বিচার্য নয়। কংগ্রেস ভুল করলেও তার বিরুদ্ধাচরণ করা কংগ্রেস বিধানে দণ্ডার্হ—এইটাই হ'ল প্রধান কথা। প্রত্যেক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানেই এই শৃঙ্খলা দাবী করবে।

এদের একটি চাঁই কিছুদিন পূর্বে লিখেছিলেন যে, তাদের এই "অনমনীয়" মত dialectic বিচারসম্মত। কথায় বলে, শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর—এদের এই dialecticএর ব্যাখ্যা দেখে ঐ প্রবচনই মনে পড়ে। মার্ক্স ও লেনিন যতই চেষ্টা করে থাকুন না কেন, তবু এই সব দিগ্‌গজদের হাতে এসে dialectics হয়েছে historical mechanism or fatalism। এদের মতো মার্ক্সীয়দের লক্ষ্য করেই লেনিন লিখেছিলেন—"Like those old Bolsheviks who have more than once already played a pitiful role in the history of our party, meaninglessly repeating a formula learned by rote instead of studying the unique living reality." কোনো দেশের বিশেষ বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করে যদি অনমনীয় কেতাবী বুলি প্রয়োগ করতেন, তবে লেনিনের পক্ষে বলশেভিক বিপ্লব সাধন করা সম্ভব হ'ত না, তবে হয়তো ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের গুরু "Old Bolsheviks"দের collaboration (সহযোগিতা) নীতিতেই লেনিনের প্রতিভা শেষ পরিণতি লাভ করতো। কিন্তু এই সব আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

আমরা দেখব ভারতীয় বিপ্লব সাধনের পক্ষে কংগ্রেসের উপযোগিতা কতটা এবং সেইজন্য তার গঠনই বা কিরূপ হওয়া উচিত। পূর্বেই বলেছি যে ১৯৩৮ সালে একদল কর্মী ঘোষণা

করেছিল, যাতে জাতীয় সংগ্রামের সময়ে জনতার প্রতি একাদিক নির্দেশ বা আদেশ প্রচারের মতো প্রতিষ্ঠান না থাকে, তার জন্যই একমাত্র কংগ্রেসকে স্বাধীনতা অর্জনের machinery বা যন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। অবশ্য এই আদর্শ অবস্থা আমরা কেবল কামনা করতে পারি ; দেশের অন্যান্য দলের মুখ বন্ধ করার অধিকারও আমাদের নেই। কিন্তু একই প্রতিষ্ঠানের নামে ও সুযোগ নিয়ে দুই সুরের কথা যাতে না বেরোয়, তার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সাধ্যায়ত্ত এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের তা করাও একান্ত কর্তব্য। কম্যুনিষ্টগণ সুবিধা মতো কংগ্রেসের নামে এবং কংগ্রেসের দোহাইতে কংগ্রেসের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের কথা বলেছে ও বলছে। অন্যান্য বহু দলও অবশ্য বিশেষে একাজ করেছে, এটা কংগ্রেস বরদাস্ত করতে পারে না। তাদের আলাদা প্রতিষ্ঠান হ'তে তারা কি বলবে বা করবে তা তাদেরই বিচার্য। কিন্তু কংগ্রেসীদের আচরণ ও বাক্য কংগ্রেসের নির্দেশানুযায়ী হওয়া দরকার। তাদের আনুগত্য একমাত্র অ-বিভক্ত ও অ-বিভাজ্যরূপে কংগ্রেসের নিকট থাকা দরকার।

আর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এমন আসন্ন হয়েছে যে, কংগ্রেসকে প্রতি পদে পদে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন—তার চেষ্টায়, ত্যাগে ও সাধনায় যে বিপ্লব ঘনিয়ে আসছে, নিজের ভিতর বিভীষণ বা পঞ্চমবাহিনী যেন তার সেই পরিকল্পিত বিপ্লব-রূপকে বিকৃত করতে না পারে। বিপ্লব যখন সুরু হয়, তখন ধাপে ধাপে, স্তরে স্তরে, stratum after stratum ধ্বসে পড়তে থাকে ;—এক একটা প্লাবনের পর প্লাবন এসে বিপ্লবকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যে বিপ্লবকে কংগ্রেস প্রবর্তন করবে, তাকে পরিপূর্ণ সার্থকতায় পরিণতি দান করার দায়িত্বও তার—মাঝখান থেকে "Old Bolsheviks"রা এসে, Collaborationistরা এসে, বা অন্য কোন দলের বিভ্রান্তিসৃষ্টিকারীরা (deviationists) এসে বিপ্লবের গতিকে যেন বিপথে চালিত করতে না পারে। ১৯১৭ সালের রুষ বিপ্লবের মুখস্ত করা ইতিহাস—'learned by rote' ভারতের অনেক দলের মনে কুহক জাগাচ্ছে ; ভাবছে, তাদের মধ্যেও কোন লেনিন লুকিয়ে আছে। তাই তাদের চেষ্টা কংগ্রেস যে বিপ্লব সুরু করবে, মাঝপথে খপ্ করে তা তারা গ্রাস করবে। তাদের এমন কোন নৈতিক বা সংগঠন শক্তি নেই যে, তাদের এই মতলবে শঙ্কিত হবার কোন কারণ ঘটতে পারে। কিন্তু বিপদ হ'ল এই—পদে পদে তারা বিভ্রম সৃষ্টি করবে, একমাত্র জীবন্ত বাস্তবকে (living reality) উপেক্ষা ক'রে তারা হয়তো কেতাবের সূত্র মেলাবার জন্য বিপ্লবের গতি রোধ করতে চাইবে। লেনিনের সময়েও পদে পদে কেতাবের বুলি দেখিয়ে বিপ্লবকে মন্থর ও বিকৃত করার লোকের অভাব ছিল না ; লেনিন তাদের জবাব দিয়েছিলেন—"Where is written that such variations in the usual historical order are inadmissible or impossible?" সেখানেও লেনিন ছিলেন দলের নেতা, তাই তাঁর কথা তারা শুনতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এখনকার উপগ্রহের দলকে থামাবে কে? কোন দুরান্তের সূর্যের সঙ্গে এদের গ্রহ বাঁধা আছে, আবার তারই পুচ্ছের সঙ্গে এদের মনের টিকিও বাঁধা আছে। সেই গতি থামাবার দায় কে নেবে? তাই পূর্বাহ্ণেই সতর্ক হওয়া দরকার।

এরপর আরও গোড়ার কথায় আসতে হয়। একটা রাজনৈতিক দলের নিকট তার সভ্যদের আনুগত্য যদি অ-বিভাজ্য না হয়, তবে সে দলকে শুধু বিতর্কসভা হয়েই তুষ্ট থাকতে হয়—কোন গণ-বিপ্লবের নেতৃত্ব ও পরিচালনা করার আশা তাকে ত্যাগ করতে হয়। কংগ্রেস ব্যাপক ; এর এই ব্যাপকতার সুযোগ নিয়ে এমন অনেক লোক এর মধ্যে ঢুকেছে, যাদের মৌলিক আনুগত্য কংগ্রেসের নিকট নয়—তাদের নিজস্ব কোনো ছোট প্রতিষ্ঠানের নিকট। কংগ্রেসের আদেশ, অনুজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞাবাণী (creed) পর্যন্ত তারা নিজেদের পার্টির রীতি ও অনুজ্ঞা দ্বারা কাটছাট ক'রে তবে গ্রহণ করে। এমন দৃষ্টান্ত বাংলায় বিরল নয় যে, কংগ্রেসের মূল প্রতিজ্ঞাবাণীকে এবং মূল প্রতীক জাতীয় পতাকাকে—(National Flag) নিজ নিজ পার্টির নির্দেশানুযায়ী অদলবদল করে গ্রহণ করে। এই অপরাধ যে কেবল কম্যুনিষ্টগণ করেছে ও করে, তা নয়। বাংলার অন্যান্য দলও ঠিক এই অপরাধ ক'রে নিজেদের বিপ্লবী-গৌরব জাহির

করে। ১৯৪২ সালের স্বাধীনতা প্রচেষ্টার এমনি অপব্যাখ্যা বাংলায় বহু হয়েছে। এমন কথাও শুনেছি—"এই আন্দোলন আমরা করেছি, কংগ্রেসের নির্দেশে নয়, আমাদের নিজ পার্টির নির্দেশে।" আরও গুরুতর কথাও শুনেছি—"সুভাষবাবু সোনান (সিঙ্গাপুর) থেকে এই আন্দোলনে যোগ দিতে বলেছেন, তাই আমরা এতে যোগ দিয়েছি।" কংগ্রেসের এই প্রচেষ্টাকে কতখানি বিকৃত ক'রে গ্রহণ করলে তবে এমন কথা মনে আসতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

বিপ্লব প্রচেষ্টার মধ্যে কর্মনির্দেশ ও কর্মপদ্ধতির এমনি অদল-বদল বা বিকৃতি যে কি পরিমাণ অনিষ্টসাধন করতে পারে, তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় লেনিনের লেখায়। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পর তিনি ক্রমাগত এই বিপদের ও অনিষ্টের দিকে তাঁর সহযোগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যারা আজকের দিনে মার্ক্স-লেনিনের দোহাই দিচ্ছে, তাদের কাছে এই সব বিষয় অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। তাই এখানে আর তা উদ্ধৃত করতে চাই না।

পরিশেষে একটি কথা কংগ্রেসকর্মীদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আজ ভারতের বিপ্লব সাধনার একটি গুরুতর পরিস্থিতি উপস্থিত হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম গণ-বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান ব'লে কংগ্রেস আজ দাবী করেছে এবং এক বৃহৎ (হয়তো বৃহত্তম) বিপ্লব-প্রচেষ্টা আজ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। এই বিপ্লবও আজ সুদূর নয়। ১৯৪২ সালের আগষ্ট প্রস্তাবে একদিকে যেমন ভারতের অবিলম্ব (immediate) স্বাধীনতার দাবী করা হয়েছে, অপরদিকে বলা হয়েছে—কারখানার ও কৃষিক্ষেত্রের শ্রমশীল জনগণই (workers in the fields and factories and elsewhere) হবে রাষ্ট্র ও সমাজ-ক্ষমতার মালিক। বিপ্লবের পথ অতি সঙ্কীর্ণ—ক্ষেত্র যদিও ব্যাপক। চলবার একটু এদিক ওদিক হলেই বিপ্লবের সাফল্য এবং বিপ্লবোত্তর সমাজ-ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষিত রূপ সবই বিপন্ন হ'তে পারে, দীর্ঘকালের সাধনা সবই ব্যর্থ হ'তে পারে। কংগ্রেস একটা মঞ্চ (platform), একটা সংঘ (organisation), একটা জাতীয় সংস্থা (National institution), এটা একটা পার্টি নয়—এসব হ'ল অত্যন্ত ছেলেমানুষী কথা, খেলো কথা। কংগ্রেস শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (disciplinary action) নিচ্ছে, কংগ্রেস লোককে বহিষ্কার ক'রে দিচ্ছে—কংগ্রেস বিপ্লবী গণ আন্দোলনের নেতৃত্ব করছে—এসব কথা একমাত্র পার্টির পক্ষেই সম্ভব—বিভিন্ন দলের সমন্বয় মঞ্চ এ করতে পারে না। আজও যদি কংগ্রেসের মধ্যে পার্টির উপযুক্ত শৃঙ্খলার অভাব কিছু থাকে, তা হ'ল অতীতের আবর্জনার শেষ চিহ্ন এবং তা পরিতাপের। আজ তাকে সংশোধন করতেই হবে। আজ কংগ্রেসকে দাবী করতে হবে—প্রত্যেক সভ্যের একনিষ্ঠ ও অ-বিভাজ্য আনুগত্য। অপর কোন রাজনৈতিক পার্টির বা সংঘের প্রতি কারুর আনুগত্য থাকলে, তার স্থান কংগ্রেসের ভিতর নেই—এ কথা আজ কংগ্রেসকে জোরের সঙ্গেই বলতে হবে। নিজের সংঘশক্তি ও কর্মশক্তির উপর পূর্ণ আস্থা রেখে কংগ্রেসকে আজ বলতে হবে—যারা কংগ্রেসের অতিরিক্ত অপর দলের প্রয়োজন বোধ করে, তারা কংগ্রেসের শক্তি হানি করে এবং কংগ্রেসের প্রতি তাদের অনাস্থারই প্রমাণ দেয়। তাই তাদের স্থানও কংগ্রেসের বাইরে—তার ভিতরে নয়।

আজ কংগ্রেস কর্মীদের তরফ হ'তে এমনি দাবী উঠবার আভাস দেখা দিতেই, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নানা কটাক্ষের উদ্রেক হয়েছে। Monolith organisation বা 'এক-প্রস্তর' প্রতিষ্ঠান ব'লে একটি আখ্যা নিন্দাসূচক অর্থেই কংগ্রেসের এই সম্ভাবিত গঠনের প্রতি প্রযুক্ত হচ্ছে। আমরা অবশ্য এই আখ্যাতে আপত্তি করতে চাই না। রুশিয়ার বলশেভিক দল যখন নিজেদের সম্বন্ধে এই আখ্যা প্রয়োগ করেছে, তখন সেটা আমরা প্রশংসাজ্ঞাপক বলেই গ্রহণ করেছি; কিন্তু আজ কংগ্রেসের গঠন যখন ঐ দিকে যাচ্ছে তখন কিন্তু অনেকে সেটা সুনজরে দেখতে পারছে না। লেনিন যখন বললেন যে, বলশেভিক ও মেনশেভিকের তাগা-তাগিটা হ'ল মূলত দলের গঠন নিয়ে মতবাদ নিয়ে নয়—at present the dissensions that divide the two wings are for the most part only questions of organisations and not of programmes and tactics—তখন সকলেই সেটা তাঁর দূরদৃষ্টির পরিচায়ক বলে নিয়েছে; কিন্তু কংগ্রেসের তরফ থেকে যখন এই গঠন-

মূলক কাট-ছাটের প্রশ্ন উঠেছে, তখন এটাকে reactionary and fascist step ব'লে নিন্দা করতে তাদের বাধছে না।

জাতীয় ঐক্য ও সংহতির নামে আজ অনেক কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এমনি ঢিলাঢালা গোঁজামিলের দল দিয়ে না হয় ঐক্য না হয় সংহতি—বিপ্লব তো অনেক দূরের কথা। এমন দলের সম্বন্ধেই লেনিন বলেছেন—"a mere family circle"—আমরা জানি কংগ্রেসের এই প্রচেষ্টা নানা দিক থেকে তীব্র প্রতিবাদ তুলবে। লেনিন লিখেছেন—"The battle to kill the separate organisations was necessarily fierce. The breeze of open and free struggle became a gale. The gale swept away every conceivable remnant of circle interests etc…" আজ কংগ্রেস একটা "ideological unity"—মতবাদের ঐক্য—কর্মপদ্ধতির ঐক্য—আদর্শের ঐক্য লাভ করতে যাচ্ছে বা লাভ করেছে; এর সঙ্গে যদি "material unity of an organisation"—সংঘগত বাস্তব ঐক্য লাভ না করতে পারে, তবে তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে।

ভারতের আসন্ন বিপ্লবের পক্ষে আজ বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে কংগ্রেসকে নূতন ক'রে একদল-প্রতিষ্ঠান—"single party organisation" ক'রে গড়ে তোলা; লেনিন যাকে বলেছেন—"philistial methods of circle squabble"—তা থেকে কংগ্রেসকে মুক্ত করা দরকার। **কংগ্রেসের এই পুনর্গঠনের সময় কংগ্রেসের বিভিন্ন সভাসমিতি, বিভিন্ন শাখা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি থেকে আজ এই দাবী তুলতে হবে—ভারতের আসন্ন গণবিপ্লবের সাফল্যের জন্য কংগ্রেস আজ অ-বিভাজ্য ও অ-বিভক্ত আনুগত্য দাবী করছে; অপর কোন দলের সভ্য হলে, কেউ আর কংগ্রেসের সভ্য হতে পারবে না**—এমন ভাবে কংগ্রেসের গঠন বদলানোর দাবী নিম্নতর সংস্থা (organisation)—প্রাথমিক জেলা, প্রাদেশিক প্রভৃতি কংগ্রেস কমিটি থেকে এই দাবী তুলতে হবে—যাতে অতি সত্বর কংগ্রেসের গঠনপদ্ধতির উপযুক্ত পরিবর্তন সাধিত হয়।

আবাহন

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ফেলে তোমার কোমল আবরণ
আবার এস বজ্রসম হ'য়ে,
শতদলের খসিয়ে দলগুলি
এস পঙ্কবনের কাঁটা ল'য়ে।
জীবন-নট-ঘরের মাঝে অগ্নি জ্বলে লোলুপ শিখা তুলে,
খবরদারি মিছা এখন চাঁপার কলি পরলে কিনা চুলে ;
ঘরের মায়া কাটিয়ে যারা বাইরে এল পথের ডাকে ভুলে,
মন্দিরেতে বাজাল মন্দিরা—
তারা এবার বলুক ডেকে, "মার পূজোতে আসবে কে কে,
এসো সবাই—প্রগল্‌ভা কি ধীরা।
আলোর রেখা যায় যে দেখা, সজ্ঞ এসো, এসো একা,
সেদিন যারা পিছিয়ে ছিলে ভয়ে
অন্ধকারে ঘরের কোণে, আজকে এসো অভয় মনে,
লগ্ন শুভ যায় বুঝি-বা ব'য়ে।"

জীবন-বীণা-তন্ত্রে তোল তোল—
শঙ্কাহারী মরণজয়ী সুর,
শক্তিহীন আমরা আজি সবে
মুক্তি তাই এখনো বহু দূর।
শাসন-ভীত সংশয়ীরে সাহস দেহ, ভরসা দেহ আনি,
পতাকাখানি তুলিয়া ধর প্রচার কর নবযুগের বাণী ;
দাসত্বের কুণ্ডে যেথা পচিয়া মরে লক্ষ কোটি প্রাণী
পাবকরূপী বহ্নি সেথা জ্বালো,
একতারা বা মন্দিরাতে ধ্বনিয়া তোল একটি সাথে—
"পরাধীনের মরণ ঘটা ভালো।"

তোমরা এস অগ্নিশিখা জাতির ভালে পরাও টীকা,
হতাশে কর আশায় ভরপুর—
বাঁচায় যে মা স্নেহরসে তাঁরেই প্রয়োজনের বশে
হতেও হয় পরম নিষ্ঠুর।

কাটিলে যারা ঘরের মায়াজাল
এবার হবে সংগ্রামেরো সাথী,
নূতন জাগরণের পথ চেয়ে
প্রতীক্ষিছে প্রাচীন এই জাতি।
ধূলিশয়ানে শায়িত মোরা কামনা করি দেবীর আগমন,
পুরাতনের ভরসা গেছে তাই তো এই নূতন আবাহন ;
শক্র যদি শাসিত হয় চণ্ডী নব করিব বিরচন—
আবার এসো ভয়ঙ্করী বেশে,
কলহদ্বেষ বিভেদ ভুলি আমরা আছি দুয়ার খুলি
রুদ্ধদ্বার কারাগারের দেশে।
অরণি নাই সমিধ্ আছে স্ফুলিঙ্গের স্পর্শ যাচে,
কাটিছে বহু নিদ্রাহীন রাতি,
আমাদের এ নব বোধন, হে জাগ্রতা, কর শোধন
সারা ভারত রয়েছে কান পাতি।

যাত্রা

অমলা দেবী

পূজার সময়ে গৃহিণী পিতৃগৃহে যাইতেছেন। ছেলে মেয়েদের মধ্যে 'লাজ লাজ' রব পড়িয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলির স্ফূর্তির অন্ত নাই। মামার বাড়ী যাওয়া তাহাদের ভাগ্যে সচরাচর ঘটিয়া উঠে না। তাহাদের দাদামশায় বাংলাদেশের বাহিরে কোন এক সহরে বড় চাকুরী করেন। মাঝে মাঝে তাঁহার কাছ হইতে সাদর আহ্বানও আসে। কিন্তু রাহা-খরচ ও রাস্তার হয়রানির ভয়ে তাহাদের বাবা রাজী হন না। সম্প্রতি দাদামশায় মাস দুই ছুটী লইয়া দেশের বাড়ীতে আসিয়াছেন। বাড়ীর পূজাও নাকি ভাঁকজমক সহকারে করিতেছেন। আত্মীয়-স্বজন, যে যেখানে আছে, সকলকে জড় করিয়া উৎসবটা নিখুঁৎ করিবার চেষ্টায় আছেন। কন্যা-জামাতাকে সংবাদটা আগেই জ্ঞাপন করিয়াছেন; এখনও পুনঃপুনঃ পত্রবর্ষণ করিতেছেন। কাজেই গৃহিণী ছেলেমেয়েদের লইয়া যাইবার জন্য তৈয়ারী হইতেছেন। কর্ত্তার যাওয়া হইতেছে না। তিনি উকীল, পূজার জন্য আদালত বন্ধ হইয়াছে; তথাপি শুধু বাড়ী আগলাইবার জন্যই তাঁহাকে থাকিয়া যাইতে হইতেছে। স্থির হইয়াছে, গৃহিণী ও ছেলেমেয়েরা ফিরিয়া আসিলে তিনি দিন কয়েকের জন্য শ্বশুরবাড়ী গিয়া সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আসিবেন।

গৃহিণী কর্ত্তাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। পাচক ব্রাহ্মণ শ্রীমান পঞ্চাননকে বাড়ী আগলাইবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিয়াছেন; কিন্তু সে কিছুতেই একা বাড়ীতে থাকিতে রাজী হয় না।

শ্রীমান পঞ্চানন উৎকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বাড়ী বাঁকুড়া জেলায়। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। বেঁটে-খাটো, গোলগাল, চেহারা; গায়ের রং মিশমিশে কালো; মুখের ভাবটা বোকা-সোকা ধরণের; উপর পাটীর দাঁতগুলি বড় হওয়ায় সদাসর্ব্বদাই হাসিতেছে বলিয়া মনে হয়; মাথার চুলগুলি চারিদিক সমান করিয়া ছাটা; মধ্যস্থলে পরিপুষ্ট একগোছা টিকি। সে নয় বৎসর হইতে এ বাড়ীতে আছে; গৃহিণীই হাতে ধরিয়া তাহাকে রান্নাবান্না শিখাইয়াছেন। চাল-চলন বাড়ীর ছেলের মতই—গৃহিণীকে 'মা' ও কর্ত্তাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকে। ছেলেমেয়েদের খাতির করে না, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের ধমক পর্য্যন্ত দেয়। বোকা-সোকা লোক বলিয়া বাড়ীর সকলে তাহাকে লইয়া কৌতুক করে; সে নীরবে সহ্য করে। শুধু কি কোন কথা বলিলে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠে।

ঝিএর নাম কালোশশী—গায়ের রং এর সঙ্গে মিলাইয়া নাম রাখিয়াছিল তাহার বাপ মা। তেলীর মেয়ে; বালবিধবা; পাতলা ছিপছিপে; বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ; গৃহিণীর বাপের বাড়ীর গ্রামের মেয়ে। গৃহিণী দ্বিরাগমনে ঘরবসত করিতে আসিবার সময়ে তাঁহার বাবা তাঁহারই এক প্রজার মেয়ে কালোশশীকে মেয়ের সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তখন হইতেই কালোশশী এ বাড়ীতে আছে। ছোট বোনের মত গৃহিণীর সঙ্গে সঙ্গে থাকে, সংসারের সব কাজ-কর্ম্ম করে; ছেলে-মেয়েদের সেই মানুষ করিয়াছে। সংসার-চালনা ব্যাপারে সে গৃহিণীর সহকারিণী। গৃহিণী তাহাকে বোনের মতই স্নেহ করেন ছেলেমেয়েরা মাসীর মত শ্রদ্ধা করে—কর্ত্তা পর্য্যন্ত তাহাকে খাতির করেন; শুধু পঞ্চাননের সঙ্গে তাহার বনে না—খুঁটিনাটি লইয়া অবিরত ঝগড়া হয়।

পঞ্চাননকে রাজী করাইবার জন্য আর একদিন শেষ চেষ্টা করিলেন গৃহিণী। রান্না ঘরের সামনে আসিয়া ডাক দিলেন—পঞ্চু! 'যাই মা' বলিয়া পঞ্চানন রান্না ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। কাঁধের গামছা দিয়া হাত মুছিতে মুছিতে কহিল 'কি বলছেন মা!' গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই কি সত্যি থাকতে পারবি না?" পঞ্চানন তৎক্ষণাৎ প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"না, মা! আমি তো বলেছি"—গৃহিণী অনুনয়ের সুরে কহিলেন—"থাকতে পারলে বড় ভাল হত, বাবা পঞ্চু! কর্ত্তা আমাদের সঙ্গে যেতে পারতেন। এতগুলি লোক—এত মালপত্র নিয়ে যেতে কি বড় খোকা পারবে? তা' ছাড়া বাবার সঙ্গে ওঁর কতদিন দেখা হয় নি। এত করে লিখেছেন বাবা—" পঞ্চানন মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া

গৃহিণীর প্রত্যেক যুক্তি সমর্থন করিল—স্বীকার করিল—যে দাদাবাবুর কষ্ট হইবে এবং কর্ত্তার এ অবস্থায় যাওয়া উচিত। গৃহিণী উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা' হলে থাকবি—" পঞ্চানন আগের মতই ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"আজ্ঞে না, মা! ও কথাটী আমাকে আর বলবেন না—" গৃহিণীর সঞ্জোজীবিত উৎসাহ নিবিয়া গেল—রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন—"কি তোর আপত্তি বল দেখি?" পঞ্চানন হাত কচলাইতে সুরু করিল। গৃহিণী কহিলেন—"চোরের ভয়?" পঞ্চানন ঘাড় নাড়িল—

—"ভূতের ভয়?"

পঞ্চানন চুপ করিয়া রহিল।

গৃহিণী কহিলেন—"এই সহরে ভূত কোথায় পাবি?"

বারন্দার এক পাশে বসিয়া কালোশশী কুটনা কুটিতেছিল—মন্তব্য করিল—"নিজেই তো ভূত! তার আবার ভূতের ভয় কিসের?"

কালোশশীর দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পঞ্চানন কহিল—"আজ্ঞে ওদের আবার অগম্যি স্থান আছে? এই সহরেও গিজ্ গিজ্ করছে—"

কালোশশীর কাছ হইতে মন্তব্য আসিল—"চোখের সমনেই তো একজন গজ্ গজ্ করছে দেখতে পাচ্ছি—"

পঞ্চানন কহিল—"ভূতই নয় মা, পেত্নী, শাখচুন্নি সব আছে—"এবার কালোশশীর দুই চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

পঞ্চানন কহিতে লাগিল—"বাড়ীতে মানুষ থাকলে ওরা পাশঘেঁষে না, কিন্তু মানুষ না থাকলেই এসে ভিড় করে—"

কালোশশী চোখ মুখ ঘুরাইয়া কহিল—"তা' সত্যি দিদিমণি, আমরা চলে গেলে বাড়ীতে মানুষ বলতে কে থাকছে—বল—"

কালোশশীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া পঞ্চানন বলিতে লাগিল—"একলা মানুষ পেলে ওরা যে কি কাণ্ড করে তা' তো জানেন মা! হয়তো ঘাড়টাই মটকে দেবে—বামুনের ছেলে অপমৃত্যু হ'য়ে কি শেষে নরকে যাব—"

কালোশশী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—"এখনই বলে একেবারে স্বর্গে যাবে! সিংহাসন সাজিয়ে রেখেছে সেখানে! বাজারের চুরিগুলো চিত্রগুপ্তের খাতায় একটাও লেখা হয়নি তো।"

পঞ্চানন রাগিয়া উঠিয়া কহিল—"দেখুন মা! যা' তা' বলছে! অনেকক্ষণ থেকে অনেক কথা সহ্য করেছি—আর করবনা বলে দিচ্ছি—"

কালোশশী তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল—"যা' তা' বলছে না তো কি! ধেড়ে মিনসের ভূতের ভয়! বলতে লজ্জা করে না?"

পঞ্চানন কহিল—"লজ্জা কিসের! ভয় করে তো বলব না? এত যদি তোর সাহস তো তুই থাকনা—"

দুই চোখ ডাগর করিয়া মুখ নাড়িয়া কহিল—"এ্যা মর ছোড়া! কথা শোন—ঘটে বুদ্ধি কি তোর ভগবান দেননি নাকি! কেলে ভূত কোথাকার!" পঞ্চানন কহিল—"ঠিক কথাই বলছি মা! ও থাকুক একা বাড়ীতে—আমি আপনাদের সঙ্গে যাব—"

গৃহিণীর মুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছিল। তিনি জোর করিয়া তাহা চাপিয়া গম্ভীর হইয়া উঠিয়া কহিলেন—"তোর এখানে একা থাকবারও দরকার নাই—যাবারও দরকার নাই। কর্ত্তা থাকবেন। তোদের মত যার চাকর বাকর তার কপালে এখনও অনেক দুঃখ আছে—" বলিয়া চলিয়া আসিলেন।

বাড়ীর জিনিসপত্রের গোছ-গাছ দশ দিন আগে হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গৃহিণী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যাহা যাইবে এবং কর্ত্তার জন্য যাহা লাগিবে—তাহা ছাড়া যাবতীয় ট্রাঙ্ক, সুটকেশ, বিছানা-পত্র গৃহিণীর শয়নকক্ষে ঢুকান হইয়াছে; গৃহিণী যাবার আগে তালা দিয়া চাবি সঙ্গে লইয়া যাইবেন। দুইজনের জন্য নেহাৎ যা' না রাখিলেই নয় তাহা ছাড়া যাবতীয় বাসন-কোসনও ঐ ঘরেই ঢুকাইয়া রাখা হইয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া কর্ত্তা বলিয়াছেন—"এ কয়েকটা থালা বাটীই বা বাইরে রাখা কেন? ঢুকিয়ে দাও। আমরা না হয় এ ক'টা দিন কলাপাতায় চালিয়ে দেব—" গৃহিণী স-ঝঙ্কার জবাব দিয়াছেন—"তা' না করলে একটাও এসে দেখতে পাব নাকি? চাকর মনিব দু'জনেরই যা' ছিরি!" বাপের বাড়ীতে যে ক'দিন থাকিবেন, সেই কয় দিনের জন্য দুইজনের মত হিসাব করিয়া চাল, ডাল, নুন, তেল মশলা, চিনি

ইত্যাদি বাহির করিয়া দিয়াছেন। বাকী সব জিনিস ভাঁড়ার ঘরে তালা আঁটা থাকিবে; এ চাবিও গৃহিণীর সঙ্গে যাইবে।

কর্ত্তা প্রতিবাদ করেন নাই, সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছেন—"সব বন্ধ করে দিয়ে যাবে! এর মধ্যে যদি কেউ এসে পড়ে?—" গৃহিণী দুই চোখ বিস্ময়ে ভাগর করিয়া কহিলেন—"কে আবার এসে পড়বে তোমার?"

—"এই কোন বন্ধু বান্ধব।"

গৃহিণী অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন—"হ্যা—বন্ধু-বান্ধবদের খেয়ে দেয়ে কাজ নাই কিনা, পূজোর সময় নিজেদের ছেলে মেয়ে, আত্মীয় স্বজন ছেড়ে তোমার কাছে বেড়াতে আসবে—"একটু ভাবিয়া কহিয়াছেন—"আর যদি কেউ আসেই তো দোকান থেকে কিনিয়ে আনাবে—" কর্ত্তা কহিয়াছেন—"বেশ কথা! বাড়ীতে জিনিস থাকতে দোকান থেকে কিনে আনতে হবে?" যুক্তিটা অখণ্ডনীয়। গৃহিণী দ্বিধার সহিত কহিয়াছেন—"কি করব তবে? তোমাদের হাতে জিনিস গুলি ছেড়ে দিয়ে গেলে, দু'মাসের জিনিস আমার দু'দিনে ফুরিয়ে যাবে। যা' লম্বা হাত তোমার ঠাকুরের আমি রাত দিন পিছনে থেকে টিকটিক করি তাই—না হলে এত দিনে সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিত—"

রান্নাঘরের বারান্দায় কলোশনী বলিয়াছিল। চাপা গলায় কহিল—"লম্বা হাত হবে না? ভূত যে! মূলোর মত দাঁতও। বেহদ্দতি যাদের ঘাড়ে চেপেছে তাদের উড়বে—পুড়বে না তো! কি হবে!"

রান্নাঘরের ভিতর পঞ্চানন রান্না করিতে করিতে গর্জ্জাইয়া উঠিল—"পেত্নী! পেওড়া গাছ ছেড়ে যখন ঘরে এসে ঘর করেছে তখন দফা রফা হবে সবাইকার—"

গৃহিণী ফিসফিস করিয়া কহিলেন—"ঐ শোন—আবার লেগেছে দুজনে; রাত-দিন বিরাম নাই। কি করা যায়, বাপু!"

কর্ত্তা হাসিয়া কহিলেন—"পঞ্চাটার বয়স কম হয়নি—বিয়ে হয়েছে?" গৃহিণী নাকি সুরে কহিলেন—"ঐ তো হয়েছে আমার আর এক বিপদ! বৌ ঠিক হয়ে গেছে—আসছে অঘ্রাণে বিয়ে; অনেক টাকা নাকি পণ দিতে হবে। ছোঁড়া উঠে পড়ে পণের টাকা জোগাড় করতে লেগে গেছে। বাজারের পয়লা তো সব চুরি করে ফাঁক করে দিলে। রাজ্যের অখাদ্য কুখাদ্য জিনিস কিনে নিয়ে আসে—আর পাঁচ আনার জিনিসের দাম বলে পনের আনা। আমাকে তো ব্যতিব্যস্ত করে দিয়েছে। তা'ও আমি বলে কোন মতে সামলাচ্ছি; তোমার কাছে যে ও কি করবে তাই ভাবছি—" বলিয়া মুখখানি চিন্তাকুল করিয়া তুলিলেন।

বাজারের খুব কড়াকড়ি ব্যবস্থা হইয়াছে। দিনের পর দিনের জিনিসের তালিকা করিয়া দিয়াছেন গৃহিণী; প্রত্যেক জিনিসের পরিমাণ ও আন্দাজী একটা দামও ঠিক করিয়া দিয়াছেন। তালিকা-গুচ্ছ কর্ত্তার হাতে দিয়া বলিয়াছেন—"দিন এক একটি করে ওর হাতে দেবে—দাম যা' লেখা আছে তাই দেবে। ওতেই ও লাভ করবে বটে—তবে বেশী কিছু পারবে না—"

কর্ত্তা এ সম্বন্ধেও একটু অনুযোগ করিলেন—"এর মধ্যে যদি কোন জিনিসের দাম বাড়ে?"

গৃহিণী নিঃসন্দিগ্ধ স্বরে জবাব দিলেন—"দাম আর বাড়বে না কিছুতেই—কমতে পারে বটে—তা' আর কি করা যাবে? তা এক কাজ কোরো না—তোমার বন্ধু রাধাচরণ বাবু তো নিজের হাতে বাজার করেন। বাজারের দর-দাম ওঁর মুখস্থ—ওঁকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস কোরো—" কর্ত্তা কহিলেন—"পাগল নাকি! আমার আর খেয়ে কাজ নাই—বাড়ীতে বাড়ীতে জিনিসপত্রের কি দাম জিজ্ঞেস করে বেড়াইগে—"

গৃহিণী কহিলেন—"ওটুকু পারবে না। আমি করি কি করে? পাড়াতে বেড়াতে বেরুলে আমাদের তো ঐ কথাবার্ত্তা! না হলে জানতে পারতাম কি করে? পল্লা দাম বাড়লে ঠিক বলে, কিন্তু কমলে কোন দিন বলে না—" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"যা হয় হবে! কত আর যাবে? তা' হিসেবটা দিন লিখে রাখতে পারবে তো? ওটা তো আর এমন কিছু শক্ত কাজ নয়—দু'মিনিটে হয়ে যাবে—" কর্ত্তা কহিলেন—"হিসেব আর কি লিখতে হবে? সবই তো হিসেব করে দিয়ে যাচ্ছ তুমি?—"

—"তা' বলে হিসেব লিখতে হবে না? এ কি কথা! তোমাকে নিয়ে পারব না, বাপু? তোমার বিয়ে না করে সন্ন্যাসী হওয়া উচিত ছিল—"

কর্ত্তা তাহা জানেন। এখনও কোন-কোন দিন সংসার-সমুদ্র তরঙ্গোদ্বেলিত হইয়া উঠিলে লোটা ও কম্বল কিনিয়া হিমালয় গুহাবাসী হইবার সঙ্কল্পও করেন। কিন্তু সেই এক বাধা—রাহা খরচ ও হুজ্জতী। তাছাড়া এই বিশ বৎসর বিরাজিত জীবন যাপন করিয়া অকর্মণ্য ও আরাম-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। সন্ন্যাস লইলেও অভ্যাসের বশে শেষ পর্য্যন্ত-সেবা দাসী সংগ্রহ করিতে হইবে।

সংসারের টাকা-কড়ি, কয়েকদিনের জন্য যাহা প্রয়োজন স্বামীকে দিয়া ও নিজেদের যাহা প্রয়োজন নিজের কাছে রাখিয়া গৃহিণী বাকী সমস্তটা ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং ব্যাঙ্কের খাতা নিজের হাতবাক্সে তুলিয়া রাখিয়াছেন।

কর্ত্তা আপত্তি করিতে সাহস করেন নাই মৃদু প্রতিবাদ করিলেন—"যদি বাড়তি কোন খরচ হয়?" গৃহিণী কহিলেন "কি খরচ হবে শুনি?" তাঁহার যা' যা' প্রয়োজন এক-একটী করিয়া হিসাব করিয়া গৃহিণী যে নিখুঁত তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন—তাহার বাহিরে আর যে কি প্রয়োজন হইতে পারে কর্ত্তা কিছুতেই স্মরণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শেষে কহিলেন—"যদি কেউ কিছু চাইতে আসে—ধর—চাদা, বকশিশ, ভিক্ষে—"

গৃহিণী বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন—"চাদা আবার কে চাইতে আসবে? যা' কি বছর দেওয়া হয়, সব দিয়ে দিয়েছি। তোমার কাছারির চাকর-বাকর, পিয়ন, ধোপা, নাপিত, মেথর যে যে বকশিশ পায়, পেয়ে গেছে। ভিক্ষে কাউকে দিতে হবে না; কেউ চাইতে এলে বলে দেবে—ভিক্ষে দেবার ক্ষমতা আমাদের নাই; যা' দিনকাল পড়ছে—আমাদের কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি উঠবে কোনদিন—"

কর্ত্তা চুপ করিয়া রহিলেন। হঠাৎ একটা প্রয়োজনের কথা মনে পড়িল—কহিলেন—"যদি সিনেমা-টিনেমা যাবার ইচ্ছে হয়?" গৃহিণী হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন— "কিছু বাড়তি রেখে গেছি গো! হিসেব করে খরচ করলে অত খরচ হবে না দেখো। তা' ছাড়া হাত-বিরেতে নাই বা বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ালে! বাড়ীতেই থেকো—"

কর্ত্তা কিছু বলিলেন না; মনে পড়িল—একজন মক্কেলের কিছু টাকা পাঠাইবার কথা আছে—

গৃহিণী কহিলেন—"চন্দ্রকে বলে গেলাম—মক্কেলেরা কেউ যদি কিছু পাঠায় তো যেন রেখে দেয়। সংসারের মধ্যে শশী আর ওর উপরে আমার নির্ভর। বলেছি—যেন খোঁজ খবর নেয়, নেবেও; আমার কথা খুব শুনে—ছেলের মত ভক্তি করে—"

চন্দ্র কর্ত্তার মুহুরী। অনেক দিন হইতে তাহার কাছে আছে। চন্দ্র গৃহিণীর দক্ষিণ হাত—গুপ্তচরও। সেরেস্তায় কি হইতেছে—কি আসিতেছে, কোন মক্কেল কত টাকা দিয়া গেছে, কাছারিতে কি কি ঘটিতেছে—সব খবরগুলি গৃহিণীর কাছে পৌঁছায়। কর্ত্তা কহিলেন—"পঞ্চাননও তো খুব ভক্তি করে তোমাকে?"

গৃহিণী কহিলেন—"তা' করে—কিন্তু ভারী হাতটান; বিয়ের কথা হওয়া অবধি যেন একেবারে ছুরি শানিয়ে বসে আছে সারাক্ষণ—"

কর্ত্তার খাওয়া-দাওয়ার সম্বন্ধে গৃহিণীর চিন্তার অবধি নাই। পঞ্চানন ঠিক কি সময়ে রাঁধিতে পারিবে? ঠিক সময়ে খাইতে দিবে? চন্দ্রকে এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া লাভ নাই। কারণ রান্না ঘরের ব্যাপারে এক গৃহিণী ছাড়া কাহারও কথা শুনে না পঞ্চানন। পঞ্চাননের দিন কয়েক ধরিয়া রিহার্সাল চলিতেছে। গৃহিণী এ কয় দিন রান্না ঘরে যান নাই, পঞ্চাননের উপর সব ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং কি করে ও কেমন করে পরীক্ষা করিতেছেন। পঞ্চানন প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে তবু ভুল-চুক বাহির হইতেছে।

সকাল নয়টার সময়ে কর্ত্তা এক বাটী দুধ খান। পঞ্চানন চা ঠিক সময়ে দিয়াছে—কিন্তু দুধের কথা মনে পড়ে নাই। ঠিক সময়ে গৃহিণী রান্নাঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"পঞ্চু—কর্ত্তাকে দুধ দেওয়া হয়েছে?"

পঞ্চানন কি একটা রান্না করিতেছিল—ছাড়িয়া দিয়া দুধের কড়াটার দিকে ছুটিল—দুধ তখনও পর্য্যন্ত জ্বাল দেওয়া হয় নাই।

গৃহিণী কহিলেন—"তরকারিটা উনুনে চাপানই থাকবে নাকি? পুড়ে যাবেনা?" পঞ্চানন আবার উনানের দিকে ছুটিল দুম করিয়া কড়াটা মাটীতে নামাইয়া দিয়া একটা বাটীতে দুধ ঢালিবার উপক্রম করিতেই গৃহিণী কহিলেন—"বাটীটা ধুলি না।"

পঞ্চানন বাটী ধোয় নাই—কহিল—"শশী ধুয়েছে বোধ হয়—" কালোশশী বাহিরেই দাঁড়িয়েছিল—খনখন করিয়া কহিল—"আমি কখন ধুলাম আর বাটী ধুয়ে দিবার জন্তে তখন আমি থাকব নাকি ?" পঞ্চাননের পরীক্ষা চলিতেছে বলিয়া কালোশশীর দিন কয়েক ছুটী হইয়াছে।

পঞ্চানন বাটী ধুইয়া আনিতেই গৃহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন—"দুধ জাল দেওয়া হয়েছে ?"

পঞ্চানন মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কহিল—"আজ্ঞে না—"

গৃহিণী কড়া গলায় কহিলেন—"এই দুধ তুই কর্ত্তাকে খাওয়াতে যাচ্ছিস ? কি না কি গাইয়ের দুধ কত রকমের রোগের বীজ গিজ্ গিজ্ করছে ! এতদিন দেখেও তোর কোন শিক্ষা হ'ল না। তুই যে কোন রোগ ঢুকিয়ে দিবিরে ছোড়া—" পঞ্চানন প্রতিবাদ করিয়া কহিল—"আপনিই তো দিন দুধ জাল দেন—" কালোশশী টিপ্পনি কাটিল দিদিমণি দিন দিন উড়ে এসে তোর জন্তে দুধ জাল দিয়ে যাবেন কি না ?"

পঞ্চানন মাথা চুলকাইতে লাগিল। গৃহিণী দুধ জাল দিবার আদেশ দিয়া কহিলেন—"তুই যে কি করবি ! খেতেই হয়তো দিতে ভুলে যাবি কোন দিন ! সব ঠিকঠাক্—না হলে বাবাকে লিখে দিতাম যাওয়া হবে না—"

পঞ্চাননের সব কাজেই ত্রুটী বাহির হইয়া পড়িতেছে। মোট কথা পঞ্চানন অবিরত তাড়া খাইয়া নার্ভাস হইয়া পড়িয়াছে। বরাবর যে কাজ অনায়াসে করিয়াছে—তাহাতেও ভুলচুক হইতেছে। যতই গৃহিণীর যাওয়ার দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে—ততই ভুলের সংখ্যা বাড়িতেছে। যাওয়ার ঠিক আগের দিন ডাল ও ভাত রান্নায় গোলমাল হইয়া গেল। ভাত পাথর কুচির মত শক্ত, ডালের রং হলুদের প্রাচুর্য্য হেতু রক্তকেও হার মানাইল। গৃহিণী ব্যাপার দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। কর্ত্তা কাছে পিঠেই ছিলেন, ডাকিয়া কহিলেন—"ওগো শুনছ ? একটা তার করে দিলে হয় না ?" কর্ত্তা গৃহিণীর অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিয়া কহিলেন—"কি হ'ল ! বুকের ব্যাথাটা আবার জানাল নাকি, ডাক্তারকে খবর দিতে হবে ?" হাক দিলেন—"খোকা—খোকা !"

খোকা বড় ছেলের ডাক নাম—বৎসর সতের বয়স—কলেজে পড়ে, স্নানের ঘরে ছিল—সাড়া দিল—"এই যে—যাই বাবা !" গৃহিণী ধমক দিয়া কহিলেন—"তুমি ভারী ধড়ফড়ে লোক—বাপু ! কি ব্যাপার না শুনেই ঘরশুদ্ধ সবাইকে অস্থির করে তোল—" কর্ত্তা আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন—"বুকের ব্যাথা নয় তা' হলে—" গৃহিণী ধারাল কণ্ঠে কহিলেন—"বুকের ব্যাথা নয়—মাথার" মুখের ইঙ্গিতে কহিলেন—"ঐ ছোড়া কি করেছে দেখ গিয়ে—" উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কে বুঝিতে কর্ত্তার কষ্ট হইল না—কহিলেন— "কি করেছে ?"

গৃহিণী খন্‌খন্ করিয়া কহিলেন—"আজ ষোল-সতের বছর হাতে ধরে রান্না শেখালাম—চোঁড়া ভাত ডাল রান্না করতে ভুলেছে ! ওর হাতে তোমাকে রেখে যেতে পারব আমি ? ও তোমাকে দুটী ভাত ডালও ফুটিয়ে দিতে পারবে না। তার চেয়ে বরং একটা তার করে দাও বাবাকে—আমার যাওয়া হবে না—" কর্ত্তা আশ্বাস দিয়া কহিলেন—"কেন এত ভাবছ বল দেখি ? ও যা' করবে তাতেই চলবে—একটা মাস তো—"

পঞ্চাননের রকম-সকম দেখিয়া গৃহিণী পূজার ঘরে গিয়া তাঁহার গৃহ দেবতার উপর সকল ভার চাপাইয়া দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

কর্ত্তার উপরও ঘনঘন উপদেশ বর্ষণ হইতে লাগিল—কাপড়-জামা যেন বেশী বাহির করা না হয় এবং যাহা বাহির করা হইবে তাহার প্রতি যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। টাকা-কড়ি সর্ব্বদা হাত-বাক্সে থাকিবে ! বাহিরে যাইবার সময়ে শয়নকক্ষে তালা দিতে যেন কোন ক্রমে ভুল না হয়। পঞ্চানন যদি সময়-মত খাইতে না দেয় তো নিজে যেন চাহিয়া খাওয়া হয়। কোন দিন যদি রান্নার গোলমাল হয় তাহা হইলে হোটেলে বা দোকানের খাবার না খাইয়া যেন রাধাচরণ বাবুর বাড়ীতে খবর দেওয়া হয়। কারণ গৃহিণী রাধাচরণ বাবুর স্ত্রীকে, তথা পাড়ার অন্যান্য বান্ধবীদের স্বামীর তদারক করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছেন। সন্ধ্যার আগেই ঘরে ঢুকিতে হইবে, এবং সকাল-সকাল খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িতে হইবে। এই উপদেশটী শুনিয়া কর্ত্তা বলিলেন—"তুমি নাই—ঘুম কি আমার হবে—" গৃহিণী কৃত্রিম কোপের সহিত কহিলেন—"বুড়ো বয়সে আর রঙ্গ করতে হবে না। আমার উপর

তোমার যা টান বুঝতে বাকী নাই। কতদিনের জন্তে যাচ্ছি, কোথায় কাছে কাছে থাকবে—তা নয়—সারাদিন আফিস ঘরে কাগজ-পত্তর নিয়ে বসে আছ—"

কালোশশী কহিল—"দিদিমণি, আমি গেলে তো পঞ্চাকেই মশারি টাঙাতে হবে—ও জানে কিনা জিজ্ঞেসা করুন তো?"

পঞ্চাননকে জিজ্ঞাসা করিতেই সে মাথা নাড়িয়া জানাইয়া দিল—ও বিদ্যা তাহার জানা নাই—গৃহিণী গালে হাত দিয়া কহিলেন—"সে কিরে? মশারী টাঙাতে জানিস্ নে? অত বড় ধুমড়ো গত্তর!" পঞ্চানন কহিল—"না জানলে কি করব। ও কাজ কি কোনদিন আমি করেছি—"

শিক্ষা-দান কার্য্য সুরু হইল। সারা দিনে ও রাত্রে বার চব্বিশ মশারি টাঙাইয়া ও খুলাইয়া কোন রকমে কাজ-চলা গোছের শেখানো হইল। তবে কার্য্যক্ষেত্রে কতদূর কি হইবে সে সম্বন্ধে গৃহিণীর সংশয় ঘুচিল না।

পরদিন সকালে চন্দ্রর শরণাপন্ন হইলেন গৃহিণী। কহিলেন—"দেখ বাবা চন্দ্র কারও উপরে আমার বিশ্বাস নাই—না কর্ত্তার উপরে, না পঞ্চার উপরে। তুমি নজর রেখো। সকাল বিকেল অন্ততঃ একবার ক'রে খবর নিও। খাওয়া-শোওয়া ঠিক মত হচ্ছে কিনা কর্ত্তাকে জিজ্ঞেস করো। পঞ্চা যেন ঘর-টর গুলো সরাইখানা করে না রাখে—দেখো। টাকাকড়ি সম্বন্ধে বাবুকে সাবধান করে দিও—"

পঞ্চাননকে বার বার ডাকিয়া কহিলেন—"রাত্রে বাইরের দরজা বন্ধ করতে ভুলিসনে, সব ঘরে তালা দিবি, দিনে বা রাত্রে কোথাও আড্ডা দিতে বেরোস না, বাবুর কাছে কাছে থাকবি, দেখা-শুনা করবি, ঠিক-ঠিক সময়ে খেতে দিবি, খারাপ জিনিস কিছু খাইয়ে দিস না, মশারি টাঙিয়ে দিবি, বাবুর ঘরেই শুবি, মোষের মত ঘুমোস নে—একটু হুঁস রাখবি—"

যাইবার ঠিক প্রাক্কালে কহিলেন—"বাবুর ঘর-টর করেছিস যদি এসে শুনি, যা'ক যা' বলে যাচ্ছি সব ঠিক ঠিক করেছিস দেখি তো পাঁচ টাকা বকশিশ দেব—আর এক জোড়া ভাল কাপড় দেব—" পঞ্চানন একগাল হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যান না,—এলেই শুনতে পাবেন কি করেছি আর, কি না করেছি—"

যাত্রার সময় আসিয়া পড়িল। কতদিন পরে বাপের বাড়ী যাইতেছেন, ছেলেমেয়েরা সব সঙ্গে যাইতেছে! তবু গৃহিণীর মনে সোয়াস্তি নাই। স্বামী ও সংসার পড়িয়া রহিল; আসিয়া যেমনটি রাখিয়া যাইতেছেন, ঠিক তেমনটী দেখিতে পাইবেন কি না কে জানে! আদেশ ও উপদেশাবলী স্বামীকে এবং ভৃত্য ভৃত্যকে আর একবার শুনাইয়া দিলেন, এবং গৃহদেবতাকে প্রণাম করিবার সময়ে ইহাদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিবার জন্ত পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিলেন।

(২)

বৎসর কয়েক পরে। জীবন-যাত্রার পথ অনেকখানি অতিক্রম করা হইয়াছে। সংসারের ভার ও বিস্তার দুইই বাড়িয়া উঠিয়াছে। স্বামী-স্ত্রী দুইজন দুই দিক সামলাইতে সারাদিন ব্যস্ত—, রাত্রে ছাড়া দুই জনের দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হয় না। স্বামী এখন সহরের মস্ত উকীল—কাজে এমনই ব্যস্ত যে দিনের বেলায় স্নানাহার বাহিরের ঘরেই সারেন। কাজ শেষ করিয়া অনেক রাত্রে অন্দরে ঢুকেন।

ছেলেমেয়েরা সব বড় হইয়াছে। বড় ও মেজ ছেলেটী পাশ করিয়া ভাল চাকুরী করিতেছে। তাহাদিগকে কন্যা দান করিবার জন্ত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দল পুনঃপুনঃ পত্রাঘাত করিতেছে। দুই-চার জন সরজমিনে হাজির হইবেন বলিয়া নোটীশ দিয়াছেন। কর্ত্তা মুখচোরা মানুষ—তাহাদের যে কি করিয়া ঠেকাইবেন—ভাবিয়া গৃহিণীর চিন্তার সীমা নাই। সংসারের সকল দায়িত্ব এতদিন নিজ স্কন্ধে বহন করিয়াছেন, এক্ষেত্রেও তাহাই করিবেন—স্থির করিয়াছেন।

বড় মেয়েটীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি অন্তঃসত্ত্বা; প্রসবের জন্ত তাঁহার কাছে আসিয়াছে। ডাক্তার বলিয়াছে স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নয়—খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন। নিজের মেয়ে—শুধু তাই নয়, পরের বাড়ীর বধূ—কি করিয়া যে মা ও ছেলে দুইজন ভালয় ভালয় দুই ঠাঁই হইবে—ভাবিয়া গৃহিণীর রাত্রে ঘুম হয় না। মেজ মেয়েটী কলেজে পড়িতেছে। পরিচয়-সূত্রে কলেজের দু-একটী ছেলে বাড়ীতে আনা-গোনা সুরু করিয়াছে। তা'ছাড়া, মেয়ে কলেজে ভর্ত্তি হওয়া অবধি হোষ্টেলের ছেলেগুলি তাঁহার বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়া

দলবাঁধিয়া সান্ধ্যভ্রমণে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে কর্ত্তাকে বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। মেয়েকে তিনি কিছুই বলেন নাই—তবে কালোশশীকে মেয়ের প্রতি সদা সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার জন্য বলিয়া দিয়াছেন। কালো-শশী অবশ্য তাঁহার আদেশ পালন করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটী করিতেছে না—তবু এ সম্বন্ধে তাঁহার মনে সারাক্ষণ অশান্তির কাঁটা খুঁচিতেছে।

যে ছেলেগুলি স্কুলে ও কলেজে পড়িতেছে—তাহাদের সম্বন্ধেও তাঁহার চিন্তা কম নহে। আজকাল সহরে একদল ছেলে-মেয়ের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, ইহারা পাঁচ রকমের বিদেশী বই পড়িয়া এমনই বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে নিজে-দের দেশী বাপ-মা-ভাই-বোনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না। সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় নাম কাটা সেপাই সাজিয়া কাজে অকাজে ঘুরিয়া বেড়ায়। ছেলে মেয়ে দল বাঁধিয়া মেশে এক সঙ্গে নাকি বাসও করে। নিজেদের সমাজ-ধর্ম্ম, রীতি-নীতির প্রতি ইহারা শ্রদ্ধাহীন; জাতি ও জাতীয়তার প্রতি নিষ্ঠাহীন; জাতীয় ভাবধারার প্রতি উদাসীন, এবং দেশ ও জাতির সত্যকার মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিহীন। আতাগাছে আপেল ফলাইবার ইহারা স্বপ্ন দেখে; বিদেশী বুলি আওড়াইয়া দেশের ছেলে-মেয়েদের মনকে মোহগ্রস্ত করিয়া তুলে। ইহারা স্কুল ও কলেজের ছেলেদের সহিত মিশে; তাহাদের দাদা ও দিদি সাজিয়া, পাঁচ রকমের পুস্তক ও পুস্তিকা পড়াইয়া, কাণে মন্ত্র দিয়া, নানারকমের আন্দোলনে, সভা-সমিতিতে, নাচ-গানের জলসায়—টানিয়া আনিয়া, নিজেদের দলবৃদ্ধির চেষ্টা করে। গৃহিণী ইহাদের নিজের ও অন্যের বাড়ীতে, রাস্তায় ঘাটে বহুবার দেখিয়াছেন। প্রাচীন শিক্ষা ও দীক্ষায় বর্দ্ধিত তাঁহার মন ইহাদের হাব ভাব, চাল-চলন বরদাস্ত করিতে পারেনা। তাঁহার নিজের ছেলেমেয়েরা কোন দিন এইরূপ হইয়া উঠিবে—ভাবিতেই তাঁহার মন শিহরিয়া উঠে। ছেলে-মেয়েদের তিনি পুনঃপুনঃ সাবধান করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ ফল হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কলেজে-পড়া ছেলে-দুটীর চাল-চলন সন্দেহজনক হইয়া উঠিয়াছে। পাঞ্জাবী ধরিয়াছে, চুল উল্টাইতেছে, নানারকমের বুলি আওড়াইতে সুরু করিয়াছে, নানা রকমের বই বাড়ীতে আমদানী করিতেছে; এমন কি আড়ালে আবডালে সিগারেটও খাইতেছে—জানিতে পারিয়াছেন। এ বিষয়ে কর্ত্তার কোন লক্ষ্য নাই—চিন্তাও নাই। কিছু বলিতে গেলেই বলেন—কোন চিন্তা নাই—এমনই একটা সময় সকলের জীবনেই আসে। তিনিও একদিন বিপ্লবী দলে নাম লিখাইয়া ছিলেন—তাহার অনেক বন্ধুও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া জেলে গিয়াছিলেন—এখন কিন্তু সকলেই নিজের নিজের সংসার পিঠে করিয়া বাঁধা রাস্তায় গুটি-গুটি পা ফেলিয়া নির্ব্বিবাদে চলিতেছে। কিন্তু মায়ের মন এত সহজে সান্ত্বনা মানে না। কোথাও কোন উপায় নাই দেখিয়া তিনি তাঁহার দেবতার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন।

কর্ত্তার জন্যও গৃহিণীর চিন্তা! তাঁহার শরীর আজকাল ভাল নাই। নানারকমের রোগ—অজীর্ণ, অনিদ্রা গেঁটেবাত ইত্যাদি। খাওয়া দাওয়ার একটু অনিয়ম হইলেই বিপদ। গৃহিণী নিজে কর্ত্তার জন্য রান্না করেন, পঞ্চাননের উপর নির্ভর করিতে পারেন না। কর্ত্তার পোষাক-পরিচ্ছদের সম্বন্ধেও গৃহিণীকে সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে হয়। কর্ত্তা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন; না দেখিলে হয়তো—পাৎলুনের সঙ্গে মোজা না পরিয়া, অথবা চটী জুতা পরিয়াই কাছারি চলিয়া যাইবেন। না বলিয়া দিলে দাড়ি কামাইতে ভুলিয়া যান। যত পসার বাড়িতেছে ও কাজ বাড়িতেছে, ততই নিজের ও সংসারের প্রতি তাঁহার উদাসীন্য বাড়িতেছে। সামাজিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও তাহার কোন হুঁস নাই। তিনি আছেন বলিয়া সব দিক সামলাইয়া যাইতেছেন। আজ যদি তিনি চোখ বুজেন, তাহা হইলে সংসারের অবস্থা কি দাঁড়াইবে ভাবিয়া, তিনি দিশাহারা হইয়া যান। ভগবানের কাছে নিয়ত প্রার্থনা করেন—"হে ভগবান! এখন যেন আমার মরণ না হয়! ছেলে দুটীর মনের মত বৌ আসুক, নিজেদের সংসার তাহারা বুঝিয়া লউক; তারপর স্বামী, সংসার ছেলে মেয়ে তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়া স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্তে যেন মরিতে পারি।"

পঞ্চাননটাও যেন দিন দিন বেপরোয়া হইয়া উঠিতেছে। এখন তাহার ছেলে মেয়ে হইয়াছে, প্রায়ই ছুটী লইয়া বাড়ী যায়। তখন সংসারের রান্না বান্নার ভার তাঁহাকেই লইতে হয়। এতদিন চাকরী ও চুরি করিয়া পঞ্চানন কিছু জমাইয়াছে—দেশে জমি-বায়গাও কিছু করিয়াছে। আজকাল কিছু বলিতে

গেলেই—চাকরী ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীতে বসিয়া চাষ-বাস করিবে বলিয়া তয় দেখায়। এখন আবার নূতন লোক আসিলে তাহাকে শিখাইয়া, পড়াইয়া মানুষ করিতে সারা জীবন কাটিয়া যাইবে, কাজেই গৃহিণী পঞ্চাননের তোষামোদ করেন। শুধু কালোশশী ঠিক আছে। বোনের মত কাছে কাছে থাকে—তাঁর সেবা করে, যতদূর সম্ভব সব কাজে সাহায্য করে, ছেলেমেয়েদের স্নেহ করে, আবশ্যক হইলে শাসন পর্যন্ত করে। ওরই উপরে নির্ভর! ও না থাকিলে একা তিনি এ সংসার সামলাইতে পারিতেন না।

* * * *

হঠাৎ একদিন আহ্বান-লিপি আসিল। মুহূর্তের মধ্যে গৃহিণীকে প্রস্তুত হইতে হইল। এবার সঙ্গে কেহ যাইবে না, যাইবার উপায় নাই। সুদূর পথ, অনন্তকালের জন্য যাত্রা তবু গৃহিণীকে একাই যাইতে হইবে।

রাত্রে সুস্থদেহে গৃহিণী ঘুমাইতে গিয়াছিলেন। শেষরাত্রে একবার কিসের উঠিয়া বাহিরে যান, কি দেখিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠেন। ছোট মেয়ে তাঁহার ঘরে শুইয়াছিল; মায়ের চীৎকারে জাগিয়া উঠিয়া বাহিরে গিয়া দেখে—মা বারান্দায় পড়িয়া আছেন—সম্পূর্ণ অচৈতন্য। সে সকলকে জাগাইয়া তুলে। সকলে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া গৃহিণীকে বিছানায় আনে। তারপর আর জ্ঞান হয় নাই। ডাক্তার আসিয়া চেতনা-সঞ্চারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া, শেষ বিদায়ের জন্য সকলকে প্রস্তুত হইতে বলিয়া গিয়াছেন।

শুভ্র শয্যায় গৃহিণী শায়িতা—সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীনা, চোখ দুইটী নিমীলিত, চোখের কোণ হইতে মাঝে মাঝে জল পড়িতেছে। শিয়রে বসিয়া স্বামী কোঁচার খুট দিয়া মুছিয়া দিতেছেন। সিন্ধু-চিহ্ন-হীন সমুদ্রের মধ্যে অকস্মাৎ জাহাজ-ডুবি হইলে লোকের মুখের চেহারা যেমন হয়, তাঁর মুখের চেহারা তেমনই। ছেলে মেয়ে গুলি শুষ্ক-বিষণ্ণ মুখে চারি পাশে দাঁড়াইয়া আছে—চোখে অবিরল অশ্রুধারা।

বড় মেয়েটী পায়ের কাছে বসিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের পায়ে হাত বুলাইতেছে। পঞ্চানন মাঝে মাঝে আসিয়া দরজায় দাঁড়াইতেছে—মুখে বিষাদের ছায়া। কালোশশী এক পাশে বসিয়া আছে—চোখে সদ্য ক্রন্দনের চিহ্ন।

আসন্নপ্রায় বিদায়ের লক্ষণ গৃহিণীর সারা দেহে ফুটিয়া উঠিল। ছেলে মেয়ে গুলি কাঁদিয়া উঠিল—"মা—মা কোথায় যাচ্ছ মা!" কালোশশী কাঁদিয়া উঠিল—"আমাকে কার কাছে রেখে যাচ্ছ, দিদিমণি—" পঞ্চানন কোঁচার খুটে চোখ মুছিতে লাগিল। চন্দ্র কোন এক বড় হোমিওপ্যাথের সন্ধানে গিয়াছে। সে শেষ বিদায়ের ক্ষণে উপস্থিত থাকিতে পারিল না।

সব শেষ হইয়া গেল! প্রসূত শোকোচ্ছ্বাস তীব্র চীৎকারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ছেলে-মেয়েরা মায়ের বুকে আছড়াইয়া পড়িল—বড় মেয়ে মায়ের পায়ে মাথা রাখিয়া একটানা কাঁদিতে লাগিল—মা—মাগো—কালোশশী বুকফাটা কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে মেজেতে লুটাইতে লাগিল, পঞ্চানন দরজার পাশে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, কর্ত্তা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন হঠাৎ হো-হো করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিলেন—"কোথাও দুদিনের জন্যে গেলে কত ব্যবস্থা করে যেতে—আজ চিরদিনের জন্যে যাবার সময় কি ব্যবস্থা করে গেলে! আমি কিছুই যে জানি না—"

একটী প্রশান্ত স্তব্ধতা গৃহিণীর সারা অঙ্গে বিরাজ করিতেছে, চোখ দুইটী অর্দ্ধ উন্মীলিত, অধরোষ্ঠে অতি ক্ষীণ নিরুপায় হাসি।

কি দেখিলাম ?

শ্রীছাত্রী

কলেজে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই কলেজের সামনের পার্কে ভীষণ ভীড় জমিয়াছে। বহু লাল পাগড়ী এবং দুচার জন বড় পুলিশ অফিসারও আছেন। সবাই ভীড় থামাইয়া লাইন করিয়া জনতাকে বসাইতে ব্যস্ত। পার্কের এক কোণায় সামিয়ানা খাটান হইয়াছে। লাল, কালো, সাদা কাপড় ও ব্রিটিশ পতাকায় উহা সুসজ্জিত। ঘরের বাহিরে মাঝারি আকারের একখানা টেবিল ; কয়েকখানা চেয়ারও সেখানে আসিয়াছে আর আসিয়াছে একটি ট্রাকে কয়েক গাঁইট কাপড় ও কয়েক বস্তা চাল। দেখা মাত্রই অনুমান করিতে অসুবিধা হইল না যে বিজয় উৎসব উপলক্ষ্যে দরিদ্র ভারতবাসীকে ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতিনিধির মারফৎ কিছু চাউল ও কাপড় বিতরণ করিয়া ব্রিটিশ সরকার প্রভূত পুণ্য অর্জ্জন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কাতারে কাতারে নিরন্ন দেশবাসী একখানা কার্ড হাতে করিয়া আসিয়া দুর্ব্বাদলাচ্ছাদিত কার্পেটের উপর আসন গ্রহণ করিল, লাঠি হস্তে শান্তিরক্ষকগণ শান্তি রক্ষা করিতে লাগিল। কলেজের বারান্দায় দাঁড়াইয়া বহু সঙ্গীসহ এই দৃশ্য দেখিতেছি ; তাহারা নানা আলোচনা করিতেছেন ; তাহার মধ্য হইতে মাঝে মাঝে দু একটা কথা কাণে আসিতে লাগিল একজন বলিলেন, "ভাগ্যি ভাই ব্রিটিশের Victory হ'ল নইলে ওরা কি এই চাল ও কাপড় পেতো ? রোজ রোজ ওদের এমনি Victory হোক আমাদের দেশের লোক খেয়ে পরে বাচুক।"

এই উৎসবে কারা আসিয়াছে কুকুরের মত ভিক্ষে নিতে ? এই রকম চিন্তায় মনটা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ছিল—কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মেয়েটির ঐ ধরণের কথার উত্তর না দিয়া আর থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম—"ভাই লেখাপড়া শিখে একথা কেমন করে বলছ ? কিসের Victory ? আর কারা এসেছে ভিক্ষে নিতে ? চোখ খুলে দেখো, ভাবো। ভারতবাসী আজ হয়েছে উলঙ্গ তার বস্ত্র গেছে বিদেশে ; অনাহারে সে মৃত্যু বরণ করছে আর তার দেশের উৎপন্ন শস্য বিদেশকে খোরাক যোগাচ্ছে।

ইংলণ্ডে সারা বছরে আহার্য্য দ্রব্য জন্মায় মাত্র ৬৬ দিনের আর সারা বছরের আহার তাদের বাইরে থেকে নিতে হয়, এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ভিতরেও তাদের অন্নাভাব এক দিনের জন্যও ঘটে নাই, আর আমাদের এই শস্য শ্যামলা বাংলাদেশের বুকের উপর দিয়ে যে দুর্ভিক্ষের ঝড় বয়ে গেলো তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে মেলে না। যে আহার্য্য দ্রব্য আমাদের দেশে জন্মায় তাদিয়ে আমাদের দেশবাসী সারা বছর সুখে স্বচ্ছন্দে খেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আজ আমাদের পেটে অন্ন নেই, নারীর লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নেই, শিক্ষা নেই, আত্মসম্মান জ্ঞান নেই, আর আমরা বলছি রোজ রোজ এমনি বিজয় উৎসব হোক।"

আকাশে বেশ রোদ উঠিয়াছিল হঠাৎ এক টুকরা ছেঁড়া মেঘ কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া বর্ষণ সুরু করিল ; আমার মনে হইল যে আমার দেশবাসীর এই দৈন্য ও নির্লজ্জতা দেখিয়া প্রকৃতি দেবীও চোখের জল রাখিতে পারিতেছেন না। আবার রোদ উঠিল। রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া জনতা সস্ত্রীক কে. সি. সাহেবের অপেক্ষা করিতেছিল। সাড়ে আটটায় তাঁহারা আসিলেন। একদিকে পুলিশ কর্ম্মচারীগণ তাহাদের কার্য্যে যেমন বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিলেন অপর দিকে প্রভুভক্তের দলও তেমনি চঞ্চল হইয়া উঠিল। শেষোক্তদের মধ্যে একটী ভদ্র মহিলার তৎপরতা ও নির্লজ্জ ব্যস্ততা সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাঁহার প্রভুভক্তির আতিশয্যের গোপন কারণ বুঝিতে কাহারও কোন কষ্ট হইতেছিল না। একটী মহিলার নির্লজ্জতা যেন আমাদের সমগ্র স্ত্রীজাতিকে কলঙ্কিত করিতেছিল।

একটা বিষয় সকলেই লক্ষ্য করিলাম যাহারা কাপড় ও চাউল নিতে আসিয়াছিল তাহারা সকলেই কালীঘাটের পেশাদার ভিখারি নন, মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিণী ও বিধবা মাতাও আছেন। তাহাদের আচার ব্যবহারে সংস্কৃতির চিহ্ন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। দারিদ্র্য এখনও তাহা নিংড়াইয়া

নিঃশেষ করিতে পারে নাই। মনে হইল যুদ্ধের পূর্ব্বে ৩০৲ টাকা মাহিনায় কেরাণীও তাহাদের মাতা ও স্ত্রীর লজ্জা নিবারণের বস্ত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে ১০০৲ টাকা মাহিনার কেরাণীরও সে সামর্থ নাই। এই সব পরিবারের মেয়েরাও যে এই ডিপার্টি দলে আসিতে বাধ্য হইয়াছেন তাহা বুঝিতে ক্লেশ হয় না।

ক্লাসের ঘণ্টা পড়িল। সকলেই বারান্দা ছাড়িয়া যে যাহার ক্লাসে চলিয়া গেলাম। ১১টায় ছুটীর সময় দেখিলাম পার্ক খালি হইয়া গিয়াছে কিন্তু মনটা তখনও খালি হয় নাই। একান্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ী ফিরিলাম।

শূর্পনখার অবমাননা

মৈত্রেয়ী গুপ্তা

রামায়ণে অনার্য্যদের রাক্ষস বানর প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তাহাদের যাহাই বলা হউক—তারা সৌর্য্যে বীর্য্যে আর্য্যদের সমকক্ষই ছিলেন। প্রবল প্রতাপান্বিত রাবণের রাজ্য অযোধ্যার তুলনায় কোন অংশে ন্যূন ছিল না। অপূর্ব্ব মণি মাণিক্য খচিত বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত রাবণ-রাজসভার বর্ণনা রামায়ণে পাওয়া যায়।

দশানন রাবণ আপন সাম্রাজ্য অতীব শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচলনা করিতেছিলেন।

অযোধ্যা-রাজ দশরথ স্বীয় মহিষী মহারাণী কৈকেয়ীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম পিতৃ-সত্য পালন করিতে অযোধ্যাপুরী ত্যাগ করিয়া চৌদ্দ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসী হইতে স্বীকৃত হন। রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা সীতাদেবী তাঁহার অনুগমন করিলেন।

একদা রাম লক্ষ্মণ সহ পঞ্চবটী বনে বিচরণ করিতেছিলেন সেই মাহেন্দ্র ক্ষণে পুষ্পিত বনভূমিতে বসন্তের অপূর্ব্ব সমারোহের মধ্যে এক অনার্য্যা নারী দেখা দিল। নারী জল-ভরানত মেঘপুঞ্জের ন্যায় কৃষ্ণা। অঙ্গবাস অতি সামান্য—দেহ নীলাকাশ সদৃশ উন্মুক্ত। নিঃসঙ্কোচ সাবলীল কঠিন দেহযষ্টীর সহিত শ্যামল বনভূমির অপূর্ব্ব সমাবেশ প্রকৃতি ভিন্ন কেহই লক্ষ্য করিল না। সঙ্কোচের কৃত্রিম আবরণ বনবাসিনীর মনো-রাজ্যকে আচ্ছন্ন করে নাই। নারী শূর্পনখা-লঙ্কাধিপতি দশানন রাবণের ভগিনী। শূর্পনখা যৌবনের শেষপ্রান্তে উপনীতা। একাকিনী নিঃশঙ্ক বিহারিনী অরণ্য-চারিনী শূর্পনখা বোধকরি এতদিন আপন আরধ্য দেবতার দর্শন পায় নাই। আজ যৌবন সূর্য্যাস্তের গোধূলি লগ্নে তাহার মন চঞ্চল হইলকেন? বিহঙ্গকুলের কাকলি তাহার মনে সুপ্ত বেদনার সৃষ্টি করিল। আকাশে বাতাসে যে সঙ্গীত গুঞ্জন করে আজি তার প্রতিধ্বনি শূর্পনখার হৃদয়ে ঝঙ্কার তুলিল। সহসা বনভূমি বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হইল।

বনপথের শুষ্কপত্র কাহার পদস্পর্শে মর্ম্মরিত হইয়া উঠিল। রাম লক্ষ্মণসহ পদচারণা করিতেছিলেন। শূর্পনখা রামের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে অবলোকন করিল। রামায়ণে রামের রূপ বর্ণনা আছে।

"মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত বাহু আজানুলম্বিত লোচন যুগল পদ্মপলাশ সদৃশ বিস্তৃত গতি গজতুল্য মস্তক জটামণ্ডলে মণ্ডিত, শরীর রাজলক্ষণ সম্পন্ন।"

প্রভাতের অরুণালোকে—দ্বিপ্রহরের খররৌদ্রে, সন্ধ্যার স্তিমিত আভায় প্রতিদিন রাম লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া শূর্পনখা আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিত। ধীরে ধীরে মুক্ত বিহঙ্গমের ন্যায় বনবাসিনীর অন্তরে অনুরাগের সঞ্চার হইল।

কোন এক অশুভ মুহূর্ত্তে শূর্পনখার মন বিচলিত হইল। অনাবিল আনন্দে তাহার নিভৃততম কক্ষ হইতে পক্ষ বিস্তার করিয়া প্রকৃতির সহিত মিলিত হইতে চাহিল। শূর্পনখা সরোবরে স্নান সমাপন করিয়া আপন অঙ্গ পুষ্প দ্বারা শোভিত করিল। অযত্ন বিন্যস্ত তাম্রবর্ণের কেশপাশ কবরীবদ্ধ করিয়া অশোকগুচ্ছ দ্বারা বিচিত্র করিল ও যথাসময়ে রাম সমীপে উপনীতা হইল।

রাম তখন আপন পর্ণকুটীরে একাকী আসিন। শূর্পনখা তথায় যাইয়া আপন দেহভার বংশদণ্ডে ন্যস্ত করিয়া অধোবদনে

রামের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। রামের পরিচয় পাইয়া সূর্পনখা আপন অনুরাগ জানাইয়া রামকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহার নিঃসঙ্কোচ অনুরাগ প্রকাশ রামের মনে কৌতুক সঞ্চার করিল। তিনি বহুদিন অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত, বিদ্বজ্জনের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত। তিনি হাস্যোদ্রেক করিয়া উঠিলেন, পরে বলিলেন,—তাঁহার পত্নী বর্ত্তমান এবং সূর্পনখাকে অকৃতদার লক্ষ্মণের সমীপে যাইতে অনুরোধ করিলেন। লক্ষ্মণও রূপবান পুরুষ—সূর্পনখা লক্ষ্মণের নিকট গেল। কৌতুকটী পূর্ণভাবে উপভোগ করিবেন বলিয়া রাম লক্ষ্মণকে অকৃতদার বলিয়া সূর্পনখাকে বঞ্চনা করিলেন।

সূর্পনখা লক্ষ্মণ সমীপে যাইলে লক্ষ্মণ তাহাকে রামের কনিষ্ঠ সহধর্ম্মিণী হইতে উপদেশ দিলেন।

রাম লক্ষ্মণের নিকট নারী ক্রীড়নক হইয়া উঠিল। সূর্পনখা ইহাদের পরিহাস বুঝিতে পারিয়া ক্রোধান্বিতা হইলে লক্ষ্মণ দেখিলেন কৌতুক উপভোগ আর বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। তিনি চরম আনন্দ উপভোগ করিতে সূর্পনখার নাসা ও কর্ণ ছেদন করিলেন।

সূর্পনখা যখন রাম সকাশে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে লাবণ্যময়ী বলা হইয়াছিল—কিন্তু রামায়ণ অনার্য্যা নারীর লাবণ্যকে রাক্ষসীর ছদ্মবেশ বলিয়াছে।

প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী প্রেম সুন্দর অসুন্দর জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে সকল হৃদয় অধিকার করে। ইহা যৌবনের সুন্দরতম আত্মোপলব্ধি। ইহাতে কোন অপরাধ নাই। অনার্য্যা নারীর অনুরাগ কাম ও সুন্দরী জনকতনয়ার রামের প্রতি আসক্তিকে প্রেম বলা হইয়াছে কেন? সকলেরই অনুরাগ প্রকাশের অধিকার আছে। ইহা সূর্পনখার পক্ষে যেমন স্বাভাবিক—তাহার ভালবাসার প্রতিদান দিতে রামের অক্ষমতাও তেমনি স্বাভাবিক। রামের সূর্পনখার প্রেম প্রত্যাখ্যানে কোন অপরাধ হয় নাই কিন্তু নারীর অন্তরের সূক্ষ্মতম সত্তা লইয়া রঙ্গরস করিলেন কেন—ইহা হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছে। উপরন্তু নারীর অঙ্গচ্ছেদ করা পৌরুষের কোন পর্য্যায়ে পড়ে? তাহা সত্ত্বেও এত বড় হীনতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেওয়ায়, লক্ষ্মণ রামায়ণে মনুষ্যত্বের স্তর হইতে নামিয়া যান নাই বরং তিনি দেবতা বলিয়াই গণ্য হইয়াছেন। নারীর লাঞ্ছনা রামায়ণে হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছে।

বাল্মিকী সূর্পনখাকে রাক্ষসী বলিয়া গালি দিলেন—লক্ষ্মণের পাপ ক্ষয় হইয়া গেল। এত বড় নিষ্করুণ আচরণ বাল্মিকীর মনে দয়ার সঞ্চার করিল না।

নারী যে দেশে লাঞ্ছিতা, অত্যাচারিতা হইয়া আসিয়াছে সেই দেশেই নারীকে দেবী বলা হয়। মানুষের অধিকার যার নাই সে দেবী। যেখানে অপরাধ যত গভীর প্রতারণাও সেখানে তত বেশী। সীতার অগ্নিপরীক্ষা ইত্যাদি ভারতের গৌরব নয়—লজ্জা।

ভগিনীর এইরূপ অবমাননায় রাবণ প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। অগত্যা জানকী হরণ হইল। রাবণকে রাক্ষস পর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছে—কিন্তু তিনি রাজার মতন আচরণ করিয়াছিলেন। জনকতনয়ার মর্য্যাদা নষ্ট তিনি করেন নাই। সীতার অগ্নি-পরীক্ষায় তার প্রমাণ আছে। মানুষ সর্ব্ব দোষ মুক্ত হইতে পারে না—কিন্তু যাহা অগৌরবের তাহাতে পৌরুষের আলোকপাত করিয়া হাস্যরসের সৃষ্টি করায় মানব মনের ক্ষুদ্রতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

হে ভারত, বন্দিনী ভারত !

শ্রীনরেন্দ্র বসু

সবার প্রথমে তুমি
তারপর বিরাট পৃথিবী,
হে ভারত,
বন্দিনী ভারত !—
প্রথম তোমারি অনুভব !!
ব্যথায়, জ্বালায় আর জীবনের নতুন আশায়
হে জননী, জন্মভূমি মোর
প্রথম তোমার কথা আমার পরাণে যেন রয়।

তোমারে বেসেছি ভালো সকলের আগে
হে ভারত,
স্বাধীন ভারত !···
বেসেছি তাদেরি মতো আমি,
আর যারা ভালো বেসে গেছে :—
তাদের স্বপ্নের মতো আমারো স্বপ্নের মাঝে তুমি
এই পরাধীনতার রাতে ;
তাদের রক্তের মতো দুর্মর রক্তের ঢেউ
আমারো বুকের পরিখাতে !
সহ্য আর অসহ্যের সীমান্তে আমার
চির জাগরূক তুমি :
আর জাগে আজ—
উপেক্ষার অন্ধকারে, বঞ্চনার অবন্ধ-নির্জনে
দুরূহ চিন্তার রাত—
গ্লানি ও লজ্জার রাত—
সেই সব রাজাহারা রাজাদের মতো।···
আর সেই সব ভক্ত,
সর্বত্যাগী নিরলস নেতাদের মতো
একমাত্র ইচ্ছা সেই—দেশে যেতে চাই
আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠা তোমায় !!
আবার নতুন করে জ্বলিয়া উঠুক
এ মহা কামনা মোর আকাশে-ধূলায়,
তোমার ব্যথিত বুকে
অগণিত মূক আর ক্ষুধিতের প্রাণে ;
জ্বলিয়া উঠুক ঘিরে এই বহ্নি-শিখা
লাঞ্ছিত ও বঞ্চিতের গানে।
হে ভারত,
বন্দিনী ভারত !—
তোমার অশ্রুর সাথে
সর্বহারা জনতার এই অন্ধরাতে
জ্বলিয়া উঠুক বহ্নি—
নব-জীবনের বহ্নি—
নতুন সৃষ্টির মহানিস্বর উল্লাসে !
মহাজাতি গড়িয়া তুলুক
তব চির অভিপ্রেত আগামীর নব ইতিহাস।

সবার প্রথমে তুমি
তারপর বিরাট পৃথিবী,
হে ভারত,
বন্দিনী ভারত !—
প্রথম তোমারি অনুভব।
ব্যথায়, জ্বালায় আর জীবনের নতুন আশায়
হে জননী, জন্মভূমি মোর
প্রথম তোমার কথা চিরদিন প্রাণে যেন রয়।

ভারতে শিল্পোন্নয়নের প্রকৃত অন্তরায়

কালীচরণ ঘোষ

ভারতবর্ষের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার যত কল্পনা ভারত সরকারের মগজে গজাইয়া উঠিয়াছিল, তাহার কোনটাই রূপপরিগ্রহ করিতে পারে নাই। যে কয়টী বিভাগ লইয়া পরিকল্পনা গড়িয়া উঠিবে বলিয়া ভারত সরকার মনে করিয়াছিল, তাহাদের নাম ও সভ্যদিগের নামের একটা তালিকাও প্রকাশ করা হয়। তাহার অধিক কিছুই হয় নাই। পরিকল্পনা সমিতিগুলির কোনও নির্দ্দেশ কাহারও নজরে পড়ে নাই, সম্ভবতঃ তাহাদের অনেকের প্রাথমিক অধিবেশন পর্য্যন্ত হয় নাই।

যুদ্ধ মিটিয়া গিয়াছে, যুদ্ধোত্তর কাল উপস্থিত, কিন্তু পরিকল্পনা নাই। এখন মনে হইতে পারে যে আর পরিকল্পনার প্রয়োজন নাই; কারণ ইংরেজ জিতিয়াছে, ভারত শাসনের যে পরিকল্পনা, রক্ষণশীল উদারনৈতিক বা শ্রমিক যে কোনও রাজনৈতিক দল প্রাধান্য লাভ করুক, স্থির করা আছে সেই অনুযায়ী সমস্ত বিভাগ নিয়ন্ত্রিত হইবে।

অথবা, বাঙ্গালা ভাষার প্রবচনে বলে তবী নাস্তী কোনও স্ত্রীলোকের চালা ঘরে জল পড়িত; যে কোনও কারণে তাহার আবাসে নানা লোক আসা যাওয়া করিত। বৃষ্টির সময় তাহাকে যদি বলা যাইত, কেন সে ঘর সারায় না, তখন তাহার উত্তর ছিল, "জল প'ড়ছে সারাই কি ক'রে।" বৃষ্টি বন্ধ হইলে সারাইবার কথায় বলিত, "জল যখন পড়ে না, তখন আবার সারাবো কি?"

আমাদের ভারতসরকার রূপ তবীর অনুহাত কতকটা হয়ত সেইরূপ। যুদ্ধ যখন মিটিয়া গিয়াছে তখন আর যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার কোনও প্রয়োজন নাই। যুদ্ধকালে তাহা কখনও সম্ভব নয়। সুতরাং শিল্পপ্রতিষ্ঠার কোনও সুচিন্তিত কর্ম্মপদ্ধতি পাওয়া গেল না এবং তাহার সম্ভাবনা ভবিষ্যতে আরও কম। ইহাতে দুঃখ করিবার কোনও কারণ নাই কারণ ভারতবর্ষ ইহাতে সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। আমাদের অর্থের অপব্যয় করিয়া বহু "কমিশন" আসিয়াছে, বিদেশী পর্য্যটকের দ্বারা গঠিত যতদূর সম্ভব, এই সকল "কমিশন" বহুবার বহু নির্দ্দেশ দিয়াছে; কিন্তু ভারতের কপালের যেগুলি তাহা ছাড়া আর কোনটাই পালিত হয় নাই। "পী কমিশন" যে নির্দ্দেশ দিল, তাহাতে ভারতের কোটী কোটী টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু কৃষি, শিল্প, মৎস্য, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কোনও কমিশনের নির্দ্দেশ পালিত হয় নাই।

ভারতসরকারের পরিকল্পনা পাওয়া না গেলেও, ভারতীয় শিল্পসম্পর্কিত এক নীতি ভারতসরকারের পরিকল্পনা এবং উন্নতিবিধায়ক বিভাগ (Planning and Development Department) হইতে প্রচারিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে নানারূপ সমালোচনা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এস্থলে বিশদ আলোচনার আর প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপতঃ ইহার মূল নীতি তিনটি:—(১) দেশের মধ্যে প্রাপ্তব্য মাল পত্রাদির সুষ্ঠু ব্যবহার দ্বারা জাতীয় দৌলত বৃদ্ধি করা, (২) দেশকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং (৩) কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি যাহাতে বেকার না থাকে তাহার সম্যক্ ব্যবস্থা করা,—এই তিনটী ভিত্তির উপর ভারত-সরকার শিল্পের সৌধ গড়িয়া তুলিতে চান। তাঁহাদের মতে এই সকল ব্যবস্থার ফলে যে অর্থ উৎপাদিত হইবে, তাহা যাহাতে যথাযথভাবে সকলের মধ্যে বণ্টিত হয়, অর্থাৎ সকলেই যাহাতে ইহার সুফল ভোগ করিতে পারে, তাহার দিকে তাঁহারা লক্ষ্য রাখিবেন।

এই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে ভারতসরকার কতগুলি শিল্প স্বকরে রাখিবে; কতগুলি বিষয়ে সরকারী সাহায্য করিবে আর মোটামুটি সকল প্রকার বৃহদাকার শিল্পের উপর একটা খরদৃষ্টি রাখিবে। এই নীতি কার্য্যকর করিবার জন্য তাঁহারা ইহার আরও বিশদ আলোচনা করিয়াছে এবং সমস্ত বক্তব্য শুনিলে মনে হইবে, বর্ত্তমান অবস্থার পক্ষে তাহা নিতান্ত উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিবার মত নীতি নহে। প্রকৃত পক্ষে ইহা কাজে লাগাইতে পারিলে দেশের যে মঙ্গল হইবে

তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। কার্য্যক্ষেত্রে ইহার বদ বদল সম্ভব এবং হয় ত তাহার প্রয়োজনও আছে, কিন্তু মূল কথা, এই নীতি প্রবর্ত্তিত হইতে কতদিন লাগিবে, ইহা কোনও কালে প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পারিবে কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। এবং আমার মতে, সমস্ত পরিকল্পনা সমস্ত কর্ম্মপদ্ধতি বা নীতি তাহারই উপর নির্ভর করিতেছে।

বৃহদাকার শিল্প সরকার বা ধনী শিল্পপতি, কাহার তত্ত্বাবধানে থাকিবে তাহা লইয়া আমার মত "গোলা লোক" মাথা ঘামায় না। দেশের মধ্যে ক্ষুদ্রবৃহৎ শিল্প গড়িয়া উঠুক, দেশ শিল্পবিষয়ে স্বাবলম্বী হউক, অনর্থক বিদেশী মাল কিনিয়া দেশের অর্থ পরহস্তে দিতে না হয়, দেশের লোকে কর্ম্মশক্তি থাকিতেও বেকার না থাকে, লোকের আয় ও জীবনযাত্রার মান অদূর ভবিষ্যতে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উত্তরোত্তর হয়, অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাস ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম হইতে কিছু অবসর কিছু আনন্দ ভোগ করিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা হইলে বর্ত্তমানের পক্ষে যথেষ্ট। শিল্পপতিগণ অতিরিক্ত লাভ পাইয়া অত্যন্ত হইয়াছে, জনসাধারণ তাহার সমৃদ্ধিতে লাভবান হয় না, সুতরাং সমস্ত প্রকৃত অর্থ-উৎপাদনকারী শিল্পতেই সরকারের মালিকানা থাকা প্রয়োজন এরূপ মনে না করিলেও হয়ত ক্ষতি নাই। আমি জানি, এই এক পংক্তি লেখার জন্য আমি ফ্যাসিষ্ট, নাৎসী, ইংরেজের টোরি দল ভুক্ত হইয়া গেলাম। কিন্তু যে দেশ শিল্পসম্পদে অত্যন্ত পশ্চাদপদ সেখানে 'কালনেমির লঙ্কা ভাগ' লইয়া অথবা সময় নষ্ট করিতে দেওয়া উচিৎ নয়।

ইহার কতগুলি কারণ আলোচনা করা যাইতে পারে। শিল্প গড়িয়া উঠিলে ট্যাক্স দ্বারা শিল্পের লাভের সংকোচন সাধন করা যাইতে পারে। যুদ্ধকালে মুনাফাকর বহু টাকা শিল্পপতিদের নিকট আদায় করিয়াছে। অংশীদার যদি কেহ থাকে, অর্থাৎ যৌথ মূলধনে কারবার গঠিত হইলে, নিয়ন্ত্রিত লভ্যাংশ বণ্টন দ্বারা অতিরিক্ত লাভ রোধ করা যাইতে পারে। অপরাপর বহু বিষয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণ কাজ করিলে, অজ্ঞ, বিচারবুদ্ধিবিহীন, স্বেত স্বার্থরক্ষায় নিযুক্ত, পূর্ব্বাপর জ্ঞানহীন ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিল্প সাধারণের ক্ষতির কারণ হইতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে চালু লাভজনক ব্যবসায় আইনের দ্বারা দখল করিয়া লইলে কাজ সহজ হয়, লোকসানেরও সম্ভাবনা কম থাকে; কেবলমাত্র পুরাতন মালিকদিগকে ক্ষতিপূরণ করিলে চলে। প্রয়োজন হইলে সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্ব পরিচালকবর্গের হাতে পরিচালনার ভার রাখিয়া সরকার "খবরদারি" করিতে পারে।

তাহা ছাড়া অন্য কথা আছে। ভারত সরকারের হাতে কতগুলি বৃহদাকার শিল্প রহিয়াছে। জনসাধারণ তাহা হইতে কত লাভবান্ হইতেছে, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। তাহা এমনই কঠিন হৃদয়হীন বস্তু, যে তাহার উপর আর কোনও আস্থাই নাই, থাকিবার কোনও কারণও বর্ত্তমান নাই। ভারত সরকারের রেল কোম্পানীর কথা আলোচনা করিলে সকল অবস্থা পরিস্ফুট হইয়া যায়। ভারতে রেল স্থাপন ও প্রসারের কাজ বিদেশী কোম্পানীর হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা প্রথম অবস্থায় ভারতীয় অর্থের কি ঘোর অপচয় ঘটাইয়াছিল, তাহা আজ ইতিহাসের কাহিনী। সরকারের হাতে রেল পরিচালনার ভার চলিয়া যাইবার পর তাহার কি অবস্থা দাঁড়াইল? হঠাৎ রেলওয়ে বোর্ডের আবির্ভাব ঘটিল, ভারতবাসীর সমস্ত কর্ত্তৃত্ব, অভারতীয়দের হাতে গেল; এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারের এলাকার বাহিরে বলিলেও হয়। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ এ বিষয়ে একেবারে অসহায়।

রেলওয়ের আয়ের কি ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা আর একবার ভাবিয়া দেখিবার কথা। অবশ্য তাহার উদ্বৃত্ত কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হয় এবং ভারত শাসন কার্য্যে ব্যয়িত হয়। কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন না যে ভারত সরকারের আয় বৃদ্ধির সহিত দেশের লোকের কল্যাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের ব্যয় বাহুল্য ঘটিয়াছে, প্রাদেশিক সরকার সমস্তই লাট সাহেবের কারবারে পরিণত হইয়াছে, যেখানে ক্ষুদ্র ছোট লাট বা লেফ্‌ট্যাণ্ট্ গভর্ণর কার্য্য পরিচালন করিতেন। পুলিশের ব্যয় বাড়িয়াছে, প্রত্যেক বিভাগের কর্ম্মচারী, বিশেষতঃ প্রধান পদে ইউরোপীয় কর্ম্মচারী বাড়িয়াছে, তাহাদের জন্য বেতন ভাতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইয়া সমস্ত অর্থ অপব্যয় হইতেছে।

তাহার উপর রেল কোম্পানীর, তথা ভারত সরকারের খাস পরিচালনে সর্ব্বসাধারণের কোনই সুবিধা হয় নাই।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা সর্ব্বাধিক টাকা সরবরাহ করে, গত পঁচিশ বৎসরে তাহাদের কোনও সুখ সুবিধার নূতন ব্যবস্থা হয় নাই। সাধারণের যাতায়াতের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ট্রেণের সময় নির্দ্ধারিত হয় না। বড় বড় সাহেব যে সকল রেলে যাইবে, তাহারা যাহাতে ভোরে বড় বড় সহরে পৌঁছিতে পারে, স্পেশাল ট্রেণ যাহাতে অব্যাহত গতিতে যাইতে পারে, এই সকল বিচার করিয়া অপরাপর ট্রেণের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর জানালায় তিন দফা অথবা চার দফা আবরণ। বৈদ্যুতিক পাখার সুযোগ হইতেই তাহাদের পাখার ব্যবস্থা হইয়াছে, গাড়ীর তাপ নিয়ন্ত্রিত করিবার সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ গাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে। যাহাতে বিলাত যাইতে বা বিলাত হইতে আসিতে প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর কোনও অসুবিধা বিলম্ব না হয়, তাহার জন্য সব-সুখসমন্বিত গাড়ী বোম্বাই হইতে কলিকাতা যাতায়াত করে। ইহা ছাড়া আরও অনেক কথা বলা চলে; কিন্তু এই সরকারী পরিচালনে সাধারণ লোক, যাহারা প্রকৃতপক্ষে কোম্পানীকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, তাহারা কি ব্যবহার পায়, তাহার একবার উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করিলাম। ঘুষের ব্যাপার রেল কোম্পানীতে যত প্রচলিত, অত্যন্ত নিন্দিত কলিকাতা কর্পোরেশনও তাহার নিকট এ বিষয়ে একেবারে নগণ্য বলিলেও চলে।

পোষ্ট অফিস সরকারী ব্যবসায়; ইহার বিপক্ষে যথেষ্ট কথা বলিবার আছে। আর সরকারী তত্ত্বাবধানে টেলিফোন কোম্পানী গিয়া কি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সবিস্তার আলোচনার প্রয়োজন নাই। যাহারা সর্ব্বনিয়ন্তা হইবার আশা পোষণ করেন, তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য কাজ প্রজা রক্ষা, প্রজার সুখ বিধান, শান্তি সম্পত্তি রক্ষা প্রভৃতি। এ সকল ব্যাপারে তাহাদের যে পরিচয়, তাহা পঞ্চাশের মন্বন্তর আর ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সম্পর্কে তাহাদের আচরিত নীতি হইতে বুঝিতে পারা গিয়াছে। আর বিবরণ বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই। মোট কথা প্রজার স্বার্থে যদি শাসনযন্ত্র নিয়োজিত না হয়, তাহা হইলে সমস্ত শিল্প তাহাদের হাতে তুলিয়া দিলেও, উন্নতির কোনও আশা করা যায় না।

দেশের স্বার্থকে প্রধান লক্ষ্য করিয়া যাহারা শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তাহারাই অগ্রসর হউক, ইহাই বর্ত্তমানের প্রধান কথা। অপরাপর দেশ, যাহারা দ্রুত উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সরকারী সাহায্য পাইয়াছে; কোথাও বা সরকার বিরাট কতগুলি বিষয় নিজেই হাতে করিয়া লইয়াছে। ভারত সরকারের পক্ষে সেরূপ পথ অনুকরণ করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। ইহার নিজস্ব কোনও মত নাই, নিজের কাজ করিবার কোনও ক্ষমতা নাই। এমন কি, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সাহায্য পাইলেও ইহারা পঙ্গু। বিদেশী স্বার্থ কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হইলেই ইহারা নিজের মত ভুলিয়া যায়। গত মার্চ্চ অধিবেশনে সরকার পক্ষ ছাব্বিশ কি সাতাশ বার পরাজিত হয়, কেন্দ্রীয় সরকারে না কি "ভারতীয়" সভ্য বেশী, তাঁহারা ইহার একটা নির্দ্দেশও মানিয়া কাজ করিতে পারেন নাই। ভারত শাসন বিধানে ১১১ হইতে ১২৫ ধারায় বিদেশী বণিকের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে; কেন্দ্রীয় পরিষদ এ বিষয় তাহাদের মত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে। ভারত সরকার কিন্তু তাহা মানিয়া লয় নাই; অথচ ইহাবাই না কি দেশের মধ্যে শিল্প প্রচেষ্টা ফলবতী করিতে দেশের মধ্যে শিল্পের প্রসার ঘটাইবে।

ভারত সরকারের শিল্প পরিকল্পনা নাই কিন্তু শিল্প সম্পর্কিত নীতির কথা লোকে জানিতে পারিয়াছে। "বোম্বাই পরিকল্পনা" নামে ধনী শিল্পপতিরা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চাহিয়াছেন, তাহারও বিশেষ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে আপত্তিকর কতটুকু; ত্রুটী কোথায় তাহা আমার মত লোকের পক্ষে সবিশেষ খুঁজিয়া বাহির করিবার শক্তি নাই; বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার প্রয়োজনও বোধ করিতেছি না। লাভের টাকা বণ্টনের কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা একটী প্রধান প্রশ্ন। যদি সত্য সত্যই জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে এ সমস্যার কিরূপ সমাধান হইতে পারে, পূর্ব্বে তাহার একটু ইঙ্গিত দিয়াছি।

আমার মনে হয়, ভারত সরকার যদি এ বিষয়ে অধিকতর শক্তিমান হইত, তাহা হইলে শিল্পপতিদের হাতে না ছাড়িয়া দিয়া শিল্প পরিকল্পনা এবং তাহা কার্য্যকর করিবার ভার সরকার লইলেও ক্ষতি ছিল না বরং ভালই হইত। সাহায্য করিবার বিশেষ নূতন ক্ষমতা নাই, অথচ অপরে করিতে

গেলে সরকারী বাধা নিষেধের অফুরন্ত সমাবেশ। বিদেশী যন্ত্রপাতি এবং বিদেশী কর্মদক্ষ ব্যক্তি না পাইলে নূতন শিল্পবিস্তারের সম্ভাবনা নাই ;—সরকার পক্ষেরও নাই, বে-সরকারী দলেও নাই। ইংলণ্ড ছাড়া অন্য দেশে যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে হইলে যে ভারতীয় মুদ্রা ও তলার প্রভৃতির একটা বিনিময় হার প্রয়োজন তাহা ইংরেজ জাতিকে মানাইয়া লইতে ভারত সরকারেরও নাই, বেসরকারী শিল্পপতিদের নাই। যদি ইংরেজ কৃপা করে, তাহা হইলে "ষ্টার্লিঙ ব্যালান্স" বা ইংরেজের হাতে ভারত সরকারের মজুত পাওনা টাকার, ইংরেজি মানে জমা অর্থ, হইতে বিদেশে মাল কিনিতে পারিবে ; আর বে-সরকারী শিল্পপতিগণ নিজ অর্জিত দঞ্চিত বা যৌথ মূলধনে ক্রয় করিতে পারিবে। ইংরেজ নির্দিষ্ট বাধা নিষেধে ভারত সরকার ও তাহার প্রজাবৃন্দ সকলেই বাঁধা। ইংরেজ যদি বলে পাউণ্ডের মূল্য এক শিলিঙ ছয় পেন্স তাহাতে তখনকার মত আর অন্য মানে চলিবে না। ইংরেজ যদি চায় নিয়হারে তাহার প্রেরিত মালের উপর আমদানী শুল্ক নির্দ্ধারিত হইবে, দেশীয় শিল্পের উপর "একসাইজ" বা ওয়েরা শুল্ক চাপাইতে হইবে, তাহা হইলে নতমস্তকে সুশীল ও সুবোধ বালকের মত তাহা পালন করিবার লোকের অভাব হইবে না।

ইংরেজ যন্ত্রপাতি দিবে না, উপযুক্ত লোকও দিবে না। হয়ত দিতে পারে, হয়ত দিতে পারে না। কিন্তু যদিই দেয়, তাহা হইলে কোম্পানী পরিচালনে এবং তাহার লাভে আধা-আধি অংশ চাই। এই সকল ব্যাপারে সে তাঁহার মনোভাব গুপ্ত রাখে নাই। আর এই স্বার্থের কথায় তাহাদের মনীষী বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিক ও সাধারণ বণিক সকলেই একমত। ডাঃ এ. ভি. হিল, রয়াল সোসাইটীর সভ্য বৈজ্ঞানিক ; কিন্তু তাঁহার দেশের স্বার্থের কথা যখন উঠিল, তখন তিনি প্রথমে দেশপ্রেমিক, তাহার পর বৈজ্ঞানিক। আমাদের গভর্ণমেণ্ট ও ধনী শিল্পপতিরা মনে করিয়াছিলেন, বৈজ্ঞানিক হিল, যে ভাষা বলিতেছেন, তাহা ভারতে সাময়িক মূল্য যাচাই মাত্র ; তাঁহার দেশের বণিকরা নিজ স্বার্থে ভারতকে সাহায্য করিবার জন্য অন্য ভাষা বলিবেন। যাহাই হউক, যাঁহারা দেশীয় শিল্পের বিস্তারকল্পে বিদেশী সাহায্যলাভের জন্য সারা পৃথিবী সফর করিলেন, তাঁহারা সকলেই সরকারী ও বেসরকারী—যে এক যাত্রায় পৃথক ফল পান নাই, তাহাই ইংরেজ জাতি, ও তাহার "মাসতুতো" ভাই আমেরিকার আসল পরিচয়।

এত কথা আলোচনা করিবার পর আমি বলিব, দেশের শিল্প পরিকল্পনা নূতন স্তর হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। সর্ব্ব-প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কথা ভারত সরকার ভারতীয় স্বার্থকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিবে এবং যেমন করিয়া সকল ক্ষেত্রের ইংরেজ একজোট হইয়াছে, সেইভাবে সর্ব্বক্ষেত্রের ভারতবাসী ভারতের স্বার্থরক্ষার্থে, তাহার শিল্পপ্রসারে বদ্ধপরিকর হইবে। এই ব্যবস্থায় যে পরিমাণ ব্যত্যয় ঘটিবে, ভারতীয় শিল্প সম্ভাবনার ঠিক সেই অনুপাতে ব্যাঘাত ঘটিবে।

যন্ত্রপাতি ও কর্মদক্ষ শিল্পী, এই দুইটী বিষয়ে আমরা অভাব মিটাইতে চাই। ইংরেজ বা অন্য বিদেশী ভারতবর্ষে তাহাদের তৈয়ারী মাল বিক্রয় করিবে বলিয়া বৃহদাকার যন্ত্রপাতি বর্ত্তমানে অন্যান্য অসুবিধা থাকিলেও, ভবিষ্যতে যে সহজ সরল চিত্তে দিবে না ইহা অবধারিত। আমাদের দেশে যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করা সুরু করিতে হইবে। এইখানে ভারত সরকার প্রকৃত সাহায্য করিতে পারে ; পরে ইহাতে তাহারা লাভবান হইবে। দুই তিন বৎসর বিদেশীর মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। এই সময়ের মধ্যেই আমরা অনেকটা স্বাবলম্বী হইব এই সঙ্কল্প লইয়া কাজে নামিতে হইবে। অপরের "পেটেণ্ট" ক্রয় করিয়া, যন্ত্রপাতি এখানে তৈয়ারী করিয়া অথবা নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তির উৎকর্ষ ঘটাইলে শীঘ্রই ফল আশা করা যায়।

এই সংশ্লিষ্ট ব্যয় করিতে হয়ত কোনও বিশিষ্ট কারবার বা ব্যক্তি সম্মত হইবে না। কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে সমস্ত গবেষণার ভার লইলে, তাহার কারখানার ও বৈজ্ঞানিকের সহায়তা করিলে, কাজ দ্রুত অগ্রসর হইবে। যে শিল্প সম্পর্কিত নীতির বিষয় বার বার উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যে গবেষণা সংক্রান্ত কার্য্যে অর্থব্যয় করিবার মানস ভারত সরকারের আছে। তাহারা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও সাহায্য করিতে প্রস্তুত। তাহা ছাড়া ভারত সরকার এই সকল কোম্পানীর মাল কিনিয়া লইয়া, প্রথমাবস্থায় আর্থিক সাহায্য দিয়া উৎসাহ দিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহার উপর যন্ত্রচালনা প্রভৃতি শিক্ষার ভার ভারত সরকার লইবেন

বলিয়া প্রতিশ্রুত। যতদিন না দেশের মধ্যে এই শিক্ষা ব্যাপক হইতেছে, ততদিন শিল্প-প্রসারের আশা নাই। অনেক বড় বড় কথা ভারত-সরকার বলিয়াছেন, অনেক বড় বড় কাজ হাতে লইবেন বলিয়াছেন। কিন্তু যে দুই বিষয়ের উল্লেখ করা গেল, তাহাই বর্ত্তমানে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার পর আরও কাজ রহিয়াছে; এই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত বিদেশীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিলে আমরা তাহা প্রতিরোধ করিব। হয় ত আমাদের যন্ত্রপাতি, আমাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিদেশীর তুলনায় হীন হইবে। কিন্তু সে ক্ষতি আমরা উপেক্ষা করিব। যুদ্ধের সময় আমরা দেখিয়াছি, দেশের শিল্প থাকিতেই, আমরা কত গুণ অধিক মূল্যে মাল ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছি। এ অভিজ্ঞতা আমাদের সহায় হউক।

আমরা পরাধীন জাতি; যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আমরা যদি মনে করি, আমরা ইংলণ্ডের অষ্টাদশ বা ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাস করি, তাহাতে আমাদের লজ্জার কিছুই নাই। কিন্তু মানুষ নিজেদের উপর শত অত্যাচার নির্য্যাতন সহ্য করিয়া এবং শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ না রাখিয়া নিজেদের সঙ্কল্প দৃঢ় থাকুক এ শিক্ষা স্বয়ং যীশু খৃষ্ট প্রচার করিলেও মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত হইবার পূর্ব্বে রাজনৈতিক দলের মূল মন্ত্ররূপে কোথাও গৃহীত হয় নাই। ভারতীয় কংগ্রেস এই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত; সুতরাং আসন্ন অর্থ নৈতিক সংগ্রামে আমরা অটল থাকিব, আমাদের এই সঙ্কল্প দৃঢ় হউক। সমস্ত পরিকল্পনার মূলে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টাই সর্ব্বপ্রধান।

কিন্তু একটি কথা না বলিলে প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হয় না। এই যে পরিকল্পনা বা চিন্তাধারা ইহার সহিত নয় লক্ষ পল্লীগ্রাম ও তাহার অধিবাসীর সমস্যা মিটাইতে চেষ্টা না করিলে উহা কোনও রূপে ফল-প্রসূ হইবে না। ইউরোপীয় ক্ষুদ্র জাতির শিল্প পরিকল্পনা ভারতের ক্ষেত্রে প্রযুজ্য নহে। ইহার স্বাতন্ত্র্য আছে; ইহার সমস্যা ভিন্ন প্রকার। পল্লীশিল্প কি করিয়া পুনরুজ্জীবিত হয় এবং বৃহদাকার শিল্পের পরিপূরক হিসাবে কি করিয়া পুষ্ট হইতে পারে, তাহার কথা ভাবা দরকার। এ প্রবন্ধের মধ্যে তাহার উল্লেখ করা গেল মাত্র; আলোচনার স্থান নাই।

বিরতি ?

দেবাংশু সেনগুপ্ত

শান্তির পারাবত,
বিরতির শ্বেত পাখা মেলে,
চলে পর্ব্বত ব্যাপি বন পথ বেয়ে,
এই বার্ত্তা নিয়ে—
থেমেছে হানাহানি।
কিন্তু থেমেছে কি,
দিক-বিদিকের বুকফাটা যত মাতা বণিতার ক্রন্দন ?
মুষ্টি-অন্নে বিক্রীতা দুহিতা ফিরেছে ঘরে ?
গৃহ বিতাড়িত গেল কি ফিরে গৃহের নীড়ে ?
পথ প্রান্তরে ফেলে আসা যত গলিত শবে
দেল কি আচ্ছাদন ?
জেনেছ কি ?
দীর্ঘ বছর ধরে
বৃহৎ স্বার্থের যূপ যজ্ঞের আহুতি
যোগান দিয়েছে রিক্ত মানব যত—
কোথাও ছোতারা,
সপ্ত-প্রাচীর বর্ম্মে নিজেরে ঘেরি
রণ দেবতার চরণে দিয়েছে ঠেলি
অবোধ অন্ধ লেখেরে
কোথাও তারাই পণ্য-জীবির বেশে
মুখের অন্ন রেখেছে লুকিয়ে
শুষেছে মাংস ধমনী
তারপর সেই অস্থি কখানা তাতেও ছাড়েনি লোভ
বেসাতি ফেঁদেছে জগত জোড়া,
তাদেরি কঙ্কালের !
তাই আজও হয়নি বিরতি
হয়নি
দলিত মানবের খুনে যে নিশান হয়েছে লাল
তার সেনাদল জানে না বিরতি জানে না,
ঘরের ধ্বনি হুঙ্কারি বলে প্রতিশোধ চাই প্রতিশোধ
শান্তির বাণী মানে না যে তারা মানে না !

অনির্বাণ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

আঠারো বছর বয়সে পৃথিবীকে যে পরিমাণ রঙীন ও বিস্তৃত দেখায়—মণীশের মনে ছিল সেই কল্পনা এবং চোখে ছিল সেই দৃষ্টি। গরীবের ছেলে সে। কলেজ-জীবন তাহার পক্ষে দুরাশা বলিয়াই বুঝি ভবিষ্যৎকে সে সর্ব্বদুঃখহারীরূপে কল্পনা করিত। একদিন এই কল্পনায় আঘাত লাগিল অপ্রত্যাশিতভাবে। কংগ্রেসের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া মহাত্মা গান্ধী-তুলিলেন—স্বাধীনতার দাবী। আরম্ভ হইল অসহযোগ আন্দোলন। দূরশ্রুত সমুদ্র কল্লোল—একদিন নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটে আসিয়া আঘাত করিল। সেই জল-কল্লোলে বহু কণ্ঠ মিশিয়া গেল। মণীশ প্রমাদ গণিল।

বিলাস তাহার হাত ধরিয়া ক্লাসের বাহিরে আনিয়া কহিল, তুই কেরে, ক্লাসরুমে বসে আছিস?

মণীশ মৃদু প্রতিবাদ করিল, লেখাপড়া ছেড়ে হৈ হৈ করলেই কি স্বরাজ আসবে?

বিলাস তাহার পিঠে চাপড় মারিয়া কহিল, কি আসবে না আসবে সে বিচার আমাদের নয়। নেতারা বলেছেন—স্বাধীনতার এই যুদ্ধে সকলকে যোগ দিতে হবে। সবাই যদি এক মনে এক প্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়ি—কেন সফল হব না?

মণীশ বলিল, তোমাদের কি—আন্দোলন যদি সফল না হয় আবার কলেজে ঢুকবে।

সে তো তুমিও পারবে। বিলাস হাসিল।

মাথা নাড়িয়া মণীশ বলিল, না ভাই—পারব না। আমাদের অবস্থা সবই জান। বাবা বেঁচে থাকলেও কথা ছিল!

কেন, তোমার যে আত্মীয় তোমাকে অর্থ সাহায্য করেন—

মণীশ বলিল, তিনি গবর্ণমেণ্টের চাকরি করেন—এসব পছন্দ করেন না।

কুছ্ পরোয়া নেই। তাহার পিঠে অভয়-সূচক চাপড় মারিয়া বিলাস কহিল, না করুন সাহায্য। ততদিনে বদলে যাবে গবর্ণমেণ্ট।

বাহিরে আসিয়া মণীশ কহিল, গবর্ণমেণ্ট বদলাক চাই না বদলাক—লেখাপড়া শেখাটা—

লেখাপড়া? এই গোলামখানার কারিকুলামে গোলাম তৈরী হওয়া ছাড়া আর কিছু আছে! সশব্দে বিলাস হাসিয়া উঠিল।

উত্তেজনা—বিশেষ করিয়া তরুণ বয়সে মনকে চাঙ্গা করিয়া তুলে। ছেলেরা তালহাউসি স্কোয়ারে গিয়া জোর গলায় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি তোলে। বেলা দশটায় ট্রামে বাসে পদব্রজে যাহারা সর্ব্বাঙ্গে দুর্দ্দশার বহু অক্ষরলেখা বহিয়া সরকারী দপ্তরের জঠরে আশ্রয় লয় এবং অপরাহ্নে ক্লান্ত শুষ্ক মুখে—শিথিল পদে সেখান হইতে বাহিরে আসে—কর্ম্মী ছেলেরা তাহাদের দিকায় দিয়া প্রবলকণ্ঠে দেশমাতার বন্দনা গান সুরু করিয়া দেয় না অবশ্য। কিন্তু কেহ কেহ ছেলেদের উচ্চকণ্ঠের চীৎকারে পথ চলিতে চলিতে দাঁড়াইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

কেহ বলে, ওসব বাতিক—দু'দিনের খেলা।

কেহ বলে, রোজগার করতে হয় না। বাপ খুড়োর পয়সায় ঢুকেছে ইস্কুল কলেজে—বাপ খুড়োর হাড়ভাঙ্গা খাটুনির উপার্জ্জনে নির্ভাবনার অন্ন মুখে তুলছে। ওদের কি!

কেহ বলে, না হে, এই চীৎকারের মধ্যে যে প্রাণ রয়েছে—

মণীশও সেই প্রাণস্পন্দন অনুভব করে। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শিরায় শিরায় রক্ত তার উষ্ণ হইয়া উঠে, বুকের মাঝে হৃৎপিণ্ড আঘাত করে—সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়ায় উত্তাল ঢেউয়ের মত। ইচ্ছা হয়—ভাসিয়া যায়—মাতিয়া উঠে।

কিন্তু বড় কঠিন সংসারের বেলাভূমি। তরঙ্গ আঘাতে সেখানকার নরম বালুস্তর পাহাড়ের স্তূপে পরিণত হইয়াছে। মা চাহিয়া আছেন—তাহার মুখের পানে; ছোট ভাই-বোনগুলি তাহাকে আশ্রয় করিয়াই বাড়িতেছে।

বিলাসের বাড়িতে আসিয়াও সে স্বস্তি পায় না। ওদের সুপরিসর সুসজ্জিত বৈঠকখানায় কর্ম্মী ছেলেরা জড়ো হইয়াছে—মেয়েদের কয়েকজন সহযোগিতা করিতেছেন। ভারতবর্ষের বৃহৎ মানচিত্র দেওয়ালে টাঙানো—তার মাথায় 'বন্দেমাতরম্'

উৎকীর্ণ পতাকা। মানচিত্রের চারিধার মেয়েদের হাতে গাঁথা ফুলের মালায় মোড়া। কয়েকটা ধূপ জ্বলিতেছে—ধূপদানি হইতে ধুনোর ধোঁয়াও উঠিতেছে। পরনে খদ্দর—মাথায় টুপি সেকালের তপোবন বালক-বালিকারা শুভ্র খদ্দি-মহিমায় ঘরখানিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

বিলাস বলিল, মণীশ—তোমাকেও খদ্দর পরতে হবে—দীক্ষিত হতে হবে।

মণীশ হাসিল। সে হাসির মর্ম্মার্থ কেহ বুঝিল কিনা—কে জানে।

ইলা বলিল, আজই ওঁকে দীক্ষা দাও বড়দা।

মণীশ সন্ত্রাসে বলিল, না, আজ থাক।

ইলা কণ্ঠে জোর দিয়া বলিল, আজ থাক! না মণীশদা।

মণীশ উঠিয়া কহিল, আসছি। অতঃপর সে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। পিছনে যে হাসির ধ্বনি উঠিল—সে মণীশকে বহুদূর পর্য্যন্ত তাড়া করিয়া গেল। গোলদীঘির একখানি খালি বেঞ্চের উপর অবসন্নের মত বসিয়া পড়িয়া সে দু'হাতে মুখ ঢাকিল। অবাধ্য অশ্রু আর বাধা মানিল না।

একটা ঘূর্ণীবায়ুর মত কিংবা দাবানলের মত এই আন্দোলন দেখিতে দেখিতে সারা শহরকে গ্রাস করিল। স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া ছেলেরা দলে দলে রাজপথে চীৎকার করিয়া ফেরে। যে বই হাতে স্কুল-কলেজের ধারে যায়—তাহাকে ধিক্কার দেয়। এখানে বিচ্ছুত হইয়া মণীশ আর কলেজের ধারে পা বাড়াইতে সাহস করিল না।

মা চিন্তিত মুখে বলেন, হাঁরে মণি—কি হবে?

মণীশ বলে, আমরা তো দেশ ছাড়া নই মা।

নারে—ওদের উপায় আছে; তুই পাশ দিয়ে চাকরি করতে না পারলে আমাদের দশা কি হবে রে!

মণীশের মন অসহ্য ক্রোধে জ্বলিয়া উঠে—পরমুহূর্ত্তে—অসহ্য ব্যথায় ভরিয়া যায়। ক্রোধ সে কাহার উপর করিবে? যুগে যুগে দরিদ্র মায়েরা যে তীব্র আশায় সংসার মরুভূমিতে মরীচিকালুব্ধ! জন্মভূমিকে চিনিতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন—সে শক্তি সাধনার উৎস অবিচ্ছিন্ন দারিদ্র্যে লুপ্ত হইয়া গেছে। প্রশ্ন জাগে—কিসের দারিদ্র্য? মণীশ মনে মনে উত্তর দেয়—মনের। জন্মগত দারিদ্র্যে কোন মানুষকেই কোন কালে নিরুত্তরে আটকাইয়া রাখিতে পারে না। সুখবিলাসী মনই তাকে ভয় দেখায়। বন্ধুর পথে চলিবার কালে কণ্টকের ভয়—অন্ধকারের ভয়—কত না ক্ষতি লাঞ্ছনার বিভীষিকা!

মণীশ হাসিয়া বলে, তুমিই তো কতবার বলেছ মা—জীব দিয়েছেন যিনি—আহার দেন তিনি। আমার নাম দেওয়া না-দেওয়াতে কি আসে যায়।

মা বলেন, সবই তো তাঁর দেওয়া। তবে ভগবান নিজের হাতে কিছু দেন না—একজনকে উপলক্ষ্য করে দেন।

বেশ তো—আমি না থাকলেও—আর কাউকে উপলক্ষ্য করে তো দিতে পারেন।

মা বলেন, তর্ক করিস নে মণি, সব কাছে যে থাকে সেই হয় উপলক্ষ্য।

তাহলে চাকরি না করা ছাড়া আর উপায় নেই?

তুই যে আমার ভাল ছেলে মণি, তুই যদি এ কথা বলিস—

মণীশ কণ্ঠে সমস্ত জোর বাহির করিয়া দিয়া বলে, না মা, ভাল ছেলে আমি নই। সে হতে আমার লোভ নেই।

মা শঙ্কিত কণ্ঠে বলেন, তবে কি করবি?

না মা, কিছুই করব না। মণীশ তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

পথে বিরাট মিছিল চলিয়াছে। মিছিলের পুরোভাগে মহিলা-কর্ম্মীরা হাতে পতাকা লইয়া চলিয়াছেন—ছেলেরা চলিতেছে জয়ধ্বনি দিতে দিতে। ফুটপাথের জনতায় গা ঢাকিয়া মণীশ এই শোভাযাত্রা দেখিল। দিনের বেলা, তবু মনে হইতেছে চারিদিকের আলোর শক্তি কলেজ স্কোয়ারের এই পথটির উপর আসিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। অবিচ্ছিন্ন জনপ্রবাহে সে আলোর স্রোত বহিতেছে। এই দীপ্তির মধ্যে ভবিষ্যৎকে চকিতে একবার দেখিয়া লওয়া যায়; কণ্ঠ হইতে আপনি বাহির হয় মাতার বন্দনা গান।

আলো আকর্ষণ করে পতঙ্গকে। পথিমধ্যস্থ মিছিল আকর্ষণ করিল পথিপার্শ্বস্থ জনতাকে। কখন যে বিরাট জনতা মিজ্জাপুর পার্কে আসিয়া নর-সমুদ্রে মিশিয়া গেল; কখন মঞ্চ পুরোবর্ত্তী নেতারা অগ্নিস্রাবী ভাষায় দেশের বলিষ্ঠ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জনতার মধ্যে ছড়াইয়া দিলেন; কোন

কোণে স্ফুলিঙ্গ দেখা দিল—কোন্ অরণ্যে দাবানল জ্বলিল—লুপ্তসংজ্ঞা মণীশ তাহা জানে না।

জ্ঞান হইলে বুঝিতে পারিল—জনতার চাপে সে লৌহ-বৃত্তের ধারে আসিয়া পড়িয়াছে। যেন কত পরিশ্রম করিয়াছে এমনই অবসন্ন সে। আকাশে বাতাসে এখনও বন্দে মাতরম্ ধ্বনির অনুরণন।

ইস্, কাঁদছেন যে!

চাহিয়া দেখে ইলা। লজ্জিত কণ্ঠে কহিল, না, ভিড়টা বড্ড বেশি—

মিটিং তো অনেকক্ষণ ভেঙে গেছে। আসুন।

ফুটপাথে পা দিয়া ইলা বলিল, ওরা আপনাকে চিনতে পারেনি—আমি কিন্তু চিনেছিলুম।

প্রশ্ন-উন্মুখ মণীশ ইলার পানে চাহিল।

সেদিন যখন চলে গেলেন আমাদের বাড়ি থেকে ওরা হেসেছিল কি না।

মণীশ এতক্ষণে কথা কহিল, আপনার ভুল হতে পারে।

কি ভুল?

মানুষকে চেনা সহজ নয়।

সত্যি কথা। খুব সত্যি কথা। একটু হাসিয়া বলিল, আপনি কি বলতে চান এই চোখের জল—এও সত্যি নয়?

অন্য কারণে চোখে জল পড়া আশ্চর্য্য নয়। যে ভিড় তারই কণ্ঠে হয়তো—

আর গলার স্বর? সে তো ভিড়ের চাপে ভাঙে নি!

মণীশ মাথা নীচু করিয়া কহিল, সত্যি বলছি বন্দে মাতরম্ আমি ইচ্ছে করে বলিনি।

আমাদের ইচ্ছে আর কতটুকু মণীশবাবু। যে বলায় সে আর একজন।

মণীশ দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ করিল, আমি ভগবানে বিশ্বাস করি না।

আমিও না। কিন্তু আমার দেশ—আমার অনুভূতি নিয়ে যে ভগবান তাকে অস্বীকার করি কি করে বলুন তো?

মণীশ সবিস্ময়ে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, এসব কি আপনার কথা?

ইলা হাসিল, আমার কথা ছেড়ে এর দাম কমে যাবে সে ভয় করবেন না।

পথের মোড়ে আসিয়া মণীশ কহিল, আসি।

ইস্—আপনাকে ছাড়ছি কিনা। তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিবার উদ্যোগ করিতেই আতঙ্কগ্রস্তের মত মণীশ পিছাইয়া গেল। ইলার প্রচণ্ড বিস্ময় কাটিতে না কাটিতে সে দূর হইতে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া দ্রুতপদে বিপরীত পথ ধরিল।

পথের মাঝে দাঁড়াইয়া স্বপ্ন দেখিবার অবকাশ মণীশের নাই।

দৃশ্য বদলাইয়াছে। কলিকাতার বুকে এক একদিন শীতের প্রভাবে ঘন কুয়াসা নামিয়া শহরকে দিকচিহ্নহীন প্রান্তরে রূপান্তরিত করে—গ্রীষ্মের দিনে সেই কুয়াসাকে খানিকটা পরিশ্রম করিয়া স্মরণে আনিতে হয়। মির্জ্জাপুর পার্কের উপরে যে আকাশ—সে অবশ্য কয়েক বছর আগেকার মতই ঘন নীল; পূর্বপশ্চিম কোণের অশ্বত্থ গাছটা বার্দ্ধক্যে আরও কিছু অগ্রসর হইয়াছে—ফুটপাথে বিরামহীন জনস্রোত। একদিন এই যজ্ঞভূমিতে দাঁড়াইয়া যে ঋত্বিকরা আবাহন মন্ত্রে মূঢ় জনতার চৈতন্যে আগুন ধরাইয়া বিরাট্ কিছু গড়িবার কল্পনা করিয়াছিলেন, উপরের বিরাট্ মৌন আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রবিস্মৃতে সে আগুন আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। আজ মানুষ উপরের পানে চাহিয়া নক্ষত্রের শোভা দেখিয়া রোমাঞ্চিত হয়—অগ্নিসৃষ্টির ইতিহাস—কুয়াসা সৃষ্টির মতই অতি প্রয়াসে স্মরণে আনিতে হয়—কিংবা ভুলিয়াছে। মণীশ যদি ভুলিতে পারিত।

পার্কের ধার দিয়া যাইবার সময় মণীশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। পার্কে ঘাস নাই—ধূলা প্রচুর। অল্প বাতাসে ও ছেলেদের খেলার দাপটে যে ধূলা উঠে—তা দীর্ঘনিশ্বাসের মতই করুণ। তবু যাইবার কালে, বহুদিন আগে একদা যে রেলিঙটার ধারে সে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া লুপ্তসংজ্ঞা হইয়াছিল, সেই রেলিঙের মাথায় পরম স্নেহভরে একবার হাত বুলাইয়া লয়।

আজ এখানে সে কিছুক্ষণ বসিবে। আপিসের নূতন কাজগুলিকে সে ভালমত আয়ত্ত করিতে পারে নাই—সে

কিন্তু বেশ পালটাবো। তার আগে দোকানে চলুন, একখানা খদ্দরের ধুতি—

ইঁডান, আসছি। আবার ছিটকাইয়া পথ হইতে ইলা ঘরে গিয়া উঠিল। ফিরিয়া আসিতেই দেখা গেল তার হাতে একটা সাদা বাণ্ডিল।

কাপড় আর চাদর! জামাটা মাপ না হলে তো তৈরী করে দেওয়া যায় না।

বাণ্ডিলটা মাথার ঠেকাইয়া মণীশ বলিল, বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে—অথচ—

বলুন না। ইলা হাসিল।

তথাপি মণীশ ইতস্তত: করিতেছে দেখিয়া সে কহিল, দাম দিতে চাইছেন তো? বা: রে দাম কেন নেবো না। যা দেবার দিয়ে দিন এই বেলা। কিন্তু ফেরত পাবেন না কিছু। বলিয়া মুষ্টিবদ্ধ বাঁ হাতের উত্তোলিত তর্জ্জনীটা বারকয়েক নাড়িল।

মণীশ মুখ তুলিয়া হাসিল, ফেরত চাইলে তো দেবে? সে সুযোগ তোমাকেই বা দেব কেন আমি!

ইলা হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, আসুন।

সখ সৌখীনতার দাসিত্ব ভুলিবেন না

ঝোঁকে পড়ে—সখ করে—বিদেশী কেনা মানে

দেশের শত্রুতা করা

মা-ই বাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী কর্ত্রী—মা'র নজর থাকলে—

দেশী ছাড়া বিদেশী মাল বাড়ীতে ঢুকতে কখনও পারে না।

দেশে সবই তৈরী হয়—আসুন—দেখুন

স্বদেশী দ্রব্য সম্ভারের স্থায়ী প্রদর্শনী

কমার্শিয়াল মিউজিয়াম

কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা

দুষ্টুমি

রূপঙ্কর দত্ত

সে দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই অনুর খেয়াল হল যে সে আজ রান্না করবে। ওর মা একাএকা সব রান্না করে পেরে উঠছিলেন না। তাই ওর খেয়াল হল যে আজকে মাকে খানিকটা পরিমাণে সাহায্য করবে। তাছাড়া আরও কারণ আছে। অনেকদিন থেকেই অনু আমায় শাসাচ্ছিল যে, দেখ বাবা আমার বিরাট নেমন্তন্ন দেওয়ার ইচ্ছে। তুমি কিন্তু আপত্তি করতে পারবে না।

আমি বললাম: আমি আর আপত্তি কর্তে পারি, ও বাবাঃ!

হ্যাঁ তুমি আপত্তি করতে পারবেনা কিন্তু। বলে অনু আমার দিকে ফিরে রীতিমত তর্জনী দেখিয়ে চলে গেল রান্না ঘরের দিকে। রান্না ঘরে যাওয়ার অর্থ মায়ের মহুরী আবদার করে আদায় করবে। আমাকে ত ধমকেই কাজ সেরে নিলে, কিন্তু ওখানে ত আর তা হবে না, কাজেই কিছু পরিমাণে আবদার চাই। তাছাড়া ওর মার প্রকৃতি আবার আমার চেয়ে অন্য রকম। তাঁকে বিরক্ত করলে তিনি সব সময় চটেন না বটে, তা হলেও অনু তার এমন সময়ে অসময়ে গম্ভীরমত ভাবটা ঠিক বরদাস্ত করতে পারে না।

: মা, মা, তুমি বুঝি কথা বলবেনা।

মা উত্তর দিলেন: কেন রে?

মায়ের মুখখানা অনু খুব জোর করে ধরে তার মুখের কাছে এনে চেঁচিয়ে বললে: শোন আজকে আমার নেমন্তন্ন রাঁধতে হবে। এখন সর ত উনুন টুনুন আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি।

মা বললেন: নেমন্তন্ন কিরে, আমার যে অনেক কাজ রয়েছে।

অনু চোখমুখ কুঞ্চিত করে বললে: বারে আমি যে বাবাকে তারপর.....তারপর মিনিকে,.....বলতে বলতে অনু হাতের আঙুলে কড় টিপতে সুরু করল—পিসিকে ছোট কাকাকে নেমন্তন্ন করে এলাম। তারা যে সবাই খাবে আমার এখানে।

মা গম্ভীরভাবে বলেন: অনু, রান্নার সময় গোল করিসনে, যা এখন।

: ওমা তুমি দেখছি রাগ করছ, রাঁধবনা বুঝি এখন।

: যা বলছি এখন অনু।

অনু নিরুপায় হয়ে রান্নাঘর থেকেই চেঁচিয়ে ডাকতে সুরু করে: ও বাবা দেখে যাও মা আমায় নেমন্তন্ন রাঁধতে দিচ্ছে না! আচ্ছা মা শোন না বেলা যে হয়ে গেল রাঁধব কখন। দেখে কিন্তু একা একা কিছু করতে পারব না। না বাই জলটা তুলে রাখি।

চলল অনু ছোট্ট পিতলের কলসী নিয়ে জল আনতে। অনুর নিজস্ব একটা সম্পত্তি আছে সেটা ওর পেতলের ছোট্ট কলসটি। একদিন ও মেলায় গেছে বেড়াতে। বাড়ি থেকে বেরুবার আগেই আমার থেকে কথা আদায় করে নিলে আজকে একটা নতুন জিনিস কিনে দেব।

: আমার সেই নতুন জিনিস দাও বাবা।

আমি বললাম: চল পুতুলের দোকানে।

পুতুলের দোকানে ঢুকে অনুর মন বিগড়ে গেল। ও বললে: পুতুল ত অনেক আছে, ও জিনিস চাই না একটা জিনিস চাই।

এখন বোঝ বিপদ! নতুন জিনিস কোথায় পাই।

: বাবা শোন সেদিন আমাদের মন্টুদি না—সে একটা নূতন জিনিস এনেছিল। জান, সে কী রকম চকচকে!

আমি বললাম: নূতন সব জিনিসই চকচকে হয় অনু।

: না—না তুমি জাননা বাবা, সে কী চকচকে! সেই নূতন জিনিসটা।

কথা বলতে বলতে অনেক দূর এসে পড়েছি। হঠাৎ পেছনে থেকে আমার কাপড়ের আঁচলে খুব জোরে টান পড়তেই ফিরে দেখি অনু, তার আঙুল এক দোকানের দিকে নির্দেশ করে দাঁড়িয়ে আছে।

: কী ব্যাপার অনু?

আঙুলটি নাকের ডগায় তুলে দেখিয়ে দিলে—ওইত বাবা।

কাঁসা পেতলের দোকান। সারি সারি কলসী, ঘটি, বাটি,

থালা ইত্যাদি সাজানো। সব জিনিসগুলো তক্ তক্ ঝক্ ঝক্ করছে। বেলা শেষের রোদ পড়ে আরো ঝক্‌ঝক্ করছে ঐ ছোটবড় বাসনগুলো এক সঙ্গে।

দোকানী এক লম্বা সেলাম ঠুকে বললে: আসুন বাবু। আমার সঙ্গে দোকানীর সামান্য দু'একটা কথার বিনিময় হওয়ার আগেই দেখি অনু তার ঈপ্সিত বস্তুটি সখল করে বসে কার সঙ্গে যেন গল্প করছে।

: খুকী তোমার নাম কি?

অনু গম্ভীর হয়ে উত্তর দিচ্ছে: ইস্ আমার নাম খুকী বুঝি? তুমি জাননা আমার নাম অনু···সেই আমার ছোট বোন আছে না, একজন তাকে বলে 'খুকু'।

কর্মচারীটি হেসে শুধালে: ও তোমার নাম বুঝি অনু?

অনু হো হো করে হেসে উঠল, বড় বড় চোখ করে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলে, হ্যাঁ। চেয়ে দেখি তার ছোট আঁচলটি গুটিকয়েক খেলনায় ও লজেঞ্চে ভরতি হয়ে গেছে।

দোকানীর ন্যায্য পাওনা চুকিয়ে দিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম। পথে অনু ছোট্ট পেতলের কলসী নিয়ে যতরকম জল তোলার কায়দা কানুন আছে তা এক একবার করে মহড়া দিয়ে দেখলে। আর আমায় শুধাতে লাগল, কেমন করে সবাই জল আনে কাঁখে করে।

বাড়ি ঢুকে অনুর মাকে জানিয়ে দিলাম: তোমার এতদিনে একটা মুস্কিল আসান হল।

অনুর মা আমার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধাল: কী আসান হলো গো আমার?

আমি বললাম: জল তোলার মুস্কিল আসান হল।

এমন সময় অতি কষ্টে অনু তার নূতন পেতলের কলসটি কাঁখে নিয়ে হেলে দুলে ঘরে ঢুকল। মুখের ভাবখানা এই যে কত পরিশ্রম করেছি মা দেখ চেয়ে। আমি সে দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললাম: ঐ। অনুর মা সেদিকে চেয়ে একেবারে হো হো করে হেসে উঠল।

অনু রীতিমত মেজাজ গরম করে বললে: হাসছ কেন আমি যে জল নিয়ে এলাম। কষ্ট হয় না বুঝি?

তারপর মাথা চুলকে নিয়ে মিনতিভরা চোখে চেয়ে বললে: আরো নিয়ে আসব মা?

মা ছুটে গিয়ে অনুর ছোট্ট গাল দুটি টিপে দিয়ে কোলে তুলে বললে: না না ঢের হয়েছে অনু আমার।

অনু হেসে ওঠে হো—হো—হো করে।

: মা আমার বালতি কোথায়?

: আমি জানিনে বাপু খুঁজে পেতে নাও গে।

এদিকে অনুর মা কড়ার ওপর মাছ ছেড়ে দিয়েছে, ওদিকে আমার আফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে—নানা কারণে অনুর মা একটু ব্যস্ত ছিলো। কড়ার মাছগুলো নাড়তে নাড়তে অনুর মা অনুর দিকে তাকিয়ে বললে: দেখ্ বাপু তোরা আমায় জ্বালাসনে। আমি কোন্ দিকে সামলাব বল?

অনু ছুটে মার সামনে এসে গম্ভীর হয়ে বললে: রাখ মা, তোমার কোন চিন্তা নেই, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

আর তিলমাত্র মার কথার অপেক্ষা না করে সোজা বালতি থেকে খানিকটা জল তুলে নিয়ে ঢেলে কড়ার মাঝে। কড়ার মাঝ থেকে একটা প্রতিবাদ এলো, সে ফোঁস শব্দ করে উঠল। মাকে একটু ধাক্কা দিয়ে হাতের খুন্তিটা নিয়ে বললে: মা, তুমি সরত আমি পাক করছি।

অনুর মা রাগ-বিরক্তির মাঝেও অমন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড দেখে আমায় না ডেকে আর পারলেন না।—ওগো শুনছ।

: কেন?

: ঐ দেখ তোমার অনুর কাণ্ড।

অনু আমায় দেখেই ডান হাতের খুন্তিখানা বাঁ হাতে নিয়ে, চীৎকার করে হাত ঘুরিয়ে বললে: ব্যস্ত হয়ো না বাবা আমি পাক করছি।

আমি হাত তুলে প্রতিবাদ করতেই, সে আমায় শাসিয়ে বললে: বাবা তুমি বড্ড বেহাড়া হয়েছো। কাজের সময় গোল করো না।

আমার পেছন থেকে এবার সত্যি সত্যি চটে জবাব দিল অনুর মা: অনু, সরে যাও বলছি। অনু বুঝল এবারের রাগটা সত্যিকারের। কোন প্রতিবাদ না করে সে ধীরে ধীরে ম্লান মুখে রান্নাঘর ছেড়ে চলে গেল।

আমি অনুর মাকে মৃদু অভিযোগ করে বললাম: তোমার ও মেজাজটা না হলেও বোধ হয় চলত। অনুর মা অনুর

সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ দেখে আমার রীতিমত পাল্টা অনুযোগ করলেন, বললেন, তুমি জান না যে অনু আজকাল কী রকম দুষ্টু হয়েছে। আমার আর কোন তর্ক করার প্রবৃত্তি ছিল না। মনে মনে বললাম, অনু যে ফুটন্ত কমল, ওর ওপর শাসনের বৃষ্টি হলে ওর স্বভাবের অসহায় পাপড়িগুলো ভেঙ্গে যাবে। তখন ওর সব সৌন্দর্য্য যাবে শুকিয়ে। সে বড় ভয়ঙ্কর অবস্থা। এত সব ঝড় ঝাপ্টার মাঝেও অনুর নেমন্তন্ন রাঁধার আয়োজন পণ্ড হল না। ঘরের পাশেই ছোট্ট একটু স্থান ছিল সেখানে গিয়ে দেখি, ইটের এক ভাঁড় লেগেছে। বাড়ীর আনাচে কানাচে যত ছোট বড় ইট ছিল তা সবই এসেছে এখানে। এ সব আয়োজনে অনু একা নয় আর একজন জুটেছে, তার নাম হল সন্তু। অনুরই সমবয়সী। ওরা দুজনে কোনদিন যে নিজেদের মত করে একটা বন্ধুত্ব গড়ে নিয়েছে তা আমি জানি না। অনুর সব আয়োজনের সে সঙ্গী। একদিন কৌতূহলী হয়ে অনুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: অনু তোমার সেই সঙ্গীটির কি খবর।

হঠাৎ অনু গম্ভীর হয়ে বললে: বাবা তুমি কিছু খোঁজ রাখ না।

আমি অনুর মুখের দিকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। অনু বললে: সন্তু ত আমার সঙ্গী নয়, বন্ধু—বন্ধু—বন্ধু।

আমার মুখের কাছে ওর মুখখানি এনে বললে: বুঝেছ?

আমি ঘাড় ঝাৎ করে জানিয়ে দিলাম, হুঁ।

ইটের পর ইট সাজিয়ে একটা দেয়াল উঁচু করে গড়া হয়েছে। ঐটাই ওদের রান্নাঘরের সীমানা। পাছে কেউ ওদের ঐ সীমানায় পা দেয় তাই দেয়ালটা দাঁড়িয়ে খবরদারী করছে। অনুর মা কি কারণবশতঃ একবার ওদের ওখানটায় পা দিয়েছিল, অমনি রেগে-মেগে আগুন। ভ্রূ কুঁচকে অনু বললে: আঃ রান্নার সময় বিরক্ত করোনা। ওর মা কি আর সেখানে দাঁড়ায় কথাটি না বলে সোজা ছুট।

সন্তু খুব গম্ভীর মুখ করে বললে: অনু, তোর ঠিক আছে ত কত লোক খাবে।

হুঁ, বলে অনু ঠোঁট উল্টিয়ে জানিয়ে দিলে। ভেবেছ কাঁচা লোক অনু, তা মোটেই নয়। সে বেশ হিসেব জানে, তাকে ঠকাও সেটি একবার গুণতিতে। সে দুই হাতের কড় টিপে টিপে বার চারেক গুণে বলে দিলে যে সে বাবা, মা, মঙ্গলা চাকর, পিসি, ছোট কাকা তারপর সন্তু ইত্যাদি মানে সে অনেক বড় নেমন্তন্ন বলতে হবে। হুঁ আমাদের অনু ছোটখাট কাজে হাত দেয় না। তার সব ব্যাপারই বিরাট বিরাট। এবং বিরাট ব্যাপারে মোড়লি করার যে তার বিশেষ ক্ষমতা আছে, তা যদি বিশ্বাস না হয় তা হলে পিসিকে শুধিয়ো; তিনি সাক্ষী দেবেন।

সন্তু বললে: অনু পায়েসটা আমি রাঁধব।

অনু গিন্নীর মত অন্যমনস্কভাব মুখের মাঝে এনে বললে: না ওটা হবে না, ওটা খুব কঠিন কাজ; আমাকেই করতে হবে, তোমাদের হাতে এসব কাজ দিয়ে আমার নিশ্চিন্ত হবার জো নেই।

সন্তু বললে: তবে আমি মাছের কালিয়াটা রাঁধব।

: হুঁ, তাও হবার জো নেই। দেখনা অনেক লোক খাবে। একটু গোলমাল হলে দুর্নাম হবে যে।

সন্তু মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হল। তাহলে অনু বড্ড অন্যায় করছে তার ওপর। এত বড় একটা নেমন্তন্ন হচ্ছে অথচ অনু তাকে মোটেই কাজের মত একটা কাজ করতে দিচ্ছে না। শুধু বলছে জল আন, মসলা পেষ। ও আবার একটা ছাই কাজ নাকি। সন্তু চুপটি করে এককোণে দাঁড়িয়ে রইল।

অনু মুখের দিকে তাকিয়ে বললে: ওমা, তাই তুই রাগ করেছিস? আমি বললাম কি না অত লোকে খাবে তাই একটু মনোযোগ দিয়ে রান্না করব। দেখিস না সব জায়গায় মেয়েরাইত রাঁধে। পুরুষেরা রাঁধে নাকি।

সন্তু প্রতিবাদ করে বললে: কেন, আমার বড়দির বিয়ের সময় বুঝি আমি দেখিনি পুরুষে রেঁধেছে। সেই কী উড়ে ঠাকুর না কারা রান্না করেছে।

অনু অমন জোরালো যুক্তির সামনে পড়ে একটু থতমত খেয়ে গেল। তাহলে তাইত এর ত আর জবাব নেই। আসতে ব্যাপারটা হল অনুর ইচ্ছে যে, ও গিন্নীপনা করে' আজ এই নেমন্তন্নর দিনে একটু রাঁধে। কেমন সবাই ওর প্রশংসা করবে—বাঃ অনু তারি চমৎকার রাঁধে! অনু

এমন সুনামের লোভটা সামলাতে পারছে না। তাই ও চায় যে ও নিজেই রান্না করে। সন্তু ওর সহকারী রূপে কাজ করে। সন্তুরও সুনামের প্রতি লোভ আছে বই কী বল? তা ও-ইবা ছাড়বে কেন? যদি সুনাম করার একটা সুযোগ পাওয়াই গেল তা' আর ছেড়ে দেওয়া কেন। সন্তু রীতিমত বেঁকে দাঁড়াল। সে হবে না ভাই, আমিও রান্না করব।

অনু ডাক দিয়ে বললে: ভাই সন্তু, আর একটা কাজ করি।

সন্তু বললে: কী।

আচ্ছা: তুই-ও রান্না করবি, আমি-ও রান্না করব। কেমন এঁ্যা—বলে অনু সন্তুর মুখের দিকের সম্মতির অপেক্ষায় চেয়ে রইল।

সন্তু একটু চিন্তা করে রাজি হল। হঠাৎ তার মনটা যেন খুশীতে ভরে উঠল।

সন্তু বললে: আচ্ছা তাই তাই হবে। তবে আমি কিন্তু কালিয়া, আর তুমি মাংস রেঁধো।

অনু একটা নাচন দিয়ে বলে উঠল: তাই হবে তাই, তাই হবে তাই।

ওদের সমস্যা সমাধান হল। সন্তু আর অনু—ওরা যেন এক বৃন্তের দুটো আধফোটা কলি। কখনো মৃদু বাতাসে দিউরে ওঠে। আবার কখনো দমকা বাতাসে হিল্লোল খেলে যায় ওদের আধফোটা প্রাণের পরতে পরতে। ওদের প্রাণে ওদের মত করেই বাজে জগতের ছন্দ-বাঁধা বিচিত্র সুরগুলি।

রান্না হল
খাবে চল
ছোট্ট পিসিমা।
দাদা বাবু
কাকা বাবু
দিদি এলো না।
কাঁচা আমের টক করেছি,
ঝাল দিয়েছি বড়।
পায়েসেতে এলাচগুঁড়ো
মিষ্টি মধুর বড়।
বড় কৈয়ের তেল-কালিয়া
চিনিপাতা দৈ
রসগোল্লা, রস বড়া
দিনাজপুরের খৈ
বর্দ্ধমানের মিহিদানা,
বরিশালের তাল
রাজসাহীর কাঁচাগোল্লা
বাকতুলসী চাল।
পদ্মা নদীর রোকা-ইলিশ
ঢাকার অমৃতি
কেষ্টনগরের সরভাজা
ছানার জিলিপি।
ভীম নাগের আম সন্দেশ
দেবো হাতে তুলে।
কে. সি. দাসের রসোমালাই
খেয়ে যাবে ভুলে।

আমাদের সেদিন এক নেমন্তন্ন ছিল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আমি ও অনুর মাই প্রধান। ওঃ রান্নার সে কী সমারোহ। রান্না ঘরে গিয়ে রান্নার বহর দেখে অবাক। কতই-বা লুচি-তরকারী, আর কতই-বা মণ্ডা মিঠাই। কে খায়? পাশের এক নিরালা বাড়ির কোনে ছিল এক মাটির স্তূপ। হয় ত সেই বাড়ির কি, তার কাজ কর্ম্মের সুবিধের জন্য কিছুটা মাটি জমিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তা কি আর রাখবার জো আছে। ওদের নজরে তা' যখন একবার পড়েছে তার একটা গতি হবেই। তা ভালই ত হল, কি বল? বেচারা মাটিকেই হয় ত জলের সঙ্গে কিয়ের হাতের ঘুটুনি খেয়ে খেয়ে একাকার হতে হত। গরম উনুনের গায়ে লেপে দিলে মাটিকে হয়ত খানিকটা আগুনের ঝাঁক সইতে হও। তার চেয়ে এ এরকম মন্দ নয়। একেবারে রসগোল্লা সন্দেশ ইত্যাদির উপকরণ। তারপর মাছ মাংস তরি-তরকারির নিকটও নেহাৎ মন্দ নয়। ঘরের আলু-পটল যে কখন এদের রান্নার ভীড়ে ঢুকে পড়েছে, তার খোঁজ অনুর মাও রাখেন না। তিনি দেখেই বললেন: তাই আমার

বুড়িতে আলু পটল নেই। শুনেই অনু চট্ করে উত্তর দিল: বারে, আলু পটলের তরকারী না হলে হবে কেমন করে।

মা হাসতে হাসতে বললেন: দুষ্টু, তা' বলে আমার বুড়িতে হাত দেওয়া।

অনুর মা আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে: বাজারের পয়সা আদায় কর, অনু। অনু অমনি ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে বললে: বাবা, একটা টাকা দাও ত, কিছু ক্ষীর আনতে হবে। আমি ত প্রমাদ গুণলাম।

অনুর মার দিকে তাকিয়ে বললাম: একেবারে আচ্ছা লোক লেলিয়ে দিয়েছ যা হোক।

অনুর মা হেসে আমার দিকে চেয়ে উত্তর দিলেন

তা' ওরা একটু নেমতন্ন রেঁধে আনন্দ করবে না।

আরে তাতে আসলে যে টান পড়ে।

তা' তুমি যেমন কিপ্‌টে, তোমার কিছু শিক্ষা হওয়া উচিত।

সে দিন ভাঁড়ার থেকে বেরিয়েই অনুর মা সোজা আমার কাছে হাজির। আমি তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম ব্যাপার কিছু একটা হয়ে থাকবে।

আমি প্রশ্ন করলাম: কি হয়েছে বল দেখিনি?

অনুর মা উত্তর দিলেন: তোমার অনুর যন্ত্রণায় আর কিছু রইল না ভাঁড়ারে।

আমি হেসে বললাম: কি হল সবই সাবাড় করলে ওরা।

তিনি আমার হাসি মুখের পানে তাকিয়ে বললেন: তুমি হাস? দেখ ত কী ব্যাপার করেছে অনু। বলেই অনুর মা এক বৈয়াম আমের আঁচার আমার চোখের সামনে ধরল।

আমি হাসিটা দমন করে বললাম: তাই ত অনু বেজায় দুষ্টু হয়ে গেছে দেখছি!

ব্যাপারটি অবশ্য অনুর মার চোখে খুবই গুরুতর, আমার চোখে নয়। আমিও ছোট বেলায় তাদেরি মত ছিলাম। সেই ছোট বেলার মনটা অনু আর সন্তুর দুষ্টুমির মাঝে এসে ধরা দেয়।

অনু চুপি চুপি সন্তুকে বলছে: এই আস্তে আস্তে, শব্দ হচ্ছে যে।

অনুর বুকের মাঝের হৃৎপিণ্ডটা যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। একেবারে তাল বেতালে উঠ্‌তে পড়্‌তে লাগল।

সন্তু একবার সশঙ্কিত দৃষ্টিতে চারদিক দেখে নিলে, তারপর, অতি সাবধানে ভাঁড়ারের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। অনু তার পিছু পিছু চলল। ঢুকতেই টুংটাং শব্দ হতে লাগল। একদিক সামলে চলে ত আর দিক বেসামাল হয়ে পড়ে। নানা হাঙ্গাম। নানা বিপদ। ভাঁড়ারের মাটির বাসনগুলো বেজায় পাজি। অনু যতই ওগুলো সাবধান করে রাখতে যায় ততই ওগুলো বেজে ওঠে। দেখত, কি বিপদ, ওরা যেন সব শত্রুতা করছে অনু আর সন্তুর সঙ্গে।

সন্তু বলে: অনু তুই মাটির বাসন-কোসনগুলি ঘাঁটিসনে ওতে বড্ড শব্দ হয়। বেশী শব্দ হলে ধরা পড়ে যাব কিন্তু।

অনু আর সন্তু পা টিপে টিপে ভাঁড়ারের মাঝে মাথা হুয়ে খুঁজতে লাগল। কোথায় আচারের বৈয়মটি। ওদের শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে ভয় আর সতর্কতায়। পাছে ধরা পড়ে লজ্জা পায়। ওরা কিন্তু জানে না যে এ একটা অপরাধ, এ চুরি। অনু বহুদিনই মার কাছে আচার খেতে চেয়েছে। মা মাঝে মধ্যে একটু একটু করে দিয়েছে। কিন্তু তাতে মন উঠত না অনুর! সন্তুকে যখন ভাগ দিত সেই মায়ের-দেওয়া আচারের, সন্তু তখন বলত, তাই কি মিষ্টি স্বাদ খেতে! ইচ্ছে হয় এক সঙ্গে পেট ভরে অনেকখানি খেয়ে ফেলি। অনু অমনি সন্তুর কথায় সায় দিয়ে বলত, হ্যাঁ তাই আমারও কিন্তু অমনি ইচ্ছে করে এক সঙ্গে সবটা খেয়ে ফেলি। তারপর চোখদুটো বেশ ভাগর ভাগর করে অনু বলে, কী জানি পাছে মা রাগ করেন আবার চাইলে, তাই চাই না।

অনুর বলার ভঙ্গিতে একটা কম্পিত আশঙ্কার ছায়া ফুটে ওঠে। মা যখন রোদে কাটা আমের ফালিগুলোকে হলুদ মাখিয়ে শুকোতে দিত তখনই অনুর মনে হত ও থেকে তুলে নিয়ে একখানা খায়। সত্যি বলতে কি, দু'একখানা তুলে মুখেও দিয়েছে। ওঃ সে স্বাদ কি আর ভোলা যায়। মনে হলে এখনও জিভে জল আসে। মা কত বকেছেন, অনু খেয়ো না কাঁচা আমগুলো। তা কে শোনে, কেবলই ইচ্ছে হয় দু'একখানা করে আমের ফালি নিয়ে খায়।

ভাঁড়ারের ঘরখানার ভিতরে অন্ধকারের বসতি। হাল্কা অন্ধকারটুকু যেন ওখানকার চিরপরিচিত কেউ। এখানে ঢুকলে সেই বাইরের কালো বিদ্‌ঘুটে অন্ধকারটার ভয়ের কথা মনে হয় না। ভাঁড়ারের মাঝে ছোট বড় অনেক বাসন-কোসন ছড়ানো আছে। বাসন-কোসনগুলোর যেন কেমন স্বভাব, ওরা যাকে নিত্য দেখে তাকে সহজভাবেই মেনে নেয়, যখনই ওদের ব্যবহারের জন্য সেই পরিচিত হাতটির পরশ পায় অমনি বিনা প্রতিবাদে তার অনুগত হয়। কিন্তু যে পরিচিত নয় তার ওরা বাধা স্বরূপ। অনুর মা নিত্য ভাঁড়ারে যায়, তাকে বাসন-কোসনগুলো চিনে নিয়েছে। তাঁর সঙ্গে ওদের পরিচয় আছে বটে, তা বলে কি অনু আর সন্তুর সঙ্গেও থাকবে? তা কেন হবে। তাইত জীবন গোল বাধল। অনু আর সন্তু ভাঁড়ারে ঢুকে ঠিক খুঁজে পাচ্ছে না কোন দিকে সেই ঈপ্সিত আচার। বাসন-কোসনগুলো ভাবলে, আলবৎ এ আবার কে এলো? ওরা অপরিচিত লোক দেখে, এখানে বাধা সেখানে বাধা নানা রকম বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। আর ওদের গায়ে অনু সন্তুর হাত লেগে পড়তে লাগল আর অমনি ঠকঠাক শব্দ করে প্রতিবাদ করতে লাগল। কোণে একটা আলমারির মধ্যে ছিল সেই আঁচারের বৈয়ামটি। আরো অনেক—অনেক সব জিনিষপত্র ছিল তার মাঝে।

সন্তুর মন যেমন অনুমনস্ক, তেমন ছিল চঞ্চল। হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে বেচারা মেটে কলসি একেবারে সশব্দে প্রতিবাদ করে উঠল। তাইত এবার উপায়। সন্তু গেল ঘাবড়ে। পাখানি তার কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে পড়ল আলমারীর গায়ে। ব্যস্! আর যায় কে কোথা। আলমারীর ভারি রাগ হল, কী! আমার গায়ে পা তুলে দেওয়া! সে রেগে মেগে, কাঁপতে কাঁপতে তার শরীরটা নিয়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল।

—ঝ ন্—ন্—ন্—ন।

শব্দ শুনে অনুর মা ছুটে ভাঁড়ারের দিকে এলো। আমি তার পিছু পিছু ছুটলাম।

গিয়ে দেখি অনু আর সন্তু উভয়েই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দেয়ালের সঙ্গে মিশে, হা করে মাটিতে পড়া আলমারীটার পানে তাকিয়ে আছে।

হয়ত ওদের মনে হয়েছে, এ্যাঁ কী হল।

আমার দিকে ওরা দুজনেই চেয়ে সলজ্জে হেসে মুখ নীচু করল।

ওদের লজ্জা মাখানো এই হাসিটুকু আমার কাছে টুকরো ছন্দের মত মনে হল। ওরা দৌড়ে ভাঁড়ার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে খোলা মাঠের পানে ছুটল।

আমি তাকিয়ে ছিলাম ওদের পানে। ছুটো ছুটন্ত জীবন কেমন করে ছোট ছোট অত্যাচার আবদারের মধ্য দিয়ে দিনে দিনে বড় হয়ে উঠছে তাই ভাবছিলাম।

২

ও ভাই সাদা মেঘের মুখখানা তোমার অমন কালো হয়ে উঠল কেন? ওঃ বড্ড যে গম্ভীর দেখছি ভাবখানা। দলে দলে সব মারমুখো হয়ে আকাশের আঙিনায় ছুটে আসছ, ব্যাপার নাকি গুরুতর? দুষ্টু মেঘ। আচ্ছা ভাই বাতাস তোমারও এ ভারি অন্যায়। তুমি অমন দুষ্টুমি করছ কেন? ঐ আমগাছটার মাথায় চড়ে অমন নাচানাচি করছ, ওর বুঝি ব্যথা লাগে না? ওর যে আমগুলো সব বাঁটা ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে তা' দেখে তোমার বুঝি কষ্ট হয় না? তুমি ভারি নিষ্ঠুর কিন্তু হাঁ, তোমার কারুর জন্যই দরদ নেই। নিজের খেয়ালে চল আর মেঘের পিছনে তাড়া করে সারা আকাশের আঙিনাটায় খবরদারী করে বেড়াও। কিছু কাজের কাজ কর না। এই ত সেদিন আমাদের বিনু মালীর খড়ের চালাখানা উড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলে, নেহাৎ সবাই মিলে ধরে রাখল বলে। তা না হলে দেরেছিল আর কি! ওমা পাখীগুলোর বাসার পেছনেও লেগেছ। তুমি যে অমন ওদের বিরক্ত করছ ওরা কোথায় থাকবে শুনি? তোমার বুঝি নিজের বাড়ি ঘর নেই? তাই বেপরোয়া হয়ে পরের ঘর-বাড়ি উড়িয়ে নেবার চেষ্টায় আছ। বারে? আমাদের ওপরও জুলুম করবে। আমার গায়ের আঁচলটা নিয়ে অমন করছ কেন? বাঃ! বার বার করে দিয়েও ত আঁচলখানা রাখতে পারছিনা তোমার জ্বালায়! অনু এবারে জোর করে কাপড়ের আঁচলখানা গায়ে জড়িয়ে বেঁধে নিলে। মনে মনে ধমকে বাতাসকে বললে, দেখি এবার তোমার কেরামতি।

আমের পাতায় পাতায় দেয় করতালি ; শব্দ ওঠে খল্‌খলিয়ে হেসে। আর বাতাসের দুষ্টু মিতরা লুকোচুরি ; একটুখানি শান্ত হয়ে চুপ করে থাকে, আবার পাগলামির পালা বেড়ে যায়, তেড়ে ছুটে আসে।

বোশেখ মাসে কালবোশেখী তোমাদের মনে একটা আনন্দ জাগায় না ? আচ্ছা তোমরাই বল, ইচ্ছে হয় না একবার বাইরে ছুটে গিয়ে বাতাসের সঙ্গে লড়াই করে আসি। ইচ্ছে হয় না অমন কড়ের দিনে মায়ের কোলে বসে অচিন দেশের রাজ পুত্তুরের গল্প শুনি ? মনে হয় যেন গোটা জগৎ তোমার চোখের সামনে এসে জীবন্ত মানুষের মত নড়াচড়া করছে। একবার ভাবত তোমাদের মাঝে কেউ কেউ পাগলা সাগর পাড়ি দিয়ে অপর পার থেকে সোনার গাছের হীরের ফুল আনতে যাচ্ছে। তাহলে মনে হয় কতই সুসাধ্য ব্যাপার—বাস্তবিক কিন্তু তা' নয়। পর তোমাদের মধ্যে কেউ রওয়ানা হলে—একখানা সোনার নৌকোয়। জানইত সোনা খুব হাল্কা—তাই দিয়ে তৈরী করলে একখানা নৌকো। তুমি সব আয়োজন করছ দুর্গম যাত্রার, এমন সময় মা এসে বললেন, তুমি যেয়ো না বাবা। আচ্ছা বল, মনটা তখন মায়ের কথায় সাড়া দিতে চায় ? কখ্‌খনই না। কেননা তখন তুমি বেশ বড়সড় হয়েছ—জগতের কত দিক দেখবে, কত বিষয় জানবে, দুঃখ-বিপদের সঙ্গে লড়াই করে করে তোমার সেই আকাঙ্ক্ষিত ধন নিয়ে আসবে। তখন কি মায়ের আঁচল ধরে চুপ্‌টি করে বসে থাকতে ভাল লাগে ? নিশ্চয়ই না। যাই হোক তুমি চলেছ—সেই সোনার নৌকোয় পাড়ি দিয়ে তোমার সেই অরূপ রতনটি আনতে। সাগরের মাঝে পাড়ি দিয়েই দেখলে যে সাগর তার ঢেউয়ের কচি হাত দিয়ে তোমায় ডাকছে, তাই এসো তোমার সঙ্গে মিতালী। তুমি বললে, মিতালী করব, কিন্তু আমার সেই হীরের ফুল আনা চাই। তোমায় পথ করে দিতে হবে। অমনি সাগর শান্ত হয়ে বললে : এসো তুমি, আমি পথ করে দিচ্ছি। তোমায় আমি নিয়ে যাব ঢেউয়ের দোলনায় দুলিয়ে দুলিয়ে। এদিকে হল কি জান ? আকাশের কোথায় সব কচি মেঘেরা ভীড় করে দেখছিল সাগর কি করে। সাগর অমনভাবে তোমার সঙ্গে মিতালী করছিল দেখে ওদের বেশ ভাবনা হল। ভেতরে ভেতরে ইচ্ছা ছিল যে ওরা তোমার সঙ্গে দুষ্টুমি করে, কিন্তু তা আর হল না। সে সাধে বাদ সাধল সাগর। সে যে অমন আপনা থেকেই বন্ধুত্ব করে বসবে তা' কি ওরা জানে। তাই কচি মেঘেরা সব পরামর্শ করে স্থির করলে যে তোমার কাছে যেতে হবে। এমন সময় পবন ঠাকুর এসে কচি মেঘদের কাছে বললেন : দেখ, তোমরা যে যে যাবে আমার রথে তাড়াতাড়ি চড়। আমার কাজ অনেক, আমি জল্‌দি চলব।

না গো না', পবন ঠাকুর অমন তেড়ে রেগে মেগে বেয়ো না কথা শোন কথা শোন।—কচি মেঘেরা সব সুর ধরে চেঁচিয়ে বলে উঠলে।

পবন ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বললে : তোমরা কাজের সময় তারি গোল কর। আমার অনেক রাজ্য ঘুরতে হবে, এখন তাড়াতাড়ি রথে চড়।

কচি মেঘেরা বললে : তা' চড়তে পারি আমরা, কিন্তু খুব ধীরে সুস্থে যেতে হবে। আমরা আজকে এক নূতন বন্ধুর খবর পেয়েছি, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করব। পবন ঠাকুর হাসি-বিরক্তি মেশানো মুখের ভাব দেখিয়ে বললেন : তোমাদের মত কাণ্ড। কে আবার নূতন বন্ধু জুটল ? —ও সেই ছেলেটি বুঝি ? তা আমি যাচ্ছিলাম তাকে পরখ করতে। যাক তোমাদের কি যেন হয় বললে তাই আর পরখ করব না ! কচি মেঘেরা সব সমস্বরে বলে উঠলো : না না ঠাকুর তোমার বীরত্ব প্রকাশ করোনা ওর কাছে।

অনু জেদ করে বললে : না, তা দেব না—তারি ত, আমরা সব কষ্ট করে আম কুড়াবো আর তিনি ভাগ বসাবেন।

অনু আর সন্তু দাঁড়িয়ে চুপি চুপি কি একটা পরামর্শ করল। ওদের মন আজকে দুঃসাহসের নেশায় মেতে উঠেছে। সন্তু একবার ঘোষেদের আমবাগানের দিকে আড় চোখে চাইলে। ঘোষেদের বাগানের কাঁচামিঠা আমের বেজায় সুনাম।

সবাই বলে :

ঘোষেদের বাগানের কাঁচা মিঠে আম
সবুজ রঙের ছোপে দেহটি সুঠাম।
বাতাসের দোলনায় দুলে দুলে নাচে।

পাতার আড়ালে থাকি পাখাদের ঘাড়ে ;
দেহে ভরা টাপুটুপু অঢ় মধুর।
গন্ধ-মাতাল মাছি হল ভরপুর।
পাতার আড়ালে দোলে কাঁচামিঠে আম।
দোলে খোকা লিচুফল আর কাল জাম।
বাতাস মাথায় তুলে নিয়ে চলে ঝাঁক ;
মৌমাছি টুনটুনি, ছাতা, ফিঙে, কাক।
বাগানের এক কোণে তোমরার চাক
থেকে থেকে বেজে ওঠে নাই তাল ফাঁক।
রিম্‌রিম্ ঝিম্ ঝিম্ বাজিছে নূপুর।
এলোমেলো চরণের চলা সুমধুর।
ঘোষেদের বাগানের আমগুলো দোলে,
জিভে আনে লোভ-জল মন বলে ভোলে।
বাগানের আমগুলো দুলে দুলে সারা
কেউ কভু ছুঁতে গেলে মালী করে তাড়া।
কেরে তোরা হৈ ভাকে গলা যেন সাধে
কোমরে কাপড় বাঁধি লাঠি নিয়ে কাঁধে।
মনের আড়ালে থাকি কয় দুষ্ট মন
ছিঁড়ে আন সব আম এই,—এই শোন।

কিছুদিন থেকে ঘোষেদের বাগানের মালী বেজায় মুস্কিলে পড়েছে। আম-বাগানের আম, লিচু-বাগানের লিচু এ সব যেন কোথায় উধাও হয়ে যাচ্ছে। মালী চব্বিশ ঘণ্টা পাহারায় ব্যস্ত। একবার চোর ধরতে পারলে আর রক্ষে নেই। মালী আম বাগানের দিকে অন্ধকারের মাঝে নিজের একটা ছোট আড্ডা গড়ে নিলে। আর রইল সব সময় সচকিত হয়ে। একদিন যায় দুদিন যায়, যার জন্য মালী অমন করে পাহারায় ব্যস্ত রইল তার কিন্তু টিকিটিও দেখা পায় না। কিছুদিন পরে মালীর মনে আলসেমি দেখা দিল। সে আজকাল যখন তখন গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে নাক ডেকে ঘুমোয়। মালী ভাবলে, যাক বাঁচা গেল, বাদল এলো খুব আরামসে ঘুমোনো যাবে। এদিকে কিন্তু আম গাছের আর লিচু গাছের পাতায় পাতায় কানাকানি হচ্ছে বাতাসের তাড়া খেয়ে। কে কোথায় পালাবে ঠাঁই পায় না। এ ওর গায় পড়ে তবু লুকোতে চায়। বাগানে সর্ সর্ করে বাজতে লাগল বাতাসের চলন্ত রাগিণী। দুদ্দান্ত দৈত্যগুলো যেন অন্ধকারের আড়াল বেয়ে বেয়ে এসে আম-বাগানের আনাচে কানাচে ঘোরা ফেরা করছে। মালীর মনে ভয় হল কি জানি বাবা, ব্রহ্মদৈত্যগুলি এই নিরালা ঘরের মাঝে এসে না ঢোকে। তাছাড়া ঐ পাশের বাগানটার সুনাম নেই। ওখানে লোকেরা প্রায়ই ভয় খায়। এসব ভাবনা চিন্তায় মালীর মনের সুখে ঘুমোবার কল্পনা কর্পূরের মত উবে গেল। মালী নিজের নড়াচড়ার শব্দ শুনেই নিজে চমকে উঠল। কে যেন ঐ বাগানের মাঝে পা টিপে টিপে আসছে। মালী কান পেতে রইল। সভয়ে নিজের হাতের লাঠিগাছি শক্ত করে ধরবার চেষ্টা করলে। হাত পা কাঁপতে লাগল, মালীর লাঠিটা ঠক্ ঠক্ করতে লাগল বুড়ো মানুষের দাঁতের মত। ভেতর থেকে কাঁপুনি উঠতে লাগল, মনে হ'ল যেন একশো পাঁচ ডিগ্রী জ্বর মেরে কেটে আসছে।

সন্তু অসুর কাঁধে একটা ঝোলা দিয়ে বললে : ভয় নেই অসু, তুই দাঁড়া আজকে একটা কাণ্ড করব।

মিলিটারী কায়দায় সেলুটটাকে টান করে নিয়ে সন্তু অসুর সামনে দাঁড়িয়ে শুধাল : এই কেমন দেখায় এখন বলত? অসুর চোখে মুখে তখন এলো চুলের গোছা সব কিছু আড়াল করে লুটিয়ে পড়েছে। অসুর মুখে এলোচুলের আড়াল থেকে হাসি ফুটে উঠল। সে মুখের ওপরকার চুলের গোছা সরিয়ে নিয়ে শুধাল : তুমি যুদ্ধে যাচ্ছ নাকি সন্তু?

সন্তু বুকখানা দুলিয়ে জবাব দিলে : হুঁ।

: যারে ; তুমি একাই যুদ্ধে যাবে নাকি, আমায় সঙ্গে নেবে না।

সন্তু একটু নীচু গলায় বললে : নেব, কিন্তু এক সঙ্গে গেলে ব্যাটা মালী টের পেয়ে যাবে।

সন্তু পকেট থেকে একটা বাঁশি বের করে বললে : ভাখ আমি যখন এই বাঁশীতে একটা হুইস্‌ল দেব তখন বুঝবি যে আমি ঠিক স্থানে পৌঁচেছি। যখন দুটো দেবো তখন বুঝবি যে কোন বিপদ ঘটেছে। কিন্তু যখন তিনটে দেবো তখন বুঝবি যে আমার কাজ উদ্ধার হয়েছে। আমি বিজয়ী—বলে সন্তু নিজের বুকের ওপর সগর্বে একটা টোকা মারলে।

খুব খানিকটা হেসে উঠল সে। প্যাণ্টের পকেটে বাঁশীটা রেখে দিয়ে সন্তু আঙুল দিয়ে একটা ঝোপ দেখিয়ে দিলে অনুকে। সন্তু হাসতে হাসতে ঢুকে পড়ল বাগানের মধ্যে। বাগানে ঢুকেই সন্তু গায়ের জামাটা খুলে ফেল্‌লে। সমস্ত গায়ে খানিকটা নানা রকমের মেশানো রং মেখে নিলে। তারপর মুখে পরল জাপানী মুখোস। পায়ের জুতো আর জামাটাকে একটা পুঁটুলী করে পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিলে। এক পা দু'পা করে সন্তু এগোতে লাগল গুড়ি মেরে মেরে।

আম-বাগান নেচে উঠল। ডালে ডালে সুকনো পাতারা সুরু করল কোলাহল। ছোট ছোট পাখীরা প্রাণ নিয়ে পালাল ভয়ে। বাগানের গাছগাছড়ার মাঝে বাতাসের হুল্লোড়। বাতাসের অমন বেদিশা নাচ দেখে সন্তুর বুক কেঁপে উঠল। সে তখন গাছের উঁচু ডালে বাতাসের ঢেউয়ের কাঁপনে কাঁপছে। একবার বাতাস মারমুখো হয়ে রুখে ওঠে, আর অমনি সন্তু ডান হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বাঁ হাত দিয়ে শক্ত করে ডাল জড়িয়ে ধরে। আকাশের পাগলা মেঘগুলো হঠাৎ থ খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল—বাবা! ওদের দৌড়-ঝাঁপের পালা এতক্ষণে শেষ কিন্তু অমন ভালমানুষটির মত চুপটি করে থাকা কেন শুনি? কিছু বদ্ মতলব আছে বোধ হয়।

সন্তু ভাবলে, মেঘেরা ত জল করাবেই। কিন্তু এর আগেই কাজটি শেষ করা চাই। আজকে মালীকে জব্দ করা চাই। দূর থেকে মালীর সাড়া পেয়েই সন্তু তর্ তর্ করে নীচু ডালে নেবে এলো। মনে মনে একটা ফন্দী আঁটল! এদিকে মালীও একটা কিছুর সাড়া পেয়ে বেশ চুপি চুপি এগোতে লাগল। মনে তার ভয়; তায় আবার বাতাসের অমন পাগলামী। মালীর বুক দুরু দুরু করে। সন্তু ভাবল, একবার তোমরার ডাকের মত ভোঁ ভোঁ শব্দ করি, দেখি মালী কি করে। পকেট থেকে ছোট্ট একখানা পেষ্টবোর্ড বের করে হাতে নিল। তারপর পাতার আড়ালে লুকিয়ে মুখের রঙীন মুখোস খুলে ফেল্‌ল। ঠোঁটের কাছে পেষ্টবোর্ডখানা ধরে আস্তে আস্তে ফুঁ দিতে লাগল। ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ—মালী একেবারে চমকে উঠল। চারিদিকে খুঁজতে লাগল শব্দ কোথা থেকে আসছে। কিন্তু শুকনো পাতার কোলাহলে তা' আর বোঝার জো নেই। পাতাগুলো এমন করেই ঝর্ ঝর্ শর্ শর্ শব্দে মাতা-মাতি করতে লাগল যে শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে মালীকে ভোঁ ভোঁ শব্দের কারণ খোঁজার আশা ছেড়ে দিতে হল। সন্তু পাতার আড়ালে লুকিয়ে মালীর ভীত ভাবখানা দেখতে পেলে। মালী এক পা এগোয় ত তিন পা পেছোয়। আর বার বার চম্‌কে উঠে চারিদিকে তাকায়। সন্তু ভাবল এইই সময়, এখন লাফিয়ে পড়ব মালীর ঘাড়ে। সন্তু মনে মনে তখন প্যাঁচ কষছে—যে এই ভাবে লাফ দেব, না ঠিক এভাবেও নয়, ঐ রকম ভাবে ঝাঁপ দেব।

ফোঁ-ও-ও-স, ফোঁ-ও-ও-স। হঠাৎ অমন কানের একেবারে কাছেই শব্দ শুনে সন্তু চমকে উঠে পেছন ফিরে চাইলে।

ওরে বাপরে! সর্ব্বনাশ! সেঁছিরে!—

একটা ভাঁরাদ্ সাপ তখন সোঁ সোঁ করে সন্তুর পানে ছুটে আসছিল। সন্তু শুধু মাত্র সাপটার দিকে এক পলক চেয়ে হাত-পা ছেড়ে দিলে সেখান থেকেই। মালী তখন কেরে বলে লাঠি উঁচিয়ে গর্জ্জন করে উঠেই থমকে গেল। মালী শূন্যে তাকিয়ে দেখলে কি একটা রঙীন জীব হাত-পা ছেড়ে দিয়ে তার ঘাড়েই লাফিয়ে পড়তে চাচ্ছে। —বাপরে—মেরে ফেল্লে রে ভূত। মালী আর সেখানে দাঁড়াবার পাত্র নয়—সোজা টেনে দে ছুট।

মুহূর্ত্ত মধ্যে সন্তু গাছের তলায় পড়ল চিৎ হয়ে—টিপ্।

আদালত ত দেখেছ, সেই যে বিচার আচার যেখানে হয় সেইখানে। আজকে আমাদের পাড়ায়ও একটি আদালত বসেছে। যে অপরাধী তার অপরাধ খুব গুরুতর কি না, তাই সাধারণত যেমন বিচার হয়ে থাকে, এটা ঠিক তেমন নয়। আদালতে অনেক ভিড় হয়েছে। কে কে এসেছে জান? চেষ্টা করলে অনেককেই চিনতে পারবে কিন্তু। আর যদি কাউকে না চেন অন্তু সন্তুকে ত চেনই। তারাও আছে ভীড়ের মাঝে। বিশেষত সন্তুকে না হলে ত আজ চলবেই না। কেন? বারে। ওযে বিচারক। ওঃ! ভাবতে পার তা বলে অন্তু এলো কেন। অন্তু না এলে ত সব মাটি। সে না এলে বিচারের বিষয়বস্তু বোঝাবে কে। তাই নাকি? অন্তু অপরাধী পক্ষের লোক, তার প্রধান কাজ

হল অপরাধীকে নিরপরাধ বলে সবার সামনে প্রমাণ করা। আদালতের সামনে যারা ভীড় জমিয়েছে—তাদের কৌতূহল ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মকি টুলুকে ঠেলছে আর বলছে, সরু না সামনে থেকে। টুলুর তা' শোনার অবসর নেই। সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিচারের কাণ্ড-কারখার সব দেখছিল। তাছাড়া টুলু একটু দেখতে লম্বাও বটে। টুলুর দেহখানা মকির দৃষ্টি আড়াল করে দাঁড়াল। তাহলে কি হবে—হ্যাঁ মকিরও ত একটা ধৈর্য্যের সীমা আছে। দু'একবার বলে যখন কোন বিশেষ সাড়া টুলুর কাছ থেকে পাওয়া গেল না, তখন আর মকিই-বা কি করে। আস্তে টুলুর পিঠের উপর একটি চিমটি কেটে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে রইল। এ ব্যাপারটায় কিন্তু ধরাপড়ার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে জেনে রেখো। যতই মকি নির্দ্দোষ বলে ভাণ করুক না।

টুলু একটি মাত্রও কথা না বলে ঘুরে রুনুর গালে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিলে। হঠাৎ এমন চড় খেয়ে, রুনু চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগল যেন। চড়টা সামলে নিয়ে রেগে বললে: আমাকে মারলি কেন? আমি করেছি কী?

টুলু বললে: তুই-ইত চিমটি কেটেছিস্।

: আরে! আমি নাকি চিমটি কেটেছি। বলে রুনু অবাক হয়ে টুলুর দিকে তাকিয়ে রইল।

টুলু ভাবল, তা' হলে ব্যাপারটা কি রকম হল, কে কাটলে আমায় চিমটিটা। মনে মনে ঠিক করলে যে ধরতে পারলে একবার দেখিয়ে দেব মজাটা। মকি এতবড় একটা চালাকি করল, এর বাহাদুরী কি কোথায়ও প্রকাশ না করে পারে? কাছেই ছিল সন্টু, তাকে ডেকে বেশ চুপি চুপি বললে: হ্যাঁ তাই দিয়েছি আজ টুলুকে ঠকিয়ে, সে আমায় ধরতেও পারে নি। কী মজা! হিঃ হিঃ হিঃ।

অজুর মাথা ভর্ত্তি দুষ্টু বুদ্ধি, সে গোল বাধাতে চমৎকার ওস্তাদ। মকির মুখের কাছে মুখখানা এনে সে এমন ভাব দেখালে যে সে মকির বড় বন্ধু—খুব চুপি চুপি কানের কাছে মুখ এনে বললে: বল না ভাই কি করেছিস।

মকির মনটা তখন একটু দোমনা হয়ে উঠল। একবার ভাবলে বলব না ওকে। কি জানি পাছে যদি টুলুকে বলে দিয়ে মার খাওয়ায়। কিন্তু তার এত বড় বাহাদুরীটা না জানাতে পারলে মনটা যেন কেমন খুঁত খুঁত করে। তাই শেষ পর্য্যন্ত মকি আর থাকতে পারলে না। একবার টুলুর দিকে, একবার অন্য সবার দিকে চেয়ে অজুর কানের কাছে মুখখানা এনে বললে: ভাখ্ এই ভাখ্, তাই জানিস্ একটা মজা।

অজু ঘাড় কাৎ করে বললে: না।

: ঐ টুলু যখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল না। তখন দিলাম কেটে একটা চিমটি। ধরতেও পারল না আমায় এমনি মজা। মকি নিজের বাহাদুরীটা জানিয়ে নিজেই হাসতে লাগল হিঃ হিঃ হিঃ।

অজু আর কথাটি বললে না চুপটি করে রইল। মকি নিজের মনের আনন্দে বুঝতেই পারলে না যে কাজটা ভাল হল না।

একটু পরেই পেছন থেকে কে যেন মকির চুলের মুঠি ধরে টান মারল।

মকি একেবারে ভাঁংকে লাফিয়ে উঠল। পেছনে চেয়েই বুঝতে পারল যে আর কেউ নয় এ অজু, সবই টুলুকে বলে দিয়েছে। উঃ ব্যথা পাচ্ছি যে, বলে মকি মাটিতে বসে পড়ল।

রুনু এতক্ষণে দৌড়ে এসে টুলুকে বললে: কি আমায় মারছিলে যে বড়?

এমন সময় আদালতে বেজায় গোলমাল পড়ে গেল। সবাই উৎসুক হয়ে চেয়ে আছে একদিকে। দেখা গেল অজুর সেই পোষা বিড়ালটাকে সন্তুর ছোট ভাই পল্টু অজের সামনে দড়ি বেঁধে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে আসছে। পুষির আসতে ভয়ানক আপত্তি। সে ঘাড় কাৎ করে, লেজ দুলিয়ে মেও ফোঁস ফোঁস শব্দ করে নানা রকম আপত্তি করছে। কিন্তু তার আপত্তি শোনে কে? তাকে আসতেই হবে। তাহলেও পুষি কিছুতেই আসতে চায় না। এই কয়েক হাত মাত্র রাস্তা পুষিকে টেনে নিয়ে আসতে পল্টু একেবারেই গলদঘর্ম্ম হয়েছে। পুষিটার বেশ বদনাম আছে। কারণ ওর দাঁতে ও নখে বড্ড ধার। মেজাজের সময় কেউ সামনে পড়লে তাকে বড় একটা রেহাই পেতে হয় না। আর এক ব্যাপার ইঁদুরগুলোর অভিশাপ কুড়িয়ে কুড়িয়ে পুষি দিনে দিনে বেড়েই চলেছে।

ওর দেহটি সুন্দর সাদা রোমে ঢাকা; লেজটি যেন শরৎকালের কাশের গুচ্ছ। সামান্য একটু রাগেই ওর চোখ মুখ ফেটে পড়ে। ওর নবাবীর কথা শুনলে মনে হয় ও যেন বাংলার মসনদে চেপে বসেছে নতুন এক সিরাজদ্দৌল্লা। আর পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ যেন হুর্ হুর্ করে ওর কাছে চলে এসেছে চাকরের মত। রাতের বেলায় যে বিছানায় শোবে তা' বেশ নরম হওয়া চাই তা' না হলে ঘুম উঠবে না। খাবারটিও বেশ পরিপাটি চাই তা না হলে গোল বাধবে। মানে সেদিন আর সে খেলই না। না খেলেইত হল, তাহলেই অন্নুর কাজ বেড়ে গেল। সে তখন লেগে যায় পুষিকে তোষামোদ করতে। বাবা, কি তোষামোদের ধরণ যদি একবার দেখ।

একদিন পুষি খাওয়ার সময় গোল বাধিয়ে দিল—সে আর খাবে না। খাবেনা ত খাবে-ই না। এ যেন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আর কি! একেবারে নড়নচড়ন নেই। অন্নু বলছে, চল্ তোতে আমাতে গিয়ে কোথায় আলাদা হয়ে বাস করি। পুষি মুখের দিকে তাকিয়ে 'ম্যাঁও' বলে ডেকে উঠল—মানে হুঁ। পুষি অন্নুর চার পাশ দিয়ে বার কতক লেজ তুলে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরতে লাগল। সেদিন খাওয়ার ত্রুটির মধ্যে আর কিছুই নয়—মাত্র এই যে, অন্নুর মা ওকে কাঁটাটুকু বেছে দেয় নি। ওকে আবার এক জায়গায় গুছিয়ে দিতে হবে সব মাছের কাঁটাটুকু, তবে ও খাবে নয়ত খাবে না। ঘটনাটি এই: অন্নুর মা কাজ কর্ম সেরে একটু বেলায় খেতে বসেছিলেন; এমন সময় গিয়ে পুষি হাজির! হাজির হয়েই ত আর কোন কথা নেই সোজা দাবী জানাল। অন্নুর মা ভাবল খেয়ে দেয়ে যা হয় দেব। দাবী জানাতে জানাতে পুষি একেবারে ভাতের থালাতে পা দেয় আর কি এমনি অবস্থা। অন্নুর মা একটা চড় বসিয়ে দিলেন—যা; বিরক্ত করিসনে! 'ফোঁস্' করে উঠে পুষি যে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল আর বেরুল না। পুষির মনটা একেবারে অভিমানের ফানুষ। যেন অবহেলায় একটু দোল লাগলেই উড়তে চায়। ঘরে গিয়েই অন্নুর সঙ্গে দেখা। কীরে পুষি? 'ম্যাঁও' বলে পুষি অন্নুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। অন্নু পুষিকে কোলে নিয়ে পেটে হাত দিয়েই চেঁচিয়ে বলে উঠল: মা, পুষি খায়নি?

মা সন্ত্রস্ত হয়ে উত্তর দিলেন: কি জানি বাছা অতশত কি আর আমার থাকে। অন্নুর মা উত্তরে আদৎ কথাটা একটু এড়িয়ে গেলেন। কেন না যদি শোনে অন্নু সে পুষির খাওয়া হয় নি তাহলে আর রক্ষে নেই। পুষি আর পুষির মনিব এক সঙ্গে চীৎকার করে সোর গোল বাঁধিয়ে দিলে, শেষে সামলানো দায় হবে।

অন্নুর মা বললেন, অন্নু পুষিকে পাঠিয়ে দে, এই মাছের কাঁটাটুকু খেয়ে যাক। কিন্তু কার কথা কে শোনে সেই পুষি যে খাটের ওপরে গিয়ে বসেছে ত বসেইছে তার আর নড় চড় নেই। সে কারুর পানে তাকায়ও না আর কোন শব্দটিও করে না। শুধু নীরবে জিভ দিয়ে তার লোমশ দেহখানা চাটতে লাগল। এদিকে অন্নুর অভিযোগে বাড়ির সবাই উতলা। সে কেবলই গম্ গম্ করছে আর বলছে, তার পুষির আদর আজকাল হয় না। মা, পিসি সবাই চুপ করে থাকে। কথা কেউ বললে আর রক্ষে আছে, বাবা! তাহলে অন্নু তার শোধ নিয়ে তবে ছাড়বে। অন্নুর মা চুপি চুপি লীলাকে বললে, যাত লক্ষী পুষিটাকে খোঁজ করে নিয়ে আয়। ততক্ষণ পর্যন্ত খাওয়া না হবে ততক্ষণ অন্নু ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে সবাইকে অস্থির করবে। লীলা পুষির খোঁজে চলল।

এমন অভিমানী পুষির বিরুদ্ধে আজ বিরাট অভিযোগ। তার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রথম দফা হল সে ডাকাত। মানে অন্য বাড়ীতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে গৃহস্থের খাবার জিনিস লুঠ করেছে, তারপর ফেরার পথে ইলিশ মাছের যে ক'টি মুড়ো ছিল তা' কিন্তু খেয়েছে। আর বাকীটা মুখে করে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। চোরাই মালের এখনও সন্ধান পাওয়া যায় নি।

দ্বিতীয় দফা হল সে অন্নুর অসাক্ষাতে বিদ্যাচর্চা করতে গিয়ে অন্নুর বইখানা আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছে। তারও শেষটুকু যে কোথায় তার খোঁজ নেই। এই এত এত সব অভিযোগের পরেও আর একটা প্রধান অভিযোগ এই যে, পুষি আজকাল নিজে স্বাধীনভাবে চলতে চায়, এবং অন্নুর আদেশ সে মোটেই গ্রাহ্য করে না। তার মানে পুষি বড় হয়ে বুঝতে পারল যে সে স্বাধীন নয়। অতএব তার মতলব হল

যে অসুর অধীনতা শৃঙ্খল তাকে ভাঙতে হবে। তাহলে বলা যেতে পারে পুষির বর্তমান দৌরাত্ম্যটা আর কিছুই নয় স্বাধীনতার আন্দোলন মাত্র। বোঝা গেল যে পুষি স্বাধীন হতে চাচ্ছে। এদিকে তাতে অসুর প্রভুত্বে বাধে। কেননা যে পুষিকে অসু এত করে শেখায় বোঝায়, দেখ্ কারুর বাড়ি যাবি না, কারুরটা খেয়ে যাবি না, ওতে আমার দুর্নাম হবে। —সেই পুষি কিনা যা তাকে করতে মানা করে তাই-ই করে। হাড়ে হাড়ে এর চেয়ে দুঃখের আর কী আছে? পুষি শেষটায় জাত মান খোয়াল। সবাই বলে অসুর পুষি বড্ড দুষ্টু—এ কি সহ্য হয়। পুষি রীতিমত অসুর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে পড়ল। অসুর মনে ভারি দুঃখ হল। হায় পুষি তুই আমায় এমনি কষ্ট দিলি। মনে কষ্ট হলে কি হবে পুষি যখন কুকর্ম করে ধরাই পড়েছে তখন তাকে ছাড়িয়ে আনতে হবেই। শত হলেও সে পুষি ত বটে। তাই অসু আজকে আদালতে অপরাধীর পক্ষ সমর্থন করার জন্য উপস্থিত।

কিন্তু বিচারকের মনের ভাবটা ঠিক অসুর পছন্দ হল না। পুষিকে ধরে আনার জন্য যেমন পল্টুকে হুকুম দিলে তা' শুনে অসুর মনে ভারি ভয় ও দুঃখ হল। কি করবে, উপায় কি! পুষি দোষী, তার অপরাধের শাস্তি নিতেই হবে। তা' বলে দস্তু বুঝি একটু ভালভাবে পুষিকে ধরে আনার কথা বলতে পারে না। উঃ যেমন করে টেনে নিয়ে আসছে, পুষির বড্ড লাগছে। অসুর চোখে জল এলো। সে পল্টুর কাছে গিয়ে বললে: তুই সর পল্টু ওকে আমি নেব।

পল্টুর পুষির ওপর একটু রাগ হয়েছে, তার কারণ পুষিকে অমন টানা হেঁচড়া করে নিয়ে আসতে, পুষি আত্মরক্ষার জন্য দু'একটি কামড় পল্টুকে দিয়েছে। পল্টু সেটা পুষির বেয়াদপি বলে মনে করে। সে জন্য পথে পল্টু পুষিকে দু'এক ঘা দিয়েওছে। কিন্তু পুষি একবারেই বিদ্রোহী। পুরোপুরি অসুর অনুরোধে পল্টু মেজাজ দেখিয়ে বললে: না সে হবে না আমার সেরকম হুকুম নেই। আসামীকে অন্যের হাতে দেওয়া আইনে নিষেধ। অসু ধমক খেয়ে আর একটি কথাও বললে না। তার মনে পুষির দুঃখের ছবিটাই বার বার করে ফুটে উঠতে লাগল।

পল্টু সাঁই সাঁই করে তার লাঠিখানা ঘুরিয়ে বলতে লাগল, সামনেওয়ালা হট যাও। পল্টুর তখন মেজাজ দেখে কে? এমন গুরুতর অপরাধের এক অপরাধী আসামীকে নিয়ে আসছে। আদালতে একটা সোরগোল পড়ে গেল। দর্শকদের মধ্যে ভীষণ ধাক্কাধাক্কি সুরু হল। সবারই কৌতূহলী দৃষ্টি ঐ একটি জীবের প্রতি। এ ওকে ঠেলে আসামীকে দেখতে চায়। তাতে দর্শকদের মধ্যে একটা বিবাদের সৃষ্টি হল। আদালত সরগরম হয়ে উঠল। আদালতে এতসব গোলমাল দেখে বিচারক দস্তু এক আইন জারী করে দিল। পল্টুরাম পুলিশকে বললে, আদালতের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আমি বাধ্য হয়ে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। কেননা ভীড় আদালতের কাজের বড়ই বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। অতএব যত শীঘ্র পার আদালতের ভীড় সরিয়ে দাও। বিচারকের হুকুম না মেনে উপায় আছে। পল্টু আর কোন কথা না বলে কাজে লেগে গেল। সে তার লাঠি ঘুরিয়ে সবাইকে শাসিয়ে দিলে খবরদার এদিকে এসোনা। কাজের ব্যাঘাত করো না তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধেও—। পল্টু বুক টান করে আদালতের সামনে ঘুরে বেড়ায়।

পাড়ার বংশীবদন একটু রোগা পটকা গোছের ছেলে। নাকটি তার ধনুকের মত বাঁকা। চুলগুলো লম্বা লম্বা, চোখ দুটো গর্তের নিবাসী। তারা বিশেষ প্রয়োজন না হলে বাইরে আসে না। হাত পাগুলো বাঁশের কঞ্চির মত লম্বা। কথা বলত নাকি সুরে। হাতের নখ সে বড় একটা ফেলত না। গায়ের জামাটাও বড় খোলার নাম সে করত না। এক কথায় জামাটি যদি একবার বংশীবদনের গায়ে চেপে বসতে পারল তাহলে আর নামবার নামটি করত না। বংশীবদনের নখের একটা সুখ্যাতি ছিল সে যখন তখন সবার গায়ে আঁচড় কেটে আলাপ করত। নখের অমন আলাপের ধারা দেখে সবাই বংশীকে এড়িয়ে চলত। সবাই ভাবত, বাবা, বংশীর নখের আঁচড় খেয়ে শেষকালটায় মারা যাব। সবাই তার নখের উৎপাতে না টিকতে পেরে নাম দিলে নোখো-বংশী। সেই নোখো-বংশী কি সব ভাবতে ভাবতে এসে আদালতে হাজির। নোখো-বংশীকে দেখে আর এক পশলা সোরগোল সুরু হল। নোখো-বংশীর কেন যে হঠাৎ আবির্ভাব হল এ রহস্য কেউই জানে না, কেবলমাত্র সস্তু ছাড়া

নোখো-বংশী মোটেই ঘাবড়াবার পাত্র নয়। সে সটান ভীড়ের মধ্যে এসে বললে: কৈ কাগজ পত্র সব ঠিক আছে।

পল্টু কি সব কাগজপত্র এনে নোখো-বংশীকে দিলে।

নোখো-বংশী আর একটুও সময় নষ্ট না করে সোজা বিচারক সন্তুর কাছে গিয়ে হাজির। বিচারক সন্তু একটু পরে ঘোষণা করল, বিচার সুরু হ'ক।

সাক্ষী হাজীর হায়, সাক্ষী হাজীর হায়—টুলু চেঁচিয়ে উঠল। এই যে আমি, এই যে আমি বলতে বলতে মক্কি এগিয়ে এলো।

নোখো-বংশী খুব গম্ভীর ভাবে মুখ ঘুরিয়ে বললে:

তোমার নাম?

মক্কি রাণী?

কী বললে মক্কি—

মক্কি আবার স্পষ্ট করে নিজের নামটা বললে: মক্কি রাণী।

নোখো-বংশী মাথা দুলিয়ে বললে: ও, তাই বল—

রাঁণী—মক্কি রাঁণী।

ডিলেঢালা ছেড়া টুইলের সার্টের পকেটে হাত দিয়ে নোখো বংশীবদন জাঁকিয়ে বসল মাটির ঢেলার ওপরে। একটু দূরেই বিচারক সন্তুচন্দ্র বড় একটা মাটির ঢেলার ওপরে গম্ভীর ভাবে বসে আছে। একটু দূরে বেচারি পুঁচি দড়ি বাঁধা পল্টুর হাতের মধ্যে! পল্টু দাদার অনুগত ছোট ভাই। সে নীরবে দাদার মুখের পানে তাকিয়ে আছে। নোখো-বংশী আদালতের কর্মচারী, তার প্রভুর সামনে একবারে চুপ। মাঝে মধ্যে পকেটের মধ্যে হাত দিয়ে কি যেন খুঁজছিল। দর্শকেরা সবাই চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে। কারুর মুখে রা-টি নেই। তবুও মাঝে মাঝে ফিস্ ফিস শব্দ শোনা যায়। বিশেষ করে নোখো-বংশীর কাছটা দিয়ে যেন ফিস্ ফিস্ শব্দটা বেশী শোনা যায়। যেন নোখো-বংশীকে কে তোষামোদ করছে, তাই এবার উৎরে দাও তার পর তোমার বিষয় যা হয় করব। নোখো-বংশী তার ধনুকের মত বাঁকা নাকওয়ালা মুখখানা ঘুরিয়ে কার পানে তাকিয়ে যেন বললে, আগে দাও তবে তঁ। নোখো-বংশী নাক দিয়ে খুঁ খুঁ করে এক রকম শব্দ করে সমস্ত শরীরটাকে একবারে নেড়ে চেড়ে চুপটি করে বসে রইল।

বিচারক কিছুক্ষণ পরে গম্ভীর গলায় নোখো-বংশীর পানে তাকিয়ে শুধাল: কই মামলার কাগজপত্র সব দাও।

নোখো-বংশী শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠে এক বাণ্ডিল ছেড়া কাগজ সযত্নে গুছিয়ে বিচারক সন্তুর কাছে দিলে। সন্তু কাগজগুলো একবার গম্ভীর মনোযোগের সহিত দেখে নিয়ে বললে: হুঁ, সাক্ষী কোথায়?

সিঙ্গন টুলু বললে: হুজুর, কাছেই আছে।

সাক্ষী মক্কি বিচারকের কাছে এসে দাঁড়াল।

সন্তু প্রশ্ন করল: আচ্ছা মক্কি তুই জানিস না অনুদির পুঁচিটা কি রকম দৌরাত্ম্য আরম্ভ করেছে।

মক্কি ঠোঁট উল্টিয়ে চোখ ঘুরিয়ে উত্তর দিলে: জানি আবার না! আমার থালা থেকে সেদিনও ইলিশ মাছখানা নিয়ে গেল। বিচারক সন্তু তখন প্রশ্ন করলে: আচ্ছা তুমি তখন ভাত খাচ্ছিলে না অন্যমনস্ক ছিলে।

মক্কি রুখে উঠে বললে: অন্যমনস্ক ছিলাম কি? খুব মন দিয়ে ভাত খাচ্ছিলাম।

এমন সময় অনু উঠে বললে: আমি জানি ও কোনদিনই মন দিয়ে ভাত খায় না। ভাত খাবার সময় খালি এদিক ওদিক চায়। আর ভাতের গ্রাস মুখ থেকে পড়ে যায়। সেজন্য ওর মা কত বকে ওকে।

মক্কি প্রতিবাদ করে বললে: তুই কি করে জানলি অনু?

অনু চট করে জবাব দিলে: কেন আমি যে তোমার সঙ্গে খেয়ে এলাম। তা বুঝি ভুলে গেছি মনে করেছ। তোমার মা যে কত বকল তোমায়—হ্যাঁ মনে নেই বুঝি?

মক্কি আর অনুতে ঝগড়া বেধে গেল।

বিচারক সন্তু আদালতের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এক সতর্ক নোটিশ দিয়ে দিলে। তারপর আবার চুপচাপ: আদালতের মাঝে আবার ফিস্‌ফাস্ সুরু হল।

নোখো-বংশী অনুর সঙ্গে কি যেন পরামর্শ করল।

নোখো-বংশী সে হবে না, সে হবে না, বলে চাপা গলায় আপত্তি জানাল। পাছে বিচারক সন্তুর দৃষ্টি পড়ে সেই ভয়ে সে মুখখানা একটু আড়াল করে বললে: অনু এবার দিয়ে দাও, তোমার পুঁচি ত ছাড়া পেয়ে গেল।

অনু বললে : আগে ছাড়া পাক না ভাই।

নোখো-বংশী একটু গলার সুর চড়িয়ে বললে : সে হবে না, এক্‌নি চাই।

অনু গেল চটে। যা রে! পুষি আগে ছাড়া পাক তবে ত।

: না আগেই দিতে হবে।

অনু জোরে চেঁচিয়ে বললে : দেবো না।

: কী, দেবে না? বলে নোখো-বংশী আরো জোরে চীৎকার করে উঠল।

বিচারক সন্তু বাধ্য হয়ে নোখো-বংশীর বিরুদ্ধে আদালতের শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য শাস্তি বিধান করল।

সন্তু বললে : এই পেস্কার নোখো-বংশী বেরিয়ে যাও। তোমার দ্বারা আদালতের কাজ চলে না।

দর্শকদের মধ্যে একটা হৈ হৈ পড়ে গেল। তারা সবাই উচ্চৈঃস্বরে হৈ হল্লা করতে লাগল। বিচারক সন্তু দাঁড়িয়ে উঠে বললে : চুপ কর। মহা বিভ্রাট। এখন উপায়? সন্তু পল্টুর দিকে তাকিয়ে কি যেন ইঙ্গিত করলে।

পল্টু একেবারে লাঠি নিয়ে ভীড়ের মাঝে লাফিয়ে পড়ল। এই-ও সব ঠিক রহ,—তার লম্বা লাঠিখানা ঘুরিয়ে লাঠি খেলার কৃতিত্বটা কসরৎ দেখিয়ে দিলে। তাতেও দর্শকেরা বশে এলো না। বরং সবাই আরো জোরে হৈ চৈ করতে লাগল। প্রতিবাদ করতে করতে একদল আদালত পরিত্যাগ করল।

ঘুষখোর পেস্কার
ধনু-বাঁকা নাক তার
—ছি-ছি-ছি।
ছেঁড়া খাতা বগলে
—হিঃ-হিঃ-হিঃ।
কটা কটা এলো চুল
গাল দুটো তুল তুল
উঁচু দাঁতে পোকা ধরেছে।
টিলে জামা ছেঁড়া কাড়া
কুলো নখে কাদা জমেছে।

পেস্কার পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

নোখো-বংশীকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। পাড়াময় খালি শব উঠতে লাগল—'ঘুষখোর পেস্কার ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পুষি সংযত ও ভদ্র হয়েছে। সে আজকাল আর স্বাধীনতার আন্দোলন করে না। সে এখন অনুর কাছে ইলিশ মাছ না খাওয়ার সংযম শিক্ষা করছে।

দুর্ভিক্ষের সন্ততি

শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী

প্রার্থনা করো—
মন্বন্তরের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে
যে হতভাগ্যের দল
মাতৃভূমি থেকে ছিটকে পড়েছে,
অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারেও
যাদের হয়নি একবাটি ফেনের সংস্থান,
নিজের ঘরেও যারা পায়নি
শান্তিতে মাথা গুঁজতে,
শোষক, শাসক আর অর্থগৃধ্নুর কুচক্রে
শৃগাল কুক্কুরের মত
যে হতভাগ্যের দল রাজপথে মৃত্যুবরণ করছিল,
প্রার্থনা করো সে বঞ্চিতদের জন্য!

তবু দেখো মুখে কোন অভিমান নেই,
মানুষের প্রতি নেই কোন অভিযোগ,
পাষাণের দেবতারে আজো করে পূজা,
ভাগ্যাহত কংকালের দল—
বিচার তো নাহি চায় কারো,
ছাড়ে শুধু দীর্ঘশ্বাস
বুকফাটা অন্তিম নিঃশ্বাস;
ইতিহাস চোখ বুজে রয়।
তর্ক ছাড়ো, ওরে ভাই,
ঘৃণা, দ্বেষ, মিথ্যা অহমিকা,
দলাদলি, ভাগ বাটোয়ারা—
ক্ষুদ্রতার অভিব্যক্তি ছাড়ো।
এ লজ্জা এদের শুধু নহে—
এ লজ্জা তোমার আমার,
এ লজ্জা সমগ্র জাতির।*

---

* পাল্লারের কেন্দ্রীয় বিপন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে ও ফিরোজপুর অনাথাশ্রমে পলাশ সেনের বাংলার পথে কুড়ানো ছেলেমেয়েদের সাথে দেখা করার পরে।

বাংলার প্রজাশক্তি ও নীল

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গদেশে নীলচাষ আরম্ভ হয়। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী সাধারণ ভাবে সকল ইউরোপীয়কেই নীলচাষের অধিকার দান করেন। পাদ্রী উইলিয়ম কেরী বাংলাদেশে আসিবার কিছুকাল পরে মদনাবতীতে নীলকুঠীর তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে বঙ্গদেশ ছাড়া বিহার, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলেও নীলচাষ বিস্তৃত হয়। কিন্তু বাংলার নীলকরদের কার্যপ্রণালীই এক অদ্ভুত অমানুষিক আকার ধারণ করে। তাহারা নিরীহ প্রজাদিগকে নীলচাষে বাধ্য করিবার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই নানাভাবে উৎপীড়ন করিতে থাকে। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই সরকার নীলকরদের অত্যাচার-উৎপীড়নের উল্লেখ করিয়া এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করিলেন :

"The attention of Government has recently been attracted in a particular manner, to abuses and oppressions committed by Europeans, who are established as indigo planters in different parts of the country. Numerous as those abuses and oppressions have latterly been, the Right Hon'ble the Governor-General-in-Council is still willing to hope that this imputation does not attach to the character of indigo planters generally, considered as a body or class of people. The facts, however, which have recently been established against some individuals of that class before the Magistrates and the Supreme Court of Judicature are of so flagrant a nature, that the Governor-General-in-Council considers it an act of indispensable public duty to adopt such measures as appear to him, under existing circumstances, best calculated to prevent the repetition of offences equally injurious to the English character and to the peace and happiness of our native subject.

"The offences to which the following remarks refer and which have been established beyond all doubt or dispute against individual indigo planters, may be reduced to the following heads :

1st.,—Acts of violence, which, although they amount not in the legal sense of the word to murder, have occasioned the death of natives.

2nd.,—The illegal detention of natives in confinement, especially in stocks, with a view to the recovery of balances alleged to be due from them or for other causes.

3rd.,—Assembling, in a tumultuary manner, the people attached to their respective factories, and others, and engaging in violent affrays with other indigo planters.

4th.,—Illicit infliction of punishment, by means of a rattan or otherwise, on the cultivators or other natives."*

লর্ড মিণ্টো তখন বড়লাট। নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারের কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি সপরিষদ এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রচার করেন এবং এইরূপ উৎপীড়ন ভবিষ্যতে আর যাহাতে না ঘটিতে পারে তাহার উপায় অবলম্বনেও দৃঢ়সঙ্কল্প হন। সরকার ৫জিলার নীলকরের লাইসেন্স বা অনুমতি-পত্র বাতিল করিয়া দিলেন। প্রজাদের উপর নীলকর-পক্ষের কিরূপ অত্যাচার উৎপীড়ন হইত তাহা মোটামুটি চারি ভাগে ভাগ করিয়া উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে :

(১) নীলচাষীদের উপর এইরূপ শারীরিক উৎপীড়ন চলিত যাহার ফলে তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ঠিক নরহত্যার পর্যায়ে না পড়িলেও ইহা প্রায় হত্যারই সামিল। (২) বকেয়া নীল আদায়ের জন্য নীলচাষীদের ধরিয়া আনিয়া নীলের গুদামে বহুদিন যাবৎ বেআইনী ভাবে আটক রাখা হইত। (৩) নীলকরদের অধীনস্থ লোকদের সম্মিলিত করিয়া চাষীদের ভয় দেখানো হইত এবং নিজেদের পরস্পরের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ বাধানো হইত। এবং (৪) বেতের উপর চামড়া দিয়া মোড়া এক প্রকার লাঠি দ্বারা চাষীদের প্রহার করা হইত। 'নীলদর্পণে' "ভাষ্যচাদ" নামে ইহার উল্লেখ আছে।

---

* *Bengal under the Lieutenant Governors*, Vol I. By C. E. Buckland, Pp. 238-9. পরে এই পুস্তকের নাম সংক্ষেপে *Buckland* বলিয়া উল্লেখ করিব। বঙ্গের দ্বিতীয় লেঃ গবর্ণর সার্ জন শিটার্, প্রাক্তন আমলে 'নীল বিদ্রোহ' হয়। এই সরকারী নীল কমিশনের রিপোর্টের উপর তাঁহার বক্তব্যলিপি নানা তথ্য ও যুক্তিপ্রমাণে পূর্ণ। উক্ত পুস্তকের ২৩৮-৭১ পৃষ্ঠায় ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ রচনায় ইহা হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। নীল সম্পর্কে আধুনিক কোন কোন লেখক এই বক্তব্যলিপি হইতে তথ্যাদি লইয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ইহার উল্লেখটী পর্যন্ত করেন নাই।

সরকার-প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি ও অনুসৃত নীতির ফলে নীলকরদের দৌরাত্ম্য সাময়িক ভাবে কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইলেও পরে ইহা আবার আত্মপ্রকাশ করে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচারের বার বৎসর পরে 'সমাচার দর্পণ' (১৮২২, ১৮ই মে) নীলকরদের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে লিখিলেন :

"মফঃস্বলে কোন কোন নীলকরেরা প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করেন তাহার বিশেষ এই, যে প্রজা নীলের দাদন না লয় তাহারদিগের প্রতি ক্রোধ করিয়া থাকেন ও খালাসীদিগকে কহিয়া রাখেন যে, ঐ সকল প্রজার গরু নীলের নিকট আইলে সে গরু ধরিয়া নীলের কুঠীতে আনিবা। তাহারা ঐ চেষ্টাতে নীলের জমীর নিকট থাকে কিন্তু যখন গরু নীলের নিকট আইলে যদ্যপি নীলের কোন ক্ষতি না করে তথাপি তখনি সে গরু ধরিয়া কুঠীতে চালান করে, সে গরু এমত করিয়া রাখে যে তৃণ ও জল দেখিতে পায় না। ইহাতে প্রজালোক বিত্তান্ত কাতর হইয়া কুঠীতে যায়। প্রথম তাহারদিগকে দেখিয়া কেহ কথা কহে না পরে গরু অনাহারে মত হয় তখন প্রজার দুঃখ হয় ইহাতে সে প্রজা রোদনাদি করিয়া সাহেবলোককে কিছু দুঃখ দিয়া ও নীল দাদন লইয়া গরু খালাস করিয়া ঘরে আইসে। এবং নীলের দাদন যে প্রজা লয় তাহার মরণ পর্য্যন্ত খালাস নাই হেতুক হিসাব হয় না প্রতিসনেই দাদন সময়ে বাকীদার করিয়া বহিয়া করজ রাখে। তাহাতে প্রজারা ভীত হইয়া দাদন করায় বাকী লিখিয়া দিয়া দাদন লইয়া যায়। এইরূপ যাবৎ গোবৎসাদি থাকে তাবৎ ভিটায় থাকে তাহার অন্যথা হইলে হাল ভাঙ্গ করে হেতুক দাদন থাকিতে অন্য সন্ত আবাদ করিয়া নির্ব্বাহ করিতে পারে না।" *

পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞপ্তিতে যে সব উৎপীড়নের কথা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা ছাড়াও যে নূতন নূতন ধারা নীলকরগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হইতেছিল—সমাচার দর্পণের বিবরণ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। ক্রমে ক্রমে এ বিষয়টি অধিকতর পরিস্ফুট হইবে। নীলচাষীদের উপর এতাদৃশ অত্যাচার-উৎপীড়ন হইলেও নীলচাষের ফলে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা কতকটা উন্নত হইতেছিল—১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর ইউরোপীয়দের এদেশে স্থায়ী বসবাস বিষয়ক সভায় দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং রামমোহন রায় এই মর্ম্মে বলিয়াছিলেন। উভয়েরই বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল—ইউরোপীয়রা এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইলে তাহাদের স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ সামর্থ্য ইহার উন্নতিতে নিয়োজিত হইবে। রামমোহন রায়ের উক্তি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। * কোন কোন নীলকর যে অত্যাচারী একথা তাঁহারা কিন্তু অস্বীকার করিতে পারেন নাই। দ্বারকানাথ ঠাকুরের উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

"With reference to the subject more immediately before the meeting, I beg to state, that I have several Zemindaries in various districts, and that I have found the cultivation of indigo and residence of Europeans have considerably benefited the country and the community at large; the Zemindars becoming wealthy and prosperous, the ryots materially improved in their condition, and possessing many more comforts than the generality of my countrymen where indigo cultivation and manufacture is not carried on, the value of land in the vicinity to be considerably enhanced, and cultivation rapidly progressing. I do not make these statements merely from hearsay, but from personal observation and experience, as I have visited the places referred to repeatedly, and in consequence, am well acquainted with the character and manners of indigo planters. There may be a few exceptions as regard the general conduct of indigo planters; but they are extremely limited, and are, comparatively speaking, of the most trifling importance."†

বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্বারকানাথ ঠাকুরের জমিদারী ছিল। তিনি এই জমিদারি পরিদর্শন কালে যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা হইতেই এখানে বলিতেছেন যে, নীলচাষে কি জমীদার কি প্রজা উভয়েই উপকৃত হইতেছে। নীলকরদের আচরণ সম্পর্কেও তিনি সাফাই গাহিয়াছেন বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, অত্যাচারী নীলকরও কোথাও কোথাও ছিল। রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর উভয়েই এদেশে ইউরোপীয়দের স্থায়ী বসবাসের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, কাজেই ইউরোপীয় চরিত্রের ভাল দিকটির উপরই বেশী জোর দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তবে অত্যাচারী নীলকরদের সংখ্যা যে সামান্য ছিল না সমসাময়িক অন্য প্রমাণ হইতে তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ১৮৩০ সালের পঞ্চম আইনে

* সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১৭০।

* মন্দিরা, আষাঢ় ১৩৪২, পৃ. ১১২ : 'জাতি-বৈর' দ্রষ্টব্য।

† *The Asiatic Journal*, June 1830, : Asiatic Intelligence, P. 69. London.

চুক্তিভঙ্গকারী নীলচাষীরা চুক্তিভঙ্গের অপরাধে ফৌজদারীতে দণ্ডনীয় হয়।* এইরূপ বেআইনী আইন ১৮৩৫ সালে মেকলে তুলিয়া দিয়াছিলেন। ঐ আইনে প্রজাদের কয়েক বৎসর যাবৎ অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে ইহার প্রতিবাদ করিয়া জনৈক মফস্বলবাসী 'বঙ্গদূত' কাগজে একখানি পত্র লেখেন। এই কাগজখানি না পাওয়ায় উক্ত পত্রের ইংরেজী অনুবাদ লণ্ডনস্থ 'এসিয়াটিক জার্ণাল' (সেপ্টেম্বর ১৮৩১) হইতে এখানে দেওয়া হইল। নীলকরদের অত্যাচারের স্বরূপ এখানে সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং রামমোহন রায়ের অনুকূল উক্তির কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পরেই এই পত্রখানি প্রকাশিত হয়।—

"Some months ago a new law was promulgated respecting the cultivation of indigo, in which various enactments were made regarding the cultivators of the soil. The injustice which has resulted therefrom has not indeed been made public by them, for although the agriculturists suffer a variety of oppressions from the planters, they have entered into no disputes on the subject. To dispute with the planters involves, first, the risk of life, and secondly, a most heavy expense; and they are so poor as to be unable to provide even for their own exigencies! Hence they are necessarily indisposed to contention...When the cultivator has once received an advance, neither he nor any of his posterity can obtain deliverance from the engagement, for the accounts are so dexterously obscure, that he always appears in arrears; that is to say, he can never expect to be emancipated from his bondage .....Under a thousand similar acts of oppression, the community groans;...every man trembles at the clubs of the planters, and is therefore deterred from complaining. The planters have now firmly rooted in the mofussil, because many of the smaller proprietors of land are drawn by avarice to seek their service. Knowing this their wishes are first consulted in the bestowment of places; and finally the rope is artfully fixed to their hooks, and they are induced to give lease of their lands; upon the strength of which, oppressions are multiplied,..."

* "In that year [1830], a law (Regulation V) was passed which made *raiyats* who broke indigo contracts, liable to prosecution and penal consequences, in the Magistrate's Courts, as for a misdemeanour."

—*Buckland*, p. 249.

এই মফঃস্বলবাসীর পত্রখানিতে নীলকরদের অত্যাচার অনাচারের ভয়ে নীলচাষীরা যে তাহাদের বিরুদ্ধে কোনরূপ মোকদ্দমা বা অন্যবিধ উপায় অবলম্বনে বিরত ছিল তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। দুইটি বিষয় এখানে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ একবার নীলের দাদন লইলে সকল প্রজাকেই পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে ইহার চাষে বাধ্য হইয়া থাকিতে হইত, দ্বিতীয়তঃ নানারূপ প্রলোভন ও ছলচাতুরী দ্বারা জমির মালিকরা নীলকরদের যাহাতে জমি ইজারা দেয় নীলকরগণ তাহার উপায় করিয়া লইত। এই সব কারণে চাষীদের উপর নীলকরদের অত্যাচারের অন্ত অবধি রহিল না।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দে ইউরোপীয়গণ বঙ্গদেশে ভূমি ক্রয় করিয়া তাহাতে স্বত্ববান হইবার অধিকার লাভ করিল। ইহার পর হইতে নীলকরেরা নিজেরাই জমি ক্রয় করিয়া এদেশীয়দের দ্বারা চাষবাস করাইতে লাগিল। অবশ্য দাদনী জমিতেও চাষ আবাদ পূর্ব্ববৎ চলিতেছিল।* এই সময় নীলকর সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পরস্পরের ভিতরকার বিবাদ-বিসম্বাদ প্রায় রহিত হইয়া গেল এবং এক এক অঞ্চলে নীলকরেরা একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে নীলকরেরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও কখন কখন দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত থাকায় নিজ নিজ প্রজাদের উপর অত্যাচার যদি বা কিছু কম হইত, ইহার পর হইতে তাহার আর সম্ভাবনাই রহিল না। নীল-চাষীরা দাস প্রজায় পরিণত হইল।

নিজ জমি ও দাদনী জমি—উভয় জমিতেই নীলচাষ হইতে লাগিল। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল—নিজ জমিতে ঠিকা লোক রাখিয়া নীলচাষ করানো অপেক্ষা দাদনী-জমিতে নীলচাষ করানো অধিকতর লাভজনক। কাজেই নীলকরগণ দাদনী জমিতে নীলচাষ করাইতেই অধিকতর আগ্রহান্বিত হইল। তাহাদের এই আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে দাদনী জমির মালিক চাষীদের উপর অত্যাচারের মাত্রাও বাড়িয়া চলিল। কোন কোন জমিদার জমির উচ্চ দর পাইয়া নীলকরদের তাহা বিক্রয় করে। আবার কোন কোন জমিদারের সঙ্গে তাহাদের দাঙ্গাহাঙ্গামা মোকদ্দমাও উপস্থিত হয়। নড়ালের দুর্দ্ধান্ত জমিদার রামরতন রায় কোন কোন অত্যাচারী নীলকরকে দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নীলকরদের অত্যাচার-

উৎপীড়ন কিছু সময়ের চলিয়াছিল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' (অগ্রহায়ণ ১৭৭২ শক) নীলকরদের অত্যাচারের বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ বাহির হয়। তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল :

"নীলকরদিগের কার্য্যের বিবরণ করিতে হইলে প্রজাপীড়নেরই বিবরণ লিখিতে হয়। তাঁহারা দুই প্রকারে নীল প্রাপ্ত হয়েন, প্রজাদিগকে অগ্রিম মূল্য দিয়া তাঁহারদের নীল ক্রয় করেন, এবং আপনার ভূমি কর্ষণ করিয়া নীল প্রস্তুত করেন। সহজ-স্বভাবে সাধু থাকিয়া মনে করিতে পারেন, ইহাতে দোষ কি কিন্তু লোকের কত ক্লেশ, কত আশা ভঙ্গ, কতদিন অনশন, কত হত্যা যে এই উদ্যমের অন্তর্ভূক্ত রহিয়াছে, তাহা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। এই উদ্যমই প্রজাবাসের দুই অমোঘ উপায়। নীল প্রস্তুত করা প্রজাদিগের ব্যবসা নহে ; নীলকর তাহাদিগকে বলদ্বারা তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করেন, ও নীলযোগ্য বৎসরে তাহারদিগের উত্তমোত্তম ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। দ্রব্যের উচিত পণ প্রদান করা তাঁহার রীতি নহে, অতএব তিনি প্রজাদিগের নীলের অত্যল্প মূল্য ধার্য্য করেন। নীলকর সাহেব স্বাধিকারের একাধিপতিস্বরূপ তিনি মনে করিলেই প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিতে পারেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া যাহা কিছু দেন তাহা প্রদান করিতে অনুমতি করেন, গোমস্তা ও অন্যান্য আমলাদের বক্সিস ও হিসাবানবিসি উপলক্ষে তাহারও কোন্ না অর্দ্ধাংশ কর্ত্তন যায়? একারণ প্রজারা যে ভূমিতে ধান্য ও অন্যান্য শস্য বপন করিলে অনায়াসে সবংশের পরিবার প্রতিপালন করিয়া কাল যাপন করিতে পারে তাহাতে নীলকর সাহেবের নীল বপন করিলে লাভ তার দূরে থাকুক, তাহারদিগকে দুঃখের পর জালে বদ্ধ হইতে হয়। অতএব তাহারা কোনক্রমেই স্বেচ্ছানুসারে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না। বিশেষতঃ কৃষিকার্য্যই তাহারদের উপজীব্য, ভূমিই তাহারদের একমাত্র সম্পত্তি এবং তাহারই উপর তাহারদের সমুদয় আশা ভরসা নির্ভর করে। কোন্ ব্যক্তি এমত সঞ্চিত ধনে জলাঞ্জলি দিয়া আত্মবধ করিতে চাহে? কিন্তু তাহারদের কি উপায়ান্তর আছে? প্রবল প্রতাপান্বিত মহাবল-পরাক্রান্ত নীলকর সাহেবের অনিবার্য্য অনুমতির অন্যথাচরণ করা কি দীন দরিদ্র ক্ষুদ্র প্রজাদিগের সাধ্য? তাহারা অত্যল্প মূল্যে সজল নেত্রে মনের বেদনা নিবেদন করুক, বা অতীব কাতর হইয়া, আর্ত্তনাদ নিরবধি পূরঃসর তাহারদের পদানত হউক, কিছুতেই তাহারদের চিত্তভূমি কারুণ্যরসে আর্দ্র হয় না—কিছুতেই তাঁহারদের অবিচলিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় না। তাঁহারা এইরূপ ব্যবহার করিয়াও আপনারদিগকে নির্দ্দয় জ্ঞান করেন না, ...। দীন দুঃখী প্রজারা এ প্রকার পরুষ বাক্য শ্রবণ করিলে আর কি করিতে পারে? তাহারদিগকে দীন ভূমিতেই অবশ্যই নীল বপন করিতে হয়—প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বহুতর গরল পান করিতে হয়। এই ভূমির নাম খাতাই জমি—খাতাই জমির প্রসঙ্গ মাত্রে প্রজাদের লোক সাগর উথলিত হইয়া উঠে।"

তখনকার বিচার-ব্যবস্থা যেরূপ ছিল তাহাতে মফস্বলের আদালতসমূহে ইউরোপীয়দের বিচার হওয়া অতীব দুরূহ ছিল। তাহারা একরূপ নিরঙ্কুশ হইয়াই ঐসব অঞ্চলে বিচরণ করিত। এজন্য অত্যাচারী নীলকরদের প্রতাপ অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছিল। এই সময়কার কলিকাতার ও মফস্বলের বিচারাদালতসমূহ সম্বন্ধে ভূদেব লেখেন :

"কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টে এবং সদর দেওয়ানী ও তদধীন যাবতীয় কোর্টে একপ্রকার পরস্পর বিরোধ ভাব ছিল। মফস্বলে কোন আদালত যদি কোন নীলকর বা কোন সওদাগর সাহেবের প্রতি হস্তার্পণ করিতে যাইতেন, অমনি ঐ আদালতের বিচারপতির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ হইত, এবং ঐ নালিশের খরচার দায়ে বিচারপতি পীড়িত হইতেন। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট ঐ সময়ে এমত বিধান করেন যে, সুপ্রিম কোর্টের খরচার টাকা সরকার হইতেই দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্ট এরূপ বিধান করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, সুপ্রীম কোর্টের সমক্ষে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে সে মোকদ্দমা আর কোম্পানীর কোন আদালত গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা ওরূপ কোন বিধান করেন নাই। যে মোকদ্দমা কোম্পানীর আদালতে রুজু আছে তাঁহারা সে মোকদ্দমা আপনারা বিচার করিবার নিমিত্ত গ্রহণ করিতেন। এই সকল কারণে কোম্পানীর আদালতগুলি বিলক্ষণ অবমানিত ও হীনবল হইয়াছিল। বিশেষতঃ ইংরাজেরা কোম্পানীর আদালতের অধীন ছিলেন না এবং ঐ সকল আদালতের কোন তুয়াক্কাই করিতেন না। এক দেশের মধ্যে থাকিয়া কতকগুলি প্রজা এক আদালতের অধীনে এবং কতকগুলি তাহার অধীনে নয় এরূপ ব্যাপার সহজেই নিতান্ত বিসদৃশ। তাহাতে আবার অনেক ইংরাজ মফস্বলে থাকিয়া কৃষি বাণিজ্যাদি নির্ব্বাহ করেন, এদেশীয়দের সহিত সকলপ্রকার কারবারও করেন অথচ এদেশীয়েরা যে আদালতের অধীনে সে আদালতকে মান্য করেন না, এরূপ করাতে যৎপরোনাস্তি বিশৃঙ্খলা ঘটে।"*

এই বিশৃঙ্খলা তথা বিচার-বৈষম্য বিদূরণের জন্যই ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সরকারের আইন-সচিব ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন কয়েকটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা প্রকাশিত হইলে কলিকাতায় ও মফস্বলে ইংরেজদের মধ্যে এরূপ তীব্র প্রতিবাদ হইল যে, সরকার ইহা প্রত্যাহার করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর মফস্বলে ইউরোপীয়গণ অধিকতর স্বৈরাচারী হইয়া উঠিল। কোম্পানীর ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের সহায় হইলেন। সিপাহী

* বাঙ্গলার ইতিহাস, তৃতীয় ভাগ, পৃ. ৩১-২।

যুদ্ধের প্রাক্কালে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মফস্বলস্থ নীলকরদের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে পর্য্যন্ত নিযুক্ত করা হইল। এই সব কারণে নীলচাষীদের দুরবস্থা কতদূর শোচনীয় হইয়া পড়িতেছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহারা এতদিন নীলকরদের অত্যাচার-উৎপীড়ন সকলই সহ্য করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পর পর তিন বৎসর খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য দ্বিগুণ বা তাহারও বেশী বাড়িয়া যাওয়ায় তাহারা আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না। উৎকৃষ্ট জমিতে খাদ্যশস্য জন্মাইবার উপায় নাই, কারণ নীলের দাদনী। আবার এই নীলচাষে তাহারা টাকাকড়ির মুখ দেখিতে পাইত না। অগ্রিম দাদন বাবদ তাহারা যাহা পাইত তাহা কুঠিয়াল কর্ম্মচারীদের সেলামী ও জমির খাজনা দিতেই ফুরাইয়া যাইত। অগ্রিম দাদনের সময় নীলের যে মূল্য ধার্য্য করা হইত তাহারা তাহাই পাইতে লাগিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও শস্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইলেও নীলের মূল্য বাড়ে নাই। অথচ নীল ছাড়া জমিতে মূল্যবৃদ্ধিপ্রাপ্ত অন্য শস্য জন্মাইবার তাহাদের উপায় ছিল না। একারণ নীলচাষীদের 'দাস' জীবন যাপন করাও সুকঠিন হইল। নীলকরদের অত্যাচার-নিপীড়নে বিভিন্ন জেলার অধিবাসীদের মধ্যে যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা এবার নীলকরদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হইতে তাহাদিগকে প্রেরণা দান করিল। মালদহ, রাজসাহী, পাবনা নদীয়া, যশোহর ও ফরিদপুর জেলার প্রজাকুল "নীলচাষ করিব না" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। মালদহে রসিক মণ্ডল, নদীয়ায় বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস এবং অন্যান্য স্থানেও নেতার আবির্ভাব হইল। যশোহরের নব্যশিক্ষিত যুবক শিশিরকুমার ঘোষ স্থানীয় নীলচাষীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। যশোহর হইতে শিশিরকুমার এবং কৃষ্ণনগর হইতে মনোমোহন ঘোষ 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করিয়া পত্র প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে প্যাট্রিয়টে সপ্তাহের পর সপ্তাহ তীব্র মন্তব্য করিতে আরম্ভ করিলেন। বিভিন্ন জেলার প্রজাশক্তি নীলকরদের বিরুদ্ধে তথা নীলচাষের বিরুদ্ধে কিরূপ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল, নিম্নে প্রদত্ত দুইটি বিবরণ হইতে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। শিশিরকুমার ঘোষ নিজ 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় এ সম্বন্ধে ১৮৭৬, ২৬শে অক্টোবর লেখেন :

"নীল বিদ্রোহের সময় মুসলমান প্রজারা কি সাহস ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ই দেখায়। সে যার অবিচলিত চিত্তে তাহারা কি না সহ্য করে। গোড়াই নদীর এখন অত্যন্ত দুর্দ্দশা। যখন নীলের গোলমাল হয় তখন গোড়াই পদ্মার ন্যায় বেগবতী ছিল। লেঃ গবর্ণর এই গোড়াই নদীর মধ্য দিয়া ষ্টিমারযোগে গমন করিতেছেন, নদীর দুই ধারে সহস্র সহস্র প্রজারা হাতে দরখাস্ত লইয়া দাঁড়াইয়া কাতরকণ্ঠে জাহাজ লাগাইতে বলিতে লাগিল। লেঃ কোনমতে জাহাজ নদীতীরে লাগাইলেন না। অগত্য প্রজা নদীতে ঝম্প প্রদান করিল। গোড়াইর বহাবেগ লক্ষ্য করিল না। তখন তাহারা নীলের অত্যাচার হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে তাহার নিদর্শন প্রাপ্তসঙ্কল্প। প্রজাদিগকে নদীতে ঝম্প প্রদান করিতে দেখিয়া লেঃ গবর্ণর জাহাজ লাগাইতে বাধ্য হইলেন। প্রজারা জাহাজ ঘিরিয়া ফেলিল, এবং গ্রাণ্ট সাহেবকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল যে তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন। যশোহর জেলে প্রায় একশত প্রজাকে ম্যাজিষ্ট্রেট আবদ্ধ করেন। তিনি কুঠিয়ালের পক্ষে ছিলেন। প্রজাদিগকে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রজাদিগকে নীল আবাদ করিতে বলেন, প্রজারা ইহাতে অসম্মত হয়। তিনি সঙ্কল্প করেন যে যতদিন প্রজারা ইহাতে সম্মত না হয় ততদিন তাহাদিগকে পানীয় কি আহার দিবেন না। প্রজারা সঙ্কল্প করিল যে প্রাণ যায় সেও ভেদ তথাচ তাহারা নীলের বাদন করিবে না। প্রজারা যে সঙ্কল্প করে কার্য্যেও তাহাই করে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া পরাস্ত হইলেন।

লেফটেন্যাণ্ট গবর্ণর সার্ জন পিটার গ্রাণ্ট উক্ত ঘটনা ১৮৬০, ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ঐরূপ বিশদভাবে না হইলেও মোটামুটি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :

"Numerous crowds of *raiyats* appeared at various places, whose whole prayer was for an order of Government that they should not cultivate indigo. On my return a few days afterwards along the same 2 rivers [the Kumar and Kaligonga], from dawn to dusk, as I steamed along these 2 rivers for some 60 or 70 miles, both banks were literally lined with crowds of villagers claiming justice at this matter. Even the women of the villagers on the banks were collected in groups by themselves ; the males who stood at and between the riverside villages in little crowds must have collected from all the villages at a great distance on either side. I do not know that it ever fell to the lot of any Indian officer to steam for 14 hours through a continued double streets of suppliants for justice all were most respectful

and orderly, but also were plainly in earnest. It would be folly to suppose that such a display on the part of tens of thousands of people, men, women and children has no deep meaning. The organization and capacity for combined and simultaneous action in the cause, which the remarkable demonstration over so large an extent of country proved, are subjects worthy of much consideration."*

বাংলার প্রজাশক্তি নীলচাষ হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত কিরূপ জোট বাঁধিয়াছিল উপরের দুইটি উক্তি হইতে তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। পূর্ব্বচুক্তিমত যাহাতে দাদনী জমিতে চাষ আবার হয় সেজন্য ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সাময়িক ভাবে চুক্তিভঙ্গকারীদের আইনতঃ দণ্ডনীয় করা হইল। ইহার বলেই নীলকর-বন্ধু যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট শতাধিক নীলচাষীকে যশোহর জেলে আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই আইনটি অল্পদিন পরেই অক্টোবর মাসে উঠিয়া যায়। মালদহের কোন কোন স্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। নদীয়া ও যশোহরে দাঙ্গা না হইলেও নীলচাষীদের মনোভাব নীলের বিরুদ্ধে যেমন দৃঢ় তেমনি তীব্র হইয়া উঠিল। এই সময় বড়লাট লর্ড ক্যানিং লিখিয়াছিলেন যে, সপ্তাহখানেক যাবৎ তিনি এত উদ্বেগের মধ্যে কাটাইয়াছেন যে সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে দিল্লীর অবরোধকালেও তিনি এতটা উদ্বিগ্ন হন নাই। কোন অবিবেচক নীলকর একবার মাত্র গুলি ছুঁড়িলে সমগ্র নিম্ন বঙ্গে আগুন জ্বলিয়া উঠিত। কাজেই নীলকর ও নীলচাষীদের মধ্যে এরূপ ব্যাপক অসন্তোষ সরকার অধিক দূর গড়াইতে দেওয়া সমীচীন বোধ করিলেন না। তাঁহারা বাংলা-সরকারের সেক্রেটারী ডব্লিউ এস্ সিটন-কারের সভাপতিত্বে একটি নীল কমিশন বসাইলেন। কমিশন ১৮ই মে হইতে তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়া ১৪ই আগষ্ট ইহা শেষ করেন। পরবর্ত্তী ২৭শে আগষ্ট কমিশন সরকারে রিপোর্ট দাখিল করিলেন। কমিশনের সম্মুখে ১১ জন নীলচাষী প্রজা সাক্ষ্য প্রদান করে। তাহাদের সাক্ষ্য হইতে নীলচাষ না করিবার জন্য তাহারা কতখানি বদ্ধপরিকর হইয়াছিল তাহা জানা যায়। নীলচাষ সম্বন্ধে কয়েকজনের মতামত মাত্র এখানে দিলাম :

বিশু মণ্ডল : আমার গলা কাটিয়া ফেলিলেও আমি নীল বুনিব না।

.....: যদি মৃত্যু স্বীকার তথাপি নীল চাষ করিব না।

জামির মণ্ডল : আমি এমন দেশে চলিয়া যাইব যেখানকার লোকে নীল চোখে দেখে না বা নীল বুনে না।

হাজি মোল্লা : নীল না বুনিয়া অন্য দেশে চলিয়া যাইব। ভিক্ষা করিয়া খাইব তবু নীল বুনিব না।

কবি মণ্ডল : তাহারও জন্য আমি নীল বুনিব না, এমন কি পিতামাতার জন্যও না।

পাঞ্জু মোল্লা : আমাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলুন, তথাপি নীল বুনিতে পারিব না। *

কমিশন প্রজাদিগের নিকট হইতে তাহাদের মনোভাব জানিয়া লইলেন। অন্যান্য সাক্ষীদের নিকট হইতেও নানা তথ্য সংগ্রহ করিলেন। নীলকরদের অত্যাচারের ধারা এতদিন যেরূপ চলিয়া আসিতেছিল কমিশনের তদন্তে তাহা একেবারে প্রকাশ হইয়া পড়িল। অসম্মত নীলচাষীদের সঙ্গে নীলকুঠি হইতে লাঠিয়াল লইয়া গিয়া মারপিট করা, বাজার পুড়াইয়া দেওয়া, ঘরবাড়ী ধ্বংস করা, নীলগুদামে চাষীদের কয়েদ রাখা, গরুবাছুর আটক করা, খেজুর বাগানের গাছ সমূলে নষ্ট করিয়া চাষীকে সেখানে নীল বুনিতে বাধ্য করা প্রভৃতি পন্থা নীলকরগণ প্রায়ই অবলম্বন করিত। নীলগুদামে কয়েদ রাখা ব্যাপারটি বড়ই গুরুতর ছিল। যে-সব চাষী কোনক্রমেই নীল বুনিতে রাজি হইত না তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া কুঠিতে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কয়েদ রাখা হইত। সেখানে তাহাদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নেরও অবধি ছিল না। তাহাদের সম্বন্ধে তদন্ত হইলে এক কুঠি হইতে অন্য কুঠিতে তাহাদিগকে চালান দেওয়া হইত। কিছুদিন পরে তাহাদের কোনও খোঁজে খবর পাওয়া যাইত না। মৃত বলিয়াই আত্মীয়-স্বজন মনে করিয়া লইত। সন্ত্রান্ত চাষীদের প্রতিই এই ব্যবস্থা বেশী করিয়া অবলম্বিত হইত। নদীয়া জেলার শীতল তরফদার নামক একজনের এইরূপ নিখোঁজ হওয়ার কথা কমিশনে প্রকাশ পায়। এ্যাশ্‌লি ইডেন যখন বারাসতে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন তিনিই একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রজাদের বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করেন যে, নীলচাষ করিতে তাহারা

*Buckland, p. 102.

* *Buckland*, Pp. 258-9. ইংরাজী হইতে অনূদিত।

আইনতঃ বাধা নহে এবং এ বিষয়ে সরকার নীলকরদের পক্ষ বলিয়া যে সাধারণের ধারণা তাহাও ঠিক নহে। এই ইডেন মহোদয় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সুপ্রিম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালতের নথিপত্র ঘাঁটিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এইরূপ অন্ততঃ উনপঞ্চাশ জন নীলচাষীর নিখোঁজ হওয়ার (kidnapping) তালিকা কমিশনের নিকট পেশ করিলেন। এই তালিকায় দেখা যায়—যখন ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ ঘটনা মাত্র একটি ঘটিয়াছিল তখন গত দশ বৎসর পূর্ব্বে সাতটি এবং গত দশ বৎসরের মধ্যে একচল্লিশটি ঐরূপ ঘটনা ঘটে। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল পনরটি।* নীল কমিশন প্রাজাদের কয়েদ রাখা ও গরু বাছুর আটক করার নিন্দা করিলেন। এই প্রসঙ্গে লেঃ গবর্ণর সার্ জন পিটার গ্রাণ্টের মন্তব্য বিশেষ স্মরণীয়। তিনি নীলকরদের এই দুইটি কার্য্যকে খুব জঘন্য অপরাধ বলিয়া গণ্য করিলেন। তিনি লেখেন :

"A country where both these offences are committed habitually, and for the most part with impunity, is a country in which the Law affords the weak no protection. The fact is a disgrace] to the Administration. It is not simple confinement in one godown that is practised. Respectable men are seized, and sent about from one factory to another, to escape discovery; and, as in Sectul Taraldar's case, they are not always ever heard of again. I trust that late measures will have had some appreciable effect in preventing the impunity of such offences, and very earnestly I hope that un-official Englishmen in India will take to heart the instruction contained in the 105th paragraph of the Commission's Report."

নীল কমিশনের রিপোর্টের ফলে তখন তখনই সরকার পক্ষে কোনরূপ আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই বটে, তবে ইহাতে নীলকরদের অত্যাচার-উৎপীড়ন কাহিনী সরকারী ছাপ লইয়া বেরূপভাবে আত্মপ্রকাশ করিল তাহাতে তাহাদের মুখ দেখাইবার উপায় রহিল না। লেঃ গবর্ণর রিপোর্টের উপরে ভারত-সরকারের নিকট যে মন্তব্যলিপি পেশ করেন তাহা হইতে জানা যায় যে,বাংলা-সরকার নীলকরদের দৌরাত্ম্য লাঘব করিয়া তাহাদের আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য এবং নিরীহ প্রজাবৃন্দ যাহাতে আইনের সহায়তা দ্রুত লাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে নদীয়া (বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি) বিভাগে মহকুমা সংখ্যা বাড়াইয়া বিচারাদালত স্থাপন করিলেন। বিচার বিভাগেরও সংস্কার সাধন করা হইল। থানার সংখ্যা বাড়াইয়া তাহাতে অধিকসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হইল। পাছে সাঙ্গাহাঙ্গামা হয় এই আশঙ্কায় স্থানে স্থানে সৈন্যও আমদানী করা হইল। নীলকর ও নীলচাষীদের মধ্যে চুক্তিপত্র রেজেষ্ট্রী করিয়া লইবারও ব্যবস্থা হইল। বাংলা-সরকার ন্যায় বিচারের পক্ষপাতী হইয়াই শাসন ও বিচার বিভাগের এতাদৃশ সংস্কার সাধন করিয়া লইলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা বেসরকারী ইংরেজদের বিশেষতঃ নীলকরদের কোপে পড়িলেন। এই সময় দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' প্রকাশ করিয়া নীলকরদের অত্যাচারের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র সাধারণের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। এই পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের জন্য লঙ্ সাহেবের তো কারাদণ্ড হইলই, অধিকন্তু বাংলা-সরকারের সেক্রেটারী সিটন-কারের নির্দ্দেশে ও সরকারী অর্থে ইহা প্রকাশিত হওয়ায় নীলকরদের উস্কানীতে ভারত-সরকারের নিকট বাংলা-সরকার নিন্দিত হইলেন এবং ইহার সাক্ষাৎ ফল স্বরূপ সিটন-কার পদত্যাগ করিলেন। শাসন সম্পর্কীয় মতভেদ হেতু লেঃ গবর্ণর গ্রাণ্ট যে অল্পকাল পরেই পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন তাহার মূলেও ছিল এই নীল। কিন্তু সে কথা আজ আর বলিব না।

* ঐ, পৃ ২৫৩।

ক্রশ-বাহিনী

শ্রীরমেন চৌধুরী

কে যায় ?
বন্ধুর পথে, ধ্বংসস্তূপের মাঝে,
ছিট ট্রেকের পাশ দিয়ে
কে যায় ওরা ?
অন্ধকার···গভীর অন্ধকার দীর্ঘশ্বাস ফেলছে
সামনে, পিছনে, চতুর্দিকে !
তবু, তবু চিনতে পেরেছি
ওরা ক্রশ-বাহিনী !···
অখ্যাত, অজ্ঞাত সহস্র সৈন্যের
মৃত আত্মার মিছিল।
চলেছে ওরা অনির্বাণ কামনার
অত্যুগ্র আলোর দিক হতে দিগন্তরে !
দুস্তর পথ—
সুদূর প্রসারিত '
ওদের চলার শেষ নেই,
কামনারও তাই।

সম্বলহীন যাত্রায় চাই পাথেয়,
সকল চাই !
কিন্তু···
অথচ এরাই দিয়েছে পৃথিবীতে শান্তির নিদান
নিরাপত্তার নির্দিষ্ট নির্দেশ !
দিয়েছে তার জন্য জীবন-উষার
অবলীলায় আত্মাহুতি !

তোমার, আমার, দেশের জন্য
এই যে অবদান,
এর প্রতিদান কই ?
কই সেই বীর-বাহিনীর স্মৃতি তোমার মনে ?
ভুলেও কি কোনোদিন তুমি ভেবেছ—
অকৃতজ্ঞ জনসাধারণ,
কখনো কি তোমার নিরঙ্কুশ জীবন-যাত্রায়
সেই মহানুভবের কথা জাগে ?
তারা যে তোমার জন্য
এমন মৃত্যু বরণ করেছে !

আজ শত্রু-মিত্র, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে
তোমার আমার প্রত্যাঘাত
একযোগে প্রতিবাদ জানাচ্ছে
নীরব আকুতি নিয়ে।
অভিযান তাদের শেষ হয়নি ;
সকলেরি কণ্ঠে সেই এক বাণী :
"আমরা প্রতারিত !"

শুধু তাই নয়,
মানুষের প্রতারণা ওই এক রূপেই প্রকট হয়নি :
ওদের চোখের সামনে
বড় করে যে আদর্শ খাড়া করা হয়েছিল
সেটাও হয়েছে মিথ্যা !···
আজ ওরা বুঝেছে
এই যে আত্মঘাতি কলহ,
মানুষের প্রতি মানুষের রক্তাক্ত বিদ্বেষ
এ কখনো যাবার নয় !
যাবার নয় ততদিনই—
যতদিন থাকবে এদের মজ্জায় মজ্জায়
সাম্রাজ্য বিস্তারের নীল রক্ত !
কার জন্যে—
কি আদর্শের মোহে
ওরা দলে দলে জীবন দান করলো ?
কেন করলো ?

জীবনের পরপারে
আজ তাই প্রতারিতের দল
শত্রুমিত্র ভেদে এক হয়েছে !
তারা চলেছে অন্ধকারে, অজ্ঞাত পথে
সুদৃঢ় পদক্ষেপে
দিক হতে দিগন্তরে প্রতিবিধানের আশায় !
আজও ওরা অন্তরে অন্তরে কামনা করে
হয়তো স্বপ্নও দেখে
মানুষের প্রতি মানুষের
সমাদর, আত্মারঙ্গ !
হয়তো কোন্ সোনার প্রত্যূষে
কোন্ অভাবিত লগ্নে
সবাই এক হয়ে যাবে
মানবতার কল্যাণে
ভ্রাতৃত্বের নিবিড়তায়
আত্ম-উৎসর্গীর দেয়ানে !!

সঞ্চয়ন

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

প্রসিদ্ধ ইংরাজী লেখক Lamb বলেছেন যে যখন একটি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয় তখন একখানি পুরানো পুস্তক পড়া উচিত। আমি যদি যখন কোনও নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয় না তখন একখানি পুরানো পুস্তক পড়া কর্ত্তব্য।

আজকাল এই যুদ্ধের হাঙ্গামায় ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে কোন নূতন পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছেনা আর যদি হয়তো এদেশে আসছে না। ছাপা বইত দূরের কথা সাদা কাগজও আসছে না যে কাগজে আমরা বই ছাপাতে পারি। কাগজ এত দুর্মূল্য হয়েছে যে আমাদের মাসিক সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্র ও পত্রিকাগুলির দেহ দিন দিন কৃশ হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় পুরানো বই পড়া ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই।

তাই হটাৎ আলমারী থেকে সঞ্চয়ন নামে একখানি বই টেনে নিয়ে পড়ছি। বইখানি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩২ সালে —কাজেই বইখানি পুরানো বই বল্‌লে অত্যুক্তি হবেনা।

পুস্তকখানি হচ্ছে একটি প্রবন্ধ সংগ্রহ আর লিখেছেন জনৈক সুশিক্ষিত মুসলমান যুবক। তাঁর নাম কাজী মোতাহার হোসেন এম. এ, আর পুস্তকখানি মুদ্রিত হোয়েছিল ঢাকা সহরে। তবে লেখক যে মুসলমান তা তাঁর ভাষায় বোঝা যায় না। আমরা যেরকম বাংলা লিখি তিনি ঠিক সেই রকম বাংলা লিখেছেন আর সত্য কথা বলতে গেলে খাসা লিখেছেন। আর ঢাকা সহরে প্রকাশিত হলেও লেখক যে পূর্ব্ববঙ্গের লোক তা জোর করে বলা যায় না। সবুজ পত্রের অন্ততঃ চারজন ভাল লেখক—যাঁরা পূর্ব্ববঙ্গের লোক। তবে তিনি একটি কথা ব্যবহার করেছেন সেটি হয় পূর্ব্ববঙ্গে নয় মুসলমান সমাজে প্রচলিত। কথাটি হচ্ছে 'হজ্জাল' এবং এ কথাটির সঙ্গে আমি ছোটবেলা থেকেই পরিচিত। আমি পাবনা জেলার লোক আর আমাদের মরাও ভাষায় বহু কথা আছে যা পার্শি অথবা আরিবী শব্দের অপভ্রংশ।

সে যাই হোক—এই জাতীয় লেখা থেকে প্রমাণ হয় যে আমরা হিন্দু হই আর মুসলমান হই—বাঙ্গাল হই আর দক্ষিণ দেশীই হই, আমাদের সকলেরই সাহিত্যিক ভাষা একরূপ ধারণ করেছে Communalismএর বেড়া টপ্‌কে।

কাজী সাহেব প্রথমেই তিনি কেন কবি হ'ন নি, গল্প লেখক হননি—তার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। সে কৈফিয়ৎ মজা ঠাট্টা করে লেখা এবং বিদ্রূপপূর্ণ। কিন্তু এ বিদ্রূপ সরল বিদ্রূপ—যদিচ তার অন্তরে অনেক সত্য কথা আছে। আমাদের সমাজে ও সাহিত্যে বিদ্রূপের নানা উপকরণ আছে। মেকি কবিতা ও নাদি গল্প যদি হাস্যাস্পদ না হয় তাহলে কি যে হাস্যাস্পদ তা আমি জানিনে। এ জাতীয় সাহিত্যের সাক্ষাৎ পেয়ে যার হাসি না পায় তার বোধ হয় কান্না পায়।

এর পর কাজী সাহেব সমাজের দিকে চোখ ফিরিয়েছেন। সমাজকে হেসে উড়িয়ে দেবার কথা নেই কারণ সমাজ প্রবল পরাক্রান্ত। যে সমাজ যত জড় তার ভারও তত বেশী ও তার চাপও তত বেশী।

কেউ সত্য কথা বলব বলে মনস্থির করলে তাঁর সত্য দৃষ্টি যে কত বেড়ে যায় আর তাঁর চিন্তা যে কত পরিষ্কার হয় তার প্রমাণ তাঁর 'বাঙ্গালী সমাজ' নামক প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধের প্রতি কথায় আমি সায় দিতে প্রস্তুত আছি। এর ভিতর সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামীর নাম গন্ধ নেই।

এখন সমাজ সাহিত্য প্রভৃতি মহা মহা বিষয় ত্যাগ করে এমন একটি বিষয়ের আলোচনা করা যাক যার উপর ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—সে বিষয়টি হচ্ছে গান।

আমরা হটাৎ আবিষ্কার করেছি যে, বাঙ্গালীর গান বলে এক জাতীয় গান আছে যার চর্চ্চা করা আমাদের কর্ত্তব্য। এ গানগুলির নাম কীর্ত্তন, বাউল, ভাটিয়ালী, সারি, জারি, পাঁচালী প্রভৃতি। বাংলা গানের সঙ্গে হিন্দুস্থানী গানের মোটা প্রভেদ এই যে, হিন্দুস্থানী গানে তাল বেশী আর বাংলা গানে টান বেশী। কাজী সাহেব একটি প্রবন্ধে এই বাংলা গানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখেছেন। এখন কলিকাতায় অলিতে গলিতে যে সব প্রাইমারী স্কুল গজিয়ে উঠেছে সে সব স্কুলে এ প্রবন্ধটি পাঠ্য পুস্তিকা হওয়া উচিত।

লেখক যে বাংলা গানের ইতিহাস জানেন, শুধু তাই নয় তিনি ওস্তাদী গানের সা রে গা মা-ও জানেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে যে চমৎকার বিচার করেছেন—সেই প্রবন্ধেই তাঁর গান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রবন্ধটিও আমি সকলকে পড়তে অনুরোধ করি। এ বিষয়ে অনেক পাণ্ডিত্য তর্কের হাত এড়াবার জন্য।

মেসার্জি রত্নম্

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় একটা নাটকীয় ঘটনার মধ্যে দিয়েই বলতে পারেন, মেসার্জি রত্নমের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'য়েছিলো। বউবাজার মোড়ের কাছে সেই যে কাঁচতাড়া আলমারী সাজানো ছোট্ট খাবারের দোকানটা আপনারা দেখেছেন, যার ভিতরের প্রশস্ত লাল সিমেন্ট করা মেঝেটার উপরে কচুরি আর সিঙাড়ার বড়ো গামলা সাজিয়ে নিয়ে ছিপ্‌ছিপে কালো চেহারার একটী ছেলে খাবার বিক্রি করতে বসে, সেই দোকানেই সমস্ত দিনের পরিশ্রান্ত দেহ আর মন নিয়ে অফিসের লেজার বন্ধ করে বেলা চারটে নাগাদ একটু টিফিন করতে যেতুম। বেলা দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত একটানা কর্মস্রোতের মধ্যে এই সময়টাই জলযোগের পক্ষে প্রশস্ততরো ছিলো। তারপরে সেখান থেকে আধঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘুরে এসে আবার সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত অবিরাম 'লেখনী' চালনায় আমার দৈনন্দিন কার্য সম্পন্ন হোত। তারপর অবসন্ন মন এবং ক্লান্ত শরীরে গৃহাভিগমন। বল নেই, বুদ্ধি নেই, হাতাস নেই, বছরের পর বছর এই কর্ম-চক্র যেন ঘড়ির কাঁটার মতো আমার জীবনের উপর দিয়ে তার ঘর্ঘর শব্দের রথ-রথ চালিয়ে চলেছিলো।

কিন্তু সেদিনই প্রথম ব্যতিক্রম ঘটলো। যে ছেলেটী রোজ আমাকে খাবার দেয় তার নাম কাঙালী। আমি দোকানের মধ্যে ঢুকলেই ছোট্ট একটা কলাপাতা জলে ধুয়ে তাড়াতাড়ি টেবিলে রেখে দেয় আর তারপরে আমার সংগে আনা গ্লাসে জল দিয়ে গরম কচুরি এনে পাতে দিয়ে নূতনতরো কোনো আদেশের জন্যে অপেক্ষা করে—সত্যি কথা বলতে আফিস থেকে আমি এই গরম কচুরির লোভেই এতোটা হেঁটে আসি, ঠিক এই সময়েই ওরা কচুরি ভাজে, পুরোণো খদ্দের ব'লে দরকার হ'লে তাড়াতাড়ি দুয়েকটা ফুলকপির সিঙাড়াও ভেজে দেয়। দোকানিটী বড়ো ভালো মানুষ—হরিসাধক, নাম, বলরাম ঘোষ—কিন্তু সেকথা থাক্।

সকাল থেকেই সেদিনটা আমার মেঘ-মলিন হ'য়ে ছিলো বলতে পারেন। আজকাল অফিসের সময়ে ট্রামে বাসে ওঠা ভীড়ের জন্যে যে কি বিপদজনক হ'য়ে উঠেছে তা বিশেষ ভাবে জানাবার প্রয়োজন নেই। অপরাধের মধ্যে, এই জন-সমুদ্র ঠেলে অফিসে আসতে মিনিট দশেক দেরী হ'য়েছিলো। —তবু একাউন্ট্যান্ট্ আমাকে ছেড়ে দেন নি—একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, এটা বাঙালীর অফিস হলেও এখানে ডিসিপ্লিন ব'লে একটা জিনিস আছে। এভাবে দেরী করা চলবে না। নত মস্তকে তাঁর আদেশ শিরোধার্য ক'রে নিয়েছি, তারপরে সারাদিন এই ভারবাহী পশুর মতো নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম—ক্যাশবই, জার্ণাল, লেজার আর ভাউচার! মনটা হাঁপিয়ে উঠেছিলো।

একটা গরম কচুরি মুখে তুলতে তুলতে ভাবছিলুম কবে যে পরিত্রাণ পাবো এঁদের হাত থেকে—তবে উর্ধ্ব মস্তকে এই দাম্ভিক ধনপতিদের সামনে গিয়ে বলতে পারবো, মূঢ় তোমরা, মূর্খ তোমরা তোমাদের এই সৃষ্টি ছাড়া অহঙ্কারকে আমি—

—হ্যালো মিসটার!

একটা অপরিচিত কণ্ঠস্বর—কচুরিটা নামিয়ে রেখে সামনের দিকে চেয়ে দেখি মধ্যবর্ণ একটী দীর্ঘাবয়ব পুরুষ আমারি সামনে একটা টেবিলে ব'সে ভাঁড়ে ক'রে গরম দুধ খাচ্ছে। এতোক্ষণ লক্ষ্যই করিনি। পরনে সার্ট এবং ফুল প্যান্ট। দুটোই যথেষ্ট ময়লা হয়ে গেছে—হাতে তার ততোধিক মলিনবর্ণ একটা টুপী, মাথার চুল অত্যন্ত অবত্ন-বিন্যস্ত—দেখলেই মনে হয় কোনো একটা দুর্গম রাস্তা পার হোয়ে অনেক জল ঝড় অতিক্রম ক'রে এখানে এসে উপস্থিত হ'য়েছে। মুখের দিকে চাইতেই বললে, ডু ইউ নো দি কলেজ হোয়ার?

আপাদ-মস্তক একবার ভালো করে' দেখে নিয়ে বললুম, ইয়েস্, ইউ ক্যান্ গো বাই দিস্ ওয়ে—ব'লে রাস্তাটা ইংগীত ক'রলুম, লোকটা আর একবার ভাঁড়ে চুমুক দিলে, তারপরে বললে, ডু ইউ নো মি ইউনিভার্সিটী?

—ইউনিভার্সিটী? বললুম, হ্যাঁ,—ইয়েস, আই নো। ব'লে তারও নির্দেশ দিলুম। লোকটা কয়েক মিনিট চুপ ক'রে রইলো, তারপরে সেই রকম ভাঙা ইংরেজীতে জিগেশ করলো, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সংগে কি আমার দেখা হ'তে পারে সেখানে?

এখানে একটু আত্মদ্বন্দ্বিত বোধ করলুম, বললুম, তত্তোটা বলতে পারি না, তবে ইউ ক্যান্ ট্রাই, তারপরে একটু থেমে জিগেশ করলুম, কেন, কি দরকার তোমার ?

একটু হাসলো লোকটা তারপরে ভাঁড়টা হাতে নিয়েই আমার কাছে এগিয়ে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো, বললে, দরকার আছে—আমি ওঁর সংগে দেখা করতে চাই—ইউ সি, আই অ্যাম ইন্ গ্রেট্ নিড্ ! আমি সিলোন থেকে আসছি।

—সিলোন থেকে ?

—হ্যাঁ, কাল সমস্ত রাত ট্রেণে দাঁড়িয়ে এসেছি। অসম্ভব ভীড়। তারপরে আগ্রা থেকে আসবার সময়ে আমার সুটকেশ টাকা কড়ি সব চুরি গেছে—আই ওয়ান্ট্ সাম্ হেলপ্।

ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হল না, বললুম, তা তুমি হঠাৎ এখানে এসেছো—ব্যবসা ট্যাবসা আছে নাকি ?

একটু হেসে সে বললে, না, আমি টুরিষ্ট ! পৃথিবীটাকে জানতে চাই, নিজের দেশে আমি একজন টিচার ছিলাম মাত্র।

—টুরিষ্ট্ ! বললুম, কোথায় কোথায় গিয়েছিলে তুমি ?

ভাঁড়ের দুধটা সম্পূর্ণ শেষ ক'রে নিয়ে একটু হাসলো লোকটা, বললে, সাউথ আফ্রিকায় ছিলুম অনেকদিন, ওখানে গবর্ণমেণ্টের রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেছি, কিন্তু ভালো লাগলো না—তাই আবার দেশে ফিরে এলুম।

আফ্রিকা ! সেই নীল নদ ! লেক নিয়াঞ্জা ! অসংখ্য অসভ্য অরণ্যবাসী নরখাদকের জন্মভূমি ! আমার যেন কেমন সব গোলমাল হ'য়ে যেতে লাগলো—বললুম, তা তুমি এখানে কোথায় থাকবে ?

পকেট থেকে একটা মলিন চিরকুট কাগজ সে বের করলে, তাতে ইংরেজীতে একটা ঠিকানা লেখা, পড়ে গেলুম, শচীন্দ্র নাথ রায়, চার নম্বর রাসবিহারী এ্যাভেনিউ।

বললুম, এখানে যাবে তুমি ?

—হ্যাঁ, আমার এক বন্ধু এখানে আসবার জন্যে ব'লে দিয়েছেন—এঁর কাছে গেলেই, আমার যা প্রয়োজন সব আমি তাঁর কাছ থেকে নাকি পাবো।

—কোন পরিচয়-পত্র আছে তোমার সংগে ?

—আছে একটা, একটু হেসে লোকটা উত্তর দিলে।

বুঝতে পারছিলুম, কথা বলতে বলতে আমি খুব আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ছি, বললুম, অল্ রাইট্—আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে চেষ্টা করবো, তোমার নাম ?

একটু হেসে সে বললে, থ্যাঙ্ক ইউ—আমার নাম মেলাজি রঙ্গম্।

দুর্ভাগ্য আমার—অনেক চেষ্টা ক'রেও সেদিন রাসবিহারী এ্যাভেনিউর শ্রীযুক্ত শচীন রায়ের সংগে দেখা হ'লো না। রঙ্গম্‌কে নিয়ে সন্ধ্যার পর দুবার গেলুম ওঁর বাড়ীতে, জানা গেলো বাইরে থেকে তখনো তিনি ফেরেন নি !

সমস্ত দিনের ট্রেণের এই দীর্ঘ পথশ্রমে রঙ্গম্‌কে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো, বললুম—এই তো ব্যাপার মিষ্টার রঙ্গম্ আমি বলি তুমি আমার বাড়ীতেই চলো, আজ রাত্তিরটা ওখানেই থাকো, কাল সকালে না হয় তোমার একটা ব্যবস্থা করবো !

প্রস্তাব শুনে সে যে কী উত্তর দেবে ঠিক করতে পারলো না, তারপরে শুধু বললে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—তোমার মতো এমন বন্ধু পেয়েছি যে কতো সৌভাগ্যে তা তোমাকে বোঝাতে পারছি না, আমাকে তুমি বাঁচালে মিষ্টার—

আমি বললুম—ব্যানার্জি !

—ইয়েস্ মিষ্টার্ ব্যানার্জি ! তুমি আমাকে বাঁচালে আজ !

সিংহলদেশীয় এই ভদ্রলোককে এভাবে বাড়ীতে নিয়ে এসে তুলবার পর আমার সমস্ত পরিবারের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব বিস্ময় সঞ্চারিত হ'লো।

বড়দি এক সময়ে বললেন, তোর কাণ্ড কি বল দেখি নীরু, দয়া দেখাতে হয় ব'লে কি এই রকম রাস্তা ঘাট থেকে লোক কুড়িয়ে আনবি ?

বললুম, কি করি বড়দি, এমন অসহায় অবস্থায় আমাদের দেশে এসে পড়েছে, আমরা যদি সাহায্য না করি, তাহলে সেটা কি অন্যায় হবে না ?

—ছাই হবে, তার জন্যে দেশে অনেক বড়ো লোক র'য়েছেন, কেন পাঠিয়ে দিলি না তাঁদের কাছে ? তোর সবই অনাছিষ্টি বাপু !

ছোট কাকা রান্না ঘরের কাছে পিঁড়ি পেতে ব'সে

কটি খাচ্ছিলেন, বললেন, অজ্ঞাত কুলশীলস্য বাসঃ দেয় ন কস্যচিৎ—!

চুপ ক'রে চ'লে এলুম, আসবার সময়ে শুধু একবার বললুম, না বউদি, সেরকম লোক ও নয়—তুমি দেখো—কোনো ভাবনা নেই তোমাদের!

যতোই বাধা, যতোই বিপত্তি আসুক, রত্নম্‌কে সে রাত্রির জন্যে আমি আশ্রয় দিলুম। রাত্রিতে আমার ঘরেই দুজনে খেতে বসলুম। অনেক গল্প করলো রত্নম্। যেদিন ও হঠাৎ সকালে আফ্রিকা ত্যাগ ক'রে যায় সেদিনের কথা। এম্‌নিই নাকি একটা খেয়ালের খেকে ও সিংহল ছেড়ে ছিটকে প'ড়েছিলো। তারপরে অনেক দেশ ঘুরেছে জীবনে—এমনকি সেই দুর্দান্ত ক্যানিবালদেরও দেখেছে সে—আর সেই লেক নিয়াঞ্জা—হ্রদ ভিক্টোরিয়া—আহা মিস্টার ব্যানার্জি, যদি তুমি দেখ্‌তে তাহ'লে বুঝ্‌তে ঈশ্বর আমাদের পৃথিবীর চারদিকে কী অপূর্ব সৌন্দর্যই না ছড়িয়ে রেখেছেন—সে যে কী চমৎকার দৃশ্য মিস্টার ব্যানার্জি!

আমি ডুবে যেতে লাগলুম, বললুম, তুমি তাদের ভাষাও শিখেছিলে তো?

—তা শিখ্‌তে হ'য়েছিলো বই কি! একটু হাসলো রত্নম্—তা না হ'লে ধরো পুরো তিনটে জেলার ভার ছিলো একা আমার হাতে।

অভিভূত হ'তে লাগ্‌লুম।

কৈশোরের স্বর্ণমুখর চকল স্রোতে আফ্রিকা একদিন আমাকে ডাক দিয়েছিলো। সেই কালো আর অন্ধকার আফ্রিকা! তখন আমি থার্ড ক্লাসে পড়ি। স্বপ্ন দেখ্‌তুম ক্যাবেল আর দিল্লী উপসাগরের পাশ দিয়ে হেঁটে চ'লেছি—কোথায় আছে কেপ্‌ডার্ড দ্বীপ—কোথায় আছে সমুদ্র-মল্ল চড়া আগুলাস্ ব্যাঙ্ক!—আফ্রিকার থেকে আসে নাকি লবঙ্গ, বাবার সময়ে মাথা উঁচু ক'রে দেখে নেবো তার সেই প্রশস্ত ক্ষেত্রটাকে। দেখে নেবো ভেল গাজ্জো, বাবেল মাণ্ডব প্রণালী আর পশ্চিম উপকূলের ক্যামেরুণ পর্বত!

আর নীল নদ? সে যে আমার স্বপ্ন সহচর। তাকে আমি দেখ্‌তে পেতুম। কোথায় ভিক্টোরিয়া আলবার্ট হ্রদের মধ্যে দিয়ে নীল ধারায় সে প্রবাহিত হ'য়ে এসেছে—তীরে তীরে ছড়িয়ে এসেছে মৃত্যুর বীজ—উর্বর ক'রেছে মিশরের পরিত্যক্ত ভূখণ্ডকে—যুগান্তরবর্তিনী ক্লিওপাট্রার চোখের আলোয় আজো কি তার জল ঝলমল ক'রে ওঠে না? —আর সেই নদী নিম্ পো-পো? হায় লোকে নাকি তাকে বলে কুম্ভীর নদী!

নীল নদেরই একটা ঘটনা বলছি তোমাকে ব্যানার্জি, রত্নম্ কথা বললে, একদিন সকালে খুব সকালেই বলতে পারো, বেড়াতে বের হ'য়েছিলুম। সবে সূর্য উঠ্‌ছে। দেখি একটী মেয়ে তীরের উপরে জলে পা দুটী ডুবিয়ে ব'সে আছে। তারী ভালো লাগ্‌লো। সেও বিদেশিনী—আমার মতো! আমি হেঁটে চ'লে গেলুম, একবার আমার দিকে চাইলো শুধু, কথা বললে না। একটু থাম্‌লো রত্নম্ তার পরে বললে, পরের দিন এসে আর তাকে দেখ্‌তে পেলুম না। আবার তার পরের দিন এলুম, দেখি, ব'সে আছে, সেই একভাবে। সমস্তটা দিন আমার ভারী ছট্‌ফট্ ক'রে কাটলো, কেবলি মনে হ'তে লাগ্‌লো, এবার দেখা হ'লে জিগেশ করবো কেন সে ওভাবে চুপ ক'রে ব'সে থাকে—কেন? কী আশ্চর্য ব্যানার্জি, পরের দিন গিয়ে দেখি ঠিক সেইভাবেই ব'সে আছে—পায়ের নীচ দিয়ে তার অনন্ত জলস্রোত সশব্দে প্রবাহিত হ'চ্ছে। আশ্চর্য তো! কতো বিষণ্ণ হ'তে পারে ওভাবে ব'সে থাকলে? তারপরে তুমি বিশ্বাস করো ব্যানার্জি 'ঝুপ্' ক'রে একটা শব্দ হ'লো, আর জলের একটু আলোড়ন ছাড়া আর কিছু দেখ্‌তে পেলুম না। ছুটে এলুম, কিন্তু কোথায় কে? কেউ তো নেই! ধপ্‌ধপে তার গায়ের রং, রেশমী চুল তার মাথায়। একী আত্মহত্যা? কিছুই বুঝিনি—কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো, তার মৃত্যুটা আমাকে ভয়ংকর নাড়া দিয়ে গিয়েছিলো!

অবাক চোখে তার দিয়ে চেয়ে আমি তখন গল্প শুনছি!

পরের দিন রবিবার।

বেলা দশটা নাগাদ দীর্ঘ অপেক্ষার পর শ্রীযুক্ত শচীন রায়ের সংগে আমাদের দেখা হোলো। রত্নমের কাছে

একজন মহারাষ্ট্রী অধ্যাপকের পরিচয়-পত্র ছিলো শ্রীযুক্ত শচীন রায়ের তিনি বন্ধু, আমার কাছে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক শুনে তিনি তাকে আশ্রয় দিতে রাজী হোলেন। বললেন, তুমি থাকতে পারো মিস্টার রস্তম্, যতোদিন না কোনো কাজ জোগাড় করতে পারছো, ততোদিন তুমি আমার সাহায্য পাবে, তবে এ্যাকোমোডেশান সম্বন্ধে, বুঝ্তেই তো পারছো, তোমার একটু কষ্ট ক'রেই এখানে থাকতে হ'বে।

—তা আমি পারবো। রস্তম্ হাস্লো, আর যতো তাড়াতাড়ি পারি আমি কাজ জোগাড় ক'রে নেবো মিস্টার রায়। তোমার এখনকার এই উপকার আমি মনে রাখ্বো।

তারপরে প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেছে। কাজের ভীড়ে আমি আর রস্তমের কোনো খোঁজ নিতে পারিনি—সেও আমার কাছে আসেনি। সেদিন বিশেষ পরিশ্রান্ত ছিলুম। সারাদিন পশুর মতো পরিশ্রম ক'রেছি—সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করছে, শুয়ে পড়লুম, তন্দ্রা আসছে।

—ব্যানার্জি, ব্যানার্জি!

—কে?

—ব্যানার্জি, ব্যানার্জি!

লেপ্টা গায়ের থেকে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালুম, তারপরে সুইচ্ টিপে আলো জেলে দরোজা খুললুম। বারান্দার উপরের অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট মূর্তিকে দেখেই চিনেছিলুম, বললুম—রস্তম্?

—ইয়েস্ ব্যানার্জি!

বললুম—কি খবর? এতো রাত্তিরে? এসো এসো—ঘরে এসো!

রস্তম্ ঘরে এসে ঢুকলো। বললুম, বোসো, কি ব্যাপার বলো তো?

একটু হাস্লো রস্তম্, তারপরে চেয়ারটা টেনে নিয়ে ভালো করে বস্লো, বললে, তোমাকে বড়ো বিরক্ত করলুম ব্যানার্জি—আজ আমি নিরুপায় হ'য়ে তোমার কাছে এসেছি।

—আহা, কি ব্যাপার, খুলেই বলোনা, একটু অধৈর্যভাবে বললুম।

—ওখান থেকে চ'লে এসেছি।

—সে তো দেখ্ছিই—কিন্তু কেন?

—ভালো লাগ্লোনা! ব'লে একটু হাস্লো।

মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলুম—আশ্চর্য লোক তো এ—অমন একটা সুদৃঢ় আশ্রয় শুধু ভালো না লাগার মোহাই দিয়ে রাত বারটার সময় এসে আমার দরোজায় কড়া নেড়ে এ তার কি রকম রসিকতা? খুব একটা কঠিন উত্তরই দিতে যাচ্ছিলুম, মাঝপথে রস্তমই আমাকে থামিয়ে দিলে, বললে, ওদের সব আছে ব্যানার্জি, নেই শুধু তোমার মতো আন্তরিকতা!

মুহূর্তে আমি যেন স্তিমিত হ'য়ে গেলুম, ঝিমিয়ে পড়লুম বলা যায়। একটু থেমে রস্তম্ বল্লে, না হ'লে খুবই সুখে ছিলুম বল্তে পারো, কিন্তু তবু ভালো লাগ্লো না, ব'লে আবার হাস্লো।

বললুম, খাওয়া হ'য়েছে তোমার?

—হ্যাঁ, মেনি থ্যাঙ্ক্স্!

বললুম, তাহ'লে আজ রাত্তিরে এখানেই থাকবে তো?

আবার একটু হাস্লো রস্তম্, বললে, তোমার যদি কোনো অসুবিধে না হয়, তা হ'লে!

—না না, আমার অসুবিধে কি? তুমি বোসো, আমি বিছানার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

বিছানা পেতে দিয়ে, আমরা দুজনে যখন শুলুম, তখন রাত বেশ গভীর। রস্তম্ বল্লে, তোমার কি এখন খুব ঘুম পাচ্ছে ব্যানার্জি?

বললুম, হ্যাঁ—না, তেমন আর কি—কিন্তু কেন বলো তো?

—না এম্নি—আজকে আমার সেই লেক্ নাকেরুর ছবিটা বড়ো মনে পড়ছে।

বললুম, আচ্ছা রস্তম্, একটা কথা জিগেশ করি, কিছু মনে কোরোনা, তোমার আবার আফ্রিকায় যেতে ইচ্ছে করে না?

খুব করে, চলো না, তোমাকে নিয়েই আবার বেরিয়ে পড়ি!

সমস্ত শরীরটা আমার শির শির ক'রে উঠ্লো, ম্লান আর নিষ্প্রভ গলায় বললুম, তা যদি পারতুম!

সমস্ত শরীরটা আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলো, আস্তে মুখ থেকে সে চাদরটা সরিয়ে নিলে, তারপরে বললে, জানো ব্যানার্জি, যেদিন আমি আফ্রিকা রওনা হই সেদিনটা

ভারী অন্ধকার, ভারী বিষণ্ণ দিন ছিলো আমার জীবনে—কেমন যেন—

বললুম, কি রকম?

বল্‌লে, শুনবে সে সব?

—যদি আপত্তি না থাকে তো বলো না?

একটু থাম্‌লো রত্নম্, তারপরে বললে, আমার এক মাসীমা ছিলেন, খুব ভালোবাস্‌তেন আমাকে—ঠিক নিজের ছেলের মতো। বয়েসে আমার থেকে বছর আষ্টেকের বড়ো ছিলেন—আমাকে একেবারে সেই ছোটবেলা থেকে মানুষ ক'রেছিলেন বল্‌তে পারো!

বললুম, ও!

আস্তে আস্তে রত্নম্ বিছানার উপরে উঠে বস্‌লো। তারপর বল্‌লে, পরে তিনি স্কুলে টিচার হয়েছিলেন, বিয়ে করেন নি! সত্যি কথা বল্‌তে ওরকম চরিত্র আমি জীবনে কখনো দেখিনি ব্যানার্জি—শো ভিভাইন! ব'লেই হঠাৎ চুপ ক'রে গেলো। তারপরে বললে, তাঁর কথা মনে পড়লে আমি বড়ো অস্থির হ'য়ে পড়ি। মাঝে মাঝে ভাবি—ব'লে হঠাৎই চুপ ক'রে গেলো!

বললুম—কই, তুমি যেদিন রওনা হও সেদিনের কথা তো বললে না?

—বলছি, রত্নম্ যেন নিজেকে সযত্নে গুছিয়ে নিলে, বললে, সেদিনটা বড়ো অন্ধকার, বড়ো করুণ ছিলো ব্যানার্জি, সত্যি তুমি বিশ্বাস করো, সেদিনটাকে আমি কখনো ভুলতে পারবো না!

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ! তারপরে আফ্রিকায় থাকতে থাকতেই খবর পেলুম, তিনি মারা গেছেন!

—মারা গেছেন?

—হ্যাঁ, আত্মহত্যা ক'রে!

—আত্মহত্যা? ব'লেই থেমে গেলুম। তারপরে চুপ করে নিজের বিছানার মধ্যে শুয়ে রইলুম।

কোনো দিকে আর কোনো শব্দ নেই। আমার ঘরের বড়ো ঘড়িটা টিক্ টিক্ ক'রে গভীর ভাবে সময়ের সমুদ্র পার হ'য়ে চ'লেছে!

কয়েকটা মিনিট কাটলো। তারপরে একবার কেশে নিয়ে রত্নম্ বললে—আর তা হোল আমার মতেই!

তবু চুপ ক'রে রইলুম। আর যেন আমার কথা বলার কিছু নেই!

চারদিকে গভীর আর নিঃসীম অন্ধকার। কান পেতে থাকলে রত্নমের নিঃশ্বাস ফেলার শব্দও যেন শোনা যাবে মনে হচ্ছে। স্তব্ধ নিঃশ্বাসে আমিও বিছানার মধ্যে শুয়ে রইলুম।

অনেকক্ষণ পরে কথা কইলো রত্নম্। বল্‌লে, সেদিনের কথা যখন মনে আসে তখন কিছু আর ভালো লাগে না ব্যানার্জি! কী যে কষ্ট হয়, তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না, আর বুঝতে পারি মাসিমা আমাকে কতো বেশী ভালোবাসতেন।

আরো কিছুক্ষণ পার হোলো। তারপর আস্তে বললে, ব্যানার্জি, তোমার ঘুমের আমি ক্ষতি করছি বোধ হয়!

বললুম—না, না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মিষ্টার রত্নম্, তোমার জীবনের এই কাহিনী শুন্‌বার জন্যে আমি সমস্ত রাত জেগে থাকতে রাজী আছি।

বোধহয় একটু হাস্‌লো সে, তারপরে বললে, হ্যাঁ—কাহিনীই বটে! জানো ব্যানার্জি, আমি কোথাও যাই, এ তিনি মোটেই চাইতেন না—কিন্তু আমি তখন অন্ধ, আমি তখন পাগল। বিরাট আফ্রিকা তখন আমাকে ডাক দিয়েছে। সেই শিশুকাল থেকে যে আফ্রিকাকে আমার মনের মধ্যে যত্নে লালন ক'রে এসেছি সে তার সমস্ত শাখা প্রশাখা বিস্তৃত ক'রে তার গিরি নদী প্রান্তর মরুভূমির উজ্জ্বল একটী স্বর্ণঝলসিত রূপ আমার চোখের সামনে ধ'রেছে ব্যানার্জি, আমি কি সেই ডাক না শুনে পারি?

চুপ ক'রে রইলুম।

একটু থেমে রত্নম্ বল্‌লে, একদিন চুপচাপ আমি গিয়ে তাঁকে আমার এই সংকল্পের কথা জানালুম। তিনি শিউরে উঠ্‌লেন। আমি জান্‌তুম তিনি আমাকে বাধা দেবেন না। কিন্তু তবু আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, কেন তুই যাবি, কি তোর দুঃখ?

—দুঃখ? আমি হেসেছিলুম একটু। বলেছিলুম, দুঃখ

কেন মাসীমা, আমি যাচ্ছি আনন্দের জন্যে, আমি যাচ্ছি আরো বিস্তৃত জ্ঞান-লক্ষ্যের প্রেরণায়!

—তোর এই স্কুল?

বললুম—থাক্ না, ফিরে এসে আবার তার নেওয়া যাবে। তুমি তো রইলে!

আমি আর মাসীমা। আমরা দুজনে মিলে 'ক্যাণ্ডি'র এই স্কুলটা গ'ড়ে তুলেছিলুম। বছর তিনেকের মধ্যেই ছোট ছেলেমেয়েতে আমাদের ক্ষুদ্র শিক্ষায়তন ভ'রে উঠলো—আয়োজন আমাদের অল্প ছিলো, কিন্তু আশা ছিলো অভাবনীয়। তারপর একদিন সুযোগ এলো, আমি ভেসে পড়লুম। যাবার সময়ে ব'লে গেলুম, তুমি দুঃখ কোর না মাসীমা, আমি নতুন জিনিস নিয়ে আসবো আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের জন্যে! তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো।

কোনো কথা বলেন নি সেদিন! দেখলুম—দুই চোখই কেমন যেন ছলছল্ ক'রে এলো এক মুহূর্তের জন্যে, তারপরেই সামলে নিলেন নিজেকে, বললেন, গিয়ে চিঠি দিস্।

বললুম, তাতো দেবোই!

তারপরে আফ্রিকা এলুম। কী ভালোই যে লাগলো। প্রথম প্রথম বড়ো রাস্তা আর সহরগুলো ঘুরে দেখ্তে লাগলুম; তারপরে সংগী জুটলো। ঢুকলুম গভীর জংগলে, একদিন ক্যানিবালদের দেখ্বার সুযোগও ঘটলো—তখন আমি প্রাদেশিক ভাষাটা খুব মন দিয়ে শিখ্ছি!

একটু থেমে রত্নম্ বললে মাসিমা মাসে অন্ততঃ দুখানা চিঠি লিখ্তেন—সবই এখার মেলে আস্তো। আমিও এখানকার প্রায় প্রত্যেকটী দিনের দিন-লিপি পাঠাতুম। সংগে সংগে উত্তর পেতুম। একথা ঠিক যে তিনি আমার চিঠি পেয়ে উত্তর দিতে একদিনো দেরী করতেন না।

এক বছর কাটলো। মাসিমা লিখলেন, আমাদের স্কুলটা নাকি আরো বড়ো হয়েছে। সরকার থেকে সাহায্য পাবার আয়োজনও প্রায় সম্পূর্ণ—এইবার যেন একবার আমি সিলোনে ফিরি।

ফেরৎ ডাকেই জানালুম, স্কুলের উন্নতির কথা জেনে আন্তরিক উল্লসিত হ'য়েছি মাসীমা, কিন্তু আমার যে এখানে অনেক কাজ, আরো সময় লাগ্বে—কাজ শেষ হ'লেই আমি ফিরবো!

আরো ছ'মাস কাটলো। মাসিমার পত্রসংখ্যা ক্রমশঃ ক'মে আস্তে লাগ্লো। আজকাল প্রত্যেক চিঠির শেষেই সেই এক দুঃখ, তুই এলে আমি খানিকটা জোর পেতুম—অনেক তো ঘুরেছিস্—এবারে চ'লে আয়!

মনে মনে বিরক্ত হোয়ে উঠ্লুম। বুঝ্লুম আমাদের দেশ আজো কেন এতো পিছনে প'ড়ে র'য়েছে! প্রতি পাদবিক্ষেপে এর অনবরত বাধা—অনবরত বন্ধন। মনের সেই গোপন ক্ষোভকে লুকিয়ে রাখতে পারলুম না। পরবর্তী চিঠিতে আমার সেই দুঃখকে আগুনের মতো ছিটিয়ে দিলুম!

তারপরে অনেকদিন তাঁর আর কোনো চিঠি পাইনি। বুঝ্লুম মনে মনে তিনি তখনক দুঃখ পেয়েছেন। আস্তে আস্তে আমার মনের সেই উত্তাপটা ক্রমশঃ ক'মে এলো। তারপরে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে আবার একদিন চিঠি লিখ্লুম। এবারে উত্তর এলো, কিন্তু তাঁর নয়, আমার ছোট ভাইয়ের। লিখেছে কয়েক মাস হ'লো তিনি টি-বি হস্পিট্যালে র'য়েছেন, অবস্থা আশংকাজনক। আমাকে একবার দেখ্তে চান।

এক মিনিটের জন্যে থাম্লো রত্নম্, তারপরে বললে, আমার সংগে আর দেখা হয়নি, দেশে ফিরবার আগেই তিনি মারা যান!

—মারা যান? অভিভূতের মতো আমি বললুম, তবে তুমি যে বললে, আত্মহত্যা ক'রেছেন?

—আত্মহত্যা নয়? রত্নমের গলাটা কেঁপে উঠ্লো একবার, বললে, তিলে তিলে নিজের শরীরের উপরে উৎপীড়ন ক'রে প্রতিদিনের অস্বাভাবিক পরিশ্রম-জর্জরিত শরীরকে একটু একটু ক'রে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেওয়াকে তুমি আত্মহত্যা বলবে না ব্যানার্জি? আবেগে রত্নমের সমস্ত শরীর কাঁপ্তে লাগ্লো।

চুপ ক'রে শুয়ে রইলুম। আমারো যেন কিছু আর শুনবার নেই, বলবার নেই—আমিও আজ এই মুহূর্তে যেন রত্নমের মতো নিঃস্ব আর রিক্ত হয়ে গেছি।

ঘড়ির শব্দটা শুধু কানে আস্ছে—টিক্ টিক্—টিক্ টিক্!

অনেকক্ষণ পরে রত্নম্ কথা কইলে বললে, তাই ভেবেছি ব্যানার্জি, আবার সেই আফ্রিকাতেই ফিরে যাবো। যে অন্ধকার মহাদেশে গিয়ে তাঁকে হারিয়েছি—সেই অন্ধকারই আমাকে গ্রাস করুক। আর আমি কিছু চাই না!

ঠং ঠং ক'রে ঘড়িতে দুটো বাজ্‌লো।

বললুম, রাত হোলো মিষ্টার রত্নম্। এবারে ঘুমোনো যাক!

—নিশ্চয়ই, মুহূর্তে নিজেকে গুছিয়ে আন্‌লো রত্নম্। ইংরেজীতে বল্‌লে, গুডনাইট! তারপরেই সে পাশ ফিরলো।

কিন্তু আমি যে অস্থির হ'য়ে উঠেছি। একী ভীষণ বিপদে পড়লুম। আমার সমস্ত পারিবারিক পরিবেশ উত্তপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে প্রতিদিন। আর সত্যি কথাই তো, একাধে যদি দুদিন অন্তর এসে লোকটা রাত দশটার সময়ে নরোজায় ঘা দেয় তাহ'লে তাঁরাই বা কতোদিন সহ্য করবেন তাকে? একদিন দুদিন করা যায় তা ব'লে প্রতি দিনের কথা বিশেষ ক'রে এই ভয়ংকর দুর্দিনে হাস্যকর নয় কি?

ছোটকাকা আমাকে একদিন সোজাসুজিই বললেন, কিরে নীরু, আচ্ছা লোক কুড়িয়ে এনেছিলি তো রাস্তা থেকে ওর কি আর এখানে চালচুলো জুটলো না কিছু?

বললুম—খুব তো চেষ্টা করছে ছোটকা একটা চাকরীরও খবর পেয়েছে। সেইটা পেলেই ও কোনো বোর্ডিং বা মেসে চ'লে যাবে, সেই কটা দিন অসময়ে একটু সাহায্য করা!

—তা তো বুঝলুম, তার জন্যে তো আমাদের আপত্তি নয়, শুধু আজ এই আকাল পড়েছে তাই, না হ'লে দুবেলা দুমুঠো খাবে সে তো আমাদেরই আনন্দের কথা।

আজ কাল রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে সব সময়ে আমি উৎকর্ণ হ'য়ে থাকি, এই বুঝি আমার দরোজায় মৃদু করাঘাতের সংগে শুনবো: ব্যানার্জি,—ব্যানার্জি!

আশ্চর্য লোক ছিলো রত্নম্, দুতিন দিন আমার কাছে থাকতো, এখানে ওখানে চাকরী খুঁজতো, তারপর একেবারে হঠাৎ উধাও হোত—তিন চারদিন আর কোন খবরই নেই।

আবার অকস্মাৎ কোনো রাত্রে দশটা কি এগারোটার সময়ে ঘা পড়তো আর শুনতুম সেই চাপা গলার ডাক, ব্যানার্জি—ব্যানার্জি!

জিগেশ করলে বলতো, একজন হিন্দুস্থানী লোকের সংগে আলাপ হ'য়ে গেলো, তারই বাড়ীতে ছিলো এ কদিন, তার পরে ভালো লাগ্‌লো না, চ'লে এসেছে! অথবা কোন দিন কোনো ধর্মশালার কথাও বল্‌তো!

এই ভাবে আরো দুমাস কাটলো। আমার পরিবারের সহ্যের সীমারেখা এবারে মাত্রা ছাড়ালো। একদিন চরম নাটক অভিনীত হ'লো। জ্যাঠামশাই আমাকে এই ব্যাপার নিয়ে যা তা ব'লে অপদস্থ করলেন।

বড়ো দুঃখ হ'লো সেদিন। মনে মনে ভাবলুম, আমার ছোট কাকার কথাই ঠিক। লোকটা ভণ্ড। লোকটা পাজী সে আমার জীবনের কতোগুলো সুযোগ নিয়ে চমৎকার গল্প ব'লে আমাকে ভুলিয়েছে। আফ্রিকা গেছে না ছাই—কী প্রমাণ আছে তার? লোকটার ব্যবসাই এই।

মনে মনে বড়ো আঘাত পেলুম, সত্যিই লোকটা ভণ্ড তা না হ'লে আজ এখানে কাল সেখানে ক'রে এভাবে কাটাবে কেন? আর খুব চালাক লোকটা, জানে কোন্‌খানে কিভাবে চল্‌তে হয়।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, আর নয়, এবারে এলে হতভাগাকে মেরে তাড়াবো, তারই জন্যে তো আমার এতো লাঞ্ছনা। কেন—কেন আমি তা সইবো?

এক সপ্তাহ দুসপ্তাহ ক'রে একমাস কেটে গেলো, রত্নমের আর দেখা নেই। ভাবলুম বোধ হয় রেহাই পেলুম হতভাগার হাত থেকে। বাঁচা গেছে!

কিন্তু না, আরো একদিন এসেছিলো রত্নম্—অবশ্য সেই শেষ! তারপরের দিন থেকে আজ পর্যন্ত তার আর কোনো সন্ধান পাইনি।

অনেক সহ্য ক'রেছি ওর জন্যে। যখন যা দরকার হ'য়েছে তাই দিয়েছি। বাড়ীতে ভাত না থাকলে সংগে ক'রে নিয়ে গিয়ে হোটেল থেকে খাইয়ে নিয়ে এসেছি—টাকা দিয়েছি—পয়সা দিয়েছি—কিন্তু আর নয়। আর ওর মোহে আমি ভুলবো না কোনদিন! থাক প'ড়ে তার সেই মায়াময় আর মোহময় আফ্রিকা। থাক্ তার সেই নীল নদ আর

ক্যামেরুণ পর্বতের গল্প, আর থাক তার সেই মাসীমার কথা, ওঃ কী অদ্ভুত গল্পই রচনা করতে পারে লোকটা !

তখন শীতকাল।

পৌষ মাসের মাঝামাঝি সময়টা বোধ হয় !

বেশ হিম পড়ছে ক'দিন থেকে। অফিসের অমানুষিক পরিশ্রমের পর এই ঘণ্টাখানেক হ'লো বাড়ী ফিরেছি। সকলেই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছেন, আমিও কিছুক্ষণ হ'লো শ্রান্ত আর ক্লান্ত শরীরে এই মাত্র বিছানা আশ্রয় ক'রেছি। অফিসের একটা ঘটনায় মনটা নিতান্ত তিক্ত আর ভারাক্রান্ত। একটু তন্দ্রা এসেছিলো বোধ হয়—হঠাৎ মনে হ'লো আমার দরোজায় কে যেন আবার আঘাত করলো। উৎকর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লুম, তারপরেই শুন্‌লুম সেই চাপা আর পুরোনো কণ্ঠস্বর : ব্যানার্জি, ব্যানার্জি !

তাড়াতাড়ি বিছানার উপরে উঠে বসলুম, তারপরে অন্ধকার আর নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে চুপ ক'রে কান পেতে ব'সে রইলুম, আবার সেই শব্দ, ঠক্-ঠক্—ঠক্-ঠক্ ! তারপরেই চাপা গলায় অপরাধীর মতো ডাক : ব্যানার্জি—ব্যানার্জি !

এক মুহূর্তে কী যেন হ'য়ে গেলো, চোখের সাম্‌নে চকিতেই জোঠামশায়ের সেই রুদ্র মূর্তিটা জেগে উঠ্‌লো, সেই যখন রত্নম্‌কে নিয়ে বিকৃত মুখে আমাকে বর্বর আর অশোভন ভাষায় গাল দিচ্ছিলেন—চার দিকের গোফটা তাঁর ঝুলে পড়েছে—সমস্ত চোখে মুখে একটা পৈশাচিক যাতনা পর পর ক'রে কাঁপছে !

বিদ্যুৎ গতিতে লাফ দিয়ে পড়লুম মাটীতে। তারপরে দড়াম ক'রে এসে দরোজার খিল খুললুম :—আজ হতভাগাকে আমি চূর্ণ বিচূর্ণ করবো।

শীতের এক ঝলক ঠাণ্ডা আর কনকনে বাতাস এসে আমার গায়ে লাগ্‌লো। দেখ্‌লুম ঠিক দরোজার ওপাশেই তিমিত অন্ধকারের মধ্যে ম্লান আর নিষ্প্রভ বিদেশী পোষাকে আমার ঘরে আসবার আদেশের অপেক্ষায় টুপীটা হাতে ক'রে নিয়ে রত্নম্ প্রতিদিনের মতো সেই ভাবে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে !

একটী শান্ত আর শুভ্র মুহূর্ত !

বললুম—কাম্ ইন্ !!

আমাদের সাহিত্য ভবন
কল্‌কাতা।

ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়

শ্রীঅনাথ বন্ধু দত্ত

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ভারতে ব্যাঙ্কারগণের ব্যাঙ্কার হইতেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া। সকলের সেরা হইলেও বয়সে ইহা শিশু মাত্র। এই সেদিন ১৯৩৫ সনের ১লা এপ্রিল ইহা পাঁচ কোটী টাকা মূলধন ও পাঁচ কোটী টাকা রিজার্ভ লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। একাধারে এই ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির ব্যাঙ্কার ও ভারতের কাগজীমুদ্রার পরিচালক। এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে কাগজীমুদ্রা পরিচালন করিত ভারত সরকার নিজে এবং এজন্য কারেন্সি বিভাগ নামে একটা সেরেস্তা ছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য্য দুই ভাগে হয়, একটা ব্যাঙ্কিং বিভাগ অপরটা ইস্যু বা কাগজীমুদ্রা বিভাগ। ইহার আর একটা প্রধান কার্য্য হইতেছে পৃথিবীর টাকার বাজারে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্য যাহাতে ঠিক থাকে এবং ওলট্ পালট্ না হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা। অবশ্য লণ্ডনের বাজারেই এই কার্য্য করা হয় এবং এজন্য লণ্ডন নগরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটী শাখা আছে। অন্যান্য ব্যাঙ্কের সহিতও ইহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে আইন অনুযায়ী তাহাদের স্থায়ী ও চল্‌তি আমানতের যথাক্রমে শতকরা ২ এবং ৫ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিতে হয়। তবে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিও সময় বিশেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কোন কোন সাহায্য পাইতে পারে যদিও এরূপ সাহায্য পাওয়া মোটেই সহজ নহে। ইহা ব্যতীত দৈনন্দিন দেনাপাওনা মিটাইবার সুবিধার জন্য যে সকল স্থানে ব্যাঙ্ক সমূহের মধ্যে 'ক্লিয়ারিং'এর ব্যবস্থা আছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কই তাহা পরিচালন করিয়া থাকে। সহজ কথায় ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কই ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কর্ণধার, ভারতের ভিতরে ও বাহিরে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য সংরক্ষণের ভারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। এক কথায় ভারতীয় আর্থিক জীবনে সুশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব এই ব্যাঙ্কের সুপরিচালনের উপর নির্ভর করে।

১৯৩৪ সনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া আইন পাশ হয়। ঐ বৎসর ৬ই মার্চ্চ এই আইন বড়লাটের সম্মতি পায়। ব্যাঙ্কটী অংশীদারগণের সম্পত্তি এবং প্রত্যেক শেয়ারের দাম ১০০৲। দুইলক্ষ কুড়ি হাজার টাকার অংশ বা শেয়ার গবর্ণমেণ্ট মনোনীত ডাইরেক্টরগণকে দিবার জন্য সরকার নিজ হাতে রাখিয়াছেন, ইহা ব্যতীত মোট পাঁচ কোটী টাকার সমস্ত অংশই সাধারণে বিক্রয় করা হইয়াছে। শেয়ারহোল্ডারগণের লভ্যাংশ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট স্থির করেন। ব্যাঙ্কের খরচ মিটাইয়া ও অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দিয়া যাহা বাকী থাকে সমস্তই ভারত-সরকারের প্রাপ্য। আইন মতে অংশীদারগণের লভ্যাংশ শতকরা অনধিক পাঁচ হইবে। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দেশে শতকরা ৪৲ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।

ব্যাঙ্ক পরিচালনের জন্য একটী কেন্দ্রীয় বোর্ড আছে। ইহাতে মোট ১৬ জন সভ্য। গবর্ণর ও দুইজন ডেপুটী গবর্ণর ভারত গবর্ণমেণ্ট মনোনীত করেন। ইহা ব্যতীত চারিজন ডাইরেক্টরও গবর্ণমেণ্ট মনোনীত করেন। বম্বে, কলিকাতা ও দিল্লীর স্থানীয় বোর্ড হইতে দুইজন করিয়া এবং মাদ্রাজ ও রেঙ্গুন স্থানীয় বোর্ড হইতে এক একজন ডাইরেক্টর কেন্দ্রীয় বোর্ডে নির্ব্বাচিত হন। ইহা ব্যতীত ভারত গবর্ণমেণ্ট একজন সরকারী কর্ম্মচারীকেও বোর্ডে ডাইরেক্টর মনোনীত করেন। বম্বে, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ ও রেঙ্গুনে একটী করিয়া স্থানীয় বোর্ড আছে ইহাদের প্রত্যেকটীতে পাঁচজন নির্ব্বাচিত ও তিনজন ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ড কর্ত্তৃক মনোনীত সভ্য থাকেন। স্থানীয় বোর্ডগুলি কেন্দ্রীয় বোর্ডের নির্দ্দেশমত কার্য্য করিয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ চালাইবার জন্য স্বভাবতই রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে যথেষ্ট পরিমাণ নগদ টাকা পয়সা ও নোট হাতে মজুত রাখিতে ও আবশ্যক মত সকলকে সরবরাহ করিতে হয়। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য দেশের মধ্যে টাকা চলাচলের দরকার হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের সাহায্যের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অল্প কমিশনে ইহার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত নানা আর্থিক ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টকে এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ককে পরামর্শ দানও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্যতম কর্ত্তব্য। কোন ব্যাঙ্ক তাহার খাতাপত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক

পরীক্ষা করাইতে চাহিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহা করিয়া থাকেন। ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত পরিসংখ্যান (statistics) প্রস্তুত ও প্রকাশ ইহার অবশ্য কর্ত্তব্যের অন্যতম। গবর্ণমেণ্টের কর্জ্জ (securities) পরিচালন এবং এই সংক্রান্ত সকল কার্য্য ইহার একটা কর্ত্তব্যের অন্যতম।

তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরেই তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের নাম করিতে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী যে সকল ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও অবণ্টনীয় লভ্যাংশ (রিজার্ভ) পাঁচ লক্ষ কিম্বা উহার অধিক সেই সকল ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীলভুক্ত হইবার যোগ্য। এই বিধান মতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, বিদেশী এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক এবং ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক সকলেই তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল, ব্যাঙ্ক অফ ম্যাড্রাস্, এবং ব্যাঙ্ক অফ বম্বেকে একত্র করিয়া ১৯২১ সনে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক গঠন করা হয়।

১৮০৬ সনে কলিকাতায় ব্যাঙ্ক অফ ক্যালকাটা নামে একটী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় পরে এই ব্যাঙ্কের নাম বদলাইয়া ইহার ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল নামাকরণ হয়। গোড়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও ইহার অংশীদার ছিল এবং ১৮৬২ সন পর্য্যন্ত ইহা নিজেদের নোট ছাপাইত। পরে অবশ্য ব্যাঙ্কের সমস্ত অংশই সাধারণে বিক্রীত হয়।

ব্যাঙ্ক অফ্ বম্বে ১৮৪০ সনে স্থাপিত হয়। ইহাতেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অংশ ছিল। নানা জাল জুয়াচুরীর জন্য ১৮৬৮ সনে এই ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে। ১৮৭০ সনে নিউ ব্যাঙ্ক অফ্ বম্বে স্থাপিত হয়। পরে ইহার নাম বদলইয়া ব্যাঙ্ক অফ বম্বে রাখা হয়।

ব্যাঙ্ক অফ্ ম্যাড্রাস স্থাপিত হয় ১৮৪৩ সনে। এ ব্যাঙ্কও নিজের নোট ছাপিত। ১৮৬২ সনে যখন ভারত গবর্ণমেণ্ট নিজেই কাগজীমুদ্রার প্রচলন করে তখন ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৭৬ সনে আইন পাস করিয়া যাহাতে তিনটী প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কই একভাবে কার্য্য চালায়, গবর্ণমেণ্ট এরূপ ব্যবস্থা করেন। গবর্ণমেণ্ট এই সকল ব্যাঙ্কের শেয়ারও ছাড়িয়া দেন এবং ব্যাঙ্কগুলিকে সম্পূর্ণ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। ১৮৭৯, ১৮৯৯ এবং ১৯০৭ সনেও ব্যাঙ্কের আইন কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হয়। ১৯২০ সনের আইনে এই তিনটী প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ককে এক করিবার ব্যবস্থা হয়।

গত মহাযুদ্ধের সময় ভারতে একটী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। যুদ্ধের পরে তিনটী প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ককে একত্র করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী ইহাদ্বারা সম্ভব কিনা দেখা হয়। কিন্তু দেখা গেল যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিতান্তই অনুরূপ। এমতাবস্থায় ইহাকে কাগজীমুদ্রার পরিচালন ভার দেওয়া চলে না। তাহা ছাড়া বিনাসুদে গবর্ণমেণ্ট তহবিল রাখিয়া সেই টাকা বাণিজ্যে প্রয়োগের অর্থই হইতেছে অন্যান্য বেসরকারী ব্যাঙ্কসমূহের সর্ব্বনাশ সাধন। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত পৃথকভাবে একটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাই সাব্যস্ত হইল।

অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় এই ব্যাঙ্কের সহিত চুক্তি হয় যে যে সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা নাই প্রথম পনের বৎসর সেই সকল স্থানে ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসাবে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিবে। অবশ্য এজন্য কমিশন পাইবে। এই চুক্তি বদ্‌লাইতে হইলে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে নোটিশ দিতে হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দশ বৎসর পূর্ণ হইতেই অর্থাৎ চুক্তি পূর্ণ হইবার পাঁচ বৎসর বাকী থাকিতেই ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে কিন্তু চুক্তি একেবারে বাতিল করিয়া দেওয়া হয় নাই। আগামী দশ বৎসরের জন্য অল্প কমিশনে নূতন বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের প্রায় চারিশত শাখা আছে।

এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

ইহাদের সংখ্যা মোট ১৬টী। ইহাদের সকলেরই হেড অফিস ভারতের বাহিরে। ইহাদের মধ্যে, ইংলণ্ডীয়, মার্কিণ, ওলন্দাজ ও অন্যান্য ব্যাঙ্ক আছে। যুদ্ধের দরুণ জাপানী ব্যাঙ্ক উঠিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের প্রথম দিকেও দুইটী জাপানী ব্যাঙ্ক—ইওকোহামা স্পীসি ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক অফ্ তাওয়ান্

ভারতবর্ষে কার্য্য করিত। জাপানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যখন ইংলণ্ড ও আমেরিকা জাপানী সম্পত্তি জমাট করিবার হুকুম দেন (freezing order) তখন সকল জাপানী প্রতিষ্ঠানে এবং এই দুইটী ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়া যায়।

ওলন্দাজদের দুইটী প্রতিষ্ঠান আছে যথা—নেদারল্যাণ্ড্ ট্রেডিং সোসাইটী এবং নেদারল্যাণ্ড্ ইণ্ডিয়া কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক। অবশ্য গত বিশ্বযুদ্ধের পর হইতেই ইহারা এদেশে কার্য্য আরম্ভ করে।

হংকং সাংহাই ব্যাঙ্কিং করপোরেশন ইংরেজের ঔপনিবেশিক ব্যাঙ্ক।

ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, মার্কাণ্টাইল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, অষ্ট্রেলিয়া এণ্ড চায়না, ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ইংরেজ ব্যাঙ্ক, হেড্ আপিস্ লণ্ডনে তবে ব্যবসাক্ষেত্র বৃটিশ উপনিবেশ ও প্রাচ্যদেশ। লয়েড্স্ ব্যাঙ্ক বিলাতের 'বিগ্ ফাইভের' অন্যতম। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে কক্স কোম্পানী নামক ব্যাঙ্কের গ্রাস (Amalgamate) করিয়া এদেশে আসিয়াছে।

এই সকল এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের মধ্যে দল পাকাইয়া কার্য্য করে এবং সে দলে ভারতীয় ব্যাঙ্ককে প্রবেশ করিতে দেয় না। ইহা খুবই স্বাভাবিক। সমস্ত আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের সব খাইয়া ইহারা জীবনধারণ করে, সেখানে নূতন ভাগীদার জুটিলে সেটা কিছু আনন্দের নহে। অবশ্য দরকার পড়িলে ইহারা লণ্ডনের বাজার হইতে টাকার আমদানি করিয়া ভারতের টাকার বাজারে যোগান দিতে পারে ও বাণিজ্যে প্রকৃত সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক এই যে ইহারা ভারতীয় বাজারে দেশীয় ব্যাঙ্কের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আমানত গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা বিদেশী বাণিজ্য ও ব্যবসাকে সাহায্য করে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নামেও এই অভিযোগ শুনা যায়।

তবে বর্ত্তমানে দুই একটা বৃহৎ ভারতীয় ব্যাঙ্ক কিছু কিছু বিনিময় বা এক্সচেঞ্জের ব্যবসা করিতেছে, কিন্তু বহির্বাণিজ্য বিদেশীর হাতে থাকায় এবং ভারতের বাহিরে বিশেষতঃ লণ্ডন ও নিউইয়র্কে এই সকল ব্যাঙ্কের শাখা না থাকায় আশানুরূপ সুবিধা হইতেছে না।

ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক

তপশীলি ব্যাঙ্কের তৃতীয় স্তরে ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলি। বর্ত্তমানে ইহাদের সংখ্যা ৭৬টী। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আরম্ভ হইবার সময় ইহাদের সংখ্যা ছিল মোট ২৬টী। বাংলাদেশে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও জলপাইগুড়ী ব্যাঙ্কিং ও ট্রেডিং করপোরেশন সর্ব্ব প্রথম তপশীল ভুক্ত হয়। দ্বিতীয়টীর নাম এখন শুনা যায় না। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান। পাঁচটী ভারতীয় বৃহৎ ব্যাঙ্ককে ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে 'ভারতীয় বিগ্ ফাইভ্' বলা হয়। তাহাদের নাম সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ্ বরোদা, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক। শেষোক্ত ব্যাঙ্কটী ভারতীয় হইলেও ইহার মালিক চার্টার্ড ব্যাঙ্ক সুতরাং ইহা এই হিসাবে বিদেশী ব্যাঙ্কের সামিল। গত দশ বৎসরে ভারতীয় ব্যাঙ্কের অকল্পনীয় উন্নতি হইয়াছে। ইহার মধ্যে আবার গত পাঁচ বৎসরের উন্নতি (অর্থাৎ যুদ্ধকালীন) বিশেষ লক্ষ্য করিবার জিনিস। কাগজী মুদ্রার সম্প্রসারণ যে ইহার একটা কারণ সন্দেহ নাই। তবে সাধারণ লোকে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছে তাহাও অন্যতম কারণ স্বীকার করিতেই হইবে। নূতন প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের মধ্যে ভারত ব্যাঙ্ক (দিল্লী), জয়পুর ব্যাঙ্ক (জয়পুর), ইউনাইটেড্ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, হিন্দুস্থান মারক্যাণ্টাইল ব্যাঙ্ক; হিন্দ ব্যাঙ্ক (কলিকাতা) হিন্দুস্থান কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক (কানপুর), হাবিব ব্যাঙ্ক ও ইণ্ডিয়া ও আফ্রিকা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের (বম্বে) নাম উল্লেখযোগ্য।

তপশীলের বাহিরে যৌথ ব্যাঙ্ক

ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে যাহারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তপশীল ভুক্ত নহে অথচ যাহাদের অদায়ীকৃত মূলধন ও রিজার্ভ পাঁচ লাখের উর্দ্ধে তাহাদেরও সংখ্যা কম নহে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যে সকল ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও রিজার্ভ ৫ লক্ষের উর্দ্ধে তাহারা আইন অনুযায়ী তপশীলভুক্ত হইবার যোগ্য এবং হইবেই সুতরাং উহার বাহিরে কিরূপে থাকিবে। প্রথম কয়েক বৎসর এসম্বন্ধে বিশেষ কড়াকড়ি ছিল না। সহজেই ব্যাঙ্কগুলি আদায়ী মূলধনের দাবী

মিটাইলেই তপশীলভুক্ত হইতে পারিত কিন্তু বর্তমানে বিশেষতঃ দ্বিশতাধুর ও দুইলক্ষ ব্যাঙ্ক ফেল পড়িবার পর হইতেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বেশ একটু হিসাবপত্রাদি পরীক্ষা করিয়া দিতুল বা তপশীলভুক্ত করে। ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলীতে কোনরূপ অবাঞ্ছনীয় কিছু থাকিলেই তপশীলভুক্ত করা হয় না। অবশ্য তপশীলভুক্ত হইলে ব্যাঙ্কের কতগুলি দায়িত্বের সঙ্গে, ব্যবসায়ীমহলে ইজ্জৎ বাড়ে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ইজ্জৎ সুপরিচালিত ব্যাঙ্কের অধিকাররূপে দেখিতে চায়। যে কোন ব্যাঙ্কই আইন অনুযায়ী যোগ্যতা অর্জন করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট তপশীলভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিবার অধিকারী। ভারত গভর্ণমেণ্ট তদন্তের ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর দিয়া থাকেন এবং কার্য্যাবলী সম্বন্ধে ভাল রিপোর্ট পাইলেই তপশীলভুক্ত হইতে আদেশ দেন। কেবলমাত্র মূলধনের যোগ্যতা অর্জন করিলেই তপশীলভুক্ত করা হয় না।

তপশীলের বাহিরে ১ লক্ষ হইতে ৫ লক্ষ টাকা মূলধন এরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যা প্রায় ১৫০টী। এই সব ব্যাঙ্কের মধ্য হইতেই পরে কেহ কেহ তপশীলভুক্ত হইয়া থাকে।

ইহারও নিম্নে পঞ্চাশ হাজার হইতে এক লক্ষ টাকা মূলধন আছে এরূপ ব্যাঙ্কের সংখ্যাও প্রায় দেড়শত। ইহাদের নিকট স্থায়ী ও চলতি জমার পরিমাণও খুব বেশী নহে। তবে স্থানীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে ইহারা ব্যবসা বাণিজ্যের সহায়ক ও মধ্যবিত্তের সাহায্য করিয়া থাকে।

সমবায় ব্যাঙ্ক

এই সকলের বাহিরে আর এক শ্রেণীর ব্যাঙ্ক বা ঋণদান প্রতিষ্ঠান আছে যাহারা সমবায় আইন অনুযায়ী সমিতিভুক্ত। ইহাদের সংখ্যাও কম নহে। প্রত্যেক আফিসে আফিসে এইরূপ প্রতিষ্ঠান অল্প বেতনভুক মধ্যবিত্তকে এবং শ্রমিককে সাহায্য করিতেছে। এইরূপ প্রতিষ্ঠান আত্মনির্ভরশীল হইতে শিক্ষা দেয়। আর এইরূপ প্রতিষ্ঠান সভ্যগণের আত্ম-নির্ভরশীলতারই অন্যতম নিদর্শন। ভারতবর্ষের কৃষকের দুঃখ-মোচনের জন্য এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন সকলেই স্বীকার করেন। নিরক্ষরতাই এই সমবায় আন্দোলনের প্রধান বাধা তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পাঁচলক্ষ ও তদূর্দ্ধ মূলধন আছে এরূপ সমবায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪২টী। ইহার মধ্যে কার্য্যকরী মূলধন কোটি টাকার উপর এরূপ প্রতিষ্ঠানও রহিয়াছে—যথা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে আরব্যান্ ব্যাঙ্ক। সমবায় আন্দোলনে রেলওয়ে কর্ম্মচারীগণের প্রতিষ্ঠানই বিশেষ উল্লেখযোগ্য—যথা, ই. আই. আর, বি এণ্ড এ. আর, জি. আই. পি ইত্যাদি। এক লাখ হইতে পাঁচ লাখের নিম্ন পর্য্যন্ত মূলধন আছে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩০৩টী। ইহারও নিম্নস্তরে সহস্র সহস্র প্রতিষ্ঠান ভারতময় ছড়াইয়া আছে। সমবায় আন্দোলন ইতালী, ডেনমার্ক ও আয়র্ল্যাণ্ডের কৃষককে নূতন জীবন দিয়াছে, কিন্তু ভারতে শিক্ষার অভাবে ইহার প্রসার বা প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হইতেছে।

দেশীয় লেন-দেন প্রতিষ্ঠান

ইহার বাহিরে বহু লেন-দেন প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যাহারা কোন হিসাবের মধ্যে ধরা পড়ে না কারণ ইহারা কোম্পানী আইনে সমিতিভুক্ত নহে। ইহারা বিভিন্ন নামে পরিচিত যথা মহাজন, সাহুকার, শ্রফ, চেটি ইত্যাদি। ইহাদেরও ব্যবসা প্রসার যে নগণ্য তাহা নহে তবে ইহাদের কার্য্যাবলী খাঁটী ব্যাঙ্কিং এর বাহিরে দ্রব্যাদির কেনাবেচাতেও প্রযুক্ত হয়। বর্ত্তমানে নানা প্রদেশেই অমীহস্তান্তর বিরোধী, উচ্চ সুদ নেওয়ার বিরোধী এবং ঋণ-সালিসী প্রভৃতি আইন পাশ হওয়ায় ইহাদের ব্যবসায়ে নানা বিঘ্নের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহাদের প্রতি দেশের সমাজাগ্রত গণতন্ত্রের নেকনজর নাই। এবং যাহাতে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি ইহাদের স্থান দখল করে সকলেরই এরূপ কামনা। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই ইহাদের কারবার চালাইবার বাধা সৃষ্টি করা হইয়াছে কিন্তু সমবায় বা অপর কোনরূপ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় নাই। এজন্য পল্লী অঞ্চলে নূতন আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার সমাধান না করিলে সমাজের নিম্নশ্রেণীর আর্থিক দুঃখ দূর হইবার নহে। ঋণদান প্রভৃতির পদ্ধতি মানিয়া চলিলে এবং শেষ পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা অধমর্ণের মঙ্গলকে

উপেক্ষা না করিলে এই প্রতিষ্ঠানগুলি যে ভারতের আর্থিক-জীবনে একেবারেই অনাবশ্যক তাহা নহে। তবে ইহাদের কর্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ দরকার। নানা প্রকার আইন দ্বারা ইহাদের অন্যায়কে রোধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র এবং কি ভাবে ইহাদিগকে দেশের আর্থিক জীবনে কাজে লাগান যায় তাহার ব্যাপক চেষ্টা হয় নাই। যে পর্য্যন্ত দেশে সমবায় আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠান সুপ্রতিষ্ঠিত না হয় সে পর্য্যন্ত এই সকল দেশীয় প্রতিষ্ঠানকে ভারতের পল্লী অঞ্চলের আর্থিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন বা বিনষ্ট করা সুবিবেচনার কার্য্য নহে। ইতিমধ্যেই ইহাদের কতকগুলি কোম্পানী আইনের সমিতিভুক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে এবং অনেকে দেন-দেন কার্য্য হইতে চিরদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিয়াছে।

শেষ কথা

ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই কৃষিপ্রধান দরিদ্র দেশে যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমাজের নিম্নস্তরের লোকের মধ্যে সস্তায় টাকা না যোগান দিতে পারে তবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্যতম কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রত্যক্ষভাবে না হউক পরোক্ষভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহায্য সমাজের নিম্নস্তরে পৌঁছান দরকার। ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু কবে সমবায় আন্দোলন দেশে দৃঢ় হইবে, তারতজোড়া কৃষি-হুণ্ডীর প্রচলন হইবে কে জানে! রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রথম দশ বৎসর অতীত হইল, এখন পর্য্যন্ত সকল কৃষি-সাহায্যই আলোচনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

হিরোশিমা-নাগাসাকী

সমীর ঘোষ

সূর্য অস্তমিত—নিষ্প্রভ সূর্য
প্রশান্ত সাগরের বক্ষে ;
প্রাচ্য-দিগন্তের শুভ্র কি তূর্য
ধ্বনিল সে হিরোশিমা বক্ষে ?
নাগাসাকী-সংগিনী তারো দেহ চূর্ণ
লোল জিহ্বা তারে লেও অঙ্ক
পরমাণবিক বোমা ক্ষয় আনে তূর্ণ
—শান্তি এসেছে, শেষ দন্ত !
অগ্নিতে জ্বলে ট্রয় ; পাম্পিয়া লুপ্ত—
লাভাস্রোত উদ্গারে অন্ত।
স্বর্ণলঙ্কা কোথা ; হস্তিনা সুপ্ত ;
হরপ্পা নয় প্রাণবন্ত।
তবু যদি কাটি মাটি—প্রান্তর প্রান্তে
দেখি আছে অস্থি'র বস্তি ;
সংখ্যা কি হস্তিনা রাজী নয় মানতে
শান্তির ক্ষয়িষ্ণু দোস্তি।

হিরোশিমা, নাগাসাকী নাগরিক ধর্মে
হারায় নি কেহ সব চিহ্ন
তোমাদের মতো কেহ কংকালে হর্ষে
ধূলি সাথে হয় নি অভিন্ন।
তোমরা শান্তি-দূত—দধীচির অস্থি
হোলে সভ্যতাপাশ মুক্ত ;
আনবিক উল্লাসে বিকীর্ণ অস্তি
জীবহীন উত্তরের বুকতো !
সূর্য ডুবলো আজ—নিষ্প্রভ সূর্য
প্রশান্ত সাগরের বক্ষে
হিরোশিমা নাগাসাকী বাজাও কি তূর্য
অরাতুরা মুমূর্ষ চক্ষে ?

রাখাল দা

সুব্রতা চৌধুরী

ভোর রাত্রি ; চারটা হবতো হবে, হঠাৎ শঙ্খ আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল গ্রামবাসীদের। এই শঙ্খ-ইঙ্গিত কিসের গ্রামের লোকেরা তা ভাল ক'রেই জানে। এই সংকেতের সঙ্গে তারা বহুদিন থেকেই পরিচিত। পুলিসের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের পুরুষেরা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বাইরে অসম্ভব দুর্যোগ ; সারা রাত্রি ঝড় ও বৃষ্টি গেছে ভীষণভাবে। বর্ষণমুখর রাত্রি কিছুটা শান্ত হ'য়ে এলেও ক্ষান্ত হয়নি এখনও সম্পূর্ণভাবে। প্রকৃতির প্রলয় নৃত্যের নমুনা দেখা যাচ্ছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গাছপালার অবস্থায়। তবু এ দুর্যোগে রাখালদাকে আটকায় সাধ্য কার ? রাখালদার জন্যই পুলিশের আজ এই অভিযান। নিপীড়িত পুরুষেরা রাখালদার সঙ্গে চ'লে গেল গ্রামান্তরে। পুলিশ-ভীতি আজ আর তাদের নেই কিন্তু পুলিশের হাতে সহজে ধরা দেবে না এই তাদের পণ।

১৯৩০ সালের আন্দোলন ; সারা ভারত যখন আন্দোলিত হয়ে উঠ্‌ল, মেদিনীপুরের ক্ষুদ্র গ্রাম রতনপুরে এসেও তার সাড়া দিয়ে গেল। রতনপুর গ্রামটা আয়তনে খুব বেশী বড় না হলেও বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। প্রকৃতি তার সমস্ত উপকরণ ঢেলে দিয়ে রতনপুরের শ্রীবৃদ্ধি করতে কার্পণ্য করে নি কোথাও। পরিষ্কার ঝকঝকে গ্রামবাসীর বাসগৃহ। দীনতা ও দারিদ্র্যের ছাপ কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। মাঝে মাঝে দু'একটা পাকাবাড়ী চোখে পড়ে কিন্তু তাও খড়ের ঘরের সঙ্গে বেশ সামঞ্জস্য রেখেই তৈরী হয়েছে ; কোথাও কোন রকম বেমানান্ নেই। গ্রামের আশে পাশের সবুজ শস্যগুলি বেশ সতেজে বেড়ে উঠ্‌ছে। এক পাশ দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে ছোট একটি নদী, অন্য সময় তার অবস্থা যাই থাক না কেন, বর্ষার জলে স্ফীত হ'য়ে কানায় কানায় ভরে উঠে। গ্রামে ঢুকতে, প্রথমেই চোখে পড়ে নদীর ধারে জাতীয় বিদ্যালয়টী, এবং বিদ্যালয়ের সামনের প্রাঙ্গনে বিরাট বাঁশের ডগায় জাতীয় পতাকা।

রাখালদার নেতৃত্বে রতনপুর গ্রামটাকে ঘিরে আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল গড়ে উঠেছে। আন্দোলনের সাড়া সবার মনেই এক পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে, কিন্তু রাখালদার পরিবর্ত্তনটাই যেন সবচাইতে বিস্ময়কর ও উল্লেখযোগ্য। তার জীবনের সব কিছু কালিমা ও গ্লানিময় আবহাওয়া যেন এ আন্দোলনের তলায় সমাধিলাভ করেছে। রতনপুরের বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল জমিদারের ইয়ার সেই রাখালদা আর নেই। গ্রামের কয়েকটী বেকার অপগণ্ড যুবকের সঙ্গে রাখালদাও ছিলেন জমিদার আড্ডার বিশেষ সঙ্গী। জমিদার বাড়ীতে পোলাও মাংসে ভুরি ভোজন ক'রে রাত ১২টা, ১টা পর্য্যন্ত নানা অবাঞ্ছনীয় আমোদ আহ্লাদে লিপ্ত থেকে স্বর্গপুরী ইন্দ্রের সুখ কল্পনাই তারা করতেন। বাইরের জগতের কথা তাদের ভাববার সময় কোথায় ? রাখালদা ছিলেন এই দলেরই একজন পাণ্ডা ও জমিদারের বিশেষ প্রিয়পাত্র। শোনা যায় এককালে তিনি গৌরবর্ণ সুপুরুষই ছিলেন কিন্তু অত্যাচারে অত্যাচারে আজ তাঁর দেহের রং তামাটে হ'য়ে গেছে। চুলগুলি খাড়া খাড়া উস্কোখুস্কো, কুঞ্চিত কপাল, কটোরাগত চক্ষু। অত্যাচারে অত্যাচারে সারাদেহে এতটুকু লাবণ্যও আর নেই। এমন কি সঠিক বয়স অনুমান করাও কঠিন। রাখালদার এ সংসারে কোন বন্ধনই ছিল না। অতি শৈশবেই পিতামাতার মৃত্যু হয়। বিধবা বৃদ্ধা পিসীর কাছেই তিনি মানুষ। রাখালদার প্রথম পক্ষের স্ত্রী বিয়ের এক বছরের মধ্যেই মারা যান। অসংসারী ও উচ্ছৃঙ্খল ভাইপোটীর জন্য বৃদ্ধা পিসীর চোখের জল ও দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। অনেক অনুনয় বিনয় ও কান্নাকাটি ক'রে পিসী নিতান্ত গরীব ঘরের মেয়ে সরলার সঙ্গে রাখালদার বিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে পিসীও তাঁর ইহজীবনের কর্ত্তব্য শেষ ক'রে পরপারে পাড়ি দিলেন। মাতৃস্থানীয়া এই পিসীর জন্যই ছিল রাখালদার বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক ও আকর্ষণ। হঠাৎ সজাগ হ'য়ে দেখ্‌লেন স্নেহময়ী পিসী তাঁকে চিরজীবনের জন্যই ছেড়ে গেছেন ; রেখে গেছেন শুধু অপরিণত বয়সের বধূ সরলাকে। তাকে বিয়ে করলেও কোন প্রীতির সম্পর্ক গ'ড়ে উঠে নি। বাড়ীর জন্য যেটুকু বা আকর্ষণ ছিল, তাও চুকে

গেল সরলার মৃত্যুর পর। রাখালদা আজ মুক্ত, তার চলা ফেরার কোন কৈফিয়ৎ, কোন জবাবদিহি, আজ আর কারো কাছে দেবার প্রয়োজন নেই। জমিদার বাড়ীতে তার দিন কাটতে লাগল বছরের পর বছর। বৃদ্ধা পিসিমা আজ আর বেঁচে নেই, সুতরাং রাখালদাকে পুনরায় সংসারী করার জন্য মাথাব্যথাও আজ আর কারো নেই। লাগাম-ছাড়া ঘোড়ার মত চলে তার জীবনের কাঁটাগুলি। অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা, অনেক অবৈধ ব্যাপার রাখালদাকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠল। রাখালদার সম্বন্ধে কানাঘুষা অনেক কথাই শোনা যেতে লাগল। হঠাৎ একদিন প্রতিবেশীরা একটি অপরিচিত মহিলাকে তার বাড়ীতে আবিষ্কার করল। রাখালদার সঙ্গে তার সম্পর্ক হঠাৎ কি করে এবং কোথা থেকে এলো তাহা সকলের অজ্ঞাতই র'য়ে গেল। নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে নানা আলোচনা করলেও কেউ সাহস ক'রে রাখালদাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারল না, কারণ রাখালদাকে যে সবাই ভয় করে।

ইতিমধ্যে স্বাধীনতার আন্দোলন মেদিনীপুরের গ্রামে গ্রামে এসে সাড়া দিয়ে গেল। রতনপুরে, গ্রামান্তর থেকে কর্মীরা এসেছেন জাতীয়-বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে, অপরাহ্নে এক বিরাট সভার আয়োজন নিয়ে। পুলিশের তরফ থেকে গ্রামের জমিদারকে এ সভা বন্ধ করার অনুরোধ জানান হল। জমিদার রাখালদার উপর সভা পণ্ড করার ভার দিলেন। হুকুম পাওয়া মাত্র রাখালদা চল্লেন সদলবলে কর্মীবৃন্দের এই অভিযান বন্ধ করতে। গ্রামের মেয়েরা ও পুরুষেরা প্রমাদ গুণলেন; না জানি কি অনর্থ বেধে ওঠে, অথচ রাখালদাকে বাধা দেওয়ার সাহসও কারো নেই; তার একগুঁয়েমি ও একরোখা স্বভাবকে সবাই করে ভয়।

বৃহৎ জনসমুদ্রের একপাশে রাখালদা দলবল নিয়ে হাজির হ'লেন। সভা সবে আরম্ভ হয়েছে; কর্মীবৃন্দের, প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা, স্বাধীনতার বাণী, পরাধীনতার গ্লানি, বিদেশীর শোষণ, দেশের অবস্থা এবং আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য মর্মস্পর্শী আবেদন প্রতি শ্রোতার অন্তর স্পর্শ করল। সভাভঙ্গ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যারা এসেছিলেন তাদের তরফ থেকে কোন প্রতিবাদ এলো না এই আবেদনের বিরুদ্ধে। সভাশেষে সবাই আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখল, স্বেচ্ছাসেবকের তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে র'য়েছে রাখালদার নামটা। জমিদারের কাছে যথাসময়ে পৌঁছল এ-খবর; শুধু তাই নয়, মদের দোকানে রাখালদার পিকেটিং-এর বার্ত্তাও। মদ যার নিত্য সাথী সে যাবে মদের দোকানে পিকেটিং করতে। জমিদার প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না। ডেকে পাঠালেন ম্যানেজারকে। রাখালদা নিজে না গিয়ে শুধু চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন—পূর্ব্ব ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে এবার তার জীবনের নূতন অধ্যায় সুরু হবে। জমিদারের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে গেছে। জমিদার বাড়ীতে সভা বসে; রতনপুরের এ আন্দোলনের কি বিহিত করা যায়। রাখালদার অভাব এ জমিদারের পক্ষে পরম ক্ষতি, একে কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। সঙ্গী, সাথীরা আশ্বাস দিয়ে বলে "রাখালকে জানা আছে। একটা মাস অপেক্ষা করুন, এ মোহ তার কেটে যাবে। আমাদের দল ছাড়া তার আর যাবার যায়গা কোথায়?"

রাখালদার প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে আজ রতনপুর ও আশে-পাশের গ্রামে শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবকের দল গ'ড়ে উঠেছে। রাখালদা এখন আর সেই জমিদার বাড়ীর ইয়ার রাখালদা নেই। গ্রামে গ্রামে ঘুরে যুবকদের নিয়ে কর্মঠ, সত্যাগ্রহী ও কর্মীর দল সৃষ্টি করে, এখন তিনি সকলের রাখালদা। পানাসক্ত উচ্ছৃঙ্খল রাখালদা আর বেঁচে নেই। এখনকার রাখালদা ত্যাগী উদার কর্মী, সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকের আশ্রয়স্থল। আন্দোলনের তীব্রতার জের গ্রামের পর গ্রাম যতই ছড়িয়ে পড়তে লাগল, পুলিশ ততই চঞ্চল হ'য়ে উঠল, কিন্তু রাখালদাকে পায় কোথায়? গ্রামের পর গ্রামে পুলিশের অভিযান ব্যর্থ হয়ে উঠল।

আজ সোমবার, জাতীয় পতাকা উত্তোলন দিবস। কংগ্রেসের নির্দ্দেশমত সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে পতাকা উত্তোলন করতে হবে। সকাল হ'তেই আশেপাশের গ্রাম থেকে মেয়েরা শোভাযাত্রা ক'রে বেরিয়ে এল। পুলিশের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা ক'রে জাতীয় পতাকা হাতে সারি বেঁধে দাঁড়াল সাবরেজেষ্ট্রারী আফিসের সামনে। পুলিশের কোন বাধাই মেয়েদের কর্ত্তব্য-পথ থেকে টলাতে পারল না। তারপর সুরু হ'ল অত্যাচার। ভুলে

গেল বাড়ীতে তাদের মা, বোন, স্ত্রীর কথা। এ কাহিনী রাখালদার কাছে পৌছল যথা সময়ে। রাখালদা আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তার সমস্ত কর্ত্তব্যের ভার সহকর্ম্মীদের হাতে দিয়ে বিদায়ের জন্ত প্রস্তুত হলেন।

আশ্বিন মাস। বর্ষণশান্ত গ্রামটীর উপর সকালের সোণালী রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। শিউলীফুলের মিষ্টি মধুর গন্ধ বাতাসে বয়ে আনছে। নদীর ঘাট আজ লোকে লোকারণ্য।

দুজন কমরেডদের সঙ্গে রাখালদা, এসে পৌছলেন সেখানে। ফুলের মালায় কণ্ঠ আজ আর তাঁর ভরে না, কপালে চন্দনের জয়টিকা। স্বেচ্ছাসেবকেরা নানাপ্রকারের জয়ধ্বনি ক'রে পেছনে পেছনে এল। গ্রামবাসীদের নিকট থেকে করজোড়ে নীরব বিদায় নিয়ে রাখালদা ধীরে ধীরে নৌকায় উঠলেন। সকলের মুখেই বিষাদের ছায়া। নৌকা ছেড়ে দিল, অনুকূল বাতাসে তর্ তর্ ক'রে নৌকা মুহূর্ত্তের মধ্যে বহু দূরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

চাষী-মজদুরের দাবী

শ্রীনিশাপতি মাজি

দেশে প্রকৃত চাষী-মজদুর সঙ্ঘ আজও ভালভাবে গ'ড়ে উঠে নাই। ফলে চাষী-মজদুররা ভূমির দাস হ'য়ে পড়েছে—জমির মালিকদের খামখেয়ালের উপর তাদের জীবন নির্ভর করছে। এতে দেশের ধ্বংস অনিবার্য্য। কেননা আর অধিক দিন চাষী-মজুররা এক-পা জমিতে আর এক-পা কল-কারখানায় রেখে টিকে থাকতে পারবে না। অবিলম্বে জমির মালিকের এবং মূলধনীর শোষণে সর্ব্বহারা হ'তে বাধ্য হবে।

এখন কথা হচ্ছে চাষী-মজদুর কারা? সকলেই বোধহয় জানেন যে সব কৃষক স্বাধীনভাবে নিজের শ্রমের উৎপন্ন ফসলের মূল্য পায় না—কৃষিকাজের সময় জমির উৎপন্ন ফসলের দ্বারা অন্ন সংগ্রহ করতে পারে না—জাবগা জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি ক'রে জমির আইনতঃ অধিকারী হতে পারে না—জমিদারগণ মধ্যস্বত্ব ভোগীদের শোষণের জন্ত এই সব হতভাগাদের লেলিয়ে দেন—এইরূপ কৃষিজীবিদেরই চাষী-মজুর বলা হয়। এদের সংখ্যা কল-কারখানার মজুরদের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক। প্রায় এক কোটী নরনারী বাঙলা দেশে রয়েছে, তাদের মধ্যে আজও কোন বাস্তব আন্দোলন সৃজন হয় নাই। বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন যদি পুনরায় এদের কথা ভেবেচিন্তে কাজে নিযুক্ত না হয় তাহলে সাম্রাজ্যবাদের আশুতায় শ্রেণীস্বার্থ সমস্বার্থের নামেই জবাই হবে।

পশ্চিমবঙ্গের চাষী-মজুরগণ নিম্ননামে পরিচিত। এদের কিরূপে ভূমিদাস করা হয়েছে তারও নমুনা মজুরির পরমাণ মাপে স্পষ্ট বুঝা যায়।

দিন-মজুর। এরা প্রতিদিন নগদ পয়সায় অথবা চাউলের বিনিময়ে মজুরি খাটে। গড়ে প্রায় দশ ঘণ্টা কাজ ক'রে ৸৹ আনা হ'তে এক টাকা মজুরি পায়। স্ত্রী-কন্তাগণও কাজ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু মজুরীর হার ও কাজের অনিশ্চয়তা এত শোচনীয় যে, একমাস কাজ না করতে পারলে অন্ন-বস্ত্র সংগ্রহ করতে পারে না। তখন পেটের দায়ে সব কিছু করতে বাধ্য হয়। যথা—চুরি, ডাকাতি, স্ত্রী-কন্তা বিক্রি এবং নানারূপ প্রতারণাপূর্ব্বক ঋণ গ্রহণও তখন ক'রে থাকে।

মাহিন-দার। জমির মালিকের কাছে দাসখত লিখে দিয়ে কাজে বহাল হয়। হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক এইরূপ ভূমিদাসের দ্বারা জমিতে ফসল উৎপন্ন করান। গরু-বাছুরের মত খেতে পায়। রোগা হ'লে মালিক তাড়িয়ে দেন অথবা দেনা দিয়ে সুদের ও আসলের তাগিদায় আজীবন বেঁধে রাখেন। জেলখানার কালাপাগড়ী কয়েদীর মত বছরে তিন টাকা হ'তে ৮০৲ টাকা পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে। এই টাকার উপর মাহিনদারের সবকিছু নির্ভর করে। ঘর-বাড়ী, বিবাহ-শ্রাদ্ধ, রোগ-বালাই, দায়ে-বিপদ ইত্যাদি।

কৃষাণ। এরা জমির উৎপন্ন ফসলের ।/৪ পাঁচ আনা চার পাইয়ের বিনিময়ে জমির মালিকের জমিতে চাষাদি করে। অবসর সময়টুকু জমির মালিক নানা কৌশলে চুষে নেন—হয়ত শোষণের বেশী সুযোগ করবার জন্য খাবারাদি মাঝে মাঝে দিয়ে থাকেন। তার উপর ধান চাষ করিয়ে ধানের বোল আনার মধ্যে ।/৪ পাই অংশ দেন কিন্তু খড়ের (বিচালী) সে অনুপাতে অংশ দেন না। গ্রামের জমির মালিকরা ছোট বেঁধে ধানের খড় হতে বঞ্চিত করে রেখেছেন। দশ বার বছর যাতে এক জমিতে কৃষিকাজ করতে না পায় তার প্রতি এইসব মালিকরা সজাগ। দিন-মজুরের ন্যায়ই কৃষি কাজ করান কেবলমাত্র বছরের চুক্তিতে।

ভাগীদার। এরা ফসলের ভাগে কৃষাণদের অপেক্ষা ৮ আট পাই হতে ৵৮ দু আনা আট পাই পর্য্যন্ত বেশী পায়। কেননা এদের ফসল চাষের জন্য গরু পালন করতে হয়—বীজ সার প্রভৃতির অর্দ্ধেক অংশ দিতে হয়। যাঁরা ফসলের ।/০ আনা ৷৵০ দশ আনা অংশ জমির মালিক বলে গ্রহণ করেন তাঁরাও কিন্তু বীজ সার প্রভৃতির খরচ আধাআধি চাপ দিয়ে আদায় করেন। বর্গাচাষী বলে স্বীকার করতে হবে এই আশংকায় দু একবছর অন্তর জমি ছাড়িয়ে নেন। জমির অবস্থা ক্রমশঃ দরিদ্রের ন্যায় মলিন হচ্ছে। রসালো ও জোরালো জমির মালিকদের তবু লোভ উত্তর উত্তর বৃদ্ধি হচ্ছে। অনেকে ভাগে চাষ না করিয়ে কৃষাণ দিয়ে জমিচাষ করাচ্ছেন। এমন কি মাহিনদার রেখেও চাষ করবার লোভ ত্যাগ করতে পারছেন না। সমগ্র দিনরাত বাড়তি শ্রমের মূল্য শোষণের জন্য তেতে রয়েছে। অথবা জিভ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছে।

অন্যান্য মজুর। রাখাল বা বাগাল। এরা গরু চরিয়ে গরু পিছু ৵০ দু আনা হ'তে ।০ চারি আনা পয়সা পায়। ছোট ছোট ছেলেরা ভাতের বিনিময়ে গোয়ালে গো-সেবার কাজে বাহাল হয়। গরুর ও ভেড়ার গোয়াল পরিষ্কার করে। সময় মত মাঠে বা নদী তীরে গরু চরিয়ে আনে। সূর্য্য অস্তের সময় খেতে পায়। শীতের দিনে শীতবস্ত্রের অভাবে স্নান করে না। শীতে কেঁপে কেঁপে গরু বাছুরের গোয়ালে খাড় খায়—গৃহী এদের একবারে অস্পৃশ্য করে রাখে। এইরূপ জমির কাজে হেটেলী থাকে। ঢেঁকিতে ভানারীও কম মজুরি নিয়ে ধান হতে চাল তৈরী করে দেয়। অনেক মেয়ে ঘর উঠান ও গোয়াল পরিষ্কার করে ভাত-মুড়ি পায়। অর্থাৎ এক কথায় বলা চলে এই যে সামান্য ভাত ও মুড়ির বিনিময়ে পল্লীর আবালবৃদ্ধ নরনারী মজুর খেটে চলছে, অথচ তাদের বাঁচিয়ে রাখবার ব্যবস্থা অথবা শক্তি বৃদ্ধি করবার উপায় নিজেদের লাভের হার কমবে বলে জমির মালিকরা করছেন না। ফলে চাষ-বাস, ঘরকন্না ও সমাজের নানা সুনিয়ম আজ অতিলোভীদের খেয়ালের জিনিস হয়েছে। পল্লীর মেরুদণ্ড এমন অবাধে ভেঙে পড়ছে। প্রাচীন সংস্কৃতির দোহাই কেউ শুনছে না। শোষণে ও শাসনের ঠেলায় শোষকের মুখে উপদেশ বাণী তাই মজুর ভাইরা শুনতে হলে চম্পট দেয়।

তাই লিখছি বাঙলাদেশে দিন-মজুর, মাহিনদার, কৃষাণ ভাগচাষী প্রভৃতি চাষী-মজুরগণ বৈধ্রবিক শক্তিকে অন্ন-বস্ত্রের আশঙ্কায় লুকিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছে। আজ যুদ্ধের চাপে নবতর সমাজ ব্যবস্থার এবং উন্নততর উৎপাদন ও ধন বণ্টন নীতির প্রবর্ত্তনের জন্য বিপ্লবের ডাক এসেছে। এ সময় আত্মবিশ্বাসহীন অমানুষ মজুরদের সচেতন ক'রে তুললে অসহায় ও অবসাদ ভাব অনেকটা দূর হতে পারে। কিন্তু তার আগে জানা চাই—জমির মালিকের বাস্তবরূপ। জমির মালিক বলতে যাঁরা নিজ লাঙলে নিজ হাতে জমি চাষ করেন তাঁরা নয়। যাঁরা অন্ততঃ ৫০৵ পঞ্চাশ বিঘা জমিতে চাষ করান তাঁদের এবং অসহায় ও অভিভাবকহীন কৃষক পুত্রদের কথাও বলছি না। যাঁরা এর বেশী শত শত এবং হাজার হাজার বিঘা জমির মালিক হ'য়ে কৃষি-মজুরদের রক্তে পুষ্ট হচ্ছেন, তাঁদের কথাই উল্লেখ করছি। এদের অত্যাচারের প্রধান অস্ত্র তিনটী।

প্রথম—শ্রম-শোষণ করেন; তন্মধ্যে প্রধান শোষণ, বেকায় খাটুনী আদায়।

দ্বিতীয়—ফসলের ভাগ-অপহরণ—তন্মধ্যে প্রধান, উৎপন্ন ফসলের অধিক শস্য আদায়।

তৃতীয়—অর্থ-শোষণ—তন্মধ্যে প্রধান, কৃষিকার্য্য নির্বাহের জন্য ঋণ দিয়ে উচ্চহারে আদায়।

উপরি লিখিত শোষণ বন্ধ করবার জন্য একদিকে যেমন থানায় থানায় মজদুর সমিতি কংগ্রেসকে স্থাপন করতে হয়েছে—সেইরূপ বাঙলাদেশের বর্ত্তমানে পতিত হলেও কৃষি-কাজের উপযুক্ত জমি যে ৫১ লক্ষ একর রয়েছে, তা অবিলম্বে চাষী-মজদুরদের প্রদানের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তাছাড়া কর্ষণের অনুপযুক্ত জমি বাদেও পতিত জমি যে ৪৬ লক্ষ একর রয়েছে, তারও কিছু অংশ কৃষি-মজদুরদের দেওয়া যেতে পারে। এই ভাবে প্রয়োজনানুযায়ী যেমন জমির পরিমাণ বাড়ানো যেতে পারে, সেইরূপ জমির উৎপাদিনী শক্তি বাড়াবার জন্য অবিলম্বে ৫০৲ পঞ্চাশ বিঘা অধিক জমির মালিকদের নিকট হতে সরাসরি চাষী-মজদুরদের জমিজায়গা প্রদান করার দিকে জনমত গঠন করা কর্ত্তব্য। এখন প্রধান কথা হচ্ছে বাঙলার মজদুরদের পরিশ্রমের ক্ষমতা হীন হয়েছে বলেই দেশে আশানুরূপ ফসল ফলছে না। দ্বিতীয়তঃ মজদুরগণ ইচ্ছামত জমির উৎকর্ষ সাধন করতে পারে নাই ব'লে ক্রমাগত জমির উর্ব্বরতা নষ্ট হয়েছে। তৃতীয়তঃ অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও মরসুমী আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে কি প্রকারে মজদুরগণ নিজদের কল্যাণ সাধন করবে? অপর আর একটী প্রশ্ন হচ্ছে মূলধনীদের টাকার অভাবে কৃষিকাজ কী চলতে পারে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে লাভ ও পড়তা ধ'রে বাড়তি আয়ের জন্যই মালিকরা একাজে লেগে আছেন। মজদুর সমিতিকে লাভের বহরটাকে এক্ষেত্রে দেখিয়ে দিচ্ছি। তার আগে ব'লে রাখছি মজুরদের কদর ও চাহিদা নষ্ট করবার জন্য মূলধনীরা অনেক সময় বাঙলার বাইরের মজুর আমদানী করেন। তারপর বাড়তি মূল্য পরিমাণ মত উৎপন্ন করবার জন্য মজুর খাটাতে সুরু করেন। এতে মজুরের মজুরীর হার মালিকের সুবিধামত থাকতে বাধ্য হয়। অপর দিকে বাড়তি মূল্য পাওয়া মাত্রই মূলধনীরা নীরব থাকেন না, পুনরায় শ্রম-শক্তি ক্রয় করবার জন্য নানাভাবে মূলধনকে নিযুক্ত করেন। এমন কি অধিক পরিমাণ ভূমিদাসকে খাটাবার জন্য অনাবাদী-ভূমিকে আয়কর জমি জায়গায় পরিণত করেন। সেখানে মজদুররা একশত টাকা উৎপন্ন করে শতকরা কুড়ি টাকা ও খাদ্যবস্ত্রের মূল্য পায় না অর্থাৎ দিনরাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে সব মজদুর যে পরিমাণ মূল্য পায় তার চারগুণ অধিক বাড়তি মূল্য মূলধনীরা পেয়ে থাকেন। এইভাবে দেশের মজদুরগণ জীবন যাত্রা নির্বাহ করে বলেই অন্নের অভাব এবং ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বিগত দুর্ভিক্ষ এইরূপ মূলধনীদের বিশেষ সহায়তা করেছে। তারই বিষময় ফলে মজদুরদের শিরদাঁড়া একবারে ভেঙে পড়েছে। এজন্য তৎপর উৎপাদনের জমি, বলদাদি, সার, বীজ ইত্যাদি যাবতীয় উপকরণ মজদুরদের হাতে তুলে দিতে হবে। নতুবা চাষী মজুরদের শুধু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব হবে না—ক্রীতদাস হতে হতে এরা একেবারে সর্ব্বহারা হ'য়ে কৃষিকাজে ইস্তফা দিবে। প্রভুর অধীন রেখে শ্রমিকদের শ্রমের উপর বাঙালী সমাজ আর অধিকদিন নির্ভর করতে পারবে না। অর্থনীতির দিক থেকে এর বিচার করলেও স্বীকার করতে হবে সরকার ও জমির মালিক যে পরিমাণ লাভবান হচ্ছেন, তার অধিক পরিমাণ লাভ শ্রমিকদের সুখ শান্তি পূর্ণ কৃষিশিল্প দ্বারা করতে পারবেন। কিছুদিন আগে বঙ্গীয় সরকারের উদ্যোগেই বাঙলার জমিদারী ক্রয় সম্বন্ধে একটা জনমত গ'ড়ে উঠেছিল। এই সময়ে অনেকে মনে ক'রেছিলেন রায়তদের বর্গা অধিকারকেও সরকার বাহাদুর ক্রয় করবেন। অর্থাৎ সরকারের খাস প্রজা গণ্য হয়ে মজদুররা কৃষি কাজ করতে পারবে। কিন্তু সাতমন তৈলও পুড়লো না এবং শ্রীরাধার উদ্দেশ্যে নৃত্যও দেখা গেল না। চাষীমজুরদের দিকে দুপক্ষের মতামত একটু তুলনা করলে বিষয়টা আরো সুস্পষ্ট হয়।

সরকার পক্ষের স্পেশ্যাল অফিসার মিঃ গার্ণার রিপোর্ট দাখিল করলেন এইরূপ—

"রায়তের বর্গা অধিকার ক্রয় বাদ দেওয়া উচিত।"

জমিদার পক্ষের স্যার বিজয়চাঁদ মহাতব লিখলেন—

"যদি রায়তবর্গের বর্গাজমি জমিদারী ক্রয়ের পরিকল্পনা থেকে বাদ পড়ে তাহলে জমিদারবর্গের খাস জমি অক্ষুণ্ণ থাকবে।"

মৌলবী ফজলুল হক (প্রধান মন্ত্রী) পরীক্ষা স্বরূপ বাঙলা

দেশের একটী জিলার জমিদারী ক্রয় করবার জন্য ঘোষণা করেছিলেন—

"গভর্ণমেণ্ট প্রথম শ্রেণীর সর্ত্ত প্রকারের খাজনা সংগ্রাহকের অধিকার ক্রয়ের নীতি গ্রহণ করেছেন। আপাততঃ বর্গাপ্রথা অক্ষুণ্ণ থাকবে।"

অর্থাৎ মজুরদের পরিশ্রমের ষোল আনা মূল্য সরকার জমিদার ও জমির মালিকগণ মোটেই ছেড়ে দিতে রাজী নন। নানা অজুহাতে রকমারি যুক্তির দ্বারা মজুরদের শ্রমকে মালিকের দ্বারস্থ করে জমিদার—তথা সরকার এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজগণ লাভবান হ'তে চান। কিন্তু সরকার যদি বিলাতের মত মজুর-সরকার হন, তাহ'লে দ্বাবতীয় দাসত্বের বন্ধন হতে মুক্ত করতে চাইবেন। আর প্রভু-মালিক ও জমিদারগণ শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য বুঝবেন। বিলাতের মজুর-সরকার কথাটা এক্ষেত্রে ব্যবহার না ক'রে রাশিয়ার উপমা দিলেই হয়ত ভাল হ'ত। কিন্তু মেকিই হোক আর খাঁটীই হোক কিছু যায় আসে না—উপমার ক্ষেত্রেই বিশ্লাত সরকারের (বর্ত্তমান) উল্লেখ করা হলো। কেননা সকলকেই স্বীকার করতে হচ্ছে আগে স্বাধীনতা তারপর সমাজ ব্যবস্থা, আইন-কানুন ও অর্থ-উন্নতির পরিকল্পনামূলক কৃষিশিল্প কাজ। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া যেমন মজদুররাজ স্থাপন করা বাতুলতা, সেইরূপ মজদুরদের ভূমিদাস হতে মুক্ত না করলেও জাতি প্রকৃত স্বাধীন হতে পারবে না। আজ এই জনমত গ'ড়ে তুলবার জন্য চাষী মজুরদের সচেষ্ট করা প্রয়োজন। এতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভাল হতে পারে। একশ্রেণীর চেতনায় সমস্বার্থের মর্য্যাদাও লাভ হয়। দেশে প্রকৃত চাষীমজদুর আন্দোলন গ'ড়ে উঠে নাই। ফলে চাষীমজুররা জমি ছেড়ে হু-হু শব্দে কল-কারখানায় হাজির হচ্ছে। যারা ভূমিদাস হ'য়ে গ্রামে রয়েছে, তারা সর্ব্বহারার মতই জীবন যাপন করছে।

জাতীয় পতাকা ও লাল পতাকা

শ্রী :—

একজন সমাজতন্ত্রী বন্ধু বলেন "জাতীয় পতাকার সঙ্গে লাল পতাকার বিরোধ প্রকৃতিগত"। তিনি আরও বলেন—ইংলণ্ডে থাকার সময় আমি দেখেছি লাল পতাকাধারী মিছিলের সঙ্গে ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকাধারী মিছিলের সংঘর্ষ, একে অন্যের পতাকা ছিঁড়ে দিচ্ছে অপমান করছে। আমাদের দেশে বিশেষ অবস্থার জন্য জাতীয়পতাকার পাশে লালপতাকা দেখছি, কিন্তু এদের মধ্যে লুকোন রয়েছে এদের প্রকৃতিগত বিরোধ।"

সমাজতন্ত্রী হিসাবে তাঁর এই কথা কি আমরা স্বীকার করতে পারি? নিশ্চয়ই না।

ইংলণ্ডের জাতীয়তাবাদ অনেকদিন আগেই সাম্রাজ্যবাদের রূপ নিয়েছে ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক। কাজেই বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের প্রতীক লালপতাকার সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল ইউনিয়ন জ্যাকের সংঘর্ষ অনিবার্য্য। কিন্তু ইউনিয়ন জ্যাক এবং আমাদের জাতীয় পতাকার প্রকৃতি কি এক? এর উত্তর সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যদি আমাদের জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক role সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে। আমাদের সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ আঘাত করেছে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে যে সাম্রাজ্যবাদের মূল খুঁটি হচ্ছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। সেইজন্য আমাদের জাতীয়তাবাদ সুস্পষ্টরূপে প্রগতিশীল ও বিপ্লবী। কাজেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের প্রতীক আমাদের জাতীয় পতাকাকে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী জাতীয়তাবাদের প্রতীক ইউনিয়ন জ্যাকের সঙ্গে কি করে তুলনা করা যেতে পারে?

ভারত তথা পরাধীন দেশগুলির জাতীয় পতাকার সঙ্গে প্রকৃতিগত ঐক্য যে পতাকার আছে সে ইউনিয়ন জ্যাক নয়—সে লাল পতাকা—কেন?

পশ্চিমের অগ্রগামী দেশগুলির শ্রমিক আন্দোলনের

প্রতীক লালপতাকা। এই শ্রমিকগণের মুক্তি সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। আমাদের জাতীয়তাবাদী মুক্তি সংগ্রামও তাই। শ্রমিক বিপ্লব ও জাতীয়তাবাদী বিপ্লব আজ এক অবিচ্ছেদ্য সংগ্রামে জড়িত,—এই সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। এই জন্যই আমাদের জাতীয়পতাকার সঙ্গে লালপতাকার প্রকৃতিগত ও অবিচ্ছেদ্য ঐক্য অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—আমাদের আনুগত্য কি তা হলে জাতীয় পতাকা ও লালপতাকা উভয়ের কাছেই থাকবে? এর একমাত্র ও সুস্পষ্ট উত্তর হচ্ছে—না।

দু জায়গায় আনুগত্য স্বাভাবিক নয় এবং সেইজন্য তা সত্য হতে পারে না। জাতীয়পতাকা ও লালপতাকাকে পাশাপাশি রেখে উভয়ের কাছে যারা আনুগত্য ঘোষণা করতে চায় তাদের এরকম অস্বাভাবিক আচরণের কারণ হচ্ছে—(১) কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসবার ক্ষমতা তাদের নাই এবং সেইজন্য জোড়াতালি দিয়ে চলতে চায়, অথবা (২) তারা যা বলে তা সত্য নয়, আসলে তাদের আনুগত্য একটি পতাকার কাছেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে তা হলে ভারতের সমাজতন্ত্রীদের অবিচ্ছেদ্য আনুগত্য কোন্ পতাকার কাছে থাকবে। এর উত্তর মোটেই অস্পষ্ট থাকেনা যদি আমরা এই বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা রাখি যে আমাদের সংগ্রাম হচ্ছে জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম। আমাদের চলতে হবে সেইজন্য জাতীয় পতাকার তলায়। এখানে আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে ভুল ধারণা রাখা চলবে না। আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন কেবলমাত্র বিদেশী শোষণের উচ্ছেদের জন্য নয়—এর উদ্দেশ্য জনসাধারণের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক।

কংগ্রেস একথা একাধিকবার বলেছে। গান্ধীজীর শেষ-কথা হচ্ছে "কৃষক-শ্রমিক-প্রজা-রাজ"। এইটাই স্বাভাবিক। জাতীয় বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার দিন শেষ হয়েছে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী বিপ্লব ধনতন্ত্রী রূপ নিয়েছে। যেমন আমেরিকা ও ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রাম। কিন্তু তখন ছিল ধনতন্ত্রবাদের উন্নতির সময়। কাজেই তখন জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম অথবা গণতন্ত্রী বিপ্লব ধনতন্ত্রেরই প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে যখন ধনতন্ত্রবাদের শেষমূর্তি সাম্রাজ্যবাদ জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে তখন জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম যদি গণ-বিপ্লবের ভিতর দিয়ে সফল হয় তা হ'লে এই বিপ্লবের সমাজতন্ত্রী রূপ নেওয়া স্বাভাবিক। চীনের মুক্তি সংগ্রামের মধ্যে সমাজতন্ত্রী শক্তি সুস্পষ্ট। আমাদের মুক্তিসংগ্রামও আজ কংগ্রেসের নেতৃত্বে সুস্পষ্ট সমাজতন্ত্রী রূপ নিচ্ছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিশিষ্ট অংশ হচ্ছে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতীক জাতীয় পতাকা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনেরও প্রতীক। পশ্চিমের মুক্তিকামী শ্রমিকের লাল পতাকাকে আমার অভিবাদন জানাই, কিন্তু ভারতের সমস্ত মুক্তিকামী সৈনিক জড় হবে একটিমাত্র পতাকার তলে—সে হচ্ছে ভারতের জাতীয় পতাকা।

ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা

[বোম্বে ক্রনিকল যাঁরা নিয়মিত পাঠ করিয়া থাকেন ১৯৪৫ সালের ১২ই আগষ্ট সংখ্যায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখিত এই পত্রটি তাঁরা পড়িয়াছেন, বোম্বে ক্রনিকল পত্রিকায় উর্দু অনুবাদ বাহির হইয়াছে আমরা ইংরাজী হইতে বাংলায় অনুবাদ করিলাম। এই চিঠিখানা ১৯৪২ সালে গ্রেপ্তারের পরই আবুল কালাম আজাদ লিখিয়াছিলেন—আশা করি অনুবাদ হইলেও গ্রাহকদিগের ভাল লাগিবে।——মঃ সঃ]

প্রিয় সাদিক,

আজমল খাঁ যাত্রা পথে ৩১। আগষ্ট তোমাকে লেখা চিঠি-খানা ডাকে দেবার জন্য কারুর হাতে দেবার সময় পাইনি কাল পর্য্যন্ত বোম্বে শহরের বিস্তৃত পরিধির মধ্যে। কিন্তু আজ আহমেদনগর কেল্লার প্রাচীর-অন্তরালে সংকীর্ণ গণ্ডীটার মধ্যে বন্দী হোয়েও অফুরন্ত সময় আর অদম্য কর্ম্মস্পৃহা অনুভব কোরছি।

নয় মাস আগে ১৯৪১ সালের ৯ঠা আগষ্ট নাইনি সেণ্ট্রাল জেলের দরজা খুলে গিয়েছিল আমাকে বাইরে বার করার জন্য। গতকাল ৯ই আগষ্ট, ১৯৪২ সাল—২-১৫ মিনিটে পুরাতন আহমেদনগর কেল্লার লৌহ কপাট—আমাকে ভিতরে ঢুকিয়ে রুদ্ধ হোয়ে গিয়েছে। বিচিত্রময়ন, বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবী নিত্য কত নূতন দরজা রুদ্ধ হবার জন্য খুলে যায়, আবার খোলার জন্যই কত দরজা রুদ্ধ হোয়ে যায়। 'ন' মাস খুব দীর্ঘ সময় নয়। স্বপনপুরীর কয়েকটি স্বপ্নময় মুহূর্ত্তের মতই মনে হয়। কিন্তু যখনই আমি চিন্তা করি মনে হয় ইতিহাসের একটি ঘটনার সমাপ্তি ঘটেছে। সময় কখন আসবে, আজ যে ঘটনা নতুন কোরে সুরু হলো তার পরিসমাপ্তি হবে।

৪ঠা আগষ্ট যখন বোম্বে পৌঁছাই মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা ছিল, ইনফ্লুয়েঞ্জার দরুণ টেম্পারেচারও ছিল, পৌঁছোবার পরেই কাজে ব্যস্ত হোয়ে পড়ি। যতই অসুস্থ বোধ করি না কেন, সময়-তালিকার পরিবর্ত্তন ভাল লাগে না। ৪ঠা থেকে ৭ই পর্য্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হতে থাকে। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ৭ই আগষ্ট বিকালে বৈঠক ডাকে। আলোচনার বিষয় এত ছিল যে, তিন দিন পর্য্যন্ত বৈঠক চলতে পারতো কিন্তু দু'দিনের বেশী চালাতে আমার ইচ্ছা ছিল না—তাই ৪ঠা আগষ্ট বেলা ২টো থেকে রাত ১১টো পর্য্যন্ত অধিবেশন চালিয়ে ঐ দিনই কাজ শেষ করি।

ক্লান্ত শরীরে বাড়ী ফিরে দেখি গৃহস্বামী আমার জন্য অপেক্ষা কোরছেন, উদ্বিগ্নও কিছুটা। এই ভদ্রলোক ক'দিন থেকে অসুস্থ ছিলেন, মানসিক অশান্তিও ছিল। তাঁর সঙ্গে আলোচনা ক'রে তাঁর উদ্বেগ বাড়িয়ে লাভ নেই মনে কোরে আমি তাঁর সঙ্গে বিশেষ আলোচনা চালালাম না। তিনি সম্প্রতি কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন, তাঁর পদত্যাগ মঞ্জুর না কোরলেও ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তাঁকে ডাকা হয়নি। তিনি বল্লেন, কে কে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরতে এসে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা কোরে একটু আগে চলে গিয়েছেন। বলে গিয়েছেন ঘর-পাকড়ের খবরটা নেহাৎ ভিত্তিহীন নয়। বিশ্বস্তসূত্রে নাকি জানা গিয়েছে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক, ঐ রাত্রেই যা কিছু ঘটবার ঘটবে।

দুই মাস আগে থেকে এই গ্রেপ্তারের গুজব এত বেশী চলছিল যে, শুনে শুনে বিরক্ত হোয়ে গিয়েছিলাম। ভাবলাম ভদ্রলোকের চিন্তা বাড়িয়েই বা লাভ কি? তাই সুচস্বরে বল্লাম "যা যা ঘটেছে তার থেকে এইসব গুজব রটবেই, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করার দরকার কি? আমাদের মাথা ঘামানোরও কোন প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে কিছু খেয়ে শুয়ে পড়া যাক। যেটুকু পারি বিশ্রাম নিইগে।"

প্রতিদিনকার অভ্যাসানুযায়ী ৪টার সময় উঠলাম। বড় ক্লান্ত বোধ হচ্ছিল, মাথার যন্ত্রণাও খুব। চা পান কোরে জেনাস্পিরিণের দুটো বড়ি খেয়ে নিলাম, গতকালের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রেসিডেন্ট কয়তেন্ট এবং অন্যান্য কয়েকজনকে কয়েকটা জরুরী চিঠি লেখার জন্য কলম নিলাম হাতে। রাত্রির তমিস্রা ভেদ কোরে অদূরে সমুদ্রে জোয়ারের জল দেখা যায়, ঢেউগুলি ফুলে আছাড় খেয়ে পড়ছে, সমুদ্রতীর থেকে কেমন একটা ঠাণ্ডা মনো হাওয়ার ঝাপটা গায়ে লাগছে। কিছুটা জেনাস্পিরিণের গুণ এবং কিছুটা ভোরের হাওয়ার মৃদু পরশে

আমার মাথার যন্ত্রণা কিছু কম বোধ হচ্ছিল, কেমন একটা তন্দ্রাবেশে চোখ জড়িয়ে আসছিল।

"ধন্য তুমি প্রভাতে সমীর।"

কলমটা রেখে বিছানায় শুয়ে পড়তে বাধ্য হ'লাম। মনে হ'ল রাস্তায় মোটর গাড়ীর আওয়াজ শুনলাম যেন। দেখলাম বাড়ীর প্রাঙ্গনে গাড়ী ঢুকে গৃহস্বামীর ছেলে ধীরুর বাংলোর দিকে গেল। স্বপ্ন হবে হয়তো। তন্দ্রাচ্ছন্ন হোয়ে পড়লাম।

১৫।২০ মিনিট এইভাবে কেটেছে কিনা জানিনা, টের পেলাম পায়ে কে ঠ্যালা দিচ্ছে। চোখ মেলে দেখি ধীরু হাতে একটা কাগজ নিয়ে দাঁড়িয়ে। বল্লো আমাকে—দুইজন মিলিটারী অফিসার ও দু'জন ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ এই কাগজটা এনেছে। বুঝতে বাকী রইলোনা কিছু, তবু ভাল কোরে দেখার জন্য কাগজটা হাতে নিলাম।

ধীরুকে বল্লাম তৈরী হতে এক ঘন্টা লাগবে। তাদের অপেক্ষা কোরতে বলে যেন। স্নান সেরে, জামা কাপড় প'রে কয়েকখানি চিঠি লিখলাম। বাইরে যখন এলাম তখন পৌনে ছ'টা। ভোরের আলো হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানালো। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা লুটোপুটি খাচ্ছে। ভোরের বাতাস যেন বাগানের ফুলগুলি থেকে মৃদু সুবাস বহন ক'রে সমুদ্রের দিকে বইছিল আর চারিদিকে একটা মিষ্টি আমেজ ছড়িয়ে দিচ্ছিল, একজন অতিথি পাশ কাটাবার সময় হাফিজের কয়েকটি লাইন মনে করিয়ে দিলেন।

ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে যখন মোটর পৌঁছালো লোকাল ট্রেণগুলি ছাড়বার সময় হ'য়ে গেলেও প্যাসেঞ্জারদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না। চারদিকে মিলিটারী পুলিশ মোতায়েন আছে। মাত্র একটি প্ল্যাটফরমে ইঞ্জিনের ঘস্ ঘস্ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ইঞ্জিনটা একটা রেষ্টুরেন্ট-কার টেনে এনে ট্রেণের সঙ্গে জুড়ে দিল। এটা একটা স্পেশাল ট্রেণ। আমাদের মত বন্দীদের জন্য ঠিক করা হোয়েছে। এক কামরা থেকে অপর কামরায় যাতায়াত করবার জন্য লম্বা বারান্দাযুক্ত গাড়ী দাঁড় করানো ছিল। ভিতরে ঢুকে দেখলাম বেশ ব্যাপক ভাবেই গ্রেপ্তারটা হ'য়েছে। প্রায় সবাই এসে গিয়েছেন। যাঁরা আসেননি তাঁরাও আসতে আরম্ভ কোরেছেন একে একে। কয়েকজন ভদ্রলোক যাঁরা আমার আগে এসেছিলেন তাঁদের চোখে মুখে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির ছাপ। কেউ কেউ অনুযোগ করলেন যে, রাত দুটোর সময় শুয়ে চারটের সময় উঠতে হোয়েছে। কেউ বল্লেন এক ঘন্টার জন্যও বিশ্রাম নিতে পারেননি তাঁরা। আমি বল্লাম আমাদের নিদ্রিত ভাগ্য-দেবী সত্যসত্যই জেগেছেন কি?

সময় এগিয়ে চলেছে। অনুযোগ অভিযোগে লাভ নেই। সঙ্গেই রেষ্টুরেন্ট-কার ছিল। আমরা চা পান করবো কি না জিজ্ঞাসা করলো। আমি ও-কাজ আগেই সেরেছিলাম, কিন্তু আবার চেয়ে পাঠালাম। তন্দ্রাতুরদের রাত্তের নেশার ঘোরটুকু ভোরের পেয়ালায় ভাঙিয়ে দেবার জন্য চায়ের আহ্বান করলাম। সকাল এবং সন্ধ্যার মধ্যে ঘটনা প্রবাহের কি ভিন্ন গতি! যে-দল সন্ধ্যায় একটা আবেগময় আবেষ্টনীর মধ্য থেকে মাত্র রাত পর্য্যন্ত তার জের টেনেছে কিন্তু এখন কোথায় সেই আবহাওয়া, সেই মাদকতাই বা কোথায়? রাতের সেই উৎসাহ উদ্দীপনার স্থানে সকালে একটা অবসাদ এসে ঘিরে ধ'রেছে! রাত্তে যে সুরের রেশটুকু মনের তন্ত্রীতে ঘা দিয়েছিল ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই তা কোথায় মিলিয়ে গেল। সে সুর আর বাজলো না। কেমন একটা বিভ্রান্ত ভাব। সকালের তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটাও রাতের বিক্ষিপ্ততার মতই গভীর। রাত ভোর উৎসাহ উদ্দীপনার পর সকালে এই অবসাদ অনুভব করলে আমাদের দুঃখের কিছু ছিল না, কারণ তা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দুঃখ এই যে, যা ঘটবার তা যদি ঘটতো আমাদের হৃদয়ের পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রকাশ হতো।

তখন প্রায় সাড়ে সাতটা। ট্রেন ছাড়বার সঙ্কেত-ধ্বনি শোনা গেল। বিখ্যাত হাফিজের লাইনগুলি আমি হাজার বার পড়েছি কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এর পূর্ব্বে এমন কোরে এর মর্ম্ম উপলব্ধি করি নি।

আমাদের গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে আমাদের গ্রেপ্তারের গুজব প্রচারে বোম্বেতে আগা খাঁ প্যালেসের নাম বহুবার উল্লিখিত হোয়েছে। ট্রেনটা কল্যাণ স্টেশন ছাড়িয়ে যখন পুণার দিকে চলতে লাগলো প্রত্যেকেই ভাবলেন পুণা এসে গিয়েছে। আমাদের কয়েকজন সঙ্গীকে জনশূন্য ছোট ষ্টেশনে নামিয়ে দিল। এমন কি বোম্বের স্থানীয় জুসেরও নামতে বল্‌ল।

আমাদের কিছুই কেউ বলল না। আবার হুইসল বেজে উঠলো। ট্রেন ছেড়ে দিল।

পুণাতেও যখন আমাদের ট্রেন থেকে নামালো না, তখন প্রত্যেকেই আমেদনগর কেল্লার কথা বলতে লাগলেন। কারণ, এদিকে আমেদনগর ছাড়া আর কিছু ছিল না। একজন ভদ্রলোক এ-অঞ্চলে থাকেন তাঁর মুখে শোনা গেল পুণা থেকে আমেদনগরের দূরত্ব ১০৮০ মাইলের বেশী নয়। ওখানে পৌঁছতে আমাদের আর দু'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা লাগবে মাত্র। চিন্তার গতি ছিল বিদ্যুৎ গতি। আমেদনগর অদূরে। শীগ্‌গীরই পৌঁছে যাব আমরা, কিন্তু আমাদের যাত্রা আমেদনগরেই শেষ হবে—না, নূতন কোরে যাত্রা সুরু করব আমরা? নিজেই আশ্চর্য্য হোয়ে যাচ্ছিলাম ভারতের ইতিহাস প্রসিদ্ধ সমস্ত স্থানগুলিই আমার দেখা হোয়েছে শুধু আমেদনগরে আসার সুযোগই পাইনি কখনও।

বোম্বে থাকা কালীন এক সময়ে ওখানে যাওয়া স্থির কোরেছিলাম কিন্তু ঘটনাচক্রে হোয়ে ওঠেনি। ভারতের অন্যান্য প্রসিদ্ধ জায়গার মত আমেদনগরও অনেক শতাব্দীর বৈচিত্রিক ইতিহাসে জড়িত। পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়ার নদীর তীরে ঠিক এই নামে একটা ছোট সহর ছিল। ১৫শো শতাব্দীর শেষ ভাগে তামিরাজ ক্ষমতাহীন হোয়ে পড়লে মালিক আহম্মদ নিজামুল্ক ভেরী ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তিনিই তামি নদীর তীরে আমেদনগর কেল্লার পত্তন করেন। আর জুনার পরিবর্ত্তে এই-খানেই রাজধানী করেন। সেই থেকে নিজাম সরকারের রাজধানী রূপেই ব্যবহার হোয়ে আসছে। ফারিস্তা (Farishta)—যিনি সপরিবারে বিজানডুর্গ থেকে চ'লে এসে এইখানে বসবাস কোরেছিলেন লিখে গেছেন যে, কয়েক বছরের মধ্যে এই স্থান বাগদাদ এবং কাইরোর তুল্য বৃহৎ এবং জনবহুল হোয়ে পড়ে।

মালিক আহম্মদ খাঁ যে-কেল্লা তৈরী করান তা মাটির দ্বারা তৈরী হয়। তাঁর পুত্র বার হাম নিজাম শাহ এটা নষ্ট ক'রে পাথরের গাঁথুনী দেওয়ান। এটা এত শক্ত এবং দৃঢ় হোয়েছিল যে, ইরাণ ও ইজিপ্ট পর্য্যন্ত এর যশ ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮০৩ সালে দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র যুদ্ধে জেনারল ওয়েলেসলি যিনি পরে ডিউক অব ওয়েলিংটন পদ প্রাপ্ত হন এটা পরীক্ষা কোরে দেখেছিলেন যে, ৩ শতাব্দীর আক্রমণ ও অত্যাচার সহ্য করার পরও এর শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে। তিনি লিখেছেন দাক্ষিণাত্যে যতগুলি কেল্লা আছে, তার মধ্যে মাত্র তেলোর কেল্লা এর কাছে দাঁড়াতে পারে। এই আমেদনগর কেল্লারই পাষাণ প্রাচীরে খোদিত বার হাম নিজাম শাহর ওরসী চাঁদ বিবির বীরত্ব গাঁথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কালির আঁচড়ে স্থান লাভ কোরেছে।

দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস এবং নাথ ওয়াতি বর্ণিত আবদুর রাহেম খাঁর বীরত্ব কীর্ত্তি এই আমেদনগর কেল্লাতেই সম্পন্ন হয়। যখন বিজাপুর গোলকুণ্ডার সৈন্য সামন্ত আমেদনগরকে সাহায্য কোরতে আসে এবং খান খানার সৈন্যসামন্ত সুহেল খানির বিরাট সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে রত হয়, দৌলত খাঁ লোদী জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন—"অনুগ্রহ কোরে বলুন কোথায় আপনাকে পাওয়া যাবে।" খান খানা জবাব দেন—"কবরের তলে।"

আমেদনগর কেল্লার নামে অতীতের বিস্মৃতপ্রায় অনেক স্মৃতিই মনের মধ্যে আলোড়ন তোলে। ট্রেন খুব দ্রুত ছুটে চলেছে। মাঠের পর মাঠ নিমেষে পার হোয়ে যাচ্ছে। ঠিক মনের গতিও ঐরকম দ্রুত। কত চিন্তা আসছে যাচ্ছে। ভাবছিলাম ঐটাই যদি আমাদের অন্তরীণের জায়গা হয় তাহলে স্থান নির্ব্বাচনের প্রশ্ন আসে না।

প্রায় দুটার সময় আমরা আমেদনগরে পৌঁছলাম। ষ্টেশনের চারিদিক নিস্তব্ধ। কয়েকজন মিলিটারী অফিসার ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাদের মধ্যে ক্যাণ্টনমেণ্টের কমাণ্ডার ছিলেন। আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। আমরা নেমেই তৎক্ষণাৎ যাত্রা করলাম। ষ্টেশন থেকে কেল্লা পর্য্যন্ত সোজা রাস্তা। রাস্তার কোথাও মোড় ঘুরতে হয় না। মনে হলো আমাদের লক্ষ্যপথও এমনই একটানা সোজা, এ পথে একবার পা দিলে আর ফেরার রাস্তা নেই। যদি কেউ ফিরতে চায় সে পিছন ফিরবে মাত্র কিন্তু সুরুতেই এখানে সে পথ রুদ্ধ।

ষ্টেশন থেকে কেল্লা মাত্র ১০ কি ১৫ মিনিটের রাস্তা। প্রথমেই কেল্লার চূড়াগুলি নজরে আসে। তারপরই কয়েক মিনিটে ওখানে পৌঁছানো গেল। এখন মাত্র একটি

পদক্ষেপের মধ্যে কেল্লার বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে কেল্লার ভিতরের দুনিয়া আলাদা হোয়ে যাবে। চক্ষের পলকে সে ব্যবধানও ঘুচে গেল। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় আমাদের প্রত্যেকটি যাত্রার মধ্যেই এই সত্য নিহিত আছে। জীবন-মৃত্যুর যাত্রা পথেও একটি মাত্র পদক্ষেপেরই ব্যবধান।

আবদুল ফজল বর্ণিত ৪০ গজ চওড়া এবং ১৪ গজ গভীর পরিখা—যাকে জেনারল ওয়েলেসলি ১০৮ফিট চওড়ায় পরিণত অবস্থায় দেখেছিলেন; আমরা দেখতে পেলাম না। সম্ভবতঃ যে পথে আমরা প্রবেশ কোরেছিলাম সেই জায়গাতেই ছিল, বুজিয়ে দেওয়া হোয়েছে। ভিতরের প্রাচীর ঢাকবার জন্য বাইরে যে স্তূপীকৃত মাটির বাঁধ ছিল তাও দেখা গেল না। প্রথমে আমরা একসার মোটরলরী তার পর ট্যাঙ্ক বাহিনী অতিক্রম কোরে গেলাম। আমাদের গাড়ী এসে থামলো কেল্লার প্রাঙ্গনে। এখানকার জমি কেল্লার অন্যান্য জায়গার চেয়ে বেশ খানিকটা উঁচু।

আমাদের নামতে বলা হোল। বোম্বে থেকে আমাদের সঙ্গে যে পুলিশের আই. জি. এসেছিলেন এখানকার ও. সির. কাছে আমাদের নামের তালিকা দিলেন। ঐটা নিয়ে তিনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। জেলের নিয়ম এই। এখন আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব বোম্বে গভর্ণমেণ্টের হাত থেকে মিলিটারী বিভাগে চলে গেল। নূতন জগতে প্রবেশ করলাম আমরা। দরজা দিয়ে ঢুকে প্রথমে ত্রিকোণা প্রাঙ্গন ২০০ ফিট চওড়া এবং ১৪০ ফিট লম্বা। মাঝখানে খানিকটা খোলা জায়গা। তারপর ৩টা ব্যারাকে কতকগুলি ঘর। ঘরের সামনে একটা বারান্দা। তারপরই খানিকটা খোলা জায়গা। ময়দান বলা চলে না অবশ্য। যাই হোক, বন্দীদের কাছে এটা খোলা জায়গারই সমতুল্য। কেউ এখানে এলে মনে করবে যে খোলা জায়গায় এসেছে। আর পায়চারী করার পক্ষে যথেষ্ট এই জায়গাটা।

প্রাঙ্গনের মাঝে একটা ঘেরা জায়গায়, একটা ধ্বজাস্তম্ভ রয়েছে। পরনে নেই, স্তম্ভটার উচ্চতা মাপবার জন্য মাথা তুলতেই মনে হলো স্তম্ভটা যেন বলছে—

"এইখানে তোমরা দুঃখের গভীর অনুভূতি পাবে।"

উত্তর কোণে একটা পুরানো জীর্ণ সমাধি-স্তূপ দেখা যায়। মাঝে গোলা গাছগুলি বৃথাই চেষ্টা কোরেছে—এর উপর ছায়া বিস্তার করবার জন্য। স্তূপের মাথার দিকে একটা কুলুঙ্গি মতন আছে। সেখানে কোন প্রদীপ নেই কিন্তু জায়গাটার ধোঁয়াটে রঙ দেখে বোঝা যায়—এক কালে সেখানে প্রদীপ জলতো।

এটা কার সমাধি জানা যায় নি। চাঁদ বিবির নয়, কারণ কেল্লার বাইরে একটা পাহাড়ের উপর তাঁর সমাধি-স্তূপ আছে। যাই হোক খুব নগণ্য ব্যক্তির সমাধি নয়,কারণ তাহ'লে কেল্লার অন্যান্য ঘরগুলির সঙ্গে এটাও নষ্ট ক'রে ফেলা হোত। এই প্রাণহীন মায়াপুরীতে আজ জীবনের চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। আমাদের মত বন্দীদের চীৎকার, হট্টগোলে ভ'রে উঠবে ব'লেই যেন এই সমাধিক্ষেত্র জনশূন্য হোয়েছিল একদিন।

দক্ষিণের ঘরগুলি সব গোলা, আতিথেয়তায় পূর্ণ যেন। এই লাইনের প্রথম ঘরখানি আমার। ঘরে ঢুকেই আমার প্রথম কাজ হলো সন্তু বিছানো। বিছানায় দেহ এলিয়ে দেওয়া। সঙ্গে সঙ্গেই নয় মাসের ক্লান্তি আর ঘুম যেন আমাকে ঘিরে ধরলো। ৩টা থেকে ছ'টা পর্য্যন্ত ঘুমোলাম। আবার ৯টা থেকে সকাল ৩টা পর্য্যন্ত।

পরদিন ৩টায় যখন উঠলাম খুব জীবন্ত আর সজীব বোধ করছিলাম। মাথার যন্ত্রনাও নেই, ইনফ্লুয়েঞ্জাও নেই। ইলেকট্রিক ল্যাম্প জ্বালিয়ে চা তৈরী করলাম। এখন আমার সামনে চায়ের কাপ—তোমার ছবি চোখের সামনে ভাসছে।

কতকাল যে এমন গভীর ভাবে ঘুমাইনি! মনে হচ্ছে কাল বোম্বে পরিত্যাগ করার পর কত মাসের ক্লান্তি যেন দূর হোয়ে গেল।

তাঁবু

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

অনেকদূর থেকে মোটরের শব্দ কানে আসতেই সচকিত হ'য়ে উঠলো অবিনাশ। বাঁ হাতটা দু'চোখের ওপর আড়াআড়ি ভাবে রেখে নিপুণ শিকারীর মত পথের দিকে চেয়ে রইলো।

ঘন শালবনের ফাঁকে ফাঁকে লাল কাঁকরের আঁকাবাঁকা পথ। সেই পথের বুকে ছোট্ট ধূলোর ঘূর্ণি একটা আর অদৃশ্য পথের বাঁক থেকে ভেসে আসে মোটরের ইঞ্জিনের অস্পষ্ট শব্দ। চোখদুটো কুঁচকে একবার ভালো ক'রে দেখে নিয়েই খুশি হ'য়ে উঠলো অবিনাশ,—তারপরেই ছুটতে শুরু করলো সবচেয়ে বড়ো তাঁবু লক্ষ্য ক'রে।

তিনি এসে গেছেন হুজুর: হাতদুটো কচলাতে থাকে অবিনাশ আর আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে তাঁবুর ভিতরে।

কোন উত্তর আসেনা তাঁবুর মধ্য থেকে। কৃত্রিম একটা কাশির শব্দ ক'রে অবিনাশ আর গলার আওয়াজটা চড়ায় আর এক পর্দা: তিনি এসে গেছেন হুজুর।

এবারেও হুজুর নিরুত্তর।

তাঁবুর মধ্যে গলাটা আস্তে ঢুকিয়ে দিলো অবিনাশ। উত্তর দেবার মত অবস্থা নয় হুজুরের। ক্যাম্পখাটে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে তিনি নিশ্চেতন। অন্ততঃ তাই মনে হ'লো অবিনাশের। খালি আর আধখালি কতকগুলো বোতল গড়াগড়ি যাচ্ছে খাটের তলায়। প্রভুর চৈতন্য অংগ হ'তে বেশ কিছুক্ষণ দেরী, অথচ ওদিকে মোটরের শব্দটা ক্রমেই নিকটতর হচ্ছে। বিচলিত হ'য়ে উঠলো অবিনাশ। আর একবার পথের দিকে চেয়েই ঊর্দ্ধশ্বাসে সে ছুটতে সুরু করলো।

প্রকাণ্ড একটা শালগাছের গুঁড়ি ঘেঁষে থামলো মোটরটা। দরজা খুলে প্রথমে নামলো মনোহর,—পাতলা ফিনফিনে পাঞ্জাবী গায়ে আর পাকানো চাদর গলায়—বাবুর সবচেয়ে প্রিয় মোসাহেব। তারপর ড্রাইভার তখন সিং পিছনের দরজাটা খুলে কায়দামাফিক সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো। সেই খোলা দরজা দিয়ে সবশেষে যে নামলো তাকে দেখে কেমন যেন হতভম্ব হ'য়ে রইলো অবিনাশ। কেবলই মনে হ'তে লাগলো তার কোথায় যেন প্রকাণ্ড একটা ভুলই হ'য়ে গেছে—নইলে এই নাকি কেশরীবাঈ—যার সম্বন্ধে নানান রকমের কথাবার্ত্তায় আজ ক'দিন ধ'রে সমস্ত তাঁবু গুলজার!

শালগাছের আড়াল থেকে চেয়ে চেয়ে দেখে অবিনাশ: সাদা রংয়ের একটা শাড়ী আর সেই রংয়েরই ঝুলহাতা একটা ব্লাউজ গায়ে,—সারা শরীরে অলংকারের লেশমাত্রও নেই, কেবল গলার কাছে চিক্ চিক্ ক'রছে পাতলা একছড়া হার! বিকালের পড়ন্ত রোদে লাল আর শিরালের নিবিড় পত্রবিস্তারের মধ্যে কেমন যেন মনে হয় বাইজীকে: দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে অবিনাশ আর মনে মনে মিল খোঁজে বাবুর আসরে দেখা গঙ্গাবাঈ, আমিনাবিবি, ছোটমতি আর অন্য সব নামকরা বাইজীদের সংগে। কিন্তু হতাশ হয় অবিনাশ। এই নিতান্ত সাদাসিধা পোষাক পরা আর সংযত চেহারার মেয়েটির মধ্যে কোথায় সেই অসংবৃত উচ্ছ্বাস যা দেখেছিলো অবিনাশ সেই সব দামী অলঙ্কারে মোড়া আর ঝলমলে ওড়নায় ঢাকা বিখ্যাত বাইজীদের মধ্যে।

না, ভুলই বোধ হয় হ'য়েছে মনোহর বাবুর। কেশরীবাঈ নাকি আজকাল যায় না কোথাও—একথা অবশ্য তাঁবুর অন্য সব বাবুদের মুখে অনেকবার শুনেছে অবিনাশ আর কেশরীবাঈ কোথাও আজকাল যায়না ব'লেই বাবুর জেদ চেপেছে যে আনতেই হবে তাকে অন্ততঃ একরাতের জন্যও—তাতে যত টাকাই খরচ হোক।

এদিকে ওদিকে কয়েকবার চেয়েই ভজনসিংহের নজরে প'ড়ে গেলো অবিনাশ। সিংজী বেশ একটু হুঙ্কার দিয়েই বললো: এ অবিনাশ, ওখানে কি করছো, এঁকে তো নিয়ে যাও তাঁবুতে।

সিংজীর আওয়াজে হঠাৎ যেন চমকে উঠলো অবিনাশ। চমকে উঠলো আর আস্তে আস্তে চোখ ফেরাল বাইজীর দিকে। আবার হতাশ হয় অবিনাশ: উজ্জ্বল চটুলতার বদলে কেমন যেন শান্ত বরাভয়ের আভাস টানা দুটি চোখে। সমস্ত শরীর ঘিরে অপূর্ব্ব সংযম।

এগিয়ে এলো অবিনাশ—এগিয়ে এলো আর হাত দুটো

জোড় করে বল্‌লো : আজ্ঞে এইদিকে আসুন,—আপনার তাঁবু এই দিকে।

মনোহর নামতেই তাকে ঘিরে ধরলো অভিদাস, সঞ্জীব, মধুর, আর অন্য সব মোসাহেবরা। অসংখ্য প্রশ্নে তারা ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলে মনোহরকে।

এই নাকি সেই কেশরীবাঈ—যে বড়ো বড়ো রাজরাজড়ার আসর ছাড়া যায়ই না,—আর যেখানেই যায় ফটা পিছু পাঁচশো করকরে টাকা বার মজুরী : হেসে ফেলে সকলে : কেশরীবাঈকে না পেয়ে কোথা থেকে খানপয়া এক বিধবাকে বুঝি যোগাড় ক'রে এনেছে মনোহর।

গলায় জড়ানো চাদরটা আছড়ে ফেলে ধমক দিয়ে ওঠে মনোহর : থামো, থামো দিকিনি সবাই। সকলের মুরোদ বোঝা গেছে! বাপ্‌স্, ভোর বেলা থেকে ব'সে ব'সে শিঠের শির-পাঁজা রীতিমত টাটিয়ে উঠেছে। মহারাণীর দেখা পাওয়াই ভার।

মনোহরের কথায় আবার একটা গোলযোগের সৃষ্টি হয় : ব'লে কি মনোহর! নাই যদি পাওয়া গেলো কেশরীবাঈকে তবে আশে পাশে নামকরা আর কাউকেই পেলে নাকি সে? এই বোষ্টুমি আনার দরকার কি ছিলো শুনি? হাটু গেড়ে ব'সে সারাটা রাত ভাঙা-কীর্তন গাইবে তো! দূর দূর—সমস্ত মাটি ক'রল মনোহর।

এইবার ক্ষেপে গেল মনোহর। মোড়াটোর ওপরে ব'সে প'ড়ে চীৎকার ক'রে উঠলো সে : বলি বল্‌তে চাও কী তোমরা! দেখেছ কোন দিন কেশরীবাঈকে?—শুধু নামই তো শুনে এসেছ এদ্দিন। এই হচ্ছে আসল কেশরী-বাঈ, এঁরই খেয়াল শুনে উদয়গড়ের রাজপুত্তুর নিজে বজরা থেকে নেমে,—হুঁ, হুঁ— : এইখানেই অবশ্য থেমে যায় মনোহর, কারণ এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না তার উদয়গড়ের রাজপুত্তুর বজরা থেকে নেমে ঠিক কি করেছিল, আর এ ব্যাপারটা আসলে উদয়গড়ের রাজপুত্তুরকে নিয়েই কিনা—তাও ভালো ক'রে মনে পড়ছে না তার—অবশ্য এই ধরণেরই কি একটা যেন শুনেছিলো সে।

মনোহরের আচমকা থেমে যাওয়াতে কিন্তু থতমত খেয়ে গেল শ্রোতার দল। মধুর অনেকখানি হাঁ ক'রে ফেললো আর হাটুর ওপরে থুতনীটা রেখে কেমনভাবে যেন চেয়ে রইলো মনোহরের দিকে।

অভিদাস সামলে নেয় অনেকটা। সামলে নিয়েই বলে : বলো কি মনোহর দা, সেই কেশরীবাঈ—এই রকম চালচলন আর এই পোষাক!

আজকাল আর বড় একটা যায় না কোথাও। বয়েসও হ'য়েছে আর তা ছাড়া টাকার দরকারটাই বা কি : নির্লিপ্তভাবে উত্তর দেয় মনোহর।

কিন্তু এখানে আস্‌তে চট্ ক'রে রাজী হ'লো যে : গলাটা অভিদাসের।

চট্ ক'রে না আরো কিছু : ভ্রুকুটি ক'রে ওঠে মনোহর : সেই সকাল থেকে কি সাধ্য সাধনা! শুধু পায়ে ধরাটা বাকি রেখেছি। কিন্তু সেই এককথা—না, আমি আর কোন আসরে যাই না। মহা মুস্কিল, এদিকে কেশরীবাঈকে না নিয়ে ফিরলে হুজুর মদের ঝোঁকে হয়ত গুলি ক'রেই বসবেন। নিরুপায় হ'য়ে হাত দুটো জোড় ক'রে বললুম : আজ্ঞে, গান করেন না করেন সে আপনার মর্জ্জি,—কিন্তু দেবীপুরের জমীদারের বিশেষ অনুরোধ একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে তাঁর তাঁবুতে। ব্যস্, ওষুধ ঠিক ধ'রে গেলো। বোসেছিলো বাইজী—একেবারে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে : কোথাকার জমিদার বল্‌লে : তার রকম সকম দেখে রীতিমত কাঁপতে সুরু করেছি আমি। হাতদুটো জোড় করেই বললুম : আজ্ঞে, দেবীপুরের। ফ্যাকাসে হ'য়ে গেলো বাইজীর মুখ। পায়ের নখগুলো খুঁটতে খুঁটতে কি যেন ভাবলো অনেকক্ষণ ধ'রে, তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললো : চলো, গাড়ী আছে তো সংগে? আজ রাত বারোটার আগেই কিন্তু পৌঁছে দিয়ে যেতে হবে আমাকে।

মনোহরের কথা শেষ হওয়ার সংগে সংগেই খুব যেন বুঝতে পেরেছে এমনি একটা মুখের ভাব ক'রে হেসে গড়িয়ে পড়ে মধুর। হাসে আর বলে : বলো কি মনোহর দা, শুধু নামেতেই এই। এখনও হুজুরের চেহারাখানা তবু চোখে দেখে নি—আর জমিদারীর বহরের আঁচটা কত সেটাও তো শুনিয়ে দিতে পারতে তুমি। আরে একবার হুজুরকে খুসী করতে পারলে আর গান

গেয়ে বেড়াতে হ'বে না বাইজীঠাকরুণকে। অনেকক্ষণ ধ'রে হাসে মধুর, তারপর আর বিশেষ কেউ হাসছে না দেখে হাসিটা হঠাৎ থামিয়ে ফেলে সে। থামিয়ে ফেলে আর বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে মনোহরের দিকে।

আরো কিছুটা দূরে আর একটা তাঁবুর মধ্যে কিন্তু এই হাসির শব্দ পৌঁছায় না। সেখানে সমস্ত যেন কেমন গম্ভীর আর মাঝে মাঝে শুধু নরম গলায় কথাবার্ত্তার আওয়াজ শোনা যায়।

তাঁবুর এককোণে দাঁড়িয়ে হাতদুটো জোড় ক'রে আস্তে আস্তে উত্তর দেয় অবিনাশ আর তাঁবুর মধ্যে মোড়ায় ওপর ব'সে ব'সে শান্ত গলায় তাকে প্রশ্ন করে কেশরীবাঈ।

: না, হুজুরের বাপকে দেখেনি, তবে শুনেছে যারা দেখেছে তাদের মুখে। খুব সুপুরুষ বুঝি ছিলেন তিনি—প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া চেহারা আর দুর্জ্জয় সাহস ছিলো তাঁর বুকে। তিনি এই রকম দলবল নিয়ে কখনো বেরোতেন না শিকারে—বন্দুক ঘাড়ে ক'রে মাসের পর মাস একলা বনে-জঙ্গলে কাটাতেন।

তাই নাকি: অভিভূত হয়ে পড়ে কেশরীবাঈ। হাতের ওপরে গালটা আলতো রেখে নিস্তব্ধ হ'য়ে শুনে যায় অবিনাশের কথা,—তারপর এক সময়ে নিস্তাপ গলায় বলে: আর তোমার হুজুরের মা? —তিনি নেই বুঝি বেঁচে?

আজ্ঞে না: মাথাটা নিচু ক'রে উত্তর দেয় অবিনাশ: তিনি বেঁচে থাকলে কি আর হুজুরের এই অবস্থা হয়। দেখবার শোনবার কেউ নেই ব'লেই হুজুর দিনরাত আকণ্ঠ ডুবে আছেন মদে। আর একপাল বাবু জুটে হুজুরকে দিন দিন জাহান্নমে নিয়ে যাচ্ছে।

তীব্র একটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে কেশরীবাঈয়ের বুক। রক্তের ঝলকে রাঙা হ'য়ে ওঠে সারা মুখ আর চোখদুটো বুজে থাকে সে অনেকক্ষণ ধ'রে। অন্ধকারে ভালো ক'রে ঠাওর করতে পারে না অবিনাশ। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে বলে: আমি যাই তাহ'লে এখন। আপনি জিরিয়ে নিন একটু।

না না: কেমনভাবে যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে বাইজীর গলার আওয়াজ আর তার সমস্ত শরীর যেন দুলে দুলে ওঠে: এঁর মাকে তুমি দেখেছ অবিনাশ? ইনি মার কথা বলেন নাকি কখনো কখনো? জিজ্ঞাসার সংগে সংগে ঋজু হ'য়ে ওঠে বাইজীর সমস্ত শরীর আর নিষ্পলক চোখে সে চেয়ে থাকে অবিনাশের দিকে।

আমতা আমতা করে অবিনাশ। বাইজী খুশী হয় এমন একটা উত্তর মনে করতে থাকে সে, তারপর এক সময়ে বলে: আজ্ঞে না, আমি দেখিনি তাঁকে। হুজুরের বাপ কোথায় যেন শিকার করতে গিয়ে বিয়ে করেছিলেন তাঁকে। বিয়ের পরে তাঁকে নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন। দেশে আর আনতে পারেননি তাঁকে। মধুরায় নৌকাডুবি হ'য়ে মারা গেছেন তিনি। হুজুর আর হুজুরের বাপকে বাঁচায় এক মাঝি।

মুহূর্ত্তে যেন কঠিন হ'য়ে আসে বাইজীর মুখ। কেঁপে কেঁপে ওঠে ঠোঁট দুটি তার: ও! এই কথাই বুঝি রটিয়েছে শশাঙ্ক চৌধুরী। মধুরায় বজরা ডুবি হ'য়ে মারা গিয়েছে তার স্ত্রী।

বাইরের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন ভাবে বাইজী। সন্ধ্যার এলোমেলো হাওয়ায় গর্জ্জন ক'রে ওঠে, শালের বন আর শুকনো পাতায় গুঁড়ো ঝিরঝির ভাবে উড়তে থাকে।

: অনেক বছর আগে—এমনি ঝড়ো হাওয়ায় পথ হারিয়েছিলো এক পথিক। অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে এক চালাঘরের দরজায় কড়া নেড়ে নেড়ে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো সে। অনেকক্ষণ পরে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিলো একটি মেয়ে, বিদ্যুতের ঝলকের মধ্যে হ'য়েছিলো দুজনের দৃষ্টি বিনিময়। আশ্রয় পেয়েছিলো পথিক। কিন্তু থাকতে পারেনি বেশী দিন। আর এক রাত্রির গভীর অন্ধকারে মেয়েটির হাত ধ'রে আবার পথে বেরিয়েছিলো সে। অসমতল আর বন্ধুর আর দীর্ঘ সেই পথ।

চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে ভাবে বাইজী: পরিপূর্ণ এক নীড়। মেয়েটির কোলে এক শিশু কিন্তু লোকটির কেমন যেন ছাড়োছাড়ো ভাব। কোথা থেকে যেন চিঠির স্তূপ আসে মাঝে মাঝে, সেগুলো প'ড়ে আর ভুরুদুটো কুঁচকে আসে তার আর দৃঢ় সংকল্পের ছায়া ভেসে ওঠে তার কঠিন মুখে। আরো কিছুদিন পরে একদিন মুখোমুখি দাঁড়ায় তারা দুজনে —মেয়েটি আর লোকটি। প্রথমে মৃদু গুঞ্জন তারপরে কর্কশ হ'য়ে আসে ভাষা: দেবীপুরের জমিদার বাড়ীতে স্থান হ'তে

পারে না মেয়েটির। অজ্ঞাতকুলশীলা—অভিজাতকুলের মর্যাদা-বোধে নাকি বাঁধবে। তাই একদিন আবার পথে বের হ'লো মেয়েটি। কিন্তু দীপককে ছাড়লো না তার বাপ। তার মায়ের অন্তর্ধানের সংগে সংগে আরো সহজ হ'য়ে উঠলো দীপকের প্রশ্নটা। তার মা'র কুলশীল সম্বন্ধে কিছু একটা নিঃসংকোচেই বলা চলবে। তাই একদিন নৌকাডুবির খবর নিয়ে মধুবা থেকে দেবীপুরে ফিরে এলেন জমিদার শশাঙ্ক চৌধুরী —বুকে তার কোমল এক শিশু।

মেয়েটির জীবনে নামলো জমাট অন্ধকার। সারেঙ্গী আর নূপুরের অবিশ্রান্ত ঝঙ্কার, ফুলের রাশ আর অজস্র টাকার উপঢৌকন। রাতির ঝাড়ে ঝাড়ে মাঝে মাঝে অস্ফুট এক কামনা কেমন ভাবে যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে আর কেমন যেন বেসুরো হ'য়ে আসে নূপুরের বোল। অনেক দেশ বিদেশের ধূলা লাগলো মেয়েটির গায়ে। একদিন কিন্তু ক্লান্তি আর অবসাদ নামে তার জীবনে—হঠাৎ কাগজে সেদিন চোখে প'ড়ে যায় শশাঙ্ক চৌধুরীর মরার খবর। প্রথমে অস্পষ্টভাবে ছাপার কতকগুলো অক্ষর চোখে পড়ে তারপর মনে হয় বুকের রক্ত ছিটানো এক মর্মন্তুদ সংবাদ। ফিরে যায় মেয়েটি—জমকালো আসর ছেড়ে সারেঙ্গী আর তবলার বোলের তালে তালে পা ফেলে ফেলে অনেক দূরে স'রে যায় সে। জীবনের সায়াহ্নে নিজের ছড়ানো জীবনকে গুছিয়ে নেয়—গুছিয়ে নেয় আর ব'সে ব'সে ভাবে সেই ঝড়ের রাতের কথা আর শুকনো পাতার শব্দের মাঝে মাঝে কার যেন কড়া নাড়ার শব্দ ভেসে আসে তার কানে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে গেছে অবিনাশ। সে ভাবলো বুঝি শ্রম আর ক্লান্তিতে ঘুমিয়েই পড়েছে বাইজী। কিছুক্ষণ পরে সে বাতি হাতে ফিরে এসে কিন্তু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো,—ঠিক তেমনি ভাবেই ব'সে আছে বাইজী—দুহাতের তালুতে আলতোভাবে মাথাটা রেখে, আর ম্লান আলোয় কেমন যেন চিক্‌চিক্ করছে তার চোখদুটো।

বাতিদানটা রেখে ফিরে যাবার সময় বাইজীর গলার আওয়াজ পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো অবিনাশ: তোমাদের হুজুরের সংগে একবার দেখা হয় না অবিনাশ?

নিশ্চয় হয়, একশোবার হয়—আসুন না আমার সংগে: কথাটা ব'লেই কিন্তু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ে অবিনাশ। এতটা উচ্ছ্বসিত যেন না হ'লেই ভালো ছিলো তার। এ অবস্থায় হুজুরের সংগে কারুর দেখা করিয়ে দেওয়াই বিপদ:—ভাবনার মাঝখানেই বাধা পায় অবিনাশ। বাইজী দাঁড়িয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে, দাঁড়িয়ে উঠেছে আর এগিয়ে আসছে তার দিকে।

ঠিক মাঝখানের তাঁবুটায় মহা হৈ চৈ সুরু হ'য়েছে; সেইখানেই বুঝি গানের আসর বসবে আজ। অনেকগুলো বাতি জ্বালানো হয়েছে আর মেঝে জুড়ে বড়ো বড়ো কার্পেট পাতা। সমস্ত কিছু ঘিরে অকারণ চীৎকার আর অহেতুক ব্যস্ততা। একবার উঁকি মেরে দেখেই অবিনাশ পার হ'য়ে এলো সেই তাঁবু। অতি সন্তর্পণে কেশরীবাঈও অবিনাশের ছায়া মাড়িয়ে মাড়িয়ে এগিয়ে গেলো।

হুজুরের তাঁবুর কাছে কেশরীবাঈকে পৌঁছে দিয়েই আস্তে আস্তে স'রে পড়লো অবিনাশ।

কেশরীবাঈ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর উঁকি মেরে দেখলো তাঁবুর মধ্যে।

উঠে ব'সেছে দীপক। অসম্ভব ক্লান্ত যেন মনে হচ্ছে তাকে। অবিন্যস্ত চুলের রাশ আর কেমন যেন বিশীর্ণ আর পাংশু তার মুখের প্রতিটি রেখা।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো বাইজী। কতদিনের অতৃপ্ত ক্ষুধা বুঝি নিবিড় হ'য়ে আসে ওর দুটি চোখে আর সুধার এক কামনা সঞ্চারিত হয় চকল রক্ত কণিকায়। ডাকবে নাকি একবার নাম ধ'রে, ডাকবে আর সে কাছে এলে সবলে জাপটে ধরবে তাকে বুভুক্ষু দুটি বাহুর মধ্যে।

কিসের যেন একটা আওয়াজে হঠাৎ মুখ ফেরালো দীপক। মুখ ফেরালো আর কেমন ভাবে যেন চেয়ে রইলো বাইজীর দিকে। তারপর আস্তে আস্তে ও এগিয়ে আসলো।

তাঁবুর দড়িটা শক্ত ক'রে ধ'রে আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে রইলো বাইজী। পায়ের তলার মাটিটা দুঃসহ আবেগে কাঁপতে থাকে আর সব কিছু যেন গোলমাল হ'য়ে যায়।

টলতে টলতে আরো এগিয়ে আসলো দীপক। এগিয়ে আসলো আর বললো জড়িত গলায়: আর ভয় কি, চ'লে এলো, চ'লে এলো,—তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলে অকল্যাণ

হবে যে আমার—কথার সঙ্গে সঙ্গেই বাইজীর একটা হাত চেপে ধরে সৈনিক।

বাইজীর চোখের সামনে দুলে দুলে ওঠে—তাঁবু আর শালের বন আর নিকষ কালো আকাশের খানিকটা। সবেগে ও ছিনিয়ে নিলো নিজের হাতটা—ছিনিয়ে নিলো আর দ্রুতবেগে ছুটতে শুরু করলো।

একেবারে কোণের তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো বাইজী। দাঁড়িয়ে প'ড়েই চীৎকার ক'রে ডাকলো: গুজন সিং, গুজন সিং। পলকে তাঁবুর মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো গুজন সিং। বেরিয়ে এসেই কিন্তু থমকে ও দাঁড়িয়ে পড়লো। তাকে আর কথা বলবার অবসর দিলো না বাইজী। উত্তেজিত কণ্ঠে বললো: জল্‌দি জল্‌দি, এখুনি আমায় ফিরে যেতে হবে। পায়ের তোড়াটাই ফেলে এসেছি মনের ভুলে! শীগ্‌গির করো—বাবুরা আসর সাজাতে সুরু করেছে।

মোটরে উঠেই কিন্তু ভেঙে পড়লো বাইজী। দুহাতে মুখটা চাপা দিয়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ও কেঁদে উঠলো। ওর স্বপ্নের সোনালী মুহূর্তগুলো টুকরো টুকরো হ'য়ে বুঝি ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। অশ্রুভেজা চোখদুটো তুলে ও চেয়ে চেয়ে দেখলো তাঁবুগুলোর দিকে। চোখের জলে কেমন যেন ঝাপসা দেখায় তাঁবুগুলো—অন্ধকারের বুকে নিষ্ঠুর অভিশাপ অজগরগুলোর মত আর তাদের পিছনে অস্পষ্ট শালের বন ঝড়ের তালে তালে অশ্রান্ত গর্জনে দুলে দুলে ওঠে।

বন্ধু

বারীন্দ্র দাশগুপ্ত

ছোট্ট ছেলেটি।

—দেখ্‌লে দুটো কথা বোলবার ইচ্ছের প্রাণটা মমতায় ভরে ওঠে, ইচ্ছে হয় ওর হাত দুটি ধ'রে ওর ঐ অনির্বচনীয়কে পেতে!

—কতোই না মিষ্টি—মনে হয় ভোর বেলার আলোকে করে উপহাস, দেয় লজ্জা ও।

ওর ঐ পাত্‌লা ঠোঁটের নিরমল হাসিটি যেন ওর মনের সব টুকুন,—কতো স্বচ্ছন্দ, কতো সাবলীল—

কোন মলিনতাই ওকে পায় নি।.....বন্দী তার নিজের অন্তরীণ ক্যাম্পে ব'সে রোজই ওকে দেখে—নিদারুণ একটা পিপাসা বন্দীকে দিনের পর দিন কেবলই ব্যস্ততায় ভরে তোলে, আগ্রহ হয় ওকে একটু আদর করতে—ভালবাসতে। কিন্তু ওমরে কেঁদে ওঠে বন্দীর সকল পিপাসা। সম্মুখে বন্ধনের কানুনগুলো জল্‌ জল্‌ কোরে ওঠে, করে আবরণহীন উপহাস—যেন বলে—"তুমি রাজদ্রোহী—"।

কিন্তু এ অভিযোগের কোন আদালত নাই, কোন কৈফিয়তের ধার এ ধারে না—কতো বড় অটোক্র্যাট্। স্বাধীনতার পূজারী যারা তারা এই অভিশাপ মাথায় কোরেই বড় বড় মহান্ ত্যাগগুলো অম্লান ভাবে স্বীকার কোরে যাচ্ছে—বলে তারা,—

"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন ততই টুটবে।" ফাঁসির দড়িটি গলায় পড়বার বেলায়ও তাদের এই কথাই মনে হয়। তাই তো বন্ধনের মর্মন্তুদ্ আবহাওয়া ও নির্যাতন এবং ফাঁসির দড়ি এঁদের কাছে কতো সহজ—যেন খেলার পুতুল।

* * *

ছেলেটি ও বন্দীর মাঝখানে ব্যবধান এমন কিছুই নয়, সামান্য কয়েক পা মাত্র। এত দিনের চকল পাদুটো যে-ভাবে বন্দীকে তার সকল কাজকর্মে অক্লান্ত ভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, সে আজ কত পঙ্গু কত অসহায়। মনের ইঙ্গিত নিয়ে পা চল্‌তে চাইলেও সে কত আড়ষ্ট। দু'চোখের সামনে ঐ গণ্ডি তাকে অজানিত ভাবে চাবুক মেরে হল্‌ট করিয়ে দেয়।

ছেলেটি কাজ করে সামনের ঐ বিস্তৃত ক্ষেতটায়, বন্দী তাই তো দেখে। কত বড় আন্তরিক টান ঐ ক্ষেতের প্রতি—ভোর বেলা ক্ষেতে আসে বেলা হেয়ে গেলেও তবুও ঘরে ফিরবার ব্যস্ততায় ওকে পায় না। ক্ষেতের ঐ মাটি যেন

ছেলেটির বুকের রক্ত—কতো আপনার। ওখানকার ঐ মাটির বুক থেকে ও আবিষ্কার ক'রবে সোনা—তারই কতো গবেষণা।···

পাওয়ার আনন্দে বন্দী চমকে উঠ্‌লো—যে দিন ছেলেটি বন্দীর কাছে এসে জল চাইল—খাবে। বন্দী ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে গ্লাসভরে জল এনে দেয়। ছেলেটি বলে "স্বদেশী বাবু, আমরা মুসলমান—তোমার ঐ গ্লাস যে নষ্ট হ'য়ে যাবে, হাতে ঢেলে দাও।" বন্দী ছেলেটিকে একেবারে কাছে বসিয়ে সমস্ত আদর ঢেলে দিয়ে জবাব দেয়—

—"স্বদেশী যারা তাদের কাছে কি হিন্দু আর মুসলমান ভিন্ন হয় রে বোকা—তারা সব্বাই এক।" ছেলেটি বন্দীর মুখের দিকে তাকায় যেন জিজ্ঞাসা—ওরা যে প্রায়ই শোনে হিন্দু আর মুসলমান নির্দ্দিষ্টভাবে আলাদা।—"আর এই গ্ল্যাস্‌না তোর কতো কাছে আমি ব'সে আছি, এমনি কোরেই হিন্দুর পাশে মুসলমান আছে"—বন্দী ছেলেটির ছোট মাথলাটা মাথা হোতে নামিয়ে নিয়ে বলে, গায়ে এখানে সেখানে শুকিয়ে যাওয়া মাটির দাগগুলো মুছে দেয়।—

ছেলেটির মনটা খুসীতে ভরে ওঠে—বিহ্বলও কতো। এত আদর যেন ওর ঐ জীবনের অভিধানের বাইরে—তাই তেও শেখে নি।

আর শিখ্‌বেই বা কেমন কোরে—এরা যে কৃষক। এক দিকে জমির প্রতিটি মাটির কণা হোলো এদের গবেষণার জিনিস। তাই তো জীবনের অবসর কতো অল্প—অপর দিকে যে ক্ষীণ সময়টুকু নিজের ভোগের জন্য পাবে ব'লে ব্যাকুলতা থাকে সেখানে তারা পায় জমিদারের শোষণ রীতির কতো নব নব রূপ। তবুতো এদের প্রাণে কতো উৎসাহ—কতো উদ্দীপনা।·····এমনি কোরেই বন্দীর সঙ্গে ছেলেটির গভীর আন্তরিকতা ভরে ওঠে। একটু অবসর পেলেই অমনি বন্দীর কাছে ছুটে আসে, কতো গল্প করে!—সেবার এক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য কেমন কোরে গাঁয়ের সকল লোক মিলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিল—বৃষ্টি যখন হোলো ঐ জলের ভিতর কেমন কোরে ও নিজে ক্ষেতে চাষ দিয়েছিল। "জমি যদি শক্ত হয়ে ওঠে তবেই তো দেশের লোক—জেলার লোক সকলে বাঁচবে, কিন্তু জমিদার বলে, খাজনা দিতেই হবে, ফসল হোক আর না-ই হোক্। তাই বা কেমন কোরে সম্ভব হয় বলুন তো স্বদেশী বাবু?—" ছেলেটি বন্দীকে একটু ভিজে গলায় বলে।—বন্দী ভাবে—সবই সত্যি। যে লোক শান্তি পেয়ে জেলে ঢুকলো—বোকার উপর শাঁকের আটি তাকে দুইয়ে দেয় আরো—যখন নিয়মিত ভাবে দিনের দার্ঘ্যানুসারে চৌদ্দ ছটাক সরষের তেল ঘানি ঘুরিয়ে সে-কয়েদী বের করতে পারে না। ঘানি ওয়ারকিং অবস্থায় ছিল না, এ সত্যতার প্রমাণ পেয়েও শাস্তির পরিমাণ লঘু হয় না—হয় ডাণ্ডাবেড়ী, না হয় হাউরা-বেড়ী, না হয় শিকলবেড়ী—এই রকম শাস্তি তার ভোগ করতে হয়। এমনিভাবে খামখেয়ালীর অরাজকতার ভিতর দণ্ড-ভোগের দিনগুলো কাটাতে হয়।—বন্দী ছেলেটিকে শুধু বলে, এইটাই যে তাই নিয়ম। মুখের কাছে নেওয়া ভাতের গ্রাস কেড়ে নিয়ে যারা পরম তৃপ্তিকে পেতে চায়—কর্ত্তব্য বোলে যুক্তিকে পরিষ্কার উচ্চারিত করতে কোন প্রকার কুণ্ঠা বোধ করে না—তাদের কাছে সবই সম্ভব। তুমি চাষ করিস তোরা—উপযুক্ত খাজনা দিয়েও মরছিস্ কিন্তু জমির দানার উপর তোদের অধিকার নাই বল্‌লেই চলে।···

• • •

—বেশ কয়েকটা দিন কেটে যায়; ছেলেটির সঙ্গে বন্দীর আর দেখা হয় না—ক্ষেতেও আজকাল আসে না—কি হোয়েছে কে জানে? বন্দী তার উদ্যত মনটি নিয়ে ক্ষেতের দিকে তাকিয়েও ছেলেটিকে দেখ্‌তে পায় না। বন্দীর মনটা একটু উচ্‌নচ্‌ কোরে ওঠে। ওর নিখুঁত সরলতা যে বন্দীকে মুগ্ধ কোরেছে। হঠাৎ দেখে ছেলেটি বন্দীর জানলার পাশে দাঁড়িয়ে। মাথায় ওর একটি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বন্দী একটা বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস ক'রে যা জবাব পেলো—আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। ছেলেটির বাবা গাঁয়ের চৌকিদার, সরকারের কাজ করে। বন্দীর সঙ্গে মিশেছে যেনে ঐ তার পুরস্কার।—"কেন স্বদেশী বাবু"—ছেলেটি চোখ ভরা জল নিয়ে জিজ্ঞেস করলো—"তোমার সঙ্গে মিশ্‌লে বাবার চাকুরী কেন যাবে?"—

ঐ সরল বালকটিকে বন্দী কি কোরে বোঝাবে যে দেশকে ভালোবাসাটাই হোলো একটা পাপ—ধরার মানুষ তাই তো কতো সাবধান।—একটা গভীর উদাস দৃষ্টি নিয়ে ছেলেটির

মাথায় হাত বুলিয়ে কেবল বল্‌লো—"তাহোলে আর এসো না—তিনি যে তোমার বাবা।"—

"আর তুমি? তুমি যে আমার বন্ধু"—ছেলেটি মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বন্দীর মুখের দিকে তাকিয়ে তড়াক্ কোরে জবাব দিলে। যেন কত যুগের হারানো সম্বন্ধকে ও পেয়েছে। স্বাধীনতার সংগ্রামে বন্দী কোন দিন এদের কথা কি ভেবেছে? বন্দী নিজেকেই প্রশ্ন করে।.....ছেলেটি মাঝে মাঝে এমনি লুকিয়ে আসে, বন্দীর সাথে মেশার আনন্দকে সে চেপে রাখতে পারে না—কি যে পেয়েছে ও-ই জানে। আসে যখন বন্দী তার ব্যাকুল সীমাহীন ভালোবাসা নিয়ে ছেলেটিকে অতি পরিচয়ের আবরণে ঢেকে রাখে।...

...বন্দী আজ বদলী হোয়ে বাংলার অন্য কোন এক অন্তরীণ ক্যাম্পে যাবে কিন্তু ছেলেটির সাথে যে আর দেখা হোলো না। হয়তো অন্ধকার রাতে শূন্য ঘরে এসে ব্যথা নিয়ে ফিরে যাবে।...ষ্টীমারে উঠে বন্দী শেষ একবার পারের দিকে তাকিয়ে দেখে...।

ষ্টীমার ছাড়বে—নোঙর উঠিয়ে দিচ্ছে—এমনি সময় ছেলেটি ছুটে এসে দুহাত কোলের ভিতর জড়িয়ে ধ'রে কান্নার সুরে বল্‌লো বন্ধু, তুমি চলে যাচ্ছ—আর এখানে আসবে না? কথাটা বের হোতে না হোতেই ছেলেটির এই অযাচিত বন্ধুত্বের দাবীকে নৃশংস ভাবে অত্যাচারিত ক'রে দিল ছেলেটির বাবা, গাঁয়ের চৌকিদার যে বন্দীর গার্ড হোয়ে সঙ্গে যাচ্ছে। চৌকিদারের কড়া মার খেয়ে চোলে যাবার সময় পিছন ফিরে একবার তাকালো চোখের জল ঝর ঝর কোরে পড়ছে কে দেবে সে চোখের জলের দাম।—কিন্তু বন্দীর সর্বতোমুখী কর্মস্রোতের ভিতর বারে বারে এই কথাটাই মনে কোরে দিল যাদের ভালোবাসা নাই, যাদের ভালোবাসবার অবসরকে হেলায় খুঁজে নাও নি, তারা অশিক্ষিত, অনুচ্চারিত হোলেও তারা ভালোবাসতে জানে।*

---

* কোন এক রাজবন্দীর ডায়েরী হইতে নেয়া।

"হে নূতন,
তোমার প্রকাশ হোক্ কুজ্ঝটিকা করি' উদ্‌ঘাটন
সূর্যের মতন।
বসন্তের জয়ধ্বজা ধরি',
শূন্য শাখে কিশলয়-মুহূর্তে অরণ্য দেয় ভরি'—
সেই মতো, হে নূতন,
রিক্ততায় বক্ষ ভেদি' আপনারে করো উন্মোচন।
ব্যক্ত হোক্, জীবনের জয়,
ব্যক্ত হোক্, তোমা মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়।"

—রবীন্দ্রনাথ

সোনার কাঠি

শ্রীমতী বাণী রায়

এদেশের মেয়েদের দিকে চাইলে প্রথমেই চোখে পড়ে—তাঁরা প্রকৃতপক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ নয়। যে কোন কাজে ঐক্য সাফল্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু, বিশেষতঃ যখন সে সাফল্যের সুফলের দাবী শুধু তুমি-আমি করি না, সমাজের সকলকেই বিলিয়ে দিতে চাই।

জৈবজগতের আদিযুগে একত্রিত হবার প্রয়োজনে মানুষ সমাজ গঠন ক'রেছিল। নিজের নিঃসঙ্গতার বিলাসে যখন বিপদ হ'য়ে দাঁড়াল তখন সঙ্ঘবদ্ধতার স্বাভাবিক তাগিদ রক্তের মধ্যে অনুভব ক'রে মানুষ নিজের পাশে অনেককে ডেকে নিল। সেইদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত আমরা এক সঙ্ঘবদ্ধ সমাজের সর্ব্বথা পুষ্টিসাধন ক'রে আসছি, কখনও বা দাসত্ব ক'রেছি বল্লেও অত্যুক্তি হবে না।

সেই বৃহৎ মনুষ্য-সমাজ বিভিন্ন ভাগে আজ বিভক্ত হ'য়েছে। প্রত্যেক ছোট ছোট অংশ নিজের নিজের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যস্ত। দেশ-বর্ণ অনুযায়ী নানা স্বাভাবিক ভাগ তো হয়েছেই, তাছাড়া এক একটি প্রদেশের মধ্যে ধর্ম্মকে বিভাজ্য মানদণ্ড বিবেচনা ক'রে আরও অনেক ভাগ পাওয়া যাবে। হিন্দু, মুসলমান দুই বৃহৎ শ্রেণী-বিভাগের পরেও এক বাংলা দেশেই অসংখ্য ছোট ছোট শ্রেণীতে এই দুই বৃহৎ শ্রেণী পুনরায় বিভক্ত হ'য়েছে। সুতরাং বিড়ম্বনার অবধি নেই।

পুরুষদের এই শ্রেণী-বিভাগের প্রবৃত্তি অতি স্বাভাবিক-ভাবে নারীমণ্ডলিতে প্রতিফলিত দেখা যায়। ছোটকে আঁকড়ে ধ'রে বড়কে ভাগ করে দেওয়া আমরা ভালভাবেই শিখেছি।

এই শিক্ষা নারীতে পুরুষ অপেক্ষা অধিক সফল দেখি। কারণ নারী সাধারণতঃ গৃহে আবদ্ধ, অভিজ্ঞতা ও ধারণার পরিধি তার পুরুষের চেয়ে কম। এ ছাড়া, ভাবপ্রবণতা এবং অনুকরণপ্রিয়তা নারীজাতির বৈশিষ্ট্য। ধর্ম্ম নারীর জীবনে একটি বড় শক্তি। এই সমস্ত বিভিন্ন উপাদানের একত্র সমাবেশ আজ নানাভাবে নারীকে জনগণের মধ্যে নিঃসঙ্গ ক'রে রেখেছে। এই সমস্ত উপাদানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে—নারী জীবনে সামাজিকতা এবং শিক্ষার অভাব।

তার ফলে আজ আমাদের দেশে কোনদিকেই নারী বিশেষ কিছু চমকপ্রদ সাফল্য লাভ ক'রে উঠতে পারছে না, যদিও নবজাগরণের ফলে উদ্যমের ত্রুটি নেই। অন্ধকার পটভূমিকায় দুই একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র বিচ্ছিন্নরূপে পরিলক্ষিত হ'লেও তারকা সভা কোথায়? একটি বিজয়লক্ষ্মী পতিতে চাহিয়া মেটে না,—অনেক চাই।

আমরা ব্যক্তিগতভাবে হয়তো কিছু না কিছু কৃতিত্ব দেখাচ্ছি, কিন্তু সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই ব্যক্তিগত বিজয়ে সকলে কি পেল? বহুর জন্য একটা নূতন জীবনাদর্শ আজ একান্ত প্রয়োজনীয়। সেজন্য সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির আবশ্যকতা আছে।

ছোট ছোট দল গঠন ক'রে এখন নারী নানাদিকে নানা কাজ ক'রছে, দেশের ও দশের উপকার নারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা কিছু কিছু হ'চ্ছে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমাজ-জীবনের বড় বড় ত্রুটিগুলি আজ পর্য্যন্ত সংশোধিত হ'ল না। ক্ষীণকণ্ঠে আপত্তি জানাচ্ছি, সে স্বর বিরাট জনপ্রবাহে কোথায় তলিয়ে গেল? সৃষ্টির আদি যুগে পুরুষকে আশ্রয় ক'রে তার মুখের দিকে চেয়েছিলাম। আজ দেখছি বিশেষ কিছু পাই নাই।

গৃহ ও সন্তান? সে গৃহ ও সন্তানে নারী অপেক্ষা পুরুষের প্রয়োজন কম নয়। আধিক দায়িত্ব পুরুষ নারীর বহন ক'রেছে সত্য, কিন্তু সংসার ও সন্তান পালনের দায়িত্ব অকলে চাবিকাঠির লৌহশৃঙ্খলের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে। আজ যুদ্ধোত্তর জগতের সহস্র পরিকল্পনার মধ্যে নারীর কতটুকু স্থান পুরুষ দিয়েছে? সুতরাং নারীর মঙ্গলের জন্য পরের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকলে চলবে না—স্বাবলম্বী হ'য়ে নারীর নিজের চেষ্টা করতে হবে। সেজন্য প্রথম প্রয়োজন—সঙ্ঘবদ্ধতা—রাজনীতি, সমাজনীতি—উভয় ক্ষেত্রে।

সামাজিক গলদগুলির কথা চিন্তা ক'রলে দেখা যাবে আমরা কেবল চিন্তা ক'রেই শান্ত হচ্ছি। মাঝে মাঝে পুরুষের স্বার্থে আঘাত লাগছে, তখন তারা নারী জাতির মঙ্গলকামীরূপে দেখা দিচ্ছে। যথা, কন্যাকে পাত্রস্থা করবার পূর্ব্বে বরপণের

নিন্দা করলে পিতা করছেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই পুত্রের পিতা রূপে সে কথা তিনি বিস্মৃত হ'য়ে দেনা-পাওনার হিসাব নিকাশ নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে উঠছেন। কন্যাদের মধ্যে, মনে হয়না এমন আত্মবিস্মৃতা কেউ আছে, যার মনে পণপ্রথার বিরুদ্ধে ঘৃণা নেই? কিন্তু সে ঘৃণা সাহস ক'রে জানাচ্ছে কয় জন? আজ যদি দেশের সকল কুমারী এক হ'য়ে বলে, "এই প্রথার উচ্ছেদ না হ'লে আমরা আজীবন বিবাহ না ক'রে থাকব।" তবে, সত্যই কি তখন পণ প্রথা চ'লে যেতে বাধ্য হবে না?

বিবাহ ব্যাপারে, বিশেষ ক'রে হিন্দু বিবাহে, এইরকম নানা রূপ ত্রুটি আছে। তার ফল নারীর পক্ষে গুরুতর। সেগুলি সংশোধন ক'রে নেবার ভার অভিভাবকদের উপরে ফেলে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকার দিন আর নেই। সে ভার নিজেদের নিতে হবে। তাহ'লে সংশোধনের আশা আছে। আজ আমি কাগজে দু'কথা লিখে কাগজ কালি বায় ক'রে পণ্ডশ্রম করছি, তুমি কমিটিতে দাঁড়িয়ে চারকথা ব'লে গলায় ব্যথা নিয়ে বাড়ী ফিরছ—এইমাত্র। যদি না একসঙ্গে কোন কিছু আমরা চাইতে শিখি, তবে সে-চাওয়ার মর্য্যাদা কেউ আমাদের দিতে আসবে না।

কর্ম্মজীবন আজ নারীর বহুদূর বিস্তৃত হ'য়েছে। অর্থ-নৈতিক সঙ্কট ও ক্রমবিবর্দ্ধমান অসন্তোষ এর জন্য দায়ী। পূর্ব্বে এদেশে নারীর কর্ম্মজীবন বলতে মোটামুটিভাবে রাজনীতিকেই আমরা বুঝতাম, সেখানে সে নেহাৎ গায়ের জোরে পুরুষের পাশে স্থান ক'রে নিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে শিক্ষা ও সমাজ সম্পর্কীয় ব্যাপারে কৃতিত্ব দেখিয়ে নারী বহু নূতন কর্ম্মক্ষেত্রের সন্ধান পেল। সম্প্রতি যুদ্ধ ব্যপদেশে ও সময়ের অগ্রগতিতে বহু পথ খুলে গেছে। এখন কর্ম্মী মেয়ের সংখ্যা প্রচুর।

কিন্তু, নারীর কর্ম্মজীবনের ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে কিছুমাত্র আশাপ্রদ দেখিনা। বড় চাকুরি দুই একজন ক'রছে, উপযুক্ত পারিশ্রমিক দুই একজন পাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সারাদিন যথেষ্ট পরিশ্রম ক'রেও বহু মেয়ে নিজের খাওয়া-পরাটাও স্বাধীনভাবে চালাতে পারে না। দুই একটি অস্থায়ী বিভাগের উদারতার কথা ছেড়ে দিলে সাধারণতঃ ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা কম পারিশ্রমিক পায় এবং সমস্ত কাজ মেয়েদের জন্য খোলা থাকে না। কর্ত্তৃপক্ষ মেয়েদের বিশ্বাস করতে পারেন না। তাঁরা মনে করেন 'নারী' শব্দের আটে 'নাবি'। এক স্কুল-মাষ্টারী বা দু'চারঘরের কেরাণী-গিরি ভিন্ন সাধারণ মেয়েদের অন্য কর্ম্মজীবন বিশেষ দেখা যায় না। এই সব কাজেও যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। বর্ত্তমান অনটনের দিনে একজন আট-এ পাশ স্কুল শিক্ষয়িত্রীকে পঁচিশ টাকার বিনিময়ে কোন স্কুলে উপরান্ত পরিশ্রম করতে দেখেছি। যদি না তাঁর রোজগারী বৃদ্ধ পিতা বা স্নেহ-প্রবণ ভ্রাতা না থেকে থাকেন তবে তো উপবাস তাঁর পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষকতায় তাঁর যাঁদের উপরে দেওয়া যায় তাঁদের একটা মাপকাঠি বজায় রেখে চলতে হয়। মেয়েদের ব্যক্তিগত খরচ সাধারণতঃ পুরুষদের চেয়ে কিছু বেশী। পঁচিশ টাকা বেতন দেওয়াটা সুতরাং নিছক দুঃসাহস।

সম্প্রতি নারীর কর্ম্মজীবনে বিপ্লবের সূচনার নির্দ্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। যুদ্ধকালীন প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হ'য়ে যাবে। বেকার পুরুষের কাজ জুগিয়ে নারীর জন্য কোন কাজ অবশিষ্ট থাকবে না। বেকার পুরুষের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে বিবাহ ক'রে সংসারাদি করার পক্ষেও নানা বাধার সৃষ্টি হবে। জীবনযাত্রার ব্যয়বাহুল্য শীঘ্র কমে যাবে না। কিন্তু অনেক অভিভাবকদের যুদ্ধব্যপদেশে বাড়তি রোজগার কমে যাবেও বাহিরে বিচরণ ক'রে স্বাবলম্বী হ'তে যাঁরা অভ্যস্ত হয়েছেন সহসা গৃহকোণে নিশ্চেষ্ট দিন যাপন করা তাঁদের অসহ্য লাগবে। সুতরাং কি করা যায়?

এই সময়ে নারীর একত্রিত হবার গুরু প্রয়োজন আছে। সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে নিজেদের শক্তি সঞ্চয় ক'রে ভবিষ্যৎ জগতে নিজের স্থান করে নিতে হবে। নহিলে যুদ্ধোত্তর জগতে নারী ভারমাত্র বলে পরিগণিত হবে।

আজ আমরা সকলে নানা বৈদেশিক আদর্শে মুগ্ধ। মেয়েরা অনেকে সেই সব আদর্শ এদেশে দেশের উন্নতিকল্পে স্থাপনা করবার জন্য ব্যগ্র হয়েছি। তার পূর্ব্বে, দেশ ও জাতির মঙ্গলের মহান দায়িত্ব গ্রহণ করবার পূর্ব্বে, নিজেদের প্রতি চেয়ে দেখতে হবে। বহুদিন পুরুষের সঙ্গে আমরা সেই আদর্শ নিজের মনে ক'রে বিসর্জ্জন দিয়ে চলেছি। আমাদের

আদর্শ ছিল বহু উর্দ্ধে, এক বিরাট 'আমরা'। কিন্তু আজ মনে হয় কেবল নিজেদের কথা ভাববার দিনও এসে গেছে। এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলতে হবে যাদের মধ্য দিয়ে নারীর সমস্ত প্রয়োজনের মীমাংসা হ'তে পারে। সে সমস্ত প্রতিষ্ঠান নারীর সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বিধান ক'রে অগ্রগতির নির্দ্দেশ দেবে।

বহু নারী-প্রতিষ্ঠান আজ অতি প্রশংসার সঙ্গে কাজ ক'রে চলেছে, কিন্তু তারা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন। একসূত্রে সকলকে বেঁধে এক কেন্দ্র থেকে চালাতে পারলে তারা আরও কার্য্যকরী হবে। এ কাজে 'সমবায় সমিতি'র মত পরিকল্পনা বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে ছোট প্রবন্ধে সম্যক্ আলোচনা সম্ভব নয়। তবে গোড়ার কথাতে ফিরে আসি—সব কাজের জন্য চাই একতা। তোমার কথা তুমি একা যত উচ্চস্বরেই বল না কেন, কেউ শুনতে পাবে না। তাই আরও দশটি কণ্ঠ তোমার সঙ্গে মিশে যাক। তবেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার শক্তি প্রবল হবে। তোমার আশা-আকাঙ্খা আজ পর্য্যন্ত যে লৌহ-কীলকের অন্তরালে লুকানো আছে, সে লৌহদ্বারও তোমার দাবীর শক্তিতে মুক্ত হ'য়ে যাবে। সোনার কাঠি তোমার কাছেই আছে, এখনও তুমি সন্ধান পাও নাই। একের উত্তম পরিশ্রম মাত্র, বহুর উত্তম অমোঘ শক্তি।

ধারাগিরি

শ্রীগিরিবালা দেবী

ঘাটশীলা হইতে ধারাগিরি আট মাইল দূরে। হেমন্তের এক শিশিরসিক্ত প্রভাতে আমরা ধারাগিরিতে রওনা হইলাম। তখনো দিনের আলো ভাল করিয়া ফুটিয়া ওঠে নাই। রাখালের বাঁশের বাঁশী নীরব। ঘন পল্লবিত বনখণ্ড হইতে সবে ঘুঘু প্রভাতী বন্দনা আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের ডাইনের শাল অরণ্যের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যদেব কেবলি রংএর তুলিকা বুলাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এমন সুন্দর সোনার প্রভাতে গরুর গাড়ীতে ছইয়ের মধ্যে যাইতে আমরা কেহই রাজী হইলাম না। গাড়ী পিছনে রাখিয়া আমরা হাঁটিতে লাগিলাম। আমাদের সামনের বঙ্কিম পথটি কখনো উঁচু কখনো সমতল। প্রসারিত পথের দুই পাশে শাল, তমাল, মহুয়া ও কুরচিগাছের সারি। ঘুঘুর উদাস স্বর বিরাম বিহীন।

ক্রমে দিনের আলোয় ভুবন ভরিয়া গেল। গাছের পাতা হইতে, ঘাসের ডগা হইতে শিশিরের মুক্তাফলগুলি মুছিয়া গেল।

লোকালয় ছাড়িয়া আমরা নিবিড় বনে প্রবেশ করিলাম। এ বনে হরিতকী ও আমলকী থোকা থোকা গাছে ঝুলিতেছে। ছোট ছোট পাহাড়শ্রেণীর মাথায় সূর্য্যের আলো ঝকমক করিতেছে। কোথাও প্রান্তর কোথাও বা শ্যামল শস্যক্ষেত্র। অসংস্কৃত রাস্তা স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গভীর নালার সৃষ্টি করিয়াছে।

গাড়ী ঘুরিয়া চলিল, আমরা হাঁটিয়াই নালা পার হইতে লাগিলাম।

কিছু দূর আসিয়া আমাদের দেখা হইল গিরি-নদীর সহিত। রাশি রাশি উপলখণ্ড বুকে লইয়া কুলু কুলু গানে স্রোতস্বিনী বহিয়া যাইতেছে। বিজনে নৃত্যমুখরা তটিনীর চপলনৃত্য নিরীক্ষণ করিবার লোক নাই। এমন স্বচ্ছ সুমিষ্ট জল কেহ গাগরি ভরিয়া লইতেও আসে নাই। স্বল্প-জলা ক্ষীণা নদীর দুই তীরে কত অজানা ফুল নীরবে ফুটিয়া নীরবে ঝরিয়া যাইতেছে। নদীর একটানা গানের সহিত ঘুঘুর আকুল স্বর মিশিয়া বনবনান্তর মুখরিত হইতেছে।

নদী পার হইয়া আমরা সড়কের পথ ধরিলাম। এ রাস্তাটা গভীর জঙ্গলের দিকে চলিয়া গিয়াছে। কোথাও লোক নাই, লোকালয় নাই। বনভূমি নীরব—নিস্তব্ধ। উপরে বৃক্ষের চন্দ্রাতপ, আবছা আলোয় ম্রিয়মাণ ধরণীতল।

পথের ধূলায় বাঘ ও ভালুকের থাবার চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া আমরা বিচলিত হইলাম।

এক একখানা শালের ডাল লাঠির আকারে ভাঙ্গিয়া হাতে

লইয়া আমরা গাড়ীর সন্ধানে সড়ক হইতে নামিয়া এক অস্পষ্ট বনপথ ধরিলাম।

একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের নিকটে আসিয়া গাড়ীর দেখা মিলিল। গাড়োয়ান ও আমাদের পুরাতন ভৃত্য বলিল আমাদের পথপ্রদর্শক বালক-ভৃত্যটি রাস্তা ভুল করিয়া আমাদিগকে মানভূমের ভীষণ জঙ্গলের দিকে লইয়া গিয়াছিল। ভাগ্যে আমরা ফিরিয়াছি, নহিলে বাঘের পেটে যাইতে হইত।

এবার গ্রাম্যপথ, দূরে নিকটে সাঁওতাল বস্তি। ছোট ছোট কুটীরের চালে লাউ কুমড়া ঝুলিতেছে। রঙ্গামাটীর দেয়াল আলপনায় চিত্রিত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উঠানে উলঙ্গ শিশুর দল খেলা করিতেছে। চারিপাশে সোনার বরণ সরিষাক্ষেত বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে। কোথায়ো বা কনকচাঁপা রংএর পাকা ধান ঝলমল করিতেছে। পাহাড়ের ঢালুতে গরু চরিতেছে, ছাগল ভেড়া লাফাইতেছে। সাঁওতাল মেয়েরা দলবদ্ধ হইয়া মাটীর কলসীতে মাথায় করিয়া জল লইয়া যাইতেছে। তাহাদের কালো কুচ্‌কুচে নিটোল সুঠামদেহ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে শুভ্র শাড়ী। কুন্দদন্তে হীরকের ছ্যুতি, সযত্নে রচিত কবরীতে পুষ্পগুচ্ছ। ছায়াঘন মহুয়াতলায় সাঁওতাল তরুণের মেলা। তাহাদের স্কন্ধে তীর-ধনুক, কানে পাখীর পালক, হাতে বাঁশরী। গ্রাম ছাড়াইয়া আলের পথ ধরিলাম। দুইদিকে আখ ও পাকা ধান। বুনোহাতীর অত্যাচারে চাষীরা গাছের উপরে মাচা বাঁধিয়া নীচে আগুন জ্বালাইয়া রাতভোর পাহারা দেয়। তাহাদের কাছে শুনিলাম গত রাত্রে তাহাদের মাচার নীচ দিয়া প্রকাণ্ড একটা বাঘ নাকি চলিয়া গিয়াছিল। তবে তাহারা বিষবাণ নিক্ষেপ করিতে পারে নাই।

বাঁক ঘুরিয়া এবার আমরা পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। আমাদের এক পাশে পাদপ-পল্লব পরিশোভিত গিরিমালা, অন্যপাশে অতলস্পর্শী গহ্বর। পথ এত অপ্রশস্ত যে, পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া একখানা গরুর গাড়ী কোনরূপে চলিতে পারে মাত্র। অরণ্যের শুষ্ক পাতার সহিত ঝরণার ঝর্‌-ঝর্‌ শব্দ মিশিয়া স্থানটিকে ভীষণ মধুর করিয়া তুলিয়াছে!

ধীরে ধীরে গাড়ীর রাস্তা বিলীন হইয়া গেল। আর গাড়ী চলে না। এক সঙ্কীর্ণ পথ বাহিয়া আমরা ধারাগিরির পাদদেশে উপনীত হইলাম। আজ এপথে আমাদের সহযাত্রী কেহ আসে নাই। দলবদ্ধ হইয়া আসিবার সুযোগ আমরা পাই নাই। সঙ্গের চাকর দুইটিকে লইয়া আমরা তিনটি প্রাণী আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

গাড়োয়ানরা গাড়ী লইয়া মাইল খানেক দূরে রহিল। একটা শুঁড়ি পথ অতিক্রম করিয়া এক ক্ষুদ্র নদীর দর্শন পাইলাম। নদীর পারে ফাটল ধরিয়াছে। কখন বা ভাঙিয়া যায়। ফাটলের গায়ে বন্যহস্তীর গমনা-গমনের নিদর্শন পাইয়া মনটা তেমন প্রসন্ন হইল না। কিন্তু দূর হইতে কল-কল শব্দ শুনিয়া অনুমান করিলাম আমাদের যাত্রাপথ শেষ হইয়াছে। আমরা আসিয়াছি দূর-দূরান্ত হইতে যাহা আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া এ-দুর্গম গিরিগহ্বরে টানিয়া আনিয়াছে তাহা এখনই নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত হইবে।

উদ্ভাসিত হইতে বিলম্ব হইল না। চক্ষু জুড়াইয়া গেল, পথশ্রমে ক্লান্ত, ভীত-কম্পিত হৃদয় এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসে পূর্ণ হইল।

চারিদিকে আকাশস্পর্শী পাহাড় রেখাকারে ঘিরিয়া একটি নিভৃত স্থান রচনা করিয়া রাখিয়াছে। শ্যামল তরুলতিকায় নীলাকাশের ছবি আচ্ছাদিত। রবিরশ্মি আচ্ছাদিত মধ্যাহ্নেই সন্ধ্যার ঘনচ্ছায়া পরিস্ফুট।

সম্মুখের গিরিগাত্র বাহিয়া বহু উর্দ্ধ হইতে নির্ঝরিণী শত-সহস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। নিম্নে এক কুণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। বিক্ষিপ্ত জলরাশি সাদা কালো পাথরের স্তর ভেদ করিয়া নদীর আকারে ছুটিয়া যাইতেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ জলে বিচরণ করিতেছে।

হেমন্তে গিরিধারা শীর্ণ হইলেও কলতানের বিরাম নাই।

নির্জ্জন নিভৃতে, গিরিগুহায় প্রকৃতিরাণী যেন ঘুমাইয়া আছেন। বন-বনান্ত তাঁহার কমনদেহে সবুজ শাড়ী জড়াইয়া দিয়াছে। কুসুম-কুন্তলা বনশ্রী তাঁহাকে ফুল সাজে সাজাইয়াছে। শিয়রে জাগিয়া ধারাগিরি ঘুম-পাড়ানী গান গাহিতেছে। কি সুন্দর মহান দৃশ্য!

এখানে স্নান করিবার সংকল্প লইয়া আমরা বাহির হইয়াছিলাম, কিন্তু কুণ্ডের হিমশীতল জল স্পর্শ করিয়া স্নানের সাহস হইল না।

মাথায় জল দিয়া, হাত মুখ ধুইয়া এক প্রশস্ত পাথরে বসিয়া আমরা সঙ্গের আনীত খাদ্যদ্রব্য আহার করিলাম।

আহারান্তে পাথরের গায়ে সকলের নাম লিখিবার ধুম পড়িয়া গেল। আমাদের পদতলে লাল, নীল, সাদা রাশি রাশি শ্লেট-পাথর গড়াগড়ি যাইতেছিল। যাহার যে রং ইচ্ছা বাছিয়া লইয়া নাম লিখিলাম।

ইহার পর বিশ্রামের পালা, আবার সেই পথ সেই নিবিড় বনভূমি। প্রভেদের মধ্যে পশ্চাৎ হইতে গভীর কল-কল ধ্বনি, মহাকবির মহাসঙ্গীত যেন মত্তপবনে তাড়িয়া আসিতে লাগিল—

"আমি ভাঙিব পাষাণ কারা,
আমি ঢালিব, করুণা ধারা,
আমি জগত প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।"

"মতিমতাংশ্চ"

উমা দেবী

(১)

দুপুরে হাওয়ায় ঘূর্ণি উড়ায় সুপ্ত ধূলার শ্রান্তি
মধ্য-দিনের আকাশে অবশ সূর্য্যের সংক্রান্তি।
খর চৈত্রের রোদের ধোঁয়ায়
মেঘ ঘেমে ওঠে আকাশের গায়,
পিচঢালা পথ টলমল করে ক্লান্ত কলকাতায়,
হঠাৎ ঘূর্ণি বাতাস ছড়ায় শুক্‌নো শালপাতায়।
এঁটো কাঁটা মাখা শালপাতা—
টানা ফুটপাথে ভাবের খোলায় জমেছে আবর্জ্জনা…
গড়ি টেনে টেনে সাজায় দোকানি সাদা ও সেমিজ
কাটা কাপড়ের থান,
শশা কেটে কেটে মিশায় মসলা নুন……
চিনে বাদামের ছড়ানো খোলায় শোভিত দিগ্বিদিক…
হাড়-বার-করা উলঙ্গ ছেলে পয়সা চেয়ে বেড়ায়……
তারি মাঝখানে এক কোণ ঘেঁসে
শুরু ওঠে মন্থন হেসে—
মাটির বাসন মুখ দিয়ে চোখে চায়ে টুপটাপ ভর্ত্তি,
—"নিখুঁত গণনা দুই পয়সায়"—নিতাই চক্রবর্ত্তী।
—নিতাই চক্রবর্ত্তি!—
ত্রিশ বত্রিশ হয়তো বয়েস শরীর শ্যামল-কান্তি,
নিরীহ চক্ষে হতভাগ্যের আছে তামসিক শান্তি।
ধবধবে শাদা পৈতের গোছা
ফোঁটা ও তিলক ঘামে মোছা মোছা,
দীর্ণ ওষ্ঠে অসন্তোষের বিস্ময়-কর স্ফূর্ত্তি……
দুই পয়সার জ্যোতিষে বিকায় উদরের পরিপুষ্টি।
……শোনো ব্রাহ্মণ শোনো!—
মনের আগুনে আনো কি চোখের ধূমলাঞ্ছনা কোনো?
কোন বণিকের গণিকা-তুষ্টি-বিলাস মিটাতে গিয়ে
ব্রহ্মণ্যের শেষ সকল করেছো নিঃশেষিত?—
লোটা কম্বল নিয়ে—
আপন সিংহাসনের সর্ত্ত দিয়েছ বেবাক লিখে?
মনে কি পড়েনা আগেকার সেই শান্ত-কোমল চিত্র
কিছু ফলমূল কিছু বা অর্ঘ
গৃহলক্ষ্মীর মাটির স্বর্গ……
আলপনা আঁকা অঙ্গন ছেয়ে নব-জ্যোৎস্নার স্ফূর্ত্তি
পূজার যোগানে ব্যস্তচরণা কল্যাণময়ী মূর্ত্তি।

(২)

বর্ষার কিছু ঋণ জমেছিল এড়িয়ে কালের দৃষ্টি…
ধরা পড়ে তাই শোধ দিতে হ'ল একটি পশলা বৃষ্টি।
মেঘে তার ভার অক্ষমে মুখ
অর্থহারার শুরু শুরু বুক,
খেলে গেল চোখে তড়িৎ জ্বালায় অসন্তোষের দীপ্তি,
নগরী মেহুর মেঘ-মায়াতুর অকাল-দানের তৃপ্তি।

পথে বেধে গেল হুড়োহুড়ি……
লাল নীল কালো পাড়ের ঢাকনি অয়েল-ক্লথের ঢাকনাতে
চুপড়ি ছাতির জড়াজড়ি,—
দোকানদারির মেলানি ওটায় ব্যাক্‌ল্ দেদালে সারিসারি,
গরম পিচের ওপরে বৃষ্টি-পতনে ধোঁয়ার ভ্রম জাগে…
এলোমেলো হাট—দ্রুতগতি……
তখন দেখি যে বইগুলি তুলে,
তালি-দেওা ছাতা সাবধানে খুলে,
নামাবলী লেখা জড়িয়ে চাদর কাদার ছিটের ভস্তি,
বাড়ীমুখো ধায় বিরল-বদন নিতাই চক্রবর্তী।
—নিতাই চক্রবর্তি!—
বাই লেনে এক পুরোনো বাড়ীর পেছন দিকের অংশে,
একখানা ঘরে নীচের তলায় টিকিয়ে রেখেছে বংশে,
ছোট এক ফালি সাঁতা আঙিনায়
মুহূর্ত কাল দুপুর বেলায়
ঠিকরিয়ে রোদ ছিটকে উধাও কোন সুদূরের লক্ষ্যে,
ওঘির যেন চুড়ির ঝলক লাগে বুকের চক্ষে।
ঘরের দেয়ালে চুন-খসা……
দিনের বেলায় টিমটিমে আলো লণ্ঠন জ্বলে একপাশে,
ওঘাড়-বিহীন মাথার বালিশ তেলতেলা ;……
হায় সহরের মরীচিকা!—
সত্যকে তুমি মিথ্যা বানাও, পল্লীর দীপ নিভ্‌লো যে……
জ্বলেছিল দীপ একপাশে—
টলটলে স্রোত নদীর তীরের
ফুল ফল ঘেরা ছোট কুটীরের,
আঙিনায় হাসে চৈতী ফসল সন্ধ্যা আলোর ধন্যা,
শান্তির সাথে স্বাস্থ্য-শোভন ছিল প্রচুরের বন্যা।

(৩)

চোখে ভেসে আসে অতীত দিনের সুপ্তি মধুর স্বপ্ন,
দীপ্তকান্তি ব্রাহ্মণ-যুবা গ্রন্থ-পঠনে মগ্ন।
বুদ্ধি প্রখর ললাট দীপ্তি—
তপঃ ক্লীর্ণ অধরে তৃপ্তি—
গৈরিক-লেপা গৃহ-অঙ্গনে শুকায় পট্ট বস্ত্র…
হৃদয়ক্ষেত্রে নিগ্রহণের তর্কশানিত অস্ত্র।
নদীর জোয়ার বাঁধবে কে?—
তরুণ্যের বাঁধা-পথ তাই ধুয়ে মুছে কাল দিল ভেঙে,
বিদ্যা-কামুক সভ্যকামেরা মুক্ত মন।…
নানা দিক হ'তে নানা জনে তাই সাজায় জীবন-তথাকে,
সুপারিশ নিয়ে চিরকাল হায়—চলেনাতো—
একদিন ধরা পড়ে ফাঁকি,……
তাই দেখি আজ কালের অন্তে
বড় বোঝা নিয়ে লুটায় পন্থে
ভাগ্যের ফেরে বড় ছিল যারা ভাগ্য যখন পড়্‌তি,
পথে আজ তাই পড়ে থাকে তারা নিতাই চক্রবর্তী।
—নিতাই চক্রবর্তি!—
একবার হায় ভেঙেছে যখন মোহ সনাতন ধর্মে,
ভাঙ্‌বে সে মোহ "দুই পয়সায়-নিখুঁত-গণনা"-কর্মে।
যিনি পয়লার থাকবার স্থান
পাতালের তলে করো সন্ধান,—
অন্ধকারের স্নেহ-মমতায় শীতল মাটির বক্ষ,
উপর—আলোকে চক্ষু ধাঁধাঁয় সূর্যেরা দুর্লক্ষ।
—অনেক অত্যাচারে—
দৈনন্দিন জীবন যাত্রা ক্রমেই স্তিমিততর।—
আরব দেশের পার থেকে আসে উড়ো জিন যাদুকর ;—
মন্তরে তার সোনা হয় ধূলামুঠি,—
পথে পথে রোগা উলঙ্গ ছেলে পয়সা চেয়ে বেড়ায়,
—হঠাৎ দুপুরে ঘূর্ণি হাওয়ায় উড়ায় শুষ্ক পত্র—
চৈত্রের রোদে আকাশ ধোঁয়াটে
মনে হয় যেন মেঘ নেমে ওঠে,
ছায়া লেগে তার জীবনে হঠাৎ নবোন্মাদনা সৃষ্টি,
এই তো সময়!—দাও—মেঘ দাও একটি পশ্‌লা বৃষ্টি।

জয়তু গান্ধিজী—গত ২রা অক্টোবর গান্ধিজীর ৭৭তম জন্মদিবস ভারতের সর্বত্র ও পৃথিবীর বহুস্থানে তাঁর লক্ষ লক্ষ দেশবাসী ও অনুরাগীদের দ্বারা সুগভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছে। গান্ধিজী নিজেই বলেছেন তিনি ১২৫ বছর বাঁচবেন বলে' আশা করেন। আমরাও প্রার্থনা করছি তিনি ১২৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থেকে স্বাধীন ভারতে তাঁর সাধনার সিদ্ধি দেখে যান। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে গান্ধিজীর অবদান অতুলনীয়। বর্তমান সভ্যতা যে ভাবে মানুষকে ক্রমাগত মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যে-ভাবে যুদ্ধের পর যুদ্ধে মানব-সভ্যতাকে কলংকিত করছে গান্ধিজীর অহিংসা, চরকা, খাদির মন্ত্র কি সেই সভ্যতাকে মরণের মুখ থেকে বাঁচাবে না? যে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা মানুষকে বহির্মুখীন করেছে সেই সভ্যতার পরিণতি সম্বন্ধে আজ সমগ্র মানব মনীষা সচকিত হয়ে উঠেছে—গান্ধিজীর চরকা ও খাদির মন্ত্র তাঁদের নতুন পথ দেখিয়েছে, তাঁদের চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনকে গান্ধিজী যে ভাবে মোড় ঘুরিয়েছেন তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। পরাধীনতার জগদ্দল চাপে জাতির অন্তরাত্মা যখন নিষ্পেষিত—গান্ধিজী সে সময়ে এলেন সম্পূর্ণ নূতন এক কার্যপদ্ধতি নিয়ে। সেই কর্মপদ্ধতি জাতিকে আত্মমর্যাদাবোধ শিখিয়েছিল, রাজনীতিক চেতনাকে কেদারাবিলাস থেকে নিয়ে এল একেবারে চাষীর পর্ণকুটীরে—নিয়ে এল তাকে মজুরের হাতিয়ারের কাছে।

বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী যারা রাজনীতি করেছিল তারা গান্ধিজীকে কোনদিনই বিশ্বাসের চোখে দেখেনি এ কথা আজ গভীর পরিতাপের ভেতর স্বীকার করতে হবে। তাদের শ্রেণী স্বার্থ তাদের এমন অন্ধ করে রেখেছে যে তারা কংগ্রেসের অগ্রগমনকে প্রাণপণে বাধাই দিয়ে চলেছে। গান্ধিজীর অহিংসা, চরকা, খাদি, অস্পৃশ্যতা নিবারণ—এর রাজনৈতিক দিকটা বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী কিছুতেই স্বীকার করে নেয়নি। তার কারণ তাঁর শ্রেণী স্বার্থ। কিন্তু কালের রথ চলেছে সমস্ত বাধা বিপত্তি তার চাকার নিচে গুঁড়িয়ে। তার কুযুক্তি দিয়ে সে আর ইতিহাসের অগ্রগমনকে বন্ধ রাখতে পারছে না। বর্তমান যুদ্ধে মানব সভ্যতা যে ভাবে বিপন্ন হয়েছে তাতেও যদি আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টি না খুলে তবে ধ্বংসের হাত থেকে তাকে মুক্তি দিবে কে?

আজ গান্ধিজীর ৭৭তম জন্মদিবসে তাঁর প্রতি আমাদের অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ—বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রাক্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষের কারামুক্তিতে আমরা তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ জানাচ্ছি। বাংলার যে-সব বীরসন্তান দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। দেশের জন্য এমন সর্বস্ব ত্যাগের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল বললে কিছু মাত্র অত্যুক্তি হয় না। জীবনের ৫৩ বৎসরের ভেতর ২৩ বৎসর শুধু বন্দী ভাবেই তাঁর জীবন কেটেছে, তাঁর ধনজন সম্পত্তি সবই তিনি দেশ মাতৃকার বেদীতে দান ক'রে নিঃস্ব হয়েছেন। অগ্নিযুগের এই নীরব কর্মীর পরিচয় সংবাদপত্রের মারফৎ ঢক্কানিনাদে প্রচারিত না হলেও যাঁরাই দেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে বিন্দুমাত্র যুক্ত তাঁরাই সুরেন্দ্রমোহনের সঙ্গে পরিচিত। সুরেন্দ্রমোহনের অসামান্য সংগঠন শক্তি ও মনীষা, তাঁর অদম্য কর্মশক্তি ও চারিত্রিক শৌর্য তাঁকে আদর্শ মানুষ হিসাবে জাতির সামনে দাঁড় করিয়েছে। দেশজননীর এই বীর পুত্রকে আমরা আমাদের সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের কারামুক্তিতে সমগ্র দেশ যেভাবে আনন্দিত হয়েছে,

তাতেই তাঁর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কারুর কোনো সন্দেহ নেই। সুভাষচন্দ্রের আকস্মিক ও শোচনীয় তিরোধানে সমস্ত জাতির সহানুভূতি শরৎচন্দ্রের উপর যেয়ে পড়েছে। তাঁর কারামুক্তিতে আমরা তাঁকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি। যে দায়িত্ব শরৎচন্দ্রকে এখনই গ্রহণ করতে হবে তার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। বাংলায় কংগ্রেস আন্দোলনের ভবিষ্যৎ তাঁর উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে তিনি বাইরে এসেই কংগ্রেসের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। দলের মোহ এতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে কংগ্রেসকে কোন কাজই করতে দেয় নাই বললে অত্যুক্তি হয় না। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের যোগ-সূত্র একারণেই অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল। আগষ্ট আন্দোলনে দেশবাসী কংগ্রেসের নামে যে বিরাট বিপ্লবের সূচনা করেছিল তা' দেশবাসীর সঙ্গে কংগ্রেসের নাড়ীর যোগ কত গভীর তা প্রমাণ করেছে। আমরা আশা করি সুরেন্দ্রমোহন ও শরৎ-চন্দ্র একযোগে কংগ্রেসের আদর্শ দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করবার ভার গ্রহণ করে সমগ্র দেশে কংগ্রেসকে বলীয়ান করে তুলবেন।

কলিকাতার ট্রাম ধর্মঘট—কলিকাতার মত ব্যবসায় বহুল কর্মচঞ্চল সহরে ট্রাম ধর্মঘট হলে সহরবাসীর অসুবিধার সীমা থাকে না। এই সহরে ট্রামে শ্রমিকদের এরূপ ধর্মঘট যে-কারণে হয়েছিল তা অত্যন্ত সামান্য এবং ট্রাম কোম্পানীর মত ধনী ব্যবসায়ীর কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ। শ্রমিকেরা যে বোনাস চেয়েছিল, কোম্পানী তা জল ঘোলা করে শেষকালটায় দিতে বাধ্য হয়ে নিজেদের অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন মাত্র। শ্রমিকদের দাবীর প্রায় সমস্তটাই কোম্পানী বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছেন—অথচ প্রথমেই যদি তাঁরা অমন অনমনীয় ভাব অবলম্বন না করতেন তবে সকলেই তাঁদের সুবুদ্ধির প্রশংসা করত। কোম্পানীর পরিচালকেরা বিদেশী বলেই যে এরকম একটা বিশ্রী ব্যাপার হতে পেরেছে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। সহরবাসীর অসুবিধাকে তাঁরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না, সেজন্যই তাঁরা এ ধর্মঘট হতে দিয়েছেন। শ্রমিকদের দাবী মোটামুটি তাঁরা মেনে নিয়েছেন অথচ তাঁরা বিলেতের ডিরেক্টর বোর্ডের দোহাই দিয়ে এই ব্যাপারটা এতদিন ফেলে রাখতে কুণ্ঠিত হন নাই। এয়ারগ্রাফ, এয়ারমেল, টেলিগ্রাম ও বেতারের যুগে বিলেত যে এদেশ থেকে বেশি দূরে নয় এ কথাটা কোম্পানীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের মগজে কি ঢোকে নাই?

বাঙ্গলায় আই-সি-এস্ চালিত সরকারের দায়িত্ব এ-বিষয়ে মোটেই কম নয়। যে ভারতরক্ষা আইনের সহায়তা নিয়ে দিনকে রাত ও রাতকে দিন এঁরা করছিলেন সেই আইন শাদা চামড়াওয়ালা ট্রাম কোম্পানীর পরিচালকদের বিরুদ্ধে কেন প্রযুক্ত হয় নাই? আই-সি-এস্ ওয়াকার যে ভাবে এই ধর্মঘটকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করছিলেন তাতে তাঁর সুনাম বিন্দুমাত্রই বাড়ে নাই। এ ভাবে কোনো স্বাধীন দেশে কাজ করলে সেদিনই যে তাঁকে তল্পীতল্পা নিয়ে বিদায় হতে হ'ত সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই ধর্মঘটে ট্রাম শ্রমিকেরা যে নিষ্ঠা, সংযম ও নিয়মানুবর্তিতা দেখিয়েছে তা যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য। ভারতবর্ষের মজদুরেরা যেদিন তাদের মত নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা পাবে সেইদিনই যে আমাদের ভাগ্যাকাশে একটী বিপুল পরিবর্তন দেখা যাবে তাতে সন্দেহ নেই। একটা বৈপ্লবিক অগ্র-গমনের দীক্ষা ভারতবর্ষের মজুরদের নিতে হবে এবং শ্রমিক কর্মীদের এবিষয়ে এখন থেকেই শিক্ষা দিতে হবে। তাদের নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতাই যে স্বাধীনতার আগতপ্রায় সংগ্রামে বিপ্লবীসৈন্যদের পুরোভাগে স্থান নেবার সুদুর্লভ গৌরব তাদের দেবে—এই কথা তাদের জানতে হবে। শুধু মাইনে বাড়ান বা বোনাস পাওয়াটাই সব কিছু নয়। এ অতি সামান্য জিনিস এবং আদতে সংগ্রামের আদর্শকে সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতর করে' ফেলে।

অ্যালেনবারির মোটর কারখানায় ধর্মঘট—কলিকাতার অ্যালেনবারি কোম্পানীর সুবৃহৎ মোটর কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট সুরু হয়েছে। কোম্পানী এই যুদ্ধের বাজারে যে লাভ করেছে তাতে শ্রমিকদের বোনাসের সামান্য দাবীকে যে তারা অগ্রাহ্য করতে পারে একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কোম্পানীর লাভের কত অংশ শ্রমিকরা পায়

সেকথা কি কোম্পানীর মালিকেরা বিবেচনা করে দেখেছেন ?

ট্রাম শ্রমিকদের মত আলেনবারির শ্রমিকেরাও সুসংহত ভাবে দাঁড়িয়েছে। আমরা আশা করি অপ্রীতি আর বৃদ্ধি না করে কোম্পানী শ্রমিকদের দাবী শীঘ্রই মেনে নেবেন। প্রকাশ কোম্পানীটি বর্তমানে একটি বিহারী কোম্পানী কিনে নিয়েছেন। অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাগে যদিও দেশী ও বিলাতী মনিব একই গোত্রের তবু দেশের লোকে দেশী মনিবদের সম্বন্ধে অনেকটা সহানুভূতিসম্পন্ন। আমরা আশা করি স্বদেশীয় শ্রমিকদের দাবী সত্বর দূর করে তাঁরা দূরদর্শিতার পরিচয় দেবেন।

যাঁরা এই সব ধর্মঘটের নেতা তাঁদের একটা কথা আমরা স্মরণ রাখতে অনুরোধ করছি। কেবল ধর্মঘটের সময়ই তাঁদের কাজ নয়, শ্রমিক সংহতিকে দৃঢ় করা এবং একটা বৈপ্লবিক আদর্শ শ্রমিকদের সামনে তুলে ধরা তাঁদের সব চাইতে বড় কাজ। বর্তমানে যাঁরা শ্রমিক নেতৃত্ব দাবী করেন 'লাল ঝাণ্ডা কি জয়' চেঁচিয়েই সাধারণতঃ তাঁরা তাঁদের কর্তব্য সম্পন্ন হয়েছে মনে করেন। শ্রমিকদের বৈপ্লবিক চেতনা বাড়াবার জন্য তাঁদের চেষ্টা অতি সামান্য। এ বিষয়ে শ্রমিক নেতাদের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করছি।

প্রাচ্যে 'জনযুদ্ধের' উপসংহার—ভারতবর্ষের 'জনযুদ্ধ'-ওয়ালারা যখন চাষীকে তার ঘরের খাদ্যসম্ভার সরকারের দালালদের হাতে ছেড়ে দেবার জন্যে আন্দোলন করছিল তখন তারা এই ভরসাটা অপরোক্ষে দেশবাসীকে দিচ্ছিল যে তারা এর জন্য না খেয়ে মন্বন্তর ও মহামারীর কবলে পড়লেও শেষাশেষি দেশে চাষী মজুরের এতে কল্যাণই হবে—ইংরেজ তাদের স্বাধীনতা দেবে, তাদের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থা ঘুচবে। কংগ্রেস যখন প্রত্যেকটি গ্রামকে অন্ন ও বস্ত্রের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হতে উপদেশ দিচ্ছিল তখন তারা কংগ্রেসের সে প্রচেষ্টাকে 'পঞ্চম বাহিনীর পরামর্শ' বলে ইংরেজের প্রচারকের চাইতেও অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে চেঁচিয়ে যাচ্ছিল।

যুদ্ধ শেষ হয়েছে। ভারতবর্ষের লোকেরা নিজে না খেয়ে ইংরেজকে এই যুদ্ধ জয়ে সাহায্য করেছে। জনযুদ্ধ-ওয়ালারা যে ভরসা দিয়ে তাদের এই যুদ্ধে সাহায্য করতে প্ররোচিত করেছিল, যুদ্ধের পর দেশবাসী কি সে ভরসার ক্ষীণতম রশ্মিটুকুও দেখতে পেয়েছে ? এই মন্বন্তর, এই মহামারী মৃত্যুঞ্জয় শিবের মত দেশবাসী যে আকণ্ঠভরে পান করল—সে-সব কিসের জন্য ? জনযুদ্ধ-ওয়ালারা এ-প্রশ্নের উত্তর এখন দেয়ই না, উল্টো এই প্রশ্নকে এড়িয়ে যাবার জন্যই সবরকম চেষ্টা করছে।

কেবল আমাদের দেশে নয়, ইন্দোচীন প্রভৃতি শ্বেত-সাম্রাজ্যবাদের অধিকৃত স্থানেও 'জনযুদ্ধে'র মহিমা প্রকট হচ্ছে। ফরাসী ইন্দোচীন ও ডাচ ইষ্ট ইণ্ডীজ থেকে জাপানীরা বিদেশীদের তাড়িয়ে যে স্বাধীন রাজ্য গঠন করতে সাহায্য করেছিল সে সব দেশের লোকেরা নতুন করে আবার তাদের পুরোনো পরাধীনতায় ফিরে যেতে রাজী হচ্ছে না। ফরাসী ইন্দোচীনে ইংরেজ আনামীদের সাবেহা করার ভার নিয়েছে, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডীজেও তাই। ইংরেজের বেতনভোগী ভারতীয় সেনারা 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' রাখবার মহৎ কার্যে সাইগনে অগ্রসর হয়েছে। 'শান্তি ও শৃঙ্খলা' রাখার অর্থটা যে কি সে কথা ইওরোপের লোকেরা জানে কি না জানি না, কিন্তু আমাদের দেশের শিশুরাও তার আসল মানে কি তা জানে। যারা মনে ভেবেছিল যে যুদ্ধের পর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর 'হৃদয়ের পরিবর্তন' হবে এবং পরাধীন দেশগুলি স্বাধীনতা পাবে, ফরাসী ইন্দোচীন ও ডাচ ইষ্ট ইণ্ডীজ তাদের চোখ খুলে দিয়েছে। আনামী ও ডাচ ইষ্ট ইণ্ডীজের অধিবাসীরা যেভাবে তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য দাঁড়িয়েছে তাতে ফরাসী ও ওলন্দাজদের সুর অনেকটা নামাতে হয়েছে। ফরাসী ইন্দোচীনে ফরাসীরা ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস দেবার ভাণ করছে এবং ডাচ ইষ্ট ইণ্ডীজেও অই ধরণের একটা রফা করবার চেষ্টা হচ্ছে।

এই যুদ্ধটা যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির নিজেদের ঔপনিবেশিক অধিকারকে পাকাপাকি ভাবে কায়েম করবার একটা চেষ্টা কংগ্রেস এই কথাটা সর্বপ্রথমেই বুঝেছিল এবং সেজন্যই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে তাদের যুদ্ধের লক্ষ্য কি সেবিষয়ে ঘোষণা করবার জন্য দাবী জানিয়েছিল। কংগ্রেস জানত যে এই যুদ্ধে ইংরেজ-মিত্রপক্ষ জিতলে তাদের অধীন রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা ত তারা দেবেই না, বরঞ্চ যুদ্ধজয়ের ফলে নিজেদের

শক্তিবৃদ্ধির দরুণ বর্তমান অবস্থাকে আরও পঙ্গু করে ফেলতে চেষ্টা করবে। ভারতবর্ষে ক্রিপস্ প্রস্তাব যতটা এগিয়েছিল, ওয়াভেলের দ্বিতীয় প্রস্তাব যে তার চাইতে অনেক অস্পষ্ট সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। গ্রীসে, ফরাসী ইন্দোচীনে, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডীজে ইংরেজ যে ভাবে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব অবলম্বন করেছে তাতেই বোঝা যায় যে জনযুদ্ধ-ওয়ালারা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেমন ভাবে আঘাত করেছিল।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী—তিন বৎসর পরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন গত ২১শে সেপ্টেম্বর বোম্বাই সহরে বসেছিল। বিগত তিন বৎসরের ইতিহাস জাতির পক্ষে পরম গৌরবের ইতিহাস। স্বাধীনতার সংগ্রাম যে কুসুমাস্তীর্ণ পথ দিয়ে চলে না জাতি গত তিন বৎসরে সে পরিচয় পরিপূর্ণভাবে পেয়েছে—এবং সেও তার কার্য দিয়ে প্রমাণ করেছে যে, সেই কণ্টকাকীর্ণ উপলবন্ধুর পথ অতিক্রম করতে সে এতটুকু নারাজ নয়। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর বোম্বাই অধিবেশন আগষ্ট বিপ্লবে জাতি যে অংশ গ্রহণ করেছিল তার জন্য তাকে অভিনন্দিত করেছে। কমিটীর সম্মুখে মূলতঃ দুইটী সমস্যা ছিল—এক, আগষ্ট বিপ্লব এবং দুই, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যা। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য কংগ্রেস এতদিন মুসলীম লীগের নিকটই গিয়েছিল। লীগের দাবী কংগ্রেস যতই মেনে নিয়েছে ততই তার দাবীর পরিমাণ অধিক হলেও লীগ নেতৃত্ব কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রামে এতটুকু এগিয়ে আসে নি। বরঞ্চ লীগ-নেতৃত্ব যে সব দিক দিয়েই প্রতিক্রিয়াশীল সে কথাই তার কথায় ও কাজে প্রমাণ করেছে। লীগ-নেতৃত্ব ভারতবর্ষের মুসলমানদের অর্থনৈতিক সামাজিক অগ্রগতির জন্য কিছুই করে নাই একথা বলা মোটেই অত্যুক্তি নয়। হিন্দুস্থান কি পাকিস্তান কাদের স্বাধীনতাই যে লীগ-নেতৃত্বের কাম্য নয়—এটা তারা নানাদিক দিয়ে প্রমাণ করেছে। এজন্যই কংগ্রেস এখন সোজা মুসলমান সমাজের কাছে যেয়ে কংগ্রেসের আদর্শ ও নীতির কথা তাদের ভেতর প্রচার করতে মনস্থ করেছে। মুসলমান সমাজ যদি মনে করে যে, হিন্দুদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করা তার স্বার্থের অনুকূল নয় তবে তারা আলাদা হ'য়ে গেলে কংগ্রেস সাধারণভাবে তাতে আপত্তি করবে না। আমরা কংগ্রেসের বর্তমান নীতি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। কংগ্রেসের আদর্শ এখন ক্রমাগতই গণ-নীতির দিকে প্রসারিত হ'চ্ছে। কংগ্রেস এখন স্বাধীনতা চায় চাষী-মজুরের জন্য। কংগ্রেস এখন স্বাধীনতা বলতে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা বোঝে না, স্বাধীনতার দ্যোতনা এখন জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতাকে বোঝায়। সমাজের যারা শতকরা ৯৯ জন তাদের অভাব-মুক্তিই কংগ্রেসের সাধনা। হিন্দু মহাসভা বা মুসলিম লীগ স্বাধীনতা বলতে এরূপ সর্বব্যাপক অবস্থাকে স্বীকার করে না। তারা স্বাধীনতা বলতে বোঝে রাষ্ট্রের ও সমাজের ক্ষমতা নিজেদের শ্রেণীর আয়ত্তে আনা। কংগ্রেসের সঙ্গে এই সব সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের তফাৎ এইখানে। কমিটী এবার সমস্ত কংগ্রেস কর্মীদের মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রবেশ ক'রে কংগ্রেসের আদর্শ সম্বন্ধে প্রচার করতে ব'লে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা মনে করি যে, পাকিস্তান বা অখণ্ড ভারতবর্ষ আমাদের সমস্যা নয়। সমগ্র দেশে ও সমাজের সর্বস্তরে যদি সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতার বাণী পৌঁছে তবে সমাজই তার ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা স্থির করবে।

ওয়াভেল পরিকল্পনা—ইংল্যাণ্ডে শ্রমিক সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ সম্বন্ধে যাঁরা উৎফুল্ল হয়েছিলেন, ওয়াভেল ও অ্যাটলীর ঘোষণায় তাঁরা অত্যন্ত নিরাশ হয়েছেন। এই সব ঘোষণায় ভারতবর্ষকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে দেওয়া হবে সে কথাটি পর্যন্ত বাদ দেওয়া হয়েছে। যে কথার মারপ্যাঁচ রক্ষণশীল ও উদারনীতিক দলগুলির একচেটিয়া ছিল সে মারপ্যাঁচ শ্রমিকদল পুরোপুরি ভাবেই শিখেছেন। চার্চিল গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে ব'লে ক্রিপ্‌স প্রস্তাবে জানিয়েছিলেন কিন্তু অ্যাটলী সরকার ঐ কথাটিকে সোজা সুজি বাদ দিয়েছেন—পরে অবশ্য ভাষ্যকারদের আবির্ভাবে বিলম্ব হয় নাই। কংগ্রেস কমিটী যে এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকবে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মিত্রপক্ষের জয়লাভের পর পৃথিবীতে পরাধীনতার অবসান হবে ব'লে যারা আশান্বিত হ'য়েছিলেন তাঁরা বিলেতে শ্রমিকদলের জয়ের ভেতর আশার আলোক দেখেছিলেন। কিন্তু শ্রমিক দল যত বড় বড় কথাই বলুক না ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার দুঃসাহস তাদের হ'তে পারে না, এ কথাটা আমরা প্রথম থেকেই বলে এসেছি। যুদ্ধের ফলে বৃটেন আজ দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হয়েছে, এখন ভারতবর্ষ তার হাত ছাড়া হ'লে তার অবস্থা যে কি হবে সে বিষয়ে তার চাইতে সেকথা আর কেউ ভাল জানে না। কংগ্রেসের নির্বন্ধতা সত্ত্বেও ইংরেজ মিত্রপক্ষ যখন কেন তারা যুদ্ধে নেমেছে সেকথা খুলে বলেনি তখনই কংগ্রেস সোজাসুজি বলেছিল যে, এ যুদ্ধে ভারতবর্ষ যোগ দিতে পারে না। কারণ এ যুদ্ধ পরাধীনের বন্ধনমুক্তির জন্য নয়। বৃটেনের শ্রমিকদল যে ভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে যুদ্ধের সময় কংগ্রেসের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ যে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক হয়েছিল, সেকথাই প্রমাণিত হচ্ছে।

কংগ্রেসের পুনর্গঠন—যে সব কংগ্রেস কর্মী কারা-কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসেছেন তাঁদের সামনে দুরূহ কার্যভার রয়েছে। প্রাথমিক কংগ্রেসকমিটীগুলি এখনই গঠন করবার ভার তাঁদের নিতে হবে। গ্রামে গ্রামে যেয়ে প্রত্যেককে কংগ্রেসের সভ্য করতে হবে। গ্রামের ভেতর যেয়ে চাষীদের কাছে জানাতে হবে কংগ্রেস কি চায়, কংগ্রেসের আদর্শ কি, কংগ্রেস যে আদর্শলাভের জন্য, তার সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য কোন্ পন্থায় অগ্রসর হবে, দেশবাসীকে সেজন্য কি দিতে হবে। কেবল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কংগ্রেস আন্দোলনকে আবদ্ধ করে রাখলে কংগ্রেস দুর্বল না হ'য়ে পারে না। এতদিন পর্যন্ত আমাদের কর্মীদের কার্যের ত্রুটী ছিল তাই সেজন্যই এখনও পর্যন্ত আমাদের সাধনা সিদ্ধিলাভ করে নাই। কংগ্রেসের অর্থনৈতিক আদর্শ কি সেই কথাটি আমাদের কর্মীকে বলে সে বিষয়ে একনিষ্ঠ প্রচার করতে হবে।

'কংগ্রেসের পুনর্গঠন' সম্বন্ধে এই সংখ্যায় জনৈক প্রবীন কংগ্রেস নেতার একটী প্রবন্ধ অন্যত্র প্রকাশিত হইল। এই প্রবন্ধটির প্রতি আমরা প্রত্যেক কংগ্রেসনেতা ও কর্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা আশা করি যে, কংগ্রেসকে monolith organisation করা সম্বন্ধে কোনো কর্মীই দ্বিমত হবেন না। যারা কংগ্রেস প্রগতিতে ভীত তাঁরাই সাধারণতঃ কংগ্রেসকে monolith organisation রূপে দেখতে চান না। তাঁরা বলেন যে, এতে কংগ্রেসের প্রসার সংকীর্ণ ও শক্তি দুর্বল হ'য়ে পড়বে। একথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। প্ল্যাটফর্ম বিলাবে কংগ্রেসকে ব্যবহার করলেই কংগ্রেস দুর্বল হ'য়ে পড়বে—একনিষ্ঠ কাজ করবার ক্ষমতা তার থাকবে না। আগষ্ট বিপ্লবে দেখা গেছে যে জনসাধারণের হাতে সমস্ত কর্তৃত্ব বেরে পড়ুক, এই নীতির যারা বিরোধী তারাই আগষ্ট বিপ্লবের বিরোধিতা করেছেন, কেউ জনযুদ্ধের নামে, কেউ 'শান্তি ও শৃঙ্খলার' নামে, কেউ বা মুসলিম লীগের নামে। কংগ্রেসের এই একান্ত বৈপ্লবিক অগ্রগমনকে ব্যাহত করবার জন্য, সর্বপ্রকারে তাকে ধ্বংস করবার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দেশের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী ও দল হাত মিলিয়েছে। আগষ্ট আন্দোলন হ'তে অনেক ব্যাপক, অনেক সুসংহত, অনেক তীব্র, এক বিপ্লব অতি দ্রুত আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে—প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণ থেকে একে রক্ষা করবার জন্য, একে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কংগ্রেসকে এখনই প্রস্তুত হ'তে হবে। এবং সেজন্যই কংগ্রেসকে monolith organisation-এ পরিণত করবার জন্য প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীকে অগ্রসর হ'তে হবে। কংগ্রেস তার প্রতিটি সদস্যের কাছ থেকে অবিভাজ্য আনুগত্য চায়। অবিভাজ্য আনুগত্য না পেলে কোন প্রতিষ্ঠানই বড় হ'তে পারে না; সেজন্যই লেনিন বলশেভিক দল থেকে সমস্ত রকম বিরুদ্ধবাদীকে তাড়িয়ে দিয়ে বলশেভিক দলকে অমন শক্তিমান করে কম্যুনিষ্ট বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ইহা কি আসল রূপ ?—গরুড় পক্ষীর ডানায় ভর করে অত্যাচার ও অবিচার অনেকই এসেছে দেশে, আশংকা করা যায় আরও আসবে। তবে সেই অবিচারটী কোন্ কালে আসে সেইটাই বিচার্য্য বিষয়। আজ যখন দেশের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেবার জন্য বিশেষ রাজনৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হচ্ছে তখন নিম্নলিখিত সংবাদটি সবার মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করবে।

আমরা সংবাদটি নীচে আংশিকভাবে প্রকাশ করলাম। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু গত ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার নিকট এক বিবৃতিতে এলাহাবাদ থেকে বলেছেন, "……কাশীতে সেদিন যে ঘটনা ঘটেছে তাতে আমি আতঙ্কিত ও ঘৃণা বোধ করছি। ঘটনার বিবরণ আমার নিকট বহেতে পৌছায়। তিনজন বিচার-সাপেক্ষ রাজনৈতিক বন্দীকে কোর্টে নিয়ে যাবার কথা ছিল, কিন্তু কোর্টের দূরত্ব প্রায় এক মাইল। বন্দীদের হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ি থাকা সত্বেও তাঁদেরকে হেঁটে যেতে হুকুম করা হয়। তাঁরা জানায় যে পায়ে বেড়ি নিয়ে হাঁটা যায় না, কোন যানবাহনের ব্যবস্থা হোক। এসব ত প্রত্যাখ্যাত হয়-ই, পরন্তু তাঁদের ধাক্কা দিয়ে ফেলে মরা জন্তুর মত হাত-পায় টেনে-হিঁচড়ে কোর্ট অবধি নিয়ে যাওয়া হয়। যখন তাঁরা গন্তব্যস্থলে পৌছাল তখন দেখা গেল যে কাপড়-চোপড় পিঠ ও কোমর সবই ক্ষতবিক্ষত এবং রক্ত ঝরছে। পথে জল চাইতে তাঁরা পায় নিছক অপমান।"

এ জাতীয় ব্যবহার এদেশে খুব নোতুন নয়। দেশের দুর্ভাগ্যের জন্য যাঁরা লড়াই করেন তাঁদের এজাতীয় ব্যবহার অনেকটা গা-সওয়া পাওয়ানা বলেই আমরা মনে করি। দেশে শুনতে পাই রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিয়ে ভারতের জন্য গঠনতন্ত্র রচনার উপযোগী রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি হচ্ছে, এবং যাতে করে আমরা "forgive এবং forget" কথাটার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারি—এমন একটু ছোটখাট অনুরোধও সরকার পক্ষ থেকে করা হয়েছে, অথচ সরকারের রাজভক্ত কর্মচারীরা forgive ও forget কথাটার ব্যাখ্যা এমন ভাবেই দিচ্ছেন যে দেশের লোকের মন আবার নোতুন করে ভাবতে সুরু করেছে যে তাহলে কি হল। এগিয়ে কি এইটে-ই প্রমাণ হয় না যা শুনছি আসলে তা কিছু নয় স্রেফ ভাওতা।

শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত কেরাণী—মাঝে মাঝে খুচরো খবর পাওয়া যাচ্ছে যে, যুদ্ধ বন্ধ হবার পরই ভারতের ধনিক শ্রেণীর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে। এঁরা এতদিন বহাল তবিয়তে ভারতের মধ্যবিত্ত কেরাণী ও অগণিত শ্রমিকের মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ দু'পয়সা করেছেন। Dearness allowance ও Bonus প্রভৃতির অন্তরালে নিজেদের আসল স্বার্থটি গোপন রেখে কেরাণীকুল ও মজুরকুলকে কোন রকমে তোষণ করে এসেছেন এঁরা। কোন কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাদের মজুরদের জন্য যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে নোতুন স্বর্গ রচনা করে দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। এঁরা Labour Welfare Officer থেকে সুরু করে Canteen পর্য্যন্ত সব ব্যবস্থাই করেছেন। কিন্তু আসল ক্ষতে বরাবরই প্রলেপ দেওয়ার অতিরিক্ত কিছু করেন নাই। স্বর্গ কোথায় রচনা হয়েছে জানি না তবে শ্রমিকদের জন্য কেমন গোয়াল ঘরের ব্যবস্থা হয়েছে তা যদি কেউ ইছাপুর, শ্যামনগর প্রভৃতি এলাকা দর্শন করেন তবে বুঝতে পারবেন। কিন্তু এতদিন নিছক শ্রমিক ও চাষীর কথাই ছিল প্রধান। এদের সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনধারণের সমস্যা। বাঙলা দেশের ক্ষয়িষ্ণু নিম্ন মধ্যবিত্ত হিন্দু ও মুসলমান ভূমিহীন ভ্রাম্যমান চাষী বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে এরা বহুল অংশে কলের মজুরে পরিণত হয়েছে। এরা সমাজের দুই অংশ থেকে এসে যুদ্ধকালীন ধনিক শ্রেণীর ধনের বাহন হয়েছে মাত্র। এই দুটো শ্রেণীই আজ এক সঙ্গে ছিন্নমূল তরুর মত সমাজের দ্বারে পড়ে আছে। পুরোনো সমস্যার সঙ্গে এই নোতুন সমস্যা এসে দেশের ধনিকদের আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ এদের মধ্যে নিম্ন মধ্যবিত্ত হিন্দু যে জাতীয় রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে এসেছে তা ধনিক শ্রেণীর পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ। আজ নানা অবস্থার চাপে এই ক্ষয়িষ্ণু নিম্ন মধ্যবিত্তও ভ্রাম্যমান মজুরের স্বার্থ প্রায় এক পাত্রেই ঢালাই হচ্ছে। এবং তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রগতিমূলক কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে ধনিকের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তারই দু'একটা স্ফুরণ ইদানিং শ্রমিকের ধর্মঘটের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। কথা প্রসঙ্গে আমরা স্ট্যাণ্ডার্ড ফারমাসিউটিক্যাল কোং লিঃ-এর ধর্মঘটের বিষয় উল্লেখ করতে পারি। এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কেরাণীবাবুরা পর্য্যন্ত শ্রমিকদের সঙ্গে স্বার্থ মিলিয়ে তাদের দাবীর সারবত্তা প্রমাণ করেছে। আমরা আশা করি যে প্রত্যেকটি ধনিক প্রতিষ্ঠানের কেরাণীবাবুরা এই ঘটনা থেকে প্রেরণা পাবেন। তারা যেন স্মরণ রাখেন যে তাদের স্বার্থ ও শ্রমিকদের স্বার্থ সমপর্য্যায়ভুক্ত।

শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্তা—'মন্দিরা' সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা কমলা দাশগুপ্তা প্রেসিডেন্সী জেল থেকে ৬ই অক্টোবর মুক্তি পেয়েছেন। আগষ্ট আন্দোলনের প্রথমেই

শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্তা

তিনি ধৃত হয়েছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল নয়। শীঘ্রই তিনি নিরাময় হয়ে দেশের কাজে যোগদান করুন এই আমাদের কামনা।

রাজবন্দীদের কথা—শারদীয় অবকাশ যখন ঘনিয়ে আসছে সে-সময়ে কারান্তরালে অবরুদ্ধ স্বাধীনতার বীর পূজারীদের কথা মর্মন্তুদ বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছি। পরাধীন দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেন তাঁদের ললাটে রাজরোষের লাঞ্ছনাই চন্দনপঙ্ক হয়ে বিরাজ করে। সেটা আমাদের গর্বের ও গৌরবের। কিন্তু তবু ব্যথায় মন টন্‌টন্ করে যখন প্রিয়জন সমাগমের দিনে তাঁদের আমরা নিজেদের মধ্যে পাই না। অনেকে ধীরে ধীরে ফিরে এসেছেন—সতীন সেন, জীবানন্দ ভট্টাচার্য, উপেন্দ্র রায়, কোহিনূর ঘোষ, অদ্বৈত দত্ত, গোবিন্দ ব্যানার্জি, অশ্বিনী গাঙ্গুলী, সুহাসিনী গাঙ্গুলী, ছায়া গুহ বিমলপ্রতিভা দেবী ইত্যাদি অনেককেই আমরা দেশের কাজে ফিরে পেয়েছি। রাজবন্দী-মুক্তি সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট কি নীতি অনুসরণ করছেন সেটা আমাদের বিচার্য নয়। যাঁরা এখনও কারা প্রকোষ্ঠে বন্দী আছেন তাঁরাও সে কথা ভাবেন না। কিন্তু একথাটা সত্যি যে এই রাজবন্দী মুক্তি নীতি যে ভাবে অনুসৃত হচ্ছে তাতে অ্যাটলী-ওয়াভেল সাহেবের বাগাড়ম্বরকে দেশবাসী সংশয়ের চক্ষে দেখতে শিখেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পঞ্চম বাহিনীর বিদায়—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম ক্ষেত্র থেকে 'পঞ্চম বাহিনী' সমগ্র জাতির ধিক্কার ধ্বনির ভেতর বিদায় নিয়েছে। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মিঃ পি. সি. যোশী এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তাঁর দলের সভ্যদের কংগ্রেসের সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দিতে বলেছেন। মিঃ যোশী এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বকে গালাগাল দিতে কসুর করেন নাই। গত তিন বৎসর কাল তাঁদের দু-মুখো বিভীষণী নীতিকে তিনি আপ্রাণ সমর্থনের চেষ্টা করলেও দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করতে না পেরে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট নেতৃত্ব যে আজ নিজেদের অত্যন্ত বিপন্ন মনে করবে, এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। আজ তাঁরা তাঁদের চিরাচরিত প্রথামত "widespread sense of political despair and frustration" ও "greater political interest" এর কথা ব'লছেন। এদেশের কম্যুনিষ্ট নেতৃত্ব এটা খুব ভাল করেই জানেন যে এই "হতাশা ও ব্যর্থতার নৈরাশ্য" দেশবাসীর হয় নাই—এটা কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হয়ে হয়েছে কম্যুনিষ্ট দলের। আগষ্ট বিদ্রোহে যে অগণিত স্বাধীনতার পূজারী দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য সর্ববিধ ত্যাগ স্বীকার করে—নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করে, পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর গুলির সামনে এগিয়ে গিয়েছিল—সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের পূজারীদের সর্বভাবে উপহৃত করতে এই বিভীষণ বাহিনী কোনো উপায়ই হীন বলে মনে করে নাই। 'কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তি চাই' স্লোগান আর জনার গ্যাপনের কয় বিপ্লবীদের নেতৃত্ব—একই প্রকৃতির তাঁওতা নয় কি?—দেশবাসীর কাছে এর প্রকৃত রহস্য ত এতটুকু গোপন নেই।

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিক্রিয়াশীল কর্মপন্থা সম্বন্ধে দেশবাসীর কোনো সন্দেহই কোনো দিন ছিল না। সেজন্যই এঁরা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর হয়ে সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধে রাজভক্ত চাইতে বেশি রাজভক্ত হতে কুণ্ঠিত হয় নাই। প্রথম থেকেই এঁরা মুসলিম প্রতিক্রিয়াশীল নবাব-ওমরাহদের অধ্যুষিত

মুসলীম লীগ নেতৃত্বকে তোষামোদ করে এসেছেন। এঁদের মতলব দেশের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বকে একত্র করে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক অগ্রগতিকে বাধা দান করা। এঁদের দলীয় কার্যপদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করলে এই জিনিসটা খুব পরিষ্কার ভাবে বেরিয়ে পড়ে। বাংলাতে দেখি মহারাজকুমার, অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যারিষ্টার, 'নীল-রক্ত'-ওয়ালা অধ্যাপক ইত্যাদি নিয়ে এঁরা দল গঠন করেছেন। কলিকাতায় অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়েদের নিয়ে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, নারী-সেবা সমিতি প্রভৃতি গঠন করেছেন। যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে গালাগালি না করে এঁরা জলগ্রহণ করেন না সেই শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে এঁরা এঁদের আওতায় গঠিত নারী সেবা-সংঘের প্রেসিডেন্ট করে রেখেছেন। তবে যখন এই প্রতিষ্ঠানটির গুণকীর্তন করতে হয় তখন প্রেসিডেন্টের নাম বাদ দিয়ে তাঁরা সেকাজটা করেন।

বৃহত্তর পরিস্থিতিতেও ভারতীয় কম্যুনিষ্টরা ঠিক এক ভাবেই কাজ করে এসেছেন। আজ তাঁরা বৃটেনের শ্রমিক দলকে প্রতিক্রিয়াশীল বলছেন কিন্তু এঁরা রক্ষণশীল হতেও রক্ষণশীল চার্চিলকে গণতন্ত্রী তাঁবুতে বন্দী করেছে বলে একদিন মাতামাতি করতে কসুর করেন নাই। আজ এঁরা লীগ-কংগ্রেস ঐক্যের জন্য লাফালাফি করছেন, কিন্তু সেজন্য মুসলিম জনসাধারণের কাছে অগ্রসর হন নাই—কারণ জনসাধারণকে নিয়ে এঁদের কারবার নয়, এঁদের কারবার রাজাবাদশা—রাজকুমার—নবাবনন্দনকে নিয়ে।

বাংলার প্রাদেশিক কম্যুনিষ্ট দলের সম্পাদক মহাশয় বলেছেন যে এঁদের দলের ৮০০০ জন সভ্য কংগ্রেসের সদস্য। কথাটা যে সম্পূর্ণ বাজে ও ভাঁওতা সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। গত তিন বছর কেহ কংগ্রেস সদস্য হতে পারে নাই—এর আগে যাঁরা কংগ্রেস সদস্য ছিলেন তাঁদের কয়জন এদের সভ্য হবার দরখাস্তে সহি করেছেন সে কথা প্রমাণ করবার সাহস এঁদের নেই। যে সব ছেলেমেয়েরা এঁদের ভাঁওতায় ভুলে এঁদের সঙ্গে কাজ করছিল, তাঁদের অনেকেই যে নিজেদের ভুল বুঝে কংগ্রেসে ফিরে আসছেন সে খবর এঁরা জানেন। এ. আই. সি. সি'তে কম্যুনিষ্ট সদস্য যে মুষ্টিমেয় দু'তিনজন আছেন তাঁরা কথা বলবার উপক্রম করা মাত্র সমগ্র জনতা তাঁদের "পঞ্চম বাহিনী" ও "জাতীয় স্বাধীনতার শত্রু দলে" বেতাবে অভিনন্দিত করে তাতেই বহু কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যদের চক্ষু খুলেছে। বস্তুতঃ বোম্বাই অধিবেশনের পর কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যে ভাঙন ধরেছে তাকে বন্ধ করবার জন্য মিঃ যোশীর কংগ্রেস ত্যাগ করা ব্যতীত আর কোনো উপায়ই ছিল না। মার্কসিজমের নামে যাঁরা "historical fatalism" এর ক্রীতদাস হয় তাদের পরিণতি এমনি শোচনীয়ই হয়। কংগ্রেস থেকে এই বিতাড়িত বাহিনীর বিদায়ে সমগ্র দেশবাসীই আনন্দিত হবে। কিন্তু সেজন্য কংগ্রেস কর্মীরা এঁদের সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি না রাখলে ভবিষ্যতে বিপদগ্রস্ত হবেন—সেকথাও যেন বিস্মৃত না হন।

'মন্দিরা' শারদীয় সংখ্যা—যে সব লেখক, লেখিকা বিজ্ঞাপনদাতা ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীদের চেষ্টা ও যত্নে শারদীয় সংখ্যা সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যারা প্রকোষ্ঠের ভিতরে আমাদের যে-সব স্বাধীনতার পূজারীরা এখনও দিন যাপন করছেন তাঁদের সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ জানাচ্ছি। আমরা জানি তাঁদের সাধনার সিদ্ধিলাভের আর দেরী নাই। শিগ্‌গিরই আমরা তাঁদের আমাদের মধ্যে ফিরে পাব।

এ সংখ্যায় সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তীর ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস 'হোমাগ্নি' এবং 'নির্বাসিত বিহঙ্গ' গেল না। আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিতভাবে দুটি উপন্যাসই বেরুবে। 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগও এবার স্থানাভাববশতঃ গেল না।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা'র কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

—ভারতবর্ষ—

অষ্টম বর্ষ | অগ্রহায়ণ—১৩৫২ | ৮ম সংখ্যা

ইউলিসিজ

শ্রীহেমন্তকুমার সরকদার

(১)

আমাদের অনেকেরই মনে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে মহাত্মা গান্ধী যে ধরণের মানুষ সৃষ্টি করতে চাইছেন সে হচ্ছে একটা বেয়াড়া, বেখাপ্পা রকমের জীব, যে বর্ত্তমান সমাজে কিছুতেই টিকতে পারে না। সে মানুষ চরকা কাটে, নিরামিষ খায়, মিনমিন করে কথা বলে, মারলে বড় জোর ভ্যাব ভ্যাব ক'রে একবার চায়,—ফিরে মারবে এমন শক্তি গায়ে নেই। সত্য এবং অহিংসা প্রকৃতি কতকগুলি অবান্তর কথা নিয়ে সময়ে অসময়ে বক-বক করে, কিন্তু গাঁয়ের গরীব বিশবাদের দৈনিক দু-এক আনা আয়ের পথ করে দেওয়ার অতিরিক্ত আর কিছু সামাজিক উপকারিতা তার নেই। অতএব কাজের লোকেরা তাকে অবজ্ঞা করে, বুদ্ধিমানেরা তাকে উপহাস করে, আর বিপ্লবীরা তাকে সহ্য করে—মাত্র কিছুদিনের জন্য।—অর্থাৎ, গান্ধীর মানুষ হচ্ছে এক কথায় যাকে বলে 'খাদি'। বাড়ীর যে ছেলেটা কিছু লেখাপড়া শেখে না সে হয় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। তেমনি সংসারে যার আর কোনই গুণ নেই সেই হয় 'খাদি'।

কিন্তু বিষয়টির আর একটা দিক আছে —এখানে প্রসঙ্গতঃ বলা উচিত যে গান্ধীজীর আদর্শের পূর্ণরূপ সমাজে আজো পরিস্ফুট হয়নি। সামান্য কয়েকজন মানুষ এই আদর্শ গ্রহণ করেছেন মাত্র। তাঁরা নিজেরাই বলছেন সিদ্ধিলাভ এখনও কেউ করেন নি। যাঁরা কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন তাঁদের মধ্যে জনসাধারণের কাছে সব চেয়ে পরিচিত সম্ভবতঃ গান্ধীজী নিজে। সুতরাং 'খাদির' উদাহরণ হিসাবে গান্ধীজীর নাম ব্যবহার করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।—অপর দিক থেকে আছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে, এই মানুষটা চুম্বকের মত নিতে লোকের মনকে আকর্ষণ করছে, তার পরামর্শ অনুসরণ করা যতই অসম্ভব মনে হচ্ছে, ততই আরো দুর্ব্বার আবেগে মানুষ তাকে আঁকড়ে ধরছে; আর পাঁচজনের মত তারও বহু প্রতিশ্রুতি সংসারের কুটিল কর্ম্মস্রোতে ভেসে গেল, কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব ভেসে গেল না, স্রোতের ওপরে জেগে থাকা পদ্মের মত হেলতে-দুলতে টলতে-টলতেও একটার পর একটা পাপড়ি মেলে চলেছে। প্রত্যেকটি স্রোতাবর্ত্তের অবসানে এই শতদলের সৌন্দর্য্য উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। চলমান প্রবাহের ওপরে মাথা জাগিয়ে থাকবেই—এই যেন তার পণ। যখন-তখন অকারণে লম্বা লম্বা উপোস করছে। ডাক্তারের মতে যখন আর বেঁচে থাকা কিছুতেই উচিত নয়, ডাক্তারিকেই নস্যাৎ ক'রে তখনও দিব্যি বেঁচে চলেছে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'soul force'—আত্মিক-শক্তি। বুদ্ধিমানেরা বিরক্ত হয়ে বলে, 'ও আত্মিক-ফাত্মিক সব বাজে। বুজরুকির আর জায়গা পায় না।' যারা আর একটু সাদাসিদে মানুষ তারা ভাবে,'কিন্তু এ কেমন করে হয়'।

প্রশান্ত, নিষ্কম্প কণ্ঠে আবার প্রতিধ্বনিত হয় দূর শতাব্দী পারের বহুবিস্মৃত দার্শনিকের আশ্বাসের বাণী—

'Hold thou thy Cross and follow me'।

বিপ্রতীপ বলে 'বোসো, দেখাচ্ছি।'

কিন্তু সংসারে নানা শ্রেণীর মানুষ আছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ছাত্র; অর্থাৎ জিজ্ঞাসু। কোন ঘটনা যখন অব্যাহত ভাবে মনের দোরে হানা দেয়, তার কার্য্য-কারণ সম্পর্ক যতদূর সম্ভব বিশ্লেষণ করে না বুঝলে অন্ততঃ নিজের মনের কাছে তার পরিত্রাণ নেই। গান্ধীজীর অধ্যাত্মবাদে ব্যক্তিবিশেষের কোন প্রয়োজন না থাকতে পারে, কিন্তু এর ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই; কারণ বর্ত্তমান যুগের ইতিহাসের এটা একটা ঘটনা। সুতরাং এর অর্থ উদ্ধার করা প্রয়োজন। গান্ধীকে বিরলার এজেন্ট বলে বুঝে যারা নিজের মনের কাছে জবাবদিহী থেকে রেহাই পেয়েছে, তারা বেঁচে গেছে। যারা তা পায় নি তাদের, সুতরাং, বৈকল্পিক ব্যাখ্যার সন্ধান করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

(২)

খুব চরমপন্থী দু-চারজনের কথা ছেড়ে দিলে দেখা যাবে সর্ব্বসাধারণের মনে গান্ধীজীর সম্বন্ধে একটা স্নেহ-শ্রদ্ধার ভাব অল্পবিস্তর আছেই। এমন কি প্রকাশ্যে তাঁকে বুজরুক বলে গালাগালি দিলেও মনের একান্তে একটা সম্ভ্রম-বোধ রয়ে যাচ্ছে, এমন দৃষ্টান্ত এদেশে নিতান্ত কম হবে না। কর্ম্ম ও মনের এই পার্থক্যটুকু আপাতদৃষ্টিতে এতই সামান্য যে হঠাৎ কারো চোখেই পড়ে না। পড়লেও তাকে সহজেই উপেক্ষা করা যায়। আমরা এই ব'লে নিজের ও অন্যের মনকে বুঝিয়ে থাকি যে এটা অতি সাধারণ ব্যাপার, এটা কিছুই নয়। কিন্তু মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে বোঝবার স্পর্দ্ধা যে করছে তার কাছে এটা মোটেও সামান্য ঘটনা নয়। বরং এইটুকুর মধ্যেই সে বর্ত্তমান সভ্যতার চরিত্র-রহস্যের একটা সূত্র আবিষ্কার করতে পারে। পারুক বা নাই পারুক, অন্ততঃ ব্যাপারটাকে একটু তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করা উচিত। কথাটা হচ্ছে এই যে, আমাদের নিয়ে গান্ধীর বিপদ যা, গান্ধীকে নিয়ে আমাদের বিপদ তার চেয়ে অনেক বেশী। আমরা তাঁকে নিতে চাই, কিন্তু নিতে পারিনে; ফেলতে চাই, অথচ ফেলবার শক্তি নেই। তার মানে, আমাদের কর্ম্মশক্তি তাঁর নাগাল পায় না, কিন্তু মননশক্তি তাঁর মানবত্বকে স্বীকার না করে রেহাই পাচ্ছে না। দ্বন্দ্বটা মনের ক্ষেত্রে নয়, কর্ম্মক্ষেত্রে, যেখানে একের বিষয়বুদ্ধি অপরের জীবনবেদকে অস্বীকার করছে।

কিন্তু এ কথাটা হঠাৎ মেনে নেওয়া শক্ত। এটা মানতে হলে স্বীকার করতে হয় যে আমাদের নিজস্ব কোন জীবনাদর্শ নেই এবং, অধিকন্তু, আমাদের আন্তঃপ্রবণতার সঙ্গে কর্ম্মের আদর্শের বিরোধ আছে। প্রথমটি দৈন্যের পরিচায়ক, দ্বিতীয়টি অসততার। কোনটিই সম্মানের নয়। তবু কিন্তু সত্য যা' তা বুঝতে এবং স্বীকার করতে চেষ্টা করা ভাল।

জীবনাদর্শের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন জীবনচেতনা। যে মানুষ আত্মসচেতন, তারই শুধু আদর্শের প্রয়োজন হতে পারে। উদ্ভিদ্-জীবনের কোন আদর্শ নেই। মানবেতর প্রাণীর মধ্যেও আদর্শের জন্য তাগিদ্ লক্ষ্য করা যায় না। এমন কি, মানুষের মধ্যেও যারা আদিম অবস্থায় রয়ে গেছে তাদেরও জীবনে সজ্ঞান কোন আদর্শের ছাপ পড়ে নি, বাঁধা-ধরা নীতি-বোধের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে তাদের জীবনের—দিনচক্র ঘুরে চলেছে—যুগের পর যুগ। আদিম বলতে বুনো, বর্ব্বর সমাজের কথাই বিশেষ করে বলা হচ্ছে না; তথাকথিত সভ্যতম দেশেরও অধিকাংশ লোক আজো আদিম অবস্থা অতিক্রম করেনি। অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষের সমাজ শুধু নীতি-বোধের দ্বারা শাসিত ও চালিত হয়, সেইটাই আদিম সমাজ। কারণ, নৈতিক শাসন-যন্ত্র অন্তর্জীবনের বিকাশের জন্য নয়, কর্ম্মজীবনের সুশৃঙ্খলার জন্য। আদিম সমাজের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য বিষয় হচ্ছে কর্ম্মক্ষেত্রের অব্যাহত কুশলতা, নৈপুণ্য। এখানে কোন ব্যক্তি হলে তার চলে না, এর অতিরিক্ত কিছু তার অপ্রয়োজনীয়, কোন কোন ক্ষেত্রে রীতিমত বিপজ্জনক। বর্ব্বর-জাতীয় লোকেরা যদি দেখে তাদের কোন ছেলে উন্মনা, ভাবুক গোছের হয়ে বেড়ে উঠছে, তাকে তারা তীর বিঁধে মেরে ফেলে। এমনি করে সক্রেটিস্‌কে বিষ খাইয়ে মেরেছিল, যিশুকে পেরেক বিঁধে। রাশিয়ার এক সম্রাট বিখ্যাত নৈরাজ্যবাদী দার্শনিক বাকুনিনের ফাঁসীর হুকুম দিয়ে তাঁর মাকে বলেছিলেন, 'আপনার ছেলে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক; কারণ, ও চিন্তা করে'। ঠিক

একই অপরাধে সোভিয়েট রাশিয়াতে বহু লোক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে, এবং আরো বহুলোক আজো সাইবেরিয়ার তুষার প্রান্তরে নিঃসঙ্গ নির্বাসনে দিনযাপন করছে।—মৌচাকের অলস মক্ষিকার মত মানুষের সমাজে সাধারণতঃ আজো দার্শনিকের স্থান নেই। কারণ সামাজিক ভাবে মানুষের মনে আজো কোন জীবন-জিজ্ঞাসা জাগ্রত হয় নি। জেগেছে কর্ম জিজ্ঞাসা, তাই বিচিত্র কর্মাদর্শের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সে সব বৈচিত্র্যের লক্ষ্য হচ্ছে একই—অর্থাৎ কর্ম-কুশলতা। কুশলতা অর্জন করবার জন্য সবচেয়েবড় প্রয়োজনীয় বস্তু হচ্ছে অভ্যাস। অভ্যাস যত দীর্ঘ হয়, কুশলতা তত বৃদ্ধি পায়; আবার কুশলতা যত বাড়ে, অভ্যাসের বন্ধন তত দৃঢ়তর হয়। —কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের এই দুই অপরিহার্য উপাদান অবলম্বন করে জীবনের যে রূপ গড়ে উঠেছে, তাকে কল্পনার রঙে রঙিয়ে নিজেকে আমরা বার বার বুঝিয়ে থাকি—'এই হচ্ছে আমাদের জীবনদর্শন।' হাতের ঘষায় রূঢ় উঠে-যাওয়া ঠাকুরের মাটির মূর্তির মত এর প্রকৃত রূপটা যখন বেরিয়ে আসে, তখন দেখা যায়, দর্শন বলে যাকে ভাবা গিয়েছিল, সেটা আসলে হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে অলক্ষ্য কতকগুলি নীতির প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি, philosophy of moral conformism.—প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রম, ও আধুনিক রাশিয়ার তথাকথিত কম্যুনিজম এর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন হতে পারে, আসল পার্থক্যটা কোথায়? নীতিবাদ দিয়ে যদি কাজ হয়, তবে তাকেই জীবনবেদ বলতে ক্ষতি কি? এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আগে জানতে হবে কাজটা সত্যি সত্যিকার হয়? কি উদ্দেশ্যে হয়?—কাজ বলতে যদি বোঝায় লাভজনক ব্যবসা, শাঁসালো সাম্রাজ্য, দুর্ভেদ্য সৈন্যদল, দ্রুততর উড়োজাহাজ, ভয়াবহতর বিস্ফোরক, তবে এই নীতিবাদে কাজ হচ্ছে, কোন সন্দেহ নেই। আর যদি বোঝায়, পৃথিবী-জোড়া এই বিরাট মো-চক্রে অভ্যস্ত, যান্ত্রিক-নিপুনতায় মধু আহরণ করছে যে মানুষ, automaton,—তার কথা, তবে কাজ হচ্ছে না,এতেও কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়।—জীবন্ত মানুষের সঙ্গে অটোমেটনের পার্থক্য যদি ধরা পড়ে, তবে নীতিবাদের সঙ্গে জীবনবেদের পার্থক্যও ধরা সম্ভব হবে।—বিষয়টা খুব সহজ ভাষায় এইভাবে বোঝার চেষ্টা করা যায়—মানুষকে বাঁচতে হলে খেতে হয়, খেতে হলে খাদ্য উৎপন্ন করতে হয়। অর্থাৎ তাকে কাজ করতে হয়। কাজ করতে হলেই তাকে অন্যের সংস্পর্শে আসতে হবে। সে কোনদিনই একা নয়। এমনকি মানুষ পদবাচ্য হবার আগে থেকেই সে দলবদ্ধ জীব। অর্থাৎ মানুষ গোড়া থেকেই সামাজিক প্রাণী। তার মানে, মানুষ গোড়া থেকেই উদরান্নের প্রয়োজনে অন্যের সংস্পর্শে ও সহযোগিতার সমলক্ষ্যে কাজ করে আসছে। এ যদি সত্য হয় তা হলে মানতে হবে কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব সৃষ্টি নয়। ব্যক্তি সেখানে নিছক আঙ্গিক মাত্র; বড় একটা যন্ত্রের যেমন বিভিন্ন অংশ। প্রতিভার তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তির কুশলতার তারতম্য থাকে। কিন্তু সেটা পরিমানগত, গুণগত নয়। প্রত্যেক কর্মী তার নিজস্ব কৌশলকে চরম উৎকর্ষে নিয়ে যেতে চায়। সে উৎকর্ষ যন্ত্রের, মানুষের নয়। আধুনিক যুগে কিন্তু এই রকম যান্ত্রিক উৎকর্ষকে আমরা সভ্যতার উৎকর্ষ বলে ধরে নিয়েছি। ফলে ঘোলাটে অপযুক্তির ফাঁকতালে যন্ত্রধর্মী মানসিক-অভ্যাস জীবনাদর্শের স্থান অধিকার করেছে। লক্ষ্য করা দরকার যে, সভ্যতার আইডিয়াটাই ব্যক্তির সম্পর্কে প্রযুক্ত। যন্ত্র বিশেষ ভাবে সভ্যও নয়, অসভ্যও নয়। যন্ত্র হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিক। সুতরাং যন্ত্রের কুশলতা মানুষের সভ্যতার উৎকর্ষ সূচিত করে না। বরং, যন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যাপারটা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ঘটতে দেখা যাচ্ছে সেটা হোলো মনুষ্যত্বের পরাজয় এবং প্রাণীহিসাবে মানুষের নিঃশেষ বিলুপ্তির সম্ভাবনা। জার্মাণীর ভি-২ বোমার উদ্ভাবককে ধ'রে মিত্রপক্ষীয় কর্মচারীরা যখন লণ্ডন সহরের ক্ষতির জন্য ধমকাচ্ছিল, ভদ্রলোক "নির্বিকার ভাবে" জবাব দিয়েছিলেন যে, রকেটের বেগ এবং পাল্লা—এই দুটোই তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল, সেটা কোথায় পড়বে এবং সেখানে কি ঘটবে, তা নিয়ে তিনি মাথা-ঘামানর প্রয়োজন বোধ করেন নি। লণ্ডনে না গিয়ে সেটা চাঁদেও যেতে পারত—তাঁর পক্ষে ফল একই। এই নির্বিকারত্বকে গত বর্বরের একটা নতুনতর ভণ্ডামি বলে মনে করা চলে, কিন্তু সেটা ভুল। এই নির্বিকারত্ব হচ্ছে এই যুগের আসল রূপ। উড়ন্ত-বোমাটার লণ্ডন সহরের উপর বিশেষ কোন বিদ্বেষ থাকার কথা নয়। সত্যি সত্যি

সেটা চাঁদে বা কোন গ্রহেও যেতে পারত। যায়নি যে সেটা নিতান্তই আকস্মিক। যন্ত্রটার পিছে যে মানুষ রয়েছে, সে কোন ব্যক্তি নয়, সে হচ্ছে শুধু একটি মগজ, এবং সেই মগজ হচ্ছে যন্ত্রের একটি আত্মিক। অর্থাৎ, যন্ত্র এবং মগজ,—এই দুয়ে মিলে একটা বড়তর যন্ত্র হোলো, যার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বেগ এবং পাল্লা। এটা কোন ব্যক্তির জীবনাদর্শ হতে পারে না। কারণ ব্যক্তি হচ্ছে একটা সামগ্রিক সত্তা, একটা ঐক্য। শুধু বেগ এবং পাল্লা নিয়ে তার চলে না। তার সামগ্রিক চেতনার মূল্য-মান দিয়ে বিচার করলে, সুতরাং, এই বেগ ও পাল্লার কুশলতাকে বলা যাবে purposeless specialisation. কিন্তু এটাই এ যুগের মর্মকথা।—এই যুগ, অর্থাৎ যন্ত্র শিল্পের যুগ, যার জন্ম হয়েছিল দুশো বছর আগে ইংরাজ মিস্ত্রী জেম্‌স্ ওয়াটের চায়ের কেটলিতে, আর যার পরিণত যৌবনের ছবি দেখা গেল জাপানের হিরোশিমায়!—আনবিক বোমা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে বার্নার্ড শ' একটা কথা ব্যবহার করেছিলেন, "monkeying with the atom."—এর ছবিটা বাঙালী পাঠকের পরিচিত। বানর তার নির্বোধ কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে চেরা-কাঠের মধ্য থেকে কীলক টেনে বার করতে গিয়ে সেই কাঠে আটকে মারা যায়। অভিযোগটা মৃত্যুর বিরুদ্ধে নয়, নির্বুদ্ধিতায় আমন্ত্রিত মৃত্যুর লজ্জাকরতার বিরুদ্ধে। হিরোশিমার ধ্বংসলীলাটা আকস্মিক নয়, গত মহাযুদ্ধের পরে, এমনকি তার আগেও, কেউ কেউ এমনিতর ধ্বংসের ছবি কল্পনা করেছিলেন। প্রায় বিশ বছর আগে Spengler দৃঢ় বিশ্বাসে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এই যুগের যান্ত্রিকতার অন্তরালে যে নীতি কাজ করছে, তার অবশ্যম্ভাবী, অনতিবর্তনীয় পরিণতি হচ্ছে এই সভ্যতার নিঃশেষ ধ্বংস। কিন্তু ব্যাপারটাকে তিনি অপছন্দ করেননি। কারণ তিনি তাঁর কল্পিত মারণ-যজ্ঞের মধ্যে রক্ত-স্নাত কাপালিকের অপরাজেয় ব্যক্তিত্বের জয় দেখতে পেয়েছিলেন। উপসংহারে তিনি লিখেছিলেন যে আমাদের ভয় পেলে চলবে না, উপস্থিয়মান সেই ভয়ঙ্কর অবসান যখন অপরিহার্যই হয়ে এসেছে, তখন বীরের মত এগিয়ে গিয়ে তাকে বরণ করতে হবে, "at least, that tragic dignity none can take of us." আজ কিন্তু একথা বলা যায় যে এই হিসাবটাতে একটা মারাত্মক ভুল ছিল। যন্ত্রের কাছে মনুষ্যত্ব বিকিয়ে দিয়ে 'monkeying' করার ফলে যে অপমৃত্যু ঘনিয়ে আসছে সেটা এগিয়ে গিয়ে লুফে নেবার মত কোন বস্তু নয়। যাত্রাদলের ভীম যতই গর্জন করুক, সে 'হিরো' হয় না, অরির সাজ-পোষাক খুলে ফেলতে অস্বীকার করলেও তার দৈন্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। শক্তির নেশায় বুঁদ্ মানব-বুদ্ধি এখনও গদাহাতে বিজেতা ও বিজিতের সীমারেখা এঁকে চলেছে, চোখে পড়ছে না বিজিতের মত বিজেতারও পর্যুদস্ত লাঞ্ছনা আটকা পড়ে গেছে কীলকহীন কাঠের গহ্বরে। এই শেষ যেদিন মরণ-ঘটাবে, সেদিন প্রমাণ হবে ওটা আগে খসে যায় নি।—জীবনাদর্শহীন কর্মপ্রেরণায় দুশো বছরের যান্ত্রিক উৎকর্ষের পর আজ উদ্ঘাটিত হচ্ছে মানুষের এই মর্যাদাহীন, গৌরবহীন পরাজয়ের ছবি। এটা ট্রাজিক নিঃসন্দেহ, কিন্তু এর মধ্যে কোন dignity নেই।

(৩)

এ যুক্তির বিরুদ্ধে একটা মামুলি আপত্তি উঠান যেতে পারে,—দুই একটা মারণাস্ত্রের উদাহরণ দিয়ে যন্ত্রের কাছে মানুষের দাসত্বের কথা প্রমাণ করার চেষ্টা ভুল। বিজ্ঞান এখনও উন্নতিশীল; আজ যা অজানা, কাল তাকে মানুষ জানছে, কাজে খাটাচ্ছে, সুতরাং দীর্ঘ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে দেখলে মানতেই হবে যে মোটের ওপর জড়শক্তির ওপর মানুষের বুদ্ধির আধিপত্য ক্রমশঃ কঠিনতর হচ্ছে। এটা মানুষের পরাজয়ের লক্ষণ নয়।

এই আপত্তিটা বিচার করে দেখা যাক। জড়-প্রকৃতির ওপরে মানব-বুদ্ধির ক্রমবর্দ্ধমান আধিপত্যের কাহিনীটা ঠাকুরদাদার ঝুলির আরো পাঁচটা গল্পের মতই আজগুবি। এ গল্পে যারা বিশ্বাস করে বুদ্ধির দিক্ থেকে তারা শিশু। শিশুবুদ্ধির কাছে বর্ণনাটাই হচ্ছে আসল, বর্ণিত বিষয়ের তত্ত্ব তার মাথায় ঢোকে না, এবং তথ্য তার কাছে নিষ্প্রয়োজন। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার বর্ণনা যতই রোমাঞ্চকর হোক্, তথ্যের দিক্ থেকে এটা কুইকসোটের অভিযানের চেয়েও হাস্যকর, এবং তত্ত্বের দিক থেকে প্রায় আকাশকুসুমের মতই শূন্যতাময়।

সাধারণতঃ আমরা যা সত্য বলে বিশ্বাস করতে ভালবাসি তার প্রতিবাদ সহ্য করতে পারি নে। বিজ্ঞানের জয়ের কথা অবিসংবাদিত ভাবে আমরা মেনে নিয়েছি, মানাটার কোন ভিত্তি নেই একথা যদি কেউ বলছে, তবে আমরা চটে যাই, এবং চটে যাই বলেই চোখে পড়ে না যে, লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা লাইব্রেরিয়ানের পাণ্ডিত্যের নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় নয়। আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের যে কৃতিত্ব তা হচ্ছে প্রধানতঃ সংগ্রহ-মূলক। বস্তুর নাম ধাম বিবরণ সংগ্রহ, তার জাতি, গোত্রের সন্ধান, একটার সঙ্গে আর একটা মিলিয়ে তৃতীয় একটা করা যায় কিনা তার প্রচেষ্টা—এই গুলিই বিশেষভাবে এখনও বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়। এ জ্ঞানের বিস্তৃতি থাকতে পারে, কিন্তু গভীরতা নেই। কারণ একটি মাত্র স্তরে এ ঘোরাফেরি করছে; একে বলা যায় mono dimensional knowledge. এ শুধু বস্তুর নাম রূপের সঙ্গে পরিচয় মাত্র, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের একজন সেক্রেটারির পঞ্চাশ-হাজার বিশিষ্ট লোকের নাম ও চেহারা মুখস্থ ছিল। এটা অসাধারণ প্রতিভা সন্দেহ নেই। কিন্তু যে জীবনে শুধু একটিমাত্র মানুষকে চিনেছে এবং ভালবেসেছে, মানুষ সম্বন্ধে তার যথার্থ জ্ঞান এই সেক্রেটারির চেয়ে অনেক বেশী। সিগ্রিড্ আণ্ডসেটকে নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ জানিয়ে লোকে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল তাঁর কেমন লাগছে, তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'ভাল লাগছে নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার ছেলেমেয়েদের কোলে নিয়ে আদর করে এর চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ আমি পাই'। শুধু পরিচয়ের থেকে সাযুজ্য, identity, যারা যে জ্ঞান তার গভীরতা বেশী, সুতরাং আনন্দও বেশী। কিন্তু এই প্রকারের জ্ঞান আধুনিক সাম্যবাদের সাধনার বিষয় নয়। তত্ত্ব ছেড়ে দিয়ে তথ্যের দিকে এলে দেখা যাবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দান আজো প্রায় নগণ্য। এখানে সে বিলাসের উপকরণ যত যুগিয়েছে, জীবনের উপকরণ তার সামান্য অংশেও নয়। এরোপ্লেনে চড়ে পৃথিবী ঘুরে না এলেও সাধারণ লোকের কিছু এসে যায় না, কিন্তু অসুস্থ হলে অসুখ সারানোটা তার চাই-ই। বৈজ্ঞানিক ওষুধে সারা পৃথিবী প্লাবিত হয়ে গেল, কিন্তু ওষুধের সমুদ্র শুষে ফেলেও সামান্য একটু মাথাধরা সারে না। স্তূপীকৃত বস্তুর পর্বতে মানুষের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয়ে এসেছে। কিন্তু ফুরিবৃত্তির জন্য যে একমুঠি প্রয়োজন, তার আশায় সভ্যতম মানুষকেও বসে থাকতে হচ্ছে আকাশের দিকে চেয়ে, যেমন বসে থাকে গ্রীণল্যাণ্ডের এস্কিমোরা, সমুদ্রের আকস্মিক প্লাবনে ভেসে আসা মাছের আশায়। —প্রধান জীবনোপজীব্যের জন্য অনিশ্চিতের উপর অসহায় নির্ভরতা এই বর্বর মানুষদের চেয়ে 'সভ্য' মানুষের এক তিলও কমেনি। প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্য বাড়ছে কল্পনা করে খুশী হয় সেই লোক, প্রকৃতির নির্মম, নৈর্ব্যক্তিক বিরাটত্বের কল্পনাই যার নেই। শিশু মন বিরাটের ধার ধারে না, সরল বিশ্বাসের উঁচি মাতৃ-ক্রোড়েই তার কাজ চলে যায়।

কিন্তু এত যে কীর্তি—এ সব তবে কি? কত ত আমরা করেছি গত দুশো বছরে, কত বড় বাড়ী, ভাল গাড়ী, আরো কত কি। আগে তাঁতি তাঁতে বুনেছে একখানা কাপড় পনের দিনে। আজ সে এক ঘণ্টায় পনেরশ' গজ বুনছে; বাংলা থেকে লোকে গয়া কাশী যেত, জীবনে আর ফিরতে পারত না, আজ পাঁচ-ঘণ্টায় গোটা পৃথিবীটা একবার ঘুরে আসা সম্ভব হতে চলেছে; একদিন তীর দিয়ে একটা পাখী মারবার জন্য গোটা দুপুর ঘুরে হাহুরাণ হতে হয়েছে, আজ দু-সেকেণ্ডে আড়াই-লক্ষ লোকের একটা গোটা শহর বেমালুম উড়িয়ে দেওয়া গেল। —এ সব তা হলে কি?

এটা আগেই আলোচনা করা গেছে। এ হচ্ছে কর্ম-নৈপুণ্য। প্রাকৃতিক শক্তির ওপর আধিপত্য নয়, তার সঙ্গে সহযোগিতায় মানুষের এই নৈপুণ্য বেড়েছে, এবং ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই সহযোগিতায় মানুষ সব সময়ই junior partuer. আমি এখন দিনের আলোয় লেখা-পড়া করছি। অর্থাৎ সূর্যের আলোটাকে আমি ব্যবহার করছি। তার মানে এ নয় যে আলোটার ওপর আমার আধিপত্য জন্মেছে। আর এক ঘণ্টা পরে এ আলো মিলিয়ে যাবে, তখন অন্য আলো জ্বালতে পারি,—সে আলোটাও পরোক্ষভাবে সূর্যের আলো। বৈজ্ঞানিক হিসাব করে বলছেন, একটা প্রায়-নির্দিষ্ট তারিখের পরে সূর্যটাই মিলিয়ে যাবে, তখন পৃথিবীতে কোন কর্ম-প্রচেষ্টাই আর সম্ভব হবে

না। ফলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, প্রকৃতি তার বিপুল উৎস থেকে কিছু শক্তি আমাদের ধার দিচ্ছে, উৎসের ওপর কোন অধিগতা আমাদের নেই, আমরা শুধু ধারে-পাওয়া জিনিসের পরিমাণ (quantity) নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। এই কারবারে বিস্তর বস্তু (forms) আমরা তৈরার করেছি। তাতে আমাদের সুবিধা বেড়েছে, কিন্তু শক্তি বাড়ে নি। ব্যাঙ্কে যত টাকাই থাকুক কেরাণীর তাতে কিছু আসে-যায় না ; টাকার অঙ্কটা যদি খুব ভারী হয়, তবে অবিরত কাজের চাপে তার হিসাব-বুদ্ধি প্রখরতর হতে পারে, এই পর্য্যন্ত। মোটের ওপর সে চাকর ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতির কামারশালায় বিচিত্র বস্তু নিয়ে কাজ করতে করতে আমাদেরও হেনরি কর্মনৈপুণ্য কিছু প্রখরতর হয়েছে মাত্র। জীবনে value কিছু বাড়ে নি ; কারণ প্রাকৃতিক শক্তির মূল্য আমরা স্থির করি নি, আমাদের মূল্য স্থির করেছে প্রাকৃতিক শক্তি—অর্থাৎ, নৈর্ব্যক্তিক যন্ত্রশক্তি। যন্ত্রকে মানুষ মানবিক কাজে লাগায় নি, মানুষকে যন্ত্র চেতনাহীন বাহ্যিক পর্য্যায়ে নামিয়েছে।

তবু একটা দুটা অসাধারণ ঘটনা দিয়ে একটা যুগকে বিচার করা সঙ্গত হয় না,—এ কথা হয়ত আংশিক ভাবে সত্য। সুতরাং বিশেষ ঘটনার কথা ছেড়ে দিয়েই এ যুগের দৈনন্দিন জীবনের চিত্রের দিকে নজর দেওয়া যাক।

কোন যন্ত্রের দিকে চাইলেই তার দুটি বৈশিষ্ট্য সহজে চোখে পড়ে ; এক, তার নিজস্ব কোন ইচ্ছাশক্তি নেই ; এবং দুই, তার ক্রিয়ার একটা নির্দ্দিষ্ট পৌনঃপুনিকতা (repetition) আছে। Motive নেই, অথচ motion আছে, সাধারণ অবস্থায় প্রাণী সম্বন্ধে এটা বলা চলে না ; কারণ কথাটা স্ব-বিরোধী। কিন্তু যন্ত্রের বেলায় এইটাই হচ্ছে সত্য, কারণ এই বিরোধেই যন্ত্রের উৎপত্তি। Motiveটা যন্ত্রের মধ্যে নেই, কিন্তু তার বাইরে আছে ; সে ক্ষেত্রে motiveটা হচ্ছে বাইরের বিচিত্র কর্ম্ম-প্রেরণার সমাবেশ। ইচ্ছা না থাকলে গায়কের গলা খুলবে না ; গ্রামোফোনের ইচ্ছাই নেই, কিন্তু গান আছে ; কারণ কয়েকটি বিভিন্ন ইচ্ছা একত্র হয়ে তার মধ্যে এমন সুতলী পাকিয়ে রয়েছে যে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কোন প্রশ্নই ওঠে না, কাজ হয়ে যায়। তা হলে কথাটা হোলো এই, যে বস্তু বাইরে কোন শক্তি বা শক্তি-সমবায় থেকে একটা নির্দ্দিষ্ট এবং অভ্যস্ত behaviour-pattern গ্রহণ করে, তাকে বলা যায় যন্ত্র।—আধুনিক জীবনের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক্ দেখা যাবে জীবন্ত-মানুষের জীবনে এই বিরোধ (contradiction) কি ভাবে দানা বেঁধে উঠেছে।—অর্থাৎ জীবধর্ম্মী মানুষ যন্ত্রধর্ম্মী হয়ে উঠেছে।

উদ্ভব বোঝার বেলায় দেখা গেছে purposeless specialisation. কিন্তু এতবড় বিস্তীর্ণ সমাজের সবটাই স্পেশালিজেশানের ক্ষেত্র নয়। ছোটবড় নানা শক্তির সমাবেশে সংসারের বিরাট কর্ম্মচক্র ঘুরছে। এ চাকায় তেল জোগাচ্ছে যে অত্যন্ত কর্ম্মপ্রবণতা, তাকে বলা যায় purposeless activisation.—হেনরি ফোর্ড গর্ব্ব করে বলছেন, আমার কারখানায় যারা কাজ করতে এসেছে ওদের গড়ীর দিকে চেয়ে দেখ, দেখবে তেরটা রাজ্যের নম্বর লটকানো আছে। মানে, ওরা তেরটা গ্রামা পার হয়ে কাজে এসেছে। দূরত্বকে স্রেফ্ উড়িয়ে দিয়েছি, আজ সবাই সবার একান্ত কাছে। পৃথিবীর অর্দ্ধেক সমস্যার সমাধান করবে এই স্পীড্।—কথাটা ভারি চমৎকার। সব মানুষ আর সব মানুষের কাছে আসতে পারছে!—এটা এমন একটা আইডিয়া যে ভাবতে গেলেই মনে আবেগ আসে, উচ্ছ্বাস আসে। কিন্তু আবেগ উচ্ছ্বাসের অসুবিধা হোলো এই যে, এদের প্রাবল্য ঘটলে সত্যের ঘরে কোন্ খানে যে ফাঁকি ঢুকে যায়, তার কোন হদিস্ থাকে না। কীর্ত্তনীয়া গাইছে, 'নিতাই কি নাম এনেছে, হরি বোল্ বলরে।' প্রকাণ্ড দোঁহার দলের একেবারে পিছের লোকেরা গানের সব কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে না। অন্যদের দেখাদেখি তারা নাচছে আর গেয়ে চলেছে, 'নিতাই কি নাউ রেঁধেছে, হরি বোল্ বলরে।'—নেচে কুঁদে অস্থির হবার জন্য গভীর কোন তত্ত্বের দরকার হয় না, একটা মোটামুটি ছন্দ হলেই কাজ চলে যায়। প্রচণ্ড স্পীডের সাহায্যে আজ পৃথিবীতে যে কোন লোকই আজ যে কোন লোকের কাছে যেতে পারছে, এই আত্মপ্রসাদে বেসামাল হয়ে আমরা আসল জিনিসটাই ভুলে যেতে বসেছি যে, কোন মানুষই তার নিজের একান্ত কাছে আসতে পারছে না। যাকে সবাইকে নিয়ে ঘর

করতে হয় তার নিজের ঘর থাকে না। ছেলেটা-রাজা পায়ে হেঁটে প্রতিদিন সকালে কাজে আসবার প্রাথমিক পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনীয়তা বোধ অন্তর থেকে প্রেরণা রূপে আসে নি, এসেছে বাইরে থেকে তাড়না রূপে। সেই তাড়নায় চালিত হয়ে মোটরগাড়ীতে বসে গাড়ীর আঙ্কিক মাত্র হয়ে প্রতিদিন দূর দূরান্তর থেকে মিস্ত্রীরা আসছে কাজ করতে। কাজটা হয়ত হচ্ছে একটা উঁচু মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর একটা ইলেক্‌ট্রিক সুইচ টিপে যাওয়া। পর পর এমনি পঞ্চাশজন সুইচ টিপে যাওয়ার পর একটা তৈয়ারী স্ক্রু বার হয়ে আসে। উনপঞ্চাশ জন সেটাকে পুরা তৈরী অবস্থায় দেখে না। আট-ঘণ্টা এমনি দাঁড়িয়ে সুইচ টেপার পর দিনের কাজ শেষ হয়। প্রতিদিন এই আট-ঘণ্টা ফিরে ফিরে আসে। কিন্তু কোন আট-ঘণ্টায় দিন শেষ হয় না। বাকী যে ষোলো ঘণ্টা থাকে, তার প্রত্যেকটি মুহূর্ত পরের আট ঘণ্টার জন্য প্রস্তুতি।—অর্থাৎ কাজের পথ এই রকম একটা বৃত্তের আকার নিচ্ছে; মিস্ত্রী কি কাজ করছে?—স্ক্রু তৈরী করছে। স্ক্রু কি হবে? গাড়ী হবে। গাড়ী দিয়ে কি হবে? মিস্ত্রী আরো দূর থেকে আসতে পারবে স্ক্রু তৈরী করতে।—বৃত্তটি বেশ সুডোল। এবং আরো অদ্ভুত হচ্ছে এই যে, এই বৃত্তের কেন্দ্র একটি নয়, অনেকগুলি। প্রত্যেকটিই আবার একটি ঘূর্ণায়মান বৃত্ত। আবার তাদেরও কেন্দ্র অনুরূপ এক একটি বৃত্ত। শেষকালের চরম কেন্দ্রের আর সন্ধানই মেলে না। মিস্ত্রীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তুমি কাজ কর কেন? সে বলবে, বাঁচতে ত হবে। বাঁচতে হবে কেন?—নইলে কাজ হবে কি করে? হেনরি ফোর্ডকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তুমি ব্যবসা করছ কেন? তিনি সম্ভবতঃ বলবেন, টাকা করতে। টাকা করে কি হবে?—আরো স্পীড বাড়বে। আরো স্পীডে তোমার কি হবে?—টাকা হবে। আমেরিকার নৌ-সেনাপতি হুকুম দিচ্ছেন, প্রশান্ত মহাসাগরের ঘাঁটি থেকে আমরা গোটা এশিয়া 'কণ্ট্রোল' করব। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, কণ্ট্রোল কেন করতে চান? তিনি নিশ্চয়ই বলবেন, শান্তি স্থাপন করতে চাই বলে। তখন প্রশ্ন হবে, কিন্তু কণ্ট্রোল করতে চাইলেই ত অশান্তির সৃষ্টি হবে? এর একমাত্র জবাব, অশান্তি না ঘটলে শান্তি স্থাপন করব কি করে?

হঠাৎ মনে হতে পারে এগুলি একপেশে ছবি, distorted picture. ছবিগুলা ব্যক্তি বিশেষের, তাই কোন কোনটা অল্পবিস্তর একপেশে হতেও পারে। কিন্তু এর মূল বক্তব্যটা যে সত্য তা বোঝা যাবে গোটা সমাজের দিকে চাইলে। কলকাতায় প্রতিদিন বহুদূর থেকে, এমনকি, ষাট সত্তর মাইল দূর থেকে হাজার হাজার লোক কাজ করতে আসে। ডেলি-প্যাসেঞ্জারের দল। বেলা দশটায় হাওড়া পোলের ওপর দাঁড়ালে দেখা যাবে জলস্রোতের মত চলেছে মানুষের স্রোত। তেমনি আবার পাঁচটার পর। কিন্তু সেই বিপুল জনতার মধ্যে একখানি পূর্ণ-পরিতৃপ্ত মুখ চোখে পড়ে না। ক্লিষ্ট, ক্লান্ত, দিশাহারা চোখের উদ্‌ভ্রান্ত চাহনির মধ্যে একই কাহিনী ফিরে ফিরে পড়া যায়,—কি যেন একটা অনির্দেশ্য দুর্বার শক্তি বন্যার প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, হাত বাড়িয়ে ধরবার মত কোন অবলম্বন পাওয়া যাচ্ছে না। মনে মনে এঁরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন, বেঁচে থাকবার জন্য কাজ করছেন। প্রবাহের বাইরে দাঁড়িয়ে যে দেখে সে দেখতে পায় কাজ করবার জন্য বেঁচে রয়েছেন।—অর্থাৎ কর্মটা জীবন-কেন্দ্রিক নয়, জীবনটা অফিস-কেন্দ্রিক।

ঐই যান্ত্রিক অভ্যাস শুধু জীবনের বাইরের রূপ প্রতিফলিত হচ্ছে, তাই নয়; মন কখনো বহির্জীবনের সঙ্গে অসম্পৃক্তভাবে চলে না। বাইরে যে স্থূল সংস্পর্শ হয়, মন তাকে নিয়ে এক একটা তাবরূপ রচনা করে চলে। আগেই বলেছি এই সব রূপের কোন কোনটা কখনো জীবনাদর্শের স্থান নিতে চায়। আধুনিক জীবন যে স্পীডের স্রোতে ভেসে চলেছে, মন তাই নিয়ে স্পীডের ফিলজফি গড়ছে।—এটা প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত ভাবে চালু হয়ে গেছে যে, জগতে স্থিতি বলে কিছু নেই, সবই চলিষ্ণু। স্থিতির ধারণা না থাকলে গতির কল্পনা আসে না, এটা যুক্তির কথা। কিন্তু দার্শনিক মন সব সময় যুক্তির অপেক্ষা করে না। সে যা দর্শন করেছে তার চেয়ে জোরালো ত আর যুক্তি নয়! বাইরে দর্শন করেছে সে স্পীড, অতএব স্পীডের ফিলজফি হচ্ছে দ্রুততর

স্টেড। এই দার্শনিকদের মধ্যে যারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তাঁরা কল্পনা করেন, ঈশ্বর একটা বিরাট স্টেড-উৎপাদক যন্ত্র, "a centre from which worlds shoot out, and which is not a thing but a continuity of shooting out." অতএব যে মানুষ বসে বসে রকেট ছুঁড়ছে লণ্ডনে বা চাঁদে বা মঙ্গলগ্রহে, সে এই ঈশ্বরেরই একটি টুকরা মাত্র; তার কাজ ঈশ্বরের "হয়ে ওঠার" process of becoming-এর একটি অনুচ্ছেদ। "God, thus defined, has nothing in him of the already made. He is unceasing life, action, freedom." শেষের চারটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। প্রাণ, কর্ম ও মুক্তি, এই তিনের অচ্ছেদ্য সমাবেশ ও সেই সমাবেশের নিরবচ্ছিন্নতা—এই হচ্ছে সত্যের পূর্ণরূপ। জীবনের মূল্য-মান এখন তাহলে খুব সহজেই তৈয়ার করে ফেলা যায়। মুক্তি বা পূর্ণ জীবন—চরম লক্ষ্য বলে যেটাই ধরা যাক্ না কেন, সেটা হবে শুধু কথা, ভাবপ্রকাশের একটা অক্ষম প্রচেষ্টা মাত্র। কারণ, চরম বলে কিছুই নেই, সব অবস্থার সঙ্গেই মিশে রয়েছে unceasing action, নিরবচ্ছিন্ন কর্ম,—যার মানে হচ্ছে নিরন্তর 'হয়ে চলা'। হওয়া বলে কিছু নেই, আছে শুধু 'হয়ে চলা'। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, মানুষ চলবে কোথায়? লক্ষ্য নেই, বেগ আছে। সুতরাং গতিটা উদ্‌ভ্রান্ত হলেও কিছু ক্ষতি নেই; বরং সেটাই হতে বাধ্য। কিন্তু গতির একটা ক্ষেত্র চাই। আজ পর্যন্ত একটি মাত্র ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে; সেটা হচ্ছে space. এখানে বৈজ্ঞানিক তর্জনী তুলে বলছেন, তাহলে গতিটা নিরন্তর হলেও গতিপথটা অনন্ত হতে পারে না; কেননা space নিজেই সীমিত।—এই দার্শনিক সিদ্ধান্তের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে কর্মজীবনে যে রূপ ফুটতে বাধ্য, সেটা হচ্ছে একটা যান্ত্রিক পৌনঃপুনিকতা। (বস্তুতঃ, আগে আলোচনা করেছি, এই দার্শনিক সিদ্ধান্তটাই কর্ম-জীবনের ভাবরূপ)। কারণ গতিটা যে আছে, সেটা প্রমাণ করবার একমাত্র উপায় সংখ্যা বা পরিমাণবাচক কোন একটা হিসাবের আশ্রয় নেওয়া,—মোটার-গাড়ীর মিটারে যেমন মাইলের সংখ্যা ছাপা হয়ে যায়। দিক-চিহ্নহীন প্রান্তরপথে এই সংখ্যাটাই চলার সাক্ষী। প্রগ্রেস্ বা উন্নতি যে হচ্ছে, এটা ধরা পড়ছে সংখ্যা দিয়ে। কারখানার মিস্ত্রী কাজে আসছে তেরটা-স্টেট্ পার হয়ে। দু-তলা বাড়ী দুশো-তলায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। দুশো টাকা বাড়ছে দুশো-কোটি টাকায়। পাঁচ মাইল গতিবেগ পাঁচ হাজার মাইলে এসে দাঁড়িয়েছে। অলডাস্ হাক্স্‌লি এয়ার হাজার শব্দের এক প্রবন্ধ লিখেছেন। যুদ্ধের কয় বছরে রেড-আর্মির সৈন্যেরা চৌদ্দ-হাজার পংক্তির কবিতা রচনা করেছে। লক্ষ্যটা হচ্ছে কর্মনিপুণতা, আর তার সাক্ষী হচ্ছে সংখ্যা।—এই লক্ষ্যহীন চলার যদি কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, যদি কেউ ছিটকে বেরিয়ে আসতে চায়, থামতে চায়, বসতে চায়, তাহলে তাকে বলতে হবে প্রগতির পরিপন্থী, reactionery. বলাটা অযৌক্তিক নয়। কারণ, উন্নতির ধারণা যে যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাতে এই গতির বিরুদ্ধবাদীকে রিএ্যাক্‌শনারি বলে গালাগালি দেওয়ার ইচ্ছাটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। রিএ্যাকশনারি তার নিজ সমর্থনে বলতে পারে গতিবাদ আর প্রগতিবাদ এক নয়। কিন্তু সে আলোচনা পরে হচ্ছে। আপাততঃ লক্ষ্যনীয় এই যে, এই গতির স্রোতে পড়ে জীবন হাবুডুবু খাচ্ছে। গোটা সমাজের প্রায় সমস্তটা জুড়ে মানুষের জীবনে একটা দ্বন্দ্ব, contradiction সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাইরের সংসার দুর্বার বেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে, কিন্তু অন্তরে চেতনার একেবারে অন্তরতম প্রদেশে এমন কিছু একটা আছে এই গতির বিরুদ্ধে যার বিদ্রোহ; যে শুধু চলতে চায় না, বাড়তে চায়; কিন্তু লক্ষ্যহীন স্রোতের বেগে যে ছিটে হচ্ছে, ঘিন হচ্ছে, বাড়তে পারছে না, অথবা ক্ষিকু, atrophied হচ্ছে। দুশো-তলা বাড়ীর ছাতে যখন চড়া শেষ হয়ে যাচ্ছে, তখন সেখানে বসে সে ক্লান্তমনে প্রশ্ন করছে, ততঃ কিম্?

(৪)

খুব সরল জবাব একটা আছে: ঐ বাড়ীর ছাতটায় সবার চড়া আজো হয় নি। সবাই আগে একবার করে চড়ুক, তারপর ভাবা যাবে ততঃ কিম্। সামাজিক ভাবে স্টেডের সাধনায় যতটা সিদ্ধিলাভ হয়েছে, সমাজের সর্বসাধারণের জীবনে সেই স্টেডকে সঞ্চারিত করার কাজে ততটা সিদ্ধি আজো হয় নি।

মোটারে তেরটা বাজা পার হয়ে কারখানার ছাতে আসছে যারা তারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। অধিকাংশ লোকে গাড়ীতে কখনো চাপে নি। এমন অনেক লোক আছে যাদের কোন কাজই নেই, অর্থাৎ ঘরে থাবার নেই। বহুলোক এমনও আছে যাদের কোন ঘরই নেই। আগে ভাবতে হবে এই সব গৃহহীন, অন্নহীন, দুর্গতদের কথা।

কিন্তু জবাবটা যত সরল, তার কার্যকারিতা তত প্রবল নয়। দারিদ্রের প্রতিকারের পন্থা ভাবতে হবে নিশ্চয়ই, এবং সে ভাবনা অনুসারে কাজও করতে হবে, এতেও সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে ভাবনার ধারা, তথা কাজের পদ্ধতি সম্বন্ধে। সমস্যা যদি হয় শুধু দারিদ্র তবে তার প্রতিকারের পন্থা এক। কিন্তু আর্থিক দারিদ্রের সঙ্গে যদি মিলে মেশে থাকে সাংস্কৃতিক দারিদ্র, মানসিক অসুস্থতা, তখন সমস্যাটার শুধু ওজন বদলেছে তাই নয়, গুণও বদলেছে। সুতরাং প্রতিকারের পন্থাও উপযুক্ত পরিমাণে বদলাতে বাধ্য। তখন আর একথা বলে চলবে না যে, আগে অন্নহীনের অন্নের ব্যবস্থা করা যাক, মানসিক এ্যাট্রফির চিকিৎসা পরে করা যাবে। দেহ-চিকিৎসকদের এক সময় ধারণা ছিল প্রাণীদেহের বিভিন্ন অংশ বিকল হলে তার জন্য খণ্ডিত ভাবে ব্যবস্থা অবলম্বন করা চলে। অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গেছে হাঁফানির জন্য ইনজেকশান দিলে চোখ কাণা হচ্ছে; মাথাধরা সারাতে ওষুধের বড়ি খেলে হৃদ্‌পিণ্ড দুর্বল হয়। এটা ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে এসেছে যে, দেহটা ঠিক মোটার-ইঞ্জিনের মত নয়, ওর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কামারশালায় পাঠিয়ে মেরামৎ করে আনা যায় না। দেহের মধ্যে যে প্রাণশক্তি স্পন্দিত হচ্ছে সে একটা সামগ্রিক সত্তা। অতঃপর মনোসমীক্ষক বলছেন, এই প্রাণের বৃত্তে যে মানস-শক্তির বিকাশ ঘটেছে, সেও একটা সামগ্রিক সত্তা। শুধু তাই নয়, অর্থাৎ মন একান্ত ভাবে সামগ্রিক নয়; দেহ, প্রাণ, মন—অস্তিত্বের এই তিন সত্তা পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে এক চেতনার দ্বারা বিধৃত—সেই চেতনা একটি অখণ্ড ঐক্য। সুতরাং, ব্যক্তিরই হোক বা সমাজের জীবনে হোক অতৃপ্তির বোধ যদি একবার ঢুকে থাকে, প্রতিকারের উপায় চিন্তা করতে হবে এই ঐক্যরূপ চোখের সম্মুখে রেখে।

যতগুলি উপায়ের কথা জানা আছে তার মধ্যে মার্ক্‌সিয় বিপ্লববাদ আজকার দিনে অধিকসংখ্যক লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছে। শুধু সেই কারণেই নয়; এই বিপ্লবাদর্শ যে দার্শনিক তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেটি মানুষের জীবন ও সমাজকে উপরোক্ত সামগ্রিক পদ্ধতিতে দেখার একটি প্রচেষ্টা। সুতরাং দেখা দরকার এই বিপ্লববাদের মধ্যে মানুষ কোন জীবনাদর্শ পেতে পারে কি না। মার্ক্‌সিয় দর্শন অনুসারে চেতনা নিত্য পদার্থ নয়, বস্তু থেকে এর উদ্ভব হয়েছে। চেতনার কোন নির্ব্যাঘাত, absolute অস্তিত্ব নেই। বস্তুজগৎ হচ্ছে একমাত্র চেতনবিষয় বা চেতনার content. বস্তুকে অবলম্বন না করে চেতনার কোন স্ফুরণ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, চেতনা ও বস্তুর পারস্পরিক সংঘর্ষে উভয়েরই পরিবর্তন বা বিকাশ ঘটছে। বস্তুর নির্দ্বিশেষ সত্তা কি রকমের তা আজও সঠিক জানা যায় নি, শুধু এইটুকু দেখা যাচ্ছে তার একটি গতিশীলতা আছে। যেহেতু এই গতিটা নিরবচ্ছিন্ন, এবং যেহেতু চেতনার উদ্ভবের পর থেকে এই গতিশীল বস্তুর সঙ্গে তার সংঘর্ষও নিত্য, সেই হেতু চেতনার সম্প্রসারণও নিরবচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। এই নিয়ত সম্প্রসারণ-শীলতাই হচ্ছে চেতনার ধর্ম্ম। তার অপর একটি ধর্ম্ম হচ্ছে সৃজনশীলতা। অর্থাৎ মানুষ—যার মধ্যে চেতনা একটা পরিণত স্তরে এসেছে—আংশিকভাবে তার ভাগ্যের স্রষ্টা। আংশিকভাবে কেননা, মানুষের চেতন-শক্তি নিজে এক বৃহৎ অখণ্ড বস্তুজগতের অংশমাত্র, সুতরাং সে এই জগৎ নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে পারে না। কিন্তু আপেক্ষিকভাবে তার নিজস্ব পরিধির মধ্যে সে স্রষ্টা। গতি এবং সৃজনীশক্তি, এ দুটি যেহেতু একই বস্তু, অর্থাৎ চেতনার, অবিচ্ছেদ্য দুটি দিক, সুতরাং চেতনার ধর্ম্মই হচ্ছে অবিরত সৃষ্টি করে যাওয়া; কোথাও থেমে থাকা নয়। নিস্তরঙ্গ স্রোতে যেমন বিচিত্র বস্তুর ছবি প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু স্রোতটা চলেছেই, কোথাও থমকে থেমে বিশেষ কোন একটা ছবিকে ধরে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে না, বরং যদি কোন কারণে গতিটা রুদ্ধ হবার মত হচ্ছে, তখন ফেঁপে উঠছে, ফুলে উঠছে, অন্ধবেগে বাধাবন্ধ ভেঙে চুরমার করে আবার ছুটে চলছে, তেমনি।

সমাজ-ব্যাপারে এই তত্ত্বের প্রয়োগ কি ভাবে হচ্ছে দেখা যাক। আধুনিক জীবন যে গ্রহণ-লাগা চাঁদের মত খণ্ডিত, একপেশে, একথা মার্কস্-বাদী স্বীকার করছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, সমাজে বৈষম্যমূলক ধনবণ্টন ব্যবস্থার ফলে এটা ঘটেছে। মানুষের চেতনা প্রথম ক্রিয়াশীল হয়েছে জীবনোপজীব্য আহরণের চেষ্টায়। পরবর্তীকালের তার যা কিছু সৃষ্টি, এমনকি কাব্য, শিল্প, সঙ্গীতের সূক্ষ্মতম রসলোক পর্য্যন্ত সব দাঁড়িয়ে আছে এই প্রাথমিক কর্ম্মপ্রেরণার ভিত্তিস্থানের ওপর। ব্যক্তির জীবনে এই কর্ম্মপ্রবাহ যদি অব্যাহত থাকে তবেই সম্ভব হয় নিত্য নবতর সৃজনের পথে চিত্তের বাধাহীন গতি, unimpeded flow of the stream of consciousness. কিন্তু বর্ত্তমান সমাজে নানা ঐতিহাসিক কারণ পরম্পরায় প্রধানতঃ দুটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে, তার একটি অন্যটির পরিশ্রমের ফল ভোগ করে চলেছে। শোষিতেরাই সমাজের প্রায় পনের আনা। এই শোষণ ব্যবস্থা যতদিন চলতে থাকবে, ততদিন শোষক ও শোষিত কারোরই কল্যাণ নেই, কারণ উভয়ের কারোরই, সুতরাং গোটা সমাজেরই, জীবনপ্রবাহ ততদিন অবরুদ্ধ থেকে যাবে। আজ মানুষের জীবনে যে দুঃখ, উদ্বেগ, অশান্তির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, সে সবই চেতনার এই অবরোধের ফল।

মুক্তির উপায়ের নির্দ্দেশ এই ব্যাখ্যার মধ্যেই আছে। জড়যন্ত্রের বস্তুবাদের অলঙ্ঘ্য নিয়ম অনুসারে সামাজিক জীবন-প্রবাহ নিজেই নিজেকে বাধামুক্ত করতে চলেছে। সাদা কথায়, শোষণের মাত্রা যত বাড়বে, শোষিতের দলে আত্ম-সচিত তত্ই বেশী পরিমাণে জাগবে। শোষক ও শোষিতের মধ্যে যে পারস্পরিক সংগ্রাম অবিরত চলেছে, জাগরণের একটা পরিণত অবস্থায় এই সংগ্রাম একটা পূর্ণ সামাজিক বিপ্লবের রূপে ব্যাপকভাবে জ্বলে উঠবে। সেই বিপ্লবের আগুনে শোষকশ্রেণীকে আহুতি দিয়ে মানুষ শ্রেণী শোষণহীন স্বাধীন সমাজের ভিত্তি পত্তন করবে। তখন আবার জীবন-প্রবাহ অবারিত বেগে চলবে। সমাজবিজ্ঞানের, তথা চেতনার বিবর্ত্তনের এই মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে যারা সজাগ হয়েছে এবং যারা একে স্বীকার করতে পেরেছে, তারা অর্থনৈতিক শ্রেণীর গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়েছে; এখন তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে অনাগত বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য সজ্ঞানে, সচেতনভাবে শ্রেণীসংগ্রাম ঘনিয়ে তোলা।—সংক্ষেপে এই হচ্ছে মার্কসীয় মতবাদ।

লক্ষ্য করা দরকার, এই তত্ত্বের দার্শনিক অংশ যেটুকু সে হচ্ছে চেতনার উদ্বর্ত্তনের একটি ধাপের বর্ণনা মাত্র; তার ব্যাখ্যা নয়। ব্যাখ্যা যা আছে, তাকে দার্শনিক সিদ্ধান্ত বলা যায় না। তাকে খণ্ডন করার মত যুক্তি না যদি থাকে, অন্ততঃ গ্রহণ করবার মত কোন যুক্তিও নেই। সুতরাং এটা ছেড়ে দিয়ে এই তত্ত্বের সামাজিক প্রয়োগের দিকটা আলোচনা করাই ভাল।

এই বৈপ্লবিক কর্ম্মবাদকে বিশ্লেষণ করলে এর বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি ওঠে। প্রথমতঃ, শব্দার্থের ওপর প্রচুর জবরদস্তি না করে একে বিপ্লববাদ বলে চালানো সম্ভব নয়। বিপ্লব মানে যদি হয় আমূল পরিবর্ত্তন, তবে মানতেই হবে, এ পরিকল্পনায় বিপ্লবাত্মক কিছু নেই। একে বলা যায় উচুদরের একটা সংস্কারমূলক পরিকল্পনা। চলতে চলতে যন্ত্রটা হঠাৎ বিকল হয়ে গেলে তার কলকব্জা ঠিক করে তাকে আবার চালু করতে হয়। এ কাজটার আসল নাম সৃজন নয়, সংস্কার।

দ্বিতীয়তঃ, এই পরিকল্পনার ওপর যন্ত্রাশ্রিত জীবনের যান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। বিপ্লব ঘটানোর ব্যবস্থা-পত্রটা বিজ্ঞানসম্মত বলে মেনে নেওয়া এবং বিপ্লবের ঘটনা-টাকে অলঙ্ঘনীয় ঐতিহাসিক ভবিতব্যতা বলে বিশ্বাস করা—এই দুয়ের কোনটারই ভিত্তি নেই। তিন হাজার বছর আগে গ্রীক চিকিৎসকদের বিশ্বাস ছিল বিষ দিয়ে বিষ ঝাড়া যায়। মানুষের শরীরের মধ্যে কোন বিষক্রিয়া ঘটলে সেই বিষই উপযুক্ত পরিমাণে ক্রমে ক্রমে শরীরে ভরে দিতে হয়। বিষে জর্জ্জর হয়ে শরীরটা যখন যায় যায় হবে, তখন তার মধ্যে প্রাণশক্তি নিজেকে বাঁচাবার আগ্রহে দুর্জ্জয় বেগে রুখে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠবে এবং সেই আলোড়নের ফলে শরীর থেকে বিষ বেরিয়ে যাবে। এই ঘটনাকে তাঁরা বলতেন Katharsis. মার্কসীয় সামাজিক বিপ্লব একটা সামাজিক ক্যাথারসিস মাত্র। কিন্তু নাম যাই হোক, এটা যদি ঘটে তা হলে আপত্তি কি? —আপাততঃ আপত্তি হচ্ছে এই যে, এটা ঘটতে পারে একথা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে বলছে না। বরং বলছে ঠিক

উল্টা কথা, অর্থাৎ একটু একটু বিষ শরীরে এমন ভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় যে, শরীর সে বিষক্রিয়া সহ্য করবার শক্তি নিজের মধ্য থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারে। রাশিয়ায় ধনতান্ত্রিক অনতর্কতার ফলে যে ঘটনা ঘটেছে, জার্মানিতে তার পুনরাবৃত্তি হয় নি, ইংলণ্ডে আগেই হয় নি। ভ্যাক্সিনেশন দিয়ে যদি বিজ্ঞান-সম্মত হয়, তবে ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় সমাজবিপ্লব হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অবশ্য মানুষের ব্যাপারে 'আছে' বা 'নেই' কোনটাই জোর করে বলা যায় না। মানুষের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী বাক্‌জাল মাত্রে পর্যবসিত হয়েছে, তার মধ্যে দু-চারটি কার্ল মার্ক্‌সের নিজেরও আছে বোঝবার সুবিধার জন্য মানুষের চেতনাকে জলস্রোতের সঙ্গে তুলনা করা যায়, কিন্তু সেটা নিছক তুলনা ছাড়া আর কিছু নয়। জল-স্রোতটা যান্ত্রিক। মানব চেতনা একটা রহস্যময় বস্তু যার উদ্বর্তনের পথে নানা অভাবিত ছন্দ রূপায়িত হয়ে ওঠে। জোরালো ভবিষ্যদ্বাণীর স্থান এক্ষেত্রে বড় বেশী নেই। আজকার দিনের খুব স্বাভাবিক একটা সম্ভাবনার কথাই ধরা যাক: মানুষের চেতন কর্মশক্তির ওপর যন্ত্রশক্তির যে আধিপত্যের নমুনা আমরা বোমাতে দেখা গেল, তাতে এটা অসম্ভব নয় যে, বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনা অবাধে চলতে থাকলেও সেটাকে ঘটিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়ার আগেই এই সভ্যতাটাই গোটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

তৃতীয় এবং প্রধান আপত্তি হচ্ছে এই যে, এই তত্ত্বে যন্ত্রের নিগড় থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করবার কোন পরিকল্পনা নেই। বরং এ নিগড়কে অপরিহার্য্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ধনবণ্টন-ব্যবস্থার বৈষম্য দূরীভূত হলেই মানুষের চেতনা কুসুমিত হয়ে উঠবে, এ ধারণার সমর্থনে কোন জোরালো যুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। যেটা যুক্তিযুক্ত কথা সেটা এই যে, মানুষের ব্যবহারিক জীবনে কোন অভাব-বোধ থাকবে না। যন্ত্রের সহযোগিতায় উৎপাদন শক্তি বেড়েছে প্রচুর, আরো বাড়ছে। সুতরাং দারিদ্র থাকবার কোন কারণ নেই। কিন্তু মানুষের চেতনার সম্প্রসারণ ব্যাহত হচ্ছে একমাত্র দারিদ্রের ফলে, এই নিদানটাই ভুল। অন্তহীন বিকাশের অভীপ্সা যদি চেতনার ধর্ম্ম হয়—যা মার্ক্‌স্-বাদীরা মেনে নিয়েছেন—তা হলে এটাও স্বীকার করতে হবে যে শুধু বস্তুজগতে অবাধ বিচরণের অধিকার অর্জ্জিত হলেই সে অভীপ্সা সার্থক হবে না। বিচরণটা তখন অভ্যাসে পরিণত হবে, এটা আগে আলোচনা করা হয়েছে। টাকার সঞ্চয় যখন অভাবকে বহুগুণে অতিক্রম করে যায়, তখন টাকা আর 'অ্যাসেট' থাকে না, সেটা হয়ে ওঠে শুধু সংখ্যা, এবং সেই সংখ্যার সঙ্গে মনের সম্পর্ক শুধু অভ্যাসের—পাঁড় তামাকখোর যেমন তামাক খেয়ে এক সময় আনন্দ আর পায় না, কিন্তু না খেলে অস্বস্তি বোধ করে। এই যান্ত্রিক দাসত্ব মনের মুক্তির চিহ্ন নয়। প্রতিবাদে মার্ক্‌স্-পন্থী কেউ কেউ বলে থাকেন, মন ত একটা জীবন্ত বস্তু, সুতরাং চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। চেতনা-প্রবাহের অবাধ সঞ্চরণের পথ বস্তুজগতে আগে উন্মুক্ত হোক্। তারপরও যদি কিছু থাকে, তার দিশা মানুষ খুঁজে নেবে।—নেবে, একথা আমরা বিশ্বাস করি; তবে সে নেওয়ার রাস্তাটা মার্ক্‌স্-বাদের মধ্য দিয়ে নয়। মনটা জীবন্ত বলেই তার সম্বন্ধে যেমন আশা আছে, তেমনি আশঙ্কাও আছে। আগেই বলেছি মানুষের সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত ভবিতব্যতার কথা সম্পূর্ণ দ্বিধা-মুক্ত মনে ঘোষণা করা যায় না। যন্ত্রের সম্পর্কে যায়। বিশেষ একটা অবস্থায় একটি যন্ত্র বিশেষ এক ধরণের কাজ দেবেই, এটা বলা চলে। মানুষের সম্বন্ধে এমনি জোর ক'রে যাঁরা কিছু বলে থাকেন তাঁদের মনের ছবিটা অল্পাধিক যন্ত্র-ঘেঁষা। আর তার সঙ্গে মিশে আছে একটা দুরন্ত আত্মাভিমান। ধারণাটা হচ্ছে এই রকম যে, সৃষ্টিতে মানুষই হচ্ছে শেষ কথা। কীর্ত্তি তার যাই হোক্, কাল-সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে তার কীর্ত্তির তরণী চিরকাল তরা-পালে ভেসে যাবে। ইচ্ছা করে বা ভুল করেও সে যদি কোন প্রস্তর-চরে ধাক্কা লাগায়, এ তরী তবু বানচাল হবে না।—সৃষ্টির আদি-অন্তহীন সমুদ্র পথে এমনি অবাধ বিচরণের ছাড়পত্র নিয়ে কোন প্রাণী চলেছে এমন সংবাদ আজো জানা যায়নি। বরং চলতে না পেরে এর জলতলের অন্ধকার গর্ভে বালু-শয্যায় অনেকে শেষ শয়ান বিছিয়েছে, এর বহু চিহ্ন আজো দেখা যায়, এমন কি কতকগুলি তার মধ্যে এমনও আছে যারা পরিণত মানব-সভ্যতার প্রস্তরীভূত-কঙ্কাল। সুতরাং মনে কিঞ্চিৎ বিনয় রাখা ভাল। বাষ্প-বিদ্যুৎ ব্যবহারজীবি

জীবনই চেতনার ইতিহাসের চূড়ান্ত অধ্যায় না হতে পারে।

কিন্তু সভ্যতার বর্ত্তমান স্তরে বাষ্প-বিদ্যুতের সঙ্গে মানব-চিত্তের সম্পর্ক হিন্দু-স্ত্রীর গাঁটছড়ার মতই অখণ্ডনীয় হয়ে উঠেছে। এবং ফলে জীবনের বিকাশ যে বাহত হতে ইতি-মধ্যেই সুরু হয়েছে এটা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। মার্ক্স্-বাদে এ গাঁটছড়া খুলবার কোন ব্যবস্থা নেই। চেতনার যে অন্তহীন সম্ভাবনার আশ্বাস মার্ক্স্-বাদে আছে তা' গভীর দার্শনিক দূর-দৃষ্টির পরিচায়ক সন্দেহ নেই। আজকার পৃথিবীর কোটি কোটি বঞ্চিতের নৈরাশ্যের অন্ধকারে এ আলো ফুটেছে। কিন্তু সে আলো প্রভাতের সূর্য্য নয়, শেষ নিশীথের শুকতারা। অন্ধকারকে তরল করে এনেছে মাত্র, তাকে একেবারে দূর করতে পারবে না। দৃষ্টিভঙ্গির একটা মৌলিক পার্থক্যের জন্যই চিন্তাজগতের এত বড় বিরাট সমৃদ্ধি বিরাট দার্শনিক সমৃদ্ধির স্থান পাচ্ছে না। কারণ, বস্তু থেকে চেতনার উদ্ভব, বস্তুর সংস্পর্শ ছাড়া চেতনার স্ফূর্ত্তি সম্ভব নয়, এটা যারা বিশ্বাস করবে না তারা এ দর্শনের অন্য হাজারটা ভাল জিনিস সত্ত্বেও একে বর্জ্জন করবে। প্রশ্ন হতে পারে, বিশ্বমানবের জীবনের এত বড় বিরাট একটা সমস্যার মীমাংসা হবে কি শুধু দু-চারজন লোকের বিশ্বাস দিয়ে?—উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সেটাও নিতান্ত কল্পনাতীত নয়। সমাধানটা যদি সত্যিই আসে, তাতে বিশ্বমানবের কোন ক্ষতি হবার কথা নয়। বস্তুতঃ একজনের বিশ্বাস দিয়ে বহুর সমস্যার সমাধান হচ্ছে, এ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে ভূরি ভূরি। বহুর এতে কোন অপমান নেই। বরং, একের সেই বিশ্বাসটাই একমাত্র বিশ্বাস্য, এটা তারা যত তাড়াতাড়ি বুঝতে সুরু করে ততই তাদের বুদ্ধির প্রখরতা প্রমাণিত হয়। সুতরাং বিশ্বাসটা একেবারে অগ্রাহ্যের নয়। কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে বিশ্বাসের কিছু যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিও পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমটা দার্শনিক: ইতিহাসে এমন বহু লোকের সাক্ষ্য মিলছে, যাঁরা চেতনার নির্ব্বিশেষ উপলব্ধির স্তরে পৌঁছে গেছেন। তাঁদের একদম মিথ্যাবাদী বা উন্মাদ বলতে পারলে অবশ্য অন্য কথা, বলতে না পারলে তাঁদের অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা দিতে হবে। বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যার পথ আরো দুরূহ করেছে মনোবৈজ্ঞানিকদের কতকগুলি অতি আধুনিক আবিষ্কার। এই সব তথ্যের মূল্য মার্ক্সিয় অনুশাসনের মূল্যের চেয়ে বেশী হওয়াই সম্ভব। দ্বিতীয়টি আরো বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়। বস্তু ছাড়া চেতনার স্ফুরণ নেই, অথচ চেতনার 'মুক্তি, free flow হচ্ছে লক্ষ্য'—এ দুটি পরস্পর বিরোধী কথা। আজ সমাজে ব্যবহার্য্য বস্তু উৎপন্ন হতে পারে প্রচুর, কিন্তু ব্যবহার করতে পাওয়া যাচ্ছে না। তার কারণ, জিনিসগুলিকে তাদের উৎপাদন কেন্দ্র থেকে ব্যবহার কেন্দ্রে হাওয়ার পথে মাঝখানে আটকে দিচ্ছে মুনফা-লোভ, profit motive. এই লোভটা এতই দুঃসহ রকমের বিশ্রী যে মনে হচ্ছে ওটাকে উড়িয়ে দিলেই মুক্তি আসবে। আজকার তুলনায় বহু পরিমাণে মুক্তি আসবে এতে অবশ্য কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষকে বাধ্য হয়ে এমন কোন জিনিস ব্যবহার করতে হচ্ছে যেটা তার নিজস্ব অংশ, integral part নয়, ততদিন সেটার ওপর তার আধিপত্য যতই আসুক, সেটা ব্যবহার করে তার সাংসারিক স্বচ্ছলতা যতই বেশী হোক্, সেটার সঙ্গে তার আসল সম্পর্ক হচ্ছে নির্ত্তরতার। এই সম্পর্কের ফলে জীবন নির্দ্বিঘ্ন হতে পারে, নিরঙ্কুশ হতে পারে না। সুতরাং মনও মুক্তি পেতে পারে না। কিন্তু মার্ক্স্-বাদে মানুষকে যন্ত্র-নিরপেক্ষ করবার কোন পরিকল্পনা নেই, তার দার্শনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে তেমন পরিকল্পনা থাকতেও পারে না। মুক্তির এই ধারণার মধ্যে যে একটা নিদারুণ অসঙ্গতি রয়েছে সেটা চোখে না পড়াটা খুব আশ্চর্য্য। এবং আরো আশ্চর্য্যতর মনে হবে যদি বস্তু-বিবর্ত্তনের চূড়ান্ত অধ্যায় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য মেনে নেওয়া যায়। আনুমানিক কয়েক কোটি বছর পরে পৃথিবীতে এনার্জি বলে আর কিছু থাকবে না। অর্থাৎ বস্তুর কোন বিবর্ত্তন আর তখন সম্ভব হবে না। তা যদি হয় তা'হলে মার্ক্সিয় যুক্তি অনুসারে মানব চৈতন্যেরও কোন প্রকাশ তখন থাকা সম্ভব হবে না। এই নিশ্চিত অবসানকে সম্মুখে রেখে আজকার দিনে কাজ যতই নৈপুণ্যের সঙ্গে হতে থাকুক না কেন, সেই কাজের পিছের ভাবাদর্শকে একটা নতুন ধরণের মায়াবাদ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। ভারতবর্ষে প্রচলিত দার্শনিক মায়াবাদের সঙ্গে এর তফাৎ হচ্ছে এই যে এটা আধা-বৈজ্ঞানিক। তার

অন্ত অনুমান করা যায় না যে এর ফলটাও ঠিক আধাআধি হবে, বরং দুনো হওয়াই বেশী স্বাভাবিক। 'নলিনী দলগত জলের' স্থায়িত্বের কালটা তিরিশ বছর না হয়ে তিরিশ কোটি বছর হচ্ছে এইমাত্র। টাকার হিসাবের বেলা তিরিশ আর তিরিশ-কোটির পার্থক্যটা নিশ্চয়ই অসামান্য, এবং সংখ্যা নিয়েই যাদের কারবার তাদের কাছে এই পার্থক্যটাই চূড়ান্ত। কিন্তু এটা অস্বীকার করা চলে না যে দার্শনিক বিচারের ক্ষেত্রে এই সংখ্যার হিসাবটা একেবারেই ধর্তব্যের মধ্যে নয়। সুতরাং এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট হেতু রয়েছে যে দার্শনিক মাধ্যমে ভারতবর্ষের সমাজে যে যে ভাল এবং যে যে মন্দ ফল ফলেছে, বৈজ্ঞানিক মাধ্যমে গোটা পৃথিবীর সমাজে ঠিক সেই সেই রকমের ভাল-মন্দ ফল বিরাটতর আকারে ফলতে বাধ্য। এর উত্তরে কেউ বলতে পারেন, কেন, রাশিয়া—খারাপ ফল ত ওখানকার জীবনে কিছু ঘটছে না! মানুষ সব দিক দিয়ে সেখানে জীবনটাকে কেমন সুন্দর করবার কাজে লেগে গিয়েছে ত!—জবাবে শুধু একটি কথা বলা প্রয়োজন: একটা গিনিপিগের জীবন-পরিবেশে সামান্য একটু পরিবর্তন ঘটলে তার বংশে সেটার কি ফল বর্তায় সে বিষয়ে তার অন্ততঃ পঞ্চাশটা জেনারেশান ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ না করে জীববিজ্ঞানীরা কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছেন না। মানুষ আরো অনেক জটিলতর প্রাণী। তবু এর মাত্র একটি জেনারেশান দেখেই যিনি সিদ্ধান্ত স্থির করতে পারবেন, তাঁর সম্বন্ধে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তাঁর সরলতা যতটা বিস্ময়কর, বুদ্ধি ঠিক ততটা নয়।

সুতরাং উপায়ান্তরের সন্ধান করতে হবে। অর্থাৎ যা প্রকৃতই বিপ্লব, যা আমূল পরিবর্তন, তার সম্ভাবনা আছে কিনা জানতে হবে। অবশ্য আমূল পরিবর্তনের পথ সহজ নয়। যে পরিবর্তন আপেক্ষিক তারও বাধা আছে, কিন্তু তার সহায়ও আছে। যে মূল ধরে টানছে সমগ্রটাই তার বাধা। তার দুঃসাধ্য অভিযানের পথে সে একা। তবুও সে রকম কেউ যদি থাকে, তারই নাম বিপ্লবী।

(৫)

হোমারের কাব্যে আছে, নায়ক ইউলিসিস সঙ্গী-দল নিয়ে অজানা সমুদ্রে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এক আশ্চর্য দ্বীপে পৌঁছালেন। সে দ্বীপের বিস্তীর্ণ দীঘি, সরোবর অপূর্ব সৌন্দর্যময়, সুগন্ধি পদ্মফুলে ভরা। ফুলে ফুলে অপর্যাপ্ত মধু। সেই মধু খেয়ে সেখানকার লোক নেশায় আবিষ্ট হয়ে সুখ স্বপ্নে ভোর হয়ে থাকে। তারা ওঠে না, চলে না, কাজকর্ম করে না, শুধু মধু খায় আর ঘুমায়। সঙ্গী-দল মধু খেতে বসে গেল। নেশা যখন জমে এসেছে, তারা বলে দিলো—ব্যস্, আর নয়, সমুদ্রের দুরন্ত ঢেউয়ের মাথায় চড়ে লাফালাফি করা আমাদের শেষ হয়েছে। এখন আমরা ঘুমাবো। ...ঘুম এলো না ইউলিসিসের। প্রথম নেশার আবেশ কেটে যেতেই তাঁর দূরাবগাহী কল্পনার দৃষ্টিসীমান্তে জেগে উঠলো একখানা ছবি—দূরে, বহুদূরে উজ্জ্বল আলোয় বিচ্ছুরিত ইজিয়ন সাগরের মর্মর তরঙ্গমালা পার হয়ে বনরাজি-নীলা ইথাকার অস্পষ্ট তটরেখা, এক প্রান্তে পাষাণ প্রাসাদের উন্মুক্ত গবাক্ষপথে প্রতীক্ষমানা পথিকবধূ পেনেলোপি। তার অদৃশ্য আকর্ষণ পদ্মমধুর নেশায় ডুবে এড়ানো যায় না। ক্ষুব্ধ, ক্ষুব্ধ, অনিচ্ছুক সঙ্গীদলকে জোর করে উঠিয়ে আবার সেই দিশাহীন সমুদ্রে জাহাজ ভাসালেন ইউলিসিস।

এই গল্পাংশকে রূপক হিসাবে নেওয়া যায়—চেতনার অভিযানের রূপক। প্রতি যুগেই পারিপার্শ্বিকের বন্ধন যখন নিবিড় হয়ে এসেছে, নেশার আনন্দ যখন অভ্যাসে পরিণত হতে চলেছে, তখনই চেতনার গভীরতর স্তর থেকে আসে এগিয়ে যাওয়ার আদেশ। আপন হাতে সাজানো ঘর ভেঙে ফেলে তবে নতুন যুগের পত্তন হয়। প্রকৃত জীবনাদর্শ গঠন করতে হলে তার মাল-মসলা সংগ্রহ করতে হবে এই দীর্ঘ ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে।

(৬)

সে ইতিহাসের শিক্ষাটা মোটামুটি কি, তার আলোচনায় এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাক। আমরা আগে দেখেছি মানুষের কর্মজীবন সুরু হয়েছে যে যুক্তি অবলম্বন করে সেটা এই রকম: বাঁচতে হলে খেতে হয়, খেতে হলে খাদ্য উৎপন্ন করতে হয়, ইত্যাদি। লক্ষ্য করা যায় যে, যুক্তির সূত্রের মাঝখান থেকে এটাকে ধরা হয়েছে, গোড়া থেকে নয়। আর একটু গোড়ার দিকে পিছিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা চলে যে,

আদৌ বাঁচতেই হচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আজ পর্যন্ত যত কথার সৃষ্টি হয়েছে এত আর কিছুতে সম্ভবতঃ নয়। কিন্তু কোন উত্তরই সর্বজন গ্রাহ্য হচ্ছে না। কিন্তু উত্তরটা যুক্তি-সহ না হলেই যে প্রশ্নটা ওঠানো চলবে না, এমন মনে করা চলে না। অর্থাৎ প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে। এবং একজনের উত্তর অপরে নিক বা না নিক, নিজের চলার সুবিধার জন্য মানুষকে কার্যকরি উত্তর একটা আবিষ্কার করতে হচ্ছে। আজ আমরা সব চেয়ে কার্যকরি উত্তর পাচ্ছি সেইখান থেকে, যেখানে আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রাচীন দর্শন এসে একই পথে মিশেছে। এই মিলনে সত্যের যে রূপ ফুটে উঠেছে তারই নাম দেওয়া যায় 'চেতনার অভিযান'।

কথাটা সংক্ষেপে এই রকম: নিশ্চেতন বস্তুর মধ্য থেকে চেতনার উদ্ভব হয়েছে এটা যুক্তিসিদ্ধ নয়। কিন্তু যেহেতু বস্তুর মধ্যে,এমন কি, আপাত নিশ্চেতন বস্তুর মধ্যেও, চেতনার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে, সেই জন্য চেতনার চিরত্ব, Eternity of conscionsness দার্শনিক সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, চেতনার সৃষ্টির জন্য বস্তুর সংস্পর্শ যদি অপরিহার্য্য না হয়, তা হলে চেতনার নির্ব্বিশেষ (absolute) সত্তা মেনে নেওয়ারও কোন বাধা থাকে না। সাধারণতঃ অবশ্য এই নির্ব্বিশেষ রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারছি না, আমরা দেখতে পাই এর বিচিত্র প্রকাশ-লীলা। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে এই প্রকাশের একটি ক্রম জানা গেছে। তদনুসারে এখন একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে সৃষ্টির আদিতে এক সময় যুগ-যুগান্ত ধরে চেতনা বস্তুর মধ্যে মিশ্রিত, involved হয়ে ছিল। তখন বস্তুর বৈচিত্র্য ছিল, চেতনার প্রকাশ বৈচিত্র্য তখনও সুরু হয় নি। তারপর একদিন সুরু হোলো বস্তুর আঁধার গহ্বর ভেদ করে প্রকাশের পালা। বীজের খোলা বিদীর্ণ করে অঙ্কুর যেমন প্রথম পাখীর ডানার মত দুটি দল মেলে উদ্গত হয়, দেখে মনে হয় উড়ে চলে যেতে চায় বুঝি, বস্তুর বুকে প্রাণের প্রকাশ হোলো তেমনি উড়ে চলবার আগ্রহে। আবার যুগ-যুগান্ত কেটে গেল। স্থলে, জলে, আকাশে কত বিচিত্র প্রাণের অভিব্যক্তি দেখা গেল, কত রূপ, কত ছন্দ! তারপর একদিন শুধু রূপ হয়ে উঠে আর তৃপ্তি নেই। দেখতে হবে, বুঝতে হবে, জানতে হবে। অতএব তার জন্য নতুন একটা শক্তি চাই। ইউনিসিসের অভিযান চলেছেই। ক্রমে প্রাণের ওপর একদিন বিকশিত হয়ে উঠলো মন। প্রাণী হয়ে উঠলো মানব। মনের কাজ হচ্ছে মেপে মেপে জানা। সে যা কিছু দেখছে, তাই ছিঁড়ছে, টুকরা করছে, ছেঁড়া-টুকরা আবার জোড়া দিচ্ছে, সংখ্যা দিয়ে বস্তুর তত্ত্ব নিরূপণের চেষ্টা করছে। এমনি করে বিচ্ছিন্ন ভাবে যে জ্ঞান, objective knowledge লাভ হচ্ছে, তারই ওপর এই বস্তু জগতের আদর্শে সে মনোজগৎ রচনা করে চলেছে—ইচ্ছা, আবেগ, চিন্তা, কল্পনা, স্মৃতি, স্বপ্ন, —এইসব হচ্ছে সে জগতের উপাদান। এমনি করে analysis ও synthesis—ভাঙা ও গড়ার মধ্য দিয়ে বস্তু জগতের সঙ্গে বিচিত্র সংস্পর্শে তার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হয়ে এলো। এখন মানসিকতার বিকাশ একটা চূড়ান্ত পর্য্যায়ে এসে গেছে। অতঃপর মনের যা সৃষ্টি তার মধ্যে গুণগত বৈচিত্র্য আর বিশেষ থাকা সম্ভব নয়, যা থাকছে সেটা পরিমাণগত বৈচিত্র্য। আজকার দিনে সমস্ত সমাজ জুড়ে চিন্তের যে ক্লিষ্টতা, ব্যবহারিক-জীবনের যে যান্ত্রিক পৌনঃপুনিকতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তার মূল কারণ এই। এ সভ্যতার চালক যারা, তাদের গতি একটা স্বাভাবিক সীমায় এসে পৌঁছে গেছে। পথের দিশা না বদলে এর পরও চলার অর্থই হচ্ছে একটা নির্দ্দিষ্ট বৃত্ত-পথে গতাগতি। চালিতদেরও সুতরাং সেই একই পন্থা। বিরাট এক অভিযাত্রী-বাহিনীর পথ যেখানে শেষ হোলো গভীর গড়খাই-এর কিনারে, সেই কিনারটা পর্য্যন্ত একবার করে যাওয়া প্রত্যেক অভিযাত্রীর পক্ষে সম্ভবও নয়, প্রয়োজনও নয়। পথ আর নেই, এইটা জেনেই ফিরতে হবে।

বিচ্ছিন্নভাবে বস্তুর জ্ঞান যখন পরিণতিতে পৌঁছালো, এরপর যেটা বাকী রইল, সেটা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন ভাবে জানা, knowledge by identity.—এখানে দুটি প্রশ্ন ওঠে; প্রথমতঃ, এ রকম জ্ঞান সম্ভব কি না; এবং দ্বিতীয়তঃ, মনের দ্বারা সম্ভব কি না। উত্তরে বলা যায়, সম্ভব, কিন্তু মনের দ্বারা সম্পূর্ণ সম্ভব নয়। মনোবিকাশের পরিণত স্তরে মানুষ প্রেমের মধ্য দিয়ে এই পর্য্যায়ের জ্ঞানের একটি অতি ক্ষীণ আভাষ পেয়েছে মাত্র। একে সম্পূর্ণ

আয়ত্ত করতে হলে মনের অতীত কোন শক্তির বিকাশ প্রয়োজন। তাকে বলা যায় অতিমানস চেতনা, supra-mental consciousness. বিজ্ঞানে বহুদিন পর্যন্ত space-এর তিন dimension-এর খবর ছিল। তারপর সন্ধান পাওয়া গেছে চতুর্থ ডায়মেন্সনের। এ ব্যাপারটাও খানিকটা তেমনিভাবে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। মানসিক স্তর পর্যন্ত চেতনা দেহ, প্রাণ ও মন—এই তিনটি সত্তা নিয়ে কাজ করেছে। অতিমানস শক্তি হচ্ছে চেতনার Fourth dimension.

অতঃপর মানুষের সকল কর্মের ও মননের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে এই অতিমানস চেতনার সৃষ্টি।

বর্তমান যুগে এই হচ্ছে মানুষের একমাত্র জীবন-বেদ।

(৭)

কিন্তু রাজনৈতিক কর্মজীবনে এ তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা কি?

উপরে আলোচ্য বিষয়টি বিবৃত করার যে চেষ্টা করা গেছে, তা যদি আংশিকভাবেও সফল হয়ে থাকে, তা হলে এখন সহজেই বোঝা যাবে যে রাজনৈতিক কাজ বলে বিশেষ কোন কাজ আর থাকতে পারে না। আমাদের মানসিক অভ্যাস হচ্ছে কাজের কুঠরী নির্দেশ করে দেওয়া। রাজনীতি এক ধরণের কাজ, সমাজ-সংস্কার আর এক, শিক্ষা-বিস্তারের উদ্যম আরো এক ধরণের। এমনি ধর্মপ্রচার, চরিত্রগঠন, শিল্পোন্নয়ন, ম্যালেরিয়া-উচ্ছেদ এবং আরো কত কি। অতএব যে লোক দেশের কাজ করে, সে গান গায় না; যে কবিতা লেখে, সে সংসার খরচের হিসাবপত্র রাখতে পারে না। যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে, ছবি আঁকাটা তার কাছে সময়ের অপব্যয় মাত্র। যে দৃষ্টি-ভঙ্গী আমাদের গড়ে উঠেছে, তাতে এরকম ঘটা কিছু অন্যায় হয় নি। মনের কাজ সব কিছুকেই টুকরা, fragment করে দেখা। আদর্শের ক্ষেত্রেও এই fragmentation প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু যে স্তরের পরিণতির আস্পৃহা এখন মানুষের মনে জাগছে, তাকে সফল করতে হলে এই process of fragmentation ছেড়ে process of synthesis-কে অবলম্বন করতে হবে। তার অর্থ, সমগ্র অস্তিত্বের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত করে তুলতে হবে; এবং দ্বিতীয়তঃ, অস্তিত্বও তার পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য, harmony সৃষ্টি করতে হবে। এই নতুন দৃষ্টি-কোণ থেকে জীবনকে দেখার অভ্যাস করতে থাকলে জীবনে আর কোন কুঠরি, compartment, চোখে পড়বে না। সুতরাং কর্মপ্রেরণার বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা ঐক্যরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তখনও 'জুতা-সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত' অনেক কিছুই করার প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু সব কাজেরই প্রেরণা অন্য সব কাজের প্রেরণার সঙ্গে মূলে ঐক্যবদ্ধ থাকায়, কোন একটির মূল্য একান্তভাবে, বিচ্ছিন্নভাবে ধার্য্য করবার প্রয়োজন হবে না। বস্তুতঃ যেটা ঘটবে, সে হচ্ছে এই যে, জীবনকে সামগ্রিক ভাবে দেখার ফলে মূল্যবিচারের সমস্ত মানদণ্ডটাই বদলে যাবে।—খুব প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত ধরা যাক্। কল্পনা করা যায় যে, বর্তমান সংস্কার অনুসারে আমরা সংগ্রাম বলতে যা বুঝি, তেমন ধরণের কোন সংগ্রাম না করেও স্বাধীনতা পাওয়া অসম্ভব নয় এবং শ্রেণী-সংঘর্ষ না ঘটিয়েও শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা সাধ্যায়ত্ত হতে পারে।

অতি-মানস চেতনার বিকাশের পদ্ধতি কি?—এ প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু পদ্ধতির বিষয়টা ইতিহাসের ছাত্রের জ্ঞানের বাইরে। এটা বিশেষজ্ঞের ব্যাপার। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনে এই বৈপ্লবিক সাধনা সফল করবার কাজে ব্যাপৃত আছেন যাঁরা, পদ্ধতির সন্ধান তাঁদের কাছে করতে হবে। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমাদের উল্লেখ্য এখানে শুধু আর একটি কথা আছে। সবাই একদিন অতিমানুষ হয়ে উঠবে, এটা সম্ভব নয়। আজ ত নয়ই, সুদূর ভবিষ্যতেও নয়। উত্তরণের প্রতিস্তরেই পরিণতির তারতম্য দেখা যাচ্ছে। বিশ্বের সমস্ত বস্তু এখনও প্রাণময় হয়ে ওঠে নি। সমস্ত প্রাণে এখনও মনের বিকাশ ঘটছে না। মানবের মধ্যেও মানসিকতার পরিণতির তারতম্য রয়েছে। সুতরাং কল্পনা করা যায় যে পরিণততম মনেরই শুধু বিকাশের পরবর্তী স্তরে আপাততঃ পৌঁছবার সম্ভাবনা আছে। ব্যক্তির জীবনে এই বৈপ্লবিক সাধনা আংশিকভাবে সফল হতে সুরু করেছে বহুদিন আগেই। এই রকম দুই-একটি সাফল্যের প্রমাণ ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও আছে। মানবেতিহাসের ছাত্রের কাছে এই সব জীবন কাহিনী

উপেক্ষনীয় নয়। কিন্তু এই দুষ্কর তপস্যা সম্পূর্ণ সফল করতে হলে, এবং সাফল্যের সংখ্যা বাড়াতে হলে, এই আদর্শবাদ সমাজগতভাবে গ্রহণ করা আবশ্যক। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিরই আপাততঃ অতিমানব হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলেও অতিমানবত্বের সাধনায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই অল্পবিস্তর দান থাকা প্রয়োজন। সুতরাং চেতনার, তথা কর্ম্মের ঐক্য, শুধু অল্প কয়েকজন ব্যক্তির জীবনে প্রতিষ্ঠা করলেই যথেষ্ট হবে না, সে ঐক্যবোধ যথাসম্ভব সমগ্র সমাজে বিস্তারের চেষ্টা করতে হবে।

এই দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখলে মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম-পদ্ধতির তাৎপর্য্য এবং তার বিপুল ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতা কল্পনা করা এখন সহজ হবে। (ক্রমশঃ)

শুয়োর

[*Saint Antoine—maupassant*]

অনুবাদক—শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

লোকে তাকে ডাকতো সান্ত্ আন্তোয়ান্ বলে। তার কারণ তার নাম ছিলো আন্তোয়ান্, আর সে নিজে ছিলো খুব হাসিখুসি, নিদারুণ খাইয়ে আর প্রচণ্ড মদ্যপ। যদিও বয়েস তার হয়েছিলো ষাট, কিন্তু তবুও সে অসম্ভব দুঃসাহসী ছিলো।

কম্ন্ যেলার একজন বড় চাষী জমিদারের ছেলে সে। রংটা তার গাঢ়, বুক ও পেট বিশাল, আর তার নীচে লম্বা একজোড়া পা, ওপরে গাছের গুঁড়ির মত বক্ষোদেশের তুলনায় রোগাই মনে হোতো।

বিপত্নীক ছিলো সে। একলাই গোলায় থাকতো, সঙ্গে থাকতো একটা কি আর দুটো মজুর। কূটবুদ্ধির সঙ্গে তার সম্পত্তির দেখাশোনা করতো সে, ব্যবসায় ওঠাপড়াও সে বেশ সাবধানের সঙ্গে লক্ষ্য করতো, আর জমির চাষ খুব যত্নে করাতো। দুই ছেলে আর তিন মেয়ে—বেশ ভালো জায়গায় বিয়ে হয়েছে তাদের। মাসে একবার ক'রে বাপের সঙ্গে খেতে আস্তো তারা। কাছাকাছি সব জায়গায়ই গায়ের জোরের জন্য তার নাম ছিলো। কারো গায়ের জোরের তুলনা দিতো তারা এই ব'লে, "আমাদের সান্ত্ আন্তোয়ান্-এর মতনই এর গায়ের জোর।"

ফ্রাঙ্কো-জর্মান যুদ্ধ যখন সুরু হোলো, সান্ত্ আন্তোয়ান্ গর্জ্জাতে লাগলো, যে সে এক একটা প্রুশিয়ান্ সৈন্যদলকে খেয়ে ফেল্‌তে তৈরি হ'য়ে আছে—খাঁটি নর্মান্ চাষীর মতনই ছিলো সে—শুধু ঢাকে বেশি শব্দ। কাঠের টেবিলের ওপর ঘুঁসি মেরে বস্তো, কফির কাপ আর ছোট্ট গেলাসগুলো সশব্দে নেচে উঠতো। তাতে, তারপর মুখচোখ লাল ক'রে চীৎকার ক'রে উঠতো, "ওদের একজনকে আমি খাবই, চন্দ্র সূর্য্যের মতো সত্যি এ।" আসলে তান্‌ভিল্ পর্য্যন্ত প্রুশিয়ান্রা আসবে এটা সে আশাই করতো না। কিন্তু যে দিন সে শুন্লো তারা রুতো পর্য্যন্ত এসেছে, সে দরজা বন্ধ ক'রে ঘরে ঢুকে রইলো আর রান্না ঘরের জানোলা দিয়ে বাইরে অনবরত উঁকি মারতে থাকলো, কখন সঙ্গীনের ফলা দেখবে রাস্তায়।

একদিন সকালবেলা সে খেতে বস্তে যাচ্ছে, হঠাৎ দরজার পাল্লা দুটো সজোরে খুলে গেলো আর গ্রামের মোড়ল মেয়র শিকো পিতলের চুড়োওয়ালা কালো এক হেল্‌মেট্ মাথায় একটি প্রুশিয়ান্ সৈন্যের আগে আগে ঘরে ঢুকলেন। আন্তোয়ান্ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, আর সকলে তাকিয়ে রইলো হতভম্ব হ'য়ে। তারা ভাবছিলো, তাদের কর্ত্তা প্রুশিয়ান্ সৈন্যটাকে এখনি টুক্‌রো ক'রে ফেল্‌বে। কিন্তু পরিবর্ত্তে তারা দেখলো সে মোড়লের সঙ্গে করমর্দ্দন করলো। মোড়ল বললেন, "এই যে, তোমার জন্য তাদের একটিকে এনেছি সান্ত আন্তোয়ান্। কাল রাত্রে ওরা এখানে এসেছে। তোমার সেই আস্বাবগুলো এর সঙ্গে কাজে লাগিও না। ওরা ব'লে দিয়েছে, সামান্য একটু ক্ষতি হলেই আমাদের পুড়িয়ে মারবে, ধ্বংস করবে। আমি তোমাকে সতর্ক ক'রে দিলাম। এখন ওকে কিছু খেতে দাও, ও তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। আচ্ছা, আমি এখন যাই, বিদায়!" এই ব'লে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

আন্তোয়ান্-এর মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হ'য়ে গিয়েছিলো। সে প্রুশিয়ানটির দিকে তাকালো—মোটা একটি যুবক, গোলাপি রং, নীল চোখ, সুন্দর চুল, গাল পর্যন্ত দাড়ি, বড় নির্বোধ, ভীরু আর ভালোমানুষ ব'লে মনে হোলো। হিংসুক নর্মান্ এক পলকে লোকটাকে বিচার ক'রে নিলো, তারপর সাহস সঞ্চয় ক'রে ইঙ্গিতে তাকে বসতে অনুরোধ করলো, বললো, "একটু খাবার খাবে?" বিদেশী বুঝলোনা। তখন আন্তোয়ান্ দুঃসাহসী হ'য়ে কানায় কানায় ভর্তি একটা প্লেট ঠিক তার নাকের তগায় দিলো ঠেলে—"এই নে! এইটা গিলে ফেল্‌রে মোটা শূয়োর!"

সৈন্যটি উত্তর করলো "জা", তারপর পেটুকের মত পাত্রটির সদ্ব্যবহার করতে লাগলো, আর কৃষক তার ব্যবহার সৈন্যটির বোধগম্য হয়নি দেখে বিজয়োল্লাসে চাকরদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে হাসতে লাগলো। তারা এতক্ষণ মুখ বিকৃত ক'রে দাঁড়িয়েছিলো, তবে আর হাসবার কষ্টকৃত চেষ্টায়।

প্রুশিয়ান্ সেই প্লেটটা সাবাড় করলে পর সান্ত আন্তোয়ান্ আর এক প্লেট দিলো তাকে। সেটাও আগের মতই তলিয়ে গেলো। কিন্তু তৃতীয় প্লেট সে প্রত্যাখ্যান করলো। আন্তোয়ান্ তবু জোর করতে লাগলো, বলতে লাগলো, "চ'লে আয়, এটাকেও কাবার কর। তোর চর্বি দরকার যে শূয়োর!" সৈন্যটি খানি বুঝলো যে তাকে আর এক প্লেট খেতে বলা হচ্ছে। তাই সে হেসে ঘাড় নাড়লো আর ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলো, যে সে তৃপ্ত হয়েছে।

তখন সান্ত আন্তোয়ান্ খুব পরিচিত লোকের মত তার পেটে আস্তে একটা ঘুঁসি মেরে চেঁচিয়ে উঠলো, "আমার শূয়োরের পেট ভরেছে রে—তোরা দেখে যা ভরেছে কিনা!"

হঠাৎ সে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো, সমস্ত মুখ লাল টক্‌টক্ করতে লাগলো, কথা বেরোলোনা, যেন এখনি কিছু ঘাবে। তার মাথায় যে ফন্দিটা এসেছিলো, তারই হাসিতে তার দমবন্ধ হ'য়ে আসছিলো। "এই তো, এই ঠিক হবে—" আন্তোয়ান্ চেঁচিয়ে উঠলো—"সান্ত আন্তোয়ান্ আর তার শূয়োর—এই দেখো আমার শূয়োর।" আর চাকর তিনটেও হাসির অট্টরোল তুললো।

এতই আহ্লাদ হয়েছিলো বুড়োর, যে সবচেয়ে উঁচুদরের একবোতল মদের অর্ডার দিয়ে ফেললো সে। সত্যিই উঁচুদরের—পেলে মাথার চুল পর্যন্ত পাতা হ'য়ে যায়। সেই মদ সে সকলকে দিলো। তারা প্রুশিয়ানের গ্লাসের সঙ্গে নিজেদের গ্লাস ছোঁয়ালো। প্রুশিয়ান্ তখন ঠোঁট দিয়ে শব্দ করছিলো—বোধহয় নিজেকে সকলের প্রিয় করবার চেষ্টায়—অথবা হয় তো জানাতে চাইছিলো যে জিনিসটা খুব প্রীতিপ্রদ। সান্ত আন্তোয়ান্ চেঁচিয়ে তাকে বললো, "এই, এই যে একটা ভালো পদার্থ। বাড়িতে বোধ হয় এরকম মদ তোদের জোটে না! নারে শূয়োর!"

এরপর থেকে আন্তোয়ান্ প্রুশিয়ানের সঙ্গে ছাড়া বাইরে যেতো না। এই মজার মধ্যে সে প্রতিহিংসা নেবার চেষ্টা করতো। বৃহদাকার, স্থূলকায় একটা ভাঁড়ের প্রতিহিংসা। যারা গ্রাম ছিলো ভয়ে স্তিমিত হ'য়ে, এমন বিজেতৃবর্গের পিছনেই সেই গ্রামবাসীরা আন্তোয়ানের এই রসিকতায় হাসি-ঠাট্টাতরোড় করতে লাগলো। সত্যি, সান্ত আন্তোয়ানের মজা আর কেউ করতে পারতো না। পৃথিবীতে তার মত ছিলো না আর কেউ।

প্রতি অপরাহ্নে সে জার্মান্ সেনাটির হাতে হাত দিয়ে বেরোতো প্রতিবেশীদের উদ্দেশ্যে। সৈন্যটির পিঠ চাপড়ে দিয়ে সে খুশি হ'য়ে পরিচয় দিতো, "এটি আমার স্বকীয় শূয়োর। কেবল দেখো ও কেমন মোটা হচ্ছে দিনকে দিন।" চাষারা সানন্দে হাসতো।

"তিন পিস্টোলে আমি এটা তোমাকে বেচতে পারি, সেনেষা।"

—"তবেই হয়েছে। তাতে আমার দারুণ লাভ আন্তোয়ান্। আমি ওর মাংসের পুডিং খেতে তোমাকে নেমন্তন্ন করব।"

"ওর পেটের কাছটা হাত দিয়ে দেখো, চর্বি ছাড়া আর কিছু নাই।"

তারপর তারা পরস্পরের দিকে চোখ টিপে হাসে। বেশি জোরে হাসে না পাছে প্রুশিয়ান্ বোঝে, যে তাকে নিয়েই মজা করা হচ্ছে। কেবল আন্তোয়ান্ দিন দিন সাহসী হ'য়ে ওঠে, ওর উকুনে চিমটি কেটে বলে, "কি চর্বি!" কিম্বা চড় মেরে

চেঁচাতো, "সব খাঁটি শুয়োর মাংস!" প্রকাণ্ড মূর্তির মত তাকে দুই হাতে তুলে নেয়—তারপর চীৎকার ক'রে ওঠে, "পাক্কা ছ'শ পাউণ্ড ওজন—একটুও নষ্ট হবে না।"

যেখানেই তারা এক সঙ্গে যেতো, আন্তোয়ানের অভ্যাস ছিলো তার শুয়োরকে কিছু খেতে দিতে বলবার। এইখানেই ছিলো সব চেয়ে বড় মজা। সে বলতো, "যা খুশি দাও, শুয়োরে কি না খায়!" আর তারা লোকটাকে জোর ক'রে রুটি, মাখন, আলু, ঠাণ্ডা মাংস নানা রকম খাবার এনে খাওয়াতো। তার মধ্যে শুয়োরের মাংসও থাকতো, তারা টিপ্পনী কাটতো, "তোমার নিজেরই, খুব কচি।"

সরলমনা ভদ্র সৈন্যটি ভদ্রতার খাতিরে খেতে বাধ্য হোতো, লোকের তার ওপর এত মনোযোগ আছে দেখে খুশি হয়। খেয়ে অসুখ করে, তবু প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। সেতাই সে মোটা হয়ে যাচ্ছিলো, ইউনিফর্মের বোতাম আর ঠিক মত লাগে না। "শীগগিরই দেখছি তোর জন্যে একটা বড় খাঁচা করতে হবে।" বলে আন্তোয়ান্।

খুব বন্ধু হ'য়ে পড়েছিলো তারা। বুড়ো যখনই কোনো দরকারে কাছাকাছি বেরোতো, প্রশিয়ান্ তার সঙ্গলাভের জন্যে নিজে সঙ্গদান করতো।

আবহাওয়া খুব খারাপ হ'য়ে পড়লো। সব জ'মে বরফ। বোধ হোলো ১৮৭০-এর ভীষণ শীত ফ্রান্সের এত দুর্দশার পরেও মড়ক নিয়ে আসবে।

আন্তোয়ান্ আগে থাকতেই সব কাজ সেরে রাখা পছন্দ করতো আর সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেও জানতো বেশ ভালোরকম। সে দেখলো, বসন্তকালে তার সার কম পড়তে পারে, তাই গরীব এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে কিঞ্চিৎ মুদ্রা-বিনিময়ে সার নিয়ে আসতে লাগলো। স্থির হোলো, তার সুবিধার জন্যে সে রোজ খানিকটা ক'রে নিয়ে যাবে। তাই প্রত্যেক দিন রাত্রির আগে তার শুয়োরের সঙ্গে সে তার গাড়ি ক'রে ক'মাইল দূরে হাউলের ক্ষেতে গিয়ে উপস্থিত হোতো, আর প্রতিদিনই তার শুয়োরকে খাওয়ানো নিয়ে রসিকতা হোতো। সারা গ্রামের লোককে দল বেঁধে ঐখানে যেতে দেখা যেতো, যেমন রবিবারে লোকে গীর্জা যায়।

কিন্তু সৈন্যটি এখন কিছু সন্দিগ্ধ ব'লে মনে হোতো, আর যখন তাদের চারপাশে হাস্যধ্বনি কিছু উচ্চমাত্রায় উঠতো, সে চারিদিকে চোখ ঘোরাতো, তার থেকে যেন রাগের আগুন ছিটকে বেরোতো মাঝে মাঝে।

এক সন্ধ্যাবেলা তার পেট ভ'রে যেতে সে আর খেতে চাইলো না, উঠে যেতে উদ্যত হোলো, কিন্তু সান্ত আন্তোয়ান্ তার হাতে এক মোচড় দিয়ে তাকে থামালো। তারপর দুই কাঁধে হাত দিয়ে তাকে চেয়ারের ওপর ঠেলে দিলো। সে ধাক্কা সইতে না পেরে চেয়ারটা গেলো উল্টে।

ঝড়ের মত অট্টহাস্য উঠলো। সান্ত আন্তোয়ান্ তার শুয়োরকে তুলে কাল্পনিক ক্ষত পরীক্ষা করবার ভাণ করলো। বললো, "খাবার না খাও, ঈশ্বরের নামে মদ তোমাকে খেতেই হবে।" কাজেই এক বোতল 'কগ্‌নাক' অর্ডার গেলো।

ভীষণ দুই নিষ্কেপ করলো সৈন্যটি, তবুও মদ্যপান করতে সম্মত হোলো। ওরা যতখানি দেয়, ততখানিই সে খেতে প্রস্তুত। সান্ত আন্তোয়ান্ও ওর সঙ্গে খেতে রাজি হোলো দর্শকদের মজার জন্যে।

আন্তোয়ান্ টোমাটোর মত লাল চোখ ভীষণ ক'রে বোতলটা উল্টালো, গ্লাস্ ভর্তি করলো। তারপর 'তোকে' ব'লে গ্লাসটা দিলো। প্রুশিয়ান্ কথা না ব'লে প্রত্যেকবারে গলার মধ্যে ঢেলে দিতে লাগলো মদ।

এ একটা যুদ্ধের মত, প্রতিহিংসার মত। কে আগে টেবিলের তলায় প'ড়ে যাবে মাতাল হ'য়ে? উত্তেজনা হোলো ভীষণ। বোতলটা যখন ফুরোলো, দুজনেই তখন যতটা পেটে ধরে, খেয়েছে। কেউই কিন্তু কাউকে হারাতে পারেনি। কালকে এর একটা চূড়ান্ত হবে।

টলতে টলতে দুজনে বেরোলো বাড়ির দিকে। পাশে-পাশে দুটো মোটা ঘোড়া মন্থর গতিতে টেনে নিয়ে চলেছে সার বোঝাই গোবরের গাড়িটা।

আবার তুষারপাত আরম্ভ হয়েছিলো, নিশ্চন্দ্র নিশীথ আলো করছিলো মৃত্যুর মত শ্বেত আদিগন্তপ্রসারী সেই সমতল। সেই ঠাণ্ডায় লোকদুটোর নেশা আরও গেলো বেড়ে। আন্তোয়ান্ জিততে পারলো না ব'লে বড় অতৃপ্ত বোধ করছিলো। এখন তার শুয়োরের কাঁধে ভর দিয়ে তাকে

একটা খানায় ফেলে দেবার মৎলবে চল্‌তে চল্‌তে একটু সান্ত্বনা-বোধ করছিলো। অপরজন পিছু হ'টে গিয়ে ধাক্কা-গুলো এড়িয়ে যাচ্ছিলো, সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তিপূর্ণ সুরে জার্মান্ ভাষায় কী যেন বিড়বিড় ক'রে উঠছিলো, বৃদ্ধ তাতে উঠছিলো উচ্চহাস্য ক'রে। শেষে প্রুশিয়ানের ধৈর্যের সীমা পার হ'য়ে গেলো, আর যেই আন্তোয়ান্ আর এক ধাক্কা দিতে যাবে, সে এক ঘুঁসি দিয়ে তার প্রতিফল দিলো—সে ঘুঁসিতে আন্তোয়ানের বিশাল দেহ কেঁপে উঠলো। মদের ঝোঁকে বুড়ো ক্ষেপে গেলো। লোকটাকে শিশুর মত দুইহাতে ধ'রে অবলীলাক্রমে তুলে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিলো, তারপর রাস্তার অপর পারে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। তারপর নিজের শক্তির এই পরাকাষ্ঠায় খুশি হ'য়ে বুকের ওপর হাত দিয়ে অট্টহাস্যে ফেটে পড়লো।

সৈন্যটি ক্ষিপ্রবেগে উঠে দাঁড়ালো খালি মাথায়, কারণ তার শিরস্ত্রাণটি গিয়েছিলো গড়িয়ে, তারপর খাপ থেকে সঙ্গীন খুলে নিয়ে ক্ষাপার আন্তোয়ান্‌কে লক্ষ্য ক'রে দুর্দাম বেগে ছুটে এলো।

তাকে আসতে দেখে আন্তোয়ান্ তার চাবুকের মাঝখানটা শক্ত ক'রে ধরলো।—গন্ধর মেরুদণ্ডের মত সরল, সবল ও অনমনীয় তার চাবুক। প্রুশিয়ান্ ছুটে এলো সোজা তার অস্ত্র সামনে ধ'রে, নরহত্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে। কিন্তু বৃদ্ধ নির্ভীক চিত্তে উদ্যত অস্ত্রের ফলাটা চেপে ধরলো খালি হাতে, সেটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো, তারপর চাবুকের একঘা কসিয়ে দিলো তার শত্রুর মাথার মাঝখানে—শত্রু সংজ্ঞাহীন হ'য়ে তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো।

ভীত, আশ্চর্য ও হতবুদ্ধি হ'য়ে গেল সে। দেহটা বার কয়েক ন'ড়েচ'ড়ে নিস্পন্দ হ'য়ে এলো। সে উপুড় হ'য়ে সেটাকে উল্টে ফেললো। তারপর খানিকক্ষণ ভাবলো, কী করা যায়। লোকটার চোখদুটো বন্ধ, আর কপালের পাশে একটা ক্ষত থেকে রক্ত ব'য়ে চলেছে অবিরলধারে। নিশীথের সেই ম্লান আভাতেও আন্তোয়ান্ তুষারের ওপরে রক্তের দাগ দেখতে পাচ্ছিলো।

তার মাথা ঘুরতে লাগলো, সে নিশ্চল হ'য়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। ওদিকে বোঝাই গাড়িটা ঘোড়াদুটোর পিছনে মন্দগতিতে চল্‌তে লাগলো।

কী করবে সে এখন? ওরা তাকে গুলি ক'রে মারবে, তার জমি পুড়িয়ে দেবে, সারা গ্রামটা ধ্বংস করবে। কী উপায়! কী উপায়!! কী ক'রে সে এখন দেহটাকে লুকিয়ে তার মৃত্যু গোপন ক'রে প্রুশিয়ান্‌দের হাত থেকে রক্ষা পায়? বহুদূর থেকে কয়েকটা ক্ষীণ শব্দ ভেসে এলো তুষারের মহান্ স্তব্ধতা অতিক্রম ক'রে। তখন উন্মত্তপ্রায় আন্তোয়ান্ শিরস্ত্রাণটা তুলে নিয়ে জোর করে তার শত্রুর মাথায় বসিয়ে দিলো, দেহটাকে তুলে ছুটে গাড়িটা ধরলো, তারপর সেটাকে রসদের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলো। কী করা যায়, তা বাড়ি গিয়ে ভাবা যাবে।

সে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলো, বহু ক্ষেত্রেও কোনো খুঁত পেলোনা। চোখের সামনে নিজের সর্বনাশ দেখতে পাচ্ছিলো সে। আস্তাবল পর্যন্ত সে গেলো গাড়ীটার পিছনে পিছনে। একটা জানালা দিয়ে আলোর রশ্মি দেখা যাচ্ছিলো। তার দাসী তখনো ঘুমোয়নি। গাড়ীটাকে ঘুরিয়ে গোবরের ভালের কাছে নিয়ে এলো সে আবার। ভাবলো, গোবরের মধ্যে লুকিয়ে ফেলবে শবটাকে।

সৈন্যটি অদৃশ্য হোলো, সমাধিস্থও হোলো তার চিন্তা অনুসারে। শবটা আন্তোয়ান্ তার শাবল দিয়ে সমান ক'রে দিয়ে সেটা কাছেই মাটিতে পুঁতে দিলো। চাকরকে ডেকে ঘোড়াদুটোকে খুলে নিতে আদেশ দিয়ে সে ওপরে গেলো।

এর পরে কী করবে, অনবরত তাই ভাবতে ভাবতে সে শুতে গেলো। কিন্তু তার বিহ্বল মনে একটা ফন্দিরও উদয় হোলো না। সেই স্তব্ধতার মধ্যে একলা শুয়ে থাকতে থাকতে তার ভয় আরও বেড়ে গেলো। নিশ্চয় তাকে গুলি ক'রে মারা হবে! ভয়ে ঘেমে সে নেয়ে উঠলো, দাঁতে দাঁত লাগলো, কাঁপতে কাঁপতে সে উঠে দাঁড়ালো, কম্বলের তলায় চুপচাপ থাকতে আর পারলো না সে। রান্নাঘরে গিয়ে আলমারি থেকে এক বোতল মদ বার ক'রে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। দু ঢোঁক পরপর গিললো, আর নেশা পূর্ণমাত্রায় চ'ড়ে গেলো, শান্ত করা দূরে থাক্। চমৎকার কাজটি সে কোরেছে নির্বোধের মত—হায় ভগবান!

পাগলের মত সে পায়চারি করতে লাগলো। কোনো কায়দা, কোনো কৈফিয়তে সে কি পার পেতে পারে? এই

ভাবতে ভাবতে এক চোঁক ক'রে মদ খেতে লাগলো। কিন্তু স্বপক্ষে কিছুই খুঁজে পেলোনা—একেবারে কিছুই না।

মাঝরাত্রির সময়ে তার নেকড়ে বাঘের মত পাহারাদার কুকুর 'দেহোরাঁ' পাগলের মত চেঁচাতে লাগলো। কাদায় আন্দোয়ানের হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরলো। আর প্রত্যেকবার কুকুরটা যেই চীৎকার আরম্ভ করছিলো, বুড়োও ভয়ে শিউরে উঠছিলো।

নিচের ঘড়িতে পাঁচটা বাজলো কুকুরটাও থামে না, আন্দোয়ান্‌ও উন্মাদের মত হ'য়ে গেছে। সে কুকুরটাকে ছেড়ে দিতে উঠলো, আর যাতে ডাক না শুনতে হয়। বুড়ো নিচে গেলো, দরজা খুলে রাত্রির হিমের মধ্যে বাইরে এলো।

তখনো খুব বরফ পড়ছে। চার দিকে সব সাদা। গোলা ঘরগুলো কালো একতাল বস্তুর মত দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা কুকুরটার শিকল খুলে দিতেই দেহোরাঁ এক লাফে সেই গোবরের স্তূপের মধ্যে নাক ঢুকিয়ে দিলো।

সান্ত আন্দোয়ানের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কম্পমান। ভীত-কণ্ঠে সে বললো, "কী হয়েছে তোর? নেকড়ে জানোয়ার?" ব'লে ক' পা এগিয়ে এসে নিরীক্ষণ করতে লাগলো অজানা ম্লান অন্ধকার আর উঠানের ছায়াগুলোকে।

অবশেষে সে সেই গোবরের রাশির মধ্যে ছায়ার মত একটা মানুষকে ব'সে থাকতে দেখতে পেলো। স্থির ও ভয়-বিহ্বল নেত্রে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো সেটার দিকে কিছু-ক্ষণ। তারপর মাটির মধ্যে পোঁতা শাবলটাকে দেখে সেটাকে সজোরে তুলে নিলো। ভয়ের এমন একটা মাত্রা আছে, যাতে মহাকাপুরুষও অসমসাহসিক কাজ ক'রে ফেলে। সেই ভয়ে বিহ্বল হ'য়ে সে ছুটে দেখতে গেলো, জিনিসটা কী।

সে-ই—সেই প্রুশিয়ানটিই। আবর্জনার উত্তাপে তার গতপ্রায় প্রাণ আবার ফিরে এসেছে। প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় সেই তুষারতলে, গায়ের ময়লা মেখে মৃদু জড়িতজ্ঞান, আঘাতে আহত, রক্তস্রাবে অবসন্ন অবস্থায় ব'সে আছে সে।

আন্দোয়ান্‌কে সে দেখলো। নেশার ঝোঁকে চিনতে না পেরে উঠবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তাকে দেখেই বুড়ো আগুন হ'য়ে উঠলো রাগে। তার মুখে ফেনা উঠতে লাগলো বিড়বিড় করতে করতে, "আঃ! তুই শূয়োর! তুই এখনো মরিস্‌নি! তুই আমার সর্বনাশ করতে চাস্? আঁ!? দাঁড়া—" ব'লে তার শাবল নিয়ে ছুটে গেলো, তারপর গায়ের জোরে সেটা প্রুশিয়ানের বুকে হাতল অবধি দিলো বসিয়ে।

সৈন্যটি আবার চীৎ হ'য়ে পড়লো, একটা দীর্ঘ মরণশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক থেকে। বুড়ো অস্ত্রটা বারেবারে বসাতে লাগলো পেটে, গলায়, বুকে। মৃতদেহটাকে উন্মাদের মত মারতে লাগলো। দেহটার আপাদমস্তক ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেলো, রক্ত বেরোতে লাগলো বুদ্বুদের মত।

শেষে অবসন্ন হ'য়ে সে ক্ষান্ত হোলো। হত্যাসাধন ক'রে সন্তুষ্ট হ'য়ে সে হাঁপাতে লাগলো। গোলাঘরের উঠোনে যখন মুরগীরা ডাকতে আরম্ভ করলো, দিবালোকের প্রথম অরুণরেখা ফুটে উঠলো আকাশে, সে শবটাকে কবর দিতে লাগলো।

স্তূপীকৃত সার সম্পূর্ণ খুঁড়ে খুব গভীর ক'রে দেহটাকে শাবল দিয়েই গড়িয়ে তার মধ্যে ফেলে মুখ বন্ধ ক'রে সার চাপা দিয়ে দিলো। তুষারপাতের দিকে তাকিয়ে সে হাসলো, তারা তার দুষ্কর্মের সকল চিহ্নের ওপর তাদের সাদা ঘোমটা বিছিয়ে দিচ্ছিলো। তারপর শাবলটাকে সেই সারের মধ্যে গুঁজে ফিরে এলো সে। বোতলে খানিকটা মদ ছিলো। সেটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে তারপর বিছানায় সে গা ঢেলে দিলো।

ঘণ্টাখানেক পরে যখন ঘুম ভাঙলো তখন তার মাথা বেশ পরিষ্কার। শান্ত হ'য়ে সে তখন ভাবতে এবং সকল বিপদের সম্মুখীন হ'তে পারে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে নিরুদ্দিষ্ট সৈন্যটির খোঁজে তাকে সর্বত্র ছুটে বেড়াতে দেখা গেলো। অফিসারদের কাছে গিয়েও সে নাকি জিজ্ঞেস করেছিলো এ ভাবে না জানিয়ে তার বন্ধুকে নিয়ে যাওয়ার অর্থ কি?

তাদের নিবিড় বন্ধুত্ব চারদিকে প্রসিদ্ধ হ'য়ে উঠেছিলো, তাই তাকে কেউ সন্দেহ করলো না। সে অন্যের সন্ধানে সাহায্য করলো, আর জানালো, যে প্রুশিয়ানটি প্রত্যহই সকালের দিকে পেটি কোট গায়ে কোথায় বেরোতো।

এক বুড়োকে সন্দেহ ক'রে তাকে গুলি করা হোলো। গ্রামে তার একটা সরাইখানা ও এক সুন্দরী মেয়ে ছিলো।

আজ·ধরণীর দিকে দিকে—

শ্রীবিমলচন্দ্র দাশগুপ্ত

আজ ধরণীর দিকে দিকে
ধূমায়িত বিদ্রোহের কাল বহ্নি-শিখা :
দারিদ্র্যের অসহ পীড়ন :
রক্তচক্ষু দানবের ক্রূর অত্যাচারে
হতভাগা বঞ্চিতের তীব্র হাহাকার।
আর, ঊর্ধ্বে সমাসীন তুমি
নক্ষত্রের দীপ্ত সিংহাসনে,—
অগ্নিময় শূন্যতলে।

এই আর্তস্বর
বিক্ষুব্ধ তরংগসম পশে নাকি শ্রবণে তোমার ?
হতভাগা সন্তান তোমার,
কী আশায় কণ্ঠাগত রুধিরাক্ত প্রাণে,
পূজার প্রদীপ জ্বালি আপনার ক্ষুদ্র আয়োজনে,
দাঁড়াইবে দেউলে তোমার ?
কোন সুধা স্বর্গ অমরার,
পানপাত্র পূর্ণ করি,
তৃষ্ণার্তের মিটাবে পিপাসা ?
—বুভুক্ষা চাহেনা স্বর্গে অপ্সরার নূপুর শিঞ্জন।

এই ভীত রোষ,
এই স্বার্থলোভীদের হীন টানাহানি,
ইচ্ছাময়, এত ইচ্ছা তব ?
রোষ-অগ্নি জ্বালি
ভস্মীভূত করিবে কি এই সব মূঢ় পুত্রদের ?
অথবা, ফিরায়ে লবে মুখ
ঘৃণাতম ঘৃণায়, লজ্জায় ?
আঁখি দুটি তব
বেদনায় ছলছল হবে নাকি কোনদিন
মানুষের লাগি ?
তুমি শুধু জেগে রবে নিষ্করুণ, নির্মম, কঠোর
আমাদের সমাধি শিয়রে ?

কে জ্বালিবে দীপ তবে তোমার দেউলে ?
কে হেরিবে এ বিশ্বের রূপ সমারোহ ?
কে গাহিবে মন্ত্র কণ্ঠে তোমার সংগীত ?

হিমাদ্রির শীর্ষে শীর্ষে
জাগাবে কী সূর্যালোকে অনন্ত বিস্ময় ?
নিরালায় নতমুখী এই বসুন্ধরা
কার লাগি সাজায়ে তুলিবে তার বর তনুখানি
রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে—
সুকুমার লালিত সৌন্দর্যে ?
—চিতাধূমে আচ্ছন্ন জগত
হেরিবে কী চাঁদানেনে স্বর্গীয় সুষমা,
অম্লান জ্যোতিষ্করাশি অসীম অম্বরে ?

হে ঐশ্বর্যবান্, তোমার ঐশ্বর্য দ্বারে
দলে দলে আসিয়াছে, হের,
ক্লান্ত, খিন্ন মুহ্যমান দল।
চাহেনা তাহারা কোন নন্দনের পারিজাত ধন :
ঊর্ধ্বে হস্ত তুলি
নাহি করে দাবী তারা স্বর্ণ-সিংহাসন।

এই মর্তভূমি,
এই শ্যাম ধরিত্রীর শ্যামাঞ্চলখানি
নব নব জীবনের পরিপূর্ণ রসে—
পরিপুষ্ট তৃণদলে, পুষ্পে পর্ণে বিচিত্র শোভায়
বিছিয়া রেখেছে যেই কুটীর প্রাংগন,
সেইখানে জন্মলভি তারা
বার বার মৃত্তিকারে বরণ করি লবে।
শুধু তুমি তাহাদের অভিশপ্ত জীবনের 'পরে
হানিওনা বজ্রমুষ্টি,—দক্ষযজ্ঞের উদ্যত মুষল ;
অগ্নিবদ্ধ করিওনা মৃদুপুষ্পবন
দারিদ্র্যের লেলিহান লোল জিহ্বা দিয়া।

দূর করে দাও আজ যত অমংগল ;
কল্যাণ মৈত্রীর রাখী বাঁধো হাতে হাতে :
—শুনাও প্রেমের বাণী।
বলো তারে—'দীপ্ত জ্যোতির্ময়,
অমৃতের বরপুত্র তুমি,
হে মানব,
আনন্দেতে জন্ম তব,
তুমি আনন্দের চির অধিকারী।'

কংগ্রেস, মধ্যবিত্ত ও গণবিপ্লব

নগেন দত্ত

আজকে কংগ্রেসকে গড়ে তুলতে হবে বলে সব কর্মীর মনে একটা সাড়া পড়ে গেছে। বিগত দিনের ইতিহাস ঘেঁটে ভুল ধোলা করবার অপ্রীতিকর দায়িত্ব কেউ আর নিতে রাজি নয় তা আমরা মন প্রাণ দিয়ে বুঝি। কংগ্রেসকে আমরা গড়ে তুলব সেটা যেমন এক প্রশ্ন, তেমন কংগ্রেসকে কোন দৃষ্টি-কোণ দিয়ে বিচার করব তাও তেমন এক প্রশ্ন। কর্মীদের কাজ করতে গেলেই এ কথা মনে আসবে। বাঙ্গালা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (হিন্দু ও মুসলমান) রাজনৈতিক চেতনা এতদিন ধরে যে খাতে বয়েছে তা যদি আবার নোতুন করে বইতে সুরু করে, তবে ভাববার কথা। সেই জন্যই প্রশ্নগুলো আসে বার বার—কংগ্রেস কাদের। আমাদের উত্তর সহজভাবে দিতে হবে যে কংগ্রেস 'ছোটলোকে'র। দোহাই ভদ্রলোকেরা তোমরা আর তাড় বাড়িও না। আমাদের মনে এ বিষয় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হতে হবে যে, ভদ্রলোকদের স্থান কংগ্রেসে হতে পারে না। একেবারে খাঁটি ভদ্রলোকদের স্থান কংগ্রেসে কেন হতে পারে না এ সম্বন্ধে পূর্বে কিছু আলোচনা করেছি। তবে বর্তমান আলোচনাতেও আমরা বলতে চাই যে তারা শ্রেণী হিসাবে আজকের দিনে দ্বন্দ্বে যোগদান করতে অসমর্থ হবে। কংগ্রেসকে যদি ছোটলোকের স্বার্থ নিয়ে লড়াই করতে হয় তাতে ভদ্রলোকদের স্বার্থে আঘাত পড়বেই। এবং সে আঘাত এমনভাবে লাগবে যাতে করে তারা ভদ্রলোকেরা মরিয়া হয়ে উঠবে নিজেদের শ্রেণী হিসাবে বাঁচাবার জন্য। গত দুর্ভিক্ষের সময় বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্ত নিজেদের রক্ষা করবার যে কৌশল অবলম্বন করেছে তার ইতিহাস যদি facts এবং figure সহকারে কষ্ট করে কেউ বের করেন তবে দেখতে পাবেন যে, এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের স্বার্থের খাতিরে ক্ষুধিত ভূমিহীন গ্রামমান চাষী-মজুরদের উপেক্ষা করেছে। তার ফলে তারাই সব চেয়ে বেশী মৃত্যু বরণ করেছে।

বাঙ্গালা দেশের হিন্দুদের সাধারণ শ্রেণী বিভাগটা এখানে একটু পরখ করবার বিষয়। বামুন, কায়েত, বদ্যি—এদের অনেকেই কেরাণী, মধ্যস্বত্বভোগী জোতদার তালুকদার, আর ছোটখাট ব্যবসাদার ও টুকরা টাকরা জমির মালিক—বাঙ্গালা দেশের আফিস আদালত-এ এদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ আছে—তাতে করে চাকুরীবৃত্তি থেকে যে অর্থনৈতিক ধারা সৃষ্টি হয় তার পুরোপুরিই সুযোগ এরা পাচ্ছে। গ্রামের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে এদেরই তলায় তাঁবেদারী করে খায় এমন বহু লোকে আছে যারা নিম্নশ্রেণীর। এই বামুন, কায়েত, বদ্যি এরা নাগরিক কর্মবৃত্তির সুফল এটাও যেমন পাচ্ছে—আর পূর্বপুরুষের কিছু সঞ্চিত জমাজমি থেকে যে সামাজিক ও আর্থিক সুযোগ পাওয়া যায় তাও উপভোগ করছে। হিন্দু সমাজের আর কতগুলো শ্রেণী যেমন ধরা যাক—কামার, কুমার, তাঁতী, ধোপা, নাপিত, মুচি, মাহিষ্যদাস, হাড়ি, ডুড়ি, বাগদি, বাউড়ি, জেলে, কৈবর্ত, রাজবংশী এবং সাঁওতালদের একটা বিশেষ অংশ—এ সবার আর্থিক ও সামাজিক স্তর এমন নয় যাতে করে এরা উপরি-উক্ত শ্রেণীর সঙ্গে আর্থিক প্রতি-যোগিতায় পেরে ওঠে।

কাজেই এদের খাদ্য সঞ্চয় ও সুযোগের উপর নির্ভর করে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করতে হয়। হিন্দু সমাজের আর এক অংশ নমঃশূদ্র শ্রেণী। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যদিও এরা একটা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েছে তবু এদের বৃহত্তর যে অংশ তা অধিক পরিমাণে আধুনিক আর্থিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এদের খুব সামান্য একটা অংশ নব্য শিক্ষার আলোক পেয়ে নাগরিক সভ্যতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাতে করে এদের মধ্যে ধর্ম ও সামাজিক ঐতিহ্য নিয়ে একটা বিরোধ দেখা দিয়েছে। নাগরিক কর্মবৃত্তি (অর্থাৎ চাকুরী) বাদে যে সমাজ-জীবন, তা বহুল অংশে

চাষ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসার মধ্যে পরিবেষ্টিত। কাজেই যে সুযোগ-সুবিধা নগর থেকে পাওয়া যায় তা এদের মধ্যে নব্য নাগরিক সভ্যতায় অত্যন্ত যে মধ্যবিত্ত অংশ, তারাই তা ভোগ করছে। অতএব এখানেও আপামর শ্রেণী ও শিক্ষিত ভদ্র সাধারণে বিভেদ রয়েছে। এর পরে আসে বিরাট মুসলমান সমাজের কথা। বিগত পঁচিশ বছরের মধ্যে এই সমাজের যে বিচিত্র পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তার বিস্তৃত আলোচনার অবসর এখানে নেই। তবু আলোচনা প্রসঙ্গে যতটা সম্ভবপর চেষ্টা করব। এবং সবিনয়ে বলছি মুসলমান সমাজের বিচিত্র সামাজিক পদ্ধতি, তা থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক সুযোগ ও সুবিধার ক্রমবিকাশ নির্ণয় করা সুকঠিন।

গত অসহযোগ আন্দোলনের ফলে যে দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হয় তার মধ্যে মুসলমান সমাজের উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীও ছিল। তারা অবশ্য খিলাফৎ আন্দোলনের মারফৎ বিরাট বিপ্লবের মধ্যে এসে পড়ে। এখানে আর একটু বলা প্রয়োজন যে কংগ্রেসের গত অসহযোগ আন্দোলন মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন বলা যেতে পারে। আন্দোলনের শ্রেণী সংযোগের দিকে দৃষ্টি রাখলে একথা বলা বেশী অন্যায় হবে না। কেননা উকীল, মোক্তার, কেরাণী, ব্যারিষ্টারবাবুরাও কিছু কিছু ছিলেন আন্দোলনের মাঝে। অবশ্য ডকের কুলি, রেলওয়ে কুলিরাও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু তা অনেকটা প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাসের মত, তখন পর্য্যন্ত গণ-সাধারণের রাজনৈতিক চেতনা অর্থনৈতিক স্বার্থের ওপর এমনা গড়ে উঠেনি, যাতে তাকে ঠিক গণ-আন্দোলন বলে মনে করা যেতে পারে। বাবুরা বলেছেন 'আমরা কি করি।'—অনেকটা এই জাতির সামাজিক চেতনার ওপর ভিত্তি করেই সমাজের নিম্নতম শোষিত গণ-সাধারণ যোগ দিয়েছিল। এই আন্দোলন যখন শান্ত হয়ে আসে তখন দেশীয় ধনিকেরা নোতুন ধনের বনিয়াদ তৈরী করতে লেগে যায়। তাতে করে সামাজিক ধন বণ্টনে এক নোতুন অধ্যায় সুরু হয়। এই যে নোতুন ধনের বনিয়াদ তার অধিকাংশ ছিল হিন্দু সমাজের হাতে। মুসলমান সমাজের যারা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল তারা ছিল উচ্চ শ্রেণীর লোক। কিন্তু হিন্দু উচ্চ শ্রেণীরা যখন নব্য ধন বণ্টনের সুবিধা-সুযোগ পেতে সুরু করে, এবং তা যখন হিন্দু সমাজের মধ্যবিত্তের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে সুরু করে, তখন তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানেরা সচেতন হয়ে ওঠে। এই সচেতনতা সম্প্রদায়িক স্বার্থ বুদ্ধির ওপর ভর করে দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। তারপর সরকারী অনুগ্রহে তা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। আমরা এখানে সরকারী নীতির আলোচনা না করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর আলোচনা করতে চাই। তবেই মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক চেতনার গলদ কোথায় ধরা পড়বে।

কিন্তু এদিকে মুসলমান জমিদার, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং এদের সমপর্য্যায় ভুক্ত সামাজিক সম্মানিত গোষ্ঠীরা এই সরকারী নব্য ধন বণ্টনের খানিকটা সুযোগ পেতে লাগল। সরকারী নব্য ধন-বণ্টন প্রথা কি তা একটু পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। গত অসহযোগ আন্দোলনের পর বহু সরকারী নোতুন বিভাগ খোলা হয়েছে, তাতে বহু মুসলমান উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা চাকুরী পেয়েছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের পর মুসলমান সমাজের বহু বড় লোকের ছেলে য়ুরোপ গিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা নিয়ে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হয়েছে। বহু ছেলে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে উচ্চ আইন ব্যবসায় যোগ দিয়েছে।

এরা সবাই শ্রেণীগত ভাবে ভাগাভাগি করে সরকারী কটি ও তৎসংক্রান্ত সামাজিক সম্পদ পেয়েছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের পর দেশে শিক্ষার প্রসার বহু বেড়েছে এবং মুসলমান সমাজের সাধারণ চাষীরও এক সময় ধারণা ছিল যে লেখা পড়া শিখিলেই ডেপুটিগিরি চাকুরীটা পাওয়া যায়। কেননা হিন্দুরা লেখা পড়া শেখে ও হাকিমি চাকুরী করে। এই যাবতীয় সহজ সামাজিক চেতনাবোধ বহু আদালতের পিছন ইত্যাদির মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। এই যে সহজ সামাজিক চেতনাবোধ এটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, এর সামান্য গোটা কয়েক কারণ আছে যেটা সহজে আমরা উপেক্ষা করে চলি। প্রথমতঃ চাষী মোকদ্দমার ফাঁদে পড়ে সহরে আসে তার সমস্ত আইন সংক্রান্ত দায়িত্ব রক্ষা করতে এমন এক ব্যক্তির কাছে, যার কাছে তার সামাজিক আচার-ব্যবহার ও মানসিক গঠন ঠিকঠিক ঠাঁই পায় না।

অথচ কম উপলক্ষে তার কাছে না গিয়ে উপায় নেই। এই একান্ত নির্ভরশীল সামাজিক চেতনা ক্রমে ক্রমে স্বার্থহীন পথ অতিক্রম করে সমষ্টিগত ভাবে আক্রোশে পরিণত হয়। এই পরিণতির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে আর্থিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে এমন ইতিহাস এর মাঝে আছে। এর অপর পক্ষের দিকটাও বিচার করে দেখবার, যে উকীলবাবুর কাছে চাষীকে মামলার জন্য যেতে হয় তিনি হয়ত নিজের জন্য রূপোর হুকো তৈরী করে তন্ত্রাসন মেজে হুকো টানছেন। কিন্তু হুকোর দামী ভ্রামাক যে উৎস থেকে আসে তার জন্য ব্যবস্থা করেছেন অন্যতম। সামাজিক ব্যবহারে এই যে ভেদবুদ্ধি এটা ক্রমে আর্থিক স্বার্থের স্তরেও পৌঁছায়। আমাদের মনে রাখা ভাল যে উপরি-উক্ত বর্ণিত উকীলটি মুসলমানও হতে পারেন হিন্দুও হতে পারেন। আসলে উকীল বাবু ও তার মক্কেল আর্থিক স্বার্থের বিচারে দুটি শ্রেণী মাত্র। একজন নিরক্ষর অবহেলিত আর একজন সুশিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। এই সব বঞ্চনা ও ব্যর্থতা থেকে চাষীর মনে তার ছেলে অথবা তার শ্রেণীর কেউ উকীল হয় এ আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়। মুসলমান সমাজে বর্তমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী জন্ম নেবার পূর্বাভাষ এই সব সহজ সামাজিক চেতনাবোধ থেকে সুরু হয়।

মুসলমান সমাজের আর একটা শ্রেণীর লোক অফিস পিয়ন, চাপরাসি, সাহেবের আর্দালী প্রভৃতি কাজে নিজেদের নিযুক্ত করে বুঝতে পেরেছে যে লেখাপড়া শিখিয়ে ছেলেপুলে মানুষ করতে না পারলে সমাজে পদস্থ হওয়া যায় না। এরা সবাই সহর থেকে যে সব নাগরিক সভ্যতার নিদর্শন নিয়ে যায় তাই গ্রাম দেশের লোকেরা হতবিহ্বল হয়ে দেখে। এদেরকে একটা বিশেষ সামাজিক মর্য্যাদা দিয়ে গাঁয়ের লোকেরা এদের মাঝে নয়া আভিজাত্যবোধ সৃষ্টি করে। অতএব এদেরও আকাঙ্ক্ষা হয় যে বংশের কেউ মানুষ হোক; বংশের কাউকে মানুষ করতে গিয়ে এরা তখন যে শ্রেণীতে জন্মে মানুষ হয়েছে সেখানে থাকতে পারে না। এদেরকে নোতুনতর পারিবেশের মধ্যে পা খাইয়ে আভিজাত্য বজায় রাখতে হয়। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে এই সব মিশ্র করণের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

আচ্ছা এই গেল মুসলমান সমাজের মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাজের একদিক। এই সব বংশের শিক্ষিত ছেলেরা যেদিন চাকুরীর জন্য সহরে যায় তখন সে দেখতে পায় যে সরকারী চাকুরীতে নোতুন শ্রেণীর ঠাঁই নেই। যারা আছেন তাদেরই শ্রেণীর জন্য এই সরকারী চাকুরী। সরকারী চাকুরী জেঁকে-বসা শ্রেণীর মধ্যে দুই সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকই আছে। তবে সংখ্যায় হিন্দু সমাজ বেশী, তাও উচ্চ শ্রেণীর লোক বেশী—বামুন, কায়েত, বৈদ্যি। বাকী নিম্নতম যে সব শ্রেণী তারা বিশেষ কোন সুযোগ পায় না। (আমরা অতি বর্তমানের কথা বলছি না কেননা এখন যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা কিছু কিছু সুযোগ পাচ্ছে তার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে।) মুসলমান সমাজের নোতুন মধ্যবিত্ত সৃষ্টি হবার পথে দুই সমাজের উচ্চ শ্রেণীরাই বাধা দিচ্ছে এবং তা শ্রেণীগতভাবে, এখানে আর্থিক স্বার্থের লড়াই বড় কথা। মুসলমান সমাজের নবা-শিক্ষিত যুবকেরা অতি নিম্ন সাধারণ ঘর থেকে এসেছে। এতদিন পরে তারা তাদের সামাজিক পরিবেশের বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেছে এবং সামাজিক চেতনার ক্ষেত্রে তারা যা খুঁজে পায় তা হচ্ছে এই যে, তাদের উপর অবিচার হচ্ছে। এই অবিচারের প্রতিবাদই উগ্র হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি নিয়ে। এই যে নবা বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী মুসলমান সমাজে দেখা দিয়েছে তাদের তথাকথিত অসন্তোষ ঘেঁটে স্বার্থের সোনা তুলে নিচ্ছে মুসলমান উচ্চ শ্রেণীরা। আসলে হিন্দুরা যেমন তাদের নিম্নশ্রেণীকে ঘৃণা করে, অবহেলা করে, মুসলমানেরাও তাই করে। তা না হলে মোমিন সম্প্রদায়ের অভিযোগ কাদের বিরুদ্ধে? একটা জোলার মেয়ে ও একটা সৈয়দ বংশের ছেলের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ হয়? ইংল্যাণ্ডের Commonerকে বিয়ে করতে যেমন Lord পরিবারের আপত্তি, ঘাড়ুয়ো বামুনের যেমন শোত্রীয়-বামুনকে বিয়ে করতে আপত্তি—এও ঠিক সেই ধরণের আপত্তি। এর পেছনে যে সব সামাজিক মনোবৃত্তি আছে তা একদিন আর্থিক স্তরে এসে পৌঁছাবে ও সামাজিক রূপ দেখা দেবে। তখন মুসলমান সমাজে আবার নোতুন আলোড়ন আসবে।

মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজকে দানা বাঁধতে আর একটা কারণ সাহায্য করেছে। রাজমিস্ত্রীর ছেলে উকীল, পিয়নের ছেলে হাকিম এটা যেমন আজ মুসলমান সমাজে অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত, তেমনি আর একটি দৃষ্টান্ত খুব ব্যাপক হয়ে উঠেছে হিন্দু সমাজে। উকীলের ছেলে কলের কুলি, তালুকদারের ছেলে বিড়ি বেঁধে খায়; কাগজের হকার ইত্যাদি। এখানে দুটো পরস্পর-বিরোধী সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধারার উল্লেখ প্রয়োজন। প্রয়োজন এই কারণে যে, সমাজ ব্যবস্থায় ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য যেমন একদিকে সংহত হচ্ছে অপরদিকে তার ধ্বংস ঘটছে। এটাকে সামাজিক সম্পদের গতি পরিবর্ত্তন বলা যেতে পারে। বর্ত্তমান ভাঙ্গা ও গড়ার মধ্যে হিন্দুসমাজ নিজে কতটা দায়ি তাও বিচার করা দরকার। যে সামাজিক আভিজাত্যবোধ হিন্দু সমাজের উচ্চস্তরকে মোহিত করে রেখেছিল সেই আভিজাত্য বোধই তাদের শ্রেণী হিসাবে ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করেছে। সমাজ ব্যবস্থায় বিয়ে, বাপের শ্রাদ্ধ ও অনুরূপ খরচের বহর, কৌলিন্য মর্য্যাদা, মামলা, নৈতিক ক্ষেত্রে পঞ্চ মকারের সেবা ইত্যাদি সব সামাজিক ব্যবহার ও ব্যাধি হিন্দুসমাজের মধ্যবিত্তের আর্থিক বনিয়াদ ধরে টান দিয়েছিল। তার ফলে বহু জমিজমা মুসলমান বণিক্‌ মধ্যবিত্তের হাতে চলে যায়। কাজেই হিন্দু মধ্যবিত্ত ব্যয়বহুল সামাজিক ঠাট ছাড়তে বাধ্য হয়। তখন অনেকের স্থান হয় ঐ কলে ও ছোটখাটো ব্যবসাদারীতে। প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু মধ্যবিত্ত মুসলমান শ্রেণী গঠনে সাহায্য করেছে।

এই সব বিভিন্ন কারণে বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্ত বর্ত্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। উপরে আমরা হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যবিত্ত গঠনের কারণ কিছুটা বিশ্লেষণ করলাম। এই মধ্যবিত্তেরা গত দুর্ভিক্ষের সময় নিজেদের শ্রেণীগতভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। পূর্ব্বে বলেছি যে সমাজের অতি নিম্ন যে শ্রেণী তারাই মৃত্যুকে বেশী সংখ্যায় বরণ করেছে। সরকারী অপরিণামদর্শিতা বাদে সমাজের তরফ থেকে কি চেষ্টা হয়েছে সেইটেই আলোচনার বিষয়। শুনলে বোধ হয় অনেকেই অবাক হবেন যে গত দুর্ভিক্ষের সময় প্রায় সবই মধ্যবিত্ত কেরাণীরা বা ঐরূপ শ্রেণীর লোকেরা ব্যবসাদার হয়ে গেল। তার ফলে যে জিনিসের দাম চার টাকা ছিল তা হ'ল চুরাশী টাকা। এই যে চুরাশী টাকা এর পেছনে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের বাঁচাবার যেমন চেষ্টা আছে, তেমন আছে অতিলোভের মনোবৃত্তি। এই দুই মনোবৃত্তি ঐক্যভাবে তার বিষক্রিয়া ছড়ায় সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর ওপর। সেখানে হিন্দুও যেই মুসলমানও সেই—শুধু সুযোগ-সুবিধা-বাদী মধ্যবিত্ত ও আপামর গণসাধারণ। কেমন করে এই শ্রেণী সুযোগ পেল আপামর গণসাধারণকে শোষণ করতে তার কিছু বিশ্লেষণ হওয়া ভাল। সরকারী নীতির ফলে খাদ্যবস্তু গ্রাম ছেড়ে সহরে এলো। আর যা গ্রামে থাকল তাও ব্যবসাদারদের তহবিলে। (মনে রাখবেন সেই ব্যবসাদাররা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক।) যুদ্ধে যেমন Key position দখল করার জন্য বিষম লড়াই চলে, এখানেও তেমন মধ্যবিত্ত ফুঁদে ব্যবসাদারদের খাদ্য, নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য ও ঔষধের ঘাঁটি দখলের জন্য লড়াই চলে। বহু ব্যবসাদার যা করেছে সে বিশ্বাসঘাতকতা পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ হয় অতুলনীয়।

কিন্তু ফুঁদেরা মাঝে পড়ে আপামর গণসাধারণের দুঃখের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে; মধ্য ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে একটা উত্তর আসতে পারে যে পেটের দায়ে তারা এই জাতীয় ব্যবসা করেছে। কিন্তু অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে নিছক পেটের দায় সেখানে ছিলনা বহুটা ছিল অতি লোভের দায়। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এরা সমাজে যে অবস্থায় বাস করে তাতে এদের এ মনোবৃত্তি জন্মাবেই এবং গণসাধারণকে শোষণ করে নিজেদের পুষ্ট এরা করবেই। কোন বিশেষ অবস্থায় এদের এই মনোবৃত্তি জন্মাবেই। এখানে গণসাধারণের কী করণীয় আছে তাই বিচার্য্য। প্রথমে দেখা যাচ্ছে যে, যুদ্ধের উৎপাদন-কেন্দ্রের অতি নিকটবর্ত্তী যত কুখ্যাত ছিল তারা উৎপাদন ব্যবস্থায় যোগ দিয়েছে। অতি লোভের আশায় নয় নিছক পেটের দায়ে। তাদের শ্রেণীগত ভাবে যে শিক্ষা-দীক্ষা আছে তাতে পেটের দায় ছাড়া অন্য কোন দায় রক্ষা হয় না। কিন্তু মধ্যবিত্তের মেটা হয়, নিছক পেটটাকে নিয়ে তারা কোন সময় কাজে নামেন না কেননা তাদের শিক্ষাদীক্ষা ও সামাজিক মর্য্যাদাবোধ তাদের উপর দিকে পা বাড়াবার

কৌশল শিখিয়ে দেয়। যাক, যারা যুদ্ধ উৎপাদনের ব্যবস্থার কাছে থাকার সুযোগ পেল না তাদের জীবিকানির্ব্বাহ করবার দুটো পন্থা থাকল। একটা ভিক্ষা আর একটা অসামাজিক বৃত্তি যেমন চুরি টুরি ইত্যাদি। কিন্তু এই অসামাজিক কর্ম্মের পিছনে প্রত্যেক ধর্ম্মেরই যে বিধি নিষেধ ছিল তা প্রথমটায় খুব কার্য্যকরী হয়েছিল। আর্থিক অবস্থার চরম পরিণতিতে এই সব অসামাজিক ঘটনা ঘটেছে। অনেক দৃষ্টান্ত এমন পাওয়া গেছে যে বাড়িতে চোর ঢুকে শুধু হাঁড়ির ভাত কটা খেয়ে চলে গিয়েছে। এথেকে অন্তত কিছুটা বোঝা যায় যে গণ মন সহসা কোন অসামাজিক বৃত্তিতে মন দেয়নি। এতে তাদের ধর্ম্মগত শিক্ষাদীক্ষা সামাজিক অনুশাসন অনেকখানি বাধা দিয়েছে। কিন্তু তারা পারেনি শেষ রক্ষা করতে। খাদ্য বস্ত্র যখন তাদের কাছে বিভিন্ন ব্যবসার ঘাঁটি পেরিয়ে আসে তখন তাদের এমন সামর্থ্য থাকেনা যে কিনে খায়। কাজেই দলবদ্ধ হয়ে অথবা যে যে ভাবে পারে সে সেই ভাবে ভিক্ষা ও অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করে। এতে করে কিছু কিছু নৈতিক শৈথিল্য সমাজের নিম্নস্তরে এসেছে বটে,তবে তাকে ফলাও করে দেখাবার কিছু আছে বলে আমরা মনে করি না। প্রথম কথা হচ্ছে সমাজের যে স্তরের জীবদের নৈতিক শৈথিল্য হয়েছে বলে আমরা ভদ্রলোকেরা পত্রিকার চেপে বাহবা নিচ্ছি তাদের সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ কতটুকু? সমাজগত ভাবে তাদের কাণে এ চীৎকার পৌঁছায়ও না। যদি সামাজিক অনুশাসনই গড়ে তুলতে হয়, তবে তাদের মধ্যে গিয়ে, একেবারে গোড়া থেকে তুলতে হবে।

এই সব নৈতিক মেরুদণ্ডহীন বিশৃঙ্খল গণসাধারণকে নিয়ে কোন দিন কি গণ বিপ্লব হতে পারে? যদি এদের দ্বারা কিছু সম্ভব হত তবে গত দুর্ভিক্ষে এরা না খেয়ে মারা যেত না এরা কেড়ে খেত। এদের মধ্যে সেই বিপ্লবী শক্তি নেই—এই জাতীয় সত্তা মতামত ইদানিং শোনা যাচ্ছে। এমনকি রাজনৈতিক কর্ম্মীদেরও অনেকের ধারণা এইরূপ। যদি নিছক দুর্ভিক্ষের কারণে একটা গণ বিপ্লব ঘটে তবে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় আর একটা গণ বিপ্লব হওয়া উচিত ছিল। আয়ারল্যাণ্ডেও দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, সেখানেও তখন বিপ্লব হতে পারত। কিন্তু হয়নি। কেন হয়নি সেইটাই ভাববার বিষয়। প্রথমত গণবিপ্লবের উপাদান কি? বর্ত্তমান দিনের শিল্পবিপ্লব এবং ভূমিস্বত্ব ও কৃষি ব্যবস্থার অগ্রগত বিকাশ মনে না রাখলে গণ-বিপ্লবের আসল রূপ ও পটভূমিকা বোঝা যাবে না। ভারতবর্ষের কৃষি ও শিল্প এক তালে পা ফেলেনি। কাজেই কৃষিকে ঠেলে রেখে শিল্প যখন বড় হয়ে উঠেছে তখন তার পরিণতিতে অগণিত জনগণও অনেকখানি ইন্ধন জুগিয়েছে। যারা গ্রাম ছেড়ে সহরে কলের কাজে এলো তারা প্রথমে একটা সঙ্ঘবদ্ধ ছিলনা। তাদের মধ্যে শ্রেণীগত ভাবে দাবী দাওয়াকে ভিত্তি করে কোন দ্বন্দ্ব প্রথম দেখা দেয়নি। কিন্তু ধীরে ধীরে সমস্যা যত জটীলতায় জড়াতে লাগল ততই দৈনন্দিন জীবনে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বিরোধিতা করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। একই স্বার্থে গ্রথিত হয়ে যখন এরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'ল তখন এলো শ্রেণী চেতনাবোধ। এবং শ্রেণীচেতনা বোধের তলাকার ইঙ্গিত বস্তু হল নব্যবিধান শিল্পী প্রতিষ্ঠা। সুদূর প্রসারী যে পরিবর্ত্তন তা শিল্পীরা প্রথম ভাবতে পারে না। তারা শুধু দ্বন্দ্ব শুরু করে দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাকে কেন্দ্র করে,একসমস্যা ছাড়াতে গিয়ে আর এক সমস্যা দেখা দেয়। কেননা আসল সমস্যা যেটা সেটা হ'ল ধনতান্ত্রিক সভ্যতার দান। যাই হোক শিল্পীর (শ্রমিক) দ্বন্দ্ব যখন বৃহত্তর ক্ষেত্র খুঁজে পায় তখন সে বিশেষ রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে দেখা দেয়। এই চেতনাই বৈপ্লবিক চেতনা! এই জাতীয় চেতনার স্ফুরণ বাঙ্গালা দেশ বাদে অন্যত্র কিছু কিছু দেখা গেছে, বাঙ্গালী নিম্নশ্রেণীরা চলিষ্ণু নয়। তারা ঘর ছাড়ে না, সেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বড় বাধা, মাটির মায়া বাঙ্গালী নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অত্যন্ত বেশী। এটা বাঙ্গালী নিম্নশ্রেণীর একটা সামাজিক মনোবৃত্তি। কাজেই বাইরের জগতে শিল্প বিপ্লবের ফলে যে জাতীয় রাজনৈতিক চেতনার উদ্ভব হয় তার সঙ্গে এই বিরাট গণ সাধারণের প্রত্যক্ষ যোগ কম। বাঙ্গালীর কৃষি সভ্যতা মধ্যবিত্তকে নানা কারণে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করেছে, কিন্তু গণ সাধারণকে স্পর্শ করেনি।

এখন আসা যাক বাঙ্গালা দেশের গণ-বিপ্লবের কথায়! প্রথমেই একটা বিষয় সবার চোখে পড়বে যে এখনকার শ্রমিকরা যতটা সঙ্ঘবদ্ধ কৃষি মজুররা ততটা নয়। এটা বোধহয়

স্বীকার করতে কারুর দ্বিধা-বোধ হবে না। যুদ্ধের বাড়তি উৎপাদনের ফলে শ্রমিকরা শ্রমের মূল্য ও মর্য্যাদা দুই-ই পেয়েছে, এবং এদের পেছনে যে সংঘবদ্ধ শ্রেণী চেতনা রয়েছে তা বহুল অংশে সুবিধা-সুযোগ আদায়ের পথ প্রশস্ত করেছে। সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে পড়ে থাকলো কৃষাণ—এরা অধিকাংশই ভূ-স্বত্ববিহীন ভ্রাম্যমাণ সামাজিক প্রাণী। এদের শ্রমের মূল্য যা বেড়েছিল তার তুলনায় উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বেড়েছিল অপরিসীম। এ গেল ভূ-স্বত্ববিহীন কৃষাণ-মজুরের কথা—তাছাড়া সমাজের নিম্নস্তরের বংশগত ব্যবসায়ী "জাত ব্যবসা" করে খায় যারা তারা একটা বিশেষ অংশ। এদের ব্যবসায়ের মূলধন ও কাঁচামাল যা ছিল সবই নিঃশেষ হয় তাদের জীবন রক্ষা করতে। এতে করে এরা যেমন হয় নিঃস্ব তেমন হয় সমাজ ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু কলের মজুর যেমন উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে "Identity of interest" সৃষ্টি করতে পেরেছিল এরা তেমন কোন কালেও পারেনি—এই না-পারার জন্য দায়ি অনেক অংশে মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক চেতনা। মধ্যবিত্তেরা নিজেদের মধ্যেই বৈপ্লবিক চেতনার বিনিময় করেছে। তাদের দৃষ্টি এদিকে তেমন প্রসারিত হয়নি। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার গুরুত্বের ফলে যে কয়টি রাজনৈতিক কর্ম্মী ছিল তারা সবাই জেলে চলে গেল, তাদের কর্ম্মধারার মধ্যে এই সব শোষিতের মনে বৈপ্লবিক চেতনার গঠন কথা খুব বড় হয়ে দেখা দেয়নি। তাতে করে এরা সঙ্কট মুহূর্ত্তে নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে দেখতে শেখেনি। তারা যে এক ব্যাপক শোষিত শ্রেণী এ চেতনা তাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। কাজেই এদের বৈপ্লবিক চেতনার পঙ্গুতা এদের সর্ব্বনাশের অনেকখানি কারণ হয়েছে। অন্য দিকে যে শিল্পের শ্রমিকেরা মরেনি বা তাদের মধ্যে তেমন কোন গোলযোগ দেখা দেয়নি তার প্রধান একটা কারণ মিল-মালিকরা খাদ্য সংগ্রহে এবার ভয়ানক তৎপর ছিল। কোন গোলযোগ হলেই যুদ্ধের উৎপাদন কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটবে তাতে লাভের মাত্রা বেশী পাওয়া যাবে না, এই আশঙ্কায় তারা নিজেরাই খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্য প্রচুর টাকা খরচ করে। এবং যাতে শ্রমিক অশান্তি না বাড়ে সেজন্য সব সময়ই খুব সচেতন ছিল। কাজেই কোন মিলের শ্রমিক বিশেষ অসুবিধায় পড়েনি। এদিয়ে একটা বিষয় খুব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে যেখানে সঙ্ঘবদ্ধ শ্রেণীচেতনা গড়ে ওঠেনি সেখানে বিপ্লবের উপাদানও জমায়নি। এই রাজনৈতিক পঙ্গু চেতনার জন্য মধ্যবিত্ত রাজনৈতিক চেতনাবাদীরা দায়ি। একথা আজ অকপটে স্বীকার করতে হবে। ভদ্রলোকের রাজনৈতিক চেতনার এইটুকু হচ্ছে ফের। আজকে কংগ্রেসের হাতে যে গুরুভার দেয়া হচ্ছে এই যে, বৈপ্লবিক চেতনা ভদ্রলোকের গণ্ডির থেকে উদ্ধার করে গণসাধারণের মাঝে বপন করা। তবেই হবে গণবিপ্লব।

যাচ্‌ঞা

প্রসাদ-কবি **শ্রীমুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী** সাহিত্যালঙ্কার

সপ্তসিন্ধু মাঝে এই পৃথিবীটি গোল,
তুষারের মত স্বার্থ যেথায় জমাট ;
পীড়িতে না দিতে চায় কেহ বড় কোল,
স্বার্থ-বালুকায় ভরা ধূ ধূ করে মাঠ।
মরু-উদ্যানো ত আছে এই সাহারায়
স্নিগ্ধ যেখানেতে শত বিদগ্ধ পরাণ ;
তবুও আশ্রিত ক্ষুণ্ণ নিজ দীনতায়
যাচ্‌ঞা প্রদীপ্ত করে ক্ষুব্ধ অভিমান।

এতই থাকুক পাওা, বুকি ক্ষুরধারা,
গুণরাশি নাশ করে দারিদ্র্য নরের ;
শ্রেষ্ঠতা থেকেও হীন রিক্ত সর্ব্বহারা,
এমনি সুতীব্র বিষ দারিদ্র্য শরের।
নর ত দূরের কথা নিজে নারায়ণ,
যাচিতে ত্রিপাদ ভূমি বলিরাজ পাশে ;
ব্রহ্মাণ্ডের পতি হ'য়ে নগণ্য বামন,
বিরাট পুরুষ বলি দেখে ওঁ'রে হাসে।
যাচ্‌ঞা করিয়া দেয় দীন হ'তে দীন,
স্বাধীনও হইয়া পড়ে ন্যূব্জ পরাধীন।

জন-সংগঠন

শ্রীসত্যেন চট্টোপাধ্যায়

পুরানো কথাই নূতন করে বলব। কেন না সময়ে সময়ে তারও প্রয়োজন আছে। মানুষ যে বেঁচে আছে, এর মত পুরানো কথা আর কিছুই নাই। তবু তার দুর্বল মুহূর্তে তাকে বলে দিতে হয়, তুমি মরনি; বেঁচে আছ। আর বিস্মৃতির অন্ধকারের মধ্যে জাতি যখন পথ-হারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তখন তার কাণের কাছে বারবার নব-চেতনার মন্ত্রিরা বাজাতে হয়। প্রভাতী খঞ্জনির তালে তালে নূতন উষার স্বর্ণদ্বারের সন্ধান দিতে হয়।

১৯৪২-এর ভারত-বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে আমরা সে-কথা ভালভাবেই জেনেছি। নিশীথ-রাত্রির বিদ্যুৎ-স্ফুরণ বিপুল গণশক্তিকে কী এক প্রলয়ের রূপে রূপায়িত করতে পারে তার পরিচয়ও আমরা জানি। বহু-উপেক্ষিত, বহু-বিলম্বিত ভারতের মহা-দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অস্ত্রহীন, উপকরণহীন জনগণ শুধু তার নীতি-মর্যাদার বলে বলীয়ান্ হয়ে কী পরিমাণ এগিয়ে আসতে পারে, তাও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু তারই সাথে একথাও উপলব্ধি করেছি যে ক্ষণকালের সেই শুভ-গর্জনকে বর্ষণে পরিনত করতে হলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণাকে পুঞ্জীকৃত করে জলদ মেঘের সঞ্চার করতে হয়। প্রতিদিনের সেই যে ধৈর্যশীল আয়োজন তারই নাম জন-সংগঠন।

এই যে সংগঠন, এরই কাজের মধ্যে লুকিয়ে আছে সংগ্রামের অনবিচ্ছিন্ন ধারা। রাজনীতি বলুন, আর সমাজ-নীতিই বলুন সকল-কিছুই জড়িয়ে আছে এরই সর্বদেহে। বড় বড় 'ইজম্' এবং অর্থনীতির তত্ত্বমূলা এর পোষকী ভাষা। আর লক্ষ কোটি নরনারীর প্রতিদিনের সংরক্ষণ এবং কল্যাণের জন্য নিয়োজিত যে গঠনমূলক কর্মপন্থা তাই হচ্ছে সমাজদেহের আটপহরে কাপড়। দরিদ্রের কুটিরে লজ্জা নিবারণ করে সে, শীতাতপে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার দায়িত্বও তার।

সেই আসল কথাটি সহজভাবে বলতে চাই আমি। নীতি-বিদ্ পণ্ডিতদের প্রতি কটাক্ষ করছি না কিছু। তবে একথা মনে করিয়ে দিতে চাই শুধু যে, বাস্তবের গতি-বিধিকে বর্ণনা করার এবং বুঝবার জন্যই থিয়োরীর জন্ম। তাকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য নয়। যুক্তির সাহায্যে জানবার জন্যই বিজ্ঞানের অবতারণা; বিষয়বস্তুকে তার আইনের চাপে কণ্ঠরুদ্ধ করে টেনে আনবার জন্য নয়। কথায় কথায় ইজম্-এর দোহাই পাড়া হয় বলে, একথা বলা প্রয়োজন। কেননা অনেক ক্ষেত্রেই স্বচ্ছ সরল দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছি আমরা। যার ফলে রাজনীতি ক্ষেত্রে জনগণের স্বার্থ এবং সত্তা বারবার মাথা কুটে মরছে শুধু মতবাদের দার্শনিক দলাদলির মধ্যে।

যুগযুগান্তের মানুষ নব নব ভাবধারায় পৃথিবীকে দীক্ষিত করেছে একথা সত্য। কিন্তু স্থান এবং কালের পরিধারির মধ্যে বিশিষ্ট মতবাদের চেয়েও বড় সত্য হল দৃষ্টিভঙ্গীর নিত্য-নূতনতা। বাস্তবের রসে সিঞ্চিত হয়ে যা সজীব ধর্মে ক্রম-বর্দ্ধমান এবং যার নবপল্লবই ইতিহাসের সীমা-রেখাকে করে রেখেছে গতিশীল। মার্কস্‌বাদ বা গান্ধীবাদের থেকেও তাই বড় কথা হচ্ছে মার্কস্ বা গান্ধীর অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী। নিউটন আইনষ্টাইনবাদের চাইতেও বড় সত্য হল তাদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা। বিজ্ঞান তাই বলছে যে, অভ্রান্ত সত্যের মত মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। কেননা, সে জানে যে, আজকের যা থিয়োরী, মহাকালের কুটিল বিশ্লেষণের কাছে তা সমাধিলাভ করবে কাল। আজকের যা, সুপ্রতিষ্ঠিত মতবাদ, রাষ্ট্র এবং সমাজের বিবর্তনের মধ্যে চূর্ণ নক্ষত্রের মত খান খান হয়ে পড়ে যাবে তা একদিন পরে।

কিন্তু তাই বলে গতানুগতিকতার দাস হয়ে থাকতে বলিনা আমি। বস্তুতঃ, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই মানুষের জীবন-সংগ্রাম। আদর্শের জন্য প্রতিদিনের যে নিদারুণ সংঘাত তার বেদনার মাঝখানেই জনগণের নব-জন্মের সম্ভাবনা।

জনগণকে চাই কেন? তার শক্তিকে প্রবুদ্ধ করার প্রয়োজন কী? বহুবার বহু বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এ প্রশ্ন বার বার প্রতিধ্বনিত হয়েছে সত্য, কিন্তু আজ আবার নূতন করে এ প্রশ্ন কেন? তার কারণ, এর উত্তরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে বিশ্বশান্তির গোড়ার কথা।

রাষ্ট্র একদিন বড়াই করে বলেছিল যে জনগণের মুক্তির সন্ধান দেবে সে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে উৎপাটন করে সমষ্টির কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করবে সে। সেই আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের সুখশান্তির উদ্দেশ্যে রক্তাঞ্জলি দিয়েছে বহু মানুষ। আমেরিকার স্বাধীনতা-বিপ্লব, ফরাসীবিপ্লব, রুশবিপ্লবের মধ্যে সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে অনেক। গণতন্ত্র, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা এবং সর্বহারার শ্রেণিতন্ত্রের যজ্ঞধূম থেকে নিপীড়িত জনগণ পরমশান্তি লাভ করবে এই আশায় আহুতি দিয়েছে বহু। কিন্তু কই রাষ্ট্রের সে আত্মাভিমান আজ কোথায়?

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা ধরার ধূলায় হারা হয়ে কেঁদে ফিরেছে এতদিন। তাই বেদনাতুর পৃথিবীর কাছে আজ এ প্রশ্ন অত্যন্ত সমীচিন। একদিন ছিল যখন রাষ্ট্রের এই নিষ্ফল অহঙ্কারকে ভেদ করে নৈরাষ্ট্রবাদ মানুষের মনে একটা আশার আলোক সম্পাত করেছিল। কিন্তু তার ইতিহাসও তেমনি বিয়োগান্তক। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলীনতার জন্য যে পরিমাণ ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং নূতনত্বের প্রয়োজন মানুষ তা পারেনি বরণ করতে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবী পরিপূর্ণ রিক্ততার সম্মুখপানে বিভ্রান্ত হয়ে তাই দিন গুণছে নূতনতর কোন এক সন্ধানের অপেক্ষায়।

জনগণকে ঠকিয়েছে রাষ্ট্র। তাদের শক্তির অপমান করেছে সে। একককে বিশ্বাস করতে পারেনি সে কোন দিন। কন্ট্রোল এবং কেন্দ্রীকরণের লাগাম পরিয়ে জনগণকে পশু বানিয়ে নিজের গাড়ী ছোটাতে চেয়েছিল রাষ্ট্র। অগ্রগতির লোভে গাড়ী টেনেছেও তারা অনেক। চলন্ত গাড়ীর চাকার বেগ সামলাতে গিয়ে কষাঘাত খেয়েছেও বহু। আজ তাদের দেহ রক্তাক্ত, মুখ কেবিল। শান্ত গৃহকোণে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে বার বার মিনতি করে তারা। কিন্তু কোথায় শান্তি? দুর্বার গতির লোভে রাষ্ট্রের যে স্বর্ণরজ্জু পরেছিল তারা একদিন, জনগণের ক্ষতবিক্ষত দেহে কেটে বসে গেছে তা আজ শাণিত ছুরিকার মত।

তাই বলছিলাম, এ এক নির্মম প্রতারণা। জনগণের সমস্ত শ্রমশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে রাষ্ট্রের কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টার মধ্যেই এই ব্যর্থ অভিযান। লক্ষকোটি মানুষের আপন আপন সেলীর মধ্যে যে শক্তি নিবদ্ধ, শত সহস্র নিরালা কুটিরের মধ্যে যে উৎপাদন-কুশলতা নিহিত তাকে হাত করে রাজশক্তির মেশিন চালাতে চাইল যেদিন রাষ্ট্র, সেদিনই তার হয়ে গেল মস্ত বড় ভুল। জনগণকে ভীড়ের মধ্যে ঠেলে দিয়ে উপরে থেকে হাততালি দেবার মনোবৃত্তি জেগে উঠল যত, মানুষ প্রবঞ্চিত হলও তত।

কিন্তু ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া। আঘাতের পর আঘাত। রাষ্ট্রের এবার জবাবদিহির পালা। মানুষ সমস্বরে বলতে লেগেছে, পরিবর্তন চাই,—আমূল পরিবর্তন। প্রতিশোধের জন্য নেই যে মরণ কামড়, তাকেই বলতে পারেন চরম বিপ্লব। সে বিপ্লব আসছে, আসতে বাধ্য।

সমগ্র পৃথিবীর পটভূমিকায় এই হচ্ছে সংগঠনের বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি। নূতন বুনিয়াদে রচনা করতে হবে কল্যাণকামী সমাজের ইমারত। তার পরিকল্পনা হবে বিকেন্দ্রীকরণ, অর্থনীতিতে এবং রাষ্ট্রনীতিতে। প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হবে তার মারফৎ।

বস্তুতপক্ষে, গণতন্ত্র এবং কেন্দ্রীকরণের ধারণা সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী। শক্তি যদি সাধারণো পরিব্যাপ্ত না হয়, উৎপাদন ক্ষমতা যদি হাত পা ছড়িয়ে সর্বসাধারণের মাঝে নেমে আসতে না পারে, রাষ্ট্রীয় অধিকার যদি জনগণের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে দলগত সংখ্যাধিক্যের অনুশাসনই হয়ে দাঁড়ায় গণতন্ত্রের নামান্তর মাত্র।

সে গণতন্ত্র চাই না আমরা। এবং চাই না বলেই নূতনতর নীতিতে গঠন করতে হবে সমাজ এবং রাষ্ট্রকে। কিন্তু কী ভাবে? একথা সত্য যে, প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থার পরিপাটির উপর নির্ভর করে তার কাঠামো। বাস্তববাদের গোড়ার কথাও তাই। সুতরাং বিকেন্দ্রীকরণ নীতির বিচার করতে হবে সেদিক দিয়ে।

উৎপাদনে বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ হল পারতপক্ষে যথাসম্ভব সহজ ও সরল প্রক্রিয়ার সহজলভ্য শ্রম ও মূলধনের প্রয়োগে বস্তুর উৎপাদন। বণ্টনে বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ এমন একটা ব্যবস্থা যার মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতিটি অংশ উৎপন্ন বস্তুর

প্রয়োজনমত ভোগাধিকার পায় এবং
ভাগীদার হতে পারে।

কাজেই একথা বলা বাহুল্য যে এই বিকেন্দ্রীকরণের পিছনে রয়েছে অর্থনৈতিক সাম্যের নীতি, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিপূর্ণ বিকাশ, সুখে স্বচ্ছন্দে পরস্পরের সহযোগিতায় বেঁচে থাকার জীবন্ত আদর্শ। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যেতে পারে একটি গ্রাম। বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্রতম একক। আপনার প্রাণ এবং স্বাতন্ত্র্যে সে আপনি মহীয়ান্, অথচ বৃহত্তের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগাযোগ। সে স্বাবলম্বী; তার তাতকাপড়, তার প্রসাধন এবং উৎকর্ষ ভোগায় সে নিজেই। কুটিরে কুটিরে শ্যামলশ্রীর মধ্য দিয়ে হাত চলে, হাতিয়ার চলে, মেসিন চলে। সমাজের কৃষিশ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী, শিল্পীশ্রেণী চমৎকার একটা শ্রেণীহীন সহযোগিতার আসরে যেন প্রগতির বাজনা বাজিয়ে চলে। গড়ে ওঠে এক অপরূপ সংস্কৃতি যেটা সম্পূর্ণভাবে গ্রামীন এবং স্বাধীন।

উৎপাদনযন্ত্রে জটিলতা নাই, কাজেই নেই ম্যানেজার বা ডিরেক্টরের একনায়কত্ব। মূলধন লাগে কম, সুতরাং আপদ্ধা নেই পুঁজিপতির শোষণের। উৎপাদন পূর্ণাঙ্গ অথচ চাহিদা-মাফিক। তাই ভয় নাই কোন স্বার্থসংঘাতের। জীবনযাত্রার এই যে অনাড়ম্বর এবং স্বয়ং সম্পূর্ণমান এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে সত্যিকারের বিশ্বশান্তির বীজ, উদ্ভিন্ন হবে যা বিকেন্দ্রীকরণের রস-সিঞ্চনে। বলতে পারেন, এ গাছের ভবিষ্যৎ জীবনে নাই পাতাবাহারের রকমারীত্ব অথবা পরভোজী লতাবাহারের চমৎকারীত্ব। কিন্তু সেই প্রশ্নেরই ত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে হবে আজ পৃথিবীকে যে, সে চায় আকাশগামি আতসবাজির ফিন্‌কুটি না গৃহকোণের স্থির প্রদীপের নীল-শিখা?

অর্থনীতির কথা বলেছি এতক্ষণ, এবার বলব রাষ্ট্রনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ। প্রকৃতপক্ষে একটি মুদ্রার এপিঠ এবং ওপিঠ এরা। একটি অপরটির পরিপূরক মাত্র। সমাজব্যবস্থার রথকে ঠিকপথে চালাবার জন্য যে মেসিনের দরকার তাকেই বলে রাষ্ট্র। কিন্তু সে মেসিন চলবে জনগণের মিলিত ইচ্ছায় এবং প্রত্যেকের অংশ থাকবে তার মধ্যে। সুতরাং রাষ্ট্র-শক্তির অনুপরমাণু হবে তারাই। এরই নাম রাষ্ট্রীয় বিকেন্দ্রীকরণ। এর এতটুকু ব্যতিক্রম হলেই বুঝতে হবে মেসিন খারাপ হয়েছে; সে বিপথে চলছে, যাতে করে যে কোন মুহূর্তে হতে পারে সংকট।

পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অনেক বিবর্তন হয়ে গেছে অতীতে। রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, ধনিকতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র প্রভৃতি অনেক প্রসূনের কলঙ্কময় ইতিহাসের ধাপ পার হয়ে আজ নূতন সীমানায় পৌঁছেছি আমরা। যারা শ্রম করে উৎপাদন করে এবার তাদের পালা। চাবিকাঠি তাদের হাতে। তারাই চালাবে রাষ্ট্র।

বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত স্বাবলম্বী গ্রামের কথা পূর্বেই বলেছি। এখন তার রাষ্ট্রীয় চিত্র দেখতে চাই। এক একটি খণ্ড রাষ্ট্র হল এক একটি গ্রাম। পরিচালক জনতা। তাদের পার্লামেন্টের সভ্য হবে চাষী, কাটুনি, তাঁতী, দর্জি, কামার, কুমোর, ছুতার, জেলে প্রভৃতি উৎপাদক এবং শিক্ষক, ডাক্তার, দোকানদার প্রভৃতি সহ-উৎপাদক। প্রত্যেকের এক একটি সংঘ, এক একটি ভোট। এরা সকলেই পরস্পর নির্ভরশীল, কাউকে বাদ দিয়ে কেউ চলতে পারে না। কাজেই দল বা আর্ডাতের প্রশ্ন নাই এখানে। গ্রাম শাসনের দায়িত্ব এবং অধিকার এই "গ্রামী"র উপর ন্যস্ত, যার পিছনে থাকবে জনগণের সমবেত শক্তি, সমবেত কণ্ঠ।

গ্রামান্তরের প্রশ্ন যেখানে উঠবে তার জন্য থাকবে পঞ্চ-গ্রামী, শতগ্রামী ইত্যাদি। বৃহত্তর শাসনসভার মৌলিক সভ্য হবে এক একটি গ্রাম, পঞ্চগ্রাম, অথবা শতগ্রাম। প্রত্যেকের এক একটি ভোট। সমগ্র দেশের সমস্যার বিচার করবে তারা। কুটিরশিল্পে যা চলবে না এবং যার জন্য দরকার হবে বৃহদ্‌যন্ত্র শিল্প, তার মালিকানা হবে তাদেরই এবং তারাই নিযুক্ত করবে পরিচালনার বোর্ড।

বলতে পারেন এ সম্ভব হবে কী করে এবং এর নিরাপত্তাই বা কোথায়? রাষ্ট্র এবং সমাজের এই যে গ্রামীন্ পরিকল্পনা এ অত্যন্ত সহজ এবং সরল। কুটিলতা এবং আড়ম্বর নাই বলেই বোধ হয় এর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আমরা এত সন্দিহান। গভর্ণমেণ্ট বলতেই পঞ্চাশ গণ্ডা নাজীর উজির দেখতে আমরা অভ্যস্ত ব'লেই বোধকরি এত সহজ এবং সরল জিনিসের ধারণা

করতে পারি না আমরা। অথবা হয়ত জনগণকে ফাঁকি দেবার কোন উপায় নাই এর মধ্যে তাই কায়েমী স্বার্থবাদীর দল চীৎকার করে ওঠে একে অসম্ভব এবং অবাস্তব বলে। কিন্তু ইতিহাসে এর নজীর যে নেই তা নয়। একদিন ছিল যখন চীন এবং ভারতবর্ষে এই সমাজ ছিল। এত সংঘাত এবং বিপর্যয়ের মধ্যেও যে তারা বেঁচে আছে তার কারণ এই গ্রামীন সংস্কৃতি। ইওরোপকো গঠনের ফলে চীন কী ভাবে তার সব চেয়ে বড় দুর্দিনে আত্মরক্ষা করেছে তার খবর আমরা জানি! দিল্লীর রাজসিংহাসন নিয়ে রক্তের বান ডেকেছে অনেক, তবু যে গ্রামীন ভারতবর্ষ তার সত্তা বজায় রেখে এসেছে বহুদিন ধরে, তার প্রমাণও প্রত্যক্ষ।

প্রকৃতপক্ষে, বিকেন্দ্রীকৃত রাষ্ট্রের শক্তিই সেইখানে। বোমার আঘাতে, দমনের বহ্নাগ্নিতে নষ্ট হতে পারে না সে কোনদিন। কেন্দ্রীভূত উৎপাদন-যন্ত্রকে বিকল করতে পারা যায় অতি সহজে। কিন্তু শতসহস্র গ্রামের মধ্যে অযুতকোটি মানুষের পেশীতে পেশীতে যা সঞ্চারিত তাকে রোধ করতে পারে কে?

অবশ্য এই সংগঠনের জন্য চাই নূতন মানুষ, নূতন মন। পশুশক্তির বলে মানুষ যেখানে শাসিত এবং দমিত, সংঘ সেখানে কৃত্রিম। বিচ্ছিন্নতা এবং বিরোধের বীজ সেখানে বর্তমান। সামাবাদের কথা সেখানে অলীক কল্পনামাত্র। মৈত্রী এবং প্রেমের বন্ধনে যে সমাজ গঠিত, অহিংসার ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রের গাঁথুনি তার নিরাপত্তা অসীম। তাদের ভয় নাই তার মধ্যে। আর যদি বা থাকে, তবে তার জন্য রয়েছে অসহযোগের অলংঘ্য অনুশাসন; সত্যাগ্রহের অমোঘ অস্ত্র।

পৃথিবীকে গ্রহণ করতে হবে এই পথ। তাকে করতেই হবে আজ না হয় কাল। এ কবির কল্পনা নয়, এ অতি বাস্তব। ধনের লোভে, পরকে ছোট করে নিজে বড় হবার লোভে মানুষ কক্ষচ্যুত হয়েছে বটে, কিন্তু প্রকৃতির সহজ আকর্ষণের বলে ফিরে আসতেই হবে তাকে আপন গণ্ডীর মধ্যে। কেন না এর পিছনে রয়েছে বাঁচবার তাগিদ, প্রয়োজনের তাগিদ।

দুর্গত এবং পরাধীন ভারতবর্ষের কাছে এ পথ আরও গ্রহণযোগ্য এবং আরও জরুরী। তাকে হতে হবে স্বাধীন, তার চাই স্বরাজ। তাই তার কাছে ভবিষ্যতের আদর্শ এবং বর্তমানের পন্থা মিলে মিশে হয়ে গেছে একাকার। এই তার জীবন-সংগ্রাম এবং এ অনিবার্য।

কিন্তু তার জন্য তৈরী হতে হবে সকলকে সকল দিক দিয়ে। জন-সংগঠন চাই। শ্রমের মারফৎ উৎপাদন করে চলে যারা, বেঁচে-থাকার চাবিকাঠি যাদের হাতে, সভ্যতাকে অক্ষুণ্ণ করে রাখে যে ধোপানাপিত, মুচিমেথরের দল তাদিকে শ্রেণীগত ভাবে সংঘবদ্ধ করতে হবে আমাদিগকে। এই এক একটি সংঘ হবে এক একটি ব্রহ্মাস্ত্র। শুধু জানিয়ে দিতে হবে তাদিকে যে, যারা তোমাদের ঘরে রেখেছে পঙ্গু, সঙীন এবং আইনের ভয় দেখিয়ে যারা তোমাদিগকে করে দিয়েছে অসাড় তাদের বিরুদ্ধে অসহযোগ করবার এবং জোর গলায় "না" বলার অধিকার তোমাদের জন্মগত।

জন-সংগঠনের কাজ সেই গড়ে-তোলার কাজ। অনেক দিনের পুরানো কথা এসব। আবার নূতন করে ভেবে দেখতে বলি সবাইকে। কেননা, এর মধ্যেই মুক্তি। নান্য পন্থা, নাহি অন্য পথ।

চরকা

শ্রীঅমূল্যচরণ রায়

চরকার পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক কথা বলা হইয়াছে। পক্ষের কথা এক ব্যক্তিই বলিয়াছেন, তিনি যত শ্রেষ্ঠই হউন না কেন। আর বিপক্ষের কথা একাধিক ব্যক্তি বলিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিও যথেষ্ট আছেন। তাই, বিপক্ষের কথা দিয়াই আমরা এই প্রবন্ধ আরম্ভ করিব; তাঁহারা বলেন, যে চরকায় কিছু হবে না, কারণ ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা হারায়, তখন দেশে যথেষ্ট চরকা ছিল চরকা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে নাই, অতএব চরকা স্বাধীনতা আনিতেও পারিবে না। উত্তম যুক্তি, এখন দেখা যাক, আমরা এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলে কোথায় গিয়া পৌছাই। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা হারায়, তখন দেশে একমাত্র চরকাই ছিল, আর কিছু ছিল না, এমন নয়। তখন দেশে চরকাও ছিল আবার কামান বন্দুকও ছিল। চরকাও যেমন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে নাই কামান বন্দুকও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে নাই। অতএব চরকা যদি স্বাধীনতা আনিতে না পারে তবে কামান বন্দুকও স্বাধীনতা আনিতে পারিবে না। এক কথায় এই যুক্তির দিক দিয়া চরকা অবলম্বন করিয়া অহিংসার পথেও স্বাধীনতা আসে না, আবার কামান বন্দুক অবলম্বন করিয়া হিংসার পথেও স্বাধীনতা আসে না। এই যুক্তি আমাদিগকে অগ্রসর হইতে দেয় না। এখন উপায়? হয় আমাদের একটা পথ বাহির করিতে হয় নয়তো নাকে তেল দিয়া ঘুমান ছাড়া আর পথ থাকে না। এখন দেখা যাক্, স্বাধীনতা লাভের যে সনাতন পথ আছে, সেই পথে চরকার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। ইহা সর্ববাদীসম্মত যে সংগ্রাম ভিন্ন কোন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না, সে সংগ্রাম হিংসাত্মকই হউক, কি অহিংসাত্মকই হউক, কি হিংসা অহিংসার সংমিশ্রণই হউক। আবার সংগ্রাম যে জাতীয়ই হউক না কেন, তাহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে discipline বা নিয়মানুবর্তিতা চাই। হিংসাত্মক সংগ্রামে যেরূপ ড্রিল করিয়া নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করিতে হয় অহিংসাত্মক সংগ্রামে সেরূপ চরকার সূতা কাটিয়া নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করিতে হয়। হিংসাত্মক সংগ্রামে সৈন্যসংখ্যা নির্দ্ধারিত আছে, তাই তাহাদের মধ্যে ড্রিল প্রবর্ত্তনই যথেষ্ট। কিন্তু অহিংসাত্মক সংগ্রামে দেশের প্রত্যেক নরনারীরই সৈনিক, তাই শিশু পশু এবং স্থবির বাদে প্রত্যেকেই যাহাতে নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার নিমিত্ত একটা কাজ করিতে পারে এরূপ কাজ চরকা ছাড়া এ যাবৎ কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই, তাই অহিংসাত্মক সংগ্রামের শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত চরকার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই সংগ্রামে বিশ্বাস করিলে, এই সংগ্রামের সৈন্যদলভুক্ত হইলে, অন্য কোন কারণে না হউক অন্ততঃপক্ষে নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার নিমিত্তও চরকা ধরিতে হইবে। অবশ্য এখানে আবার আর একটি কথা অহরহঃ শুনা যায়। তা ইতিহাসের কথা। অহিংসার দ্বারা কোন পরাধীন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এর প্রমাণ ইতিহাসে নাই, সত্য কথা। আবার দুই শত বৎসরের একটা নিরস্ত্র জাতি হিংসার দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এ প্রমাণ ইতিহাসে আছে কি? স্বাধীনতা অধিনতার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। দুই শত বৎসর একটা গোটা জাতিকে নিরস্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে কি? যখন কার্য্যকারণ দুইই ইতিহাস বহির্ভূত, একেবারে নূতন, তখন তার মুক্তির পন্থাটা ইতিহাস বহির্ভূত হইবে ইহাইতো স্বাভাবিক। তা ছাড়া এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে একটা জিনিস প্রমাণ হইয়াছে যে বৃহত্তর হিংসার (bigger violence) কাছে ক্ষুদ্রতর হিংসার (smaller violence) কোন মূল্য নাই। আজ violenceএর প্রায় ষোল আনা শক্তি অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও জাপানকে একটি এটোমিক বোমার কাছে মাথা হেঁট করিতে হইয়াছে। এই অভিজ্ঞতার পর আজ আর তিন তুড়িতে অহিংসাকে উড়াইয়া দেওয়া সহজ হইবে না।

অহিংস সংগ্রামে dicipline হিসাবে চরকার প্রয়োজনীয়তার কথা যাহা বলিলাম তাহাকে চরকার জাতীয়তার দিক্ বলা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া চরকার আন্তর্জাতিকতার দিক্ আছে। সে দিকটাকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার

করিতে হইবে। চরকা কুটীর-শিল্পের প্রতীক। আজ এই যান্ত্রিক সভ্যতার মরসুমের মধ্যে কুটীর শিল্পের কথা বলা তো দূরের কথা চিন্তা করাও শক্ত। তবে একটা কথা বলিলে বোধ হয় কেহই আপত্তি করিবে না যে যান্ত্রিক সভ্যতার ফলে জগদ্ব্যাপী বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। ১০০ লোকের কাজ ১০ জন লোক দিয়া করিতে পারিলে বাকী ৯০ জন লোক বেকার হইয়া পড়িবে ইহা সহজ পাটীগণিতের কথা। অবশ্য এখানে একটা যুক্তি শোনা যায় যে আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে নানারূপ ব্যবসার পথ বাহির করিয়া বেকার সমস্যার সমাধান করিব। কিন্তু অতিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, ব্যবসা যদি Arithmetica Progressionএ বৃদ্ধি পায় তবে বেকার সংখ্যা Geometrical Progressionএ বৃদ্ধি পায়। একটা অন্যটার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে না। ৩০।৪০ বৎসর পূর্বে বাংলায় অনেক জিলায় হাজার হাজার পরিবার ধান ভানিয়া অন্নসংস্থান করিত। এখন গ্রামে গ্রামে ধানের কল হওয়ায় প্রায় সকলেই বেকার হইয়া পড়িয়াছে এবং বোধ হয় গত দুর্ভিক্ষের সময় নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

এ ছাড়া এর আর একটা দিক্ আছে। সে দিকটাকে স্বাস্থ্যনীতির দিক বলা চলে। এই কলের চাউল, কলের আটা, কলের তৈল এবং কলের মদ্যপান স্বল্পায় বর্ষা আরম্ভ হইতে না হইতেই অনেকেই একটু পরে পাড়ী হন, অর্থাৎ পা দু'খানা একটু ফোলে এবং পেটটা একটু খারাপ হয়। এবং বেরিবেরির ফলে কাহাকেও বা তাহার গিন্নীকে পাঠাইতে হয় সিমুলতলায় হাওয়া পরিবর্তনের জন্য আবার কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে বা তাহার গিন্নীকে পাঠাইতে হয় কেওড়াতলায় একেবারে দেহ পরিবর্তনের জন্য।

আর্য্য ঋষিরা এই অবস্থাটা বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহারা গোড়াতেই এটাকে বাধা দিয়াছেন। মনুসংহিতায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান মনু এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন এবং মহাযন্ত্র প্রবর্ত্তনকে তিনি ব্যভিচার বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য মনীষীরাও ইহা বুঝিয়াছেন। তবে বড় বিলম্বে বুঝিয়াছেন। সর্ব্বনাশের মাত্রাটা যখন একেবারে উদারা মুদারা তারা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন তাঁহারা বুঝিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে এ সম্পর্কে প্রথমেই দেশনী ধারণ করেন, কবি Count Leo Tolstoi. ইহার পরে আরও অনেক পাশ্চাত্য মনীষী ইহা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এমন কি Macdonald হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক রাজনৈতিককেও বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বিব্রত হইতে হইতেছে।

অবশ্য ইহার উপর কেউ কেউ হয়তো বলিবেন—তাহা হইলে কি আমাদের আবার গরুর গাড়ীর যুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে। না, সে ভয় নাই। সত্য কোন দিন মরে না, এত বড় যান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যেও কুটীর শিল্প একেবারে মরে নাই। তাহার মধ্যে যেটুকু সত্য আছে, তাহা নিয়া সে পড়িয়া আছে। সেইরূপ যন্ত্রের মধ্যে যেটুকুন সত্য আছে, তাহা নিয়া সে পড়িয়া থাকিবে।

তৃণাংকুর

শ্রীঅমর ভট্ট

দু' দিনের ইতিবৃত্ত ইতিহাসে বেশী কিছু নয় :
স্বর্গীত দিনের স্বপ্ন মোছে কোন গোধূলি বেলায়
শংকিত পায়ের চিহ্নে রেখে যাওয়া শেষ পরিচয়
অবলুপ্ত একদিন অনাগত-তৃণাংকুর প্রায়।

অতীতের অন্ধকারে আজিকার বর্ত্তমান কাঁদে—
প্রতীক্ষা কাতর শুধু ভবিষ্যের অন্ধ দিনগুলি ;
নিঃশ্বসিত পরমায়ু প্রতিদিন নব পরমাদে
স্বাক্ষী বর্ত্তমান খোঁজে ভূত আর ভবিষ্যত ভুলি।

নির্ম্মম ক্ষোভের মূল্য যৌবনের আত্ম-বলিদানে—
ব্যর্থ হবে কতখানি, কোনদিন হয়নি নির্দ্দেশ ;
ওদিকে চেতনা বন্ধু—শোন আজ কল্পনার গানে
অনাগত বসন্তের কোন এক সংগীতের রেশ !

অবকাশহীন এই কামনার অচকল ডাকে
মিথ্যা হ'ল জীবনের সব মৃত্যু, সব পরাজয়।
গৈরিক বসনধারী প্রান্তরের শূন্য ফাঁকে ফাঁকে
নবীন অংকুর হ'তে শ্যামলের নব অভ্যুদয়।

নীল আন্দোলনের শেষ অধ্যায়

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

নীল কমিশনে প্রদত্ত সাক্ষ্য প্রমাণে নীলকরদের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িল। এদিকে তাহারা বঙ্গের ছোটলাট সার্ সিটোর গ্রাণ্ট এবং সেক্রেটারী সিটন-কারের উপর ক্রমে ক্ষেপিয়া উঠিল। নীল কমিশনের সভাপতি রূপে সিটন-কারের কার্য্য-কলাপ এবং নীলচাষীর উপর নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে ছোটলাট গ্রাণ্টের তীব্র মন্তব্য তাহাদের মনে একেবারে আগুন জ্বালাইয়া দিল। কমিশনের কার্য্য যখন চলিতেছিল তখনই নীলকরগণ ভারত-সরকারের নিকট স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়া এবং কলিকাতাস্থ তাহাদের মুখপত্র 'ইংলিশম্যান' ও 'বেঙ্গল হরকরা' মারফত গ্রাণ্ট সাহেবের বিরুদ্ধে সুনিয়ন্ত্রিত অভিযান শুরু করিয়া দিয়াছিল। নীলকরগণ ইতিপূর্ব্বেই সংঘবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াছি। তাহাদের সংঘ এই বৃহত্তর সংঘটির অন্তর্ভুক্ত ছিল—The Landholders and Commercial Association of British India। তাহারা ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই ছোটলাটের বিরুদ্ধে ভারত-সরকারের নিকট এক আবেদন প্রেরণ করে। ইহার উপসংহারে তাহারা লেখে :

"Your petitioners humbly pray your Excellency in Council to take into consideration the petition and to pass such orders as may oblige His Honour, the Lieutenant-Governor of Bengal, to refrain from pursuing a course of conduct which cannot but be ruinous to the Indigo planter in Bengal, and point out to His Honour the impropriety of interfering with the due course of the administration of the law by the regularly appointed Judicial Officers as laid down by the Legislative Council of India and which interference is, as your petitioners submit, both illegal and unconstitutional, and especially indiscreet in the case of a dispute between capital and labour, and that Your Excellency may pass such orders as may under the above circumstances seem proper."

উক্ত সংঘ ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেবের বিরুদ্ধে আবেদনে যে অভিযোগ আনয়ন করে তাহা সত্য হইলে খুবই গুরুতর। বিচার-আদালতের কার্য্যে নীলকরদের বিরুদ্ধে, সুতরাং প্রজাদের সপক্ষে, তিনি হস্তক্ষেপ করিতেছেন, সংঘের এই অভিযোগ। তাই তাহারা ভারত-সরকারের নিকট ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া আবেদন করিল। গ্রাণ্ট সাহেবও ভারত সরকারের নিকট নিজ বক্তব্য পরবর্ত্তী ১৭ই আগষ্ট তারিখে পেশ করিলেন। সপরিষদ বড়লাট অভিযোগ-পত্র এবং উত্তর উভয়ই বিবেচনা করিয়া ৩১শে আগষ্ট এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন যে, ছোটলাট যে নীতি অনুসরণ করিয়া এবং কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের পূর্ণ সম্মতি আছে। এ কথা নীলকরদের কর্ণে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। তাহারা পুনরায় ১৩ই অক্টোবর ছোটলাটের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া আবেদন করিল। এবারেও কিন্তু বড়লাট তাহাদের অভিযোগের যাথার্থ্য মানিয়া লইলেন না। ১৮৬০, ২৪শে নবেম্বরের একখানি পত্রে ছোটলাট গ্রাণ্ট সাহেব তথা বাংলা-সরকারের কার্য্যকলাপে বড়লাটের সম্মতি সম্পূর্ণরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে :

"The Governor-General concurs with the President in Council in considering that there is nothing in the letter of the 13th October from the Indigo planters' Association which should affect the opinion already expressed by the Governor General in Council that the conduct of the Bengal Government and of its officers generally has been marked by a strictly impartial administration of the law to all classes concerned."

অর্থাৎ, পরিষদের সভাপতির সঙ্গে বড়লাট এবিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, নীলকর সভার ১৩ই অক্টোবরের পত্রে এমন কিছুই উল্লিখিত হয় নাই যাহা দ্বারা বাংলা-সরকার এবং তাহার কর্ম্মচারীবর্গের আচরণ সম্পর্কে সপরিষদ বড়লাটের পূর্ব্ব অভিমত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। বাংলা-সরকার শাসন ব্যাপারে সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিই সম্পূর্ণ অপক্ষপাত আচরণ করিয়া চলিয়াছেন।

ভারতবর্ষে বসিয়া ভারত-সরকারের নিকট হইতে নীল-করগণ স্ব-স্ব অভিপ্রায় চরিতার্থ করিতে অসমর্থ হইল বটে,

কিন্তু ইহাতে নিরস্ত না হইয়া তাহারা বাংলা-সরকার তথা ছোটলাট গ্রাণ্টের বিরুদ্ধে বিলাতে পর্যন্ত আন্দোলন চালাইতে বদ্ধপরিকর হইল। তাহারা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে *Brdhmins and Pariahs* শীর্ষক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করাইল। গ্রাণ্ট সাহেবের উপর তাহাদের বিজাতীয় ক্রোধ ও বিরক্তি ইহার প্রতি ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথমেই তাঁহার সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে :

"This high officer has interferred with the free course of justice, has destroyed capital and trade of British settlers of India and has created the present disastrous condition of incendiarism and insurrection now spreading in the rural districts of Bengal."

অর্থাৎ, এই উচ্চতন কর্মচারী বিচার-আদালতের স্বাধীন কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার কার্যের ফলে ভারতবর্ষের ইংরেজ বাসিন্দাদের পুঁজি ও ব্যবসা নষ্ট হইয়াছে। বঙ্গের গ্রামাঞ্চলের বর্তমান মারাত্মক বিদ্রোহ ও অগ্নিকাণ্ডের উদ্রেকও তিনিই করিয়াছেন।

এই পুস্তিকার একটি অধ্যায় 'Civilians vs. British Settlers' বা 'সিবিলিয়ান কর্মচারী বনাম ইংরেজ বাসিন্দা'। পূর্বে কোম্পানীর কর্মচারীগণ প্রায়ই উদ্ধতপ্রকৃতি, ঘুষখোর এবং অসচ্চরিত্র ছিল। রামমোহন রায় এই শ্রেণীর কর্মচারীদের ঔদ্ধত্যের নিকট কখনও নতিস্বীকার করেন নাই। তিনি এবং তাঁহার অনুবর্তীগণ এই সকল সিবিলিয়ানের বিরোধী এবং বেসরকারী ইংরেজ ব্যবসায়ীদের খুবই পক্ষপাতী ছিলেন। শেষোক্ত দল যাহাতে এদেশে বসবাস করিয়া দেশমাতার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করে সে বিষয়ে আগ্রহশীল ছিলেন। পরে কিন্তু এই শ্রেণীর ইংরেজই ভারতবাসীদের প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে আর ইহাতে ইংরেজ কর্মচারীদেরও সহায়তা লাভ করিতে থাকে। তবে ঐ সময় ইংরেজ সিবিলিয়ানগণের মধ্যে কেহ কেহ ভারতবাসীদের পক্ষে দণ্ডায়মান হন। বঙ্গের ছোটলাট গ্রাণ্ট, সেক্রেটারী সিটন-কার প্রভৃতি ছিলেন এই শ্রেণীর বরণী সিবিলিয়ান। পুস্তিকায় গ্রাণ্ট প্রমুখ এই শ্রেণীর সিবিলিয়ানগণই লক্ষ্যীভূত হইলেও পূর্বেকার সিবিলিয়ানদের চালচলন সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাইতেছে। নিম্নের অংশটি শুধু কৌতুককর নহে, বাস্তবের সঙ্গেও ইহার যথেষ্ট মিল আছে :

"That a feeling of dislike to Settlers exists among Civilians : that the Civilians as distinguished from the Settlers are too much of a caste : and that the Covenanted Service is as it were the Nobility of India. Such have been the British Brahmins of India and the British Pariahs of India, as, after long enquiry their conditions have been developed by the imperial judgement of a Committee of English gentlemen. Those Nababs were but too often extortionate Governors and corrupt Judges. They shook the pagoda tree as violently as they could and they made haste to become rich and to quit the country. But the few struggling Settlers who had found their way from England without being decorated with the Company's Covenant, were Pariahs—the lowest of the low."

পূর্বেকার কোম্পানীর কর্মচারীদের প্রতি এরূপ কথা প্রযোজ্য হইলেও নীলকরদের উপরই গ্রাণ্ট প্রমুখ সিবিলিয়ানদের প্রতি ইহা আদৌ খাটে না। তাঁহারা স্বার্থনিষ্ঠ ও প্রজাপরণী ছিলেন বলিয়াই স্বার্থান্ধ অত্যাচারী নীলকরদের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। ছোটলাট গ্রাণ্টকে 'the present high priest of the Civil Service Juggernaut' ('সিবিল সার্বিস জগন্নাথদেবের বর্তমান প্রধানতম পুরোহিত') এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্মীদের 'Civil Lattials' ('সিবিল লাঠিয়াল') বলিয়া বর্ণনা করিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। উক্ত পুস্তিকার উপসংহারে নীলকরগণ স্বদেশবাসীদের নিকট এই প্রার্থনা জানাইল :

"We asked to be relieved from the oppression of an ignorant and mischievous despot, who is ruling the finest country of the earth, who is even now rendering it necessary to take military occupation of the rural districts of Bengal, and who, if he remain your Minister, will soon bring matters to such a pass that you will have to make your choice between abandoning the country and holding it at the point of the bayonet."

গ্রাণ্ট সাহেবের প্রতি নীলকরদের ঈর্ষা এখানে সুপ্রকট। তাহাদের মতে 'একজন অজ্ঞ স্বৈরাচারী শাসকের উপর পৃথিবীর সুন্দরতম প্রদেশের শাসন ভার অর্পিত। তাঁহার সাংঘাতিক অত্যাচারের হাত হইতে তাহারা রক্ষা পাইতে চায়। ইহার

জন্য এখনও বাংলার গ্রামাঞ্চলে সৈন্য মোতায়েন রাখা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই বাহিনী যদি আরও কিছুকাল আপনাদের মধ্যবর্তীরূপে অবস্থান করে তাহা হইলে ব্যাপার ক্রমশঃ এমনই হইয়া উঠিবে যে, তখন আমাদের এই দুইটি পন্থার একটি বাছিয়া লইতে হইবে—হয় আমাদিগকে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, নয় সঙ্গীনের ঘায়ে দেশ রক্ষা করিতে হইবে।'

নীলকরদের ঔদ্ধত্য, কটূক্তি ও মিথ্যাভাষণ এখানে চরমে উঠিয়াছে। যাহা হউক, ব্রিটিশ জনসাধারণ তাহাদের প্রচারে বিচলিত হইল না। বড়লাটের মত ভারত-সচিবও গ্রাণ্টের কার্যকলাপ পূর্ণ সমর্থন করিলেন। বড়লাটের নিকট প্রেরিত ডেসপ্যাচে তিনি এ সম্পর্কে এই অভিমত ব্যক্ত করেন :

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। ভারত-সচিব বড়লাটের মতই শুধু সমর্থন করেন নাই, তিনি যে ভাষায় তাঁহার সমর্থন ব্যক্ত করিয়াছিলেন ভারত-সচিব প্রায় সেই ভাষাতেই তাহা প্রকাশ করিলেন। গ্রাণ্ট সাহেবের প্রতি নীলকরদের ক্রোধের এখানেই কিন্তু পরিসমাপ্তি হয় নাই। একটু পরেই সে কথা বলিতেছি। ইতিমধ্যে তাঁহার প্রতি নীলকর-সমর্থক পত্রিকা-গুলির ব্যবহারের কিঞ্চিৎ আভাস দিব। সিপাহী বিদ্রোহের সময় গ্রাণ্ট সাহেব বড়লাট লর্ড ক্যানিঙের আইন-সচিব ছিলেন, এই সময় ইংরেজ পরিচালিত পত্রিকাগুলি ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন এরূপ বিষোদ্গার করিতেছিল যে, সরকার সাময়িক ভাবে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন হইতেই গ্রাণ্টের উপর তাহাদের রাগ ছিল। তখন তাহারা গ্রাণ্ট সাহেবকে 'হোয়াইট বা শ্বেতকায় পাদ্রী' বলিয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে। এই সময় আবার নীলকর-সমর্থক পত্রিকাগুলি, বিশেষ করিয়া 'বেঙ্গল হরকরা' গ্রাণ্ট ও তাঁহার অধীনস্থ কর্মীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিতে লাগিল। ইহার কিছু নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল ;

"The animus of Messrs. Grant, Eden, Herschel and Seton-Karr has been directed only against their countrymen, not against the natives." ('মেসার্স গ্রাণ্ট, ইডেন, হার্শেল ও সিটন-কারের বিদ্বেষ তাঁহাদের স্বদেশবাসীদের বিরুদ্ধে, এদেশবাসীদের বিরুদ্ধে নহে।')

'Mr. Grant may now be said to be reaping. It is manufacturing season with him just at present. He sowed Perwannas, he ploughed with Minutes, he harrowed us with Lushingtons and Herschels, and he is now reaping—blood.' ('গ্রাণ্ট সাহেবের এখন শস্য তুলিবার সময়। তিনি জমিতে পরওয়ানা বপন করিয়াছেন, 'মিনিট' দ্বারা চাষ করিয়াছেন, লাশিংটন হার্শেল দ্বারা মৈ দিয়াছেন, এখন তিনি তুলিতেছেন —রক্ত!')

গদ্যে গালিবর্ষণে সন্তুষ্ট না হইয়া 'হরকরা' গ্রাণ্ট মহোদয়ের নামে ছন্দে গালিবর্ষণ করিল :

"Governor Grant is a terrible man,
As he reigns in Allpore Hall ;
A compound of Chengis and Kublai Khan
Tamerlane, Nadir and all.
Says J. P.
Grant Sez he
Drive me the planets into the sea."

নীলকর সম্প্রদায় তথা স্থানীয় বেসরকারী ইংরেজগণ ছোটলাট গ্রাণ্টকে কিরূপ ভাবের জীব মনে করিয়াছিল 'হরকরা'র এই কয় পঙক্তিতে তাহা যেন বুঝা যাইতেছে। গ্রাণ্ট মহোদয়কে চেঙ্গিস খাঁ, কুবলাই খাঁ, তৈমুরলঙ্গ, নাদির শা প্রভৃতির সংমিশ্রণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে!

যাহা হউক, ভারত-সরকার ও ভারত-সচিব বাংলা গবর্নমেণ্টের তথা গ্রাণ্ট মহোদয়ের সপক্ষে থাকায় নীলকর সম্প্রদায় বিবিধ ভাবে চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহারা গ্রাণ্ট সাহেবকে কোনমতেই ভুলিতে পারিল না। বাংলা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত একখানি পুস্তকে (*Selections from the records of the Government of Bengal—No. XXXIII, Part III*) নীলদা বিভাগের অস্থায়ী কমিশনার ই. এইচ. লাশিংটন কর্তৃক ১৮৬০, ৭ই আগষ্ট বাংলা-সরকারের সেক্রেটারীকে

লিখিত একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। ইহাতে এই মর্মে লেখা ছিল যে, যশোহরের অন্তর্গত লক্ষীপাশা নীলকুঠির অধ্যক্ষ জন মাকআর্থারের প্ররোচনায় একটি দাঙ্গা হয় এবং তাহাতে একজনের মৃত্যু ঘটে। সরকারী পুস্তকে এই পত্র প্রকাশিত হইলে কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টে ম্যাকআর্থার ছোটলাট গ্রাণ্টের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা রুজু করেন। ১৮৬২, ১৬ই মে প্রধান বিচারপতি বার্ণেস পীকক্সের এজলাসে এই মোকদ্দমা হয়। মানহানিকর বিশেষ কিছু প্রমাণিত না হওয়ায় মোকদ্দমার খরচা বাবদে গ্রাণ্ট সাহেবকে এক টাকা মাত্র দিতে হইল! এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইহার পূর্বেই ২৩শে এপ্রিল তারিখে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

শেষ দিকে কোন কোন কারণে ভারত-সরকারের সঙ্গে গ্রাণ্ট সাহেবের মতান্তর ঘটে। ইহার মূলেও ছিল নীল। নীলকর-জমিদারগণ রায়তদের নিকট হইতে পাওনা আদায় করিতে না পারায় ভারত-সরকার এই উদ্দেশ্যে সার্থক ব্যবস্থা করিবার জন্য নদীয়া বিভাগে দুই জন বিশেষ কমিশনার নিয়োগ করেন। কয়েক মাস পরে ছোটলাট যখন ভারত-সরকারের নিকট কমিশনারদের রিপোর্ট পেশ করিলেন তখন তাঁহারা বলিলেন, কমিশনারগণ এবং গ্রাণ্ট কেহই বিশেষ কমিশনার নিয়োগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। ইহা লইয়া উভয়ের মধ্যে পত্রের আদান-প্রদান হয়। বড়লাট লর্ড ক্যানিং গ্রাণ্ট সাহেবের পত্রের সারবত্তা স্বীকার করিলেও ইহার অশোভনসূচক ভাষায় আপত্তি করিয়াছিলেন। গ্রাণ্ট বিদায়ের দিনে তাঁহার এরূপ ভাষার জন্য ত্রুটি স্বীকার করিয়া যান। বাস্তবিক এই সময় ভারত-সরকার বাংলা-সরকারের উপর কতকটা বিরাগ এবং নীলকরদের উপর পক্ষপাত প্রদর্শন করিতে থাকেন। পরবর্তী আলোচনাতেই আমরা ইহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিব।

নীলকর সম্প্রদায় তথা বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজের বিবেচনায় ছোটলাট সার্ জন পিটার গ্রাণ্টের মত বাংলা-সরকারের পূর্বতন সেক্রেটারী, বড়লাটের আইন-সভায় বাংলার প্রতিনিধি ও নীল কমিশনের সভাপতি ডব্লিউ. এল. সিটন-কারও পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধেও তাহারা ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। শীঘ্রই এইরূপ একটি ছিদ্র উপস্থিত হইল। কিন্তু আর একজন মহামান্য ব্যক্তি পুরোভাগে আসিয়া পড়ায় তাহারা তাঁহার নাগাল পায় নাই। তথাপি নীলকর-বন্ধু 'বেঙ্গল হরকরা' ১৮৬১, ২৮শে মে তারিখে এমন উৎফুল্ল চিত্তে নিম্নের সংবাদটি দিলেন যেন বহু দিনের অন্বেষণের পরে ইপ্সিত শিকার মিলিয়াছে:

"We understand that Mr. Grion-Karr avows that it was by his order, the pamphlet was circulated, and we trust that no technicalities will prevent his being prosecuted in the Supreme Court and that no false tenderness or Court favour may keep him from being dismissed that service which he has so foully disgraced."

এখানে যে পুস্তিকাখানির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা আর কিছুই নহে—দীনবন্ধু মিত্র কৃত নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ। নীলকর সম্প্রদায় তথা বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজ সিটন-কারকে আইনের বেড়াজালে ফেলিতে না পারায় কতকটা মনঃক্ষুণ্ণ হইল। তবে সিটন-কার সম্বন্ধে ভারত-সরকারের আরম্ভ হইতে তাঁহাদের দ্বারা অনুরূপ ব্যবস্থা করাইতে কিরূপে সমর্থ হইয়াছিল একটু পরেই তাহা বলিতেছি। ইতিমধ্যে একটি ভূমিকাসম্বলিত নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ লইয়া বেসরকারী ইউরোপীয় মহলে ভীষণ চৈ-চৈ' উপস্থিত হইল। তাহাদের মুখপাত্র রূপে ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স এণ্ড কমার্শিয়াল এসোসিয়েশন অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার পক্ষে সেক্রেটারি ডব্লিউ. এফ. ফারগুসন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ও ২৬শে মে পর পর দুইখানি পত্রে বাংলা-সরকারের নিকট জানিতে চান যে, এরূপ মানহানিকর পুস্তিকা তাঁহাদের অনুমোদনে ("Under their Seal and Frank") দেশ-বিদেশে বিলি হইয়াছে কিনা। বাংলা-সরকারের সেক্রেটারী ই. এইচ. লাশিংটন সরকারী অনুমোদনে পুস্তকখানি বিলি হওয়ার কথা জানাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজ ইহাতে মোটেই খুশী না হইয়া একদিকে যেমন ভারত-সরকারের নিকট অভিযোগ-পত্র প্রেরণ করিল অন্যদিকে কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টে মুদ্রাকর সি. এইচ. ম্যাথুয়েলের বিরুদ্ধে ৬ই জুন তারিখে মামলা রুজু করিয়া দিল। পরবর্তী ১১ই জুন বিচারে ম্যাথুয়েলের দশ টাকা মাত্র জরিমানা হইল। এইরূপ কম জরিমানা হইবার কারণ ম্যাথুয়েলের উকীল পুস্তক-

প্রকাশক পাদ্রী জেমস লঙের ইচ্ছা অনুসারে তাঁহার নাম আদালতে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহার পরই সত্যকার মোকদ্দমা সুরু হইল। পাদ্রী লঙের নাম প্রকাশিত হওয়ায় নীলকর সমাজ কম উৎফুল্ল হয় নাই। কারণ আলেকজাণ্ডার ডাফ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সকল পাদ্রীই নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া নিরীহ অত্যাচরিত রায়তদের পক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। লঙের বিরুদ্ধে বাদী স্বয়ং দাঁড়াইলেন 'ইংলিশম্যান' কাগজের মালিক-সম্পাদক এণ্ডারসন বেট এবং উপরোক্ত এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ডব্লিউ. এফ. মাকডনল। লঙের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ উপস্থিত করা হইল। প্রকাশকের ভূমিকায় তিনি নীলকর-বন্ধু ইংরেজ-পরিচালিত দুইখানি পত্রিকার সম্পাদকদের অর্থের বিনিময়ে নীতি বিসর্জন দিয়া খ্রীষ্টান-বিগর্হিত কার্য্য করার জন্য নিন্দা করিয়াছিলেন। একথা তখন সকলেই জানিতেন যে, 'ইংলিশম্যান' ও 'বেঙ্গল হরকরা'ই সর্ব্বতোভাবে নীলকরদের সমর্থন করিয়া চলিত। একারণ প্রথমোক্ত পত্রিকার মালিক-সম্পাদক লঙের বিরুদ্ধে মানহানিকর উক্তির জন্য বাদী হইলেন। নীলদর্পণে নীলকরদের অপকীর্ত্তির কথা সুব্যক্ত, কাজেই উহার ইংরেজী অনুবাদে তাহাদের মানহানি হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। তাই তাঁহাদের পক্ষে দ্বারকানাথ দ্বিতীয় অভিযোগ আনিলেন। সুপ্রিম কোর্টে ১৮৬১ সালের ১৯শে, ২০শে এবং ২৪শে জুলাই সার্ মর্ডাণ্ট ওয়েলস এজলাসে জুরীর সম্মুখে পাদ্রী লঙের বিচার সুরু হইল। উভয় পক্ষের সওয়ালজবাবের পর বিচারপতি ওয়েল্‌স জুরিদের যখন মামলার বিষয়বস্তু বুঝাইয়া দিতেছিলেন তখন উপস্থিত কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহার অভিমত কোন্ দিকে। তাঁহার বক্তৃতায় অনুচিত পক্ষপাত অতি সুস্পষ্ট রূপেই ধরা পড়িয়া গেল। বক্তৃতাকালে বাঙালীদের গালি দিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই,তবে বিচার সম্পর্কীয় মুদ্রিত রিপোর্টে তাহা স্থান পায় নাই। জুরীগণ একবাক্যে পাদ্রী লঙকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। বিচারপতি ওয়েল্‌স তাঁহাদের মত গ্রহণ করিয়া লঙের প্রতি এক সহস্র টাকা জরিমানা ও এক মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। বাঙালী-প্রধানগণ বরাবর লঙের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ তাঁহার উকীলের ব্যয় এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ জরিমানার টাকা দিয়া দিলেন। কালীপ্রসন্ন টাকা লইয়াই আদালতে গিয়াছিলেন।

পাদ্রী লঙের বিচার-প্রহসন শেষ হইল। তিনি একজন ভারতীয়কে দিয়া নীলদর্পণের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ইনি হইলেন স্বনামধন্য কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইহার জন্য তিনিও কম দুঃখভোগ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন:

"ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত সোসনে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি সেই দায়ে তাঁহার জীবন-নির্ব্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" —'বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী'—"বিবিধ," পৃঃ ৭৮।

এখানে প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিচারপতি সার্ মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌সের অনুচিত পক্ষপাত এবং বাঙালীদের উপর অযথা গালিবর্ষণে বাঙালীসমাজে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। নেতৃবর্গ ভারত-সচিব সার চার্লস উডের নিকট ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া আবেদন করিয়াছিলেন। বাঙালীগণ এবিষয়ে কিরূপ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছিল ১৪ই এপ্রিল ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশ' পাঠে তাহা জানা যায়:

"লঙ সাহেবের বিচারকালে স্যর মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স যাবতীয় বাঙ্গালীকে গালি দিয়াছিলেন বলিয়া এতদ্দেশীয় মনুষ্যের প্রধান লোক একত্র হইয়া সভাবাজারে রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে এক সভা করিয়া সর মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌সের দুঃস্বভাবের বিষয় গ্রেট সেক্রেটারির গোচর করিলেন। প্রায় ২০,০০০ লোক ঐ আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেন। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই, আবেদন পত্র সোসনে মুদ্রিত হইয়া স্বাক্ষরার্থ প্রায় একমাস চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হয়, ইংলিশম্যান ও হরকরা সম্পাদক এক খণ্ডের জন্য ৫০০ টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, এরূপ একটা হইয়াছিল যে তথাপি কেহ এক খণ্ড দেন নাই। স্যর চার্লস ইক আবেদনের উত্তর দানকালে মর্ডাণ্ট ওয়েল্‌সকে সাবধান করিয়া দিলেন।"

এখন সিটন-কার সম্বন্ধে অবলম্বিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিব বেলগকারী ইউরোপীয় সমাজ তাঁহার উপর কিরূপ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কিরূপ হীন ধারণা পোষণ করিত 'হরকরা'র উক্তি হইতে আমরা তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। আইনের নাগালের মধ্যে তাঁহাকে না পাওয়ায় তাহারা ভারত-সরকারের দ্বারস্থ হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে নীল বিষয়ক নীতি সম্পর্কে ভারত-সরকার ও বাংলা-সরকারের মধ্যে কতকটা বাদানুবাদ ও মতানৈক্য উপস্থিত হয়। নীলকর-জমিদারদের গাত্রদাহ-আদায় লইয়া ইহার সূচনা হয়। ভারত-সরকারের অজ্ঞাতসারে নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ প্রচার, লঙের বিচার প্রভৃতি ব্যাপারে উভয়ের ভিতরে সন্দেহের ভাব আরও বাড়িতে থাকা খুবই স্বাভাবিক। ভারত-সরকার উক্ত পুস্তিকা প্রচার সম্পর্কে বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজের অভিযোগ-পত্র পাইয়া স্বভাবতঃই ছোটলাট সার্ জন পিটার গ্রাণ্টের নিকট ব্যাপারটি আনুপূর্ব্বিক জানিতে চাহিলেন। গ্রাণ্ট ১৮৬১, ১৯শে জুন সমুদয় ব্যাপার বিবৃত করিয়া লিখিলেন যে, নীল সম্পর্কে বাঙালীদের সত্যকার মনোভাব ইংরেজ সম্প্রদায়ের গোচরীভূত করাইবার জন্যই নীলদর্পণের অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয় এবং ইহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ অনুমোদনও ছিল। কিন্তু ইহা প্রকাশিত হইলে সরকারী পুস্তিকা হিসাবে সরকারী ছাপ দিয়া বিলি করা হইবে এরূপ তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে তাঁহার অজ্ঞাতসারেই বাংলা গবর্ণমেণ্টের তৎকালীন সেক্রেটারি সিটন-কার এইরূপ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আলোচনার পর সিটন-কার তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন। বহু শত পুস্তিকা নানা স্থানে প্রেরিত হওয়ায় তখন আর ভ্রম সংশোধনের উপায় ছিল না।

ইহার পর ২৪শে জুলাই বিচারে লঙের কারাদণ্ড হইয়া গেল। বিচার-কালে স্বতঃই বিভিন্ন স্থলে সরকারী ছাপ দিয়া পুস্তক প্রেরণের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই সময় বাংলা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি ছিলেন ই. এইচ. লাশিংটন, সিটন-কার ছিলেন বাংলা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বড়লাটের আইন-সভার সদস্য। বিচার-সমাপ্তির পর দিনই সিটন-কার মহোদয় ছোটলাটের নিকট পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিলেন এবং পুনরায় বাংলা গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি পদে ফিরিয়া যাইবার অধিকার ত্যাগ করিলেন। ছোটলাট তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিলেন না। সিটন-কার ২৯শে জুলাই 'ইংলিশ-ম্যান' পত্রিকায় নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশ ও প্রচারে তাঁহার যোগাযোগ ও দায়িত্বের কথা সবিস্তারে বিবৃত করিয়া এক্‌খানি পত্র লিখিলেন। ঐ দিনই বাংলা-সরকারকেও তিনি পোলাপুলিভাবে সব কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। ছোটলাট ভারত-সরকারকে এই পত্রখানি প্রেরণকালে লিখিলেন যে, সিটন-কার পদত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সাধারণ স্বার্থের খাতিরে তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। ভারত-সরকার কিন্তু ছোটলাট গ্রাণ্ট এবং সিটন-কার সাহেবের যুক্তিতর্ক গ্রহণ না করিয়া ১৮৬১, ৮ই আগষ্ট তারিখে একটি দীর্ঘ প্রস্তাবে সিটন-কারের কার্যের তীব্র নিন্দাবাদ করিলেন। তাঁহাদের মতে ভারত-সরকারের অজ্ঞাতসারে, এমনকি ছোটলাটকেও না জানাইয়া বাংলা-সরকারের সেক্রেটারির পক্ষে সরকারী ছাপ দিয়া এরূপ বিতর্কমূলক বিষয়ের পুস্তক প্রচার নিতান্তই গর্হিত কর্ম্ম হইয়াছে এবং তিনি ইহার উপযুক্তরূপ ত্রুটি স্বীকারও করেন নাই। সুতরাং তিনি

"Chargeable, not only with an unwarrantable assumption and indiscreet exercise of an authority which did not belong to him, but with a neglect of duty which it is difficult to reconcile with motives that led him to such an assumption."

অর্থাৎ, যে কর্তৃত্ব তাঁহার নাই তাহাই তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছেন এবং যে উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই এরূপ করুন না, ইহা দ্বারা তিনি কর্ত্তব্যে অবহেলাই করিয়াছেন। তাই সপরিষদ বড়লাট আদেশ দিলেন যে,

"When Mr. Seton-Karr shall no longer have to discharge the duties of his present position in the Legislative Council, he should not be allowed to return to the office of the Secretary to the Government of Bengal."

অর্থাৎ, সিটন-কার আইন-সভার সদস্য থাকিতে পারিবেন না, তাঁহাকে বাংলা-সরকারের সেক্রেটারি পদেও ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

ভারত-সচিব সপরিষদ বড়লাটের মতেই মত দিলেন বটে, তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও লিখিলেন যে, সিটন-কারের মত একজন যোগ্য কর্ম্মচারীকে যেন অন্য কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করা হয়। তাঁহারই কথায়

"So able and distinguished a public servant as Mr. Seton-Karr has shown himself to be, will, on his ceasing

to sit in the Legislative Council, be placed in some suitable situation where the public may have the benefit of his service."

ইহার পরেই সিটন-কার কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হইয়াছিলেন। তিনি শেষে ভারত-সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারি পদেও কার্য করেন।

এই সময়ে ভারত-সরকার নীলকরদের কিরূপ পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন আর একটি ব্যাপার হইতেও তাহা বেশ বুঝা যায়। নীলকর-জমিদারগণ প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা বাকিতে আদায় করিতে পারে নাই। এ বাবদ বাকি খাজনার দায়ে যাহাতে জমিদারি নীলাম না হইয়া যায় তাহার উপায় করিয়া দিবার জন্য তাহারা ভারত-সরকারের দ্বারস্থ হয়। সরকার তাহাদের নিতান্তই অনুগত হইয়া বাংলা-সরকারকে এই মর্মে আদেশ দিলেন যে, রাজস্ব মিটাইয়া দিবার জন্য বাংলার রাজকোষ হইতে তাহাদিগকে যেন প্রয়োজনীয় অর্থ ধার দেওয়া হয়! এই আদেশ কর্ণগোচর হইবা মাত্র ভারত-সচিব সার্ চার্লস উড ইহা বাতিল করিয়া দেন। এই সময় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লেখেন:

"This was a course so unprecedented, so novel, and so completely demonstrative of the partiality or weakness of the Government, that it had but reach the notice of the Secretary of State to be countermanded. Sir Charles Wood at once saw through the error, and sent out strict orders prohibiting the course adopted by Government."

আর একটি বিষয় উল্লেখ না করিলে নীল-প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। নীল-কমিশনে সাক্ষ্যদানকালে পাদ্রী লি. রমণ্ডেলস্ বলেন যে, হরমণি নাম্নী জনৈক কৃষক-বালিকাকে কৃষ্ণনগরের কাহিনীটা নীলকুঠিতে অপহরণ করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এই নীলকুঠির ভারপ্রাপ্ত সাহেবের নাম ছিল আচিবাল্ড হিল্‌স। কমিশনের সভাপতি সিটন-কার কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট ডব্লিউ.-জে. হার্শেলকে দিয়া অনুসন্ধান করান। হার্শেল অনুসন্ধানে হরমণির অপহরণ ব্যাপার যে সত্য তাহা বুঝিতে পারেন, কিন্তু ইহার জন্য দায়ী কে তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা যাচাই করিয়া হিল্‌স সাহেবকেই দোষী করেন। ইহাতে হিল্‌স সাহেব 'পেট্রিয়ট'-সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে দশ হাজার টাকার খেসারত দাবি করিয়া চব্বিশ পরগণার প্রধান সদর আমীনের এজলাসে মানহানির মামলা আনেন। নীল-আন্দোলনে হরিশ্চন্দ্র যেরূপ নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাহারা তাঁহার উপরও অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিয়াছিল। মোকদ্দমা রুজু হইবার পরই হরিশ্চন্দ্র ১৮৬১, ১৪ই জুন মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু হিল্‌স সাহেব ছাড়িবার পাত্র নন, হরিশ্চন্দ্রের সদ্য বিধবা পত্নীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা লড়িতে বদ্ধপরিকর হইল। হরিশ্চন্দ্রের পত্নী আর মোকদ্দমা পরিচালনে রাজি হইলেন না, হাজার টাকা খেসারত দিয়া হিল্‌স সাহেবের সঙ্গে আপোষ করিয়া লইলেন। এইরূপে বঙ্গদেশে নীল আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ভারত-সরকারের সহায়ে নীলকর তথা বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজ আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু নীলচাষ তথা নীল-ব্যবসার উপর অশনিপাত হইল। নীল ইহার পর আর মাথা তুলিতে পারে নাই।*

---

* বর্তমান প্রবন্ধ রচনায় নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি:

(১) *History of Indigo Disturbances in Bengal*—Lalit Chandra Mitra. 1907.

(২) *The History of the Nil Darpan, with the State Trial of the Rev. J. Long, etc.* Calcutta. August 29th 1898.

(৩) *Bengal under the Lieutenant-Governors, Vol. I*—C. E. Buckland. 1901.

হোমাগ্নি

(উপন্যাস)

শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় ঘণ্টা শেষ হইবার ঘণ্টা বাজিল। চন্দ্রবাবুর ক্লাস আছে, ফার্ষ্ট ক্লাসে ইংরাজী কবিতা। আনন্দময়কে স্কুল দেখাইয়া অফিসে ফিরিতে অনুরোধ করিয়া তাকিলেন—কেমন দেখলেন বলুন। আসুন অফিসে এসে বসে বলবেন। কিন্তু আনন্দময় চন্দ্রবাবুর অনুরোধ এড়াইয়া গেলেন। কেন? তাঁহার কি ভাল লাগিল না? বোধ হয় জগজ্যোতিকে প্রহারের দৃশ্যে তিনি আহত হইয়াছেন। কিন্তু তাহাকে প্রহার করিয়া শাসন করা ভিন্ন শাসন করার আর কোনও পথ তাঁহার ছিল না। আর অন্য কি ভাবে ছেলেটিকে শাসন করা যাইত? বুঝাইয়া কি তাহাকে ফেরান যাইত? বুঝাইতে গেলে চন্দ্রবাবুকে অশক্ত মনে করিয়া বাড়ী ফিরিয়া দ্বিগুণ অত্যাচার করিত মা-বাপের উপর। আর কোন পথ ছিল না। তবু মন হইতে গোপন কাঁটার মত জিজ্ঞাসাটা গেল না। ইংরাজী কবিতার বই ও ডিক্সনারী হাতে তিনি উঠিয়া পড়িলেন, ভাবিতে ভাবিতেই উঠিলেন। ভাবিতে ভাবিতেই কখন ক্লাসে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন তাহা তাঁহার খেয়াল নাই। চমক ভাঙিতেই দেখিলেন ছেলেরা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি তাহাদের বসিতে বলিলেন।

পড়ান আরম্ভ হইল। পড়াইতেছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা—দি ডাফোডিল্‌স্। প্রথমেই গোটা কবিতাটা চন্দ্রবাবু রিডিং পড়িলেন। আবৃত্তির পর কবিতাটীর ব্যাখ্যার পূর্বে কবির সম্বন্ধে একটু, লেক ডিষ্ট্রিক্ট সম্বন্ধে একটু বলিয়া লইলেন তারপর প্রতিটি লাইন ধরিয়া ধরিয়া মানে করিয়া বুঝাইয়া সম্পূর্ণ ব্যাখ্যায় গেলেন। কথার পর কথার অর্থ [illegible] কবিতা পড়াইতে তাঁহার ভাল লাগে না। তবু কি করিবেন, ছেলেদের পাশ করাইতে হইবে তো? তবু পড়াইতে পড়াইতে স্কুলপাঠ্যের বানান-মানে-বোধিকার গণ্ডী পার হইয়া কাব্যের আনন্দলোকে আপনার অলক্ষ্যে কখন উত্তীর্ণ হইয়া যান; সঙ্গে সঙ্গে আপনার হৃদয়ের আনন্দ-ভাণ্ড পূর্ণ হইয়া ছাত্রদের মধ্যেও আনন্দধারা বর্ষিত হয়। যাহার যেমন শক্তি গ্রহণ করে। আজও কখন সেইখানে ছাত্রদল সমেত পৌঁছিয়া গিয়াছেন। শ্লোকের পর শ্লোকে সে আনন্দ ঘনতর হইয়া উঠিতেছে। সবল কণ্ঠের স্বচ্ছন্দ প্রাণময় আবৃত্তিতে ঘর ভরিয়া গিয়াছে। তিনি আবৃত্তি করিতেছেন—

> For oft, when on my couch I lie
> In vacant or in pensive mood,
> They flash upon that inward eye
> Which is the bliss of solitude;

কবে কোথায়, কোন পাহাড়ের পায়ে গাছের ছায়ায়, কোন জলার গায়ে সোনার বর্ণ ফুল ফুটিয়াছিল, তাহারই অর্থহীন মাধুরীতে কবি যেদিন মুগ্ধ হইয়াছিলেন; সে বহুদিনের কথা। হঠাৎ নির্জন মুহূর্তে সেই অর্থহীন অপরূপ দৃশ্য মনের আকাশে সোনার ছায়া ফেলিল, সে দৃশ্য কি অমৃত তাঁহাকে দিয়াছিল, তাহা কবি বুঝিলেন।.....পড়াইতে পড়াইতে তাঁহার কুইলাব সাহেবকে মনে পড়িল। এই কবিতা তিনিও পড়াইয়াছিলেন। যেদিন পড়াইয়াছিলেন সেদিন বহুদূরবর্তী পর্ব্বত-হ্রদ-বেষ্টিত লেক প্রদেশের ছবি স্পষ্ট হইয়া চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই বিদেশী অপরিচিত পুষ্পযূথের স্বর্ণবর্ণ ও অপূর্ব্ব মধুগন্ধও পাইয়াছিলেন যেন! আজও এই কবিতা পড়াইবার সময় সেই সেদিনের প্রত্যক্ষ-করা দৃশ্য ও গন্ধের স্মৃতি এই পুষ্পযূথের স্মৃতির মতই মনোলোককে আকুল করিয়া তোলে। চন্দ্রবাবু ভাবেন—ঠিক তেমনি করিয়াই কি ইহাদের মনে আজ সেই ছবি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে না? ভাবীকালে কি এই স্মৃতি হইতে তাঁহার মত উহারা আনন্দ পাইবে না?

ঘণ্টা পড়িল। পড়া শেষ করিতে হইবে। আরও কয়েক মিনিট পড়াইয়া বক্তব্য যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত করিয়া সেদিনের মত পড়ান শেষ করিলেন।

অফিসে ফিরিলেন অতি লঘু মন লইয়া। পড়াইতে যাইবার সময় যে একটা জিজ্ঞাসা গুরুভাবে হইয়া বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল তাহার স্থলে একটি মিষ্ট স্নিগ্ধভাব সারা

মনোলোক আপ্লুত। তাহারই প্রভাবে মুখে একটি অতি প্রচ্ছন্ন হাসি খেলা করিতেছে। তাঁহার মুখর হইতে ইচ্ছা হইতেছে। অফিসে ঢুকিয়াই চঞ্চলভাবে বই দুইখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া চেয়ারের উপর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। পাশের লাইব্রেরী ঘরে কি একটা উত্তেজিত আলোচনা চলিতেছে। চিত্তবাবু, তারণবাবু, হরেরামবাবুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছেন। অকস্মাৎ কি কৌতূহল হইল তিনি উঠিয়া পাশের ঘরে গেলেন। এ তাঁহার পক্ষে ব্যতিক্রম। তিনি সমস্ত কাজ করেন ধীরে সুস্থে, ভাবিয়া চিন্তিয়া। কোথাও কোন আলোচনা চলিলে, এমন কি তাঁহার পাশেও যদি চলে, তিনি আহ্বান না পাইলে কথা বলেন না।

পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়াইতেই সকলেরই উচ্চ কণ্ঠস্বর সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া গেল। তিনি হাসিতে হাসিতেই প্রশ্ন করিলেন—কি মশাই, এত উত্তেজনা কেন? ব্যাপার কি? তাঁহার প্রশ্নে হরেরামবাবু ও চিত্তবাবু এক মুহূর্তের জন্য বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহারা দীর্ঘদিনের পরিচয়ে চন্দ্রবাবুর স্বভাবের খবর জানেন। কেবল জানেন না তারণবাবু। তিনিই উত্তেজিত হইয়াছেন সর্বাধিক। তিনিই বলিলেন—বলুন তো মাষ্টার মশাই, অকারণে মারবার অধিকার কারও আছে কি না? সে ছাত্র হতে পারে বা যে কেউ হতে পারে। কাউকে বিনা অপরাধে মারা সঙ্গত কি না?

চন্দ্রবাবুর লঘুচিত্ততা কোথায় উড়িয়া গেল। মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তাঁহার চলিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু আর উপায় নাই। গম্ভীরভাবে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন। তারণবাবু তাঁহার আকস্মিক মুখভাব পরিবর্তনে একটু বিচলিত হইয়া গেলেন। তবু বলিলেন—হরেরামবাবু সেকেণ্ড ক্লাসে এই ঘণ্টায় সংস্কৃত "ট্রানস্লেশন করাচ্ছিলেন। হরিনারায়ণ বলে একটি ছেলেকে একটি ট্রানস্লেশন জিজ্ঞাসা করলে সে বলতে পারেনি। তার পাশেই বসেছিল রামপদ ঘোষ। রামপদকে জিজ্ঞাসা না করতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে ট্রানস্লেশনটির উত্তর দেয়। তাই হরেরামবাবু বলেন যে—থাম, থাম, বারবার ফেল করে লজ্জা করে না? খুব বাহাদুরী দেখাতে চাস, না? বলে উঠে তাকে দু'চার ঘা মেরেছেন। তাই আমি বলছি—তিনি ঠিক করেন নি! কারণ কোনো ছাত্রের মনে কটু কথা বলে অতি কঠিন আঘাত দেওয়ার অধিকার কোন শিক্ষকের আছে বলে আমি মনে করি না। তার ওপর যে ক্ষেত্রে ছাত্রটি নিরপরাধ।

চন্দ্রবাবুর মুখ আরও ভারী হইয়া উঠিল। তারণবাবুর সমস্ত অভিযোগটা যেন তাঁহারই বিরুদ্ধে আসিয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল। এই জিজ্ঞাসাই তো সারাদিন নিজের মনে মনে চলিয়াছে। কিন্তু সমাধান হইল না তো? যদি বা ভুলিয়া গিয়াছিলেন তো আবার ভিন্নরূপে ফিরিয়া আসিয়া মন জুড়িয়া বসিল। তারণবাবু বলা শেষ করিলেন—ছেলেটির বয়স হয়েছে। ছেলেটি নাকি ক্লাসেই কেঁদে হরেরামবাবুকে বলেছে যে আপনার কাছে এই নিয়ে কমপ্লেন করতে আসবে। অসহিষ্ণুভাবে চন্দ্রবাবু বলিয়া উঠিলেন—দেখুন তারণবাবু, আপনার যুক্তির সারবত্তা আমি মানি। আপনি এ পথে নতুন এসেছেন। তাই একটা কথা আপনাকে বলে দি। ডিসিপ্লিন বলে একটা জিনিস আছে। ক্লাসের মধ্যে ছাত্রদের সমস্ত ব্যবহারের দায়িত্ব যেমন শিক্ষকের সম্পূর্ণভাবে, তেমনি তাঁর আদেশের বা প্রচলিত কোন নিয়মের লঙ্ঘনের অপরাধে, শিক্ষকের শাস্তি দেবার অধিকারও তেমনি অখণ্ড। কাজেই মনোবেদনার কথাটা যত বড়ই হোক, তার চেয়ে বড় কথা ডিসিপ্লিন রক্ষার। এ বিষয়ে হরেরাম অন্য কিছু করতে পারতেন বলে আমি মনে করি না। কথা শেষ করিয়া চন্দ্রবাবুর মনে হইল যেন আনন্দময়ের সমস্ত যুক্তিকে যেন আনন্দময়ের সামনেই খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলেন।

তারণবাবু মাথা নামাইয়া বসিয়াছিলেন। চিত্তবাবু ও হরেরামবাবুর পক্ষ হইয়া চন্দ্রবাবু তর্ক করিলেও এবং সে তর্কে তাঁহাদের জয় হইলেও চন্দ্রবাবুর এই বিক্ষুব্ধ মূর্তির সামনে তাঁহারা কেমন যেন কাট হইয়া গেলেন। কথা শেষ করিয়া চন্দ্রবাবু আর কোন দিকে চাহিলেন না। উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

টিফিনের ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই রামপদ ঘোষ আসিয়া চন্দ্রবাবুর সামনে দাঁড়াইল। চন্দ্রবাবু ভাবিয়াছিলেন ব্যাপারটা ঐখানেই মিটিয়া গেল। তাই চন্দ্রবাবু ইহার জন্য প্রস্তুত

ছিলেন না। ছেলেটির সভাই বয়স হইয়াছে। প্রায় প্রতি ক্লাসেই এক বৎসর করিয়া ফেল করিয়া দুই বৎসর করিয়া পড়িয়া, গতবার সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়াছে। তার পূর্ব্ব বৎসর আর প্রমোশন পায় নাই। বড় জমিদারের ছেলে, অত্যন্ত ফিটফাট হইয়া ফুল বাবুটি সাজিয়া থাকে। স্বভাবটি অত্যন্ত শান্ত, ধীর। ক্লাসে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। সঙ্গীসাথী বড় একটা কেহ নাই। প্রাইভেট মাষ্টার আছে, তাহা সত্ত্বেও পড়াশুনা হয় না। ক্লাসে পিছনের বেঞ্চে বসিয়া থাকে। প্রথম প্রথম পড়াশুনা করিত, এখন বার বার ফেল করিয়া আর পড়াশুনায় মন দেয় না। আজ হঠাৎ কি উৎসাহ হইয়াছিল, ট্রান্সলেশনটা মনে আসিতেই বলিয়া দিল। ভাবিয়াছিল মাষ্টারমহাশয় খুব তারিফ করিবেন। তাহার পরিবর্ত্তে জুটিল প্রহার ও অন্তরজ্ঞেণী তিরস্কার। সে আসিয়া যখন চন্দ্রবাবুর সামনে দাঁড়াইল, তখন তাহার ফিটফাট বেশভূষা কেমন অগোছাল হইয়া গিয়াছে। চোখ দুইটা লাল, কেশগুলি ঝুলিয়া আছে। চন্দ্রবাবুর কাছে কথা বলিতে গিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার পর তারণবাবুর কাছে চন্দ্রবাবু যাহা শুনিয়াছিলেন, ছেলেটি তাহারই প্রতিধ্বনি করিল।

সমস্ত শুনিয়া চন্দ্রবাবু গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন—তোমার একটু লজ্জা হলো না আমার কাছে একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কম্প্লেন করতে আসতে? একে তুমি ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করেছ, দোষ তোমার। সেই দোষের শাস্তি দিয়েছেন তিনি ঠিকভাবে। তুমি কি মনে কর যে এটা তোমার খুব বাহাদুরীর কাজ হচ্ছে?

ছেলেটি অভিমানাহত স্বরে প্রতিবাদ করিল—স্যার, আমি কি ইচ্ছে করে ফেল করি? যে শক্তি আমার নাই, সে অভাবের জন্যে কি আমি দায়ী? আর সেই জন্যে তিনি আমাকে অপমান করবেন?

চন্দ্রবাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন—অপমান? অপমান তুমি কাকে বল? তোমাকে একজন শিক্ষক যদি তিরস্কার করেন তা হ'লে তোমার অপমান হয়? আদুরে দুলাল হয়েছ? খুব বড় বড় কথা বলতে শিখেছ দেখছি! তিনি উন্মাদের মত প্রহার আরম্ভ করিলেন। বেশ কয়েক ঘা প্রহার করিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—যাও, চলে যাও, get out!

ছেলেটি কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। তিনিও অন্য দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। চাকর আসিয়া আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। ছেলেটিকে প্রহার করিয়া অবধি চন্দ্রবাবুর মনটা বড়ই তিক্ত হইয়া আছে। বিকালের দিকে একটা ক্লাস ছিল। সেটা কোন রকমে সারিয়া আসিয়া সেই যে চৌকিতে আসিয়া বসিয়াছিলেন আর উঠেন নাই। বার বার জগজ্যোতি ও রামপদর বেদনাহত করুণ দুইটি মুখ অন্ধকারের মধ্যেই চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতেছিল।

এই বিষণ্ণ বেদনাবোধের সহিত আরও একটা তিক্ততা জড়িত হইয়া রহিয়াছে। আনন্দময়ের স্পষ্ট অথচ অতি ইঙ্গিতময় প্রতিবাদ, আর তারণবাবুর মতামত। কিন্তু ছেলেদের শাসন করিতে গিয়া প্রহার না দিয়া উপায় কি? প্রায় পনর বৎসর তিনি শিক্ষকতা করিতেছেন। ইহার মধ্যে ছেলেদের রাগ মানাইবার, দোষ শোধরাইবার, সৎ পথে চালিত করিবার বহু বিচিত্র ও বিভিন্ন পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কোনটাই সফল হয় নাই। শেষকালে এই আজিক ও চিরাচরিত প্রথা অবলম্বন করিয়াই তত্ত্ব ফল পাইয়াছেন। কিন্তু তবু কোথায় ইহার পিছনে একটা বেদনাবোধ, একটা অক্ষমতা রহিয়া গিয়াছে, তাহা কোন ছেলেকে প্রতিবারই প্রহারের সময় তিনি উপলব্ধি করেন। অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারা দুই পথে চলিয়া মনে অবিরাম একটা বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। তিনি অত্যন্ত অসহায়ের মত ভাবেন—অন্য জনের তো বলিয়া দিয়াই, সমালোচনা করিয়াই খালাস। কিন্তু সমস্ত গণ্ডগোল যে তাঁহাকেই পোয়াইতে হয়। তাঁহার ঐ প্রহারের মহৌষধ প্রয়োগ না করিয়া উপায় কি! অন্য পথ কৈ? ইহাদের শাসনের, ইহাদের ঠিক পথে চালাইবার ভিন্ন পথ, ভিন্ন পদ্ধতি কে জানে?

আজিকার দিনটা বড় খারাপ গেল। তারণবাবুকে যে তিরস্কারটা করিয়াছেন তিনি জানেন সেটা তিনি নিজেকেই করিয়াছেন। সে আত্মধিক্কার ছাড়া আর কি! তিনি কি জানেন না যে মনবেদনা কাহাকেও দিতে নাই! তবু তারণ-

হঠাৎ সেই নমিত-মুখ মূর্তি তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। তাহার উপর আনন্দময়! সে তরুলোকের উপলব্ধিকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। তাঁহার মনের এই মুহূর্তের কথাটি তারাবাবু ও আনন্দময়ের কথা তিনি মানিয়া লইলেন—আর কাহাকেও কোন ছাত্রকে তিনি প্রহার করিবেন না। কিন্তু তাহা হইলে ডিসিপ্লিন! যে নিয়মানুবর্তিতা তাঁর ধ্রুব আদর্শ, তাহা একেবারে রসাতলে যাইবে যে? থাক। কিন্তু তাহা যে অসম্ভব!

তবে রামপদকে একটু সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। তাহাকে প্রহার করাটা সত্যই অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু ডিসিপ্লিনের জন্য উহার প্রয়োজন ছিল। তবু সে কি করিতেছে একবার দেখিয়া আসিবেন, দুইটা মিষ্ট কথা বলিয়া আসিবেন।

এই সময়টা বোর্ডিংএ ছেলেদের পড়াশুনা তদারক করিবার সময়। তিনি লণ্ঠনটি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন। অন্যদিন প্রথমে পাকা বোর্ডিং-এ যান, তারপর মাটির বোর্ডিং-এ, শেষকালে তারিণী বোর্ডিংএ ঘুরিয়া আসেন। আজ প্রথমেই গেলেন তারিণী বোর্ডিংএ। রামপদ তারিণী বোর্ডিংএর দু নম্বর ঘরে থাকে। এ সময়ে তিনি ঘরাসাদা গোপনে দেখাশোনা করেন। কে পড়িতেছে, না পড়িতেছে, কে কি করিতেছে, প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারিলেই সেটা দেখা যায়। ছেলেদের সহজ রূপটা দেখিতে পাইলে তাহাদের সংশোধন করিতে সুবিধা হয়। আজও গোপনে রামপদর দরজার সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। দেখিলেন অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে ছেলেটি পড়িতেছে। তারপর ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই রামপদ চমকিয়া উঠিল, তাঁহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। চন্দ্রবাবু দেখিলেন ছেলেটির মুখটি ম্লান হইয়া আছে, চোখের কোণটা যেন বসিয়া গিয়াছে, আর চোখে শঙ্কিত ভীরু অভিমানের দৃষ্টি। তাঁহার মনটা টন টন করিয়া উঠিল। একবার ইচ্ছা হইল ছেলেটির মাথায় হাত বুলাইয়া দেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সম্পূর্ণ এক অবান্তর প্রশ্ন—তোর বাবা কেমন আছে রে?

ছেলেটি বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, এ প্রশ্ন কেন? চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লইয়াই বলিল—ভাল আছেন স্যার।

—এখন আসবেন না এ দিকে?

—কৈ না তো?

—তোর পরীক্ষার জন্যে তৈরী কেমন হ'ল? এবার কিন্তু পাস করতে হবে।

রামপদ চুপ করিয়া থাকিল। এবার হয়ত পাস সে করিতে পারিবে। কিন্তু আজকার ব্যাপারের পর সে কথা বলিতে সাহস হইল না। চন্দ্রবাবু অন্য কথা পাড়িলেন। রামপদ স্বভাবত শান্ত ধীর হইলেও লেখাপড়া ছাড়া অন্য সমস্ত উৎসব-কর্মে উৎসাহী, পাওা গোছের। সরস্বতী পূজার প্রধান উদ্যোক্তা সেই।

—সরস্বতী পূজোয় এবার কেমন চাঁদা উঠবে রে?

এবার তাহার মুখ প্রচ্ছন্ন খুশি হইতে প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সে বলিল—তা অনেক হবে স্যার। যদি পাশ করিতে পারি তা হ'লে খুব করে করব স্যার।

চন্দ্রবাবু বুঝিলেন যথেষ্ট হইয়াছে। তিনি উঠিয়া পড়িলেন। আবার অতি প্রসন্ন লঘুতায় তাঁহার মন ভরিয়া উঠিয়াছে এক বিচিত্র উপলব্ধি তাঁহার মনে অকস্মাৎ মেঘান্ধকারের মধ্যে তড়িতালোকের মত জাগিয়া উঠিল। শাসন করিয়া বিশেষ করিয়া প্রহার করিয়া সংশোধন করা তিনি পরিত্যাগ করিবেন। (ক্রমশঃ)

পরাধীনতাই সমস্যা

শ্রীসুব্রতা চৌধুরী

"Middle-class unemployment" সমস্যাটা শুনে আসছি সব সময়, কারণ সমস্যা ত এই মধ্যবিত্ত লোকদের নিয়ে। ধনীদের সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠে না, প্রাচুর্যে তারা পরিপূর্ণ, তাদের সঙ্গে সব দিক থেকেই পার্থক্য। দিনমজুরদের এ প্রশ্ন উঠে না; যে ভাবেই পারে একভাবেই তারা জীবিকা সংস্থান করে নেয়। কিন্তু যত সমস্যা এই মধ্যবিত্ত লোকদের নিয়েই। বিধাতার অঢেলো কৃপা তাদের উপর বর্ষিত হয় নাই অথচ প্রেজুডিস প্রতি পদে পদে দিয়ে আসছে বাধা।

আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখলে মনে হয় বর্ত্তমান যুদ্ধ লোকের ভাগ্য দিয়েছে ফিরিয়ে। ৩০৲ টাকার কেরাণী আজ ৫০০৲ টাকায় চাকুরীয়ান, ৮০৲ টাকা যার রোজগার ছিল, আজ সে মেজর, ক্যাপ্টেন, কর্ণেল ইত্যাদি। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধ ভাগ্য ফিরিয়েছে কজনের এবং কতদিনের জন্য? দেশের কোটি কোটি নরনারীর মধ্যে মুষ্টিমেয় জন কয়েকের ভাগ্য পরিবর্ত্তনেই কি দেশের সব সমস্যার সমাধান হয়েছে। দেশে টাকার অভাব আজ নেই কিন্তু মানুষের এতবড় লোচনীয় অধঃপতন ও চরম দুর্গতির ইতিহাসও বিরল। প্রকৃতি-দত্ত দুর্ভিক্ষের উপর মানুষের হাত নাই সত্যি, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সেই ভীষণতা আজো মানুষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। কিন্তু '৪৩ সালের বাংলার যে দুর্ভিক্ষ, এতো মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ; তাই এ আরো অসহনীয়। কলিকাতার রাজপথে শীর্ণকায় অগণিত ভিখারীর দল চলেছে একটুখানি ফেনের জন্য। পরিধানে বস্ত্র নাই, পেটে অন্ন নাই সে কি বীভৎস দৃশ্য। পূর্ব্ব বঙ্গে বড় বড় সহরের অবস্থাই বা কিসে কম। সেই করুণ হৃদয়-বিদারক আর্ত্তনাদে আজো সমস্ত মনটা পীড়িত হয়ে উঠে।

অগণিত ভিখারীর এই মহাসম্মিলন অন্ন-বস্ত্রের এই হাহাকার এ শুধু পরাধীন দেশ বলেই সম্ভব। কোন স্বাধীন দেশে এ ঘটনা বিরল। চালের অভাব কি দেশে সত্যিই ছিল? বস্তা বস্তা গম চাল ভাল রক্ষকশীলদের গুদামে পচে গেছে। Black market-এ এই খাদ্য শস্য বিক্রী করে বহু ব্যবসায়ীরা আজ তাই লক্ষপতি। বস্ত্রও কি দেশে ছিল না? বস্ত্র সমস্যার সমাধান কি রাষ্ট্রের আয়ত্তের বাইরে? বস্ত্র সমস্যা মিটান কি একান্তই অসম্ভব ছিল? বস্ত্র উৎপাদনে রত দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বেঁচে থাকলে এই বস্ত্র সমস্যার কিছুটা সমাধান হতো; কিন্তু সেগুলির যে পরিণতি হলো তা ভাবলে আশ্চর্য্যই হতে হয়। সরকার পক্ষ থেকে কিছু বাজেয়াপ্ত করে এবং কিছু পুড়িয়ে নষ্ট করা হলো। বিহারেও ৩ লক্ষ টাকার খাদি নষ্ট হয়েছে এই ভাবে। কিন্তু তবু এই নিয়ে কোন প্রতিবাদ করাই চলে নাই কারণ এ পরাধীন দেশের পরাধীন জাতীর প্রতিষ্ঠান। এক মুঠো অন্নের জন্য একখানি বস্ত্রের জন্য বহু সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা যে ঘৃণিত জীবন বেছে নিয়েছে তা কারো অজানা নেই। একখানি বস্ত্রের জন্য আত্মহত্যার সংখ্যাও আজ নিতান্ত নগণ্য নয়। এ সবই শুধু সম্ভব পরাধীন জাতি বলেই, কোন স্বাধীন দেশ হলে তার ইতিহাস দাঁড়াতো অন্যরকম। সেখানে ক্ষুধার্ত্তদের সামনে বিদেশে চাল রপ্তানী এত সহজ ছিল না; বুভুক্ষুদের সামনে মিষ্টির দোকানে মিষ্টিগুলিও নিরুপদ্রবে স্তরে স্তরে এমনি সাজান থাকত না; ধনীর গৃহের আমোদ প্রমোদ মাসের পর মাস এমনি নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়াও সহজ ছিল না। কাতর কণ্ঠে দিনের পর দিন একটুখানি ফেনের জন্য আর্ত্তনাদ করেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে তারা যেতো না এত সহজে; সমস্ত দেশের উপর দিয়ে যে ক্যাপা আগুন তারা আন্‌তো ছারখার করে দিয়ে যেতো গোটা দেশটাকেই।—তারপর হঠাৎ চোখে পড়ল ভিখারীর সংখ্যা লঘিষ্টটা, কিন্তু কোথায় গেল তারা! কে তাদের ব্যবস্থা করল কি ভাবে কিছুই জান্‌তে পারা যায় নাই, কারণ এ জান্‌তে চাওয়াও যে বে-আইনী। এবারের দুর্গতি সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আজ চাটগাঁর দিকে তাকালে কি দেখা যায়। নীতি নাই, সমাজ নাই, নৈতিক বুদ্ধি নাই, কোন তন্ত্র আবেষ্টনী নাই; "লেবার কোর" সব কিছুকে আজ নিশ্চিহ্ন করে গেছে। লেবার কোর-এ যে ঘৃণিত ও কলঙ্কিত জীবন তারা কাটিয়ে যাচ্ছে, যে বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে তাদের ভবিষ্যৎ রুগ্ন বংশধরদের জন্ম দিচ্ছে, কে দায়ী হবে সেই মানিকর পরিণামের জন্য! কেউ কেউ

বলেন যুদ্ধের সময় এদেশের দুর্নীতি সর্বত্রই সৃষ্টি হয়ে থাকে, কিন্তু এ যুদ্ধ কেন বেধেছিল, কারা বাধিয়েছিল, ভারতবাসী ত চায় নাই এ যুদ্ধ। তারা জানে এ যুদ্ধের ফল বড় বিষময়, তারা জানে এ যুদ্ধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে পরাধীন ভারতকেই। কারণ গত মহাযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদের রয়েছে। কিন্তু একথা স্পষ্ট স্বীকার করার অধিকারও নেই আজ। তাই ১৯৪২ সালের বম্বেতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে—"যুদ্ধ আমরা চাই না এবং কুইট ইণ্ডিয়া" প্রস্তাবের ফলে, দেশের নেতাদের করা হল অবরুদ্ধ, ফলে দেশকে পরিচালিত করার কেউ রইলেন না বাইরে। তারপরই লাগল, দেশব্যাপী এই বিক্ষোভ, অশান্তি ও দুর্ভিক্ষ।

তারপর এখন কথা হচ্ছে, কতদিনের জন্য এই যুদ্ধ বেকার সমস্যা মিটিয়েছে? পোষ্টওয়ার (Post-War) প্ল্যান যদিও করা হচ্ছে কিন্তু এতেই কি মিটবে সমস্যা? সেই ক্যাপিটেলিজিম-এর যুগই আবার আসবে। একদল খেটে মরবে আর একদল তার ফল ভোগ করবে; একদল শোষণ করবে আর একদল শোষিত হবে; একদল বঞ্চিত আর একদল প্রবঞ্চক, ফিরে আসবে অসন্তোষ, বাধবে আবার যুদ্ধ। বিজ্ঞানের উন্নতিতে নূতন নূতন কল কারখানার সৃষ্টি হবে, মানুষ মারার নূতন নূতন সহজ পথ আরো বের হবে, কালের চাকা এমনিভাবেই ঘুরে চলবে। কিন্তু শান্তি কি থাকবে এতে? তাই ত সন্ধির ঠিক ২০ বছর পরেই এই যুদ্ধের আবির্ভাব, এবারের বিজিত ও বিজেতার মধ্যে যে ব্যবস্থা হয়েছে মঙ্গলের পথ এতেই কি সুপ্রশস্ত হবে? বিজ্ঞান হয়ত বলবে, এযুগের মানুষেরা এগিয়ে যাচ্ছে—ইভলিউসনের জোরে। কিন্তু ইভলিউসান আজ মানুষকে এমন পর্য্যায়ে এনে ফেলেছে—মানুষ চায় না এ বাহ্যিক ইভলিউসান। মানুষের আজ সব চাইতে বড় কাম্য শান্তি—মনের ইভলিউসান্।

যে দেশের মানুষের হাতে কোন ক্ষমতাই নাই, যে দেশে মানুষের চলার পথে এত বাধা, এত নিয়ম এত কানুন সেখানে সব রকম সমস্যাই এসে জটলা পাকিয়ে উঠবে, কিন্তু কোন সমস্যারই সমাধান আর হবে না। আজ অন্যান্য স্বাধীন দেশে, যেখানে শতকরা নিরানব্বইজন শিক্ষিত, সেখানে আমাদের দেশে শতকরা দশজন লোকের প্রাথমিক শিক্ষা নেই, নিজের নামটা পর্য্যন্ত তারা সই করতে জানে না। এর ব্যাখ্যা এই নয় যে ভারত কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অশিক্ষায় পরিপূর্ণ। ভারত পরাধীন, এই তার সব চাইতে বড় ব্যাধি আজ। দেশের নিরক্ষরতার জন্য দেশের লোকেরাই কি দায়ী? দুর্দ্দিন ত সব দেশেই এসেছিল—ইউরোপের ইতিহাসে ঘাটলে আদিম যুগের বর্ব্বরতার কত চিহ্ন দেখা যায়, কিন্তু স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাষ্ট্র সব কিছুকেই আজ গড়েছে নিখুঁতভাবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাগুলি যেখানে বিদেশীর করায়ত্ত সেখানে সমাজ সমস্যা, বেকার সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা, সব রকমের সমস্যাই পরাধীনতার গ্লানিতে ম্লান হয়ে থাকবে।

রাশিয়া কথা বলে

[দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হয়েছে। রুশ জাতির বীরত্বই মিত্র-শক্তিকে প্রধানতঃ জয়ী করেছে—জার্মান অধিনায়ক হিটলারের সীমাহীন দম্ভকে খর্ব করে দিয়ে—সে বিষয়ে কারও মতভেদ নাই। কী করে রুশ জাতি অপরিসীম নিগ্রহ ভোগ করেও শক্ত হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল, তার ইতিহাস বর্তমানে কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শী বা যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের লেখা থেকে। আমাদের মতো পরাধীন প্রত্যেক জাতির পক্ষে সে-সব কীর্তি-কাহিনী জানার প্রয়োজন আছে। প্রত্যেকটি ঘটনাই ইতিহাস—গল্প নয়।—সংগ্রাহক]

সাহিত্যিক ও তরকারি

কি এসে জানাল, বাজার বড্ড ঠাণ্ডা, কিছুই পেলাম না

—কি পেলে না? গোল আলু?—স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

আমি বললাম: না ফুল। বসন্তের নোতুন ফুল আনতে বলেছিলাম···

পরদিন কিছু মিলল। তাই দিয়ে সাজান হল আমার রাইটিং টেবিলখানা।

তারপর আর এক দিন। আগের মতই সে এসে জানাল, বাজার আজও ঠাণ্ডা—কিচ্ছু নেই···

এবার ফুলের তাগিদ ছিল না—ফুল আজকাল বড় একটা মিলে না বলে ফুলের চারা কিনে আনতে বলেছিলাম।

ফ্যাক্টরীতে যারা দিনের ভাগে কাজ করে, তারা ছুটির পর দলে দলে ফিরছে। অফিসে যারা কাজ করে তারাও। কিন্তু আশ্চর্য—সবারই হাতে বড় বড় কোদাল। কী ব্যাপার! তারা তো রেলের শ্রমিক নয়—রাজমিস্ত্রীও নয়, তবে?

খোঁজ নিয়ে জানলাম—যুদ্ধের সহায়তায় অসামরিক কাজে যোগ দিয়েছে তারা। মস্কৌএর সহরতলীতে বিস্তর জমি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সহরেও কিছু কিছু পাওয়া গেছে। সেখানে তারা শাকসব্জী ফলাবে—যাতে অভাবের সময়ে সহরবাসীদের খাদ্যাভাব না ঘটে।

সাধু সংকল্প।

সেদিনও ঘরের চালায় বরফ জমাট বেঁধে রয়েছে—এক ফোটা শিশির পর্যন্ত জমিতে পড়ে নি। লেখক-সমিতি থেকে আমন্ত্রণ এল—কৃষি বিভাগে নাম দিতে হবে।

আমি তো শুনে থতমত খেয়ে গেলাম।—বলে কি!

আমি জানি—লেখক-সমিতির কয়েকটি বিভাগ আছে—যেমন, কবিতা-বিভাগ, গল্প-বিভাগ, অনুবাদ-সাহিত্য-বিভাগ, সমালোচনা-বিভাগ, এমন কি এই যুদ্ধের হিড়িকে সেনা-লেখক বিভাগও খোলা হয়েছে। কিন্তু কৃষি বিভাগ? সে আবার কি? লেখার সঙ্গে কি সম্পর্ক তার?

যা হোক ব্যাপার কি জানতে গেলাম সমিতির অফিসে। একজন বৃদ্ধ—সমালোচক বলে তার সুনামও আছে—বাগ্রভাবে বক্তৃতা করছেন উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে লক্ষ্য করে: তরিতরকারি ফলানো মানে তিনি বলছেন, আপনাদের পেশীগুলোকে শক্ত করে তুলবে। জমি কোপানর চেয়ে এমন চমৎকার আরেকী বিশ্রাম আর কিছু হতে পারে না। একবার মনে করে দেখুন—লিও টলস্টয়ের কথা। তিনি কি করে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন প্রত্যেক লোককে জমিতে কাজ করতে। একবার মাটির তলায় যে বীজ ফলাবেন, মাটির উপরে যখন কুঁড়ি মেলবে, তাই দেখে শিশুর মতো দিলখোলা আমোদ পাবেন—প্রতিটি সবুজ পিস দেখে প্রাণ আনন্দে নেচে উঠবে।

বেশি বাদবিতণ্ডা করতে হয়নি; কাগজপত্রেও তেমন প্রচারের দরকার পড়ল না। স্বেচ্ছাসেবকেরা এই আন্দোলন চালাল প্রত্যেক ফ্যাক্টরীতে, প্রত্যেক অফিসে এবং প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী।

সরকার বলেছেন: নিজেদের খাদ্য নিজেরা ফলাও,—আমাদের সাহায্য কর।

সোভিয়েট জানাল: এই নাও জমি, জমি-চষার যন্ত্রপাতি, আর এই নাও শস্যের বীজ।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, এই আন্দোলনে শুধু লেখক-সমিতিই নয়—সঙ্গীত সম্মেলন, বৈজ্ঞানিক মহল, স্কুল কমিটি, ছাত্রদল, সামরিক বিভাগ, সেলাই-কারখানা, গভর্ণমেণ্ট

ডিপার্টমেন্ট, মেয়েমহল, পুলিশ বিভাগ, নগরবাসী ছোট-বড় গেরস্থ সবাই সাড়া দিয়েছে।

গভর্ণমেন্ট অফিসের টাইপিষ্ট কর্মচারীরা ছুটির পর অতিরিক্ত সময় অফিসে বসে টাইপরাইটারে টুকটাক দ্রুত হাতে চালিয়ে টাইপ করা আবেদন পত্র ছাড়ল—সোভিয়েট দপ্তরে: আমাদের অফিসে এতজন কর্মচারী, কাজেই এতগুলো কোদাল চাই, এই পরিমাণ বীজ না পেলে কিছুতেই চলবে না। অনুগ্রহ করে ব্যবস্থা করুন।

কোন কোন টাইপিষ্ট সহকর্মীকে বলছে—তুমি কি কাঁচুড় লাগাবে? আমি কিন্তু ফলাব লেটুস।

তাছাড়া পথে ঘাটে মাঝে মাঝে এধরণের কথাবার্তাও শোনা গেল—এক বন্ধু অপরজনকে বলছে: না হে, এখন আর কি বেরবার তোমার বাসায় যেতে পারব না। আমাদের কাজ আছে। জানতো, সপ্তাহে আর ছুটি নেই। কাজেই, এই ছুটির দিনটা আর বিকাল বেলার অবসর সময়টুকু ছাড়া আর ও-কাজের সময়ই-বা কোথায়?

মস্কোর ফ্ল্যাটবাড়ীর বারান্দায় (মস্কোর অধিকাংশ লোকই ফ্ল্যাটবাড়ীর বাসিন্দা) কিংবা উঠানে গেলে দেখা যায়, সবাই সেখানে মাটী কেলে তার উপর ফসল ফলাচ্ছে। বাড়ীতে কারিতে কারিতে জল ঢালছে স্ত্রীলোকেরা চারা গাছের গোড়ায়।

ফ্যাক্টরীর সামনের চত্বরে শ্রমিকরা কাজের পর কোদাল হাতে মাটি কোপাচ্ছে—জমি পরিপাটি করছে। রাতের পাহারোওলারা ইস্কিমিদেরদের মতো যন্ত্রপাতি নিয়ে ফসল ফলানো অভ্যাস করছে।

গতকালও আমি একজন লেখকের কাছে গিয়েছিলাম। শুনলাম, সে বক্তৃতা শুনতে যাচ্ছে। আমিও তাঁর সঙ্গ নিলাম। একজন নাম করা সাহিত্য-সমালোচক—তাঁর কাঁধে একখানি কোদাল—নানাভাবে কথা বলে চেষ্টা করছে অধিকাংশ আমরাও যেন জমিতে নেমে পড়ি সাহিত্য-সভার পক্ষ থেকে। —হাঁ, আমি 'শস্য ফলাও আন্দোলনে' লেগেছি, তিনি বলে গেলেন, কিন্তু আপনারা মনে করবেন না লিও টলস্টয় জমি চাষ করে গেছেন বলে আমিও একাজে নেমেছি। আমি কিন্তু তা মনে করি না। আমি চাই টলস্টয়ের মতো চমৎকার লিখতে। কিন্তু এও জানি, জমিতে ফসলই ফলবে—লেখা ফলবে না।

তবে একথাও আপনারা মনে করবেন না যে আমার বাবা চাষী ছিলেন এবং সারা জীবন চাষবাস করেই এই শহরে জীবন কাটিয়েছেন বলে একাজ আমিও করছি। তা নয়, আমার কাজ অন্য রকমের। তবে এ কাজে যে নামলাম তার কারণ, আমি জানি, একাজে একটা কোদালের ঘা প্রকারান্তরে শত্রুপক্ষের মাথায় গিয়ে লাগবে। চাষ করে এক-একটা গোলে আলু বা বাঁধাকপি ফলান মানে, অন্য কথায় বলা যায় শত্রুর বিরুদ্ধে এক-একটি গোলা তৈরী হচ্ছে। আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এক হাতে ইতিহাস লিখে যাচ্ছি, আর এক হাতে চালাচ্ছি কোদাল…

কেন—এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন?

—ওলাভি লেভিচ।

গেরিলাদের স্কুল

গেরিলাদের আড্ডায় বসে একমনে শুনছি তাদের কথা-বার্তা। খুড়ো এলুশা দলের নেতা। মাথায় পাকা চুল—সুপ্রশস্ত কাঁধ দুটি। গেরিলা দলের রীতিনীতি কায়দা-কৌশল সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা করে যাচ্ছেন:

সাবাস্ বন্ধুরা, নিজের চোখ দিয়ে নিজেকে দেখো, দেখে নিজেকে বুঝতে চেষ্টা করো। মনে রেখো, ভীরু কখনও জয়লাভ করতে পারে না—কোন কালেই না। আমাদের শক্তি কেবল সাহসে, এবং সাফল্য নির্ভর করে হঠাৎ আক্রমণের কৌশল ও তৎপরতার ওপর। তোমরা ওত পেতে বসে থাকবে ঝোপে জঙ্গলে। শত্রুরা দলে ভারি এই দেখেই যদি বন্য শশকের মতো ছুটে পালাও বা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাক তাহলে সবাই তোমাদের ঘৃণা করবে—তাছাড়া নিজেদের দলকে প্রতারণাও করা হল,—শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করা তো হলই না।—কেউ ভুলেও কোনদিন তোমার নাম মুখে আনবে না।

কিন্তু যদি তুমি ওত পেতে ঠিক জায়গায় পড়ে থাকতে পার সাহস করে—তাহলেই বাস্! সে এক মস্ত ব্যাপার! মনে কর, জার্মানরা এগিয়ে আসছে—ক্রমেই এগিয়ে আসছে… মাত্র বিশ গজ…পনের গজ…এই দশ গজের মধ্যে এসে পড়ল।

তখুনি···তাদের হকচকিয়ে দিলে পর পর রাইফেলের দন্যবহার করে। তোমার দিকে ফিরে তাকাবার অবসর পর্যন্ত পাবে না—ওরা রাইফেল ধরবে কখন? ঠিক জেনো এরই মধ্যে অনেকেই লুটিয়ে পড়েছে···

এবার তোমরা কিন্তু একটা মস্ত কাজ করে এসেছ। কমরেড্‌রা তোমাদের অশেষ সম্মান দেখাল। তখনই তোমাদের সুনাম হল। কথাটা পরিষ্কার হল তো?

—হাঁ, জলের মতো।—একজন বলল।—গেরিলা যুদ্ধের মূল-নীতি সম্পর্কে এইটুকুই ঢের। কিন্তু কথায় কাজ কি? যুদ্ধের সাফল্য কাজে দেখাতে হবে। চলো···

খুড়ো এল্যাশা লাইবেরিয়ার একজন নাম করা গেরিলা যোদ্ধা। বিশ বছর আগে দল গড়ে তিনি শ্বেতজাতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তখন থেকে তাঁর খুব খ্যাতি। প্রত্যেক লোক তাঁকে নামে ডাকে চেনে। এখন তাঁর বয়স ৫৫ বৎসর। এ বয়সে আবার পুরানো কাজে নেমেছেন। তিনি শুধু দলই গড়েন নি—সর্বসাধারণের জন্যে তিনি গেরিলা 'যুনিভারসিটি' খুলেছেন—যাতে এই গোপন যুদ্ধ-কৌশল শিখে স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় দাঁড়াতে পারে। এই 'যুনিভারসিটি'তে তিনি নিজের রীতি ও ধারা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং কখন কি করে কি করতে হয় সে-বিষয়ে বক্তৃতাও করেন। তাছাড়া হাতে-কলমেও শিক্ষা দেন।

সময় সময় তিনি ছাত্রদের নিয়ে গোপনে বেরিয়ে পড়েন। বনের ধারে রাস্তায় এসে দাঁড়ায় তারা। খুড়ো সবাইকে সতর্ক করে দেন—কেউ যেন গুলি না ছোঁড়ে। জার্মানদের রসদ বোঝাই একটা লরী সেপথে খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে। মাত্র বিশ গজ দূর দিয়ে সেটা বেরিয়ে গেল। খুড়ো এল্যাশা একটুও নড়লেন না—কোন ইঙ্গিতও করলেন না।

পর পর আরও কয়টি লরী চলে গেল। কিন্তু তিনি চুপচাপ। এদিকে ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে।

কিছুক্ষণ পর সেপথে দেখা গেল—শত্রুপক্ষের অশ্বারোহী দল। যখন কাছে এগিয়ে এল, খুড়ো এবার ইঙ্গিত করলেন। গেরিলাদের রাইফেল হঠাৎ গর্জে উঠল। চক্ষের নিমেষে ১১জন অশ্বারোহী নিচে পড়ে গেল। শত্রুদের আর সবাই তাড়াহুড়ো করে যে পথে এসেছিল—সে পথেই পিছিয়ে গেল প্রাণ নিয়ে।

এল্যাশা ছাত্রদলের এই অনায়াস সাফল্যে খুব খুশী হলেন।

অল্পদিনেই তাঁর ছাত্রদল অনেক কায়দাকানুন শিখে নেয়—কেমন করে চক্ষের পলকে এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় সরে পড়তে হয়, কেমন করে শত্রুপক্ষের পরস্পরের যোগসূত্র কেটে দিতে হয়, কি করে হাতবোমা ছুঁড়তে হয়—এবং কি করেই-বা মাইন পেতে বেকায়দায় ফেলতে হয় শত্রুপক্ষকে—সবই।

এল্যাশা অবসর সময় পুরানো দিনের গল্প করে ছাত্রদের মন চাঙা করে রাখেন। তাঁর প্রত্যেকটি গল্প ঠিক বাছাই করা, যেমন কৌতূহল বাড়ায় তেমনি শেখার যথেষ্ট উপকরণও থাকে। সেদিন তিনি বলছেন—কয়েক বছর আগে পূর্ব অঞ্চলে কি ব্যাপার ঘটেছিল;

—শত্রুপক্ষের প্রায় ১৫০ জন সৈনিক নিকটেই একটা গ্রাম অধিকার করে সেখানে আড্ডা গেড়েছে। যাতে কোন উপদ্রব না ঘটে সেজন্য পাহারা বসিয়ে তারা রাস্তাঘাট খুব সুরক্ষিত করে রেখেছে। তা ছাড়া গ্রামটার চারদিকেই জলা-ভূমি থাকায় তারা নিশ্চিন্ত মনে সে গ্রামেই তাদের ঘাঁটি বসাবার মতলব করে। আমরা যে সে গ্রামে হানা দিতে পারব না—এ বিষয়েও তারা নিশ্চিন্ত ছিল।

কিন্তু আমাদের দল কিছুতেই নিশ্চিন্ত নয়। অনেক চেষ্টার পর জানা গেল—দুর্গম জলাভূমির একদিক দিয়ে জল অনেকটা কম। হেঁটে পার হওয়া কষ্টকর হলেও অসম্ভব নয়। আমি আর দেরী করলাম না। দলের বাছাই করা কয়েকজনকে নিয়ে সেপথে গ্রামে ঢুকে অতর্কিতে হানা দিলাম। সেনাপতি হাতে নাতে ধরা পড়ল। এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের লোকদের সাহায্যে শত্রুসেনাদের মেরে কেটে হটিয়ে দিয়ে—তাদের ঘোড়াগুলো নিয়ে চম্পট দিলাম। ঘোড়ায় চড়ে জলা-পথ পেরুতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

তারপর সেনাপতির বিচারও আমাদের হাতেই হল।

এ গল্প যেদিন হয়, তার পরদিন একটি ছেলে এসে জানাল—একটি ক্ষুদ্র জার্মানদল এসে—গ্রামে এসে দপ্তর

ফেলেছে। এবার তোমার পূর্ব দেশের বীরত্ব এখানে ফলাতে পারি না কি?

এই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চুপি চুপি ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে কেমন হয়?

এল্যাশার মুখ সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন—বেশ চমৎকার হয়। তা যদি করতে পার—তাহলেই বলব—বাহাদুর।

এই কথার পরই গোরিলাদল রওনা হল। গভীর রাত্রিতে গিয়ে হঠাৎ হানা দিল শত্রুর ঘাঁটিতে। শত্রুরা এমন বেকায়দায় পড়ে গেল যে রাইফেল ধরবার সময়ও পেল না। গোরিলাদল হাতবোমা আর আগুনে বোতল নিক্ষেপ করে দলটিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে এল নিজেদের আড্ডায়। একজনও আহত হয়নি।

খুড়ো এল্যাশা একদিন পূর্ব দেশে বীরত্ব দেখিয়ে লাল-পতাকা চিহ্নিত পদক উপহার পেয়েছিলেন—আর সেদিন একটা জার্মান দলকে নিঃশেষে হটিয়ে দেওয়ায় পেলেন 'অর্ডার অব লেনিন' পুরস্কার।

—ফেটনক

নির্বাসিত বিহঙ্গ

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সেদিন অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতার ভেতর দিয়ে রাত্রি কাটল। গোলমাল-গুঞ্জন বড় ছিল না। কাজেই ঘুমের ব্যাঘাত হবার কথা নয়। তবে দিনের বেলায় যে শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে তারই মর্মান্তিক স্মৃতি বন্দীদের মনের ওপর দুর্বহ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল। এ ব্যাপারের ফলে বিরূপ ভবিষ্যতের ছায়া যেন তাদের চোখের সম্মুখেই প্রতিফলিত হতে লাগল।

বন্দী ইগনাজ, প্যাভলক এবং পালমার পাশেই খোলা মাটির ওপর শুয়ে পড়েছিল। এক-একবার সামান্য নড়াচড়া করতেই শেকল-বোঝার ঝন-ঝন ধ্বনি শোনা যেতে লাগল—যেন বিদ্রোহীদের কবলে অস্ত্রাগারে লণ্ডভণ্ড ব্যাপার চলেছে।

শেষবেলার দিকে যে বাকী পথটা সে হেঁটে এসেছে, তাতে অন্তত এটুকু বোঝা গেল যে সে দস্তুরমত শক্তিমান। তার ঘাড়গর্দানার এবং কপালের প্রতিটি শিরা-উপশিরা এমন ভাবে ফুলে উঠেছিল যে—যেন ছিঁড়ে পড়ে পড়ে অবস্থা। তবু কোন রকমে হোঁচট খেয়ে খেয়ে বেড়া-প্রাচীরের ভেতর এসে যখন পৌঁছুল, তখন তার চোখদুটি রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে—দৃষ্টিও অপ্রখর। অতিরিক্ত বোঝা চাপানোর ফলেই যে এ রকম অবস্থা ঘটেছে, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ যেখানে পাঁচ পাউণ্ড শেকলবেড়ী দস্তুরমত বোঝা, সেখানে পঞ্চাশ পাউণ্ডের চাপ—অত্যাচার ছাড়া আর কি হতে পারে? তাছাড়া মূলকথা এই যে, সেখানে সে সত্যকথা বলেছিল—বন্দীদের পলায়ন-চেষ্টায় তার পরামর্শ ছিল না, তা-সত্ত্বেও এই যে বিচার-হীন নির্যাতন—এই নির্যাতনই যেন তাকে আরও উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিল।

—তুমি কি এতটা সইতে পার, বন্ধু? —প্যাভলক জিজ্ঞেস করল।

ইগনাজ বলল—না, পারি না···

তোমার এই দুরবস্থা দেখে এরার হয়ত ক্যাপটেনের দয়া হবে···

—হয়ত হবে···

—যদি নাও হয়, যদি রাত্রিটা কোনরকমে কষ্টে সৃষ্টে কাটাতে পার, তাহলেও মন্দের ভাল। কাল তো বিশ্রামের দিন। আবার রওনা হবার আগে ক্যাপটেনও বদল হবে। নূতন ক্যাপটেন হয়ত এমন পাষণ্ড নাও হতে পারে।

—কি জানি, এও হয়ত সত্যি···

প্যাভলক ও পালমা ইগনাজের দুর্বহ কষ্ট লাঘবের জন্য যতটুকু করবার করতে লাগল। খাওয়ার সময় তাকে খাইয়ে দিল, ভেষ্টা পেলে জল ঢেলে দিল তার মুখে, এমন কি নিজেদের পরণের পায়জামা ছিঁড়ে টুকরো ন্যাকড়া দিয়ে ঝোলানো শেকলগুলো গায়ের সঙ্গে বেঁধে দিল বেশ আঁটসাট করে। কিন্তু তাতেও তেমন আরাম দেওয়া সম্ভব হল না।

বন্দী ইগনাজ শেকল-পরা দৈত্যের মতো সারাটা রাত নিদারুণ অস্বস্তিতে ছটফট করে কাটাল।

পরদিন বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপে তার দেহের যন্ত্রণা চরমে উঠল। প্যাস্তলফ পেছনে থেকে এই সহীদের নির্মম লাঞ্ছনা দেখতে লাগল সকরুণ চোখে। লোকটি যেন আর বেশীক্ষণ স্থির থাকতে পারবে না—দূর থেকে সেদিকে চাইতেও যেন অন্তরে পীড়া দেয়,—ভীষণ কষ্ট হয়। ইগনাজের কপালের শিরা-উপশিরাগুলো যেন অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ খুঁজছে। গর্দান নিদারুণ ফুলে উঠেছে। গর্দানের পিছনে শক্ত করে বাঁধা হাত দুটি। কানের দুপাশে দোলায়মান শেকলের শেষাংশে আধ-মোড়ানো মাথায় সজোরে ঘা মারতে চায়। সম্মুখের দিকে ভারি শেকল-বোঝা—ভারের সমতা রাখবার জন্যে মাথাটা যেন পেছন দিকে সটান হেলানো। প্রশস্ত স্কন্ধদেশেরও যেন ক্রমাবনতি ঘটেছে। অন্ধের মতো তার অস্থির পদক্ষেপ। ইগনাজ যেন আর মানুষ নয়।

—আর কত পারবে?—প্যাস্তলফ বলল।—এবার হয় ভেঙে পড়বে, নয়ত পাগল হয়ে যাবে···

ভোরবেলায় ইগনাজ টলতে টলতে আহারের যায়গায় গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। প্যাস্তলফ মুখে খাবার তুলে ধরতেই সে একবার তাকাল। চোখ দিয়ে যেন রক্ত ছিটকে বেরুচ্ছে। মাথাটা অতিকষ্টে দুবার নেড়ে জানাল—খাওয়ার ইচ্ছা তার নেই।

রক্ষীদলের ক্যাপটেন খানিক দূরে পাইচারি করে বেড়াচ্ছিলেন। এবার ভারিক্কি চালে সিগারেট ফুকতে ফুকতে তদারক করতে এগিয়ে এলেন সেখানে। এসেই বিদ্রূপ করে বললেন: কেমন প্রেসিডেন্ট মশাই, ভাল তো? কেমন লাগছে এখন? হাঁ, এবার একবার উঠে দাঁড়ান দেখি—হুকুমদার যখন আমিই!

হুকুমের পরেই হুমকি।

ইগনাজ অগত্যা দুর্বল পা-দুটিতে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

—যা দেখছি মশাই, তোমার পক্ষে লাইনে এসে দাঁড়ানো কষ্টকর ব্যাপার হয়ে উঠেছে। যদি না পার, তবেই তো নিয়মভঙ্গের অপরাধ—না?

কিন্তু ইগনাজের মুখে একটি কথাও শোনা গেল না।

—আজ রাত্রিতে দয়া দেখিয়ে বরং একটা শেকল খসানো যাবে। এবং এখান থেকে তোমাদের রওনা হবার আগে নূতন ক্যাপটেনকে না হয় বলে দেব যাতে এক-এক রাত্রিতে এক-একটা করে খুলে দেওয়া হয়! কিছু ভেব না তুমি, এভাবে একদিন আবার স্বাভাবিক অবস্থা তো ফিরেই পাবে। আমার বিশ্বাস যে, যে লঘু দণ্ড তোমায় দেওয়া হল, তাতেই তোমার সমুচিত শিক্ষা হবে। কি বল হে···

এই পর্যন্ত বলেই সদাশয় ক্যাপটেন সিগারেটের ছাইটা ঝেড়ে নিয়ে পিছু ফিরলেন। ইগনাজ এই মুহূর্তে কি ভাবল। এবং নিঃশব্দে একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে লাফ দিয়ে ধপাস্ করে পড়ে গেল ক্যাপটেনের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে শেকলের ঝনঝনিও শোনা গেল। অসতর্ক ক্যাপটেনের ওপর ততক্ষণে ইগনাজ পঞ্চাশ পাউণ্ড শেকল-বোঝা নিয়ে চেপে বসেছে। এই আকস্মিক ব্যাপারে বিমূঢ় হয়ে পড়ল সবাই। কেউ ছুটে এগিয়ে আসার আগেই ইগনাজ তার হাতে বাঁধা পঁচিশ পাউণ্ড ওজনের মরচে-ধরা শেকলের ঘা মেরে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিল ক্যাপটেনের মাথার খুলি।

নিমেষেই এই মহাকাণ্ড ঘটল। ক্যাপটেনের দফা রফা হয়ে গেছল দস্তুরমত মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগেই। কেন না, পেছন দিক থেকে তার মাথায় আঘাতটা এমন প্রচণ্ডভাবে এসে লেগেছিল, যা নিয়েট হাতুড়ীর আঘাতের চেয়েও প্রচণ্ড। তবু ইগনাজ সন্তুষ্ট হতে পারেনি। সে লুটিয়ে-পড়া দেহের ওপর শক্ত হয়ে চেপে বসে পুনঃ পুনঃ হাত চালিয়ে মাথার খুলি উড়িয়ে দিল। এ কাজের উপরই যেন তার জীবন—তার দৈহিক নির্যাতনের অবসান নির্ভর করছে—ইগনাজ হয়ত তাই ভেবেছিল।

বন্দীরা আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল। ভয়ে পিছিয়ে গেল রক্ষীরা। পরক্ষণে ভারপ্রাপ্ত সার্জেন্ট সাহস করে ছুটে এল। এসেই ব্যাপারটার হেস্তনেস্ত করে দিল। যে কশাক সেনাটি এতক্ষণ বিমূঢ়ের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল, সার্জেন্ট তার

হাত থেকে বাইসেপটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে পর পর গুলি করল ইগনাতের ওপর।

এভাবে অভিনয় শেষ হল।

এবার সার্জেন্টই হল বন্দীদলের কর্তা—দল চালাবার ভার নিতে হল তাকেই। মৃতদেহ দুটিকে টেলগার ওপর উঠিয়ে দিয়ে হুকুম করল : চলো···

আবার শোক-শোভাযাত্রা সুরু হল।

যা আগে ঘটে, পরবর্তী ফলাফল সূচিত হয় তা থেকে—ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা পূর্বঘটিত ব্যাপার থেকেই অনেকটা বোঝা যায়। মানুষের প্রত্যেক কাজের মূলে থাকে কল্পনা, সচেতন ধারণা বা এমনি অন্য কিছুর ফল। এবং এই সকল ভয়াবহ দুর্ঘটনা যেন অধীমাংসিত জিঘাংসাবৃত্তি নিয়ে হঠাৎ আপতিত হতে চলেছে এই চলমান বন্দীদলের ওপর—এ যেন জীবনমৃত্যুর নিষ্করুণ ভৌতিক খেলা। মৃত্যু যেন হাত বাড়িয়ে কেবলই ধাওয়া করছে তাদের পিছু পিছু। জীবন ও মৃত্যু এবং মৃত্যু ও জীবনের প্রশ্ন যেন জট পাকিয়ে তাদের মনে এক সঙ্গে গাঁথা হচ্ছে। অন্তর যেন থেঁতো হয়ে গেছে তাদের। কল্পনা সচেতন হয়ে উঠেছে কোন অচেতন রহস্যের গূঢ় অর্থ নিয়ে।

প্যাভলফ ও পালমা পাশাপাশি চলেছে। মুখে বড় একটা কথা নেই, কিন্তু মনে অন্তহীন ভাবনা। উভয়েই ভাবছে একটি নারীর কথা, যাকে তারা উভয়েই ভালবাসে—ভাবছে অসহায়া নারীর নিঃসঙ্গ জীবনের কথা।

প্যাভলফ অনেক সময় লক্ষ্য করেছে, অস্বস্তিকর ঘুমের ঘোরেও পালমা বিড়বিড় করে স্ত্রীর নাম করে। আর একদিন : তারা নিঃশব্দে চলেছে। পালমা অজ্ঞাতসারে নীরবতা ভঙ্গ করল। উদাস মনে বলতে লাগল : ভগবান, সে নিরাপদে নিঃশঙ্কে আছে এ খবরটুকু যদি কোন রকমে পেতাম!—এ হল পালমার মনের গোপন-কথা। কিন্তু কথাটা যে কিভাবে প্রকাশিত হল, পালমা তা জানতেই পেল না। কিন্তু পল প্যাভলফ কথাটা শুনেই হেসে উঠল—এমনি ভাবে সে আর একদিন হেসেছিল রাত্রির অন্ধকারে বেড়া-প্রাচীরের ভেতর শুয়ে।

তারপর আর একদিন।

রাস্তার দুপাশে মস্ত বড় দুটি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে ছিল। এবার তারা অপর এক অঞ্চলে এসে পড়ল।

পালমা জিজ্ঞেস করল : এখানে এত বড় বড় স্তম্ভ কেন?

প্যাভলফ বলল : এবার টমস্কে এসে পড়লাম। এখন আমরা ইয়েনিসেইস্ক্ প্রদেশে। এ হ'ল দু-অঞ্চলের সীমা।

—ও, তাই তো!

আবার দুজনে নীরব। উভয়েই বুঝতে পারল, সময় ক্রমেই নিকটবর্তী হয়ে আসছে—এবার ছাড়াছাড়ি হতে হবে। একজন যাবে এই প্রদেশে, অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে এবং আর একজনকে আরও দু'শ মাইল বিশ্রী বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হবে। কোথায় সেই কারা প্রদেশ! ভয়ঙ্কর দুর্গম সে-পথ এবং তার শেষ আরও ভয়ঙ্কর!

পথ চলতে চলতে পালমা হঠাৎ বলল : আমি যে কথা তোমায় বলেছিলাম—স্মরণ আছে তো পল আইভানোভিচ্? আমার কথা রাখবে তো? তুমি পালিয়ে যাবে—আমার স্ত্রী কোথায় আছে খুঁজে বার করবে। আমার সব কথা তাকে জানাবে···

—আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব তার ত্রুটি হবে না, সার্জ প্যাট্রোভিচ্।

সেই দিন রাত্রি বেলা।

প্যাভলফ ও পালমা শুয়ে পড়েছে। প্যাভলফ ধীরে ধীরে ডাকল : সার্জ, তুমি ঘুমিয়েছ?

—না বন্ধু, কিছুতেই ঘুম আসছে না।

—এবার একটা কাজ করা যাক। তোমার পোষাক খুলে আমার পাশে রাখ তো? অবাক হচ্ছ? শোন তাহলে। আগামী কাল অচিন্স্কে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হতে হবে। তুমি আমাকে শপথ করিয়েছ—শপথ করিয়েছ হোপ ইভানোভনার জন্য যথাসাধ্য করতে। তাহলে আমারও একটা কথা তোমায় রাখতে হবে। প্রতিজ্ঞা কর যে আপত্তি করবে না।

—না পল, আপত্তি করব না। তুমি যা বলবে তাই করব।

—শপথ কর।

—আমি শপথ করছি। আমার সাধ্যমত আমি করব···

—হাঁ, সে কাজ তোমার অসাধ্য হবে না। মনে রেখো, তুমি শপথ করেছ। তাহলে এবার বলি: অচিন্‌স্‌কে পৌঁছার পর যখন হাজিরা ডাক হবে, তখন তুমি আমার নামে হাজিরা দেবে; আর আমি তোমার নামে হাজিরা দেব। অর্থাৎ তখন থেকে তুমি হবে পল প্যাভলফ, আর আমি সার্জ পালমা। এই হবে আমাদের পরিচয়।

—এ মতলব কেন পল আইভানোভিচ?

—তুমি এ প্রদেশেই আমার যায়গায় থেকে যাবে···

—কিন্তু···

—না, এর মধ্যে আর কিন্তু নেই, সার্জ। বসন্তকাল আসবে···কোকিল যখন সাড়া দেবে, ততদিন তুমি অপেক্ষা করবে···

—পল···

—কোকিলের সাড়া পেয়ে তুমি আবার পথ ধরবে—উত্তরমুখো সেই অষ্টিয়াস্‌কুলের দিকে···

পালমার শরীর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরেও পালমা বলতে লাগল: কিন্তু খুব হুঁসিয়ার! একাজ হোপ ইভানোভনার জন্যে। তার জন্যে তোমাকে খুব সাবধানে চলতে হবে। তারপর তার সঙ্গে যখন তোমার দেখা হবে, তাকে জানাবে—আমাদের যা আদর্শ, যা চরম লক্ষ্য, তা পাওয়ার জন্য কাজ চালিয়ে যেতে হবে। সেই হেতু এই অবস্থায় যা করার ছিল, পল প্যাভলফ মাত্র তাই করছে।

পালমা এবার রুদ্ধ স্বরে বলল: এ যে তোমার নিজের মৃত্যুর পথ বেছে নিলে, পল: আমার জন্য তোমার জীবন···

প্যাভলফ বাধা দিল: হাঁ তোমার জন্য, হোপ ইভানোভনার জন্য অথবা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য। সম্ভবত তাও নয়। কেননা, সুযোগ সুবিধা পেলে আমিও একদিন কারা-প্রদেশ থেকে পূর্বাকলে চম্পট দেব।

পালমা কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল। একদিকে এই আত্মত্যাগের মহত্ত্ব, অপর দিকে প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা···তার মস্তিষ্ক আলোড়িত হয়ে উঠল এই দুই-এর প্রতিক্রিয়ায়। প্যাভলফের এই কাজে পলিমার বিষাদ-ছায়াচ্ছন্ন মন হঠাৎ যেন নবালোকে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল।

শেষে হতাশকণ্ঠে সার্জ বলল: আর বলো না প্যাভলফ, আর কিছু বলো না··

—তুমি কিন্তু শপথ করেছ···

—অ্যাঁ,···কিন্তু···তা···

—সার্জ, একবার ভেবে দেখ তোমার প্রিয়তমা স্ত্রীর অবস্থা···তোমার ছেলের কথা···

—অ্যাঁ, আমার ছেলে·· তাই তো··· —বলেই সে নীরব হয়ে গেল। আর একটি কথাও সে বলতে পারল না।

নয় মাস পর।

—'সার্জ পালমা'কে দেখা গেল ক্লান্ত, কাহিল, পথশ্রমে অবসন্ন—কিন্তু মুখমণ্ডল স্ফূর্তিতে সমুজ্জ্বল। রাশিকৃত বরফে ছেয়ে গেছে কারা প্রদেশ। বরফ—শুধু বরফ, যেন শেষ নেই। দেখে দেখে চোখ ক্লান্তিতে জড়িয়ে আসে। এই বরফময় রাজ্যে কাঠের তাঁবু খাটিয়ে সে একাকী বসে আছে। নিঃসঙ্গ মন। মাঝে মাঝে তার দৃষ্টি সীমাহীন দিগন্তরে বিলীন হয়ে যায়।

এদিকে ইয়েনিসেইস্‌ক্ প্রদেশে 'পল প্যাভলফ'—উন্নত দেহ, মাথায় সোণালী চুল, নীল চোখ—সমুজ্জ্বল দৃষ্টি। সে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে বসন্তের কোকিল কবে সাড়া দেবে···নির্দেশ দেবে সেই শুভ-সুযোগের···

এমনি করে দুই বন্ধুর মধ্যে মহান্ আত্মদান ও দান-গ্রহণ—অপরিসীম ভালবাসার অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।

তারা ভালবাসে একজন মমতাময়ী মহীয়সী তরুণীকে।

(অনুবাদ উপন্যাস) [ক্রমশঃ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিদায়ী সভাপতি

শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্তের অভিভাষণ

আমার ভ্রাতা ভগিনী সহকর্মী ও দেশবাসীগণ,

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভানেত্রী হিসাবে চারি বৎসরের অধিককাল আমি যে পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলাম তাহাতে বসিবার যোগ্যতা আমার ছিল না। এককালে দেশবন্ধু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তুলনায় আমি একজন অযোগ্য কর্মী। তবুও আমি যে ইহাতে বসিবার পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম এবং দেশের সঙ্কট-মুহূর্তে নানা দুর্যোগের ভিতর দিয়া গুরুভার বহন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম তাহার মূলে ছিল আপনাদের ঐকান্তিক আগ্রহ এবং অতুলনীয় সাহায্য। সে কথা মনে করিয়া আজ আমার অন্তর কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাই আজ প্রথমেই আপনাদিগকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইবার সুযোগ ইতিপূর্বে আর কোন মহিলা কর্মী লাভ করেন নাই। আপনারা আমাকে এই আসনে বসাইয়া বাঙ্গালা তথা ভারতের নারীজাতির প্রতিই আপনাদের অসীম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সেই নারীজাতির পক্ষ হইতেও আপনাদিগকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এই বন্ধু সম্মিলনের দিনে আজও যাঁহারা বন্দীজীবন যাপন করিতেছেন তাঁহাদের কথা আমি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। তাঁহারা অচিরে আমাদের সঙ্গে মিলিত হউন ইহা আমি সর্বদা কামনা করি। কেবল তাহাই নহে, আপনাদের নিকটও আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহাদের মুক্তির জন্য আপনারা প্রাণপণ চেষ্টা করুন। একথা অস্বীকার্য, তাঁহাদিগকে বাদ দিলে আমাদের সকল কর্মপন্থাই অসম্পূর্ণ থাকিবে।

আমার এই গুরুদায়িত্ব বহনে যাঁহাদিগকে সর্বদা নিকটে পাইয়াছিলাম এবং যাঁহারা অক্লান্তভাবে আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইজন আজ ইহলোকে নাই। স্বর্গতঃ সেই দুই সহকর্মী বিনয়েন্দ্রনাথ পালিত ও শৈলজানন্দ সেনের নাম উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। তাঁহাদের আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক্ মঙ্গলময়ের চরণে এই প্রার্থনা জানাই।

শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সরোজিনী নাইডু, ও বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা আমাকে সুরধার পথে চলিতে প্রেরণা দিয়াছিল। তাঁহাদের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা ব্যতীত আমি এপথে কখনও চলিতে পারিতাম না ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। তাঁহাদিগকে আমি বারে বারে প্রণাম জানাইতেছি। এই সঙ্গে আমি মৌলানা সাহেবের সহধর্মিণী স্বর্গতা জুলেখা বেগমের কথা না বলিয়া পারিতেছি না। তাঁহার আশীর্বাদ লাভ করিবার পরম সৌভাগ্যও আমার হইয়াছিল। তাঁহার পুণ্যস্মৃতি আমি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। ভগবানের নিকট তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

দেশের অসংখ্য নরনারী যাঁহারা দেশের জন্য হাসিমুখে নানা নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন এবং সেই নির্যাতনের ফলে যাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারাও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আমাকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন; আমরা সেই ভ্রাতা ভগিনীদের উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর নিকটও আমার ঋণের সীমা নাই। তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত আমি কোনমতেই এই দুরূহ কর্তব্যভার বহন করিতে সক্ষম হইতাম না। কংগ্রেসের প্রতিদিনের কাজে আমি তাঁহাদের উপর একান্তভাবে নির্ভর করিয়াছি এবং তাঁহারাও আমাকে সাহায্য করিতে এতটুকু কার্পণ্য করেন নাই। আতীত জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় দুর্যোগের দিনে আমি যেটুকু কাজ করিতে পারিয়াছিলাম তাহার মূলে ছিল তাঁহাদের আন্তরিকতা এবং সহযোগিতা। তাঁহাদিগকে আমি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

এই আসনের প্রকৃত অধিকারী যিনি ছিলেন, সেই দেশবন্ধুর অমর আত্মার উদ্দেশে আমি শতকোটি প্রণাম জানাই। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি আমার গুরু। কেবল তাহাই নহে, তিনি ভারতবর্ষের ভাগ্য-গগনে ধ্রুবতারকা স্বরূপ। আমরা যখনই দিক্‌ভ্রান্ত হইব তখনই এক ধ্রুবতারকা আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিবে। তাঁহার অনির্ব্বাণ চিতাগ্নি দেশবাসীর অন্তরে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করুক্ এবং তাহারা স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ করুক ইহাই আমার একমাত্র কামনা।

আজ বাঙ্গলার কৃতিসন্তান পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুরেন্দ্রমোহন ঘোষকে আমরা নিজেদের মধ্যে ফিরিয়া পাইয়াছি। দেশের জন্য তিনি কি করিয়াছেন এবং কি পরিমাণ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন তাহার অবতারণা করা নিষ্প্রয়োজন। দেশপ্রেমে ও বৈরাগ্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহ আজ বাঙ্গলা দেশে নাই। শ্রীঅরবিন্দ ও দেশবন্ধুর আদর্শ আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়া তিনি যে মহত্বের ও অনাগু সাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত জাতীয় জীবনে অত্যন্ত বিরল। আজ আমাদের পুরোধা হিসাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সর্ব্বোচ্চ আসনে বসিবার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তিই হইতেছেন সুরেন্দ্র-মোহন। আমি তাঁহাকেই এই আসনে বসাইয়া তাঁহার প্রতি আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে চাই। একদিন এই গুরুভার তিনিই আমার মত অযোগ্য কর্ম্মীর হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন, আজ সে ভার তাঁহাকেই ফিরাইয়া দিয়া আমি অবসর গ্রহণ করিতেছি।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভানেত্রী হিসাবে আজই আমি শেষবারের মত আপনাদিগকে সম্বোধন করিতেছি এবং শেষবারের মত দুই একটি কথা আপানাদের নিকট নিবেদন করিতেছি।

পৃথিবীতে ভয়াবহ যুদ্ধ শেষ হইলেও হিংসা ও বিদ্বেষের অনল এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। এই বিদ্বেষবহ্নি নির্ব্বাপিত করিয়া পৃথিবীব্যাপী শান্তি ও মৈত্রী স্থাপন, মনুষ্যত্বের বিকাশ এবং নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে হইলে মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত আদর্শ জীবনের প্রতি স্তরে গ্রহণ করা এবং তাঁহার প্রদর্শিত অহিংসার পথে চলা একান্ত আবশ্যক। সকল ভেদ ভুলিয়া আমরা একত্র হইয়া আজ মহাত্মার বাণী যেন দিকে দিকে প্রচার করিতে পারি। এইজন্য আমি প্রত্যেক দেশ-বাসীকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি।

আমাদের নির্য্যাতিত ভ্রাতা ভগ্নীদের কথা আমি আগেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহাদের এবং তাঁহাদের দুর্দ্দশা পীড়িত পরিবারবর্গের দুঃখ মোচনের জন্য আপনারা বদ্ধপরিকর হউন— ইহাও আমার অনুরোধ। বলা বাহুল্য এই ব্যাপারে আমরা যাহাই করিনা কেন, কোন দিনই তাহা অতিরিক্ত হইবে না, বরং করার অপেক্ষা না করাই চিরদিন বড় হইয়া রহিবে।

একথা ঠিক যে পল্লীসংগঠন ব্যতীত দেশের কোন কাজই সার্থক হইবে না। এবিষয়ে স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথ যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আজও সত্য। এসম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ এবং দেশবন্ধুর নির্দ্দেশও মহা মূল্যবান। আপনারা এই সকল কথা ও নির্দ্দেশ এবং মহাত্মার পরিকল্পনা অনুযায়ী পল্লীসংগঠন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করুন এই অনুরোধ না করিয়া পারিতেছি না। স্বাধীনতার সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে প্রতিটি পল্লীবাসীকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইবে। লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর নিরন্ন পল্লীবাসীদের নিকটে যাইয়া তাহাদের সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া তাহাদের জীবন গড়িয়া তুলিতে না পারিলে তাহারা স্বাধীনতার তাৎপর্য্য কি করিয়া বুঝিবে এবং কি করিয়াই বা স্বাধীনতার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে?

আমি আপনাদের নিকট কোন বিস্তৃত কর্ম্মপন্থা উপস্থাপিত করিতে চাই না। কর্ম্মী হিসাবে আমার মনে আজ যেকয়টি বিষয় জাগিয়াছে তাহাই সংক্ষেপে আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম। এখন হইতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ আমাদিগকে আমাদের লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত করিবেন এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যিনি অলক্ষ্যে থাকিয়া আমাদের সকল কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করেন, যাঁহার আশীর্ব্বাদ অজস্র ধারায় আমাদের উপর নিয়ত বর্ষিত হয় এবং যাঁহার অসীম করুণায় আমি স্বল্প ক্ষমতা সত্ত্বেও নিদারুণ দুর্য্যোগের মাঝে বিরাট কর্ত্তব্য পালন করিতে সাহসী হইয়াছি, সেই ভগবানের নিকট আমার এক-মাত্র প্রার্থনা সুরেন্দ্রমোহন দীর্ঘ জীবন লাভ করুন এবং তাঁহার ও তৎসহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক্। বন্দে মাতরম্।

পুস্তক পরিচয়

জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত— শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স কর্তৃক ১২ নারিকেলবাগান লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ক্রাউন অষ্টাংশিত। ১১২ পৃঃ। এক টাকা আট আনা।

স্বদেশী আন্দোলন যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ সেই চেতনা বাংলাদেশে প্রথম আরম্ভ হয় হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষার চেষ্টার মধ্য দিয়া। ইংরেজী সভ্যতার আক্রমণে বিপর্যস্ত হিন্দু-সমাজের আত্মরক্ষার নানা প্রচেষ্টার মধ্যে 'হিন্দু মেলা' বা 'জাতীয় মেলা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদিও সর্বপ্রথমে ইহা হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল তবুও ইহার দৃষ্টান্ত ক্রমে ক্রমে মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। জাতীয় মেলার কার্যকারিতাই শেষকালে ইণ্ডিয়ান লীগ, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন ইত্যাদির মধ্য দিয়া জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশের রাজনৈতিক চেতনাবোধের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত না হইলে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটা বিস্তৃত অংশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতে বাধ্য। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের সমাজে যে বিষম আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহার ফল কিরূপ সুদূরপ্রসারী হইয়াছে এবিষয়ে আমাদের আলোচনা যতই হইবে ততই তাহা জাতির পক্ষে কল্যাণকর হইবে। বর্তমানে আমরা আমাদের এই অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীর সব দেশেই নিজ নিজ অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে যথোচিত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে গৌরবময় ধারণা না থাকিলে ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের ধারা দুর্বল না হইয়া যায় না। এবিষয়ে ইংল্যাণ্ড ও সোভিয়েট রাশিয়া কাহারও মতদ্বৈধ নাই। ক্যাসাবিয়ানকা, নেলসন সম্বন্ধীয় নানা গল্প ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করিয়াও ছেলেদের শেখান হয় যেন তাহারা নিজেদের জাতির অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে গৌরব অনুভব করে; সোভিয়েট রাশিয়াতেও দেখি ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করিয়াও গল্প উপন্যাস কবিতায় জন-গণের তথাকথিত বিপুল জাগরণের ইতিহাস প্রস্তুত হইতেছে যাহা পড়িয়া বর্তমান ও ভবিষ্যতের জাতি নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে গর্বিত হইতে পারে। জাতীয় মেলার ইতিহাস আমাদের গর্বের জিনিস—ইহা আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক চেতনা-বোধের প্রথম ও প্রধানতম সোপান। সত্যকে বিকৃত করিয়া ইহার ইতিহাস জানিতে হয় না। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের "জাতীয়তার নবমন্ত্র" গ্রন্থখানি এইজন্যই প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরে স্থান পাইতে বাধ্য। অসাধারণ পরিশ্রমের সহিত তিনি পুরাতন পুস্তকাদি ও সংবাদপত্রাদি ঘাঁটিয়া হিন্দু মেলা বা জাতীয় মেলার যে ইতিহাস রচিত করিয়াছেন জাতির সংস্কৃতির ইতিহাসে তাহার স্থান বহু উচ্চে। হিন্দু মেলার প্রাণস্বরূপ নবগোপাল মিত্রের আলেখ্যখানি এই পুস্তকের ঐতিহাসিক মর্যাদা প্রচুর বাড়াইয়াছে। আমরা আশা করি বাঙ্গালী পাঠককুলে এই পুস্তকখানি বিশেষভাবে আদৃত হইবে। [শ্রীঃ]

আচ্ছা ফ্যাসাদ (ছড়া ও গল্প)—শ্রীসুনির্মল বসু। ৸০ আনা।

সহরে মামা (শিশু প্রহসন)—শ্রীসুনির্মল বসু। ৷৷০ আনা। উভয় গ্রন্থই বুলবুল সাহিত্য মন্দির, সি-৫ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

সুনির্মল বাবু ছোটদের জন্য বই লিখিতে সিদ্ধহস্ত। 'আচ্ছা ফ্যাসাদ' বইখানি বড় বাংলা হরফে কতকগুলি চমৎকার ও সচিত্র ছড়া ও গল্পের সমাবেশ। 'সহরে মামা' একটি ছোট্ট প্রহসন, এটিও ছবিতে বোঝাই। বাংলা দেশের

ছোট ছেলেমেয়েরা দুখানি বই পড়েই খুব যে খুশী হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। [শ্রী শঃ]

ডাক্তারের দিগ্বিজয়—শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী। প্রকাশক : সরস্বতী লাইব্রেরী সি ১৮-১৯, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। ১৭২ পৃঃ। ২।০ টাকা।

জুলে ভার্ণের উপন্যাস 'রাশিয়ার রাজদূত' অনুবাদ করিয়া মনোমোহনবাবু যে সুখ্যাতি বাংলার কিশোর মহলে লাভ করিয়াছেন 'ডাক্তারের দিগ্বিজয়' বইখানি তাঁর সেই সুনাম পুরাপুরি বজায় রাখিয়াছে। হিউ লফটিং-এর ডাঃ ডুলিট্‌লের গল্প ইওরোপের কিশোর সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। মনোমোহনবাবু এই বইখানি কিশোর বাংলার হাতে তুলিয়া তাহাদের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। যাকে ঠিক 'humour' বলে বাংলা সাহিত্যে তাহার অভাব অত্যন্ত। 'ডাক্তারের দিগ্বিজয়' বইখানি এই 'humour'-এ বোঝাই। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীইন্দু গুপ্তের তুলিতে ছবিগুলি অত্যন্ত প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মনোমোহনবাবুর লেখা ও ইন্দুগুপ্তের আঁকা ছবি এই উভয়ে মিলিয়া বইখানিকে অত্যন্ত উপভোগ্য করিয়াছে।

ভাষণ—শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়। প্রাপ্তিস্থান : সরস্বতী লাইব্রেরী। সি ১৮-১৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা আট আনা।

আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে অনেকেরই চিত্ত বিধাগ্রস্ত। কারণ, মনোবিকারের বীজাণু আজ হাওয়ায় উড়িতেছে। সৌভাগ্যবশতঃ সুবোধরঞ্জনের কবিতায় বিকারের চিহ্ন নাই। সরল সুস্থ কল্পনা কবিতাগুলিতে রস-সঞ্চার করিয়াছে। নূতনের মোহে তিনি বিভ্রান্ত হন নাই।

"তাহারা সুধায় মোরে—কী তুমি এনেছো ?
তোমার অঞ্জলিও কি ভরিয়াছে সেই সুরে
ফুটেছিল যাহা অন্ত দিন ?...
সেও ভালো, তবু যেন নূতন সৃষ্টির মোহবশে
আপনার মূর্তিখানি বিকৃত করিয়া থাকি'
মাতিওনা উন্মাদ-রভসে।"

এই 'ডুবারু তরণী' আর 'উড়োজাহাজের' যুগেও 'যাদুকরী রাতের পরীরা' যেখানে আলসে ঘুমায়, সেখানে তাঁর 'স্বপনের ছায়া নামে।' শীতের রাত্রে পৃথিবী যখন 'কুয়াশার কাঁথা মুড়ি দিয়ে বসে' থাকে, তখন নির্বাক তিনি সেই মোহ উপভোগ করেন, 'বিশ্বলোকের বিচিত্রতার সরসে' তাঁহার আঁখি জুড়াইয়া যায়। কিন্তু, তাই বলিয়া সংসার-পলাতক স্বপ্নবিলাসী তিনি নহেন। জীবনেরই জয়গান শুনি তাঁহার কাব্যে। "দুঃখে ও সুখে অজেয় মানব—জীবনের গান গাই প্রতি দিবসের রণে ক্ষতদেহ, তবু তার ক্ষয় নাই।" ইহাই প্রকৃত কবির গান। নবযুগের নেশায় 'আলেয়া আলোর পিছনে' ছুটিয়া তিনি 'আঁধি সৃজন' করেন নাই, রহস্যমধুর জীবন জ্যোৎস্নায় চির-আনন্দের গান গাহিয়াছেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু—জওহরলালজী ৭৭ বৎসরে গত ১৪ই নভেম্বর পা দিয়েছেন। সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে আমরা এই উপলক্ষে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করছি। সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে একত্রিত হয়ে আমরা প্রার্থনা করছি তাঁর অদম্য কর্মশক্তি বহু বৎসরের জন্য অব্যাহত থাকুক—যে অনাগত বিপ্লবকে প্রত্যুদ্গমন করে নেবার জন্য আজ দেশের কর্মশক্তি জাগ্রত হয়েছে সেই বিপ্লবের চরম চরিতার্থতাকে যেন তিনি রূপদান করে যেতে পারেন। জাতীয় কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পরিবর্তনকে তিনি প্রথমেই ধরতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং সেই পরিবর্তনকে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নেবার জন্য তিনি তাঁর সমস্ত কিছু উৎসর্গ করেছেন। তিনি নিজেকে বা নিজের দলকে বড় করবার মোহে কংগ্রেসকে কোনোদিনই খাটো করেন নাই; কোনো দিন তিনি দল তৈরী করবার দিকে মন দেন নাই, কারণ তিনি জানেন যে দেশের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে দল তৈরী করা মানেই কংগ্রেসকে দুর্বল করা,—কংগ্রেসের নামে, বিপ্লবের নামে গণতন্ত্রবিরোধী নেতৃত্বকে আবাহন করে আনা। নামের মোহ বা দলের মোহ কোনদিন তাঁকে পাগান এবং সেজন্যই দেশ তাঁকে মাথায় করে নিয়েছে। পরাধীন দেশে রাজশক্তির লাঞ্ছনা চিরদিনই স্বাধীনতার পূজারীদের গর্বের জিনিস—রাজলাঞ্ছনার সে গর্ব তাঁর আছে। নিজ দেশবাসীর থেকেও, নামের কাঙ্গালদের থেকেও তাঁর লাঞ্ছনা কম আসে নাই কিন্তু মহত্তের পক্ষে তাহাও ভূষণ স্বরূপ। সুতরাং লাঞ্ছনা তাঁকে কর্দম লিপ্ত না করে তাঁকে আরো মহীয়ান করেছে। জাতিকে তিনি মহান করেছেন, বরীয়ান করেছেন—তিনি দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে পৃথিবীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করুন—আজ তাঁর ৭৭তম জন্মতিথিতে এই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্ত—গত অক্টোবর মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশনে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্ত প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভানেত্রীত্ব পরিত্যাগ করেন এবং ঐ কমিটী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষকে সভাপতি পদে বৃত করেন। দেশের এক মহাদুর্দিনে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা কংগ্রেসের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং নানা দুঃখ দহনের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর কর্তব্য সমাপন করেছেন, দেশবাসী একথা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার

শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্ত

করবে। বাঙ্গলার এমন কোন কর্মী নাই বললে অত্যুক্তি হয় না যিনি লাবণ্যপ্রভার স্নেহ ও যত্নের স্বাদ পান নাই। যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই তাঁর অনবদ্য চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছেন। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও যিনি যখনই কোনো কংগ্রেস কর্মীর বিপদের কথা শুনেছেন তখনই সেখানে ছুটে গিয়েছেন। আমরা প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘদিন নিরাময় হয়ে দেশের সেবা করবার অধিকারী হোন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ—দীর্ঘদিন কারাভোগান্তে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ মুক্ত হয়ে আসবার পর বঙ্গীয়

প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি পদে তিনি পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন। দেশবাসী আশা করেছিলেন যে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরুণ চন্দ্র গুহও মুক্তি পাবেন এবং সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচন এক সঙ্গেই হবে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ

বাঙ্গলাদেশের শাহানশাহ্ সি. আই. ডি. প্রভুদের মর্জি যখন তা নয় তখন অরুণবাবু আজও মুক্তি পেলেন না।

সুরেন্দ্রমোহন সেই ধরণের কর্মী যাঁরা সভাসমিতিতে বাগাড়ম্বর করার চাইতে জনসাধারণের সঙ্গে মিশে গেয়ে তাদের মধ্যে স্বাধীনতার আন্দোলনকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া পছন্দ করেন। এই সব নীরব কর্মীদের বিদেশী রাজশক্তি অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখে তাই সুরেন্দ্রমোহনের তিপ্পান্ন বৎসর বয়সের তেইশ বছরই কেটেছে কারাকক্ষের অন্তরালে। কিন্তু নির্যাতন তাঁকে এতটুকু দুর্বল করতে পারে নাই। তাঁর সাধনার একাগ্রতাই তাঁর শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে। জেল থেকে বেরিয়ে এসেই তিনি আবার অদম্য উৎসাহের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন স্বাধীনতার সংগ্রামে। বাঙ্গলায় মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্তদের প্রাধান্যের জন্য কংগ্রেস কোনদিনই তেমন বলশালী ছিল না। কংগ্রেসকে ভাঙিয়ে নিজেদের দলকে বড় করাই ছিল বাংলার কর্মীদের অনেকের লক্ষ্য। কংগ্রেসকে গ্ল্যাটফর্মরূপে ব্যবহার করে কংগ্রেসের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নিজেদের দলকে বড় করতে যাওয়ার স্পৃহার জন্যই বাঙ্গলায় রাজনীতি হয়েছিল পঙ্কিল। সুরেন্দ্রমোহন তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্র থেকে এই আবর্জনা দূর করবার জন্য যেদিন নেমে এসেছিলেন সেদিন থেকেই তাঁর ব্রত শুরু হয়েছে কংগ্রেসকে জনগণের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান করা—গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসকে জনপ্রিয় করা, জনগণের একান্ত আপনার জিনিস করা। ৪২এর বিপ্লব সফল যে হয় নাই তার অন্যতম কারণ গ্রামগুলিতে কংগ্রেসের সংগঠন অসম্পূর্ণ ছিল। বাঙ্গলার সেই সব স্থানেই এই বিপ্লব একটা তীব্র রূপ পেয়েছিল যেসব স্থানে কংগ্রেস আন্দোলন খাঁটি কংগ্রেস আন্দোলনই ছিল;—কোনো 'ইজমের' বালাই বা দলের মোহে কর্মীরা যেখানে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে নাই সেখানেই আন্দোলন সমগ্র গণমনকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। আন্দোলনের সফলতার ও তীব্রতার এই কারণ সুরেন্দ্র

শ্রীযুক্ত সুপতি মজুমদার

মোহনের দৃষ্টি এড়ায় নাই—তিনি জানেন যে বিপ্লবকে সফল করবে দেশের নিম্নতম শ্রেণী, চাষী মজুর, এবং বিপ্লব তখনই সফল হবে যখন চাষী মজুরের হাতে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা যাবে। কংগ্রেসকে সফল হতে হবে সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর

ফল এনে দিবে। এজন্যই সুরেন্দ্রমোহন আজ গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস সংগঠনের জন্য আবেদন করছেন। আমরা আশা করি তাঁর এ আবেদন সার্থক হবে।

শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সহ সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার সার্দ্ধ তিন বৎসর পর দমদম জেল থেকে গত ২৮শে অক্টোবর মুক্তি পেয়েছেন। জেল থেকে বেরিয়ে এসেই তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। দেশসেবার গুরু অপরাধের জন্য বিদেশী রাষ্ট্রশক্তি যে কয়জন স্বাধীনতার পূজারীকে অত্যন্ত ভীতির চক্ষে দেখে ভূপতি বাবু তাঁদের অন্যতম। তাঁর অদ্ভুত কর্মশক্তি, অসাধারণ মনীষা এবং সুগভীর দেশপ্রীতি তাঁর আত্মত্যাগকে মহীয়ান করে তুলেছে। আমরা তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু ও দেশের দাবী—রাজনৈতিক কর্মীদের কর্মপদ্ধতি নিয়ে সময় সময় মতভেদ হয়ে থাকে। অতীতে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমাদের এমনি কিছু মতভেদ ছিল। কিন্তু সে কথা স্মরণ করার আজ আর কোন পক্ষ থেকেই কোন প্রয়োজন নেই। কারণ আজ তিনি আবার কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন, এবং কংগ্রেসও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছে। বর্তমানের কাজ এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্য —এই শুধু আজ আমাদের সকলের একমাত্র চিন্তনীয় বিষয়। কিন্তু সেই জন্যই এটাও লক্ষ্য রাখা দরকার যেন অতীতের ভুল আবার না ঘটে। গন্তব্যের দিকে দৃষ্টি স্থির না রাখলে পদে পদে ভুলের সম্ভাবনা।—এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে হচ্ছে এই জন্য যে আজ ভারতবর্ষ একটি অত্যন্ত সঙ্কটময় অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে। চালিয়ে নেবার দায়িত্বের একটি অংশ নানা কারণে শরৎচন্দ্রের ওপর এসে পড়েছে। তাঁর নিজ দায়িত্ব তিনি যোগ্যতার সঙ্গে বহন করুন, তাঁর নিকট দেশের এই দাবী। এ দাবী সফল হবেই এমন আশা করতে পারলে দেশ আনন্দিত হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে শরৎচন্দ্রের কতকগুলি প্রকাশ্য বিবৃতিতে কোন কোন মহলে কিছু নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের সবিনয় অনুরোধ শরৎচন্দ্র এ বিষয়ে একটু অবহিত হোন।

চিয়াং কাইশেকের রাজনৈতিক চরিত্র নির্ণয়ে পণ্ডিত জহরলালের ভুল হয়ে থাকতে পারে। ভুল হয়েছে এটা যদি নিশ্চিত বুঝা যায় তা হলে তাঁর সমালোচনা করার অধিকার বিশেষজ্ঞ মহলের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের অখণ্ডতা রক্ষার প্রয়োজন আরো বড় এবং ব্যাপক। পরিণতীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব অপদস্থ হতে পারে, এমন সুরে সমালোচনা করার অধিকার আজ ভারতবর্ষে কারো থাকা উচিত নয়। অথচ সমালোচনার ফলে যদি এমনি অবস্থা ঘটবার আশঙ্কা দেশের বহু লোকের মনে জন্মে থাকে তবে তার দায়িত্ব সমালোচকের। শরৎচন্দ্রের অভিপ্রায় কি ছিল, সেটা প্রশ্ন নয়। তাঁর বিবৃতির প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে, এইটাই আলোচ্য।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে শরৎচন্দ্র যে সব বিবৃতি দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন, তাতেও অনেকের মনে অসন্তোষ জমে উঠেছে। কোন বন্ধু বা আত্মীয় বন্দীর মুক্তির জন্য চেষ্টা করার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তিরই আছে। কিন্তু যিনি সমগ্র বাংলার নেতৃত্বের দাবী রাখেন, তাঁর কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক বলেই কোন বিশেষ ব্যক্তিকে একান্তভাবে বন্ধু বলে গণ্য করবার তাঁর অধিকার কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত। ব্যক্তিগত অধিকার খণ্ডিত করবার জন্য শরৎচন্দ্র যদি প্রস্তুত না হতে পারেন, তাঁর নেতৃত্বের অধিকার খণ্ডিত হবেই, কোন বন্ধুই এটা প্রতিরোধ করতে পারবেন না। এর তত্ত্ব এবং তথ্য শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাত থাকার কথা নয়। সুতরাং তাঁর অত্যন্ত সতর্ক হবার প্রয়োজন আছে। গত কয় বৎসরের স্বরাষ্ট্রিক এবং আন্তঃরাষ্ট্রিক নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে শরৎচন্দ্রের প্রতি একটি অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। মুখ্য, নৈর্ব্যক্তিক ভাবে এই মনোভাবকে কাজে লাগাতে পারলে তাঁর হাতে ভারতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি। অসতর্ক মুহূর্তের অবহেলায় এই ঐতিহাসিক সুযোগ যদি তিনি হারান, তবে সেটা হবে তাঁর নিজের পক্ষে আক্ষেপের বিষয় এবং দেশের পক্ষে অকল্যাণকর। যেহেতু আমাদের পক্ষে দুটাই অত্যন্ত পরিতাপের, সেইজন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলতে বাধ্য হলাম।

বন্দীমুক্তির আন্দোলন—রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য একটা ব্যাপক আন্দোলনের সময় হয়েছে বলে আমাদের

বিশ্বাস। যাঁদের দ্বারা এ রকম আন্দোলন হতে পারে তাঁদেরও এ রকম বিশ্বাস কিনা তা জানবার সুযোগ আমরা পাচ্ছি না। যাকে একটা দস্তুরমত আন্দোলন বলা চলে তার অভাবে লোকে অনুমান করতে পারে যে নেতারা এবিষয়ে যথেষ্ট অবহিত নন। এ অনুমান ভ্রান্ত কিনা সে তর্ক নিরর্থক। এ অনুমান যে হচ্ছে এইটাই লক্ষ্য করার বিষয়। আগামী নির্বাচনের ফলাফলের রাজনৈতিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। কংগ্রেস নেতৃবর্গ যে এই নিয়েই বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত আছেন, এটা সকলেই দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু বন্দী-মুক্তির আন্দোলনকে নির্বাচন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ার পন্থা আছে, উপযোগিতাও আছে। এ আন্দোলন সুরু করার দায়িত্ব প্রধানতঃ কংগ্রেসের। সংবাদপত্রগুলিরও এ দায়িত্বের অংশ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আজ পর্যন্ত এ নিয়ে যা কিছু করা হয়েছে তা প্রধানতঃ ব্যক্তিগতভাবে—প্রচেষ্টা এবং লক্ষ্য, দুই দিক থেকেই। এই প্রচেষ্টার একটা বড় অংশের লক্ষ্য হচ্ছে অসুস্থ বন্দীদের মুক্তি। অসুস্থ ব্যক্তির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা মানুষের একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক অভ্যাস। কিন্তু সেটা রাজনৈতিক প্রয়াস নয়। এমন কি, সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কারো দুর্বল হৃদ্‌পিণ্ডের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করতে বসলেও তাতে জাতির রাজনৈতিক হৃদ্‌পিণ্ড সবলতর হয়ে উঠে না। অধিকন্তু এতে পীড়িত ব্যক্তিদের মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যায়। অথচ এমনি ধরণের অর্থহীন প্রচেষ্টার আবোল-তাবোলের মধ্যে বন্দীমুক্তির প্রশ্নের রাজনৈতিক দিকটা চাপা পড়ে যাচ্ছে।

বন্দীমুক্তি ও সরকারি নীতি—স্বল্পসংখ্যক স্বদেশ-ভক্তকে আরো কারারুদ্ধ করে রাখার পিছনে সরকারের যে নীতি রয়েছে, বন্দীদের মুক্তির জন্য আন্দোলন করতে হলে সেই নীতিটা পরিষ্কার বোঝা দরকার। এই সব বন্দীদের অনেকে গত ১৯৩০ সাল থেকে জেলে আছেন। এঁদের মধ্যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আসামীরা আছেন। ১৯৩০-৩৪ সালে দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আছেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে যে সকল রাজবন্দী কারামুক্ত হয়ে কংগ্রেসের নীতি কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করে কংগ্রেসের কাজ করছিলেন তাঁরা অনেকে আছেন। তার মধ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সেক্রেটারি এবং অন্যান্য সদস্যেরা আছেন। নিখিল ভারত রাষ্ট্র সভার (এ, আই, সি, সির) কয়েকজন সদস্য আছেন। এঁরা কারারুদ্ধ হয়েছেন জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরে, অথবা জাপানের যুদ্ধে নামার কিছু আগে। এমন অনেক তরুণ ছাত্র আছেন যাঁদের রাজনৈতিক জীবন সুরু হয়েছে ১৯৩৯ সালের পরে। তার আগেকার কোন কাজকর্মের সঙ্গে তাঁদের কোন যোগাযোগ থাকা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব ছিল না। এঁদের বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ থাকে তবে সেটা এই যে তাঁরা ৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লবে অংশ নিয়েছিলেন বা নিতে চেয়েছিলেন।—বন্দীদের এই শ্রেণীবিভাগ থেকে এটা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে এঁদের তিন শ্রেণীর বিরুদ্ধে সরকারের দুটি বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ, সরকারি ভাষায় যাদের সন্ত্রাস-বাদী বলা হয় তাদের সরকার ছাড়তে চায় না; এবং দ্বিতীয়তঃ, যাদের অবাধ গতিবিধি ভারতরক্ষার পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারত, তাদের জেলে আবদ্ধ রাখা হবে। এই দুটি ছাড়া সরকারের আর কোন যুক্তি থাকতে পারে না। অথচ যে কোন লোকই বুঝতে পারে যে আজকার দিনে এ দুয়ের কোনটিরই কোন ভিত্তি নেই। কারণ প্রথমতঃ, তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে কয়েকজন প্রকাশ্য ভাবে সরকারকে লিখে জানিয়েছেন যে সন্ত্রাসবাদে তাঁরা বিশ্বাস করেন না; বর্তমানে তাঁরা ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্ম-পদ্ধতিতে আস্থাবান। মুক্তি পেলে তাঁরা এই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করবেন। কম্যুনিষ্ট পার্টিকে সরকার আইন-সঙ্গত দল বলে ঘোষণা করে প্রকাশ্যভাবে কাজ করার অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু এই সব বন্দীদের মুক্তি দেন নি। অনুমান করা যেতে পারে যে সরকার এঁদের কথায় বিশ্বাস করেন না। কিন্তু সে অনুমান ভুল। সন্ত্রাসবাদের যুগ চলে গেছে এটা দেশ যে বুঝেছে, সরকার সেটা ভাল করেই বুঝেছেন। গত এগার বছরের মধ্যে এমন একটা ঘটনাও ঘটে নি যাকে সন্ত্রাসবাদী কাজ বলে প্রচার করা যায়। সুতরাং সন্ত্রাসবাদের অপরাধে কাউকে আটকে রাখার কোনই যুক্তি নেই। দ্বিতীয়তঃ ভারতরক্ষার কথা। কিন্তু সে অজুহাতটাও এখন নিছক গায়ের জোরে ছাড়া আর কোন জোরেই চলে না।

জার্মানি ও জাপানের সর্তহীন আত্মসমর্পণের পরও যদি সরকার পক্ষ থেকে এমন যুক্তি দেওয়া যায় যে কয়েকজন ভারতবাসী জেলের বাইরে থাকলে জার্মানি ও জাপানের কাছে ভারতের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে, তার মত হাস্যকর আর কিছু হতে পারে না। বাংলা সরকারের নীতি যাঁরা নির্ধারণ করেন তাঁদের মধ্যে এমন নিরেট বেকুব কেউ আছেন বলে আমরা বিশ্বাসও করি না। আগষ্ট-বিপ্লব সম্পর্কে যাঁরা কারারুদ্ধ হয়েছেন তাঁদের ছেড়ে না দেওয়ারও কোন যুক্তি নেই। কারণ, সরকার পক্ষ থেকে বড়লাট এবং কংগ্রেস পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি আজাদ উভয়েই যে সব প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে উভয় পক্ষ থেকেই স্বীকৃত হয়েছে যে তখনকার অনুসৃত নীতির জের টেনে যাওয়ার মত অবস্থা বর্তমানে আর নয়। বড়লাট বলেছেন, "Forgive and Forget." মৌলানা আজাদ বলেছেন, 'আগষ্ট আন্দোলন এখন আর সুরু করা হবে না'। সুতরাং সে আন্দোলন সম্পর্কে যুত ব্যক্তিগণকে মুক্তি না দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

অথচ মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে। বন্দীদের মুক্তি হচ্ছে না। এই যুক্তিহীন একগুঁয়েমির অন্তরালে যে অসৎ অপকৌশল রয়েছে জনসাধারণের সেটা ভাল করে বোঝা প্রয়োজন। এবং তদনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এটা খুব স্পষ্ট যে সন্ত্রাসবাদ বা ভারত-রক্ষা শুধু একটা ছল মাত্র এবং তা অতি নিম্নস্তরের নির্বোধ ছল। মুক্তি না দেওয়ার আসল কারণ হচ্ছে এই যে বাংলা দেশের কতকগুলি কর্মীর বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিভা যাতে কোনমতেই জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত হতে না পারে, তার জন্য সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই সব দেশভক্তকে তারা জনসাধারণের সঙ্গে মিলে কাজ করতে কিছুতেই দেবে না। কিন্তু জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন নীতিই দীর্ঘকাল চালু রাখা যায় না। তাই বাংলা সরকারের আপ্রাণ চেষ্টা হচ্ছে এই সব বন্দীদের জীবন ও কর্মনীতির সঙ্গে জনসাধারণের যাতে কোন পরিচয় না হয় তার ব্যবস্থা করা। যতদিন সম্ভব ছিল ততদিন সরকার পক্ষ থেকে বরাবর এঁদেরকে 'টেররিষ্ট' বলে ঘোষণা করেছে। তারপর যুদ্ধ এসে পড়াতে নতুন কথা পাওয়া গেল। সরকার বলতে সুরু করল এঁরা ফ্যাসিষ্ট। অবশ্য ইংরাজের রাজা রাখতে হলে তাকে সব লজ্জা সরম বরবাদ করে এমনি নির্লজ্জ মিথ্যা প্রচার করতেই হবে এতে আমাদের দুঃখ হবার কিছু নেই। আমাদের দুঃখের কথা এই যে এই অপপ্রচারে দেশের অনেক পণ্ডিত-মূর্খ বিভ্রান্ত হয়েছে। আমরা মনে করি বন্দীদের প্রকৃত পরিচয় জনসাধারণকে জানাবার দায়িত্ব নিতে হবে কংগ্রেসকে। দেশ যখন এঁদের চিনবে তখন জনসাধারণের মধ্যে এঁদের মুক্তির জন্য দাবী গঠিত হবে—যে দাবী কোন সরকারই উপেক্ষা করতে পারবে না। এবং আমরা আরো মনে করি যে নির্বাচন প্রচারের মধ্য দিয়েই এই দাবী সৃষ্টির কাজ খুব ভাল ভাবে হতে পারে। এমনকি, বন্দীদের মধ্যে যারা জনসাধারণের কাছে অপেক্ষাকৃত পরিচিত, বিভিন্ন কেন্দ্রে তাঁদের নামেই নির্বাচন প্রচার চালালে বন্দীমুক্তির আন্দোলন ও নির্বাচন প্রচার দুইই জোরালো হবে।

কলিকাতার ছাত্র আন্দোলন—এই মন্তব্য যখন লেখা হচ্ছে সেই সময় গোটা কলকাতা সহরে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ৪২ সালের আগষ্ট সেপ্টেম্বরে দেখা গিয়েছিল একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের নিষ্ঠুর উলঙ্গ বর্বরতা আর একদিকে সেই বর্বরতার প্রতিরোধে দৃঢ়-সঙ্কল্পিত নিরস্ত্র জনসাধারণের সর্বস্ব পণে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে-পড়া। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী তখন যে অত্যাচার করেছে, ইতিহাসে তার তুলনা বেশী নেই। অত্যাচারের পেষণে জনগণের প্রতিরোধ শিথিল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ জ্বলে-ওঠা বারুদের মত বিশাল জনগণের সেই ক্রোধাগ্নির স্মৃতি অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত কারো মন থেকেই মুছে যায় নি। মাত্র তিন বছরের মধ্যেই সে আগুন আবার জ্বলে উঠতে পারে একথা তাবা অনেকের পক্ষেই কঠিন ছিল। কিন্তু আজ সেটা সম্ভব হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে গত ২১শে সেপ্টেম্বর বুধবার কলকাতার ছাত্রেরা আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য ও তারতব্যাপী দমননীতির প্রতিবাদে ওয়েলিংটন পার্কে এক সভা করেন। সভার শেষে ছাত্রদের এক শোভাযাত্রা ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে যেতে থাকে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরেই

ম্যাডান স্ট্রীটের মোড়ে পুলিশ তার প্রতিরোধ করে এবং বলে যে ডালহৌসির দিকে শোভাযাত্রা করে যাওয়ার হুকুম নেই। তখন ছাত্রেরা রাস্তার ওপর বসে পড়েন এবং জানিয়ে দেন যে পথ খোলা না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা সত্যাগ্রহ করবেন। ডালহৌসি স্কোয়ারে যাওয়ার সঙ্কল্প থেকে তাঁরা কিছুতেই বিচ্যুত হবেন না। শোভাযাত্রীরা সম্পূর্ণ শান্তভাবে থাকেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অতঃপর তাঁদের কি কর্তব্য সে-সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতাদের পরামর্শ চেয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীসুরেন্দ্র মোহন ঘোষ তখন কলকাতার বাইরে ছিলেন, এবং শ্রীশরৎচন্দ্র বসু ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হননি। শ্রীকিরণশঙ্কর রায় ও অন্যান্য কয়েকজন এসে ছাত্রদের শোভাযাত্রা ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু ছাত্রেরা সে পরামর্শ গ্রহণ করেন নি। তাঁদের বক্তব্য ছিল এই যে যেহেতু শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ নয়, সেইজন্য মাঝ পথে একে আটক করাতে পুলিশের জুলুমের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এ জুলুম তাঁরা সহ্য করবেন না। কংগ্রেসের নির্দেশের প্রশ্ন এখানে ওঠে না। যতক্ষণ তাঁরা সম্পূর্ণ অহিংসভাবে পুলিশের জুলুমের প্রতিরোধ করবার জন্য প্রস্তুত, ততক্ষণ তাঁদের কাজে কংগ্রেসের সমর্থন আছে বলে তাঁরা ধরে নেবেন, এবং কংগ্রেস নেতাদের সাহায্য প্রত্যাশা করবেন।

সন্ধ্যা সাড়ে-ছ'টার পর দ্বিতীয় একটি শোভাযাত্রা সেন্ট্রাল এভেনিউ থেকে ধর্মতলায় পৌঁছায়। পুলিসদল তখন দুই শোভাযাত্রীদলের মাঝখানে পড়ে যায়। মতিশীল স্ট্রীটে একদল অশ্বারোহী পুলিশ মোতায়েন ছিল আগে থেকেই। এই সময় তারা এসে শোভাযাত্রীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও পদাতিক পুলিশ লাঠি চালাতে থাকে। শোভাযাত্রীরা এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং তাঁদের মধ্যে কিছু চঞ্চলতা দেখা দেয়। কিন্তু তবু তাঁরা ছত্রভঙ্গ হন নি। তখন ইউরোপীয় পুলিশ কর্মচারিরা যদৃচ্ছা গুলী ছুঁড়তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে লাঠিও চলে। ফলে আহতদের সাহায্য করতে যারা যান তাঁরাও অনেকে আহত হন। শোভাযাত্রীরা তখন কিছু পরিমাণে ছত্রভঙ্গ হয়ে যান। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাঁরা রাস্তার ওপর এসে দাঁড়ান। আহতদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পুলিশও সাময়িকভাবে আবার লাইন করে পথ রুখে দাঁড়িয়ে যায়। এরপর বহুক্ষণ পর্যন্ত ছাত্রদের মধ্যে একটা অস্থিরতার ভাব দেখা যায়। ছাত্র নেতাদের মধ্যে একটা দ্বিধার ভাব ফুটে উঠেছিল। অনেকগুলি দল মিলে সভা ও শোভাযাত্রা হয়েছিল বটে। কিন্তু সঙ্কটের মধ্যে পড়ার পরে বোঝা গেল যে বিভিন্ন দলের মধ্যে মতের অনৈক্য ছিল, এবং কোন দলেরই লক্ষ্য সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোন ধারণা ছিল না। সুতরাং শৃঙ্খলা তাদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। প্রাণ গেলেও ডালহৌসি স্কোয়ারে যাওয়ার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করা উচিত হবে না, এ বিষয়ে অনেকেই একমত ছিলেন। কিন্তু নিজেদের মধ্যে উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে তর্ক আলোচনা চলতেই থাকে। অনেকের মধ্যেই একটা অনিশ্চয়তার ভাব ফুটে উঠে। গুলীর পূর্বে সকলেই সম্পূর্ণ অহিংস ছিলেন। কিন্তু পরে প্রায় সকলের মধ্যেই প্রতিশোধ স্পৃহা দ্রুত বেড়ে উঠতে থাকে। সকলের মধ্যেই একটা বেপরোয়া উত্তেজনার ভাব দেখা দেয়। অবস্থা যে কোন মুহূর্তেই অত্যন্ত গুরুতর হয়ে ওঠার আশঙ্কা ছিল। এই সময় শ্রীমতি বীণা দাস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তখন রাত্রি নটা। সেই সময় থেকে পরদিন সকাল সাতটা পর্যন্ত কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে শোভাযাত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন এবং ছাত্রদের প্রতিরোধ শক্তি যাতে কোন হিংসাত্মক কাজের পথে চালিত না হয় তারজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। সে রাত্রে শ্রীমতি বিমল প্রতিভা দেবী এবং আরো কয়েকজন এসেছিলেন। কিছু পরে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিও এসেছিলেন। কিন্তু ছাত্রেরা তাঁদের কারো কথা শুনতে চান নি। স্বর্গীয়া জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী শ্রীমতি দাসের সঙ্গে ছাত্রদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। সকাল হতে না হতে পুলিসের বর্বরতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দাবানলের মত সহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ট্রাম, বাস বন্ধ হয়ে যায়। দোকানপাট কিছুই খোলা থাকেনা। বেলা দশটার সময় কলকাতা সহরের বড় বড় রাস্তাগুলি ঘুমন্ত পুরীর মত নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হচ্ছিল শুধু মাঝে মাঝে বিভিন্ন শোভাযাত্রী দলের চীৎকারে। সহরের সব অঞ্চল থেকে শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে দলে দলে লোক এসে শোভাযাত্রায় যোগ দিতে থাকে। সকলের চোখে মুখে তীব্র ঘৃণা ও রোষ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। দুপুরের পর থেকে

কলকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের অনেক কারখানা বন্ধ করে শ্রমিকরা বেরিয়ে আসে। এতখানির জন্য সরকার বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না। সকাল থেকে শহরের নানাস্থানে গুলি চলতে থাকে এবং বহু লোক হতাহত হয়। গুলী চলবার পরও জনতা স্থান ত্যাগ না করায় বেলা তিনটার পর ধর্মতলা থেকে পুলিসবাহিনী উঠিয়ে নেওয়া হয়। বিজয়ী ছাত্রদল ও জনগণ শোভাযাত্রা করে ডালহৌসি স্কোয়ার প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু ততক্ষণে জনসাধারণের মধ্যে ক্ষিপ্ততা অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার তৃতীয় দিনে এই মন্তব্য যখন লেখা হচ্ছে তখনও শহরের বিভিন্ন স্থানে জনতার রোষের অভিব্যক্তি ও পুলিসের গুলির সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

গুলী চালানর কৈফিয়ৎ হিসাবে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে ছাত্রেরা যথেষ্ট শান্ত ছিলেন না। তাঁরা ইট নিয়ে পুলিশ দলকে আক্রমণ করেছিলেন এবং একখানা পুলিশের গাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এরকম ঘটনা সত্যই ঘটেছিল কি না, তা জানবার কোন উপায় নেই। ঘটে থাকতে পারে, নাও ঘটে থাকতে পারে। যদি ঘটেও থাকে, সেটা ছাত্রদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল তার কোন প্রমাণ নেই। অপর দিকে, ছাত্রেরা সংঘবদ্ধভাবে অহিংস প্রতিরোধের যে শক্তি পরবর্তী দিনে দেখিয়েছেন তাতে এটা বিশ্বাস করাই স্বাভাবিক যে তাঁদের দ্বারা হিংসাত্মক কাজ অনুষ্ঠিত হয় নি। ভারতবর্ষে অহিংস সংগ্রামের কাহিনীটা ঠিক গত বুধবারের ঘটনা নয়; এর একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসের শিক্ষা হচ্ছে এই যে, যারা হঠাৎ উত্তেজনায় বিবেচনা বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, অজস্র গুলীবৃষ্টির মধ্যে নির্ভীক ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস তাদের থাকে না। তারা হয় বেতাবে পাল্টা প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে, না-হয় পালিয়ে যায়। বর্তমান ক্ষেত্রে ছাত্রেরা এ দুয়ের কোনটাই করেন নি। মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনেও তার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন একুশ ঘণ্টাকাল অবিচলিত ধৈর্যে লড়াই করে মরণজয়ী হোলো যারা তাদের চরিত্র সম্বন্ধে লজ্জার সঙ্গে কথা বলা উচিত। বেহেড উন্মাদ এবং নির্লজ্জ শয়তান ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করবে না যে এই ছাত্রদের মধ্যে কেউ ইট ছুঁড়েছিল বা গাড়ী পুড়িয়েছিল। ওরকম ঘটনা যদি সত্যই ঘটে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে সে কাজ সরকারি গুপ্তচরদের। নিরস্ত্র জনতা ইট দিয়ে বন্দুকধারী পুলিশকে আক্রমণ করেছে, এটা ইংরাজের পুলিশের সনাতন গল্প। এ গল্পে আর কেউ বিশ্বাস না করুক, তারা নিজেরা করে, অথবা করতে চেষ্টা করে, যাতে ইটের বদলে গুলী ছোড়াটাও শেষে আর বেমানান না দেখায়। এ গল্প তারা এর আগেও বহুবার বলেছে, এবং প্রকাশ্য তদন্তে প্রতিবারই এ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু গল্প যারা তৈয়ার করে, এতে তাদের লজ্জা হয় নি। কারণ তারা দোকানদার। লজ্জাবোধ থাকলে তাদের দোকানদারি করা চলত না। আমাদের মনে পড়ছে ১৯৩১ সালে হিজলী ক্যাম্পের ঘটনা। জেলের দরজা খুলে বন্দীদের ঘরের মধ্যে ঢুকে গুলি চালিয়েছিল ইংরাজের পুলিশ। বাংলা সরকারের একজন সেক্রেটারি হাচিন্‌স্ সাহেব তখনও সংবাদপত্রের মারফৎ এই ইটপাটকেলের গল্প দেশে ছড়িয়েছিল। পরে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত সরকারি বেতনভুক ভারতীয় ও ও ইংরাজ দুজন বিচারক তদন্ত করে একমত হয়ে রায় দিয়েছিলেন যে হাচিন্‌সের গল্প সত্য নয়, সে মিথ্যাবাদী। বিচারকের প্রকাশ্য তদন্তে প্রমাণিত সেই চরম মিথ্যাবাদীরও পরবর্তীকালে পাপে ধাপে পদোন্নতি হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বড় কর্মচারী হওয়ার বাধা হয় নি। এমন কি জাপযুদ্ধের সময় ব্রহ্মদেশে ইংরাজের পরাজয়ের পর বারো লক্ষ অসহায় প্রবাসী ভারতীয়ের ভাগ্যবিধাতা হয়েছিল এই লোকটি, এবং তার বিধানের ফলে কি ঘটেছিল সে কথা সকলেরই জানা। ইংরাজ রাজত্বের এই হচ্ছে আসল রূপ। এবং এ-রূপ বহুদিন আগেই এদেশের লোকের চোখে উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে। সুতরাং ধর্মতলায় নিরস্ত্র ও অহিংস ছাত্রদের ওপর গুলী বর্ষণের সরকারি কৈফিয়তে কেউ ভুলবে না। বরং শয়তান বাইবেল পড়বে এটা যদি আমরা আশা করতাম তবে আমাদের পক্ষে সেই হোতো চরম নির্বুদ্ধিতার নিদর্শন।

এই অন্যায়ের তদন্তের দাবী উঠেছে। নিরপেক্ষ ও বেসরকারি তদন্ত হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। লজ্জাবন্ধভাবে জনসাধারণের এই তদন্তের দাবী সমর্থন করা উচিত। গুলী বর্ষণের জন্য যে দায়ী তার শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু শাস্তি হবে না, এটাও আমরা

জানি। অন্যায়ের প্রতিকার কোনদিন হয়, কিন্তু অন্যায় যে করে তার শাস্তি সচরাচর হয় না। এটা ইতিহাসের শিক্ষা। তদন্তের জন্য আন্দোলন প্রসঙ্গে এ কথাটা যেন আমরা ভুলে না যাই যে অন্যায়ের প্রতিকারটাই আমাদের আসল লক্ষ্য। সমবেতভাবে শাসনকর্তৃত্ব হস্তগত করবার জন্য প্রস্তুত হতে পারলে তবেই সে লক্ষ্যে পৌঁছান যাবে। আজকার এই তদন্তের দাবী সেই বিশাল প্রচেষ্টার একটি সামান্য অংশমাত্র। এ কথা মনে রেখে এই দাবী সমর্থন করতে হবে। ছাত্রেরা এই প্রচেষ্টার গাম্ভীর্যের যে আস্বাদ সৃষ্টি করেছেন তা অতুলনীয়। কংগ্রেসের অহিংস প্রতিরোধ নীতির কার্যকারিতারও বিস্ময়কর প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ দুয়ে মিলে অভিযানের পথের স্পষ্ট সন্ধান দিচ্ছে। আমরা আশা করি বাংলার ছাত্রদের কাছে পথের এই নির্দেশ ব্যর্থ হবে না। অহিংস বিপ্লবের পথটা তরুণ বাংলা বরাবরই সন্দিগ্ধ চোখে দেখে এসেছে। সে সন্দেহ এবারে কেটে যাওয়া উচিত। এবং এই আন্দোলন প্রসঙ্গে ছাত্রদের মধ্যে যে অপূর্ব নৈতিক শক্তি ও ঐক্যবোধ বিকশিত হলো, তাকেও আর ঘুমিয়ে পড়তে দেওয়া উচিত হবে না। ছাত্রদের পরবর্তী কর্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। জনসাধারণের যে নৈতিক সহানুভূতি ও সক্রিয় সমর্থন তাঁরা পেয়েছেন, তা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি বিপুল। তাঁদের বুঝে দেখা উচিত যে এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র এই কারণে যে তাঁরা কংগ্রেসের পতাকা হাতে কংগ্রেসের দাবী নিয়ে রাস্তায় হয়েছিলেন। কংগ্রেসের এ দাবী সমগ্র ভারতবর্ষের জনগণের দাবী। বিজয়ী শোভাযাত্রার সম্মুখে কংগ্রেস পতাকার পাশে পাশে কংগ্রেস বিরোধী বিভিন্ন দলের পতাকাও এসে জুটেছিল, এতেই প্রমাণ হচ্ছে যে ক্ষুদ্র ব্যক্তি-স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধ হয়ত আরো কিছুদিন জিইয়ে রাখা চলে, কিন্তু বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের একচ্ছত্র নেতৃত্ব অস্বীকার করার শক্তি আজ আর কারো নেই। আজ ছাত্রদের কর্তব্য তাঁদের বিজয় অভিযানের পথ থেকে ওই বিরোধী পতাকাগুলিকে একে একে অপসারিত করা। এ কাজ কঠিন আমরা জানি। কিন্তু প্রাণ দিতে যারা ভয় পায় না, তাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব কিছুই নয়। ওই সব পতাকার নীচেও বহু নিভিক, মরণজয়ী প্রাণ স্পন্দিত হচ্ছে আমরা বিশ্বাস করি। সুতরাং আমরা আরো বিশ্বাস করি যে প্রাণোৎসর্গের উপযুক্ততম ক্ষেত্র তাঁরাও খুঁজে পাবেন। এঁদের পথ দেখাবার দায়িত্ব রয়েছে তাঁদের যাঁরা নিজের বিচার বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিঃসংশয়ে মেনে নিতে পেরেছেন।

জনগণের উচ্ছৃঙ্খলতা—গত দুদিন ধরে কলকাতা সহরে ক্ষুব্ধ জনতার ক্রোধের যে বিশৃঙ্খল অভিব্যক্তি কোন কোন স্থলে দেখা যাচ্ছে তা আমরা সমর্থন করি না। কংগ্রেস নেতারা এই উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এবং করছেন। ছাত্র দলগুলিও তাদের সব শক্তি নিয়োগ করেছে জনতার অধৈর্য শান্ত করবার জন্য। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে অবিরত যে গুলীবর্ষণ চলছে তাতে নেতাদের ও ছাত্রদের সব আবেদন ও চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। বাংলার লাট-সাহেব মিঃ কেসি তাঁর বেতার বক্তৃতায় (২৩শে নভেম্বর) বর্তমান অবস্থার কতদূর বিকৃত ছবি দেওয়া যায় তার চেষ্টা করেছেন। জনসাধারণ হঠাৎ ক্ষেপে উঠে সরকারের অসুবিধা করেছে, শিশুর মত সরল ভাষায় এই কথাটা তিনি লোককে বোঝাতে চেয়েছেন, একটা কথা তিনি ভুলে গেছেন যে তাঁর শ্রোতারা সবাই শিশু নয়, এবং তাদের অনেকে দস্তুর মত দুক্ত-ভোগী। সরকারি আচরণই যে জনসাধারণের ক্ষিপ্ততার একমাত্র কারণ একথা স্বীকার করতে তাঁর চাকরীর অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু বুঝতে লোকের অসুবিধা হচ্ছে না। নেতাদের সঙ্গে কথা বলে তিনি বুঝছেন যে বর্তমান গোলমাল তাঁরা সমর্থন করেন না। কিন্তু তাঁর একথা ঘোষণা করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ নেতাদের সঙ্গে কথা না বলেও আমরা ঠিক ঐ কথাই বুঝেছিলাম। বর্তমান হাঙ্গামা আমরা কেউই সমর্থন করি না। তবে সমর্থন না করার পক্ষে তাঁর ও আমাদের কারণের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে। জনতার উচ্ছৃঙ্খলতা শান্ত হোক এটা আমরা চাই। আমরা প্রত্যেকেই এই উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। এবং চেষ্টা করছি বলেই আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে এই হাঙ্গামার জন্য দায়ি কেসী সাহেবের সরকার। সরকারি নীতির পরিবর্তন না হলে জনতাকে শান্ত করা সম্ভব নয়। এবং নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে সরকারও এটাই চান যে জনরোষ যেন

রাজনৈতিক নেতাদের নিষ্ক্রিয়শক্তির বাইরে চলে যায়। কারণ তখন এক ঢিলে দুই পাখী মারা সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে। কেসি সাহেব শিশুর মত কথা বলেও তিনি শিশু নন। সুতরাং তাঁর সরলতায় আমরা সন্দেহ করি।

আলোচ্য ঘটনাটিকে আমরা যে ভাবে দেখেছি তাতে আমাদের মনে হয়, বুধবার সন্ধ্যায় কংগ্রেসের কোন যোগ্য নেতা যদি গুলীবর্ষণের পূর্বেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতে পারতেন, তবে হাঙ্গামা এমন আকার ধারণ করত না। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু শ্রীশরৎচন্দ্র বসু কলকাতায় থেকেও সেখানে উপস্থিত হন নি। ছাত্রদের শত আবেদন নিবেদন এবং বিশিষ্ট নেতাদের চেষ্টাতেও সেদিন শরৎবাবুকে ঘটনাস্থলে আনানো সম্ভব হয়নি। ঘটনার ওপর তিনি যেদব বিবৃতি দিয়েছেন তাতে এটা পরিষ্কার যে আগাগোড়া ব্যাপারটার তাৎপর্যই তিনি বুঝতে পারেন নি। তাঁর মত নেতার এই অক্ষমতা মারাত্মক। তাঁর বক্তব্য এই যে লোহাপট্টি প্রভৃতির ব্যাপারটা তিনি জানতেন না। পরে যখনই তিনি সংবাদ পান যে গোলমাল একটা ঘটবার আশঙ্কা হচ্ছে, তিনি টেলিফোনে এবং লোক মারফৎ লোহাপট্টা ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ পাঠিয়েছিলেন। যেহেতু ছাত্রেরা তাঁর নির্দেশ মান্য করে নি সেই হেতু গোলমালের দায়িত্ব তাঁর ত নেইই, উপরন্তু ছাত্রদের মধ্যে ডিসিপ্লিনের অভাবের জন্য তিরস্কার করবার অধিকারও তাঁর আছে।—বহু ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনায় আমরা জেনেছি যে শরৎবাবুর "বাণী" ও বিবৃতি ছাত্রসমাজকে মর্মান্তিক আঘাত করেছে।

শরৎবাবুর নির্দেশ না নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করা হয়েছে এবং তাঁর নির্দেশ নিয়ে সেটা বন্ধ করা হয় নি—দুটাই অত্যন্ত সত্য। কিন্তু নির্দেশের অপেক্ষা না করা এবং নির্দেশ উপেক্ষা করার প্রশ্নটা শরৎবাবুর কাছে এতই বড় হয়ে উঠেছে যে এই আন্দোলনের স্বরূপ তাঁর চোখে ঢাকা পড়ে গেছে। তিনি প্রথমেই ধরে নিয়েছেন যে এটা ছাত্রদের একটা খেয়াল—আরো পাঁচটা ছোটবড় খেয়ালের মতই ইচ্ছা করে তারা এটা করছে, ইচ্ছা না করলে নাও করতে পারত এবং নিষেধ করলে নিশ্চয়ই আর করবে না। শরৎবাবু এবং আরও অনেকের চোখেই সেদিন এ আন্দোলনের গোড়ার কথাটা ধরা পড়েনি। এটা যে কারো একটা আকস্মিক খেয়াল নয়, এটা যে ১৯৪২ সালের 'Quit India',—'ভারত ছাড়' আন্দোলনের একটা নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ—যে দাবী নিয়ে এই শতাব্দীর প্রথম থেকেই বিশাল ভারতবর্ষের গণচেতনার উন্মেষ সুরু হয়েছে, যুদ্ধ থামবার সঙ্গে সঙ্গেই যে দাবী গোটা এশিয়ায় ছড়িয়ে গেল 'এশিয়া ছাড়' ধ্বনি তুলে—পরাধীনতার অক্টোপাসের সঙ্গে একটা বিস্তীর্ণ মহাদেশের সেই মরণপণ ঝাপটা-ঝাপটির একটা টুকরা দৃশ্য মাত্র—পরিপক্ক বুদ্ধি রাজনৈতিক দর্শকরাও এটা বুঝতে পারেন নি।

নেতৃত্বের কাজ হচ্ছে সব সময়েই গণআন্দোলনের সঙ্গে যোগ রক্ষা করা; কোন ক্ষেত্রে কোন আন্দোলন যদি ভুল পথে পরিচালিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন নেতৃত্বের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের মধ্যে এসে সেই আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালিত করবার চেষ্টা করা। যারা এ আন্দোলনে নেমেছিল, এর সমগ্রত্বের দৃষ্টি তাদের অনেকের না থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে নেতৃত্বের কাজ হচ্ছে আন্দোলনকারীদের দৃষ্টি বাধামুক্ত করে সমগ্রের সঙ্গে সেই যোগাযোগটা ধরিয়ে দেওয়া। আমরা আনন্দিত বিস্ময়ে দেখেছি সেদিন শ্রীমতী বীণা দাস কেমন করে এ দুর্যোগের মধ্যে ছাত্রদের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন; কেমন করে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল করবার এবং বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকায় এ আন্দোলনের রূপকে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। দরদী ও সঠিক নেতৃত্বের আবেদন যে ব্যর্থ হয়না, সেদিন আমরা তা দেখেছি।

বিপ্লবের সূচনা—জনসাধারণের অকারণ উচ্ছৃঙ্খলতা কেউ সমর্থন করেন না, আমরাও করি না। কিন্তু তিন দিন যে ব্যাপার চলেছে তাকে নিছক উচ্ছৃঙ্খলতা বলে বর্ণনা করা, এবং তদনুযায়ী কাজ করা অত্যন্ত ভুল হচ্ছে, একথা সাংবাদিক হিসাবে সরকারকে ও রাজনৈতিক নেতাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। উচ্ছৃঙ্খলতা বলতে সাধারণতঃ বোঝায় লক্ষ্যহীন স্বেচ্ছাচার। আজ জনসাধারণ ক্ষেপে উঠেছে বটে, কিন্তু তাদের কার্যকলাপের মধ্যে এমনি স্বেচ্ছাচারের দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়ে নি। বরং আমরা

যতগুলি ঘটনা দেখেছি বা শুনেছি তার সবগুলিই সরকারের কোন না কোন উপদ্রবের প্রতিবাদে সঙ্ঘবদ্ধ কাজ। এ কাজ যারা করছে তাদের (১) প্রায় কারো রাজনীতির কোন জ্ঞান নেই; (২) তাদের কোন লক্ষ্য নেই; (৩) তাদের নেতা নেই। এগুলা হচ্ছে 'নেই'-এর দিকে। 'আছে'র দিকে যা' তা' হচ্ছে (১) ইংরাজ শাসনের ফলে তাদের বর্তমান দুরবস্থা, এই জ্ঞান, (২) কংগ্রেস এই দুরবস্থার প্রতিকার করবে এই ভরসা, (৩) সুতরাং উপস্থিত উপদ্রবের প্রতিবাদে ঝোঁকের মাথায় যে যা কিছু করছে সব কংগ্রেসের কাজ। এই বিশ্বাসে তারা রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে, কাউকে যেতে দেবে না; কিন্তু কংগ্রেস পতাকা-ওয়ালা গাড়ী দেখবা-মাত্র নিজেরা রাস্তা পরিষ্কার করে ক্রুদ্ধ জনতার মধ্য দিয়ে গাড়ীর সঙ্গে চীৎকার করতে করতে দৌড়েছে,'কংগ্রেসকা হাথ, ছোড় দেও!' একটাও অকারণ মারামারি, হাঙ্গা, খুন বা লুট-তরাজের গল্প আমাদের কানে আসে নি আজ তিন দিনে। অথচ প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর একবার করে গুলী চলেছে। নেতৃত্বহীন জনতার এতখানি শৃঙ্খলা পূর্ণ-বিপ্লবের দিনেও ইতিপূর্বে কোন দেশে দেখা গেছে বলে আমরা জানি না। এখানে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা অভাবনীয়। মানুষ মৃত্যুভয় অতিক্রম করেছে। কিন্তু এটা আত্মহারা ক্ষ্যাপার বে-পরোয়া সাহস নয়। এই ক্ষ্যাপামীর মধ্যে শৃঙ্খলা আছে, সঙ্কল্পের স্থিরতা আছে। এই হচ্ছে বিপ্লব। পুঁথি-পড়া চোখের ঝাপসা দৃষ্টি একে এখনও চিনতে পারছে না। অবশ্য এটা এখনও বেশীদূর ছড়ায় নি। অজস্র গুলীবৃষ্টির মধ্যে আগামী কয়েকদিনে এই বিপ্লব ডুবিয়ে দেওয়া এখনও সহজ। কিন্তু তার পরিণাম শুভ নয়, এটা আমরা সরকারকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। মিঃ কেদি নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে খুসী হয়েছেন এই জেনে যে নেতারা কেউ এ হাঙ্গামা সমর্থন করেন না! কিন্তু এতে তাঁর একটা মারাত্মক ভুল হচ্ছে। নেতারা সমর্থন করছেন কিনা তাতে কিছু এসে যাচ্ছে না। তাঁরা এর সুরুও করেন নি। কিন্তু আজ তাঁরা যদি এর নেতৃত্ব না নিতে পারেন, তবে কাল তাঁরা আর নেতাই থাকবেন না। এ ক্ষ্যাপামী তার আপন নেতৃত্ব সৃষ্টি করে নেবে। এটা আমরা সরকার ও নেতা দুই তরফকেই ভেবে দেখতে বলি। সরকারকে বলি এই জন্য যে, বিপ্লবের রক্ত-পিচ্ছিল পথ এড়াতে পারলে আমরা খুসী হবো। বিপ্লব অপরিহার্য। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতিভা এর বৈকল্পিক পথের সন্ধান করছে। ইতিমধ্যে সরকারি নির্বুদ্ধিতা যদি এমনি চলতে উঠতে থাকে, তবে সে সন্ধান ব্যাহত হবে, ভারতবর্ষও অন্যান্য দেশের মতই বিপ্লবের রক্তাক্ত পথে হয়ত এগিয়ে যাবে। সে যাত্রা কারো পক্ষেই শুভ নয়। অশান্ত, বিক্ষুব্ধ জনতা আজ কংগ্রেসকে তাদের একমাত্র নেতা বলে জেনেছে, চিনেছে, বুঝেছে। এ সুযোগ যেমন কংগ্রেসের, তেমনি সরকারেরও। এই জনতার কল্যাণ বিধানের কোন শক্তি বা বুদ্ধি যদি কেদি সাহেবের থাকে, তবে তিনি কংগ্রেস নেতাদের ডেকে অন্য পরামর্শ করুন। কলকাতায় রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারি টহলের ব্যবস্থা দ্বারা কোন সদুদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না।

বিপ্লবের শহীদ্—এই খণ্ড-বিপ্লবে আজ পর্যন্ত কতজন হতাহত হয়েছেন, তার সঠিক তালিকা এখনও পাওয়া যায় নি। নিহতদের পরিবারবর্গ ও আহতদের প্রতি আমরা আমাদের গভীর সহানুভূতি জানাচ্ছি। আর যাঁরা প্রাণোৎসর্গ করেছেন তাঁদের জন্য সমবেদনা নয়, অশ্রু নয়, আক্ষেপ নয়, তাঁদের উদ্দেশ্যে শুধু দিতে পারি—রামেশ্বর বন্দোপাধ্যায়ের শবযাত্রায় সেদিন দল ও সম্প্রদায় নির্বিশেষ চল্লিশ হাজার নরনারী যা দিয়েছে—ভরা-হৃদয়ের পূর্ণ নীরবতা।

জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী—গত বৃহস্পতিবার (২২ নভেম্বর) রামেশ্বর বন্দোপাধ্যায়ের শবানুগমনের সময় জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীর মোটর গাড়ীর সঙ্গে একখানি মিলিটারি লরীর সংঘর্ষের ফলে রাসবিহারি এভেনিউ ও রসারোডের সংযোগস্থলে জ্যোতির্ময়ী দেবী সাংঘাতিক আহত হন ও হাসপাতালে নীত হওয়ার অল্পকাল পরেই দেহত্যাগ করেন। জ্যোতির্ময়ী দেবী একজন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রেই তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল বেশী। বাংলার যে সকল নারী মুক্তিসংগ্রামের পুরোভাগে স্থান নিয়েছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতমা। কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দিয়ে বহুবার তিনি কারাবরণ করেছেন। নির্ভীক তেজস্বীতা ও হৃদয়বত্তার গুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। বর্তমান খণ্ড-বিপ্লবের

মধ্যেও তিনি যে কাজ করেছেন তার তুলনা নেই। বুধবার সমস্ত রাত্রি তিনি ছাত্রদের মধ্যে থেকে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁর কথা না মানলেও তিনি তাদের ছেড়ে যান নি। যতবার লাঠিচার্জ ও গুলীবর্ষণ হয়েছে তার সব কয়বারই তিনি ঘটনাস্থলে ছিলেন। প্রায় ষাট বছরের ওপর তাঁর বয়স হয়েছিল। কিন্তু এই বয়সেও যে অক্লান্ত কর্মশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তা বিস্ময়কর। আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নেবার জন্য বাসায় যেতে তাঁকে রাজী করান যায় নি। বিপদের মুখে ছেলেদের ছেড়ে দিয়ে তিনি কিছুতেই যেতে পারছিলেন না। রামেশ্বরের শবযাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা করে সব পিছে তিনি গাড়ীতে যাচ্ছিলেন। সেই দিনই এই মহীয়সী মহিলার দেহান্ত হবে তা কেউ ভাবতে পারে নি। তাঁর মৃত্যুতে বাংলার নারীসমাজ একজন যোগ্য ও ভরসাস্থলী নেতাকে হারালো। তাঁর ভ্রাতা শ্রীপ্রভাত গাঙ্গুলীকে আমরা আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি।

কংগ্রেসের সদস্য হবার শেষ তারিখ—রাষ্ট্রপতি আমাদের নির্দেশ অনুসারে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত কংগ্রেস সদস্য হওয়া যাবে। আমরা আশাকরি সকলেই নিজেরা গরজ করে কংগ্রেসের সদস্য হবেন।

কংগ্রেস সংগঠন—বিভিন্ন স্থানের কর্মীদের কাছ থেকে আমাদের কাছে অভিযোগ আসছে এই মর্মে যে অনেকগুলি প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটি কোনই কাজ করছে না। নামে মাত্র একটা কমিটি আছে। কিন্তু তার, এমনকি, একটা নির্দিষ্ট অফিস পর্যন্ত নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন অদ্ভুত কথাও শোনা গেছে যে কর্মীদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে কমিটির প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারি বলেছেন, 'অফিস? অফিস আমার পকেটেই আছে!'—বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারির কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে তিনি যেন এই অভিযোগের তদন্ত করেন, এবং এই সব ভদ্রলোকদের একটু বুঝিয়ে দেন যে, ব্যক্তিবিশেষের পকেট যতই বড় হোক, কংগ্রেস অফিসের পক্ষে সেটা যথেষ্ট প্রশস্ত স্থান নয়। যে পকেটে কংগ্রেস অফিস থাকতে পারে সেখানে নিঃসন্দেহ আরো দুই একটি ভাল ভাল জিনিসও আছে। কিন্তু সে সব জিনিসের সঙ্গে কংগ্রেস অফিসের মিতালি রক্ষা করা আর সমিচীন হচ্ছে না, এই কথাটা ঐ সব ভদ্রব্যক্তিরা যত তাড়াতাড়ি বুঝবেন ততই দেশের পক্ষে ভাল হবে, এবং তাঁদেরও মন্দ হবে না।

আমাদের কথা—নানা কারণে 'মন্দিরা' প্রকাশ করতে বিলম্ব হয়ে গেল। এজন্য ত্রুটী স্বীকার করছি।

শ্রীযুক্তা কমলা দাশগুপ্তা চিকিৎসকদের পরামর্শে পূর্ণ বিশ্রামের জন্য হাজারীবাগে গেছেন।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅবনীনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা'র কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

অগ্নিযুগ

অষ্টম বর্ষ | পৌষ—১৩৫২ | নবম সংখ্যা

কেন ৪২ সাল?

শ্রীঅঃ

'৪২ সালের আগষ্ট-বিপ্লব ভারতের ইতিহাসে এক চিরস্থায়ী আসন দখল করবে। নিতান্ত সরকার-ঘেঁষা ও সরকারী অনুগ্রহপুষ্ট দু'একটি দল ভিন্ন আর সবাই এই বিপ্লব প্রচেষ্টার জন্য কংগ্রেস নেতৃবর্গের প্রশংসা করছে। পূর্বে যারা কংগ্রেস নেতৃবর্গের প্রতি আস্থাহীন ছিল, তারাও আজ এই আগষ্ট-বিপ্লবের জন্য তাঁদের সুখ্যাতি করছে। কিন্তু বহু লোকের মনেই এই বিপ্লব-প্রচেষ্টার মর্ম অনুভূতি হয়নি। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, সেই থেকে ধাপে ধাপে কংগ্রেস এগিয়ে গিয়েছে গণবিপ্লবের দিকে। সেই মাসেই কংগ্রেসের কার্যকরী সভা ব্রিটিশ সরকারের নিকট জানাবে দাবী করে—এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ভারতে কি ভাবে প্রয়োগ করা হবে। সরকারের কাছ থেকে সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রী-মণ্ডলীদের মন্ত্রিত্ব থেকে ডেকে ফিরিয়ে নেয়। যুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি এখান থেকেই শুরু হ'ল। কংগ্রেস সেই সঙ্গে নীতিগতভাবে ঘোষণা করলো যে, সে সর্বপ্রকারে ফ্যাসি-বিরোধী, এবং সেই হিসাবে দুই যুদ্ধমান শক্তি-সংঘের মধ্যে মিত্রশক্তিদের প্রতিই তার সর্বান্তঃকরণের সহানুভূতি। কংগ্রেসের এই যুদ্ধনীতির ফলে কংগ্রেস ইংরাজের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কোনো প্রত্যক্ষ অন্তরায় সৃষ্টি করবে না; —এই হ'ল কংগ্রেসের non-embarrassment policy—অন-অন্তরায় নীতি।

কংগ্রেসের এই নীতিতে একদল মর্ম-কংগ্রেসী বিদ্বেষ-ভাবে উষ্মা প্রকাশ করলো। পূর্ব থেকেই এরা কংগ্রেস-নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করছিল। কথা যাই-ই বলুক এবং যার মুখ দিয়েই বলাক, এদের প্রধান কথা ছিল কম্যুনিষ্টদের তরফের এবং তা ছিল 'immediate local and partial struggle'—অনৌপ স্থানীয় ও আংশিক সংগ্রাম। যখন জাতি সমগ্র-ক্ষমতা আহরণের এক আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, তখন এই প্রকার বাণী উচ্চারণকে লেনিন তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেছেন। বাংলাদেশে কোনো গ্রামে পথকর বা জলকর আদায়ের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ, কোনো জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজা-ক্ষ্যাপানো, কারখানায় দু'চার টাকা বেতন বাড়াবার জন্য শ্রমিকদের ধর্মঘট করানো, সরকারের কোনো অতীত বা বর্তমানের আনুষ্ঠানিক বা প্রতীক কোনো অনাচারের বিরুদ্ধে হৈ-চৈ করা—এ সবেরই কিছু মূল্য হয় তো একদিন ছিল। কিন্তু যখন ইউরোপীয় মহা-যুদ্ধ আসন্ন বা চালু, যখন সমগ্র জনগণ ক্ষমতা আহরণের জন্য ব্যগ্র, তখন এমনি সব "সংগ্রামের" পথ হ'ল 'বিপ্লব-বিরোধী। Economism, putschism, প্রভৃতি ভাষায় লেনিন এই মনোভাবের নিন্দা করেছেন। এই প্রসঙ্গে পরে আক্ষেপ ক'রে তিনি লিখেছেন perhaps I Perhaps the

not yet started!" —'অথবা হয়তো আমাদের ভুল, হয়তো এখন বিপ্লব শুরু হয়নি!'

তাঁ পার্থক্য হ'ল এখানে;—বিপ্লব শুরু হয়েছে কি হয়নি এখনও তা বুঝে কার্যক্রম নির্ণয় করাতেই হ'ল প্রকৃত নেতৃত্ব। তাদের এই উগ্র শিশু-বিপ্লবীরা—infantile left-wing —একদিন শিখেছিল যে, politics is based on economics, এই মূলসূত্র বিদ্যা যে আজকের দিনের বাস্তবের প্রস্তরগাত্রে ঘা খেয়ে ফিরে যেতে বাধ্য, একথা হৃদয়ঙ্গম করা এদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সরকারের নিকট দাবী পেশ করা—অথচ তার সঙ্গে ঐ দাবী পূরণের কোনো sanction জাতি বা দলের হাতে প্রস্তুত না রাখা যে বিপ্লবের রাস্তার ঠিক উল্টো দিকে চলা, সে কথা এরা তলিয়ে দেখলো না। এমনি ব্যর্থ দাবী পেশ করাকে লক্ষ্য করেই লেনিন বলেছেন, presenting demands which are comical in their pretentious impotence"—'এমন দাবী পেশ করা যা তার ব্যর্থ আড়ম্বরে নিতান্তই হাস্যাস্পদ।' অথচ কম্যুনিষ্ট পার্টির ভেতর থেকে এমনি সব 'ব্যর্থ বাগাড়ম্বরের সমাবেশ হতে লাগলো; আর একদল চালাক রাজনৈতিক সেই সব জিগীরকে (slogans) গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতির সমান দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। গত বিশ্বযুদ্ধ যে এর পূর্বগামী বিশ্বযুদ্ধ থেকে একটু আলাদা রকমের,—১৯১৭ সাল থেকে শুরু ক'রে যে পৃথিবীর ইতিহাসের এক নব পর্যায়ের সূচনা হয়েছে—যেমন হয়েছিল ১৭৮৯ সালে, সে কথা উপেক্ষা করেই ভারতের এক দল বামপন্থী তাদের রাজনীতি গ'ড়ে তুলছিল। একটা কথা খুব সহজভাবেই চলছিল—কংগ্রেসের বুড়ো নেতারা political tactics বা রাজনৈতিক চাল বোঝে না, তাই অনেক সুযোগ এঁরা হারাচ্ছেন। এই poltical tacticsএর দোহাই দিয়ে দাবী পেশ করা, আংশিক সংঘর্ষ ঘটানো, কংগ্রেসের নেতৃত্বকে নীচে থেকে ধসিয়ে দেওয়া প্রভৃতি অনেক কাজ এই বামপন্থীরা বাৎলাচ্ছিল। লেনিন এক জায়গায় লিখেছেন,—"By party tactics we mean the political behaviour of the party or the character, tendency or methods of its political activity. Tactical resolutions are adopted by party Congresses for the purpose of determining exactly what the political behaviour of the party as a whole should be in regard to new tasks or in regard to new political situation". অর্থাৎ: 'দলীয় কর্মকৌশল কথাটার অর্থ আমরা বুঝি পার্টির রাজনৈতিক আচরণ অথবা রাজনৈতিক কার্যকর্মের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও পদ্ধতি। সম্পূর্ণ-নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অথবা নূতন কর্মের দায়িত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গোটা পার্টির রাজনৈতিক আচরণ কি রকম হওয়া উচিত তা নির্দ্ধারণ করার জন্যই পার্টি-কংগ্রেসে tactics সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়ে থাকে।'

কিন্তু লেনিনের এই সংজ্ঞা উপেক্ষা ক'রে tactics বা চাল মারবার দোহাই দিয়ে সম্মুখের 'নূতন দায়িত্ব' new task) ও 'নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতি' (new political situation) সম্বন্ধে এরা সম্পূর্ণ উদাসীন রইলো।

এই নূতন পরিস্থিতি কি?

লেনিনের ভাষায় জবাব দিচ্ছি—"The revolution that has started in Russia has created such a new situation." —যে বিপ্লব শুরু হয়েছে, তাতেই ঐ নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে "Partial struggle"—আংশিক সংঘর্ষকে বর্জন করে লেনিন অনুমোদন করছেন—"The general, single, whole and complete struggle"—সাধারণ, গোটা, সমগ্র ও সম্পূর্ণ এক সর্বব্যাপক "desperate"—মরীয়া, মরীয়া সংগ্রাম। এমনি পরিকল্পনা নিয়েই চলছিলেন কংগ্রেসের 'বুড়ো' 'ধীর-গতি' নেতৃবর্গ। বিপ্লবী দলের অভিমানের বশে বরাবরই কংগ্রেস-নেতৃত্বের প্রতি আমাদের একটু অবজ্ঞার ভাব ছিল। এঁরা বিপ্লবের কি বুঝবেন—এমনি একটা ধারণা এঁদের প্রতি পোষণ করতাম। কিন্তু যুদ্ধের শুরু থেকে ধাপে ধাপে এঁরা যেভাবে দেশ ও জাতিকে চালনায় নিয়েছেন, যেভাবে '৪২ সালের বিপ্লবের জন্য দেশকে প্রস্তুত করছিলেন, তাতে তাঁদের বিপ্লবী-নেতৃত্বের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে আজ কোনো লজ্জা বা সংকোচ বোধ করছি না।

বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হ'তে দুই দিকে খেয়াল রাখতে হয়

—এক হচ্ছে বাস্তব অবস্থার প্রস্তুতি, অপর হচ্ছে এই বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে জনমনকে তৈরী করা:—যাতে অবস্থার পরিপক্কতার সুযোগ তারা নিতে পারে—যাকে লেনিন বলেছেন, preparation of social and psychological condition.

বিপ্লবের সুযোগ আসে—জনতার্থিতি হ'য়ে চলে যায়; অবস্থা পরিপক্ক হয়—কিন্তু কেউ তাকে আঁচল পেতে গ্রহণ করে না, সে ব্যর্থ হয়ে ইতিহাসের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে যায়; —এমন ঘটনা মানবের ইতিহাসে বিরল নয়; বরং এমন করুণ ঘটনার প্রাচুর্যেই ইতিহাস ভরপুর। ভারতের ইতিহাসেও এমন ঘটনা বিরল নয়, বরং প্রচুর। মোগল শক্তি যখন আভ্যন্তরীণ জৈবিক তাড়নে ভেঙে পড়ছিল, তখন ভারতের হিন্দু-মুসলমান বা সম্মিলিত ভারতবাসী বা কোনো প্রদেশ ঐ পরিপক্ক অবস্থার সুযোগ নিতে পারলো না। মুসলমান নবাব-সুবেদার-নিজামের দল নিজ নিজ স্বার্থের তাড়নায় পারিবারিক রাজত্ব স্থাপন করলো—যার পিছনে না ছিল জনগণের সমর্থন, না ছিল তাদের স্বকীয় কোনো শক্তি। আর হিন্দুরা পাঞ্জাবে ও মহারাষ্ট্রে যে পুনরুত্থানের চেষ্টা করলো, তার মধ্যেও কোনো বিপ্লবী এষণা ও আবেগ ছিল না। তাই প্রতি সেনাপতি বা রাষ্ট্রপরিচালক মূল রাষ্ট্রকে ক্ষুণ্ণ ক'রে, বৃহত্তর স্বার্থকে বিক্রয় ক'রে নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপন করতে চেষ্টা করলো। মানসিক প্রস্তুতি ছিল না ব'লেই সমগ্র ভারতবাসী মুষ্টিমেয় ভাগ্যান্বেষী ইংরেজের কাছে দেশ ও জাতিকে বিক্রয় করেছিল।

গত বিশ্বযুদ্ধ এমনি এক অবস্থার সূচনা করছিল। হয় ত আবারও বিপ্লবের সুযোগ আসবে—কিন্তু জনতার্থিতি হয়ে ফিরে যাবে। এই যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় জার্মেনীর যে ক্ষিপ্র জয় দেখা গিয়েছিল, তাতে ইংরাজের রাষ্ট্রীয় শক্তি সম্বন্ধে সর্বত্রই সংশয়ের উদয় হয়েছিল। হয় ত এই শক্তি ভেঙে পড়বে, কিন্তু তার সুযোগ নেবার জন্য জাতিকে প্রস্তুত করার রাস্তা কি? মানসিক প্রস্তুতির একটা প্রধান অঙ্গ হ'ল জনতাকে আসন্ন বিপ্লবের জন্য উৎসুক ও উদ্‌গ্রীব ক'রে তোলা; এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের রূপ, তার পন্থা ও আদর্শ জাতির সামনে খুলে ধরা। কোন্ পথে ধাপে ধাপে এগুতে হবে, কোথায় গিয়ে পৌঁছতে হবে, কোন্ শুভক্ষণে এই নব সৃষ্টি শুরু হবে—এ সব কথা জনমনকে বুঝাতে হবে, শেখাতে হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে বুঝা যাবে, '৪২ সালের বিপ্লব শুরু হয়েছে সেই দিন থেকে—'৩৯ সালে যেদিন কংগ্রেস এই যুদ্ধ-উদ্যমে সহযোগিতা করতে অস্বীকার ক'রে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের মন্ত্রত্বের দায়িত্ব থেকে ফিরে ডেকে নিল। কিন্তু সেই সময় কংগ্রেস এই কথাও বললো যে, দুই যুদ্ধমান শক্তি-সমাবেশের মধ্যে ফ্যাসিবাদী চক্রশক্তিদের প্রতি কংগ্রেসের কোনো সহানুভূতি নেই, বরং ফ্যাসি-বিরোধী-শক্তিদের প্রতিই কংগ্রেসের নীতিগত সহানুভূতি—যদিও বাস্তবগত অবস্থা বিবেচনায় কংগ্রেস সেই সহানুভূতিকে কার্যে প্রতিফলিত করতে পারে না। এখানেই হচ্ছে বিশ্বরাজনীতির গতির সঙ্গে কংগ্রেসের যোগ। ফ্যাসিশক্তিগুলি যে আদর্শ ও মতবাদ নিয়ে এই যুদ্ধে নেমেছিল, তাতে তাদের জয় মানব-সভ্যতার পরিপন্থী হ'তে বাধ্য। England's adversity is India's opportunity—ইংলণ্ডের বিপদই ভারতের সুযোগ—এই নীতি আজকার দিনে অচল। আজকার পৃথিবী পরস্পর বিচ্ছিন্ন দেশের সমাবেশ নয়; আজকার পৃথিবী নীতিতে গতিতে, সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে প্রায় অখণ্ডত্ব পেয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের ইউরোপের টনসুফেরা ভারতের ৬০ লক্ষ লোকের জীবননাশের কারণ হয়েছিল; এবারকার যুদ্ধ বাংলার চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষ লোকের জীবন হরণ করেছে—কেবল দুর্ভিক্ষ দিয়ে। এই সব নিতান্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়;—এর পিছনে রয়েছে বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটা যোগসূত্র। এই দু'টি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলাম—তার অর্থ এই নয় যে, স্থানীয় শাসন যন্ত্রের অক্ষমতা, অসততা, ও হৃদয়হীনতা এর জন্য দায়ী নয়। সে দায়িত্ব পুরোপুরিই আছে; —কিন্তু তবুও উপলক্ষ এসেছে দু'টি বিশ্বযুদ্ধের বধচক্রের সাথে।

আজ একথা প্রায় সবাই মানছে যে, freedom is indivisible just as peace is indivisible—শান্তি যেমন অখণ্ড, তেমনি গণ-স্বাধীনতাও অখণ্ড। ইতালীর পর জার্মেনী, তারপর উত্তর সাগরের কূলবর্তী চার পাঁচটি ক্ষুদ্র দেশ ও ফ্রান্স ছাড়া কলিয়ার পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত ইউরোপ প্রকাশ্যতঃ ফ্যাসি-শাসনপদ্ধতি গ্রহণ করেছিল;

ফ্রান্সেও ফ্যাসিজম ধীরে ধীরে প্রবেশ করছিল। এশিয়ার একমাত্র কয়েক স্বাধীন ও শক্তিশালী দেশ জাপান ক্রমেই গণ-স্বাধীনতার বিরোধী পথ নিয়ে ফ্যাসিস্ট-প্রথার দিকে ঝুঁকেছিল। সেই অবস্থায় ফ্যাসি-শক্তিসমূহের জয় বিশ্বমানবের অমঙ্গলেরই সূচনা করতো এবং সেই পরিবেশে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর হয়ে যেত। বিশ্বরাজনীতির এই গতি দুরদর্শী ক'রে কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল তার নীতিগত সহানুভূতি মিত্রশক্তির প্রতি—যদিও ভারতের দাসত্বের অবস্থায়, তার স্বাধীন-সত্তা স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত সে সক্রিয়ভাবে এই যুদ্ধে সাহায্য করতে পারে না। এই নীতি ঘোষণা ক'রে সে উৎকণ্ঠার সহিত যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করছিল, আর ধীরে ধীরে জনমনকে প্রস্তুত করছিল—আসন্ন বিপ্লবের জন্য। তখন আশু অনতিবিলম্ব সংগ্রামের জন্য একদল চেঁচামেচি করছিল। তারপর যখন সত্যিকার বিপ্লব-প্রচেষ্টা এল, তখন ঐ অধৈর্য সংগ্রামীদের একদল গেল জনযুদ্ধের দোহাই দিয়ে এই বিপ্লবের বিরুদ্ধে সরকারকে সাহায্য করতে। আর একদলের কতিপয় পৃষ্ঠপোষক গেল বাংলার শূন্য মন্বন্তরের তক্তে—বিপ্লবী জনতার উপর লাঠি চালানো ও গুলী চালানোর নৈতিক দায়িত্ব মাথা পেতে নিতে; সরকারী denial policyর মারাত্মক যুদ্ধ-উদ্যমের কার্যে সহযোগিতা ক'রে কয়মাস পরের দুর্ভিক্ষের পথ প্রস্তুত করার দায়িত্ব থেকেও এরা অব্যাহতি পায় না।

কিন্তু আমাদের মূল কথায় ফিরে যেতে হয়। বিপ্লবের বাস্তব ও মানস অবস্থার পরিপক্কতা কখন এবং কি ক'রে এল? সাপ্তাহিক *Forward* ৪০-৪১ সালে বরাবর একটি কথা বলেছে—এখনও সংঘর্ষের সময় আসেনি। সে সময়ে আসবে—যখন যুদ্ধের বাহিরের চাপে শাসনযন্ত্র ভেঙে পড়বার উপক্রম হবে, আর যখন যুদ্ধ-উদ্যমের আভ্যন্তরীণ চাপে দেশের আর্থিক অবস্থা জনসাধারণের জীবন-যাত্রাকে বিপর্যস্ত ক'রে তুলবে। সেই সন্ধিক্ষণে জনমন যাতে সচেতন থাকে, বিপ্লবোন্মুখ হয়ে ওঠে, যাতে তারা নেতৃত্ব হয়ে ওঠে, নিজেদের ভাগ্য-বিধানের দায়িত্ব নিতে পারে—সেই ভাবে তাদের ধীরে ধীরে প্রস্তুত করতে হবে। সেই সন্ধিক্ষণের পূর্বে যাতে জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে প্রস্তর-প্রাচীরে মাথা খুঁড়ে ব্যর্থ না হয়; আবার যাতে সেই সন্ধিক্ষণে তারা জেগে উঠতে দেরী না করে;—এই দুইদিকের প্রতি খেয়াল রাখাই হল বিপ্লবী-নেতৃত্বের প্রধান দায়িত্ব।

এই মানসিক প্রস্তুতির জন্যই কংগ্রেস ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছে। '৩৯ সালের শেষে মন্ত্রীদের ডেকে নিল; '৪০ সালের রামগড় কংগ্রেসে (মার্চ মাসে) প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের প্রথম আভাস দিয়ে কংগ্রেস সংগঠনকে তার জন্য প্রস্তুত করার নির্দেশ দিল। এর কিছু পরে সরকারের তরফ থেকে আপোষের কোনো ইঙ্গিত পেয়ে, এল পুনা প্রস্তাব। যে রকম দ্রুতগতিতে ইংরাজের রাষ্ট্রশক্তি তখন ভেঙে পড়ছিল, তাতে ভারতের শাসনযন্ত্র সম্বন্ধে আশংকা জেগেছিল। তেমনি সংকট সময়ে ভারতের অবস্থা কি হবে? কোন অখণ্ড শাসনযন্ত্র গড়ে তুলবার ক্ষমতা কি জনগণের ছিল? না, মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সময়ের মতো আবার ভাগ্যান্বেষীদের বংশগত শাসন প্রতিষ্ঠার সুযোগ হ'ত? আবার তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা, নবাব, নিজামদের উদ্ভব হ'ত না তো? ইংরাজরা কি তেমনি সুযোগই দিত না? এই সব বিবেচনা ক'রে পুনা প্রস্তাবের উপযোগিতা তখন ছিল—এ কথা আজ অস্বীকার ক'রে লাভ নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন সব কথাকবিতে টিকলো না, তখন পুনা প্রস্তাব প্রত্যাহার ক'রে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল।

পূর্বোক্ত উৎসাহী সংগ্রামীগণ এই প্রস্তাবকে অভ্যর্থনা করলো ব্যঙ্গবিদ্রূপ দিয়ে। এটা তারা বুঝলো না যে, এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ হ'ল এক আসন্ন ব্যাপক সংগ্রামের পূর্বাভাস ও প্রস্তুতি। এই সময় *Forward* কংগ্রেস নীতি ব্যাখ্যা ক'রে যে-সব প্রবন্ধ লিখেছে, বিদগ্ধজন মহলে তার যথেষ্ট সমাদর হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে *Forward*এর ঐ সব প্রবন্ধ পড়তেন। পরে তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "Your interpretation of the movement was accurate."—'এই আন্দোলনের ব্যাখ্যা তোমাদের সঠিকই হয়েছিল।' তারপর যুদ্ধের মধ্যে দু'টি ঘটনা ঘটলো—রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং তার প্রায় ছয় মাস পরে জাপানের যুদ্ধে যোগদান। যুদ্ধ ঘনিয়ে এল ভারতের প্রান্তে; ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও আমেরিকার এসিয়ার সাম্রাজ্য দু'এক মাসের মধ্যেই লোপ

পেল ইংরেজের চরম দুর্দিন তখন সন্নিকট ব'লে বিবেচিত হচ্ছিল। এই সঙ্কট সময়ে কংগ্রেস-নেতৃবর্গকে জেল থেকে মুক্ত করা হ'ল। এর পর এল ক্রীপ্‌স্। ঠিক যে অবস্থায় কংগ্রেস পূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, ঠিক সেই অবস্থায় আবার কংগ্রেস ক্রীপ্‌স্ প্রস্তাব আলোচনা করতে গেল। এটা পিছে হটে যাওয়া নয়—এটা হঠাৎ শাসনযন্ত্র ভেঙে পড়ার আকস্মিকতার সংস্থানের চেষ্টা।—কারণ তখনও বিপ্লবের বাস্তব ও মানসিক অবস্থা পরিপক্ক হয়নি।

প্রচলিত শাসনযন্ত্র ভেঙে পড়লেই গণবিপ্লব হয় না বা গণস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। তা যদি হ'ত তবে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৮-২০ সালে জার্মানী, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে গণস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হ'ত এবং মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে যেয়ে ভারতেও গণবিপ্লবের পর গণস্বাধীনতা স্থাপিত হ'ত। একটা রাজনৈতিক দল যেমন খুশীমতো বিপ্লব ঘটাতে পারে না, তেমনি আবার কোনো বিপ্লবী দলের পরিচালনা ব্যতীত বিপ্লবের সুযোগ এলেও বিপ্লব অনেক সময়ে হয় না। এমনি বিপ্লবীদের লক্ষ্য ক'রে ১৮৫০ সালে মার্কস্ লিখেছিলেন, "For you, pure will, instead of objective conditions, is the driving force of revolution" —তোমাদের পক্ষে বাস্তব বিপ্লবী অবস্থার চেয়ে তোমাদের খুশীই হ'ল বিপ্লবের প্রেরণা। তিনি আরও লিখেছেন, "You palm off revolutionary phrase"for revolutionary development"—বিপ্লবী পরিণত অবস্থার চেয়ে বিপ্লবী বচনই তোমাদের কাছে বড়। বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য মার্কস্ যে সব লক্ষণ বলেছেন তাকে ভাগ ক'রে বলা যায়: (১) প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, সমাজের উচ্চ ও নিম্ন স্তরের মধ্যে বৈষম্যের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে; (২) শাসনযন্ত্রের শিথিলতা ও অক্ষমতা ফুটে উঠছে—আর্থিক অব্যবস্থায়, যুদ্ধের পরাজয়ে অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করার অক্ষমতায়,—যার ফলে জনগণের নিকট শাসকবর্গের খ্যাতি ও মর্যাদার হানি হয়েছে এবং জনগণ সদা শঙ্কিত থাকছে—কখন্ কি ঘটে; (৩) এই অনিশ্চিত শঙ্কিত অবস্থার ফলে জনগণ শাসনবিধিকে অগ্রাহ্য করার সাহস পাচ্ছে, লুঠতরাজ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা করছে। এই নীতির ব্যাপ্যা করেই লেনিন লিখেছেন, "It is not sufficient for the revolution that the exploited and the oppressed masses understand the impossibility of living in the old way and demand changes; for the revolution it is necessary the exploiters should not be able to rule as of old. Only when the masses do not want the old regime and when the rulers are unable to rule as of old, then only can the revolution succeed. This truth may be expressed in other words: Revolution is impossible without an all national crisis, affecting both the exploited and the exploiters.—'শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের তরফ থেকে পুরাতন শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকা যে অসম্ভব এটা বুঝা এবং পরিবর্তনের দাবী করাই বিপ্লবের পক্ষে যথেষ্ট নয়—শোষকদের তরফেও পুরাতন ব্যবস্থায় শাসন করতে অসমর্থ হওয়াও বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন। বিপ্লব-প্রচেষ্টা সফল হ'তে পারে কেবলমাত্র তখনই—যখন জনগণও পুরাতন ব্যবস্থায় থাকতে আর রাজী নয়, শাসকগণও সে ব্যবস্থায় আর শাসন করতে অসমর্থ। এই তথ্যই অন্য ভাষায় প্রকাশ করা যায়: শোষক ও শোষিত উভয় শ্রেণীই একান্ত বিব্রত হয়ে পড়ে এইরকম একটা সর্বব্যাপী জাতীয় সঙ্কট ভিন্ন বিপ্লব অসম্ভব।'

ঠিক এই অবস্থা তখনও এসেছিল কি? জার্মানী বা জাপানের যুদ্ধের চাপে ইংরাজ সরকার ভেঙে পড়লে গণবিপ্লব বা গণস্বাধীনতা যে সংঘটিত হ'ত এমন কোন স্থিরতা ছিল কি? সেই স্থিরতা ছিল না বলেই ১৯১৭ সালে লেনিন লুকিয়ে রুশিয়াতে প্রবেশ ক'রে গণবিপ্লবের আয়োজন করেছিলেন এবং সেই বিপ্লব সংসাধন করতে প্রায় ৭ মাস অপেক্ষা করেছিলেন।

হঠাৎ শাসনযন্ত্র ভেঙে পড়লে, গণশক্তি যখন বিপ্লবের জন্য ও নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হয়নি, তখন হয়ত একদল ভাগ্যান্বেষী আপদচারী (adventurer) খুদে dictator বা স্বেচ্ছাচারী শাসক হয়ে বসতো। তাই গান্ধীজী তখন বিশেষভাবে মনোযোগ দিলেন জনমনকে তৈরী

করতে। ক্রীপ্‌স প্রস্তাব ব্যর্থ হবার পরেই তাই এল self-sufficiency and self-protection এর—আত্ম-পর্যাপ্ততা ও আত্মরক্ষার—প্রোগ্রাম। দেশের প্রতি উনতকে (unit) খাদ্যে, বস্ত্রে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পর্যাপ্ত করা ও আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত করা হ'ল প্রাক্-বিপ্লবের শ্রেষ্ঠতম প্রস্তুতি। এই কর্মপদ্ধতিকেও বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছেন, বিপ্লব-বিরোধী ব'লে ব্যঙ্গ করেছেন। জাতিকে আত্মবিশ্বাসে স্ব-স্থ ও স্বপ্রতিষ্ঠ করতে না পারলে জাতিকে বিপ্লবের রাস্তায় নেওয়া যায় না। তখন বাহিরের আক্রমণ ভারতের পূব দিক দিয়ে আসল ; ইংরেজ সাম্রাজ্যিক শক্তি—পচা নলখাগড়ার মতো ভেঙে পড়ছে। তখন 'বুড়ো' গান্ধীই জাতিকে ডেকে বললেন—স্ব-স্থ হও, স্বপ্রতিষ্ঠ হও, আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আন, ভিতরের সাম্রাজ্যিক শাসন এবং বাহিরের সমাবিক অভিযান—দু'টোকেই প্রতিরোধ করতে হবে। যখন জাতি বিমূঢ়—একদল তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে আর এক দল জনযুদ্ধের মিথ্যা ছিপ্পীর তুলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক শক্তির নলখাগড়াকে ঝাঁকড়ে ধরছে—তখন কংগ্রেসের 'বুড়ো আপোষকামী' নেতারা জাতিকে মাতিয়ে তুললেন বিপ্লবের আহ্বানে। তারা আহ্বান দিলেন জাতির শ্রমশক্তিকে, বললেন—কৃষিক্ষেত্রের, কারখানাগৃহের ও অন্যান্য রকমের শ্রমিকদের হাতেই ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের ও সমাজের সব ক্ষমতা থাকবে। তাই তাদের ডেকে বললেন, "তোমরা ক্ষমতা আহরণ ক'রে নাও—সমাজের প্রাণশক্তি যেখানে, সেই গ্রামকেন্দ্র থেকে শুরু কর, ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও।" আর বজ্রকণ্ঠে ব্রিটিশকে বললেন—"ভারত ছেড়ে যাও"—"QUIT INDIA"!

জনতার নিকট এই আহ্বান বিধিমতোভাবে তাঁরা দিতে পারেননি ; তার পূর্বেই ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সরকার তাঁদের জেলে পুরে দিল। তবুও তাঁদের এই অস্ফুট আহ্বান জনতার কর্ণে ও মর্মে গিয়ে পৌঁছল। সংগ্রামের জন্য "premature" আহ্বান ক'রে শুধু জেল ভর্তি করা কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল না। এমনি অবিমৃষ্য দাবীর উত্তরেই মহাত্মাজী একবার বলেছিলেন—"the jails are already full."

কংগ্রেসের রাজনীতি ছিল—বিপ্লবপন্থী গণশক্তি দিয়ে ক্ষমতা আহরণের (revolutionary seizure of power)। বিপ্লবের প্রকৃত মর্ম হ'ল এই : যে শ্রমহীন জনতা তাদের শ্রম দিয়ে জাতিকে লালন করছে, অথচ যারা নিজেরা তাদের শ্রমলব্ধ সম্পদ হ'তে বঞ্চিত হচ্ছে, যারা সংখ্যায় ও শ্রমে জাতির প্রাণভাণ্ডার ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, তারা যদি নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পাল্টে নিজেদের হাতে ক্ষমতা আহরণের চেষ্টা করে, তবে তাকেই বলা যায় বিপ্লব। যে-কোনো রাষ্ট্রবিভ্রাট বা মাৎস্যন্যায় সৃষ্টিই বিপ্লব নয়। সুবিধাভোগী উচ্চ স্তরের মুষ্টিমেয় লোক আরও সুবিধা দখলের জন্য যদি রাষ্ট্রবিভ্রাট ঘটায়, তাকে বিপ্লব বলা চলে না—ইংরেজীতে তাকে বলে *coup de'tat* বা rebellion বা counter-revolution. বিপ্লবের এই সংজ্ঞা মনে রেখে যদি আমরা ভারতীয় রাজনীতি বিচার করি, তবে ভারতের আসন্ন বিপ্লব হ'বে প্রধানত কৃষক-চাষীদের বিপ্লব ; কারণ কৃষক-চাষীরাই হ'ল ভারতীয় অর্থসম্পদের প্রধান উৎস, তারাই সংখ্যায় শতকরা ৭৫ জন, তারাই আজ সব চেয়ে দুর্গত ও অবহেলিত, এবং তারাই হ'ল জাতির প্রাণশক্তি। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস এই কৃষক-চাষীকে, এই গ্রাম্য জনতাকে প্রস্তুত করছে আগতপ্রায় বিপ্লবের জন্য। গ্রামে বসে ধৈর্যের সঙ্গে ধীর মন্থর গতিতে গঠনমূলক কাজ এই বিপ্লবী প্রস্তুতির প্রধান অঙ্গ। যুদ্ধের শুরু থেকে এই প্রস্তুতিকে কংগ্রেস যথাসম্ভব ক্ষিপ্র করেছে ; বিভিন্ন প্রত্যক্ষ কর্মমূলক প্রচার দ্বারা গ্রাম্য জনতার মনে আশা জাগিয়েছে, উৎকণ্ঠা জাগিয়েছে, এই সরকারের প্রতি অনাস্থা ও অবিশ্বাস জাগিয়েছে, তার যুদ্ধপ্রচেষ্টার সহযোগিতাকে অন্যায় ও অধর্ম বলেছে, "কখন কি হয়" (anything might happen) এই অনিশ্চিত শঙ্কিত মনোভাবকে প্রশ্রয় দিয়েছে ; তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছে, খাদ্যে ও বস্ত্রে আত্ম-পর্যাপ্ততার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে, আত্মরক্ষার ও আত্মমর্যাদার অভয়বাণী শিখিয়েছে, শেষ এবং সর্বশেষ তাদের বলেছে—সমগ্র ক্ষমতা তোমরা ছিনিয়ে নিতে পার, বিদেশী আক্রমণ ও সাম্রাজ্যিক নিষ্পেষণ থেকে যদি বাঁচতে চাও, ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও, যা তোমাদের ন্যায্য পাওনা তা অধিকার কর, গ্রামে গ্রামে

নিয়েদের পক্ষাঘাতই সরকার গড়ে তোলে। সিঁড়ির যেমন সবগুলি ধাপ মিলে একটা গোটা জিনিস—মাঝখান থেকে দু'টো ধাপ বাদ দিলে আরোহণ সহজ না হয়ে বরং কঠিন হয়—বিপ্লবের প্রস্তুতিও সবগুলি ধাপ মিলে একটা গোটা কার্যক্রম, মাঝখান থেকে দু'টা ধাপ বাদ দিলে বিপ্লব সহজ না হয়ে কঠিনই হয়, হয় তো অসম্ভবই হয়।

যখন জাপানী আক্রমণ আসন্ন, ঠিক তখনই এর উপযোগী সময় এল কেন? আগেই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ভারতের বিপ্লব ও স্বাধীনতার বিশেষ প্রয়োজন ঐ সময়ে—কারণ "for the success of freedom and democracy", "for the success of the cause of the United Nations"—সমগ্র বিশ্ব-মানবের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য, মিত্রশক্তিবর্গের জয়ের জন্য, এশিয়া ও আফ্রিকার নিষ্পেষিত জাতিসমূহের স্বাধীনতার জন্য এই বিপ্লব-প্রয়াস বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ইংরাজের বিরুদ্ধে জাপানী আক্রমণকে আমন্ত্রণ করার জন্য নয়—জাপানী আক্রমণকে সুষ্ঠুরূপে গণশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করার জন্যই ভারতের ঐ বিপ্লব-প্রয়াস। এই কথাটা বিস্তৃত হ'লে কংগ্রেসের ঐ স্মরণীয় প্রস্তাবের মর্মকথাই অবহেলা করা হবে। নিষ্পেষিত পরাধীন জাতি বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে যাবে না—যেমন যায়নি মালয়, ইন্দোচীন, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ও ব্রহ্মের অধিবাসীরা। স্বাধীনতা ও গণ-অধিকারের স্বাদ যা আশা পেলে ভারতের গণশক্তি জাপানী আক্রমণকে বরদাস্ত করতো না—নিজেদের প্রায়-করায়ত্ত ক্ষমতাকে রক্ষা করার জন্য বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের গণশক্তি রুখে দাঁড়াত, কিন্তু পূর্ণ পরাধীন অবস্থায় তারা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যে বিদেশী আক্রমণকারীদের কাছে আত্মসমর্পণ করতো। এটা যে কেবল ভারতের পক্ষে অশেষ দুর্গতির কারণ হ'ত, তা-ই নয়; সমগ্র বিশ্বমানবের পক্ষেও বহু বছরের জন্য অশেষ দুঃখের কারণ হ'ত। কাজেই ঐ মহা সঙ্কট সময়ে ভারতের বিপ্লবী গণপ্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের উপর এক মহান দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল।

তাই ১৯৪২ সালই ছিল ভারতের বিপ্লব-প্রয়াসের সব চেয়ে উপযুক্ত সময়। তার পূর্বে হ'লে, জনমন থেকে যে সাড়া স্বতই প্রবাহিত হয়েছিল, তার দশমাংশও পাওয়া যেত না; এবং বিপ্লবের বাস্তব পরিপক্কতাও তখন হ'ত না। এর পরে হ'লেও সঙ্কট সময়ের সুযোগ থাকতো না—জনমনের 'কখন কি হয়' এই শঙ্কিত ভাব কেটে যাওয়ার ফলে তাদের কাছ থেকে অনুরূপ সাড়া পাওয়া যেত না এবং বাস্তব অবস্থাও তেমন অনুকূল থাকত না। কংগ্রেসের ঐ তিন বছরের সব কার্যক্রম মিলে একটা গোটা জিনিস—ঐ বিপ্লব-প্রয়াসকে সমগ্রভাবেই আমাদের বুঝতে হবে। নতুবা ভবিষ্যতেও আমরা ভুল করবো।

মহাত্মাজী

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কপালে চিন্তার রেখা, মুখে প্রসন্ন হাস্য। এই মহাত্মাজী। ক্ষীণ তনু, কিন্তু দুর্জয় সাহস। অসীম ধৈর্য এবং অটল পণ। তাই পঁচিশ বৎসরের উপর তিনিই জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী একদময়ে লিখেছিলেন: "পলিটিসিয়ানরা পলিটিক্সের দেবদেবীদের মাটির ঠাকুর হিসেবে পূজা করে। তিন দিন ধরে তাকের বাদ্যি, ধূপদীপ, পুষ্পচন্দন, স্তুতি প্রণতির ছড়াছড়ি। তারপর বিসর্জন।" কিন্তু মহাত্মাজীর প্রভাব সুদীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ, উত্তরোত্তর বর্ধমান। তার কারণ কি? নেতৃত্বের পতনের মূলে থাকে অন্ধ অহমিকা, অদূরদর্শিতা, আদর্শ-নিষ্ঠার অভাব অথবা উচ্ছৃঙ্খল উত্তেজনা-জনিত অবসাদ। বাপুজীর বিনয় সর্বজন-বিদিত, প্রতি পদক্ষেপ দৃঢ় অথচ সতর্ক, সুচিন্তিত এবং লক্ষ্যাভিমুখী। আর তাঁর নিষ্ঠা অতুলনীয়। নিজের মত বা বিশ্বাস তিনি জোর করে' অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চান না, কাজ দেখিয়ে অন্যকে নিজের মতে আনতে চান। বলের প্রয়োগের যেমন তিনি অযাচক, তার রক্ষণে এবং পোষণেও তেমনি যত্নবান। না হলে ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে শক্তি নিজেকে নিঃশেষ করে' ফেলে, লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। কতিপয় উচ্চশিক্ষিতের বক্তৃতামঞ্চ থেকে কংগ্রেসকে কি করে তিনি সর্বসাধারণের সংগ্রাম প্রতিষ্ঠানে, সুগঠিত সেনাবাহিনীতে পরিণত করেছেন, তা ভাবলেই নিমেষে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা উপলব্ধি করি। শুধু প্রতিষ্ঠানটিকে শক্ত করে গড়ে তোলা নয়, অকম্প্র হস্তে আজও তিনি তাকে ঝড়-ঝঞ্ঝা-দুর্যোগের মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিচ্ছেন।

উনিশ শ' উনিশ। গান্ধিজী তাঁর অসহযোগ প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করলেন। সেদিন অনেকেই প্রস্তাবের অর্থ ও সামর্থ্য সম্বন্ধে সন্দিহান। কিন্তু ক্রমশঃ বিরোধীরা তাঁর পার্শ্বচর ও অনুচর হয়ে দাঁড়ালেন। শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস-কমিটির প্রতিষ্ঠা হ'লো। রাষ্ট্রীয় মহাসভা শুধু বার্ষিক মিলন-সভা রইলো না; হ'ল স্থায়ী কর্মপরিষৎ। কর্মপন্থাও নির্দিষ্ট হ'লো। জনগণকে আত্মনির্ভর করে তোলবার জন্য হ'লো ব্যাপক আয়োজন। পরমুখাপেক্ষিতা আর নয়। মুখে মুক্তির বাণী আর দৈনন্দিন জীবনে দাসত্ব—এ অসঙ্গতি দূর করতে হবে। কর্মিদল প্রস্তুত করে বাপুজী আরম্ভ করলেন সত্যাগ্রহ। নিরস্ত্র যেন পেলো আত্মচেতনা, দেখলো বিপ্লবের নূতন পথ, নবমন্ত্রে হ'লো দীক্ষিত। এর পূর্বে বীরের সাক্ষাৎ মেলেনি এমন নয়। মিলেছে দুঃসাহসী হিংসাব্রতী বিপ্লবীর দেখা, দু'চার জন নিষ্ঠাবান্ দেশসেবকের সাক্ষাৎ। কিন্তু সমগ্র দেশকে জাগিয়ে তোলা, সর্বসাধারণকে সংঘবদ্ধ করা বাপুজীর চেষ্টাতেই প্রথম সম্ভব হ'লো।

তারপর থেকে চলেছে ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম। কখনও ব্যাপক আন্দোলন, কখনও বিশ্রাম ও প্রস্তুতি। জনমনের উত্তেজনা ও শ্রান্তি, যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা ও শান্তি-কামনার ছন্দ গান্ধিজী অনায়াসে ধরতে পারেন। তাই জওহরলালজী বলেছিলেন, মহাত্মাজীর কথার সুরে দেশের নাড়ীর স্পন্দন টের পাওয়া যায়। ঘটনার গতি এবং দেশের চিত্তে তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যেন তাঁর প্রত্যক্ষ। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তিনি চাষীমজুরের সঙ্গী। তাদের অন্তরকে তিনি চিনেছেন ঘনিষ্ঠভাবে। কখন তাদের কি অভাব অভিযোগ, কোন্ ব্যথা তাদের মর্মান্তিক হয়ে বাজে, কি নির্দেশ তারা চায়, কোন্ পথ দিয়ে তাদের লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়, তিনি অনায়াসে বুঝতে পারেন। পুথি-

পোড়োর দল যে সমালোচনাই করুন না কেন, এ বিষয়ে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যে অসাধারণ এবং তাঁর কার্যপ্রণালী যে জনসাধারণের সহজবোধ্য ও ফলপ্রদ, গত পঁচিশ বৎসরের রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাবলীই তার প্রমাণ। রাষ্ট্রনীতি নিয়ে নানা পরীক্ষা নানা দেশে চলেছে। একজনের অভিজ্ঞতা হয়তো আর একজনের থেকে স্বতন্ত্র। বিভিন্ন দেশের অবস্থার পার্থক্য আছে বলেই সর্ব-জাতীয় সকল নেতার একই রকমের অভিজ্ঞতা বা একই রকমের সিদ্ধান্ত আশা করতে পারিনা। আমাদের দৃষ্টিকে বাস্তব জীবনের দিকে প্রসারিত করতে হবে, বইয়ের পাতায় নিবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। গান্ধিজী পরিণামদর্শী, তাই আদর্শবাদী, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তিনি ঘোর বাস্তব-বাদী, নিপুণ পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেই কাজ করেন। অর্থনীতি আর রাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক তিনি ভালভাবেই জানেন, কিন্তু তা নিয়ে পণ্ডিতী আলোচনা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, ব্যবহারিক সার্থকতার দিকেই তাঁর দৃষ্টি।

অবাস্তব স্বপ্নচারী যদি তিনি হতেন তবে বিশাল-ভারত-ব্যাপী কংগ্রেসকে সুনিয়ন্ত্রিত সেনাবাহিনীতে পরিণত করা কি সম্ভব হ'ত তাঁর পক্ষে? অর্থনীতির উপরেই রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি, এ জ্ঞান না থাকলে চরকা, কুটীরশিল্প প্রভৃতির সাহায্যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তিনি কি এমন উঠে পড়ে লাগতেন? সবল প্রস্তুতের দাবী নিয়ে সত্যাগ্রহ, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-উপলক্ষ্যে জনগণের শোষণের প্রতিবাদে আন্দোলনের আয়োজন,এ সব কি তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় দেয় না? নিছক কেতাবী সাম্যবাদ হয়তো কেবল কল-কারখানার মজুরের স্বপ্ন দেখে, কিন্তু প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে, এদেশ এখনও প্রধানতঃ গ্রামবাসী চাষীদের দেশ। হঠাৎ এক নিমেষে শিল্প বিপ্লব আনবার সুযোগ নেই আমাদের হাতে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আমদানি করে' দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে দিতে আপাততঃ আমরা অক্ষম। বর্তমান অবস্থায় দেশকে অপেক্ষাকৃত স্বাবলম্বী ও স্বচ্ছল করার জন্য অবিলম্বে যতটুকু করা যায়, গান্ধিজী তাই করেছেন। কোন অবস্থায় কোন রকম যন্ত্রশিল্প ব্যবহার করা চলবেনা, একথা তিনি বলেন না। তবে, মানুষের মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করে যেন আমরা তাকে কল-কারখানার দাস করে' না তুলি, এই তাঁর উপদেশ।

অনেক দেশে রাজনীতি শুধু কৌশলী লোকদের আত্ম-প্রতিষ্ঠার উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। গান্ধিজী স্বয়ং ত্যাগ ও সেবার আদর্শরূপে বিরাজ করছেন আমাদের সামনে। তাঁর মন্ত্র গ্রহণ করে সেবাদ্বারাই কংগ্রেস জয় করেছে দেশের হৃদয়। আজ এই প্রতিষ্ঠানের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সমগ্র জনমত। এর শক্তি হয়েছে অমোঘ। এরই অভয়-পতাকা-তলে দাঁড়িয়ে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী উপেক্ষা করছে গোলাগুলির আক্রমণকে।

নেতৃত্বের সম্মান গান্ধিজীর প্রভুত্ব-কামনার ফল নয়। বরং নিজেকে সকলের আড়ালে রাখতে তিনি ভালোবাসেন। নিঃস্বার্থভাবে আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছেন বলে'ই আমরা তাঁকে এত আপন মনে করি। জীবন-যাত্রায়ও সাধারণের সঙ্গে তিনি প্রভেদ রাখেননি। দেশের নেতা হতে হলে আগে সর্বতোভাবে 'দেশের লোক' হ'তে হবে, এ সত্য তিনি উপলব্ধি করেছেন।

আজ জীবনের স্বরূপ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে অভিনয়ে, আন্তরিকতাকে হটিয়ে দিতে চাইছে কূট কৌশল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সত্য সাধকের অতুলনীয় চরিত্র গৌরব। অটুট নিষ্ঠা এবং অজেয় মনোবল উদ্বুদ্ধ করুক আমাদের অন্তরকে, শক্তি এনে দিক আমাদের পথ-চলায়।

গান্ধীজীর স্বাতন্ত্র্য কোথায় ?

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

গোলাজাত শস্যকে গান্ধীজী বীজরূপে ছড়িয়ে দিয়েছেন ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত। সেই বীজ আত্মদানের দিগন্তব্যাপী ফসলের মধ্যে সফল হয়েছে। গান্ধী আসবার আগে ঈশ্বরের সেবকেরা ছিলো মঠের চতুঃসীমানার মধ্যে বন্দী হ'য়ে অবরুদ্ধ সেনাবাহিনীর মতো। ধ্যানধারণার তুরীয় জগতের সঙ্গেই সন্ন্যাসীদের কারবার ছিল বেশী। স্বামী বিবেকানন্দের পরিকল্পনা ছিল স্বতন্ত্র। তিনি চেয়েছিলেন, সর্ব্বত্যাগী যুবকের দল ছড়িয়ে পড়বে দিক থেকে দিগন্তরে গ্রামে গ্রামে সর্ব্বহারা জনসাধারণের মধ্যে। সমস্ত জীবনকে তারা উৎসর্গ করবে দরিদ্র-নারায়ণের সেবার কাজে। তাদের শরীর হবে ইস্পাতের মত শক্ত আর সেই শরীরের মধ্যে যে-মনকে তারা বহন ক'রে বেড়াবে তা থাকবে জনসাধারণের প্রতি প্রেমে পরিপূর্ণ। তারা আর সব দেবদেবীকে ভুলে গিয়ে একমাত্র দেবতাকে হৃদয়-আসনে করবে প্রতিষ্ঠিত। এই দেবতা সর্ব্বহারা নর-দেবতা।

মঠের সন্ন্যাসীরা দরিদ্র-নারায়ণের জন্য যথেষ্ট করেছেন এবং এখনও করছেন। কিন্তু তাঁদের চলার বেগ মন্দীভূত হতে চলেছে—এবিষয়ে সন্দেহ নেই। দুর্ভিক্ষে, জলপ্লাবনে, অন্যান্য দৈবদুর্বিপাকে মিশনের সন্ন্যাসীরা বিপন্নের পাশে গিয়ে দাঁড়াল পরমাত্মীয়ের মত। কিন্তু স্বামীজী আশা কোরেছিলেন, সন্ন্যাসীরা প্রতিদিনের সেবাকার্য্যের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের হৃদয়কে স্পর্শ করবেন। তাদের মধ্যে তাঁরা জাগিয়ে তুলবেন নূতন উদ্দীপনা, নূতন শক্তি, নূতন প্রাণ। তাঁরা মঠের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকবেন না গোলাজাত শস্যের মত। বীজের মত তাঁরা ছড়িয়ে পড়বেন সারা দেশে। তাঁদের জীবনের শিখা সারা দেশময় জ্বালিয়ে তুলবে অসংখ্য জীবনের শিখাকে। তাঁদের আত্মদানের ভিতর দিয়ে আসবে দিকে দিকে দীপ্ত, মুক্ত, মহাজীবনের বন্যাপ্লাবী বন্যা।

স্বামীজীর সাধনা এবং স্বপ্নকে সফলতা দান করবার জন্য এলেন গান্ধীজী। ত্যাগের যে বিরাট শক্তি আশ্রমের তরুচ্ছায়ায় ভক্তির এবং জ্ঞানের সাধনার মধ্যে বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল তাকে বিরাট কর্ম্মধারার মধ্যে সফল করে তুলবার জন্য প্রয়োজন ছিল একজন মহামানবের। সেই মহামানব গান্ধী। তিনি এসে ডাক দিলেন। দিগন্ত থেকে বেরিয়ে এলো ত্যাগের গৈরিক ধ্বজা উড়িয়ে সহস্র সহস্র পুরুষ-সিংহ। পিছনে পড়ে থাকলো গৃহ, পুত্রকন্যা, মাতা, প্রেয়সী। ঐশ্বর্য্যের মায়া তাদের বেঁধে রাখতে পারলো না, আরামের মোহে তারা আঁকড়ে রইলো না ঘরকে। এরা নূতন রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর দল। অসহযোগের তূর্য্যধ্বনি শুনে বেরিয়ে এসেছে মুক্তপথের ধূলিধূসরিত বুকে। এদের স্বপ্ন মুমূর্ষু জাতিকে নূতন ক'রে বাঁচাবার স্বপ্ন। বিবেকানন্দ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন এত দিনে তা সফলতা খুঁজে পেলো। এই নূতন সন্ন্যাসীর দল নিজেদের বাঁধা পড়তে দিলো না দেবালয়ের কোণে ভজন-পূজন-সাধন-আরাধনার মধ্যে। তারা নদীর চিরমুক্ত জলধারার মত চলতে লাগলো গ্রাম থেকে গ্রামে। সর্ব্বহারা চাষীদের মধ্যে পাতলো তাদের তপস্যার আসন, হরিজনদের পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে নূতন সাধকের দল অস্পৃশ্যদের সেবায় করলো আত্মনিয়োগ। সন্ন্যাস জনসেবার মধ্যে নিলো নূতন গরিমাময় রূপ। চরকা নিয়ে যারা গ্রামে গ্রামে দরিদ্রনারায়ণের সেবাকার্য্যের মধ্যে গেল তলিয়ে তাদের আত্মদান জাতির জনগণের হৃদয়ে আনলো আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। তাদের মধ্যে জন্ম নিলো দেশাত্মবোধ। জাতির বৃহত্তর স্বার্থের বেদীমূলে তারা শিখলো আপনাদিগকে উৎসর্গ করতে।

গান্ধী জীবে দয়া করার কথা বলেন না। গান্ধী জীবে দয়া করেন না। তিনি করেন মানুষকে রাজার মত সম্মান। তিনি দরিদ্র-নারায়ণের মধ্যে এলেন পরোপকার করবার জন্য নয়—তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদাবোধকে জাগাতে। মুষ্টিমেয় ধনীরা উপর থেকে দান করবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করবার লোভে এবং গরীবেরা দায়ে প'ড়ে সেই দান চিরকাল কুড়িয়ে চলবে—এ দৃশ্য গান্ধীর কাছে অসহনীয়। তিনি চান মানুষের নবতর সমাজকে গড়তে যেখানে উপর থেকে কেউ দেবে না এবং নীচে থেকে কেউ কুড়োবে না, যেখানে ভিক্ষুক ব'লে কেউ থাকবে না, যেখানে ধনীও থাকবে না, নির্ধনও থাকবে না।

মার্ক্স যাকে শ্রেণীহীন সমাজ বলেছেন গান্ধীজী তাকে বলেছেন রামরাজ্য। গান্ধীর পরিকল্পিত এই রামরাজ্যে মানুষে মানুষে ধনগত, ধর্ম্মগত অথবা বর্ণগত কোন বৈষম্য নেই, নারী এবং পুরুষ সমান অধিকার লাভ করেছে, জমিতে এবং রাষ্ট্রে জনসাধারণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গান্ধী চান মানুষ-মাত্রকে পূর্ণ, শুদ্ধ, মুক্ত দেখতে। মানুষকে রাজার মত সম্মান করেন ব'লেই জগন্নাথের মন্দিরে কোনদিন প্রবেশ করলেন না। যে মন্দিরে তাঁর সহস্র সহস্র হরিজন-রাজার প্রবেশাধিকার নেই তার মধ্যে তিনি কেমন ক'রে প্রবেশ করবেন? পরিত্যক্ত বিদেশীবস্ত্র তিনি দরিদ্রদের দান করতে পারলেন না—তা পুড়িয়ে দিলেন। অন্যের পরিত্যক্ত বস্ত্র তিনি নিজে পরেন না। দরিদ্র ব'লেই কি তাদের পরিত্যক্ত বস্ত্র দিয়ে অপমান করতে হবে? সেণ্ট ফ্রান্সিস্ সম্পর্কে বিখ্যাত লেখক Chesterton লিখেছেন: For he treated a whole mob of men as a mob of kings. একথা গান্ধীজী সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

সমর্পণ

শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ

যেদিন এসেছে দুঃখ, এসেছে বঞ্চনা
জীবনের পূর্ণপাত্র করিয়াছে অশ্রু বেদনায়,
সেদিন, হে প্রভু, তোমারে দিয়েছি অভিশাপ।
তিক্তকণ্ঠে করেছি তোমারে—শক্তিমান্ তুমি ভগবান্
তাই অসহায় মোর পরে করো অবিচার।
অশান্ত হৃদয় মোর, পারেনি তো করিতে গ্রহণ
তোমার এ দান—হাসিমুখে প্রসন্ন অন্তরে।
জানি নাই, বুঝি নাই, তোমার কল্যাণ-আশীর্ব্বাদ
ছিলো লুক্কায়িত দুঃখ বেদনার মাঝে।
কঠিন আঘাত হানি, ভেঙে দিলে অভিমান
বিনম্র করিলে মোরে।
এই ভালো, এই ভালো, প্রভু।
তোমার এ রুদ্ররূপে পারি যেন করিতে গ্রহণ।
সহজ অন্তরে।
দাও ধৈর্য্য, দাও ক্ষমা, দাও দৃষ্টি, উদার মহান্
শান্ত করো বিক্ষোভের ঝড়।
অন্তরের অন্তঃস্থল হতে, পারি যেন করিতে স্বীকার
তোমারে আপন বলি। আমার অশ্রুর মালা,
দিনু তোমার গলে,—সেই তার দাম।

লহ অর্ঘ্য

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

জীবনযাত্রার পথে নেমেছে গোধূলি-অন্ধকার
উদয়তোরণ গেছে পিছে,
আদর্শ সম্মুখে রেখে জ্যোতির্ময়, অকম্প্র আত্মার
চির-ধ্রুব নির্ভরে চলিছে।

অনির্ব্বাণ দীপ হাতে, অন্য হাতে ত্রিবর্ণ পতাকা—
অগ্রদূত দেখাইছে পথ—
ঊর্দ্ধাকাশে ধ্যানমগ্ন সপ্তঋষি, গ্রহতারা আঁকা,
শব্দহীন সমগ্র জগৎ।

হেথায় পল্লীর মাঝে কিন্নিরব ঝঙ্কারিত হয়,
সন্ধ্যা নামে, শান্ত এ ভুবন;
কল্পনায় মুগ্ধনেত্রে জাগিতেছে নিবিড় বিস্ময়
করি' পাঠ তোমার জীবন।

সম্মুখে ধরেছো তুলি' আমাদের আদর্শ মহান্—
রাজা তুমি, ঋষি তুমি আজি,
অধিকার করিয়াছ ত্রিশকোটী মানবের প্রাণ—
লহ অর্ঘ্য, গান্ধী মহারাজী।

জয়তু মহাত্মা

শ্রীঅমল সেন

সর্ব লাগি সর্বত্যাগী ভারতের মুক্তিদূত
রিক্ত দীন হে মুক্ত বৈরাগী !
পৃথিবীর নবজন্ম-প্রত্যূষ প্রতীক্ষা করি'
দীর্ঘরাত্রি আছো তুমি জাগি।
অনির্বাণ দীপ-শিখা নিশীথের অন্ধকারে
জ্বলিতেছে জ্যোতি করি' দান—
দুঃখের তপস্যা তব বন্ধন পীড়ন মাঝে
করিতেছে মুক্তির সন্ধান।
তব কণ্ঠে উচ্চারিত অহিংসার নাম-মন্ত্র
বেদগাথা করায় স্মরণ,
ক্ষুব্ধ ক্ষুব্ধ দানবের যতো দম্ভ অহংকার
অন্যায় অসত্য আচরণ
সত্যের কৃপাণে তুমি করিয়াছ বিখণ্ডিত
মুক্তি-মন্ত্রে বজ্র করি বল,
শৃংখলের কণৎকার সংগীতের মতো বাজে
তব কর্ণে রজনী-দিবস।
নব-প্রভাতের তীরে তুমি নব-যুগ-সূর্য
জ্যোতি তব অম্লান অম্লান—
দূরাগত সমুদ্রের গর্জনের মতো বাজে
তব দৃপ্ত উদাত্ত আহ্বান !
কারার বাহিরে মোরা নিত্য কারাগারে রহি
বহি যারা শৃংখলের ভার,
যুগ যুগান্তর ধ'রে যারা দুঃখ-ব্যথা স'য়ে
করিতে পারিনে প্রতিকার—
সেই মূক সর্বহারা বন্দিত বুভুক্ষ যতো
ম'রে আছে অপমানে লাজে,
আত্মার আত্মীয় রূপে তুমি এলে হে বরেণ্য
সে পীড়িত মানব-সমাজে,
তুমি আমাদেরি হ'য়ে চেয়েছ অকুণ্ঠ কণ্ঠে
স্বাধীনতা প্রদীপ্ত তার্যায়,
অখণ্ড বিশ্বাস তব ভাঙেনি মুহূর্ত তরে,—
জেগে আছো বাগ্র প্রত্যাশায়
কবে পোহাইবে রাত্রি, কবে দূর পূর্বাচলে
দেখা দিবে তরুণ তপন—
কবে হবে মুখরিত মুক্তি-মন্ত্রে ভারতের
সারা দিক দিগন্ত-অংগন !

তোমার তপস্যা জানি রাত্রিশেষে এনে দিবে
জ্যোতির কণক পদ্মখানি
মুক্তির মাংগল্যে ভরা সর্ব দুঃখ-গ্লানিহরা,—
বেদনা-পদ্মের বীণাপানি
তোমার বীণার তারে চরণ রাখিয়া তাঁর
তুলেছেন নতুন ঝংকার !
মহাত্মা, পেয়েছ তুমি মহান্ মানব-আত্মা
অলিখিত আশীর্বাদ তাঁর।
নিখিল মানব-মনে তোমার আসন পাতা
নিখিলের বেদনার কবি,
তুমিই দিয়েছ ভাষা বিশ্বের বেদনাতার
আপন অন্তরে অনুভবি'।
ল'য়েছ তুলিয়া শিরে কণ্টক মুকুটখানি
মৃত্যুরে ক'রেছ অস্বীকার,—
আঘাতে টলোনি তুমি, অপমানে আছো স্থির
অন্তরে র'য়েছ নির্বিকার।
যাত্রা তব দুঃখ-পথে দুঃখের দীপালি জ্বালা
অন্তহীন কাঙালের ঘরে,
তোমারে দেখেছি মোরা শ্মশান পল্লীর বুকে,
ভারতের নগরে নগরে।
চরকার নব-মন্ত্র তুমি দিলে ভারতেরে
স্বদেশীর নব-দীক্ষা দান,
অসত্যের সাথে তুমি শিখালে অসহযোগ
মনুষ্যত্বে দানিয়া সম্মান।
জাগ্রত উদ্দীপ্ত চিত্ত ভারতের মুক্তি দূত
অগ্নিমন্ত্রে শংকা করো দূর,
হাত ধ'রে টেনে তোলো আজো যারা অন্ধকারে
স্পন্দিত কম্পিত শংকাতুর।
সমস্ত দুঃখের ঊর্ধ্বে তুলিয়া উন্নত শির
তুচ্ছ করি সর্ব মিথ্যা ভয়
বিধিদত্ত অধিকার স্বাধীনতা আমাদের
যেন গো করিতে পারি জয়।
নব-জীবনের পথে চলিয়াছে যাত্রীদল
রাত্রি বুঝি হ'য়ে এলো শেষ—
মুক্তির নবীন বাণী বাজিছে গম্ভীর তানে,
তোমারে নমিছে সর্বদেশ।
স্বাগত স্বাগত ঋষি, হে বরেণ্য সুলতান
ভারতের হে মুক্তি-সাধক,
লহো আমাদের নতি মহাত্মা, মানব আত্মা
জয় হোক্ তব জয় হোক্।

কেস্ অব্ খুজা

শুভেন্দু ঘোষ

স্টেশনের রাস্তা ধরে যাচ্ছিলাম। এই নিরন্তপাদপ দেশে, এইখানটায়, রেল কোম্পানি বহু যত্নে যে-সব গাছ লাগিয়েছিল, সন্ধের আলো-আঁধারের সঙ্গে মিলে তাদের স্নিগ্ধ সবুজ আভা চোখদুটো জুড়িয়ে দিচ্ছিল।

আন্‌মনে চলছি ; মনে হল, কে যেন চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। খেয়াল করলাম না।

কাছে আসতে প্রশ্ন হ'ল, 'আপনি সন্নিসি ?'

অদ্ভুত প্রশ্ন ! লোকটাকে এক চোখে দেখে নিলাম। মধ্যবয়সী বাঙালী, তবে বাঙালীর পক্ষে লম্বা-চওড়া বটে। রংটা ঘোর কালো, পরণে হাফ্ প্যান্ট, হাত-কাটা সার্ট ; সঙ্গে বেশ মজবুত একটা সাইকেল। উত্তর দিলাম, 'বেশ দেখে লোকে তাই মনে করে বোধ হয়।'

ভদ্রলোক কথার প্যাচটা লক্ষ্য করলেন না, বোধ করি। কোনো রকম ভূমিকা না করেই সিধে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি সন্নিসি, কখনো ভগবানকে দেখেছেন ?'

গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে চায় নাকি ? বেশী বয়সেও অনেকের চাপল্য যায় না ;—এও তাই নাকি ? সন্ধের স্নিগ্ধ আলো হাওয়ার মনটা ঝিমিয়ে ছিল, চট করে সজাগ হয়ে লড়াইয়ের জন্য তৈরী হয়ে উঠল। কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না ; ঝেড়ে কেলার জন্যে জবাব দিলাম, 'না'।

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে প্রশ্ন করলেন, 'দেখেন নি ? আচ্ছা, ভগবানকে দেখা যায় ?'

সে মোলো ! ভদ্রলোকের মুখের দিকে আর একবার ভাল করে দেখে নিলাম :—এ প্রশ্ন তাঁর অন্তর থেকেই আসছে ! হয়তো মাথা খারাপ। 'বললাম, জানি না।'

ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা : 'কেউ দেখেছে, বলতে পারেন ?'

'শুনেছি পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে দেখিয়েছিলেন। আরও অনেকে হয়তো দেখে থাকতে পারেন। তাঁকে দেখবার মত ব্যাকুলতা আমার কোনোদিন হয় নি। কাজেই এঁদের খোঁজ আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।'

ভদ্রলোক যেন একটু ঘুষড়ে গেলেন, কিন্তু সঙ্গ ছাড়বার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি বলতে বলতে চললেন, 'আপনি বিরক্ত হচ্ছেন। আজকের কাগজ দেখেছেন আপনি ? কলকাতায় রাস্তায় কত লোক না খেতে পেয়ে মরছে তার ছবি বেরিয়েছে। এখানেও দেখি,—জোরে সাইকেল চালিয়ে পালিয়ে যাই,—দেখা যায় না চোখে। ভগবান এসব দেখেন না কেন ?'

কথাটা বলে ভদ্রলোক একটু থামলেন ; বুঝলাম, এ প্রশ্নের উত্তর তিনি আমার কাছে আশা করছেন। উত্তর যাহোক্ একটা দেওয়া যেত, কিন্তু তাতে তাঁর তৃপ্তি হ'ত না নিশ্চয়। ভাবলাম, একবার প্রশ্রয় পেলে ভদ্রলোকের পাগলামি রোধ করা যাবে না। চুপ করে থাকলাম।

এই সময় উমেশবাবুর সঙ্গে দেখা। রেলের গার্ড। এখানেই বাড়ীঘর করেছেন। আমাদের আশ্রমে মাঝে মাঝে এসে থাকেন। আমার সঙ্গীকে দেখে একটা নমস্কার করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইনস্‌পেকশন থেকে ফিরলেন বুঝি ? স্বামীজীর সঙ্গে কোথায় দেখা হল ?'

আমিই উমেশবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিলাম : 'এই—রাস্তায় আসতে আসতে আলাপ হল।'

রেলবাবুদের পাড়ায় এসে পড়েছি। ছিমছাম ছোট ছোট বাড়ী, লাগনে একটু করে উঠোন, রাস্তা থেকে বেড়া দিয়ে ঘেরা। ওরই মধ্যে একটা বড় গোছের বাড়ীর ফটকের কাছে এসে আমার অদ্ভুত সঙ্গীটী বললেন, 'এইটাই আমার বাসা। আসুন না ?'

কোনো কাজ ছিল না হাতে, তবু বললাম, 'আজ নয়, পরে।'

'আসবেন তো ? নিশ্চয়ই আসবেন তো ? এমনি সন্ধের পর আসবেন। শীঘ্র একদিন আসবেন কিন্তু।'

ভদ্রলোকের আগ্রহটা একটু বেশী বেশী হ'লেও এতটুকু অস্বাভাবিক মনে হল না। বললাম, 'আসব, পরশু তরশু

আসব।' ভদ্রলোক 'মিনু, মিনু' করে চীৎকার করতে করতে ভিতরে গেলেন। আমি উমেশবাবুর সঙ্গ নিলাম।

উমেশবাবু নিজে থেকেই অদ্ভুত লোকটার পরিচয় দিলেন: "ওঁর নাম দেবেনবাবু—ট্রাফিক ইনস্‌পেকটর—বিলেত ফেরত। বিলেত যাওয়ার একটা ইতিহাস আছে। বাঙ্গাল দেশের লোক, ম্যাট্রিক পাশ করে ই বি রেলের অফিসে কাজ করতেন। বড় সাহেব কী একটা গালিগালাজ করায় তাকে পিটিয়ে দেবেনবাবু চাকরী ছেড়ে দেন, বলে আসেন, বড় সাহেবের বড় সাহেব হয়ে এ অপমানের শোধ নেবেন। বড় চাকরী পাবার আশায় ভদ্রলোক স্থির করলেন, বিলেত যাবেন। সামান্য অবস্থা, তার ওপর বিয়ে থা করেছেন, বিলেত যাওয়ার টাকা কোথায়? বাড়ালের গোঁ—যথাসর্বস্ব বিক্রী সিক্রী করে, বৌ ছেলেকে কোন্ এক আত্মীয়ের বাড়ীতে রেখে দেবেনবাবু তো বিলেত গেলেন। গোঁয়ে তো আর বিদ্যে বশ হয় না, মাথা চাই। আলাপ করেই নিশ্চয় বুঝেছেন, একেবারে গবেট। বহু ঘষে মেজে রেলের কী একটা ছোট-খাট পরীক্ষা পাশ করে ভদ্রলোক দেশে ফিরে এলেন,—এসে চাকরী পেলেন কি? না, গার্ডের চাকরী! আমরাও তো গার্ড—তার জন্যে বিলেত যেতে হয়েছে? একেবারে মাথা খারাপ! আপনাকে জিজ্ঞেস করেন নি, ভগবান দেখেছেন কিনা? ওই ওঁর পাগলামি। গার্ড থাকতে সন্নিসি টন্নিসি দেখলে উনি মাঝ রাস্তায় গাড়ী থামিয়ে তাকে তুলে নিয়ে ঐ সব পাগলামি করতেন। বার দুই তার জন্যে ওঁর নামে রিপোর্টও হয়েছিল,—ওয়াকার সাহেব না থাকলে ওঁর চাকরী থাকত কি? ভেবেছেন? ওই ওয়াকার সাহেবই ওঁকে ট্রাফিক ইন্সপেক্টর করে দিয়েছে, কপাল, মশায়, কপাল! নইলে ওঁর যোগ্যতাটা কি! দু'কথা গুছিয়ে বলতে পারে? কি নজরেই যে সাহেব ওঁকে দেখেছে! ঐ একেবারে ন্যাক; ওঁকে দিয়ে কারও কোনো উপকার হবার জো নাই—কারও প্রোমোশন রেকমেণ্ড করা কি—।" উমেশবাবুর বাড়ীর কাছে এসে পড়ায় তিনি তাঁর বক্তব্যের পরিসমাপ্তি হিসেবে মুখ মুচকে একটু হেসে বিদায় নিলেন। উমেশবাবুর ঐ হাসিটি দেখলে আমার সমস্ত মন কেমন বিষাদ হয়ে ওঠে—কেমন যেন অশুচি বোধ হয়।

[২]

কথামত দেবেনবাবুর বাড়ী গিয়েছিলাম,—কদিনই গিয়েছি। লোকটাকে আমার বেশ লাগে,—কেন লাগে, তা বলা বড় শক্ত। এ রকম লোককে বয়দাস্ত করতে পারব, এ ধারণা আমার নিজেরই ছিল না। ওঁর কথাগুলো গঙ্গাফড়িঙের মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলে—কোথা থেকে কোথা গিয়ে পড়বে, বোঝা যায় না; ভদ্রলোক তাঁর অফিসের রিপোর্ট লেখেন কি করে, কে জানে!

একদিন বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে বসেছি, দুজনেই চুপ চাপ,—আমি একটার পর একটা সিগারেট ফুঁকে চলেছি। (দেবেনবাবু নিজে সিগারেট খোকেন না, আমার জন্যে টিনটা আনিয়েছেন।) হঠাৎ দেবেনবাবু একটু উস্‌খুস করে পাঠরতা মেয়ের দিকে চেয়ে 'এই একটা' বলে একটা সিগারেট ধরালেন। আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, ব্যাপার কি?

একটু চেপেচুপে বসে দেবেনবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, 'জানেন স্বামীজি, আমাদের কিঙ্কর ডাক্তার বলেন, ওঁর হোমিওপ্যাথিক মতে আমি নাকি 'থুজা'র কেস্! আপনি কি বলেন?'

আমি কি বলব? জবাব দিলাম, 'আপনার কি অসুখ তা জানিনা; হোমিওপ্যাথিও আমি জানি না। কি করে কি বলি, বলুন তো?'

দেবেনবাবু অধীর হয়ে বলে উঠলেন, 'অসুখ হতে যাবে কেন আমার? ঐ ডাক্তারই বলেন, আমার নাকি অসুখ—'এ কেস্ অব থুজা'!'

আমি খুব মনোযোগ দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী লক্ষ্য করতে থাকলাম। দেবেনবাবু মেয়ের দিকে চোরাচোখে একবার চেয়ে বলতে সুরু করলেন, 'জানেন স্বামীজি, বিলেতে আমার খুব টানাটানির মধ্যে চলত। একটা ছোটো হোটেলে স্টুয়ার্ডের কাজ করতাম, তার ওপর পরীক্ষার পড়া ছিল। রাত্রে খেতে অনেক রাত্রি হয়ে যেত। খেতে বসে রোজই দেখতাম, প্লেটের কাছে আর একখানা হাত। মানুষ দেখতে পেতাম না, শুধু একখানা হাত। সেও যেন খেতে চাইত! আমার এমন দুঃখ হত, কিন্তু খিদের জ্বালায় আমি খেতে বসে যেতাম। খাবার প্লেট থেকে সে যদি খাবার তুলে নিত,

তা হলে যে আমি আপত্তি করতাম তা নয়। একদিন খুব দেরী হয়ে গিয়েছে, পেট চোঁ চোঁ করছে,—সেদিন হাতখানা দেখে মনে হল, তারও খুব খিদে পেয়েছে। ওকে না দিয়ে আমার কিছুতেই খেতে ইচ্ছে হল না। তাকে বললাম, 'আজ তুমিও খাও, নইলে আমি রাত্রে খাওয়াই ছেড়ে দেব।' তখন কি হল, জানেন? হাতখানা আমার মধ্যে মিলিয়ে গেল, যাবার সময় জানিয়ে গেল, আমি গেলেই তারও খাওয়া হবে। এই কথা শুনেই ডাক্তার বলেছেন, আমি নাকি খুজার কেস্। কিন্তু তা তো সত্যি নয়, কি বলেন?'

আমি একমনে গল্প শুনছিলাম, এত তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে দেবেনবাবুর বর্ণনার মধ্যে কোন ফাঁক আছে কিনা, ধরবার চেষ্টা করি নি। তাঁর প্রশ্নের খোঁচাতে আমার চমক ভাঙল, মনের ঘোর তখনও পুরো কাটেনি বোধ হয়।

দেবেনবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তারের ভুল হয়েছে, আপনি কি বলেন?'

আমি বেশ বিজ্ঞভাবে উত্তর ভুল বজায় রেখে উত্তর দিলাম, 'এটাকে একটা রোগমাত্র মনে করতে আমার বাধছে; তবে কোনো মতামত প্রকাশ করা আমাদের শোভা পায় কি? মনের একটা অসাধারণ অবস্থা থেকে হয় তো এটার উদ্ভব; অসাধারণ হলেই সেটাকে আমরা অস্বাভাবিক বলে থাকি। ডাক্তার বাবু হয় ত এই জন্যেই একটা বিকৃতি, একটা রোগ বলেন। আচ্ছা, দেবেনবাবু, আপনি যে মানুষটাকে দেখতেন তার চেহারা আপনার কিছু মনে আছে? তার মধ্যে, আপনি তো শুধু একখানা হাতই দেখেছিলেন!'

দেবেনবাবু বললেন, 'বিলেতে থাকতে শুধু হাতই দেখেছিলাম বটে, কিন্তু দেশে ফিরে গোটা মানুষই তো দেখেছি।'

রহস্যের একটা তল পাবার আশায় জিজ্ঞেস করলাম, 'সে কথা তো বলেন নি।'

দেবেনবাবু অকারণে অভিযোগ করলেন, 'আপনি তো কিছু না শুনেই বললেন, ডাক্তার ঠিক বলেছে। আপনি তো বিশ্বাসই করতে চান না।'

আমি চুপ করে থাকলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেবেনবাবু আপনা থেকেই সুরু করলেন, 'বিলেত থেকে ফেরার পর ক'মাস চাকরীর চেষ্টা করতে হয়েছিল। ঐ সময় সারাদিন চাকরীর চেষ্টা করে মনটা বড় খারাপ হয়ে থাকত। সেইজন্যে, সন্ধের পর প্রায়ই বেহালার স্বামীজির কাছে যেতাম।'

একটু রহস্য করবার লোভ সামলাতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'তিনি বুঝি আপনাকে ভগবানের হদিস্ বাৎলে দিয়েছিলেন?'

দেবেনবাবু বিরক্ত হলেন, বললেন, 'না। তাঁকে ভালো লাগত বলে। আপনি সন্ন্যিসি হলে কি হবে, আপনি বড় হিংসুটে। স্বামীজি খুব ভাল লোক ছিলেন; আপনি তাঁকে জানেন না তাই। রাত্রি নটা দশটায় আর সবাই চলে গেলে তিনি আমার সঙ্গে দুএকটা কথা বলতেন—খুব ভাল লাগত। একদিন হয়েছে কি জানেন? খুব শীত পড়েছে, স্বামীজির বাড়ী থেকে বেরুলাম, দেখি, কে একজন সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। সে খুব শীতে কাঁপছে। আমার ভারী দুঃখ হল। তাকে বললাম, 'আমার চাকরী হলে তোমাকে আমি একটা গায়ের কাপড় কিনে দেব।' বলবামাত্র সে আমার মধ্যে মিলিয়ে গেল। আপনি তো বলেছেন, আমি মানুষ দেখিনি, শুধু হাত দেখেছি!'

[৩]

সেদিন গল্প করতে করতে রাত্রি হয়ে গেল। দেবেনবাবু আমায় একটু এগিয়ে দিতে এলেন। চুপচাপ চলেছিলাম। ছুটফুটে জ্যোৎস্না রাত্রি, রাস্তায় লোকজন নাই। দেবেন বাবু আপন মনেই বলতে সুরু করলেন, 'ভগবান আছেন, তার প্রমাণ আমি দিতে পারি; আমাদের বিলাসবাবু কিন্তু কিছুতেই মানতে চায় না। আচ্ছা স্বামীজি, আপনি মানেন তো, ভগবান্ আছেন।'

শ্রান্তি বোধ হচ্ছিল; ভগবান দেখার প্রসঙ্গ এড়াবার জন্যে উত্তর দিলাম, 'আছেন, তা মানি। তবে তাঁর কোনো মূর্তি আছে কিনা, তাঁকে দেখা যায় কিনা, একেবারেই বলতে পারি না।'

দেবেনবাবু একটু উত্তেজিত ভাবেই বললেন, 'আমি বলছি, ভগবান আছেন, তিনি আমাদের কথা শোনেন।

নেন, মিনুর যখন টাইফয়েড হয়েছিল, ডাক্তার বলে গেলেন, 'রাত কাটলে হয়।' আমি ওকে খুব ভালবাসি কিনা, আমার সে যে কি অবস্থা আপনি বুঝবেন না। আপনারা বেশ আছেন! মেয়ে বাঁচবে না শুনে আমার বুকের ভিতর সে যে কি করতে লাগল। অন্ধকার ঘুটঘুটে রাত্রি, ছাদের উপর গিয়ে কেবলই মনে হতে লাগল, 'ভগবান, তুমি আমার ঐ একটী মাত্র মেয়েকে নিয়ে নিবে? আমাকে নিয়ে ওকে বাঁচিয়ে দাও'। মনের মধ্যে যত কথা ছিল ভগবানের উদ্দেশ্যে সব খুলে বলে দিলাম: ভগবান, তোমার না আছে কান, না আছে চোখ। ওদিন হরিবাবুর ঐ সুন্দর ছেলেটাকে মেরে ফেললে! ওর মায়ের কান্না শুনেছ তুমি? শুনলে থাকা যায় না, মাথা খারাপ হয়ে যায়! হরিবাবু চাকরী ছেড়ে দিলেন, বলেন, 'আর কেন?' এ-সব তুমি দেখো? আমার মেয়েকে তুমি নিতে চাও, একবার ভেবে দেখেছ, ওর মার কি হবে? আমার কি হবে! ভেবেছ এ সব কথা। তোমার বিচারও নাই, মনে একটু দয়া মমতাও নাই। তোমার মত ভগবান থেকে লাভ?—এমনি করে সারারাত ছাই পাঁশ কত বকলাম। আপনি হাসছেন, স্বামীজি? আপনাদের কি? বেশ আছেন। ছাদের ওপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, স্বপ্নে শুনলাম মিনু ভাল হয়ে গিয়েছে। তখনও স্বপ্ন দেখছি, মিনুর মা এসে আমায় জাগাল, বলল, 'যাক, রাত কেটেছে, মিনুর আর জ্বর নাই, ভগবান এ যাত্রা রক্ষা করেছেন।' ঠিক তাই। সকালে ডাক্তার এসে বললেন, 'আর ভয় নাই'। কিন্তু আশ্চর্য্য! আমার একটুও আশা ছিল না।'

আমি এতক্ষণ দেবেনবাবুর মুখের পানে চেয়ে ছিলাম,—ভদ্রলোকের বিশ্বাসের সরলতা বেশ ভাল লাগছিল। তিনি আপন মনে বকে যাচ্ছিলেন—একান্ত অন্যমনস্কভাবে। আজকের দিনে এ রকম বালসুলভ সরলতা নিয়ে লোকে বেঁচে থাকতে পারে, দেখে বিস্ময় বোধ হচ্ছিল। বাইরের সহস্র আঘাত উপেক্ষা করে এটা এত সহজে সজীব থাকে কি করে?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর দেবেনবাবু উসখুস্ করতে লাগলেন। ভাবলাম, বুঝি বাড়ী ফেরার তাগিদ আছে, বলতে সংকোচ বোধ করছেন। বললাম 'এবার আপনি ফিরুন, অনেকদূর এসে পড়েছেন।'

দেবেনবাবু বললেন, 'না, আর একটু যাই।' মিনিট কয়েক নিঃশব্দে চলার পর প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, স্বামীজি, আমরা এমন কেন?' বলে, আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকলেন। জিজ্ঞেস করতে হল, 'কেমন কেন?'

'এই—নিজের ছেলেমেয়েদের যে চোখে দেখি, পরের টাকে সে চোখে দেখতে পারি না কেন? আমাদের উমেশ বাবুকে তো চেনেন? তাঁর ছেলে ভন্টু—বেশ ভাল ছেলে; তার ভবল নিমুনিয়া হ'ল—এই-যায়, সেই-যায় অবস্থা। ওদের বাড়ীতে মেয়েরা তো কান্নাকাটি সুরু করলেন। ভাবলাম, ভগবানকে জানিয়ে মিনুকে বাঁচিয়ে নিয়েছিলাম—আর একবার দেখিনা। কিন্তু তেমন করে বুক খুলে কথা তো বেরুল না! আমরা সংসারী লোক, নিজেরটা বুঝি; পরেরটা তো তেমন বুঝি না। বারে বারে মনে মনে বলতে লাগলাম, 'ভগবান্, ভন্টুকে বাঁচিয়ে দাও!' হঠাৎ মনে হল, ভগবানের নাম নিয়ে একটা তুলসী পাতা খাইয়ে দিলেই ও ভাল হয়ে যাবে। তখনই গিয়ে উমেশবাবুকে বললাম। আমি বিলেৎ-ফেরৎ ডেক্স—আমার দেওয়া তুলসী পাতায় রোগ সেরে যাবে,—এ কথা উমেশবাবুর বড়দা মোটেই মানতে চাইলেন না, হয় ত। যা হোক্, আমি জিদ করাতে তাঁরা রাজী হলেন। আপনি শুনলে অবাক হবেন, তারপর থেকেই ভন্টুর অসুখ সারতে লাগল। ভগবান আছেন, স্বামীজি,—এর চেয়ে আর বেশী প্রমাণ চান?'

আমি এই সমাজেরই লোক, লোকে বলে, ধর্মব্যবসায়ী; কিন্তু সত্যি বলতে, কোন রকম অন্ধ বিশ্বাসকে আমি মনের মধ্যে স্থান দিতে পারি নাই, মধ্যে মধ্যে আমার এখনও মনে হয় যে, ভগবান বলে কিছুই নাই, আর না থাকলেও মানুষের কিছু যায় আসে না। যাক সে কথা, দেবেনবাবুর গল্প শুনে আমি মনে মনে একটু করুণার হাসি হাসলাম। কিন্তু বিরুদ্ধ যুক্তি দিয়ে তাঁকে চটাতে কেমন যেন মায়া হল। দেবেনবাবুর মাথায় ছিট আছে, একথা আমি জানি; কিন্তু ঐ ছিটের জন্যেই তাঁর ওপর আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। তাঁর পাগলামি নিয়ে কেউ বিদ্রূপ করলে আমার দুঃখ হয়। কেন তাই বলছি।

এখানে আমার কয়েকদিন আগেকার কথা। নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় দিন তিনেক দেবেনবাবুর ওদিক যাওয়া হয়নি, অথচ যাওয়াটা বেশ অত্যন্ত হয়ে উঠেছিল। সেদিন একটু অবকাশ করে বেরিয়ে পড়লাম।

দেবেনবাবুর বাড়ীর ফটকে এসে দেখি, তাঁর বসার ঘরে আলো জ্বলেনি। হয়ত বাড়ী নেই, ভেবে স্টেশনের দিকে চলে যাচ্ছি, 'স্বামীজি, স্বামীজি' বলে ডাকতে ডাকতে লম্বা লম্বা পা ফেলে দেবেনবাবু আমায় এসে ধরলেন: 'আপনি এসে চলে যাচ্ছেন, আর তিনদিন আমি আপনার অপেক্ষায় বসে আছি। আজ আপনি না এলে আমি আপনার আশ্রমে যেতাম। আমি যে কি বিপদে পড়েছি, তা জানেন না।'

হঠাৎ দেবেনবাবুর মুখের ওপর চোখ পড়তে চমকে উঠলাম, তাঁর বিরহীর মত পথ চাওয়া নিয়ে একটু কৌতুক করতে যাচ্ছিলাম, উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি—কি বিপদ?'

'আচ্ছা, আপনিই বলুন তো অ
অন্তে কি আমি দায়ি?'

'তা কেন হবে?'

'তাই তো হচ্ছে। উমেশবাবুর চাকরী গেলে, তাঁর পরিবারের কষ্ট হবে, তার জন্তে কি আমি দায়ি? তাঁর নিজের কোনো দায়িত্ব নাই?'

এই রকম উল্টো দিক থেকে কথা আরম্ভ করা হল দেবেনবাবুর রোগ,—ভারী বিরক্ত লাগে। কোনো উত্তর না দিয়ে আমি চুপ করে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত তাঁর এলোমেলো কথার মধ্য দিয়ে যা জানা গেল, তার মূল মর্ম হচ্ছে এই:

'রেলকর্মচারী হয়ে ইঞ্জিনের পোড়া কয়লার ব্যবসা করা হচ্ছে কোম্পানীর আইন বিরুদ্ধ। ঐ কয়লা খোলা নিলামে বৎসরে একবার করে বিক্রী করা হয়। উমেশবাবু রেলের কর্মচারী হয়েও গত কয় বছর ঐ কয়লার ব্যবসা করে আসছেন। ব্যাপারটা অনেকেই জানে; যথেষ্ট লাভ হওয়ায় তার একটা অংশ দিয়ে, তদ্বির করে, উমেশবাবু ছোট কর্তাদের বরাবর ঠাণ্ডা রেখে এসেছেন। এবার ব্যাপারটা একটু বেশী দূর এগিয়েছে; বড় অফিস থেকে দেবেনবাবুর ওপর তদন্ত করার আদেশ এসেছে। তদন্তের ফলে যা জানা গিয়েছে তাতে উমেশবাবুর পক্ষে চাকরী রাখা দায় হবে। তদন্ত সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটা গোপনীয় ভাবেই চলছিল, তবু উমেশবাবু কি করে টের পেয়ে কাল রাত্রে অনেকক্ষণ হাতে-পায়ে ধরে কেঁদে কেটে গিয়েছেন; ওদিকে উমেশবাবুর স্ত্রীও অন্দর মহলে ধর্না দিয়ে আছেন—দুদিনে ছেলে মেয়েদের মুখ চেয়ে উমেশবাবুকে ঐ ব্যবসা করতে হয়েছিল, ঐ আয়টুকু না থাকলে সংসার চালানো দায় হত। তাছাড়া, এ তো চুরি জোচ্চুরি নয়,—অন্তে যে ব্যবসা করতে পারে রেলে কাজ করেন বলেই উনি তা করলে অন্যায় হবে? ধর্ম তো আর আইন নয়। বাঙালী হয়ে, একেবারে আপনার লোক হয়ে দেবেনবাবু কি বাঙালীর জাত মারবেন? সামান্ত দুটো কথা—তা এমন মিথ্যেই বা কি? — সামান্ত দুটো কথা লিখে দিয়েই একটা পরিবারকে যদি বাঁচানো যায়, তাই কি ধর্ম নয়?'

এই সব অকাট্য যুক্তির ঘায়ে, উমেশবাবুর ভবিষ্যৎ কি হবে এবং নিজে কি রিপোর্ট দেবেন—এই ভাবনায় দেবেনবাবু একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। উমেশবাবুকে তো বলে দিয়েছেন, মিথ্যে কথা তিনি জেনে শুনে আজ পর্যন্ত বলেননি সুতরাং মিথ্যে রিপোর্ট তিনি দেবেন না; কিন্তু তাই বলে কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়?

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি করবেন?'

'তারই জন্তে তো আপনাকে খুঁজছিলাম। কি করব, বলুন তো? ওদের তো কষ্ট হবে! তার জন্তে কি আমি দায়ী? উমেশবাবুর কোনো দায়িত্ব নাই? তিনি বে-আইনী কাজ করলেন কেন? কি মুস্কিলেই পড়েছি?'

'সে তো সত্যিই।'

'তা হলে সত্যি রিপোর্টই দিয়ে দিই, কি বলেন?'

ওঁর ব্যগ্রতা দেখে আমার হাসি পেল। বুঝলাম, তিনি আর ভাবতে পারছেন না, আমার ঘাড়ে সিদ্ধান্তের ভারটা ফেলে দিতে পারলেই তিনি বেঁচে যান। কিন্তু এ রকম ক্ষেত্রে অন্তের মাথা গলানো ঠিক নয়। বললাম, 'মিথ্যে লিখতে মন যখন সরে না, তখন মিথ্যে লিখবেন না।'

'কিন্তু চাকরী গেলে উমেশবাবুর কি হবে? আপনি তো বেশ বললেন, ঠিক ঠিক লিখে দেন।'

'আমি কিছুই বলিনি,—যা খুশী করুন গে।'

'আমি কি বিপদে পড়েছি, আপনি দেখছেন না। শুধু শুধু রাগ করছেন! কি করব, বলুন না!'

কোনো জবাব না দিয়ে আমি উঠে পড়লাম।

সেবার দিন স্টেশনে দেবেনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমায় দেখে খুব খুশী হয়ে বললেন, 'আপনার কথামত সত্যি রিপোর্টই লিখে দিয়েছিলাম। তারই মধ্যে শেষ দিকে লিখে দিয়েছিলাম, চাকরী গেলে উমেশবাবুর খুব কষ্ট হবে, তাঁর চাকরীটা যেন না যায়। তার জন্যে সাহেব আমায় সাবধান করে দিয়েছেন, অমন যেন আর না লিখি। উমেশবাবুর চাকরী তো বেঁচে গিয়েছে, কি বলেন?'

রাজপথ

মণিমালা দাশগুপ্তা

সুনীল আকাশে
নীচের সবুজে
—দিক্‌রেখা যেথা এক হ'য়ে মেশে,
শুভ্র-জ্যোৎস্না
নামে পথে
আর—, ছায়াপথে নামে চাঁদ—।
জীবনের ডাকে—কোন্ সে আশায়
শ্রান্ত-রজনী থমকিয়া চায়—
ঘোচেনাকো তার
আশাপথ-চাওয়া
তাই
গেয়ে ওঠে গান।
ধরণীর বুকে—ব্যর্থতা একী!
রাজপথ তব নাম?

এখনো নেভেনি
আলোর সে শিখা
ধোঁয়ার আড়ালে পড়েছে যা' ঢাকা,
মরীচিকা-সম ভুলের ছন্দ
ভুলাইছে তব প্রাণ!
মন্দির মাঝে—
বাজে মন্দিরা—
শোনো নাই তার তান?

উল্লাস আর বেদনার গীত
প্রীতি জাগে মনে—
কভু আনে ক্ষতি—
নীরবে চাহিয়া শুধু দেখো—
এই জীবনের অভিযান—!
বিদ্রোহ নাই—হে বিরাট
শুধু আছে বুঝি অভিমান?

যত জন যান—অবহেলি তোরে
দলিয়া—পিষিয়া—
চলে যারে যারে
তবুও প্রেমিক—ধরার ধূলায়
পাতিয়াছো তব স্থান।
রাখি নাই মোরা—রাখি নাই আজও
রাখি নাই তব মান।

জাতি-বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ (৭)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক এবং ষষ্ঠ দশকের প্রথম দুই বৎসর নানা কারণে স্মরণীয়। সিপাহী বিদ্রোহ, আর ইহার মধ্যে কোম্পানীর কর্তৃত্ব অবসান হইয়া স্বয়ং ব্রিটিশ-রাজের ভারত-শাসন ভার গ্রহণ, নীল আন্দোলন এবং আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী এই সময়ের মধ্যে ঘটিয়া যায়। ইংরেজ আমলে সিপাহী বিদ্রোহকে প্রথম ব্যাপক স্বাধীনতা আন্দোলন বলিয়া অভিহিত করা হয়। তবে ইহা কয়েকটি দেশীয় রাজা, উত্তর-পশ্চিম-ভারতের জনমণ্ডলী ও সৈন্য-সামন্তদের মধ্যেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলার শিক্ষিত সমাজ ইহার সঙ্গে যোগ দেয় নাই, বরং ইংরেজেরা যখন বাঙালীদিগকেও ইহার মধ্যে টানিয়া লইয়া সমভাবে অত্যাচার-উৎপীড়নের চেষ্টা করে তখন তাহারা এই বলিয়া ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করে যে, বিদ্রোহ সৈনিক শ্রেণী ও পশ্চিমের জনগণের মধ্যেই নিবদ্ধ, বাঙালী সমাজের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কোনরূপেই ইহার সঙ্গে যোগ নাই। নীল আন্দোলনে বাংলার প্রজাকুল যে অভূতপূর্ব্ব সঙ্ঘশক্তি প্রদর্শন করে তাহার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বাঙালীর মুখপাত্র বাংলার শিক্ষিত সমাজ এই আন্দোলন সমর্থন করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা যে নানাদিক দিয়াই এক নবযুগের সূচনা করিতেছিল তাহা বোধ হয় তখন তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই। এক কথায়, গত শতাব্দীর পঞ্চম দশকের শেষ এবং ষষ্ঠ দশকের প্রথম—এই দশ বৎসর বাঙালী তথা ভারতবাসীর সমাজ ও রাষ্ট্র-জীবনে একটা ছেদ টানিয়া দিয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে কার্য্যধারা ছিল এক রূপ পরে হইল অন্য রূপ। আর এই সময় হইতে যে নবজীবনের সুরু হইল তাহা শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও ক্রমশঃ পরিণতির দিকেই অগ্রসর হইয়াছে। মোটামুটি বলিতে গেলে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাণী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক শাসন-ভার গ্রহণ অবধি আমরা একই লক্ষ্য পানে ছুটিয়াছি।

এই কথাটি আর একটু পরিষ্কার করিয়া দেখা যাক্। ইংরেজ যে ইংরেজ, ভারতবাসীর সঙ্গে যে তাহার কোনকালেই মিলন হইতে পারে না; ইংরেজ শাসক, ভারতবাসী শাসিত; ইংরেজ প্রভু, ভারতবাসী তাহার দাস—এই মনোভাব ইংরেজদের কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে থাকে। সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর নিকট হইতে ভারত-শাসন ভার ব্রিটিশ-রাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন তদবধি এই মনোভাব ইংরেজ জাতির মনে, কোন শ্রেণীবিশেষের মাত্র নহে, অনুপ্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তখন তখনই অবশ্য এই ধারণা সুপরিস্ফুট হইয়া দেখা দেয় নাই। পুরাতন ইংরেজ সম্প্রদায়—শাসক এবং সাধারণ দুই-ই—আস্তে আস্তে আসর হইতে বিদায় লইল। তাহাদের স্থান যাহারা আসিয়া পূরণ করিতে লাগিল এবং পুরাতনদের মধ্যেও যাহারা নূতন পরিবেশের মধ্যে আসিয়া পড়িল সকলেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতে বদ্ধপরিকর হইল। ক্রমে এই স্বাতন্ত্র্য-রক্ষা প্রণালী একটি কলা বা আর্টে পরিণত হইয়াছে। নীল আন্দোলনের জের ষষ্ঠ দশকে টানা হইলেও এবং ইহার মধ্যে কখন কখন সদাশয় ইংরেজদের প্রজাপক্ষ অবলম্বন করিতে দেখা গেলেও, ভিতরে ভিতরে স্বাতন্ত্র্য-প্রীতি ঘোরতর হইয়া উঠিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে আমাদের পরবর্ত্তী আলোচনা পাঠক-পাঠিকার নিকট সহজেই বোধগম্য হইবে।

সিপাহী বিদ্রোহের পর দুই তিন বৎসর নিজেদের সামলাইয়া লইতেই কর্তৃপক্ষের কাটিয়া গেল। তাহারা অতঃপর ভারত সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নিখিল-ভারত এবং প্রাদেশিক আইন-সভা স্থাপন, হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা, ফৌজদারী আইন প্রণয়ন, সামরিক ব্যবস্থার সংস্কার ও সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন প্রভৃতি করিয়া লইলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় একটি বিষয় প্রকট হইয়া পড়ে। তাহা এই যে, ব্রিটিশ শাসকগণ ভারতবাসীদের মনোভাব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু খোঁজখবর রাখিতেন না। এবারে শাসন-ব্যবস্থার সংশোধন করিয়া তাহা খানিকটা জানিয়া লইবার

সুবিধা হইত। শাসন দৃঢ় করিবার পক্ষে ইহা বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। বাংলা ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় যে-সব পুস্তক লিপিবদ্ধ হয় তাহার বিষয়বস্তু জানিয়া লওয়াও কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন বোধ করিলেন। পাদ্রী লঙকে দিয়া পঞ্চম দশকে বাংলা পুস্তকাদির সারাংশ ইংরেজীতে অনুবাদের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু ষষ্ঠ দশকে এইজন্য একটি সুনির্দ্দিষ্ট বিভাগের সৃষ্টি হইল। ব্যবসার দিকে মন দিলে শাসনকার্য্য পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা, এইজন্য কোম্পানীর বাণিজ্যের অবসান লবণের ব্যবসা কর্তৃপক্ষ বন্ধ করিয়া দিলেন। এ বিষয় এখানে একটু বিশেষ করিয়া বলি। পূর্ব্ব যুগে ভারতবাসীরা নিজেরাই প্রয়োজনীয় লবণ প্রস্তুত করিয়া লইত। লবণ উৎপাদনের ও ব্যবসার অধিকারও তাহাদের ষোল আনা ছিল। লর্ড ক্লাইভ অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে এই অত্যাবশ্যক জিনিসটি, অর্থাৎ লবণ শিল্পটি তাহাদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া কোম্পানির একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। কোম্পানীর এই ব্যবসা শুরুতে খুবই লাভজনক হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিগণ সরকারের অধীনে নিমক মহালে দেওয়ানী করিয়া সামান্য যাহা কিছু পাইয়াছিলেন তাহাতেই অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বিলাতী লবণ আনিয়া ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলে, কারণ যানে তখন ইহা খুবই সস্তা করা হয়। সরকারও লবণ ব্যবসা চালাইবার প্রয়োজনীয়তা আর অনুভব করিলেন না। শাসন-সৌকর্য্যের অছিলায় সরকার ১৮৬২-৬৩ সালে লবণ ব্যবসা তুলিয়া লইলেন।

কর্তৃপক্ষ যখন নিজেদিগকে এইরূপ সুদৃঢ়ভিত করিবার কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছিলেন তখন আমরা শিক্ষিত ভারতবাসীরা কি করিতেছিলাম? পঞ্চম দশকে নগরে ও গ্রামে আমাদের মধ্যে কিরূপে কতকটা আত্মসচেতনতা আসিয়াছিল তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কিন্তু যে শাসন-চাপ জাতির দেহ ও মন পিষ্ট করিতেছিল তাহাতে ইহা ব্যাপক ও স্থায়ী হইতে পারে নাই। সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য আমরা কতকটা ইতিপূর্ব্বেই জানিয়া লইয়াছি। টমাস বেবিংটন মেকলে, চার্লস ট্রেভেলিয়ান প্রমুখ শিক্ষা-ব্যবস্থার নিয়ামকগণ যেমনটি চাহিয়াছিলেন, শিক্ষা-বৈশিষ্ট্যে তথাকথিত শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে প্রায় তাহাই ঘটিয়া যাইতেছিল। ইংরেজী শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে স্বজাতি, স্বসংস্কৃতি, স্বধর্ম্ম, স্বজাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সকলের উপরই ক্রমবর্দ্ধমান বিতৃষ্ণা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। বিদেশীর নিকট হইতে গ্রহণীয় যতটুকু তাহা লইতে অন্ততঃ ভারতবাসীরা কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই, কিন্তু তাহারা ইতিপূর্ব্বে কখনও নিজেকে হারাইয়া বিদেশী বনিয়া যায় নাই। এ সময়ে ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বিদেশী রীতি নীতিরই সবিশেষ পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা অনেকেই সুরাপানে এতই আসক্ত হইয়া উঠিল যে, তাহাতে বহু মনীষা অকালে বিনাশপ্রাপ্ত হইল, বহু বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার একেবারে ছারখারে গেল।

সিপাহী বিদ্রোহের দরুণ এবং শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার, সংশোধন, পুনর্গঠন প্রভৃতি হেতু সরকারী রাজকোষের উপর নিরতিশয় টান পড়ে। রাজকোষ অন্ততঃ আংশিকভাবেও পূরণ করিবার জন্য ষষ্ঠ দশকের আরম্ভেই আয়কর নির্ম্মমভাবে স্থাপিত হইল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত নিম্নতন আয়ের লোকের আয়কর ধার্য্য হইয়াছিল এইরূপ—বার্ষিক ৫০০ টাকার অধিক আয়ের নিমিত্ত শতকরা ৩ টাকা, ২০০ টাকা অধিক এবং ৫০০ টাকার ন্যূন আয়ের নিমিত্ত শতকরা ২ টাকা! ভূদেব মুখোপাধ্যায় সামাজিক প্রবন্ধে (৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ২২০) দুই শত টাকা ও তদধিক আয়ের লোকের একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা এই তালিকা হইতে সমাজের এতাদৃশ আয়বান লোকের সংখ্যা এবং তখনকার শোচনীয় সাধারণ আর্থিক অবস্থা জানিয়া লইতে পারেন। বলা বাহুল্য, এইরূপ আয়কর স্থাপনে লোকের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইতে লাগিল।

নিমতলা শ্মশানঘাট উঠাইয়া দিবার জন্য সরকার চেষ্টিত হন ১৮৬৪ সালে। কিন্তু সাধারণের প্রতিবাদ হেতু এই কার্য্য হইতে তাহারা বিরত হন। ইহার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হইয়াছিল তাহাতে স্বনামধন্য রামগোপাল ঘোষ নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ সরকার এক অনুজ্ঞা প্রচার করিয়া চড়ক পূজায় বাণফোঁড়া নিষেধ করিয়া দিলেন। এই দশকের আর একটি উল্লেখযোগ্য নির্দ্ধারণ পাদ্রকা

পরিধান সম্পর্কে। এক সময়ে সরকারী বা বেসরকারী আপিসে ইউরোপীয় কর্মচারীদের প্রকোষ্ঠে ভারতবাসীদের জুতা পায়ে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল। ক্রমে কলিকাতায় সাহেবী ধরণের বুট জুতা পায়ে আপিসে ঢুকিবার নিয়ম হয়। দেশী চটি বা বা নাগরাই জুতা কিন্তু বরাবর এ অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। এই সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার আত্মচরিতে (পৃ: ৯৭-৯) নিম্ন অভিজ্ঞতা হইতে একটি কৌতুকপূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন। শিবনাথ তখন ছাত্র, পিতার পত্রবাহক হইয়া তিনি স্কুল ইন্‌সপেক্টর উড্রো সাহেবের প্রকোষ্ঠে চটি জুতা পায়ে প্রবেশ করিলে তাঁহার সঙ্গে এইরূপ কথাবার্ত্তা হয়:

"উড্রো। তুমি আপীস ঘরের বাহিরে জুতা খুলিয়া এস নাই কেন?

আমি। এ ঘরে প্রবেশ করিবার সময় জুতা খুলিতে হয় এ নিয়ম যে আছে, তা তো জানিতাম না; তাহা হইলে এ ঘরে প্রবেশ করিতাম না।

উড্রো। তুমি জুতা পরিয়া এ ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে অপমান করিয়াছ। তুমি জুতা খুলিয়া এস।

আমি। না সাহেব, আমি জুতা খুলিব না। আমি কিরূপে আপনার অপমান করিলাম বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার পায়ে জুতা রহিয়াছে, আপনার কেরাণীবাবুর পায়ে জুতা দেখিতেছি। আপনারা যদি খোলেন তবে আমি খুলিতে পারি।

উড্রো। ও যে বুট জুতা।

আমি। বুট জুতা পায়ে দিয়ে এলে আপনার মান থাকিত, আর চটি জুতা পায়ে দিয়ে আসাতে আপনার মান গেল। এ নূতন কথা; ইহা আমি কিরূপে বুঝিব?

উড্রো। হাঁ আমার আপীসের এ নিয়ম আছে, তাহা তুমি কি জান না?

আমি। না সাহেব আমার জন্মে এমন নিয়ম শুনি নাই।

উড্রো। তুমি জুতা খুলিবে কিনা, বল।

আমি। না সাহেব, খুলব না।

উড্রো। তবে তোমার চিঠি নেব না।

আমি। এই কাগজ আপনার ছেলের উপর রৈল। ও আপনারই কাগজ; নেন নেবেন, না নেন না নেবেন। আমার কাজ আমি করে গেলাম।"

শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে উড্রো সাহেবের কথাবার্ত্তার বাকী অংশ আর এখানে দিলাম না। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, ইংরেজ কর্মচারীগণ অতি তুচ্ছ ব্যাপারেও কিরূপ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতেন। শিবনাথ বলিয়াছেন, 'সোমপ্রকাশে' এই ঘটনাটি প্রকাশিত হয় এবং সাহেবের ব্যবহারের উপর এবং সাধারণ ভাবে উক্ত প্রথা সম্পর্কে সম্পাদক তীব্র মন্তব্য করেন। অবশ্য ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ভারত-সরকার এই অনুজ্ঞা দেন যে, বুট জুতা পায়ে ভারতীয়গণ রাজধানীর ন্যায় মফস্বলেও সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারিবেন। চটি জুতার বরাত কিন্তু ফিরিল না। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কার্য্য স্মরণীয়। তিনি দেশী চটি জুতা পায়ে ছোট লাটের সঙ্গে পর্য্যন্ত দেখাসাক্ষাৎ করিয়া ইহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখাও বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। লর্ড কার্জ্জন বড়লাট হইয়া প্রথম কলিকাতা আসিলে (১৮৯৮) ভারত-সভার নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে যথারীতি অভিনন্দন করিতে লাট-ভবনে গমন করেন। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী চটি জুতা পায়ে থাকায় দর্শনের অনুমতি পান নাই! তিনি অগত্যা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন।

ধর্ম্ম ব্যাপারেও সরকার পুরাপুরি স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে কোম্পানীর আমলে হিন্দুদের দেবদেবী রক্ষার ও তীর্থস্থান পরিচালনার ভার কর্ত্তৃপক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যথাসময়ে মন্দিরে ভেট দিতেন। ক্রমে এই প্রথা প্রায় রহিত হইয়া যায়। এই প্রথার অবশেষ—পুরীর জগন্নাথ দেবের সেবার নিমিত্ত যে বার্ষিক দেওয়া হইত এই দশকে তাহাও উঠিয়া গেল। খুর্দার রাজাকে কিছু বার্ষিক দিয়া নিজেদের বার্ষিক বন্ধ করিয়া দিলেন।

সরকার পুনরায় নীলকরদের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। কিন্তু নানা কারণে নীলের ব্যবসা পূর্ব্বের ন্যায় আর লাভজনক রহিল না। আবার ইহাতে ঝঞ্ঝাটও অনেক পোহাইতে হয়। তাই ইউরোপীয়গণ অনেকে এ ব্যবসা ছাড়িয়া অন্য দিকে চোখ ফিরাইল। আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে যে চা জন্মে সে সম্বন্ধে গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই খবর পাওয়া যায়। কিন্তু এদিকে কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া লোকে তখনও চীন হইতেই চা আমদানী করিত। চায়ের চাষ-আবাদ শিক্ষা করিবার জন্য কাহাকেও কাহাকেও ও-দেশে পাঠানোও হইয়াছিল। ১৮৩৪ সালে বড়লাট

বেন্টিঙ্ক একটি কমিটি বসাইয়া এদেশে চায়ের চাষ-আবাদ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করেন। রাজা রাধাকান্ত দেব এই কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। কমিটি শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ডক্টর এন. ওয়ালিচের উপর অনুসন্ধানের ভার দেন। ওয়ালিচ আসামের পূর্ব্ব দিকে পার্ব্বত্য অঞ্চলে গিয়া স্বাভাবিক ভাবে উৎপন্ন প্রচুর চা দেখিতে পান। তাঁহার রিপোর্ট পাইয়া ইউরোপীয়গণ ইহার পর হইতে চীনে না গিয়া ঐ অঞ্চলে ইহার চাষ-আবাদ আরম্ভ করে। কিন্তু গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের পূর্ব্বে তাহারা এ ব্যবসায়ে তেমন মনোযোগী হয় নাই। নীল ব্যবসা আর লাভজনক না হওয়ায় তাহারা চা-শিল্পের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল তাহাদের কাজে সরকার বিশেষ সাহায্য করিতে লাগিলেন। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হয়। পূর্ব্বে ব্যবসায়ীরা সরকারের নিকট হইতে অনেক ক্ষেত্রেই কোনরূপ সাহায্য পাইত না, কোন কোন স্থলে বিশেষ বাধাই পাইয়াছে। এই সময়ে সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজদের মধ্যে পদগত মর্য্যাদার বাধা লোপ পাওয়ায় উভয়ে উভয়ের পরম মিত্র হইয়া উঠিল। সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজ সাধারণের এই একাত্মভাব সম্বন্ধে বর্ত্তমানকালে আমাদের মনে কোন সন্দেহই আর জন্মে না। কলিকাতার ইউরোপীয় Big Business বা বণিক প্রধানদের সভায় বড়লাট স্বয়ং যোগদান করেন এবং শাসনতান্ত্রিক জটিল বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সরকারী নীতি তাহাদের নিকট ব্যক্ত করিয়া থাকেন। বড়লাট ও বণিক্ প্রধানদের প্রকাশিত মতামতে প্রায়ই কোনরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। যে কথা বলিতেছিলাম। চায়ের চাষ আবাদের জন্য বিস্তর শ্রমিক প্রয়োজন। অথচ জনবিরল পার্ব্বত্য অঞ্চলে সস্তায় এত শ্রমিক কোথায় পাওয়া যাইবে? সরকার তাঁবী চা-করদের সহায় হইলেন, ১৮৬৩ ও ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আইন করিয়া শ্রমিক সংগ্রহের বিধিব্যবস্থা করিয়া দেন। চা-শ্রমিকদের ঘৃণ্য দুঃসহ জীবনের এখানেই সূত্রপাত।

সরকার যখন ভারত-সাম্রাজ্যের বনিয়াদ পাকা করিবার বিবিধ আয়োজনে লিপ্ত তখন সমাজের উপর সরকারী কার্য্যকলাপের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইতেছিল তাহা আমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক। ভারতীয় সমাজের সর্ব্ব বিভাগে সরকার যখন নিজ শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিয়া গেলেন তাহারই মধ্যে, এই ষষ্ঠ দশকেই, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এবং উড়িষ্যায়, দুইটি ভীষণ দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী জীবনাহুতি দিলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এই শিক্ষাও দিয়া গেল যে, মহাদেশ সদৃশ বিশাল ভূখণ্ড জুড়িয়া বসবাস করিলেও ভারতবাসীরা এক, তাহাদের স্বার্থ এক আর তাহাদের উন্নতি এই ঐক্যবোধের উপরই নির্ভর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের সাহায্যকল্পে ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে ১৮৬১ সালের মার্চ্চ মাসে যে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন তাহার মধ্যে এই মহাভারতের বাণীই আমরা শুনিতে পাইলাম। তিনি বলিলেন :

"যে স্থানে এই দারুণ দুর্ভিক্ষ অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের প্রিয় ভূমি। সেই কারণই আমাদের জ্ঞান ধর্ম্মের আকর স্থান। আমাদের ঋষিরা সরস্বতী নদীর তীরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ব্রহ্মের নাম উচ্চারণ করিতেন। তাঁহাদের মুখ হইতে 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম' এই সকল জীবন্ত মহাবাক্য বিনির্গত হইয়াছে, তাহা এখনও পর্য্যন্ত আমরা সংকীর্ত্তন করিতেছি। আহা! সেখানকার লোকেরা এখন অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছে। সেই দাবানল নির্ব্বাণের নিমিত্তে আমাদের যাহার যে ক্ষমতা, যৎকিঞ্চিৎ বারি দানে যেন ত্রুটি না হয়। সেই ভারতভূমির প্রধান স্থান,—সেখানকার লোকেরা শোকেতে, দুঃখেতে, ক্ষুধাতে, তৃষ্ণাতে, জর্জ্জরিত হইতেছে, তাহাদের এই দুঃখের অবস্থা স্মরণ করিয়া আমরা কি ব্যাকুল হইব না?" আমরা কোন্ প্রাণে তাহাদের এই দুঃখ দেখিয়া উদাসীন থাকিব? সেখানকার সেই ঘোর সন্তাপানল এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। মৃতকল্প যাত্রার উষ্ণ নিশ্বাস এখন পর্য্যন্ত আসিয়া আমাদের সমুদয় শরীর দগ্ধ করিয়া দিতেছে। এস আমরা সকলে একাত্মা হইয়া সেই দুঃখ নিবারণ করি। ইহাতে আমরা কেবল আমাদের ভ্রাতৃগণের দুঃখ শান্তি করিব এমন নহে; ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পিতার কার্য্য করা হইবে।.....সেই পশ্চিমবাসিগণ, যাহাদের সঙ্গে আমাদের এমন নিকট সম্বন্ধ,.....ভাষাতে, ভাবেতে, ধর্ম্মেতে, সমুদয় সংসারের কার্য্যেতে, যাহাদের সঙ্গে আমাদের ঐক্যতা; তাহাদের সঙ্গে দয়ার্দ্রচিত্ত হওয়া কি কঠিন? তাহাদের দুঃখ-দাবানলে কিঞ্চিৎ সাহায্য দিতে কি আমাদের কষ্টবোধ হইবে? তাহাদের দুঃখ দেখিয়া আমরা কি হাস্য কৌতুকে দিনযাপন করিব? তাহারা অন্নাভাবে মরিতেছে মনে করিয়া আমরা কি অন্নের কোন স্বাদ পাই?"

ইহার ছয় বৎসর পরে ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় এবং বঙ্গ

ও বিহারের কোন কোন অংশেও ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। এক-মাত্র উড়িষ্যায় এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ দশ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যায়। ইহা আমাদিগকে বাংলার ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। সরকার শাসন সুদৃঢ় করিতে ব্যস্ত; স্থানীয় কর্তৃপক্ষ একটু হুসিয়ার হইলেই উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে এত অধিক লোক মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইত। কর্তৃপক্ষ সময়ে কোনরূপ বন্দোবস্ত করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন নাই। একারণ বিলাতে ও এদেশে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহারা নিন্দিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করার ওজুহাতে তাঁহারা সকল দোষ হইতেই একরূপ মুক্তি পাইলেন। এই দুর্ভিক্ষকালেও বাংলার নেতৃবৃন্দ দুর্গত উড়িষ্যাবাসীর সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। কলিকাতায় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও প্যারীচরণ সরকার অন্নছত্রাদি খুলিয়া অন্নহীনের মুখে অন্নদানের ব্যবস্থা করিলেন। ভারতবাসীরা যে একাত্ম, সম্পদে তাহাদের মনে এ ভাব দৃঢ় হইবার অবকাশ পায় নাই, বিপদে দুঃখ-দৈন্যের মধ্যেই তাহারা পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইল।

এই দশকে নানা কারণে সরকারী ও বেসরকারী ইউরোপীয় সমাজে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের প্রভাব হ্রাস পাইতে লাগিল। চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে শিক্ষা ব্যাপারে পাদ্রীদের প্রভাব ছিল খুবই বেশী, এই সময়ে সরকার তাহাদের প্রভাব-মুক্ত হইয়া নিজ মতে চলিতে লাগিলেন। পাদ্রীদের প্রাধান্য আর স্বীকৃত হইল না, বরং কখন কখন মনে হইতে লাগিল, কর্তৃপক্ষ খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়াই যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণে অগ্রসর হইয়াছেন। তবে উদ্দেশ্য কিন্তু সর্বক্ষেত্রে একই—ইংরেজী বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া এদেশীয়দের সর্বতোভাবে ইংরেজী প্রণালীর পক্ষপাতী করা। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালীগণ নিজস্ব আদর্শচ্যুত হইয়া কিরূপ ভ্রান্তপথে চলিতেছিল একটু পূর্বেই তাহার আভাস দিয়াছি। এখানে এই বিষয়টি আর একটু বিশদ করিয়া বলা আবশ্যক। তৃতীয় দশকের প্রথমে ডিরোজিওর শিক্ষায় যুবকগণ কতকটা উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের এই উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল সাময়িক, যুবকগণ স্বল্পকাল উত্তেজনা কাটাইয়া, এমন কি ইহার মধ্যেও, নানাপ্রকারে সমাজেরই সেবায় মন দিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে অন্যূন পঁচিশ বৎসর যাবৎ সরকার যে প্রণালীতে শিক্ষা ব্যবস্থা করিয়া চলিয়াছিলেন এবং ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের সরকারে চাকুরি দিয়া যেরূপ পুরস্কৃত করিতেছিলেন তাহাতে এই সমাজ —অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষিত ইঙ্গবঙ্গ সমাজ—সাধারণ হইতে দূরে সরিয়া গিয়া একেবারে আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছিল। সমাজ সেবা বা জাতির স্বার্থ অপেক্ষা নিজের সেবা বা স্বার্থ রক্ষাই ক্রমে তাহাদের ধর্ম হইয়া উঠিল। সুরাপানাদি নানারূপ পাপও তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিল। সরকার নিজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তখন যে-সব আয়োজন করিতেছিলেন তাহার প্রতি সমসাময়িক লোকেদের তেমন নজর পড়ে নাই, হয়ত তখন তাহা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু এই যে বিজাতীয় স্রোত আসিয়া সমাজের নেতৃস্থানীয় শিক্ষিত মণ্ডলীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল, মনীষীগণ কেহ কেহ এই সময়ে দিব্যচক্ষে তাহার অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই স্রোতের গতি কথঞ্চিৎ ফিরাইবার জন্য মেদিনীপুরে বসিয়া রাজনারায়ণ বসু মহাশয় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে জনকল্যাণকর বিবিধ প্রচেষ্টার সূচনা করেন। তাঁহার ঐকান্তিকতায় স্থানীয় লোকেরাও ক্রমে তাঁহার কার্যে সহায়তা করিতে উদ্বুদ্ধ হইলেন। বিদেশী আমদানী সুরাপান প্রথা সমাজদেহকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছিল। রাজনারায়ণ প্রথমেই ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সুরাপান-নিবারণী সভা স্থাপন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'মেদিনীপুরে এই সুরাপান-নিবারণী সভা জন্য আমার যত পীড়ন হয়, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য তত হয় নাই।" ইহার দুই বৎসর পরে, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর প্যারীচরণ সরকার মহাশয় কলিকাতায় ঐ একই আদর্শে বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি স্থাপন করিলেন। তাঁহার এই মহৎকার্যে সহায় হইয়াছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, মধুসূদন পণ্ডিত, আমেরিকান পাদ্রী সি. এইচ. ডল প্রভৃতি। সোসাইটির উদ্দেশ্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :

"মাদক সেবন দেশব্যাপী হইয়া দুশ্চিন্তা, ক্লেশ, ব্যাধি ও অধঃপতন প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিতেছে; রাসায়নিক বিশ্লেষণ, শরীরতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক তথ্য, শত শত মহাসত্যের বিদ্যমানের অভিমত এবং নানাদেশীয়

[illegible] করিয়াছে যে, যাহারা মদ্য পরিত্যাগ বা অল্পরূপে,
[illegible] প্রমুখিত হেয় বা মনের পরিপুষ্টিকল্পার্থে
[illegible] উপায় স্বরূপ, কোনপ্রকার প্রমত্তকারী
[illegible] ব্যবহার করেন নাই, সেই সকল ব্যক্তিরা [illegible] ও ইহা
[illegible] অনুকূল ক্ষেত্রস্বরূপ, ইহা একটী তীব্র বিষ। [illegible] অল্প
[illegible] ব্যবহারে অধিকারী সম্বন্ধে বিশেষতঃ এদেশে [illegible] হইয়াছে
[illegible] পরিমিত পানই অধিকাংশ স্থলে মোহের পথে প্রথমতার
[illegible] সোপান স্বরূপ হয়। এই সকল কারণে সর্বপ্রকার মদ্যপানে বিরতির
[illegible] ও সকলকে এই মদ্যপানের বিষময় ফল প্রদর্শিত ও
[illegible] বিষয়ে উদ্যোগী, যাবতীয় দেশ-হিতৈষী ব্যক্তিবর্গের সমবেত
[illegible] আহ্বান করিয়া সভার মতে নিবারণী সমাজ' (Bengal Temperance Society) নামে একটী সমিতি গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে।"*

এই উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য সোসাইটির মুখপত্রস্বরূপ ইংরেজী *Well-Wisher* ও বাংলা 'হিতসাধক' নামে দুইখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এক বৎসরের মধ্যে সোসাইটির কার্য কিরূপ ব্যাপ্তিলাভ করে 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র (অগ্রহায়ণ ১২৭১) নিম্নোক্ত বিবরণ হইতে তাহা বুঝা যাইবে :

"এই সুরাপান নিবারণ হেতু হইতে দূর করিবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত [illegible] কয়েক মহাশয় কলিকাতায় একটী সুরাপান নিবারণী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। কে বৎসর হইল সভাটি সংস্থাপিত হইয়াছে। সুরাপান নিবারণার্থে সর্বাগ্রে সমস্ত সভাতে সুরাপানের দোষ সকল প্রকাশ করা হয় যে উদ্দেশ্যে সভায় সুরাপানের দোষসকল লিখিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। বিনামূল্যে এবং কোন কোন পুস্তক অল্প মূল্যে সর্বত্র প্রদত্ত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন প্রতিজ্ঞাপত্র ছাপান হইয়াছে, যাঁহারা সুরাপান করেন না এবং যাঁহারা সুরাপান পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই সকল প্রতিজ্ঞাপত্রে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিতেছেন। অল্প অল্প নগর পল্লীগ্রাম প্রভৃতি অনেক স্থানে এই মূল সভার শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবং সমুদয় সভায় প্রায় তিন হাজার সভ্য হইয়াছে। তং তং স্থানেও উপরোক্ত উপায় সকল দ্বারা সুরাপান নিবারণের চেষ্টা হইতেছে।"

বিজাতীয় শিক্ষাবৈগুণ্যে জাতি কিরূপ আত্মবিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল একটু পূর্বেই সে সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। রাজনারায়ণ মেদিনীপুরে অবস্থানকালে ইহাও ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেন এবং নিজেদের মধ্যে স্বজাতি-প্রীতি উদ্রেককল্পে জাতীয় গৌরব সম্পাদিনী বা জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী নামে একটি সভা স্থাপন করিলেন। ইহার ইংরেজী নাম দেওয়া হইয়াছিল 'Society for the Promotion of National Feeling'। ইংরেজ শাসক জাতি বলিয়া তাহাদের ভালমন্দ সবকিছু গ্রহণ করিবার যে একটা অত্যধিক আগ্রহ শিক্ষিত সমাজে লক্ষিত হইতেছিল এই সভা হইল তাহার মূর্তিমান প্রতিবাদ। নিজস্ব ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ঐতিহ্য সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন করিব, কিন্তু ইহাকে যুগোপযোগী করিয়া লইবার জন্য বাহির হইতে ভাল ভাল জিনিষ আহরণ করিতে কোন বাধা নাই। যুগে যুগে ভারতক্ষেত্রে কত জাতির সমাবেশ হইয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে কত ভাল ভাল জিনিষ আমরা আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছি। ইউরোপ হইতে আগত ভাল ভাল জিনিষও আমরা আত্মস্থ করিব, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা আত্মহারা হইয়া পর অঙ্কে দেহ এলাইয়া দিব কেন? এই কথাই মেদিনীপুরে জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা সর্বপ্রথম বাঙালী জাতির নিকট ঘোষণা করিলেন। রাজনারায়ণ এই সভার কার্যবিবরণী হইতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে একখানি অনুষ্ঠান-পত্র রচনা করিয়া জাতির নিকট পেশ করিলেন। এই বিখ্যাত অনুষ্ঠান-পত্রখানি আমি অন্যত্র* প্রকাশিত করিয়াছি। ইহাতে তিনি আমাদের নিজস্ব ব্যায়াম, সঙ্গীত, চিকিৎসা বিদ্যা, ভাষা-সাহিত্য, আচার-ব্যবহার রক্ষণ ও পোষণের কথা বলিয়া সমাজ-দেহে সুরাপানাদি যে সব পাপ ঢুকিয়াছে তাহা কালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। জাতি নিজেকে সংস্কার ও শোধন করিয়া কিরূপে সময়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারিবে তাহার নির্দেশ ইহার মধ্যে আছে। অনুষ্ঠান-পত্রখানি প্রচারিত হইলে সমাজের চিন্তাশীল নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি স্বতঃই ইহার উপর পড়িল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় সমসাময়িক নেতৃবৃন্দের সহায়তায় ইহার আদর্শে সুবিখ্যাত জাতীয় বা হিন্দু মেলা ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক আলোচনার ভার ছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উপর। কিন্তু জাতিকে আত্মপ্রত্যয়শীল করিতে হইলে শুধু প্রচলিত বা প্রস্তাবিত সরকারী আইন-কানুনের

* "সাধারণ সরকার"—নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃ. ১০০।

* সংগ্রহীত "জাতীয়তার নবমন্ত্র", পৃঃ ১০২-১১২ দ্রষ্টব্য।

প্রতিবাদ বা সমালোচনা করিলে চলিবে না, আত্মরক্ষামূলক, জাতিগঠনমূলক—তাহা সাহিত্য সংস্কৃতি, কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি বহু দিকেই আমাদিগকে প্রয়াস পাইতে হইবে ; রাজনারায়ণের অনুষ্ঠান-পত্রের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মেলা এই ভার লইয়াছিলেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে দেশের আপামর জনসাধারণ এইখানেই প্রথম স্বদেশপ্রেম তথা স্বজাতি সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথাও যে তখন কাহারও কাহারও মনে (যেমন, হিন্দুমেলার অন্যতম প্রধান কর্ম্মী, নাট্যকার ও কবি মনোমোহন বসু মহাশয়ের মনে) না উদিত হইয়াছিল এমন নহে, কিন্তু জাতিকে সকল দিক হইতেই এইজন্য তৈরী করিয়া ব্যাপক প্রচেষ্টা আশী বৎসর পূর্ব্বেকার এই জাতীয় মেলার মধ্যেই প্রথম লক্ষ্য করি।

এই সময়ে রাষ্ট্রীয় কোন কোন প্রস্তাব বা কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া দেশবাসী সকলকাম হইয়াছিল বটে, কিন্তু ব্যাপকভাবে কোনরূপ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে তাহারা অগ্রসর হয় নাই। তবে রাষ্ট্রের মতিগতি যেখানেই জনস্বার্থের প্রতিকূল ছিল সেখানেই নেতৃবর্গ তাহা ধরিয়া ফেলিতে পারিতেছিলেন। সরকার ক্রমে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মেরই একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। খ্রীষ্টানীর স্রোত তখন অনেকটা কমিয়া গেলেও মাঝে মাঝে তাহা আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির সদাশয়তায় এ সময়েও ইহার গতিরোধ করিতে উদ্যোগী হন। এই দশকে ব্রাহ্মসমাজ একটি সুনিয়ন্ত্রিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে পরিণত হয়। হিন্দু আচার ব্যবহার পরিশুদ্ধ করিয়া তৎসমুদয় গ্রহণ করিবার দিকেও সমাজ-নেতাদের দৃষ্টি পড়ে। শিক্ষিত যুবকগণ দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া এবং অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে উদ্বুদ্ধ হইলেন। শিক্ষা, বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের দিকেই প্রথম তাঁহারা মনোযোগ দিলেন। বসন্তকুমার ঘোষ ('অমৃতবাজার পত্রিকা' সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা), উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ যুবকগণ এই উদ্দেশ্যে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' প্রকাশের পরিকল্পনা করেন এবং উমেশচন্দ্রের সম্পাদকতায় ইহা বাহির হয়। অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার প্রচারেও তাঁহারা উদ্যোগী হইলেন। কেশবচন্দ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করিয়া ভারত-ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিলেন।

এই সময়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও একটি আন্দোলন বিশেষভাবে দেখা দেয়। ওয়াহাবি আন্দোলন নামে ইহা পরবর্ত্তী কালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। মূল আদর্শ ধর্ম্মানুগ হইলেও শেষে ওয়াহাবীরা বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত হইবার জন্য ইংরেজ বিতাড়নে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। এ সব কথা পরে আলোচ্য।

স্বদেশীয় সংস্কৃতি শিক্ষা শিল্প বাণিজ্য লোপের কারণ হইল ইংরেজ ও ইংরেজ শাসন, কাজেই ইংরেজ ভারত ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত দেশের মুক্তি বা উন্নতির সম্ভাবনা নাই এইরূপ ধারণাও তখন কোন কোন চিন্তাশীল শিক্ষিত ব্যক্তির মনে উদিত হইয়াছিল। বীটন (বেথুন) সাহেবের স্মৃতিরক্ষাকল্পে কলিকাতায় ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে বীটন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজ ও বাঙালী মনীষীগণ ইহার সভ্য ছিলেন। সোসাইটির মাসিক সভায় এক এক জন সভ্য প্রবন্ধ পাঠ করিতেন এবং ইহার বিষয়বস্তু লইয়া উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে আলোচনা হইত। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চের মাসিক সভায় এইচ. এল. পি. ওয়াইন নামক একজন সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী "Bodily Training—its Effect on National Character" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি এই মর্ম্মে বলেন যে, শিক্ষিত ভারতবাসীদের মধ্যে শারীর চর্চ্চার অভাব হেতু তাহাদের মানসিক বৃত্তিসমূহ সম্যক পুষ্টিলাভ করিতে পারিতেছে না। বক্তৃতার পর বক্তাকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ইহার কারণ যে অন্যবিধ সেদিকে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি বলেন :

Education, in the highest sense of the term, must be one of national development to be of any use to a country. That result, however, he thought, was not to be expected in India, so long as the vast superiority of the English race caused itself to be felt by the natives and produced in their minds an

overwhelming sense of their own inferiority. The two nations, he thought, must be amicably parted, before anything good or great could be achieved by the people of this country. *

তারাপ্রসাদের শেষ কথা কয়টির সারমর্ম এই যে, ইংরেজ ভারতবর্ষ ছাড়িয়া না গেলে ভারতবাসীদের দ্বারা মহৎ বা কল্যাণকর বড় কিছু সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ইদানীং ইংরেজদের ভারত ছাড়িয়া যাইতে ('Quit India') বা ইংরেজদের কর্তৃত্ব ভারতবাসীদের হাতে ছাড়িয়া দিতে বলা হইতেছে ঐ একই কারণে। আশ্চর্যের বিষয়, প্রায় আশী বৎসর পূর্বে একজন বাঙালীর মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল। হিন্দু মেলার উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্রও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কিন্তু তারাপ্রসাদের কথার প্রতিবাদ করিয়া এই মর্মে বলেন যে, মোহনিদ্রা হইতে ভারতবাসীকে জাগাইতে হইলে অধিকতর শক্তিমান ইংরেজের এখানে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য অবস্থিতি আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্র কয়েক বৎসর পরে যে জাতি-বৈরের কথা বলিয়াছিলেন নবগোপালের উক্তির মধ্যে তাহারই মূল লক্ষ্য করি। সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে ভারতবাসীরা যে ব্যায়ামচর্চা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অগ্রসর হইয়াছেন সেদিকেও তিনি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

* *The Proceedings and Transaction of the Bethune Society from Nov. 10th 1859 to April 20th 1869. P. cxvii.*

নবগোপালের কথা যেমনটি সোসাইটির রিপোর্টে প্রদত্ত হইয়াছে—এখানে উদ্ধৃত করিয়া অদ্যকার প্রসঙ্গ শেষ করিব :

Babu Nobogopal Mitter in an animated speech combatted the position taken by the last speaker, that the presence of the English race acted as a dead weight on the energies of the people of this country. On the contrary, he thought that a great nation could not come in contact with an inferior one without benefiting the latter. Such, he thought, was the growing tendency of English influence and English example on his own countrymen. They have already started in a career of future eminence, and he saw no reason to despair of their one day rivalling their great model. They have already given evidences of a high state of mental culture, as well as of their longings for physical improvement. He then referred to a movement made some years ago by a few of his educated countrymen for raising a volunteer corps among themselves. He also brought to notice the existence at the present moment of a number of native gymnasiums supported entirely by natives, without any aid from Government. *

* *Ibid. Pp. cxvii & iii.*

প্রতীক্ষা

সুব্রতা চৌধুরী

ধ্বংসপ্রাপ্ত সামচুন নগরের শেষপ্রান্তে ছোট্ট একটি কুটীরে বাস করে মা ও ছেলে। আশেপাশে আর কোন বাড়ী নেই। শত্রুর বোমায় তাদের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গেছে আজ। ছোট্ট একটা টীলার উপর কুটীরটী আজও রয়েছে আগেকার মত দাঁড়িয়ে। নিচে বয়ে চলেছে পাহাড়ী ছোট্ট একটী নদী। তার সরব গতিতে স্থানটীকে করে তুলেছে মুখরিত। একভাবে যাচ্ছে কেটে তাদের দিনগুলি। অভিযোগ তাদের কম কাজেই অভাবও তাদের নেই আজ। ছেলেটির নাম চিয়াংলুং; কাজ করে সৈনিক বিভাগে, যা পায় তাতেই তাদের দিন বেশ চলে যায়; কিন্তু এমন দিন ছিল তাদের যেদিন অভিযোগ ছিল প্রচুর এবং সঙ্গে সঙ্গে অভাবও লেগে থাকতো নিত্য। চিয়াং-এর পিতা এই সামচুন সহরের একটী বিশিষ্ট প্রাসাদের বাসিন্দা ছিলেন। সৈনিক বিভাগের উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। যা রোজগার করতেন তার দ্বিগুণ ছিল তাঁর ব্যয়। চিয়াংএর বড় এক ভাই ছিল। পিতার মৃত্যু-সময় তার বয়স ছিল মাত্র দু'বৎসর; কাজেই বাপকে তার ভাল মনেই নেই। তার বাবা বেশ দিলখোলা লোক ছিলেন। মনটা ছিল বেশ উদার ও প্রশস্ত। দেখতে যেমন লম্বা তেমনি বলিষ্ঠ। চোখে মুখে একটা সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন ফুটে উঠ্‌তো, দেখলেই মনে কেমন একটা সম্ভ্রমের ভাব আপনা থেকেই জাগতো। সৈনিক বিভাগের উপযুক্ত কর্মচারী হিসাবে সেখানে তাঁর যথেষ্ট সম্মান ছিল। ভদ্রলোকটী ছিলেন দারুণ সামাজিক, সবই তাঁর প্রতিমাসে ক্লাবে কিংবা অন্য নানা অনুষ্ঠানে এবং গরীবের অন্ন-ছত্রে যোগাতেই শেষ হয়ে যেতো, তাই মাসের শেষে যখন সংসার খরচে পড়্‌তো টানাটানি, তখন ঋণ ছাড়া আর উপায় ছিল না। ঋণের বোঝা তাঁর দিন দিন যদিও বেড়ে যাচ্ছিল তবু ভবিষ্যতে পদোন্নতির স্বপ্ন তাঁর মনে এই আশার বাণী বয়ে আনতো যে তখন আস্তে আস্তে সব শোধ করে দিতে পারবেন, কিন্তু এই সব কল্পনার মাঝে তাঁর পরকালের ডাক এসে পৌঁছল। একদিন তিনি একদল সৈন্য নিয়ে পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে চলছিলেন। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল আস্তে আস্তে। ক্রমেই এই দুর্গম পথে পথ-চলা হয়ে উঠ্‌ল কষ্টকর। হঠাৎ একটা পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খাওয়ার ঝুঁকিটা সামলিয়ে নিতে না পারে তিনি কয়েক হাত নিচে একটা খাদের ভিতর পড়ে গেলেন। স্থানটীর গভীরতা মোটেই ছিল না, কিন্তু নিচে একটা পাথরের উপর পড়ে মাথায় আঘাত পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। বাড়ী নিয়ে আসা হলো। জ্ঞান আর তাঁর হলো না। তিনদিনের মধ্যে ইহজগতের সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে শান্তির পথে পা বাড়ালেন। মৃত্যুর পর দেখা গেল একজন উচ্চ পদস্থিত কর্মচারী রেখে গেছেন দু'টী নিরাশ্রয় শিশু এবং তাদের বিধবা মাকে। জমার খাতায় তাঁর একটি পয়সাও নেই তার উপর রেখে গেলেন আরো কতগুলি ঋণের বোঝা। দেখতে দেখতে বাড়ী-ঘর আসবাবপত্র সবকিছুই মহাজনেরা এসে ঋণের দায়ে টেনে নিয়ে গেল। সর্বস্ব হারিয়ে রিক্ত হয়ে বিধবা দুটি শিশু সন্তান নিয়ে যেদিন পথে বের হলেন সেদিন তাদের এক মুষ্টি অন্নের সংস্থানও নেই। আত্মনির্ভরশীল বিধবাটি সামচুন সহরের শেষ প্রান্তে এমনি ছোট্ট কুটীরে বাস করতে লাগলেন। সেলাই ও অন্যান্য কাজ করে দু'টী শিশু ও নিজের জীবিকা অর্জ্জনের সংস্থান এমনি ভাবেই করে নিলেন।

সুখে দুঃখে তাদের দিন কেটে যায়। প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হতো সে অবস্থাকে মানিয়ে নিতে। তারপর সবই অভ্যাসে এসে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে বড় ছেলেটী বড় হয়ে সৈনিক বিভাগে অল্প বেতনেই ভর্ত্তি হয়ে গেল। বিধবাটী দোয়াস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে মনে মনে ভগবানকে ডেকে শুধু বলেন, "ঠাকুর এবার হয়তো আমার দিন ফিরিয়ে দেবে।" তাঁর সেই আশ্বাস ঠাকুরের কাণে পৌঁছল কিনা কে জানে? মাস কয়েক পর ছেলেটী একদিন কাজ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়্‌ল। মা ব্যস্ত হয়ে এসে গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন ভীষণ জ্বর। বুকটা তাঁর কেঁপে উঠ্‌ল শুধু এ কথা ভেবে 'যে ভাল হয়ে উঠ্‌বে তো' সে জ্বর বিকারে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর উপযুক্ত পথ্য ও চিকিৎসার অভাবে, যাকে হয়তো বাঁচিয়ে রাখা যেতো

পোনর দিন, এক সপ্তাহ আগেই তাকে বিদায় দিতে হলো। চিয়াংএর বয়স মাত্র দশ বছর। সংসারে অনভিজ্ঞ সে, তবু এ এই শোকের ছায়া তার অন্তরেও বিষাদের কালিমা এনে দিল। নিত্য সাথী সাথীটীকে হারিয়ে বিশ্বসংসার তার কাছে কেমন একা একা ঠেকতে লাগল। শোকের তাপে বিধবাটীর চোখের জল পর্য্যন্ত রুদ্ধ হয়ে গেল।

দিন কেটে যায়। কালের গতি সব দুঃখকেই ম্লান করে দেয় আস্তে আস্তে। এমনি করেই মানুষ সব কিছু সামলে নেয়। চিয়াং বছর কয়েক পরে এসে ঢুকল এই সৈনিক বিভাগেই। চিয়াংএর মা আগের মত আর তেমন সোয়াস্তি পান না। কেমন যেন তাঁর ভয় হয়। আতঙ্কটা তার মনের সহজ ভাবটীকে সম্পূর্ণ ভাবে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। চিয়াংএর নিত্যসাথী এখন তার মা। দিনান্তে ক্লান্ত শ্রান্ত দেহ নিয়ে বাড়ী ফিরে এসেও মাকে তার বলা চাই প্রতিদিনকার কাজের বিবরণ, শোনান চাই তার নতুন নতুন অভিজ্ঞতার বার্ত্তা।

চীন জাপান যুদ্ধে সৈনিক মহলে মহা একটা হলস্থূল পড়ে গেল। কাজ অফুরন্ত, অবসর বড় কম। এরই মধ্যে সময় ক'রে চিয়াং মাকে এসে দিত তাদের যুদ্ধের আগা গোড়া খবর, প্রায়ই বলত "চল মা আমার সঙ্গে তুমিও যুদ্ধে।" মা বলতেন "আমায় কি কাজ দিবি তোরা? আমি যে অস্ত্র চালাতে জানি না।" চিয়াং শুধু বলত "লোক মারাই কি যুদ্ধ ক্ষেত্রের একমাত্র কাজ? আরো কত কাজ রয়েছে। আমার বড় খারাপ লাগে যখন দেখতে পাই মুমূর্ষু সৈনিকেরা জলের জন্য কাতরিয়ে কাতরিয়ে মরছে। সেখানে এমন কেউ নেই যে তাদের মুখে এক ফোঁটা জল দেয়। বড় কষ্ট লাগে ভাবতে, সারাটা জীবন তাদের কাটাতে হয় এমনি স্নেহহীন অবস্থায়, মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত তাদের দরদী কাউকে পায় না। কতগুলি নীরস কাজের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক। এ ছাড়া দুনিয়ায় তাদের আর কোন প্রয়োজন নেই।"—দিন কয়েক পরে চিয়াং এসে একদিন তার মাকে বলল "কাল থেকে আমায় ফ্রন্টের দিকে যেতে হবে।" মার মুখে আতঙ্কের ছায়া ঘনিয়ে আসতে দেখে চিয়াং প্রশ্ন করল—"তোমার কি কোন আপত্তি আছে?" মা তক্ষুনি নিজেকে সামলে নিয়ে বল্লেন "না আমার কোন আপত্তি নেই; জন্মভূমি রক্ষা করার জন্য আমি আমার সব চাইতে বড় স্বার্থকে ছাড়তে পারব।" চিয়াং আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বল্ল 'আমিও ঠিক এই কথাই শুনতে চাই, যদি কোন বিপদ আসে সেদিন যেন তুমি এ কথাটুকুই শুধু ভাবতে পার যে চিয়াং জন্মভূমিকে ভালবাসতো তাই তার নিজের শক্তিটুকু দিয়ে চেয়েছিল তাকে রক্ষা করতে।' দূরে ঘণ্টা বেজে উঠল—চিয়াং তাড়াতাড়ি ছুটে চলে গেল চোখের দৃষ্টির বাইরে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মা ফিরে এলেন তাঁর নিত্য কাজে। ব্যাণ্ডের তালে তালে সৈনিকেরা সব সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে; চিয়াংও গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিল।

দিনান্তে যুদ্ধাবসানে যার যার আবাসে ফিরে গেছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত অবস্থায় পড়ে আছে চিয়াং। কত স্থানটী থেকে ক্রমাগত রক্ত পড়ছে। পিপাসায় তার কণ্ঠ শুকিয়ে আসছে। সঙ্গের লোকটীকে ডেকে জড়িয়ে জড়িয়ে বল্ল 'আমার মাকে এ খবর দিও।' ভীষণ সে যুদ্ধক্ষেত্র। যেখানে সেখানে আহত সৈনিকেরা পড়ে আছে। যন্ত্রণার করুণ আর্ত্তনাদ সেখানকার বাতাসকে করে তুলেছে বিষাক্ত। স্থানে স্থানে মৃত সৈনিকের স্তূপ পড়ে আছে। এমনি এক কিনারায় চিয়াং-এর প্রাণহীন দেহও পড়ে রয়েছে। মুদ্রিত চোখের কোণ দিয়ে যে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল তার দু'ফোটা এখনও লেগে আছে। অব্যক্ত বেদনার সব কিছু পরিসমাপ্তি হয়ে মুখখানা যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে স্নিগ্ধ স্বর্গীয় জ্যোতিতে।

দিনের আলো ক্রমেই নিবে এল। সূর্য্যাস্তের শেষ রশ্মিটুকুও আস্তে আস্তে পৃথিবীর বুক থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। নিত্যকর্ম্ম সেরে বিধবাটী এসে দাঁড়ালেন নদীর ধারে। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় চিয়াং-এর প্রতীক্ষায় চেয়ে রইলেন দূর পথের দিকে। ভাবছেন মনে মনে "চিয়াং হয়তো আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছে অনেক শত্রু পরাজিত করে; তার কাছে শুনব যুদ্ধের খবর, শুনব তার অদ্ভুত বীরত্বের কথা।"

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নদীটি বয়ে চলেছে চিরন্তন প্রবাহে নিত্য কালের মত।

———

ছাত্রসমাজের প্রতি

শ্রীবীণা দাস

আপনাদের আজকের এই সভায় সভানেত্রীত্বের দায়িত্ব ও সম্মান দিয়ে আমাকে কেন টেনে এনেছেন আমি জানি না। আমার অযোগ্যতার কথা আমার তো মনে হয় আমার মতই আপনাদের কাছেও সম্পূর্ণভাবেই পরিস্ফুট।

বন্ধুগণ! কলকাতা সহরে ছাত্রদের সভা অথবা অধিবেশন এই প্রথম নয়; বহুবার বহু উপলক্ষে এভাবে আমরা মিলেছি। কিন্তু তবু সেই সব-কিছু থেকে আজকের এই সভাকে আমরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে দেখতে পারি, এর গুরুত্ব এবং দায়িত্ব সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করতে পারি। আজকের দিনে যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এবং সমস্ত নিপীড়িত জাতির ইতিহাসে এর তুলনা মেলে না। পৃথিবীর রণাঙ্গনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে; আর সে যুদ্ধে একদিকে দাঁড়িয়েছে ক্ষমতামদমত্ত দিগ্বিজয়ী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিপুঞ্জ, অপর দিকে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীন, —রয়েছে ব্রহ্ম ও মালয়, রয়েছে ভারতবর্ষ। একদিকে এরোপ্লেন, মেশিনগান ও এটম্ বোমা—অন্যদিকে যুগ-যুগান্তরের বঞ্চিত নিরস্ত্র বন্ধনক্লিষ্ট নরনারীর মুক্তি ও মনুষ্যত্বের মর্যাদা ফিরে পাবার দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা ও দুর্বল প্রতিজ্ঞা। একদিন যা দার্শনিক ও কবির স্বপ্ন ছিল, ঐতিহাসিকরা যার ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, বহু বীর ও শহীদ যে দিনকে এগিয়ে আনার জন্য প্রাণ দিয়ে গেছেন, ঠিক সেই দিন ও পরিস্থিতি আজ আমাদের সামনে উপস্থিত। তাকে চরম সফলতায় মণ্ডিত করে তোলার দায়িত্ব আজ আমাদের উপর এসে পড়েছে। তাই আজকের এই ছাত্রসভার যদি কোনও প্রয়োজন বা সার্থকতা থাকে, সে হ'চ্ছে এই মহা দায়িত্ব সম্বন্ধে প্রতিটি ছাত্রকে তীব্রভাবে সচেতন করে তোলা,—এবং কেমন করে সেই দায়িত্ব বহন করতে পারা যায় তারই নির্দেশ দেওয়া। নইলে শুধু বক্তৃতা দেওয়া বা শোনার জন্য বা কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য এভাবে আড়ম্বর করে মিলবার অর্থ আজকের দিনে আর খুব বেশী হয় না। আজ তাই আমাদের আরব্ধ মুক্তি-সংগ্রামকে জয়যুক্ত করতে হ'লে আমাদের আজ যা যা সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন সেগুলি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব। যে কোনও সংগ্রামে জয়লাভ করতে হলে প্রথমতম প্রয়োজন নির্ভীকতা ও দৃঢ়তা, দ্বিতীয় প্রয়োজন ত্যাগ ও নিষ্ঠা, তৃতীয় প্রয়োজন সঙ্ঘবদ্ধতা ও সংগঠনশীলতা।

এর মধ্যে প্রথম প্রয়োজন সম্বন্ধে আজকে আর বলবার খুব বেশী কিছু নেই; এতদিনের সাধনায় জাতির অন্তর থেকে ভীতির কালিমা, জাতির ললাট থেকে কাপুরুষতার দুরপনেয় কলঙ্ক যেন অনেকখানিই মুছে গিয়েছে বলেই আজ মনে হয়। পুলিশের লাঠী অথবা গুলি এদুয়ের মধ্যে যেমন বিশেষ কোন পার্থক্যই আজ লোকের মনে নেই,—তেমনি একেবারে শুধু হাতে মাথা উঁচু করে তার সামনে অনায়াসে এগিয়ে যেতেও কারও আর বাধে না। ঠিক এমনি এক অদ্ভুত নির্ভীকতার সামান্যমাত্র পরিচয় কিছুদিন আগে এই কলকাতা সহরের ছাত্রদের কাছে আমরা পেয়েছি। নিঃশঙ্ক দৃঢ়তার মহিমায় উদ্ভাসিত, রুধির-স্নাত, মৃত্যু-উত্তীর্ণ ছাত্রসমাজ সেদিন সমগ্র জাতির শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন লাভ করেছে। কিন্তু শুধু এই নির্ভীকতাই বিজয়-লাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তার সঙ্গে একটা নিষ্ঠাপূর্ণ সঙ্ঘবদ্ধ ও সংগঠিত মনোভাবের, একটা সুস্পষ্ট চিন্তাধারার ও সুনির্দিষ্ট কর্মধারার প্রয়োজন, এবং তারি অভাব আমাদের মধ্যে আজও অত্যন্ত অধিক। ঠিক ওই জিনিসগুলিরই অভাবে ১৯৪২ সালে আমরা জয়লাভ করতে পারিনি। সেদিনও আমাদের সাহসের অভাব হয়নি, অভাব হয়েছিল সংগঠনের,—স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাতির অন্তরকে আলোড়িত করে তুলেছিল, কিন্তু তার উপায় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা অতি অল্প লোকেরই ছিল। আজ আমরা সময় পেয়েছি—হয়তো খুবই অল্প সময়, আর সেজন্যই

তার প্রতিটি মুহূর্তকে আমাদের ফলবান্ করে তুলতে হবে।

আজকের এই প্রস্তুতির সময় আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হওয়া উচিত আমাদের দেশের গণশক্তিকে জাগিয়ে তোলা, —সচেতন করে তোলা,—আমাদের সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তাদের সংগঠিত করে তোলা। কারণ নিরস্ত্র ভারতবর্ষের একটিমাত্র শক্তি আছে; সে শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ সচেতন গণশক্তি। একমাত্র এই শক্তি নিয়েই সে পৃথিবীর বৃহত্তম সামরিক শক্তিকেও তুচ্ছ করতে পারে, বহুপুরাতন সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ্ ভেঙে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। কিন্তু সেই শক্তিকে সংপ্রতিষ্ঠ ও সজাগ করে তোলার জন্য আমাদের যা করা উচিত তা আমরা করিনি। কর্তব্য-বিচ্যুতির অপরাধ আমাদের প্রায় প্রত্যেককেই স্পর্শ করেছে; এবং সে অপরাধ ছাত্র-সমাজের পক্ষে অমার্জনীয় হয়ে উঠেছে। কারণ জনতাকে সচেতন করে তোলার কাজে ছাত্র-সমাজের দায়িত্ব অপরিসীম। বন্ধুগণ, চীনের ইতিহাস আপনারা অনেকেই পড়েছেন, রাশিয়ার ইতিহাস থেকে আপনারা সবচেয়ে বেশী প্রেরণা লাভ করেন বলে আমি মনে করি। কিন্তু তাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী করে কি চোখে পড়ে না সেখানকার তরুণ সমাজ কিভাবে অচেতন অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের মধ্যে, কারখানার মজুরদের মধ্যে বিপ্লবের আদর্শ, সচেতনতার আলো নিয়ে দলে দলে এগিয়ে গিয়েছিল? শোভাযাত্রা বা সভার চেয়ে "গ্রুপ মিটিং" করা, বস্তির মধ্যে গিয়ে ক্লাশ করা, কারখানার মধ্যে আলোচনা-সভা করা এগুলিকেই তারা অধিকতর প্রয়োজন বলে মেনে নিয়েছিল। নিষিদ্ধ পুস্তিকা নিয়ে গভীর রাতে মাইলের পর মাইল হেঁটে তারা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলে গিয়েছে,—কোনও ক্লেশ, কোনও বাধা তারা গ্রাহ্য করে নি। এমনি করে তাদের অন্তরের দীপশিখা থেকে তারা বহু সুপ্ত হৃদয়ে আলো জ্বালিয়ে তুলেছে;—এমনি করে তারা সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে, সমস্ত স্তরের মধ্যে বিপ্লবী মনোভাব সৃষ্টি করে নিয়েছিল। বিপ্লবে নেতৃত্ব নিতে পারে এমন মানুষ প্রতি কারখানায়, প্রতি গ্রামে তৈরী করে তুলেছিল। আর তারই ফলে রাশিয়ার গণবিপ্লব সফল হ'তে পেরেছিল; চীন দীর্ঘ ১০ বৎসর ধ'রে জাপানকে প্রতিরোধ করতে পেরেছিল। এদের সঙ্গে তুলনা করে যদি একবার নিজেদের দিকে তাকাই, লজ্জায়, অকৃতকার্যতার গ্লানিতে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা হয়। গণ-আন্দোলন, গণ-সংগঠন সম্বন্ধে আজও কোন ধারণাই আমাদের মনের মধ্যে নেই;—আজও আমরা ভাবি শুধু বুঝি সহরের বুকে বসে মাঝে মাঝে সভা করলে, শোভাযাত্রা করলে অথবা Study Circle করে "ষ্ট্যালিন বড় না ট্রট্স্কি বড়" এই নিয়ে বিতর্ক করলেই, রাজনৈতিক কাজ আমাদের যথেষ্ট করা হয়ে যায়। এরই ফলে একদিকে পড়ে রয়েছি আমরা—তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়, যারা হয়তো অনেক পড়েছি, অনেক শুনেছি, হয়তো বা স্বাধীনতার সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা এবং চেতনাও আমাদের আছে।—অপর দিকে পড়ে রয়েছে দেশের অগণিত অশিক্ষিত বুভুক্ষু মৃতপ্রায় নরনারী, যারা অন্ধকারে পথ হাতড়ে মরছে,—এক ফোঁটা আলো যাদের সামনে কেউ তুলে ধরছে না।—মানুষের মত বেঁচে থাকার অধিকার ফিরে পাবার একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তাদের অবচেতন মনকে তোলপাড় করে তুলছে—অথচ সেই আকাঙ্ক্ষাকে সচেতনতার স্তরে উঠিয়ে এনে কর্ম ও সংগ্রামের পথে প্রবাহিত করে দেবার কেউ নেই।—কিন্তু আর সময় নেই, —সময় নষ্ট করার সময় আর নেই। সত্যিই যদি আমরা স্বাধীনতা চাই, স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়লাভ করতে চাই, আমাদের চল্লিশকোটি নরনারীকে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে চাই—তাহ'লে আমাদের ওই অশিক্ষিত অগণিত বুভুক্ষু নরনারীর দিকে ফিরে তাকাতেই হবে,— তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে আসতে হবে। এ কাজ সহজ নয়; অন্তত slogan দেওয়া বা সভা করার চেয়ে অনেক অনেক কঠিন। কিন্তু তবু এই কঠিনকেই আজ সত্য সত্যই বরণ করে নেবার সময় এসেছে। অভিযান তো আমাদের সহজের অভিমুখে নয়; দুরূহতম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হ'লে দুরূহতম পথেই এগিয়ে যেতে হয়; কঠিনতম মূল্য দিতে শিখতে হয়। আজ কংগ্রেস মনে করে কংগ্রেসের আসন

ও এক-হিসাবে আরব্ধ সংগ্রামে ছাত্র-প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি ছাত্র এক-একজন স্বেচ্ছা-সৈনিক ; এবং ঠিক সৈনিকেরই মনোবল, সহিষ্ণুতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা নিয়ে তারা সংগ্রাম করবে।

বন্ধুগণ! জীবনের যে প্রভাতে মানুষ সুখের ও সম্ভোগের স্বপ্ন দেখে, সৌভাগ্যের শিখর থেকে শিখরে অধিরোহণ করবার আশা রাখে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের শান্ত শুভ্র আবহাওয়ায় দিন যাপন করে যায়, ছাত্রজীবনের সেই শুভ্র প্রভাতেই আপনাদের সামনে শুধু এক সংগ্রামকঠিন ধূলিমলিন দুঃখ বেদনা ও যন্ত্রণা-সঙ্কুল পথ অপেক্ষা করে রয়েছে। পরাধীন জাতির ছাত্র হয়ে জন্মানর এই হচ্ছে সবচেয়ে বড় অভিশাপ, সব চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ। এই অভিশাপকে আপনারা প্রতি পদক্ষেপে কণ্টকিত রক্তাক্ত পদক্ষেপে জয় করে এগিয়ে চলুন, আর এই আশীর্ব্বাদ আপনাদের দুঃসহ কালরাত্রির অবসানে মহামুক্তির উদয়-শিখরে উত্তীর্ণ করে নিয়ে যাবে। দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের কথার প্রতিধ্বনি যেন প্রতি-নিয়ত আপনাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে ধ্বনিত হয়—

"I can offer you nothing except hunger, thirst, privation, forced marches and death —so that India shall be free."

বন্দে মাতরম্

---

* কলিকাতা ছাত্র কংগ্রেসের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে সভানেত্রী শ্রীযুক্তা বীণা দাসের অভিভাষণ।

আগুন

শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী

জলন্ত বহ্নির তেজে ভস্মীভূত হয়
কত সৃষ্টি—শক্তিমান মানব ও দানবের গড়া,
বিদূরিত হয় কত অনাসৃষ্টি, আবর্জ্জনা রাশি ;
কোন বীর, কোন তেজ—কেহ নাহি যেসে তার কাছে।

তারপর একদিন নিস্তেজ হলে সে,
অথবা সুযোগ সতি দাবাইয়া তারে
দুর্ব্বলেরা বলীয়ান হয়, কাপুরুষ বীরত্ব দেখায়,
তদুপরি পাতিয়া আসন
মূঢ় দর্পে ঢাকিয়া তাহারে
বলে—অনুজল বহ্নি, এই বীর তুমি
মোর কাছে বন্দী থাকো, আমি প্রভু তব।

কত কাল এই ভাবে কাটে!
প্রভু হয়ে প্রভুত্বের চরম উত্তাপে
আগুনের তেজ (সে তো মরিবার নয়)
থেকে থেকে কেঁপে উঠে—দুর্ব্বার কম্পন,
বাহিরিতে চায় সে, গ্রাসিবারে চায়—।

সূর্য্য তারে দিল তেজ,
পৃথিবীর আকাশ বাতাস—তারা তার করে সহায়তা,
একদিন বহ্নিশিখা ওঠে পুনঃ জ্বলি'।
সে আগুনে পুড়ে যায় প্রভুর আসন,
ভস্ম হয় সর্ব্ব আচরণ
উড়ে যায় দূরে যায় যতনা বাঁধন
আগুন আবার ওঠে জ্বলি।

হোমাগ্নি

শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(চার)

সমগ্র স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা হইয়া গেল। তাহার পনর দিনের মধ্যে পরীক্ষার ফলও বাহির হইল। পরীক্ষার ফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার দুইটি। রামপদ পাশ করিয়াছে। প্রমোশনের সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে একটা টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছে, আর সেইদিন বিকালে ক্লাসের সমস্ত ছেলেদের পেট পুরিয়া মিষ্টি খাওয়াইয়াছে। এটি যেমন শুভ সংবাদ, অপরটি অবশ্য তেমন নয়। রায় সাহেবের ছেলে নিতাই প্রত্যেক বৎসরই ফার্স্ট হইত। এবার ফণি আসায় হাফ-ইয়ারলিতেই সে সেকেণ্ড হইয়াছিল। বাৎসরিক পরীক্ষাতেও তাই। শুধু তাই নয় তাহাদের নম্বরের এত তফাৎ হইয়া গেল যে সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া গেল। আটশো নম্বর ফুল মার্ক। ফণি পাইয়াছে—সাতশো ষাট। আর নিতাই পাইয়াছে ছয় শো তেত্রিশ। ফণির নম্বর যে শুনিতেছে সেই অবাক হইয়া গিয়া তাহার প্রশংসা করিতেছে। প্রমোশনের পরই নিতাইয়ের কানের কাছে কে একজন ফণির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গেল। নিতাইয়ের মুখরতা তখন বিলুপ্ত; কচি মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। কালিবাবু তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কালিবাবুর মনে হইল যেন নিতাইয়ের মুখখানা তাহার বাবার মতই গাম্ভীর্যে ভীষণ ও কুটিল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন—তোর অঙ্কের খাতায় নিশ্চয় গণ্ডগোল আছে। তুই বাড়ী যা! আমি খানিক পর তোদের বাড়ী যাব। তোদের অঙ্কের খাতা দেখেছিল তারণবাবু তো? আচ্ছা যা! নিতাইয়ের জুড়ী বাহিরেই দাঁড়াইয়াছিল। কালিবাবু ছাত্রকে তুলিয়া দিয়া তখনকার মত নিশ্চিন্ত হইলেন।

পরদিন সকালে কালিবাবু নিতাইয়ের পড়ার ঘরে পৌঁছিতেই শুনিতে পাইলেন—রায় সাহেব মোটা গলায় অনবরত গর্জন করিতেছেন। একটু মন দিতেই বুঝিতে পারিলেন যে রায় সাহেবের তর্জন চলিতেছে ছেলের উপর—হতভাগা, পড়াশুনা করবি না একেবারে, ফাঁকি দিয়ে বেড়াবি। তাতে কি আরও ভাল ফল হবে?—আর তেমনি হয়েছে ফাঁকিবাজ মাষ্টার। পড়াতে পড়াতে বুড়ো হ'ল আর কাজ করার দিকে মন নাই। কেবল তো তোর সঙ্গে গল্প করে—দেখি। ছেলেও চুপ করিয়া থাকিবার ছেলে নয়, সে বলিতেছে—এইবার তুমি চুপ করবে? অনেক তো বকলে—তোমার দৌড় তো আমি জানি। আমি তো তবু এতদূর এগিয়েছি। তোমার বিদ্যে তো পাঠশাল পর্য্যন্ত। পাশ করেছি, সেকেণ্ড হয়েছি, তাও তোমার খুশী নাই। বলছো ফার্স্ট হতে পারিনি কেন? কালিবাবু ভাবিলেন এই রায় সাহেব ফাটিয়া যাইবেন। কিন্তু রায় সাহেবের কণ্ঠস্বর নামিয়া গেল। গলায় সহানুভূতির বেশ মিশাইয়া বলিলেন—ওরে বাবা, আমি কি তোকে সেই জন্যে বলছি, সেই জন্যে তিরস্কার করছি। তুই আমার ছেলে হয়ে কোথাও হেরে যাবি—এটা কি কথা? কোন এক অজ পাড়াগাঁয়ের একটা আকাট চাষার ছেলে ঐ একটা উল্লুক, ওদের বাড়ীতে পেয়ে, স্কীতে পড়ে, তোকে হারিয়ে দেবে—এটা আমি সহ্য করব কি করে? এবার ছেলে চটিয়া উঠিল, বলিল—বেশতো, আমি পারলাম না। এবার তুমিই আমার বদলে গিয়ে পড়। পড়ে তাকে হারিয়ে দাও। কিন্তু পারবে না তা আমি আগে থেকেই বলে রাখছি। এবার রায় সাহেব ও ছেলে দুইজনেই হাসিয়া উঠিল। কালিবাবু ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকিলেন।

রায় সাহেবের হাসি কালিবাবুকে দেখিয়াও থামিল না। হাসিতে হাসিতেই বলিলেন—দেখছ মাষ্টার, ছেলে কি বলছে? ছেলে বলছে—ওর সঙ্গে আমাকে নতুন করে পড়তে। বলিয়াই আবার এক দমক হাসি। হাসি থামিলে কালিবাবু বলিলেন—দেখুন রায় সাহেব, নিতাই সেকেণ্ড হইয়াছে সত্যি; কিন্তু অত কম নম্বর পাবার কথা তার নয়। অঙ্কের খাতায় কোন গণ্ডগোল হয়েছে নিশ্চয়। নিতাই অঙ্কে খুবই ভাল। তারপর পরীক্ষার পর ওর অঙ্কের উত্তর ও যা লিখে এনেছিল তাতে তো আমার ধারণা ওর সব অঙ্কই হয়েছে। কিন্তু ও পেলে অঙ্কে দেড়শোর মধ্যে একশো পাঁচ, আর সে ছেলেটি দেড়শো পুরো। আপনি এক কাজ করুন।

আপনি চন্দ্রবাবুকে একখানা অফিসিয়াল চিঠি লিখুন—নিতাইয়ের অঙ্কের খাতা পরীক্ষা করাতে। তাতে দেখুন কি হয়।

রায় সাহেবের চোখ দুইটা নাচিয়া উঠিল। কালিবাবুর গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনে হইল নিতাইয়ের এত বড় শুভার্থী সংসারে আর কেহ নাই। এমন কি তিনিও নন। রায় সাহেব উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—ঠিক বলেছ মাষ্টার ঠিক, ঠিক। ঐ চাষার ছেলেটা ঐ আনন্দের বাড়ীতে থাকে তো। আর আনন্দর সঙ্গে তো তোমাদের তারণের গলাগলি ভাব। ঠিক বলেছ। কিছু বিচিত্র নয়। দাঁড়াও এক্ষুণি একখানা চিঠি তোমাদের ঐ গবুচন্দ্র হেডমাষ্টারকে লিখে দি। এক্ষুনি। দাঁড়াও কাগজ আনি।

আর সবুর সহিল না। নিজেই উঠিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাগজ কলম লইয়া আসিলেন। তারপর মনোগ্রাম করা দামী চিঠির কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কালিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি লিখবো হে মাষ্টার। 'মাই ডিয়ার হেডমাষ্টার'? তারপর অতি বিশ্রী ধরণে এক লাইন লিখিয়াই কাগজখানা ফেলিয়া দিলেন। তারপর কাগজ কলম কালিবাবুর দিকে আগাইয়া দিয়া বলিলেন—না; তুমিই লেখ। তুমি থাকতে আর আমি লিখি কেন? কালিবাবু বলিলেন—আমি লিখব কি করে? আমার লেখা তো সকলেই চেনে স্কুলে। রায় সাহেব বলিলেন—আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে পরে। তুমি লিখে ফেলতো আগে। তারপর সেরেস্তার কাউকে দিয়ে চিঠিখানা নকল করিয়ে দিলেই হবে।

চিঠি লেখা হইল। রায় সাহেব বলিলেন—পড় তো মাষ্টার, কি লিখলে শুনি। রায়সাহেবের এই দাম্ভিক ও অতি স্থূল অভিনয়ে কালিবাবুর বিরক্তিও আসিল, হাসিও পাইল। তবু পড়িলেন। রায় সাহেব শুনিয়া গম্ভীরভাবে ঘাড় দোলাইয়া বলিলেন বাঃ ঠিক হয়েছে, খাসা হয়েছে। কালিবাবু এবার হাসিয়া ফেলিলেন, কিন্তু হাসিটাকে সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভঙ্গি ও অর্থ দিলেন, বলিলেন—এর ফল যা হবে, বুঝলেন রায় সাহেব। তারণ একেবারে বসে যাবে আর আমাদের নিতাইয়ের পঁয়তাল্লিশ নম্বর বেড়ে যাবে। তা হলে ফার্ষ্ট বয়ের সঙ্গে ওর তফাৎটা অনেক কমে আসবে। আর একটা কথা। আমি গোপনে ওদের, মানে নিতাইয়ের আর সেই ছেলেটির অন্য খাতাগুলোও দেখব, তারপর সেগুলোও পরীক্ষা করান যাবে, বুঝলেন। আমি আজ উঠি। কালিবাবু উঠিলেন।

যাইতে যাইতে কালিবাবু বলিয়া গেলেন—এবার স্কুল কমিটির ইলেকশনে দাঁড়াবেন রায় সাহেব তা হ'লে। এই কথা থাকলো।

কালিবাবু তখন খানিকটা চলিয়া আসিয়াছেন এমন সময় ফের ডাক আসিল—মাষ্টার! ও মাষ্টার! রায় সাহেব ডাকিতেছেন। কালিবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। রায় সাহেব কি ভাবেন কি তাঁহাকে? রায় সাহেব তাঁহার সহিত এমনভাবে কথা বলেন যেন তিনি তাঁহার কোন আমলা বা কর্ম্মচারী। তিনি যে একজন শিক্ষক; সমাজে দশের মধ্যে তাঁহার যে একটি সম্মানের নির্দ্দিষ্ট আসন আছে তাহা রায় সাহেব ভুলিয়া যান। ভুলিয়াই বা থাকেন কেন তিনি তাহা জানেনই না। বিরক্তি সত্ত্বেও তাঁহাকে ফিরিতে হইল। ঘরে ফের ঢুকিতেই চোখে পড়িল—রায় সাহেবের চোখ দুইটা নবজাগ্রত ক্রোধের প্রকাশে উত্তপ্ত। রায় সাহেব বলিতে লাগিলেন—আচ্ছা মাষ্টার, এক কাজ কর না কেন? তারণকে তোমরা স্কুল থেকে তাড়িয়ে দাও না কেন? আর ঐ যে ছেলেটা আমার নিতুর সঙ্গে পড়ে ওটাকেও এক কাজ কর। ও বরং আমার সেরেস্তায় আমলার কাজ শিখুক। কাজ শিখলে ওর ভাল মাইনে করে দেব।

কালিবাবু অবাক হইয়া রায় সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারণকে তিনি আন্তরিক ভাবে বরদাস্ত করিতে পারেন না এটা ঠিক হইলেও রায় সাহেবের পরিমাণহীন দাম্ভিকতার মধ্যে শিক্ষক ও ছাত্রদিগকে তিনি কি ভঙ্গিতে দেখেন এইটা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতে লাগিল। এইবার কালিবাবু উত্তর দিলেন—আপনি কি বলছেন রায় সাহেব? আপনি কি মনে করেন স্কুলের মাষ্টাররা আপনার আমলা-গোমস্তার মত? আপনি বললেই তাদের একজনকে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে? আর ফণির কথা বলছেন? সে কথাটা আমাকে না বলে বরং চন্দ্রবাবুকে বলে পাঠান। সব চেয়ে ভাল হয় যদি আনন্দময়কে বলেন।

রায় সাহেব ততক্ষণে আবার ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিলেন—আহা চট কেন মাষ্টার। আমি কি আর তোমাকে এখুনি বলছিলাম ছাড়িয়ে দিতে? চেষ্টা ক'রো এই আর কি!

কালিবাবুর আর ভাল লাগিল না। তিনি উত্তর না দিয়াই বাহির হইয়া পড়িলেন।

বেলা তখন পাঁচটা। জল খাবার খাইয়া চন্দ্রবাবু চৌকির উপর বসিয়াছিলেন। কাজ কর্ম্ম বিশেষ ছিল না, পড়ানোর হাঙ্গামা নাই, ছেলেদের প্রমোশন হইয়া গিয়াছে। কেবল যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে তাহাদেরই টেস্ট পরীক্ষা চলিতেছে। অবসর পাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া বিশ্রাম লইতেছেন। বিশ্রাম কি তাঁহার ভাগ্যে আছে? এই তো টেস্টের ফল বাহির হইলেই আবার পড়াবার হাঙ্গামা। এবার কয়টা পাশ করিবে কে জানে? কোন ডিভিশনেই বা কয়টা? এই সময় রায় সাহেবের দারোয়ান আসিয়া সেলাম করিয়া তাঁহাকে দুইখানা চিঠি দিয়া গেল—রায় সাহেব দিয়াছেন। চিঠি দুইখানা তিনি না পড়িয়াই পাশে রাখিয়া দিলেন। ভদ্রলোককে তিনি জানেন। পত্রের মধ্যে হয়ত কোন তিক্ত কথা আছে। পড়িলেই জ্বালা ধরিয়া যাইবে। বাহিরের দিকে তিনি তাকাইলেন। বোর্ডিংএ একটিও ছেলে নাই। গ্রামের কতকগুলি ছোটছেলে রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে। উহাদের খেলা বোধ হয় শেষ হইয়াছে। স্কুলের সামনেই সদানন্দ বাবুদের গেষ্ট হাউস, তাহার পাশেই হাটের জায়গা, হাটের পিছনে ফুটবল গ্রাউণ্ড। সাদা সাদা মূর্ত্তিগুলি ছুটিয়া বেড়াইতেছে, মাঝে মাঝে উচ্চ কণ্ঠস্বর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এক সময় তিনিও খুব ভাল খেলিতে পারিতেন। আগে আগে এখানে আসিয়া প্রথম প্রথম যখন তাঁহার খেলার নেশা ছিল তখন তিনিও নিয়মিত খেলিতে আসিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় স্কুলের এমন চমৎকার গ্রাউণ্ড তৈরী হইয়াছে। তাঁহারই চেষ্টায় খেলা দেখাইবার জন্য একজন গেমস্ টিচার রাখা হইয়াছে। কিন্তু কোন ফল হইল না। গেমস্ টিচার হরেরাম বাবু। তাঁহার দ্বারা কিছু হয় না। অত্যন্ত স্বার্থপর প্রকৃতির লোক। ছেলেদের সহিত মিশিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। তাহার উপর দুই মাইল দূরে বাড়ী। স্কুল সারিয়া গিয়া আর ফেরেন না। অথচ মাহিনাটি লইবার সময় কোন নড়চড় হয় না। খেলার মাঠে একদিনও থাকেন না। তিনি তিরস্কার বা অনুযোগ করিলে দুই একদিন আসেন, তাহার পর আবার বন্ধ হইয়া যায়। আজকাল তবু তারণবাবু নিয়মিত খেলার মাঠে যাইতেছেন। শুধু যাওয়া নয়, উহার সহিত অপর্য্যাপ্ত উৎসাহ মিশিয়া আছে যেন।

চন্দ্রবাবুর মনে হইল ভদ্রলোকের কিছুদিন হইতে কেমন যেন একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যেদিন আনন্দময় তাঁহার সঙ্গে তারণবাবুকে লইয়া আসেন সেদিন চন্দ্রবাবুর স্পষ্ট মনে আছে, ভদ্রলোক একটিও কথা বলেন নাই। তাহার পর স্কুলে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াও তেমনিই ছিলেন না। কাহারও সহিত অত্যন্ত মাখামাখি বা হৃদ্যতা ছিল না, কোন শিক্ষকই তাঁহার কাছে বন্ধু বা শত্রু ছিলেন না। ভদ্রলোক ভদ্রতার সহজ দূরত্ব দিয়া এড়াইয়া চলিতেন। দশটা আলোচনা হইলেও চন্দ্রবাবুর মতই তিনি কোন আলোচনায় যোগ দিতেন না। কেবলমাত্র আলোচনার ফলাফলগুলি মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মুখের উপর আপনার ছায়া অতি লঘুভাবে ফেলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই মিলাইয়া যাইত। ছেলেদের কোনদিন জোরে মারেন নাই বা তিরস্কার করেন নাই। উত্তেজিত ভাবে কথা কোনদিন বলেন নাই বা জোরে হাসেন নাই। চন্দ্রবাবুর মনে হইত যে ভদ্রলোক অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে এসব করিতেন তাহা নহে, তারণবাবু স্বভাবতই শান্ত। সময় সময় তারণকে দেখিয়া মনে হইয়াছে যে ভদ্রলোকের ভিতরটা যেন মরিয়া গিয়াছে। সময় সময় তাঁহার চোখে চন্দ্রবাবু এমন নিস্তেজ, শীর্ণ, অর্থহীন দৃষ্টি দেখিয়াছেন যাহাতে তাঁহাকে একটা জীবন্ত পাথরের মূর্ত্তির মত মনে হইয়াছে। সেই মানুষ আজ চঞ্চল প্রাণবান হইয়া উঠিয়াছে।

সেটা তিনি লক্ষ্য করিলেন পূজার ছুটির পর। পূজার ছুটির পর যখন তারণবাবু চন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, চন্দ্রবাবু দেখিলেন তারণবাবুর শীর্ণ দেহে মেদের কঠিন-কোমল লাবণ্যময় আস্তরণ পড়িয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াই তারণবাবু যখন হাসিলেন তখন মুখের কালো রঙের উপর যেগুলির

আভা ফুট হইয়া উঠিল। আর হাসি পূর্ব্বের মত শান্ত নয়, সরব হাসিতে স্বাস্থ্য ও প্রাণের প্রকাশ স্পষ্ট।

সকলেই বিশেষ করিয়া বাহিরের শিক্ষকরা এবং ছাত্ররা যারা তারণবাবু সম্বন্ধে কথঞ্চিত সচেতন, তাহারা তাঁহার ব্যবহারে পরিবর্ত্তন দেখিয়া আশ্চর্য্য তো হইলই, উপরন্তু কেহ বা খুসী কেহ বা বিরক্ত হইল। তবে তাঁহার স্বাস্থ্যের অভিনব পরিবর্ত্তন কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না। আজকাল তিনি শিক্ষকদের আলোচনার মধ্যে যোগ দেন, তর্ক করেন আর তর্কের সময় উত্তেজনার প্রাবল্যে কাহাকে কেমন কথা বলা দরকার সে জ্ঞানও সময় সময় বিলুপ্ত হইয়া যায়।

চন্দ্রবাবু তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হন, মনে কৌতূহল জমিয়া উঠে সহানুভূতির সঙ্গে তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা করেন। প্রথম যৌবনে, কৈশোর ও যৌবনের প্রত্যন্তদেশে অবস্থানের সময় যে ফুটন্ত তরল আদর্শবাদ মানুষকে চঞ্চল করে, যাহা তাঁহারও ছিল, তাহাই যেন এই ত্রিশ বৎসর বয়সে তারণবাবুর চরিত্রে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। চন্দ্রবাবুর মনে হয় যে পারিপার্শ্বিকের চাপে আদর্শবাদের যে লাভার উপর সংসার চাপিয়া বসিয়াছিল, আজ সেই পাথরখানা যেন হঠাৎ সরিয়া যাওয়ায় আবার সেই লাভাস্রোত ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছে। চন্দ্রবাবু সহানুভূতির সহিতই ভদ্রলোককে দেখেন। কিন্তু অকস্মাৎ গোলমাল হইয়া গেল সেদিন। ভদ্রলোক ডিসিপ্লিন হইতে মানুষের মনোবেদনাকে বড় বলিয়া দেখেন।

কিন্তু তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া অবধি তাঁহার মনে সুখ ছিল না। পরদিন স্কুলে তারণবাবুর বেদনাহত চোখের দিকে তাঁহার চোখ পড়িতেই তিনি তাঁহাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। কোন্ বক্র পন্থা দিয়া গেলে উভয়েই অলক্ষিতে ঠিক যায়গায় পৌঁছান যায় চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্রবাবু সোজাসুজিই কথাটা বলিয়া ফেলিলেন—তারণবাবু, কিছু মনে করবেন না। কালকে আপনাকে যে যুক্তি দিয়েছিলাম সেটার সম্বন্ধে আমারও সন্দেহ আছে। কালকের তিক্ততার জন্যে আমাকে মার্জ্জনা করবেন। কথা কোনরূপে বলিয়া ফেলিয়াই বুঝিলেন—বুকটা হালকা হইয়া গিয়াছে। একটা নিশ্চিন্ত নিশ্বাস আপনা-আপনি বাহির হইয়া আসিল। তারণবাবুর মুখের দিকে চাহিতেই দেখিলেন—তাঁহার চোখ দুইটা জলে করিয়া আসিয়াছে।

তারপর হইতে চন্দ্রবাবু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, তারণবাবুর উত্তেজনা আরও বাড়িয়া গিয়াছে তর্ক করার সময় গলার স্বর আগের চেয়ে আরও উঁচু পর্দ্দায় উঠে, আর জোরে হাসিয়া থাকেন। সেই দিন হইতেই তারণবাবু বিকালে ফুটবল গ্রাউণ্ডে হাজিরা দিতে সুরু করিয়াছেন। নিজে খেলেন, ছেলেদের খেলা শেখান, নিজে প্রচুর গোলমাল করেন, ছেলেরা গোল করিলে ধমক দেন।

রায় সাহেবের চিঠি দুইখানা পাশেই পড়িয়া আছে। তিনি প্রথমখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া উঠিল। ইংরাজীতে লেখা। অতি শুদ্ধ ব্যাকরণ-দোষহীন ভাষায় রায়সাহেব নারায়ণ রায় তারকনাথ স্কুলের হেড মাষ্টারকে জানাইতেছেন যেন তাঁহার ছেলে, পঞ্চমশ্রেণীর ছাত্র নিতাই রায়ের অঙ্কের খাতাখানি আবার পরীক্ষা করান হয়। কে লিখিল চিঠিখানা? মুসাবিদা কে করিয়া দিল? রায়সাহেব নিজে? তিনি তো এক লাইন লিখিতে পারেন না। তবে? কালিবাবু? চন্দ্রবাবুর মুখে অতি তিক্তহাসি ফুটিয়া উঠিল। পরের চিঠিখানা তিনি খুলিলেন। পড়িতে পড়িতে মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, মুখ গম্ভীর ও আরক্ত হইয়া উঠিল। চিঠিখানা লালকালিতে ভাঙা ভাঙা বাংলা অক্ষরে নারায়ণবাবু চন্দ্রবাবুকে লিখিয়াছেন। চিঠিখানা ব্যক্তিগত। চিঠিতে রায় সাহেব লিখিয়াছেন যে যদি খাতা পরীক্ষা করিয়া নিতাইয়ের খাতায় নম্বর দিবার কোন গণ্ডগোল বাহির হয় তাহা হইলে চন্দ্রবাবুর কর্ত্তব্য সে শিক্ষককে স্কুল হইতে বিতাড়িত করা। আর ফণি বলিয়া যে একটি অনাথ ছেলে আনন্দময়ের বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা করে সে ছেলেটি নাকি খুব বুদ্ধিমান। নারায়ণবাবু ছেলেটিকে তাঁহার সেরেস্তায় চাকরী দিতে ইচ্ছুক। কারণ অমনি একটি ছেলের তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন। এ বিষয়ে চন্দ্রবাবু যদি ব্যবস্থা করেন তবে তাঁহার বিশেষ উপকার করা হইবে। আর তিনি যদি আনন্দময়কে ও ফণিকে এ বিষয়ে তাঁহারে অনুরোধ জানান তাহা হইলে তিনি আরও উপকৃত হইবেন। তিনি স্থাণুর মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস

থাকে মাত্র—ব্যক্তিগত শ্রম। ব্যক্তিগত শ্রম অর্থাৎ গতর খেটে খাও, উৎপন্ন শ্রম বিক্রি করে খাও।

এর বিনিময়ে যা আসে তাই বাঁচবার পাথেয়। সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশের এই পর্যায়ে হিন্দু ও মুসলমান চাষী বিভিন্ন রকমে সাড়া দেয়। এখানে ধর্মগত শিক্ষা অনেক খানি জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। ধর্মের অনুশাসনে শ্রম উৎপাদকারী চাষীর মন বিভিন্ন পন্থায় তার সমাধান খোঁজে। আসলে শ্রমউৎপাদকারী দুটি জীবই (হিন্দু ও মুসলমান) অর্থনৈতিক বনিয়াদের ওপর একই শ্রেণীভুক্ত। ধর্ম সেখানে বাইরের পোষাকী কাপড়ের মত ঝুলছে। ধর্মের অনুশাসন যেমন সামাজিক রীতিনীতির মোড় ফিরিয়ে দেয় তেমনি সামাজিক রীতিনীতি অর্থনৈতিক জীবনের এক-একটি রূপ বিকাশ করে। পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক শক্তি সমাজ ও সামাজিক রীতিনীতি এবং অনেকখানি ধর্ম সংস্কারকেও গড়ে তোলে। এই গড়ে তোলার কাজে বিভিন্নশক্তির ঘাতপ্রতিঘাত, ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াও পরস্পর নির্ভরশীলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। কাজেই চাষীর সামাজিক চেতনা ও অর্থনৈতিক স্বার্থবোধ কতগুলো মিশ্র শক্তির সম্মিলিত ফল মাত্র। কোন শক্তিই স্বয়ম্ভূ নয়। তাকে সব ক্ষেত্রেই প্রতিরোধ অতিক্রম করে তবে আসতে হবে। সে যখন প্রতিরোধ অতিক্রম করে আসবে তখন পূর্বে যা ছিল তা থাকবে না; যা ছিল না তাই হবে। মোদ্দা কথা প্রতিরোধের বীজ সব ক্ষেত্রেই থাকবে শুধু মাত্র তা পরিণতির অপেক্ষা রাখে।

পূর্ববর্ণিত চাষী ছেলে স্বাবলম্বী হতে বাড়ি ছাড়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যদি এই জীবেরা কোথাও একবার কোন ঘাটে নঙর ফেলে ত সেইখানেই স্থায়ু হ'য়ে পড়ে। এরা যখন স্থবির হয়ে পড়ে তখন সেখানে সম্বন্ধ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই থাকে, সামাজিক অর্থাৎ বিবাহে অথবা কাজের পালক পুত্র ইত্যাদি। এমনি করেই মুসলমান জনতার প্রসার ঘটে। যে সব পরিবারের সঙ্গে এই সামাজিক সম্বন্ধ ঘটে তারা বেশীর ভাগই ভূমিহীন ও জনবলহীন। জনবলহীনতার জন্য সংসারে অর্থাগম সীমাবদ্ধ। কাজেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের এক বিশেষ অবস্থায় ভূমিহীন চাষীর কাছে জনবলই মূলধন হিসাবে গণ্য হয়। এ কথাটার জলন্ত দৃষ্টান্ত মফস্বল সহরের মিউনিসিপ্যালিটির মেথরদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানকার মেথররা ও তাদের নব্য বংশধরেরা বিশেষ একটা বয়স পার হবার পরই আয়ের অধিকারী হয়। সমষ্টিগতভাবে সবাই শ্রম বিক্রয় করে খায়।—বাপ, বেটা, মা ও মেয়ে।

অতএব চাষীর সমাজের সঙ্গে যে বিনিময় তার উপাদান হয়ে পড়ে ব্যক্তিগত শ্রম। এই করে সে খাঁটি শ্রমজীবী হয়ে পড়ে। তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক চেতনা—দিন আনব দিন খাব, তবে সংসারে শান্তি থাকবে, নচেৎ নয়। এর মধ্যে সমষ্টিগতভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষামূলক কোন চেতনা গড়ে ওঠেনি, অর্থাৎ কোন রাজনৈতিক চেতনা গড়ে ওঠেনি। এই রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলার ভার কংগ্রেসের। কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্ব সেই দিকে অগ্রসরমান।

এতক্ষণ যে আমরা আলোচনা করলাম তা সম্পূর্ণই মুসলমান চাষীকে লক্ষ্য করে। এখন বিচার করা যাক হিন্দু চাষী কারা এবং কি করে তারা ভূমিহীন কৃষাণে পরিণত হয়। এখানে প্রথমে বিচার করতে হবে হিন্দুচাষীর সামাজিক পরিবেশ কি? এবং কি কারণে তারা তাদের সামাজিক ভূ-স্বত্বভোগীর স্তর থেকে বিচ্যুত হয়ে একেবারে ভূমিহীন কৃষাণে পরিণত হয়। হিন্দু ও মুসলমান চাষীদের সম্বন্ধে এই কথা প্রযুজ্য—জমি ছিল, কিন্তু এখন নেই। তখন ভূ-স্বত্বভোগী ছিল, এখন শ্রমস্বত্বভোগী হয়েছে। এই অবস্থার কারণ বিচার করতে গেলেই আমাদের প্রথম দেখতে হবে এদের সামাজিক জীবনের শিকড় কতটা গভীর ভাবে নিবদ্ধ। এরা শ্রেণী হিসাবে স্থায়ু না চলিষ্ণু। যদি চলিষ্ণু হয়—তবে কেন? যদি স্থায়ু হয় তবে কেন? হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ অর্থাৎ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই—ব্রাহ্মণ, কায়েত, বৈদ্যি এবং কোথাও নমঃশূদ্র—যে সামাজিক ধনের প্রভুত্ব শিক্ষার ও বংশগত অধিকারের ফলে ভোগ করত, তাতে একদিন টান ধরে। একথা আমরা পূর্বের প্রবন্ধে উল্লেখ করেছি। এই তিনটি সম্প্রদায়ের জনতা বৃদ্ধি যা হয়েছে, তাতে করে তাদের কিছুটা ভূস্বত্বভোগী, কিছুটা শ্রমস্বত্বভোগী হতে হয়েছে। এবং এদের অধিকাংশের শ্রমস্বত্ব কায়িক পরিশ্রমে নয় সম্পূর্ণই মানসিক, অর্থাৎ বুদ্ধিগত। এর

একমাত্র মূলধন হল শিক্ষা। হিন্দুর উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে—হয়ত সমাজতাত্ত্বিকেরা ঠিক উত্তর দিতে পারবেন—জনতা বৃদ্ধি যা হয়েছে তা অধিকাংশ মেয়ে, তুলনায় পুরুষের সংখ্যা কম। এদের মধ্যে আর একটা শ্রেণী আধা-গেঁয়ো, আধা-শহুরে সত্তাতা গড়ে তুলেছে। এরা ঠিক মাটির মায়াও ছাড়েনি আর শহর থেকে দু'পয়সা যা পাওয়া যায় তাও গ্রহণ করে। এরা মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে আজও বেঁচে আছে। আর এক শ্রেণী আছে তাদের কিছুই নেই—চাকুরীজীবী। ভূ-স্বত্ব নষ্ট হয়ে গিয়ে শ্রমস্বত্ব পুরোপুরিই চাকুরীতে দাঁড়িয়েছে। ফলত, এদের একমাত্র ভরসা জীবনবীমা স্বত্ব। মধ্যবিত্তের এই জাতীয় সামাজিক জীবন ভাঙনের ফলে দেশী-বিদেশী বণিকের মূলধন বীমা কোম্পানীতে খানা বাঁধতে সুরু করেছে। এর উপর জনসাধারণের কোন কর্তৃত্ব নেই, এবং একই সামাজিক কারণে ব্যাঙ্কের ব্যবসায় বিশেষ করে savings accountটি ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করেছে—এদিকেও জনসাধারণের কোন কর্তৃত্ব নেই। সামাজিক নব্য ধন উৎপাদনে এমনি করে মধ্যবিত্ত সমাজ, জীবনবীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের বিশেষ একটি শাখাকে পরক্ষোভাবে সাহায্য করছে। মধ্যবিত্ত সমাজে তার ভূ-স্বত্ব হারিয়ে শ্রমস্বত্বকে ভিত্তি করে যে জীবন যুদ্ধ সুরু করেছে তারই আভাস ইঙ্গিতে এখানে দেওয়া গেল। আর একটু বলা ভাল, এই যে জীবন-যুদ্ধ যা শ্রমস্বত্বকে নির্ভর করে বাঁচতে চাওয়া তার একমাত্র বনিয়াদ হল শিক্ষা—অর্থাৎ মানসিক পরিশ্রম। এখন আমাদের দেখতে হবে যে এর কোন প্রতিকূল সামাজিক দৃষ্টান্ত আছে কিনা। যেমন মধ্যবিত্তের জনতা বৃদ্ধির মাঝে মেয়েদের সংখ্যা বেশী, তেমন হিন্দু নিম্ন শ্রেণীর জনতার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা বেশী। তাতে করে ফল হয়েছে যে হিন্দু নিম্নশ্রেণীর বৈবাহিক ক্রিয়া অনেকখানি ধন সঙ্কট হরণ করে নিচ্ছে। মুসলমান সমাজে জীবন যাত্রায় একজন চাষীর কাছে বৈবাহিক ক্রিয়া খুব দুশ্চিন্তার কারণ নয়। বিবিধ কারণে মুসলমান নিম্ন সমাজে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মধ্যে মুসলমান সমাজে এক বিশেষ ধরণের বিবাহ পদ্ধতি একটা কারণ। একটু অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে হিন্দুর নিম্নশ্রেণীর জনতা তেমন হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে হিন্দুর উচ্চশ্রেণীর। এই বৈবাহিক সমস্যা সমাধান করতে অনেক নিম্নশ্রেণীর লোককে মহাজনের কাছে হাত পাততে হয়। তার ফলে ভূ-স্বত্ব বাঁধা বাঁধা পড়ে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা আর ফিরে আসে না। তার অর্থ সম্পত্তি হস্তান্তর হওয়া। ফলে সে ভূস্বত্ব বঞ্চিত হয়ে শ্রমস্বত্বজীবীতে পরিণত হয়। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করে বলা ভাল যে হিন্দু ও মুসলমান চাষীর ভূস্বত্ব থেকে শ্রমস্বত্বোপজীবীতে পরিণতির একটি মাত্র কারণ এখানে নির্দেশ করলাম। আরও অনেক বিচিত্র কারণ আছে, তবে সব কারণের বনিয়াদ হল সামাজিক পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক অবস্থা।

- আমরা এতদিন ধরে সমাজের নিম্ন স্তরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক কতকটা সহজ মানবিকতার দৃষ্টি দিয়ে দেখে এসেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে জনসেবার নামে এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছি। ঠিক মূল সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিচার করতে চাই নি। তাই আমাদের চোখে অগণিত হিন্দু ও মুসলমান চাষীর সমস্যা অনেকটা সাম্প্রদায়িকতার রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। এখানে একটা কথা উঠিতে পারে যে হিন্দু ও মুসলমান পরিবেশের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সূত্র কোথায়? আমরা আশা করি পরবর্তী বিশ্লেষণে তা প্রকাশ করব। পূর্বেই বলেছি যে হিন্দু ও মুসলমান চাষীর সব ক্ষেত্রেই একটা সামাজিক সম্বন্ধ থাকে তা কাউকে যা ডেকে হোক, অথবা বিধবার ধর্ম পুত্রভাবেই হোক এ থাকবেই। যদি কেউ গ্রামদেশে গিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর চাষীর ব্যক্তিগত জীবন পর্যালোচনা করেন তবেই এর সত্যতা অনুভব করতে পারবেন। বাঙ্গালার চাষী অথবা নিম্নশ্রেণী ঘর ছাড়ল না বলেই বাঙ্গালা ভাষা আজ গণতন্ত্রিতে দাঁড়তে পারলে না। যাক সে আলোচনার স্থান এ নয়।

চাষীর একক শ্রমের উপস্বত্ব বাদে, জীবন যাত্রায় তার আরও অনেক চাহিদা আছে, যা মেটাতে তাকে অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হয়। এখানে চাষীর কৃষিজাত দ্রব্য যা অপরের জমীতে জন্মাবার কোন অধিকার নেই, অথচ নিজের মত করে উৎপন্ন করা যায়—এমন কতগুলি সীমাবদ্ধ স্থানের মাঝে চাষী তার উদ্বৃত্ত অবসর চালতে সুরু করে। এতে যা উৎপন্ন হয় তাকে অবলম্বন

করেই চাষীর এক ধরণের বিনিময় সমাজের সঙ্গে শুরু হয়। চাষীর যে শ্রম পাঁচের টাকায় কাড়া খাটে তার ফল সে পাচ টাকা পঞ্চাশে। এখানে শ্রমের বিনিময়ে টাকা আসছে, কিন্তু শ্রমের বিনিময়ে দ্রব্যও আসে। চাষী তার উদ্বৃত্ত অবসর ঠেলে বা ভরসায় তা বেঁচে থাকার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। এখানে শ্রম + দ্রব্য + অর্থ = জীবনযাত্রা।

হাটে বাজারে যে কলাটা-মূলটা, ডিম, হাঁস, মুরগী বিক্রির জন্য আসে তা সবই ছোট খাট গৃহস্থ চাষীর উৎপন্ন দ্রব্য। অবশ্যি বড় বড় চাষীরা—যে সব উৎপন্ন কৃষিদ্রব্য ফড়েদের (মধ্যব্যবসায়ী) মারফৎ শহরের বাবুদের জন্য পাঠায়—তার কথা আমি বলছি না—তাদের মোটা পয়সা মোটা লাভ। আমি তাদের কথা বলছি যারা ঘরের কোনে দুটো ঢ্যাঁড়স গাছ লাগায় এবং সেই গাছে আটটা দশটা যা ঢ্যাঁড়স ফলে তাই বিক্রি করে তেলটুকু নুনটুক কিনে আনে। এদের এই যে শ্রমলাভ দ্রব্যের মারফৎ বিনিময় চলে এখানে এরা অনেক বঞ্চিত হয়। এই বঞ্চনা আপাততঃ খুব ক্ষুদ্র বলেই বোধ হবে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে এর যদি বিচার করা যায় তবে এর পরিমাণ কত বুঝতে পারা যাবে। কথা উঠতে পারে যে, বঞ্চনার প্রকৃতিটা কি? উত্তর হচ্ছে যে, বঞ্চনা মূলত ঠিকই থাকে। ব্যক্তি বিশেষে এর প্রভেদ ঘটে মাত্র। তাই বঞ্চনার প্রকৃতির কোন বাধাধরা বৈশিষ্ট্য নেই; এই বঞ্চনা রোধ করতে গিয়ে যদি চাষীরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদ করে তবে রাজনৈতিক চেতনার আসল ভিত্তি রচনা হয়। যেমন ধরা যাক মহনা মিঞা ও হাফু মিস্ত্রি দু'জন মিলে হাটে এসেছে। একজন এসেছে মুরগী বিক্রি করতে আর একজন হাঁস। উভয় উভয়কে চেনে না। কিন্তু বিক্রেতা হিসাবে দুজনই সমপর্যায়ভুক্ত। এবার লক্ষ্য করবেন ফড় কোথা থেকেই উপস্থিত হয়। ক্রেতা-বিক্রেতা মধ্যে প্রত্যক্ষ কোন যোগ না থাকার ফলে চাষী কি ভাবে বঞ্চিত হয়। শহর থেকে নৌকো করে ফড়ে (অর্থাৎ মধ্য-ব্যবসায়ী) গেল হাঁস-মুরগী কিনতে। হাঁস-মুরগীর যে দর ফড়ে শহরে পাবে তার চেয়ে অন্তত শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমে ঐ হাঁস-মুরগী সে কিনবে। এতে করে সেই ফড়ে যেমন বাঁচবে তেমন হবে তার স্ত্রীর গলার হার। অর্থাৎ উৎপাদকারীর সঙ্গে ক্রেতার কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকার ফলে এই বঞ্চনা বেড়েই যাচ্ছে। এখন যদি এমন হয় যে, চাষীরা নিজেরা সংঘবদ্ধভাবে এমন একটা দরে বিক্রয় করবে যাতে বঞ্চনার কোন অবসর থাকবে না—তবেই এই একপেশে লাভের বিনিময় বন্ধ হতে পারে। এই খানেই কংগ্রেসের রাজনৈতিক চেতনা দানের বড় সুযোগ। এদের বোঝাতে হবে যে তোমরা সংঘবদ্ধভাবে যদি এই দাবী কর যে তাদের মূল্য ছাড়া বিক্রয় করব না তবে তার ফলপ্রসূ প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। এমনি করে ধীরে ধীরে ছোটখাট স্বার্থসিদ্ধির মধ্য দিয়ে বৃহত্তর স্বার্থের দিকে চাষীর সঙ্ঘবদ্ধ চেতনাকে টেনে আনতে হবে। একবার যদি তারা নিজেদের দাবীর প্রতিষ্ঠা করতে পারে তবে তারা বৃহত্তর পরিধির মধ্যে নিজেদের শক্তি খুঁজে পাবে। যেমন ধরা যাক, জমিদার যদি কোন কারণে খাজনা মকুব করতে রাজি না হন, যেখানে সত্যিকারের খাজনা মকুব করার কারণ বর্তমান, ধরুন ঝড় হয়ে সমস্ত শস্য বা আংশিক ভাবে শস্য নষ্ট হয়েছে—এ অবস্থায় যদি সেই সংঘবদ্ধ চেতনা আবার সাড়া দেয়, তবে জমিদারকে তা না মেনে উপায় নেই। আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে যদি আমরা সেই সংঘবদ্ধ চেতনাকে আরোপ করি তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিরাই তাতে জড়িত হয়ে পড়বে। প্রতিবাদী চিরকালই তার অমিত শক্তি নিয়ে আঘাত করে। সেখানে যদি সেই সংঘবদ্ধ চেতনা তার নিজস্ব রীতিতে সাড়া দেয়, তবে হবে সত্যিকারের আন্দোলন। এই আন্দোলনের রূপ চেতনা যে ভাবে গড়ে ওঠে ঠিক সেই ভাবে প্রতিফলিত হয়, প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে। আজ জাতীয় কংগ্রেসের যে গতি তা দেখে পষ্টই বলা যেতে পারে যে চাষীর মধ্যে সেই সত্যিকারের সঙ্ঘবদ্ধ চেতনা গড়ে তোলবার দিকে ছুটে চলেছে। তা না হলে আজ কংগ্রেসের "কৃষাণ-মজদুর রাজ" বলার প্রয়োজন হত না।

কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার

দীর্ঘ ৬০ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। এই দীর্ঘ দিনের ইতিহাস হইতেছে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের চেষ্টার ইতিহাস। সূত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া এই বিশাল দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কংগ্রেস সহরের অধিবাসী ও সুদূরান্তবর্তী পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার বাণী বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। জনসাধারণের নিকট হইতেই কংগ্রেস শক্তি অর্জন করিয়াছে এবং একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে—কংগ্রেস ভারতের জনসাধারণের স্বাধীনতা লাভের কামনার জীবন্ত প্রতীক। বহুকাল ধরিয়া কংগ্রেস এই পবিত্র উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছে, কংগ্রেসের নামে এবং পতাকাতলে দেশের বহু নরনারী তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য জীবন দান করিয়াছে এবং বহু কষ্ট সহ্য করিয়াছে। সেবা ও ত্যাগের দ্বারা কংগ্রেস দেশের জনসাধারণের অন্তরে স্থান লাভ করিয়াছে; জাতির প্রতি কোন অসম্মানের নিকট মস্তক অবনত করিতে অস্বীকার করিয়া কংগ্রেস বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে।

জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের জন্য গঠনমূলক কর্মপন্থা অবলম্বন এবং স্বাধীনতালাভের জন্য অবিরাম সংগ্রাম করাই কংগ্রেসের ব্রত। কংগ্রেস তাহার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বহু সমস্যা এবং এক বিরাট সাম্রাজ্যের সশস্ত্র শক্তির সম্মুখীন হইয়াছে। শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বনের দ্বারা কংগ্রেস শুধু যে সংগ্রামের পরেও আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছে তাহাই নয়, ইহা নতুন শক্তি অর্জন করিয়াছে। গত তিন বৎসরের অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থান ও নিষ্ঠুরভাবে তাহা দমন করার পরে কংগ্রেস পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়াছে এবং দুর্দিনের দুঃখবেদনার সাথীরূপে জনসাধারণের অধিকতর প্রীতি অর্জন করিয়াছে।

সমান অধিকার—

কংগ্রেস নরনারী নির্বিশেষে ভারতের প্রত্যেকটি লোকের সমান সুযোগ ও সমান অধিকার লাভের পক্ষপাতী। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্য সাধন, পরমত সহিষ্ণুতা ও সদিচ্ছা গড়িয়া তুলিবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট। সমস্ত দেশবাসী যাহাতে একত্রে সর্ববিধ সুযোগ লাভ করিতে পারে এবং ইচ্ছামত ও শক্তিমত বিকাশ লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য কংগ্রেস পূর্ণ সুযোগ দিয়াছে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থাকিয়া নিজেদের জীবন ও সংস্কৃতি লইয়া স্বাধীনভাবে বসবাস করিবার অধিকার কংগ্রেস সকল সম্প্রদায় ও ভৌগোলিক এলাকাকেই দিতে চাহিতেছে। এই কারণে ভাষা ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করিয়া ভৌগোলিক সীমারেখা নির্দিষ্ট করা হইবে। যাহারা সামাজিক অত্যাচার ও অবিচার সহ্য করে, কংগ্রেস তাহাদের অধিকার সমর্থন করে এবং সকলের সমান অধিকার লাভের পথে যে সকল বাধা আছে তাহা দূর করিবার পক্ষপাতী।

কংগ্রেস এক স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করিয়াছে—উহাতে প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবে। এই রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শে গঠিত হইবে—উহার বিভিন্ন অংশে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তিত থাকিবে এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে উহার আইনসভাগুলি গঠিত হইবে। এই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উহার বিভিন্ন অংশ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবেই সংযুক্ত হইবে। বিভিন্ন অংশকে সর্বাধিক পরিমাণে স্বাধীনতা দিবার উদ্দেশ্যে সকল অংশের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য সাধারণ ও প্রয়োজনীয় কতকগুলি ফেডারেল বিষয়ের একটি যথাসম্ভব ক্ষুদ্র তালিকা করা হইবে। সাধারণ বিষয়ের আর একটি তালিকা করা হইবে—উহার অন্তর্ভুক্ত হওয়া না হওয়া বিভিন্ন অংশের ইচ্ছাধীন বলিয়া ধার্য করা হইবে।

শাসনতান্ত্রিক অধিকার—

শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারসকল স্বীকৃত হইবে, তন্মধ্যে এইগুলিও থাকিবে :—

(১) প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ

করিবার, স্বাধীনভাবে সভাসমিতি করিবার এবং আইনের ও নৈতিক আদর্শের বিরোধী নহে, এরূপ ব্যাপারে শান্তিপূর্ণভাবে অস্ত্রশস্ত্র না লইয়া সম্মবদ্ধ হইবার অধিকার থাকিবে।

(২) প্রত্যেক নাগরিকের নিজের বিবেক অনুসারে কাজ করিবার এবং জনসাধারণের শৃঙ্খলা ও নৈতিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ না করিয়া নিরুপদ্রবে তাহার নিজের ধর্ম আচরণ ও প্রচার করিবার স্বাধীনতা থাকিবে।

(৩) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং বিভিন্নভাষাগত এলাকার সংস্কৃতি, ভাষা ও বর্ণমালা রক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে।

(৪) আইনের নিকট জাতিধর্ম ও বর্ণনির্বিশেষে স্ত্রীপুরুষ সকলেই সমান বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(৫) সরকারী চাকুরী, ক্ষমতা বা মর্যাদাসম্পন্ন পদ অথবা কোন ব্যবসায় বা বৃত্তি সম্পর্কে জাতি, ধর্ম ও বর্ণাদির বৈষম্য করা হইবে না।

(৬) রাষ্ট্রীয় বা স্থানীয় অর্থে অথবা ব্যক্তিবিশেষের অর্থে সাধারণের ব্যবহারার্থে নির্মিত কূপ, পুষ্করিণী, রাজপথ, বিদ্যালয় অথবা সাধারণ বিশ্রামাগার প্রভৃতিতে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার থাকিবে।

(৭) প্রত্যেক নাগরিকের অস্ত্র রাখিবার ও বহন করিবার অধিকার থাকিবে, তবে এই সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অনুসারেই উহা রাখিতে হইবে।

(৮) আইনের বিধান ব্যতীত কাহারও স্বাধীনতা হরণ করা হইবে না অথবা কাহারো বাড়ী বা সম্পত্তি দখল বা বাজেয়াপ্ত করা হইবে না।

(৯) সমস্ত ধর্ম সম্বন্ধে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকিবে।

(১০) প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই সর্বজনীনভাবে ভোটাধিকার থাকিবে।

(১১) রাষ্ট্র বিনাব্যয়ে বাধ্যতামূলকভাবে বনিয়াদী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবে।

(১২) প্রত্যেক নাগরিক স্বাধীনভাবে ভারতের সর্বত্র চলাফেরা করিতে বা উহার যে কোন স্থানে বসবাস করিতে অথবা যে কোন ব্যবসায় বা বৃত্তি অনুসরণ করিতে পারিবেন; আইন অনুসারে বিচার বা রক্ষার ব্যবস্থা ভারতের সর্বত্র সকলের পক্ষেই সমান থাকিবে।

অনুন্নত শ্রেণীর রক্ষা ও উন্নতির সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা থাকিবে। যাহাতে তাহারা দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়া জাতীয় জীবনে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে। উপজাতিসমূহের উন্নতির ব্যবস্থা হইবে এবং তপশীলী শ্রেণীর শিক্ষা ও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা থাকিবে।

বিভিন্ন সমস্যা—

দেড়শত বৎসর ধরিয়া বিদেশী শাসনের ফলে জাতির অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। কতকগুলি সমস্যা দেখা দিয়াছে, অনতিবিলম্বে তাহার সমাধান প্রয়োজন। দীর্ঘদিনব্যাপী শোষণের ফলে জনসাধারণ দুঃখ ও অনশনের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কেবলমাত্র রাজনৈতিক দিক দিয়াই দেশ পরাধীন নয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক এবং ধর্মের দিক দিয়াও দেশ অবনতির চরমে পৌঁছিয়াছে। যুদ্ধকালে দায়িত্বহীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভারতীয় স্বার্থবিরোধী শোষণের ফলে এবং অযোগ্য শাসন ব্যবস্থার জন্য জনসাধারণের অশেষ দুর্গতি ও শেষ পর্যন্ত ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সৃষ্ট হইয়াছে। স্বাধীনতা ভিন্ন এই সকল সমস্যা সমাধানের আর কোন উপায় নাই। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতাও বুঝিতে হইবে।

দারিদ্র্য দূর করা—

দারিদ্রের অভিশাপ দূর করিয়া জনসাধারণের জীবনধারণের মান কি করিয়া উন্নত করা যায়—ইহাই প্রধান সমস্যা। জনসাধারণের এই মঙ্গল বিধান করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। এই পথে যে সকল প্রতিবন্ধক তাহা দূর করিতে হইবে। কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি এই জন্যই। শিল্প, কৃষি, সমাজসেবা এবং জনহিতকর কার্যে উৎসাহ দিতে হইবে। দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য এবং যাহাতে অন্যের উপর নির্ভর করিতে না হয়, এজন্য এইগুলিকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দ্রুত প্রসারিত করিতে হইবে। কিন্তু জনসাধারণের হিতসাধন ও তাহাদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় উন্নতি বিধান, বেকারসমস্যা দূরীকরণ এবং ব্যক্তিগত মর্যাদা বৃদ্ধিই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। এইজন্য

সমস্ত ক্ষেত্রে সামাজিক অগ্রগতির সমন্বয় সাধন করিতে হইবে এবং অর্থ যাহাতে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের হস্তে সঞ্চিত না হইতে পারে, এ দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সমাজের স্বার্থবিরোধী পুঁজিবাদ যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, খনিজ সম্পদসমূহকে জাতীয় সম্পদে পরিণত করিতে হইবে, যানবাহন ও শিল্প, কৃষি এবং অন্যান্য বিভাগের উৎপাদন ও বণ্টনপ্রণালী সমূহকে জাতীয়করণের ব্যবস্থা করিতে হইবে—যাহাতে স্বাধীনভারত একটি কো-অপারেটিভ কমনওয়েলথে পরিণত হইতে পারে। প্রধান প্রধান শিল্প, খনিজ সম্পদ, রেলওয়ে, জলপথ, জাহাজ ও অন্যান্য যানবাহন, কারেন্সী ও এক্সচেঞ্জ, ব্যাঙ্কিং ও ইনসিওরেন্স প্রভৃতি জাতীয় গভর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে।

গ্রামাঞ্চলের সমস্যা—

যদিও দারিদ্র্য ভারতবর্ষে সর্বব্যাপী তথাপি ইহা প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলের সমস্যা। জমির উপর অত্যধিক চাপ পড়ায় এবং অন্যান্য ধন উৎপাদনী ব্যবস্থা না থাকায় এই সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষ ক্রমশঃ গ্রামমুখীন হইয়া উঠিয়াছে। জীবিকা উপায়ের বিভিন্ন প্রকার কার্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং জমির উপর অধিকাংশ লোককে নির্ভর করিতে হইতেছে। ফলে জমি বহু ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাতে আধিক দিক দিয়া লোকসানই হইতেছে। সুতরাং জমি সংক্রান্ত বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হওয়া উচিত।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকর্মের উন্নতি করিতে হইবে। এবং যতদূর সম্ভব তৎপরতার সহিত ছোট বড় মাঝারি সর্বপ্রকার শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে। ইহার দ্বারা কেবল যে জাতির ধন উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে তাহা নহে, জমির উপর চাপও কমিবে। জীবিকা হিসাবে কুটীর শিল্পকে উৎসাহিত করিতে হইবে। শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা করিবার সময়, কেবলমাত্র জাতির সর্বাধিক ধন উৎপাদনের কথা ভাবিলে চলিবে না, এই পরিকল্পনাটি এমনভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, যাহাতে নূতন বেকার সমস্যার সৃষ্টি না হয়। এই পরিকল্পনাটি এমনভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেকটি সক্ষম লোক কাজ পাইতে পারে। ভূমিহীন শ্রমিকদের কাজ করিবার সুযোগ দিতে হইবে এবং তাহাদের হয় কৃষিকর্মে কিম্বা শিল্পে নিযুক্ত করিতে হইবে।

ভূমি সংক্রান্ত ব্যবস্থার সংস্কার—

ভারতবর্ষে জমি সংক্রান্ত নিয়মকানুনের সংশোধন হওয়া একান্ত দরকার। এই সংশোধনের জন্য রাজসরকার ও কৃষকের মধ্যে যাহারা রহিয়াছেন, তাহাদের সরাইয়া দিতে হইবে। অপসারিত করিবার পূর্বে এই সমস্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। এক দিকে ব্যক্তিবিশেষ বা কৃষকবিশেষ জমির মালিক থাকিবেন অপর দিকে কৃষিকর্মের উন্নতির জন্য এবং নূতন সামাজিক মূল্য সৃষ্টি করার জন্য ভারতের বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট কৃষকদের সদিচ্ছা ও অনুমতিক্রমেই এইরূপ পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে। সরকারের সহায়তায় ভারতের বিভিন্ন অংশে পরীক্ষামূলক সমবায় কৃষি-আগার স্থাপিত হওয়া উচিত। প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে ও নানারূপ পরীক্ষা চালাইবার জন্য সরকারী কৃষি-আগার থাকাও উচিত।

ভূমির উন্নতি সাধন—

ভূমি এবং শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইলে নগর ও পল্লীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগ ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। অতীতের পল্লীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং পল্লীর ক্ষতি করিয়া সহর ও নগর উন্নতিলাভ করিয়াছে। এই ত্রুটি সংশোধন করিতে হইবে এবং সহর ও গ্রামবাসীর জীবন-যাত্রা নির্বাহের মান যাহাতে একরূপ হয়, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। বিভিন্ন প্রদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিতরে যাহাতে সমতা রক্ষা করা যাইতে পারে, তজ্জন্য কোন একটি নির্দিষ্ট প্রদেশে সমস্ত শিল্প কেন্দ্রীভূত হইতে দেওয়া উচিত হইবে না।

শিল্পের কর্মক্ষমতা নষ্ট না করিয়া এবং শিল্পের ক্ষতি না করিয়া যথাসম্ভব বিভিন্ন প্রদেশেই শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কৃষি এবং শিল্প এতদুভয়ের উন্নতিসাধন এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি এবং কল্যাণ সাধনের জন্য ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নদীগুলির যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। নদীর জলস্রোতের শুধু অপচয়ই হইতেছে না; যাহারা নদী-তীরে বাস করে, নদীগুলি তাহাদেরও যথেষ্ট ক্ষতি করিতেছে। জল-সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, সর্বদা সমভাবে জল সরবরাহের ব্যবস্থা এবং বিপজ্জনক বন্যা এবং কৃষির উপরিভাগের ক্ষতি নিবারণ, ম্যালেরিয়া বিতাড়ন, জলস্রোত হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন এবং অন্যান্য উপায়ে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করিয়া পল্লী অঞ্চলে জীবনযাত্রানির্বাহ প্রণালীর উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করিবার জন্য নদী কমিশন গঠন করিতে হইবে। শিল্প এবং কৃষির উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এই উপায়ে এবং অন্যান্য উপায়ে দ্রুতগতিতে দেশে শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে হইবে।

জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা—

বুদ্ধিবৃত্তি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং নীতির দিক হইতে জনসাধারণকে উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের শিক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে তাহারা নূতন কর্মপদ্ধতির উপযুক্ত হইতে পারে। জাতির পরিপুষ্টি সাধনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যাপকভাবে জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইবে এবং অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় এই ব্যাপারে পল্লী অঞ্চলের অভাব অভিযোগের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। মাতৃমঙ্গল এবং শিশু-কল্যাণের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইভাবে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে যে, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই সমভাবে অগ্রসর হইবার সুযোগ লাভ করিবে এবং সকলের জন্যই সামাজিক নিরাপত্তা থাকিবে।

বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে নানাদিক দিয়া ও অসংখ্য কার্যের ভিতর দিয়া প্রভাবান্বিত ও গঠন করিয়াছে। ভবিষ্যতে ইহা মানুষের জীবনের উপর আরও বেশী প্রভাব বিস্তার করিবে। কৃষি, শিল্প ও সাংস্কৃতিক অগ্রগমন এবং দেশরক্ষাও বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসাহিত করা ও বিস্তৃতভাবে ইহার ব্যবস্থা করা সরকারের অবশ্য করণীয় কার্যের মধ্যে অন্যতম।

শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা—

কারখানায় শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করা ও তদ্রূপভাবে জীবনধারণের জন্য তাহাদের ন্যূনতম মাহিনা ঠিক করিয়া দেওয়া সরকারের কর্তব্য। আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী এবং ভারতের বিশেষ আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের বাসস্থান, কাজের সময় ও সর্তাবলী সরকার কর্তৃক নিরূপিত হইবে। শ্রমিক ও মালিকদের বিবাদের মীমাংসা, বৃদ্ধ বয়সে আর্থিক দুর্গতি হইতে রক্ষা, অসুস্থ ও বেকার অবস্থায় আর্থিক ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সঙ্ঘ গঠিত হওয়া উচিত। নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রমিক "ইউনিয়ন" গঠন করিবার অধিকার থাকিবে।

কৃষকদের ঋণ অতীতে কৃষক সমাজকে ধ্বংসের পথে লইয়া গিয়াছে। বর্তমানে নানা কারণে যদিও এই ঋণের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে হইবে এবং সমবায় ঋণ সমিতির ভিতর দিয়া কৃষকদিগকে অল্প সুদের হারে ঋণ দিতে হইবে। অন্যান্য ব্যাপারের জন্যও গ্রামে ও সহরে সমবায় সমিতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে ছোট ছোট শিল্প গড়িয়া তোলার জন্য শিল্প-সমবায় সমিতিসমূহ গড়িয়া তুলিতে হইবে। বর্তমানে ভারতের জরুরী সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধান করিতে হইলে—সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সমস্ত বিভাগেই সুপরিকল্পিত উন্নতিমূলক কার্য হওয়া দরকার, একথা সত্য হইলেও, কতকগুলি সমস্যা অতীব জরুরী। সরকারের অব্যবস্থা ও অনুপযুক্ততার জন্য ভারতের জনগণ অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট পাইয়াছে। অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং এখনও খাদ্য ও বস্ত্রের অভাব ব্যাপকভাবে রহিয়াছে। জীবনধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ব্যাপক দুর্নীতি দেখা দিয়াছে তাহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির আশু সমাধান হওয়া দরকার।

আন্তর্জাতিক ব্যাপারে—

আন্তর্জাতিক ব্যাপারে স্বাধীন জাতিগুলি লইয়া বিশ্বযুক্তরাষ্ট্র গঠন কংগ্রেস সমর্থন করে। তাহা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেস অন্যান্য জাতির সহিত—বিশেষ করিয়া তাহার প্রতিবেশী দেশগুলির সহিত বন্ধুত্বের ভাব বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিবে। সুদূর প্রাচ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রহিয়াছে, সুতরাং ভারত স্বাধীন হইয়া অবশ্যই ঐ সকল দেশের সহিত সেই সম্পর্ক নূতন করিয়া সংস্থাপন করিবে। নিরাপত্তা এবং ভাবীকালের বাণিজ্যিক সুযোগের স্বার্থেও এই সকল দেশের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা দরকার হইবে। ভারতবর্ষ অহিংসার ভিত্তিতে তাহার নিজের স্বাধীনতা সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে, সে সর্বদাই বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার জন্য প্রচার বিস্তার করিবে। অন্যান্য পরাধীন জাতির স্বাধীনতা ভারত সর্বদাই চাহিবে, কেননা একমাত্র স্বাধীনতার ভিত্তিতে এবং সাম্রাজ্যবাদের অবসান হইলেই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব।

১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, ভারতের ইতিহাসে সেই হইতে এই প্রস্তাব বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সেই দাবী ও 'চ্যালেঞ্জ' লইয়া কংগ্রেস আজও দাঁড়াইয়া আছে। সেই প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়াই এবং সেই সংগ্রামের বাণী লইয়াই কংগ্রেস আজ নির্বাচনের সম্মুখীন হইয়াছে।

আমাদের কর্তব্য—

কংগ্রেস এক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত। ইহার মধ্যে বিরাট ভবিষ্যৎ নিহিত আছে। সুতরাং এই সময় যতভাবে পারেন আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদিগকে সমর্থন করুন—সমগ্র দেশের ভোটদাতাদের নিকট কংগ্রেসের এই আবেদন। এই সকল নির্বাচনে ক্ষুদ্র বিষয়, ব্যক্তিগত স্বার্থ বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের স্থান নাই। একমাত্র লক্ষ্য হইল আমাদের জন্মভূমির স্বাধীনতা, তাহা হইতেই আমাদের দেশের লোক অন্যান্য ব্যাপারেও স্বাধীনতা পাইবে। ভারতবাসীরা অনেকবার স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞা-পালন করিতে এখনও বাকী আছে। যে মহান্ উদ্দেশ্য আমাদিগকে বারংবার আহ্বান করিয়াছে, সেই আহ্বানে আমরা চলিয়াছি। সমর নিকট যখন আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণভাবে পালন করিতে সক্ষম হইব। এই নির্বাচন আমাদের একটি ক্ষুদ্র পরীক্ষা, বৃহত্তর লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য প্রস্তুতি মাত্র। যাঁহারা স্বাধীনতা চাহেন, ভারতের মুক্তি যাহাদের কাম্য তাঁহারা সমস্ত শক্তি ও বিশ্বাস লইয়া এই পরীক্ষার সম্মুখীন হউন এবং আমাদের স্বপ্ন স্বাধীন-ভারতের দিকে একযোগে অগ্রসর হউন।

আমাদের কথা—সুদীর্ঘ কারাবাসের পর শ্রীযুক্তা কমলা রায়গুপ্ত বর্তমান সংখ্যা থেকে 'মন্দিরা'র সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেছেন। শ্রীযুক্তা স্নেহলতা সেন জানতি, বিশেষ করে ভারতীয় সংবাদ পত্র জগৎ, নিউজ পেপার কন্ট্রোল অর্ডার, পেপার কন্ট্রোল (ইকনমি) অর্ডার ও ভারতরক্ষা আইনের সর্বদিক প্রসারী রাষ্ট্রাক্রমণের সময় যেভাবে 'মন্দিরা'কে চালিয়ে এসেছেন তা সকলকে বিস্মিত ও আনন্দিত করেছে। রাষ্ট্রশক্তি যখন জাতীয় প্রগতির প্রচণ্ডতম অভিব্যক্তিতে দিশাহারা ও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কাজ করছিল, সে সময় তাঁর নিভৃত গৃহকোণ ছেড়ে শ্রীযুক্তা স্নেহলতা 'মন্দিরা'র ভার গ্রহণ করেছিলেন। কত বাধা, কত লাঞ্ছনা যে তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে তা' যাঁরা মন্দিরা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁরাই জানেন। তাঁর অসীম ধৈর্য ও কর্তব্য সম্পাদনে একনিষ্ঠা সকলকে মুগ্ধ করেছে। 'মন্দিরা'র সহঃ সম্পাদিকা হিসাবে তিনি এখনও আমাদের সাহায্য করে যাবেন।

পরলোকে শ্রীকালীনাথ রায়—লাহোরের দৈনিকপত্র 'ট্রিবিউন্'-এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়ের পরলোক গমনে ভারতবর্ষের সাংবাদিককুল একজন বিশিষ্ট সহকর্মী হারিয়েছেন। এদেশে সাংবাদিকদের মর্যাদা কালীনাথ যে ভাবে বাড়িয়েছেন তার তুলনা খুব কমই মেলে। সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় তাঁর সাংবাদিক জীবনের সুরু হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর দক্ষতা সংবাদপত্র জগতে তাঁকে পরিচিত করে। তাঁরই ফলে লাহোরের "পাঞ্জাবী" পত্রিকার দায়িত্ব তাঁকে নিতে হয়। তারপর তিনি সুবিখ্যাত 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদনাকার গ্রহণ করেন। তাঁর নির্ভীক, তেজস্বী, পক্ষপাতশূন্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধসকল দেশবাসীর অবিমিশ্র শ্রদ্ধার কারণ হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বর্বর বিকাশের বিরুদ্ধে তাঁর জ্বালাময়ী প্রবন্ধ তাঁকে রাজদরবারের রোষ দৃষ্টিতে আনয়ন করে এবং তারই ফলে তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। সার্দ্ধ দুই বৎসর পূর্বে তিনি শারীরিক অসুস্থতার জন্য 'ট্রিবিউন্'-এর কর্মভার ত্যাগ করে বাংলায় এসেছিলেন কিন্তু 'ট্রিবিউন্'-এর ট্রাষ্টীরা তাঁর অনুপস্থিতিতে পত্রিকাখানির ক্ষতি হচ্ছে বলে তাঁকে পুনরায় নিয়ে গিয়েছিলেন। শীতের সময় লাহোরের ঠাণ্ডা সহ্য হবে না মনে করে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। কিন্তু ব্রঙ্কো-নিমোনিয়ার আক্রমণে তিনি কলকাতাতেই ৬৮ বৎসর বয়সে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। বাঙ্গালার বাইরে যে সব বাঙ্গালী-বাঙ্গলার সুনাম বৃদ্ধি করেছেন কালীনাথ তাঁদের অন্যতম। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিজনদের প্রতি আমাদের সমবেদনা জানাচ্ছি।

শ্রীঅনাথগোপাল সেনগুপ্ত—শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়ের আকস্মিক পরলোকগমনের সংবাদ আমাদের কাছে আত্মীয় বিয়োগ ব্যথার ন্যায় দুঃসহ। অনাথগোপাল সহজ ভাষায় দুরূহ অর্থনীতির বিষয়গুলি যেরূপ সরল ও সহজ বোধ্য ভাবে সর্বসাধারণের জন্য লিখতে পারতেন বাঙ্গলা সাহিত্যে তেমন লেখক খুব অল্পই আছেন। ইতিহাস ও অর্থনীতিতে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রগাঢ়। আমাদের জীবনের দৈনন্দিন কার্যের মধ্যে তিনি তাঁর জ্ঞানের খোরাক পেয়েছিলেন বলেই তাঁর লেখা কখনও সুকঠোর হয় নাই। গান্ধীজির অর্থনীতিবাদ বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল সুগভীর। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ "জাগতিক পরিবেশ ও গান্ধিজীর অর্থনীতি" তাঁর এই জ্ঞানের সুষ্ঠু পরিচয়। মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বেও তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখন কে জানত যে তাঁকে আমরা এত শীঘ্রই হারাব। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর—১৯০০-এর মেদিনীপুর, স্বাধীন ভারতের—বীর সন্তানের জননী

'মেদিনীপুর ১৯৪২ সনেও প্রমাণ করেছে যে সে মরে নাই। বিপ্লবী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৩০ ও ১৯৪২-এর মেদিনীপুরের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তিকাহিনী চিরদিন দেদীপ্যমান থাকবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের যে বর্বর রূপ ১৯৪২-এ ভারতবর্ষে প্রকট হয়েছিল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের উলঙ্গ নৃশংসতার ইতিহাসেও তার তুলনা পাওয়া দুষ্কর।

১৯৪২-এ মেদিনীপুর অনাগত বিপ্লবকে বরণ করে নেবার যে পদ্ধতি দেখিয়েছে—ত্যাগে, সংযমে, নিষ্ঠায়—তা এক নতুন, অপূর্ব পদ্ধতি। নিরস্ত্র, সত্যাগ্রহী, বিপ্লবী মেদিনীপুরবাসী দেখিয়েছে যে, সত্যাগ্রহের সাহায্যে রাজশক্তিকে অচল করা সম্পূর্ণ সম্ভব। মেদিনীপুরবাসী দেখিয়েছে যে, কংগ্রেসের গঠন মূলক পদ্ধতি যদি গ্রামগুলিতে অনুসরণ করা যায় তাহলে তাদের শক্তি হয়ে ওঠে দুর্বার—এরোপ্লেন থেকে বা মাটীর উপর থেকে কোনো অত্যাচার, কোনো নৃশংসতাই তাদের দমাতে পারে না।

মেদিনীপুরের অত্যাচারের কাহিনী প্রেস সেন্সরের জন্য এতদিন পর্যন্ত প্রকাশিত হতে পারে নাই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি সম্প্রতি এক বিবৃতিতে ১৯৪২-এ সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, পাঁশকুড়া, তমলুক, মহিষাদল, ময়না এবং কাঁথি মহকুমার ঘটনাবলী সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে জনগণের বিপুল অভ্যুত্থানের পরিচয়ে মন একদিকে যেমনি গর্বে ভরে ওঠে অপরদিকে তেমনি আইন ও শৃংখলার নামে যে অত্যাচার তাদের ওপরে হয়েছে তাতে মন প্রাণ বিষিয়ে ওঠে। সামরিক কারণের অজুহাতে মেদিনীপুরের সংবাদ বাইরে প্রকাশ না করার ফলে বহু সরকারী কর্মচারী বেপরোয়া কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিল। মেদিনীপুর কুনো সিভিলিয়ান ও আই-বি'র চক্ষুশূল। সুতরাং এই সুযোগে তাদের অনেকে মেদিনীপুরকে একঘরে শিবে ফেলবার একটা চেষ্টা যে করবে সেটা অবিশ্বাস্য নয়। তদানীন্তন বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী—মৌলবী ফজলুল হক ও শ্যামাপ্রসাদ মেদিনীপুরের ব্যাপারে নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ বাংলার সিভিলিয়ান-চক্রান্ত থেকে মেদিনীপুরকে বাঁচাতে অক্ষম হয়েই পদত্যাগ করেন। ফজলুল হক মেদিনীপুরের সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করবেন আশ্বাস দিয়েছিলেন কিন্তু নাজিমুদ্দিন-সুরাবর্দির চক্রান্তে তিনিও বাংলার লাট কর্তৃক মন্ত্রীত্ব থেকে বিতাড়িত হন। বসু-দলের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু প্রভৃতি নিজেরা মেদিনীপুরে সরকারী অত্যাচারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন—কিন্তু তাঁরা সে অত্যাচারের কোনো প্রতিবিধান করেন নাই—টুকরোটাকরা ভাবে কোনো অভিযানের প্রতীকার করবার মত আশ্বাস দিলেও আসলে সিভিলিয়ান ও আই-বি'র কর্তাদের হাতে তাঁরো ছেলেরই মত ছিলেন। সুরাবর্দি সাহেব নিজে মেদিনীপুরের লোক। এটা একান্ত পরিতাপের বিষয় যে নির্যাতিত মানবাত্মার বেদনায় তিনি এতটুকু ভ্রূক্ষেপ করেছেন বলে কেউ জানে না। পরাধীনতার থেকে মুক্তিলাভের যে, প্রচেষ্টা, তা সে হিন্দুই করুক, আর মুসলমানেই করুক, কি খ্রীষ্টানেই করুক, স্বাধীনতাকামী প্রত্যেকটি মানুষই তার প্রতি সহানুভূতি না দেখিয়ে পারে না।

জনমতের চাপে গভর্ণমেণ্ট মেদিনীপুরে বহু পরে যে সাহায্য দিতে সুরু করেন সে-সাহায্যের রূপও চমৎকার। শ্যামাপ্রসাদের ভাষায়—

> "গভর্ণমেণ্ট দিনে সাহায্য দান এবং রাত্রিতে ঘরে চড়াও হইয়া এই অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই উন্মত্ত ও জঘন্য ব্যাপার অনেকদিন চলিয়াছে। অনেক তারিখই আমি অভিযোগ করিতেছি যে, সুপরিকল্পিত-ভাবে ঘূর্ণীবাত্যার আগে ঘরবাড়ী লুঠ ও পোড়ানো হইয়াছে; আমি বলিতে লজ্জাবোধ করিতেছি যে, ঘূর্ণীবাত্যার পরেও গভর্ণমেণ্টের নিষেধ সত্ত্বেও এই ব্যাপার চলিয়াছে।"

শ্যামাপ্রসাদ পদত্যাগ করে' ও ফজলুল হক বিতাড়িত হয়ে নিজেদের বিবেকের কাছে রেহাই পেলেন কিন্তু ক্ষমতার লোভে যাঁরা রয়ে গিছলেন তাঁদের কি জবাবদিহি আছে?

মিঃ কেসীর সিভিলিয়ানী সরকার বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদকের মেদিনীপুরের বিবৃতির একটা প্রতিবাদ করেছেন। আমরা দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি এই প্রতিবাদের ভাষা ও ভাব এত পশু যে, এই প্রতিবাদই দেশের

লোককে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে যিনি এই প্রতিবাদটি রচনা করেছেন তিনি নিজেই তা সমর্থন করেন না। যে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই পুলিশের লোক দিয়েই অনুসন্ধান! কি চমৎকার যুক্তি আর কি চমৎকার মাত্রাজ্ঞান?

মিঃ কেসী ও তাঁর সিভিলিয়ান পরামর্শদাতাদের একটা কথা বোঝা দরকার। দেশের লোক জানে যে, তারা যখন বিদেশীদের অধীনতার থেকে মুক্তি পাবার জন্য লড়াই করে তখন বিদেশী শাসকশ্রেণী তাকে দমন করতে চেষ্টা করবে এবং সে চেষ্টা এদেশী বেতনভুক লোক দিয়েই তারা করবে। কিন্তু সে চেষ্টা যদি সভ্যসমাজের প্রচলিত আচার ব্যবহারের রীতি বহির্ভূত হয় তাহলেই সেটা অত্যন্ত কলংকের ব্যাপার হয়। মেদিনীপুরে, বালিয়াড়ি, অন্তি-চিমুরে স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের যে চেষ্টা আমাদের বিদেশী শাসকেরা করেছেন সেটা অনেক স্থলেই সভ্যসমাজের রীতি অনুমোদিত নয়। এর জন্য লোকে কোনো অনুসন্ধান কমিটী চায় না—ও রকম কিছু চাওয়াতে আমাদের আত্মসম্মানজ্ঞানে বাধে। নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালানো—তা এদেশে নতুন কিছু নয় এদেশে জনতার হাতে কবে আবার রাইফেল বা হাত গ্রেনেড থাকে? বড় জোর দুই একটা রাস্তার ইটপাটকেল লেবুকাটায় যোগাড় হয়। সুতরাং ওসব অনুসন্ধান কমিটী দাবী করাটা বাজে কথা। কিন্তু একটা কথা মিঃ কেসীকে হৃদয়ঙ্গম করতে অনুরোধ করছি—এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চারিদিকের সিভিলিয়ানদের ও তাঁদের পাইক বরকন্দাজদেরও হৃদয়ঙ্গম করতে বলছি। সেটা হচ্ছে এই। ৭৩ বছরের বৃদ্ধা মহিলাকর্মী তাঁর ঘর থেকে, সংসার থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতার ঝাণ্ডা হাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে এগিয়ে চলেছে—ঝাঁকে ঝাঁকে রাইফেলের গুলি তাদের ওপর পড়ছে—ভ্রূক্ষেপ নেই, তারা এগিয়ে চলেছে। বৃদ্ধার হাতে একটি ত্রিবর্ণ পতাকা—যে পতাকার মধ্যে আছে দেশের প্রত্যেকটি লোককে তার দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য জুগিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি। জনতা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। কণ্ঠে তাদের একমাত্র বাণী "ভারত ছাড়"!

উত্তরে সুরু হোলো সরকার পক্ষ থেকে গুলীবর্ষণ। কিন্তু পর পর দুটি গুলীর আঘাতেও বৃদ্ধা থামলেন না। তৃতীয় একটি গুলী তারপর তাঁর বক্ষপঞ্জর ভেদ করে চলে গেল। অবসান হোলো তাঁর জীবনের, কিন্তু তাঁর অভিযানের নয়। তাঁর পতাকা অন্য আর একজন তুলে নিয়ে নিরস্ত্র, অহিংস জনতাকে পরিচালিত করে চলল। গুলীবৃষ্টির মধ্যে একটি একটি করে কত অমূল্য প্রাণ নিস্পন্দ হয়ে গেল, কিন্তু তাদের অভিযান ব্যর্থ হয় নি। মেদিনীপুরের একটা বড় অংশে স্বাধীনতার পতাকা তারা উড্ডীন করতে পেরেছিল।

আজাদ হিন্দ ফৌজ আন্দোলন—আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র সুদূর প্রাচ্যে যে সাময়িক ভারত গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করেছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ সাময়িক গভর্ণমেণ্ট স্থাপনার দৃষ্টান্ত মোটেই দুর্লভ নয়। এই সাময়িক গভর্ণমেণ্টের হয়ে যাঁরা তাঁদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন তাঁদের কয়েকজনের বিরুদ্ধে ভারতের ব্রিটিশ সরকার সমগ্র জনমতের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও সামরিক আইন অনুসারে বিচার সুরু করেছেন। প্রকাশ প্রধান সেনাপতি লর্ড অকিন্‌লেক্ এবং বড়লাট লর্ড ওয়েভেলের অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই সব বিচার হচ্ছে। আই-সি-এসদের প্রভাব এড়িয়ে ওঠার সাধ্য কি বড়লাট এবং প্রধান সেনাপতির নেই?

পরাধীনতার বিরুদ্ধে যাঁরা সংগ্রাম করতে নামেন বিজেতা ক্ষাত্রশক্তি তাঁদের কোনদিনই সুদৃষ্টিতে দেখতে পারে না। স্বাধীনতার সংগ্রামে যাঁরা এগিয়ে যান তাঁরা এসব কথা জেনেই এগিয়ে যান। আজাদ হিন্দ ফৌজে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা জানতেন যে যদি তাঁরা জয়লাভ করতে না পারেন তাহলে তাঁদের অদৃষ্টে লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে অভিনন্দিত করতে সমগ্র ভারতবর্ষ যে-ভাবে দাঁড়িয়েছে সেটার মূল কারণ খুঁজতে আমাদের বেশি দূর যেতে হবে না। কংগ্রেসের যে 'QUIT INDIA'—'ভারত ছাড়' বাণী জাতির মর্মতল হতে উৎসারিত হয়েছে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সেই বাণীরই মূর্ত প্রতীক এবং সেজন্যই সমগ্র ভারতবাসী আজাদ হিন্দ্ ফৌজের পেছনে এমন করে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি কলিকাতার অধিবেশনে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীরত্ব, ত্যাগ ও একতা-

বোধের প্রশংসা করে বলেছেন যে এর মানে এই নয় যে, কংগ্রেস স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায় পরিত্যাগ করেছে। সর্দার প্যাটেল দেশপ্রিয় পার্কের বক্তৃতায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, তাঁদের তিনি কংগ্রেসের পতাকাতলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক রূপে দেখতে চান। আজাদ হিন্দ্ ফৌজও দেখেছে যে, অন্ত বিদেশীয় জাতির সাহায্য নিয়ে স্বাধীনতা লাভ করার পথে বহু প্রতিবন্ধক আছে। জাপান আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে যখন তার হাতের ক্রীড়নক রূপে ব্যবহার করতে সমর্থ হল না, তখনই তাদের প্রয়োজনমতো সাহায্য দিতে পরাঙ্মুখ হয়েছে।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করবার আছে। কোথাও কোথাও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের আন্দোলনকে একটা বিভ্রান্তিকর পথে পরিচালিত করবার চেষ্টা লক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশে 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' নাম দিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হচ্ছে। কংগ্রেসের বাইরে স্বতন্ত্রভাবে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

কংগ্রেস ও দলীয় স্বার্থ—বাঙলাদেশে আমরা দেখেছি যে, দলের স্বার্থ রাখতে গিয়ে প্রত্যেক দলই কংগ্রেসের প্রভূত ক্ষতি করেছে। কংগ্রেসের নামের সুবিধা নিয়ে নিজের নিজের দল পুষ্টি করা বাঙলাদেশে বহু বার হয়ে গেছে। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি যেমন একমুখে কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে অপর মুখে কংগ্রেসের প্রত্যেকটি নেতা ও তাদের কার্যকলাপের নিন্দা করে' আসলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করে' থাকে, বাঙলার তথাকথিত কংগ্রেসীরা তেমনি 'কংগ্রেসী নেতারা বাঙালা বিদ্বেষী,' 'তাঁরা বাঙালীকে দেখতে পারেন না' এই সব অত্যন্ত নীচ ও সংকীর্ণ প্রচারকার্য করতে কুণ্ঠিত হন নাই। এতে কংগ্রেসের কোনো ক্ষতি হয় নাই কিন্তু বাংলার নাম অনপনেয় কলংক কালিমায় লিপ্ত হয়েছে। ঠিক এই ধরণের প্রচারকার্য আবার সুরু হয়েছে। গান্ধী-জহরলাল প্রভৃতি সুভাষচন্দ্রের বিষয়ে কবে কি বলেছিলেন সে-সব কথা আজ আবার বাংলার ছেলেদের সামনে প্রচার করা সুরু হয়েছে। বাংলার কংগ্রেসী নেতৃত্বকে আমল না দেবার একটা চেষ্টা কিছুদিন থেকে সুরু হয়েছে। বাংলার কংগ্রেস কর্মীদের এখনই এবিষয়ে অবহিত হতে অনুরোধ করছি।

কংগ্রেস নির্বাচনী ইস্তাহার—কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচন চলছে। প্রাদেশিক পরিষদের জন্যও নির্বাচন আসন্ন। এবারকার নির্বাচনের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে এইজন্য যে, ভারতের জনসাধারণের কত অংশ অখণ্ড ভারতের পক্ষপাতী তার একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। নির্বাচন উপলক্ষে সব দলই নিজ নিজ মত অনুযায়ী ইস্তাহার প্রকাশ করেছেন। কংগ্রেস একরাষ্ট্র ভারতের সমর্থক। কারণ কংগ্রেসের বিশ্বাস এই যে, রাষ্ট্রিকভাবে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করা ভারতের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল নয়। অথচ এদেশে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের বাস, তারা অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পরের সঙ্গে মিলিতে পারে না, বা চায় না। এত বিরোধী উপাদান জুড়ে এক রাষ্ট্র সৃষ্টি করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ সন্দেহ নেই। কংগ্রেস কি ভাবে এ কাজ করতে চায়—নির্বাচনের প্রাক্কালে জনসাধারণকে সে কথা বুঝিয়ে বলা কর্তব্য। আমরা দেখে খুশী হলাম যে, কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে ভারতের কঠিন রাষ্ট্রিক সমস্যার একটা সর্বজনগ্রাহ্য, সন্তোষজনক সমাধান দেওয়া হয়েছে। এই ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে, স্বাধীন ভারতে যুক্ত-রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে, কিন্তু সে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের কোন অংশকেই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে আটকে রাখা হবে না। নীতি হিসাবে এটা অবশ্য একেবারে নতুন নয়। কংগ্রেস একথা এর পূর্বেও বহুবার বলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকবার ইচ্ছা দেশের কোন কোন অংশে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সুতরাং ভারত যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র এমন হওয়া দরকার যে, কোন ভারতীয়ই এই রাষ্ট্রের বাইরে থাকার আবশ্যকতা না বোধ করে। এই উদ্দেশে বর্তমান ইস্তাহারে কংগ্রেস পক্ষ থেকে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য বারো দফা মৌলিক অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি এই ঘোষণা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র রচিত হলে সেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন ভারতীয়েরই আর কোন অভিযোগের কারণ থাকবে না। কংগ্রেসের ঘোষিত মৌলিক নাগরিক অধিকারগুলি এইরূপ :—

১। ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে মতামত

প্রকাশ ও সভাসমিতি করার অধিকার আছে—সভায় অবশ্য সশস্ত্রভাবে জমায়েত হওয়া চলবে না, এবং আইন ও নীতির বিরোধী কিছু করা চলবে না।

প্রত্যেক নাগরিক জনসাধারণের শান্তি ও নীতির বিধান লঙ্ঘন না করে নিজস্ব বিবেকবুদ্ধি অনুসারে নিজের ধর্ম আচরণ করতে পারবেন।

৩। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতি, ভাষা ও লিপি রক্ষা করা হবে।

৪। আইনের দৃষ্টিতে নর, নারী, ধর্ম, জাতি ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল নাগরিকই সমান।

৫। ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতি নির্বিশেষে সকল নরনারীর সরকারি চাকুরি, সম্মান, বৃত্তি ও ব্যবসায়ে সমান অধিকার থাকবে।

৬। সরকার কর্তৃক নির্মিত বা ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক জনসাধারণের সেবায় উৎসর্গীকৃত সমস্ত জলাশয়, কূপ রাজপথ, বিশ্রামগৃহ ও অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে সকলের অধিকার থাকবে।

আইনসম্মতভাবে সকল নাগরিকেরই অস্ত্র রাখার অধিকার থাকবে।

৮। বে-আইনীভাবে কাউকে আটক করা, বা তার বাসগৃহে প্রবেশ করা ও জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করাও চলবে না।

৯। ধর্মগত ব্যাপারে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকবে।

১০। সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে।

১১। রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের নিখরচায় আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে।

১২। প্রত্যেক নাগরিক ভারতের যে কোন অংশে ভ্রমণ করতে, বাস করতে এবং ইচ্ছামত বৃত্তি বা ব্যবসায় গ্রহণ করতে পারবেন, আইনের চোখে তিনি তত্রত্য অধিবাসীদের সঙ্গে সমান বিবেচিত হবেন এবং তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের থাকবে।

বড়লাটের বক্তৃতা—গত ১০ই ডিসেম্বর কলকাতায় এ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার অফ কমার্সের এক সভায় ভারতের বড়লাট সাহেব এক বক্তৃতায় ভারতবাসীকে কিছু সদুপদেশ শুনিয়েছেন। বক্তৃতায় তিনি অনেকগুলি ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে একটি বিষয়ে এদেশের লোকের বিশেষ আগ্রহ হওয়ার কথা। বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিদের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে অত্যন্ত সরলভাবে বলেছেন যে তিনি, বিলাতের গবর্ণমেণ্ট এবং তত্রত্য জনসাধারণ আন্তরিকভাবেই চান যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে এদেশে কতকগুলি সমস্যা আছে এবং সে সমস্যাগুলো খুব সহজও নয়। 'ওপন্ সিসেম' বলে আলিবাবার গুপ্তধনের গুহার দরজা খুলে যেত বটে, কিন্তু 'কুইট ইণ্ডিয়া' সেই রকম মন্ত্রের কাজ করবে, এটা মনে ভাবা খুব ভুল হচ্ছে। ওদব অবথা কথা না বলে এদেশে যে সব দল আছে, কোন না কোন উপায়ে তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টার দিকে নজর দেওয়াই ভাল, ইত্যাদি।—ঐক্যের দিকে নজর দেওয়া মন্দ, একথা আমরা কেউ কখনো বলি নে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের মনে হচ্ছে ওয়েভেল্ সাহেব কংগ্রেসের ভুল দেখিয়ে দেবার আগ্রহের আতিশয্যে নিজে একটা মস্ত ভুল করেছেন, যা করা তাঁর উচিত ছিল না এই কারণে যে তিনি বড়লাট সাহেবের যথাযথ করছেন না, করেছিলেন সেনাপতিত্ব, এবং সেই আমলে এমনিতর ভুলের ফল তাঁকে এক সময় ভুগতে হয়েছিল। তিনি সাহেব মানুষ, মন্ত্রে শ্রদ্ধা না থাকলে কেউ তাঁকে দোষ দেবে না। কিন্তু তিনি রাজনীতিকও বটে; মন্ত্রের যদি কোন রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকে সেটা না বুঝতে পারলে তাঁর নিজের অপ্রশংসা এবং অসুবিধা দুই-ই ঘটবার কারণ আছে। তাঁর বক্তব্যের সারার্থ হচ্ছে এই যে মন্ত্রের গুণে ইংরেজ ভারত ছাড়বে না। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে ইংরেজ খুব অল্পদিন আগেও হংকং ছেড়েছিল, সিঙ্গাপুর, মালয়, ব্রহ্মদেশ, আন্দামান ছেড়েছিল। ছেড়েছিল কারো কোন মন্ত্রের জোরে তা কেউ বলছি না। কিন্তু ব্রহ্মদেশের লাটসাহেব সার রেজিনাল্ড ডরমান স্মিথ ব্রহ্মত্যাগের পর বিলাতে গিয়ে প্রথম যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে ইংরাজ সৈন্যদের ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করতে হয়েছে তার প্রধান কারণ এই যে সে দেশের অধিবাসীরা ইংরাজকে চায় নি।

ওয়েভ্‌ল্‌ সাহেব তখন সেনাপতি ছিলেন; একথার সত্যতা তাঁর আরোও ভাল করে জানা থাকার সম্ভাবনা। কিন্তু মানুষ অনেক জিনিস জেনেও ভুলে যায়। তা ছাড়া আণবিক বোমার সুবিধা যারা পেয়েছে, তারা বহুদিনের বহুকষ্টে অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অত্যন্ত অবিশ্বাস্যরকম অল্প সময়ের মধ্যে ভুলে গেছে। সুতরাং বড়লাট সাহেবকে আমরা স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার মনে করি যে, কোন দেশের অধিকাংশ লোক সমবেত ভাবে যখন কোন বিদেশীকে বলে, "কুইট", "চলে যাও", তখন সেটাকে মন্ত্র বলে বিদ্রূপ না করে, একটা মারাত্মক যন্ত্র বলে সমীহ করতে সুরু করা ভাল। একদিন যে অবস্থায় ইংরাজকে পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলি ছাড়তে হয়েছিল, সে অবস্থা আর কখনো ফিরে আসতে পারে না, এমন মনে ভেবে রাখা নির্বুদ্ধিতা। আণবিক বোমার চেয়েও মারাত্মক অস্ত্র তৈয়ার হতে পারে। এবং এটা যেমন ইংরাজের হাতে হয় নি, সেটাও তেমনি অন্য কারো হাতে হতে পারে। বাইরের অন্য কোন জাতির আদেশে ইংরাজকে যদি 'ভারত ছাড়তে' হয় তাতে ইংরাজের সম্মান নেই, এবং সে অবস্থাটা নিশ্চয়ই ভারত তথা অন্যান্য বহু দেশের পক্ষেও শান্তিপ্রদ হবে না। সুতরাং কংগ্রেসের বক্তব্য হচ্ছে এই যে আজ যদি ইংরাজ শান্তিতে ভারত ছেড়ে যায় তবে তার ফলে সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। এবং বিনা অস্ত্রে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলে ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে যে মৈত্রী গড়ে উঠবে তার জোরে পররাজ্যলিপ্সু কোন জাতই মাথা তুলতে পারবে না। পৃথিবীর ইতিহাসের সেই নূতন ভূমিকা রচনা করবার মহৎ সম্মান আজও ইংরাজের প্রাপ্য হতে পারে যদি সে একে গ্রহণ করতে চায়। পৃথিবীতে শান্তিস্থাপন করতে হলে ইংরাজকে যা' যা' করতে হবে তার মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ হচ্ছে অবিলম্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করে এদেশের জাতীয় সরকারের হাতে শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করে নিরুপদ্রবে ভারত ছেড়ে চলে যাওয়া। এটা সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে অদ্ভুত প্রস্তাব মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই। কিন্তু পররাজ্য শোষণের লোভে মনুষ্যত্বই যাদের আচ্ছন্ন হয়ে যায় নি এমন সব বিদেশীরাই এই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ সম্ভব ও সঙ্গত বলে স্বীকার করেছেন। সুতরাং বড়লাট ওয়েভ্‌ল্‌ সাহেবের এতে হাসি পাওয়ার কোন কারণ নেই।

কিন্তু এতগুলি বিভিন্ন দল ও মতবাদ যে আছে—এদের সম্বন্ধে কি করা যাবে? সমস্যাটা সহজ নয় একথা মানতেই হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বলতে চাই যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখপাত্ররা এই সমস্যা সম্পর্কে যে মনোভাব অবলম্বন করেছেন, তার মধ্যেও কোন যুক্তি বা শুভবুদ্ধির প্রেরণা নেই। তাঁদের মনের কথাটি ঠিক কি তা নিয়ে এখানে আমাদের গবেষণা করার কোন দরকার নেই। আমরা ধরে নিচ্ছি যে মুখে তাঁরা যা বলছেন সেইটাই তাঁদের মনের কথা। লক্ষ্য করা দরকার যে এই মুখের কথায় যে মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে সেটা পাড়াগাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তারের রোগনির্ণয়ের মত—তার মধ্যে যুক্তি একটুও নেই এবং বুদ্ধি আছে আরো কম। এঁরা সোজাসুজি ধরে নিচ্ছেন যে, মিলের অভাবটাই যেহেতু সমস্যা, মিলন ঘটালেই সমস্যার সমাধান। কংগ্রেস বার বার এটা দেখিয়ে দিচ্ছে যে অমিলটা আসল সমস্যা নয়, এটা হচ্ছে রোগের একটা লক্ষণ মাত্র। আসল সমস্যা হচ্ছে অন্নবস্ত্রের অভাব। এবং যতদিন দেশের জনসাধারণ নিজের হাতে শাসনকর্তৃত্ব না পাচ্ছে, ততদিন এ অভাব থেকে যাবে। আসল সমস্যার সমাধান হচ্ছে না বলেই লোকের নানারকম চিত্তবিভ্রম ঘটছে এবং নানা মতবাদের ও দলের উদ্ভব হচ্ছে। ইংরাজ ভারত ছাড়লেই এই সব বিদ্বেষ, বিভ্রান্তি ক্রমে ক্রমে চলে যাবে। এই সত্য কথাটা স্বীকার করতে না পারাতে ইংরাজ সরকারের মুখপাত্রদের শুভবুদ্ধি এতটুকুও প্রকাশ পাচ্ছে না। যুক্তির দিক থেকেও বড়লাট সাহেবের কথা অত্যন্ত ছেলেমানুষের মত শোনায়। তিনি বলছেন, "I repeat that it is our earnest wish and endeavour to give India freedom, but we cannot and will not abandon our responcibilities without bringing about some reasonable settlement." "আমি পুনরায় বলছি,ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়াই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা ও উদ্যম, কিন্তু একটা যুক্তিসঙ্গত বন্দোবস্ত ঘটানোর আগে আমরা আমাদের দায়িত্ব ত্যাগ করতে পারি না এবং করব না।"—কথাটা এই একই ভাবে বলতে বলতে

ইংরাজ রাজনীতিকদের মুখস্থ হয়ে গেছে, এবং শুনতে শুনতে আমরাও এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, কেউ কোথাও দাঁড়িয়ে মুখ খুলেছেন দেখলেই আমরা ধরে নিতে পারি তিনি কি বলছেন। কিন্তু অনন্তকাল ধরে পুনরুক্তি করলেও মিথ্যাটা মিথ্যাই থেকে যায়, এবং পুনরুক্তি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে করলেও মিথ্যাটা সত্য হয়ে ওঠে না, বরং অন্তরটাই মিথ্যাময় হয়ে ওঠে। ইংরাজ রাজনীতিকদের ঠিক এই ব্যাপারই ঘটেছে। তাই তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না যে, তাঁদের এই তোতাপাখীর মত অভ্যস্ত ঘোষণায় ভারতকে স্বাধীনতা দেবার ইচ্ছার কোন আভাষ নেই, এবং কাজ কর্মে সেই সম্পর্কিত 'উদ্যমের' একান্ত অভাব আছে। বাধ্য না হলে তাঁরা দায়িত্ব ত্যাগ করবেন না, এই কথাটা যদি বড় লাটসাহেব বলতেন তা হলে আমরা মেনে নিতাম যে তিনি একটা আন্তরিক কথা বলেছেন। 'যুক্তিসঙ্গত বন্দোবস্ত' বলতে যদি সেই মানে হয়, তা হলে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু প্রকাশ্যতঃ যে মানেটা ওয়েভেল্ সাহেব আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন সেটা মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয়। খুব সোজা কথা এই যে, ভারত শাসনের দায়িত্ব ইংরাজ সরকারের হাতে যতই বেশী দিন থেকে যাচ্ছে ততই বেশীসংখ্যক দলের উদ্ভব হচ্ছে—এটা প্রত্যক্ষ ঘটনা। ইংরাজের হাতে দায়িত্ব যদি আরো বেশী দিন থাকে তবে আরো দলাদলি বাড়বে, এটাও সমানই স্পষ্ট। ইংরাজের হাতে দায়িত্ব থাকার ফলে হঠাৎ এক সুপ্রভাতে ভারতবর্ষে দলাদলি মিটে যাবে, যাদুমন্ত্রে না বিশ্বাস করলে আর এ মতবাদে আস্থা স্থাপন করা চলে না। অথচ বড় লাটসাহেব লোকের মনে এমনি আস্থা সৃষ্টি করতে চাইছেন দেখে স্বভাবতঃই মনে হচ্ছে যে, যাদুমন্ত্রে আসলে বিশ্বাস তাঁরই হয়েছে। যদিও কংগ্রেসের ওপরে এমনি বিশ্বাস আছে কল্পনা করে কংগ্রেসকে তিনি বিদ্রূপ করতে ছাড়েন নি। অথবা এমনও হতে পারে যে, সম্ভবতঃ কোন কারণে তাঁর বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, মারণ-যজ্ঞের মত উচাটন মন্ত্রেও ভারতবাসীর আর কোন অধিকার নেই। ওই সবেতেই এখন একমাত্র অধিকার ইংরাজের!

শ্রীযুক্তা নাইডুর ভাষণ—গত ২৬শে অগ্রহায়ণ শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কংগ্রেস মহিলা কর্মীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মহিলা সভায় শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু যে বক্তৃতা করেন তাতে তিনি সকলকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য গঠন-মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে বলেন। গঠন-মূলক কাজকে শুধু চরকা তাঁত এই সংকীর্ণ অর্থে বুঝলে চলবে না। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের আধিক, সামাজিক ও আত্মিক প্রয়োজন মেটানোই প্রকৃত গঠনমূলক কাজ। এই উদ্দেশ্যে জন-সাধারণকে শিক্ষাদান, তাদের আত্মনির্ভরশীল ও আত্মরক্ষণশীল করে তোলা দরকার।

শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনীও তাঁর বক্তৃতায় সকলকে কংগ্রেসের নির্দ্ধারিত গঠনমূলক কার্যের ওপর জোর দিতে বলেন।

আগষ্ট বিপ্লবে নারীর স্থান—গত আগষ্ট বিপ্লবে ভারতের নারী-সমাজ একটা বিশিষ্ট ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার দরুণ তাঁদের বহু নির্যাতন ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি আগষ্ট বিপ্লবের ইতিহাস সঙ্কলন করার জন্য বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলা থেকে মাল-মসলা সংগ্রহ করছেন। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির মহিলা সাব-কমিটির নির্দেশ অনুসারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির মহিলা সাব-কমিটির সেক্রেটারী শ্রীযুক্তা কমলা দাশগুপ্ত বিভিন্ন জেলা-কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারীদের নিকট নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ চেয়ে পাঠিয়েছেন। আমরা আশা করি এ সমস্ত সংবাদ সংগ্রহের ব্যাপারে সকলেই কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করবেন:

১। যে সমস্ত মহিলা আগষ্ট বিপ্লবে প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের নাম। (ঘটনার পূর্ণ বিবরণসহ।)

২। ১৯৪২ সালের আন্দোলনে জেলায় যত জন মহিলা গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা।

৩। কতকাল তাঁরা কারাদণ্ড ভোগ করেছেন।

৪। যে সব মহিলা বিনা বিচারে আটক ছিলেন এবং রাজনৈতিক অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা।

৫। মেয়েদের ওপর নির্যাতনের বিবরণ:—(ক)

ধর্ষণ, (খ) প্রহার, (গ) অন্যান্য শারীরিক নির্যাতন; (ঘ) অন্যান্য প্রকারের অত্যাচার; (ঙ) বেআইনীভাবে আটক।

৬। ধনসম্পত্তির ক্ষতি।

৭। হাজতে বা পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন মেয়েদের উপর ব্যবহার।

৮। জেলে মেয়েদের উপর ব্যবহার।

৯। যে সব ক্ষেত্রে শিশু ও বালকদের ওপর নির্যাতন হয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণ।

১০। আন্দোলনের সময় মেয়েরা যে সমস্ত কাজ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—(ক) প্রকাশ্য সত্যাগ্রহ, (খ) সংগঠন সম্পর্কিত কাজ, (গ) পরিচালিকা ও নেত্রী হিসেবে। (ঘ) অন্য কোনভাবে। ১১। যে সব ক্ষেত্রে মেয়েরা বিশেষ দক্ষতা ও সাহস দেখিয়েছেন তার পূর্ণ বিবরণ।

১২। অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবরণ।

কংগ্রেস মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা দল—নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির মহিলা সাবকমিটি প্রতি প্রদেশে ও জেলায় কংগ্রেস মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা দল গঠনের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে অতীতে কংগ্রেস মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকারা বিশেষ প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয় অংশ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা যে পর্যাপ্ত নয় তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া স্বেচ্ছাসেবিকাদের আরও সুসংঘটিত করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে কংগ্রেস যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য। স্বেচ্ছাসেবিকাদের শুধু ড্রিল প্যারেড করতে শিখলেই চলবে না—বরং ড্রিল প্যারেড বাধ্যকরী নহে; অবশ্য নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই আছে। প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবিকাকে কংগ্রেসের সভ্য হতে হবে এবং তাদের খদ্দর পরিধান করা বাঞ্ছনীয়। সর্বোপরি প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবিকাকে কংগ্রেসের কোন না কোন গঠনমূলক কাজের সাথে যুক্ত হতে হবে। কুটির শিল্প, নৈশবিদ্যালয়, চরকা ক্লাস, বুলেটিন প্রচার কার্য, হিন্দি শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় স্বেচ্ছাসেবিকাদের কার্যতালিকার মধ্যে থাকা প্রয়োজন।

স্বেচ্ছাসেবকদের কর্তব্য—বোম্বাই এ. আই. সি. সি. অধিবেশন থেকে প্রত্যাগত বন্ধুদের সকলেই একবাক্যে সেখানকার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়মানুবর্তিতার প্রশংসা করেছেন। আমরা বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করতে পারলে অত্যন্ত আনন্দিত হতেম। কলকাতায় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও অন্যান্য সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের আগমনে চারদিকে যে-সব সভাসমিতি হয়েছে তাতে স্বেচ্ছাসেবকদের অনেকেই নিয়ম মেনে চলাটাকেই যেন যে-নিয়ম বলে মনে করেছেন। তাঁদের ব্যবহারে মনে হয়েছে যে তাঁরা সাধারণের চাইতে একটু বেশ ভাল করে নেতৃবৃন্দকে দেখতে পাবেন ও তাঁদের কথা শুনতে পাবেন এজন্যই যেন তাঁরা স্বেচ্ছাসেবক হতে গেছেন। এর ফলে অধিকাংশ স্থানেই দেখা গেছে যে সভা যখন সুরু হয়েছে তখন জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকেরা সেখানে নেই। যে দায়িত্বের ভার তাঁদের দেওয়া হয়েছে সে দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে বহন করবার চেষ্টা করাই সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। একথা অবশ্য খুবই সত্যি যে বহু স্বেচ্ছাসেবকই তাঁদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে বহন করেন কিন্তু একটি দুষ্ট গরু যেমন সম্পূর্ণ গোয়ালকে কলঙ্কিত করে তেমনি একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বেচ্ছাসেবক বা স্বেচ্ছাসেবিকা সমগ্র বাহিনীর বদনামের জন্য দায়ী হয়। যাঁরা নিজেদের উপর ন্যস্ত ভার সুষ্ঠু ভাবে বহন করতে পারবেন না তাঁরা যেন স্বেচ্ছাসেবক হতে এগিয়ে গিয়ে সমগ্র বাহিনীকে দুর্নামের ভাগী না করেন।

এ সম্পর্কে আর একটি বিষয়ও উল্লেখ করা প্রয়োজন। আজকের দিনে কংগ্রেসের ডাকে বহু লোকই স্বেচ্ছাসেবক হবার জন্য এগিয়ে আছে। উপযুক্ত কাজ ও সংঘটনের অভাবে এদের মধ্যে নিরুৎসাহ আসতে পারে। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের নিবেদন, তাঁরা যেন এ সমস্ত স্বেচ্ছাসেবককে সঙ্ঘবদ্ধ করে ফলপ্রসূ কাজে নিযুক্ত করেন।

কম্যুনিষ্ট পার্টি ও কংগ্রেস—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির আটজন কম্যুনিষ্ট সদস্যের নিকট যে চার্জশিট প্রেরণ করেন, তার মর্ম এইরূপ—"নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য হিসাবে

যে আপনারা এ, আই, সি, সি কর্তৃক নির্দ্ধারিত নীতি ও কার্য তালিকা নিষ্ঠা সহকারে মেনে চলতে বাধ্য ছিলেন, কার্যতঃ আপনারা ১৯৪২ সালের জুন মাস থেকে সেই নীতি ও কার্যতালিকার বিরোধিতা করেন ; বিশেষতঃ ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে এ, আই, সি সি, যে নীতি ও কার্যতালিকা স্থির করেছিলেন আপনারা সক্রিয়ভাবে তাতে বাধা দেন।

"কংগ্রেস যখন ভারতের স্বাধীনতা স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত ও জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জনসাধারণকে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিতে নিষেধ করেছিল সে সময় আপনারা সংবাদপত্র, পুস্তক ও প্রচার পুস্তিকার সাহায্যে, এবং সভাসমিতিতে ও অন্যান্য উপায়ে যুদ্ধপ্রচেষ্টার অনুকূলে অবিশ্রান্ত প্রচার কার্য চালিয়েছেন এবং এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন।"

এ, আই, সি, সির কম্যুনিষ্ট সদস্যেরা এই অভিযোগের যে উত্তর দিয়েছেন, তার সম্বন্ধে প্যাটেল, নেহরু ও পন্থকে নিয়ে যে বিশেষ সাব কমিটি গঠিত হয়, তা নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন : কম্যুনিষ্ট সদস্যরা যে উত্তর প্রেরণ করেছে মূলতঃ প্রচার কার্যই তার উদ্দেশ্য। যে সব সুস্পষ্ট অভিযোগ করা হয়েছিল তার জবাব দেবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই এবং কোথাও বিন্দুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করা হয় নাই। যে সব প্রমাণের ওপর নির্ভর করে অভিযোগ করা হয়েছিল, তাদের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা হয় নাই। কম্যুনিষ্ট সদস্যরা সব সময়ই তাদের আচরণ যুক্তিসঙ্গত হয়েছে এই বলতে চেয়েছে এবং কংগ্রেসের মূলনীতিকে আক্রমণ করেছে। তাদের কৈফিয়ৎকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কুৎসা বলা যায়। তাদের উত্তর আগাগোড়াই ধৃষ্টতাপূর্ণ। তাদের উত্তর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তারা অনেকদিন থেকেই সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসের নীতি ও কার্যতালিকার বিরুদ্ধাচরণ ক'রে আসছিল এবং প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের সম্মান ও মর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ হয় সেইভাবে এখনও তারা কাজ করে যাচ্ছে।

এ, আই, সি, সির কম্যুনিষ্ট সদস্যরা তাঁদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল তার কোনই সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নি। কংগ্রেসের নীতি ভুল ছিল, কি ঠিক ছিল, এ প্রশ্ন এখানে উঠছে না ; প্রশ্ন হচ্ছে কম্যুনিষ্টরা কংগ্রেসের নীতি ও কার্যতালিকার কার্যতঃ বিরোধিতা করেছে কিনা।

ওয়ার্কিং কমিটি এ, আই, সি, সি'র শ্রীযুক্ত সরদেশাই ভগত, চিংলে, আসফ, সজ্জাদ জাহির, মোহন সিং যশ, কার্যানন্দ শর্মা ও ভরদ্বাজ এই কয়জন কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যদের কংগ্রেস নিয়মানুবর্তিতা ভঙ্গ করবার অপরাধে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করেছেন। কংগ্রেসের সদস্য হয়ে কংগ্রেসের নিয়মানুবর্তিতা ভঙ্গ করা ও তার বিরোধিতা করা যে অত্যন্ত গর্হিত একথা কম্যুনিষ্ট পার্টির সুবিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বুঝতে না পারার কারণ বোঝা বিশেষ কষ্টকর নয়। যোশী সাহেবের বিবৃতি তাঁর নিজের পরেরখাঁদের মতে Penetrating Analysis হতে পারে কিন্তু "Flaming Indictment" যে নয় সেটা দলের পণ্ডিতরা না বুঝলেও যাদের এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান আছে তারা বুঝতে পারে। কংগ্রেসের শক্তি যে কত বিরাট তা তাঁরা খুব ভাল করে জানেন বলেই তাঁরা এতদিন পর্যন্ত একে আঁকড়ে ধরেছিলেন—ভেবেছিলেন যে রাষ্ট্রক্ষমতা যেদিন আসবে সেদিন কংগ্রেসে থাকার সুযোগ নিয়ে তাঁরা সেই ক্ষমতা দখল করতে পারবেন। কিন্তু আগষ্ট আন্দোলনে তাঁরা জাতীয় বিপ্লবকে অগ্রগমনে সহায়তা না করে তাকে এমনভাবে ব্যাহত করতে লেগেছিলেন যে তাতে মনে হোল যে তাঁরা কোনো বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির তরফ থেকে এদেশের জাতীয় বিপ্লবের বিরুদ্ধে 'পঞ্চম বাহিনী'র কাজ করছেন। এটা সুখের কথা যে কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসের ভিতর থেকে তার নিয়মানুবর্তিতা ভাঙ্গার বিভ্রান্তি বুঝতে পেরে কংগ্রেস থেকে সরে পড়েছেন। কিন্তু তাদের এই বিভ্রান্তি যদি আগষ্ট আন্দোলনের পূর্বেই ঘুচত তাহলে তাঁরা 'পঞ্চম বাহিনী'র অনপনেয় কলংক গায়ে মুখে মেখে এমন করে কম্যুনিষ্ট মতবাদকে লাঞ্ছিত করতেন না।

কেহ কেহ বলে থাকেন যে আগষ্ট আন্দোলনে দেখে যে বিপ্লবের অগ্নিশিখা রাষ্ট্রসঙ্ঘের পত্তন করেছিল কংগ্রেস তার অনুমোদন করে নাই সুতরাং বিরুদ্ধাচরণ করে' কম্যুনিষ্ট পার্টি অন্যায় কিছু করে নাই। এই যুক্তি যে যুক্তি নয়, 'ভাবের ঘরে লুকোচুরি খেলা' তা সহজেই বোঝা যায়। গান্ধিজী

থেকে সুরু করে কংগ্রেসের প্রত্যেকটি নেতাকে দিনের পর দিন প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে গালাগালি করেও তারা নিজেদের কংগ্রেসী বলে জাহির করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে কংগ্রেসের নীতির শুধু মৌলিক নয়, প্রকাশ্য ও কার্যতঃ বিরুদ্ধাচরণ করে যে কংগ্রেসে থাকা যায় না একথাটা ভারতীয় কম্যুনিষ্টরা যদি না বোঝেন তাহলে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে তাত্ত্বিক করা যায় না।

কংগ্রেসের ভেতরে থেকে তার নীতির ও কার্যপদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করা সুস্থ রাজনৈতিক বুদ্ধির অভিব্যক্তি নয়। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি যদি এই কথাটা গোড়াতেই বুঝতেন তাহলে তাঁরা সত্যিকারের ভাল কাজ করতেন। তাঁদের আচরণ এমন নোংরা হয়েছে যে আজ দেশের সাধারণ শ্রমিকেরা পর্যন্ত তাঁদের ব্রিটিশ রাজশক্তির গুপ্তচর বলে' মনে করে। যুদ্ধের সময় যখন কারখানাগুলির মালিকেরা লাখো লাখো টাকা রোজগার করেছে সেসময় তারা সেসব জায়গায় শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির জন্য কোনো আন্দোলন করতে দেন নাই এই বলে যে তা হলে তাতে যুদ্ধোদ্যমের ব্যাঘাত হবে। কোনো কারখানায় ধর্মঘট হলে বা ধর্মঘট করবার উদ্যোগ করলে তারা সেখানে দৌড়ে গেছেন যাতে ধর্মঘট না হয়। অথচ তাঁরা এই সব মিল মালিকদের ওপর এমন কোনো চাপও দেন নাই যাতে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি হয়। কিন্তু যুদ্ধ যখন মিটে গেছে, যখন কারখানাগুলির কাজ কমে আসছে, মালিকরা যখন কোনো একটা অছিলা খুঁজছে যাতে শ্রমিকদের ছাঁটাই করতে পারে, সেসময় তারা যেন মিল মালিকদের হাতে সেই অছিলা তুলিয়ে দেবার জন্যই শ্রমিকদের ধর্মঘট করবার জন্য উস্‌কিয়ে দিচ্ছেন! ট্রাম ধর্মঘটে তাঁরা এমনভাবে কাজ করেছেন যে, তার ফলে আজ ট্রাম শ্রমিকেরা সমস্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির ওপর খেপে রয়েছে! একটা অতিরিক্ত সুবিধার লোভ দেখিয়ে নেতৃত্ব বজায় রাখা কিছুদিনের মত চললেও বেশিদিন রাখা চলে না। যুদ্ধোত্তর কালে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি যেভাবে কাজ করছে তাতে যুদ্ধের সময় তারা যে-সাম্রাজ্যবাদীদের হয়ে কাজ করেছিল যুদ্ধোত্তর কালে তাদেরই বাহন মিল-মালিকদের হয়ে কাজ করছে বলে সাধারণে সন্দেহ করলে তাদের বিশেষ অপরাধ দেওয়া যায় না।

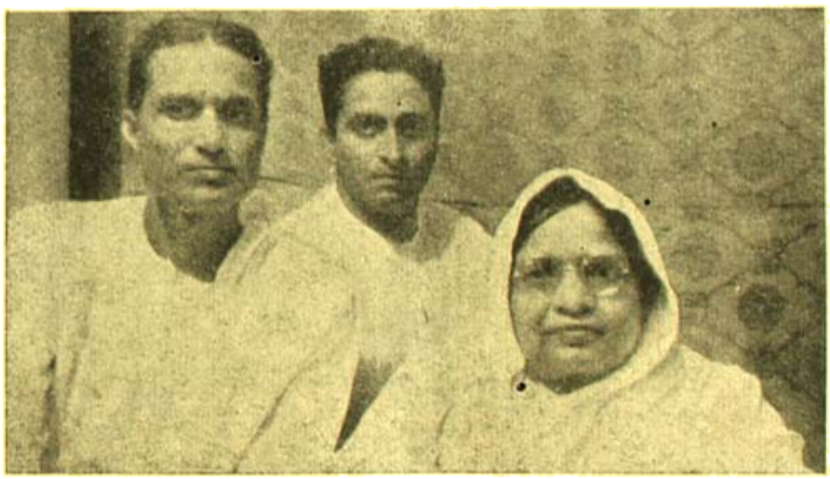

হাওড়া-শালিখার অধিবাসীবৃন্দ কর্তৃক বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রিয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন ঘোষকে সম্বর্ধনা উপলক্ষে গৃহীত চিত্র। চিত্রে সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন, সম্বর্ধনা সমিতির সভাপতি, হাওড়ার বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী শ্রীকমলাক্ষ চাটার্জি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রিয় সমিতির প্রাক্তন সভানেত্রী শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্তকে দেখা যাইতেছে। ৩রা নভেম্বর ১৯৪৬

৺শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅবনীনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'পরিচয়'র কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

ফরোয়ার্ড

পুনরায় প্রতি শুক্রবারে বাহির হইতেছে।

বার্ষিক মূল্য

ষান্মাসিক ৩৷৷০

প্রতি সংখ্যা ।০ আনা

ফরোয়ার্ড হাউস

৩২ আপার সার্কুলার রোড — কলিকাতা

সিলেট ইনডাষ্ট্রিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ

স্থাপিত—১৯২৮

টেলিগ্রাফ—ইনডাষ্ট্রিয়েল ফোন—সিলেট ১৭

কলিকাতা অফিস :—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট

টেলিগ্রাফ—সিডাষ্ট্রিয়েল ফোন—কলিঃ ৫৬০৭

অনুমোদিত মূলধন— ১০,০০,০০০৲

বিক্রীত মূলধন— ৫,৫০,০০০৲

আদায়ী মূলধন (অগ্রিম কল ও শেয়ার বাবদ প্রাপ্ত টাকা সহ) ৪,৩৫,০০০৲

কার্য্যকরী তহবিল ১,০০,০০,০০০৲ উর্দ্ধে

—অন্যান্য শাখা—

ঢাকা, ময়মনসিং, নারায়ণগঞ্জ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, গৌহাটী, শিলং, নওগা, শিলচর, করিমগঞ্জ, করিমগঞ্জ বাজার, মৌলবী বাজার, হবিগঞ্জ ও ছাতক।

সর্ব্ববিধ ব্যাঙ্কিং কাজ সুবিধাজনক সর্ত্তে করা হয়।

জে, এম, দাস—জেনারেল ম্যানেজার

জীবন বীমায়

বঙ্গে মিউচুয়্যাল

লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্

ভারতের

প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত—১৮৭১

দত্তিদার এণ্ড সন্স্

চীফ্ এজেন্টস্

২নং রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেস্, কলিকাতা।

ফোন: কলিকাতা ১০১৮

(চম বর্ষ- দশম সংখ্যা)

—অগ্নিহোত্র—

অষ্টম বর্ষ | ফাল্গুন—১৩৫২ | একাদশ সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY

অহিংসার পথ

শ্রীঅ:

"কৃধি মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ"—কোন লোককে ও এই বিশ্বকে হিংসা কোরো না—হে রুদ্র! উপনিষদের ঋষি সংহারের রুদ্রকে এই ভাবে প্রার্থনা জানাচ্ছেন। সেই রুদ্রের কাছেই তব কামনা করছেন—"স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।" —সেই রুদ্রই যেন আমাদিগকে শুভ-বুদ্ধিযুক্ত করেন।

এই হ'ল অতি প্রাচীন যুগের ঋষিদের প্রার্থনা। তখন মানুষ ছিল বর্বর, পরিবেষ্টন ছিল নিষ্ঠুর, প্রকৃতি ছিল রুদ্র, জীবনযাত্রা ছিল বিপদ সঙ্কুল। তখনও মানববুদ্ধি বাহ্য প্রকৃতির উপর নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি; তখন নির্মম হিংস্রতাই ছিল জীবন রক্ষার প্রধান উপায়; তখন মানব-প্রকৃতিতে জান্তব-বৃত্তিই ছিল প্রবল—তার কোমলবৃত্তি তখনও জাগেনি, তার কাব্য ও সৌন্দর্যজ্ঞান তখনও বিকশিত হয়নি। কিন্তু তবুও দূরদর্শী ঋষি কামনা করছেন—"স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।" —আমরা যেন শুভবুদ্ধি হই। আরও কামনা করছেন—"কৃধি মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ।" —মানুষকে বা বিশ্বকে হিংসা কোরো না।

তারপর বহু যুগ চলে গেছে। মানব আজ সভ্যতার ও সংস্কৃতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছে: তার জ্ঞানবিজ্ঞান প্রকৃতির আদিম শক্তির উপর জয়ী হয়েছে—জল-স্থল-মরুৎ আজ তার আয়ত্তে এসেছে। আর মানব স্বভাবে জান্তব ধর্মের চেয়ে প্রবল হয়েছে মানবধর্ম; তার কাব্যবৃত্তি, তার সৌন্দর্যজ্ঞান তার আদিম বর্বরতার উপর জয়ী হয়েছে। কিন্তু মানব প্রকৃতির জন্তু তবুও মরলো না—বর্বর একেবারে লোপ পেল না। তাই কবি আক্ষেপ করে বলেছেন:—

"নম্র হ'ল শিকলে-বাঁধা মানব,
তবু সেই আদিম বর্বর জাগাতে রইল তোমার ইতিহাস।"

তাই আমরা দেখেছি হিংস্র হ'তে হিংস্রতর যুদ্ধ এসে মানব সভ্যতার ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্কিত করেছে। আজ মানববুদ্ধি প্রকৃতির অন্যতম আদি ও গুহ্যতিগুহ্য শক্তিকে—আণবিক শক্তিকে—এই হিংসার কাজে নিয়োজিত করছে। প্রকৃতির মধ্যে এই সুপ্ত রুদ্রকে দেখে প্রাচীন মানব ভয় পেয়েছিল। সেই রুদ্র প্রকৃতির অপর রূপও তারা জানত। তাই তারা বলেছিল—"প্রত্যাত্তমনাংস্তিষ্ঠতি সর্বা কোপান্তকালে সংহৃত্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ।" প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী-রূপে অবস্থান করেন, বিশ্বভুবনকে সৃষ্টি করে পালন করেন—আবার প্রলয়কালে তিনিই সংহার করেন। প্রকৃতির নিহিত যে রুদ্রশক্তি এতদিন বিশ্বভুবনকে সৃষ্টি ও পালন করেছিল, এবং প্রকৃতির নিয়মবলে সময়মত সংহার করছিল, আজ মানব সেই রুদ্রশক্তিকে আয়ত্ত করে পরস্পরের সংহারে প্রয়োগ করছে। বৈজ্ঞানিকগণ আজ শুষ্ক ও স্তম্ভিত। তাঁরা করুণ কণ্ঠে মিনতি ক'রে বলছেন—এই হিংস্র বর্বরতা সংবরণ কর, বিজ্ঞানকে এমনিভাবে গণিকাবৃত্তিতে নিয়োজিত কোরো না। যে রাষ্ট্র-শক্তিসংঘ আজ জয়ী, তারা পরাজিতদের

বিচার করেছে,ফাঁসী দিচ্ছে—যুদ্ধে বর্বর আচরণ করেছে ব'লে। যারা ধরা হয়েছে, তাদের বিচার কে করবে? দুই মিনিটের দু'টি আণবিক বোমা যে বর্বর নির্মমতার সাক্ষ্য দিচ্ছে, তা অতি আদিম যুগের বর্বরকেও লজ্জা দেয়। কিন্তু লজ্জা মানব লজ্জা পাচ্ছে না, বরং সে স্পর্দ্ধাভরে হিংস্র হতে হিংস্রতর মারণ অস্ত্রে অধিকতরে লিপ্ত হচ্ছে। আণবিক শক্তির পর সে হাত বাড়াচ্ছে বিশ্বরশ্মির দিকে—এই cosmic raysকে মানুষ সংহারের কাজে কি ক'রে নিয়োজিত করা যায়।

কিন্তু লজ্জা পেয়েছে ভারতের অমর আত্মা। ভারতের অর্ধ নগ্ন ফকির আহ্বান দিচ্ছেন হিংসার পথ ত্যাগ ক'রে অহিংসার শক্তিকে প্রবল করে তুলতে। অনাগত অমঙ্গলকে যেন তিনি জানতে পেরেছিলেন; তাই বহু পূর্ব হ'তে তিনি বলছেন—হিংসায় কোন মঙ্গল হ'তে পারে না, মঙ্গল চাও তো অহিংসার পথ গ্রহণ কর। ভারতের স্বাধীনতার জন্য, ভারতের বিপ্লবসাধনের জন্য তাই তিনি এই অহিংস পন্থা গ্রহণ করেছেন।

বাংলার রাষ্ট্র-চেতনাশীল বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে গান্ধীজীর এই অহিংস পন্থা গ্রহণ করা একটু কঠিন মনে হয়েছে। বাংলায় গান্ধীবাদ যে তেমন শিকড় গাড়তে পারে নি, তার প্রধান কারণ হ'ল গান্ধীজীর এই অহিংসা নীতি। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছিলেন—বাঙালীর সব সম্বলই আছে, নাই কেবল মৃত্যুর সম্বল। বাঙালীর না আছে রাণা প্রতাপ, না আছে শিবাজী, না আছে রণজিৎ। মৃত্যুসম্বলের অভাবের জন্য রবীন্দ্রনাথের এই আক্ষেপ বাংলার যুবককে একদিন পাগল ক'রে তুলেছিল। দলে দলে বাংলার যুবক বেরিয়েছিল আত্মবলির সম্মোহিনী আকর্ষণে। তারা ছুটেছিল কেবল মরতে নয়—মারতেও। তাই হঠাৎ যেদিন ১৯২০ সালে গান্ধীজীর বাণী এল—তোমরা অহিংস হও—সেদিন রাষ্ট্র-চেতনাশীল বাঙালী সেই বাণী কানে তুলল না। কেউ গেল অহিংসার ভিত্তিতে গঠিত মূল আন্দোলনেই বিরুদ্ধাচরণ করতে; কেউ বা গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ ক'রে সাময়িকভাবে অহিংস পন্থা মেনে নিল। কিন্তু অহিংসার প্রতি নিষ্ঠা ও আস্থা তাদেরও ছিল না। নতুন একদল মুষ্টিমেয় কর্মী গান্ধীজীর আদর্শকে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করলো, কিন্তু তারা এমন নিবিড়ভাবে নৈষ্ঠিক হ'ল যে গণ্ডীর বাইরের বিরাট জনতার প্রতি তারা মনই দিতে পারলো না।

এমনিভাবে পঁচিশ বছর চলেছে। একান্ত নিষ্ঠাবান কর্মী-দল অতি ধীরগতিতে কর্ম পরিধির বাড়িয়েছে; যারা সাময়িক-ভাবে অহিংসার পন্থা নিয়েছিল তাদের মধ্যে অহিংসার কার্যো-পযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আস্থা ও বিশ্বাস বেড়েছে। পর পর তিনটি আন্দোলনের ফলে—বিশেষ করে ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের ফলে—দেশের সর্বশ্রেণীর মধ্যে অহিংসা পন্থার প্রতি পূর্বের উপেক্ষা কমেছে। গান্ধী প্রবর্তিত বিপ্লব পন্থা নিতান্তই ভাববিলাসীর খেয়াল নয়—এ কথা আজ অনেকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। বাঙালীর চিন্তারাজ্যের এই সন্ধিক্ষণে এল 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজের' বিচার আবার বিভ্রম এল—হাঁ, এই তো ঠিক পন্থা। ইংরেজীতে একটি বচন আছে—সব রাস্তা দিয়েই রোমে যাওয়া যায়। তা যায়, কিন্তু সব রাস্তাই সহজ রাস্তা নয়। বিপ্লবেরও বিভিন্ন রাস্তা থাকা সম্ভব। বিদেশে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার ভিতর সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদ হিন্দ্ বাহিনী যে গঠনশক্তি, কর্ম-স্পৃহা ও ত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন, তা নত মস্তকে স্বীকার করতে কেউ কুণ্ঠাবোধ করবে না। কিন্তু ঐ পথে ভারতের বিপ্লব আসবে এই আশায় বসে থাকা বা তদনুযায়ী কার্যক্রম নিয়ে রাজনীতি পরিচালনা করা ভারতের জন্য ও প্রায়-আগত বিপ্লবের সহায়ক নয়—এ কথাও স্বীকার করা দরকার।

১৯৪০ সালে বোম্বাইতে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধি-বেশনে জওহরলাল গান্ধীজীর সম্বন্ধে বলেছিলেন—"অন্যান্য বিষয়ে হয়তো গান্ধীজী খুব বড়—আমি সঠিক জানি না।. কিন্তু রাজনীতিতে যে তিনি অদ্বিতীয় (without peer) —তা আমি জানি।" গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতি এই দৃঢ় বিশ্বাস বাঙালীর মনে নিবদ্ধ করা দরকার। নইলে বাংলা-দেশে কংগ্রেস কখনও শক্তিশালী হবে না। রাজনৈতিক চেতনাশীল শিক্ষিত কর্মীর সংখ্যা বাংলার মতো অন্য কোনো প্রদেশেই বোধ হয় নেই। এত দীর্ঘ কারাভোগ ক'রেছে এত অধিক সংখ্যক শিক্ষিত ত্যাগী কর্মী—আর কোন প্রদেশেই বোধ হয় তা হয়নি। কিন্তু তবুও সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বাংলা প্রায় সবার পেছনে। '৪২ সালের বিপ্লবপ্রয়াসে

বাংলার অংশ খুব গৌরবের নয়—অবশ্য একমাত্র কাঁথি মহকুমা ছাড়া। কেন? এর প্রধান কারণ বর্তমান রাজনীতির সঙ্গে বাংলার কর্মীরা তাল রাখতে পারছে না। তারা যেন সর্বদা নিজেদের একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখছে। এই বৈশিষ্ট্য গর্বের নয়—পরিতাপের। দেশবন্ধু একদিন একটা নতুন কর্মপন্থা বাতলেছিলেন—যা গান্ধীজী পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন, সর্ব ভারতও তা গ্রহণ করেছিল। যতদিন পর্যন্ত দেশবন্ধু তা পারেন নি ততদিন পর্যন্ত সর্বসাধারণীয় সিদ্ধান্ত ও কংগ্রেসের নিয়মানুগতা মেনেই তিনি চলেছেন; —যেখানে সেখানে পুরোপো কথার কারুন্দী ঘেঁটে আত্মপক্ষ সমর্থনের হাস্যাস্পদ চেষ্টা তিনি কখনও করেন নি। সুভাষচন্দ্র নির্বাসিত জীবনে একটা চরম প্রয়োগ করেছিলেন; কংগ্রেস তার যথোপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছে। আমরা দেখছি বাংলার দানকে সর্বভারত স্বীকার ক'রে নেয়। কিন্তু কেবল বেয়াড়াপনা ক'রে একটা বৈশিষ্ট্যের ঠাট বজায় রাখার কাজ এগোয় না—কেবল ঠাট বজায় রাখাই হয়। তাই আজ বাংলাকে বুঝতে হবে এই অহিংসাগামী কংগ্রেসের পন্থা কি। তা না হ'লে সর্বভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা থেকে বাংলা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়বে।

বাংলার ইতিহাসে অহিংসপন্থা একেবারে নতুন নয়। চৈতন্যদেব নিতান্তই মৃদু শান্ত অহিংসবাদ বাংলার তৎকালীন সমাজে এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। চৈতন্যকে কেবল একজন নিরীহ বৈষ্ণব ব'লে বা শান্ত গোবেচারা ধর্মপ্রবর্তক ব'লে মনে করলে বাংলার ইতিহাসের অল্পমাত্র পরিচয়ই দেওয়া হবে। গোঁড়া হিন্দুসমাজের ও মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির রুদ্ধ হিংসাত্মক প্রতিরোধের বিরুদ্ধে তিনি এক সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিলেন। তাই বাঙালীর পক্ষে এই অহিংস পন্থা গ্রহণে আত্মাভিমানের বাধা আসা উচিত নয়।

গান্ধীবাদ বা নৈষ্ঠিক কংগ্রেস পন্থা গ্রহণের বিপক্ষে বাংলার কর্মীদের যে মনোভাব, তার মূলে রয়েছে দু'টি কারণ। বাঙালীদের একটা অপবাদ আছে যে, সামরিক শক্তিতে তারা ক্ষীণ বা নিকৃষ্ট। এই নিকৃষ্টতা অনুভূতির প্রতিক্রিয়া—যাকে ফ্রয়েডের ভাষায় বলা হয়—inferiority complex—বাংলার যুবকদের মনে প্রবল। বাংলার খ্যাতি আছে তার বুদ্ধি-শক্তির জন্য, তার ভাবপ্রবণতার জন্য। কিন্তু সামরিক খ্যাতি তার কোনো দিনই ছিল না। তার ইতিহাস খুঁজে তন্ন তন্ন ক'রে তাই সে দাঁড় করাচ্ছে শশাঙ্ককে, ভীমকে, প্রতাপাদিত্যকে, কেদার রায়কে। এতে নবজাগ্রত বাংলার যুবকগণ তুষ্ট হ'তে পারে না। তাই তারা আধুনিক জগতে ভারতের বিপ্লবসাধনে সামরিক বীরত্বের খ্যাতি অর্জন করতে ব্যগ্র হচ্ছে। অহিংসার আহ্বানে এই জন্যই তাদের অন্তরে বিশেষ সাড়া জাগাতে পারে না। এর দ্বিতীয় কারণও আছে। ভারতের এই জাতীয় জাগরণের পথে বাংলা ছিল অগ্রণী; সেই প্রথম অবস্থায় সে অগ্রসর হয়েছিল সশস্ত্র বিপ্লবের—গুপ্ত সমিতির মারফৎ। সেই পথকে ত্যাগ করতে আজ বাংলার মনে বাধছে, তার আত্মাভিমানে বাজছে। তার মনে হচ্ছে, এত যুবকের লাঞ্ছনা বরণ, এত যুবকের আত্মদান, এত পরিবারের সব সুখ-শান্তি বিসর্জন দেওয়া—এ সবই যেন ব্যর্থ ও নিষ্ফল ব'লে অভিহিত হচ্ছে। এ কথা আমরা ভুলে যাই যে, বালোর পোষাক, আচরণ, খাদ্য প্রভৃতির উপযোগিতা বাল্যকালের পক্ষে যথেষ্ট থাকলেও, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্তন দরকার হয় এবং এর জন্য বাল্যের এই সব প্রয়োজনকে ব্যর্থ ও নিষ্ফল ব'লে বর্জন করা হয় না। অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে এই সব পরিবর্তন সাধন করা দরকার হয়।

বাংলার কর্মীদের পক্ষে বিচার ক'রে দেখা দরকার এই অহিংস বিপ্লব সাধনের পন্থা কি? প্রথমেই আপত্তি ওঠে, বিপ্লব আবার নিরস্ত্র বা অহিংস হয় কি ক'রে! বিপ্লব অর্থই তো রক্তারক্তি, মারামারি, কাটাকাটি। ইতিহাসের দিক দিয়ে আলোচনা করলে একথা যে কেবল আংশিক সত্য তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাসের সেই বিস্তৃত আলোচনা এখানে করতে চাই না। অন্যত্র সে আলোচনা করা যাবে। তবে এটুকুই কেবল বলতে চাই—ইতিহাসে নিরস্ত্র বিপ্লবের দৃষ্টান্ত একেবারে শূন্যের কোঠায় নয়,—এবং সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যেও অস্ত্রের প্রয়োগটা মুখ্য ছিল কি গৌণ ছিল তাও ইতিহাসের সাহায্যে বিচার করা দরকার। অধিকাংশ বিপ্লবের ইতিহাসেই দেখতে পাই অস্ত্রের ঝনঝনায় বিপ্লব সুরু হয়নি এবং প্রধানতঃ অস্ত্রের বলেই

বিপ্লব সফলও হয়নি। প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই অস্ত্র-নিরপেক্ষ ভাবেই বিপ্লব সুরু হয়েছে এবং অস্ত্রপ্রয়োগের চেয়ে নিরস্ত্র জনতার চাপই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিপ্লবকে জয়ী করার বেশী সহায়ক হয়েছে। তাছাড়া ইতিহাসের নিয়ম তাকে একটা বাঁধাধরা রাস্তায় চালিত করে না;—ভবিষ্যতের গতি নতুন নতুন পথায় নতুন নতুন রূপে ফুটে ওঠে! কাজেই পূর্বেকার বিপ্লবে অস্ত্রের প্রয়োগ ছিল ব'লে ভবিষ্যত বিপ্লবেও যে অস্ত্রের প্রয়োগ বা অহিংস পন্থা অনিবার্য, তেমন দাবী বিচার-সহ নয়। সাধারণত মার্ক্সের দোহাই দিয়ে সহিংস পন্থার অনিবার্যতা প্রতিষ্ঠা করা হয়। Communist Manifestoর শেষ পাতাতে তিনি বলেছেন, "Forcible overthrow" অর্থাৎ জোর ক'রে উৎখাত করা ভিন্ন তাঁর পরিকল্পিত বিপ্লবের আর কোনো পন্থা নেই। অথচ তিনিই পরে বলেছেন, ইংলাণ্ড ও আমেরিকার মুক্তরাজ্যে নিরস্ত্র বিপ্লব সম্ভব। "Capital" গ্রন্থের প্রথম ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় এঙ্গেল্‌স ইংরেজ জাতিকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে ইউরোপের মধ্যে একমাত্র ইংলাণ্ডেই বিধিসঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে (peaceful and legal means) বিপ্লব সম্ভব ব'লে মার্ক্স মত দিয়েছেন; কাজেই মার্ক্সের মত ইংলাণ্ডবাসীর পড়া ও জানা উচিত।[১] দেখতে পাচ্ছি তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লবের কথা একেবারে অসম্ভব বলেননি—বরং আশা করতেন যে শান্তিপূর্ণ উপায়েই ইংলাণ্ডে বিপ্লব হ'তে পারে। অন্যত্র তিনি বলেছেন—বলপ্রয়োগ হ'ল অন্তঃসত্ত্বা সমাজের ধাত্রী, নূতনকে জন্ম দিবার সহায়ক।[২] তাঁহার মতে নবজাতকের জন্মের সময় ধাত্রীর প্রয়োজনটা আকস্মিক—অনিবার্য নয়। যেখানে কোনো কারণে বিভ্রাট ঘটে যায়, সেখানেই ধাত্রী ডাকতে হয়; যেখানে প্রসূতি সুস্থ ও সবল থাকে, যেখানে গর্ভস্থ ভ্রূণ সুস্থ থাকে, সেখানে ধাত্রীর প্রয়োজন হয় না। আমরা মনে করি বিপ্লবসাধনে বলপ্রয়োগের প্রয়োজনও ঠিক এমনি অবস্থায় হয়—অর্থাৎ যখন প্রসূতি ঠিকমতো হয়নি, যখন সমাজ দেহে অবাঞ্ছিত ও অনাবশ্যক ব্যাধির প্রভাব থাকে, যখন নূতন সমাজের পরিকল্পনা ভ্রূণরূপে পুরাতন সমাজের মানস-গর্ভে ঠিকমতো বিকশিত হয়নি, তখনই বলপ্রয়োগ ক'রে বিপ্লবসাধন করা হয়। আমাদের গ্রাম্য বচনে থাকে বলে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো—এও কতকটা তাই। প্রসূতির ত্রুটি বলপ্রয়োগ দ্বারা পুষিয়ে নেওয়া হয়।

বিপ্লবের সংজ্ঞা কি? এক কথায় বলা যায়—সুবিধের সুবিধাভোগী শ্রেণীর হাত থেকে বঞ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর ক্ষমতা আহরণ করা। দু'টি শ্রেণীর স্বার্থের সংঘর্ষ থেকে এই ক্ষমতা হস্তান্তর হয়। সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যে যতদিন ভাঙন না হয়, ততদিন বিপ্লব সাধন প্রায় অসম্ভব বা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যে একদল নিজেদের শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তারাই নীচের শ্রেণীকে উস্কিয়ে তোলে। প্রতি বিপ্লবের ইতিহাসেই এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ইতিহাসের এই সব আলোচনা অন্যত্র হবে। এই প্রসঙ্গে লেনিনের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতে চাই। "……for the revolution it is necessary the exploiters should not be able to rule as of old…… Revolution is impossible without an all-national crisis affecting both the exploited and the exploiters."—অর্থাৎ শোষকগণও যখন বুঝবে যে পূর্বের ব্যবস্থায় আর চলে না, তখনই কেবল বিপ্লব সম্ভব হবে। শোষক ও শোষিত উভয়কেই আচ্ছন্ন করছে এমন এক সর্বব্যাপক জাতীয় সংকটেই বিপ্লব হ'তে পারে। শোষকদের মধ্যে এই যে অনুভূতি, একেই গান্ধীজীর ভাষায় বলা যায়—অন্তঃকরণের পরিবর্তন—change of heart; মার্ক্সীয় পরিভাষায় এর সূচনাকে বলা যায় declassed বা শ্রেণী বিচ্যুত কর্মীর উদ্ভব। এর গোড়ার কথা হ'ল গান্ধীজীর সেই change of heart—মতিগতির পরিবর্তন!

এই মতিগতির পরিবর্তন হয় নানা কারণে; সব সময়ে ধর্মবুদ্ধি থেকেই হয় না। আজ বাংলার জমিদারগণ অনেকেই

---

(১) "...in Europe, England is the only country where the inevitable social revolution might be effected entirely by peaceful and legal means". (Capital, Preface to first English Edition)

(২) "Force is the midwife of every old society pregnant with a new."—Capital (vol. I—chap. 24—Sec. 6)

বুঝছে যে জমিদারী প্রথা আর চলতে পারে না। তাদের এই অনুভূতি ধর্মবুদ্ধি প্রণোদিত নয়;—এবং ধর্মবুদ্ধিও প্রায় সব ক্ষেত্রেই আসে অবস্থার চাপে। টলষ্টয় নিজের জমিদারী ছেড়ে দিয়েছিলেন ধর্মবুদ্ধি থেকে। কিন্তু এই ধর্মবুদ্ধি বাস্তব অবস্থা নিরপেক্ষ নয়—বরং বাস্তব থেকেই এই শুভবুদ্ধির উদ্ভব হয়েছে। '১৭ সালের বিপ্লবের পর রাশিয়াতে প্রায় সব জমিদারই তাদের জমিদারী থেকে উৎসাদিত হয়েছিল। তখন সবাই সমানভাবে প্রতিরোধ করেনি। কেউ এই নূতন অবস্থাকেই মঙ্গলজনক ব'লে মেনে নিয়েছিল, কেউ অনিবার্য অমঙ্গল বলে মেনে নিয়েছিল, কেউ বা প্রাণপণে এতে বাধা দিয়েছিল। এই বাধাদানকারীর সংখ্যা যত বেশী হবে, বলপ্রয়োগ তত বেশী করতে হবে। এই বাধাদানকারীর সংখ্যা কমানো সম্ভব কিনা এবং কমাতে পারলে বিপ্লবোত্তর সমাজব্যবস্থা ব্যাপকতর, গভীরতর ও সুপ্রতিষ্ঠিততর হয় কিনা—এই হ'ল বিচার্য।

পূর্বে বলেছি, বাংলার জমিদারগণ অনেকে আজ বুঝতে পারছে যে, জমিদারী প্রথা আর চলতে পারে না, চিরস্থায়ী প্রথা আজকার অর্থনীতিতে অচল হয়েছে। আজ জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ করতে গেলে এদের তরফ থেকে তেমন তীব্র প্রতিরোধ আসবে না; এমনকি অনেকে স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলবে—যে একটা গলবদ্ধ প্রস্তর খণ্ডের ভার বহন থেকে অব্যাহতি পেল। গান্ধীজী বলেছেন, কৃষকগণ লোভ গিয়ে জমি দখল করবে—তোমার আমার অনুমতির অপেক্ষা রাখবে না। সেদিন কলকাতায় তিনি বলেছেন, পরপ্রমভোগী মধ্যবর্তী জমিদার, তালুকদার, পত্তনীদার প্রভৃতির জমি কৃষকগণ চাষ করতে চাইবে না এটা স্বাভাবিক; যে চাষ করবে সেই জমির মালিক। এই শিক্ষার মধ্যে অহিংস পন্থার কোনো নির্দেশ নেই—যা একে কাজে ফলাতে অহিংস পন্থার ব্যতিক্রম হবার কোনো প্রয়োজনও নেই। কিন্তু এই মনোভাব সৃষ্টির জন্য বা এই কার্যক্রম সফল করার জন্য কেবল অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থার স্বাভাবিক তাগিদের উপর নির্ভর করলে চলবে না, এর জন্য প্রস্তুতি দরকার, এর জন্য ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত একটা বিশেষ কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার। জমিদারী প্রথা আজ আছে স্বাভাবিক নিয়মে। কিন্তু জমিদারদের অভিপ্রেত পরিবর্তনের জন্য এই অবস্থাগতিক চাপকে বহুল পরিমাণে বাড়িয়ে তোলা যায়। তারই নাম হ'ল বিপ্লব গ'ড়ে তোলা।

যে কথাটা জমিদারদের সম্বন্ধে বললাম, ঠিক সেই কথাই ইংরাজ সরকার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। আজ এরাও অনুভব করছে, সেই পুরাণো মাতব্বরী আর খাটছে না। একটা অর্ধাচীন ক্ষুদ্র জাতির মুষ্টিমেয় লোক এসে একটা অতি প্রাচীন কাল থেকে সুসভ্য জাতির কোটি কোটি লোকের উপর মোড়লী করবে, আর তাদের দেহের রক্ত, খেত-খামারের শস্য, মনের শক্তি সব শোষণ ও হরণ করবে—এ আর চলে না। অথচ এই পরম সম্পদ তারা ছাড়তেও পারছে না। এখন তাদের অবস্থা কতকটা সাপের ছুঁচো গেলার মতো। তাই আজ তারা নানা উদ্ভট ও অযৌক্তিক সমস্যার সৃষ্টি ক'রে তাদের অধিকারকে আরও কিছুদিন চালিয়ে নিতে চাচ্ছে। এই অপচেষ্টার মধ্যে আমাদের জাতির এক একটা অংশকে তারা টেনে নিচ্ছে। আমাদের জাতির এক একটা অংশের সহযোগিতা যেদিন তারা হারাবে, বা যেদিন তা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাবে না, সেইদিনই তারা এই খেলা ছাড়তে বাধ্য হবে। এই পার্লিয়ামেন্টারী সদস্যদের একজন সেদিন বলেছেন, ক্রীপ্‌স্ প্রস্তাবের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাবের (Dominion Status) দিন অনেক পূর্বে চলে গেছে; আজ সমান মর্যাদার ও সম-অধিকারের ভিত্তিতে ব্রিটিশ ও ভারতের মধ্যে মৈত্রীর কথা ভাবতে হবে। এই অনুভূতি আজ ব্রিটেনের একেবারে মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; ব্রিটেনের সব লোকই চার্চিলের মতো চোখে ঠুলি পরা কলুর বলদের দৃষ্টি নিয়ে দেখে না। সামনের ও এ-পাশ ও-পাশের বস্তুও তাদের দৃষ্টিতে কিছুটা পড়ে।

এই যে সঙ্গীন ও সঙ্কটজনক অবস্থা তাদের সামনে এসেছে, এটাকে আরো ঘনিয়ে তোলার কাজকে আমরাই ক্ষিপ্র করিতে পারি। যারা মার্ক্‌সবাদে বিশ্বাসী তারাই আজ যেন এই পন্থার সব চেয়ে বড় বিরোধী, এবং মার্ক্‌সের মতের দোহাই দিয়েই এই বিরোধিতা তারা করে। অথচ মার্ক্‌সবাদের গোড়ার কথাই হ'ল economic interpretation—অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা। ইতিহাসের বিবর্তনের

মূলে রয়েছে এই অর্থনৈতিক কারণসমষ্টি। গান্ধীজীর কর্মপদ্ধতির সঙ্গে এই অর্থনৈতিক কারণসমষ্টির যোগ যে কত গভীর তা তাদের পুঁথিবদ্ধ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। একান্ত ভাবে ধর্মবিশ্বাসী হয়েও অকুণ্ঠভাবে তিনি বলেছেন যে, নিজের নিকট ভগবানকেও উপস্থিত হ'তে হ'লে অন্নরূপে যেতে হবে, তার অন্নের সংস্থান না ক'রে তার কাছে কোনো কথাই বলা চলে না। সমাজের মানুষের মনে আর্থিক প্রভাবের এত বড় স্বীকৃতি অন্যত্র পাওয়া কঠিন। গান্ধীজীর এই মনোভাবের মূল আমরা যেমন পাই বাইবেলে, তেমনি পাই উপনিষদে। তৈত্তিরীয়তে বলা হয়েছে—ভৃগুর প্রথম ব্রহ্মানুভূতি হ'ল, "অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি।"—অন্নই ব্রহ্ম ইহা জানিলেন, অন্ন হ'তেই এই ভূতবর্গ জন্মগ্রহণ করে, অন্নের দ্বারাই তারা জীবনধারণ করে। অতএব "অন্নং ন নিন্দ্যাৎ।"—অন্নের নিন্দা কোরো না।

গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির একপ্রান্ত রয়েছে এই অন্নমূলক রাজনীতিতে, অপর প্রান্ত রয়েছে বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানবের অন্তরে প্রতিরোধের স্পৃহা ও শক্তি জাগাবার দিকে। এর এক উদ্দেশ্য হ'ল সুবিধাভোগী শ্রেণীর মতিগতির পরিবর্তন সাধন—তা সে ধর্মবুদ্ধি থেকেই হোক্, অথবা অন্নবুদ্ধি থেকেই হোক্। অপর উদ্দেশ্য হ'ল সুবিধাভোগীর হাত থেকে ক্ষমতা আহরণ ক'রে নূতন সমাজব্যবস্থা গ'ড়ে তুলবার শক্তি বঞ্চিত নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে উৎপন্ন করা। বল প্রয়োগ দ্বারা যে বিপ্লব হয়, তাতে কেবল এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যের এক ক্ষুদ্রাংশ সাধিত হয়—অর্থাৎ অনিচ্ছুক সুবিধাভোগীর হাত থেকে শক্তি কেড়ে নেওয়া হয়। এর ফলে হয়, তাদের তরফ থেকে বাধা আসে প্রচুর, আর নব-উত্থিত শ্রেণী কর্মপটুতার অভাবে পদে পদে করে ভুল। তাই প্রায় প্রত্যেক সশস্ত্র বিপ্লবের মত মারামারি কাটাকাটি তা প্রায় সবই হয় অনাবশ্যক গৃহযুদ্ধে। এই গৃহযুদ্ধের ফলে জাতীয় শক্তিক্ষয় হয় প্রভূত পরিমাণে—যার ফলে নূতন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাবে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। বিপ্লবোত্তর পুনর্গঠনের সময় রাশিয়াতে এই অসুবিধার বহু দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছে। অথচ সশস্ত্র বিপ্লবে সমাজের উপর স্তরে মানসিক প্রস্তুতির অভাবের ফলে রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ অনিবার্য হয়।

সশস্ত্র বিপ্লব নির্ভর করে প্রধানতঃ জোর জবরদস্তির উপর। সমাজের লোকদের মতিগতির পরিবর্তন আসে পরে এবং প্রধানতঃ বলপ্রয়োগের ফলে। কাজেই সশস্ত্র বৈপ্লবিক গঠনের কাজ সুরু হয় বিপ্লবের উদ্দামতা শান্ত হ'লে পর। কিন্তু নিরস্ত্র বিপ্লবে বিপ্লব গঠন করার কাজ সুরু হয় পূর্বাহ্নেই, হৃদয়ের পরিবর্তনও সুরু হয় বিপ্লবের উদ্দাম অবস্থার পূর্বেই। গান্ধীজী যে দিল্ বদলের বা হৃদয়ের পরিবর্তনের কথা বলেন, —যে change of heartএর কথা বলেন—তা কেবল একমুখী নয়। কেবল সামাজিক শক্তির অধিকারীদের হৃদয়ের পরিবর্তন হ'লেই বিপ্লব সংসাধিত হয় না; যারা বঞ্চিত তাদেরও হৃদয়ের পরিবর্তন বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন। বঞ্চিতরা একদিকে থাকে সঙ্কুচিত ও দুর্বল হয়ে—অপরদিকে দুর্বলের অক্ষম ক্রোধ ও বিরাগ তাদের করে তোলে ক্রূর। এমনি মনোভাবের লোক দিয়ে নূতন সমাজের গঠন হ'তে পারে না। তাই গান্ধীজী বারবার বলছেন—দুর্বলের অহিংসার চেয়ে সবলের হিংসা ভাল। তিনি চান সবলের, শক্তিমানের অহিংসা। নিজের শক্তি সম্বন্ধে মানুষ যখন সচেতন হয়—আর তার সাথে যদি যোগ হয় একটা শুদ্ধবুদ্ধি—তবে সে ক্রূর হবেনা, নিষ্ঠুর হবেনা;—সে হবে স্নিগ্ধ, তার মুখে থাকবে বরাভয়;—সে অন্যায়কে ধ্বংস করবে ক্রূর আনন্দের বশে নয়, শুদ্ধবুদ্ধির বশে। এটা নিছক স্বপ্নবিলাসীর স্বপ্ন নয়। এর আংশিক বাস্তবরূপ আমরা দেখেছি ১৯৪২ সালে। সেখানে যে ব্যতিক্রম হয়েছে তা আমরা জানি। সে ব্যতিক্রম পন্থার দোষে নয়—সেই পন্থা থেকে বিচ্যুতির দোষে।

এ হ'ল একদিকের conversion—মতিগতির পরিবর্তন। অপর দিকের conversion—মতিগতির পরিবর্তন—হবে উর্ধ্বতন শ্রেণীর—সুবিধাভোগীদের মধ্যে। সেই পরিবর্তন সাধনেরও প্রধান উপায় হ'ল গান্ধীজীর গঠনমূলক কাজ। যদি সাধারণ মানুষ—the common man নিজের অন্তরে ও আবেষ্টনে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করে পাকে, বস্তুতে, কায়িক প্রয়োজনে এবং মনের সংরাগে ও বিরাগে স্ব-স্থ হয়,

স্বপর্যাপ্ত হয়, তবে পরবর্তী সুবিধাভোগী শ্রেণীর অনার্জিত সুবিধার উৎস আপনা হ'তেই শুকিয়ে যাবে; সে সুবিধাভোগী স্বদেশী-ই হোক্ বা বিদেশী-ই হোক্—কিছু আসে যায় না তাতে। গঠনমূলক কর্মকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কেবল ১৮ দফা গণ্ডে রাখলে খুব ভুল করা হবে। গঠনমূলক কাজের মর্মকথা হ'ল—শতকরা ৮০।৯০ ভাগ যে সাধারণ জনতা—যারা শ্রম করে কিন্তু শ্রমোৎপন্ন সামাজিক সুবিধা ও ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত, দেহে মনে তাদের সুস্থ ও সবল করতে হবে, অন্নে বস্ত্রে তাদের স্বয়ম্ভর করতে হবে, যাতে তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মানসিক শক্তি, দৈহিক বল, ও বৈষয়িক সংস্থান অর্জন করতে পারে। চরখার দাবী আসে এখানে, কুটির শিল্পের কথা আসে এখানে, বুনিয়াদী শিক্ষার কথা আসে এখানে, পল্লীস্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথা আসে এখানে। বঞ্চিতকে যদি এইভাবে গঠন করা যায় তবে বঞ্চক এক সুপ্রভাতে অনুভব করবে—my occupation is gone—আমাদের উপজীবিকা মারা গেছে। তখন সে অনুভব করবে যে, পুরোনো ব্যবস্থা আর চলে না। আজ মেজর ওয়াট (Major Wyatt) বলতে বাধ্য হয়েছেন—১৯৪২ সালের ক্রীপস্ প্রস্তাব আজ অচল—সম্পূর্ণ নূতন ক'রে সমঝোতার ভিত্তিতে ভারতের সমস্যা ব্রিটেনকে মেটাতে হবে। এমনি চিন্তা ব্রিটেনের অধিকাংশ লোক একদিন করতে বাধ্য হবে—অবশ্য যদি আমরা বাস্তু বিপ্লবের পূর্বেই বিপ্লবকে গঠন করতে পারি।

ব্রিটেন আজ বুঝেছে যে, পুরোনো ব্যবস্থা অচল; কিন্তু সে কেবল খুঁজছে কোনো ফাকফন্দি বের ক'রে সমস্যাকে ধামাচাপা দিতে পারে কিনা। তাই কোথায় আছে আবেদকার, কোথায় আছে জিন্না, কোথায় আছে মানবেন্দ্রনাথ রায়, কোথায় আছে পি-সি যোশী—এই সব খুঁজে বেড়াচ্ছে। আজ যে এই সব এমনি সহজে বের হচ্ছে তার জন্য দায়ী আমরা—বিপ্লবকে গঠন করার কাজে আমাদের ত্রুটি। আজ পাকিস্থানের জিগীর উঠেছে, মুসলিম লীগ সমস্ত মুসলমান জনতাকে বিভ্রান্ত করছে—এর জন্য দায়ী আমরা, আমরাই এই সুযোগ দিয়েছি ও দিচ্ছি। বিপ্লব সাধনের দায়িত্ব যে নিয়েছে, বিপ্লবের পথের অন্তরায় দূর করার দায়িত্বও তার—তা না করতে পারা তারই ত্রুটি। যদি মুসলমান জনতার হৃদয়-মনকে আমরা জয় করতে না পেরে থাকি, গত দুর্ভিক্ষের সময় লীগ-পন্থী মন্ত্রী আমলের সরকারের অক্ষমতা, অবহেলাতা ও অসততা সত্ত্বেও যদি মুসলমান জনতা আজও লীগের অনুরক্ত থাকে—তবে তা কেবল আমাদের কর্তব্য অবহেলারই পরিচয় দেয়। আজ অনুসন্ধিৎসু হওয়া দরকার। এই অক্ষমতার কারণ কোথায় নিহিত তা বোঝা দরকার। নিজেদের অন্তরের অন্ধকার কোণ অন্বেষণ ক'রে দেখতে হবে কোনো ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি, কোনো শ্রেণীস্বার্থ, কোনো সাম্প্রদায়িক স্বার্থ আমাদের চিন্তা ও কর্মকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চালিত করেছে কি না। এই কর্তব্য পূরণের জন্য কোনো রাজনৈতিক বুদ্ধি না রেখে মুসলমান জনতাকে সেবা করতে হবে—আর তাদের বলতে হবে, সুস্থ মনে ও শুভবুদ্ধিতে তারা যা তাদের ভাল ব'লে মনে করবে তাই দিতে আমরা প্রস্তুত। বাংলায় বিপ্লব-সাধকদের কাছে আজ সব চেয়ে বড় কর্তব্য হয়ে পড়েছে মুসলমান জনতার বিশ্বাস অর্জন করা। স্বাধীনতার পথ, বিপ্লবের পথ বহুল পরিমাণে সুগম হবে এটা সাধন করতে পারলে। আজ যদি হিন্দু বা মুসলমান কোনো বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে সাম্যের বলে শক্তি আহরণ করে, তবে ভারতের এই সর্বপ্রধান সমস্যার সমাধানের জন্য বহুবর্ষব্যাপী শোনিত-সিক্ত গৃহযুদ্ধ চলবে। বিপ্লব গ'ড়ে উঠবে না ততদিন না ঐ গৃহযুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়। কিন্তু গান্ধীজীর অহিংস পন্থায় এই সমস্যার সমাধান—পূর্ণরূপে না হোক্, অন্তত—সূচনায়—পূর্বাহ্নেই হয়ে যাবে। এবং এই সমাধান খুবই সম্ভব—যদি সুবিধাভোগী হিন্দু সম্প্রদায় স্বেচ্ছায় নিজেদের ক্ষমতা ও সুবিধা বর্জন করে। রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে এই মনোভাব সৃষ্টি করা বিপ্লব-সাধকদেরই দায়িত্ব। কিন্তু আশঙ্কা, যে-সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াতে হবে তাতেই যেন ভূত লুকিয়ে আছে। হয় এই অন্তর্নিহিত অবচেতন সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি তাদের ছাড়তে হবে, নতুবা বিপ্লবী হবার মিথ্যা অহমিকা ছেড়ে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে তাদের আসা উচিত। ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক রাজনীতি যে গৃহ যুদ্ধকে আমাদের সামনে প্রকট ও আসন্ন করে তুলেছে—বিশেষ করে বাংলার কর্মীদের সে সম্বন্ধে অবহিত ও আত্ম-অনুসন্ধিৎসু

হওয়া উচিত। অনেক ভাল কথার আবরণে অনেক ক্ষুদ্র স্বার্থের বিষাক্ত কীট লুকিয়ে থাকে। তাই বিপ্লবী কর্মীদের বলছিলাম—অনুষ্ঠিতভাবে মুসলমান জনতার সেবা কর, তাদের আস্থা অর্জন করার জন্য দ্বিধাহীনচিত্তে তাদের সত্যিকার দাবী মেনে নাও। তাই তো গান্ধীজী গঠনমূলক কাজের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা স্থগিত এবং অস্পৃশ্যতা দূর করার কথা এত জোর করে বলেন। এই দুটির মধ্যে গৃহযুদ্ধের বীজ লুকিয়ে আছে। গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে যে অহিংস বিপ্লবের পরিকল্পনা আমরা পাই, তাতে এই গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা নিবারিত হয়।

বিপ্লবের পথে গৃহযুদ্ধের আর একটি রূপও আছে—যাকে বলা হয় class struggle বা শ্রেণীসংগ্রাম। অনেকের কাছে শ্রেণীসংগ্রাম একটা article of faithএর মতো—যেন সর্ববিশ্বাসের অঙ্গ বিশেষ। বর্তমান সমাজে শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীবিদ্বেষ আছে। কিন্তু এ'কে রক্তাক্ত শ্রেণীসংগ্রামকে ফুটিয়ে তুলতেই হবে—এমন অনিবার্যতার নিগড় ইতিহাস থেকে পাই না। ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা হয়েছে যা কোন বিশেষ সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না; তেমনি ইতিহাসের সব পর্যায়ে বিবর্তন ব্যাখ্যা করতে হলেই শ্রেণীসংগ্রামের সাহায্য নিতে হবে—এমন কথা বলা বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচায়ক নয়। নৈষ্টিক মার্কসীয় মতে মানব সমাজের বিবর্তনকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়—আদিম সাম্যবাদ, দাসপ্রথা, সামন্ত প্রথা ও পুঁজিবাদ (primitive communism, serfdom, feudalism and capitalism) এবং এর পর আসবে সাম্যবাদী (socialist) সমাজ। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ের সমাজে শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীসংগ্রাম ছিল না। অথচ সমাজের বিবর্তন হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সমাজে যে সংঘর্ষ আমরা পাই, তাকেও শ্রেণীসংগ্রাম বলা ঠিক নয়। কারণ, সেখানে বৈষম্য ও সংঘর্ষ শ্রেণীতে শ্রেণীতে ছিল না। প্রথম যুগের গ্রীসের হেলট (helot) বা রোমের সার্ফ (serf) সমাজের অন্তর্গত শ্রেণী ছিল না—এর আরও পূর্বের কথা না হয় নাই তুললাম। এই দাস বা গোলামরা ছিল সমাজের বহির্ভূত—বিদেশী বিজিত জাতির লোক। মিসরের সুদীর্ঘ ইতিহাসে অন্তর্দ্বন্দ্বের দৃষ্টান্ত বা শ্রেণীসংগ্রামের কাহিনী খোঁজ হয় নেই—থাকলেও এত বিরল যে ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে কোন উল্লেখযোগ্য অংশ এর নেই। সত্যিকার শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীসংগ্রাম দেখা দেয় সামন্ততান্ত্রিক যুগে। [আগামী বারে সমাপ্য]

অন্বেষণ

শ্রীবিমল বসু

সেদিন হ্যারিসন রোডের মোড়ে ট্রামের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। অসংখ্য মানুষের আনাগোনায়, যানের যাতায়াতে, ফিরিওয়ালা ও হকারের বিচিত্র চিৎকারে, পথচারী-দের আলাপে গুঞ্জনে হাস্য পরিহাসে যেন রথতলার মেলা বসেছে হ্যারিসন রোডের মোড়ে। নীরবে দাঁড়িয়ে আছি এই বিচিত্র কোলাহলের মধ্যে, হঠাৎ চোখে পড়লো পথের ধারে একটি মুচি পথচারীদের জুতো মেরামতের আশায় বসে, তার কাছে একটি ছোট্ট ছেলে বসে স্লেটে কি যেন লিখছে, মুচি স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে সেই লিখন-রত ছোট্ট ছেলেটীর লেখার দিকে। ছোট্ট ছেলেটি মাথা নিচু করে একমনে লিখে চলেছে, তার কাছে ময়লা ছেঁড়া একটা বই। তাদের দিকে তাকিয়ে মনে হলো ওরা যেন ধ্যান-মগ্ন; সহস্রজনের কল-কোলাহল, ভবল-ডেকার বাস ইত্যাদির কুৎসিৎ আওয়াজের মধ্যেও ওরা যেন সুন্দরের ধ্যান করে চলেছে। ওরা—শুধু বাণী-মগ্ন শিব।

অপূর্ব্ব অদ্ভুত লাগলো এই পথের বাঁকে প্রচণ্ড কোলাহলের মধ্যে নিভৃত-ধ্যানমগ্নদের এই অতি অপরূপ ছবি। আমি যদি ছবি আঁকতে পারতাম……

ছোট্ট ছেলেটির হয়তো সবে অক্ষর পরিচয় ঘটেছে, তন্ময় হয়ে গেছে সে এই নব পরিচয়ে, তার বাবা ছোট্ট ছেলেটির তন্ময়তা দেখে ভাবছে ছোট্ট ছেলেটির ভবিষ্যৎ জীবনের কথা, যা' সে পায়নি, যে জীবনের যাত্রাপথের সঙ্গে তার যোগসূত্র রচিত হয় নি, তার ছেলেই পাবে সে জীবনের পরিচয়, জ্ঞানের আলো শিক্ষার আলো সে-শিশুকে এনে দেবে নব-জীবনের মর্ম্মবাণী, সে বাণীর সম্যক্ পরিচয় লাভ করার জন্যে ছোট্ট ছেলেটির এই তন্ময়তা। কিন্তু বাস্তব-জগতে তাই কি সত্য হবে? হয়তো দু'দিন পরেই ফুরিয়ে যাবে ওর নেশা, বাস্তবের তাগিদ এসে ছোট্ট ছেলেটির কাঁধে ঝুলিয়ে দেবে তার বাবার জুতো সেলাই করার যন্ত্রপাতি। পথে পথে কিশোর যুবকে মানুষের পায়ের দিকে তাকিয়ে, কেটে যাবে তার জীবন, সে কিশোর যুবক হবে, বিবাহ করবে, তার ছেলে হবে, তখন শেষ বয়সে এই বুড়ো বাপের মতো সেও কোন পথের প্রান্তে একান্তে বসে তার ছোট্ট ছেলেটিকে অক্ষর পরিচয় করিয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করবে, মনে মনে স্বপ্ন-রচনা করবে ছেলের ভবিষ্যৎ-জীবনের……এমনি ব্যর্থ-জীবনের চক্রে আবর্ত্তিত হতে থাকবে এ দেশের গণ-জীবন। যেমন ভাবে আবর্ত্তিত হয়ে আসছে এত কাল।

নিজের ভালমন্দ, দেশের ভালমন্দ জানবার ও বোঝবার অধিকার এ দেশের জনসাধারণ পায় নি শুধু শিক্ষার অভাবে। যারা চাষী মজুর, জুতোর কামার, শ্রমজীবি যারা তারা জানে না কংগ্রেস কি—কি তার লক্ষ্য, কি তার আদর্শ, দেশের স্বাধীনতা কাম্য কি জন্য এবং কাদের মুখ চেয়ে। কংগ্রেস থেকে তাদের সরিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে, ভুল বোঝান সম্ভব হয়েছে, ধর্ম্মের নামে বজ্জাতি করা সম্ভব হয়েছে এবং হচ্ছে জনসাধারণ অত্ত অশিক্ষিত বলে। এই জন্যে এ দেশের চাষী মজুর জুতোর কামার মুচী মেথর সব শ্রমজীবিরা জানে না কোনটা ভালো আর কোনটাই বা মন্দ। এই জন্যেই জমীতে সে প্রাচীনকালের মতো লাঙ্গল দেয়, আধুনিক চাষের কথা, সারের কথা, শ্রম-জীবনের সুখের ও স্বস্তির কথা জানিতে পারে না। অপরে যা বোঝায় তাই তারা বোঝে, বাবুদের কথায় কেবল মাথা নাড়ে, সায় দেয় আর জয়ধ্বনি তোলে। তাদের অজ্ঞতার, অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে তাদের নাম করেই একদল তাদের শোষণ করছে একথা বুঝে উঠতে পারে না। চাষীমজুর শ্রমজীবিদের বোধ-শক্তি না এলে, লাল আর কালোর তফাৎকে সাদা চোখে যতদিন না তারা বুঝতে পারছে ততদিনই এইরকম চলবে। কৃষক-মজদুর রাজ প্রতিষ্ঠা হবে না কোনকালে, দেবতার নামে উপচার সম্ভারের প্রাচুর্য্যটুকু ভোগ করবে পূজারী ব্রাহ্মণেরা, কৃষক-মজদুর রাজ প্রতিষ্ঠা করার নামে বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্তরাই রাজত্ব চালিয়ে যাবে, স্বরাজের নামে ব্যক্তি ও শ্রেণী বিশেষের 'স্ব'টাই প্রতিষ্ঠিত হবে সকলের আগে। এর থেকে, এই অধঃপতন ও অজ্ঞতা ও অশিক্ষা থেকে কি এদের মুক্তি নেই? শরৎচন্দ্র যে পণ্ডিত মশাইয়ের স্বপ্ন দেখে গেছেন, যে বৃন্দাবনকে আমরা

দেখেছি শরৎচন্দ্রের মানস-কল্পনায়, সমস্ত বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কর্মচঞ্চল যে বৃন্দাবনকে আমরা দেখেছি ছাপার অক্ষরে বইয়ের মধ্যে বন্দী, বাস্তবের মাঝে এই বাংলার দুর্গত দিনে তার কি দেখা মিলবে না? জাতির মধ্যে চেতনার সঞ্চার করতে গেলে গণ চেতনা ও জাগরণের প্রয়োজন। তা না হলে দেশের জন্যে বৃহৎ ত্যাগ তিতিক্ষা আত্মদান বারংবার শুধু ব্যর্থ হয়ে যাবে যেমন হয়েছে গিয়েছে। আজকের দিনে সারা জাতির মধ্যে একটা অস্থির ভাব জেগেছে, শিক্ষার দ্বারা, দেশের অভাব ও দুঃখকষ্টের অভাব বেদনা, নির্যাতন ও অবিচারের কার্য্য কারণের ওপর বাস্তব আলো বিচ্ছুরণের দ্বারা গণ-চেতনায় জাতির এই অস্থির ভাবকে আরো উদ্বেল করে তোলা প্রয়োজন আগামী কঠোর সংগ্রামের মুখ চেয়ে।

কিন্তু তা হবে কবে? কে করবে? কোথায় সেই বৃন্দাবন যে বলেছিল দৃঢ়স্বরে দশ বছরের মধ্যে এ-দেশে অশিক্ষিত বলে কেউ আর থাকবে না। এই বৃন্দাবন মরমী শরৎচন্দ্রের মানসলোকের অলীক স্বপনচারী, সে কি শুধু ছবি? শুধু কথার মালা, কাজের জ্বালা এতটুকু নেই কোথাও?

হঠাৎ মনে হলো শরৎচন্দ্র বাংলা দেশে যে বৃন্দাবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, দেখেছিলেন জ্ঞানের শিক্ষার আলোক-বর্তিকা হাতে করে সুদৃঢ় পদক্ষেপে অন্ধকার পথ বেয়ে বৃন্দাবন চলেছে, অন্ধকার ঘরে জ্ঞানের শিক্ষার স্বাস্থ্যের আনন্দের প্রদীপ জ্বালাতে জ্বালাতে। মনে হলো পথভুলে সে-বৃন্দাবন মহাচীনে গিয়ে পড়েছে। শরৎচন্দ্রের মানস-পুত্র বৃন্দাবন বাস্তবভাবে মহাচীনে জনসাধারণের মধ্যে চাষী-মজুরদের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ শিখা জ্বালিয়ে তুলেছে অতি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ভাবে। কল্পনায় বাংলাদেশে যে বৃন্দাবনের ছবি দেখেছিলেন শরৎচন্দ্র, তারই বাস্তব-ছবি মহাচীনের এই বৃন্দাবন—আসল নাম তার জিমি ইয়েন।

পশ্চিম রণাঙ্গনে ২০০,০০০ হাজার চীনা শ্রমিকদের আমদানী করা হয়েছিল মিত্রপক্ষের ট্রেঞ্চ খোঁড়া, রাস্তা তৈরী ও কলকারখানায় কাজ করবার জন্যে। জিমি এই পশ্চিমে এসেছিল ক্যান্টিনে কাজ নিয়ে। পাঁচ হাজার চীনা-কুলীদের দো-ভাষীর কাজও তাকে করতে হতো। একদিন এক চীনা-মজুর তাকে ধরে বললো তার হয়ে একখানা চিঠি তার স্ত্রীকে জিমির লিখে দিতে হবে। অক্ষর-জ্ঞানহীন চীনা-মজুর আর অক্ষর-জ্ঞানহীন ভারতীয় মজুরে তফাৎ কোন-খানেই নেই। জিমি কি আর করে পাঁচ সাত ভেবে একখানা চিঠি সেই কুলীর হয়ে লিখে দিলো কুলী-বউয়ের কাছে। একখানা চিঠি লেখাই তার 'কাল' হলো। দিন দুই পরে তাকে আরো তিনজনের হয়ে তিনখানা চিঠি তাকে লিখতে হলো। ব্যস্, তারপর থেকে জিমির কাজ গেল বেড়ে। অসংখ্য চিঠি লেখার তাগাদা উপরোধ অনুরোধ···অসম্ভব উৎসাহ নিয়ে জিমি তাদের চিঠিপত্র লিখে দিতে সুরু করলো, শুধু তাই নয় অক্ষর-জ্ঞানহীন কুলীদের আনন্দ ও সাধারণ জ্ঞান বাড়াবার জন্যে সে কুলীদের ক্যাম্পে খবরের কাগজ পড়িয়ে শোনাতে লাগলো···জিমির কাজের মধ্যে এলো বিচিত্র আনন্দ অনুভূতি।

হঠাৎ একদিন সে এক নতুন স্বপ্ন দেখলো যে স্বপ্ন দেখেছিল শরৎচন্দ্রের বৃন্দাবন। জিমির মনে হলো: আচ্ছা, এই কুলী মজুরদের লেখাপড়া শেখালে কেমন হয়; ওরা··· নিজেরাই নিজেদের চিঠি লিখবে খবরের কাগজ থেকে নিজেরাই বিশ্বের সংবাদ সংগ্রহ করে নেবে। আত্মনির্ভরতায় অপূর্ব্ব আনন্দ আছে। সে-আনন্দের সঙ্গে এদের একবার পরিচয় যদি করিয়ে দিতে পারা যায়···

জিমি কুলী মজুরদের চিঠিপত্র বিশ্লেষণ করে দেখলো এক হাজার শব্দ মজুরদের লেখালে তারা তাদের চিঠিপত্র নিজের হাতে লিখতে পারবে, এবং লেখাপড়ার কাজটা মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারবে। পরের দিন পাঁচহাজার কুলীদের নিয়ে সে এক প্রকাণ্ড সভা বসালো এবং ঘোষণা করলো যে সে তাদের লেখাপড়া শেখাবে। চীনা কুলীমজুররা তো অবাক। আরে! 'বাবু' বলে কি, চাষী-মজুর আবার লেখাপড়া শেখে নাকি! লেখাপড়া শেখে তো বাবুরাই। তার ওপর চীনা ভাষায় ৪০,০০০ এর ওপরের বেশী বিচিত্র শব্দ আছে। চাষী মজুররা তো বাপু কোন কালেই লেখাপড়া শেখে নি।

···'পয়সা কড়ি লাগবে না, যারা শিখতে চাও, পড়তে

চাও লিখতে চাও ; তারা এগিয়ে এসো'—জিমি পাঁচহাজার শ্রমিকদের মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিলো। ভয়ে কেউ এগিয়ে আসে না, জিমি যে কেমন কথা বলবে তা যদি এরা জানতে পারতো তাহলে কেউই আসতো না এই সন্তায়। শেষে অনেক ভয়ে ভয়ে কৌতূহল ভরে পাঁচ হাজার শ্রমিকদের মধ্যে এগিয়ে এলো চাল্লিশ জন শ্রমিক। তাদের নিয়ে শুরু হলো জিমির নব-অভিযান। প্রতি রাত্রে এক ঘন্টা করে ক্যাম্পে এই লেখাপড়া 'খেলা' কাজ চলতে লাগলো। চার মাস পরে সেই চাল্লিশ জনকে এনে জিমি দাঁড় করালো ক্যাম্পের সমস্ত শ্রমিকদের সামনে। অন্য সমস্ত চীনা-মজুরদের বিস্ময়ে হতবাক করে তারা ব্ল্যাক্ বোর্ডের ওপর জিমির লেখা চমৎকার পড়ে গেল। তারপর সারা ক্যাম্পে সাড়া পড়ে গেল। জিমির ছাত্র-সংখ্যা এর পর থেকে হু হু করে বেড়ে যেতে লাগলো। রাত্রি বেলা সারা ক্যাম্পে যেন পাঠশালা বসে যায়। বয়স্ক ছাত্রেরা গলা ফুলিয়ে দুলে দুলে পড়তে থাকে। সে এক অতি অদ্ভুত দৃশ্য। তাদের জানবার ও লেখবার কী তীব্র আকাঙ্খা। সমস্ত দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর রাত্রে তারা পড়তে লিখতে বসে। তাদের দিকে তাকিয়ে আনন্দ সহানুভূতিতে জিমির চোখে জল আসে।

হঠাৎ একদিন তার মনে হলো এই ক্যাম্পের মাত্র পাঁচ হাজার চীনা মজুরকে লিখতে পড়তে শিখিয়ে তার কাজ শেষ হয়ে যাবে? যারা ছড়িয়ে আছে পশ্চিমের নানা সহরে নগরে গ্রামে সেই সব চীনা মজুরদের কথা জিমির মনে হলো। সে এলো ফ্রান্সে। ফ্রান্সে তখন চীনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আশি জন অধ্যাপক স্বেচ্ছাসেবক হয়ে এসেছিলেন। জিমি এই আশি জন অধ্যাপকদের কাছে নিজের পরিকল্পনা ব্যক্ত করলো এবং শ্রমজীবিদের শিক্ষিত করে তোলার সহজতম পন্থা হিসাবে তার আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী ও নব পদ্ধতি তাদের শিখিয়ে বুঝিয়ে দিলো। মাত্র এক হাজার শব্দ নিয়ে লেখাপড়া খেলা! এই আশি জন অধ্যাপক সারা ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়লো। আশ্চর্য্য ফল ফলতে লাগলো চারিদিকে। চীনা কুলীদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে সাড়া পড়ে গেল, নবজীবনের স্পন্দন-ধ্বনি ধ্বনিত হতে লাগলো। চীনা শ্রমজীবিরা শিক্ষিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পড়বার মতো বইয়ের অভাব সমস্যা দেখা দিতে লাগলো। মাত্র এক হাজার শব্দের ভেতর বই, সংবাদপত্র ছাপা হওয়া দরকার। এমন অদ্ভুত ঘটনা এর আগে কখনও দেখা যায়নি। মাত্র হাজার শব্দ সম্বলিত বই বা সংবাদ-পত্র! তা আবার হয় নাকি? কিন্তু না হলে চলবে কেন? এই সমস্ত শ্রমজীবিদের পড়বার মতো বই চাই তো। কিন্তু সে রকম সহজ বই কোথায়? কাজেই জিমি চীনা শ্রমিকদের সাপ্তাহিক পত্রিকা অনেক পরিশ্রম করে প্রকাশ করলো। মাত্র এক হাজার শব্দের ভেতর আবদ্ধ থাকলেও পত্রিকায় সারা জগতের প্রায় সব খবরই থাকতো। সাধারণ জ্ঞান ও জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো শ্রমিকরা সহজেই আয়ত্ত করে নিতে লাগলো। শ্রমিকদের এই আন্তরিক আগ্রহ দেখে জিমির মনে হলো শিক্ষার ভেতর দিয়ে এমনি করেই চীন জাতির গণ চেতনা আনা এবং রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হতে পারে। পশ্চিম রণাঙ্গনের এই ২০০,০০০ শ্রমজীবিরাই তো মহাচীনের ৪০০,০০০,০০০ জনসংখ্যারই একটা অংশ। মহাচীনের এই সংখ্যাহীন জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এই অগনণ জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা যায় তা কি কেউ ভেবেছিল। শিক্ষাই এবং রাজনৈতিক চেতনা জনগণের অবস্থার উন্নতি ঘটাবে এবং তাদের প্রতিরোধ-শক্তি বাড়িয়ে দেবে একথা জিমিই অনুভব করেছিল এবং এই মহান উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সার্থক করে তোলার জন্যে নিজেকে নিবেদন করেছিল।

জিমি নতুন করে শুরু করলো তার এই শিক্ষা আন্দোলন। মধ্য চীনের চ্যাংসাতে জিমি তার প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করলো। এই আন্দোলনের মধ্যে নাটকীয় বিষয়বস্তু সংস্থাপন করে সমস্ত চীনা জাতির কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। প্রাচীর পত্রে বক্তৃতায় কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা-আন্দোলনকে সুদূর প্রসারী করে তোলার চেষ্টা চলতে লাগলো। গুদাম-ঘর, সাধারণ গৃহস্থের বাড়ী, আনন্দকুঞ্জ এমন কি মন্দিরকে শিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত করা হলো। অনেক জায়গায় ভোর রাত্রেও চাষী মজুররা পাঠ গ্রহণ করতো। জিমি চ্যাংসা সহরকে কয়েকটা ভাগে বিভক্ত করে ফেললো। ছাত্রদের গ্রহণ করতে লাগলো শিক্ষক

হিসাবে। চাঁদের সংগ্রহে জিমি প্রচুরভাবে পেলো। শ্রমজীবিদের মধ্যে অসম্ভব উৎসাহ দেখা দিতে লাগলো। আন্তরিক আগ্রহে ও শুভ ও সৎ ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে। জিমির জীবনে তারই আভাষ পাওয়া গেল। প্রথম পরীক্ষায় ১,৪০০ জনের মধ্যে ২৬৫ জন শ্রমজীবি সাফল্য লাভ করলো। জিমি অবাক। এতখানি সে আশা করতে পারেনি। জিমি তার সহকারীদের নিয়ে বিপুল বিক্রমে চীনের দর্জায় এইভাবে শিক্ষা-আন্দোলন চালাতে লাগলো। নানা-স্থানে কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রতিষ্ঠা হতে লাগলো। সমস্ত চীন জুড়ে প্রাদেশিক গণশিক্ষা সমিতি গড়ে উঠলো এবং পরিশেষে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে পিকিংয়ে প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করতে সমর্থ হলো। তখন এই গণ-শিক্ষা আন্দোলনের বার্ষিক বাজেট হলো ৩৬০০ চীনা ডলার।

১৯২৮ সালে জিমি এলো আমেরিকায় সম্মানীয় ডিগ্রি নেবার জন্যে। আমেরিকা থেকে তার নব শিক্ষা আন্দোলনের জন্যে সে অর্থ সংগ্রহ করতে বিস্মৃত হলো না। আমেরিকার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সে অর্দ্ধ কোটি ডলার সংগ্রহ করতে সমর্থ হলো। হেনরি ফোর্ড তার হাতে প্রচুর অর্থ দিয়ে প্রশংসা করে বলেছিল: তোমার পরিকল্পনা চমৎকার। আমি যেমন অসংখ্য মডেল তৈরী করে যাচ্ছি, তুমিও তেমনি অসংখ্য মানুষদের শিক্ষিত করে তোলো। হেনরি ফোর্ডের এই মন্তব্য জিমির মনে ছিল। সমালোচকরা একদা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে জিমিকে জিজ্ঞাসা করেছিল: একটা জেলাকে শিক্ষিত করে তুলতে তোমার সাত বছর লাগলো হে! সারা চীন-দেশে কমসে কম ১২০০ হাজার জেলা আছে, তোমার গণ-শিক্ষা আন্দোলন তাহলে ১২,৩০০ বর্ষ-ব্যাপী বলো। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রত্যুত্তরে জিমি একটু হেসে বলেছিল: মোটেই না, প্রথম মডেল নির্খুঁত করে তুলতে হেনরি ফোর্ডের অনেকদিন লেগেছিল বটে কিন্তু এই নির্খুঁত মডেলকে অনুসরণ করে স্বল্প সময়ের মধ্যে হেনরি ফোর্ড অসংখ্য মোটর গাড়ী তৈরী করতে কি পারেননি?

আমেরিকা থেকে জিমি ফিরে এলো চীনে প্রচুর উৎসাহ আর অর্থ নিয়ে। বৈপ্লবিক মতবাদও সে নিয়ে এলো। শিক্ষা সম্পর্কীয় নবজাগৃতির সার্থকতা নিরূপিত হয় ক্লাস-ঘরের সঙ্কীর্ণ ছক্ কাটা গণ্ডির মধ্যে নয় জনসাধারণের মধ্যে। একক চেষ্টায় এই অভিযানকে কার্যকরী করে তোলা সম্ভব। এ হলো জিমির বৈপ্লবিক মতবাদ। কথা নয় কাজ। এই ছিল জিমির সার্থক বাণী। সবাই এই গণ-শিক্ষা আন্দোলন নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে সে সম্বন্ধে সুদীর্ঘকাল পরেও কেউ কোন বই লেখে নি।

জিমি পণ্ডিত অধ্যাপক শিক্ষাব্রতী থেকে সুরু করে গবর্ণমেণ্টকে পর্য্যন্ত সহর থেকে সরিয়ে নিয়ে এলো গ্রামে। পিকিং সহর থেকে সবাইকে সরিয়ে নিয়ে এলো গ্রামে। বিখ্যাত, শিক্ষাব্রতী, পণ্ডিত, অধ্যাপক সহর ছেড়ে তিন সিয়েন (Ting Hsien) গ্রামে এসে জনসাধারণের সঙ্গে শ্রমজীবিদের বন্ধু হয়ে উঠলো। মাটির ঘরে, কুঁড়ে ঘরে তাদের সহজ জীবন-যাত্রা সুরু হলো। জনগণের বন্ধু তারা হয়ে উঠলো। পণ্ডিত ও অধ্যাপকদের নতুন করে শিক্ষা সুরু হলো সহজভাবে সরল ভাষায় শ্রমজীবিদের কেমন করে শিক্ষিত করে তোলা যায় তারই প্রথম পাঠ গ্রহণ করতে লাগলো অধ্যাপক ও পণ্ডিতেরা শুধু অক্ষর পরিচয় নয়, পড়তে বা লিখতে শেখা নয়, কেমন করে সামাজিক স্বাস্থ্য ও অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো যায় সে শিক্ষাও চলতে লাগলো এই গণ-শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে। এই গণ-শিক্ষা আন্দোলনই চীনদেশে নব-জীবন আন্দোলনের সূচনা করলো। সারা চীনা জাতির সামগ্রিক উন্নতই হলো এই গণশিক্ষা আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য। জাতিকে বাঁচাতে গেলে উন্নত করতে গেলে সহর নয় গ্রামকেই বাঁচানো ও উন্নত করা আগে দরকার। তাই গণ শিক্ষা আন্দোলন গ্রামকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো। জাতির শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, চিন্তানায়ক, শিক্ষাব্রতীরা গ্রামকে বাঁচাবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হলো এই গণশিক্ষা আন্দোলনের পুরোভাগে এসে। ছাত্রেরা, অধ্যাপকেরা এই গণশিক্ষা পরিষদ থেকে বিশেষভাবে শিক্ষা-প্রাপ্ত হয়ে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো—গ্রাম্যজীবনে নবচেতনার মন্ত্রবাণী নিয়ে। ছোট ব্রতীদল গ্রামে গ্রামে পরিদর্শন করে বেড়াতে লাগলো। বিশেষভাবে শিক্ষিত ছাত্র শিক্ষক তার শিক্ষাকে বাস্তব কাজে ফুটিয়ে তোলার জন্যে বেছে নিলো এক একটি গ্রামকে। সেবাব্রতী বিশেষভাবে শিক্ষিত ছাত্র শিক্ষকের আন্তরিকতায় ও চেষ্টায় প্রত্যেকটি গ্রাম যখন

স্বাবলম্বী হ'য়ে উঠলো। জন-স্বাস্থ্য উন্নত হতে লাগলো তখন সে দেবাব্রতী ছাত্রকে অভিনন্দিত করা হতো গ্রামাঞ্চলের সহজ আনন্দ প্রকাশে বক্তৃতার আর বাজি পুড়িয়ে।

গণ-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের জনসাধারণকে শিক্ষিত করা হতে লাগলো উন্নত জীবন যাপনে। অমিতব্যয়িতায়, বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ আবাদ করায়। শুধু ভালো চাষী নয় বহুরকমের ব্যবসায়ী করে তোলার চেষ্টা চলতে লাগলো। সিকিংয়ের কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ পদত্যাগ করে সহর ছেড়ে চলে এলেন গ্রামে, গ্রামবাসীদের তিনি বন্ধু হয়ে উঠলেন। তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সিন-এর (Hsien) অর্থ-নৈতিক অবস্থার অসম্ভব উন্নতি ঘটানো সম্ভব হলো।

ইতিমধ্যে গণশিক্ষা পরিষদ থেকে ৮০,০০০ ছাত্র উত্তীর্ণ হয়েছে, অসংখ্য গ্রাম সমবায় নীতিতে গড়ে উঠে 'সিন' সমবায় প্রতিষ্ঠান একটা বিরাট কর্মকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। অসংখ্য উৎসুক দর্শন-প্রার্থী আসছে সেই সমবায় প্রতিষ্ঠানে জাতির নবজীবনের প্রাণস্পন্দনধ্বনি শোনার জন্যে দেখার জন্যে। সে-পথ অনুসরণ করার জন্যে। কেউ কেউ এখানে বিশেষভাবে শিক্ষা লাভ করে নিজ গ্রামে ফিরে গিয়ে সমবায় নীতি গ্রামোন্নয়নে মন দিল।

১৯৩৮ সালে হংকং চীনের রাজধানী হলো চীনের সর্বাধিনায়ক চিয়াং কাই শেক অধিনায়ক চ্যাং চি চুং (General Chang Chi Chung) হুনান প্রদেশের শাসনকর্তাকে জাপানীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বাহিনী গঠনের কাজে নিয়োগ করলেন। অধিনায়ক চ্যাং গণ-শিক্ষা আন্দোলনের স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন এবং জাতিকে নবজীবন দান করতে গেলে জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অটুট ও কার্যকরী করে তুলতে গেলে এই গণশিক্ষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সমবায় ভিত্তিতে দেশের গণ-জাগরণ আনা প্রয়োজন। তাই তিনি ডাক দিলেন জিমিকে। জিমি যেন এই আহ্বানের অপেক্ষায় ছিল। টিন-সিন-এর মতো স্বাবলম্বী ও সুদৃঢ় সারা প্রদেশকে করে তোলার জন্যে জিমির সাহায্য প্রার্থনা করা হলো। জিমি যে আহ্বান বাণীর জন্যে এতদিন নিঃশব্দ সাধনায় রত ছিলো, সে আহ্বান বাণী অবশেষে এলো। তার পরিকল্পনা আকাশ ছোঁয়া অবাস্তব নয় তা প্রমাণ করার জন্যে জিমি গেলো এগিয়ে। বিশেষ ভাবে শিক্ষিত দল নিয়ে সে গেল চ্যাংকতে। তার এই নব অভিযানে এগিয়ে এলো অসংখ্য নরনারী প্রায় ৩০,০০০ সাহায্যকারী এর মধ্যে ছিল আশ্রয়প্রার্থী অধ্যাপক, পণ্ডিত শিক্ষাব্রতী ও স্কুল-শিক্ষক—এঁদের সংখ্যা প্রায় ৫০০০হাজার।

জাতির দুর্গতির দিনের উপযোগী করে তাদের শিক্ষিত করে তোলা হতে লাগলো। দেশ-শাসন বিচার ব্যবস্থা, জন-স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নত করতে এক এক দলকে শিক্ষিত করে তোলা হতে লাগলো। প্রদেশের প্রত্যেকটি গ্রাম জনপদ যাতে সবদিক দিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে তারই বাস্তব-চেষ্টা চলতে লাগলো।

গণ-শিক্ষার মধ্যে দিয়ে মহাচীনে এলো নব জাগরণ—নব জীবন। জিমি তার ভাষণে একবার বলেছিল : গণ-জাগরণ না ঘটলে কোন জাতিই এ-পৃথিবীতে উন্নত হয়ে উঠতে পারে না। গণ-শক্তি হলো জাতির প্রাণ, এই নিদ্রিত প্রাণকে গণ-শিক্ষার মধ্য দিয়ে জাগরিত করা যায়। জাতির সংগঠন কাজে জন সাধারণের যোগ যতদিন না ঘটছে ততদিন এ পৃথিবীতে শান্তি আসতে পারে না।

গণ-শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক মানুষকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করা। সত্যকার মানুষে পরিণত করা দরকার। এই স্বয়ং সম্পূর্ণ মানুষ অন্য মানুষের সত্যিকারের বন্ধু হয়ে উঠতে পারে। পৃথিবীতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে গেলে গণ-শিক্ষার প্রয়োজন। শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন গণ-শিক্ষা। এই গণ-শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠলে শুধু চারটি স্বাধীনতা নয় পঞ্চম স্বাধীনতা—অজ্ঞানতা থেকে মুক্তিও সম্ভব হবে।

চীনে যা সম্ভব হয়েছে, সার্থক হয়েছে। আমাদের এ দেশে তা সম্ভব হবে না কেন? শরৎচন্দ্রের বৃন্দাবন কি এ দেশের জনগণের জন্যে এসে দাঁড়াবে না। জিমির মতো নিঃশব্দে কাজ করে যাবে না জাতির মুখ চেয়ে? সে মানুষ কোথায়? কোথায় সেই স্বয়ং সম্পূর্ণ গোটা মানুষ গড়ে তোলার পরিকল্পনা?

হঠাৎ কাঁধের ওপর একটি কঠিন স্পর্শ পেয়ে বাস্তব জগতে ফিরে এলাম। বিদেশী বন্ধু পিঠ চাপড়ে জিজ্ঞাসা করলো : কিহে সাহিত্যিক, পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে যে!

—একজন মানুষকে খুঁজছি!

বন্ধু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো : অসংখ্য পথচলা মানুষের মাঝে—কোন মানুষকে খুঁজছো এই অবেলায়?

কি উত্তর দেবো। অসংখ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ভিড় করে এলো মনে। উত্তর দিতে না পেরে ভাবতে লাগলুম কি উত্তর দেবো।

নারী সমাজ এবং গৃহ

শ্রীমায়া গুপ্ত

বারংবার শুনেছি "নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক নয়, পুরুষের কর্মক্ষেত্র বহির্জগৎ, নারীর কর্মক্ষেত্র গৃহ। নারী যখন এই বিধি অস্বীকার করেন তখন তাঁর এক inferiority complex—হীনমন্যতা প্রকাশ হয়।"

এই কথাগুলি বহুবার বহুজনের দ্বারা বলা হয়ে গেছে—হয়ত ধরা কঠিন—বিশেষ করে উক্তি। একদা সংযুক্ত প্রদেশের এক ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রীও বলেছিলেন ঐ কথাগুলি—এক বৃহৎ নারী শিক্ষা-কেন্দ্রে বহু শিক্ষিতা নারীর সমক্ষে—সুতরাং এ মতবাদ প্রাচ্যে কতদূর ব্যাপক তা আর বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই। ভারতে শিক্ষিতের হার শতকরা ১৭।১৩, প্রকৃত বা পূর্ণ শিক্ষিতের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প, এবং শিক্ষিত শ্রেণী মধ্যবিত্তেরই অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের মধ্যেও এই ধরনের চিন্তাধারারই প্রচলন সুতরাং অশিক্ষিত জনসমাজ যে নারীকে একমাত্র গৃহরক্ষিকা ভিন্ন আর কিছু ভাবতে পারেন না তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। যেখানে আর্থিক বাধা নেই সেখানে আছে সংস্কারগত বাধা—এবং যেখানে প্রকৃত পক্ষে গৃহের বাহিরেও জাতীয় ধনোৎপাদনের পূর্ণ অংশ নারী গ্রহণ করেছেন সেখানে সংস্কার দ্বারা তাঁকে গৃহ বন্দিনী জীবই কল্পনা করা হয়েছে।

এই ধরনের যুক্তি কত ভ্রান্ত তার বিচার করবার প্রয়োজন আছে এবং শিক্ষিত আধুনিক নরনারীরই তা বিচার করা কর্তব্য। 'নারীর কর্মক্ষেত্র গৃহ এবং বাহিরের কর্মক্ষেত্র গ্রহণ করতে হলেও নারীর প্রধান ক্ষেত্র গৃহ'—একথা অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নেবার কোন কারণ নেই। এই যে কর্মবিভাগ তা বর্তমান সময়েও শুধু মুষ্টিমেয় ধনী ও মধ্যবিত্ত নারীর জন্য—মধ্যবিত্তের সীমানার বাহিরে যে বিরাট নারী শক্তি জাতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে তারা এ নীতির বশীভূত নয়।

কর্মবিভাগের যে ব্যবস্থা মধ্যবিত্ত সমাজে প্রচলিত হয়েছে সামন্ত নীতি প্রচলিত চিন্তাধারা এবং তদনুসারে আর্থিক ব্যবস্থাই এই বিশ্বাসের মূলে। কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত সমাজ নিয়ে চিন্তা করবার জন্য এরূপ ভুল হতে পারে, এবং যা দুর্ভাগ্যবশতঃ ক'একশত বৎসর ধরে মধ্যবিত্ত নারীর জীবনে অলঙ্ঘ্য প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে সমগ্র নারী জাতির জন্য বিধান হিসাবে প্রচার করার মূলে যে অজ্ঞতা তা হতে মুক্ত হবার উপায় সমাজের বৃহত্তর শ্রেণীর নারীর জীবন যাত্রাকে সংস্কার-মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা বিচার। এই শেষোক্ত শ্রেণী সমাজের সমস্ত নারীর শতকরা ৭৫ হতে ৮০ ভাগ পর্যন্ত।

এই নারী মণ্ডলী তাঁদের পুরুষের সঙ্গে একত্রে সমস্ত কঠিন ও শ্রমসাধ্য কাজ করে থাকেন—। একত্রে ক্ষেতে কাজ করেন, বীজ বপন শস্য সংগ্রহ এবং বিক্রয় পর্যন্ত করেন—যার সাহায্যে সহরের সমস্ত ধনী ও ধনহীন মধ্যবিত্ত জীবিত থাকেন। তাঁরা কিষাণ রমণী। সমাজের আর বহু নর নারী আছেন যাঁদের সাহায্যে কল কারখানা চলে—যেখান হতে জাতির প্রয়োজনের ও বিলাসের সমস্ত বস্তু তৈরী হয় যেমন বস্ত্র, ঔষধ, ধাতুদ্রব্য ইত্যাদি। এই কলকারখানা গুলিতে প্রায় অর্দ্ধেক কর্মী নারী। এই সকল কর্মী নারীর গৃহ আছে, সন্তান আছে।

এই নারীরা যদি গৃহকেই একমাত্র কর্মক্ষেত্র বলে গ্রহণ করবার আদর্শ শিক্ষা করতেন তবে অবস্থা অচল হ'ত। তার কারণ বর্তমান যুগের উৎপাদন নীতি এবং তার ব্যবহার বৃদ্ধি। শুধু পুরুষের সাহায্যে সমস্ত কাজ হয় না, নারীরও প্রয়োজন। কোথাও কাজের সুবিধা হিসাবে বিভাগ,কোথাও কর্মী সংখ্যার বৃদ্ধি করে। যদি এই কিষাণ ও কর্মী নারীরা তাঁদের মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত ভগ্নীদের মত গৃহ সংরক্ষণে জীবন উৎসর্গ করেন তবে একদিকে বৃহত্তর সমাজের খাদ্য বস্ত্র ঔষধ এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব ঘটবে এবং অপরদিকে তাঁদের নিজেদের জীবন ধারণ সমস্যা প্রবলাকার ধারণ করবে। বর্তমানের ব্যক্তি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এই কর্মী সম্প্রদায় মধ্যবিত্তের গণ্ডীতেও উঠতে পারেন না—এবং তাঁরা যদি জাতীয় ধনোৎপাদনের নিজের গৌরবময় অংশ সুলভ না করেন, অপর জীবন ধারার আদর্শ গ্রহণ করেন তবে তাঁদের উপবাস হতে বাঁচাবার সাধ্য কোন রাষ্ট্রের নেই এবং সমগ্রভাবে সমাজও অভাব হতে অব্যাহতি পাবে না।

এই কর্মী নারী সমাজে যারা নিম্ন শ্রেণী বলে গণ্য তাঁদের ঘর আছে সন্তান আছে। যদি তাঁদের গৃহস্থালীতে শিল্পের অভাব থাকে তবে তার জন্য দায়ী নারীর কর্মজীবন নয়, দায়ী দারিদ্র্য, রাষ্ট্রের অনবহেলা ও অত্যাচার যার ফলে এই দারিদ্র্য। যে উৎপাদন নীতি সামন্ত তন্ত্রের সমর্থনে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সৃষ্টি করে সেই হৃদয় হীন শোষণ নীতি এই অন্যায় দারিদ্র্যের মূলে। কথাটা অন্যে বলার চেষ্টা করছি সেই জন্য দু-একটী বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। প্রবন্ধ বৃহৎ হয়ে যাবার ভয় আছে তাই সে চেষ্টা করা বৃথা, শুধু এইমাত্র বলা যায়, যে-সামন্ততন্ত্রের জমি ব্যবস্থায় এবং বাস্তি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় একের পক্ষে বহুকে শোষণ সম্ভব হয়, তার বিরুদ্ধে জগতের সর্বত্র জনমত সৃষ্টি হচ্ছে। রাষ্ট্র এই উৎপাদন নীতি সমর্থন করে ছোট খাটো আইন সংশোধনে শোষণ রোধ করবার চেষ্টা করেছে বহু কাল, স্কুলের বহু তত্ত্ব শিক্ষা দেবার চেষ্টা করেছে কিন্তু ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার ব্যর্থতার নিদর্শন রয়েছে। পূর্ণ কর্মের বিনিময়ে পূর্ণ খাদ্য বস্ত্র ও প্রয়োজনীয় বস্তু না পাওয়ার যে tragedy এবং মধ্যবিত্ত নারী সমাজকে কর্ম বিমুখ করে অপ্রয়োজনীয় করে রাখার যে tragedy, উভয়ের মূলে আছে ঐ নীতি যা এক বিরাট শোষণকে সম্ভবপর করেছে। যারা মধ্যবিত্ত নারী সমাজের ব্যর্থতাকে সমর্থন করে তারা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে কর্মী নরনারী সমাজের দারিদ্র্যকেও সমর্থন করে;—তারা সমর্থন করে এক নীতি—যার দ্বারা বহু অন্যায় সাধিত হয়।

এবার দেখা যাক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—নরনারীর এই কর্ম বিভাগ হতে কতটা উপকৃত হয়েছে। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত গৃহে একজন মাত্র উপার্জনক্ষম পুরুষ এবং প্রায় অর্দ্ধডজন আশ্রিত—সেই উপার্জনের দ্বারা হয়ত দু জনের পক্ষে যথেষ্ট তার অন্নদাস থাকেন। ফলে এই হয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবন যাত্রার মান নেমে যেতে থাকে। মধ্যবিত্ত সমাজে ধনী অভিজাতের অনুকরণে চলেন বা চলবার চেষ্টা করেন এইজন্য বাহ্যাড়ম্বরে কতকটা উপার্জন নষ্ট হয় এবং অভাব, অভিযোগ, দুঃখ সমস্ত চাপা দিয়ে রাখার নিয়ম চলে আসছে। যেহেতু প্রকাশ্য বিদ্রোহ হয় না—তাই বলে কি এমন কথা বলা যায় যে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বাস্থ্যহীন শক্তিহীন এবং নিরানন্দ নয়? এক্ষেত্রে নারী সমাজকে বাঁচবার মন্ত্র দিতে হবে কাজ খুঁজে নিয়ে সংসারকে পুষ্ট করবার। তাঁর নিজের এই অসহায় দারিদ্র্যে সমাজের কেহ উপকৃত নয় এবং তিনি তো নয়ই, স্থূল প্রভাবের সঙ্গে তাঁকে আর একটী অভাব সহ্য করতে হয় সে বস্তুটী তাঁর আত্মমর্যাদা। নীরব সহিষ্ণুতার কোন রকমে অর্দ্ধাহার দিয়ে সন্তান, স্বামী, আত্মীয় স্বজনকে বাঁচিয়ে রাখার সার্থকতা নেই, কারণ যারা অর্দ্ধাহারে বাঁচেন তাঁরা পূর্ণরূপে বাঁচেন না, তাঁদের দেহের ও মনের গঠন ক্ষয় হয় অল্পায়ু হন তাঁরা।

মধ্যবিত্ত সমাজের যে ব্যর্থ গৌরববোধ আছে যে নারীর উপার্জন করা সম্মান হানিকর, এর কারণ ধনী অভিজাতের অনুকরণ স্পৃহা। আর এক শ্রেণী আছেন যারা মনে করেন —এবং ঠিকই মনে করেন—যে নারী উপার্জনক্ষম হলে পুরুষ প্রাধান্য নষ্ট হবে। এই ধারণার মূলে বহুকালের শ্রেণী সংস্কার—কতকটা superiority complex বলাও যায় একে। এই সংস্কার বহুক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃতও হতে পারে। প্রথমোক্ত শ্রেণী—যখন অভিজাত সম্প্রদায়ের আদর্শে নারীর বহির্জগতের কর্মক্ষেত্র নিন্দনীয় ভাবেন তখন শেষোক্ত শ্রেণী কোন কথা না বলে—অথবা "ধর্ম লোকাচার নষ্ট হয়" "গৃহ ও পরিবার বন্ধন ছিন্ন হয়" "নরনারীর পবিত্র বন্ধন ক্ষুণ্ণ হয়" "নারীর মহৎ আত্মোত্যাগের আদর্শ নষ্ট হয়" ইত্যাদি বলে নারীর গতিপথ রোধ করেন। বলা বাহুল্য এরাই নারীর উচ্চশিক্ষা ও অন্যান্য অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার বিরুদ্ধে মতবাদ প্রচার করেন। এই মনোভাবের মূলে এক সঙ্কীর্ণ এবং অদূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গী দায়ী। মধ্যবিত্ত গৃহের কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় সেবার জন্য এবং নারীর উপর আধিপত্য রাখবার জন্য এই ভাবে মধ্যবিত্ত নারীকে অক্ষম করে রাখার যে দুঃখময় পরিণাম তা এদের চিন্তাশক্তির অতীত।

এই দৃষ্টিভঙ্গী বড় অদূরদর্শী—কারণ নারী স্বাবলম্বিনী হলে যে বন্ধু পুরুষ বন্ধু, সখী সাহায্যকারিণী হিসাবে নারীর কাছ হতে লাভ করেন—তার সন্ধান তাঁর জানা নেই তাই তুচ্ছ বস্তু হারাবার ভয় প্রবল হয়ে উঠেছে।

নারীর যে সমাজের কাছ হতে কর্মজগতে প্রতিষ্ঠা ও সাম্যের দাবী—তার দ্বারা হীনমন্যতা প্রকাশ হয় না। বরঞ্চ

তাঁর আত্মবলের গৌরবই প্রকাশ হয়। হীন অবস্থাকে নিষ্ক্রিয়ভাবে মেনে নেওয়ার মধ্যে হীনতা আছে তাকে অস্বীকার করবার শুধু চাই শক্তি। ভারতবাসী আজ জগতের স্বাধীন জাতির সমমর্যাদা চায়—তাকে হীনমন্যতা বলবে কোন মূঢ়?

ভারতীয় মধ্যবিত্ত নারী যদি নিজেদের গৃহসীমানার বাহিরে দৃষ্টিপাত করে জগতের আধুনিক নারীর জীবন ধারার পরিবর্তিত গতির সন্ধান লাভ করেন—তবে তাঁর পক্ষে এ কথা মেনে নেওয়া অসম্ভব যে নারীর কর্মক্ষেত্র শুধু গৃহ। আজকের ইতিহাসের প্রতি অধ্যায় তার সামনে তুলে ধরেছে যে নারী কেবল গৃহরক্ষিকা নন—সর্বপ্রথম তিনি রাষ্ট্রের বৃহত্তর সমাজের, শেষে, তারপর তিনি নারী। সর্বপ্রথম তিনি রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি, তিনি, ভবিষ্যতের সমাজ গঠনের ও সভ্যতার নব তন্ত্রের জন্য যে প্রচেষ্টা বিশ্বময় চলছে তার অংশভাগিনী—তিনি জাতির শক্তি ও ধনোৎপাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করেই গৌরবান্বিত হতে পারেন—নতুবা নয়। আজকের নারী জীবনের এই সার্থক চিত্র যদি তাঁর সামনে ধরা হয় কেমন করে তিনি বিশ্বাস করবেন—যে ভারতীয় মধ্যবিত্ত নারীর নিরুপায় নিষ্ক্রিয় জীবনই গ্রহণীয় এবং তিনি জগতের সমস্ত নারী মণ্ডলী হতে পৃথক এবং আদর্শস্থল?

গৃহ হচ্ছে বিশ্রাম আবাস—গৃহ কারাগার নয়—। অভাব ও drudgery গৃহকে—নরনারী উভয়ের কাছেই কারাগারে পরিণত করে। একথা বিশেষভাবে সত্য নারীর জীবনে, যখন তিনি গৃহ বন্দিনীর জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হন এবং বহির্জগতের কর্ম ও মুক্তি, বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে একাত্মতা হতে বঞ্চিত হন। কর্মজীবনের দায়িত্ব ও স্বাধীনতা দুইই মানুষকে বলিষ্ঠ ও সুন্দরই করে। আর্থিক ও সামাজিক পরাধীনতার জন্য মধ্যবিত্ত নারীর কাছে গৃহ এক বাধ্যবাধকতার আশ্রয় স্থল—অধিকাংশ স্থলে জাগ্রত নারী সমাজের কাছে তাদের বাধ্যতামূলক গৃহরক্ষিকার জীবন বহু কারণে কারাগার। কোথাও সেই কারাগারে অন্নবস্ত্রের প্রাচুর্য্যের জন্য অবসাদ এবং অধিকাংশ স্থলে নিরুপায়ে আজীবন অভাব ও অবহেলার যন্ত্রণার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ অবসাদ, এই হল মধ্যবিত্ত গৃহে নারীর জীবন। এই দুটী নিষ্ক্রিয় অবস্থাই মানুষের মনুষ্যত্বকে খর্ব করে। বাহিরের কর্ম-জীবনের উপযুক্ত পরিশ্রম হতে এই নারীরা মুক্তি লাভ করেন অবসাদ ও ব্যর্থতা হতে, এবং বৃহত্তর জীবনের সন্ধান পাবেন। অভাবগ্রস্ত নারী কর্ম ও উপার্জন দ্বারা মধ্যবিত্ত জীবনের মান উন্নত করেন যার দ্বারা তিনি অভাব ও পীড়নের অবসাদ হতে মুক্তিলাভ করেন; বৃহত্তর সমাজ তথা ব্যক্তিগতভাবে নারী উভয়েই ব্যবহারিক ও আত্মিক দিক হতে সার্থক হবেন। কর্মের পথ মুক্তির পথ। অভাব মোচন ও আত্মগৌরবের পথ—শুধু কর্ম দ্বারাই পাওয়া যাবে অপর কোন উপায়ে নয়।

শুধু গৃহকর্মে তা হয়না কারণ গৃহকর্মকে productive labour বলা যায়না। নারীর সমস্ত দিন গৃহকর্মের পরিশ্রমের পরিবর্তে নারী সমাজের বা রাষ্ট্রের কৃতজ্ঞতাভাজন হন নি—এ ঐতিহাসিক সত্য; এর দ্বারা তিনি বৃহত্তর সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরমুখাপেক্ষি, অসম্মানিত অধীন জীব হয়ে পড়েছেন। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর এ অতি বিরাট ক্ষতি—আত্মমর্য্যাদা ও আনন্দ দুটীর সম্বন্ধ নিকট, একটীর অভাবে অপরটী পাওয়া যায় না।

এ তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষতির কথা—এবার দেখা যাক গৃহের কি ক্ষতি নারীর হীন অবস্থায়। গৃহকে সুন্দর করবার ও তার দ্বারা আকৃষ্ট হবার মত গৃহ রচনার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন সে শিক্ষা মধ্যযুগের পরায় গৃহ রক্ষণে পাওয়া যায় না। সচ্ছলতা নাই অথচ দিবারাত্র ব্যাপী গৃহস্থালী, এ বিড়ম্বনার চূড়ান্ত। নরনারী উভয়েই কিছু সময় কর্ম ব্যপদেশে গৃহের বাহিরে থাকেন তবে গৃহ পরিবেশ আকর্ষণকর হওয়া স্বাভাবিক, এবং কেবল গৃহমুখী চিত্তই গৃহকে মনোহর করতে পারে—বাধ্যতামূলক নীতি নয়। অপর দিকে দিবারাত্র গৃহবন্দিনীর কাছে গৃহ কারাগার মনে হওয়াই স্বাভাবিক—এবং তা যদি না হয় তবে বুঝতে হবে যে তিনি বহুকালের বন্দী জীবনে ক্ষীণবল ও ভীরু হয়েছেন—বহির্জগতের মুক্ত রুক্ষ বাতাস আলো তাঁর ভীতির কারণ হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা সাহস ও সহযোগিতার দ্বারা মনকে ভয় মুক্ত করে জীবন যুদ্ধে নেমে পড়াই একমাত্র পথ—এই পথে নিশ্চয় জীবন অপেক্ষাকৃত বরণীয় হয়ে উঠবে। 'অপেক্ষাকৃত' শব্দটী ব্যবহার করছি এইজন্য যে বর্তমান ব্যক্তি ধনতান্ত্রিক

রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সমাজের দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর—যারা সমাজের শতকরা ৯০ ভাগ নরনারী—তাঁদের জীবনকে পূর্ণরূপে সার্থক করা সম্ভব নয়।

উপার্জনক্ষম হলে মধ্যবিত্ত নারী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গৃহজীবন সংস্কারে মনোযোগ দিতে পারবেন। জীবন ধারণের মান বৃদ্ধি হলে অভাব দূর হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরাম স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিচ্ছন্নতার প্রয়াস—স্বল্প চেষ্টায় নারী সমাজের মধ্যে মূর্ত করা সম্ভব হবে নতুবা নয়। গৃহকে মনোরম করবার জন্য বহির্জগৎকে আপন করতে হবে, দিবারাত্র গৃহের মায়া, অভাবজনিত সঙ্কীর্ণতায় নিরুপায় মজ্জমান অবস্থা গৃহকে ব্যর্থ করে। মানুষের মনের সহযোগিতা না থাকলে সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এ নিত্যকার ঘটনা দ্বারাই দেখা যায়—অধিক মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের প্রয়োজন নেই।

গৃহকে সুন্দর ও মনোরম করবার জন্য যে পরিমাণ সময় ও শক্তিক্ষয়ের প্রয়োজন, নারী যদি বাহিরের কর্মজীবন গ্রহণ করে—তবু তার অভাব হবার কথা নয়, এবং যে নারী সকাল হতে রাত্রি পর্যন্ত নিত্য গৃহকর্ম করতে থাকেন তাঁদের চেয়ে কর্মী মেয়েরা এ কাজ ভাল পারেন। এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। গৃহ যখন নরনারী উভয়ের সমবেত চেষ্টা, সম্রদ্ধ সহযোগিতা এবং উভয়ের স্বাধীনতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে গৃহকে মনোরম করবার জন্য কর্মীকে দিবারাত্র অনন্ত-কর্মা হয়ে গৃহে আবদ্ধ থাকবার প্রয়োজন হয় না। সামান্য কয়েক ঘণ্টায় গৃহকর্ম সমাধা হতে পারে এবং তার কৌশল নারী কর্মজীবনে স্বয়ং শিক্ষা করে নেন —। সাহায্যকারী দাস-দাসীর প্রচুর প্রয়োজন নেই তার জন্য এবং অপ্রয়োজনীয় গৃহ-কর্ম (মধ্যবিত্ত সমাজে গৃহকর্মের অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয় drudgery) বাদ দেওয়া প্রয়োজন। বর্তমান যুগে প্রয়োজনীয় গৃহকর্মের ও বহুলাংশ জনসাধারণের সুবিধার জন্য জাতীয় উৎপাদনের পর্যায়ে আনবার চেষ্টা হচ্ছে—ও সে চেষ্টা উত্তরোত্তর সার্থকতা লাভ করছে।

প্রকৃত সমাজ সেবককে এই সমস্ত বিষয়গুলি ভেবে দেখতে হবে। পুরাকালের রীতিনীতিতে আজকের জীবনের সমস্যা দূর হবে না—সমস্ত সংসারে তার নজির রয়েছে। বৈজ্ঞানিক বিচার ধারায় পথ নির্বাচন করা চাই। সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় কর্মীর পক্ষে বর্তমান বাস্তব জীবনের রূঢ় অভাব অভিযোগের মূল প্রশ্নগুলি এড়িয়ে পুরাতন আদর্শবাদ প্রচার করা অত্যন্ত অজ্ঞতার পরিচয়। পথের নির্বাচন ও নির্দেশ নর নারী উভয়ের জন্য ন্যায়সঙ্গত ও বাস্তবিক জীবনে লাভজনক হওয়া চাই।

এরা ওরা তারা

শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী

এরা কপের বোঝাটি মাথায় বহিয়া ধরায় জন্ম নিল,
ওরা পরদারে ঘোরে কারবার করে রঙীন হইয়া গেল,
তারা বিনা মূলধনে লাভ তুলে নিতে ট্যাক্‌সো বসাবে দিল।

এরা একবেলা কচু আধপেটা খেয়ে মরিয়া হইয়া বাঁচে,
ওরা পেট পুরে খেয়ে অন্যে না চেয়ে নিজেরে লইয়া আছে,
তারা পরের উপরে নিজে খেয়ে আগে রপ্তানি করে পাছে।

এরা নেংটি পরিয়া গামছা কাঁধেতে সকালে চলিয়া যায়,
ওরা ধুতি জুতা পরে খাতা বগলেতে পরদার তাগাদায়,
তারা ছাট্ কোট্ পরা কপোতকপোতী ট্যাক্সিতে শোভা পায়।

এরা তাড়ির নেশায় গাছের তলায় অজ্ঞান হয়ে থকে,
ওরা চোরের অন্নেতে ঘুম নাহি যায়, সারারাত জেগে থাকে,
তারা তেতালার শুয়ে প্রেয়সীর পাশে, দারোয়ান দ্বারে হাঁকে।

এরা কোদাল তুলিয়া মারামারি করে, মাপে পুতে, তাথে তাথে,
ওরা চক্ষুবুজি করিতে শুদ্ধি আদালতে যায় দেখে,
তারা দত্ত লইয়া ভণ্ডামি করে স্বার্থের পানে চেয়ে।

এরা পরের স্বার্থে, হায় হতভাগা, ঢালিছে জীবন প্রাণ,
ওরা মূর্খ পাইল বিশাল বিশ্বে পরদারি অবসান,
তারা দর্পী করিল সুযোগ লভিয়া মানুষের অপমান।

এরা বুঝেও বোঝে না এদেরি মাঝারে সুপ্ত কি মহাবল,
ওরা শুনেও শোনে না মহাকাল কেন টানিতেছে রসাতল,
তারা দেখেও দেখে না অন্নেতে ঢাকা রয়েছে কি হোমানল।

রবীন্দ্র-কাব্য পরিক্রমা (১)

শ্রীমহেন্দ্র নাথ

(পূর্বানুবৃত্তি)

তারপর যে দুর্জয় এবং অবিনশ্বর প্রতিভার সৃজন শৈলী ভারতীয় সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের সাথে সংযুক্ত ক'রে দিলো তিনি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর জীবন-প্রবাহের বিচিত্র কলধ্বনির আলোচনা—প্রবন্ধান্তরে করবার চেষ্টা করেছি। কতোটুকু সফলতা লাভ ক'রেছি, জানি না।*

আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর কবি সাহিত্যের ভাব-সম্পদ, তত্ত্বানুভূতি প্রভৃতি আলোচনা করবার চেষ্টা কোরব।

কাব্যে তত্ত্ব-সন্ধানের কোন সার্থকতা আছে কিনা অর্থাৎ মূল আলোচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের জীবন পরিবেশ, রবীন্দ্র মানসের অন্তরালে যে ভাবধারা, এক কথায় রবীন্দ্র মানসের বিরাট পটভূমির আলোচনা করা দরকার হতে পারে রবীন্দ্রনাথের জীবনে বাহিরের পরিবেশ বা জীবনের মূল্য বা প্রভাব তেমন নেই; আপন প্রাণাবেগের সৃজনমুখর গতিবেগই তাঁর সৃষ্টির মূল কথা।

তবু কাব্যালোচনার আগে সংক্ষেপে তাঁর জীবনাদর্শ ও ভাবধারার আলোচনার প্রয়োজন আছে ব'লেই মনে কোরি।

উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাকপৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কাজেই রবীন্দ্রনাথের জীবনে উপনিষদের প্রভাব কোন মতেই উপেক্ষনীয় নয়। প্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন :

"কিন্তু সব থেকে বেশি করিয়া যে জিনিষের প্রভাব তাঁহার জীবনে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কাজ করিয়াছে—সে হইতেছে উপনিষদের প্রভাব। ...রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মধ্যে যে সংযম দেখিতে পাই, তাহা তাঁহার ঔপনিষদিক শিক্ষার ফলে—যে শিক্ষার স্রোত তাঁহার জীবনে ফল্গুর ন্যায় বহিয়া তাঁহার অগোচরে কাজ করিতেছিল। তাঁহার নাটো-উপন্যাসে, এমন দুই একটি চরিত্র আছে, যাহারা রবীন্দ্রনাথের এই ঔপনিষদিক আদর্শ সম্ভূত। ...তাঁহার ব্রহ্মচর্যাশ্রম সেই উপনিষদ যুগের গুরু গৃহের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্যই বলিতেছিলাম—রবীন্দ্রনাথের জীবন উপনিষদের শিক্ষার অভিব্যক্তি।" (রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড—পৃঃ ৩১)

রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর জীবনে ঔপনিষদের প্রভাব অস্বীকার করেননি। সেইজন্যই অনেকে তাঁকে ঋষি আখ্যায় আখ্যায়িত ক'রে পরিতৃপ্তি লাভ করেন। কিন্তু উপনিষদের আদর্শকে গ্রহণ কোরলেও উপনিষদের ব্যাখ্যাতেই তিনি তাঁর সৃষ্টি প্রতিভা নিয়োজিত করেন নি। উপনিষদের ভাব-ধারাকে কেন্দ্র ক'রে অনুপম সৃষ্টি-সম্পদে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা,—'ধর্ম',—Religou of Man—'মানুষের ধর্ম' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর সাহিত্যিক জীবনে ঔপনিষদিক প্রভাবের সুস্পষ্ট পরিচয়। উপনিষদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—'তত্ত্বমসি'—'ওমিত্যেতৎ' প্রভৃতি মন্ত্র বাক্যের বিরাট ব্যাখ্যান, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—'কো বৈ ভূমা তৎ সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং' প্রভৃতির ভাবরূপ এবং ব্রহ্মতত্ত্বসার রবীন্দ্র সাহিত্যের সংগে অংগাংগীভাবে জড়িত। এই জন্যে রবীন্দ্র-নাথ যে কেবল উপনিষদের ভাষ্যকার তাহা নহে। উপনিষদের আদর্শ এবং ভাবধারাকে কেন্দ্র করে, তাকে আপন লোকোত্তর প্রতিভার আরক রসে জীর্ণ ক'রে, তিনি এমন একটা ভাব-জগতের সৃষ্টি করেছেন, যা' তাঁর একান্ত নিজস্ব, যার মাঝে একান্তভাবে তাঁর শক্তিই উদ্ঘাটিত। তিনি নিজেই বলেছেন :

"বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বার বার আবৃত্তি দ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সব কিছু গ্রহণ করতে পারিনি সকল মন দিয়ে। শ্রদ্ধা ছিল, শক্তি ছিলনা হয়ত। এমন সময় উপনয়ন হল। উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হ'য়েছিল, কেবলমাত্র মুখস্থ ভাবে না। বার বার সুস্পষ্ট উচ্চারণ করেছি আবৃত্তি করেছি এবং পিতার কাছে গায়ত্রী মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি। তখন আমার বয়স বার বৎসর হবে। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত বিশ্ব-ভুবনের অস্তিত্ব আর আমার

* রবীন্দ্র-মানস—মাঘিয়া মাঘ '৪৯সাং হ'তে জ্যৈষ্ঠ '৫০সাং পর্যন্ত প্রকাশিত।

অস্তিত্ব একান্তক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তার সঙ্গে অখণ্ড।" (মানুষের ধর্ম, পৃঃ—১০১—১০২)

এ' উক্তির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে ভাবময় রূপ আমাদের ধ্যাননেত্রে ভেসে ওঠে, তা' কি সেই উপনিষদ যুগের ব্রহ্মতত্ত্বান্বেষী সৌম্য-সাধকের রূপ নয়! এই রূপ-পরিধিতে যে জগৎ ভেসে' ওঠে, তা' কি সেই ব্রহ্মিষ্ঠ ঋষিদের জগৎ নয়। যে জগৎ হ'তে তাঁরা বিশ্ববাসীকে ডেকে বলেছিলেন :

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত
মাদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
ত্বমেব বিদিত্বাইতি মৃত্যু মেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

(শ্বেতাশ্বতঃ উপনিষদ)

প্রাচীন ভারতের এই গৌরবময় যুগকে রবীন্দ্রনাথ যে কী অপরিসীম শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করেছেন, তার ইংগিত আমরা পাই নিম্ন কবিতাটিতে।

"একদা এ' ভারতের কোন বনতলে
কে তুমি মহান প্রাণ, কী আনন্দ বলে
উচ্চারি' উঠিলে উচ্চে—'শোন বিশ্বজন
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধাম বাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়; তাঁরে জেনে' তাঁর পানে চাহি'
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।
আর বার এ' ভারতে কে দিবেগো—আনি'
সে মহা আনন্দ মন্ত্র, সে উদাত্ত বাণী
সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্যে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা,—সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃত বার্তা?
যে মৃত ভারত
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।

(নৈবেদ্য : শূন্যস্থ বিশ্ব)

এই কবিতাটির মাঝে উপনিষদের প্রভাব যে কতো বেশী এবং ঔপনিষদিক আদর্শ ও যে যুগের মুখর ঐতিহ্যকে রবীন্দ্রনাথ যে কী অপরিসীম শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, তাই-ই অনুপমরূপে প্রকাশিত হ'য়েছে। তাঁর 'ধর্ম' গ্রন্থে উপনিষদের তত্ত্ব-সমূহের ব্যাখ্যা তিনি বিশদভাবেই ক'রেছেন। যথা স্থানে—তা আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ ব্যাখ্যানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

What must be the religious ideal that is to rule our Indian centre of culture? The one abiding ideal in the religious life of India has been *mukti*—the deliverance of man's soul from the grip of self, its communication with the Infinite soul through its union in *Ananda* with the universe. (Creative Unity, page 201.)

এই সমস্ত ভাষণ এবং আরও অসংখ্য তত্ত্ব ব্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে যে-ভাবধারা, যে-জীবনাদর্শ প্রকাশিত হ'য়েছে, তা' যে সর্বাংশে—ঔপনিষদিক তাতে সংশয়ের আর অবসর কোথায়। প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্ম সাধনা বর্তমান যুগ-সংস্কৃতির সাথে মিলিত হ'য়ে বিরাট সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে যে রবীন্দ্রনাথে বিকাশ লাভ করেছে' তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে! এই যে সমন্বয় সাধন—ইহার মাঝেই রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব। রবীন্দ্রনাথে যে কেবল প্রাচীন এবং বর্তমান কালের মিলন সাধিত হ'য়েছে, তা' নয়। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য ভাবধারাও একটা বিস্ময়কর সামঞ্জস্য সাধিত হ'য়েছে। এই জন্যই তিনি এতো বড়—তাঁর মনীষা সমস্ত মানবিক পরিমিতির অতীত। পাশ্চাত্যের রূপবাদ এবং প্রাচ্যের ভাববাদ রবীন্দ্রকাব্যে অবিচ্ছেদ্য সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এমন উদার পরিণতি লাভ ক'রেছে, যার তুলনা সর্বকালেই বিরল। এ' জন্যই কোনো একটা দেশ বা কোন নির্দিষ্ট কালের সীমার মাঝে তাঁকে আবদ্ধ করা যায় না। সর্বদেশ, সর্বকাল তাঁকে আপন বুকের সন্তানরূপে দাবী করে। বিশ্বজনীনতা তাঁর কাব্যে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য—বিশেষ ক'রে রামায়ণ মহাভারত এবং কালিদাসের অমর সাহিত্যের প্রভাবও রবীন্দ্রনাথে উপেক্ষার বস্তু নয়। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত ব'লেছেন :

"সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য, বিশেষ ক'রে কালিদাসের কাব্য

রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে বিশেষ ভাবে নাড়া দিয়াছে। এর কারণ, এ' সাহিত্যের সাথে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিশেষ যোগ আছে।" (জয়ন্তী উৎসর্গ, পৃঃ ১৮।)

ভাবতীয় ভাববাদের দিক দিয়েও কালিদাসের সাথে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ মিল আছে। কালিদাসের কাব্যে যেমন বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ভাবময়, রসঘন সত্তার সাথে মানব জীবনের ভাব ও রসের মিলন সাধিত হয়েছে, রবীন্দ্র কাব্যেও তাই-ই। প্রকৃতি যে জড় পদার্থ নয়—অনন্ত বিচিত্র সৌন্দর্য মাধুরী যে ভাবুকের সৃষ্টি ও অনুভূতির সীমায় ধরা দেয়, প্রকৃতি মানুষে যে আনন্দ-বেদনার যোগাযোগ আছে কালিদাসের কাব্যে তা' উদ্ঘাটিত হ'য়েছে। রবীন্দ্র কাব্যেও তাই-ই। এ' দিক দিয়ে ভারতের এই দুই শ্রেষ্ঠ কবির মাঝে নিবিড় আত্মীয়তা আছে। তারপর কালিদাস এবং তাঁর কাব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে সশ্রদ্ধ অনুরাগ আছে 'মেঘদূত' 'সেকাল'—'কালিদাসের প্রতি'—'কুমার সম্ভব' প্রভৃতি কবিতাগুলোই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ। অথচ কালিদাসের মহাকাব্য 'মেঘদূত' এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'মেঘদূত'এর মাঝে ব্যবধান অনেকখানি। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি—কালিদাসের প্রভাব ইহার মাঝে অস্পষ্ট। রামায়ণ বা মহাভারতের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হ'য়ে তিনি যে সমস্ত কবিতা লিখেছেন সে গুলোর মাঝেও রামায়ণীয় বা মহাভারতীয় উপাদান গৌন; রবীন্দ্র মানসের কল্পনাই তাতে মুখ্য। 'ভাষা ও ছন্দ'—'গান্ধারীর আবেদন'—'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ'—'চিত্রাঙ্গদা'—'বিদায় অভিশাপ' প্রভৃতি কবিতা-গুলোই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ। এদের মাঝে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাই গতিশীল—এদের স্রষ্টাও তিনি। তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্যই এদের মাঝে মুখর। এ' সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ক'একটি পংক্তি উদ্ধৃতির লোভ সামলাতে পারলাম না। তিনি লিখেছেন :

"সৃষ্টি কর্ত্তা কে, তাকে সৃষ্টির উপাদান কিছু বা ইতিহাস যোগায়, কিছু বা সামাজিক পরিবেষ্টন যোগায়। কিন্তু এই উপকরণ তাকে তৈরী করে না। এই উপকরণগুলি ব্যবহারের দ্বারা সে আপনাকে স্রষ্টারূপে প্রকাশ করে।"

তারপর একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি ব'লেছেন :

"সন্ন্যাসী উপগুপ্ত বৌদ্ধ ইতিহাসের সমস্ত আয়োজনের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাছে এ কী মহিমায়, এ কী করুণায় প্রকাশ পেয়েছিল। এ যদি যথার্থ ঐতিহাসিক হোত তা' হ'লে সমস্ত দেশ জুড়ে' কথা ও কাহিনীর ধূলিলুট পড়ে যেত। আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি তার পূর্ব বা তার পরে এ' সকল চিত্র ঠিক এমন ক'রে দেখতে পাননি। (কবিতা আশ্বিন ১৩৪৮ বাং)

সে জন্যই ব'লেছি কালিদাসের কাব্য, রামায়ণ বা মহাভারতের প্রভাব রবীন্দ্রনাথে থাকলেও সৃষ্টি কর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একমাত্র রবীন্দ্রনাথ। অথচ উদ্ধৃতিটিতে তিনি তাঁর কাব্য জীবনে কোনো কিছুর প্রভাবই অস্বীকার করেননি।

তারপর তিনি ব'লেছেন :

"ইতিহাস সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষের সারথ্যে চলেছে বিরাটের মধ্যে, ইতিহাসের অতীত সে মানবের আত্মার ক্ষেত্রস্বরূপে। আমাদের উপনিষদে এ' কথা জেনেছিল, এবং সেই উপনিষদের কাছ থেকে আমি যে বাণী গ্রহণ ক'রেছি, সে আমিই ক'রেছি, তার মধ্যে আমারই কর্তৃত্ব।" (কবিতা : আশ্বিন, ১৩৪৮ বাং)

রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত কবিতা-গুলো সম্বন্ধেও কবির এ উক্তি সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। 'গান্ধারীর আবেদন'—'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' প্রভৃতি কাহিনী কবিতাগুলোর মাঝে মহাভারতের প্রভাব আছে অস্বীকার কোরি না; কিন্তু এদের চারিত্রের মাঝে যে মৌলিক স্বাতন্ত্র্য, যে গৌরব সংযোজিত হ'য়েছে, তা' রবীন্দ্র মানস লোকের নিজস্ব সৃষ্টি। এদের মধ্য দিয়ে আমরা কর্ণ ও কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে নতুন ভাবে দেখতে পেয়েছি। মহাভারতের কর্ণ ও কুন্তী বা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সাথে, রবীন্দ্রনাথের কর্ণ ও কুন্তী বা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর তেমন কোনো উপাদানিক বা চারিত্রিক সামঞ্জস্য নেই। 'চিত্রাঙ্গদা' বা 'বিদায় অভিশাপ' কবিতা সম্বন্ধেও এ' উক্তি খাটে। সে জন্যই বার বার বোলতে চেয়েছি উপনিষদ হ'তে আরম্ভ ক'রে রামায়ণ মহা-ভারতের প্রভাব রবীন্দ্রনাথে থাকলেও, তাঁর প্রতিভা নতুন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে। উপনিষদ রামায়ণ

মহাভারতের পারিপার্শ্বিকে নতুন আলোক সম্পাত ক'রেছে।

রবীন্দ্রমানসের পটভূমিকায় যে কেবল বেদ উপনিষদ বা রামায়ণ মহাভারতের বিপুল প্রাণ সম্পদ তাঁর সৃষ্টি সাধনকারী প্রতিভায় বিচিত্ররূপে প্রেরণা সঞ্চার ক'রেছে, তা' নহে। বিরাট বস্তু বিশ্ব বা বিশ্ব জীবনের বিচিত্র রূপও তাঁর আহরণ পদ্ধতি এবং অনুভূতিকে 'বিজন বিষাদে ঘন অন্তরের নিভৃত ছায়া' হ'তে 'সংসারের তীরাভিমুখী ক'রেছে। অন্তর্মুখী কবি-মানসে ইহার অর্থাৎ এই বস্তু বিশ্বের প্রভাব খুব বেশী না হ'লেও একবারে উপেক্ষার বস্তু নয়। হ'তে পারে এই বস্তু বিশ্বানুভূতিকে অতিক্রম ক'রে তাঁর আত্মকেন্দ্রিক আবেগ বিহ্বল ভাব কল্পনা বার বার জয়ী হ'য়েছে; হ'তে পারে তাঁর নির্বিকার নিরাসক্ত কবি-মানসে ভাবলোকের গভীরতায় মাঝেই চরম সার্থকতা লাভ ক'রেছে; কিন্তু জীবনের নানা আকস্মিক মুহূর্তে, অনুভূতির এ' অসম্পূর্ণতার বেদনা তাঁকে যে পীড়িত ক'রেছে বিরাট রবীন্দ্রসাহিত্যে তার প্রচুর প্রমাণ আছে। স্বধর্মানুভূতি এবং অসম্পূর্ণতার দুর্বলতাও তিনি সচেতন মুহূর্তে অস্বীকার করেননি। তাই—

'বিপুলা এ' পৃথিবীর কতোটুকু জানি'—

এ' উক্তিতে ভূমিকা ক'রে পরিশেষে তিনি ব'লেছেন:

"তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।"

কিন্তু এই অনাড়ম্বর ও সরল স্বীকৃতির অন্তরালে যে সংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর কবি মানসের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কি এতোই সুলভ! রবীন্দ্রনাথের বিদেহী কবি-কল্পনা কি অগাংক্তেয়দের সে অলিগলিতে ঘুরে বেড়ায়নি, যেখানে—

"চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল
তাঁতি বসে তাঁত বুনে, জেলে ফেলে জাল।"

ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে কোন সামাজিক মানুষই স্ব-রচিত উর্ণনাভের আবেষ্টনীর মাঝে প্রশান্তচিত্তে অবস্থান কোরতে পারেন না। বাহিরের বিশ্বজীবনের সংঘাত মুখর তরংগাঘাত তাঁকে রাজপথে—জীবনের ধূলি ধূসর চলার পথে টেনে' আনবেই। কাজেই রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্ব-মানবিক চেতনা-সম্পন্ন, দরদী মনীষীর পক্ষে বহির্জাগতিক ঘটনা সংস্থান সম্পর্কে নির্লিপ্ত ও উদাসীন থাকা কোনো মতেই সম্ভব হ'তে পারে না। দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত এবং পরবশ বাঙ্গালী জীবনের দুঃখবেদনায় যে তিনি কী দুঃসহ মর্মবেদনা ভোগ কোরতেন, তা কি আমরা জানিনা! 'অখ্যাত জনের' জীবন-পরিবেশকে হয়তো বা তিনি পরিপূর্ণ রূপ দিতে পারেন নি। তথাপি তাঁর মরমী-মন তাদের আপন কবির আবির্ভাব কামনা ক'রে ব'লেছে:

"কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি' কান পেতে আছি।"

তাঁর অন্তরের এই অনাড়ম্বর বাণীর কি কোন তুলনা আছে!

জানি রবীন্দ্রনাথের মতো লোকোত্তর প্রতিভার কাছে বহির্জাগতিক ঘটনা সংস্থান এবং ইহার রেখাপাত ও প্রেরণা সঞ্চারের ক্ষমতা খুব বেশি হতে পারে না। ক্ষণিক আকৃতির সৃষ্টি করে তা' পেছনে পড়ে থাকে, আর ভাব-গ্রাহী কবি মানস সমস্ত উপলক্ষ্য, সমস্ত আবেদনশীলতাকে অতিক্রম করে, বস্তু বিশ্বের অতীত যে-ভাবলোক, তাতে আপন স্বার্থকতার সন্ধান পায়। সমস্ত ব্যথা-বেদনার ঊর্ধ্বে যে শান্তির অমরাবতী, তাকে কেন্দ্র করেই তার সৃষ্টিধারা উৎসারিত হয়। তথাপি যে উপলক্ষ্য বা ঘটনা-সংস্থান, তাকে বৃহত্তর জীবনের সন্ধান দেয়, তার মূল্যও কোন কিছু উপেক্ষার বস্তু নয়। তা, হ'লে রবীন্দ্রমানসের পটভূমিকায় আমরা বহির্জাগতিক ঘটনা বৈচিত্র্যের অনিবার্যতাকে কোনো মতেই অস্বীকার করতে পারি না। বিরাট প্রতিভা এবং সৃষ্টির তুলনায় পটভূমিও যে ব্যাপক এবং বিপুল প্রসারী হবে তাতে বিস্ময়ের কি কোন কারণ আছে। সীমাহীন কাল ও বিচিত্র ভাবধারা, অনন্ত-কালব্যাপী বহুরূপী জীবন প্রবাহ প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র মানসের বিশালত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই সমস্ত বিচারশক্তি, উপলব্ধি এবং আহরণ পদ্ধতিকে ব্যর্থ ক'রে দুরধিগম্য সৃষ্টি রহস্যের মতো তা শুধু আমাদের মুগ্ধ বিস্ময়ই আকর্ষণ করে।

[পরবর্তী প্রবন্ধ: রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি]

কংগ্রেস ও ঘরোয়া দ্বন্দ্ব

নগেন দত্ত

১৯২১ খৃষ্টাব্দ থেকে কংগ্রেস যে আন্দোলন গড়ে তুলেছে তার প্রাথমিক যুগে যে সব সমাজগত শক্তি কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে নিজেদের শক্তিশালী করেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মুসলমান সমাজের খিলাফৎ আন্দোলন। যে খিলাফৎ আন্দোলনের মারফৎ মুসলমান উচ্চ শ্রেণী জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে যোগ দেয়—সেখানে রাজনৈতিক চেতনার উপাদান ছিল খুব কম—এবং তার একতার আভিজাত্য। তুর্কীর সুলতানের বিপদে ভারতীয় মুসলমানের সমাজগত যে শক্তি নিজেকে প্রকাশের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তার পরিণতি পরবর্তী-কালে ধর্মের ভিত্তিতে সমাজগত স্বার্থের মাঝে সমাধান খুঁজেছে। কংগ্রেসের বিগত দিনের নেতৃত্বের ত্রুটির কথা উল্লেখ করলে কংগ্রেসের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ হবেনা, বরং নিজেদের বিগত কর্মের পূর্ণ আলোচনাই হবে। আমাদের মনে হয় ধর্মের ভিত্তিতে মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর চেতনাকে গড়ে তুলতে গিয়ে আমরা বিপদগ্রস্ত হয়েছি। আজকের দিনে যে ধর্মের ভিত্তিতে আন্দোলন মুসলমান সমাজে গড়ে উঠছে তার প্রকৃত কারণ জন্ম নিয়েছে খিলাফৎ আন্দোলনের মাঝে। তখনকার কালের ভারতীয় মুসলমান সমাজের মন বিক্ষিপ্ত হওয়ার একমাত্র কারণ তা যদি খুব ভাল ভাবে বিচার করা যায় তবে দেখা যাবে, যে খলিফার কারণে এত বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল সেই খলিফা ও তার অনুসৃত প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ অটোমান সাম্রাজ্যের জনগণের দুঃখের অশেষ কারণ ছিল ইতিহাসে এ সাক্ষ্যের আর অন্ত নেই। অটোমান সাম্রাজ্যের গণ্ডির মধ্যে জনগণের কোন দাবী দাওয়াই রক্ষা হত না। অবশ্যি কথা উঠতে পারে যে আমরা আজকের দিনে এই আলোচনা করছি, বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে। আমাদের বক্তব্য, আন্দোলন কোন সময়ই বর্তমানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা উচিত নয়। প্রতিটি আন্দোলনের মাঝে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনের সংমিশ্রণ থাকা উচিত। তা না হলে আন্দোলন বর্তমানের উত্তেজনার মাঝে নিজের স্ব-মূর্তি ধারণ করে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবে। সেই জন্যই প্রতি আন্দোলনের পূর্বে একজাতীয় বৈপ্লবিক রাজ-নৈতিক চেতনার উদ্ভব হওয়া উচিত যা শুধু বর্তমানের কোলাহলে নিঃশেষিত হবে না। তার পরিণতি খুঁজতে হবে সব ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে। এই চেতনা প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলনকে সাহায্য করবে না। কিন্তু তার পরোক্ষ প্রভাব সমস্ত আন্দোলনের পরিণতিকে টেনে নিয়ে যাবে সফলতার দিকে।

মূল বক্তব্যে এবার ফিরে আসা যাক। গত ১৯২১ খৃষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনে খিলাফতের সমস্যাকে কেন্দ্র করে মুসলমান সমাজের যে শ্রেণীর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে বা যাদের মাঝে স্পন্দন জাগে—তারা আসলে বৈপ্লবিক চেতনাসম্পন্ন মুসলমান শ্রেণীও নয় বা বৈপ্লবিক চেতনার ফলও সে আন্দোলন নয়। তবে এরা কোন শ্রেণী? শিক্ষাভিমানী উগ্র আভিজাত্যবিলাসী ধর্মের আবরণে ঢাকা বিভিন্ন স্থিতস্বার্থের তত্ত্বধার—এদের নিয়েই কংগ্রেস প্রথম আন্দোলনের কাজে হাত দেয়। সমাজসৌধ যেমন পরস্পর স্বার্থের গাঁথুনি দিয়ে তৈরী তেমনি বিভিন্ন স্তরের সমাবেশও সেখানে আছে। আন্দোলন ধীরে ধীরে নিম্নস্তরে তার পলি ফেলতে সুরু করে। উচ্চস্তরের আন্দোলন যখন শান্ত হয়ে আসে তখন নিম্নস্তরের সেই পলি আবার ফসল ফলাতে সুরু করে অর্থাৎ আন্দোলন দানা বাধতে থাকে। অনতি ভবিষ্যতে যে আন্দোলন আসছে সেটা হবে এই নিম্নস্তরের চেতনার বিকাশ, এ বিষয় সন্দেহ নেই। তখন পর্যন্ত দেশের, কি গণ-সাধারণ কি মধ্যবিত্ত সাধারণ, কারুর মনেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রকৃত রূপটি ধরা পড়েনি। অসহযোগ, নীতি হিসাবে যে একটা যুগান্তকারী নীতি তা ভারতবর্ষের উচ্চ শ্রেণীরাও মেনে নেয়নি। প্রভেদ হচ্ছে এইখানে—গণ-সাধারণ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি, মধ্যবিত্ত সাধারণ ভাববার প্রয়োজন বোধ করেনি, উচ্চবিত্ত সাধারণ জেগে ঘুমিয়েছে; অর্থাৎ পূর্ণতর বিকাশের দিকে এই অসহযোগ নীতিকে কেহই নিয়ে যাবার সচেতন প্রয়াস পায়নি। অথচ অসহযোগ নীতির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা কিন্তু সর্বসিদ্ধ গণ-

সাধারণই দিয়েছে। বিদেশী কিনিবনা এটা উচ্চবিত্তেরা বলে থাকেন। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যায় তারাই সবার আগে বিদেশী কিনে বিদেশী বণিকের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। দেশী শিল্প যদি উচ্চবিত্তের আভিজাত্যের খোরাক জোটায় তবে তাদের সমাজে স্থান পায়। মধ্যবিত্তেরা ঠেকায় বাধ্যে কাজ চালায়। মনের দিক দিয়ে গ্রহণ করেনা। কিন্তু হাকিমিক্স ও তজ্জা বাগ্‌দির দেশী পণ্যদ্রব্য ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাকে বাধ্য হয়েই তাই কিনতে হয়, কেননা সে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়। আজ যদি সর্বশ্রেণির গণ-সাধারণের মনে এই চেতনা জাগিয়ে তোলা যায় যে, প্রয়োজন তাদের সব ক্ষেত্রেই স্বল্প, তা ছাড়া বিদেশী পণ্য পেতেও বিস্তর বাধা, কাজেই ঘরের জিনিস যদি ব্যবহার করতে পারা যায়, তবে পণ্যটা ঘরেই থাকবে। অতএব বিদেশী পণ্যে আমাদের প্রয়োজন নেই। এই সাদা কথাটা হাক মিক্স ও তজ্জা বাগ্‌দিকে বোঝালে সে বোঝে। কিন্তু উচ্চ ও মধ্যবিত্তেরা কিছুতেই তাদের রুচি দিয়ে এ কথা স্বীকার করবে না; বলবে, মশাই জানা আছে, সব ভাঁওতা। অথচ ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, সব দেশের শিল্পই গবেষণা, প্রয়োগ ও পরীক্ষা করতে করতে সৌষ্ঠব লাভ করেছে। দেশী শিল্পের প্রাথমিক অবস্থায় এ দায়িত্ব দেশকে মাথা পেতে নিতেই হইবে। কিন্তু এ সব কথার মধ্যে বড় লোকেরা নেই। আর একটা কথা, রণ ক্ষেত্রে যদি Blockade রণনীতির অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গণ্য হয়, তবে স্বাধীনতা যুদ্ধে অসহযোগ অপরিহার্য বলে গণ্য হবে না কেন? কংগ্রেসের অসহযোগ নীতি অনেকটা অস্ত্রহানের অস্ত্র। আজ যদি ব্রিটিশ ভারতের পাওয়ানা ষ্টার্লিং মিটিয়ে না দেয় তবে ভারতের হাতে অসহযোগ নীতি ছাড়া আর কি আছে যাতে ব্রিটিশকে বাধ্য করা যেতে পারে। কিন্তু মজা হচ্ছে, দেশী ধনিকদের নিয়ে। যে গণসাধারণ তাদের বেশীর ভাগ ক্রেতা তাদের প্রতি এদের অবিচারের অন্ত নেই। যে জাতীয়তার নাম গেয়ে তারা পুঁজি চালে সেই জাতীয়তার প্রতি তাদের তিল মাত্র শ্রদ্ধা নেই। দেশের মানুষকে তারা আপনার জন ভাবে না। সেখানে দেখা যাচ্ছে সাদা ও কালা আদমি সব-স্বার্থের দুটি শাখা মাত্র—একটি ভারতের মাটিতে জন্মেছে, অপরটি জন্মেছে বিলাতের মাটিতে। ভৌগোলিক দূরত্বের ব্যবধান বাদে দুটোরই সমান বৈশিষ্ট্য। আজ যদি দেশী ধনিক বিদেশী ধনিকের তুলনায় নোতুন দৃষ্টিকোন দিয়ে গণসাধারণের সমস্যা বিচার না করে তবে তাদের বিরুদ্ধে মতবাদ একদিন স্পষ্ট ভাবে গড়ে উঠবে। কংগ্রেসের আজ সাদা কথায় এদের বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়েছে যে দেশী ধনিকেরা যেন বিদেশীদেরই মত শোষণে তৎপর না হন। তাহলে কংগ্রেসকেই গণসাধারণের পক্ষ থেকে তাদের বিপক্ষে প্রতিবাদ করতে হবে। কংগ্রেস দেশী হোক আর বিদেশী হোক কোন রকম শোষণই আমল দেবে না।

একটা সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীভূত অবস্থায় জনগণের যে দুর্দশা হয় তার বহুল দৃষ্টান্ত অটোমান সাম্রাজ্যের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করলেই পাওয়া যাবে। তখনকার কালের পরিস্থিতিতে দুটো সমপর্যায়ে ভুক্ত সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব খুঁজে পাওয়া যাবে অটোমান ও মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে। অটোমান সাম্রাজ্যের আবদুল হামিদের আমলে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের তেমন কোন মর্যাদা ছিল না, তেমনি এদিকে ঔরংজেবের আমলে হিন্দু সম্প্রদায়ের তেমন কোন মর্যাদা ছিল না। ইংলাণ্ডেও একদিন ইহুদিদের বিরুদ্ধে নানাবিধ বিধিনিষেধ ছিল। সম্প্রদায়গত ভেদবুদ্ধির ওপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক চেতনা গড়ে ওঠা ইতিহাসে তেমন কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়। কিন্তু এই সম্প্রদায়গত ভেদ বুদ্ধিজনিত যে রাজনৈতিক আদর্শ তা সবক্ষেত্রেই ধ্বংসের কারণ হয়েছে। অটোমানের সম্বন্ধেও এ কথা যেমন প্রযুজ্য তেমন মোগলের সম্বন্ধেও প্রযুজ্য।

একমাত্র সাম্রাজ্যবিকেন্দ্রীকরণ কেবল যদি খিলাফৎ আন্দোলনের কারণ হয় তবে তার মুখ্য উদ্দেশ্য যে খুব প্রগতিমূলক ছিল না তা স্পষ্টই বোঝা যায়। আমাদের মনে হয় কামালপাশা কেবলমাত্র ইসলামের দোহাই দিয়ে নিজের নীতির সমর্থন খুঁজেছিলেন। তুর্কীর বিপ্লবে অটোমান সাম্রাজ্য ভেঙে নব্য মুসলমান রাষ্ট্রই গঠন করেছে মাত্র। আসলে বিশ্বের মুসলমান সমাজের সর্বাঙ্গীন মুক্তির কোন প্রেরণা জোগায়নি। তাই যদি হত তবে মধ্যপ্রাচ্যে আরব

রাষ্ট্রের আর এই দুর্গতি হত না। সেই দিক থেকে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার বিষয়, যদি কোন আন্দোলন জনগণের সর্বাঙ্গীন মুক্তির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সুরু হয় তবেই তা স্থায়ী হয়। কিন্তু নিছক ধর্মের ভিত্তিতে সুরু হলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সেইজন্যই খিলাফৎ আন্দোলন সত্যিকারের আন্দোলন নয়। তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কংগ্রেসের বৈপ্লবিক পরিণতির সম্ভাবনা পূর্বেই বুঝতে পেরেছিল। ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজের খিলাফৎ আন্দোলনের দ্রুত ব্যাপক প্রসার দেখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বুঝতে পেরেছিল যে এদের এই আন্দোলনের চেউকে যদি কোন বিশেষ স্বার্থের উদ্দেশ্যে প্রবাহিত করা যায় তবে হয়ত কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নীতিকে পরোক্ষভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। তাতে আর একটি সুফলের সম্ভাবনা, মুসলমান সমাজের যে কোন প্রগতিমূলক আন্দোলনকেও বাধা দেয়া যাবে। কেননা আর্থিক সুযোগ-সুবিধার ওপর নির্ভর করে যে শ্রেণীটি মুসলমান সমাজে রয়েছে তাদেরকে গোটা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে গোটা কয়েক কুপার কড়ি বিলিয়ে দিলেই তারা শান্ত হবে। অগণিত জনগণকে তাদের উচ্চশিক্ষার চমক ও স্বিতস্বার্থলব্ধ সুযোগ—এই দুটির যুগপৎ ব্যবহার করে আপাতত দমিয়ে রাখা যাবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুসলমান সমাজের উচ্চ শ্রেণীকে হাতে রেখে প্রতিক্রিয়ার ধূম্রজাল চড়াবার এই যে অপচেষ্টা তার প্রধান কারণ হল তখন পর্যন্ত কংগ্রেস বড়লোকদের আওতা ছেড়ে সর্বত্যাগীদের অভিমুখে রওনা হয়নি। এবং রওনা হলে যে পদে পদে তাকে দ্বন্দ্ব ঘোষণা করে চলতে হবে তা তখনকার কংগ্রেস ঠিক অনুভব করতে পারেনি। হিন্দু সমাজের যে বড়লোকেরা কংগ্রেসে একদিন ছাউনি ফেলেছিল তারা বিভিন্ন প্রকারে নিজেদের বিব্রত অনুভব করে আস্তে আস্তে সরে পড়তে সুরু করে। এই প্রথম হল কংগ্রেসের ক্রমবিকাশের সুরু। কংগ্রেস ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ছুঁৎমার্গ পরিহার করার নীতি গ্রহণ করে। সামাজিক বিচারে এই ছুঁৎমার্গ পরিহার যুগান্তকারী মনোবৃত্তি। এই একমাত্র ছুঁৎমার্গকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বর্তমান কলুষিত অবস্থার মূলে আঘাত করেছে কংগ্রেস। এবং হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ্যধর্মের অত্যাচারে যে শ্রেণী নিপীড়িত হয়েছে তাদের মধ্যেও চেতনার সাড়া পাওয়া গেছে। কিন্তু সেখানেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ রয়েছে। সে একেবারে দশরথের মত দশ দিকে তার রথ চালায়, পাছে হিন্দু-সমাজের নিম্নশ্রেণীর এই নবজাগ্রত স্বাধিকার বোধ কংগ্রেসের বৈপ্লবিক চেতনার আবহাওয়ায় পরিপুষ্টি লাভ করে সেই ভয়-এ অনুন্নত সম্প্রদায় বলে একটি নোতুন সম্প্রদায় সৃষ্টি করে, কংগ্রেসকে মূল থেকে কীটদংষ্ট্র ও ক্ষত বিক্ষত করবার চেষ্টা করেছে। আজ যদি কংগ্রেসের আওতায় হরিজনদের নবজাগ্রত চেতনা স্বাধিকারের জন্য লড়াই করতে সুরু করে তবে হিন্দু সমাজের ধর্মের ভিত্তিতে রচিত স্বিতস্বার্থগুলি আপনা থেকেই ভেঙ্গে পড়বে এবং ধর্মের সূত্র ধরে হিন্দু-সমাজের যত ধর্মপোষিত স্বিতস্বার্থ আছে তাকে রক্ষা করার অছুহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হরিজনদের বিরুদ্ধতা করবে। অনেকে ভাবতে পারেন যে হরিজনদের দাবী নিয়ে যদি কোন আন্দোলন সুরু হয় তাকে কেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরুদ্ধতা করতে যাবে?

প্রথম কারণ: ধর্মের বর্তমান সংস্কারাচ্ছন্ন অবস্থায় এমন কতগুলো লোক দানলব্ধ সম্পত্তি অথবা ধন দৌলত ভোগ করছে যারা, তারা শ্রেণী হিসাবে ধর্মের কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা ছাড়া অন্য কোন উপজীবিকার ওপর বাঁচতে পারেনা। তাই ধর্মের ভিত্তিতে যাতে কোন প্রগতিমূলক চিন্তাধারা না গড়ে ওঠে সেই অপচেষ্টায় তারা ব্যস্ত।

দ্বিতীয় কারণ: ধর্মের সংস্কার বা তজ্জনিত কোন প্রগতিমূলক চিন্তাধারা একমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের মারফৎ স্পর্শযোগ ঘটায়। তাতে করে রাজনৈতিক আন্দোলন ধর্ম সংস্কারের মৌলিক উপাদান হিসাবে গণ্য হয়। কেননা ধর্মের ভিত্তিতেই সামাজিক ধারা প্রবর্তিত হয়, সামাজিক ধারার ভিত্তিতে অনেক ক্ষেত্রে আবার গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা। দেশে যখন সর্ববাপী রাজনৈতিক আন্দোলন সুরু হয় তখন এর প্রত্যেকটি অংশ স্ব-স্ব বিরোধ মাথায় করে নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগান দেয়। আসলে এর প্রত্যেকটি অংশ অবিভাজ্য ও পরস্পর নির্ভরশীল। কিন্তু এরা কোন আন্দোলনের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে

সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে না। এই হচ্ছে সামাজিক ও অর্থগত অংশের মজ্জাগত দুর্বলতা। এই দুর্বলতাগুলি সাম্রাজ্যবাদের কূটচক্রে বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বাহন হয়ে কাজ করতে থাকে। এরাই কোন প্রগতিমূলক আন্দোলনকে ভেতর থেকে বাধা দিয়ে ঘরোয়া দ্বন্দ্বের অবতারণা করে।

কংগ্রেসের দিনের পর দিন অমিত প্রভাব দেখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলমান সমাজের একটা বিশেষ অংশকে ঘরোয়া দ্বন্দ্বের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে, এবং আমাদের মনে রাখা ভাল যে, জাতীয় বিপ্লবের একটা বিশেষ পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদীদের অস্ত্র হচ্ছে, সমাজের কোন একটা বিশেষ অংশকে আর একটা অংশের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া। আমেরিকা ও ফরাসীর ঘরোয়া দ্বন্দ্বের কথা আজকে প্রায় ইতিহাসের বিস্মরণে ডুবে গিয়েছে; কিন্তু রাশিয়ার ও চীনের ঘরোয়া দ্বন্দ্বের কথা একেবারেই টাট্‌কা আমাদের মনে পড়ছে। রাশিয়ায় যখন বিপ্লব সুরু হয় আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফরাসী ও জাপান এই চারটি শক্তি সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে রাশিয়ার প্রগতিমূলক ধারাকে ব্যাহত করবার কাজে লেগে যায়। এখানে আর একটি বিস্ময়কর ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করবার, গত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিশেষ করে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা রাশিয়া এক ও অবিভাজ্য বলে তাদের রাজনৈতিক মতবাদ ইউডেনিচ, র‍্যাঙ্গেল, ডেনিকিন ইত্যাদির মারফৎ প্রচার সুরু করে। এবং এই মতবাদের পেছনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের যোগান খুব মোটা রকমের ছিল। ঠিক সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-ই ভারতে হিন্দু ও মুসলমান দুটো জাত অতএব বাঁটোয়ারা অনিবার্য্য—এই মতবাদকে পরোক্ষভাবে উস্কানী দিচ্ছে। এই পরস্পরবিরোধী নীতির পেছনে কোন কোন স্বার্থের যোগাযোগ রয়েছে তা বিচার করবার। জারের আমলে যে অখণ্ড সাম্রাজ্য রাশিয়ায় ছিল তাতে বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতি, বহু জাতি এক নৈর্দ্দণ্ড অবস্থার মধ্যে বাধ্য হয়ে বাস করত। তাদের না ছিল ভাষাগত স্বাধীনতা, না ছিল সংস্কৃতিগত কোন প্রসার। এক রাশ জাতির অধীনে এতগুলি জাতিকে প্রপীড়িত হয়ে বাস করতে হত। অপেক্ষাকৃত কুশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত জাতিগুলির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের ধনে ধনিয়া খুব কেঁপে ওঠে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আফ্রিকাকে বলা যেতে পারে। এ গেল এক দিক, আর এক দিক হল, যদি রাশিয়ার জারের প্রভুত্ব কায়েম করা যায় তবে একজাতিকে আর একজাতির বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে একটা চিরস্থায়ী গোলযোগের আগুন জ্বালিয়ে রাখা যাবে। যদি সাম্রাজ্যের এক অংশের সঙ্গে আর এক প্রতিবেশী কোন অংশের বিরোধ বাধে তবে আর্থিক ক্ষতি যেমন অনিবার্য্য তেমন কেন্দ্রীয় সরকার চালনা করাও দুরূহ হয়ে পড়ে। রাশিয়ার জারকে হাতে পায়ে বেঁধে তার চেয়ে ঘরে কাঁটা পুতে রাখা ভাল, যাতে আসতে যেতে পায় বিঁধবে। লেনিন প্রথমেই এই সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতি বুঝতে পেরেছিলেন। এবং এক এক করে তিনি এই সাম্রাজ্যবাদী কূটনৈতিক চালকে পর্য্যুদস্ত করেন। যেমন ধরা যাক, Peace without annexation, Self-determination, Cancellation of all Favoured Nation Clauses, এই তিনটি নীতি গ্রহণ করে তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের ঠাণ্ডা করেছেন।

আমরা যদি কংগ্রেসের বিরোধী শক্তিগুলোকে শ্রেণীবদ্ধ করি তবে দেখতে পাব যে কংগ্রেসকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যতটা আয়োজন না করেছে তার চেয়ে শতগুণ আয়োজন করেছে পরোক্ষভাবে আঘাত করবার। একথা আজ স্বীকার করি বা না-ই করি তাতে এসে যায় না। আজ পর্য্যন্ত কংগ্রেসে হিন্দু সাধারণের আনাগোনা বেশী। তাতে সাধারণভাবে মুসলমান সমাজের মধ্যে একটা আক্ষেপ হতে পারে যে হিন্দুরাই সব করে। তাছাড়া হিন্দু মহাসভার ক্রমবিলীয়মান প্রভাব থেকেও একথা বলা যেতে পারে যে হিন্দুর বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে স্ফূর্তি পাচ্ছে। কিন্তু তা বলে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে কংগ্রেস হিন্দুর প্রতিষ্ঠান। কেন না কংগ্রেসের নিজেরস্থনির্দ্দিষ্ট নীতি, পন্থা ও মতবাদ আছে যেটা হিন্দুরাও বরদাস্ত করে না মুসলমানেরাও বরদাস্ত করে না। কংগ্রেসের আদর্শ—সব ক্ষেত্রেই হিন্দুমহাসভা ও মুসলিম লীগ বিরোধী, কাজেই মুসলীম লীগের বর্ত্তমান নেতৃত্বের যে বৈশিষ্ট্য, তা যখন পর্য্যন্ত কার্য্যকরী ততক্ষণ পর্য্যন্ত কংগ্রেস লীগ মিলনের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। হিন্দু-মহাসভা সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলে। মুসলমান সমাজের উচ্চবিত্তেরা ধর্ম্মকে কেন্দ্র

করে যে নেতৃত্ব আজ গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে তা অদূর ভবিষ্যতে পরাজয় মানতে বাধ্য। তার কারণ কংগ্রেসের কার্যক্রম আজ মুসলমান জনসাধারণকে নানা দিক থেকে প্রভাবিত করছে। এই কংগ্রেস প্রভাবপুষ্ট মুসলমান সমাজের মন হয়ত কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ নাও করতে পারে। কিন্তু কালে কালে যে সে ধর্মাশ্রয়ী নেতৃত্বকে সচেতন ভাবে আঘাত করবে এ সুনিশ্চিত এবং ধর্মাশ্রয়ী নেতৃত্ব প্রাথমিক বাধা পাবে তার নিজস্ব কেন্দ্র থেকে। রাজনৈতিক চেতনার যে স্তর আজও মুসলমান গণসমাজে ব্যক্তিকেন্দ্রিক আছে, তা ক্রমশই সমষ্টিগতভাবে সাড়া দেবে, এবং নোতুন নেতৃত্ব সেই সমষ্টিগত চেতনা নিয়ে গড়ে উঠবে। তখন সেখানে ধর্মের ঐক্যের চেয়ে বড় হয়ে উঠবে সামাজিক বিনিময় এবং সে সামাজিক বিনিময় হবে সমতার ওপর ভিত্তি করে। ধর্মের সমষ্টিগত পর্যায়ে পার হয়ে সেখানে আপনা থেকে তাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ের রূপ নিতে হবে। এই ভাঙা গড়া মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মাঝে অনিবার্য্য।

কারণ হিসাবে পারিপার্শ্বিক ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। কংগ্রেস তিন-তিনটা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি সত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে যে সে সর্ব্বনিম্ন গণসাধারণের। প্রথমে সে পারেনি এ রূপ দিতে, আজও এই সত্তা পূর্ণতা লাভ করেনি, তবু চেষ্টা সব দিক দিয়ে চলছে যেন কংগ্রেস সর্ব্বকালেই গণসাধারণের হয়। কংগ্রেসকে সর্ব্বনিম্ন গণসাধারণের সংঘে পরিণত করতে গিয়ে তাকে প্রথমেই ডাকতে হয়েছে চাষী ও মজদুরকে। সেখানেও প্রতিপক্ষ থেকে প্রবল বাধা আসছে ঘরোয়া দ্বন্দ্বের মারফৎ। সে আলোচনা পরে হবে। মুসলমান সমাজের অগণিত যারা অর্থাৎ যাদের কথা শিক্ষা-অভিমানী নাগরিক সভ্যতায় বঞ্চিত শ্রেণীর মুসলমানেরা ভাবে না, তারা কংগ্রেস নেতৃত্বকে বিচার করবে দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে, সেখানে কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্যক্রম কার্য্যকরী হবে যাদুকরের সোনার কাঠির মত। মুসলিম লীগের বর্ত্তমান ধর্মাশ্রয়ী নেতৃত্ব কোনক্রমেই বৈপ্লবিক কার্য্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে না। যদি গ্রহণ করে তবে বর্ত্তমান নেতৃত্বের স্তম্ভ ভেঙে পড়বে, সেখানে রূপান্তর ঘটবে। কংগ্রেস যেমন ক্রমবিকাশের পথ গ্রহণ করেছে তেমন ক্রমবিকাশের পথ যদি মুসলিম লীগ ত্যাগ ও দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করে তবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একই লক্ষ্যে এসে পৌঁছাবে; তখন কংগ্রেসের স্থান পথ প্রদর্শক হিসাবে থাকবে। যদিও আজ মনে হয় এটা সুদূর কল্পনা কিন্তু কংগ্রেসের এই ত্যাগের ও সেবার আদর্শ মুসলিম লীগের তলদেশ হতে প্রভাব বিস্তার করবে এবং ধর্মাশ্রয়ী লীগ নেতৃত্ব কতগুলো কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস প্রদর্শিত পথে চলবে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই কার্যক্রমগুলি ঘরোয়া দ্বন্দ্বের রূপ নেবে। লীগের বর্ত্তমান নেতৃত্বের সত্যিকারের আক্রোশ হিন্দুমহাসভার বিরুদ্ধে আর আর নেই, তার সব আক্রমণই কংগ্রেসকে লক্ষ্য করে। যে ঘরোয়া দ্বন্দ্ব আসন্ন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, এবং আমাদের মনে হয় ভারতের জাতীয় বিপ্লবের অনস্বীকার্য্য পর্য্যায় হিসাবে তা আসবেই—তাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অর্থ এবং পরামর্শ দিয়ে লালনপালন করার চেষ্টা করবেই। লীগের বর্ত্তমান নেতৃত্বের শেষ দান হিসাবে আমাদের এ ঘরোয়া দ্বন্দ্ব গ্রহণ করতে হবে। এটি হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কংগ্রেস বিরোধিতার পরোক্ষ অস্ত্র প্রয়োগ। এই দ্বন্দ্বের অবসানে লীগের নবীন নেতৃত্ব জন্ম নেবে।

কংগ্রেসকে অদূর ভবিষ্যতে আরও একটি ঘরোয়া দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হবে। এবং সে ঘরোয়া দ্বন্দ্বের উৎস হবে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দল। যদিও এদল মার্কসবাদের সর্ব্বহারা বিপ্লবের আদর্শে আস্থাবান ও কার্য্যক্ষেত্রে তারা চাষী-মজদুর নিয়েই মূলত কর্ম্ম পরিচালনা করে থাকেন, তবু নীতি বিভ্রাটের ফলে তার বৈপ্লবিক আদর্শ আজ ক্ষুণ্ন হতে বসেছে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতি যে মনোভাব তারা প্রকাশ করেছে তাতে অনেকেরই মনে প্রশ্ন উঠেছে যে সত্যিকারের objective condition তারা মানে কি না।

জনযুদ্ধ নীতি গ্রহণ করার পর যে সব অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তাতে একথা মনে হতে পারে যে তারা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে না মেনে সূক্ষ্ম যুক্তিজালে নিজেদের কর্ম্মের শক্তি ও সম্ভবনাকে বাধা দিয়েছে। ভারতে কংগ্রেসের সমর্থক আজও যারা আছেন তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। কংগ্রেস বিভিন্ন স্তর পার হয়ে যে

দিকে রওয়ানা হয়েছে তা দেখে এই উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ও শঙ্কিত হয়ে উঠেছে, এই শঙ্কা উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কেও দ্বিধা বিভক্ত করে দুটো শাখায় পরিণত করেছে। একদল কংগ্রেসে মধ্য দিয়ে সমাধান খুঁজছে আর একদল কংগ্রেস বিরোধীতার আপাত সুযোগ পাওয়া যাবে মনে করে কম্যুনিষ্ট সহায়ক হয়েছে। তা ছাড়া আর একটা উচ্চশ্রেণী আছে যারা কংগ্রেস ও কম্যুনিষ্ট কাউকেই বরদাস্ত করে না তারা অর্থাৎ Bombay Plan-ওয়ালারা—উভয়কে শত্রু বলেই মনে করে। কালে কালে এই ব্যর্থকাম মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এই Bombay Plan ওয়ালাদের দলে ভীড়বে। কংগ্রেসের মধ্যে কিষাণ-মজদুর নেতৃত্ব অভ্যুত্থান হলে এদের সুযোগ সঙ্কুচিত হবে। কাজেই এদের যাতে সুযোগ সুবিধা থাকে তার জন্য এরা আলাদাভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে তোলবার চেষ্টা করবে।

আচ্ছা কংগ্রেস তার নিজস্ব পদ্ধতিতে কিষাণ-মজদুর সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে যে সব আন্দোলন সৃষ্টি করবে তখনই প্রবল বাধা আসবে কম্যুনিষ্ট দল থেকে। তারপরে আন্দোলনের প্রকৃত সময় কোনটা তা নির্দ্ধারণ করা নিয়ে যে বিভেদ ঘটবে সেই বিভেদই ঠেলে দেবে কম্যুনিষ্ট দলকে অচ্ছুতে। একেত তিব্র তাঁবু আছে তার আবার তাদের যা লড়াইয়ের সরঞ্জাম সেও কংগ্রেস নিতে বসেছে, সে অবস্থায় তাদের সক্রিয় বিরোধিতা কতটা হবে সেটা সহজেই অনুমেয়। এখানেও মজদুরে মজদুরে ঘরোয়া দ্বন্দ্বের অবকাশ আছে। কাজেই কংগ্রেসকে মজদুর বাহিনী গঠন করতে গিয়ে প্রথম বাধা দেশী স্বিতস্বার্থের কাছ থেকে যতটা না পেতে হবে তার চেয়ে দ্বিগুণ পেতে হবে কম্যুনিষ্ট দলের তরফ থেকে।

দেশী স্বিতস্বার্থ আজ বাধ্য হয়ে কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল সে অবস্থায় হয়ত কংগ্রেসকে সামনাসামনি ঘাটাবে না। কিন্তু সেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশে বাঁধা। তাই তাকে তাদের সাহায্য কিছু, কম্যুনিষ্ট বিরোধিতার সাহায্য কিছু—এ নিতেই হবে। তখন কম্যুনিষ্টদল কংগ্রেসকে এক তিলও ছেড়ে কথা কইবে না—অতএব ঘরোয়া দ্বন্দ্ব। কংগ্রেসকে আজ যদি সর্ব্বহারা বিপ্লবের নীতি গ্রহণ করতে হয় তবে এ ঘরোয়া দ্বন্দ্ব এড়াবার নয়। আজকের দিনের যে বিশ্বরাজনীতির পরিস্থিতি তাতে দেখা যায় যে, কোন একটা বিশেষ সমস্যার ওপর জোর দিলেই তার সমাধান হয় না। শুধুমাত্র ইংরেজ এদেশ থেকে চলে গেলেই এদেশ সত্যিকারের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা লাভ করবে না। জনগণের সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার সমাধান করতে গেলেই কংগ্রেসকে এই সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে নব্যব্যবস্থা গড়তে হবে। কংগ্রেসের দায়িত্ব আজ যে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক বেশী।

বিদায় বেলায়

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

একটী ছোট মফস্বল সহর। সহরটির এক পাশ দিয়া একটী খাল বহিয়া গিয়াছে। খালটীর পূর্ব্বধারে সহরের প্রায় বার আনা আর পশ্চিম ধারে প্রায় চারি আনা অংশ অবস্থিত। পশ্চিম ধারে খালের পাড়ের উপরে খানিকটা ফাঁকা জায়গা—তাহারই একপাশে দুইখানা টিনের ঘর। ঘরের সম্মুখে এক-খানা সাইনবোর্ডে লেখা রহিয়াছে—"রায় বাহাদুর ক্লাব"। বেলা আন্দাজ আটটার সময়; সে দিন একটি যুবক, হাতে একটি চামড়ার সুটকেশ ও বগলে একটী সতরঞ্চি-মোড়া সামান্য বিছানা লইয়া, রায় বাহাদুর ক্লাবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিতেছিল। রায় বাহাদুর ক্লাব বাহির হইতে তালা বন্ধ ছিল। ঘরের বারান্দায় উঠিয়া যুবকটি দেখিল লেখা আছে—"প্রত্যহ বেলা ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত ক্লাব খোলা থাকে।" অগত্যা যুবকটি পুনরায় পথে নামিয়া আসিয়া,সম্মুখে একজন পথিককে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"রায় বাহাদুর ক্লাবের সেক্রেটারী অমৃত চাটার্জ্জির বাড়ীটা কোথায় বলতে পারেন?" লোকটী কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল—অমৃত চাটুজ্জে? তেঁতুল গেছে রায় বাহাদুর? যুবকটি বিস্মিত হইয়া জবাব দিল তেঁতুল গেছে কি? লোকটি পুনরায় বলিল—তিন জন রায় বাহাদুর এ সহরে। আর তিন জনই এই পাড়াতেই থাকেন। একজন তেঁতুল গেছে—ঐ যে তেঁতুল গাছ দেখ্‌ছেন না—ওরই পাশে তাঁর বাড়ী। আর একজন খেজুর গেছে—ঐ দেখুন দক্ষিণ ধারের খেজুর গাছওয়ালা বাড়ীটা তাঁর। আর একজন তাল গেছে রায় বাহাদুর—ঐ যে উত্তরের ঐ পুকুর পাড়ে দুটো তাল গাছ দেখ্‌ছেন—ঐ তাঁর বাড়ী। আপনি সোজা তেঁতুল গাছটা লক্ষ্য করে চলে যান —অমৃত চাটুজ্যে তেঁতুল গেছে। যুবকটী হাসিয়া বলিল—আচ্ছা তাই যাচ্ছি।

যুবকটীর নাম প্রণব নাথ মৈত্র। বি-এ পাশ করিবার পর আজ ৩।৪ বৎসর বেকার হইয়া বসিয়া আছে। ছোট বেলা হইতে প্রণব সাহিত্য চর্চ্চা করে—বৎসর কয়েক ধরিয়া তাহার গল্প উপন্যাস নানা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় বাহির হইতেছে। লিখিয়া যে সামান্য আয় হয় তাহা দিয়া সংসার চলিতে চায় না। সংসারে তাহার মা, একটী ছোট ভাই, ছোট বোন বর্ত্তমান। সম্প্রতি খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া সে এখানে ছুটিয়া আসিয়াছে। এখানকার রায় বাহাদুর ক্লাব হইতে একখানা পত্রিকা পরি-চালনার জন্য একজন সাহিত্যিক চাই। বেতন মাসিক ষাট্ টাকা। আবেদন না করিয়া প্রার্থীকে সত্বর নিজে আসিয়া দেখা করিতে বলা হইয়াছে। প্রণব তাহার নিজের দেশ খুলনা হইতে তাই আজ ট্রেণে সারারাত্রি জাগিয়া এখানে আসিয়া নামিয়াছে।

রায় বাহাদুর ক্লাবের একটী ইতিহাস আছে। এই সহরের খালটির পূর্ব্ব-পাড়ের অংশে অন্য একটী ক্লাব আছে। সে ক্লাবটী প্রধানতঃ সহরের শিক্ষিত যুবকগণ দ্বারা পরিচালিত। সেবার ১৯৩০ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময়—এ সহরে আন্দোলনটী অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে এবং এই ক্লাবটীর পরিচালনায় যে সমস্ত যুবকগণ ছিল—তাহারাই ছিল এখানকার স্বদেশী আন্দোলনের মূল নেতা। আন্দোলনের সময় একদিন প্রকাশ পায় যে, অমৃত চাটার্জ্জি তাহাদের ভিতরের অনেক খবর, সোজা একেবারে আই, বি, অফিসে-পৌঁছাইয়া দেন। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও নাকি পাওয়া যায়। তাহার পর যুবকেরা একদিন তাঁহাকে রীতিমত অপমান করে এবং এই ক্লাবের সভ্যপদ হইতে তাঁহাকে অপ-সারিত করে। ইহার কিছুদিন পরেই অমৃত চাটার্জ্জি রায় বাহাদুর হন। অমৃত চাটার্জ্জি অবস্থাপন্ন লোক—পঞ্চায়, চরে তাঁহার পৈত্রিক আমলের ২০।২৫ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী বর্ত্তমান। তাহার পর হইতেই এই রায় বাহাদুর ক্লাবের প্রতিষ্ঠা। অন্য দুই জন রায় বাহাদুর—ধনঞ্জয় পাল একজন পাকা ব্যবসায়ী আর তারকনাথ সোম সরকারী উকিল। কিন্তু এ সহরে ইহাদের নাম প্রায় সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে। অমৃত চাটুজ্জে তেঁতুল গেছে—ধনঞ্জয় খেজুর গেছে আর তারকনাথ তাল গেছে রায় বাহাদুর নামে অদ্যাবধি

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। প্রণব হেতুল গাছের নিচে আসিয়া দাঁড়াইল।

সম্মুখে একটী এক তলা পাকা বাড়ী। গেট ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রণব দেখিল বৈঠকখানার বারান্দায় একজন লোক রৌদ্রে পিঠ দিয়া বসিয়া আছে। প্রণবের সাড়া পাইয়া লোকটী পিছন ফিরিয়া তাকাতেই সে বলিয়া উঠিল—রায় বাহাদুর—

লোকটী সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলিয়া তাহাকে ইসারায় একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিল। প্রণব প্রথমে লক্ষ্য করে নাই। এখন দেখিল লোকটী শুধু রৌদ্রে পিঠ দিয়াই নাই মনে মনে মন্ত্র জপ করিতেছেন। প্রণব খানিকটা অপ্রতিভ হইয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। মিনিট দশেক পরে লোকটী তাহার নিকটে উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—খুলনা থেকে।

—কি দরকার?

—আজ্ঞে একটু প্রয়োজন আছে—রায় বাহাদুর অমৃত চট্টোপাধ্যায়কে একবার—। তিনি বাধা দিয়া বলিলেন—আমিই রায় বাহাদুর। প্রণব তাড়াতাড়ি উঠিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—আজ্ঞে আপনার ক্লাবের জন্য একজন লাহিড়ীকে চেয়েছেন—আমি একজন প্রার্থী।

অমৃত চাটার্জ্জি একটু হাসিয়া বলিলেন—আমি আগে থাকতেই অনুমান করেছিলাম। তোমার নামটী কি?

—শ্রীপ্রণবনাথ মৈত্র।

—তা বেশ, বেশ। হাত মুখ ধোও। তারপর চাকরটাকে ডাকিয়া হাত মুখ ধুইবার জল দিতে বলিয়া বলিলেন—তুমি একটু বোস বাবাজী, আমি চায়ের কথাটা বলে আসি। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—বাবাজীর লেখা পড়া কত দূর করা হয়েছে?

—আজ্ঞে কয়েক বৎসর হলো বি-এ পাশ করেছি।

—বেশ, বেশ। লেখা টেখা কিছু অভ্যেস আছে তো?

—গল্প উপন্যাস কিছু কিছু লিখি।

—তা চা খেয়ে একবার ধনঞ্জয় দাস আর তারক সোমের বাড়ী থেকে ঘুরে এসো। ওরা দুটোও আবার আজ কয় বছর হলো রায় বাহাদুর হয়েছে কিনা। ওদেরও একবার মতামত নেওয়া দরকার। আর বিকেল বেলা ক্লাব ঘরে বসে—তোমার সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা যাবে। আহারাদি এখানে করো বুঝলে। আর শোন বাপু, ও দুটোকে তেমন কিছু খোশামোদ করার দরকার নাই—ও করার আমিই করবো। তবে একবার দেখা করা দরকার—দেখা করে এসো! সরকার বাহাদুরেরও আজ কাল আর কাজ নাই।—কেন বাপু শুধু শুধু আবার ওদের রায় বাহাদুর করা? এ সহরে কি আর—একজন রায় বাহাদুর থাকলে চলতো না। যুদ্ধের তবিলে মোটা চাঁদা দিলেই হলো বুঝি? ধনঞ্জয়টাতো একটা নীরেট তবে কিছু পয়সা আছে। শ্রেফ টাকার জোরে রায় বাহাদুর হলো! যুদ্ধের তবিলে কুড়ি হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছে কিনা। আর তারক ছিল গবুচন্দ্র উকীল—খেতাবের তবিলের জোরে হলো গভর্ণমেণ্ট প্লীডার নইলে বলে—হুঁঃ।

চা জল খাবার খাইয়া প্রণব পথে নামিয়া পড়িল। অমৃত চাটুজ্জে লোকটিকে তাহার মন্দ মনে হইল না।

সম্মুখের সেজুর গাছ কয়টীর তলা দিয়া প্রণব আসিয়া ধনঞ্জয় দাসের বাড়ীতে ঢুকিল। বৈঠকখানা ঘরখানি একখানি পোতোবাধান টিনের ঘর। বারান্দায় একখানি হাত ভাঙা কাঠের চেয়ার—আর একখানা বেঞ্চ পাতা রহিয়াছে। কিছু দূরে একটি গোয়ালঘর সেখানে কয়েকটী গরু বাঁধা রহিয়াছে। একজন লোক গেঞ্জি গায়ে গামছা কাঁধে গরুর জাবনা মাখাইতেছিল। প্রণব তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল—ওহে শুনছো? লোকটী একবার ঘাড় ফিরাইয়া প্রণবের দিকে তাকাইয়া পুনরায় নিজের কাজে মন দিল। প্রণব কয়েক মিনিট বারান্দার উপরে দাঁড়াইয়া রহিল। কাজ সারিয়া লোকটী তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

—কি চাই?

—রায় বাহাদুরকে—

লোকটি এবার হেঁড়ে গলায় জবাব দিল—আমাকে পছন্দ হচ্ছে না বুঝি? প্রণব অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিল—আজ্ঞে আমি চিনতে পারি নি—মাফ্ করবেন।

—চিনতে পারিনি! যত সব! বলিয়া ধনঞ্জয় আসিয়া হাতল ভাঙা চেয়ারখানিতে উপবেশন করিলেন। চেয়ারখানি

একটুখানি ক্যাচ্ শব্দ করিয়া—এক পাশে একটু হেলিয়া তাল সামলাইয়া লইল। শীতকালের সকালে গেঞ্জি গায়ে কাঁধে গামছা ফেলিয়া যে রায় বাহাদুর ধনঞ্জয় গফুর জাবনা মাখিবেন—তাহা সত্যই প্রণব কল্পনা করিতে পারে নাই।

ধনঞ্জয় প্রশ্ন করিলেন—কি চাই?

—আজ্ঞে আমি আপনাদের রায় বাহাদুর ক্লাবের বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি।

—তা বেশ, বিকাল বেলা ক্লাব ঘরে আমাদের সঙ্গে দেখা করো।

প্রণব বাহির হইয়া যাইতেছিল ধনঞ্জয় পুনরায় ডাকিয়া বলিলেন—শোন। প্রণব ফিরিয়া দাঁড়াইলে বলিলেন—যদি পরণের কাপড়খানায় তোমার বহর কত ইঞ্চি বলতে পার? প্রণব প্রশ্নের কি জবাব দিবে বুঝিতে পারিতেছিল না—মন তাহার বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

—আমি রায় বাহাদুর ধনঞ্জয় দাস। শেয়ার মার্কেটে আমার লাখ পানেক টাকা খাটে। তাছাড়া লরি যন্ত্রকি আছে, পাটের গুদাম আছে। কই আমিতো কখনও আট হাতি ধুতির উপরে পরলাম না। সম্মান? স্বয়ং সরকার বাহাদুর যেচে রায় বাহাদুর করে দিলেন—বিলাসিতা করেই দেশটা ডুবলো—বুঝলে? প্রণব কোন কথা কহিল না।

—এখন যাচ্ছ কোথায়!

—রায় বাহাদুর তারক সোমের বাড়ী।

—রায় বাহাদুর না কচু? যাও গিয়ে আধ ঘণ্টা না বসলে দেখা হবে না—এখন সে ঘোড়ায় চড়ছে। পঞ্চাশ বছর বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করে আগের পক্ষের যোয়ান যোয়ান দুই ছেলেকে দিয়েছে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে। বাড়ীতে এনে ঢুকিয়েছে—শালাশালী কতগুলি। রোজ সকালে বৌকে দেখিয়ে দেখিয়ে—ঘোড়ায় চড়া চাই।

তারক সোমের বাড়ীর আঙিনায় ঢুকিতেই এক অভিনব দৃশ্য চোখে পড়িল। তারকনাথের অন্দর হইতে একটি ঘোড়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে বাহির হইয়া আসিল। ঘোড়ার পিছনে একটী ১৪।১৬ বৎসরের তরুণী লাঠি হাতে করিয়া হেট্ হেট্ করিয়া শব্দ করিতেছে আর হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। ঘোড়ার যিনি সোয়ার তিনি লাগাম ছাড়িয়া দিয়া তৎক্ষণ ঘোড়ার গলা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছেন। প্রণবের পাশ দিয়া ঘোড়াটী যাইবামাত্র লাগাম ধরিয়া ঘোড়াটী থামাইয়া ফেলিল। একেবারে হাড় জির জিরে পক্ষীরাজ! আগে মিউনিসিপ্যালিটীর ময়লার গাড়ীর কাজ চালাইত—এখন আর কাজ চালাইতে না পারায়, নীলামে বিক্রয় করা হইয়াছে। মাস দুই হইল রায় বাহাদুর পঁয়ত্রিশ টাকায় খরিদ করিয়াছেন। রঙ্গস্থলে প্রণবের আবির্ভাব হওয়ায় এখানেই যবনিকা পাত হইল—তরুণীটী অন্দর মহলে চলিয়া গেলেন। তারকনাথ প্রণবের পরিচয় লইয়া—তাহাকে একেবারে নিজের খাস-কামরায় লইয়া বসাইলেন। বয়স তাঁহার পঞ্চাশের কম নয়। মুখে বাটারফ্লাই গোঁপ—মাথায় চুল গুলা অসম্ভব কাল-কলপ দেওয়া বলিয়া সন্দেহ হয়। নানা কথা বার্ত্তায় একেবারে তিনি প্রণবের সহিত সমবয়সীর মতো মিশিয়া গেলেন। অবশেষে নিজের জালিকায় (সেই লাঠি হাতে তরুণীটীর) হাতের এক কাপ চা খাওয়াইয়া বিদায় দিলেন।

বিকালবেলা প্রণবের "ইন্টারভিউ" হইয়া চাকুরী পাকা হইয়া গেল। ধনঞ্জয় কিন্তু তবু ছাড়িলেন না—আজকালকার ছেলেরা আবার বাংলা শেখে? আমাদের সময় ছিল বোধোদয়। বোধোদয় ভাল করে পড়লে আবার কথা আছে—ভাষা একেবারে আয়ত্ত করা সারা। আজকাল কি সব বাজে বই যে পড়ান হয়। প্রণবও ছাড়িল না—জবাব দিল—তা সত্যি। কিন্তু বোধোদয় পড়েও যাদের বোধোদয় হয় না—তাদের উপায় কি?

পরের দিন প্রণবকে তাহার কাজ বুঝাইয়া দেওয়া হইল। সহরের অন্ত ক্লাবটীর নাম "মিলন সঙ্ঘ"। সম্প্রতি এই সঙ্ঘ হইতে একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির হইতেছে। গত সংখ্যায় তাহারা রায় বাহাদুরদের বিশেষ আক্রমণ করিয়া লিখিয়াছে। রায় বাহাদুর ক্লাব হইতেও একটী পত্রিকা বাহির করিয়া ইহার সমুচিত জবাব দিতে হইবে। অমৃত চাটুজ্জে বলিলেন—

—বুঝেছো বাবাজী ওদের দলের সব ছোঁড়াগুলো স্বদেশী। দলে ৩।৪টী মেয়েও আছে। অমলা নামে একটি মেয়ে ওদের লিডার। একটু মসান চড়িয়ে লিখ্‌বে বাবাজী—ঐ মেয়েগুলো আর ছেলেগুলোর ভেতরে, ইয়ে—বুঝতেই তো পারছো।

ঘনশ্যাম বলিলেন—আর আমাদের তিন জনের নামে তিনটে খুব ভারী ভারী প্রবন্ধ। আমাদের তো সময় নাই—নইলে একটা প্রবন্ধ লিখতে আর কি—ভারীতো দশ মিনিট তার লেই বাস্। প্রণব হাসিয়া বলিল—তা সত্যি।

অমৃত চাটুজ্জের বাড়ীতে প্রণবের আহার ও বাসস্থান স্থির হইল। তারক সোম আজ রাত্রে প্রণবকে তাহার ওখানে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। নিজের স্ত্রী ও শালীর সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিয়া—তাহাকে যেন একেবারে অন্তরঙ্গ করিয়া ফেলিতে চাহিলেন। শেষে প্রণবকে বিদায় দিবার সময় বলিলেন—একটা কথা আছে প্রণববাবু। আপনাকে একান্ত বন্ধুজন বলেই বল্‌ছি। আপনি তো গল্প লিখিয়ে—এই সংখ্যায় একটা গল্প দেবেন। আমাকে আর ওঁকে যদি নায়ক নায়িকা করেন অত্যন্ত আনন্দিত হব। ওঁর—মানে, আমার স্ত্রীর কথা বলছি—নামটী হলো—লাবণ্য-লতা। প্রণব হাসিয়া বলিল—বেশ বেশ এ আর বেশী কি?

—আজ্ঞে, আমাদের দুজনার মধ্যে বেশ একটু ইয়ে আছে এমনি করে লিখবেন।

—ইয়ে মানে গভীর প্রেম তো? বেশ তাই হবে।

২

মাস দুই খাটিয়া পত্রিকাখানা লেপা শেষ হইল। একটা গল্প তিনটী প্রবন্ধ সম্পাদকীয় আর বিশেষ করিয়া মিলন-সঙ্ঘের বিরুদ্ধে তিক্ত সমালোচনা এই সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে। কলিকাতা হইতে পত্রিকা ছাপান হইবে। তারকনাথের এক বন্ধুর প্রেস আছে—সেখানে সমস্ত পাণ্ডুলিপি দেওয়া হইয়াছে। প্রুফ দেখা ইত্যাদির জন্য প্রণবও কয়েক দিন হইল কলিকাতায় আসিয়াছে। কিন্তু প্রণবের মনে সুখ নাই। এই দুইটী মাস ধরিয়া পরিশ্রম করিয়া, এ কি সৃষ্টি করিল সে। এতগুলি পাতা শুধু বাজে ফরমাইসী প্রবন্ধে আর বিশ্রী সমালোচনায় ভর্ত্তি। প্রেস হইতে এক কর্ম্মা ছাপিয়া আসে আর প্রণবের মনের ভিতরে কাঁটার মতো খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতে থাকে। এই দুইটী মাসের মধ্যে একটা ভাল গল্প লিখিতে অবসর পায় নাই সে—যে উপন্যাসখানায় হাত দিয়াছিল তাহার একটী অধ্যায়ও আর অগ্রসর হয় নাই। অমৃত চাটুজ্জের মতো একটা হিংসুটে ঘনশ্যামের মতো একটা নীরেট আর তারক সোমের মতো একটা স্বৈণের হুকুম-মত লিখিতে হইবে তাহাকে?

প্রণবের ইচ্ছা হইতেছিল—আজই সে চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কিন্তু এ দিকে যে সংসারে বিষম টানাটানি—ছোট ভাইটার হয়তো পড়া বন্ধ হইয়া যাইবে—বোনটীর বিবাহের যোগাড় হইবে না।

পত্রিকা যথা সময়ে বাহির হইল। পাঁচশ কপি ছাপাইয়া সহরের বহুলোককে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইল। কোন কোন মহলে বাহবাও যে না পাইল এমন নয়।

তিন মাস পরের কথা। ১৯৪২ সনের আগষ্ট মাস। বোম্বাইতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে হঠাৎ কারারুদ্ধ করায় দেশময় তুমুল বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। আজ এই সহরের একটী মাঠে জনসভার আয়োজন হইয়াছে। জনাকীর্ণ পার্কটীর কোথাও তিল ধারণের স্থান ছিল না। প্রণব ইহারই এক পাশে একটু স্থান করিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। কয়েকজন বক্তা পর পর প্রবল উত্তেজনা মূলক বক্তৃতা দিয়া গেলেন। ইহার পর অমলা দেবীর বক্তৃতা। ইতিমধ্যে জনতার এক পাশে কয়েক জন লাঠিধারী পুলিশ আসিয়া হাজির হইয়াছিল। অমলা দেবী বক্তৃতা দিয়া যাইতেছিলেন—এমন সময় দেখা গেল আরও বহুসংখ্যক পুলিশ লাঠি ও বন্দুক লইয়া এইদিকে মার্চ্চ করিয়া আসিতেছে ও লাঠি আস্ফালন করিতেছে। জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিল। পুলিশ বাহিনী অতর্কিতে একেবারে জনতার উপরে নির্ব্বিচারে লাঠি চালাইতে লাগিল। জনতার ভিতর হইতেও দুই একটী ইট পাটকেল পুলিশের দিকে আসিয়া পড়িতে লাগিল। অধিকাংশ লোক যে যেদিকে পারিল পলাইল। প্রণব কি করিবে না করিবে স্থির করিতে পারিতেছিল না। পুলিশের লাঠির ভয়ে যে পলাইয়া যাবে, ইহা তাহার নিকট অসহ্য ঠেকিল। অমলা দেবী কিন্তু তখনও বক্তৃতা চালাইয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ সেইদিকে নজর পড়িতেই প্রণব দেখিল কয়েকজন লাঠিধারী পুলিশ তাঁহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। ইহারা স্ত্রীলোকের গায়েও হাত দিবে নাকি? প্রণব কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারিল না—সে একেবারে অমলা দেবীর সম্মুখে আগাইয়া আসিল।

সম্মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই দেখে—একখানা লাঠি একেবারে অমলা দেবীর মাথা লক্ষ্য করিয়া শূন্যে উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। প্রণব এক মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজের ডান হাতখানি অমলা দেবীর মাথার উপরে তুলিয়া ধরিল—চোখের পলকে লাঠিখানি আসিয়া প্রণবের হাতের উপরে দারুণ আঘাত করিল। অমলা দেবী এতক্ষণে সমস্ত অবস্থাটা বুঝিতে পারিলেন। উত্তেজনায় প্রণবের কোন খেয়াল ছিল না—সে অমলা দেবীর একখানা হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া কহিল—বাইরে আসুন। নিজের দুই হাত ও শরীর অমলা দেবীর পাশে বিস্তৃত করিয়া দিয়া প্রণব তাঁহাকে বাইরে লইয়া আসিল বটে কিন্তু অমলা দেবীর উদ্দেশ্যে সমস্ত আঘাত গুলি তাহাকেই শরীর পাতিয়া লইতে হইল।

জনতার ভিড় আর ছিল না। পুলিশ বাহিনীও চলিয়া গিয়াছে। অমলা দেবী প্রণবের দিকে চাহিয়া বলিলেন—একি আপনি যে সাংঘাতিক আহত হয়েছেন। প্রণব তাহার হাতখানার দিকে চাহিয়া দেখে, ইতিমধ্যেই অনেকখানি জায়গা দারুণ ফুলিয়া উঠিয়াছে—এক স্থান কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে। এতক্ষণ বিষম উত্তেজনায় বোধ শক্তি তাহার ছিল না, এবার অসহ্য বেদনায় সে সেখানেই মাটির উপরে বসিয়া পড়িল। অমলা দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার বাড়ী কোথায়? প্রণব বলিল—আমি বিদেশী।

—এখানে কোথায় থাকেন?

—এখন এক প্রকার নিরাশ্রয় বলতে পারেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া জুটিল। অমলা দেবী বলিলেন—"একে আশ্রমে নিয়ে চল।" দুইজন স্বেচ্ছা-সেবকের কাঁধে ভর করিয়া প্রণব আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে একজন ডাক্তার ডাকিয়া ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করা হইল। হাতের কনুইয়ের কাছের হাড় সরিয়া গিয়াছিল তাহা যথাস্থানে আনিয়া "স্প্লিণ্ট" দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল। অনেক রাত্রি ধরিয়া অমলা দেবী প্রণবের শুশ্রূষা করিয়া—সে একটু সুস্থ বোধ করিলে, শয়ন করিতে গেলেন।

প্রায় দশ বার বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন কংগ্রেস কর্ম্মী কর্ত্তৃক এই আশ্রমটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই হইতে এই আশ্রমটীকে কেন্দ্র করিয়াই এই অঞ্চলের কংগ্রেসীদের সমস্ত কাজ কর্ম্ম পরিচালিত হয়। অমলা দেবী আজ বৎসর তিনেক পূর্ব্বে এই সহরের মেয়েদের ইস্কুলটীতে একজন শিক্ষয়িত্রী হইয়া আসেন। কিন্তু কয়েক মাস চাকুরী করিবার পরই কোন এক রাজনৈতিক ছোঁয়াচের গন্ধ পাইয়া স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার চাকুরী নাকচ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু অমলা দেবী এ সহরটী ছাড়িয়া যান না। ইতিমধ্যে অনেক ভদ্র-পরিবারে তিনি বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সংসারে বিশেষ কোন বন্ধন না থাকায় কয়েকটি মেয়েকে 'প্রাইভেট' পড়াইবার ভার লইয়া অন্ন সংস্থানের উপায় করেন এবং এখানকার কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ক্রমে এই আশ্রমটীর সমস্ত ভারই তাঁহার উপরে আসিয়া পড়ে।

প্রণব বুঝিল সত্য সত্যই সে নিরাশ্রয়। স্বদেশী সভায় আসিয়া আহত হইয়া রায় বাহাদুর ক্লাবের চাকুরী পাওয়া তো দূরের কথা—অমৃত চাটুজ্জের বাড়ীতেও আর সে ঢুকিতে পারিবে না। সুতরাং নির্ব্বিবাদে এখানেই তাহাকে পড়িয়া থাকিতে হইবে।

৩

দিন পনেরর মধ্যে প্রণব সুস্থ হইয়া উঠিল। সুতরাং আর এখানে থাকিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। প্রতিদিন অন্যান্য কাজকর্ম্ম সারিয়া সাধারণতঃ বিকালবেলা অমলা দেবী তাহার নিকটে আসিয়া বসেন—কোন কোন বিষয়ে সাধারণভাবে আলোচনাও করেন—কোন কোন দিন অন্য দুই-একজন কর্ম্মী থাকে—কোন কোন দিন বা তিনি একাই থাকেন। সেদিন বিকালবেলা অমলা দেবী প্রণবের নিকটে বসিয়া কি যেন বলিতেছিলেন—ঘরে আর কেহ ছিল না। প্রণব বলিয়া উঠিল—এবার বিদায় নিতে হয়—কাল যাচ্ছি। অমলা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—কেন? প্রণব হাসিয়া বলিল—আপনার কেমন ধরণ দেখে মনে হচ্ছে যেন—আমার এখান থেকে আর কোথাও যাওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না। এখন তো বেশ ভাল হয়ে গেছি—শুধু শুধু আর আপনাদের কষ্ট দেওয়া কেন?

—ভাল হয়েছেন কোথায়? হাতের ঘাটা এখনও ভাল সারেনি। কাঁকর ঢুকেও একটু রয়েছে।

—ও কিছু না, দুদিনেই সেরে যাবে।

—অন্ততঃ সে দুটো দিন তো থাকুন তারপর দেখা যাবে! এখান থেকে যাবেন কোথায়?

—দেশে।

—দেশ কোথায়?

—খুলনায়।

—আপনার কথা তো বিশেষ কিছুই শোনা হলো না। কি করেন সেখানে।

—বিশেষ কিছু করি না। তারপর একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—একটু আধটু সাহিত্য চর্চ্চা করি।

—সাহিত্য চর্চ্চা? লেখেন নাকি?

—হাঁ তবে অল্প স্বল্প।

—কোন পত্রিকায় বেরোয় নাকি?

—হাঁ, সন্ধ্যায়, বিজলীতে—

—সন্ধ্যার লেখক প্রণব মৈত্র আপনি? অমলা রীতিমত বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। "রক্তরাগ", "অন্তাচল" আপনার লেখা?

প্রণব হাসিয়া বলিল—হাঁ।

—কি আশ্চর্য্য, কিছুই বলেন নিতো? এযে বিশ্বাস হতে চায় না। আপনার রক্তরাগ একটা অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ওর কত জায়গা যে আমি একেবারে মুখস্থ করে ফেলেছি। আপনি জানেন না আপনার লেখার কত বড় ভক্ত আমি। প্রণব পুনরায় হাসিয়া বলিল—আমার সৌভাগ্য।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এমনি করে আমাদের মাঝে লুকিয়ে রয়েছেন—একদিনের তরেও জানতে দেন নি!

—কিন্তু এই আমার একমাত্র পরিচয় নয় অমলা দেবী—আমার আরও পরিচয় আছে—তা শুনলে হয়তো ঘৃণায় মুখ ফেরাবেন। আমি অন্যায় করেছি।

অমলা পুনরায় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—কেন বলুন তো?

—বলছি শুনুন। এবার আপনাদের সহরের রায় বাহাদুর ক্লাব থেকে একখানা মাসিক পত্রিকা বের হয়েছে, আপনাদের উদ্দেশ্য করে অনেক কটূক্তি করাও হয়েছে, স্থানে স্থানে কদর্য্যতার মাত্রাও ছাড়িয়ে গিয়েছে—দেখেছেন বোধহয়?

—দেখেছি—কিন্তু তা কেন?

—বলাম যে অন্যায় করেছি। লেখক কে জানেন? আমি নিজে। মাসিক সাত টাকার বিনিময়ে সমস্ত আমাকেই লিখতে হ'য়েছে।

—আপনাকে লিখতে হয়েছে?

—হাঁ, আমাকেই! কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিল না। অবশেষে প্রণব বলিল—মনে করেছিলাম, যাবার বেলা ক্ষমা চেয়ে নেব। কাল যাচ্ছি। কিন্তু বারে বারে মনে হচ্ছে কি জানেন একটা টাকার লোভে কেন গ্রহণ করেছিলাম এখানে? মনের গ্লানি কিছুতেই দূর করতে পারছি নে যে! অমলা বলিলেন—আপনি অন্তরাগের লেখক—আপনার সেই লেখা—"কিন্তু আর দেখ্‌লে মাথা খুঁড়ে মরবো না। ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করে ভগবানকে ডাকবো না—নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে বিলাপ করবো না। শত সহস্র দুর্ব্বল বাহুর আঘাতে লৌহ দ্বারও চূর্ণ হয়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়বে। যে স্বচ্ছতোয়া ভোগবতীর ক্ষীরধারাকে, এতদিন একান্ত নিজের প্রয়োজনে বন্দী করে রেখেছিল অত্যাচারীর দল—তাকে মুক্ত করে জগদ্ধিতায় বিলিয়ে দেব।" সেই আপনি কয়েকজন কুটিল স্বার্থান্বেষীর কটা টাকার লোভে, এমনি করে লিখতে পারলেন?

—তাইতো আজ যুক্ত-করে ক্ষমা চাচ্ছি অমলাদেবী—যাবার আগে আমাকে প্রসন্ন মনে বিদায় দিন।

—কিন্তু কেন যাবেন?

—কেন যাব না?

—ওরা সব সরকারী লোক। কেউ কেউ একেবারে আই, বি'র চর বলেও অত্যুক্তি হয় না। অনুতাপ যদি হয়ে থাকে—অন্যায়ই যদি বুঝে থাকেন—তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?

—তার মানে?

—দেখছেন না, আজ সারা ভারতবর্ষময় কি বিপ্লব চল্‌ছে? আসুন আমাদের সাথে—থাকুন এখানে—এই বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। প্রণব হাসিয়া বলিল—এতখানি শক্তিমান আমাকে কল্পনা করে নিলেন কেমন করে বলুন তো?

—কেমন করে? তবে কেন লিখেছিলেন—"এই বিপ্লবের আগুনকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও—সারা দেশময় দাবানলের মতো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠুক। যারা মরবার তারা পুড়ে মরুক, কিন্তু হাল আসেনা। এমনি করে লক্ষ জীবন বলির পরেই না হবে, সত্যম্ শিবম্ সুন্দরের প্রতিষ্ঠা!" ইত্যাদি।

প্রণব পুনরায় হাসিয়া বলিল—আপনার মতো এমনি আর গুটিকতক ভক্ত যদি আমার জোটে, তা'হলে বাণপ্রস্থীর পাশে প্রণাম ঠুকে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করতে হবে দেখছি।

অমলা বলিলেন—হাঁ ভাই—কলম আর কিছু দিন ধরতে পারবেন না। এতদিন যা লিখেছেন—সে যে শুধুই বুলি নয়, তার প্রমাণ দিতে হবে।

—অর্থাৎ এবার অন্ততঃ সরকারী-অতিথিশালা থেকে ঘুরিয়ে এনে, আমাকে আপনি কিছুতেই রেহাই দেবেন না—এই তো?

—হাঁ, তা যদি হয়, আমি আনন্দিতই হবো।

প্রণবের আর যাওয়া হইল না—রহিয়া গেল। কয়েক দিনের ভিতরেই সে পাকা স্বদেশীওয়ালা বনিয়া গেল। আশ্রমের সমস্ত কর্মীরা প্রণবদা ছাড়া জানে না—প্রণব না হইলে কোন কাজে উৎসাহ আসে না। এমনকি অমলাদেবীও খানিকটা ঢাকা পড়িয়া গেলেন প্রণবের আড়ালে।

একদিন অমলা হাসিয়া বলিলেন—এ দেখ্‌ছি আমার পাল কেটে কুমীর আমার মতো হলো।

প্রণব প্রশ্ন করিল—কেন?

—এতদিন আমি ছিলাম নেত্রী। আর দেখছি তিন দিনের ভিতরে একজন নেতার মাথা নেত্রীর মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেল।

প্রণব হাসিয়া বলিল—হবে না—অন্তরাগের লেখক। আর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে যে!

—কিসের প্রায়শ্চিত্ত?

—তোতো বাঙালীর ছেলে—দুই একটা নিছক্ প্রেমের গল্প উপন্যাস লিখবো—তা নয় লিখতে গেলাম অন্তরাগ। আর লিখ্‌লাম গাল ভরা বিপ্লবের কথা। আগে কে জানতো তার ঠেলা এতদূর অবধি পৌঁছবে। তারই প্রায়শ্চিত্ত করছি।

অমলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—অর্থাৎ নাকে খত্ দিচ্ছেন।

—নয়তো কি? আর কখনও বস্তির প্রেম আর ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস ছাড়া যদি কিছু লিখি আমার নাম কিরিয়ে রাখবেন।

—বাকী আর ছিল কি মশাই—রায় বাহাদুর ক্লাবে তো ঢুকেছিলেন।

—রায় বাহাদুর ক্লাবের দোষ দেবেন না। রায় বাহাদুর ক্লাব আর পুলিশের লাঠিই তো এখানকার পথ দেখিয়ে দিল—নইলে এমন ভক্তের আমায় সন্ধান পেতাম কি করে?

ইহার কিছুদিন পরে এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গেল এখান হইতে কয়েক মাইল দূরে অনেকগুলি সাঁওতাল বস্তি। একদিন হঠাৎ সেখান হইতে কয়েক সহস্র সাঁওতাল, দল বাঁধিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া, বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিয়া সহরে আসিয়া ঢুকিল। পুলিশ ভয়ে ভয়ে গুলী চালাইল। কয়েকজন লোক হতাহত হইল বটে কিন্তু সাঁওতাল বাহিনী পিছু হটিল না। তাহারা ফৌজদারী আদালতের ক্ষতি করিল, দেওয়ানী আদালতের কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলিল—অবশেষে ট্রেজারী লুটিয়া লইয়া নিজেদের গ্রামে ফিরিয়া গেল। ফলে আশে পাশে এবং সহরে ব্যাপক ধর পাকড় আরম্ভ হইল।

পরের দিন ভোর বেলা হইতেই অমলা দেবীদের আশ্রম পুলিশে ঘিরিয়া ফেলিল।

অমলা দেবী প্রণব সকলেই গ্রেপ্তারের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল পুলিশ প্রণবকে কিছু বলিল না অমলা দেবী এবং আরও দুই জন কর্মীকে গ্রেপ্তার করিল।

প্রণব তাহার নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। অমলা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন—এবার বিদায় চাইতে এলাম। প্রণব তাহার নিকটে উঠিয়া আসিয়া বলিল—কিন্তু আমি কি করবো অমলা। অমলা কিছুক্ষণ প্রণবের মুখের দিকে দুই চোখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল—সে কি আমাকেই বলে দিতে হবে?

—হ্যাঁ তোমাকেই। তুমি ছাড়া আর কেউ হয়তো এ পথে টেনে আন্‌তে পারতো না।

অমলা বলিল—ছিঃ ওকথা বলো না—ওতে নিজেকে খাট করে ফেলা হয়। বেশ, আমিই বলছি তাহলে—রইলো এই আশ্রম—রইলো এখানকার আন্দোলনের শুভাশুভের দায়িত্ব—সবই তোমাকেই বহন করতে হবে।

প্রণব বলিল—বেশ—তোমার ভার মাথা পেতে নিচ্ছি।

—তবে আসি। অমলা বাহির হইয়া যাইতেছিল, কি ভাবিয়া ফিরিয়া বলিল—তোমার পায়ের ধুলো মাথায় নিতে পারি?

প্রণব হাসিয়া বলিল—ভক্তের ভক্তি যে দেখছি বড় বেয়াড়া রকম বেড়ে উঠলো।

অমলাও হাসিয়া বলিল—না আজ থাক।

সে সোজা পুলিশ বাহিনীর ভিতরে গিয়া দাঁড়াইল।

ইউলিসিজ্

শ্রীহেমন্তকুমার সরকদার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

( )

সত্য ও স্বাধীনতা

গান্ধীজী একাধিক বার বলেছেন স্বাধীনতার চেয়ে সত্য তাঁর কাছে বড়। বলেছেন এমন সময়ে যখন স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য একটা বিরাট জাতি সংগ্রামে নেমেছে, বা নামতে উদ্যত হয়েছে। গান্ধীজীর উক্তিতে, সুতরাং প্রচুর বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। আংশিক পরিমাণে সে বিক্ষোভ এখনও আছে। তাঁর মতের বিরোধী যাঁরা এই উক্তির যথেষ্ট অপ-ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এবং তাঁর অনুবর্ত্তীদেরও অনেককে এর উপযুক্ত ব্যাখ্যা বা সমর্থন যোগাতে প্রচুর ঢোক গিলতে এবং মাথা চুলকাতে হয়েছে। কথাটাকে তলিয়ে বোঝবার জন্য কোন সাগ্রহ চেষ্টার অভাব বরাবরই ছিল, আজো আছে।

সত্য অর্থে আমরা মোটামুটি বুঝে নিয়েছিলাম এমন একটা কিছু যার সঙ্গে স্বাধীনতার কোন যোগাযোগ থাকার কথা নয়। ছেলেবেলায় নীতিবোধে পড়া গেছে, 'সদা সত্য কথা কহিবে'। কিন্তু সে নীতিবাক্য ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করবার সুবিধা সর্ব্বদা খুব কম লোকেরই হয়েছে। কারো কারো প্রায় কখনই হয় নি। তা সত্ত্বেও কিন্তু জীবন কেটে যাচ্ছে, এক রকম। আর যদি কেউ এসে বলে সত্য কথা বলতে না শিখলে স্বরাজ পাওয়া যাবে না, তা হলে সেটা পঙ্গুর পরাণোর চেয়েও জবরদস্তি হবে। মানবপ্রকৃতি এ রকম জবরদস্তি সইবে কেন? বিশেষতঃ আশে পাশে চেয়ে সত্যের সঙ্গে স্বাধীনতার কোন সম্পর্ক যখন দেখা যাচ্ছে না। ইংরাজদের অতবড় সাম্রাজ্য সত্যের বনিয়াদের ওপর গড়া নয়। তার বিপুল বাণিজ্যকীর্ত্তির মধ্যে সত্যের প্রভাব আরো কম। কোন কোন ইংরাজ রাজনীতিকের মিথ্যা-বাদিতা বিশ্ববিখ্যাত। তা সত্ত্বেও যদি ইংরাজ শক্তিমান ও লক্ষ্মীমন্ত হতে পেরে থাকে, তবে আমরাই বা সত্যনিষ্ঠার বাড়াবাড়ি না করে স্বাধীন হতে পারব না কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। উত্তর নেই বল্লেই হয়। চেষ্টা করে উত্তর দিতে গেলে নিছক কতকগুলা তর্কের সৃষ্টি হয়। বেয়াড়া তর্কে ক্লান্ত হয়ে এক সময় আমরা সিদ্ধান্ত করে বসেছি গান্ধীজী স্বাধীনতা চান না, তিনি তাঁর নিজের মগজের কতকগুলা উদ্ভট খেয়াল আমাদের ওপর পরীক্ষা করে চলেছেন মাত্র। এই ধারণার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হচ্ছে এই যে গান্ধীজীর মত ও পথ অনুসরণ করে স্বরাজ আসবে না, আমাদের উপায়ান্তরের সন্ধান করতে হবে। সে রকম সন্ধান যে চলছে না তা নয়।

একটা চলতি কথা আছে: পিঠার স্বাদ বোকা যায় খেলে। গান্ধীজী স্বাধীনতা চান কি না তা বোঝা যায় দেশের জন-সাধারণের দিকে চাইলে। এ দেশের জনসাধারণ আজো স্বাধীনতা চাইছে কি না, বা কি চাইছে, সেটা পরে আলোচনা করা যাচ্ছে। এখানে প্রসঙ্গতঃ একথা বল্লে নিশ্চয়ই কারো আপত্তি হবে না যে আজ ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ, অজ্ঞ, অশিক্ষিত, দরিদ্র মানুষ কিছু একটা চাইছে, এবং জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে, তাদের সেই চাওয়ার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীকে তারা জড়িয়ে ফেলেছে। কে কি চায়,সে তর্ক এখন বহুল পরিমাণে অবান্তর। আজ বিশাল ভারতবর্ষের বাক্যহীন অগণিত নরনারী গান্ধীজীর বাক্যে ভাষা পেয়েছে—এইটাই হচ্ছে একটা নিঃসন্দিগ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। অনেক বছর আগে শ্রীঅরবিন্দ বাল গঙ্গাধর তিলক সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "His life, his character, his work and endurance, his acceptance by the heart and the mind of the people are a stronger argument than all the reasonings in his speeches; powerful as these are, for Swaraj, Self-government, Home Rule, by whatever name we may call the sole possible present aim of our effort, the freedom of the life of India, its self-determination by the people of India. Arguments and speeches do not win liberty for a nation; but where there is a will in the nation to be free and a man to embody that will in every action

of his life and to devote his days to its realisation in the face of every difficulty and every suffering, and where the will of the nation has once said, "This man and his life mean what I have in my heart and in my purpose," that is a sure signpost of the future which no one has any excuse for mistaking."—ভবিষ্যতের দিশারি, যিনি সমগ্র হৃদয় দিয়ে, মন দিয়ে মানুষকে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর নিজের প্রতিটি কর্মে ও মননে মানুষের প্রাণের স্ফুট বা অস্ফুট আশাকে রূপায়িত করে তুলেছেন, এমন নেতার উদ্ভব হয় মানবজাতির অগ্রগতির স্বতোৎসারিত প্রেরণার তাগিদে। সে প্রেরণা যুক্তি তর্কের অতীত। কথা হচ্ছে, আজ আমরা দেখতে পাই তিলক সম্বন্ধে লিখিত এই কথাগুলি গান্ধীজীর সম্বন্ধেও কতখানি সত্য। বরং সে দিনের ও আজকার রাজনৈতিক চেতনার তুলনায় আজ একথাগুলিকে গান্ধীজীর সম্পর্কেই বেশী প্রযুক্ত বলে মনে হবে। এ যদি সত্য হয়, অর্থাৎ একটা বিরাট জাতি যদি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে, তাঁর চেষ্টায় যদি মানুষ আশা পায়, তাঁর মুখে ভাষা পায়, তবে আজ আর আলোচনা করে লাভ নেই তিনি স্বাধীনতা চান কিনা, সন্ধান করে দেখতে হবে তিনি কি চান। তাঁর চাওয়া ও আমাদের চাওয়ার মধ্যে কোন্‌খানে অমিল ঘটছে, সেটা তখন স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সুতরাং সবার আগে দেখা দরকার আমরা কি চেয়েছি।

অনেকেরই মনে হতে পারে, এ প্রশ্নটা তোলাই নিরর্থক। কারণ, আমরা কি চাই, তা পৃথিবীর সবাই জানে। যদি কেউ না জানে তবে সে হয় মূর্খ, না হয় ভণ্ড। লক্ষ কণ্ঠে আমরা লক্ষবার ঘোষণা করেছি আমরা চাই স্বাধীনতা। একথা খুবই সত্য। কিন্তু আরো সত্য হচ্ছে এই যে সেই লক্ষের মধ্যে খুব কম লোকই আছেন স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণা যাঁদের খুবই স্পষ্ট। আরো একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে স্বাধীনতার বিভিন্ন ধারণা রয়েছে এবং একই ব্যক্তির মনে বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনতার বিভিন্ন কল্পনা লক্ষ্য করা যায়। কথাটা একটু গোড়া থেকে আলোচনা করা যাক্।

গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে প্রতি দশ বছর অন্তর আমাদের স্বাধীনতার ধারণা বদলেছে। এই শতাব্দীর প্রথম কয় বছরে বাংলা দেশে যাঁরা বিপ্লবীদল গড়ে তুলেছিলেন তাঁরা স্বাধীনতার কি রূপ কল্পনা করেছিলেন তা আমরা অনেকেই ভাল করে জানবার কোন সুযোগ পাই নি। এর ফলে কেউ কেউ এমন সিদ্ধান্ত করেছেন যে তাঁদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এ সিদ্ধান্ত সঙ্গত হতে পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু সে তর্কের মধ্যে না গিয়েও এ কথা বলা যায় যে আজ শতাব্দীর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে স্বাধীন ভারতের যে ছবির ওপর আমরা কল্পনার তুলি বুলিয়ে চলেছি, সেই ছবিখানি প্রথম যুগের বিপ্লবীদের মনে ছিল না। একথা নিন্দাসূচক অর্থে বলা হচ্ছে না। ইতিহাস থেকে যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে, তারই বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে। সেদিন ইংরাজের বিরুদ্ধে হঠাৎ জাগা আক্রোশে বোমা ছোড়া হয়েছিল এবং বিলাতি কাপড় পোড়ানো হয়েছিল। এসব যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা মুক্তি সংগ্রামের পুরোগামী সৈনিক; তাঁদের দুর্দম দুর্দ্ধার দেশে আগুন জ্বেলেছিল। কিন্তু তবু বলা যায়, এযুগ হচ্ছে রাজনৈতিক চেতনার কৈশোর। একে তুলনা করা যায় 'রক্তকরবীর' কিশোরের সঙ্গে। আত্মবিস্মৃত ভাবোন্মাদ কিশোর তার নন্দিনীকে শুধু ডেকে আনন্দ পায়, কেন ডাকে তা সে জানে না। বস্তুতঃ এই যুক্তিহীন, বিশ্লেষণহীন আত্মদান কৈশোরের ধর্ম্ম, অনাবিল জীবনপ্রবাহের দুর্বার শক্তির প্রকাশ। বাংলার এই শক্তি বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। সেদিনের মন্ত্র ছিল 'বন্দে মাতরম্', ভাব ছিল 'ভক্তি', সাধ্য ছিল 'মুক্তি' এবং সাধনা ছিল 'দরিদ্র-নারায়ণের সেবা'। সেদিনের গান ছিল, 'ওমা, আমার যে ভাই তারা সবাই তোমার রাখাল তোমার চাষী'। সে গানে ভাবোচ্ছ্বাসের অন্তরালে আর যে বস্তু ছিল তা হচ্ছে করুণা। দেশাত্মবোধের এও এক সুর নিশ্চয়ই। কিন্তু সে মনোভাবের সঙ্গে আজকার কৃষক-মজুর প্রজারাজের পরিকল্পনার পার্থক্য শুধু রূপের নয়, গুণেরও। 'আনন্দমঠের' উপক্রমণিকার মধ্যে এই গোটা যুগের মর্ম্মবাণী ধ্বনিত হয়ে

উঠেছিল: অতি বিস্তৃত অরণ্য। তার মধ্যে অন্ধকার নিশীথে হঠাৎ মধুর কণ্ঠের শব্দ, 'আমার মনোবাসনা কি সিদ্ধ হইবে না?' তিনবার এই প্রশ্ন হলো। তারপর "উত্তর হইল, তোমার পণ, কি?

পণ আমার জীবন সর্বস্ব!

জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।

তবে আর কি আছে? আর কি দিব?

তখন উত্তর হইল, ভক্তি।"

এই ভক্তি, নিষ্কাম সেবা, মাতৃরূপে দেশের ধ্যান—গীতা, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ—সব মিলিয়ে সর্বসাধারণের গ্রাহ্য কোন আদর্শবাদ সৃষ্টি করা যেত না তা নয়, কিন্তু হয় নি। পূর্বে বলেছি কাঁচির দুটা পাতে মিলে তবে কাটে। বাংলায় যে প্রাণ দীপ্ত তেজে জ্বলে উঠেছিল, শুধু তারই শক্তিতে সারা ভারতের পথ প্রস্তুত হতে পারত না। পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে এ শক্তি অন্য পথে চালিত হোলো। কিন্তু ততক্ষণে এই আন্দোলনের ফলে যে বীজ ছড়াবার তা ছড়িয়ে গেছে। গোটা 'আনন্দমঠের' বিপুল কর্মপ্রচেষ্টা একটি 'মনোবাসনার' বাহ্যিক প্রকাশ। অথচ সে মনোবাসনা কোথাও নির্দিষ্ট হয়নি। শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই ভারতের সমাজ তার নিজের পদ্ধতিতে কিন্তু সেটা নির্ণয় করে নিল। দুটি শক্তির গোড়া পত্তন হোলো। একদিকে আদর্শের সন্ধানী মধ্যবিত্তের তরুণদল দ্বারা বৃটিশ কবলমুক্ত স্বাধীন ভারতের অস্পষ্ট স্বপ্নে আবিষ্ট, আর একদিকে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রশক্তির কর্ণধার ভারতীয় ধনিক। ১৯০৭-৮ সালে যা' দেখা গিয়েছিল নিছক ভাবোন্মাদনা রূপ, ১৯১৭-১৮ সালে তার মূল দেশের মাটিতে ছড়িয়ে গেছে। তখন ভারতীয় ধনতন্ত্রের গোড়া পত্তন হয়ে গেছে, এবং সাধারণ লোকে স্বরাজের একটা সংজ্ঞা ঠিক করবার চেষ্টা করছে। যদিও ১৯২১-২৮ সালে দেখা যাচ্ছে দেশের নেতৃস্থানীয় তখনও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং পূর্ণ-স্বাধীনতা এই দুটোর মধ্যে সন্দিগ্ধচিত্তে দুলছেন, তবুও সেই আন্দোলনই এটা অন্ততঃ সূচিত করেছে যে স্বাধীনতার পরিকল্পনা একটা নিশ্চয়তার কাছাকাছি এসেছে। বৃটিশ সম্পর্কের পূর্ণ অবসান এই ছিল তখনকার সেই পরিকল্পনার একটি দিক। সংগ্রামের পুরোভাগে যে তরুণ সৈনিকদল ছিলেন, তাঁরা নানাভাবে এই দিকটাই প্রচার করে চলেছিলেন। অপর কোন দিকের প্রশ্ন নিয়ে বড় একটা কেউ ব্যাপৃত হননি, এবং তার থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে যে সে প্রশ্নটা তখনও বেশী লোকের মনে ওঠেনি। ১৯৩৭-৩৮ সালে দেখা যাচ্ছে যতগুলি রাজনৈতিক দল কাজ করছেন তাঁরা সবাই বুঝতে এবং বোঝাতে চেষ্টা করছেন স্বাধীনতা কার জন্য? পূর্ণ-স্বাধীনতাই যে লক্ষ্য সেটা ততদিনে সর্বসম্মতিক্রমে মেনে নেওয়া হয়েছে। এবং দ্বিতীয় যে কথাটা স্বীকার করা হয়েছে সেটা এই যে শুধু বুদ্ধিজীবী ভদ্রশ্রেণীর দ্বারা সেটা অর্জন করা যাবে না। তারজন্য গণসংযোগ করতে হবে, কৃষকদের সঙ্গে মিলতে হবে, মজুর শ্রেণীকে দলে টানতে হবে। সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় যে ব্যাপারটা ঘটাতে হবে, তার নাম তখন দেওয়া হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে রাজনীতিক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে পর্যন্ত তখন গুরুতর পরিবর্তন এসে গেছে। ইংরাজ দেখলেই একদিন যাঁদের হাত নিস্‌পিস্ করত, তাঁরা এই সময় বলতে সুরু করেছেন যে লড়াইটা ইংরাজের বিরুদ্ধে নয়, ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। দেশ জননীর স্তোত্রে তখন আর কাজ চলছে না, স্তোত্র কেটে ছেঁটে ফেলতে হচ্ছে। নানা উপলক্ষ্যে স্বীকার করতে হচ্ছে যে দেশ কথাটার আর তেমন মানে হচ্ছে না, এবং যতটুকু মানে হচ্ছে সেটাও দেশের বিভিন্ন অংশের কাছে বিভিন্ন রকম। সেই সময় থেকে আরো দশ বছর—সম্পূর্ণ হবার আগেই বর্তমানে দেখা যাচ্ছে এই সকল অংশের অন্ততঃ অনেকগুলির দাবী অবারিত হয়ে উঠেছে এবং স্বাধীনতার যে রূপটা সবার মন ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করছে সেটা হচ্ছে কৃষক-মজুর-প্রজারাজ। অর্থাৎ এতদিনে স্বাধীনতার একটা যুক্তিসঙ্গত রূপ আঁকা হয়েছে।

ওর মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য করার আছে? সেটা হচ্ছে এই যে এই রূপটা মনের পটে আঁকতে আমাদের প্রায় পঞ্চাশ বছর সময় লেগে গেছে। এর থেকে মনে করা চলে যে যাত্রার সুরুতে এটা ছিল না, চলতে চলতে এটা দিনে দিনে ফুটে উঠেছে। অনেকে এ কথার প্রতিবাদ করতে পারেন। তাঁদের মতে আজকার কল্পিত কৃষক-মজুর প্রজারাজের মূল প্রেরণা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম থেকেই

ছিল। প্রথম যুগে যাঁরা সর্ব্বস্ব পণ করে সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছিলেন তাদের ভাষা ছিল স্বতন্ত্র, কারণ বর্ত্তমানের ভাষা বোঝবার মত মন তখনও জনসাধারণের তৈরি হয়নি। ঐতিহাসিক পরিণতির বিশেষ একটি স্তরে এসে আদর্শকে যে ভাষায় প্রকাশ করা হচ্ছে সেটা নতুন হতে পারে, কিন্তু তার মূল বিষয় বস্তুর মধ্যে কোন নূতনত্ব নেই। এ বিষয়ের এত সূক্ষ্ম বিচার আমাদের বর্ত্তমান আলোচনায় খুব প্রাসঙ্গিক নয়। লক্ষ্য নিয়ে এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায় সম্বন্ধে গত পঞ্চাশ বছর ধরে যে তুমুল মতদ্বৈধতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে যে গুরুতর সংঘর্ষ লক্ষ্য করা গেছে তার থেকে আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত এই যে মুষ্টিমেয় দু-চারজনের কথা ছেড়ে দিলে জন-সাধারণ সমগ্রভাবে বহুদিন পথ হাতড়ে হাতড়ে তবে বর্ত্তমান মতবাদে এসে পৌঁছেছে।

প্রসঙ্গতঃ এইখানে আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করা যেতে পারে। সেটা হচ্ছে এই যে বর্ত্তমানের কল্পনা অনুযায়ী জাতীয় স্বাধীনতার সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হতে না হতেই জাতির সংজ্ঞা নিয়ে বাদানুবাদ সুরু হয়ে গেছে। খুব অল্পদিনের মধ্যেই হিসাবে ঠিক হয়ে গেছে যে ভারতবর্ষে একটি জাতীয় স্বাধীনতায় চলবে না, কারণ জাতি ভারতবর্ষে একটি নয়, এমন কি দুটিও নয়। এরই মধ্যে গুণ্‌তিতে যোলো কি সতেরটা পাওয়া যাচ্ছে। হিসাব যত সূক্ষ্মতর হবে, এই সংখ্যাটা ততই আরো বাড়তে পারবে এমন সম্ভাবনা আছে।

এই দুটিকে মিলিয়ে দেখলে তৃতীয় আর একটি তথ্য চোখে পড়ছে। সেটি এই যে স্বাধীনতার কল্পনার সঙ্গে রাষ্ট্র অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে গেছে। সমগ্র ভারতবর্ষ সম্পর্কেই হোক আর প্রদেশগত ভাবে বা সম্প্রদায়গত ভাবেই হোক, লড়াইটা বর্ত্তমানে এমন পথ নিয়েছে যে পথের লক্ষ্য হচ্ছে স্বাধীন রাষ্ট্র সংস্থাপিত করা। এ বিষয়ে সকলেই একমত যে স্ব-কর্তৃত্বশীল রাষ্ট্র স্থাপিত হলেই স্বাধীনতা পাওয়া গেল। মত দ্বৈধতা যে ব্যাপারটাতে আছে সেটি হচ্ছে এই স্ব-কর্তৃত্বের কার্য্যকরী-দিকটা নিয়ে। অনেকে মনে করছেন গণতান্ত্রিক শাসন-পরিষদের মধ্যে দিয়ে সর্ব্বসাধারণের স্বাধীনতার পথ সুগম হবে। কারো কারো বিশ্বাস যে শুধু ওই টুকুতে কিছুই হবে না। গণতান্ত্রিক শাসন-পরিষদ অবশ্য হতেই হবে, কিন্তু সেই পরিষদ যদি সম্পূর্ণ ভাবে বা অন্ততঃ মুখ্যতঃ নিজ সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারা গঠিত না হয়, তবে সেই সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা তার দ্বারা রক্ষিত হবে না। সুতরাং শাসন-পরিষদের রচনা কি ভাবে হবে সেইটাই আপাততঃ প্রধান আলোচ্য হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ এত দিনের এত সংগ্রাম, স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষের মধ্যে এত সংঘাত যে স্বাধীনতার জন্য তার রূপ ও প্রকৃতি যখন চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে এল তখন দেখা যাচ্ছে সেটা শুধু একটি কর্তৃত্বশীল রাষ্ট্র। অর্থাৎ স্বরাজ এবং স্বরাষ্ট্র একার্থবোধক।

(১৪)

এখন দেখা যাক স্বরাষ্ট্রের প্রকৃত মূল্য কি।

একথা নিশ্চয় যে জাতিগত ও রাষ্ট্রগত চেতনার উপযোগিতা আমাদের জীবনে আছে। দেখা যাচ্ছে মানুষকে বাঁচতে হলে খেতে পরতে হয়, এবং খেতে পরতে হলে খাদ্যাদি উৎপন্ন করতে হয়, সুতরাং তাকে বাধ্য হয়েই বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে সহযোগিতায় আসতে হয়। মানুষের প্রকৃতি ও প্রয়োজন বিভিন্ন, সুতরাং সহযোগিতার রূপও বিচিত্র হতে বাধ্য। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের জন্য সমাজে একটি কর্তৃত্ব-কেন্দ্র থাকার প্রয়োজন আছে। বর্ত্তমানে রাষ্ট্র হচ্ছে এই কর্তৃত্ব-কেন্দ্র। সুতরাং এই রাষ্ট্র যাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে তারা যত বেশী পরিমাণে আমার সমস্বার্থ-বিশিষ্ট ততই কার্য্যক্ষেত্রে আমার চলার পথ সুগম হবে। সুতরাং রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা যেমন আছে, রাষ্ট্র গণনিয়ন্ত্রিত হবার প্রয়োজনও সেই পরিমাণে আছে।

দ্বিতীয়তঃ সমস্বার্থবিশিষ্ট লোক মুখ্যতঃ তারাই হতে পারে যারা আমার কাছাকাছি থাকে, যারা আমার সঙ্গে একই সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে উঠেছে, একই ভাষায় কথা বলে, খাওয়া-দাওয়া, আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ, পূজা-অর্চ্চার যাদের সঙ্গে মিল আছে, দৈনিক অন্নসংস্থানের জন্য যাদের সঙ্গে একই সঙ্গে খুঁজতে হয়, খাটতে হয়, তারা আমাকে যত সহজে বুঝবে, যাদের সঙ্গে এই মিলটা নেই, তারা তা বুঝবে না। সুতরাং রাষ্ট্র শুধু গণনিয়ন্ত্রিত হলেই চলবে না, স্বগণ নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই।

জাতি ও রাষ্ট্র দুটি মনোস্তাত্বিক ও অর্থ নৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে একসাথে মিলে—মিলিত রূপটার নাম দেওয়া গেছে রাষ্ট্রজাতিত্ব, nationalism. ঐতিহাসিক পরিণতির ধারাপথে এটা এসে আজ আমাদের মনে বাসা বেঁধেছে। আজ এর উপযোগিতা আছে। কিন্তু সে সম্পর্কে দুটি জিনিষ প্রসঙ্গতঃ লক্ষ্য করা দরকার। প্রথমতঃ রাষ্ট্রজাতিত্বের চেতনা মানুষের কোন চিরন্তন সংস্কার নয়। এর যে দুটি ভিত্তি—মন ও অর্থনীতি—তার নিয়তই পরিবর্তন হচ্ছে। সুতরাং দ্বিতীয়তঃ, এর উপযোগিতার বোধ যদি তার যথার্থ মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তা হলে হিতের চেয়ে অহিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাচ্ছে। আপাততঃ দ্রষ্টব্য এইটুকু যে মানুষ শুধু হৃদয়াবেগ নয়, বা নিছক অর্থনীতি নয়। বাঁচতে হলে অর্থ যেমন প্রয়োজন, আরো অনেক কিছু প্রয়োজন। সুতরাং সম্পর্ক যে তার নিছক অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের সঙ্গেই হবে বা হচ্ছে তা নয়, দূর-দূরান্তবর্তী মানুষ নানাভাবে পরস্পরের সঙ্গে নানা সম্পর্কে যুক্ত হচ্ছে। এই সব সম্পর্ককেই অর্থের গণ্ডীর মধ্যে টেনে রাখতে গেলে অনর্থ হবেই, এতে কোন সংশয় নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কতকগুলি সার্বভৌম নীতি ও ন্যায় আছে। এ গুলির যাথার্থ্যতা বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। এই সব নীতির মধ্যে যদি কোথাও খাঁকতি পড়ে তবে তাকে বুদ্ধিদ্বারা সংশোধন করা যায় এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রসন্ন মনের সহজ প্রীতির মধ্যে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু জাতিপ্রেম যেখানে নীতিনিষ্ঠাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে সেখানে মনের কোন স্বাভাবিকতা থাকতে পারে না। জার্মানি থেকে ইহুদিদের তাড়িয়ে দেওয়াতে কয়েক বছরের জন্য বিশুদ্ধ জার্মানদের নানারকম সুবিধা হয়েছিল এটা নিশ্চয়। কিন্তু তারপর জার্মানরাই একমাত্র বিশুদ্ধ মানুষ এই মনোভাব যখন সমস্ত অ-জার্মানদের অসহনীয় ক্ষুব্ধতায় আঘাত করতে থাকলো, তখনই জার্মানির পতনের সূত্রপাত হোলো, এবং সে পতন ঘটাবার কাজে বিতাড়িত ইহুদিদের দাম কম নয়। শেকস্‌পীয়রের ইংল্যাণ্ড এবং গোটের জার্মানির দুজন লোকের কারোরই অপরকে বর্বর মনে করবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকার কথা নয়। তা সত্ত্বেও অন্ধ যুদ্ধে ভিতবার জন্য রাজনৈতিকদের নিজ নিজ সৈন্যদলকে উত্তেজিত করতে পরস্পর বিরুদ্ধে বর্বরতার অপবাদ দেবার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু ঐ দুই দেশের ধর্ম-যাজকেরা যখন নিজ নিজ গীর্জায় গিয়ে পরস্পর বর্বরতার সম্পর্কে ঈশ্বরের মনে প্রত্যয় জন্মাবার চেষ্টা করতে থাকেন, তখন তাঁদের ধর্মনিষ্ঠায় মানুষের সন্দেহ জাগে এবং জাতিনিষ্ঠা হাস্যাস্পদ হয়। মসজিদের সামনে দিয়ে শোভাযাত্রা নিয়ে যাওয়ার সময় বাজনা না-বাজালে হিন্দুর ধর্মাচরণে ব্যাঘাত হয় এবং বাজালে মুসলমানের ধর্ম থাকে না, এ মনোভাব সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে। স্বজাতির চেয়ে মানবজাতি বড়, এই নীতি মেনে নিতে রাজী হলে তখন বিভিন্ন জাতির মানুষের সম্পর্কে যুক্তির ভিত্তিতে বিচার করে দেখা চলে। মানবজাতির চেয়ে স্বজাতি বড় এই বিশ্বাস যদি মনে একবার শিকড় গজিয়ে ফেলে, তখন বিচারের পথ আর থাকে না, এবং মানব ও জাতি দুই-ই বিপন্ন হয়।

অবশ্য একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয় যে এই অপরিমিত জাতিপ্রেম বা সম্প্রদায়-পূজা রাষ্ট্রজাতিত্বের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। জাতিপ্রেমকে স্বাভাবিক মাত্রার মধ্যে রাখতে না পারার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু আমরা পূর্বে দেখেছি মানুষের চলার ছন্দ যেখান থেকে নিরূপিত হয় তার শক্তি নিছক যুক্তির চেয়ে অনেক বেশী। জীবনের বহু ক্ষেত্রেই চলার বেগে যুক্তির তাল কেটে যায়। রাষ্ট্রজাতির সম্পর্কে এখানে প্রসঙ্গক্রমে এতগুলি কথা বলার উদ্দেশ্য এটা দেখানো যে রাষ্ট্রজাতিত্বের বন্ধনটাই যুক্তি ও ভাবের দিক দিয়ে এমন একটা অস্বাভাবিকতার ধার ঘেঁষা যে এ পথে চলতে গেলে পাঁচটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পথে না পড়ে বিপথে পড়ার সম্ভাবনা বেশী।

তা সত্ত্বেও বর্তমানে আমাদের সমুখে স্বাধীনতার চিত্র হিসাবে যেটা রূপায়িত হয়ে উঠছে তা হচ্ছে এই স্বশাসিত রাষ্ট্রজাতি, national state. বিচার করে দেখা দরকার এই state বা রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ কতখানি স্বাধীনতা লাভ করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবীতে' এক যক্ষপুরীর রাজার চিত্র আছে—অটল ভালাবরণের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে রাজা, তাকে দেখা যায় না, শুধু মাঝে মাঝে জালের আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসে তার একখানা হাত ; পেশী শিরাবহুল শক্তিধর সেই হাতের নেতৃত্বে পরিচালিত পিপড়ের সারির মত লক্ষ লক্ষ খোদাইকারের দল অন্ধকার পাতাল খুঁড়ে তাল তাল সোনা আহরণ করে আনছে :—ভেবে দেখলে বোঝা যায় এই রূপক কাহিনী আধুনিক রাষ্ট্রের নির্ভুল বর্ণনা। রাষ্ট্রশক্তি হচ্ছে সেই অদৃশ্য রাজার হাতখানার মত—তার পিছে কোন ব্যক্তি নেই, সুতরাং তার মন নেই, হৃদয় নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুদ্ধিও নেই, কিন্তু সে হাতের নৈপুণ্য পরমাশ্চর্য্য। সে হাতের একমাত্র পরিচয় হচ্ছে তাতে কাজ হয়। আর কিছু হয় কি না সে প্রশ্ন অবান্তর, হাতখানা কাজের জন্য।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দুটি বিষয় আলোচনা করেছি। তার একটি হচ্ছে এই যে বর্ত্তমান কালে মানুষের কর্ম্মস্পৃহা প্রধানতঃ চরিতার্থ হচ্ছে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে। যন্ত্রের যে পরিচালক সেও যন্ত্রের একটা জীবন্ত আঙ্গিক। মূল যন্ত্র ও তার সেই আঙ্গিক—দুয়ে মিলে একটা বৃহত্তর যন্ত্রের মত কাজ করে চলে। দ্বিতীয়তঃ কথাটা হচ্ছে এই যে যন্ত্রের প্রভাবে মানুষের মন এমনি প্রভাবিত হয়ে গেছে যে মানুষের জীবন ব্যাপারের প্রায় সমগ্র ক্ষেত্রেই যান্ত্রিক নিয়ম কাজ করছে। এমন কি যেখানে সাক্ষাৎভাবে কল-কব্জা নিয়ে কাজ করতে হয় না, সেখানে কাজ সংঘটিত হয় মনুষ্যশক্তির সমবায়ের দ্বারা, সেখানেও সেই সমবায় রচিত হয় যান্ত্রিক আদর্শে, এবং ইচ্ছাশক্তি যন্ত্র ছাড়াই যন্ত্র চালিতের মত কাজ করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই রকম যান্ত্রিক সমবায়ের সব চেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে আধুনিক রাষ্ট্র। এবং এই সঙ্গে আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে এই যে এই সমধর্ম্মী রাষ্ট্রসমাজের কোন না কোন শ্রেণীর স্বার্থে সেই শ্রেণীর প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয়। সোভিয়েট শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে একটি বক্তৃতায় মার্শাল স্ট্যালিনও একথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছিলেন, "The state is a machine in the hands of the Governing class, for suppressing the resistance of its class antagonists. In this respect, the dictatorship of the proletariat differs in no way essentially from that of any other class."—এই মেশিনের একমাত্র কাজ হচ্ছে এর পরিচালকদের স্বার্থে সোণার যক্ষপুরী গড়ে তোলা। এবং সেই উদ্দেশ্যে খোদাইকারদের কাজের তদারক করা। এর চেয়ে মহত্তর কোন কাজ আজ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রের দ্বারা হয় নি এবং তা হবার জন্য যে রাষ্ট্রের উদ্ভব নয় তা এর ইতিহাস থেকে প্রমাণ হয়।

এই ইতিহাসে মানুষের সভ্যতার দুটি স্তর পাওয়া যাচ্ছে। একটি হচ্ছে মুখ্যতঃ কৃষিজীবি, দ্বিতীয়টি মুখ্যতঃ শিল্প-বাণিজ্যজীবি, industrial-mercantile. মুখ্যতঃ বলার অর্থ এই যে কোন সমাজই নিছক কৃষি বা নিছক বাণিজ্য দ্বারা বাঁচতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেক সমাজেই বিশেষ একটি সময়ে এর একটি বা অপরটি প্রাধান্য লাভ করে। বাণিজ্যের যা ধনাগম হয় 'তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মনি'—এটা সম্ভবতঃ সার্ব্বভৌমিক স্বীকৃতি। সুতরাং কৃষিতে যখন পেট আর ভরতে চাইল না, তখন ইউরোপ সমুদ্রের পারে পারে বাণিজ্যের সন্ধানে ছুটলো। ইউরোপের ইতিহাসে এই যন্ত্রের সময়টাকে বলা হয় বর্ত্তমান যুগের আরম্ভের কাল। সেই সময় থেকে সুরু করে আজ পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচশো বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের জাতিগুলি এবং তাদের বিভিন্ন অঞ্চলবর্ত্তী শাখা-প্রশাখা দ্বারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে বিস্তর বাণিজ্য করেছে, বিপুল ধনার্জ্জন করেছে, কত বিচিত্র বস্তু ও ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেছে, এবং এই সব এবং আরো অনেক কিছু নিয়ে এক বিশাল ও চাকচিক্যময় সভ্যতার সৃষ্টি করেছে। এই সভ্যতার জৌলুসে আজ গোটা পৃথিবীর প্রায় সকলেরই চোখ অল্প-বিস্তর ধেঁ-ধেঁ গেছে—আমরা অনেকেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মেনে নিয়েছি যে এই সভ্যতার যা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ সেইগুলিই চিরন্তন কালের মানব সংস্কৃতির সম্পদ এবং এই পাঁচ-শো বছরের ইতিহাসের গতি যে দিকে সেইটাই মানব প্রগতির চরম দিশা।

বস্তুতঃ এই সভ্যতা মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসের অবিরাম তরঙ্গমালার একটি তরঙ্গ মাত্র। এর যা কিছু সম্পদ তা বহুলাংশে সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে উদ্ভাবিত।

আধুনিক রাষ্ট্র এই সব সম্পর্কের অন্যতম। এর উদ্ভব ও পরিণতি সমসাময়িক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

কৃষি-ভিত্তিক সমাজের সঙ্গে আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যভিত্তিক সমাজের একটা মৌলিক পার্থক্য এই যে প্রথমোক্ত সমাজে কর্তৃত্ব-কেন্দ্র অর্থাৎ শাসনশক্তি বহুধা বিক্ষিপ্ত decentralised সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য রাজনিয়ন্ত্রিত ক্ষাত্রশক্তি আছে। এ শক্তিকে লোকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু তার একটা মোটামুটি রকম নিজস্ব চৌহদ্দি রয়েছে, যার বাইরে ব্রহ্মণ্য শক্তির একচ্ছত্র প্রভুত্ব। এমনকি পোপের হুকুমে রাজাকে সিংহাসন ছাড়তে হচ্ছে, ব্রাহ্মণ গুরুগুরুর আদেশে ক্ষত্রিয় রাজাকে আইন করতে হচ্ছে বা বদলাতে হচ্ছে। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে guild বা বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধানে। সমাজের সমসাময়িক আদর্শের পরিপন্থী না হলে এই বিধানের অন্তর্বর্তী মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বড় একটা খণ্ডিত হচ্ছে না। কিন্তু কৃষি থেকে বাণিজ্যের পথে পদার্পণ করার পর প্রয়োজনের তাগিদে রাষ্ট্রশক্তি ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত হ'তে সুরু করে। কারণ এর প্রথম যুগে পশ্চিম ইউরোপের কতকগুলি দেশের কিছু সংখ্যক মানুষ দেশ-দেশান্তরে অভিযান করে প্রচুর ধনলুণ্ঠন করল। বস্তুর চাহিদা যত বাড়তে থাকলো, তার উৎপাদনও ততই বাড়াতে হোলো। বাড়াবার তাগিদে এক সময় উন্নত ধরণের বাষ্প-চালিত যন্ত্রের উদ্ভব হোলো। যন্ত্র চালাবার জন্য মানুষ চাই। কাজেই প্রাচীন উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে দিতে হোলো যন্ত্রের মজুর সংগ্রহ করবার জন্য। এত পরিবর্তন একদিনে হয়েছে তা নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে পরিবর্তন কখনো ধীরে, কখনো দ্রুতিতে ঘটেছে তার মূল ধারাটা এই। এই পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য যে শ্রেণীর হাতে বাণিজ্যের ফলে টাকা এসেছিল তারা ধীরে ধীরে রাজশক্তিকে সংহত কেন্দ্রীভূত করবার কাজে লেগে গেল। বিক্ষিপ্ত রাজশক্তির আমলে বাণিজ্য বিস্তারের ব্যাঘাত ঘটে, প্রয়োজন মত উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তনায় বিঘ্ন হয়। আবার সংহত রাজশক্তি যদি ব্যক্তিবিশেষের হাতে থাকে, অথবা বাণিজ্য-জীবি ছাড়া অন্য শ্রেণীর হাতে থাকে তাহলেও সেই অসুবিধাই হয়। এই অভিজ্ঞতা থেকে আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যজীবি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব। যে সময় এই আন্দোলন সুরু হয় তার অব্যবহিত পূর্বে ব্রহ্মণ্যশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে রাজশক্তি জয়ী হয়েছে। রাজার ক্ষমতা তখন অপ্রতিহত। বুদ্ধিজীবিরা নানা যুক্তি দিয়ে জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে রাজক্ষমতা ঈশ্বরের বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। নতুন বৈশ্য সম্প্রদায় এই রাজক্ষমতায় আঘাত হানাতে আবার সংঘর্ষ বাধলো এবং এবার রাজশক্তির হার হোলো। বৈশ্যশক্তি ইংলণ্ডে রাজার মাথা কেটে ফেলে সকলকে জানিয়ে দিল যে ঐশ্বরিক বিধানের যুক্তি সমেত রাজার মাথাটাও নিতান্ত অকাট্য নয়। আরো কয়েকটি অনুরূপ ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর বৈশ্য গণতন্ত্র সমাজে আদর্শ হিসাবে চালু হয়ে গেল, ঠিক যেমন পূর্বতন যুগে রাজ-তন্ত্রই ছিল আদর্শ শাসনব্যবস্থা।

ভারতবর্ষে এই নূতন সমাজব্যবস্থা সহজভাবে গড়ে ওঠে নি। এদেশের মাটিতে এর মূলোচ্ছেদ হয়েছে প্রধানতঃ ইংরাজের বাণিজ্য বিস্তারের তাগিদে। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল পর্যন্ত এদেশ তার প্রাচীন ব্যবস্থা আঁকড়ে ধরেছিল। ইংরাজের আইনে ক্রমে ক্রমে সে বন্ধন শিথিল হ'য়ে এসেছে। সার জন মেটকাফ্ লাটসাহেবি থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে দেশে ফিরে গিয়ে কোম্পানীর পরিচালক সংসদে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে দিতে না পারলে এদেশে ইংরাজ শাসনের ভিত্তি শক্ত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তিনি দেখিয়েছিলেন ভারতবর্ষের জনসাধারণ রাষ্ট্র নিয়ে কখন বড় একটা মাথা ঘামায় নি। তাদের দৈনন্দিন জীবন ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করেছে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মারফত গ্রাম্য সমাজ। কত যুদ্ধ ও বৈদেশিক আক্রমণ তাদের ওপর দিয়ে চলে গেছে, কত রাজা, সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, কত বিপ্লব, কিন্তু গ্রাম্য সমাজ তার প্রাচীন ব্যবস্থা আঁকড়ে ঠিক টিকে থেকেছে। রাজশক্তির পরিবর্তনে প্রজাসাধারণের জীবনের ভারকেন্দ্র কখনো স্থানচ্যুত হয় নি।—সার জন মেটকাফ ব্যবস্থা দিয়েছিলেন যে গ্রাম্য পঞ্চায়েতকে ভেঙে দিতে হবে সরকারি আদালত বসিয়ে। সেই ব্যবস্থা অনুসারে পরবর্তীকালে কাজ হয়েছে। জনসাধারণের

জীবনের সব কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে কেন্দ্রীভূত হয়েছে ইংরাজ সরকারের হাতে। ব্যক্তির সামাজিক জীবনের যে স্বাধীনতা গণতন্ত্রের মূল কথা, যার বিকাশ ইউরোপে একদিন হয়েছিল পেরিক্লিসের এথেন্সে, প্রায় সমসাময়িক কালে ভারতবর্ষে হিউয়েনসাং যা লক্ষ্য করেছিলেন, এবং তাঁর সময় বা আরো আগে থেকে সার জন মেটকাফের সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষ যা ভোগ করে এসেছিল তা এই ভাবে ইংরাজ বৈশ্যশক্তির আওতায় পড়ে নষ্ট হয়েছে। কিন্তু তবু এইটাই চরম ক্ষতি নয়। সব চেয়ে বড় পরাজয় আমাদের হয়েছে এইখানে যে এই বৈশ্যতন্ত্রের শ্রেণীস্বার্থমূলক রাষ্ট্র সংগঠনকে আমাদের তথা বিশ্বমানবের চিরন্তন কালের শ্রেয়তম সমাজ ব্যবস্থা বলে মেনে নিতে চলেছি।

অবশ্য এই পরাজয়—বা একে যে নামই দেওয়া যাক না কেন—যা হয়েছে তা ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই হয়েছে। ইংরাজের শোষণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য যেমন একদিন জাতীয় চেতনার সূত্রপাত হয়েছিল, তেমনি স্বাভাবিক কারণেই ক্রমে ক্রমে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যজীবী সম্প্রদায়েরও উদ্ভব হয়েছে। পূর্বে বলেছি কাঁচির দুটা পাতে মিলে তবে কাটে। রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা পাত হচ্ছে মধ্যবিত্তের আদর্শপ্রবণতা। আর একটা পাত হচ্ছে অর্থনৈতিক সংস্থিতি। বৈশ্যশ্রেণীর সাম্প্রদায়িক স্বার্থ যদিও আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের প্রধান উপাদান, কিন্তু গণতন্ত্রের মূল তত্ত্বে একটা বড় আদর্শের প্রেরণা আছে। সব মানুষের সমান অধিকার সমান সুবিধার আশা বা কল্পনা উৎসাহ না জাগায় এমন [illegible] মধ্যবিত্ত সমাজের খুব কম আছে। এই ভাবালুতা অবশ্য কার্যক্ষেত্রে প্রবল শ্রেণীস্বার্থের প্রতিকূলতার কাছে হার মানে। কিন্তু তাতে ইতিহাসের এগিয়ে চলতে বাধা হয় না। আদর্শবাদী মধ্যবিত্ত হচ্ছে কর্তৃত্বশীল বা কর্তৃত্বলিপ্সু শ্রেণীর সংগ্রামশক্তি। ভারতবর্ষেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য যুদ্ধ করছে এই শক্তি। কিন্তু এর পিছে থেকে পৃষ্ঠরক্ষা করছে যে সেটা হচ্ছে উদীয়মান ধনতন্ত্র। ভারতে একটা রাষ্ট্র হবে, কি কয়েকটা হবে, এই নিয়ে যে ঝগড়া সেটা হচ্ছে প্রদেশ বা সম্প্রদায় বিভক্ত ধনতন্ত্রের আত্মকলহ।

এর ফলস্বরূপ দুটিমাত্র ব্যাপারের উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই। প্রথমতঃ এই কলহের ফলে স্বাধীনতার সংগ্রামশীল সৈনিকদের চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। এবং দ্বিতীয়তঃ একটা বিশেষ ধরণের রাষ্ট্র নিয়ে কলহ-কোলাহলে বাতাস এমনি ঘুলিয়ে গেছে যে এই রাষ্ট্রে শক্তি ভাগাভাগিটাই সবার কাছে একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রের মূলভিত্তি যে প্রচলিত ধরণেরই হবে এটা যেন সবাই স্বতঃসিদ্ধির মতই ধরে নিয়েছে।

মহাকবি নবীনচন্দ্র

[illegible]শান্তি ঘোষ

বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি চতুষ্টয়ের (হেমচন্দ্র, মধুসূদন, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ) মধ্যে নবীনচন্দ্র একজন। কিন্তু বাঙ্গালী পাঠক সাধারণ নবীনচন্দ্রের সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত নহে। "পলাশীর যুদ্ধে"র কবি হিসাবেই অনেকের নিকট তাঁহার পরিচয়। "পলাশীর যুদ্ধ" তাঁহার অন্যতম সার্থক রচনা হইলেও তাঁহার প্রতিভা বৃহত্তর সৃষ্টি কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল এবং তাহা সার্থকতা লাভ করিল তাঁহার "উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" রচনায়। দীর্ঘকাল একোদ্দিষ্ট ভাবে নিযুক্ত হইয়া তিনি যে অক্ষয় ঐশ্বর্য্য বাঙ্গলা সাহিত্য ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন তাহা হইল রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস। মহাভারতের উপাখ্যানকে বিষয়বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়া "ইউরোপের প্রাচীন ক্লাসিক আদর্শের মহাকাব্যের (Heroic Epic)" অনুসরণে আধুনিক ভারতের সমস্যাযুক্ত যে কাব্যত্রয়ী সৃষ্টি করিলেন তাহা তাঁহার কবিজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

নবীন সাহিত্যের আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিক প্রচেষ্টার মূল সুর—জাতীয় নিষ্ঠা। কবি বঙ্কিম স্বদেশপ্রীতিকে সকল ধর্ম্মের উপরেই স্থান দান করিলেন। বঙ্কিমের ধ্যানদৃষ্টিতে পরিস্ফুট হইল পরশোষিত, নিপীড়িত, হৃতসর্ব্বস্ব ভারতের রূপ—মা যা হইয়াছেন ভারতের গৌরবময় সমৃদ্ধ অতীতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন—মা যা ছিলেন এবং ভাবীকালের স্বাধীন ভারতবর্ষের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তিনি উজ্জীবিত হইয়া উঠিলেন মা যা হইবেন। বর্ত্তমানের দুঃখ দুর্দ্দশার অবসান কল্পে পরবশ্যতার বিলোপের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করিলেন। পরাধীনতার, জাতীয় অবনতির এই মর্ম্মজ্বালা নবীনচন্দ্রের সাহিত্যেও পরিব্যাপ্ত। তাঁহার অবকাশ "রঙ্গিনী" ও "রঙ্গমতার" প্রতি ছত্রে ছত্রে জাতীয়তার অভিব্যক্তি আমরা লক্ষ্য করি। যুবরাজের (প্রিন্স অভ ওয়েল্স) ভারত আগমন উপলক্ষ্যে তিনি "ভারত উচ্ছ্বাস" শীর্ষক যে কবিতা রচনা করেন তাহাতে পরাধীনতার অভিশাপের মর্ম্মবেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরাজ শাসনের ফলে শৌর্য্য বীর্য্যহীন, ক্লিষ্ট ঐতিহ্যভ্রষ্ট ভারতের শোচনীয় দুর্দ্দশার কথা গভীর বেদনার সঙ্গে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন এবং যুবরাজকে উদ্দেশ করিয়া যে ছন্দোবদ্ধ বাণী তিনি উচ্চারণ করিলেন তাহা অবনত ভারতেরই মর্ম্মবেদনার রূপ :

"তোমার সাহিত্য, তোমার সঙ্গীত,
তোমারই শিল্প, তোমার আচার,
তব সভ্যতায় ভারত প্লাবিত,
ভারতের আহা! কি হয়েছে আর!
ভারতের তন্ত্র বীরত্ব সকল,
দুঃখিনীর লজ্জা রক্ষে 'মেন্‌চেষ্টার';
লবণাম্বুরাশি বেষ্টিত যে বল,
জন্মে 'লিবারপুলে' লবণ তাহার।"

•

"হায়! যুবরাজ, এই পরিণাম
শতবর্ষ তব দাসত্ব করিয়া?
ভারতের বল, বীর্য্য, কীর্ত্তি, নাম,
চিরদিন তরে গেল কি বিবিয়া?"

ইংরাজ শাসন শুধু যে ভারতের অতীত গৌরব ধ্বংস করিয়াছে তাহা নয়; ভারতের বীরজাতিসমূহকে দুর্ব্বল ও নির্বীর্য্য করিয়াছে, ইহার বেদনা কবি গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র জাতি—"নিদ্রাতেও যার শিয়রে তুরঙ্গ কটিবন্ধে অসি," রাজপুত জাতি—যাহারা দিপাহী বিদ্রোহে রক্তরক্তে ভারতের জাতীয় কলঙ্ক অপনোদনের প্রয়াস পাইল সেই বীরজাতিসমূহ পরাধীনতার অভিশাপ শিরে বহন করিয়া "কীর্ত্তি-বীর্য্যহীন" জীবনযাপনের গ্লানি ভোগ করিতেছে।

"পলাশীর যুদ্ধে" রাণী ভবানীর ভিতর দিয়া নবীনচন্দ্রের আত্মাই মূর্ত্তির হইয়া উঠিয়াছে, ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মূলে যে হীন চক্রান্ত কার্য্যকরী ছিল তার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে গিয়া রাণী ভবানী যে তেজোদৃপ্ত বাণী উচ্চারণ করেন তাহা অবিস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে :

"জ্ঞানহীনা নারী আমি, তবু মহারাজ!
দেখিতেছি দিব্য চক্ষে সিরাজদ্দৌলায়

করি রাজ্যচ্যুত, শান্ত হবে না ইংরাজ
বন্ধ হইবে সব রাজ্য-পিপাসায়।
সেই শক্তি টলাইবে বঙ্গ-সিংহাসন,
থামিবে না এইখানে; হয়ে উন্মত্ত,
শোণিতের স্বাদে যথা শার্দ্দূল যেমন,
প্রধাবিবে মহারাষ্ট্র—শৈলের ভিতর।
হবে রণ ভারতের অদৃষ্টের তরে,
কি ভীষণ! ভেবে মম শরীর শিহরে।

"জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্ন জাতি; তবু হেন আর্য্য-পাতালে।
যেন, ভারতবর্ষে আছে অধিষ্ঠিত
সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষ। এই দীর্ঘকাল
একত্র বসতি হেতু, হয়ে বিমূর্ছিত
জেতাজিত বিভেদ ভাব, আর্য্যসুত সনে
হইয়াছে পরিণয় প্রথা স্থাপিত;
নাহি ঘৃণা যবন জাতি-ধর্ম্মের কারণে।"

মিরজাফর, উমিচাঁদ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ প্রভৃতি রাণী ভবানীর উপদেশ কর্ণপাত করেন নাই, তার বিষময় ফল সমগ্রজাতি আজ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছে, ভারত-ভূমিতে মুসলমানরা দস্যি আক্রমণকারী রূপেই বিদেশ হইতে আসিয়াছিল তথাপি তাহাদের বংশধররা ভারতবর্ষকে আপন জন্মভূমি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ইংরেজ জাতি বাণিজ্যের ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছে। তাহাদের বংশধররা শুধু যে মাতৃভূমিরূপে ভারতবর্ষকে গ্রহণ করে নাই তাহা নহে, তাহাদের স্বদেশের এবং স্বজাতির পরিপুষ্টির জন্য ভারতের রক্তমোক্ষণ চলিতেছে অত্যাচার ও নিপীড়নের ভিতর দিয়া। এই অভিশাপ হইতে দেশ মুক্ত পাইবে কবে? পলাশী প্রাঙ্গণে ভারতের ভাগ্যলিপি লিখিত হইবার পূর্ব্বে যদি রাজন্যবর্গ রাণী ভবানীর মন্ত্রণায় চালিত হইতেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের এই শোচনীয় দুর্দ্দশা হইত না। রাণী ভবানীর সেই বীর-উক্তি এখনও আমাদের কর্ণে অনুরণিত হইতেছে :—

"আমার কি মত? শুন মহারাজ!
অসংখ্য পামর যদি, নিক্ষোষিয়া অসি,
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি সবার
প্রবেশ সম্মুখ রণে; যেন পূর্ণ শশী,
বঙ্গ স্বাধীনতা-জয়া বঙ্গের আকাশে
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে
হাসুক উজলি বঙ্গ! এই অভিলাষে
কোন্ বঙ্গবাসি—রক্ত যমনী-ভিতরে
নাহি হয় উন্মত্ত? আমি যে রমণী;
বহিছে বিদ্যুৎ—বেগে আমার ধমনী।

এই উক্তির ভিতরে নবীনচন্দ্রের স্বাধীনতা-লিপ্সু মনের পরিচয় কি আমরা পাই না?

যাহারা নিরিত, হৃতসর্ব্বস্ব "নিজবাসভূমে পরবাসী" যাহারা, তাহাদের প্রতি নবীনচন্দ্রের সহানুভূতি জাতীয় নিষ্ঠারই পরিচায়ক। আর্য্য কর্ত্তৃক অনার্য্য নিপীড়নের এবং আর্য্য কর্ত্তৃত্ব হইতে নিজেদের স্বদেশ উদ্ধার করিবার জন্য অনার্য্যদের যে প্রচেষ্টা তাহার মধ্যে ইংরাজ শাসন হইতে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের আভাষই কি সূচিত হয় না? মুমূর্ষু চন্দ্রচূড়ের কেদোক্তি কি ভারতবর্ষেরই মর্ম্মজ্বালার অভিব্যক্তি নহে? রৈবতকে নাগরাজ চন্দ্রচূড়ের মুখ দিয়া নবীনচন্দ্রের যে বাণী নির্গত হইয়াছে তাহা তাঁহার মর্ম্মস্থলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করাইবে।

"একটী প্রাচীন জাতি করিল যাহারা
জন্মভূমি দাসত্বজীবী ভিক্ষাব্যবসায়ী;
নিষ্পেষিয়া মনুষ্যত্ব দলিয়া চরণে
পশুত্বে পরিণত করিল যাহারা,—"

তাদের বিরুদ্ধে চন্দ্রচূড়ের যে অভিশাপের বাণী তাহা ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে ভারতেরই তিক্ত মনোভাবেরই সূচনা করে। আজ সমগ্রজাতি ইংরেজ রাজত্বের অভিশাপের উলঙ্গরূপে সম্মুখে বিদ্রোহের অগ্নিধ্বজা ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়াছে। এই জাতীয় জাগরণের মূলে যে কয়জন অমর-সাহিত্যিকের দান রহিয়াছে তাহাদের একজন হিসাবে নবীনচন্দ্রকে আমরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।*

* মহাকবি নবীনচন্দ্র সেনের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত।

জাতি-বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ (৯)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

যে-সকল সার্থক প্রচেষ্টা গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে জাতির মনে দেশাত্মবোধ দৃঢ়মূল করিতেছিল তাহাদের মধ্যে হিন্দু বা জাতীয় মেলার নাম সর্বাগ্রে করিতে হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আলোচনায় এই মেলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি। এই দশকের প্রারম্ভ হইতে ইহার কার্য্যকলাপ বহুমুখী হইয়া উঠে। আমি অন্যত্র* হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত বিস্তৃতভাবে দিয়াছি, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইংরেজ ঐ সময় যেরূপ স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মী হইয়া উঠিতেছিল তাহাতে ভারতবাসীদের মনেও তাহার প্রতিক্রিয়া হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক ছিল। হিন্দু মেলা এই প্রতিক্রিয়াকে একটি সুষ্ঠু রূপ দিয়া সাধারণের সমক্ষে ধরিলেন এবং তাহাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনিয়া দিলেন। মেলার কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিলেন—শাসকজাতির সাহায্য প্রত্যাশা না করিয়া আমরা নিজেরাই নানা বিষয়ে উন্নতি করিয়া লইব। তাঁহারা এক কথায় ইহার নাম দিলেন 'আত্মনির্ভর'। তখন শাসকরূপে ইংরেজ জাতি যেরূপ রাষ্ট্রীয় সর্ব্বকর্ম্ম নিয়ামক হইয়া পড়িতেছিল তাহাতে শাসিতের মধ্যে তাহার উপর নির্ভর করিবার প্রবৃত্তি অনায়াসেই জন্মিতে থাকে। কিন্তু পরাধীন জাতির পক্ষে এই প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া আদৌ কল্যাণকর নহে। তাই হিন্দু মেলার 'আত্মনির্ভর'-ঘোষণা সময়োপযোগী হইয়া পরমুখী মনকে স্বমুখী করিয়া আনিল। হিন্দু মেলার প্রতিজ্ঞা—শিল্পে সংস্কৃতিতে, ভাষায় সাহিত্যে, পোষাকে পরিচ্ছদে, আচারে ব্যবহারে—সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বকর্ম্মে আমরা আত্মনির্ভর গুণটির অনুসরণ করিব। ইহার ফলে, বর্ত্তমান যতই মন্দ হউক, আমাদের সুমহান্ অতীতের উপর ভবিষ্যৎ উন্নতির সৌধ গড়িতে পারিব। হিন্দু মেলায় প্রদর্শিতব্য দ্রব্যাদি সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ইহার তৃতীয় অধিবেশনে (১৮৬৯) অন্যতম উদ্যোক্তা মনোমোহন বসু বলিয়াছিলেন :

"যাহাদের পূর্ব্ব-সমাজ ও পূর্ব্ব-সভ্যতার অনিবার্য্য পরাক্রম অদ্যাবধি দেদীপ্যমান আছে, তাহাদের বিপরীত ভাবাপন্ন অপর দেশীয় সভ্যতার প্রচলন শুভও নয়, সুসাধ্যও নয়, সুসিদ্ধ হইবারও নয়। বরং পূর্ব্বকার সেই সকল শিল্পাদির সংশোধন ও উন্নতি করিবার চেষ্টা করা উচিত।...শুধু স্ত্রীশিল্প কেন? সাধারণ শিল্প সম্বন্ধেও এই কথা খাটিতে পারে। ফলতঃ সকল বিষয়েই এই সিদ্ধান্তটি স্মরণ রাখিতে হইবে, যে, ইউরোপীয়দের স্বাবলম্বন ও উদ্যোগটি আমাদের অনুকরণীয় বটে, কিন্তু কার্য্যসাধন প্রণালী এবং ঘর সংসারের রীতি নীতি সম্যক্ গৃহীতব্য নহে। এই মীমাংসাকে সম্মুখে রাখিয়া এই মেলার প্রদর্শন গৃহ সজ্জিত করা উচিত। বিশেষতঃ যখন স্বদেশীয় লোক ও স্বদেশীয় উদ্যোগ দ্বারা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনোদ্দেশ্যেই ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন অগ্রে স্বদেশীয় শিল্প-বিদ্যার সংস্কার, উত্থান ও নবযৌবন সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করাই অত্যাবশ্যক হইতেছে।"

হিন্দু মেলা সমাজ-জীবনে যে অনুপ্রেরণা আনিয়াছিল তাহার ফলে জাতীয় বিদ্যালয়, জাতীয় ব্যায়ামশালা, জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, জাতীয় প্রদর্শনী, জাতীয় সভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। কবি ও মনীষীগণ জাতীয় সঙ্গীত, স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতা, নাটক এবং বিভিন্ন দেশের মুক্তিসাধক বীরপুরুষদের কীর্ত্তিকলাপপূর্ণ গ্রন্থাদি রচনায় মন দিলেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে রচিত ও প্রচারিত হইলেও জাতীয় রঙ্গমঞ্চে 'নীলদর্পণ' অভিনয় বঙ্গবাসীর প্রাণে নব চেতনার সঞ্চার করিল। হিন্দু মেলার বার্ষিক অধিবেশনগুলিতে সম্বৎসরে জাতির উন্নতি অবনতির কথা আলোচিত হইত এবং স্বদেশবাসীদের উদ্দেশ করিয়া উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতা করা হইত। বাঙালীদের সম্মুখে তখন যে-সব উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল—যেমন, নগরে নগরে সওদাগরী কুঠী, অপর্য্যাপ্ত বাণিজ্য কার্য্য, নীল চা প্রভৃতির অসামান্য চাষ ও ব্যবসায়, বিচিত্র হর্ম্মকার্য্য, সুচিত্রিত কারুকার্য্য ও চিত্রকার্য্য—তাহাতে তাহাদের কোনই অধিকার

* "জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত"।

ছিল না। হিন্দু মেলার ষষ্ঠ অধিবেশনে (১৮৭২) মনোমোহন বসু আমাদের এই হীন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 'অহংবাদী সভ্যাভিমানী নরবপু'কে বলিলেন :

"তোমরা কিসের বড়াই করিয়া বেড়াও ? তোমরা বাক্যাড়ম্বর কিন্তু আর কি কাজের যোগ্য ? তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা উন্নত হইয়াছ একথা কোন্ সাহসে ব্যক্ত কর। যে ইংরাজ জাতির দ্বারা এই সকল কার্য্য হইতেছে, ইহা তাহাদের উন্নতি, তোমাদের কি ? শ্রীফল পক্ক হইলে বায়সের কি ? তাহারা স্বদেশে উন্নতির সঙ্গে বাস করেন, এখানেও সেই উন্নতিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া স্বদেশে এবং অধীন দেশে, উভয় স্থানে আপনারা আরো উন্নত হইতেছেন, তোমরা কেবল সাক্ষীগোপাল। তোমরা কেবল দর্শক আর স্তুতিবাদক বৈ আর কি ? সুতরাং তোমাদের উচ্চে উত্থান হইল কৈ ? তোমাদের প্রখর বুদ্ধিরূপ সুতীক্ষ্ণ বাণ আছে সত্য, কিন্তু প্রাকৃত বিজ্ঞান নামা রাধাচক্রের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া লক্ষ্যভেদ করিতে না পারিলে সে বুদ্ধি থাকাতে ফল কি ?"

সুতরাং শুধুমাত্র পূর্ব্বপুরুষদের কৃতিত্ব স্মরণ না করিয়া প্রাকৃত বিজ্ঞান অর্জ্জনপূর্ব্বক আমাদিগকে উন্নত শাসকজাতির সমকক্ষ হইতে হইবে। প্রাকৃত বিজ্ঞান—রসায়ন, পদার্থ-বিদ্যা প্রভৃতির ব্যবহারিক দিক শিক্ষাদানের জন্য জাতীয় বিদ্যালয়ের আয়োজন হইল, জাতীয় সভায়ও মধ্যে মধ্যে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা প্রদত্ত হইতে লাগিল। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য এই সময় হইতে বিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। হিন্দু মেলার বার্ষিক অধিবেশন-গুলিতে যেমন, জাতীয় সভার মাসিক অধিবেশনগুলিতেও তেমনি বাঙালী সমাজকে আত্মস্থ হইতে উপদেশ দেওয়া হইত। এই প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু প্রদত্ত 'হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা', 'সে কাল আর এ কাল' শীর্ষক বক্তৃতাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এখানে হিন্দু মেলার আর-একটি কৃতির কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা প্রয়োজন। বাঙালীকে বলবীর্য্যের অধিকারী করিয়া তোলা এই মেলার উদ্যোক্তাদের, বিশেষতঃ নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল। জাতীয় ব্যায়ামাগারে শারীর চর্চ্চার আয়োজন হইল। বিবিধ প্রকারের অস্ত্র চালনা, কুস্তি, কসরত, লাঠিখেলা, অসি-চালনা, অশ্বারোহণ, বন্দুক-ছোড়া প্রভৃতি রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইত। তখনও অস্ত্র-আইন হয় নাই, কাজেই বন্দুকের ব্যবহার শিক্ষা অবাধে চলিতে পারিত। মেলার প্রকাশ্য অধিবেশনে শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতা হইত, এবং ব্যায়াম-বিদ্যায় কুশলীরা পুরস্কৃত হইতেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' মেলার এই দিকটির উন্নতির জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এ বিষয়ে পত্রিকা উক্তি প্রণিধানযোগ্য। চতুর্থ অধিবেশনের বিবরণ আলোচনা প্রসঙ্গে 'পত্রিকা' (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭০) লেখেন :

"আমাদের দেশীয়গণের বুদ্ধির উৎকর্ষ অনেক হইতেছে। এ সঙ্গে শারীরিক বলবীর্য্যের, ব্যায়াম ও শস্ত্র শিক্ষা প্রভৃতির নিতান্ত অভাব এবং সেই অভাবের নিমিত্ত আমাদের এত হীনতা। যদি কেহ দেশের মঙ্গল চান, তবে যাহাতে এরূপ হয় সেইরূপ একটি আয়োজন করুন। আমরা বোধ করি কৃষ্ণকামিনীর চারুকার্য্যে পারিপাট্যতার কথা শুনা অপেক্ষা অনেকে 'মেলায় ঘোড় দৌড়ে দুজন বিকলাঙ্গ হইয়াছে, লাঠিখেলায় একজনের মাথা ভাঙ্গিয়াছে, বন্দুক ছুড়াতে একজন মরিয়াছে' শুনিয়া অসংখ্য গুণে সন্তুষ্ট হইবেন।"

পঞ্চম অধিবেশনের কার্য্যকলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে 'পত্রিকা' (২'মার্চ্চ ১৮৭২) লিখিলেন যে, মেলায় "যাহারা এই ব্যায়াম চর্চ্চায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের নাম প্রকাশ হউক, ইহা লইয়া তর্কবিতর্ক হউক, তাঁহাদের নামে কবিতা বন্দী হউক, তাঁহাদিগকে সাধুবাদ করা হউক, এইরূপ ঠিক কাজ করিতে থাকিলে শারীরিক বল যখন গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিবে, তখন মেলার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।" অষ্টম অধিবেশনের পরে 'পত্রিকা' (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪) লেখেন :

"আমরা যখন দেখিব হিন্দু মেলার সুবিস্তীর্ণ রঙ্গভূমি মল্ল বেশধারী হিন্দু সন্তানগণে পরিপূর্ণ হইয়াছে, বাঙ্গালীরা তেজস্বী অশ্বগণকে অবলীলাক্রমে ও অমোঘ কৌশলে সঞ্চালন করিয়া দর্শকগণকে বিমোহিত করিতেছেন, যখন দেখিব হিন্দু সন্তানগণ বন্দুক তলোয়ার প্রভৃতি বিবিধ

অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উদ্যমের সহিত উৎসাহ পূর্ব্বক যুদ্ধে পরস্পর প্রবৃত্ত হইতেছে এবং পরস্পর পরস্পরের আঘাতে আঘাতিত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে কেহ আহত পদে, কেহবা আহত হস্তে, কেহবা আহত মস্তকে রঙ্গস্থান পরিত্যাগ করিতেছেন, ও তদুপলক্ষে পুলিশ আসিয়া নবগোপাল বাবুর হস্ত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, সেইবার জাতীয় হিন্দু মেলার মহৎ উদ্দেশ্য অনেকাংশে সুসিদ্ধ ও সফল হইয়াছে।"

হিন্দু মেলার পরেই উল্লেখযোগ্য ভারত-সংস্কার সভার কার্য্য। কেশবচন্দ্র সেন ইহার প্রতিষ্ঠাতা। কেশবচন্দ্র ভারতে ব্রিটিশ শাসন 'বিধাতার বিধান' বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং ইংরেজ ও ভারতবাসীর মিলন-প্রয়াসী ছিলেন। তথাপি ইংরেজ শাসনের কুফলগুলির প্রতি তিনি এবং তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ সাধারণকে সজাগ করিতে কসুর করেন নাই। কেশবচন্দ্র ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইংলণ্ড গমন করেন ও ছয় মাস পরে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। বিলাতে অবস্থান কালে তিনি ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের শাসন-ব্যবস্থা, বিশেষতঃ আবগারি বিভাগের তীব্র নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এজন্য এদেশের সরকারী মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তিনি ভারতে ফিরিয়া আসিয়া মাসখানেকের মধ্যেই উক্ত ভারত-সংস্কার সভা প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সভার উদ্দেশ্য হইল ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি সাধন। সভার কার্য্য পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হয়—(১) স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন, (২) সুরাপান ও মাদক-নিবারণ বিভাগ, (৩) সুলভ সাহিত্য বিভাগ, (৪) ব্যবসায় ও জ্ঞান শিক্ষা বিভাগ এবং (৫) দাতব্য বিভাগ। সুলভ সাহিত্য বিভাগ হইতে যে 'সুলভ সমাচার' প্রকাশিত হয়—পূর্ব্ব প্রবন্ধেই তাহা বলিয়াছি। ভারত-সংস্কার সভা এই সকল কার্য্য সাধনে ইংরেজের সাহায্য লইতে পরাঙ্মুখ না হইলেও স্বদেশবাসীর উপরই অত্যধিক নির্ভর করিয়াছিলেন। সভা প্রতিষ্ঠার পরই 'বামাবোধিনী পত্রিকা' (অগ্রহায়ণ ১২৭৭) ইহার উদ্দেশ্য ও কর্ম্মবিভাগ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিলেন :

"সকল জাতীয় ও সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ী লোক—যাঁহার সভার উদ্দেশ্য সাধনে অনুরাগ আছে, তিনি এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন। বাবু কেশবচন্দ্র সেন এই সভার সর্ব্বোপরি সভাপতি।

"প্রথম বিভাগের কার্য্য নিম্নলিখিত উপায় সকল দ্বারা সাধন হইবে। বালিকা বিদ্যালয়, অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা, বামাগণের উপযোগী পত্রিকা প্রচার, সময়ে সময়ে পুস্তকাদি প্রকাশ এবং পরীক্ষা গ্রহণ ও পারিতোষিক দান ইত্যাদি।

"দ্বিতীয় বিভাগের কার্য্য এইরূপ হইবে। সুরাপান এবং অন্যান্য মাদক সেবন হইতে যাহাতে লোকে বিরত থাকে এরূপ পুস্তক প্রকাশ, বক্তৃতা দান; ইহা দ্বারা যে অজ্ঞানক পাপবৃদ্ধি হইতেছে তদ্বিষয় সাধারণের নিকট প্রচার করা ও কথোপকথন করা এবং ইংলণ্ডের সুরা-পাননিবারণী সভার সহিত যোগ রাখিয়া তাহার সাহায্য গ্রহণ করা ইত্যাদি।

"তৃতীয় বিভাগ দ্বারা সাধারণ লোকদিগের মধ্যে বিদ্যা প্রচার নিমিত্ত অল্প মূল্যে সহজ ভাষায় লিখিত পত্রিকা ও পুস্তকাদি সময়ে সময়ে প্রচারিত হইবে। ১লা অগ্রহায়ণ হইতে এই বিভাগ দ্বারা এক পয়সা মূল্যে সহজ ভাষায় লিখিত একখানি পত্রিকা প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে।...

"চতুর্থ বিভাগ হইতে শ্রমজীবীলোকদিগের ইংরাজী ও বাংলা শিক্ষার নিমিত্ত একটি বিদ্যালয় হইবে। অপরাহ্ণ বেলা ৭টা হইতে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং মধ্যম অবস্থার ভদ্রলোকদিগকে দরজীর কাজ, কম্পোজিটরের কাজ, লিথোগ্রাফ, ঘড়ী মেরামত করা, ইংরেজী হিসাব রাখা প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য প্রাতঃকালে বেলা ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত স্কুল খোলা থাকিবে।

"পঞ্চম বিভাগে দুঃখী ছাত্রদিগকে বিদ্যালয়ের বেতন ও পুস্তক দান, বিধবা ও পিতৃহীন দরিদ্র ভদ্র পরিবার-দিগকে মাসিক সাহায্য প্রদান ও আসন্ন রোগীদিগকে চিকিৎসা ও ঔষধাদি দ্বারা সাহায্য করা ইত্যাদি কার্য্য হইবে।"

প্রতিটি বিভাগে কার্যও অবিলম্বে আরম্ভ হইল। স্বল্প মূল্যে পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ায় দরিদ্র লোকেরা সংবাদপত্র পাঠের সুবিধা পাইল। প্রথম সপ্তাহে দুই হাজার ও দ্বিতীয় সপ্তাহে পাঁচ হাজার 'সুলভ সমাচার' বিক্রয় হইয়া যায়। এযুগে যখন এক আনা দুই আনা মূল্যে লক্ষাধিক পত্রিকা দৈনিক বিক্রয় হইতেছে তখন উহা হয়ত তেমন বিস্ময়কর ঠেকিবে না, কিন্তু তখনকার দিনের পক্ষে ইহা সত্যই বিস্ময়কর ছিল। মাদকদ্রব্য নিবারণ বিভাগ হইতে 'মদ না গরল' নামে এক-খানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক হইলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। বরাহনগরে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বেই একটি শ্রমজীবী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি একটি শ্রমজীবীদের পত্রিকাও প্রকাশ করেন। ভারত-সংস্কার সভাও শ্রমজীবীদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইলেন। স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন বিভাগেও কার্য সুরু হইল। যুবক ব্রাহ্মগণ কর্তৃক অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা, বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতির কথা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি। ফরিদপুরের নৃসিংহ হইতে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'অবলাবান্ধব' পত্রিকা সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করিতে-ছিলেন। ইহা অতঃপর কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ভারত-সংস্কার সভা স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন এবং এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উৎসাহে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বামাহিতৈষিণী সভা স্থাপিত হইল। মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গা-মোহন দাস প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের পত্নীগণ ইহার সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। এখানে স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ক বিবিধ বিষয়ের আলোচনা হইত।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি সহকর্মীদের সহযোগে কেশবচন্দ্র সেন একান্ত নিষ্ঠার সহিত ভারত সংস্কার সভার জাতিগঠনমূলক কর্মসূচী অনুসরণ করিয়া-ছিলেন। সভা স্বীয় কার্য দ্বারা শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তবে পূর্ববর্ণিত হিন্দু মেলা সমাজচিত্তে যে উদ্দামতা আনিয়া ইহাকে জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিল, ভারত-সংস্কার সভা দ্বারা তেমনটি হওয়া সম্ভবপর ছিল না। কারণ সভার কর্ণধারগণ একটি বিশিষ্ট মণ্ডলীভুক্ত ছিলেন এবং বিবাহ বিষয়ক ১৮৭২ সালের তিন আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর মূল সমাজদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। তদুপরি তাঁহারা ইংরেজের আধিপত্য স্বীকার পূর্বক তাহারই সঙ্গে নিজেদের সংস্কৃত ও উন্নত করিয়া লইবার পক্ষপাতী হইলেন। তবে পরবর্তী কালে তাঁহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে ইহার বিপরীত ভাবও যে উদয় না হইয়াছিল এমন নহে, কিন্তু সে কথা এখন বলিব না।

হিন্দু মেলা এবং ভারত-সংস্কার সভা বঙ্গসমাজে যে আন্দোলন উপস্থিত করিল, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী মুখে তাহা পরিষ্কৃত ও কথঞ্চিৎ যুক্তিসিদ্ধ হইয়া শিক্ষিত বাঙালীর মনে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিল। পূর্ব অধ্যায়ে দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র সম্বন্ধে ডেপুটি বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধ মত উদ্ধার করিয়াছি এবং তাহার উপর অমৃতবাজার পত্রিকার কঠোর মন্তব্যের কথা বলিয়াছি। 'পত্রিকা' পর পর দুই সংখ্যাতেই সরকারী নীতি এবং বিশেষ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মতামতের তীব্র সমালোচনা করেন এবং একটিতে আক্ষেপ করিয়া এমন কথাও বলেন যে, "Under the pressure of a foreign government even the true patriot turns a traitor to his country," অর্থাৎ বিদেশী শাসনের চাপে পড়িয়া খাঁটি স্বদেশপ্রেমিকও স্বদেশের শত্রুতে পরিণত হন। কঠোর সমালোচনা করিতে গিয়াও 'পত্রিকা' বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধের উল্লেখ না করিয়া পারেন নাই। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজের সঙ্গে বাঙালীর মিলনের আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। শাসকের সুস্মিত শাসিতের মিলনে মৃত্যু ডাকিয়া আনে। উভয়ের মধ্যে জাতি-যোগিতাই হইল জীবন। বঙ্কিমচন্দ্র এই মহামূল্য বাণী তাঁহার অনবদ্য ভাষায় 'জাতি বৈর' প্রবন্ধে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি ইহার উপসংহারে কিন্তু বলিলেন :

"অতএব জাতি-বৈর স্বভাবসঙ্গত। এবং ইহার দূরীকরণ স্পৃহনীয় নহে; কিন্তু জাতি-বৈর স্পৃহনীয় বলিয়া, পরস্পরের প্রতি দ্বেষ করা স্পৃহনীয় নহে। দ্বেষ মানুষের অতি কুৎসিৎ অবস্থা; যাহার মনে স্থান পায় তাহার চরিত্র কলুষিত করে। বাঙালী ইংরেজের প্রতি বিরক্ত থাকুন, কিন্তু ইংরেজের অনিষ্ট কামনা না করেন;

ইংরেজ বাঙালীর প্রতি বিরক্ত থাকুন, কিন্তু বাঙালীর অনিষ্ট কামনা না করেন। জাতি-বৈরের ফলে প্রতিযোগিতা কিন্তু বিদ্বেষ ও অনিষ্ট কামনা না করেন, অনেক স্থলে তাহা ঘটিতেছে।"

দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কেন বিরুদ্ধ মনোভাব-পোষণ করিতেন তাহার মূল আমরা এখানে পাইতেছি। তিনি জাতি-বৈরের পক্ষপাতী ছিলেন, ইহাকে তিনি একটি সত্যকার রূপ দান করিয়াছিলেন। কিন্তু জাতি-বৈরের ফলে প্রতিযোগিতাই তিনি চাহিতেন, ইংরেজ ও বাঙালী পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও অনিষ্ট কামনার তিনি বিরোধী ছিলেন। এই আদর্শের অনুবর্তী হইয়া তিনি 'বঙ্গদর্শনে' লেখনী ধারণ করিলেন। প্রচলিত মত ও ভাবধারাকে যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া তবে জাতিকে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন। তিনিও এদেশে ইংরেজের উপস্থিতি দূষণীয় মনে করিতেন না, বরং ইংরেজ শাসন পূর্ব্বেকার শাসন অপেক্ষা উদার ও কল্যাণকর বলিয়া বহু প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া ইহারও দোষ ত্রুটি দর্শাইতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। 'বঙ্গদর্শন' ক্রমে বাঙালীর দর্পণ হইয়া উঠিল। বঙ্গদর্শন-মুকুরে বঙ্গসমাজ নিজেকে চিনিয়া লইল। হিন্দু মেলার অনুষ্ঠাপনা, ভারত সংস্কার সভার কার্য্যক্রম এবং বঙ্গদর্শনের যুক্তিসিদ্ধ বিচার বিভ্রান্ত বাঙালীকে আত্মস্থ করিয়া তুলিল। বঙ্কিমচন্দ্র পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ে বঙ্গদর্শনে আলোচনা করেন। তাঁহার বহু সিদ্ধান্ত বা মতামত আজিকার দিনে বিচার করিলে হয়ত টিকিবে না। কিন্তু যে সাবলীল ভাষায়, যুক্তি-সুষমায় মণ্ডিত করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য সাধারণের নিকট পরিবেশন করিতেন তাহাতে বাঙালী জাতি ইহার নিকট শুধু নতি স্বীকার করে নাই, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হইয়া উঠিল। হিন্দু মেলার শিক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীমুখে নূতন শক্তি লাভ করিল। সত্য বটে, বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙালীর বাহুবল', 'স্বাধীনতা ও পরাধীনতা', 'অনুকরণ', 'ভারত-কলঙ্ক' প্রভৃতি প্রবন্ধে প্রচলিত মতবাদের সমালোচনা করিয়াছিলেন, এবং ইহারই ভিতরে এমন অনেক কথা ছিল যাহা আজ অবান্তর বলিয়াই মনে হইবে, কিন্তু ইহাতে তখন তিনি যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা সমাজের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলপ্রদ হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র যে আদর্শ সম্মুখে খাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহার নিরিখে ইংরেজ শাসকের দোষত্রুটি ধরিয়া ফেলিয়া তাহার উপর কশাঘাত হানিতেন। সর্ জর্জ ক্যাম্বেল বঙ্কিমচন্দ্রের একজন হিতৈষী ছিলেন। তাঁহার শাসনকুশলতারও তিনি প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার শাসন বা শিক্ষা কেন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন:

"সর্ জর্জ ক্যাম্বেল এদেশীয়দিগকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন। তিনি বিবেচনা করিতেন, ইহারা অবনত, —কোন গুরুতর ভারের অযোগ্য। এই ঘৃণা তাঁহার শাসনকার্য্যের আর একটি ঘোরতর বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহার প্রতি ঘৃণা আছে তাহার সুখদুঃখের ভাগী হওয়া যায় না, প্রজার সুখদুঃখের ভাগী না হইলে কখনও প্রজার সুখবৃদ্ধি দুঃখ নিবারণ হয় না।" *

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ শাসনের একটি বিশেষ কুকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন "বঙ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধাবলীতে। বঙ্গে ব্রিটিশ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নূতন করিয়া জমি বিলি ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছিল। কিছুকাল যাবৎ পরীক্ষার পর ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস এক দল স্থায়ী ভূমিকর সংগ্রাহক সৃষ্টি করিলেন। যে ব্যবস্থার দ্বারা ইহা সম্ভব করা হইল তাহার নাম দেওয়া হইল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। করসংগ্রাহকগণ জমিদার নামেই অভিহিত হইলেন। সরকার বরাবর এই জমিদার শ্রেণীর সুখসুবিধার প্রতিই দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছেন, ভূমির শস্য উৎপাদনকারী কৃষকদের উপর নজর দেন নাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইবার চল্লিশ বৎসর পরে রাজা রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন যে, ইহা দ্বারা জমীদার শ্রেণীর উপকার হইলেও কৃষককুলের কোন উন্নতি হয় নাই। নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করায় জমিদারদের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়াছিল বটে কিন্তু প্রজা সম্পর্কিত ভূমি-সংক্রান্ত যে-সব আইন বিধিবদ্ধ হয় তাহাতে জমিদারদেরই সুবিধা হইল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারতসভা ইহা

* বঙ্গদর্শন—জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ : "সর উইলিয়ম গ্রে ও সর্ জর্জ ক্যাম্বেল।"

জমিদারের শ্রেণীর সঙ্গে হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সঙ্কটকে সর্ব্বসাধারণের মুখপাত্র করিয়া তুলিবার জন্য 'অমৃত বাজার পত্রিকা' সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ প্রমুখ নেতৃবর্গ সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তাঁহারা পরে সাধারণের মুখপাত্র স্বরূপ ইণ্ডিয়ান লীগ ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করিলেন। যে সময় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনকে সাধারণ সভায় পরিণত করিবার কথা হইতে থাকে, সেই সময় ১৮৭২-৭৩ সালে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে কৃষকের দুঃখের কাহিনী বলিতে সুরু করিলেন। এই সময়ে জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে পাবনায় যে প্রজা বিদ্রোহ হয় তাহাও তাঁহাকে এই বিষয়ের আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকিবে। বঙ্কিমচন্দ্র সরকারের আইন-কানুনের সমালোচনা করিয়া লিখিলেন :

"আমরা দেখাইলাম যে, ব্রিটিশ রাজত্বকালে ভূমি-সংক্রান্ত যে সকল আইন হইয়াছে, তাহাতে পদে পদে প্রজার অনিষ্ট হইয়াছে। প্রতিবারে দুর্ব্বল প্রজার বল হরণ করিয়া আইনকারক বলবান্ জমিদারের বলবৃদ্ধি করিয়াছেন। তবে জমীদার প্রজাপীড়ন করিবেন না কেন?"

বঙ্কিমচন্দ্র অতঃপর বলিতেছেন যে ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রজার অনিষ্ট করেন নাই। তাঁহারা বিদেশী, এ দেশের অবস্থা সবিশেষ অবগত না হওয়ায় পদে পদে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভ্রমে পতিত হইয়া মহা অনিষ্টকর বিধি সকল প্রচারিত করিয়াছেন। কিন্তু ভ্রমবশতঃই হউক, আর যে কারণেই হউক, প্রজাপীড়ন হইলেই রাজার দোষ দিতে হয়। ইহার পর তিনি একটি গুরুতর কথা বলিতেছেন :

"ইংরাজের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ—সে প্রতাপে সমগ্র আসিয়াখণ্ড শঙ্কিত; তবে ক্ষুদ্রজীবী জমীদারের দৌরাত্ম্য নিবারণ হয় না কেন? বহুদূরবাসী আবিসিনিয়ার রাজা জনকতক ইংরেজকে পীড়ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজ্য লোপ পাইল। আর রাজপ্রতিনিধির অট্টালিকার ছায়াতলে শত শত প্রজার উপর পীড়ন হইলেও, তাহার কোন প্রতীকার হয় না কেন? জমীদার প্রজা ধরিয়া আনিতেছেন, প্রহার করিতেছেন, মারিয়া টাকা আদায় করিতেছেন, তাহার ফসল লুটিতেছেন, ভূমি কাড়িয়া লইতেছেন, সর্ব্বস্বান্ত করিতেছেন, তাহার প্রতিকার হয় না কেন? কেহ বলিবেন তাহার জন্য রাজপুরুষেরা আইন করিয়াছেন, আদালত করিয়াছেন, তবে গবর্ণমেণ্টের ত্রুটি কি? আমরাও সেই কথা জিজ্ঞাসা করি। আইন আছে—সে আইনে অপরাধী জমীদার দণ্ডনীয় হন না কেন? আদালত আছে—সে আদালতে দোষী জমীদার চিরজয়ী কেন? ইহার কি কোন উপায় হয় না? যে আইনে কেবল দুর্ব্বলই দণ্ডিত হইল, যাহা বলবানের পক্ষে খাটিল না—সে আইন আইন কিসে? যে আদালতের বল কেবল দুর্ব্বলের উপর, বলবানের উপর নহে, সে আদালত আদালত কিসে? শাসনদক্ষ ইংরাজেরা কি ইহার কিছু সুবিধা করিতে পারেন না? যদি না পারেন, তবে কেন শাসনদক্ষতার গর্ব্ব করেন? যদি পারেন তবে মুখ্য কর্ত্তব্য সাধনে অবহেলা করেন কেন? আমরা এই দীন হীন ছয় কোটি বাঙ্গালী কৃষকের জন্য তাঁহাদিগের নিকট যুক্তকরে রোদন করিতেছি—তাঁহাদের মঙ্গল হউক!—ইংরাজ রাজ্য অক্ষয় হউক!—তাঁহারা নিরুপায় কৃষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।"

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই আকূতি তখন পূর্ণ হয় নাই। পাবনার প্রজাবিদ্রোহ হইলে নিম্নোক্ত ঘোষণা করিয়াই সরকার নিজ কর্ত্তব্য সমাধা করিলেন :

"Whereas in the district of Pabna, owing to attempts of *zamindars* to enhance rents and combinations of *raiyats* to resist the same, large bodies of men have assembled at several places in a riotous and tumultuous manner, and serious breaches of the peace have occured—*This* is gravely to warn all concerned that, while on the one hand the Government will protect the people from all force and extortion, and the *zamindars* must assert any claims they may have by legal means only, on the

other hand the Government will firmly repress all violent and illegal action on the part of the *raiyats* and will strictly bring to justice all who offend against the law, to whatever class they belong.

"The *raiyats* and others who have assembled are hereby required to disperse and to prefer peaceably and quietly any grievances they may have. If they so come forward they will be patiently listened to, but the officers of Government cannot listen to rioters. On the contrary, they will take severe measures against them.

"It is asserted by the people who have combined to resist the demands of the *zamindars* that they are to be the *raiyats* of Her Majesty the Queen and of Her only. These people, and all who listen to them, are warned that the Government cannot and will not interfere with the rights of property as secured by law; that they must pay what is legally due from them to those to whom it is legally due. It is perfectly lawful to unite in a peaceable manner to resist any excessive demands of the *zamindars*, but it is not lawful to unite to use violence and intimidation."*

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষকদের অবস্থার উন্নতির উপায় নির্ণয় করিলেন। [illegible] জমীদারী বন্দোবস্তে দুই-চারি জন জমীদার ধনী হইয়াছেন, কিন্তু

[illegible] অধিক মহাজন ব্যক্তির পরিবর্ত্তে আমরা ৬০ কোটি দরিদ্র দেখিতেছি। দেশের অন্নের কারণ, আর পাঁচ জন টাকা ধরচ করিয়া ফুরাইতে পারে না, সে কারণ নাই—দেশে অন্ন বন্ধের অভাব, বিনিময়ের

ধন নাই, সে ভাল? দ্বিতীয় অবস্থা যে প্রথমোক্ত অবস্থা হইতে শতগুণে ভাল, তাহা বুদ্ধিমানে অস্বীকার করিবেন না। প্রথমোক্ত অবস্থায় কাহারও মঙ্গল নাই। যিনি টাকার গাদায় শুইয়া আছেন, দেশের প্রায় তাঁহার সর্ব্বস্বহরণ করিয়া উঠে। আর যাহারা নিরন্ন অন্নবস্ত্রের কাঙ্গাল, তাহাদের কোন শক্তি হয় না। কেহ অধিক বড়মানুষ না হইয়া, জনসাধারণের স্বচ্ছন্দাবস্থা হইলে সকলেই মনুষ্যত্বপ্রাপ্ত হইত। দেশের উন্নতির সীমা থাকিত না। এখন যে পাঁচ ছয় বাবুতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ঘরে বসিয়া মৃদু মৃদু কথা কহেন, তৎপরিবর্ত্তে তখন এই ছয় কোটি প্রজার সমুদ্রগম্ভীরগম্ভীর মহানিনাদ শুনা যাইত।"

ইংরেজের আইন সাধারণ প্রজার কতখানি সুরক্ষার কারণ হইয়াছিল বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বলিয়াছেন। শাসন বিভাগের তথা শিক্ষা-সম্প্রদায়ের সকলেই সাধনে সহকারী নীতি কিরূপ প্রযুক্ত হইয়াছে মহাত্মা ভোলানাথ চন্দ্র তাহা বিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। নিজ স্বার্থের পরিপোষণে ইংরেজ জাতি দেশ সম্বন্ধে যে সব আইন করিয়াছে তাহার ফলেই ইহার আজ এই দুর্দ্দশা। ভোলানাথ লিখিতেছেন:

"It may be summarised as a policy wholly and purely of interest, and not of duty. At first prohibitive, next aggressive, then suppressive, it has at last become repressive. Nothing bounds its Native ambition for anything approaching commercial rivalry. In name, it advocates free trade. In fact, it upholds a gigantic monopoly. The whole history of that policy—of the gradual steps taken to elaborate its frame-work, and of the changes introduced from time to time to mature, harden, and set it in the mould in which it exists and works at the present day—cannot but leave on the mind the impression that selfishness, combined with insincerity, is the essen-

* *Bengal under Lieutenant Governors*, Vol. I. P. 646.

tial of all commercial legislation by England with reference to India and that the break-up and repression of Indian industry being the great object of that legislation, it has been the most efficient cause of the decay and ruin of Indian manufactures—which are now like a star whose light survives, though space no longer contains its substance."*

কিন্তু এ অবস্থার প্রতিকার কি? তোলানাথ বলিতেছেন—ইহার জন্য আইনকানুনের প্রয়োজন নাই, আসুন, নষ্ট শিল্প উদ্ধারের জন্য দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া আমরা প্রতিজ্ঞা করি—স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যতিরেকে আমরা বিলাতী দ্রব্য স্পর্শ করিব না। ইহা আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে। তাঁহার কথায়

"Without using any physical force, without incurring any disloyalty, without praying for any legislative succour, it lies quite in our power to regain our lost position. It would be no crime for us to take to the only but most effectual weapon—moral hostility—left us in our last extremity. Let us make use of this potent weapon by resolving to non-consume the goods of England."

সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকিলে আমরা সাফল্য লাভ করিব, শিল্পে বাণিজ্যে আমরা উন্নত হইব—তোলানাথ আমাদিগকে এই আশার বাণীও শুনাইলেন:

"It is most unjust to impute our backwardness and want of energy to any pecular *insouciance* in the Hindoo race. Let the seed be thrown and it is sure to germinate. Let a beginning be made and the experiment will succeed. Not the less are there interested merchants and planters, and, I may say, quasi-slave-holders to oppose the measure intended to do away with their privileges, than there were to oppose the abolition of slavery in the British colonies. Let the movement be conducted with the untiring zeal and perseverence and the noble disinterestedness of another Wilberforce."

* এই অনুচ্ছেদটি এবং পরবর্তী দুইটি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ কৃত "মনীষী তোলানাথ চন্দ্র" হইতে উদ্ধৃত।

ছায়া পূর্বগামিনী

শ্রীসতী—

জাতি আজ জাগ্রত, জাতি তাই অশান্ত। যে মূর্তি ১৯৪২ সনে এক ঝলকমাত্র দেখেছিলাম, সেই অগ্নিমূর্তি তখন ভারতের সাতলক্ষ পল্লীতে পরিব্যাপ্ত হ'তে পারলে রাষ্ট্রের ও সমাজের সমস্ত ক্ষমতা ভারতের জনসাধারণের করায়ত্ত হ'তে পারতো। কিন্তু সেই দুর্দম সংগ্রাম শক্তি লুকিয়ে থেকে তখন শুধু দেখে নিচ্ছিল কেমন ক'রে আসছে সংগ্রামের ধারা। ১৯৪২ সনে আমরা দেখেছি দেশ প্রয়োজনানুরূপ প্রস্তুত নয়, তারা শুধু পর্দার আড়াল থেকে দেখে যাচ্ছে আর আয়ত্ত করতে চেষ্টা করছে কেমন ক'রে সংগ্রাম সুরু ক'রে পরিচালনা করতে হবে, কেমন ক'রে ক্ষমতা আপন মুষ্টিতে কবলিত করতে হবে। তারা শুধু দেখছিল, শিক্ষা করছিল, আপন অন্তরালায় পুরে নিচ্ছিল বারুদ-শক্তি।

আছে মেদিনীপুর, বালিয়া, বোম্বাই, জামসেদপুরের জলন্ত ঐতিহাসিক শিক্ষা। থানাগুলি দখল ক'রে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত রেখে গেছে কারা? বিস্তীর্ণ অঞ্চলের রেল লাইন তুলে ফেলেছিল কারা? তারা মূলতঃ ভারতের কৃষকশ্রেণী। কলকারখানাগুলি অচল ক'রে দিয়েছিল আমাদের মজুরশ্রেণী। যা কিছু কাজ হয়েছিল এবং যা কিছু হয় নি তার সমস্ত গুণ এবং দোষ জাতির। জাতির পক্ষে

১৯৪২ সন এক মহাসম্পদ। যে পথে ১৯৪২ সন দেখিয়েছে, যে নির্দেশ সে আজও আঙুল তুলে ইঙ্গিত ক'রে রেখেছে জাতি তা ভুলছে না—তারা এগিয়ে চলে এসেছে বহু বহু দূর। '৪২ সনে দেশ যথেষ্ট প্রস্তুত ছিল না সেজন্য সেদিন সিদ্ধিলাভ সম্ভব হয় নাই। কিন্তু আজ অশান্ত জনগণ বিদেশীর তর্জনীশাসন আর মুহূর্তমাত্রও সহ্য করতে রাজী নয়। আজ তাদের অসহিষ্ণু দুর্বার গতি। এক দুর্ভিক্ষের করাল দ্রংষ্ট্রার মধ্যে থেকে ভাষাহীন যাতনায় তারা দাপাদাপি ক'রে মরেছে। মন্বন্তরসৃষ্ট সেই দুর্ভিক্ষ কারা এনেছিল দেশ সেকথা ভোলে নাই। সেই লক্ষ লক্ষ উপবাসী আত্মার লক্ষ "তুখা হুঁ" রব জাতির কানে কানে আজও বেজে চলেছে। থামবে না সেই বাজনা যতদিন না এই মন্বন্তরসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের অন্তরালবর্তী সৃষ্টির ধারা পরিবর্তিত হয়, রূপ বদলে যায়। প্রতিটি জীবনের মূল্য দেবার জন্য স্বাধীন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয় কৃষক-মজদুর-প্রজারাজ।

সেই "তুখা হুঁ"র অন্তিম আর্তনাদ জাতিকে কষাঘাত ক'রে চলেছে, আজাদ হিন্দ ফৌজের বাসনা সঙ্গে রয়েছে, আর রয়েছে ১৯৪২ সনের নির্দেশ এবং অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবার জন্য "Inner Voice" (আত্মার আহ্বান)।

* * *

সহর বিক্ষিপ্ত, জনতা উন্মত্ত বিশৃঙ্খল। পুলিশ ডালহৌসী স্কোয়ারে শোভাযাত্রা যেতে দেবে না। জনগণ ক্ষেপে ওঠে—বেআইনী ক'রে রেখেছ? মনে নাই ২১শে নভেম্বরের কাহিনী? আমরা ক্যাপ্টেন রশিদের মুক্তি চাই, আমরা আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি চাই, আমরা শোভাযাত্রা ক'রে ডালহৌসি স্কোয়ারে যেতে চাই—দেখি রোধ করে কার সাধ্য? দেখতে দেখতে লক্ষ লোক সংহত হ'ল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, হিন্দু মুসলমান, কংগ্রেস লীগ। আকাশ ভেঙে ধ্বনি উঠলো—"হিন্দু মুসলমান এক হও।" গান্ধীজী মাথা কুটেও জিন্নাহ্‌কে একতিল টলাতে পারেন নি। কিন্তু বিদেশীর বিচারশালার দণ্ডবিধান এক আঘাতেই হিন্দু মুসলমান জনসাধারণকে মুহূর্তে এক ক'রে দিল। তারা প্রাণ ভ'রে একসাথে চীৎকার ক'রে উঠল "হিন্দু মুসলমান এক হও।" অন্য কোন ধ্বনিই সেদিন এর চেয়ে বেশী জোর পায় নি। সেদিন মনে হয়েছিল হিন্দু মুসলমানের মিলন উপর থেকে হবার নয়, গান্ধী জিন্না আলোচনা দ্বারা নয়। মিলন হবে জনসাধারণের তলার দিক থেকে এবং আপনা থেকে। সেদিনের হিন্দুমুসলমানের মিলিত এই শক্তিকে সরকারের সাধ্য ছিল না অবহেলা করে। আগের দিন যেটা ছিল রক্ষিত (Protected area) এবং বেআইনী স্থান, পরের দিন জনমতের তীব্র চাপে সেটা হ'য়ে গেল অরক্ষিত সাধারণ স্থান। হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান শোভাযাত্রা ক'রে চললো আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। কলকাতা সহর দেখে নিল এক অপূর্ব দৃশ্য, শুনতে পেল এক অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ত ধ্বনি, হিন্দুমুসলমান এক হও। এমন আন্তরিক বুকভরা আহ্বান আর বুঝি শীঘ্র শোনা যায় নাই।

সেই শোভাযাত্রাকে পুলিশ লাঠিচার্জ করে ফিরাবার পথে। জনসাধারণ রূপে দাঁড়াল। তারাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তার পেছে কলকাতা সহরকে গভর্ণর সাহেব তুলে দিলেন মিলিটারীর হাতে। মিলিটারীর নৃশংস বুলেটের বর্বর নিষ্ঠুরতার তুলনায় অসহায় জনগণের উন্মত্ত আচরণ অতি তুচ্ছ। মিলিটারী বেপরোয়া গুলি চালাচ্ছে, জনতা পিছু হ'টে যাচ্ছে না—তারা গুলি খেয়ে মরছে আবার এগিয়ে আসছে, আবার গুলি চলছে।

ট্রাম ডিপোর ট্রামগুলিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারীরা অবিরাম বুলেট চালিয়ে গেল। মানুষগুলি অসহায় ভাবে আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়ে যেতে লাগল। ট্রাম-গুলি পুড়ছে যেন জনতার মনের আগুন জ্বলছে। সমস্ত কলকাতা সহরের লোকগুলি ক্ষেপে উঠেছে, মিলিটারী লরি ট্রাক, পোষ্টাফিস, পুড়িয়ে দিচ্ছে। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ডাক সব প্রায় বন্ধ। ওদিকে মিলিটারীর ট্যাঙ্কগান, মেসিন-গান, বন্দুক, রিভলভারের গুলিতে শত শত লোক আহত হচ্ছে। অমূল্য প্রাণগুলি চলে যাচ্ছে, সেদিকে উন্মাদ কলকাতার ভ্রূক্ষেপ নাই।

কংগ্রেস এই উন্মত্ত বিশৃঙ্খল জনগণকে শান্ত করবার জন্য বার করল শান্তিবাহিনী। সেই শান্তিবাহিনী আমরা চলেছি খিদিরপুরের দিকে।

"তোমরা শান্ত হও, ঘরে ফিরে যাও, মিলিটারী বেপরোয়া গুলি চালাচ্ছে, তোমাদের অমূল্য প্রাণগুলি

এভাবে অযথা মেরে ফেলতে ওদের সুযোগ দিও না। তোমাদের প্রাণের মূল্য আছে। ওরা মূল্য দেবে না। আমাদের এভাবে দুর্বল করে দেবার সুযোগ ওদের দিও না। ঘরে ফিরে যাও—আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও, দেশকে প্রস্তুত কর। সংগ্রামের আহ্বান কংগ্রেস যেদিন দেবে সেদিন সবাই বার হয়ে এসো। আজ এভাবে অযথা শক্তিক্ষয় করো না।"

গাড়ী ঘিরে ধরে জনতা। "আপনারা কংগ্রেসের পতাকার পাশে লীগের পতাকা নিয়ে নিন"—অনুরোধ জানায় মুসলমান ভাইয়েরা। "দাও ভাই" ব'লে হাত বাড়িয়ে থাকি। কোথায় বা লীগ আফিস, কোথায় বা পতাকা? শুধু তারা মনের আবেগ জানিয়ে ভিড়ে মিলিয়ে গেল। আমরা মনের মধ্যে মুসলিম ভাইদের আকুল আবেদন কৃতজ্ঞতাভরে গ্রহণ ক'রে এগিয়ে চললাম।

চলেছি উত্তর কলকাতার দিকে। চৌরঙ্গী ফিরিঙ্গী পাড়া। পার হ'তে গিয়ে দেখি Grand Hotel, Firpo, Metro Cinema, Bristol Hotel সব ভেঙ্গে চুরমার, ওলট পালট—যেন এ ঘোর বিদেশে তাদের কেউ নেই। একটা বন্দুকের দোকান দেখি গ্রহরীশূন্য, দরজা খোলা, চেনাই যাচ্ছে না। শুনি বন্দুকের দোকানটি নাকি লুট হয়ে গিয়েছে। তাবি এ কি সম্ভব যে নিরস্ত্র ভারতের নিঃস্ব জনতা অস্ত্রের দোকানটিকে রিক্ত করে রেখে যাবে?

যাচ্ছি Central Avenue-এর পথে। অদূরে সিনিক পার্কের মধ্যে গুলি চলেছে, ছুটোছুটি আওয়াজ, অসহায় লোকে গুলি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, জনতা একবার ছুটে যাচ্ছে আবার এগিয়ে আসছে ভিড় করে। আমরা হাত তুলি—"শান্ত হও, ঘরে ফিরে যাও, ভিড় করে এগিয়ে এসে এভাবে গুলির মুখে দাঁড়িয়ে থেকো না—চলে যাও এখান থেকে, ওরা আগে বাড়ী যাক। অনুরোধ না তোমাদের কথা।"

আবার ওদিকে যাই ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে। সারাদিন অজস্র গুলি চলেছে, বহু প্রাণ চলে গিয়েছে। জনতা ট্রাক্স লরি পুড়িয়েছে, ট্রাম বাস উল্টিয়েছে, তারা অতিরিক্ত গাড়ী আমাদের প্রয়োজনে দিয়েছে, দিয়েছিল যখন আমাদের ঘরে ফিরে যাবার শান্তিবাণীর তারা উপযুক্ত উত্তর দেয় নেতৃবৃন্দের কিন্তু যখন জানাল কংগ্রেস আসন্ন সংগ্রামের জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে অনুরোধ করছে, শক্তির অপচয় নিরোধ করতে অনুরোধ জানাচ্ছে, তখন ছেড়ে দিল। যেন বিদ্রূপের সুরে বলে উঠল "তবু যাচ্ছো"।

যাই ওয়েলেসলির দিকে। গুলির আওয়াজ আসছে, মানুষ ছুটছে, পড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখি গাড়ীর একটু দূরে গুলির আঘাতে একটি আহতকে একজন দুহাতে তুলে নিয়ে ছুটে আসছে গাড়ীর দিকে। অর্থাৎ একে তোমরা হাসপাতালে নিয়ে যাও। ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে। সেই অতি অল্প সংখ্যক এ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে কোন এ্যাম্বুলেন্স যখন সময় পাবে তখন এসে এদের হাসপাতালে নিয়ে যাবে। আমাদের চোখের সামনেই আরও কয়েকজন পড়ে গেল, অসহায় আমরা, কিছুই কোথাও করতে পারি না। না পারি ওদের শান্ত করতে, না পারি বাঁচাতে।

শান্ত হতো, ঘরে ফিরে তারা যেতো, একটি প্রাণও আমাদের এমন ক'রে অযথা বলি যেতো না যদি মিলিটারীর হাতে কলকাতার শহরকে তুলে না দেওয়া হতো। কি বেপরোয়া ভাবে, হিংস্র উন্মত্ত ভাবে মিলিটারীরা গুলি না চালাতো। প্রথম আঘাত কে হেনেছিল? কেন হেনেছিল? কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারীর সাঁজোয়া গাড়ীগুলি বেপরোয়া-চালিয়ে চালিয়ে ইংরেজ কর্মকারী জনতাকে চমৎকার বীরত্বের সঙ্গে প্রতিরোধ করে আবার নিরাপদে ব্যারাকে ফিরে গেছে। অসহায় জনতা গুলি খেয়ে মরে ঢেউ হয়ে গেছে, আর কেউ হাসপাতালে গিয়ে দুহাতে মৃত্যুকে আহ্বান করছে।

কিন্তু এই তিনটে দিন পার হবে এসে আজ তাবি ওদের দমননীতিতেই কি শুধু আজ হয়েছে? শুধুই কি বিদেশী অত্যাচারের উদাহরণ দেখেছি? এতিহ্যের অনুসরণ? আর কিছুই কি আমরা দেখি নাই? প্রাণ দিয়ে প্রাণ রক্ষার আকুল আহ্বান কি একটুও সাড়া দিয়ে যায় নি? ব'লে যায় নি কি তারা—আমরা এগিয়ে এলেছি [illegible] Forward March [illegible] আসছে [illegible] নিঃশেষে প্রাণ দান ক'রে তারা।

.....ধরার নিগূঢ় বক্ষতলে রেখে গেল ভূষার সম্বল।

নিজ হস্তে সূর্যমানের চিহ্ন মুছে দিয়ে গেল।"

নির্বাসিত বিহঙ্গ

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী

একাদশ পরিচ্ছেদ

ইরকুটস্ক থেকে কারা পর্যন্ত যে সুদীর্ঘ পথ—সে-পথটা সব চেয়ে দুর্গমই নয়, সব চেয়ে ভীষণ। কিন্তু এ বন্দী যাত্রীদলের দুর্গম সুগম বলে বিবেচনা করার কোনই মূল্য নেই।

শিলকা নদীর তীরে যে মাসে তারা পৌঁছাল—তখন শীতের হাওয়া বইতে সুরু করেছে। সারা শীতকালের জন্যে নৌকো-চলাচল গেছে বন্ধ হয়ে। নদীস্রোত জমে গেছে। উপর দিয়ে পায়ে হেঁটেও যাওয়া যায় না—অতটা পুরু হয়ে জমাট বাঁধেনি তখনও। কাজেই এবড়োখেবড়ো পার্বত্য পথ ধরে তাদের এগুতে হল। এবার দলে স্ত্রীলোক ও পুরুষ ছাড়া কারও শিশু-সন্তান সঙ্গে ছিল না। এ কারণে হোপ মনে মনে কিছুটা স্বস্তি বোধ করছিল।

ফার এবং পাইন গাছের মধ্য দিয়ে চলেছে বন্দীযাত্রীদল। কন্‌কনে ঝাপটা হাওয়া এসে লাগে তাদের চোখেমুখে—হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। পার্বত্য নদীধারা কোথাও-বা পথ ছাপিয়ে হঠাৎ জমে গেছে—যেখানে সেখানে তাদের অস্থির পদক্ষেপ ইতস্ততঃ ছড়ানো বরফের কুচিতে বাধা পায়।

নিদারুণ এই কর্মভোগ। তাহোক। কিন্তু পথের তো শেষ আছে? অবশেষে আল্ট-কারা অঞ্চলের পর্বতচূড়ো চোখে পড়ে। পর্বত-প্রান্তে শুষ্ক নদীস্রোত চকচক করে। নদীকূলে ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন বাড়ী-ঘর। তাই দেখে হোপের আশা জাগে—উত্তেজনায় টিপ টিপ করে বুক—শান্ত শুষ্ক-শাখায় যেন আকস্মিক ঝড়ের মাতামাতি সুরু হল।

হোপের মন কত কথা বলে। প্রশ্ন জাগে: সার্জ তাহলে বেঁচে আছে তো? গিয়ে দেখা পাব তো? আহা না জানি কী দুরবস্থায় সে প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে? এই আঠারো মাসের ব্যবধানে কত দুর্ঘটনাই না ঘটে দিতে পারে!

কিন্তু কর্ণেল জাজারীন?

সার্জ পালমা ও হোপের যুক্ত জীবনের মাঝখানে সে আবার দুষ্টগ্রহের মতো দেখা দেবে। উত্ত্যক্ত করে তুলবে তাদের? সেখানে কর্ণেলের উপস্থিতি, এবং গায়ে-পড়া বন্ধুত্বের খাতিরে অহেতুক করুণা প্রদর্শন হোপ এবং সার্জের মধ্যে বিপর্যয় ঘটাবে না তো?

কর্ণেল জাজারীনের আচরণ সম্পর্কে সব কথাই মনে পড়ল হোপের। হঠাৎ এ কী বিপর্যয়! যাকে সে এড়িয়ে চলতে চায়, সে লোকের হাতের মুঠোতেই আবার পড়তে হল? অদৃষ্টের পরিহাস কী নির্মম? যেমন ইভ্‌র আর কসিকল—জীবনের দায় এবং মৃত্যুর পরিহাস কি এমনি রকম? কিন্তু হোপ নিজেকে নানা পরীক্ষায় গড়ে তুলেছে কঠোরতম করে। দুর্ভাগ্যের শত আঘাতেও সে মুষড়ে-পড়বে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে পারে না নিশ্চিন্ত থাকতে। কর্তব্য ও সেবাধর্মের প্রলেপ দিয়ে থেৎলে-যাওয়া অন্তরের যাতনা দূর করতে সে উদ্‌গ্রীব এবং জীবনের সব-কিছু সমর্পণ করে সে তখন এক মহান আশ্রয়-লাভের জন্য ব্যাকুল। এ কয় বৎসরের কর্ম-সাধনায় ক্ষয়-ক্ষতির ভেতর দিয়ে একটি সিদ্ধান্তে সে এসেছে, তা এই—এই যে জীবন এবং জীবনের যত মুখর ক্ষতি ও না-পাওয়া অধিকারের জন্য যে প্রচণ্ড সংগ্রাম—সবই অনুভূতির খেলা। হোপ এবং তার প্রিয়তম স্বামী সার্জ পালমা উভয়েই সাধনা ও দুর্ভোগ সাগ্রহে বরণ করে এই অনুভূতি লাভ করেছে যে—সম্মুখে মাত্র দুটি পথ: হয় তাদের উঠতে হবে মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে, নয় সরে পড়তে হবে ভবিষ্যৎ আশার সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়ে লোকচক্ষুর বাইরে।

পরদিনের ব্যাপার।

লোয়ার ডিগিংস-এ পৌঁছুবার পূর্বমুহূর্তে ও কারা প্রাচীরের সীমানায় ঢুকবার আগে। গভর্নর ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারী দাঁড়িয়ে আছেন আগত বন্দীদলের অপেক্ষায়।

নবাগত দল এসে পৌঁছুতেই নাম ডাকা হল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীদের পাঠিয়ে দেওয়া হল কারাকুটিরে। স্ত্রীলোকেরা রইল দাঁড়িয়ে নিতান্ত অসহায়ার মতো। যারা স্বামীর সঙ্গে স্বেচ্ছায় নির্বাসনে এসেছে এবং যারা স্বেচ্ছায় এসেছে

নির্বাসিত স্বামীর সঙ্গে বাস করবে বলে—তাদের সম্মুখে হঠাৎ দেখা দিলেন একটি বিশিষ্ট কর্মচারী।

হোপের শ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম হল—আতঙ্কে শিউরে উঠল আপাদমস্তক।

এই বিশিষ্ট লোকটি স্বয়ং কর্ণেল জাজারীন।

ছটকে সহসা তাকে চেনা বড় কঠিন।

মুহূর্ত পরেই জিজ্ঞাসাবাদ সুরু হল। এবং কে কোথায় যাবে—কিভাবে পাঠানো হবে তাও ঠিক হয়ে গেল দুচার কথায়। তারপর তিনি হোপের দিকে একটু এগিয়ে এলেন। : তাহলে দুর্গমপথের ভয় এড়িয়ে তুমিও এসে পড়েছ, ম্যাডাম?—অতিরিক্ত সম্ভ্রম বজায় রেখে বললেন। : যে স্বামীর জন্যে কোমলা নারী এত দীর্ঘ পথের দুর্গমতা অবহেলায় এড়াতে পারে, সে লোকটি স্বামী হিসেবে নিশ্চয় মহাগুণী—এ মনে করলে ভুল হবে না।

হোপ কর্ণেলকে নীরবে অভিবাদন জানাল।

কর্ণেল আবার বললেন : সবাইকে বিদায় করে তোমাকেই সব শেষে যে জিজ্ঞাসাবাদ করছি,এর মধ্যে অশিষ্টতা বলে কিছু নেই—এটটুকু আগে জানাচ্ছি। তোমার উপযুক্ত ব্যবস্থার ভার সাধারণ কর্মচারীদের হাতে দেওয়া ভাল বোধ করলাম না—সে কাজ আমি নিজের তত্ত্বাবধানেই করব—এই কারণ। যদি তুমি রাজী হও, এবং আমাকে বিশ্বাস কর, তাহলে এসো আমার সঙ্গে—তোমার স্বামীর কাছে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

হোপ কোন কথা বলল না। কর্ণেলকে অনুসরণ করল।

কারাগারের সদর গেট পেরিয়ে তারা উপত্যকা ভূমিতে নেমে এল।

কর্ণেল বললেন : তোমার স্বামী প্রথমে যেভাবে ছিলেন, তাঁকে তার চেয়ে ভাল অবস্থায় এখন রাখা হয়েছে এবং আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে।…

হোপ উদাস-দৃষ্টিতে তাকাল কর্ণেলের দিকে।

কর্ণেল মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন : হাঁ, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখানে আমি যে মস্তবড় পদ পেয়েছি, সে তাঁরই অনুগ্রহে। আমার কৃতজ্ঞতা তাঁকে জানাই। এখানে নিদারুণ মহামারী দেখা দিয়েছিল গত বসন্তকালে। টাইফাসের সংক্রমণে বন্দীরা মরতে থাকে পোকামাকড়ের মতো। সরকারী ডাক্তার সাহেবও রেহাই পেলেন না। এই দুঃসময়ে সাহস করে এগিয়ে এলেন তোমার স্বামী—স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলেন শত শত রোগীর চিকিৎসার ভার।

একথা শুনে হোপ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

কর্ণেল বললেন : যদিও কাজটা আইনবিরোধী, তবু আমার চেষ্টার ফলে তিনি বাধা পেলেন না। গভর্ণর-সাহেবের চিকিৎসাও তিনি করেছিলেন, কিন্তু গভর্ণর মারা গেলেন।…

হোপ বিমূঢ়ের মতো শুনতে লাগল।

কর্ণেল জাজারীন বললেন : আর কারও চিকিৎসাধীনে থাকলে গভর্ণর মারা যেতেন না একথা আমি বলি না, তবে তোমার স্বামী চেষ্টা করেও তাঁকে বাঁচাতে পারলেন না। সেই গভর্ণরের পদ আমি পেলাম—কেবল তাঁরই সমর্থন ও উদ্যোগে। আমি দায়িত্বভার হাতে নিতে প্রথমে ভয়ে ইতস্তত করছিলাম—একথা স্বীকার করতে বাধা নেই। তার পর অবশ্য তোমার স্বামীর সাহস বল পেয়ে সে পদ নিলাম …ও হো, এই যে এতক্ষণে এসে পড়েছি, ম্যাডাম।

সামনে একটা ছোট্ট কুড়েঘর। এবড়ো খেবড়ো কাঠের খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে আছে ঘরটি। জানালা একটা আছে বটে, কিন্তু সহসা চোখে পড়ে না। চালার ধার ঘেঁসে লম্বমান হয়ে বরফ ঝুলে জমে রয়েছে। কর্ণেল কড়া নাড়লেন, কিন্তু অপেক্ষা না করেই দরাদরি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন।

শূন্য ঘর।

কর্ণেল বললেন : যাহোক, বাসা যখন আছে, পাখী ঠিক ফিরে আসবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক। হাঁ, তুমি এখানে আসবে বা এসেছ, এ খবর কিন্তু তাঁকে আগে দিইনি। কারণ কার কখন কি অবস্থা ঘটে বলা তো যায় না? পথে কত লোক মারা পড়ে। কাজেই মিথ্যা আশা মনে জাগিয়ে শেষে নিরাশ করা তো চরম নিষ্ঠুরতা। দেখছ তো এ ঘরখানা। আরে, এতো এখানকার রাজপ্রাসাদ।

কর্ণেল ঘাড় বাঁকিয়ে আবার বললেন : ঐ সব কয়েদীদের কাঠের খুঁটির বেড়া-দেওয়া ঘরের চেয়ে এবাড়ী অনেক ভাল।

এ কথায় হোপ কষ্ট হল। এ হবে আমার সোনার সংসার···

শান্তভাবে কথাটি বলেই সে চুপ করে গেল। পাছে মনের রোষ প্রকাশ পায়, সেইজন্য আর একটি কথাও বলল না।

—এখানে কিন্তু রুচি-বোধ বা রীতি-বিচার বলে কিছু নেই।—এই বলেই কর্ণেল কাঁধ ঝাঁকাল।

ঘরের এক কোণে ইটের গাঁথনি দেওয়া একটা উনুন—শাদা টাইএর উপর দিয়ে একটু একটু আগুন দেখা যায়। ঘরের মেঝে অনাবৃত। একটা কদর্য টেবিল এবং একজোড়া অমসৃণ অস্বস্তিকর চেয়ার। মোট কথা, ঘরের ভেতরটা একান্ত রুক্ষ, বৈচিত্র্যহীন, নিরানন্দ। এদৃশ্য সাধারণ মানুষেরও মনঃপূত নয়।

কর্ণেল জাজারীন তাচ্ছিল্যভরে তাকাতে লাগলেন ঘরের আসবাবপত্রের দিকে।

হোপ বলল: এই আমার সেন্টসিটার্সবার্গ।

কর্ণেল নিজের মনের অবস্থাটা অনুভব করে থতমত খেলেন। বললেন—সেন্টসিটার্সবার্গ! হাঁ বেশ তো, তুমি সেখানে আরও আরামে থাকতে পার—যদি তুমি চাও... ম্যাডাম! আমি তোমাকে এমনভাবে রাখব···

হোপের বুক কেঁপে উঠল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে চেঁচিয়ে বলল—কর্ণেল···

কর্ণেল থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারি বুটের ঘা খেয়ে এক টুকরো বরফ উনুনের দিকে ছিটকে পড়ল। হোপের দৃঢ়তা নিষ্ফল হল না। জাজারীন যেন এক তীক্ষ্ণধার প্রত্যাঘাত পেলেন।

বিপদের সম্ভাবনায় হোপের চোখের সম্মুখে যেন ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এল আবছা অন্ধকার। কিন্তু তার অন্তর রুখে উঠল হিংস্র বাঘের মতো। কিন্তু সে হিংস্রতা যেন তাকেই কামড়াতে লাগল।

উনুনের অপর পাশে একটা মোটা আলনায় ঝুলছে বেতের ঝাঁপি। তারই ভেতর এলোমেলো পড়ে আছে বুননের কাঠি ও সুতো। উনুনের গোড়ায় স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য একজোড়া স্লিপার। দেয়ালের কাঁটায় ঝুলছে একটা রঙিন গাউন। হোপের চোখ সেদিকে পড়তেই সে চমকে উঠল—অন্তর বলে গেল। সে যেন আসামীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়িয়েছে—জবাবদিহি করতে হবে এক মহাবিচারে। ঘরের ভেতর স্ত্রীলোকের ব্যবহারের আরও অজস্রখানেক উপকরণ একে একে হোপের চোখে পড়ল।

হোপের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। হয়ত ভুল করে এ বাড়ীতে আসা হয়েছে এই মনে করে সে তাড়াতাড়ি কর্ণেল জাজারীনের দিকে তাকাল। কর্ণেল নিপুণভাবে লক্ষ্য করছিলেন হোপের আচরণ। হোপ একবার তাকিয়েই দৃষ্টি নামিয়ে নিল—পাছে তার মনের দুর্বলতা প্রকাশ পায়—এই ভয়ে।

কর্ণেলের চোখ দুটি এবার অদ্ভুত রকম চকমক করে উঠল।—আমি তোমাকে এখানে না আসার জন্য মনেপ্রাণে বাধা দিয়েছিলাম, ম্যাডাম পালমা। সেজন্য আমাকে দোষ দিতে পার না। তুমি জান না এখানকার জীবন কিরূপ নিঃসঙ্গ অথচ বিসদৃশ। এখানকার জীবন বিপথগামীর জীবন। তুমি তো দেখতেই পেয়েছ, বন্দীদের কোন বিষয়ে স্বাধীনতা নেই। তবে তুমি বাইরের মানুষ—তোমার উপর আইনও খাটে না। তবে এখনকার ক্রী-কম্যাণ্ডের অদ্ভুত সংস্কার আছে এবং নিজেদের সেই সংস্কারের বশেই তারা নিজেদের খাপ খাইয়ে চলে।

এসময়ে কুটিরের দরজা খুলে গেল। একটি মহিলা ঘরে ঢুকে আশ্চর্য হয়ে গেল তাদের দেখে। মাথা থেকে সে টুপিটা নামাল এবং কোন কথা না বলে গা থেকে খুলে ফেলল ভেড়ার চামড়ার কোটখানা। মহিলাটির দেহ সুগঠিত, অকপট সুন্দর চেহারা। মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত অতিরিক্ত কৌতূহল।

জাজারীন বললেন: ম্যাডাম রসকোভা, দেখুনতো এ মানুষটি কে? আপনার জন্য নূতন মানুষ নিয়ে এলাম। ইনি কে জানেন? ইনি হলেন ম্যাডাম পালমা—স্বামীর সঙ্গে থাকবেন বলে এখানে এসেছেন।

মহিলাটি সসম্ভ্রমে হোপকে অভ্যর্থনা করল: ভাল ভাল।—এবং বলেই শ্রদ্ধাভরে হাত বাড়িয়ে দিল হোপের দিকে। বলল: ডাক্তার সাহেব জেলখানার বন্দীদের দেখতে গেছেন—এই একটু পরেই আসছেন। ওঁকে হঠাৎ অবাক করে দেওয়া যাবে—তখন কী মজাই না হবে!

আচ্ছা, গভর্নর সাহেবকে এবার এক কাপ চা এনে দি? আর ম্যাডাম তো রয়েই আছেন—তা বুঝতে পারি।

এই বলেই মহিলাটি চায়ের আয়োজনে লেগে গেল। উনুনের আগুনটিকে উস্কে দিল একটা কাঠি দিয়ে।

হোপ বিদ্যুতের মতো ম্যাডাম রসকোভার করমর্দন করল তারপর কৃতজ্ঞতাচ্ছন্ন দৃষ্টি ফেলে তার চলার ভঙ্গি লক্ষ্য করতে লাগল। কিন্তু তার মস্তিষ্ক যেন জমে গেছে—কোন কাজই করছে না—এমনি বোধ হল। —এ কী রহস্য! সার্জ পালমার ঘর—যেখানে তার নিজের চির-অধিকার, সেখানে এ রমণীটি কেন? অথচ কী সুন্দর মনোভাব তার! আচার-আচরণে কোন দোষ-কলঙ্কের বিভ্রম জাগায় না।

ম্যাডাম রসকোভা কেরোসিনের ডিবাটা জ্বালাতে চেষ্টা করে—কিন্তু বৃথা চেষ্টা। নেড়েচেড়ে বলে—আহা তেল ভরতেই যে ভুলে গেছি। ঝুল শুধরাতে সে শূন্য তেলের টিনে হাত দিয়েই আবার বলে: আপনারা একটু বসুন, আমি তেল আনতে চললাম। এই এক দৌড়ে···

এই বলেই টুপিটা মাথায় পরে পা বাড়াল। এমনি সময়ে দোর-গোড়ায় তারি বুট থেকে বরফের কুচি ঝাড়ার ঠক ঠক আওয়াজ শোনা গেল।

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল পল প্যাভলফ।

অস্পষ্ট আলোকে সে প্রথমে লক্ষ্য করেনি আগন্তুক অতিথিদের। বিস্মিত হলো না সামরিক পোষাকধারী লোকটিকে দেখেও। বিস্মিত হবার কিছু ছিলও না। কেননা, অতি ছুসিচার অনুচর-অতীত এই প্রাণীরা রাত্রিদিন এমনি-ভাবে পরের ঘরবাড়ীতে ঢু মেরেই থাকে—কাজেই হঠাৎ হকচকিয়ে যাবার মতো তেমন ব্যাপার কিছুই ছিল না।

কর্ণেল বললেন: আপনার ঘরে আজ একজন নূতন অতিথি নিয়ে এসেছি, মিঃ পালমা।

—অতিথি?

—হাঁ, আপনার স্ত্রী···

—স্ত্রী,—আমার স্ত্রী! —এই বলেই সে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দিল ইস্তানোভনার দিকে।

পল প্যাভলফকে প্রথমে দেখেই হোপের মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। একটা অস্ফুট চীৎকার বেরিয়ে এল তার কণ্ঠ চিরে। হাত বাড়িয়ে দু-পা এগিয়ে এল সে—কিন্তু স্থিরভাবে দাঁড়াতে পারল না। সহসা সে পড়ে গেল।

'আহা' 'আহা' করে ম্যাডাম রসকোভা ছুটে এল এবং স্নেহ ও সহানুভূতির সুরে বলল: অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ইনি এলিয়ে পড়েছেন।

তারপর দুহাতে ধরে হোপকে ধীরে ধীরে উঠাল।

দাঁতে দাঁত চেপে প্যাভলফ আত্মসংবরণ করল। বলল: ক্ষমা করুন গভর্নর সাহেব···

কিন্তু প্যাভলফের বুক তখন কাঁপতে সুরু করেছে—যেন ঝড়ের তাণ্ডব। মস্তিষ্কে অশান্ত আলোড়ন সুরু হয়েছে এবং তাড়াতাড়ি হোপকে সাবধানে ধরে অপর পাশে ছোট্ট শয়নঘরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল।

কর্ণেল জাজারীনও এগিয়ে এলেন: আমি কিছু করতে পারি।

পল ধন্যবাদ জানাল: দরকার হবে না গভর্নর সাহেব। এখুনি সে সুস্থ হয়ে উঠবে। ম্যাডাম তার কাছে থাকুন। বাস্তবিক দীর্ঘপথের পরিশ্রম তাকে কাবু করে ফেলেছে।

কর্ণেল জাজারীন জিজ্ঞেস করলেন: ওদিকে আপনার রোগীরা কেমন আছে?

—ভালই বোধ হচ্ছে। শীত পড়েছে, এই ঠাণ্ডাটাই আমাদের সহায়। এখন ক্যাপটেন লেলেকভের রোগী দেখার পালা। আশা করি, আমরা মাসখানেকের মধ্যে এই মহামারী তাড়াতে পারব। আশঙ্কা এই যে বসন্তকালটা ঘুরে এলেই আবার অবস্থা ঘোরালো হয়ে দাঁড়াতে পারে·· যদি না···

—এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্যসহ সব কাগজপত্তর উপরে পাঠিয়েছি, কিন্তু এখনও কোন জবাব পাইনি।

—এ সম্পর্কে আপনার তড়িৎ বিবেচনা-সঙ্গতই হয়েছে। এখানে তো শুধু আমার-আপনার কথা নয়—অনেকের জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন···

—আপনি তো জানেন উপরওয়ালাদের রকম-সকম। —কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন কর্ণেল জাজারীন। : আমরা এখন বহুদূরে, এবং মজা এই, দূরের ব্যাপার গুরুতর হলেও কাছের তুচ্ছ ব্যাপারেই আগে মিটে। জবাব না আসা পর্যন্ত কী আর করা যায়? যা হোক, খবর এলে দেখা যাবে। আমার বিশ্বাস, আপনার পত্নীকে পথের দুর্ভোগ আর পোহাতে হবে না। আচ্ছা আসি এবার। নমস্কার।

(অনুবাদ উপন্যাস)

ক্রমশঃ

কংগ্রেস চিত্র প্রদর্শনী

এবারকার স্বাধীনতা সপ্তাহে কর্ম-সূচীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়—কংগ্রেস চিত্র প্রদর্শনী। চিত্রের সাহায্যে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ধারাবাহিক ইতিহাস দর্শকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছিল তা একাধিক দিক

বঙ্গভঙ্গ—

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্থায়ী করার প্রয়োজনে ইংরেজ রাজনীতিকরা যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন লর্ড কার্জনের "বঙ্গভঙ্গ" পরিকল্পনা তার অন্যতম। বাংলার জাতীয় আন্দোলনের পুরোহিত সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সমগ্র বঙ্গদেশ মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদ জানালো নেতৃবৃন্দের আবেদন নিবেদন যখন ব্যর্থ হলো তখন সুরু হোল ব্যাপক আন্দোলন, সুরু হোল বিদেশী পণ্যবর্জন আন্দোলনের সূচনা। শুভ রাখী-বন্ধন তিথির মিলন মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে বাঙ্গালীরা সেদিন মরণ-জয়ী সঙ্কল্প গ্রহণ করলো—"ইংরেজ শাসকদের স্থির সিদ্ধান্তকে অস্থির করতেই হবে।"

"সাতকোটী লোকের করুণ ক্রন্দন
শুনে না শুনিল কার্জন দুর্জ্জন
তাই নিতে প্রতিশোধ মনের মতন
করিলাম রাখী বন্ধন"।

"বঙ্গভঙ্গ" আন্দোলন জয়ী হোল, নতি স্বীকার করতে হোল ইংরেজ সরকারকে জনগণের সংগ্রামশীল প্রতিরোধের সম্মুখে।

অভ্যুত্থান—

মহাত্মা গান্ধীর "ভারত ত্যাগ কর" মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ জনগণের অভ্যুত্থানের পরিচয় রয়েছে এই চিত্রে। ১৯৪২ ইংরাজীতে জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবী অস্বীকার করে ইংরেজ সরকার নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করে জাতীয় স্বাধীনতা প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হলো; অন্যদিকে গান্ধীজি পরিচালিত কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের চূড়ান্ত সঙ্কল্প গ্রহণ করে জনগণ অগ্রসর হয়ে এলো। এই গণ-অভ্যুত্থান ভারতীয় জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছে।

করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে—

"Quit India" মন্ত্রের উদ্গাতা গান্ধীজি যে তাঁর সহকর্মীদের কারারুদ্ধ করা হোল। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার যে মশালখানা ধুমায়িত হচ্ছিল সেটা দাবানলের মত জ্বলে উঠলো। কারাপ্রাচীরের ভিতর থেকে দেশনায়কের বজ্রনির্ঘোষ ভেসে এল "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে", স্বাধীনতা লাভ করলো অথবা মৃত্যু বরণ করলো। এই অগ্নিশিখা ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হোল। ব্রিটিশ সিংহশক্তির চরম নির্দয়তা প্রকাশ করেও শাসকরা নির্বাপিত করতে পারলো না এই অগ্নিকে। সাম্রাজ্যবাদকে ভস্মস্তূপে পরিণত করা পর্যন্ত জ্বলতে থাকবে এই অগ্নিশিখা অনির্বাণ রূপে।

কংগ্রেস চায় কৃষক-মজদুর-প্রজারাজ—

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে পুঁজিবাদীদের সহায়তা পুষ্ট কয়েকটী স্বার্থ-সর্বস্ব মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণীর সংগঠনরূপে মিশ্রিত করার অপচেষ্টা কমিউনিষ্ট পার্টি প্রমুখ কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের প্রধান কর্মসূচি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রপতি আজাদ, পণ্ডিত নেহেরু প্রভৃতি জননায়ক এই মিথ্যা ভাষণের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে দিয়েছেন। তাঁরা সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করেছেন যে কংগ্রেস ইংরাজ রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে সত্যিকার "কৃষক-মজদুর-প্রজারাজ" প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কংগ্রেস পরিকল্পিত স্বরাজে জনসাধারণের হাতেই রাষ্ট্রব্যবস্থার ভার ন্যস্ত করা হবে এবং এতে রক্ষিত হবে দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থ।

(ছবি—পুরুলিয়ার সৌজন্যে)

দিয়ে মূল্যবান। চোখের সামনে ঘটনাবলীর জীবন্তরূপ দর্শকদের চিত্তের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। চিত্র সজ্জার মধ্যে খানিকটা অপূর্ণতা সত্ত্বেও ইহার অভিনবত্ব আমাদের মুগ্ধ করেছে। প্রায় ২০০ খানি চিত্রের মধ্যে আমরা কয়েকটির মাত্র পরিচয় এখানে দিলাম। বিভিন্ন জেলায় এই প্রকার চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার এবং এই চিত্র সমূহের তাৎপর্য এবং আনুষঙ্গিক ইতিহাসের বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করি। ইহার ভিতর দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতিক চেতনার সঞ্চার হবে। আমরা আশা করি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সংশ্লিষ্ট বিভাগ এই বিষয়ে অবহিত হবেন।

ক্যাপটেন রসিদ আলি—

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অন্যতম সেনানী ক্যাপটেন রসিদ আলি সামরিক বিচারালয় কর্তৃক দণ্ডিত হয়েছেন। ভারতের গভর্ণর জেনারেল এই দণ্ডাদেশ সংশোধিত আকারে অনুমোদন করেছেন। ইহাকে কেন্দ্র করে সমগ্র ভারতবর্ষে যে গণ-বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করেছে তার প্রচণ্ডতম মূর্তি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহানগরী কলিকাতার বুকে। বালক বালিকা যুবক প্রৌঢ় বহু জনগণ ইংরেজ সৈন্যের অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছেন। মৃত এবং আহতদের সংখ্যা বিগত নভেম্বর হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিকে ম্লান করে দিয়েছে। বাংলার গভর্ণর বিক্ষুব্ধ মহানগরীকে শান্ত করার কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে সামরিক শাসনের আশ্রয় নিয়েছেন অর্থাৎ স্বাভাবিক শাসন কার্য অচল হয়ে পড়েছিল।

কংগ্রেসের সহায়তাকে পরিহার করে মুসলিম লীগের শরণ নিতে গিয়ে ক্যাপটেন রসিদ যে বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন তা নেতাজীর আদর্শের পরিপন্থী হলেও ক্যাপটেন রসিদের দণ্ডাদেশকে ভারতবর্ষ একটা জাতীয় ক্ষতি এবং জাতীয় অবমাননা বলেই গ্রহণ করেছে। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মতাবলম্বী নরনারী সমস্ত বিভেদ বিসম্বাদ বিস্মৃত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এই ঔদ্ধত্যের জবাব দিয়েছে। যে রক্ত-স্রোত কলিকাতার বুকে প্রবাহিত হয়েছে তার স্মৃতি সাম্রাজ্য-বাদী শাসনের নিষ্ঠুরতা আমাদের অন্তরে চিরজাগরূক রাখবে এবং এই শাসনতন্ত্রের বিলোপ সাধনের জন্য কঠোরতর সংগ্রামের নিমিত্ত জাতিকে প্রস্তুত করবে। সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষে হিন্দু আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন—এই অপভাষণের দ্বারা আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রতি সর্ব সম্প্রদায়িক শ্রদ্ধাকে দ্বিধা বিভক্ত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন জিন্না সাহেব। তাঁকেও আজ হিন্দুমুসলমানের সম্মিলিত সংগ্রামের কাছে শির নত করতে হোল। আমাদের জাতীয় সমস্যা যে হিন্দু মুসলমানের মিলিত সমস্যা এবং হিন্দু মুসলমানকে যুক্ত ভাবেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে—এ সত্যই জিন্না সাহেব ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন।

মুক্তি আন্দোলনের এই এক শুভদিন। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ক্রীড়নকদের মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত মুসলিম জনসাধারণও আজ বুঝতে পেরেছে তাদের কল্যাণ কোন্ পথে। সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন সম্প্রদায় বিচার করে না —ইহার প্রমাণ আমরা বহুবার পেয়েছি। মুসলমান ছাত্র-সমাজও যে আজ অগ্রসর হয়ে এসেছে স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের যথার্থ স্থান গ্রহণ করতে তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি ক্যাপটেন রসিদ আলির দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তাদের অভিযানের ভিতর দিয়ে। এই ঘটনা উপলক্ষ্য ও লক্ষ্য পথে অগ্রসর হওয়ার ইহাই সূচনা। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধানতম কলঙ্ক সাম্প্রদায়িক অনৈক্য। কলিকাতার শহীদদের রক্তে যদি এই কলঙ্ক চিরতরে অপনোদিত হ'য়ে যায় তাহলে এই রক্তস্নান সার্থকতা লাভ করবে। এই উপলক্ষে কবির সেই প্রশ্নটিই আমাদের মনে জাগছে!—

"বীরের এ রক্তস্রোত মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সেকি শুধু ধরার ধূলায় হ'বে হারা
স্বর্গ কি হ'বে না কেনা?"

কলিকাতায় মিলিটারীর অত্যাচার—

ক্যাপ্টেন রসিদ আলির দণ্ডাজ্ঞার প্রতিবাদে ও আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির জন্য ছাত্রদের একটি শোভাযাত্রা চলে-ছিল ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে। পুলিশ সেই শান্ত শোভা-যাত্রার উপর করল লাঠিচার্জ। এই প্ররোচনায় নিরীহ জনতা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। কেসী সাহেব তা পেয়ে মিলিটারীর হাতে সহর সমর্পণ করলেন। মিলিটারী যথেচ্ছাচার শুরু

চালিয়ে ৫৭ জনকে নিহত করে এবং পাঁচ শতের অধিককে আহত করে। গুলি চালিয়ে মেরে ফেলার সময় স্বেচ্ছাচারী এই মিলিটারীরা কি লক্ষ্য করে নাই যে, ভয় দেখিয়ে শাসন করার যুগ ভারতে আর নাই? জনতা বহু গুলী খেয়েছে, গুলী খাওয়া বাঘের মত আবার তীব্রতর বেগে ছুটে এসেছে। হিংস্রতম মিলিটারী দ্বিগুণ বেগে বুলেট চালিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে। তবু জনতা নিরস্ত হয় নাই, বা তাদের শান্ত করা যায় নাই। তারাও ক্ষেপে গিয়ে মিলিটারী লরী, ট্রাক, পোষ্টবক্স, ট্রাম পুড়িয়েছে। ট্রেন থামিয়ে দিয়েছে, পুড়িয়ে ফেলেছে। টেলিগ্রাফ টেলিফোন বন্ধ হয়েছে। দোকানপাট, অফিস কাছারী, সমস্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এক কথায় সহর পল্লী ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এসে গিয়েছিল।

আমরা জনগণের এই আচরণ সমর্থন করি না। এতে কিছু লাভ হয় না। কিন্তু এই অশান্তি ও প্রাণহানির দায়িত্ব কার? পুলিশ প্রথমে যদি শান্ত জনতাকে আঘাত না করতো তবে কিছুই হ'তে পারতো না। যে ডালহৌসি স্কোয়ার আগের দিন বিশেষভাবে রক্ষিত স্থান বলে বিবেচিত ছিল জনগণের তীব্র চাপে পরদিনই সেটা সাধারণ স্থান ব'লে ঘোষিত হয়ে গেল এবং শান্তভাবে শোভাযাত্রা সেটা প্রদক্ষিণ ক'রে এল। সেখানে কোন কিছুই ঘটল না। কিছুদিন পূর্বে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস উপলক্ষে কয়েক মাইল ব্যাপী বিরাট এক শোভাযাত্রা কত ঘণ্টা ধরে সমস্ত যানবাহন বন্ধ ক'রে দিয়ে অনায়াসে উৎসব সম্পন্ন করেছে। তখন কিন্তু পুলিশ লাঠি চার্জ করে নাই, কোথাও শান্তিভঙ্গও হয় নাই। যেখানেই পুলিশ আঘাত করে সেখানেই জনগণও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ১৪৪ ধারা জারী করে, সঙ্গীন উঁচিয়ে রেখে, গুলী চালিয়ে কংগ্রেসের শান্তিবাহিনীকে এবং অন্যান্য সকলকে গ্রেপ্তার ক'রে জনসাধারণকে শান্ত করা যায় না। শান্ত করা যায় শুধু অশান্তির মূল কারণ দূর করতে পারলে। সেই দিকেই আমরা গভর্ণমেণ্টকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি।

ভারতীয় নাবিক বিদ্রোহ—

বোম্বাই ও করাচীতে ধর্মঘটকারী ভারতীয় নাবিকদের সামরিক পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে চেষ্টা করে। ব্যর্থ হ'য়ে তারা গুলী চালায়। ভারতীয় নাবিকগণও তাতে উত্তেজিত হয়ে প্রত্যাক্রমণ করে। ফলে তুমুল সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। ভারতীয় নাবিকগণ একটি অস্ত্রাগার এবং প্রায় কুড়িখানা রণতরী অধিকার করে। ধর্মঘট ক্রমে বোম্বাই, পুণা, আমেদাবাদ এবং দিল্লী, কলকাতাতেও ছড়িয়ে পড়ে। মিলিটারীর গুলীতে বোম্বাইতে প্রায় তিনশতজন হত এবং তেরশত আহত হয়।

নৌবাহিনী ধর্মঘট করেছে কেন? তাদের অসন্তোষের একমাত্র কারণ হচ্ছে প্রত্যেক বিষয়ে বৃটিশ সৈন্যের তুলনায় ভারতীয়দের উপর বৈষম্যমূলক আচরণ। তাদের বেতন, খাদ্য, ছুটি প্রভৃতি যে স্বাভাবিক অভিযোগ ছিল কর্তৃপক্ষ তা উপেক্ষা করেছেন। ফলে ধর্মঘট অনিবার্য হয়ে ওঠে। তারই পরে এই সংঘর্ষ। এই বিক্ষোভকে গডফ্রে সাহেব বিদ্রোহ আখ্যা দিয়েছেন, এবং তয় দেখিয়েছেন যে, প্রয়োজন বোধ করলে নৌবহরটিকে ধ্বংস ক'রে দিতেও তাঁরা দ্বিধাবোধ করবেন না।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনার পর বিদ্রোহীরা তাঁর নির্দেশ অনুসারে বিনাসর্তেই আত্মসমর্পণ করে। ভারতের প্রধান সেনাপতি এই আত্মসমর্পণের পর যে বক্তৃতা দিয়েছেন সেটা মোটেই আশাপ্রদ নয়। তিনি বলেছেন নাবিকদের অভিযোগের তদন্ত এবং প্রতিকার করা হবে কিন্তু সমস্ত দাবী পূরণ করা সম্ভব হবে না। ভারতীয় নাবিককে বৃটিশ নাবিকের সমান বেতন খাদ্য ইত্যাদি কেন যে দেওয়া যাবে না তা আমরা বুঝি না। কাজ যেখানে একেবারে একপ্রকার সেখানে বেতনের পার্থক্য থাকবে কেন, এই বর্ণবৈষম্য থাকবে কেন এই হ'ল নাবিকের দাবী। সমরসচিব বলেছেন ভারতের আর্থিকক্ষমতা বৃটেনের সমান নহে। উত্তরে বলা যায় ভারতীয় নৌবাহিনীতে যে সমস্ত ইয়োরোপীয় আছেন ভারতগভর্ণমেণ্ট তাদের জন্য যদি অত বেতন যোগাতে পারেন, ভারতীয় আর্মির জন্য যদি এত কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় হতে পারে সেখানে ভারতীয় সৈন্য বা নৌবাহিনীর লোকেরা কেন পাবে না?

প্রধান-সেনাপতি আরো বলেছেন যে, শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের মধ্যে যাঁরা নেতৃত্ব করেছেন তাঁদের দণ্ডবিধান করা

হবে। কিন্তু এই শৃঙ্খলাভঙ্গের মূল কারণ কি সেটা যদি তিনি দূর করতে চেষ্টা করতেন তবে ধর্মঘট হ'ত না। কর্তৃপক্ষ এদের অভিযোগ পূর্বেই জানতেন—কিন্তু প্রতিকার করেন নাই। মূল দায়িত্ব এখানেই।

যুদ্ধের পর বৃটিশ সৈন্যরা যখন তাদের দাবী জানিয়ে ধর্মঘট করে কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ সেই দাবী মিটিয়ে তাদের সঙ্গে আপোষ করেন। ভারতীয় বিমানবাহিনীতে যে ধর্মঘট হয় তাও এভাবেই তারা মীমাংসা করেন। কিন্তু ভারতীয় নাবিকদের বেলায় অভিযোগ জানিয়ে ধর্মঘট করলে কেনইবা গ্রেপ্তার ও গুলী চালানো হয়। এবং কেনইবা শাস্তি বা শিক্ষা দেওয়ার জন্য জেনারেল অকিনলেক মুষ্টি উত্তোলন করেন। তাঁরা 'জয়হিন্দ্' লিখেছিলেন জাতীয় পতাকা উড়িয়েছিলেন, এই দেশপ্রেমই কি তাঁদের অপরাধ? মৌলানা আজাদের সঙ্গে প্রধান সেনাপতির যে আলোচনা হয় তা প'ড়ে মনে হয়েছিল শাস্তিবিধান হয়তো হবে না কিন্তু সে ধারণা যে ভুল সেকথা সেনাপতি মহাশয় পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু যুগ বদলেছে, ভারতবর্ষও যুগের সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছে। শাস্তি দিয়ে, চোখ রাঙিয়ে শাসন করার দিন আর নাই। জেনারেল অকিনলেককে আমরা বলতে চাই যে, যেমন ক'রে বৃটিশ সৈন্যদের দাবী পূরণ করা হয়েছে, তেমনি ক'রে ভারতীয় সৈন্যদের দাবী তাঁরা পূর্ণ করুক। তবেই ভারতীয় নাবিককে সত্যিকার শান্ত করা যাবে, শাস্তি দিয়ে বা হুমকী দিয়ে নয়।

আসন্ন দুর্ভিক্ষ—

সরকার ঘোষণা করেছেন ভারতে পুনরায় দুর্ভিক্ষ আসন্ন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের অপেক্ষাও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবার সম্ভাবনা। সমস্ত পৃথিবীতেই এই বৎসর খাদ্যশস্য কম উৎপন্ন হয়েছে এবং সমগ্র পৃথিবীই দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন। সুতরাং ভারতবর্ষ বিদেশ থেকে সাহায্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পাবে না এ কথা নিশ্চিত। কেন এত বড় দুর্ভিক্ষ আবার ভারতে আসছে তার সমস্তগুলি কারণ এখনো সঠিক ভাবে নির্দ্ধারণ ক'রে প্রকাশ করা হয় নাই। কয়েকটি স্থানের অনাবৃষ্টি ও সাইক্লোনের সংবাদমাত্র লর্ড ওয়েভেল জানিয়েছেন। ভারতের প্রয়োজনীয় খাদ্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ খাদ্য কম রয়েছে। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের কোন কোন অংশের অবস্থা ভয়াবহ হবার সম্ভাবনা।

কেমন ক'রে এই দুর্ভিক্ষ এড়ানো যায় সেটাই বর্তমানে একটি প্রধান সমস্যা। লর্ড ওয়েভেল গান্ধীজীর পরামর্শ চেয়েছেন। প্রথমেই গান্ধীজী জানিয়েছেন যে, বর্তমান দায়িত্ববোধশূন্য শাসনপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে দল নির্বিশেষে কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করা উচিত এবং তাঁদের উপর বর্তমান খাদ্যসংকট সমাধানের ভার দেওয়া কর্তব্য। গান্ধীজীর নির্দেশিত এই পথই একমাত্র উপায় ব'লে আমরা মনে করি। কিন্তু সরকার যদি শুধু অবস্থা জ্ঞাপন করা এবং পরামর্শ চাওয়াই যথেষ্ট মনে করেন অথচ পরামর্শানুযায়ী কার্য না করেন তবে জনসাধারণের সহযোগিতা পাওয়া যাবে কেমন করে? পণ্ডিত জহরলাল বলেছেন 'এ বছর মানুষ কীট পতঙ্গের মত অনাহারে মৃত্যুবরণ করবে না। তারা তার পূর্বে, চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে।' তবে, বর্তমান অসাধু ও অক্ষম গভর্ণমেণ্ট যদি পরিবর্তিত হয়। যদি জনসাধারণের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের উপর খাদ্যসমস্যার ভার অর্পিত হয় তবেই একমাত্র এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সমাধানের উপায় পাওয়া যাবে।

গান্ধীজীর উপদেশ—

আসন্ন দুর্ভিক্ষ রোধ করার জন্য গান্ধীজী আট দফা পথ নির্দেশ করেছেন। যেখানেই জলের সুবিধা আছে সেখানেই তিনি খাদ্য ও তরিতরকারি উৎপাদন করতে বলেছেন। তাতে অন্যদিকের খাদ্যের অভাব পূরণ করা যেতে পারে। সমস্ত স্কুলের বাগানেও খাদ্য উৎপাদন করানো উচিত। যেমন অসামরিক তেমনি সামরিক বিভাগকেও খাদ্য সংকোচ করতে হবে। কেবলমাত্র অসামরিক জনগণের জন্য দুর্ভিক্ষ নিশ্চয়ই আসে না। তিনি আরও বলেছেন যে সমস্ত প্রকার বীজ রপ্তানী বন্ধ করতে হবে। যারা নিজেরা ক্ষুধার অন্ন পায় না তারা বীজ রপ্তানী করবে কেমন করে? ফসল ফলাবার জন্য

সরকারকে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টির আশায় মাথা কুটে মরলেও যখন বর্ষা নামে না তখন কূপ খনন করে সেচের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। সমস্ত দেশেই সরকার এই ব্যবস্থা ক'রে থাকেন। চোরা-বাজার ও অসাধুতা এই মুহূর্তে বন্ধ করতে হবে। এবং তার না পেতে সাহসের সঙ্গে এই সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে।

গান্ধীজীর নির্দেশিত এই পন্থাগুলি আমাদের এখনই গ্রামবাসীদের বোঝানো কর্তব্য। দলে দলে কংগ্রেস কর্মীগণ গ্রামের মধ্যে থেকে স্থানীয় লোকেদের নিয়ে এই কাজ-গুলি যথাসম্ভব নিজেদেরই আরম্ভ করে দেওয়া প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে এই ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করার জন্য উপযুক্ত চাপ দিতে চেষ্টা করা উচিত। যদি এভাবে আমরা সফল হতে পারি তবে বোধ করি দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা আমরা তত উপলব্ধি করব না। গ্রামগুলি যদি স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে নিজেদের উৎপাদন সম্বন্ধে সচেতন হয়, যদি তারা স্বয়ং সম্পূর্ণ হ'তে এখন থেকে চেষ্টা করে, খাদ্যের একদিকের অভাবকে অন্যপ্রকার উৎপাদন দ্বারা পরিপূরণ ক'রে নেয়। গ্রামের উৎপাদন উদ্বৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত যদি চালান না দেওয়া হয় তবে শুধু দুর্ভিক্ষ নয়, আসন্ন সংগ্রামেও তাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেকটি গ্রামকে আমাদের এভাবে এখন থেকেই যে কোনো অবস্থার জন্য প্রস্তুত করে রাখতে হবে।

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের উপায়—

সমস্ত স্বাধীন দেশ দুর্ভিক্ষের সময় নানাপ্রকার ব্যবস্থা দ্রুত অবলম্বন ক'রে দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে চেষ্টা করে। আমাদের দেশেও কতগুলি বিষয়ে এখনি সতর্কদৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শ্যাম, অষ্ট্রেলিয়া, ইকুয়েডর, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলি সাহায্য করতে পারে। তাদের কাছ থেকে সমস্ত পৃথিবী যেমন সাহায্য পাবে, ভারতবর্ষেরও সেই সমস্ত স্থান থেকে আমদানীর ব্যবস্থা করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যশস্য রপ্তানী বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। যার নিজের ঘরে খাবার নেই সে বিদেশকে খাওয়াবে কেমন করে?

সরকারী গুদামে খাদ্যের অপচয় সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হবে। অপচয় হ'লে উপযুক্ত শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করতে হবে। চালের বদলে ধান রাখা কর্তব্য। চাল অপেক্ষা ধান বেশীদিন ভালভাবে রক্ষা করা যায়। অবিলম্বে সৈন্য অপসারণ করা প্রয়োজন। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরও এখনো বিদেশী সৈন্যদের খাওয়াবার মত অবস্থা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভারতবর্ষের নাই। চীনাবাদাম, ভুট্টা, ছোলা, কলাই প্রভৃতি খাদ্য সহজ প্রাপ্য করা প্রয়োজন। সস্তায় এগুলি এখন থেকেই পাওয়া গেলে দুর্ভিক্ষের সময় খেতে অভ্যাস থেকে যাবে, মানুষ এ খেয়ে বেঁচে যাবে।

জমির খাজনা ও সর্বপ্রকার ট্যাক্স কমিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। বিক্রয়কর (বর্তমানে বাংলায়) বন্ধ হওয়া উচিত। ট্রেণযাত্রীর ভাড়া কমিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। প্রতি পাঁচ পয়সা ও সাত পয়সাকে বাড়িয়ে ছয় ও আট পয়সা করা হয়েছিল যুদ্ধের মুদ্রাস্ফীতার প্রয়োজনে। বর্তমানে সে প্রয়োজন আর নাই। সুতরাং পূর্বপ্রথায় ফিরে গেলে প্রায় অর্ধেক যাত্রী কিছু পয়সা ঘরে রাখতে পারবে। বাংলার পুনর্গঠন পরিকল্পনায় জন্য গভর্ণমেণ্ট নয়কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। দুর্ভিক্ষ আসন্ন দেখে গ্রামের উন্নতি করে এমনি কর্মীরা এই টাকা দিয়ে গ্রামের কাজ করতে আরম্ভ করুক। গ্রামকে সংগঠিত করুক। অসৎ ও অসাধু কর্মচারীদের অপসারিত করা উচিত। চোরাবাজারি ও মুনফাখোরদের জন্য শাস্তিবিধান করা উচিত। এগুলিকে নির্মূল করা প্রয়োজন। সমস্ত মিথ্যা গুজবকে বন্ধ করে দিয়ে সঠিক সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করা উচিত। সর্বোপরি প্রয়োজন, জনসাধারণের আস্থা-ভাজনদের উপর এই দুর্ভিক্ষ সমস্যা সমাধানের ভার থাকা। তাহলে জনসাধারণ সহজেই তাঁদের বিশ্বাসও করবে এবং আত্মনির্ভর হ'তেও সচেষ্ট থাকবে। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া এমনি করেই শুধু দূর করা যেতে পারবে।

বৃটিশ পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি দল—

ভারতবর্ষের রাজনীতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ভারত সম্পর্কে ইতিকর্তব্য নির্দ্ধারণে বৃটিশ মন্ত্রীসভাকে পরামর্শ দেবার জন্য ইংরাজজাতির দশ জন প্রতিনিধি ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং সফর শেষ করে তারা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনও করেছেন।

ভারতে অবস্থানকালে একাধিক লেখক বিভিন্নভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ মন্তব্য করে আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হবার চেষ্টা করছেন। ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত ভারত সম্পর্কে যত তথ্য ইংরেজ লিখিত পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে তাহা একটী লাইব্রেরী পূর্ণ করবার পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু বৃটিশ রাজনীতিদের আরো তথ্য জানবার প্রয়োজন হোল। বহু কমিশন এদেশে প্রেরিত হয়েছে, বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করে বহু ইংরেজ রাজনীতিবিদ রিপোর্ট প্রণয়ন করেছেন এবং সেই রিপোর্ট নিয়ে বৃটিশ পার্লামেন্টের সভায় বহু নাটক প্রহসনের অভিনয়ও হয়ে গেছে। বৃটিশ রাজনীতিকরা যদি মনে করে থাকেন যে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অজুহাতে তারা এখনও চটুল নাটুকেপনার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন তবে তারা ভুল করেছেন। জাগ্রত ভারতবর্ষ আজ স্বাধিকার লাভে বদ্ধ-পরিকর। বিগত সার্দ্ধশত বৎসরের দাসত্বের কলঙ্ককালিমা রক্ত রক্তে অপনোদন করার দুর্জয় সঙ্কল্প ভারতের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে। বৃটিশ রাজনীতিকদের কূটনীতিক দাবাখেলা ভারতবর্ষ আর সহ্য করবে না। "রাজায় প্রজায় আজি হবে পরিচয় ঘনিষ্ট কঠিন।" কঠোর বাস্তবের সামনে দাঁড়িয়ে আজ বৃটিশ রাজনীতিকদের পথ বেছে নিতে হবে। হয় তাদের দীর্ঘকালের শোষণ নীতি পরিত্যাগ করে "ভারত ছাড়ো" দাবীর ভিত্তিতে ভারতবর্ষের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপিত করতে হবে আর নয়ত বিপ্লবী ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক চেতনাকে প্রতিহত করবার জন্য তাদের প্রস্তুত হতে হবে। কমিশন ও রিপোর্টের দিন শেষ হয়ে গেছে।

সিন্ধুর প্রাদেশিক শাসনকর্তার লীগ পক্ষপাত—

প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে ভারতীয় সভ্যদের মধ্য থেকে সংখ্যা গরিষ্ঠদলকে মন্ত্রীসভা গঠন করতে আহ্বান করার রীতি সার ক্রান্সিস্ মোডী লঙ্ঘন করেছেন। মিঃ সৈয়দের নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেস কোয়ালিশন দলের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও মুসলিম লীগকে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করার অধিকার দেওয়ার মূলে কি আছে তা সহজে অনুমান করা যেতে পারে।

পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানবজাতিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষে যে শোষণ মূলক স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র পরিচালনা করেছে তা' শোষিত জনগণের অস্তিসম্পাতে ধ্বংসোন্মুখ। স্বার্থান্ধ জাতীয় স্বার্থ বিরোধী মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের সহায়তায় ইহাকে স্থায়ী করার এই প্রয়াস আমাদের করুণা উদ্রেক করে। সাম্প্রদায়িক তিক্ততা সৃষ্টি করে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামকে চিরকালের জন্য পর্যুদস্ত করে রাখা যায় না,—এই সত্যটা যত শীঘ্র আমাদের ইংরাজ শাসকরা উপলব্ধি করবে ততই তাদের মঙ্গল। মুসলিম লীগও আর দীর্ঘকাল মুসলমান জন-সাধারণের ক্রম বর্দ্ধমান রাষ্ট্রিক চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারবে না। লীগকে শিখণ্ডী খাড়া করে জাতীয়তার বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের এই অভিযান ব্যর্থ হবেই। ইংরেজ শোষণের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমানের মিলিত সংগ্রামের দিন সমাগত!

ভারতীয় নারীদের লাঞ্ছনা—

উইমেনস্ অক্সিলিয়ারী কোরের অন্তর্ভুক্ত একদল মহিলা সংবাদপত্রে যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেছেন তা' আমাদের স্তম্ভিত করেছে। সৈন্যবাহিনীর একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারী বিভাগের একাধিক নারীর ঘনিষ্ঠতা যদি বৈহিক আসক্তিতে পর্যবসিত হয় তাতে আমরা অণুমাত্র বিস্মিত হই না। যুদ্ধের ইহা অপরিহার্য অভিসম্পাত। অন্যান্য দেশেও এইরূপ ঘনিষ্টতার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। প্রথম বিশ্ব সংগ্রামের পটভূমিকায় যে কয়েকখানি স্মরণীয় গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তার মধ্যে মিস্ স্মিথএর *"Not so quite"* অন্যতম। বৃটিশ অভিজাত সম্প্রদায়ের যে সকল মেয়েরা এম্বুলেন্স চালনা এবং আনুষাঙ্গিক অন্যান্য কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল তাদেরও একাধিক সৈন্যের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের বিবরণ আমরা এই পুস্তকে পেয়েছিলাম। কিন্তু সেখানে নারীরা স্বেচ্ছায় সৈন্যদের আবেদন স্বীকার করে নিয়েছিল তাদের আন্তরিক সহানুভূতির প্রেরণায়। আর এক্ষেত্রে নারীরা বাধ্য হয়েছে কর্মচারীদের জুলুম ও প্রলোভনের কাছে আত্মদান করতে। সামরিক বিভাগের পদস্থ কর্মচারীদের সহযোগিতায় ভারতীয় নারীবাহিনীকে নারীত্ব বিসর্জন দিতে বাধ্য করা এবং বিশেষ করে তাদের রুচি বিরুদ্ধ কর্মে প্ররোচিত করার দৃষ্টান্ত শুধু এই দুর্ভাগা

দেশেই মিলিত। [illegible] এবং ভবিষ্যৎ জীবনের স্বচ্ছলতার প্রলোভনে বিভ্রান্ত হবে এতগুলো ভদ্রপরিবারের সন্তানকে যারা অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছিয়ে দিল তাদের প্রতি সুদূর ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায় কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তা দেখবার জন্য সমগ্র দেশ উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। পরাধীন দেশের মেয়ে বলেই কি এদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের ঔদ্ধত্য সামরিক কর্তাদের প্রকাশ পেল? তাদের দেহকে নিয়ে যে বিকৃতমস্তিষ্ক সৈন্য বিভাগের কর্মচারীরা প্রকাশ করেছে তা' যে কোন সভ্যজাতীয়ই একটা দুঃস্বপনের কলঙ্ক। এর যথোচিত বিধান যদি কর্তৃপক্ষ না করে তবে দেশবাসী তাদের কন্যা ভগিনীর লাঞ্ছনার প্রতিবিধানের ভার নিজেরাই গ্রহণ করবে।

ইন্দোনেশিয়া—

বিশ্বের সমযোত্তর রাজনীতিক আবহাওয়া প্রধানত দুইটী কেন্দ্রকে ঘিরিয়া গড়িয়া উঠিতেছে। ইহার একটী কেন্দ্র হইতেছে রাশিয়া ও অন্যটী হইতেছে এ্যাঙ্গলো স্যাক্সন চক্র। যুদ্ধের সাময়িক তাগিদে এই দুই চক্রই এক কেন্দ্রীক হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু আজ যুদ্ধ অবসানে ইহাদের নিজেদের স্বভাবের রূপ ক্রমশই প্রকাশিত হইতেছে। এ্যাঙ্গলো স্যাক্সন চক্রের আবার দুইটী বাহু। একটী যুক্তরাষ্ট্র ও অপরটী গ্রেট ব্রিটেন। যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনের স্বার্থ যে একেবারে অভিন্ন তাহা নয়—তবে গ্রেট ব্রিটেন তার নিজের স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার জন্য 'বিশ্বস্ত ছোট ভাই'এর ভূমিকা অভিনয় করিয়া চলিয়াছে। যেমনটী আছে তেমনটি রাখিতে পারার মধ্যেই ব্রিটিশ স্বার্থ নিহিত। এবং এই ব্যাপারে ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা ও সাহায্য প্রার্থী। এই সাহায্য কতখানি ও কতদিন ব্রিটেন পাইবে তাহা সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের পরিস্ফুটির চালের উপর নির্ভর করিবে। আপাতত দেখা যাইতেছে যে এ্যাঙ্গলো স্যাক্সন চক্র একটী কেন্দ্র ঘিরিয়াই চলিতেছে।

যেমনটী ছিল তেমনটী রাখিতে পারার মধ্যই ব্রিটিশ কূটনীতিক মাহাত্ম্য নিহিত। এবং সর্ব ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ কূটনীতিকগণ স্বিত স্বার্থ রক্ষা করাকেই সব চাইতে বড় কৌশল বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে ডাচ গবর্ণমেণ্টের সাম্প্রতিক বিবৃতির ভিতরও আমরা সেই ব্রিটিশ কূটকৌশল দেখিতে পাইতেছি। ইন্দোনেশিয়ার বর্তমানে যে শাসনতন্ত্র আছে তাহাকেই কৌশলে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেই ঔপনিবেশিক বিপ্লবের প্রথম ধাক্কাটা কাটাইয়া উঠিতে পারা যাইবে ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। এবং এই বিশ্বাসের বশীভূত হইয়াই তাহারা তাহাদের আশ্রিত ও অনুগৃহীত ডাচ গবর্ণমেণ্টকে উপদেশ দিতেছে। তবে প্রতীচ্যের প্রদীপ্ত স্বাজাতিকতার নিকট সব কূটকৌশলকেই শেষ পর্যন্ত হার মানিতেই হইবে। 'দ্বীপ ভারতের' স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতারই একটী অংশ এবং সমগ্র ঔপনিবেশিক বিপ্লবের প্রতীক। ডাঃ সুকর্ণ বার বার আবেদন করিলেন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে শ্রীজওহর লাল নেহরুকে ঐ দেশে যাইতে দিতেছে না তাহা হইতেই ইহা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও এই সংগ্রামের অন্তর্নিহিত একতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। ইন্দোনেশিয়া মুসলমান প্রধান স্থান—এবং তাহার নেতাও মুসলমান যদিও তাঁর নাম সুকর্ণ। এই মুসলমান দেশের মুখপাত্র নেতার পক্ষে শ্রীজওহরলালের নিকট আবেদন পাঠানোর ভিতরেই সমগ্র প্রতীচ্যের স্বাধীনতা সংগ্রামের একতা সূচিত হইতেছে।

নিরাপত্তা বৈঠক—

তথাকথিত নিরাপত্তা বৈঠকের অধিবেশনের কয়েকটী বৈঠক হইয়া গেল। এবং ইহার ভিতর দিয়াই এ্যাঙ্গলো স্যাক্সন ও রুশ দ্বন্দ্বের খানিকটা আভাস পাওয়া গেল। এখনও ব্যাপারটা ঘোরাল হইয়া উঠে নাই তবে যে ভাবে পারস্পরিক মানসিক ও স্বার্থিক দ্বন্দ্ব বাড়িয়া চলিতেছে তাহাতে যে কোন মুহূর্তে ঝড় উঠিলেও আশ্চর্য হইবার কিছু থাকিবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে বেভিনের উক্তি ও রুশ প্রতিনিধির পাল্টা যুক্তি বুঝিতে হইবে। নিরাপত্তা বৈঠকে পারশিক ও গ্রীক প্রশ্ন হাওয়ার গতি কোন দিকে তাহা স্পষ্টই বুঝাইয়া দিতেছে। বেভিনের উক্তি ব্রিটেনের ঘরের সমাজতন্ত্রবাদ ও বাহিরের সাম্রাজ্যবাদী রূপটী অতি নিখুঁত ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছি। এবং যে ভাবে বেভিন চলিয়াছেন তাহাতে তিনি যে চার্চিলের যোগ্য উত্তরাধিকারী তাহা প্রমাণিত হইতে আর বেশী দেরী হইবে না।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২বং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅবনীনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'অগ্নিবীণা'র কার্যালয় ৩২বং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

অগ্নিযুগ

অষ্টম বর্ষ | চৈত্র—১৩৫২ | দ্বাদশ সংখ্যা

অহিংসার পথ

শ্রীঅঃ

(পূর্বানুবৃত্তি)

আজকের দিনে শ্রেণীবৈষম্য আছে এবং তা দূর করা দরকার। এর কি একমাত্র উপায় রক্তাক্ত শ্রেণীসংগ্রামের রাস্তা? মার্ক্‌সের বহু মত লেনিন ও স্টালিন অবলম্বন করেছেন পরিবর্তিত সময়ের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য। মার্ক্‌সীয় চক্রে "revisionist" বা "সংশোধনবাদী" বলে একটা নিন্দাসূচক শব্দ এক সময়ে প্রচলিত ছিল। অথচ লেনিনের চেয়ে বড় সংশোধক বা revisionist বোধহয় আর কেউ ছিল না—বার্নষ্টাইন, কাউটস্‌কী, বগডানভ প্রভৃতিও নয়। ইতিহাসের ও সমাজবিজ্ঞানের যে সব উপকরণের উপর মার্ক্‌স্ তাঁর মত গ'ড়ে তুলেছেন, মানুষের জ্ঞান তারপর অনেক এগিয়ে গিয়েছে। মর্গান (Morgan) আজ সমাজবিজ্ঞানের চরম কথা নয়। শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধেও আজকার সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের সাহায্যে নতুন ক'রে ভেবে দেখবার প্রয়োজন আছে। সমাজ বিবর্তনের একমাত্র পথ শ্রেণীসংগ্রাম, বা শ্রেণীবৈষম্য দূর করার একমাত্র রাস্তা শ্রেণীসংগ্রাম—আজ একথা অবিসম্বাদিত সত্য হিসাবে গ্রহণ করা কঠিন।[১]

এতদিন গান্ধীজী এই সম্বন্ধে একেবারে নীরব ছিলেন; বাংলায় এসে এই সম্বন্ধে তিনি সামান্য কিছু বলেছেন। আশা করি এই সম্বন্ধে তাঁর মত আরও পরিষ্কার ক'রে তিনি বলবেন। তবে তাঁর নির্দিষ্ট কর্মপন্থা থেকে এটুকু আমরা বুঝেছি যে, যে বিপ্লব তিনি আহ্বান করছেন তা থেকে উৎপন্ন হবে এমন এক সমাজ, যেখানে শ্রেণীবৈষম্য থাকবে না; এবং এই ভবিষ্যৎ সমাজের ভিত্তি স্থাপনের জন্য বিস্তৃততম জনতার কর্মসহযোগিতা প্রয়োজন হবে। যে গঠনমূলক কর্ম তিনি আজ প্রবর্তন করছেন তার গোড়ার কথা হ'ল—হীনতম ও দুর্বলতম মানবের কাজের ও ভোগের অধিকার যেন সকলের সঙ্গে সমানভাবে থাকে; অপরদিকে উচ্চতম ও সক্ষমতমেরও কাজের এবং সেবার দায়িত্ব সকলের সঙ্গে যেন সমানভাবেই থাকে। বুনিয়াদী শিক্ষা ও গঠনমূলক কাজের ভিতর যে সমাজের সূচনা তিনি করছেন, সেখানে সকলের পক্ষেই শারীরিক উৎপাদক শ্রমের (physical productive labour) সমান দায়িত্ব এবং সকলের পক্ষেই সামাজিক সুবিধা ভোগের অধিকার সমান। এর উপর তিনি বলেছেন—কংগ্রেসে গ্রাম্য কৃষক-জনতার অধিকারই সকলের চেয়ে বড়; এর বিরোধী কোনো দাবীই কংগ্রেস মানবে না। তিনি আরও বলেছেন—কংগ্রেস কার্যতঃ কিষাণ প্রতিষ্ঠানই হয়েছে ও উঠছে।[২]

১। শ্রেণীসংগ্রাম অর্থে আমরা হিংস্র রক্তাক্ত শ্রেণীসংগ্রামকে সূচিত করছি। প্রাত্যহিক জীবনে শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে বোঝাপড়ির দরকার রয়েছে, তাকে আমরা শ্রেণীবিরোধ সংজ্ঞা দিচ্ছি। এই পার্থক্যটুকু মনে রেখে এই প্রবন্ধ পড়তে হবে।

২। "I have no hesitation in saying that the Congress will sacrifice every interest for the sake of the dumb millions. It is therefore essentially a peasant organisation and is becoming so progressively.

বিখ্যাত আগষ্ট প্রস্তাবে কংগ্রেস এ কথাও বলেছে যে, সমস্ত সামাজিক সুবিধা কৃষিক্ষেত্র ও কারখানাগৃহের শ্রমশীল জনতার হাতেই থাকবে।

যে বিরাটতম জনতার সংগ্রাম কংগ্রেস পরিচালিত করছে, তার মধ্যে অনেক ছোটখাটো সংগ্রাম ডুবে যাচ্ছে, গ'লে যাচ্ছে। উঁচু পাহাড়ের উপর উঠলে যেমন নীচের জমির ঘরদোর গাছপালা সবই বিরাটের সামনে ডুবে যায়, ঠিক তেমনি সংগ্রামের উত্তুঙ্গ শিখরে উঠলে ছোটখাটো সংগ্রাম বিরাটের কাছে লোপ পায়—ওর মধ্যে ডুবে যায়। বিরাটতম জনতার সংগ্রাম হ'ল তেমনি উঁচু স্তরের সংগ্রাম—এর মধ্যে অনেক ছোট সংগ্রাম ডুবে গেছে। কংগ্রেসের কার্যক্রম সর্বব্যাপী—সর্বগ্রাসী। কবে বিপ্লব সংঘটিত হবে, তারপর নূতন সমাজের পত্তন করবে—এই আশায় কংগ্রেস বসে নেই। সে তার নূতন সমাজের পত্তন শুরু করেছে আজই, এই গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে। হিন্দু মুসলমানের গৃহযুদ্ধ; সবর্ণহিন্দু ও অবর্ণহিন্দুর গৃহযুদ্ধ, শ্রমশীল ও পরশ্রম-ভোগীর গৃহযুদ্ধ, নারী ও পুরুষের অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব, শহর ও গ্রামের রেষারেষি—এমনি বহু দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সমাধান এই গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে ক'রে নেওয়া হচ্ছে। গান্ধীজী বলেছেন—অতি দীনতম ও দুর্বলতমও যাতে স্বাধীনতার পর পূর্ণ অধিকার ভোগ করতে পারে, তার জন্যই দরকার যাতে স্বাধীনতা অর্জনেও তারা অংশ গ্রহণ করতে পারে। এই উক্তির মর্ম কি? বিপ্লব সাধনে সকলেরই অংশ থাকবে—কাজেই তার ভোগেও সকলেরই অংশ স্বভাবতই থাকবে। এই অধিকার কারুর দয়ার দান নয়, কারুর সদ্বুদ্ধি-প্রণোদিত করুণা নয়—এটা তাদের স্বোপার্জিত। গান্ধীজী স্পষ্ট ভাষায়ই বলেছেন—ক্ষেতের মালিক হবে তারা, যারা নিজ হাতে চাষ করে; আর কারখানার মালিক হবে শ্রমিকরা। গান্ধীজী যা আজ বলেন, কংগ্রেস দু'দিন পর তা গ্রহণ করে। কংগ্রেসও আগষ্ট প্রস্তাবে বলেছে—ক্ষেতের, কারখানার ও অন্যভাবের শ্রমশীল জনতাই সমস্ত সামাজিক ক্ষমতার মালিক হবে। শ্রেণীগত বিভেদ ও বৈষম্য বজায় রেখে এই ব্যবস্থা চলতে পারে না—বিশেষ যখন প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে উৎপাদক দৈহিক শ্রমকে অপরিহার্য দায়িত্ব ব'লে মেনে নেওয়া হচ্ছে। ব্যাপকতম ভিত্তিতে যে গণসংগ্রামের কথা, এই অহিংস পন্থা নির্দেশ করছে, তার মধ্যে স্বতই শ্রেণীসংগ্রাম ডুবে যায়—কারণ, পরশ্রমভোগী শ্রেণীকেই অস্বীকার করা হচ্ছে এর মধ্যে।

তবুও হয়তো প্রশ্ন উঠবে—সুবিধাভোগী তার সুবিধা স্বেচ্ছায় ছাড়বে কেন? এই প্রশ্নের জবাব পূর্বে দিয়েছি। গঠনমূলক কাজ সঠিকভাবে করতে পারলে সুবিধাভোগীরা বুঝবে যে, সব সুবিধার উৎস শুকিয়ে গেছে। গঠনমূলক কাজের মধ্যে যেটুকু ত্রুটি থাকবে তা পুষিয়ে নিতে হবে অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ দিয়ে। যে সুবিধাভোগী শেষ পর্যন্তও বুঝবে না—ভবিষ্যতের দাবী কি, তার সঙ্গে করতে হবে অসহযোগ এবং তার উপর চালাতে হবে সত্যাগ্রহ। এক দেশের ইতিহাসের শিক্ষা অন্য দেশেও জ্ঞাত হয়, যার ফলে অন্যান্য দেশ একটু সহজেই সতর্ক হয়ে শুধরে চলে। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে রাজাকে হত্যা করতে হয়েছে। এই কাহিনী ও শিক্ষা সর্বদেশের লোকের নিকটই পরিজ্ঞাত আছে। রাজতন্ত্রকে সংশোধন বা উচ্ছেদ করতে হ'লে সব দেশেই রাজার তাজা মাথা কাটতে হবে এমন কোনো কথা নেই। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাজবংশকে হত্যা করতে হয়েছিল। সব দেশেই এটা করতে হবে এমন দাবী ইতিহাস করে না। ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো—কেবল গৃহস্থ ঘরের নীতি নয়; ইতিহাসেরও এই নীতি। সর্বদেশের সুবিধাভোগীরাই আজ জেনেছে—"এমন দিন নহিঁ রহেগা"—এমনি দিন আর থাকবে না। কাজেই ঘূর্ণাবর্ত অসির আস্ফালনেই যে তারা হুইয়ে পড়বে, এতে খুব বিস্মিত হবার কিছু নেই। মার্ক্স বলেছিলেন, এই ইংল্যাণ্ডে বিধিসঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ বিপ্লব (legal and peaceful revolution) সম্ভব। লেনিন পরে বলেছিলেন—মার্ক্স যে অবস্থায় এই আশা করেছিলেন তার পরিবর্তন হয়েছে, কাজেই তাঁর ঐ আশা আজ আর সফল হ'তে পারে না। কিন্তু গত নির্বাচনের পর অনেকেরই আবার আশা হচ্ছে, শান্তিপূর্ণ ও বৈধ পথে ইংল্যাণ্ডে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধিত হ'তে পারে—যেমন হয়েছিল ইংরাজীর বিপ্লব। আজ ইংল্যাণ্ডের

সুবিধাভোগীরা জানে যে, জনমতের বিরুদ্ধে অস্ত্রের আশ্রয় নেওয়া বাতুলতা। তাই চার্চিল যুদ্ধের জন্য অস্ত্রে শান না দিয়ে আমেরিকায় গেছেন—হয়তো সেখানে অবসরে ব'সে স্মৃতিকথা লিখবেন।

আমরা যখন বলেছি শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়েও বিপ্লব সম্ভব এবং তা স্বল্পকালেই হ'তে পারে, তখন আমরা কেবল ইংরাজের হাত থেকে ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা আনবার কথা মনে করিনি ;—ওতেই আমরা তুষ্ট হব এমন কথা কেউ যেন মনে না করেন। ব্যাপকতম অর্থেই আমরা 'বিপ্লব' শব্দটির প্রয়োগ করেছি। অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ ক'রে নূতন সামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে, যাতে ব্যাপকতম জনতা—যারা শ্রমশীল অথচ শ্রমোৎপন্ন সম্বন্ধে বঞ্চিত—সেই জনতা সামাজিক ক্ষমতার ও কর্তৃত্বের আধার ও নিয়ামক হবে। তেমন বিপ্লবই আমরা কামনা করি। অমনি প্রশ্ন উঠবে—তবে শ্রেণীসংগ্রাম এড়াতে চাই কি ক'রে? পূর্বেই বলেছি, শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীবিদ্বেষ সমাজে আছে। এর নিরসনও আমরা চাই ; শ্রমশীল জনতার কর্তৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীহীন সমাজও আমরা চাই। কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রামের যে রক্তাক্ত রূপ এদেশে ইউরোপীয় রাজনৈতিক ও তাদের এদেশীয় অনুচরগণ প্রচার করে, আমরা মনে করি তা পরিহার্য ও পরিহরণীয়।

শ্রেণীবিদ্বেষের ও শ্রেণীবৈষম্যের মূলে রয়েছে অপরের শ্রমকে শোষণ করার প্রথা। গান্ধীজীর অহিংস পন্থা এই শোষণকে বন্ধ করার উপায়ই বাতলে দিচ্ছে। শোষণ প্রথার মধ্যে দু'টি শ্রেণীরই সহযোগিতা দরকার—এক শ্রেণী শোষণ করে ও অপর শ্রেণী শোষিত হয়। এই গঠনমূলক কর্মপদ্ধতিতে দুর্বলতম ব্যক্তি, দীনতম পরিবার ও শোষিত গ্রাম্য জনতাকে বলা হচ্ছে—স্বপ্রতিষ্ঠ হও, শোষণচক্রের আবর্তে প'ড়ো না, এই সহযোগিতা থেকে দূরে সরে দাঁড়াও। এটা শুধু মুখের কথা বলা নয় ; হাতে ধ'রে এক এক পা ক'রে তাকে চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে—এই অন্যায় শোষণের সহযোগিতার বাইরে স্বাবলম্বী হয়ে দাঁড়াবার ক্ষেত্রে। গঠন মূলক কর্মপদ্ধতিকে করগুণতিতে ১৫ দফা বা ১৮ দফার হিসাব করলে নিতান্তই যান্ত্রিক হিসাব হবে। এর মর্মকথা (spirit) হ'ল, দীনতম মানুষকে, দীনতম গ্রাম্য সমাজকে স্বাস্থ্যে, মনে, খাদ্যে, বস্ত্রে, শিক্ষায়, সামাজিকতায় স্বাবলম্বী ও স্বপ্রতিষ্ঠ করা। পূর্বেই বলেছি যে, এই গঠনমূলক কাজের ফলে এক সুপ্রভাতে শোষকগণ দেখবে—তাদের পক্ষে মধুভোজী দিন ফুরিয়ে গেছে, শোষণের সব উৎস শুকিয়ে গেছে।

সশস্ত্র বিপ্লব কেবল বঞ্চিত শ্রেণীকেই নিয়েই তুষ্ট থাকতো ; তাদের মধ্যে থেকেও মুষ্টিমেয়কে পেলেই সশস্ত্র বিপ্লবী খুশী। মুষ্টিমেয়কে অস্ত্রে সজ্জিত ক'রে তারা শোষক শ্রেণীর হাত থেকে শক্তি কেড়ে আনবে। শোষিতের অপর বৃহৎ অংশকে এবং শোষকের প্রায় সবাইকেই তারা পরে ভূরস্ত করবে—কাউকে বা কিলিয়ে, কাউকে বা মাথায় হাত বুলিয়ে কাউকে বা নূতন প্রলোভনে ভুলিয়ে। কিন্তু অহিংসা বিপ্লবের পক্ষে তা করা চলে না। পূর্বাহ্নেই তাকে উভয় শ্রেণীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। পূর্বেই বলেছি গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি একদিকে স্পর্শ করছে শোষিত ও বঞ্চিতদের, এবং অপরদিকে স্পর্শ করছে শোষক ও পরশ্রমভোগীদের। শোষিতদের সম্বন্ধে এইমাত্র বললাম। শোষকদের সম্বন্ধেও বলেছি—একদিন তারা অনুভব করবে, এই শোষণক্রিয়া আর চলে না। এই অনুভূতি তাদের মনে দ্রুতভাবে আসবে যদি আমরা গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির ফলে তেমনি আর্থিক প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে পারি। পূর্বেই বলেছি—এক উপায় হল গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি দিয়ে শোষণের উৎস শুকিয়ে দেওয়া, এবং অপর উপায় হ'ল সক্রিয় অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ।

জাগ্রত জনতার আর একটি সহায়ও জুটবে। আজ ভারতেও জনতার যে রাষ্ট্র-অধিকার আছে, অহিংস বিপ্লবের পক্ষে তা-ও এক মস্ত বড় সহায়ক। নিজেদের অধিকার ও দাবী সম্বন্ধে সচেতন হ'লে এই শ্রমশীল সংঘবদ্ধ জনতার প্রভাব রাষ্ট্রযন্ত্রের উপরও পরিলক্ষিত হবে। এর ফলে রাষ্ট্র-অনুশাসন দ্বারা—আইনের বলে—তাদের দাবীর পূরণ ধাপে ধাপে হ'তে থাকবে। গঠনমূলক কর্ম, সত্যাগ্রহ ও অসহযোগের ফলে বাহিরের বিরাট সমাজ-ক্ষেত্রে এদের মধ্যে যে শক্তি ও স্বাধিকারবোধ জাগবে, রাষ্ট্র আইন-কানুন দিয়ে

ক্রমে ক্রমে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবে। অহিংস বিপ্লবের পক্ষে রাষ্ট্রযন্ত্রকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যেই গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির পরিপূরক হিসাবে ব্যবস্থাপরিষদকে গ্রহণ করা

জনতার দাবীর পূর্ণ স্বীকৃতি রাষ্ট্র আজই করবে না তা জানি। আংশিক স্বীকৃতি পাওয়া যাবে তাতে জনতা তুষ্ট থাকবে না, বরং নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে নূতন নূতন দাবী তারা তুলবে। কুণ্ঠিত চিত্তে রাষ্ট্র ক্রমে তাও মেনে নেবে। অহিংস বিপ্লবের পক্ষে রাষ্ট্রযন্ত্রকে কাজে লাগানো বিশেষ প্রয়োজনীয়। কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের দু' বছরের ইতিহাস এর অনেক সাক্ষ্য দেবে। মার্ক্স্ বলেছিলেন, আংশিক গণ-অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রেও বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে(legal and peaceful means) বিপ্লব সম্ভব। রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিপ্লবের কাজে লাগাতে হবে এবং লাগানো যায়—এই অনুভূতি থেকেই মার্কস একথা বলেছিলেন সচেতন জনতার প্রভাব রাষ্ট্রের উপর যা প্রতিফলিত হবে তা কেবল ওই নৈর্ব্যক্তিক যন্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে

যে সব ব্যক্তি রাষ্ট্রযন্ত্রকে চালায়, তাদের উপরও এই প্রভাব পড়বে। এর ফলে রাষ্ট্রবেতনের অহিফেনে যে সব রাষ্ট্র কর্মচারীর বিচার বুদ্ধি স্তম্ভিত হয়ে আছে, তাদের অহিফেনের নেশা কেটে যাবে; জাতির বিরাট সত্তার সঙ্গে তাদের যোগ তারা অনুভব করবে।

সুবিধাভোগীদের মধ্যে এই মনোভাবের সৃষ্টি করা নির্ভর করে তেমন পরিবেশের সমাবেশ করতে পারার উপর, এবং সে কাজ আমাদেরই। মার্ক্স যখন শ্রেণীসংগ্রামকে অনিবার্য মনে করেছিলেন, তখন শ্রমশীল জনতা ছিল রাষ্ট্র অধিকারচ্যুত, অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ও চেতনাহীন। কেবল ইংল্যাণ্ডে এই অবস্থার কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল। ১৮৩০-৩২ সাল থেকে ইংল্যাণ্ডের সাধারণ জনতা কিছু পরিমাণ রাষ্ট্র-অধিকার পেয়েছিল। তাই তিনি আশা করেছিলেন ইংল্যাণ্ডে নিরস্ত্র বিপ্লব সম্ভব—অন্য কোথায়ও নয়। অধিকারচ্যুত, অজ্ঞ ও চেতনাহীন শ্রমিককে যদি অধিকার আহরণ করতে হয়, তবে দু'টি রাস্তা আছে—ধীর কিন্তু সুনিশ্চিত ও সুবিস্তৃত কর্মপন্থায় এদের মধ্যে চেতনা ও অধিকার-বোধের সঞ্চার করা; অথবা আপাতঃ ক্ষিপ্র কিন্তু পিচ্ছিল পথে মুষ্টিমেয় লোকের অন্তের বলে ক্ষমতা আহরণ করা। আজকের দিনে কোনো দেশের শ্রমশীল জনতাই—ভারতেরও নয়—এমন অধিকারচ্যুত, অজ্ঞ ও চেতনাহীন নয়, যেমন ছিল ইউরোপের জনতা এক শ' বছর পূর্বে। মার্কস আহ্বান দিয়েছিলেন কেবল কারখানার শ্রমিককে—কারণ, তারা সংখ্যায় কম, মূল-উৎপাটিত ব'লে তারা বেপরোয়া, তারা একজোট্ হ'য়ে কাজ করে, তাই তাদের সংঘবদ্ধ করা সহজ। তিনি চেয়েছিলেন ক্ষিপ্র কাজ—কিন্তু ১০০ বছরে তা মাত্র সামান্য শুরু হ'য়েছে। যে ক্ষিপ্রতার জন্য বিরাট কৃষক জনতাকে তিনি বাদ রেখেছিলেন, যে ক্ষিপ্রতার জন্য তিনি রক্তাক্ত শ্রেণীসংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন, সে ক্ষিপ্রতা ইতিহাসের গতি পায় নি। পূর্বেই আমরা বলেছি যে, বলপ্রয়োগ ক'রে বিপ্লবসাধন কতকটা যেন কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাবার মতো—স্বাভাবিক গতিতে যার জন্য দু'দিন সবুর করতে হবে, কৃত্রিম উপায়ে তাকে অকালে পাকিয়ে তোলা শেষ পর্যন্ত লাভের নয়। কিলিয়ে পাকানো কাঁঠালে ও স্বাভাবিকভাবে পাকা কাঁঠালে যে পার্থক্য, ঠিক সেই পার্থক্য আছে সশস্ত্র ও নিরস্ত্র বিপ্লবে—অন্ততঃ আজকের দিনের সামাজিক পরিবেশে। ইতিহাসে দেখতে পাই সশস্ত্র বিপ্লবের পর একটা বিপ্লব বিরোধী অবস্থা ফিরে আসে—বিপ্লবের গতি পিছিয়ে যায়। ক্রমওয়েল, নেপোলিয়ান-দ্বয় এবং হয়তো বর্তমানে স্টালিন এই পিছিয়ে যাওয়ারই দৃষ্টান্ত। কৃত্রিমভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করলে স্বাভাবিক নিয়মেই তারপর একটা অবসাদ আসে। সশস্ত্র বিপ্লবে এই কৃত্রিম উত্তেজনার আশ্রয় নেওয়া হয় অনেকখানি—তাই পরবর্তী অবসাদও হয় ব্যাপক।

আজ যে ইতিহাস মার্ক্সকে ছাড়িয়ে গেছে, এটা মার্ক্সের নিন্দাচ্ছলে উক্তি নয়; মার্ক্সের শিক্ষা অনুসারে ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা পেয়েছি, এই উক্তি তারই ফল। শ্রমশীল জনতার যে অবস্থায় শ্রেণীসংগ্রামকে তিনি অনিবার্য বলে মনে করেছিলেন, সে অবস্থা আজ আর নেই। ইংল্যাণ্ডে শ্রমিকদের যে অবস্থায় তিনি বৈধ ও শান্তিপূর্ণ বিপ্লব সম্ভব মনে করেছিলেন, সেই অবস্থারই আরও উন্নত রূপ আজ প্রায় সব দেশেই দেখতে পাই। কাজেই বৈধ ও শান্তিপূর্ণ বিপ্লব বহু দেশেই আজ সম্ভব।

এই সম্ভাবনার একমাত্র রাস্তা হ'ল গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি। জগতের ইতিহাসে সমাজ সংস্কারক, ধর্মপ্রবর্তক, রাজনৈতিক চিন্তাশীল ও বিপ্লবী বহু এসেছেন; যুগে যুগে সমাজে নূতন বিধান এঁরা বহু দিয়েছেন। কিন্তু মানবের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনকে এমন সমগ্রভাবে গান্ধীর মতো আর কেউ নাড়া দিয়েছেন কিনা সন্দেহ। সমগ্র সমাজকে নূতন করে গড়বার এমন প্রয়াস আর দেখেছি কিনা সন্দেহ। এই প্রয়াসের রাস্তা হ'ল গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি। এই গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির মূল কথা হচ্ছে, বিপ্লবকে গ'ড়ে তোলা—সমাজের মধ্যে যে সব সমস্যা, সংঘর্ষ ও বিরোধ রয়েছে তার সমাধান করা। আজও যারা মনে করে বিপ্লব এখনও শুরু হয়নি, এক অনির্দিষ্ট দিনে শুরু হবে এবং আরও এক অনির্দিষ্ট দিনে তার সাফল্য লাভ হবে, তারপর ধীরে সুস্থে নূতন সমাজ গড়তে হবে, তারা বিপ্লবের মর্মকথাই জানে না। বিপ্লব শুরু হয় বিপ্লবী নেতার মনে, ছড়িয়ে পড়ে তা বিপ্লবী জনতার মনে মনে—তখন তারা বাস করে বিপ্লবের ভিতরে। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে আমরা বিপ্লবের ভিতর দিয়ে চলেছি—আর বিপ্লবকে ছড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি দিক হ'তে দিগন্তরে। তরঙ্গসঙ্কুল নদীবক্ষে একখানা জাহাজ যখন চলে, তখন তার গতিমুখে উত্তালতর, বিক্ষুব্ধতর তরঙ্গমালা সৃষ্টি ক'রে ক'রে সে চলে। বিপ্লবী জনতার চলার বেগ ঠিক তেমনি ব্যাপকতর, গভীরতর বিপ্লব সৃষ্টি করতে করতে বিপ্লবের ভিতর দিয়েই এগিয়ে যায়। গঠনমূলক কাজ হ'ল তেমনি বিপ্লবী জনতার গতিমুখের বিপ্লবের তরঙ্গমালা।

আর এই হ'ল অহিংসার পন্থা—যেখানে শ্রমে যেমন সকলেরই দায়িত্ব, অধিকারে তেমনি সকলেরই দাবী; যেখানে কায়িক উৎপাদক শ্রম (physical productive labour) হবে অধিকার ভোগের একমাত্র ছাড়পত্র, যেখানে মানুষ চালিত হবে শুভবুদ্ধি দিয়ে। হিংসায় জর্জরিত এই পৃথিবীতে আজ প্রয়োজন হয়েছে এই শুভবুদ্ধির, দায়িত্ব ও দাবীর যুগ্ম ভিত্তিতে মানুষের সমাজকে গ'ড়ে পরশ্রমভোগী অনোপার্জিত সম্ভোগবিলাসীর জীবনযাত্রা অসম্ভব ক'রে তোলা। হয়তো কেউ প্রশ্ন করবে—বিশ্ব কি এই শুভবুদ্ধির বাণী শুনবে? কিন্তু সহিংস বিপ্লবের বা শ্রেণীসংগ্রামের বাণীও বিশ্ব এক শ' বছরেও গ্রহণ করেনি। আজও মার্ক্সের আশা স্বপ্ন জগতেই রয়েছে। শ্রেণীসংগ্রামের পথেও সাম্যবাদী সমাজ আজও কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রাশিয়ায় এই ৩০ বছরের প্রয়াসে সেখানেও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন কথা বলা চলে না। মার্ক্স-লেনিনের আশা ও আদর্শের অতি সামান্য অংশ রুষ রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়েছে। অনেক বিষয়ে ওখানকার ব্যবস্থা তাঁদের আশা ও আদর্শের প্রায় বিপরীত দিকে চলেছে। Withering away of the state এবং interim periodএর রাষ্ট্রে স্থায়ী সৈন্য, পুলিশ ও আমলাতন্ত্র না থাকার (no standing army, no police and no bureaucracy) মত বর্তমান রাশিয়াতে মোটেই মান্য হয়নি—গতিও সেইদিকে নয়। তবুও মার্ক্স-লেনিন মানবের ভবিষ্যৎ পথ প্রদর্শকদের অন্যতম। অপরদিকে বুদ্ধ বা যীশুর বাণী পৃথিবী একেবারেই প্রত্যাখ্যান করেছে, একেবারেই তাতে মানুষ কান দেয়নি—এমন কথাও তো বলা চলেনা। আজ গান্ধী যা বলছেন, মানুষ পুরোপুরি তা গ্রহণ করবে এমন দাবী আমরা করছিনা। কিন্তু আত্মধ্বংসের অন্ধকার গহ্বরের একেবারে প্রান্ত সীমায় এসে মানুষ আজ দাঁড়িয়েছে। আর এক পা এগুলেই সে পড়বে ঐ অন্ধকার গর্ভের গভীরতম তলে। এই বিপদের মুখে আজ তাকে সাবধান করার প্রয়োজন হয়েছে। দু'পা অন্তত সে পিছিয়ে দাঁড়াক—সামনে গভীর গহ্বর।

পৃথিবী আজ এক গোষ্পদে পরিণত হয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকার আণবিক বোমা জাপানের উপর পড়েছে। একদিন হয়তো তাদের নিজেদের উপরও পড়বে। এই ধ্বংসের লীলায় সমস্ত পৃথিবী হয়তো মেতে উঠবে। হয়তো সেই সর্বগ্রাসী ধ্বংসে সবাই জড়িয়ে পড়বে। আজ, ভারতের মুখ থেকে এই যে সাবধান বাণী বের হচ্ছে, সর্বদেশের বিভ্রান্ত মানব উৎকর্ণ হয়ে আছে এর মর্ম উপলব্ধি করার জন্য। প্যালেস্টাইন যীশুকে হত্যা করেছিল। ভারত বুদ্ধকে হত্যা করেনি—বরং গ্রহণ ক'রে তাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছিল। আশা আছে গান্ধীকেও ভারত গ্রহণ করে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবে—ভীত সন্ত্রস্ত মানবের অভয়মন্ত্র হিসাবে।

ল্যাটিনে একটা কথা আছে, *Lux ex orient*—আলো

আসে পূব দিক থেকে। আজও হয়তো পশ্চিম তাকিয়ে আছে পূবাকাশ পানে—যদি কোনো নূতন আলোর রেখা সেখানে ফুটে ওঠে। পূব গগন কি নিজের ধর্ম বিস্মৃত হয়ে বিশ্বকে হতাশ করবে? এই অহিংসার পন্থা হ'ল সেই নূতন আলোক-রেখা। একে বুঝতে হবে—বুঝবার জন্য মনকে অনুকূল করুন, বাস্তবকে হৃদয়ঙ্গম করুন, ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে বৃহত্তর পটভূমিকায় নিরীক্ষণ করুন—আর যুক্তিকে জাগ্রত করুন, শুষ্কবুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করুন। গান্ধীর পন্থা, অহিংসার পন্থা অযৌক্তিক পাগলের প্রলাপ নয়। ১৯২০ সাল থেকে '৪২ সাল পর্যন্ত জাতীয় তরীর কাণ্ডারী তাঁর দক্ষতার পর্যাপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। গুড় যে মিষ্টি তা খেয়েই বুঝতে হয়; সেই যুক্তি অনুসারেই বলছি—গান্ধীর অহিংস পন্থা একেবারে ভুল পন্থা নয়।

বিপ্লবী দৃষ্টি থাকবে দূরপ্রসারী ও গভীর; সমস্যার আশু ও ভাসা-ভাসা সমাধান তার কাজ নয়। সে চাইবে দূর ভবিষ্যতের জন্য, মানব সমাজের দূরতম প্রান্তের ও গভীরতম স্তরের জন্য নূতন ক'রে গড়তে। রাত্রি যখন গভীর অন্ধকার, তারপরেই প্রদোষের আলো ফুটে ওঠে পূর্বদিগন্তে. বালার্কের রক্তিম আভা নিয়ে। স্নিগ্ধ মৃদু সে আভাই ধীরে ধীরে দীপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়—আকাশ ও ধরণীকে উদ্ভাসিত ক'রে। বিপ্লবীর আভা ঠিক তেমনি—স্নিগ্ধ ও মৃদু—সমাজে অন্ধকার যখন সর্বব্যাপী ও গভীর, ঠিক তারই পর ঐ স্নিগ্ধ ও মৃদু আভা প্রথম আশার আলোকপাত করে অন্ধকারের বুকে, পরে দীপ্ত তেজে সে উদ্ভাসিত করে-দিকদিগন্তকে। নবজাত মানব সমাজকে নূতন পথের সন্ধান দেয় ঐ আলো।

সেই স্নিগ্ধ ও মৃদু আলোর সন্ধান নিহিত আছে ভারতের এই অহিংস বিপ্লব পন্থার মধ্যে।

আমার প্রেতের কায়া

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মরম আমার তোমার চরণ তলে
পেতে দিয়ে ছিনু। এ-পথে চলিবে বলে
আঁখি জল ঢালি ধুয়েছি পথের ধূলি
বুকে দলেছিনু পথ কণ্টকগুলি।

পরাণ পিষিয়া তোমার দেবার লাগি
সুধা নিরমিয়া গিয়াছি প্রসাদ মাগি;
সাধুতার তুমি চাহনি আমার পানে
চকিত হও নি বুক ভাঙা মোর গানে।

বাছিয়া লয়েছো আপন স্বরগ ফল
সাধুতার মূল্য দিয়া। লয়ে আঁখিজল
মরিয়াছি আমি। গোপন দুখ সে মম
কিছু কি বাজেনি তব বুকে প্রিয়তম?

হেলায় নিহত আমার প্রেতের কায়া
তোমার স্বরগে ফেলেনি কি কোন ছায়া?

আশংকা

সুধাংশুকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলুপাড়ায় গোষ্ঠ কলুর বাড়ী। দিনরাত ঘানি ঘোরে শব্দ হয়—ক্যাঁ কট কট! সকালে সকলেই ব্যস্ত, শব্দ কাণে গেলেও কেউ লক্ষ্য করে না, দুপুরে শব্দটা দিবানিদ্রালুদের বিরক্তির কারণ; সন্ধের মন্দ লাগে না একটানা ক্যাঁ কট্ কট্ শব্দ, ছেলেরা সুর করে পড়তে বসে, কথক ঠাকুর খুলে বসে রামায়ণ, কিন্তু দুপুর রাতে হঠাৎ ঘুম-ভাঙা লোকের কাণে শব্দটা লাগে অতি বীভৎস, সবাই ভুলে যায় যে গোষ্ঠ কলুর ঘানি ঘুরছে যেন একটা ভীতিপূর্ণ রহস্যের চক্র আসছে এগিয়ে। তার এক জোড়া বলদ, অবলবদল করে দেয় দুটোকে, সারারাত চলে ঘানি, এই তার একমাত্র উপায়।

ঘরে বাছা পুষ্যি কেউ তারা প্রয়োজনীয় নয়। আধবয়েসি মেয়েটা হাত নেড়া করে শ্বশুরবাড়ী থেকে চলে এসেছে। গোষ্ঠর একমাত্র ছেলে বিষ্টু সে-বছর মড়কের সময় মারা গেল, তার বিধবা বৌ ঘুরে বেড়ায় গোষ্ঠর চোখের ওপর, স্বামী অজ্ঞাতে কোন শক্ত কথা বলতে বাধে—আহা বৌটার বয়েস বড় অল্প। কিন্তু কি দরকার ছিল আবার ভাইটাকে টেনে আনার, নিজের না আছে একটা কোলে-পিঠে! বিষ্টু যদি একটা ছেলে রেখে যেতো। গোষ্ঠর চোখ ছল ছল করে ওঠে, কংকালসার বুকখানা ঘনঘন কাঁপতে থাকে মুখে আওয়াজ করে—হেট, হেট! ঘানি ঘুরতে থাকে।

রোজ বিকেলে গোষ্ঠর জ্বর হয় কাপুনি ধরে, আফিংএর নেশায় একটু ঢুলুনিও আসে চোখে। সেদিন সন্ধের আপাদ-মস্তক চাদরে ঢেকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে গোষ্ঠ বসেছিল ঘানি-ঘরে। গোয়ালে একটা বলদ ডেকে উঠলো বার কতক। গোষ্ঠোর মেয়ে বাসিনী তখন দাওয়ায় বসে সুদের হিসেব করছে মনে মনে, দাওয়ার আর একপাশে কেরাসিনের ডিবে জ্বালিয়ে পড়তে বসেছে বৌয়ের ভাই—বঙ্কিমনাথ। বাসিনী ধমকে ওঠে—কাণ কি তোমাদের নেই গা, গরুটা অমন করে ডাকছে একমুঠো খড় দিলে কি মা সরস্বতী পালাবে? ভাই পড়ে জব্দ হবে। আকেলও যদি থাকে, বুড়ো লোকটার আজ জ্বর হয়েছে তাই, নইলে গরুর কাজের কুটো নাড়তে দেয় কাউকে?"

বাসিনীর চীৎকারে বঙ্কিমনাথ ওঠে না, ওঠে তার দিদির ইসারায়। পড় দিয়ে যখন বঙ্কিমনাথ গোলা খেলে আনতে যায়, গোষ্ঠ কাঁপতে কাঁপতে ওঠে আসে গোয়ালঘরে—"দেখ বাপু ওই দুটো আমার সম্বল, তোমরা আর ও দুটোর ওপর চোখ দিও না, ওরা না খেতে পেয়ে চেঁচিয়ে মরে সেও ভাল—" গোষ্ঠ আরও কি বলতে বলতে বঙ্কিমনাথের দেওয়া খড়গুলো তারা থেকে তুলে ফেলে দেয় ওগুলো যেন বিরক্তির বিষ মাখানো; আবার নতুন করে নিজে হাতে দেয় খড়। বঙ্কিমনাথ নিরস্ত হয়ে ফিরে আসে। গোষ্ঠ বাসিনীকে লক্ষ্য করে বলে—"তোরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে ঝগড়া কর কিন্তু আমার গরু নিয়ে ঝগড়াঝাটি পাপপাপন্ত করিস্ না, ওদুটো আমার শেষ সম্বল।"

গোষ্ঠোর নেশার আমেজ ও তন্দ্রার ঘোর কেটে যায়, হুকো হাতে নিয়ে আবার ভাবতে থাকে—বিষ্টুর চেষ্টায় হয়েছিল একখানা দালান আর টিনের চাল নগদও কিছু করেছিল, তাছাড়া বৌটার গায়ে গহনা গড়িয়ে দিল দুএকখানা। বিষ্টু বরাত নিয়ে এসেছিল বরাত নিয়েই চলে গেল; গোষ্ঠর হাতের জলটুকুও পেলে শেষ সময় কিন্তু গোষ্ঠর কি হবে? সে ইহকালের হাহাকার পরকালে শুনতে পায়, স্থির করে আর কষ্ট করবে না—নিজের পেট মেরে পরকে শেঠ করে তার লাভ কি? তার সামনে তারই অবর্তমানের দিনগুলো ভেসে ওঠে—ননদ ভাজে ঝগড়া হচ্ছে দিনরাত, বাড়ীখানা হতশ্রী তবু কেউ চেয়ে দেখে না, বৌ পাড়ায় বলে বেড়ায়—ওর বাপের ভিটে. যাক না পড়ে বুক ফাটবে ওর, আমি বঙ্কিমনাথকে নিয়ে চলে যাব শীতলপুর। মেয়ে বলে বেড়ায়—কোলে নেই তার কাঁথার ভাবনা, আমার তো আর শ্বশুরের ভিটে নয় আমি চলে যাব নবদ্বীপ না হয় বৃন্দাবন। গোষ্ঠোর চোখের সামনে তার ভিটেতে ঘুঘু চরছে, গজিয়ে উঠেছে মস্ত বড় বড় নিম আর আসশেওড়া। দু'চোখ বয়ে জল নামে, অস্ফুটস্বরে বলে ওঠে—বিষ্টু, বিষ্টুরে।

রাতে শুয়ে শুয়ে বঙ্কিনাথ বলে—"দিদি এখান থেকে চলে চল্ তোর শ্বশুরও আমায় দেখতে পারে না।"

দিদি জবাব দেয়—"শীতলপুরে গিয়ে কি খাব বল। তুই এখানে থেকে মানুষ হয়ে নে তারপর একটা বিয়ে করে শীতলপুর চলে যাস্। আমি আর কোথায় যাব, এ আমার শ্বশুরের ভিটে, এখানে যে আমার মাটি কেনা।"

দিদির গলাটা কেমন কেঁপে ওঠে বঙ্কিনাথ পেয়ে যায় সে রাতের মত।

পরদিন দুপুরে খেতে বসে গোষ্ঠ বলে—"বাসিনী আমায় আর চাবটী ভাত দে।" ভাত এলো। তারপর চাইলে গোষ্ঠ দুধ। বাসিনী অবাক হয়ে জবাব দেয়—"এবেলা তো দুধ খাও না বাবা। দুধ সব রোজে দিইছি।"

চেঁচিয়ে ওঠে গোষ্ঠ—"খাই না, এবার থেকে খাব আমি।"

বাসিনী বাপকে থামিয়ে বৌয়ের ঘরে যায় দুধের খোঁজে। কিন্তু ফিরে আসে খালি হাতে।

গোষ্ঠ একটু চাপা গলায় বলে—"যত সব রাক্ষুল জুটেছে বাড়ীতে, আমি মরছি শুকিয়ে আর কে কোথাকার ঠিক নেই দুধ রাত থেকে যাবেন ফুলে।"

বাসিনী সুবিধে বুঝে যোগ দেয়—"আমিও তো বলে ধবিনি শ্বশুরবাড়ী থেকে একটা দেওরপোকে এনে রাখতে তো পারি। যত সব বাড়াবাড়ি।"

গোষ্ঠ বেশ চেঁচিয়ে হুকুম জারি করে—"কাল থেকে আমার দুধ চাই, আগে আমার তারপর কুত্ত তোজন।"

দিন কতক পরের ঘটনা। সন্ধের ঝোঁকে গোষ্ঠ বাসিনীকে বলে—"বঙ্কিনাথের অসুখ কি বাড়াবাড়ি। সহর থেকে বড় ডাক্তার এলো যে?"

"অসুখ বাড়াবাড়ি নয় তোমার বোয়ের আদিখ্যেতা"—বাসিনী উত্তর দেয়।

গোষ্ঠ চুপ করে যায় তার মনে একটা অস্বস্তির খোঁচা। আজ কদিন ধরে সে কেবল ছেলেটার অমঙ্গল কামনা করেছে, কত দুর্ঘটনার ছবি আঁকা সোপণ করেছে মনে মনে। তারপরই ঐ ছেলেটা অসুখে পড়লো। গোষ্ঠর বুকখানা টন্ টন্ করে ওঠে একটা অব্যক্ত বেদনায়। তার মনে হয় বঙ্কিনাথ তার বাড়ীতে থেকে খেতেও পারে, সেও দেখতে পারে তার বাড়ী-ঘর, ঘানি, বলদদুটো, যেমন দেখতো বিষ্টু। বঙ্কিনাথ তা পারবে, লোকের কাছ থেকে তেলের দাম গোষ্ঠ নিজে হাতে নেয় বটে তেল মেপে দেয় বঙ্কিনাথ; পদ্মের কত কাকুতি মিনতি করে একটু ফাউয়ের জন্যে কিন্তু বঙ্কিনাথ এক ফোঁটাও দেয় না কাউকে। সে-ই মাঝে মাঝে পরিষ্কার করে ঘানি-গাছটা। বাসিনী কত চেষ্টাই না করলে দেওরপোটাকে পুষ্যি নিতে কিন্তু তারা দিলে না তো, লোকে বলে তার বংশে পুষ্যিও নাকি নইবে না। হয়তো এই বঙ্কিনাথই শেষ সময়ে দেবে দু'ফোটা গঙ্গাজল, শ্রদ্ধার সঙ্গে করবে তার শ্রাদ্ধ, হরিনাম বসাবে দাওয়ায় একপাশে, যেমন করে করতে পারতো বিষ্টু। ভাবতে ভাবতে গোষ্ঠর গলা শুকিয়ে যায়—ছেঁড়া কম্বলখানা পাশ থেকে টেনে নিয়ে বলে ওঠে—"বাঁচুক, বাঁচুক বঙ্কিনাথ"।

অত রাতে শ্বশুরকে দেখে বৌ সোজা হয়ে বসে বঙ্কিনাথের বিছানায়, মাথার কাপড়টা বড় করে টেনে দেয়। দরজার কাছ থেকে গোষ্ঠ এগিয়ে আসে বঙ্কিনাথের মুখখানা দেখবে বলে। —"বৌমা, বঙ্কিনাথ ভাল আছে তো"? কাঁপতে কাঁপতে গোষ্ঠ প্রশ্ন করে। অস্ফুটস্বরে বৌ উত্তর দেয়—"হ্যাঁ"।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গোষ্ঠ বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

ইউলিসিজ্

শ্রীহেমন্তকুমার তরফদার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৪

প্রশ্ন হতে পারে এতে দোষটা কি? শিল্প-সভ্যতার একটা বিশেষ স্তরে আজ ভারতবর্ষ উপনীত হয়েছে। এই স্তরের রাজনৈতিক আদর্শ হচ্ছে ন্যাশনাল স্টেট্। ভারতবর্ষও সুতরাং তাই দাবী করছে। ইতিহাসের গতিপথে এইটাই স্বাভাবিক ঘটনা।

গান্ধীজীর তরফ থেকে এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে ন্যাশনাল স্টেট্ বা স্বরাষ্ট্র আমাদের চাই নে তা নয়, কিন্তু একান্তভাবে সেইটাই কাম্য নয়। স্বরাষ্ট্রের চেয়ে স্বরাজ শ্রেয়তর। এই কথাটার ব্যাখ্যার জন্যই বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা।

আমরা প্রথমে দেখেছি অত্যাচার থেকে, নিষ্পেষন বাঁচবার জন্যই স্বাধীনতার আন্দোলন একদিন সুরু হয়েছিল। কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এটাকে মনে হবে আংশিক সত্য। কারণ হঠাৎ এক সময় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আমরা অত্যাচারিত হতে সুরু করেছি বা ইংরাজই একমাত্র লোক যে আমাদের ওপর অত্যাচার আরম্ভ করেছে, এমন নয়। যে দীর্ঘ ইতিহাস আমরা পিছে রেখে এসেছি এবং যে দীর্ঘতর ইতিহাস আমাদের সম্মুখে পড়ে রয়েছে তার মধ্যে ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদ একটি অতি সামান্য ঘটনা মাত্র। সাম্রাজ্যবাদের শোষণ থেকে মুক্ত হলেই যে মানুষ স্বাধীন হয় তা নয়। চারিদিকে চাইলেই এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মিলবে। স্বরাষ্ট্রশাসিত দেশে আমাদের চেয়ে বেশী নাগরিক স্বাধীনতা হয়ত আছে, কিন্তু মোটের ওপর সেটা মাত্রার পার্থক্য। গুণগতভাবে দেখলে একজন সাধারণ ইংরাজ আর একজন সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে স্বাধীনতার তারতম্য খুব বেশী নয়। ইংরাজকেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকা সংগ্রহ করতে হয়, ভারতবাসীকেও তাই। ইংরাজেরও জীবিকা অর্জ্জনের জন্য সমাজনিয়ন্ত্রিত বাঁধা পথে চলতে হয়, পথের ভীড়ে অনেক সময় থেমে থাকতে হয়, বেকার বলে রাজদ্বারে ভিক্ষা চাইতে হয়। হিটলারের সঙ্গে যখন ইংরাজ সরকার মিতালি করে, এই ইংরাজ যদি তখন বুঝতে পারেও যে সে মিতালি টিকবে না, পরিণামে যুদ্ধ বাধবেই, তাহলেও তার কিছু করার নেই, এবং অবশেষে একদিন যখন যুদ্ধ বেধেই যায় তখনও তার কিছু করার থাকে না অবশ্য যুদ্ধে যাওয়া ছাড়া। যেতে না চাইলে তাকেও ঠেলে যেতে হয়। তারই মত জার্ম্মানির একজন মজুরকে সটান গুলী করে মারতে তার ইচ্ছা হওয়ার কোন কারণ নেই, তবু তাকে মারতে হয়, এবং ঠিক সময়মত মারতে না পারলে মরতে হয়। যুদ্ধ শেষে লুঠের ভাগ তার অদৃষ্টে জোটে না। বাড়ী ফিরে এসে তাকে করতে হয় হাঙ্গার মার্চ্চ। মজুরির হার বাড়াবার জন্য ধর্ম্মঘট করলে তার স্ত্রী-পুত্র মরে না খেয়ে এবং সে মরে গুলী খেয়ে। বাণিজ্য মন্দার দিনে মালিকদের মুনফার হার বজায় রাখতে তার মজুরির অংশ কাটা যায়। প্রতিশোধ নেবার জন্য পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনের সময় অন্য দলের লোককে ভোট দিতে পারে। সেই দল মন্ত্রী হয়ে পূর্ব্বের মন্ত্রীরা যা-যা করেছিল, ঠিক তাই করে চলে। এবং সেই মজুর আগেও যেমন অসহায়ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখেছে, এবারেও তাই দেখে। রাষ্ট্র হচ্ছে যন্ত্র। পরিচালক বদলালে যন্ত্রের গুণ বদলায় না। ওস্তাদ পাইলট এসে মোটর গাড়ী চালাতে বসলেই মোটর যে অমনি এরোপ্লেনের মত উড়ে চলবে তা নয়, সে তার বাঁধা নিয়মে রাস্তা দিয়েই চলবে। খানায় পড়ে আটখানাও হয়ে যেতে পারে—সে সম্ভাবনাটাকে না হয় বাদই দেওয়া গেল।

তর্ক উঠতে পারে যে এ সব সত্ত্বেও ইংলণ্ডের সাধারণ নাগরিকের সঙ্গে ভারতের সাধারণ নাগরিকের তফাৎ আছেই। ইংরাজের আয় বেশী, দারিদ্র্যের জ্বালা তার কম। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রামে ভারতবাসীর চেয়ে অনেকখানি জয়ী হয়েছে। এবং ঐ জয়ের মূলে আছে স্বাধীন রাষ্ট্র।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে ইংরাজের আয় বেশী আমাদের চেয়ে। সারা পৃথিবী থেকে সম্পদ শোষণ করে

আসছে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদীরা। তাদের জীবনযাত্রার মান কাজে কাজেই উঁচু। এবং তার সঙ্গে তাল বজায় রাখতে চাষী মজুরকেও তাদের অনেকখানি ওঠাতে হয়েছে। ভারতবর্ষে যেখানে মজুরি এক টাকা, ইংলণ্ডে সেক্ষেত্রে পাঁচ টাকা। কিন্তু মজুরির এই অনুপাত দারিদ্র্যের অনুপাতের নির্দেশক নয়। যে এক টাকা রোজগার করে এবং এক টাকা খরচ করে সে যত দরিদ্র, যে পাঁচ টাকা রোজগার করে পাঁচ টাকাই খরচ করে, সেও ঠিক তেমনি দরিদ্র। তফাৎ যেটা থাকছে সেটা জীবনযাত্রার মানে। এক টাকায় ভোগের পরিমাণ যা হয়, পাঁচ টাকায় তার পাঁচগুণ হবে, এটা সোজা হিসাব। —অর্থাৎ স্বাধীন রাষ্ট্র থাকাতে ইংরাজ নাগরিকের ভোগের প্রাচুর্য্য বেড়েছে। জীবনের লক্ষ্য যদি হয় ভোগ, তা হলে জানতে হবে রাজনৈতিক কর্ত্তাদের লক্ষ্যও হওয়া উচিত স্বরাষ্ট্র।—প্রশ্ন হচ্ছে, জীবন যদি ভোগ না হয় তবে এটা কি?

গান্ধীজী বলেছেন, "Life is an aspiration. Its mission is to strive after perfection, which is self-realisation."—এখন সব চেয়ে কঠিন প্রশ্ন হচ্ছে এই পূর্ণতা বা আত্মোপলব্ধি কি রকম? এই সব শব্দগুলি কৌটা, চন্দন, মালা-তিলকের সঙ্গে এমন জড়িয়ে গেছে এবং সেসমস্ত জিনিষগুলি সম্বন্ধে আমাদের মনে এমন একটা বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়েছে যে এ সম্বন্ধে স্নিগ্ধ মনে কোন আলোচনা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। কিন্তু একটু খোলামন নিয়ে দেখতে চেষ্টা করলে দেখা যাবে যে বিষয়টা শেষ পর্য্যন্ত হয়ত খুব মারাত্মক রকমের কঠিন বা অসম্ভব রকমের হাঙ্গামের কিছু নয়।

আপাততঃ মনে হ'তে পারে পূর্ণতার কোন নির্বিশেষ রূপ নেই। এটা আপেক্ষিক ব্যাপার। মানুষের মনের গঠন বিচিত্র রকমের। যে লোক আফিম করে এবং সিনেমা দেখে নিরুদ্বেগে দিন কাটাচ্ছে, মনে মনে সেও ত যথেষ্ট পূর্ণ। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মনের পরিণতির একটা ক্রম আছে। এদেশে এমন লোক নিশ্চয়ই এখনও কিছু কিছু রয়েছে যাদের বিশ্বাস তারা মহারাণীর রাজত্বে বাস করছে। এমন লোক, নিঃসন্দেহে, বহু আছে যাদের মতে ইংরাজ রাজত্বটা মোটের ওপর ভালই। পরিণতির দিক থেকে এই সব মানুষকে খুব উঁচুস্তরের আমরা বলি না। কর্ম্মনৈপুণ্য বর্ত্তমান সমাজে যত উঁচু আসন পেয়ে গেছে। কিন্তু বাবুই পাখীর বাসায় বা মৌচাকে যে নৈপুণ্য আছে তার কাছে বহু সভ্যমানুষের নৈপুণ্য হার মেনে যায়। দেহে, মনে প্রাণে কি কি ঐশ্বর্য্য থাকলে মানুষ পূর্ণ হয় তার চূড়ান্ত তালিকা না দিতে পারলেও তার একটা মোটামুটি খসড়া মনে ছকে নিয়ে আমরা সাধারণ জীবনে অবিরতই মানুষের বিচার করি চলি। হঠাৎ যদি কখনও কোন জীবন্ত মানুষ সেই খসড়ার সঙ্গে খানিকটা মিলে যায়, তবে তাকে আমরা আদর্শ মানুষ বলে মেনে নি। এই মানার মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক সত্যের স্বীকৃতি আছে, সেটা এই যে মানুষ একটা জীবন্ত পদার্থ, তার হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে। বৃদ্ধি আছে মানলেই সঙ্গে সঙ্গে এটাও মানতে হয় যে তার একটা পথ আছে, একটা দিক আছে। শালগাছ কখনো ঘুমড়োলতার মত ছড়িয়ে যাবে না, সে আকাশে মাথা তুলে সোজা উঠে যায়।—এটুকু পর্য্যন্ত প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় পাওয়া যাচ্ছে।

এই অভিজ্ঞতার পিছে যে তত্ত্ব রয়েছে, সেটা দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক, দুইই। কারণ বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সেই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রথমে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে আমরা এর নাম দিয়েছি 'চেতনার অভিযান'। পর্ব্বত কন্দর বন্দী নির্ঝরের প্রথম বন্ধন-মুক্তির পর যেমন ছুটে চলে তেমনি অচেতন বস্তুর পিঞ্জর থেকে মুক্ত হয়েছে সুপ্তোত্থিত চেতনার অভিযান অচেতন থেকে চেতনে, বস্তু থেকে প্রাণে, প্রাণ থেকে অবশেষে মনে। মনোপরিণতির এক স্তরে এসে প্রাপ্তি হয়েছে মানব। এর প্রত্যেকটি ধাপই পূর্ব্বেকার ধাপের চেয়ে বেশী আলোকময়, অর্থাৎ চৈতন্যময়। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছে যে মনই এ ইতিহাসের শেষ কথা নয়। পরিণতির আরো উর্দ্ধতর স্তর এর পরে রয়েছে। মনের উদ্ভাবিত বাষ্প বিদ্যুৎ সুতরাং মানুষের চূড়ান্ত কীর্ত্তি নয়। এখনও বহু পথ তাকে অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে মন তার আপন সৃষ্টির কারাগারে বারে বারে স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব স্বীকার করছে। তার অগ্রগতি অব্যাহত

বাপার জন্ত তাই বারে বারে সে কারাগার ভেঙে ফেলে বেরিয়ে যেতে হয়। তার কাজ হচ্ছে টুকরা করে, খণ্ড খণ্ড করে জানা। সমগ্রের উপলব্ধি নিয়ে সে কাজ করে না। সাময়িক কার্যসিদ্ধি যাতে হয় তাতেই তার আকর্ষণ জন্মে যায়। নিজের কীর্তি নিয়ে, সঞ্চয় নিয়ে সে আত্মহারা হয়ে থাকে, তার নিজের অতীত তার ভবিষ্যতের দিশা নিরূপণ করতে চায়; কর্মপ্রবাহের ওপর তার কোন আধিপত্য থাকে না, কর্মপ্রবাহই তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নিজের অনুভূতিকে, প্রয়োজনকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখার অভ্যাস হওয়াতে এই প্রবাহ থেকে মন সাধারণতঃ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারে না। উপলক্ষ্যের মধ্যে লক্ষ্যটা হারিয়ে যায়। প্রাসঙ্গিক উদাহরণ হচ্ছে স্বাধীনতার আদর্শ। মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে কত সাধক তপস্বী উঠেছেন। কিন্তু তাঁদের সাধনা বহুল পরিমাণে ধনতান্ত্রিক শ্রেণী কর্তৃত্বের মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে।

পারিপার্শ্বিক বস্তুশক্তির সঙ্গে মনের যে সংগ্রাম তার চেয়ে কঠিনতর সংগ্রাম হচ্ছে তার নিজের অর্জিত সংস্কারের সঙ্গে। অভ্যস্ত পথ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহজ পথ, ফ্যাসনে বাঁধা জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য অনায়াস লভ্য। বাঁধা লোহার পাটির ওপর দিয়ে ট্রেণ চলে তরতর করে। অজানা পাহাড় পথে যে মানুষ চলেছে তার পদে পদে বাধা। মনের অভিযানের পথটা হচ্ছে এই বন্ধুর পাহাড় পথ। প্রতি মুহূর্তে তাকে স্বাচ্ছন্দ্যকর পরিচিতের বন্ধন কেটে অনভ্যস্ত অপরিচিতের দিকে এগিয়ে চলতে হচ্ছে। এ চলার একদিকে আছে দুঃখ, আর এক দিকে মুক্তি। এই মুক্তির অন্য নাম হচ্ছে স্বরাজ। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "We may conceive also of an brganised state of consciousness in which mind liberates itself from subjection to material sensation and becoming dominant determines its own forms instead of being itself determined by the forms in which it finds itself as a result of life-evolution."—এই liberation বা মুক্তির স্পৃহা মানুষের জীবনের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করছে। বস্তু-শক্তিকে মানুষ নিয়ত কাজে ব্যবহার করছে। ব্যবহার করতে করতে এক একটা অভ্যাস জন্মে যাচ্ছে। কিন্তু বস্তুশক্তি বা অভ্যাস যখনই বন্ধনের কারণ হয়ে উঠছে তখনই তার বিরুদ্ধে মনের বিদ্রোহ। বস্তুর শক্তির ওপর, মানসিক সংস্কারের ওপর মানুষ প্রভুত্ব করবে, এই হচ্ছে সে বিদ্রোহের মর্মকথা। এই বিদ্রোহের পথে যে অভিযান সেই হচ্ছে গান্ধীজীর "striving for perfection."

কিন্তু গতিটা যখন আছে তখন তার একটা লক্ষ্যও নিশ্চয়ই আছে। অবিরাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানব-চৈতন্য চলেছে এটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তার একটা গন্তব্য থাকা চাই। স্থিতির ধারণা না থাকলে গতির ধারণাও থাকত না। অথবা ভাষান্তরে বলা যেতে পারে, গতিটা শুধু স্থিতিশীল কোন সত্তার অভিব্যক্তি মাত্র। গান্ধীজী বলছেন, "I do dimly perceive that whilst everything around me is ever-changing, ever-dying, there is underlying all that change a Living Power that is changeless, that holds all together, that creates, dissolves, and re-creates. That informing Power or Spirit is God. And since nothing else I see merely through the senses can or will persist, He alone is."—মানুষের চেতনা একটা পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে চলেছে। হয়ত এই প্রবাহটা চিরন্তন। মানুষ এই প্রবাহে অসহায়ের মত ভেসে যেতে পারে, যেমন আজকার দিনে যাচ্ছে। অথবা এই প্রবাহের বেগ থেকে নিজের চৈতন্যকে মুক্ত করে—এই চিরচঞ্চলের মধ্যে যে নিত্যকালের স্থির, অচঞ্চল সত্তা বিরাজ করছে তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সংযোগ স্থাপন করতে পারে। চেতনার উত্তরণের ইতিহাসের বর্তমান স্তরে এসে মানুষ এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টাকে তার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে চলেছে। এই সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে পরিবর্তনের প্রবাহ থেকে মনের ক্রমিক মুক্তির। বাইরের বস্তুজগৎ যার সঙ্গে মন নিত্য সম্পর্কে জড়িত, তাকে অস্বীকার করে এই মুক্তি অর্জন করা যাবে না। কারণ এই বস্তুজগৎ চিরন্তন। মানুষের সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে তার চেতনায় মনের অতীত এমন কোন নূতন ধরণের মনন বা অতি-মানস শক্তিকে জাগ্রত করা যে এই বিশ্বনাট্যের বিচিত্র কর্মপ্রবাহে অংশ নিতে পারবে এত

চৈতন্যকে যে শক্তি এক বৃহৎ সামঞ্জস্য বিধৃত করে রেখেছে তার সঙ্গে নিত্যযুক্ত থেকে। চেতনার মধ্যে স্থিতি ও গতির এই যুগপৎ উপলব্ধিই হচ্ছে পূর্ণ স্বরাজ। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, (Man "has to recover the consciousness of his inalienable freedom by recovering the consciousness of unity in the Lord, unity in himself, unity with all existence. This done, life and work can and should be accepted in their fullness, for the manifestation of the Lord in life and work is the law of our being and the object of our world-existence."

এই হচ্ছে গান্ধীজীর 'সত্য'। এই সত্য যিনি গ্রহণ করেছেন তিনি হচ্ছেন, প্রাচীন যোগশাস্ত্রের পরিভাষায়, কর্ম্মযোগী, এবং গান্ধীজীর রাজনৈতিক পরিভাষায় সত্যাগ্রহী।

৫

প্রশ্ন হতে পারে আমাদের জীবনে এ সত্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ কোথায়? উত্তরে গান্ধীজীর বক্তব্য হচ্ছে এ সত্যের প্রয়োগের ক্ষেত্র সমগ্র জীবন। কারণ এর দার্শনিক ভিত্তি একবার মেনে নিলে জীবনকে খণ্ডিত ভাবে দেখবার আর পথ রইল না। রাজনৈতিক জীবনের ব্যক্তিগত জীবনের স্বার্থে তখন আর কোন গোঁজামিল দিতে হবে না, ধর্ম্মসাধনার সঙ্গে সমাজ-সেবার কোন বিরোধ ঘটবে না। জীবনের কোন কিছুকেই বাদ দিতে, এড়িয়ে চলতে হবে না; কিন্তু সমস্ত বিচিত্র অভিব্যক্তিকেই একমুখী, one-pointed করতে হবে। বাক্য, ব্যবহার, কর্ম্ম, চিন্তা, মনন, অভীপ্সা—যত বিচিত্র জীবন-প্রকাশ সব তখন নানা ফুলে গাঁথা একটি মাত্র মালার মত গেঁথে উঠবে। অন্যায়, অসত্য, কপটতা জীবন থেকে ক্রমে মুছে যাবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অসত্যের সঙ্গে রফা করবার বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তিও থাকবে, ততক্ষণ জীবনের এই মালা গাঁথা সম্পূর্ণ হবে না। গান্ধীজী বার বার বলেছেন তিনি চান "total transformation of life",—অর্থাৎ জীবনের সামগ্রিক উন্নয়ন। এর অর্থ হচ্ছে ব্যক্তির জীবনের কাঠামো, তথা তার সভ্যতার রূপ আগাগোড়া পালটে যাবে। আজ মানুষের মনে অবলম্বনের পক্ষে বাধা—তার সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধেই তাই সত্যাগ্রহীর সংগ্রাম। তার লক্ষ্য সুতরাং শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নয়, জীবনের সামগ্রিক মুক্তি।

সুতরাং এখন সহজেই বোঝা যাবে গান্ধীজীর সঙ্গে আমাদের স্বাধীনতার বিরোধ কোথায়। সত্যের যে ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া গেছে তা যদি দার্শনিক সিদ্ধান্ত সমত হয়ে থাকে, তা হলে মানতেই হবে যে আমাদের স্বাধীনতার নেশা আমাদের দিক্‌ভ্রষ্ট করেছে। অর্থাৎ সমগ্র ভাবে মানব-চৈতন্য যে মহৎ ভবিতব্যতার দিকে এগিয়ে চলেছে, আমরা আমাদের সঙ্কীর্ণ কামনার ঘূর্ণাবর্ত্তে বাঁধা পড়ে সে পথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়েছি। খোলা মনে আমাদের সমস্ত কর্ম্মপ্রচেষ্টা লক্ষ্য করলে একথা পরিষ্কার হবে। আমাদের বলতে বিশেষ ভাবে ভারতবর্ষের কথা বলা হচ্ছে না। শিল্প বাণিজ্যভিত্তিক সভ্যতার মোহগ্রস্ত সমস্ত অঞ্চলের লোকের কথাই বলা হচ্ছে। এই সভ্যতায় পুষ্ট জীবন সম্বন্ধে সব চেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে এই যে এ জীবন অন্তর ভাবে disintegrated, বিচ্ছিন্ন। সমস্ত জীবনটাই যেন কতকগুলি এয়ার-টাইট কুঠরিতে ভাগ করা। আশ্চর্য্য প্রতিভার সঙ্গে বিস্ময়কর নির্ব্বুদ্ধিতা, মহৎ হৃদ্‌বৃত্তির সঙ্গে দারুণতম পাশবিকতা এ জীবনে পাশাপাশি ঠাঁই পায়। এই জীবনের মোট প্রকাশকে বলা যায় a bundle of nervous reactions. জীবনের সমগ্র উপলব্ধিই হচ্ছে বাইরের বস্তু জগতের সংস্পর্শে। তাই স্নায়বিক স্তরের থেকে গভীরতর কোন স্তরে চেতনার কোন স্পন্দন বড় একটা বোধ করা যায় না। আমাদের প্রসঙ্গ হচ্ছে রাজনীতি; সুতরাং রাজনীতির কথাই ধরা যাক। রাজনীতি জীবনের একটা বিশেষ আর্ট বলে আমরা ধরে নিয়েছি। এর সঙ্গে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের কোন যোগাযোগ না থাকলেও চলে। আমরা যা চাই নিরলঙ্কৃত সত্যের সঙ্গে তাকে প্রকাশ করতে আমরা ভরসা পাইনে। হাজারটা বক্তৃতামঞ্চ হইতে প্রতিদিন ঘোষণা করা হচ্ছে স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে বা স্বাধীনতা যারা হরণ

করেছে তাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলার রীতি আমাদের নয়। নিজেদের দোষ আমরা গোপন করি, প্রতিপক্ষের গুণের প্রশংসা করলে আমাদের রাজনৈতিক ক্ষতি হয়।—অর্থাৎ জীবনের জন্য পলিটি নয়, পলিটির জন্য জীবন।

এ রকম করতে আমরা কেন বাধ্য হই তা বোঝা কিছু শক্ত নয়। স্বরাজ আর স্বরাষ্ট্র সম্পূর্ণ পৃথক। স্বরাজ হচ্ছে অন্তরের একটা উপলব্ধি, এটা চেয়ে পাওয়া যায় না, কেড়ে নেওয়া যায় না, কিনে আনা যায় না। ফুল যেমন আপনা থেকে ফুটে ওঠে, স্বরাজের উপলব্ধিও তেমনি ফুটে ওঠে; বস্তু, ব্যবস্থা ও সংস্কারে—এ সবের বন্ধন-মুক্ত অন্তরাত্মার বিকাশ। কিন্তু স্ব-রাষ্ট্র হচ্ছে বাইরের একটা বস্তু। বিশেষ একটা প্রয়োজনে এর ব্যবহার—যেমন পথ চলতে মোটর গাড়ী। গাড়ীর চালকের পক্ষে তার সত্তার কোন সামগ্রিক উন্নয়ন দরকার করে না। গাড়ী চালাবার কায়দাটুকু শিখে নিলেই হোলো। রাজনৈতিক শিক্ষা হচ্ছে এই ধরণের খণ্ডিত শিক্ষা। এই শিক্ষার জোরে বর্ত্তমানে পারিপার্শ্বিকে টিকে থাকা চলে, কিন্তু কোন উন্নত সভ্যতা সৃষ্টি করা যায় না। ইংরাজকে নির্জ্জলা শয়তান বলে প্রচার না করলে যে দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তেজনা সৃষ্টি করা যায় না, সে দেশ স্বাধীনতার অধিকারি নয়। আদম সুমারির সময় বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা মিথ্যা করে না দেখালে যাদের মতে হিন্দুর সংস্কৃতি বিপন্ন হয় তাদের নিজের সংস্কৃতি মানব-সংস্কৃতির পরিপন্থী। জিন্না সাহেবকে সাদা চেক লিখে দেওয়ার প্রস্তাব করাতে যাঁরা গান্ধীজীর সমালোচনা করার স্পর্দ্ধা রাখেন তাদের স্পর্দ্ধা যত উত্তুঙ্গ, মনুষ্যত্ব ততখানি নয়। এই সব সংস্কৃতির সৈনিকেরা পৃথিবীতে যুগে যুগে এসেছে আবার চলে গেছে, ইতিহাসের বিশাল প্রান্তর পথে তাদের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু কোন এক বিস্মৃত অতীতে যারা বলেছিল 'আত্মন্ সর্ব্বতঃ স্বাহা', যারা প্রার্থনা করেছিল, 'আত্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যাতু,—তারা কে ছিল, কবে ছিল, কোথায় ছিল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার সন্ধান করার প্রয়োজনও হয় না, কারণ সে বাণীর ঝঙ্কার আজো নিখিল-মানবের হৃদয়তন্ত্রীতে নবীন অভীপ্সার রাগিণী সৃষ্টি করছে। যে সংগ্রাম পূর্ণ-সত্যের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে চালানো যায় না, তা বিশ্ব-মানবের জীবন সত্যকে বিকৃত করে, ব্যর্থ করে। সুতরাং খণ্ডভাবেও কোন কল্যাণ তার দ্বারা হবার সম্ভাবনা থাকে না।

এ মনোভাবের বিরুদ্ধে একটা প্রচলিত আপত্তি এই যে ও কথাগুলা ভাল বটে, কিন্তু প্র্যাকটিকেল নয়। আজ আমাদের নিছক বেঁচে থাকবার জন্যই স্বাধীনতা প্রয়োজন। যে ভাবেই হোক আগে স্বাধীনতা পেয়ে রাষ্ট্র ত গঠন করা যাক্। উন্নততর সংস্কৃতির কথা তারপর ধীরে সুস্থে ভাবা যাবে। দীর্ঘ যুগের নিষ্পেষনের ফলে আজকার মানুষের যা অবস্থা, এত বড় বড় কথা তারা শুনবে কেন? সে শক্তি বা কোথায়? এর উত্তরে গান্ধীজী বিনা দ্বিধায় বলছেন, "The ideal must not be lowered because of our weakness or imperfections." কিন্তু এর উত্তরটা আর এক ভাবেও দেওয়া যায়। স্বরাষ্ট্র স্থাপিত হলেই যে বাঁচার পথ সুগম হবেই এর নিশ্চয়তা নেই। জাপান বা জর্ম্মানি তার প্রমাণ। আজকার দিনে আর কোন জাতির খণ্ডিত ভাবে ঘরকরণা করবার উপায় নেই। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক্ তার ভাগ্য বিশ্বমানবের অদৃষ্টের সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা। তা যদি হয় তা হলে পৃথক ভাবে জাতীয় স্বার্থের চিন্তা না করে সমগ্রভাবে বিশ্বসংস্কৃতিকে উন্নততর স্তরে নিয়ে যাওয়ার সাধনায় আত্মনিয়োগ করলে ক্ষতি কি? দ্বিতীয়তঃ সামগ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনার মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে, তবে স্বীকার করতে হবে আজ একটা অংশের, কাল আর একটা অংশের উন্নতি—এমন ভাবে উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে না। মানুষ যখন বাড়ে, তার দেহ, প্রাণ, মন সব এক সঙ্গে একই তালে বাড়তে থাকে। তৃতীয়তঃ যদি ধরে নেওয়া যায় যে স্বরাজের সাধনা এখনই করতে গেলে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিপন্ন হবেই, তাতেই বা কি এসে যায়? বিশ্বের যা মূল সত্য তার চেয়ে আমাদের এই কটা মানুষের জীবনের মূল্য বেশী হতে পারে না। এত বড় বিশাল বিশ্বে ভারতবর্ষ এতই অকিঞ্চিৎকর যে তার নিঃশেষ বিলুপ্তিতেও বিশ্ববিবর্ত্তনের ছন্দে তাল কাটবে না।

কিন্তু আসল কথা এর কোনটাই নয়। গান্ধীজীর বিরুদ্ধে আমাদের প্রচলিত আপত্তির অনেকগুলিই শুধু মৌখিক মাত্র। আমাদের আসল আপত্তি যা সেটাকে খোলাখুলি

প্রকাশ করতে আমরা চাই নে। কিন্তু সেটা ভেঙেচুরে বলতে সম্প্রতঃ এই বলতে হয় যে যে শক্তির মন্ত্র নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলন একদিন সুরু হয়েছিল, সে মন্ত্র আমরা হারিয়ে ফেলেছি। পশ্চিমের রাষ্ট্রতন্ত্রের মোহ আমাদের এই বিস্মৃতি এনে দিয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করেছি যে রাষ্ট্রের একটি স্তম্ভ হচ্ছে অর্থনীতি, আর একটি হচ্ছে মানুষের মন। অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার একটা সীমা আছে। সে প্রয়োজনের গণ্ডী ছাড়িয়ে গেলে অর্থ আর নিছক প্রয়োজনের বস্তু থাকে না। প্রয়োজন এখন প্রভাবে রূপান্তরিত হয়। আধুনিক রাষ্ট্রের একটা বড় দিক হচ্ছে এই যে এ মানুষের শক্তির নেশা বহুল পরিমাণে চরিতার্থ করে। বস্তুতঃ বর্তমান কালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে শক্তির প্রতিযোগিতা দেখা যায় তার মূলে বাণিজ্যের প্রয়োজন যতখানি, শক্তির মত্ততা তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ব্যক্তির জীবনেই হোক্ আর সমাজের জীবনেই হোক শক্তির নেশা মানুষকে অনেক ক্ষেত্রেই বিপথে নিয়ে যায়। শক্তিলাভের জন্য মানুষ অনেক স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে, অনেক স্বার্থে আঘাত দিতে পারে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রবাদীদের একটা বড় অংশ যে শক্তির পূজারী হিসাবেই স্বাধীনতার সৈনিক হয়েছেন এতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষ ভাবে এর সত্যতা প্রমাণ হয় নির্বাচনের সময়।

এই কারণেও এই সব লোকের সঙ্গে গান্ধীজীর আদৌ মিল হচ্ছে না। কারণ জাতির জীবনে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার যেমন প্রয়োজন আছে, ব্যক্তির জীবনে শক্তিরও প্রয়োজন আছে। গান্ধীজী এর কোন প্রয়োজনকেই অস্বীকার করছেন না। কিন্তু কোনটাকেই একান্তভাবেও তিনি বোধ করছেন না। যে মানুষ শুধু শক্তির নেশায় বিভোর তার কোন স্থান তাঁর কাছে নেই। কারণ সামগ্রিক উন্নয়নের সাধনা শক্তি বা সম্পদের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু নিছক শক্তির বা সম্পদের সাধনা জীবনের সামগ্রিকতাকে আঘাত করে। ব্যক্তিগত Ego বা অহমিকার তৃপ্তির জন্য যে শক্তির অর্জনা সেটা মানুষের বিবর্তনের ঐতিহাসিক ধারাকে বিপথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। সত্যের সঙ্গে পূর্ণযোগের দ্বারাই শুধু সে পাওয়া সার্থক হতে পারে। কিন্তু যে শক্তি বা সম্পদের পূজারী সে পূর্ণসত্যকে জীবনে গ্রহণ করছে না। এই কারণে গান্ধীজীর কাছে স্ব-রাষ্ট্রের চেয়ে স্বরাজ বড়। বস্তুতঃ তার পরিকল্পিত সত্যতার পূর্ণ বিকাশের দিনে রাষ্ট্রের প্রয়োজনই হবে না। রাষ্ট্রশক্তি ক্রমে ক্রমে উঠে যাবে। কারণ যে মানুষ বিশ্ব-বিবর্তনের মূল ছন্দের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিয়েছে, যে তার নিজের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গতি খুঁজে পেয়েছে, তাকে শাসন করতে বা পরিচালনা করতে বাইরের কোন শক্তির প্রয়োজন হবে না। এই দিক থেকে বলা যায় গান্ধীজী নৈরাষ্ট্রবাদী।

এবং এই কারণেই গান্ধীজী বলতে পারেন যে, যে রাষ্ট্রিক প্রচেষ্টার মূলে আছে শুধু সম্পদ বা শক্তির লিপ্সা, সে রাষ্ট্রের চেয়ে সত্য অনেক বড়।

রাহুমুক্ত

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

শীতের রাত। হিম পড়ছে বাইরে। ঘরের ভেতর তিনটি লণ্ঠন জেলে আইতার বসে আছে। বাঁশের মাচাঙের উপর প্রশস্ত বিছানা। সেখানে আইতারের বউ ছায়ার মত নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে।

হঠাৎ আর্তনাদ করে আইতারের বউ নড়ে উঠলো। যেনো তীক্ষ্ণ চীৎকার করে মেলগাড়ী স্টেশন পেরিয়ে গেলো। তারপর সামান্য কান্না। কান্নার সুর বেয়ালের কিনারে মিইয়ে গেলো। আইতারের দৃষ্টি এল কেমন যেন কঠিন হয়ে।

লণ্ঠনের পীতাভ আলোকের দিকে চেয়ে চেয়ে আইতার ভাবতে লাগলো, ইন্দু আজ বাড়াবাড়ি সুরু করেছে। সাধারণত সে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে চীৎকার দেয়। কিন্তু আজ সন্ধ্যা থেকেই সে শুয়ে আছে, আর চীৎকার দিচ্ছে।

এই অষ্টম মাস, আইতারের মনে হলো, কী জানি ইন্দু যদি আজ হঠাৎ সন্তান প্রসব করে। আইতারের স্নায়ু জ্বলতে লাগলো। সর্বনাশ, ইন্দু তা' হলে সমস্ত সংসারকে ছিন্ন করে কুৎসিত সন্তান প্রসব করবে। আইতার কোন মতেই চোখ খুলতে পারবে না, চাইবে না, কাণ বন্ধ করে রাখবে, পাড়াপড়শির কলরব শুনবে না।

কেন যে সেই রাত্রে মশাল জেলে আইতার পথ চলেছিল। জ্যৈষ্ঠের প্রথম দিক। পথে ছিল পাকের গন্ধ। মাঝখানে, মাঝখানে একপাতা জল। ঘুরঘুটি অন্ধকার। পথ চলছে পশ্চিম দিকে। পেছনে বিষেণপুর প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি জিপ-কার চলাচল করেছে বলে পথ কাদায় মাখা। মাঝে মাঝে এক ঝাঁক মোনাকী পথের বাঁকে পাওয়া যায়। দু'ধারে ঘন বাঁশ বন। আইতার পরবর্তী গ্রামের উদ্দেশ্যে পা চালাচ্ছিল। এ দিকটা তার খুব অপরিচিত নয়।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো। পথের মাঝখানে একটি লাশ যেন পড়ে রয়েছে। আইতার সভয়ে চীৎকার দিল, কোন জায়? তার গলার আওয়াজ ঘন ঘন করে উঠলো মশালের শিখা সহসা কেঁপে গেল কয়েকবার।

লাশ কোন জবাব দিল না।

আইতার সাহসে এগিয়ে এসে মশাল নিচু করলে। আশ্চর্য সুন্দর একটি কচি মণিপুরী মেয়ের মুখ। বয়েস ষোলোর বেশী হবে না। কোমর থেকে নিম্নাংগ রক্তমাখা। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। হলদে জমির উপর কালো ডোরার কাপড় দিয়ে বুক পর্যন্ত ঢাকা। অনেক রক্ত মাটিতে আশে পাশে। মুখে ফেনা জমে আছে।

আইতার জাতিতে খাসিয়া, কিন্তু ছোটো থেকে মণিপুর অঞ্চলে চরে খাচ্ছে বলে এদেশের ভাষা ও প্রথা জানে। তাই মশালটা মাটিতে পুঁতে আস্তে আস্তে মেয়েটির শরীর নাড়া দিয়ে ডাকলে, লাইছাবি, লাইছাবি, অ-লাইছাবি।

মেয়েটি জবাব দিলে না। আইতার মশালের একফালি আলোয় দেখলে কিনারেই খানিকটা জল জমে আছে। তাড়াতাড়ি কিছুটা জল এনে মেয়েটির মাথায় কয়েক অঞ্জলি দিতেই মেয়েটি চোখ খুললে। আইতার একান্ত উৎসুক হয়ে মেয়েটির মাথা তুলে ধরলো।

পর পর অনেক জিজ্ঞাসাই করলো আইতার। কিন্তু মেয়েটি জিহ্বা আর খুলল না। মেয়েটি কি তা হলে বোবা?

আইতারের বয়স তিরিশ পেরোয়নি। জোয়ান ছেলে। কি জানি কেমন যেন ভালো লাগলো এই মেয়েটিকে। পাতলা ছিপছিপে-মেয়েটি। বামকাণে এখনও বুঝি চাপা-ফুলের বোঁটা লেগে রয়েছে। মেয়েটির চুলে বেণী নেই, কাজেই মেয়েটি কুমারী। আইতারের মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো। কর্তব্য-জ্ঞান আইতারের বকতে লাগলো। পরবর্তী ঘোড়াডুবুর গ্রামে মেয়েটির স্বজাতি আছে, অতএব সে গ্রামে কোনমতেই আইতার উঠবে না। সে সোজা জিরিঘাট চলে যাবে, কাছাড় জেলার এলাকায়।

ঘন্টাখানেক মেয়েটিকে ঘাড়ে করে নিয়ে আসছিল আইতার। কিন্তু মেয়েটি যেন ভারী হয়ে উঠেছে। আর ঘাড়ে থাকতে চায় না বলে মাটিতে ধপাস করে নেমে পড়লো।

কিন্তু আইভারি ভোলেনি
সাগরে ডুবতে লাগলো।

পাহাড়ের নিচে ছিপী নদী যেখানে দু'ধারা গেছে, ঘন জঙ্গল বনের নিচে সেখানে আইভারের ঘর। ক্রমাগত তিনদিন আর চৌদ্দ ঘণ্টায় তারা মণিপুর রাজ্য ছাড়লো। ছিপী নদীর নীল জলে পা ধুয়ে ঘরে ফেরার সময় আইভার জিজ্ঞেস করল, এবার বলো তোমার নাম।

মেয়েটি মাথা নিচু করে জবাব দিলে, ইন্দুপ্রভা।

আইভার কী খুশিই না হলো হঠাৎ জবাব পেয়ে। ফের জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছিল তোমার?

মেয়েটির চোখ মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল। তবু মেয়েটি আইভারকে সব খুলে বলেছিল। বিষেণপুর থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরের এক গ্রামে মেয়েটির ঘর। বিকেলের দিকে সে সবুজ রাস্তার উপর দিয়ে তাদের স্কুল থেকে ফিরছিল। হঠাৎ দেখে মস্ত বড় মোটর গাড়ী সামনে। একটা কর্কশ শব্দে কাকুনি খেয়ে গাড়ীটা ওর সামনে থেমে পড়লো। ইন্দুপ্রভা আর চেঁচাতে পারল না। কালো কাফ্রীগুলি তাকে মুখ-চাপা দিয়ে গাড়ীতে তুলে নিল।

তারপর গাড়ী অনেক সময় ধরে দ্রুতগতিতে সন্ধ্যা অবধি চললো। ইন্দুপ্রভা কয়েকবারই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল যতবারই জ্ঞান হয়, ততবারই দেখে ছোট ছোট মেশিনগান-গুলি এধারে ওধারে সাজানো। তিন পা'ওলা মেশিনগান দেখতে শিশুর মত, কিন্তু লোহার কংকাল। একদিকে মেশিনগান, অন্যদিকে কাফ্রীগুলির ক্ষুধার্ত চোখ, আর পুরু ঠোঁট। দাঁতগুলি রাক্ষসের মত বলে সেদিকে ইন্দুপ্রভার চাইতে ভয় করে। যতবারই তার জ্ঞান হলো ততবারই দেখল তার সামনে মেশিনগান, কালো কংকাল।

ইন্দুপ্রভা চুপ করে গিয়েছিল। আইভারও চুপ হয়ে গেল। আইভারের মনে হলো, ইন্দুপ্রভা নতুন জন্ম পেয়েছে

ইন্দু বললে, আমি তোমার সংগেই রওনা দিলাম। জানি, আমাকে ঘরে নেবে না আমাদের পরিবার। ক্ষত্রিয় পরিবার কিনা, খুব গোঁড়া। তুমি আমাকে বিয়ে করবে ত'?

নিশ্চয়! ঘরের খুঁটি দুবার টেনে টেনে আইভার যেন সংকল্পের দৃঢ়তা পরীক্ষা করল।

হঠাৎ ইন্দুপ্রভা পুনরায় চীৎকার করে উঠলো। কী তীব্র আর্তনাদ। আইভার খাড়া হয়ে দাঁড়ালো। তবে কি আজই ইন্দুর সন্তান হবে? আইভার আবার বসে পড়লো। না, না, সে ইন্দুর সন্তান চায় না। যদি সন্তান আজ জন্ম নেয়, তবে আজই তাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে হবে। দুর্ভাগা আইভারের ইন্দু ত আইভারের সন্তানের মা হবে না।

সমস্ত বিষণ্ণতা আর রুক্ষতা ভেদ করে আইভারের চোখে হঠাৎ যেন খুশির চমক লাগলো যদি নবজাত শিশুটি আইভারের আকৃতি পায়। কিন্তু আইভারের মন আবার রুক্ষ হয়ে গেলো। তাত' সম্ভব নয়।

গর্ভের দ্বিতীয় মাস থেকে রাতের পর রাত ইন্দুপ্রভা ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠেছে। আইভার কতোবারই না গত কয়েকমাস রাত্রে লণ্ঠন জ্বেলেছে। আইভার একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে, কি দেখলে ইন্দু?

ইন্দু জবাব দিয়েছে, আমি মরি না কেন? দেখলাম, আমার পেটের শিশুর গায়ে মাংস নেই, কংকাল, লোহার মত। আরো দেখলাম, আমার শিশুর চেহারা কালো কাফ্রীর মতো।

আইভার যন্ত্রণায় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছে। ইন্দুর মুখে সে এসব শুনতে চায় না। সে শুনতে চায়, পেটের শিশু আইভারের মত হয়েছে। তাহলে কি ইন্দু কাফ্রীর বীজাণুকেই এতকাল গর্ভে রক্ষা করেছে, রূপ দিচ্ছে। আইভার অস্থির হয়ে উঠে। ইন্দু তার সন্তানের মা তবে নয়। আইভার সেইজন্যেই ইন্দুর সন্তান চায় না।

আইভারের হঠাৎ চমক ভাঙলো। ইন্দুপ্রভা যেন তাকে আস্তে আস্তে ডাকছে। একটি লণ্ঠন নিয়ে আইভার উঠে এলো। শয্যার উপর চিত্রার্পিতের মতন ইন্দুপ্রভা। আইভার বুকে জিগ্‌গেস করলে, ডেকেছো?

—হাঁ, তুমি ঘুমোবে না আজ? তোমার খুব-কষ্ট হচ্ছে, না? ইন্দুপ্রভা বললে, আজ আমার চীৎকার আমি নিজেই শুনতে পাচ্ছি। কী সাংঘাতিক কষ্টই না হচ্ছে। কী জানি আজই শিশু জন্মায়। জন্মালেই তাকে মেরে ফেলো। কাফ্রীর শিশুকে কোনমতেই বাঁচতে দিও না।

ইন্দুপ্রভা নীরব হলো। আইভারও নীরবে চিন্তা করতে

লাগলো, পৃথিবী এই যুদ্ধে কেন এত ছোট হয়েছিল? কেন তারা এসেছিল আফ্রিকার অরণ্য থেকে? কাফ্রীরা কেন ইন্দুপ্রভার সর্বনাশ করলো।

ইন্দুপ্রভা ভাবছিল, যদি কোনো কাফ্রী আমাকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করত, তা হলে মা হয়ে শিশুকে মারবার কথা বলতে হত না।

আইভার ভাবছিল, যদি কাফ্রী শিশু জন্মায়, তা হলে ইন্দুপ্রভাকে ছেড়ে চলে গেলে কেমন হয়। শিলাএ ফিরে গিয়ে মৌলাই বস্তির কোনো একটি গ্রাম্য মেয়ে বিয়ে করলেই ইন্দুকে ভুলতে পারা যাবে।

ইন্দুপ্রভা ভাবছিল, যদি কাফ্রী শিশু জন্মায়, তবে আইভার কি আর আমাকে ভালোবাসবে তেমন? যদি আইভার গভীর দুঃখে আমাকে ছেড়ে চলে যায়, আর যাবার সময় কাফ্রী শিশুকে মেরে না যায়, তাহলে শিশুটিকে নিয়ে আমি কেমন করে সামলাবো? ইন্দুপ্রভা বিদিশা হয়।

বাইরে হিম পড়ছিল। ঘরে তিনটি লণ্ঠনই জ্বলছিল। আইভার লণ্ঠনের আলোকে ঘরকে উজ্জ্বল রেখেছে। কোনমতেই যেনো কংকাল আসবার ব্যবস্থা পায় না। ঘরে তিনটি লণ্ঠনই জ্বললো সারারাত। আইভার ঘুমিয়ে পড়েছিল ইন্দুপ্রভার গলা জড়িয়ে।

পরদিন ভোর। কুপতহু ইন্দুপ্রভা আইভারের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বললে, আজ আর বাইরে বেশী দূর যেয়োনা। আমার সমস্ত শরীর কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠছে বারবার। যদি আজই কিছু হয়ে যায়।

আচ্ছা, বলে আইভার বড়শি হাতে নিয়ে বাইরে এলো। জিরী নদীর উজানে মস্ত বড় এক বাঁকে অনেক মাছ হিলহিল করে বাঁশের ছায়ায়। জলে বড়শি ফেলে আইভার স্তূপের মত বসে রইল।

আইভার পরিমাপ করতে লাগলো তার ভালোবাসার। ইন্দুপ্রভাকে সে প্রথম খুবই ভালোবাসত। এখন আর ভালোবাসেনা। ইন্দুপ্রভা কাফ্রী শিশুকে নিয়ে গর্ভিনী না হলে ভালোবাসা অবিকলই সমান থাকত। কিন্তু গর্ভিনী হয়েছে বলেই না এখন এই যুদ্ধের মধ্যে একে ত্যাগ করে চলে যাওয়া যায় না। মনুষ্যত্ব বলে দুনিয়াতে কিছু আছে তো।

আইভারের চিন্তার স্রোত বাঁক ঘুরলো। আচ্ছা, ইন্দুপ্রভাকে ঔষধ খাইয়ে কাফ্রী শিশু আর ইন্দুকে একসংগে মারা যায় কি না। তা হলেই ত' ল্যাঠা চুকে। কিন্তু আইভার আবার মাথা নাড়তে লাগলো—এটা হলো ব্রিটিশ রাজত্ব, মানুষ খুন করলে জলের তলে গিয়েও নিস্তার নেই।

আইভার যেন চিন্তার অথই জলে পড়েছে। সে নিজেই হঠাৎ যেন লজ্জিত বোধ করল নিজেকে নিয়ে। পাহাড়ী জাতির ছেলে বলে খুনের চিন্তা সে করতে পারছে, কিন্তু কী দোষ ইন্দুপ্রভার। সে বেচারী তো নির্দোষ। কী সুকোমল মুখখানি তার। কালো কাফ্রীর ছেলেকে সে ত' ইচ্ছা করে জন্ম দিচ্ছে না।

বড়শি গুটিয়ে আইভার উঠলো। আজ আর তার বড়শিতে মাছ লাগবে না। ঘরে ফিরে এসে দেখলে, ইন্দুপ্রভা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। আইভারের কেমন যেন স্নেহ বোধ হলো। কিনারে বসে পড়ে বললে, দাই নিয়ে আসবো?

ইন্দুপ্রভা বললে, না এখনো বোধ হয় সময় হয়নি। আইভার যেন রেহাই পেলো। ধাত্রী এসে একটি শিশুর জন্মের মধ্যস্থ সাক্ষী হয়ে যেত—সে-বিষম আপাতত কাটলো।

যন্ত্রণা বাড়ে কমে। দিন গেল উৎকণ্ঠার মধ্যে। আইভার আর স্বস্তি পাচ্ছে না। এখনই যদি হয়ে যায়। একটি কালো শিশু যদি মাটীর উপর পড়ে কাফ্রীরক্তের চরম ঘোষণা করে, তা হলে আইভার কি করতে পারে? প্রসবকে কি কোনমতেই ঠেকানো যায় না?

ইন্দুপ্রভার পাণ্ডুর মুখের উপর অপরিসীম বিষণ্ণতা। শিশুর চাইতে আইভারকে নিয়েই তার বিষম চিন্তা।

আজ রাত্রে আইভার আর তিনটি লণ্ঠন জ্বাললো না। একটি লণ্ঠন জ্বালিয়ে পীনশিখার আলোকে মৃদু করে রাখলো। আসুক শিশু অন্ধকারেই। বেশী আলোক শিশুর জন্মকে লজ্জা দেবে।

একটি বেতের মোড়ার উপর আইভার পাহারা দিতে দিতে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগে উঠলো ইন্দুপ্রভার ডাকে।

রাত তখন অনেক। ইন্দুপ্রভা ক্ষীণকণ্ঠে ডাকছিল আইভারকে। আইভার চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালো।

ইন্দুপ্রভা ক্ষীণকণ্ঠে বললে, লণ্ঠন নিয়ে এদিকে এসো। লণ্ঠন হাতে করে বাঁশের মাচাঙের কিনারে যাবার আগেই আইভার দেখল, বিছানায় অনেক রক্ত।

ইন্দুপ্রভা হতাশ হয়ে বললে, হয়ে গেছে। তোমাকে জাগাবার প্রবৃত্তিই আমার হয়নি। ইন্দুর স্বরে কান্নাকেতে পড়লো।

আইভার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালিয়ে দেখল, শাদা একটি মাংসপিণ্ড বিছানায় নড়ছে। না, চোখের ভুল হবার নয়। আইভার চীৎকার করে উঠলো, ইন্দু এ-শিশু যে আমার।

ইন্দুপ্রভা বিছানা থেকে উঠবার চেষ্টা করল। প্রচণ্ড উত্তেজনায় বলল, কই দেখি, দেখি।

ইন্দু দেখল কালো নয়, কংকাল নয়, একটি নধর, সার্থক, সুন্দর নবজাত শিশু।

নির্বাসিত বিহঙ্গ

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী

পূর্ব্বানুবৃত্তি

কর্ণেল চলে গেলেন। প্যাভলফ তাড়াতাড়ি ভেতরের প্রকোষ্ঠে এল। ম্যাডাম রসকোভা ততক্ষণে হোপের গা থেকে খুলে দিয়েছে পরণের আর-আর পোষাকেগুলো। এবং ঠাণ্ডা জলে মুছিয়ে দিয়েছে কপাল ও চোখের পাতা। বলল: দুচার মিনিটের মধ্যে উনি সুস্থ হবেন। আপনি বরং—একটু চা তৈরী করে আনুন। অন্য কিছু করার আগে একটু গরম চায়েতেই তার উপকার হবে।

প্যাভলফ বলল চা-টা আপনিই তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন, ম্যাডাম। আমি বরং এখানে একটু বসি।

ম্যাডাম রসকোভা সানন্দে প্যাভলফকে নিজের জায়গায় বসিয়ে দিয়ে তখনই চা তৈরি করার জন্য উঠে গেল।

হোপের তখন চেতনা ফিরে আসছে ধীরে ধীরে। শেষে চোখ খুলে চাইল। অদূরের উনুনের দপদপে আলোয় তার চোখের তারা জ্বলজ্বল করতে লাগল। প্যাভলফ কিছুক্ষণ শান্তভাবে তাকিয়ে রইল। তারপর হোপের চোখ তার চোখে পড়তেই সে মন স্থির করে নিল।

—সে কোথায়?—ফিস ফিস করে বলল হোপ।

—তুমি ব্যস্ত হয়োনা হোপ। সার্জ এখন বাড়ীর পথে। —পল কোমলকণ্ঠে বলল।

—বাড়ীর পথে? সার্জ বাড়ী যাচ্ছে, আর আমি এখানে? হায় অদৃষ্ট? হোপ এবার উঠে বসল এবং অবাক-বিস্ময়ে পলের মুখের দিকে তাকাল।

সার্জ বাড়ীর পথে? কি ভাবে? কেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না···

কথা বলতে হোপের ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠছিল।

—আমরা ভেবেচিন্তে তোমার ভালোর জন্য একটা ব্যবস্থা করেছিলাম,হোপ ইভানোভনা। টমস্কের কারা-গৃহে আমাদের দেখা হয়েছিল। সেখান থেকে যাতে তাড়াতাড়ি সে তোমার কাছে চলে যেতে পারে, এই মনে করে আমরা পরস্পরের নাম বদল করেছিলাম।

—নাম বদল করেছিলে?—হোপ অস্পষ্ট স্বরে বলল।

—হাঁ, হোপ, আমার নাম নিয়ে সে লঘু নির্বাসনে মিউনিস্কে চলে গেল আর আমি এলাম তার জায়গায়—এই কারা-প্রদেশে। কথা ছিল, সে এই বসন্তকালে সেখান থেকে পালিয়ে যথাসময়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হবে। কিন্তু এখন দেখছি, আমরা তিন জনেই বিপদের মুখোমুখি পড়ে গেলাম। আমাদের সবার জীবনই যেন নির্মম অদৃষ্টের হাতে ঝুলছে। এখানে কর্তারা সবাই আমাকে সার্জ পালমা বলেই জানে। এজন্য তোমাকেও একটা অসুবিধা মেনে নিতে হবে, নতুবা সার্জও বিপদে পড়বে।

—তোমাকে তারা সার্জ পালমা বলে জানে! সার্জ পালমা বলে জানে? হোপ বিড়বিড় করে বারবার বলতে লাগল। বলতে লাগল অবোধ শিশুর পাঠ মুখস্থ করার মতো। এর কোন অর্থই যেন সে খুঁজে পেল না।

—হাঁ, হোপ ইভানোভনা,কিন্তু তোমাকে খুব আস্তে কথা বলতে হবে। এখানে 'সার্জ পালমা' বলেই আমার পরিচয়। —পল খুব ধীরে স্পষ্টভাবে কথা কয়টি বলে গেল। —এবং যদি কোন রকমে তারা এই সত্য রহস্য টের পায়, তাহলে সার্জের সর্বনাশ হবে, তোমার এবং আমার সর্বনাশ হবে। বুঝতে পারছ কি বলছি আমি?

—না—না, আমি জানি না, বুঝতে পারছি না কিছু। দয়া করে আমাকে একটু ভাবতে দাও, পল···

—পল নয় 'সার্জ'—মুখে আঙুল দিয়ে পল ফিসফিস করে বলল। তুমি আমাকে সার্জ বলে ডাকবে। কথাটা তুমি মনে রাখতে চেষ্টা কর, হোপ ইভানোভনা।

এই সময়ে ম্যাডাম রসকোভা এক হাতে চায়ের কাপ আর এক হাতে আলো নিয়ে এল এবং মা যেমন পীড়িত শিশুর মনে আনন্দ দেবার চেষ্টা করেন, তেমনি সুমধুর সান্ত্বনার হিল্লোল তুলে হাসি-মুখে এসে দাঁড়াল বিছানার কাছে।

—হাঁ, এইতো দেখছি ভালো হয়ে উঠেছেন। এইটুকু খেয়ে ফেলুনতো এবার। তারপর উঠে এসে বসুন—ঐ উনুনের কাছে। ওখানে বসে একটু গরম হওয়া যাক। পাঁচ হাজার মাইল ঠাণ্ডা আর বরফের ঝাপটা আপনি

হাড়মাসে সহ্য করেছেন। এখনই আমাকে মেরি তারকীর কাছে দৌড়াতে হবে—আমি গিয়ে বলে এসেছি—

—না, না আপনি যাবেন না, ম্যাডাম। আমি অনুরোধ করছি···হোপ পাগলের মতো চেঁচিয়ে বলল।

—বাঃরে! তাহলে মেরিয়া আমাকে ক্ষমা করবে না। —ম্যাডাম রসকোভা হেসে বলল। আবার এসে দেখব তোমরা দুজনে দুজনকে আপনার মতো পেয়ে গেছ। তখন আবার আরাম করে বসে কথাবার্তা বলা যাবে।

ম্যাডাম রসকোভা ওভার কোট গায়ে চাপিয়ে মাথায় টুপি পরে বেরিয়ে পড়ল।

এবার পল শান্ত ভাবে বলল :—এসো হোপ ইভানোভনা, আগুনের কাছে গিয়ে বসা যাক। ম্যাডাম রসকোভা ঠিকই বলেছে, তোমার হাড়মাংস শীতে জমে গেছে।

—আমার অন্তর বরফ হয়ে গেছে, জমে গেছে আমার মস্তিষ্ক—এই তো বোধ হচ্ছে।—হোপ বলল এবং উনুনের পাশে তার জন্য পাতা আসনটায় ধপাস করে বসে পড়ল।

এবার ধীরে ধীরে হোপ সম্বিৎ ফিরে পেল—চিত্তবিক্ষোভের ফলে সে বিবেচনা-বোধ হারিয়ে ফেলেছিল, তখন সেভাবটা কেটে গিয়ে দেহের শিরা-উপশিরায় যেন রক্তের চলাচল পর্যন্ত অনুভব করল। এবং ছোট ছেলেদের ভুলে-যাওয়া পুরানো পাঠের মতো বলতে লাগল :

: এখানে সার্জ পালমা তুমি? এবং আমি—? হায় অদৃষ্ট, হা ভগবান! এখন আমার কী কর্তব্য?

নিজের এই কয়টি কথাই যেন মহাবোঝা হয়ে তার বুকে চেপে বসল এবং অস্থির ভাবে লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করল।

—তুমি আমায় বিশ্বাস কর, হোপ ইভানোভনা।—পল প্যাভলফ শান্তভাবে বলল এবং হোপের ঠাণ্ডা ছোট্ট হাত দুখানি ধরে ধীরে তাকে বসাল।

—তাই তো! হাঁ, কিন্তু···

—হোপ ইভানোভনা আবার বলি, ভাল করে শোন। যদি আমাকে বিশ্বাস কর, তাহলে সবদিক রক্ষা পাবে। এখানে সার্জ পালমা বলে আমার পরিচয় এবং তুমি···

—হাঁ, আমি, আমি কি?···

প্যাভলফ ইতস্তত: করল।

পরিষ্কার অনুভূতি দিয়ে পলের মনের কথা বুঝতে পারল হোপ।

—'মাত্র কিছু দিনের জন্য হোপ'—প্যাভলফ চঞ্চল ভাবে নিজ দেহটাকে একবার ঝাঁকুনি দিয়ে বলল : যতদিন না শুনতে পাই, সার্জ নিরাপদে পালিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে গেছে, ততদিন, মাত্র ততদিন তোমাকে আমার···আমার স্ত্রী-রূপে বাস করতে হবে। এ ছাড়া অন্য উপায় তো দেখছি নে।

'আমার স্ত্রী!'—কথাটা বলতে গিয়ে প্যাভলফের অন্তরে যেন ঝড়ের তাণ্ডব সুরু হল, শিরায় উপশিরায় তপ্ত রক্ত সঞ্চালিত হল মহাবেগে। হায়, তাই যদি হ'ত! তাহলে শূন্য কুটীর ভরে যেত স্বর্গের সুষমায়। ভগবানের কাছে কিছুই আর আমার কাম্য বলে থাকত না। কিন্তু এই একটি মাত্র কথা হোপের মনে অন্যভাবে সঞ্চালিত হয়ে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটাবার উপক্রম করল।

অস্পষ্ট ভাবে—স্ত্রী-রূ-পে-বাস-কর-তে হবে?—এইটুকু বলেই সে এক লাফে উঠে দাঁড়াল। তীব্র ঘৃণায় জ্বলে উঠল তার চোখ দুটি—সেই মহানুভবা নারী, জলন্ত যার বুদ্ধিবৃত্তি, কর্তব্যে যে আত্মসমর্পণ করেছে, সেই মহীয়সী আজ এমন দুর্বিপাকে পড়ে একান্ত বিমূঢ় হয়ে পড়ল।

ঐ একটি কথায় গূঢ়ার্থ সঞ্চারিত হল হোপের মনে!—এবং যদি তাই হয়, তাহলে প্যাভলফ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানেই তাকে বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। হোপের মুখের দিকে সে চোখ তুলে তাকাতে পারবে না পাছে তার মনের চাঞ্চল্য অন্যভাবে হোপ গ্রহণ করে। তাহলে প্যাভলফকে মৃত্যুর পথই বেছে নিতে হবে।

—আমাকে প্রতারণা করার জন্যেই বুঝি তোমার এই অপকৌশল! এই জন্যেই বুঝি! ছিঃ ছিঃ, পল প্যাভলফ, তোমাকে কি বলে ধিক্কার দিব বুঝি না! যে নারী তোমাকে মনে প্রাণে সারাজীবন ধরে বিশ্বাস করে এল, প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তাকে কবলিত করার এই দুর্বুদ্ধি তোমার!

তোমার এ তিরস্কার আমার অসহ্য, হোপ ইভানোভনা!—পল শান্তভাবে বলল। : এমন কু-ধারণা আমার মস্তিষ্কে কখনও ঢুকেনি। এমন কি তোমাকে এমন কথা

কখনও বলতে হবে এমন কল্পনাও আমার ছিল না। সে সময়ে তোমার দুরবস্থার কথাই আমাদের ভাবিয়ে তুলেছিল, হোপ। তাই ঐরকম বন্দোবস্তের আয়োজন করেছিলাম আমরা। কিন্তু ফল হল উল্টো। তুমিও যে এখানে চলে আসতে পার এ কথা আমরা ভাবতেও পারি নি।

—তাই বুঝি তোমাদের ঐ ব্যবস্থা করতে হল?—হোপ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল। : তোমরা ভেবেছিলে—আমি হাত গুটিয়ে বসে কেবল বিলাপ করেই দিন কাটাব, না? নারীর মন এই বুঝি তোমার ধারণা?

হোপের কণ্ঠস্বরে প্রকটিত হল তীব্র কটুক্তি।

—সত্যি ভাই···আমরা তোমার সুখের কথাই ভেবেছিলাম এবং সেজন্য আমি আমার জীবন পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। এবং ওপথে পা দিয়াছিলাম তোমারই মঙ্গল কামনায়।

—আমি এখনি ফিরে যাচ্ছি। হোপ বলল—এবং বিভ্রান্ত-ভাবে দরজার দিকে তাকাল। উল্টোনেরা—আগুন তখন নিভে গেছে। উত্তেজনায় হোপের বাহুযুগল কাঁপছিল। পল দুহাতে সেই কম্পিত বাহু চেপে ধরে বলল, তুমি শান্ত হও, হোপ ইভানোভনা, কথা শোন। একমাত্র তোমার আকাঙ্ক্ষিত কর্ত্তব্য যদি আমি না করতে পারি, তবে আমার বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই। কিন্তু এখন তা পারি না। এ সময়ে তোমার ফিরে যাওয়া অসম্ভব কথা। তোমরাই হলে এখানকার শেষ যাত্রী। কোন দল আর এখান থেকে পাঠানো হবে না। দক্ষিণের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। সার্জের ভবিষ্যৎ ভালোর কথা নাই বা বললাম, অন্ততঃ তোমার নিজের কথা ভেবেও আপাতত এখানে থাকা তোমার প্রয়োজন।

—তোমার স্ত্রী-রূপে?

হোপের কণ্ঠস্বর আবেগদীপ্তির উল্লাসে মত্তো তুলল।

—তা নয়, মাত্র স্ত্রীর অভিনয়। তোমার নিজের জন্যে এবং বাঁচবার হেতুতে নামে মাত্র স্ত্রী-রূপে। এবং আমার জন্যে। হোপ, পবিত্রতম বিশ্বাস যেখানে থাকে, স্বয়ং ভগবানও সেখানে এসে দাঁড়ান। আমাকে বিশ্বাস কর হোপ, এবং বিশ্বাস করার প্রয়োজন। এক সময়ে তুমি আমাকে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেছিলে। সে-সময়ে কোন আবেদন অনুরোধের বালাই ছিল না। এবং আমি—অন্তত অদৃষ্টের পীড়নে যাই ঘটে থাক—বদলে যাইনি।

হোপের হাতদুখানি সহসা দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠল ক্রোধের আতিশয্যে।

পল আবার শান্তভাবে বলল: আমি যে আসলে সার্জ পালমা নই—এই কথা এখানে যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাহলে সার্জ নিরাপদে দেশে গিয়ে পৌঁছলেও তার পরিত্রাণ নেই। তাহলে তার এত চেষ্টা সবই বিফল হবে।

—এবং তোমারও পরিত্রাণ নেই—এই তো?—হোপ ঘৃণামিশ্রিত সুরে তিক্তস্বরে বলল।

—না, তাই শুধু নয়। তোমার মানসম্ভ্রমের ভাবনাও আছে। এবং এখানে এই করেই তোমার মানসম্ভ্রম বাঁচিয়ে রাখতে পারব—এমন কি জঘন্য অঘটন থেকেও। কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে একাকী বাস করার মতো স্থান এই কারা-প্রদেশ নয়। আমাদের ঐ যে পাহারাধারী মানুষগুলো দেখছ, ওরা পৃথিবীর নোংরা আবর্জনা-বিশেষ। এবং দিনে কিংবা রাত্রিবেলায়—যে-কোন সময়ে আমাদের ঘিরে তাদের অবাধ যাতায়াতের অধিকারে আছে—তারা না করতে পারে এমন জঘন্য কর্ম কিছু নেই। আইনের অধিকার পেয়ে তারা স্বভাবতই উচ্ছৃঙ্খল। সে চোখে ভয়ঙ্কর দেখল। নিঃসহায় নিরাশ্রয় হোপ এবার স্তব্ধ হয়ে গেল।

সহসা কর্ণেল জালারীনের পাশবৃত্তি তার চোখের উপর ভেসে উঠল। নিঃসহায়, নিরাশ্রয়—শয়তান যেন বাহু বাড়িয়ে রয়েছে। হোপ অভিভূত হয়ে চেয়ারে বসে পড়ল জড় পাথরের মতো। দুহাতে মুখ ঢেকে সে হো-হো করে কেঁদে উঠল। সম্মুখে যেন নরকের ছবি। হোপ আশ্রয় চায়—চায় এমন আশ্রয় যেখানে বিশ্বাস আছে, করুণা আছে, যেখানে কলুষের লেশ মাত্র নেই। প্যাডলকের উপর তার শুভানুভূতি ফিরে এল। বলল, পল, তুমি আমায় করুণা দাও, ক্ষমা দাও। তুমি যা বলবে, আমি তাই করব—যদি শুনাবে তাই বিশ্বাস করব—

পল মুহূর্তে হোপের পায়ের কাছে বসে পড়ল। এবং তার হাত দুখানি ধরে শান্ত কণ্ঠে বলল: হোপ ইভানোভনা কথা শোন, আমাকে বিশ্বাস কর। তুমি আগে আমাকে

মনে প্রাণে-বিশ্বাস করতে—সেই রকম বিশ্বাস তোমার মনে আবার ফিরে আসুক। কেবল বিশ্বাস কর যে আমার দেহে শেষ রক্তবিন্দু সচল থাকতে তোমার কোন অসম্মান হবে না অপমান তোমায় কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

—বিশ্বাস করি—পল, বিশ্বাস করি। কিন্তু আগে কি ভেবে কি বলে ফেলেছি……তোমায়……

—যদি বিশ্বাস করতে পার তবে সবই ঠিক হয়ে যাবে। হোপ ইভানোভনা। সার্জ দেশে পৌঁছেই আমাকে জানাবে—জানাবে সে মুক্ত—স্বাধীন। তখন আমরা তার সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করব। সে-সময় পর্যন্ত এখানে তুমি নিরাপদে থাকবে—যদি তুমি—হাঁ যদি……

হাঁ, যদি সে এতদিন বিশ্বাসী স্ত্রীর মত পল প্যাভলফের কারা-কুটিরে বাস করতে পারে। প্যাভলফ তা জানে এবং হোপও জানে উভয়ের চালচলনে যদি স্বামীস্ত্রীর সঠিক অভিনয় বজায় রেখে চলতে পারে, তাহলেই তাদের সমস্ত কল্পনা বস্তুত কার্যে সফল হবে।

হোপ খানিকক্ষণ নীরবে মাথা গুঁজে বসে রইল। ভ্রূকুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে, চোখের আনত দৃষ্টি উহুনের উপর। তারপর সহসা তার মন অভিমানে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করল: কিন্তু এই—এই যে মাডাম রসকোভা বলে মহিলাটি তোমার সঙ্গে বাস করেন—ইনি কে?

এই অভাবিত প্রশ্নে পল প্যাভলফ স্ত্রীপ্রকৃতির বুদ্ধিবিভ্রম ও দুর্বলতায় সচকিত হয়ে উঠল। তার চোখে নারী মাত্রই ছিল শুভ্রতা-স্নেহের আঁটা পুঁথির মতো। যে পবিত্র পুঁথির পাতায় একদিন সে প্রেমের আভাস পেয়েছিল, তা শুধু কল্পনাতেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। তাকে আবার কঠোর পাঠশালায় দীক্ষা নিতে হয়েছে।

প্যাভলফ গম্ভীর স্বরে বলল: আন্না ভ্যাসিলিয়েভনা ভাঃ ক্লেভর রসকোফ-এর পত্নী। তাকে তো আমরা সবাই চিনি। যখন আমরা ওডেসায় ছিলাম, সে সময়ে তারা স্বামীস্ত্রী দুজনেই সেন্ট পিটার্সবার্গে গরীবদুঃখীদের মধ্যে কাজ করতেন। তাই প্রভুদের কৃপায় ইয়াকুটস্কে ডাক্তারকে আসতে হল। পরে তাঁর স্ত্রীও এলেন। তাঁর ইচ্ছা যে স্বামীর সঙ্গে থাকেন কিন্তু প্রভুদের মতি অন্য রকম। তারা তাঁকে স্বামীর সঙ্গে থাকতে দিতে রাজি নন।

—কিন্তু এখানে তোমার সঙ্গে কেন?

—তার কারণ—এখানে কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে একাকী বাস করা নিরাপদ নয়। অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গেও না। ঐদিকে উপত্যকা ভূমিতে একটা ছোট কুটীরে মেরিয়া তারস্কীর সঙ্গে তিনি থাকতেন। কিন্তু তারপর থেকে প্রতিরাত্রিতে নানা অজুহাতে সেখানে কসাক সৈন্যদের আনাগোনা সুরু হয়। কাজেই ডমিটি পোলকফ মেরিয়াকে তার কুটিরে আশ্রয় দেয় এবং আন্না ভেসিলিয়েভনা এখানে আসতে বাধ্য হন। এই মহিলাটি ভারী চমৎকার এবং আদর্শ স্ত্রী। তিনি ঐ ঘরটীতে থাকেন। আর আমি এই উনুনের পাশে ঘুমাই।

—তাহলে আমাদের সব কথা তুমি তার কাছে বলতে পার।

—আমার মনে হয়, তা করা উচিত হবে না!—প্যাভলফ খানিক ভেবে বলল।—না, যদি কোন সূত্রে প্রকাশ হয়ে পড়ে। কাজেই এসব কথা তাকে না জানানোই ভাল।

—কিন্তু—পল!—অজ্ঞাতসারে হোপের কণ্ঠস্বর করুণ হয়ে উঠল।

—পল নয়—বল সার্জ

এই সময়ে দরজায় খুট করে আওয়াজ হল। খিল দেওয়া ছিল না, সহজেই খুলে গেল। রসকোভা ভেতরে ঢুকলেন।

আঃ এখনও! ভালো কথা!—সহজভাবে তিনি বললেন। ম্যাডাম তো সবই বুঝতে পেরেছেন কাজেই আমার উপর ঈর্ষার কারণ নেই—না?

ওহো, আপনারা তো! আপনার মতো দৃষ্টি দিয়েই আমিও দেখতে পারতাম। আমিও কিন্তু তেমনি ধারণা করে বসতাম, কিন্তু এখানে সেরকম কারণ নেই, আপনাকে এই যে নিশ্চয়তা দিতে পারি। এখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন দেখছি! এই মানুষটি কিন্তু ভারি চমৎকার! মানুষটি আপনার কিনা! কাজেই তার সঙ্গেই সবার আগে হৃদ্যতা জমে উঠবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু আমার

মানুষটি ভয়ানক বেঁকে দাঁড়িয়েছেন এবং যতদিন আমি বেঁচে থাকি—এমনিভাবেই থাকবেন বলে যেন বোধ হয়। এখন যাহোক একটা সুরাহা হয়েছে। আপাততঃ মেরিয়া ও ডমিটির সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করে এলাম। একটু ঘেঁসাঘেঁসি করে থাকতে হবে আর কি। যাহোক, এখন সামান্য যা-যা নেওয়া দরকার নিয়ে চললাম, বাকী যা হয়, কাল দেখা যাবে।

এই বলেই তিনি কথায় চলায় দুমদাম করে ভেতরে কোঠায় গিয়ে ঢুকলেন।

চকিতা হরিণীর মতো হোপের চোখ দুটি করুণ হয়ে উঠল। চেঁচিয়ে বলল: কী করছেন? আপনি যাবেন না ম্যাডাম।

—কেন বাছা! ওখানে গেলে আমার অসুবিধে হবে, একথা কখনও ভেবো না। অন্তর তোমার ভাল, এ তোমার সহৃদয়তার পরিচয় মানি কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর সংসারে এভাবে তৃতীয় ব্যক্তির থাকাটা অন্তরায় বিশেষ! কুড়ি বছর হল আমিও বিবাহিতা হয়েছি। স্ত্রীপুরুষের মনের গোপন পরিচয় আমি জানি। ও পরিচয়ে স্বামী ও স্ত্রী অভিন্নহৃদয়। তাছাড়া তোমাদের ত আজ মধুযামিনী। বলতো—সত্যি কিনা! ভাবছ কি, এমন শুভমুহূর্ত আমারও আসবে আবার কি ··হায় ভগবান···আচ্ছা চলি এবার।

হোপ ব্যাকুল হয়ে বাধা দিল: আপনি যাবেন না ম্যাডাম। আমার অনুরোধ রাখুন। আপনি যাই ভাবুন না কেন—এখান থেকে চলে যাওয়ার মতো প্রয়োজন বা কারণ ঘটে নি।

—প্রায় দুবছর বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন কাটিয়েছেন। ম্যাডাম রসকোত্তা ভর্ৎসনা করে বললেন: তার পরেও আজ আবার ···কেন বাছা, তুমি আমাকে বিষের মতো ঘৃণা করছ? তারপর প্যাভলফের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন—না গো, তাহলে বল আমি কিছুই বুঝি না। না? তাহলে বলতে হয় বাপু, তোমার স্ত্রীটি নিতান্ত জড়প্রকৃতির! হয় তুমি তার উপর দুর্ব্যবহার কর—না হয় তোমার অভ্যর্থনা সে পায় নি। সার্জ প্যাট্রোভিচ্ তাকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে চাও, তাহলে আপনার প্রথম কর্তব্য—এখন তাঁকে বাহুবন্ধনে টেনে নেওয়া। আর আপনি কিনা···ম্যাডাম পালমা হারাধন পেয়ে কেঁদে পড়েছেন—দুঃখশোকে আর সব ভুলে গেছেন, তাই তার এত ভয়—এত সঙ্কোচ। আমি এখুনি বিদায় নিচ্ছি। আমার অনুরোধ, আপন করে গ্রহণ করুন তাকে···

ম্যাডাম রসকোত্তা ভেতরের প্রকোষ্ঠে গিয়ে ঢুকলেন। আপন মনেই বললেন: তাহয় না। আমি তার চেয়ে বেশি জানি···বেশি জানি···

হোপ ও প্যাভলফ উঠেই তার কথাকটি শুনতে পেল।

ম্যাডাম রসকোত্তার সরল অন্তর—সদা প্রফুল্ল মন! মনের আনন্দে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র মুহূর্তে গুছিয়ে নিলেন।

হোপ নিরুপায় হয়ে তাকাল প্যাভলফের মুখের দিকে। তার সে দৃষ্টি—শিকারীর কবলে সচকিতা হরিণীর দৃষ্টির মতো, সকরুণ—অসহায়।

—তাকে থামাও পল—কিছুতেই যেতে দিওনা। ফিস-ফিস করে বলল হোপ। বলায় দৃঢ়তা প্রকটিত হল। যদি তাকে এখান থেকে ছেড়ে দাও, তাহলে আমি এক্ষুণি বাহিরে গিয়ে ঐ বরফের উপর শুয়ে পড়ব—তারপর যা হয় হবে।

কিন্তু হোপ দেখল—প্যাভলফ বিমূঢ় হয়ে পড়েছে, কোন কর্তব্যবুদ্ধি খুঁজে পাচ্ছে না। তখন সে নিজেকে সহসা সামলে নিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিল। বলল: প্যাভলফ, আমি অসুস্থ, ম্যাডাম রসকোত্তার এখানে থাকা দরকার।

প্যাভলফ উঠে ভেতরের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে বলল: আন্না ভ্যাসিলিয়েভনা, আমার স্ত্রীর অনুরোধ—যেভাবেই হোক্ আরও দু—একদিন আপনি এখানে থেকে যান! তার শরীর অশক্ত পথশ্রমে কাতর। আপনার সঙ্গ এবং সাহায্য পেলে সে কৃতজ্ঞ থাকবে।

—তাহলে আপনি? আপনিও তাই বলেন নাকি?—ম্যাডাম এগিয়ে এসে অভাবিত বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকাল। তোমরা তো আচ্ছা যুগল দেখছি। ভাল কথা। হাঁ, সার্জ প্যাট্রোভিচ, এই যদি আপনার মনের কথা হয়, এবং আমাকে যেতে বারণই করেন, তাহলে আমি না বলতে পারি না। তাহলে মেরিয়া আর ডমিটিকে আবার বলে আসি—যে আমি আজ যাচ্ছিনা। অবশ্য কথা শুনে তারা আমাকে

পাগল মনে করবে। করে তো করুক—কি আর হবে তাতে।

এই বলেই বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

খানিক পরে ফিরে এল ম্যাডাম রদকোভা। তার পর আহারে বসে গেল। কিন্তু তার তীব্র সতর্ক লক্ষ্য হোপের উপর। হোপ তখনও জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে আনত চোখ, তখন তিনি মাথা নেড়ে তাকে বললঃ কী হল তোমার বাছা! কিছুই বুঝতে পারছি নে? জ্বর টর নয় তো?

পল উনুনের কাছে মাদুর পেতে শুয়ে পড়ল। তার শুষ্ক অন্তরে ও মনে যেন এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে। হোপের এই অভাবিত আগমনে একবার মনে হল তার উপর যেন এক বিরাট বোঝা চেপে বসেছে, কিন্তু অপর দিকে উৎসাহের অনুভূতি সাড়া দিল—রক্ত সঞ্চালনে। পাশের উনুনে আগুন প্রায় নিভে গেছে—সাদা আঙারের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে আগুনের ক্ষীণ শিখিক। হোপের কথাও তার মনে এমনি আশা স্বপ্ন জাগিয়ে তুলেছে—সুদূর নির্বাসনে অন্ধকার নিঃসঙ্গ ঘুচে যাবে। সে আপন মনেই বলে উঠলঃ হোপ···হোপ ইভানোভনা···না—না···হোপ পালমা···

শেষ পর্যন্ত পল ঘুমিয়ে পড়ল—সে এক গভীর ঘুম। এই কারা প্রদেশে নির্বাসিত জীবনের এই এক বছর এমন আরামের ঘুম ঘুমায়নি সে—পায়নি এমন সচেতন আনন্দময় বিশ্রাম অবসর।

অনুবাদ উপন্যাস

(ক্রমশঃ)

সূর্য-প্রণাম

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

স্তূপীকৃত।
ভূলুণ্ঠিত।
এই শবদেহের প্রণাম করো।
কী বেদনায় থরো থরো
ওই অধরে কাঁপন জাগে।
মুক্তি মাগে
মৃত্যু-নিথর ও হাতগুলি বৃথা লিত।
স্তূপীকৃত।
ভূলুণ্ঠিত।

ওই শোণিতের রং নিয়ে আজ
নতুন দিনের সূর্য জাগে
রক্ত-রাগে,
নিকষ-কালো আঁধার ভেদি।
তোমার আমার বুকের বেদী
দীর্ঘশ্বাসের হোমের শিখায়
কঠিনব্রতের মন্ত্র লিখায়
উঁচু ক'রে
দেখুক চেয়ে
জাতনধরা জীবন যাদের
কলংকিত।
মরণ-ভীত।

স্তূপীকৃত
ভূলুণ্ঠিত
এই শবদেহের প্রণাম করো।
—প্রণাম করো।

মহান প্রহরী

শ্রীকপিল চট্টোপাধ্যায়

মহাত্মা গান্ধী তাঁর অনুকরণীয় ভাষায় একদা রবীন্দ্রনাথকে ভারতবর্ষের প্রহরী স্বরূপ ব'লে উল্লেখ ক'রেছিলেন। আজকে সেই উক্তি নিয়েই মহাত্মাজীকে সম্মান দেবার উপযুক্ত সময় এসেছে—আমরা তাই দেবো—সমস্ত বাংলা এবং আসামের পক্ষ থেকে তাই হবে আমাদের প্রাণের একান্ত শ্রদ্ধা নিবেদন।

মহাত্মাজীর সমগ্র জীবনের সাধনার মধ্যে যে সংস্কৃতির ঐশ্বর্যকে আমরা দেখেছি, ভারতবর্ষের দীর্ঘ অপহৃত স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনবার জন্যে তাঁর যে অপরিমিত আয়াস, তা সম্পূর্ণ ভারতীয় সংস্কৃতি সম্ভূত। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ থেকে এই ঋষি তাঁর নব নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির শাণিত চিন্তার জ্যোতির্ময় আলোকে সমস্ত ভারতবর্ষকে একটু একটু করে শত শত শতাব্দীর গভীর তমিস্রা থেকে জাগরিত করেছেন।

গান্ধীজীই সর্বপ্রথমে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে ইউরোপীয় ঢঙ, বিবর্ণ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অনুকরণের হাত থেকে রক্ষা করে সত্যিকারের বিপুল গণ-প্রতিষ্ঠানে উত্তীর্ণ করে দেন। সর্বপ্রথম তিনিই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাদের প্রতি যারা মাঠে, যারা কারখানায় তাদের বিন্দু বিন্দু রক্ত বিলিয়ে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, তিনি আর কংগ্রেসের পরিসর এতো বিস্তৃত করেছেন যে ধনী, নির্ধন, পুঁথিবাসী বা অশিক্ষিত—সকলেই তার ছত্রছায়াতলে সহজেই এসে দাঁড়াতে পেরেছে। সেই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ থেকে অনবরত সকলকে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, প্রত্যেক ভারতবাসীর স্বাধীন ভাবে বাস করবার দাবী আছে, প্রত্যেক নর নারী যেন ভাবে তার স্বাধীনতার কথা, স্বপ্ন দেখে যেন তার স্বাধীনতার, তাদের শরীরের শেষরক্ত বিন্দু তারা যেন দান করে যায় ভারতের স্বাধীনতার জন্যে।

কতোগুলি ভীরু, কাপুরুষ, যারা ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদকে বিশেষ ভীতির চোখে দেখতো তাদের তিনি সেই অন্ধবিশ্বাস থেকে টেনে তুলেছিলেন, বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের নিজেদের সংস্কৃতি কতো ঐশ্বর্যবান্—তিনি একটা বিরাট মৃতপ্রায় জাতিকে শক্তিশালী বীর জাতিতে সঞ্জীবিত ক'রেছিলেন, যারা নিঃসংকোচে তাদের উদ্যত বেয়নেটের সামনে জীবন পেতে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না, যারা হাসতে হাসতে কারাবরণ করে। মহাত্মাজীর আবির্ভাবের পূর্বে অবশ্যই অনেক বীর ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা মুষ্টি-মেয়—কারণ তাঁরা আসতেন শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে থেকে—গান্ধীজী সেই প্রেরণাকে সমস্ত জনগণের মধ্যে সুবিস্তৃত করে দিলেন।

ভারতের স্বাধীনতার জন্যে বহু নেতা মহাত্মাজীর থেকেও হয়তো সুউচ্চ আসনে উন্নীত হয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁরা সকলেই পশ্চিমের রাজনীতির অনুকরণই ক'রে-ছিলেন। গান্ধীজী কোনোদিনই নিজেকে বিজ্ঞাপন দিয়ে বেড়ান নি পরন্তু আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের যোগীর মতো নিঃশব্দে সুদৃঢ় সাধনা করেছেন। তাঁর জীবনের একমাত্র তপস্যা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা। তাঁর এই সাধনার উজ্জ্বল অগ্নিশিখা শান্তভাবে জ্বলছে, যেন একটুকরো 'হীরের মতো কিংবা গীতার ভাষায় বলা যায় নিবাতে নিষ্কম্প একটী উজ্জ্বল প্রদীপের মতো। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যা এই অগ্নিশিখাকে নিষ্প্রভ বা নির্বাপিত ক'রে দিতে পারে।

সন্দেহ নেই সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে একজন বিরাট অধিনায়ক এবং নির্ভীক বীর। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি হচ্ছেন একজন সাধারণ শ্রেণীর জন নেতা, কোনো একটী আন্দোলন তিনি নিশ্চয়ই সুপরিচালিত করতে পারেন। অবশ্যই যদি সেখানে সচেতন জনমণ্ডলী পান—গান্ধীজীর মতো কৃষকদের হৃদয়ের মধ্যে তিনি আসন গ্রহণ করতে পারেন নি। সন্দেহ নেই পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু একজন বিরাট রাজ-নিতিবিদ এবং আন্তর্জাতিক সভায় তিনি হয়তো উপযুক্তম প্রতিনিধি, কিন্তু তিনিও আমাদের মহাত্মাজীর মতো জনগণের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেননি। সুভাষচন্দ্র এবং জহরলাল দুজনেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা —কিন্তু, গান্ধীজী—একমাত্র গান্ধীজীই ভারতবর্ষের বিরাট গণবিপ্লবের শ্রেষ্ঠতম নির্দেশকর্তা।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দ থেকে গান্ধীজী দৃঢ়ভাবে সমস্ত জনগণের

মধ্যে এই স্বাধীনতার সচেতনতা-কে উদ্বুদ্ধ ক'রেছেন। তাঁর কাছে দেশের জনমণ্ডলী তাঁর আদর্শকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলবার পক্ষে অস্ত্র স্বরূপ হোয়ে উঠেনি। সাধারণ শ্রেণীর জন-নেতারা এমন কি সুভাষচন্দ্রের মতো যাঁরা তাঁরাও জনগণকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করবার জন্যে উন্মুখ হোয়ে থাকেন।

সুভাষচন্দ্রের আদর্শ অবশ্যই অত্যন্ত চমকপ্রদ এবং গৌরবজনক, কিন্তু সত্যিকারের গণতন্ত্র বা সম্পূর্ণ ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত হ'য়েছে তাতে প্রত্যেক নর-নারীর স্বতন্ত্রভাবে তার নিজস্ব ক্ষমতা এবং আদর্শ সম্বন্ধে সচেতনতা থাকা প্রয়োজন। সুভাষচন্দ্র এইদিক থেকেই সচেতন জনমণ্ডলীকে উদ্বুদ্ধ ক'রেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে থেকে যাতে স্বাধীনতার জন্যে তাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করতে পারেন তার প্রেরণা সঞ্চার করতেন। এ-ছাড়া তাঁর বাহ্যিক কাজে,লেখায়, বক্তৃতায় এবং অভিভাষণগুলি বাদে এমন কোনো পরিকল্পনা ছিলো না যাতে জনমণ্ডলী তাদের নিজেদের শক্তির উপরে বিশ্বাসবান্ হোতে পারে। এইগুলিই হ'চ্ছে সাধারণ শ্রেণীর জননেতাদের জীবনের ত্রুটী। রাজনীতির এই সব প্রক্রিয়া ইউরোপীয় দেশগুলিতে চলতে পারে, কারণ সেখানে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ সামাজিক এবং আর্থিক স্বাধীনতা নয় কারণ সেখানকার লোকেরা অভিজাত সম্প্রদায়ের দ্বারা অনবরতই প্রপীড়িত হোয়ে থাকে।

এই দিক থেকে গান্ধীজীর নির্দেশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। তাঁর বাহ্যিক সরলতার অন্তরালেও সমস্ত কৃষক এবং মজুরের প্রতি প্রেমের একটী অনির্বাণ অগ্নিশিখা জ্বলছে। তিনি পশ্চিমের এই গণতন্ত্রকে অলভ্য ব'লে প্রত্যাখান ক'রেছেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি নির্ভীকতার সংগে বললেন: "আমার গণতন্ত্র হচ্ছে এই যে প্রত্যেক ব্যক্তি সে তার নিজের প্রভু-স্বরূপ।" তাছাড়াও গান্ধীজী উনিশ শতকের ইউরোপীয় স্বাধীনতাকে পুনঃ প্রবর্তন চান না। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের জনগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে নিজেকে উৎসর্গ ক'রেছেন যে স্বাধীন ভারতবর্ষে উৎপীড়ন থাকবে না, অন্যায় থাকবে না, দারিদ্র্য থাকবে না। এই পথ সুদীর্ঘ হোতে পারে, কিন্তু যে জাতির ইতিহাসে হাজার বছরের সংস্কৃতি উজ্জ্বল হোয়ে র'য়েছে সেখানে কয়েক শত বৎসর এমন কিই বা বেশী হবে?

গত ৫০০ বৎসরের মধ্যে ইউরোপ বহুবিধ সমাজ ব্যবস্থার চেষ্টা ক'রেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত তারা কোনো সুদৃঢ় একটা যুক্তিতে এসে পৌঁছতে পারেনি—তার থেকে কোনো শান্তিও পায়নি—সার্থকতাও আসেনি। গান্ধীজী সমস্ত জনগণের কাছে জন-নেতার মতো এগিয়ে যান নি—গেছেন সেবক হিসেবেই। তিনি সমস্ত জনমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে অন্ধ অনুসারক হিসেবে গ'ড়ে তুলতে চাননি। তিনি চেয়েছেন জনগণের প্রত্যেকেই আত্ম-সচেতন হোয়ে উঠুক, জীবনের সমস্ত কিছুকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতাকে চরম ক'রে ভালবাসুক, নির্ভীক এবং বলশালী হ'য়ে উঠুক। জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রাণ দেওয়া খুবই সহজ। এর জন্যে বীরত্বের খুব বেশী প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি না, কিন্তু এর থেকে অনেক অনেক হাজার গুণ বেশী কঠিন কাজ হ'চ্ছে গর্জমান আগ্নেয়-অস্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ একলা মরা; আর বর্তমানে এইভাবে সাহসের সংগে মৃত্যু বরণ করবার প্রেরণা হচ্ছে সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের আদর্শ। গান্ধীজীই জনমণ্ডলীর মধ্যে এই অপূর্ব সাহস সঞ্চারিত ক'রেছেন। তিনি অন্ধ অনুসরণের একেবারেই পক্ষপাতী নন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মার্সিকাব্দাঘ গান্ধীজী ব'লেছিলেন: "আমি চাই না, কেউ আমার অনুসারক হোক, আমরা সকলেই সহযাত্রী—সত্যের গৌরবজ্জ্বল পথে তীর্থযাত্রা ক'রেছি।" এই উক্তির সত্যিই কোনো তুলনা নেই। এই হচ্ছে যথার্থ গণতন্ত্র, এবং একে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে অত্যন্ত সতর্কতার সংগে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। সময়ে সময়ে আমাদের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের মতো প্রতিভার যখন আবির্ভাব ঘটে তখন, তিনি গান্ধীজীর এই ধীর এবং মন্থর গতি দেখে অধৈর্য হয়ে ওঠেন এবং মনে করেন, গান্ধীজী বর্তমানে একটি নিরাপিত আগ্নেয়-গিরি ছাড়া আর কিছুই নন। কিন্তু তাঁর এই অগ্রগমন মন্থর গতিতে হওয়াই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কারণ তিনি এই স্বাধীনতার প্রেরণা শুধু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেই সঞ্চারিত করতে চান না—তাঁর চারিপাশের বিপুল জনমণ্ডলীকেও সমানভাবে সচেতন ক'রে তুলতে চান। তিনি উচ্চশিক্ষিত এবং মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজের মানুষকে যন্ত্রস্বরূপে ব্যবহার জনমণ্ডলীকে কখনোই প্রবুদ্ধ করতে চাননি। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্বে গান্ধীজী স্পষ্টভাষায় ব'লে-

ছিলেন : "যতোদিন না সমস্ত দেশ অহিংসা নীতিতে বলীয়ান হ'য়ে উঠে বিদেশী শাসনকে পরিহার করবার ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছে, ততোদিন অতন্দ্রভাবে অপেক্ষা ক'রেছি। কিন্তু এখন আমি কিছু পরিবর্তন চাই, এখন আমি অনুভব করছি, যে আর আমার অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।"

সুতরাং ভারতীয় স্বাধীনতার-যুদ্ধের আধ্যাত্মিক অগ্নিশিখা ১৯৪২ খৃষ্টাব্দেই লেলিহান হয়ে উঠলো। এই গণবিপ্লবের মধ্যে গান্ধীজীর সমস্ত প্রেরণাকে আমরা অন্তর দিয়ে অনুভব করলাম, এবং এই প্রচণ্ড বিপ্লবের মধ্যে এই কথাটাই স্পষ্ট হোয়ে উঠ্‌লো যে গত ২২ বছর ধ'রে কংগ্রেস একান্ত নিভৃতে শান্তভাবে যে শক্তি সঞ্চয় ক'রেছে তা সম্পূর্ণ ব্যবহারের দিন আজকে নিঃসন্দেহে সমাগত। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি সমস্ত জনমণ্ডলীকে বিরাট আহ্বান জানালেন, বল্‌লেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করবার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়।

গান্ধীজীর এই দীর্ঘ—বাইশ বছরের তপস্যা ব্যর্থ হয়নি। বুদ্ধিজীবী সমাজের কোন জননেতাই গান্ধীজীর মতো নির্ভীক-ভাবে বল্‌তে পারতেন না : "আমি ইচ্ছে করি, সমস্ত শক্তি, সমস্ত মতবাদ আজ একীভূত হোয়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাক্—সমস্ত ভারতবর্ষের জন্যেই এই যুদ্ধ ঘোষিত হোচ্ছে—আমি চাই এর একটি সুসম্পূর্ণ অহিংস পরিণতি, আমি চাই নতুন যুগের অভ্যুদয়। ...ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি অবশ্য প্রয়োজনীয়। আজকাল শাসকেরা বল্‌ছেন, আমরা স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে রাজী আছি যদি আমরা ঠিক জান্‌তে পারি কার হাতে এই ভার অর্পণ করা সম্ভব! আমার উত্তর হচ্ছে এই যে ভারত-বর্ষকে ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিয়ে যাওয়া হোক, যদি তা অসম্ভব বোধ হয় তা হলে তাকে বিপ্লবের হাতেই দেওয়া হোক। ...এই যুদ্ধে আমরা আমাদের সমস্ত ব্যাধিকে আরোগ্য করবো, সেই অসুখ থেকে আমরা মুক্ত হবো, যে অসুখ আমাদের সমস্ত মানবত্বকে নষ্ট ক'রেছে এবং যা আমাদের ক্রমশঃ ক্রীতদাসে পরিণত করেছে। ...আমি চাই সমস্ত জনগণের মধ্যে এই স্বাধীনতার ইচ্ছা বলবতী হোয়ে উঠুক.....আমি চাই এখন এই অগ্রগমন যত সংক্ষিপ্ত এবং দ্রুত হয়—এই হবে আমার সব থেকে বড়ো সংগ্রাম। আরো অপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে, ...তোমরা কাপুরুষ হোয়ো না, কারণ কাপুরুষদের বেঁচে থাকবার কোনো অধিকারই নেই। 'স্বাধীনতা' আমাদের মন্ত্র হোক, এবং তা আমরা অনবরত উচ্চারণ করি!"

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির জন্যে আমি বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করছি না। এই থেকেই প্রমাণিত হবে গান্ধীজীর সমস্ত জীবনের 'স্বাধীনতার' তপস্যার আগুন কি ভাবে উজ্জ্বল হোয়ে জ্বল্‌ছে। ঠিক এই সময়ে যখন আমরা শুনি যে গান্ধীজী জনযুদ্ধের উপযুক্ত নেতা নন—তখন অত্যন্ত দুঃখবোধ করি। আমরা এ রকম কথা বলি তার একমাত্র কারণ তাঁর মতো জননেতাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি না।

গান্ধীজীকে দুটো দিকে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রতে হ'য়েছে, প্রথম হচ্ছে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয় হচ্ছে—ভারতীয় ধনিক সম্প্রদায়ের শাসনের বিরুদ্ধে।

সেই জন্যেই গত আগষ্ট আন্দোলন শুধু যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো তা নয় এ কথাও প্রমাণ করলো যে শাসকদের সমস্ত ক্ষমতা যারা মাঠে কাজ করছে, যারা ফ্যাক্টরীতে বিন্দু বিন্দু রক্ত দিচ্ছে তাদের হাতেই ন্যস্ত হোক।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দীর্ঘ বন্দি-জীবনের শেষে মুক্তিলাভ ক'রে তিনি আবার কংগ্রেসকে সঞ্জীবিত ক'রে তুললেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের গণ-আন্দোলন থেকে এটুকু তিনি বুঝ্‌লেন যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কেও বিশ্বাস করা কঠিন।

সুতরাং তিনি সমস্ত কংগ্রেসের গতিবেগকে, কৃষকদের মধ্যে শ্রমিকদের মধ্যে এবং যুবকদের মধ্যে সঞ্চারিত করলেন। এই ভাবে, সমস্ত কৃষক এবং মজুরদের নিয়ে তিনি ঘুমন্ত ভারতবর্ষকে জাগ্‌বার প্রেরণা দিলেন। এই হচ্ছে আমাদের বর্তমান জননেতার নির্দেশ। নির্বাচন বা পার্লামেন্টের কোন কাজকেই গান্ধীজী গুরুত্ব দেন না, গত কয়েক সপ্তাহ থেকে তাঁর এই সব সম্পর্কিত ব্যাপারে অদ্ভুত শুষ্কতাই হচ্ছে তাঁর স্বাধীনতার তপস্যা।

তিনি একজন পরম নিষ্ঠাবান যোগীর দৃঢ়তায় অচল অটল হ'য়ে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছেন এবং নীরবে প্রহর গুণ্‌ছেন—অতন্দ্র দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের মহেন্দ্র-ক্ষণের জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছেন।

এখন আমাদের উচিত, তাঁর মতো এই বিরাট-জননেতার উপদেশ পালনের উপযুক্ত হোয়ে ওঠা—সমস্ত বিদ্বেষ—সমস্ত মালিন্য ধুয়ে মুছে তাঁর সংগে তাঁর পতাকাতলে দাঁড়িয়ে একত্রিত হোয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া—প্রার্থনা করি, যখন স্বাধীনতার জন্যে দ্বিতীয় মহাসংগ্রামের ডাক আস্‌বে, তখন যেন আমরা উপযুক্ত সাহসের সংগে সেই পরম পবিত্র এবং জলন্ত আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।

জাতি-বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ (১০)

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

সপ্তম দশকের প্রথমার্ধে যে-সব জাতীয় প্রচেষ্টা এবং চিন্তাপূর্ণ বিশ্লেষণমূলক রচনা ভারতবাসীর মনে স্বদেশ-প্রেমের বীজ ছড়াইতেছিল তাহার আভাস আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে পাইয়াছি। ভারতবর্ষের শাসন-নীতি তখন একটি নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলিতেছিল। ইংরেজ জাতি তখন একথা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিল যে, তাহারাই ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা, কাজেই ভারতবর্ষের সমাজ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতিগত সর্ব্ববিধ কার্য্যের নিয়ামকও তাহারাই। একারণ ওয়াহাবী আন্দোলন তাহারা সহ্য করিতে পারে নাই। শিক্ষা ব্যাপারেও নিজেদের মতানুযায়ী কর্ম্ম করিতে তাহারা এতটুকুও দ্বিধাবোধ করে নাই। সিবিলিয়ানি কার্য্যের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে না করিতেই সুরেন্দ্রনাথকেও ইহা ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইতে হইল। ভারতবর্ষের করদ বা মিত্র রাজ্যগুলি কোম্পানির আমলে ব্রিটিশ প্রভুত্বের কণ্টকস্বরূপ ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর তাহাদের বিষদাঁত ভাঙিয়া দিয়া তাহাদিগকে শাসকবর্গ একেবারে বশম্বদ করিয়া ফেলে। কিন্তু ইংরেজ এই সময় এতই প্রভুত্বপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, সমস্ত ন্যায় নীতি বিসর্জ্জন দিয়া এই বশম্বদ সম্প্রদায়ের উপরও হস্তক্ষেপ করিতে তাহারা ত্রুটি করিল না। সন্দেহবশে মিত্ররাজ্য বরোদার গাইকোয়াড়কে পদচ্যুত করা হইল।

পূর্ব্বে নীলকরদের অত্যাচারে বঙ্গীয় সমাজ জর্জ্জরিত হইতেছিল। এখন ইংরেজ মাত্রেই ভারতবাসীর প্রভু, কাজেই তাহারা স্থানে অস্থানে তাহাদের অপমান লাঞ্ছনা করিতে পশ্চাৎপদ হইল না। চা-বাগানে শ্রমিকদের উপর চা-কর সাহেবের অত্যাচার কাহিনী তখনই প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছিল। ইহা ছাড়া ভারতবর্ষের দিকে দিকে ইংরেজের হাতে ভারতবাসীর অপঘাত মৃত্যুর কথাও জানাজানি হইতে লাগিল। শাসক ও শাসিতের বিচার-বৈষম্য উৎকট আকার ধারণ করিল। অপরাধী ইংরেজ হইলে বহুক্ষেত্রে গুরুতর অপরাধ, এমন কি নরহত্যা বা নরহত্যার চেষ্টা বা প্ররোচনা প্রমাণিত হইলেও, তাহার লঘুদণ্ড অর্থাৎ সামান্য কিছু জরিমানা এবং অল্প কয়েকদিনের জেল মাত্র হইত। পক্ষান্তরে, ভারতবাসী এরূপ অপরাধ করিলে তাহার ভাগ্যে চরমদণ্ডই লাভ হইত। শাসক সম্প্রদায়ের এইরূপ কুকীর্ত্তির কথা যতই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতে থাকে, শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অসন্তোষ ততই ধূমায়িত হইয়া উঠে। নিপীড়িত জাতির পক্ষে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রচারকার্য্য ভারতবাসী আজ সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিবে। কলিকাতা ও মফস্বলের অন্যান্য সংবাদপত্রেও উৎপীড়ন-নিপীড়নের সংবাদ প্রকাশিত হইত, কিন্তু পত্রিকা যেরূপ তীব্রতা ও তেজের সঙ্গে ইহার প্রতিবাদ করিত এরূপটি অন্য কোন কাগজের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। দায়িত্বহীন বিদেশীয় স্বৈর-শাসনের পরিবর্ত্তে দায়িত্বশীল প্রতিনিধিমূলক স্বদেশীয় শাসনের প্রবর্ত্তন না হইলে ভারতবর্ষের কল্যাণ নাই—এই কথা 'অমৃতবাজার পত্রিকা' তারস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার জাতীয় রঙ্গমঞ্চের কার্য্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অভিনেতারা রঙ্গনাট্যে শাসকজাতির কার্য্যকলাপের কথা এমন ভাবে সাধারণের সমক্ষে ধরাইয়া দিতে থাকেন যে, তাহা সত্বর কর্ত্তৃপক্ষের নজরে আসিল। তাঁহারা রঙ্গমঞ্চ নিয়ন্ত্রক আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া লইলেন।

সত্য কথা বলিতে কি, শাসক ও শাসিতের মধ্যে এই যে ব্যবহার-বৈষম্য ইহা শিক্ষিত ভারতবাসীর মনেই বেশী করিয়া বাজিল। কারণ তাহারাই সাক্ষাৎভাবে এই বৈষম্যের ফলভাগী হইল। চার্লস্ ট্রেভেলিয়ান শিক্ষিত ভারতবাসী একেবারে ইংরেজ বনিয়া যাইবে এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাঁহার শ্যালক মেকলে ভারতবাসীর নিজস্ব শিক্ষাদীক্ষার উপর তখন যতই কটূক্তি করিয়া থাকুন না কেন, তাঁহার দূরদৃষ্টি ছিল, এবং এই দূরদৃষ্টি বলেই তিনি ভগিনীপতি হইতে আরও এক ধাপ আগাইয়া বেশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়া ভারতবাসীরা পাশ্চাত্য উন্নতিমূলক

স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহেরই পক্ষপাতী হইবে। শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষতঃ শাসিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, অনবরত স্বার্থ-সংঘাত উপস্থিত হওয়ায় ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতবাসীকে ইংরেজ বলিয়া ধরিয়া লইবার পক্ষে বিষম বিঘ্ন ঘটিল। অথচ তাহারা অনিয়ন্ত্রিত অনাচারের হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য স্বায়ত্ত শাসনের অনুরাগী হইয়া উঠিতে লাগিল। হিন্দু মেলা, ভারত-সংস্কার সভা এবং মনীষীবর্গের রচনাবলী ভারতবাসীকে 'আত্মনির্ভর' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছিল। বিশেষভাবে রাজনৈতিক বিষয়াদি আলোচনার জন্য ইণ্ডিয়ান লীগ ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু উক্ত ভাবটি সত্যোপেত ও বস্তুগত করিয়া তুলিবার জন্য আরও কতকগুলি বিষয় আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েসন বা ছাত্রসভার মাধ্যমে সেই অভাব পরিপূরিত হইল।

আনন্দমোহন বসু বিলাত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ১৮৭৫ সালে এই ছাত্রসভা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসীদের মধ্যে র‍্যাংলার হইয়াছেন। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষাতেও তিনি উত্তীর্ণ। তিনি গুণে কৃতিতে শাসকজাতির অপেক্ষা কোন অংশে কম নন্। সমাজ সেবার আদর্শ লইয়াই হয়ত আনন্দমোহন প্রথমে এই সভা প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই ইহা ইংরেজী শিক্ষিত এবং শিক্ষার্থী যুবকগণের চিত্তে একটি নূতন প্রেরণা দিতে সক্ষম হয়। আর এ কার্য্যের পুরোহিত হইলেন সিবিল সার্বিস কর্ম্মচ্যুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট সুবিচারের আশা নাই দেখিয়া তাঁহার অন্যায় অপরাধ রদ করাইবার জন্য উপরন্তু কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে বিলাত যান। কিন্তু তখন কি এদেশে কি বিদেশে শাসকবর্গ সমভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সেখানেও তাঁহার কোন সুবিধা হইল না। ইহার পর সুরেন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টার হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, কিন্তু তখন শিক্ষিত ভারতবাসীদের প্রতি শাসক জাতি এতই ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে, পরীক্ষক-সভা কর্ম্মচ্যুতির অপরাধে অপরাধী বলিয়া সুরেন্দ্রনাথকে যোগ্যতা সত্ত্বেও ব্যারিষ্টারী সনদ দিতে অসম্মত হইলেন। এইরূপে বিফল মনোরথ হইয়া দেশে ফিরিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় সুরেন্দ্রনাথকে তাঁহার মেট্রোপলিটান কলেজে ইংরেজী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিলেন। এইখানে সুরেন্দ্রনাথ উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইলেন। সুরেন্দ্রনাথ স্বল্পকাল মধ্যেই আনন্দমোহন প্রতিষ্ঠিত ছাত্র-সভার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। যে আত্মনির্ভরের বাণী বঙ্গীয় সমাজে এতদিন প্রচারিত হইতেছিল, সুরেন্দ্রনাথ ছাত্র সমাজের নিকট প্রদত্ত বিবিধ বক্তৃতায় তাহাকে ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাধারণের সম্মুখে ধরিলেন। যে শাসক জাতির উপরে শিক্ষিত ভারতবাসীর একান্ত নির্ভর ছিল তাহাদের হস্তে প্রতিপদে লাঞ্ছিত হইয়া আমাদের জাত্যাভিমান ক্রমশঃ জাগরিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এই জাত্যাভিমান এতদিন প্রকাশের ছন্দ খুঁজিয়া পায় নাই। প্রথমে সুরেন্দ্রনাথের মুখেই তাহা আত্ম-প্রকাশ করিল। বিপিনচন্দ্র পাল তখন যুবক ছাত্র—তিনি এবং তাঁহার মত শত শত যুবক তখন যে সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাহা তিনি একাধিক স্থলে অনবদ্য ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। সকল ক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্রের মতামতের সঙ্গে অনেকে একমত না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার বিশ্লেষণ ঐ সময়কার অনুপ্রাণনার একটি পূর্ণ চিত্র প্রদান করে:

"সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমক্ষে প্রত্যেক জাতির ইতিহাসই যে সেই জাতির স্বদেশ ভক্তির অবলম্বন ও প্রতিষ্ঠা এই সত্য প্রচার করিলেন।"

"এই ছাত্র-সভায় সুরেন্দ্রনাথ শিখশক্তির অভ্যুদয়—The Rise of the Shikh power,—সম্বন্ধে যে অগ্নিময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার স্মৃতি,—সেই বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছিলেন—তাঁহাদিগের চিত্ত হইতে কখনও লুপ্ত হইবে না। শিখধর্ম্মের উৎপত্তি, শিখ খালসার প্রতিষ্ঠা, প্রথমে মোগল এবং পরে ব্রিটিশ প্রভু শক্তির সঙ্গে, শিখ খালসার যুদ্ধবিগ্রহের কথা, সেকালের স্কুল পাঠ্য ভারত ইতিহাসের মধ্যেও ছিল। সুরেন্দ্রনাথ এই বক্তৃতায় যে সকল ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহা যে

একেবারে অজ্ঞাত ছিল এমত নহে। কিন্তু সেই সকল পূর্ব্ব পরিচিত ঘটনার অন্তরালে স্বরাষ্ট্র-প্রীতির যে শক্তিশালিনী উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল, সুরেন্দ্রনাথের তড়িত-সঞ্চারিণী বাগ্মীপ্রতিভাই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের নিকট তাহা ফুটাইয়া তোলে। সেই হইতেই এদেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসচক্ষে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অভিনব মর্ম্ম ও উন্মাদিনী উদ্দীপনা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। ছত্রপতি মহারাজা শিবাজী আধুনিক ভারতবর্ষে যে এক বিশাল হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তাঁহার মর্য্যাদা জ্ঞান এখনো আমাদের জন্মায় নাই। সুতরাং সে সময়ে মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উদ্দীপনা আমাদের নবজাগ্রত স্বাদেশিকতাকে স্পর্শ করে নাই। আমাদের এই নূতন স্বাদেশিকতা তখন একটা কল্পিত বিশ্বজনীনতার ভাব অবলম্বন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একটা স্বদেশাভিমান মাত্র আমাদের চিত্তকে তখন অধিকার করিয়াছিল। হিন্দু বলিয়া কোন গৌরবাভিমান তখনো আমাদের মধ্যে জন্মায় নাই। হিন্দুধর্ম্মের প্রচলিত প্রাণহীন কর্ম্মকাণ্ডে আমাদের পুরুষানুগত বিশ্বাস একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। এই সকল কারণে ছত্রপতি মহারাজা শিবাজী ভারতে যে মহা হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম ও উন্নত মর্য্যাদা উপলব্ধি করিবার অধিকার আমাদের ছিল না। অন্য পক্ষে বাবা নানক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে একদিকে যেমন কোনো প্রকারের কর্ম্মবাহুল্য ছিল না, অন্যদিকে সেইরূপ গুরুগোবিন্দ-প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রে জাতিবর্ণগত কোনো বৈষম্যও ছিল না। শিখ খালসা বহুল পরিমাণে ইংরেজের পিউরিটান (Puritan) সাধারণতন্ত্রের বা Common wealth-এর অনুরূপ ছিল। আর এইজন্যই আমাদের ইংরেজীশিক্ষা ইউরোপীয় সাধনায় অভিভূত চিত্তকে শিখ ইতিহাসের উদ্দীপনাতে এমন প্রবলভাবে অধিকার করিতে পারিয়াছিল। ...সুরেন্দ্রনাথের মুখে শিখ ইতিহাসের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষু রাজপুতনার কীর্ত্তিকাহিনীর উপরেও গিয়া পড়িল। এইরূপে সুরেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের নিকটে ভারতের আধুনিক ইতিহাসে এক নূতন প্রাণতার প্রতিষ্ঠা করেন।" ('চরিত-কথা' : সুরেন্দ্রনাথ, পৃ. ৪৭-৯)

চৈতন্যমহাপ্রভু সম্বন্ধে এতদিন শিক্ষিত সমাজ নানারূপ কুধারণাই পোষণ করিয়া আসিতেছিল। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম ও শিক্ষার প্রতি রামমোহন রায় হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত বহু বরীয় মনীষী কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবর্গ চৈতন্যদেবের ভক্তিবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ইহার গুণগান করিতে থাকেন। কিন্তু সমাজের তথাকথিত উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠায় এবং নিম্ন বর্ণের সামাজিক উন্নয়নে চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম কতখানি সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিল সে বিষয়ে তখন পর্য্যন্ত কেহই আলোচনা করেন নাই। সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রসমাজের নিকট এই বিষয়ে যে বক্তৃতা করিলেন তাহাতে মহাপ্রভুর ধর্ম্মের এই দিকটির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি ইহার দিকে সম্যক্ আকৃষ্ট করিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ভিত্তি যেমন তাঁহারা শিখ খালসার মধ্যে প্রাপ্ত হইল চৈতন্যদেবের শিক্ষার মধ্যে তাঁহারা তেমনি প্রথম সামাজিক সাম্যের আদর্শের কথা শুনিতে পাইল। আবার,

"সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মী-প্রতিভাই আমাদের সমক্ষে আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শকেও উজ্জ্বল করিয়া ধরে। ম্যাট্‌সিনির দৈবী প্রতিভা, গ্যারীবল্ডীর স্বদেশ উদ্ধারকল্পে অদ্ভুত কর্ম্মপ্রচেষ্টা, য়ুন-ইতালী (Yung Italy) সম্প্রদায়ের এবং নব্য আয়র্লণ্ডের (New Irland) আত্মোৎসর্গপূর্ণ দেশচর্য্যা, এসকলের কথা সুরেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথমে এদেশে প্রচার করেন এবং তাঁহার এই সকল ঐতিহাসিক শিক্ষাকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বে আমাদের যে স্বদেশাভিমান বহুল পরিমাণে কবি-কল্পনা ও পৌরাণিকী কাহিনী অবলম্বন করিয়াই ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহাই এখন স্বদেশের এবং বিদেশের ইতিহাসের দৃষ্টান্তের ও শিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে সত্যাপেক্ষ ও বস্তুতন্ত্র হইয়া উঠিল।" (ঐ, পৃ ৪৯)

বিপিনচন্দ্র ইংরেজী আত্মচরিতে (*Memories of My Life and Times*, P. 245-8) এই শেষোক্ত বক্তৃতা-

গুলির কতকটা বিস্তারিত উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকারা ইহা নিশ্চয়ই পাঠ করিবেন। ইটালী যখন অষ্ট্রিয়ার দখলে ছিল তখন অষ্ট্রিয়ানরা সাধারণ-ভাবে এবং অষ্ট্রিয়ান সেনাদল বিশেষভাবে কিরূপে ইটালীর নরনারীর ইজ্জৎ নষ্ট করিতেছিল তাহার বর্ণনা শুনিয়া ঐ সময় এদেশে শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের কথা শ্রোতা যুবকবৃন্দের মনে স্বতঃই উদয় হইতেছিল। পূর্বে যেমন উল্লিখিত হইয়াছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ প্রান্তিক অঞ্চলে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে ব্যবহার-বৈষম্য, শাসিতের উপর শাসকের উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' কর্তৃক সরকারী কর্মচারীদের অনাচারের কাহিনী প্রকাশ—এইসব ব্যাপারে পরাধীন ইটালীয়দের অবস্থার সঙ্গে পরাধীন ভারতীয়দের অবস্থা হুবহু মিলিয়া যায়। সুতরাং ইটালীর মুক্তিমন্ত্রের উদ্গাতা ম্যাট্‌সিনির জীবন ও কর্মের দিকে বাংলার যুবক-চিত্ত অতি সহজেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ম্যাট্‌সিনি প্রথম জীবনে কার্বোনারাই নামক গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে গুপ্ত কার্যের সঙ্গে যুক্ত না হইয়া প্রকাশ্যেই অষ্ট্রিয়ার বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করেন। বাংলার যুবকবৃন্দও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইটালীর গুপ্ত সমিতিগুলি হত্যাকার্যে লিপ্ত হইতেও কুণ্ঠিত হইত না, কিন্তু বাংলার যুবকবৃন্দ তখন ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত, কোনরূপ বৈপ্লবিক কর্মের মধ্যে ইহা আত্মপ্রকাশ করে নাই। সুরেন্দ্রনাথ এইরূপ বহু গুপ্ত সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র বলেন :

"Though without any serious plan or policy of political action aiming at the liberation of their people from the British yoke, these societies were, however, not lacking in seriousness. Their patriotism was serious, and how seriously they took it was seen in the vows and rituals of many of these societies. I knew of one such society, though I was not myself a member of it, whose initiatory rites were almost Masonic in some aspects. Every member of this society had to sign the pledge of membership with his own blood drawn at the point of a sword from his breast. They were dreamers of wild dreams, but harmless dreamers so far, whose thought and imagination alone were of a revolutionary character, but who never seriously meant to rise in physical revolt against the British authority in the country,..."

(ইংরেজী আত্মচরিত, পৃ. ২৪৮)

বিপিনবাবু এখানে বলিতেছেন যে, ইংরেজের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে কার্যতঃ কিছু করিবার চেষ্টা না করিলেও এই সকল গুপ্ত সমিতি মোটেই গুরুত্ববিহীন ছিল না। গুপ্ত সমিতিগুলির সভ্যদের স্বদেশভক্তি কিরূপ প্রগাঢ় ছিল ইহাদের অনুষ্ঠানাদির দিকে লক্ষ্য করিলে তাহা সম্যক উপলব্ধি হয়। তিনি এমন একটি সমিতির কথা জানিতেন যাহার প্রত্যেকটি সভ্যকেই তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষ চিরিয়া ইহা হইতে রক্ত লইয়া সেই রক্তে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইত। সভ্যগণ ছিলেন বিপ্লবের ভাবে বিভোর। কিন্তু স্বপ্ন এবং কল্পনামার্গ ছাড়াইয়া তাঁহাদের এই বিপ্লবী মনোভাব এদেশ হইতে ইংরেজদের বহিষ্কৃত করাইয়া দিবার জন্য কার্যে প্রকাশিত হইবার তখন কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যেও গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ যুবকবৃন্দ সঞ্জীবনী সভা গঠন করিলেন। মন্ত্রগুপ্তি ইহার প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। সর্বপ্রকারে স্বদেশের উন্নতি-সাধন ছিল ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

এই বিপ্লবাত্মক মনোভাব সে যুগের বিদ্যার্থী ব্রাহ্মযুবকদের মধ্যে বিশেষ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। কেশবচন্দ্রের ভারত-সংস্কার সভার কার্যক্রমের কথা পূর্ব অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। এই সময়ে কেশবচন্দ্রের মতবাদ আশানুরূপ প্রগতিশীল ছিল না বলিয়া ব্রাহ্মযুবকগণ আরও আগাইয়া যাইতে চাহিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ কেশবচন্দ্রের সহকর্মীগণ এই যুবকদের নেতৃত্ব গ্রহণে অগ্রসর হইলেন।

বলা বাহুল্য, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বহু ব্যাপারে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার সহকর্মীদের কাহারও কাহারও মতদ্বৈধতা তখন উপস্থিত হইয়াছিল। যে ইংরেজী শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা প্রভাবে স্বদেশ-সেবায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে প্রগতিশীল বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহাদের হৃদ্‌গত প্রেরণা ছিল মূলতঃ রাজনৈতিক। স্বদেশকে বিদেশীর কবলমুক্ত করিতে হইলে স্বদেশের ধর্ম ও সমাজকে স্বচ্ছন্দ সতেজ ও সাবলীল করিতে হইবে—এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়াই তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন। বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, তারাকিশোর রায় চৌধুরী (পরে, সন্তদাস বাবাজী), কালীশঙ্কর শুকুল, আনন্দচন্দ্র মিত্র এবং শরৎ চন্দ্র রায় এই ছয় জন ব্রাহ্মযুবক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পৌরোহিত্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতামূলক প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। ইহা ১৮৭১ সালের মাঝামাঝি সময়ের কথা। শিবনাথ তখন সরকারী হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতা কর্মে লিপ্ত। কাজেই তিনি নিজে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। একদা গভীর রাত্রে অগ্নি সাক্ষী করিয়া এই যুবকগণ কিরূপে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার আত্মচরিতে (পৃঃ ২৪৩-৪) দিয়াছেন। বিপিনচন্দ্র পালও ইংরেজী আত্মচরিতে (পৃঃ ৩১৭-৮) এ বিষয়ে কিছু লিখিয়াছেন। ইহার কিছুকাল পরে ১৮৭৮ জানুয়ারী মাসে শিবনাথের পৌরোহিত্যে গগনচন্দ্র হোম এবং উমাপদ রায় বরাহনগরে গঙ্গাতীরে অনুরূপ আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা লইলেন। গগনচন্দ্র তাঁহার জীবনস্মৃতিতে (পৃঃ ২৪-৬) প্রতিষ্ঠাপত্র সমেত এই ব্যাপারটির একটু বিশদ উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, হেয়ার স্কুলের অনুষ্ঠানও একই ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। গগনচন্দ্র লিখিতেছেন :

> "ব্রাহ্ম সমাজের কার্যে আমি বহু দিন হইতেই [শিবনাথ] শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট সুপরিচিত হইলাম। তাঁহার নিকটেই আমি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করি। সে এক অপূর্ব অনুষ্ঠান। আনন্দচন্দ্র মিত্র, কালীশঙ্কর শুকুল, শরৎ চন্দ্র রায়, তারাকিশোর [রায়] চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল ও সুন্দরীমোহন দাস তাঁহার নিকট পূর্বেই এই মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আমার দীক্ষার দিনে বরাহনগরে গঙ্গাতীরে এক বাগানে, গভীর রাত্রে, তাঁহারা সকলে দীক্ষার্থী উমাপদ রায় ও আমাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন ; সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করা হইল আমরা বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া বটপত্রে লিখিয়া নিজেদের প্রবৃত্তির মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, ধর্মবিশ্বাসে প্রতিমা পূজা, সমাজে জাতিভেদ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরাধীনতা অগ্নিতে আহুতি দিলাম, তাহার পর বটপত্রগুলি পুড়িয়া নিঃশেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলাম :—
>
> (১) প্রতিমাপূজা করিব না, প্রতিমাপূজার সহিত কোনরূপ যোগ রাখিব না।
>
> (২) জাতিভেদ মানিব না, কোনপ্রকারই ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে জাতিভেদকে প্রশ্রয় দিব না।
>
> (৩) স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করিয়া সমাজে তাহা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিব।
>
> (৪) বাল্য-বিবাহ অশেষ অকল্যাণের আকর জানিয়া নিজেরা এক্ষণ বৎসরের পূর্বে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইব না। ষোড়শ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালিকার পাণিগ্রহণ করিব না ; এবং যে বিবাহের পাত্রের বয়স একুশের এবং পাত্রীর বয়স ষোল বৎসরের কম, তেমন বিবাহে যোগদান হইতে বিরত থাকিব।
>
> (৫) নিজেদের ও স্বদেশবাসীর শক্তি ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চা ও তাহার প্রচার করিব ; নিজেরা অশ্বারোহণ এবং আগ্নেয়াস্ত্র চালনা অভ্যাস করিব ; এবং সমস্ত দেশে যাহাতে অশ্বারোহণ ও বন্দুক ছুড়িবার অভ্যাস প্রচলিত হয় তাহার জন্য সচেষ্ট থাকিব।
>
> (৬) একমাত্র স্বায়ত্তশাসনই বিধাতৃনির্দিষ্ট শাসন-ব্যবস্থা ; কিন্তু দেশের বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিদেশীয় শাসনকে স্বীকার করিব ; কিন্তু দুঃখ-

দারিদ্র্য-দশা দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কদাপি এই গভর্ণমেণ্টের অধীনে দাসত্ব করিব না।"

ভারতবর্ষের শিক্ষিত যুবকবৃন্দের মনে যখন অন্ততঃ চিন্তাতেও এইরূপ স্বাধীনতা স্পৃহা উদ্রিক্ত হইতেছিল তখন শাসক সম্প্রদায় কি করিতেছিলেন? তাঁহারা এই আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার কোনই চেষ্টা করিলেন না, বরং ইহাকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য 'নিষ্টুইনেব' ছলাকলার আশ্রয় লইতে লাগিলেন। বিলাতে গিয়া ভারতীয় যুবক সিবিলিয়ানি পরীক্ষায় ইংরেজ যুবকদের প্রতিযোগী হইতে থাকে। কিন্তু ইহার সপক্ষে রাণী ভিক্টোরিয়ার স্পষ্ট নির্দেশ থাকিলেও কর্তৃপক্ষ ইহাতে বাদ সাধিতে দ্বিধা করিলেন না। নিতান্তই নির্লজ্জভাবে পরীক্ষার্থীদের বয়স কমাইয়া একুশ স্থলে উনিশ করা হইল! ইহার উদ্দেশ্য কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। ইহা লইয়া ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং বিশেষ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র ভারতে এবং এমন কি বিলাতেও প্রতিনিধি পাঠাইয়া যেরূপ আন্দোলন চালাইয়াছিলেন তাহা আজ ইতিহাসের বস্তু।

ভারতবর্ষের দিকে দিকে যখন দুর্ভিক্ষ আত্মপ্রকাশ করিল তাহারই মধ্যে লর্ড লিটন ১৮৭৭, ১লা জানুয়ারি দিল্লীতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটা জাঁকাল দরবার করিয়া রাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারত সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী (Empress of India) বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রুশ-ভীতির অছিলায় আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে সমরে লিপ্ত হইয়া সরকার দেশব্যাপী অন্নকষ্টের মধ্যে যুদ্ধে জলের মত টাকা খরচ করিতে লাগিলেন। দেশীয় জনিয়া, বিশেষ করিয়া বাংলা সংবাদপত্রে ইহার তীব্র প্রতিবাদ হইতে লাগিল। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের অমৃতবাজার পত্রিকা, সোমপ্রকাশ ও সাধারণী এবং মফস্বলের হিন্দু হিতৈষিণী (ঢাকা), চারুমিহির (ময়মনসিংহ) প্রভৃতি পত্রিকায় সরকারী কার্য্যের যেরূপ সমালোচনা ক্রমাগত হইতে লাগিল তাহাতে কর্তৃপক্ষ স্থির থাকিতে পারিলেন না। সরকার যে এই দশকের প্রথম হইতেই বাংলা তথা দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলির প্রতি বিশেষ নজর রাখিতে আরম্ভ করেন তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই সময় সার এশ্‌লি ইডেন বাংলার ছোটলাট ছিলেন। নীল আন্দোলনের সময় প্রজাহিতৈষণার জন্য ইডেন সকলের শ্রদ্ধা-প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'তে হি নো দিবসা গতাঃ'। সরকারী কর্ম্মচারীদের অনেকেরই আগেকার সেই মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই ইডেনই দেশভাষার সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। তিনি প্রথমে দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র সম্পাদকগণকে ডাকাইয়া ধমকাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেও যখন তাঁহারা শোধরাইলেন না তখন এই শ্রেণীর সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আইনের প্রস্তাব আনিলেন। বিশেষ করিয়া তাঁহারই আগ্রহাতিশয্যে যে এই আইন বিধিবদ্ধ হয় তাহা এখন প্রায় সকলেই জানেন। বড়লাট লর্ড লিটন ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ কাউন্সিল আহ্বান করিলেন। এই একই অধিবেশনে বিলটি উত্থাপিত, প্রস্তাবিত, সমর্থিত, আলোচিত ও বিধিবদ্ধ হইয়া গেল! আইনটার নাম হইল *"The Vernacular Press Act"* বা "দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন"। এরূপ বৈষম্যমূলক আইন ইংরেজ রাজত্বে পূর্ব্বে আর কখনও বিধিবদ্ধ হয় নাই। যত দোষই করুক, ইংরেজী কাগজগুলির শাস্তি হইবে না; তাহাদের বেলায় সাধারণ আইনই প্রযোজ্য, শুধু বাংলা সংবাদপত্রগুলি স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলাতেই যত অপরাধ করিল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বহু বৎসর যাবৎ দ্বিভাষী কাগজ ছিল। এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর সপ্তাহ হইতেই পত্রিকা বাংলা অংশ বর্জ্জন করিয়া সম্পূর্ণ ইংরেজীতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। সোমপ্রকাশ কিছুকালের জন্য অন্তর্ধান হইল। সাধারণী দুই হাজার টাকা জামানত দিয়া কোনমতে আত্মরক্ষা করিল। এই আইনের বিরুদ্ধে এদেশে যে বিশেষ আন্দোলন চলিয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। বিলাতেও ইহার অবিমৃষ্যকারিতার কথা প্রচারিত হইল। পার্লামেণ্টে উদারনৈতিক দলের নেতা গ্লাডষ্টোন এই আইনটার তীব্র নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করিলেন। বিলাতে সাধারণ নির্ব্বাচনের পর উদারনৈতিক দল মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়া লর্ড রিপনকে এদেশে বড়লাট নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তিনি আসিয়া এই আইন তুলিয়া দেন।

যে বৎসরে দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন বিধিবদ্ধ হয়, ঠিক ঐ সনেই 'আর্মস এক্ট' বা অস্ত্র আইনও বিধিবদ্ধ হইল। এই যে এক কলমের খোঁচায় ভারতবাসীদের নিরস্ত্র করা হইল

আজ পর্যন্ত আমরা তাহার ফল ভোগ করিতেছি। ভারত-প্রবাসী ইংরেজ ফরাসী আর্মানী বুদ্দিস্তানী যে কেহই অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে, কিন্তু পারিবে না শুধু ভারতবর্ষের যুগযুগান্তের সভ্যকার অধিবাসী হিন্দু মুসলমান প্রভৃতিরা। অস্ত্র আইন ভারতবাসীকে কতখানি নির্বীর্য ও পৌরুষহীন করিয়াছে তাহা যে কোন একটি শস্ত্র জাতির সঙ্গে আমাদের তুলনা করিলে সহজেই বুঝা যাইবে। বিপিনচন্দ্র বলেন,

> "Even more than the Vernacular Press Act this Arms Act wounded our self-respect. And the feeling of resentment against it was, though not so vocal, much wider than that aroused by the Vernacular Press Act."
>
> (ইংরেজী আত্মচরিত, পৃ. ২৯৪)

অর্থাৎ, দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইনের চেয়েও অস্ত্র আইন আমাদের আত্মসম্মানে বিশেষ আঘাত দিয়াছিল। ইহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কথায় অতখানি প্রকাশিত না হইলেও মুদ্রাযন্ত্র আইনের চেয়ে ঢের বেশী ছড়াইয়া পড়ে। কংগ্রেসের প্রথম যুগে প্রায় প্রতিটি অধিবেশনেই এই অস্ত্র আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হইত। বিধিবদ্ধ হইবার পরেই ইহার বিরুদ্ধেও তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছিল। উদারনৈতিক দল পার্লামেন্টে ইহার বিরুদ্ধে মন্তব্য করিলেও পরে যখন মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিলেন তখন দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন বটে, কিন্তু অস্ত্র আইন প্রত্যাহার সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করেন নাই।

সুতরাং দেখা গেল, শাসনব্যবস্থার ফলে শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে সংঘাত উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার ফলে গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় ভাবধারণায় আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। শাসক জাতিও এতদিন নিজেদের যে ক্ষমতা সংহত করিয়া লইতেছিল, পাছে তাহাতে কোনরূপ ত্রুটি দৃষ্ট হয় এইজন্য দ্রুত নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেও আরম্ভ করিল। শাসক ও শাসিত উভয়ই কি ভাবধারণায় কি কার্য্যক্রমে যেন বিপরীতমুখী হইয়া উঠিতে লাগিল। এই অবস্থার মধ্যে আমরা অষ্টম দশকে উপনীত হইলাম।

বিংশ শতাব্দীর মানুষ আমরা

শ্রীশান্তি পাল

কুৎসিত অভ্যাস ভরা অলস মুহূর্ত্ত আমার,
খর্ব্ব করে জীবনের সত্যাশ্রয়ী জীবে,
প্রতিহিংসা জ্বলে ওঠে বনাগ্নির মত
ভস্ম করি' বুদ্ধিচয় সহজাত জ্ঞান।
পাংশুল ধরণী
গৃহে গৃহে ওঠে হাহাকার
হতশ্রীতে ভ'রে যায় মন,
তবু গান গাহি, তবু চলি—
অবিরাম অবিচ্ছেদ, একটানা গতি
মাত্র দেড়ফুট ব্যবধান।
রক্ত মাংস দিয়ে গড়া এই দেহখানি
তাই এত রক্ত ভালবাসি।

প্রেম প্রীতি দয়া মায়া ভালবাসা মিথ্যা এই সব
বহুমূল মজ্জাগত কুসংস্কার মত।
বিংশ শতাব্দীর মানুষ আমরা
বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান,
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে হের হের প্রতিচ্ছায়া তার
মূর্ত্ত হ'য়ে উঠিতেছে প্রতি পলে পলে
নিতান্ত সে দৃষ্টি কটু।
জিজ্ঞাসে পথিক আর কতদূর ভাই ?
মন্বন্তর ?—মহামারী ?—বিপত্তি ?—বিপ্লব ?—
শ্রীসংযুক্ত কলাবিদ্যা এ যে !
আমাদের সৃষ্টি নব, সভ্যতার চরম বিকাশ !
একের ইচ্ছায় মরে কোটি কোটি প্রাণ
তবু সাড়া নাই এই নিখিলের বুকে
বিংশ শতাব্দীর দায়, মানুষ আমরা !

উপায় ও পন্থা

অমৃত কুঁঅর

আচার্যবিনোবা সংকট নিবারণকল্পে উপায় ও পন্থা নির্ধারণে গান্ধীজী যখন নিজে অবহিত হইলেন, এবং তৎপ্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, তখন হইতে এ বিষয়ে অসংখ্য প্রস্তাব গান্ধীজীর কাছে নিরন্তর আসিতেছে। ঐ প্রস্তাবসমূহের কতকগুলি তিনি তাঁহার বিভিন্ন বিবৃতি ও 'হরিজন'-এ লিখিত প্রবন্ধে ইতিপূর্বেই সন্নিবেশ করিয়াছেন। এই স্থলে আরও কতকগুলি প্রণিধানযোগ্য প্রস্তাবের প্রতি দেশকর্মীর ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। তাহার কোন্ কোন্‌টিকে সরকার কার্যে রূপ দিতে পারেন তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন। জনসাধারণের কর্তব্য হইবে আবশ্যকমত সাধ্যানুসারে সহযোগিতা করা।

কার্পাস-চাষোপযোগী 'কৃষ্ণ মৃত্তিকা' নামে পরিচিত বহু লক্ষ লক্ষ একর জমিতে—গণ্টুরে ৪ লক্ষ, কৃষ্ণা ৪ গোদাবরী জেলায় ৬ লক্ষ, সাবরমতীতে ১০ লক্ষ, ও অন্যান্য স্থানে ১০ লক্ষ—এখন তামাকের আবাদ হইতেছে। ইহা সরকারবিহিত যে তামাকের ব্যবহারে লোকের ক্ষতি ছাড়া চুক্তি নাই, তাই এই সুযোগে ঐসব জমির মালিকগণ, তামাকের বদলে তথায় খাদ্য-শস্যের ও গো-খাদ্যের চাষ প্রবর্তন করিতে পারেন।

২। সুবাসিত তৈল, সাবান ইত্যাদি প্রসাধনদ্রব্য প্রস্তুত করিতে নারিকেল-শুঁঠ নামে পরিচিত, মালা-বর্জিত শুষ্ক নারিকেলের বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে। শুঁঠ সহজে পচে অনায়াসে বহুদিন রাখা যায়। ইহা পুষ্টিকর খাদ্য। নারিকেল-শুঁঠে প্রচুর পরিমাণে উত্তম উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ, খনিজ লবণ ও খাদ্যপ্রাণ বর্তমান। কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরেই নারিকেল বেশি জন্মে। নারিকেল-তৈলের ব্যবসায় খুব বড় বড় ব্যবসায়ীর হাতে।

৩। পুণা হইতে একটি বন্ধু জোয়ারের দুইরকম নমুনা পাঠাইয়াছেন। 'ক'-চিহ্নিত নমুনার জোয়ার লোকে শত শত বৎসর চাষ করিয়াছিল। বাধ্যতামূলক আইন করিয়া প্রতি মণ (৪০ সের) ৬৲ টাকা দরে সরকার তাহা কিনিয়া লয়। কয়েক মাস পূর্বে যে সব কৃষক নিজেদের উৎপন্ন শস্যে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদের 'খ'-চিহ্নিত নমুনার জোয়ার এখন পেটের দায়ে ১০৲ টাকা দরে কিনিয়া জীবন রক্ষা করিতে হইতেছে। এই কথা সত্য হইলে, ইহাকে সরকারী মহলের অযোগ্যতার, অপরিণামদর্শিতার ও গরিবের হিতাহিত-প্রশ্নে চরম উদাসীনতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলিয়া ধরিতে হইবে। স্থানীয় লোকের কি-পরিমাণ খাদ্য-শস্য আবশ্যক তাহা সঠিক নির্ণয় না করিয়া এক দানা খাদ্য-শস্যও রপ্তানি হইতে দেওয়া অন্যায়।

৪। এক সুহৃদ বিহার হইতে মহুয়া সম্বন্ধে গান্ধীজীকে লিখিয়াছেন। মহুয়া খাওয়া যায়, কিন্তু দেশীয় মদ তৈয়ারি করিতেই মহুয়ার ব্যবহার অধিক হইয়া থাকে। কড়া আইন করিয়া মহুয়া হইতে মদ তৈয়ারি যদি খুব কমাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে গ্রামের লোকে মহুয়া অনুপুরক খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে পাইবে। তাহাতে আর একটা লাভও হইবে। অধিকাংশ লোকে আয়ের শতকরা ২০৲ টাকা নেশায় নষ্ট করে। এই টাকা তখন আর খরচ করিবার উপায় থাকিবে না। তাহা দিয়া তাহারা এখনকার অপেক্ষা অধিক দুধ, শাক-সবজি, ডিম ইত্যাদি কিনিতে সক্ষম হইবে। গরুকে দানা দিতে হয়। মহুয়া খাওয়াইলে, গরুকে এখন যে দানা দেওয়া হয়, তাহা অপেক্ষা অনেকটা কম দিলেও চলিবে।

৫। খাদ্য-শস্য হইতে মদ প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

৬। খেতসার তৈয়ারির কারখানায় চাল বা ভুট্টা চালান দেওয়া সাময়িকভাবে একেবারে বন্ধ করিতে বা খুব কমাইতে হইবে।

৭। পাঞ্জাব হইতে এক বন্ধু জানাইয়াছেন যে গম যেসব স্থানে জন্মে, তথায় লোকে কাঁচা ঘাস হিসাবে গরুকে গম-গাছ খাইতে দেয়। এইভাবে দৈনিক বহু শত মণ গম-গাছ গরুর পেটে যায়। ফলিতে দিলে, ২০০/—৩০০/ মণ এইরূপ গম-গাছ হইতে ৫০০০/—৭৫০০/ মণ গম পাওয়া যায়। বন্ধুটি বলেন, মানুষের খাদ্য-পরিমাণ যেমন বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, গো-খাদ্যের পরিমাণও তেমনই নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া

কর্তব্য। আর, গম-গাছের পরিবর্তে গরুকে অধিক পরিমাণে কাঁচা-ঘাস ও সবজি দেওয়া উচিত।

৮। হোটেলে ও রেস্তোরাঁয় নানাপ্রকার বিস্কুট, কেক্, লৌকিন খাদ্য ও মিঠাই তৈয়ারি হয়। এ বিষয়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এবং এরূপ খাদ্য যাহাতে কম তৈয়ারি হয়, সেদিকে নজর দিতে হইবে।

৯। উৎসব উপলক্ষে বা কাহারও সম্মানার্থে ভোজের আয়োজন বন্ধ করিতে হইবে।

১০। শ্রীশ্যারেলালজী চালের সম্পর্কে ইতিপূর্বে লিখিয়াছেন। তাহা হইলেও, চালের কথার পুনর্বার অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। দিনাজপুর হইতে একজন জানাইয়াছেন যে চালের কলে ৩০,০০০/ মণ খুদ পড়িয়া আছে ও নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কিন্তু লোককে তাহা দিলে কয়েক হাজার লোক খাইয়া বাঁচিত। লেখক আরও বলেন, বাঙলা দেশে কত চাল হয়, তাহার কত অংশ গবর্মেণ্ট চালের কল হইতে কিনিয়া থাকে এবং তাহা কি কাজে লাগায়, কত খুদ বাংলার বিভিন্ন স্থানের কলে মজুত আছে ও খুদ-বিতরণের নিমিত্ত নিযুক্ত কোন খাদ্য-কমিটির হাতে ঐ খুদ দেওয়া হইবে কিনা ইত্যাদি বিষয় নিরূপণের জন্য তদন্ত হওয়া আবশ্যক।

১১। অধ্যাপক বদ্ধ মনে করেন যে সহরবাসীদের জন্য রেশনের ব্যবস্থা করিতে সরকার কোন কসুর করেন নাই বটে, কিন্তু পল্লী-অঞ্চলের সম্বন্ধে তাঁহারা কোন চিন্তাই করেন নাই। তিনি নিম্ন-বর্ণিত প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন :

(ক) খাদ্য-শস্যের মূল্য বৃদ্ধি করিলে অর্থের লোভে কৃষক অন্য শস্যের আবাদ করিবে না। কাপড়, কেরোসিন, আলানি কাঠ ও তৈলের অভাবে কৃষক নিরতিশয় কষ্ট পাইতেছে। খাদ্য-শস্যের মূল্য বাড়িলে ও ব্যবসায়ীর হাতে দিয়া বিক্রয় না করিয়া নিজেরা ক্রেতার কাছে বিক্রয় করিলে তাহাদের কষ্টের উপশম হইবে। অন্ন, বস্ত্র ও একান্ত আবশ্যক বস্তুর কথা তো গেল। তাহা বাদে গৌণ বস্তুও যাহাতে উৎপন্ন শস্যের সঙ্গত বিনিময়ে রেশনিং ব্যবস্থায় তাহাদের পক্ষে সুলভ হয় তাহা করিতে হইবে।

(খ) অন্যান্য মূল্যে চাষ-আবাদের বন্দোবস্তি ব্যবস্থা।

(গ) কে কত বেশি উৎপাদন করিতে ও কে কত কমে চালাইতে পারে, এ বিষয়ে গৃহস্থ, কৃষক ও গ্রামবাসী অন্য-লোকের অনাবিল প্রতিযোগিতা। যে সব কৃষক অধিক উৎপাদন করিবে, তাহাদের অধিক পয়সা ও অধিক গৌণ দ্রব্য দেওয়ার ব্যবস্থা।

(ঘ) কৃষি-যোগ্য পতিত জমি কোথাও অনাবাদী থাকিবে না। জমি নাই এমন কৃষককে বা কৃষক-সংঘকে, তথায় খাদ্য-শস্যের চাষ করিতে হইবে, এই সর্তে তাহা বিলি করিতে হইবে।

(ঙ) খাদ্য-শস্য যাহারা উৎপন্ন করে, তাহারা যাহাতে সংবৎসরের খোরাকের অধিক খাদ্য না রাখে, সে বিষয়ে সচেষ্ট হইতে হইবে। অতিরিক্ত খাদ্য-শস্য গ্রাম্য পঞ্চায়েতের হাতে দিতে হইবে। পঞ্চায়েত কৃষক ভিন্ন অন্য লোকের ও ক্ষেত-মজুরদের কাহার কি পরিমাণ দরকার নির্ণয় করিয়া তাহা ন্যায্যভাবে বণ্টন করিয়া দিবে।

(চ) অতিরিক্ত খাদ্য-শস্য অপর স্থানে পাঠাইতে হইলে তাহার ব্যবস্থা রেলার কর্তৃপক্ষ করিবে। খাদ্য-শস্যের সংগ্রহ, বণ্টন ও ন্যায্যসঙ্গত বরাদ্দের ভার থাকিবে রেশনিং কর্তৃপক্ষের হাতে।

(ছ) গ্রামের লোকে বিবাহ ও অন্যান্য উৎসব হইতে যাহাতে এখন বিরত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিবাহাদি উৎসব একান্ত যদি হয়ই, তবে নিয়মরক্ষার অধিক দ্রব্য যাহাতে খরচ না হয় তাহা দেখিতে হইবে। অপচয় তো নিবারণ করিতেই হইবে।

(জ) মিস্ত্রী ও তদ্বিধ লোকের জন্য একস্থানে আহারের ব্যবস্থা করিলে অপচয় কম হইবে আর খরচ কম পড়িবে।

(ঝ) প্রতি পঞ্চাশ গ্রামের জন্য অথবা প্রত্যেক তালুকের জন্য এক-একটি শস্যের গোলা রাখিতে হইবে। তাহা হইলে কোন গ্রামের হঠাৎ অভাব হইলেই অবিলম্বে প্রয়োজনমত খাদ্য-শস্য দেওয়া যাইবে। অন্যথায় বিভ্রাট ঘটিবে।

(ঞ) গো-শকটের নিমিত্ত যতটা-পরিমাণ লোহা ও লৌহ-নির্মিত জিনিস দরকার ততটা-পরিমাণ লোহা ও লৌহ-

নির্দিষ্ট জিনিস প্রত্যেক তালুককে দিতে হইবে। অন্যথায় খাদ্য-শস্য সংগ্রহে ও বিতরণে ব্যাঘাত জন্মিবে।

(চ) একস্থান হইতে অপরস্থানে খাদ্য-শস্য প্রেরণের জন্য দরকার হইলে সামরিক বিভাগের মোটর গাড়ি এ কাজে লাগাইতে হইবে এবং আবশ্যকমত এজন্য স্পেশাল রেলগাড়ির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ছ) সহরবাসীদের অপেক্ষা গ্রামবাসীদের জন্য অধিক খাদ্য-শস্যের বরাদ্দ করিতে হইবে।

(জ) জলের অপচয় নিবারণ করিতে হইবে এবং দরকারমত কূপ খনন করিতে হইবে। কূপের সংস্কার প্রয়োজন হইলে সরকার সংস্কার করাইবে।

(ঝ) বনজ ও তৃণজ সার সংগ্রহ ও প্রয়োজনমত অন্যস্থানে প্রেরণ করিতে হইবে। ইহার রেলভাড়া কম করিতে হইবে। সারের বিতরণ-ব্যবস্থা পঞ্চায়েতের হাতে বা কৃষক-সংঘের হাতে দিতে হইবে।

(ঞ) একই জমিতে বৎসরে তিন-চার-বার কন্দের চাষ করা যায়। বেশি করিয়া কন্দের চাষ করিতে লোককে উৎসাহ দান করিতে হইবে।

(ট) ধান ঢেঁকিতে ভানিতে হইবে। তাহা হইলে শতকরা ১০ ভাগ বেশি চাল পাওয়া যাইবে।

(ঠ) প্রাদেশিক ও জেলা-কর্তৃপক্ষ যদি বৈজ্ঞানিক প্রথায় ধান গম ও কলাইয়ের চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে ইহাদের পুষ্টিকারিতা শতকরা ১৫ হইতে ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

১২। গো-পালনে লোককে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। গন্টুর হইতে একটি বন্ধু লিখিয়াছেন যে তাঁহার জেলার 'অঙ্গোল' গাভীর ভাল দুগ্ধবতী গাভী বলিয়া খ্যাতি আছে। কিন্তু সামরিক প্রয়োজনে ও কসাইখানার জন্য তাহা প্রতিনিয়ত চালান হইতেছে।

১৩। এই সংকট নিবারণের জন্য সমর-বিভাগের লোকদের, বিশেষ যাহাদের কাজ হইতে অবাধ দেওয়া হইতেছে তাহাদের, কি কি কাজে লাগানো যাইতে পারে তাহা এক পত্রপ্রেরক নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন যে কলাণ হইতে কারজাট পর্যন্ত যে উপত্যকা বিস্তৃত তাহা খুব উর্বরা দেশের জমি। এই উপত্যকার ধার দিয়া নদীর জল সমুদ্রে বহিয়া যায়। তাহা সত্ত্বেও নভেম্বর হইতে জুন পর্যন্ত এখানকার হাজার হাজার বিঘা জমি পড়িয়া থাকে। নদীর আশ-পাশের জমিতে নদীর জল সেচের ব্যবস্থা সহজেই হইতে পারে, আর দূরের ক্ষেতের জন্য কূপ খনন করিয়া দিলেই হয়। কিন্তু গরীব ধানের চাষীর পক্ষে এই ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। ধানের ক্ষতি না করিয়া যদি অন্য শস্যের আবাদ জলের সাহায্যে হয়, তাহা হইলে সমর-বিভাগের ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার ও অপর সৈনিকদের এই কাজে গবর্ণমেণ্ট লাগাইবে না কেন? এখানে যে প্রস্তাব করা হইল এই বৃহৎ দেশের অন্য অনেক জায়গায়ও, তদনুসারে কাজ করা যাইতে পারে।

১৪। পরিশেষে, সর্বজননিন্দিত চোরাবাজারের ও অতিলাভের আশায় সঞ্চয় করিয়া রাখার প্রবৃত্তির কথা বলিতেই হইবে! ধনী ব্যক্তিরা চোরাবাজারে না কিনিলেই চোরাবাজার থাকিত না। ইহাই চোরাবাজার বন্ধ করিবার উৎকৃষ্ট পথ। ধনীরা এ কথায় কান দিবেন কি? হিংসা আজ আকাশে বাতাসে সর্বত্র বিদ্যমান। কেবল খুন-খারাবি, লুঠতরাজ, অগ্নি-সংযোগ ও সম্পত্তির নাশকেই যে হিংসা বলে তাহা নহে। লোভ, স্বার্থপরতা, শোষণ, উৎকোচ দান ও গ্রহণ এবং নৈতিক আবিলতা, খুন ও লুট-তরাজ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর হিংসার কার্য। আর তাহার ফলও সমধিক মারাত্মক। জনতার বিক্ষিপ্ত রোষ কালক্রমে মন্দ হইয়া যায়, অথবা অধিকতর প্রবল হিংসার কাছে পরাভূত হইয়া ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু শেষোক্ত হিংসা-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নাই। কীট যেমন পুষ্পকে অলক্ষ্যে ব্যাধিদুষ্ট করিয়া দেয়, ইহাও তেমনই সমাজদেহে প্রবিষ্ট হইয়া সমাজের জীবনী-শক্তি বিনষ্ট করিয়া দেয়। ইহা বিরুদ্ধে অনুপেক্ষণীয় জনমতের সৃষ্টি হইলে, এবং লোকে নৈতিক আচরণের আবশ্যকতা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করিলেই তবে পাপ দূর হইবে। পুণা, ২. ৩. ৪৬

—হরিজন পত্রিকা হ'তে উদ্ধৃত

পুস্তক-পরিচয়

[অনুগ্রহ করিয়া সমালোচনার জন্য দুইখানি পুস্তক পাঠাইবেন। ম:

বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলন—সমরেন্দ্রনাথ বসু। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র কংগ্রেস। সি ১৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা। মূল্য চারি আনা।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র কংগ্রেসের সম্পাদক সমরেন্দ্রনাথের এই ছোট্ট পুস্তিকাখানি নানা কারণে অত্যন্ত মূল্যবান। রাজনৈতিক আন্দোলনে পৃথিবীর সব দেশেই ছাত্রসমাজ একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকে। পরাধীন দেশের রাজনৈতিক সংগ্রামে ছাত্রদের দান অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। চীনের ছাত্র আন্দোলনের ব্যাপকতা এই বিষয়ে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সমরেন্দ্রনাথ এই ছোট্ট পুস্তিকাখানিতে বাঙলার আগষ্ট বিপ্লবের পরবর্তী যুগে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন কি ভাবে কাজ করিতেছে সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। বিপ্লব-সমর্থক ও বিপ্লব-বিরোধী দলগুলির কার্যধারার বিশ্লেষণ ও ঐতিহাসিক বিবর্তন তিনি বিশদভাবে দেখাইলেও তিনি বাংলা দেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস উনিশ শতক হইতে দিয়াছেন। ডিরোজিও স্থাপিত Academic Association, ১৮৩৮ সালে স্থাপিত Society for the Acquisition of General Knowledge, Epistolary Association প্রভৃতি আমাদের বর্তমান ছাত্র আন্দোলনের প্রথম পুরোধা একথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। বর্তমান ছাত্র আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁহার এই পুস্তিকাখানি প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের আমরা পড়িতে অনুরোধ করিতেছি। এ সম্পর্কে লেখকের প্রতি আমাদের একটি নিবেদন আছে। তিনি বাঙলার ছাত্র আন্দোলন সম্বন্ধে একটি বৃহত্তর ইতিহাস লিখিলে আমাদের রাজনৈতিক সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইবে। অবশ্য এরূপ পুস্তক লেখা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু ইহার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর বঙ্গীয় ছাত্র-আন্দোলনের ইতিহাসের আবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না।

লোক-শিক্ষা—দেবাংশু সেনগুপ্ত, এম-এ। লোক-শিক্ষা পরিষদ। ১১ বি, এস্, আর, দাশ রোড, কলিকাতা। মূল্য চার আনা।

আমাদের জনসাধারণের নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য যে-সরকারী যে সব প্রচেষ্টা হইতেছে "লোক-শিক্ষা-পরিষদের" প্রচেষ্টা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। গ্রন্থকার এই পুস্তিকাখানিতে প্রায় কোনরূপ বাদের মধ্যে না যাইয়া জনসাধারণের নিরক্ষরতা দূর সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা দিয়াছেন তাহা আমরা প্রত্যেকটি কংগ্রেস-কর্মীকে বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এই পরিকল্পনার বিশেষত্ব এই যে ইহাকে বাস্তবে রূপ দিবার চেষ্টা বহুলাংশে সার্থক হইয়াছে। ছাত্র ও ছাত্রীরা ইচ্ছা থাকিলেই এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে পারেন। এই পুস্তিকাখানির বহুল প্রচার হইলে দেশবাসীর যথেষ্ট উপকার হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

সাহিত্যে প্রগতি—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রকাশক—পূরবী পাবলিশার্স ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪০+২৫০+৮৵০। মূল্য ৩।০ আনা।

এক সময়ে আমাদের ভিতরে বিশেষতঃ আমাদের সাহিত্যিক ও শিল্পীদের মধ্যে, একটি 'রবিন্‌সন্-ক্রুসো'-সুলভ 'সমাজবদ্ধ মানুষের প্রভাব ব্যতীতই জীবনকে ও জীবনের স্বপ্নকে গড়িয়া তোলার ভাব' কাজ করিত। এই সব সাহিত্যিক এবং শিল্পীর দল তাঁহাদের সৃষ্ট কার্য্যগুলিকে লৌকিক জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধবিহীন এক ঐশ্বরিক প্রেরণার দান বলিয়া মানিয়া লইতেন এবং জনসাধারণকে তাহাই জানাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে মানুষের ধারণার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্য এবং শিল্পের মূল্য নির্দ্ধারণের ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কোনো সাহিত্যিক বা শিল্পীর বিচার করিতে হইলে তাঁহার সমসাময়িক সমাজকে পরিষ্কারভাবে জানিবার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আমরা মানিয়া

লইয়াছি। সমকালীন সমাজ ব্যবস্থাকে একেবারে অস্বীকার করিয়া কেহই যে চলিতে পারেন না, একথা আজ আর তর্ক বিচারের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সাহিত্যিক বা শিল্পীর মন নির্ভীব দর্পণ মাত্র নহে। সমাজকে বা তাহার চিন্তা-ধারাকে নির্খুত ভাবে প্রতিবিম্বিত করা সাহিত্য বা শিল্পের উদ্দেশ্য নহে এবং সে পথে তাহার কোনোও সার্থকতাই নাই সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার ঘাত প্রতিঘাত এই সব সাহিত্যিক বা শিল্পীর মনকে কি ভাবে স্পর্শ করিয়াছে তাহাই তাঁহাদের সৃষ্টকার্যের মাধ্যমে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়।

ডাঃ দত্ত বলিতে চাহিয়াছেন যে সাহিত্যের ভিতর দিয়া লেখকের এই মনোভাব যখন উত্তরোত্তর সমাজব্যবস্থার দিকে যাইবার ইঙ্গিত দিয়াছে তখনই আমরা তাহাকে প্রগতিসূচক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। বলা বাহুল্য এই ইঙ্গিতের অর্থ নির্বিচার চীৎকার মাত্র নহে। সাহিত্যের রীতিকে পূর্ণ মূল্য দিয়াও লেখকের মনোভাবের যে প্রচ্ছন্ন নির্দেশ থাকে এখানে তাহারই বিচার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই প্রগতির বিচারের অন্যতম মাপকাঠি বর্ণিত চরিত্রের সামাজিক অবস্থান। যে কোনোও সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলেই দেখা যায় যে সাহিত্যের মূলচরিত্রগুলির উপাদান আদিম কৃষিসভ্যতার যুগে শাসক এবং তাঁহার পার্শ্বচরগণের জীবন হইতেই লওয়া হইত এবং তাহাই ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া আধুনিক নগর সভ্যতার যুগে ধনিক শ্রেণী বা তাহাদেরই নিম্ন অংশের মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবন হইতে লওয়া হয়। এইভাবে ক্রম বৃহত্তর জনগণের জীবনকে সাহিত্যের ভিতর দিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা মুষ্টিমেয় কয়জন হইতে বহুজনকে অনুভব করিবার পথে লইয়া যায়। কিন্তু বহুজনের জীবন যাত্রা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া রচিত এই সাহিত্য কোনো বিশেষ যুগের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে না। সমাজের উচ্চতরশ্রেণীর মার্জিত সাহিত্যের সঙ্গেই স্বল্প শিক্ষিত জনগনের জীবনধারা হইতে আহৃত এই অমার্জিত সাহিত্যের স্রোত একটি সমান্তরাল রেখায় যুগ যুগ ধরিয়া বহিয়া আসিয়াছে। শিক্ষা ও উপযুক্ত উৎকর্ষের অভাবে এই সাহিত্য ধারা অধিকাংশ যুগেই অলঙ্কারবিদ্ পণ্ডিতদের উন্নাসিক অবজ্ঞার আড়ালেই রহিয়া যায়। পুরাতন লোক সাহিত্য প্রচলিত ছড়া প্রভৃতির ভিতর বহুজনের জীবনের ছবির যে টুকরাগুলি ছড়ানো দেখা যায় তাহাকেই অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক দেখাইয়া তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলে আমরা বিস্মিত না হইয়া পারি না। ডাঃ দত্ত আমাদের সেই ভাবে বিস্মিত করাইয়া দেওয়ার দাবী রাখেন।

বহুজনের জীবনভাষ্য হওয়া ছাড়াও ভাব প্রকাশের আর এক প্রগতিশীল রূপ দেখি জনমনীষতার সুদৃঢ় প্রকাশে। এই জনমনীষতা কেবল যুক্তিতর্কের অবতারণা নহে, সমাজ ব্যবস্থায় নানারূপ পরস্পর বিরোধী ও আত্মঘাতী জটিলতা দেখিয়া সাহিত্যিক যে মতবাদের ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন তাহা কিরূপে সমষ্টিগত ভাবে মানব মনকে উত্তরোত্তর সমাজ ব্যবস্থার দিকে ঠেলিয়া দেয় তাহা বিশেষ ভাবেই লক্ষণীয়। ভারতের কয়েকটি বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের ভিতর দিয়া কিভাবে এই সমাজ, জাতি এবং জীবনকে বুঝিবার চেষ্টা হইয়াছে ডাঃ দত্ত তাহার একটি মূল্যবান ধারণা আমাদের মনে জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অল্প কয়টি প্রবন্ধের ভিতর দিয়া বাঙলা, হিন্দী ও উর্দু সাহিত্যের লেখকদের আত্মপ্রকাশ চেষ্টা এই বিশেষ দিক হইতে দেখিয়া সাধারণ বাঙালী পাঠকের সম্মুখে তাহাকে পরিষ্কার ভাবে মেলিয়া ধরার কৃতিত্ব সামান্য নহে। তবে প্রবন্ধগুলি বিচ্ছিন্ন বলিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের রূপ সম্বন্ধীয় একই উক্তি একাধিক বার প্রয়োগ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে প্রবন্ধগুলির তথা বইটির মূলরস বিশেষ ব্যাহত হয় নাই বলা চলে।

তবে গ্রন্থকারের নিকট আমাদের একটি অনুরোধ আছে যে বইটি যখন বিশেষ করিয়া বাঙালী পাঠকের জন্যই লেখা তখন তিনি যেন পরের সংস্করণে যে সব হিন্দী ও উর্দু কবিতার বাঙলা অনুবাদ দেওয়া হয় নাই সেগুলিরও অনুবাদ যোগ করিয়া দেন। আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে প্রুফ সংশোধন অত্যন্ত কষ্টকর কাজ এবং ডাঃ দত্তের ন্যায় একজন প্রবীন ব্যক্তিকে এই কষ্ট স্বীকার করিতে বলা যায় না। কিন্তু তাহা ভালভাবে না করাইয়া লইলে উদ্ধৃত কবিতাংশগুলি কোনো কোনো জায়গায় প্রেস কম্পোজিটারের হাতে অনর্থক ওলট পালট খাইয়া পাঠকের মনোদুঃখের কারণ হইয়া থাকিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব—

বিগত ২৪ মার্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষভাবে সুসজ্জিত এক বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি হিসাবে উৎসবে যোগদান করেন। পদবী সম্মান লাভেচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবার অনেক বেশী হয়েছিল। আমন্ত্রিত দর্শকদের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় বহু মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। এবারকার উৎসবে প্রধান অঙ্গ পণ্ডিত জহরলালের ভাষণ। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের অতীত ঐতিহ্য এবং ভাবীকালের গৌরবময় রূপ বিশ্লেষণ করেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের নেতৃত্বে এশিয়ার অন্যান্য মহাদেশসমূহকে ঐশ্বর্য ও নায়কত্বের দিক দিয়ে অতিক্রম করার এ আশা পণ্ডিতজী ব্যক্ত করেন।

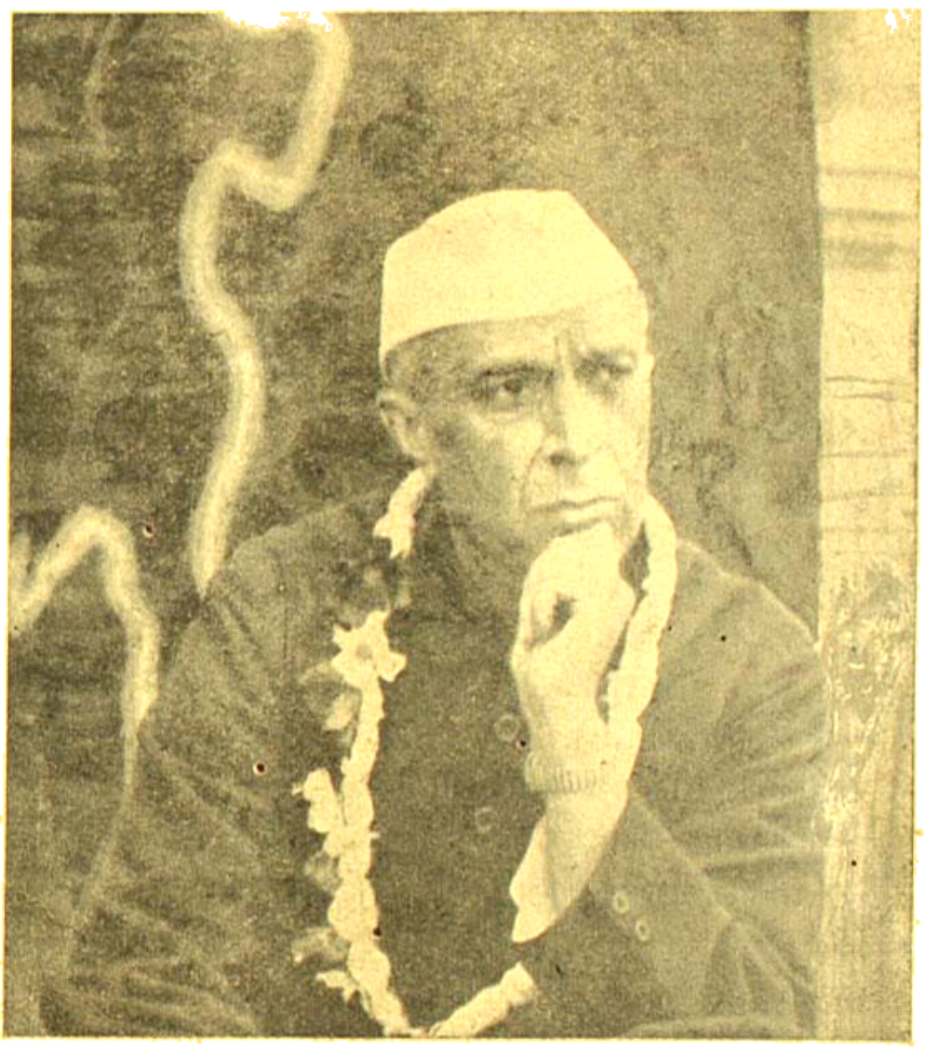

বিশ্ববিদ্যালয়ের তাই স চেন্সেলার, যুবক সম্প্রদায়কে দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের সঙ্কল্প গ্রহণ করে অবিচলিত দৃঢ়তার সঙ্গে লক্ষ্য পথে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের চেন্সেলার সার ফেড্রারিক বারোজ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অদূরবর্তী। তিনি ছাত্রছাত্রীদিগকে স্বাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাদের যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন।

মুসলিম লীগের ভাগ্য বিপর্যয়—

মুসলিম লীগের তাদের ঘর বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছে। সম্প্রদায়ের কৃপাদৃষ্টি যে সংগঠনের ভিত্তি সেই সংগঠনের এই শরিণাম অবশ্যম্ভাবী। মুসলিম লীগের কর্ণধার মিঃ জিন্না থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য তাঁবেদার সদস্যরা ও জানতো যে ইংরেজ স্বার্থে মুসলিম লীগকেই তাদের অংশীদার

যে গ্রহণ করবে এবং সেটা আদৌ বলে ক্ষমতা লাভের প্রলোভনে মুসলিম লীগকে আশ্রয় করেছিল। আমেরী সাহেবের বহু অপকর্মের দোসর হিসাবে জিন্নাসাহেব তাদের কাছ থেকে যথেষ্ট প্রশ্রয় পেয়েছিল যার ফলে ভারতবর্ষে মুসলিম সমাজে তার প্রতিষ্ঠা হয়ে উঠেছিল অনন্যসাধারণ। বৃটিশ রাজনীতিকরা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিল যে জাতীয় মহাসভার আদর্শের সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কোন আপোষ সম্ভবপর নয়। সুতরাং তারা মুসলিম দলপতি ও তার অনুচরদের সাহায্যে কংগ্রেসের অগ্রগতিকে প্রতিহত করার প্রয়াস পেয়েছিল কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশে লক্ষ লক্ষ নরনারী স্বাধীনতার জন্য যে মৃত্যুপণ সংগ্রাম আরম্ভ করেছে তার শক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং তারি ফলে ভারতবর্ষে স্বাধীনতার ভিত্তিতে একটা বোঝাপড়া করার জন্য ইংরেজ রাজনীতিকরা আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছে। এই নির্বাচনও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে মুসলমান জনসাধারণ লীগের অনুবর্তী নহে। আসাম, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ জিন্নাসাহেবের পাকিস্থানী স্বপ্ন ব্যর্থ করে দিয়েছে। সিন্ধু প্রদেশে লীগদল খেতাঙ্গদের পক্ষপুটচ্ছায়ে থেকেও বোধ হয় শেষ পর্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারলো না। সিন্ধুর প্রাদেশিক লীগের সভাপতি মিঃ গজদার ব্যবস্থা পরিষদে যে বক্তৃতা করেছেন তাতে তিনি মিঃ জিন্নার অনুগ্রহপুষ্ট লীগ সদস্যদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। তিনি বলেছেন যে এইসব লীগ সদস্যরা দেশের সত্যিকার কল্যাণকামী নহে। তাহারা ইস্‌লামের দোহাই দিয়ে মুসলিম জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের হীনস্বার্থে কায়েম করার চেষ্টা করেছে। মিঃ গজদারের বক্তৃতা থেকে এইটী অনুমান করা যায় যে তিনি এবং তাঁহার অনুগামী একাধিক মুসলমান সদস্য মিঃ সৈয়দ ও মৌলাবক্সের সহযোগিতায় দেশের স্বাধীনতাকামী এক দলগঠন করতে অগ্রসর হবেন এবং সে দল কংগ্রেসের সঙ্গে এক যোগে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যাবে। মুসলিম লীগের উপর শেষ আঘাত হেনেছেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এট্‌লী তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে তিনি, মুসলিম লীগকে ভারতবর্ষে অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে দেবেন না। জিন্না সাহেব আমেরী সাহেবের প্রতিশ্রুতির প্রতি বৃটিশ রাজনীতিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেও তিনি তার লুপ্তপ্রায় প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্ধার করতে পারবেন না। মুখে বিদ্রোহের হুমকি দিলেও বিদ্রোহ করবার সত্যিকারের শক্তি যে তাঁর নেই সেটা ঘোষণা করেছেন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন—

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এবারকার অধিবেশনে যে সব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তন্মধ্যে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান খাদ্য-পরিস্থিতির এবং বৃটিশ মন্ত্রীমণ্ডলের সঙ্গে ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ইতিকর্ত্তব্য সংক্রান্ত আলোচনাই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। লর্ড ওয়াভেল ভারতবর্ষের খাদ্য-পরিচালনার জন্য যে যুক্তকমিটি গঠন করার প্রস্তাব করেছিলেন ওয়ার্কিং কমিটি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। ওয়ার্কিং কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত খাদ্য সংক্রান্ত সমস্যা সমূহের সুষ্ঠু সমাধান সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান সরকার যতদিন কার্যকরী থাকবে ততদিন অন্য কোন কমিটির পক্ষে এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা সাধ্যাতীত। বাস্তবিকক্ষেত্রে এই কমিটি শুধু পরামর্শদাতা কমিটিরূপে পর্যবসিত হবে। আর যদি লোকায়ত্ত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সরকারই অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে খাদ্যসমস্যারও সমাধান করতে সমর্থ হবে। এইরূপ কোন কমিটির আর প্রয়োজন হবে না।

বৃটিশ মন্ত্রীদের সঙ্গে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আলাপ আলোচনা চালাবার দায়ীত্ব রাষ্ট্রপতি আজাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। যখনই প্রয়োজন বোধ করবেন তখনই তিনি ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আহ্বান করবেন। এবং [redacted] গান্ধীর পরামর্শ প্রার্থনা করবেন। সমগ্র দেশ এই আলাপ আলোচনার ফলাফলের জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। কংগ্রেস ভারতবর্ষের জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত যেমন সমগ্র দেশেরই সিদ্ধান্তরূপে পরিগণিত হবে ঠিক তেমনই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দেরও এমন এক ব্যবস্থায় উপনীত

হওয়া প্রয়োজন, যে ব্যবস্থা জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবে।

দিল্লী পুলিশের অনশন ধর্মঘট—

'রুটীর বদলে ইষ্টক' দেওয়ার প্রাচীন প্রবাদ বাক্য কার্যে পরিণত করেছে দিল্লীর পুলিশ কর্তৃপক্ষ। বর্তমান দুর্মূল্যের দিনে স্বল্প বেতনভোগী পুলিশদের জীবনযাত্রা যে কি দুর্বহ হয়ে উঠেছে তার দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বহু আবেদন নিবেদন করেও যখন ফল হোল না তখন দিল্লীর দুই সহস্রাধিক পুলিশ ধর্মঘট আরম্ভ করেছে। তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণের চেষ্টামাত্র না করে' কর্তৃপক্ষ সশস্ত্র বৃটিশবাহিনীর সহায়তায় এই আন্দোলন দমন করার সঙ্কল্প করেছে। ইহার প্রতিবাদে অন্যত্রও যে বিক্ষোভ দেখা দেবে সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু কর্তৃপক্ষ জনবিক্ষোভকে বিবেচনার মধ্যেই আনবে না কারণ কর্তৃপক্ষ জনমতের উপর নির্ভরশীল নহে। পুলিশের দাবী অত্যন্ত সাধারণ এবং ন্যায়সঙ্গত। তাদের প্রথম দাবী দেশের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে তাদের বেতন বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়তঃ উৎকৃষ্টতর খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা। কর্তৃপক্ষ অনায়াসেই তাদের দাবী পূরণ করতে পারে। আমরা আশা করি কর্তৃপক্ষ তাদের অনুসৃত নীতি পরিবর্তন করবে।

ভারত সরকারের বাজেট—

অর্থসচিব স্যার আর্চিবল্ড রোনাল্ডস কেন্দ্রীয় পরিষদে যুদ্ধবিরতির পর যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে দেশব্যাপী নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়েছে। ১৯৪৪-৪৫ সনে ১৫৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়বে ব'লে যে অনুমান করা হয়েছিল সেখানে প্রকৃতপক্ষে দশ কোটি টাকা কম ঘাটতি পড়বে। ১৯৪৬-৪৭ সালে মোট ৩১৬ কোটি টাকা ব্যয় হবে এবং সমস্ত হিসাব দেখিয়ে অর্থসচিব বলেছেন যে, আগামী বৎসর গভর্ণমেণ্টের নিট ঘাটতির পরিমাণ হবে ৩৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা।

আগামী বৎসরে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রত্যক্ষ কোন ব্যয় নাই, বরং পূর্বের লক্ষেরও বেশী সৈন্য অবসর গ্রহণ করবে তবুও কিন্তু রাজস্বসচিব যুদ্ধব্যয় ব্যাপারে ততখানি খরচ হ্রাসের ব্যবস্থা করতে পারেন নি। এই যুদ্ধব্যয়ই তখনো থাকবে বাজেটের সর্বাপেক্ষা বড় খরচ। সাধারণ শাসনের খরচ অপেক্ষা সমরবিভাগের খরচ থাকবে ত্রিগুণেরও বেশী; এবং ভারতবাসীর পক্ষে এই সমরবিভাগের খরচ সম্বন্ধে ভোট দিবার কোন অধিকারই নাই। তারা শতকরা ৮২৲ টাকা খরচের ব্যাপারে ভোট দিবার অনধিকারী, অধিকারী শুধুমাত্র শতকরা ১৮৲ টাকা খরচের। রাজস্বসচিব এত খরচের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বলেছেন যে, ভারতীয় সৈন্য ও নৌবহরকে জাপানে রাখতে হয়েছে। এই অবাঞ্ছিত ও অপমানকর অধিকার ভারতবর্ষের ঘাড়ের ওপর কেন চাপানো হ'ল? পরাধীন ভারতবাসী পরাধীনতার জ্বালা মর্মে মর্মে জানে। তাকে যেমন একদিন যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করতে তারতবাসীর অনুমতির অপেক্ষা করা হয় নাই, ঠিক জাপান শাসনের অংশ গ্রহণ করানোতেও বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষের মত গ্রহণ করা প্রয়োজন বোধ করে নাই। এখানে আসল কথা হচ্ছে জাপান শাসন করতে ইংরেজের যে ব্যয় হবে তার একটা প্রকাণ্ড অংশের দায়িত্ব ভারতবর্ষের উপর চাপানো। এভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার স্বার্থ রক্ষা করতে ভারতবর্ষ বিন্দুমাত্রও রাজী নয়। তার মূলমন্ত্র হ'ল 'ভারত ছাড়ো', 'এশিয়া ছাড়ো'।

রাজস্বসচিব যে বাজেট দেখিয়েছেন তার সর্বাপেক্ষা ত্রুটি হচ্ছে এই যে, এটাতে দরিদ্রকে সাহায্যের জন্য বা আসন্ন দুর্ভিক্ষের প্রতিকারের জন্য কোন একটি ব্যবস্থাও করা হয় নাই। বাজেটে দেখা হয়েছে শুধু ধনী ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ ও সুবিধা।

অতিরিক্ত মুনাফা-কর উঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। এটা শুধু ধনীদেরই সুবিধার জন্য। যখন এই কর ছিল তখন এই কর থেকে রেহাই পাবার জন্য ব্যবসায়ীরা কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদের অধস্তন কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করেছিল, যেন ওটা মুনাফা নয়, ব্যবসায়েরই খরচ। এখন ওই কর উঠে যাওয়াতে ব্যবসায়ীরা কর্মচারীদের আর বর্তমানে বর্দ্ধিত বেতন দেওয়া প্রয়োজন বোধ করবে না,

মনে করবে সেই টাকাটা তাদেরই প্রাপ্য। যাঁরা মনে করেন যে, এই অতিমুনাফা কর উঠে যাওয়াতে জিনিসের মূল্য কমে যাবে তাঁরা অনেকখানি ভুল করেন। অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, বোম্বের মিলমালিকরা অতিলাভ সত্ত্বেও বস্ত্রের মূল্য হ্রাস করে নাই। তখন তারা শুধু অতিরিক্ত মুনাফা কর আইন অনুসারেই সরকারকে একশত কোটি টাকা কর দিতে বাধ্য হয়েছিল। মানুষ তখন অগ্নিমূল্যে বস্ত্র কিনতে বাধ্য হয়েছে, আবার ওদিকে অর্থাভাবে, ক্রয় করবার ক্ষমতার অভাবে না খেতে পেয়ে মরেছে। তবুও মিলমালিক বস্ত্রের মূল্য হ্রাস করে নি।

কতগুলি নিত্যব্যবহার্য বিষয়ে কর বৃদ্ধি করাতে প্রত্যক্ষভাবে দরিদ্র জনসাধারণেরই দুঃখবৃদ্ধি ও ব্যবসায়ীর লাভ হবে। যেমন সুপারী তামাক প্রভৃতি। দরিদ্রের বোঝাকে একটু হাল্কা করার কোন ব্যবস্থাকেই বাজেটে স্পর্শ করা হয় নাই। জ্বালানীস্বরূপ কেরোসিনের দাম আরো কমানো উচিত ছিল। জনসাধারণের জীবন ধারণের উপযোগী খাদ্য এবং খাদ্য উৎপাদনের উপযোগী সকল প্রকার দ্রব্যের, ও বস্ত্র, দিয়াশলাই, লবণ, চিনি, পোষ্টকার্ড, যাতায়াতের ব্যয়, চিকিৎসা ব্যয়, ইত্যাদির মূল্য কমাবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল।

এটা অবশ্য স্বীকার্য যে, ব্যবসায়ীর লাভের সুযোগ উপস্থিত হ'লে ব্যবসায়ী শিল্প বাণিজ্য বিস্তারে মনোযোগী হবে। ফলে অধিকতর লোক ওইদিকে উপার্জনের পথ পেলে বেকার সমস্যার কিছুটা সহুপায় হতেও পারে। কিন্তু যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজে যে অনুপাতে লাভ পেতে এরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে যুদ্ধের পরে সেটা সংকুচিত হবার আশঙ্কায় তারা নিজেদের তহবিল বড় করবার চেষ্টায় প্রথমে মনোযোগ দেবে—তারপর শিল্পবাণিজ্য বিস্তারের কথা উঠবে। অতএব অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে সম্মুখে যে আসন্ন দুর্ভিক্ষের ছায়া দেখা যাচ্ছে তার আংশিক সমাধানেরও কোন ব্যবস্থা বাজেটে দেখতে না পেয়ে আমরা স্তম্ভিত হয়েছি। বাজেটে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাসের কোন পরিকল্পনাই নাই। সরকারী সাহায্য দিয়ে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নিম্নস্তরে রাখার কোন ব্যবস্থাই কি করা যেতো না? সরকারের দৃষ্টি এখন এদিকেই আকর্ষণ করা কর্তব্য বলে আমরা মনে করি।

খাদ্য সংকট—

খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, সেন বলেছেন যে, ভারতে ৬০ লক্ষ টন খাদ্যবস্তু ঘাটতি পড়বার সম্ভাবনা। এই সংকট এড়াবার জন্য খাদ্যের রেশন শতকরা ২৫ ভাগ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেখানে দুর্ভিক্ষ আসন্ন সেখানে দেশের সর্বসাধারণকে মৃত্যু থেকে বাঁচাবার জন্য নিজের গ্রাস থেকে দুমুঠি খাদ্য তুলে রাখা সুবিবেচনার পরিচায়ক।

সে সঙ্গে আবার এটুকুও দেখা প্রয়োজন যে যতটা খাদ্য দেওয়া হ'ল তাতে উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টি আছে কিনা। কিন্তু শুধু রেশন কমিয়ে দিলে কতটুকু আসে যায়? এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ নিবারণ করতে যে উপযুক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন তা হচ্ছে কি? আসন্ন দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে বাজার-দাম বৃদ্ধি পেতে সুরু করেছে। কিশোরগঞ্জ, হাজিগঞ্জ, আরামবাগ, মিরকাদিম, মুন্সীরহাট ইত্যাদি বহু স্থানে ইতিমধ্যেই ২৪৲, ২০৲, ১৮৲ টাকায় চালের মূল্য উঠে গিয়েছে। শোনা যাচ্ছে ঠিক গতবারের মতো নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর প্রভৃতি বাজার থেকে চাল উধাও হয়েছে। মজুতদার ও মুনাফাখোরেরা ইতিমধ্যেই বাজারে কাল দৃষ্টি ফেলতে আরম্ভ করেছে। অবিলম্বে সরকারের উচিত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রে এদের শাস্তি বিধান করা। একমাত্র সরকারই এদের দমন করতে পারে—সব স্বাধীন দেশেই তা করা হয়ে থাকে। সরকারের আরো উচিত বাধ্যতামূলকভাবে চালের দাম বেঁধে দেওয়া।

দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক গান্ধীজী প্রভৃতি নেতাদের জানিয়েছেন যে, চালের কলগুলিতে প্রায় ৩০ হাজার মণ ভাঙা চাল প'চে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সরকার নিজেও কিনছেন না এবং কলগুলিকেও সাধারণের কাছে এই চাল বিক্রি করতে অনুমতি দিচ্ছেন না। এই সংবাদ সত্য হলে আমরা সরকার পক্ষের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করি। শুধু একটু কালের জন্য হাহাকার ক'রে যে জাতি অনাহারে মৃত্যুর মুখে চলে যায়, যে দেশের আসন্ন দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচবার প্রয়োজনে সরকার দেশ বিদেশে মুক্ত ডেলিগেশন পাঠিয়ে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা প্রচার করছেন সে দেশে তাঁরা তিরিশ

হাজার মণ খাদ্য পচিয়ে ফেলছেন কেন? এই মুহূর্তেই সরকারের এই দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি বলেছেন যে, ১৯৪৪ সালের মে মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত কেবলমাত্র কলকাতার বন্দর থেকেই ৬১, ৭৯৭ টন, ৩ হন্দর, ৪০ পাউণ্ড চাল রপ্তানী করা হয়েছে। সরকার এ বিষয়ে যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের দেশ এখনো বিদেশে কেমন ক'রে চাল রপ্তানী করছে? এগুলি এক্ষুনি বন্ধ ক'রে দেওয়া প্রয়োজন।

আমরা শুনছি নিরন্নের অভিযান সুরু হয়ে গিয়েছে, ২৪ পরগণা, হাওড়া প্রভৃতি জেলা থেকে দৈনিক গড়ে ২০০ 'নিরন্ন' কলকাতায় আসছে। বোম্বাই সরকার বিজাপুর জেলার ১৫৪টি পল্লীতে এবং আমেদনগর জেলার ১৯৯টি পল্লীতে খাদ্যাভাব ঘোষণা করেছেন। আবার আরেকদিকে প্রচণ্ড অপচয়ের বিবরণও আসছে। বাগেরহাট থেকে জানানো হচ্ছে যে ৮০ হাজার মণ ধান খোলা মাঠেপাঠে পচে' যাচ্ছে। অসামরিক সরবরাহ বিভাগের হাওড়া, শালকিয়া, বাঁধাঘাট অঞ্চলে কয়েকটি গুদামে প্রায় দুই লক্ষ মণ আটা এবং চাল প'চে যাওয়াতে সেগুলি নাকি নদীর সাহায্যে লিলুয়ার নিকট বাদা অঞ্চলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। গত মাঘ মাসে নাকি নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীতে প্রচুর আটা ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কিছুদিন পূর্বে বাখরগঞ্জ জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির নিকট জানিয়েছেন যে, লক্ষ লক্ষ মণ চাল ও ধান বাখরগঞ্জের মফঃস্বল থেকে নৌকা ও ষ্টীমারে অজ্ঞাতস্থানে পাঠানো হচ্ছে। পাটনা থেকে এ, পি,-র সংবাদে প্রকাশ যে, বিহারের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলি থেকে প্রতিদিন প্রভূত পরিমাণ ধান নেপালের সীমান্ত দিয়ে বাইরে চালান দেওয়া হচ্ছে।

এই সমস্ত অপচয় ও রপ্তানীর সংবাদ সত্য হ'লে, এগুলিকে অবিলম্বে সরকারের বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত। না হ'লে একদিকে হবে প্রচণ্ড অপচয় ও অভাব আরেকদিকে হাজার হাজার দরিদ্রের অনাহারে মৃত্যু। দুর্ভিক্ষ কবলিত ভারতবর্ষ খাদ্য দ্রব্য এক তিলও অপচয় বা রপ্তানী করতে পারে না, এবং এসব বন্ধ করার উপযুক্ত ক্ষমতা আছে একমাত্র সরকারের।

এই অপচয় ও রপ্তানী ছাড়াও অন্য কতগুলি বিষয়ে এখনি সতর্কভাবে কাজ আরম্ভ করা উচিত। গান্ধীজী সেচ কার্যের জন্য কূপ খনন করতে বিশেষ জোর দিয়েছেন। গান্ধীজীর আট দফা পরিকল্পনা বাদেও এবার ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ১৫টি সুন্দর পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে। আমরা জনসাধারণকে ও সরকারকে সেগুলির প্রতি অবহিত হ'তে অনুরোধ করছি।

গবর্ণমেণ্ট ও কম্যুনিষ্ট পার্টি

কিছুদিন পূর্বে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি মারফত কম্যুনিষ্ট পার্টির ভূতপূর্ব সদস্য মিঃ বাটলিওয়ালা কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করেন। বাটলিওয়ালা উক্ত বিবৃতিতে বলেন তিনি কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদক মিঃ যোশী ও ভারত গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব স্বরাষ্ট্র সচিব স্যর রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েলের মধ্যে যে পত্রালাপ চলেছিল তার একটা গোপন ফাইল দেখেছেন। তাঁর মতে উক্ত পত্রালাপ থেকে নিঃসন্দেহ প্রমাণ হবে যে কম্যুনিষ্ট পার্টির পলিট ব্যুরো ও ভারত গবর্ণমেণ্টের মধ্যে একটা মিতালী স্থাপিত হয়, এবং মিঃ যোশী কম্যুনিষ্ট পার্টিকে ভারত সরকারের সাহায্যের জন্য লাগাতে রাজী হয়। এই মিতালী সম্পর্কিত কাজ পার্টির ভিতরে পর্যন্ত অত্যন্ত গোপনে রাখা হত। মিঃ বাটলিওয়ালার মতে ফ্যাসী-বিরোধী আন্দোলনের নাম করে কম্যুনিষ্ট পার্টি যে সব রাজনৈতিক আন্দোলন চালাত সে সবই সরকারকে কয়েকটি সংকট থেকে উদ্ধার করার জন্য যে চুক্তি হয়েছিল, তারই একটি অংশ। মিঃ বাটলিওয়ালা আরও বলেন, "পার্টির গুপ্ত অনুচরদের মারফত ভারতীয় দপ্তরের গোয়েন্দা বিভাগের সাথে মিঃ যোশীর গুপ্তভাবে কিরূপ যোগাযোগ ছিল তাহা প্রকাশ্যভাবে জানাবার জন্য আমি কম্যুনিষ্ট পার্টিকে অনুরোধ করিতেছি।" তিনি মিঃ যোশীকে আরও প্রশ্ন করেন যে ১৯৪২ সালের সংগ্রামের সঙ্গে যে সব জাতীয়তাবাদী কর্মী জড়িত ছিলেন তাদের সম্পর্কে বা আজাদ হিন্দ সরকারের যে সব লোক

ভারতে এসেছিলেন, তাদের সম্পর্কে যোশী সরকারের গোয়েন্দাদের কাছে সংবাদ সরবরাহ করেছিলেন কি না। মিঃ বাটলিওয়ালা যোশী-ম্যাক্সওয়েল পত্রাবলী সাধারণে প্রকাশ করার জন্য যোশীকে আহ্বান করেন।

মিঃ যোশী ও কম্যুনিষ্ট পার্টির সংবাদপত্রগুলো মিঃ বাটলিওয়ালার অভিযোগ সব অস্বীকার করে। বাটলিওয়ালার বিবৃতির জবাব দিতে গিয়ে তাঁরা কংগ্রেস ও বাটলিওয়ালাকে প্রাণ খুলে গালাগালি দেওয়া থেকে সুরু করে অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা বলেছিল। কিন্তু একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের ধার দিয়াও যায় নাই—যোশী ও ম্যাক্সওয়েল সাহেবের মধ্যে কোনরূপ পত্র বিনিময় হয়েছিল কি না সে সম্বন্ধে তাঁরা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ নীরব। বরং এমন ভাব দেখাচ্ছে যে উক্তরূপ পত্রালাপের কথা পর্যন্ত সম্পূর্ণ মিথ্যা। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তরে এ প্রসঙ্গের ওপর খানিকটা আলোক সম্পাত হয়েছে। ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ যে এক প্রশ্নের উত্তরে বর্তমান স্বরাষ্ট্র সচিব জানিয়েছেন যে কম্যুনিষ্ট পার্টি ও সরকারের মধ্যে কংগ্রেসের বিরোধিতা করার জন্য কোনরূপ লিখিত বা অলিখিত চুক্তি হয় নাই। এবং এই উদ্দেশ্যে সরকার কম্যুনিষ্ট পার্টিকে টাকা দেয় নাই। অনেকেরই বোধ হয় সরকারী 'পাকল' সার্কুলারের কথা মনে আছে। এই সার্কুলারে গবর্ণমেণ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টি, রেডিকেল পার্টি প্রভৃতিকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাজে লাগাইবার জন্য সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছিল। বর্তমান স্বরাষ্ট্র সচিবের মতে কংগ্রেস বিরোধিতা করার জন্য সরকার ও কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে কোন প্যাক্ট বা বোঝাপড়া হয় নাই বা সে উদ্দেশ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে টাকা দেওয়া হয় নাই। কিন্তু স্বরাষ্ট্র সচিবের উত্তর থেকে বোঝা গেল না, যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্য করার জন্য সরকার ও কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে কোন বোঝাপড়া হয়েছিল কি না। যদি তা হয়েও থাকে, এবং সে উদ্দেশ্যে যদি তারা সরকারের কাছ থেকে টাকাও নিয়ে থাকে, তবে সেজন্য কম্যুনিষ্ট পার্টির লজ্জার কোন কারণ থাকা উচিত নয় (যেমন রেডিকেল পার্টির নেই)। কারণ কম্যুনিষ্ট পার্টির মতে উক্ত যুদ্ধ জনযুদ্ধ এবং সেজন্য কম্যুনিষ্ট পার্টি সেযুদ্ধে সরকারকে সর্বোতোভাবে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত ছিল; অতএব সেই 'জনযুদ্ধকে' জয়যুক্ত করার জন্য তারা যদি সরকারের সঙ্গে কোন বোঝাপড়া করেই থাকে এবং সেইজন্য সরকারের কাছ থেকে অর্থ ও অন্যরূপ সাহায্য নিয়ে থাকে তবে (অন্যেরা যাই মনে করুক) কম্যুনিষ্টরা, তাদের দিক থেকে, কোন বিবেকবিরোধী কাজ করেছে বলে মনে করা তো উচিত নয়। তা ছাড়া লিখিত বা অলিখিত চুক্তি না করেও তো সরকারের সহযোগিতা করা যায়। আর সরকার কম্যুনিষ্ট পার্টিকে টাকা দিয়েছে, এখন পর্যন্ত তার কোন নিশ্চিত প্রমাণও তো নেই স্বীকার করতে হবে। অবশ্য পাঁচালো সমালোচকরা বলতে পারে যে হাতে নাতে ধরা যায় এমন প্রমাণ রেখেই যে সরকার টাকা দেবে এমন কি কথা আছে। নানা পরোক্ষভাবেও তো সরকার অর্থ সাহায্য করে থাকতে পারে? আর যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করার জন্য সরকার যদি কম্যুনিষ্ট পার্টিকে কোন সাহায্য দিয়ে থাকে, তবে কম্যুনিষ্ট পার্টি সে সাহায্য কংগ্রেস বিরোধিতার কাজে লাগাতে পারে, এবং যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্যের নামে কম্যুনিষ্ট পার্টি যে কংগ্রেস বিরোধিতা করেছে, এ কথা কে না জানে? এর উত্তরে কম্যুনিষ্ট পার্টি বলতে পারে তারা যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে গিয়ে যে সব কাজ করেছে, তাতে কংগ্রেসের বিরোধিতা করা হয় নাই।

এখন বাটলিওয়ালার অভিযোগের কথা। বোম্বাইর ফ্রি প্রেস জার্ণাল, পাটনার সার্চলাইট ও দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইমস্ পত্রিকায় কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রশ্নোত্তরের আর একটি বিবরণ (এসোসিয়েটেড প্রেসের দেওয়া) বের হয়েছে। তাতে প্রকাশ, সৈন্যবিভাগের সঙ্গে মিঃ যোশী গোপন যোগাযোগ রক্ষা করতেন কিনা—মাসানীর এই প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের গোয়েন্দা বিভাগের জন্য তিনি দায়ী নহেন। বাটলিওয়ালার অভিযোগ সত্য কি না এই প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব বলেন, উক্ত অভিযোগের অনেকখানিই ঠিক নয়। যোশী-

ম্যাক্সওয়েল পত্রাবলী প্রকাশ করতে সরকার রাজী আছেন কিনা, মাসানীর এই প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন পত্রলেখকের অনুমতি ছাড়া সরকার তা প্রকাশ করতে পারেন না।

উপরোক্ত প্রশ্নোত্তর থেকে দেখা যায় যে প্রথমত, স্বরাষ্ট্র সচিবের মতে বাটলিওয়ালার সব অভিযোগ মিথ্যা নয়। দ্বিতীয়তঃ, বস্তুতপক্ষে, যোশী ও ম্যাক্সওয়েলের মধ্যে যে পত্রবিনিময় হয়েছিল, সরকার তাহা স্বীকার করছেন। তৃতীয়তঃ, উক্ত পত্রাবলী প্রকাশ করতে সরকারের আপত্তি নাই, কিন্তু অন্তপক্ষের লেখকের অনুমতি না পেলে তাঁরা তা প্রকাশ করতে পারেন না। কেন্দ্রীয় পরিষদের উক্ত প্রশ্নোত্তর প্রকাশ হবার পর যোশী সাহেব ও কম্যুনিষ্ট পত্রিকাগুলো বলছে, "দেখলে তো, স্বয়ং স্বরাষ্ট্রসচিব বলছেন যে বাটলিওয়ালার অভিযোগ সব মিথ্যে!" কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা যোশী-ম্যাক্সওয়েল পত্রালাপ সম্বন্ধে নীরবই আছে। যোশী সাহেবকে এখন পরিষ্কার ভাষায় বলতে হবে, তিনি বা তাঁর পার্টির তরফ থেকে কেউ ম্যাক্সওয়েল বা ভারত সরকারের সাথে পত্রালাপ করেছিল কি না। যদি তা করা হয়ে থাকে, তবে সে পত্রালাপের বিষয়বস্তু নিশ্চয়ই পারস্পরিক কুশল জিজ্ঞাসা ছিল না, তাতে রাজনৈতিক আলোচনাই করা হয়েছে। তা যদি হয়, তবে যোশী সাহেব সে পত্রালাপের কথা স্বীকার করছে না কেন, এবং সে সব পত্র প্রকাশ করছে না কেন বা প্রকাশের অনুমতি দিচ্ছে না কেন?— সে সব পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হোক এবং তখন জনসাধারণ নিজেরাই সে সব পত্র থেকে কম্যুনিষ্ট পার্টির স্বার্থকলাপ সম্বন্ধে নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। যদি যোশী সাহেব এ সব পত্রাবলী প্রকাশ করতে রাজী না হয়, তবে এটা ধারণা করা অন্যায় হবে না যে, এ সম্পর্কে নিশ্চয়ই কম্যুনিষ্ট পার্টির কোথায় একটা দুর্বলতা আছে।

কম্যুনিষ্ট সমর্থকগণ কর্তৃক মহেন্দ্র দাসের হত্যা—

এবারকার নির্বাচন উপলক্ষ্যে বহুস্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা, মারপিট ও খুনজখম পর্যন্ত হয়ে গেছে। এর মধ্যে নেত্রকোণার বালক কংগ্রেসকর্মী শ্রীমান মহেন্দ্র দাসের হত্যা অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার। শ্রীমান মহেন্দ্র নেত্রকোণার ছাত্র-কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট কর্মী। মহেন্দ্র অপর কয়েকজন কংগ্রেসকর্মীর সঙ্গে কংগ্রেসপ্রার্থীর সপক্ষে প্রচার কার্যের জন্য বাহির হয়। উক্ত কেন্দ্রে কম্যুনিষ্ট পার্টির তরফ থেকেও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হচ্ছিল। কম্যুনিষ্ট পার্টির সমর্থকরা মহেন্দ্র ও তার সঙ্গীদের ওপর নির্মমভাবে মারপিট করে। মহেন্দ্রের সঙ্গীরা গুরুতর ভাবে আহত হয়ে কোনক্রমে ফিরে আসে, কিন্তু মহেন্দ্রের কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। দুই তিন দিন পরে একটা ডোবার মধ্যে মহেন্দ্রের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। মহেন্দ্রের মা এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানান যে মহেন্দ্রের মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখা যায়, তাহাকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাহার মৃতদেহ অর্ধদগ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়, এবং তাহার প্রত্যেকটি দাঁত ভেঙে দেওয়া হয়। তরুণ কর্মীর এইরূপ অপমৃত্যুতে আমরা তার আত্মীয়স্বজনের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

প্রাদেশিক নির্বাচন—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন কার্য শেষ হয়েছে। এবারকার নির্বাচনে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, জাতীয়তাবাদী মুসলিম ও কম্যুনিষ্টরাই প্রধানত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। প্রায় সমস্ত সাধারণ কেন্দ্রেই কংগ্রেস-প্রার্থীরা জয়লাভ করেছে এবং হিন্দুমহাসভা ও কম্যুনিষ্ট প্রার্থীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। এ পর্যন্ত যে খবর পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়—হিন্দুমহাসভা একটি এবং কম্যুনিষ্টরা মাত্র তিনটি আসন দখল করেছে। মুসলিম কেন্দ্রে মুসলিম লীগ বিরাট সাফল্য দেখিয়েছে। জাতীয়তাবাদী মুসলীমরা এ পর্যন্ত মাত্র ৪।৫ টা আসন দখল করেছে। নির্বাচিত কংগ্রেস প্রার্থীদের মধ্যে এবার অনেক নির্যাতীত কর্মী, ভূতপূর্ব রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দী আছেন। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা গেল: শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত (ইনি এখনও ভারতরক্ষা আইনে বন্দী আছেন), শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ সেন শ্রীযুক্ত কৃপতি মজুমদার, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত অমরকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত মিহিরলাল

চাটার্জি, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ব্যানার্জী, শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, শ্রীযুক্তা বীণা দাস, শ্রীযুক্ত বিনোদ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ধর, শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায়, শ্রীযুক্ত চারু ভাণ্ডারী, শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল ব্যানার্জী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দলপতি, শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব দাস, শ্রীযুক্ত অমূল্য অধিকারী, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ব্যানার্জী, শ্রীযুক্ত অরুণা চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ মুখার্জী, শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত গণেন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত নিশীথনাথ কুণ্ডু, শ্রীযুক্ত বসন্তলাল মুরারকা, শ্রীযুক্তা আশালতা সেন, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত দিনেশ ব্যানার্জী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী, শ্রীযুক্ত হেরেন সেন, শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার।

ভারতীয় সমস্যা ও ইংরেজের নতুন উদ্যোগ—

১৪ই মার্চ তারিখে বিলেতের পার্লিয়ামেন্টে প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটিলি ভারত সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেছেন তা অধিকাংশ দায়ীত্বশীল ভারতীয় নেতার সমর্থন লাভ করেছে। মিঃ এটিলি ভারতের স্বাধীনতার দাবীকে সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করে নিয়েছেন। জাতীয়তাবাদ যে সমাজের সমস্ত স্তরকে আলোড়িত করেছে এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনীও যে এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয় এই সহজ সত্যটিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা না করে এটিলি সাহেব ভালই করেছেন। "১৯৪৬ সালের উত্তাপ ১৯২০, ১৯৩০ অথবা এমনকি ১৯৪২ সালের উত্তাপ নয়" একথা সত্যিই যদি প্রধান মন্ত্রী বুঝে থাকেন তাহলে শুধু ভারতের পক্ষেই নয়, ইংরেজের পক্ষেও সেটা মঙ্গল। সাম্প্রদায়িক বিরোধকেও তিনি অযথা গুরুত্ব দেন নি। মিঃ এটিলি বলেছেন, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের অগ্রগতির পথে 'ভিটো' ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ আমরা সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকে দিব না। আমাদের শাসক শ্রেণীর মুখে একথাটি সম্পূর্ণ নতুন এবং সেইজন্যে এটি বিশেষ করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতায় যে আন্তরিকতার সুর রয়েছে তা অনেকের মনকে স্পর্শ করেছে। কংগ্রেসও একে ভালভাবে নিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ যে আজ ভারতের মাটিতে টিকে থাকতে পারে না দেশ বিদেশের ঘটনায় ইংরেজ শাসক শ্রেণীর কাছে যদি তা আজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাহলে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই।

প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতায় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশ অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। মিঃ এটিলি বলেছেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠের অগ্রগতির পথে "ভিটো" প্রয়োগের ক্ষমতা সংখ্যালঘিষ্ঠের হাতে দেওয়া হবে না। ভাল কথা। কিন্তু এর মধ্যে একটি জিনিস এখনো বেশ পরিষ্কার হচ্ছে না। মুসলিম লীগের অন্যায় ও গণতন্ত্র বিরোধী দাবীগুলি কংগ্রেসের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয় এবং সেইজন্যে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে মিটমাটেরও কোন সম্ভাবনা এখন দেখা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে কি হবে? অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার দাবীকে স্বীকার করে নেওয়া হবে অথবা মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলিকে আলাদা করে দেওয়া হবে? আলাদা করার আগে সম্প্রদায় নির্বিশেষে স্থানীয় সমস্ত জনসাধারণের মত নেওয়া হবে কি না? আত্মরক্ষা যানবাহন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে সর্বভারতীয় ঐক্য বজায় থাকবে কি না? এইগুলির সন্তোষজনক উত্তরের উপর আলাপ আলোচনার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করছে।

তারপর দেশীয় রাজ্যের প্রশ্ন। এ প্রশ্নে বর্তমান ঘোষণায় বিশেষ কিছু অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। রাজন্যবর্গের শুভ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে মিঃ এটিলি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। তাঁর কথা হচ্ছে, "আমি এক মুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করি না যে ভারতের অগ্রগতিতে ভারতীয় রাজন্যবর্গ বাধার সৃষ্টি করতে চাইবেন।" মিঃ এটিলির এই শিশু সুলভ বিশ্বাস প্রবণতা এই কঠিন রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে কিছুমাত্র সাহায্য করবে না। ভারত সচিব পেথিক্ লরেন্স মিশনটাকে আরো ঘোরালো করে তুলেছেন তাঁর কথাতে দেখা যাচ্ছে যে গঠন তন্ত্র বিধায়ক পরিষদে দেশীয় রাজ্য থেকে যে সব প্রতিনিধি যোগ দেবে তারা যে প্রজাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হবে তার বিশেষ কিছু সম্ভাবনা নাই। এই প্রতিনিধিরা হবে প্রধানতঃ রাজন্যবর্গের মনোনীত ব্যক্তি। এটা নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের মূল নীতির বিরোধী এবং সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসার পথে নানা বাধার সৃষ্টি করবে।

স্ত্রী প্রতিনিধিদের সঙ্গে নেতৃবৃন্দের আলোচনা সুরু হয়েছে। উভয় পক্ষের বন্ধুত্বপূর্ণ উক্তি অনেকের মনেই আশার সঞ্চার করেছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতীয় সমস্যার সমাধানের এত বড় সুযোগ ইংরেজ আর কখনো পায়নি। এবং বর্তমান অবস্থার গুরুত্ব যদি ইংরেজ সত্যিই বুঝে থাকে তাহলে ভারতীয় সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভাবনার একেবারে বাইরে নয়। কিন্তু একথাও ভুললে চলবে না যে ব্যর্থতার বীজ মিঃ এটলি ও পেথিক্‌লরেন্সের উক্তির ফাঁকে ফাঁকে রয়ে গেছে এবং সেইজন্যেই মুক্তিকামী জনগণের কাছে যেন কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখা না দেয়।

ইরাণ ও তুরস্ক সম্পর্কে রুশনীতি—

সত্য, অর্ধসত্য ও মিথ্যা গুজবের ফলে সংবাদ পত্রের পাতায় ইরাণ ও তুরস্ক এখন বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে। ১৩ই মার্চ ওয়াশিংটন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টেট ঘোষণা করলে যে সশস্ত্র সোভিয়েট বাহিনী ইরাণের রাজধানী তেহেরাণের দিকে ধাওয়া করেছে। ১৪ই ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে আবার এ সংবাদের সমর্থন করা হল। ঐ তারিখে কিন্তু পারস্যের প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে এ সংবাদের কোন সমর্থন পাওয়া গেল না, অথচ তখন নাকি রুশ বাহিনী রাজধানী থেকে মাত্র তেইশ মাইল দূরে। ঐ তারিখেই আবার ওয়াশিংটনস্থ ইরাণী দূত এই মত প্রকাশ করলেন যে সোভিয়েট সৈন্যদল তুরস্কের দিকে ধাওয়া করেছে এবং শীঘ্রই তুরস্কের সীমান্তে গোলযোগের আশঙ্কা করা যায়। ১৫ই তারিখে সোভিয়েটের পক্ষ থেকে রুশসৈন্যের তেহেরাণ অভিযানে সংবাদ অমূলক বলে ঘোষণা করা হল এবং সাম্রাজ্যবাদী সংবাদ প্রতিষ্ঠান ঘন্টারও স্বীকার করতে বাধ্য হল যে রুশিয়ার তেহেরাণ অভিযানের সংবাদটি ভুল। ইতিমধ্যে ওয়াশিংটনে আবার সোরগোল পড়ে গেছে, তুরস্ক বুঝি যায় যায়! রুশসৈন্য তুরস্কের সীমান্ত অতিক্রম করল বলে। কিন্তু ইস্তাম্বুলের সরকারি মহলে এর কোন সমর্থন পাওয়া গেল না এবং রুশ সৈন্যও তুরস্কের সীমান্ত থেকে দূরেই রয়ে গেল।

শোনা যায় গোয়েবেল্‌স্ নাকি মিথ্যা সংবাদ সৃষ্টিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। ভদ্রলোক সময় থাকতে বিদায় নিয়ে ভালই করেছেন, তা না হলে তাঁর স্থান আজ কোথায় যে নেমে আসত বলা যায় না।

এই সব আতঙ্ক জনক মিথ্যা সংবাদ সৃষ্টির পিছনে সাম্রাজ্যবাদীদের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। নিকটপ্রাচ্য হচ্ছে এ্যাংলো আমেরিকান্ সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে স্পর্শকাতর স্থান। এশিয়ার অধীন দেশগুলির সঙ্গে ইংরেজের যোগসূত্র প্রধানতঃ এখান দিয়েই গেছে। তা ছাড়া রয়েছে তেলের প্রশ্ন। এখানকার বিপুল তৈল সম্পদ প্রায় সমস্তই এখন ইংরেজ ও আমেরিকার হাতে চলে গেছে। দেশগুলির শাসকবর্গ ইংরেজ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যিক স্বার্থের তল্পিবাহক মাত্র। সাম্রাজ্যবাদীদের এখন মুস্কিল হয়েছে এই যে অন্যান্য অনগ্রসর দেশগুলির মত নিকট প্রাচ্যের দেশগুলিতেও যুদ্ধের ঘাত প্রতিঘাতে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিপুল প্রসার লাভ করেছে। এই বিপ্লবী শক্তির সঙ্গে সোভিয়েট রুশিয়ার সংযোগ দিন দিন ঘনিষ্ট হয়ে উঠছে। এই মূল সত্যটি দৃষ্টি এড়িয়ে গেলে ইরাণ, তুরস্ক থেকে আরম্ভ করে প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, লেবানন এবং এমন কি মিশরের বর্তমান গোলযোগের গুরুত্ব ঠিক বুঝা যায় না।

রুশ সৈন্য কর্তৃক ইরাণ ও তুরস্ক আক্রমণের অমূলক সংবাদ প্রচারের পিছনে ইংরেজ ও আমেরিকার মূলত তিনটি উদ্দেশ্য আছে—(১) এই সব দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলিকে সোভিয়েট বিরোধী করে তোলা, (২) এখানে ইংরেজ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যিক স্বার্থ রক্ষার প্রচেষ্টায় জগতের জনমতের সমর্থন লাভ করা, (৩) প্যালেষ্টাইন, মিশর, ইন্দোনেসিয়া প্রভৃতি দেশের উপর সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের নিষ্ঠুরতা থেকে লোকের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়া।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে রুশিয়া কি চায়? এই সব দেশ থেকে ইংরেজ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব দূর করতে সোভিয়েট রুশিয়ার স্বার্থ রয়েছে নিঃসন্দেহ। কিন্তু এটা শুধু রুশিয়ারই স্বার্থ নয়, সাম্রাজ্যবাদের এই পরাজয়ে সমস্ত মুক্তিকামী মানুষেরই আনন্দের কথা। কিন্তু রুশিয়া কি কেবল এতেই সন্তুষ্ট? অথবা সেও বুঝি তেল ও সামরিক ঘাঁটির লোভে এই সব দেশে নতুন ধরণের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চায়? আজেরবেইজানের স্বায়ত্ত শাসনের আন্দোলন কি

স্বতঃস্ফূর্ত অথবা রুশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী মতলবে সেখানে একটি কৃত্রিম আন্দোলনের সৃষ্টি করছে? ইরাণের রুশ সমর্থক বামপন্থী "তুদে" পার্টি কি সত্যি জাতীয় প্রতিষ্ঠান অথবা রুশিয়ার সাহায্য পুষ্ট একটি পঞ্চম বাহিনী মাত্র? তুরস্ক সম্পর্কে রুশিয়ার আসল উদ্দেশ্য কি?—এই সব দেশ সম্পর্কে রুশিয়ার বর্তমান নীতির বিচার করতে হলে আগের প্রশ্নগুলির নির্ভুল উত্তর পাওয়া দরকার। সাম্রাজ্যবাদী সংবাদ প্রতিষ্ঠান-গুলির একতরফা সংবাদের উপর ভিত্তি করে হটাৎ কোন সিদ্ধান্তে এলে নিকট প্রাচ্যের রুশনীতিকেই শুধু ভুল বুঝা হবে না, এখানের বিপ্লবী জাতীয় আন্দোলনগুলির প্রতিও হয়ত অবিচার করা হবে।

১৩৫২ সাল—

১৩৫২ সাল শেষ হয়ে এলো। কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে বিগতপ্রায় বর্ষের স্মৃতি। বিপ্লবিদলের সংগ্রাম পেল পরিণতি; কারামুক্ত নেতৃবৃন্দের কণ্ঠে নির্ঘোষিত হোল নূতন আশা আকাঙ্ক্ষার বাণী; নবজীবনের স্পন্দন নবীনতর ছন্দে প্রকাশ পেল আমাদের রাষ্ট্রিক জীবনে; বিপ্লবী সুভাষের মুক্তি প্রচেষ্টার অপূর্ব কাহিনী পরিব্যাপ্ত হোল দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুচরদের হিংস্রতার বিরুদ্ধে কলিকাতার রক্তরঞ্জিত রাজপথে ছাত্রদের অভিযান স্মরণ করিয়ে দিলো—"আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি-, কাড়াকাড়ি"। মুক্তিকাম ভারতের শেষ সংগ্রামের অগ্নিশিখা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে হোল পরিব্যাপ্ত; কংগ্রেসের পতাকাতলে সমগ্রজাতি বিদ্রোহের সঙ্কল্প গ্রহণ করলো। বিচলিত হোল সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ; ব্রিটিশ মন্ত্রীত্রয় জাগ্রত ভারতবর্ষের জনমতের অবিসম্বাদিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে ঐক্য স্থাপনের প্রয়াসে উপনীত হোল ভারতবর্ষে; জাতীয় সংগ্রামের সেনানী উচ্চারণ করলেন সাবধান বাণী—"হয় তোমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করো আর নয়ত সমগ্র ভারতে দেখা দেবে এমন এক ব্যাপক বিপ্লব যার প্রতিরোধ শক্তি তোমাদের নেই।" এই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয় আসন দিয়ে বিদায় নিলো ১৩৫২ সাল। এই বর্ষের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা ভাবীকালের দিকে দৃষ্টিপাত করি; নিজেদের প্রস্তুত করি অনাগত ভবিষ্যতের বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করার জন্য।

এই সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরার অষ্টমবর্ষ অতিক্রান্ত হোল। বহু প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মন্দিরাকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়েছে। মন্দিরার পরিচালকদের মধ্যে অনেককেই বিগত কয়েক বৎসর কারান্তরালে থাকতে হয়েছে ফলে মন্দিরার বিকাশ এবং প্রসার আশানুরূপ হয়নি। তথাপি মন্দিরার পাঠক পাঠিকা এবং অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকদের যে সহানুভূতি ও সক্রিয় সহায়তা মন্দিরা পেয়েছে তারজন্য মন্দিরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। এবং তাঁদেরই পূর্ণতর সহায়তার উপরে নির্ভর করে মন্দিরা আরম্ভ করবে তার নবমবর্ষ। নতুন বর্ষ থেকে মন্দিরার বার্ষিক চাঁদা হবে ছয় টাকা এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য হবে আট আনা। মন্দিরার আয়তন হবে বৃদ্ধি পরিচালকদের প্রচেষ্টায়, কিন্তু এর শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করবে মন্দিরার লেখক, পাঠকপাঠিকার এবং অন্যান্য শুভার্থীদের সস্নেহ সহযোগিতার ওপর।

মন্দিরার পরিচালিকাদের মধ্যে অন্যতম শ্রীমতী বীণা দাস কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। আমরা তাঁকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

আগামী বৈশাখ হইতে শ্রীতারাপদ রাহার নতুন উপন্যাস

"যাত্রা হ'ল সুরু"

প্রকাশিত হইবে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা'র কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।